

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

চতুর্থ খণ্ড

মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

□□ সতর্কতা: এই বইটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) প্রযুক্তির সাহায্যে অনুবাদ করা হয়েছে

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস (৪ খণ্ড)

(এই অনুবাদটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) দ্বারা তৈরি)

লেখক : মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান

অরজিনাল বই ডাউনলোড : [link](#)

বিনীত সতর্কতা: এই অনুবাদটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) দ্বারা তৈরি, তাই এতে ভুল থাকা স্বাভাবিক। আকিদা বা ফতোয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই মূল বই যাচাই করার অথবা বিজ্ঞ আলেমদের শরণাপন্ন হওয়ার অনুরোধ রইল। এই অনুবাদের ওপর ভিত্তি করে কোনো আমল বা সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ দায়ভার পাঠকের নিজের। যদি যাচাই করে বা বুঝে-শুনে পড়া সম্ভব না হয়, তবে বইটি না পড়ার জন্য বিনীত অনুরোধ রইল।

□□ পাঠকের প্রতি সতর্কতা

এই অনুবাদটি সম্পূর্ণভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) বা স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তির সাহায্যে তৈরি করা হয়েছে। প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার কারণে এর শব্দচয়ন, বাক্য গঠন কিংবা ভাবানুবাদে অনিচ্ছাকৃত ভুল বা অসংগতি থাকাটা একেবারেই অস্বাভাবিক নয়।

বইটি পড়া শুরু করার আগে দয়া করে মনে এই বিষয়টি গেঁথে নিন যে— “আমি বইটি কেবল জানার ও শেখার উদ্দেশ্যে পড়ছি। পড়ার সময় কোনো কথায় সন্দেহ বা খটকা লাগলে, তা আমি যাচাই না করে গ্রহণ করব না।”

বিশেষ করে আকিদা, ফতোয়া বা স্পর্শকাতর কোনো মাসআলার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র এই অনুবাদের ওপর অন্ধভাবে নির্ভর করবেন না। যেকোনো আমল বা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আগে অবশ্যই মূল বই মিলিয়ে দেখবেন অথবা বিজ্ঞ আলেমদের শরণাপন্ন হবেন।

এই অনুবাদের ওপর ভিত্তি করে নেওয়া যেকোনো আমল বা সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ দায়ভার একান্তই পাঠকের। তাই বিনীত অনুরোধ, নিজে যাচাই-বাছাই করে পড়ার মানসিকতা থাকলেই কেবল বইটি অধ্যয়ন করবেন।

প্রথম সংস্করণ

চতুর্থ খণ্ড

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

ইসলামের সুলতানগণ

পঞ্চম থেকে দশম হিজরি শতাব্দী (দশম থেকে পঞ্চদশ খ্রিস্টীয় শতাব্দী)

সিসিলির ইতিহাস, ক্রুসেড, আতাবেগ আমিরগণ, আইয়ুবী শাসকগণ,

খওয়ারেজম শাহী সালতানাত, তাতার আক্রমণ, মিশরের আব্বাসীয় খিলাফত, মামলুক
সুলতানগণ,

তাতারদের মধ্যে ইসলামের প্রচার, উসমানীয় সালতানাত: প্রতিষ্ঠা থেকে উত্থানকাল পর্যন্ত।

তাকরিজ

শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক ইসকান্দার সাহেব

ভূমিকা

শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি সাহেব দামাত বারাকাতুহুম

প্রচেষ্টা

মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান দামাত বারাকাতুহুম

ইসলামের ইতিহাসের শিক্ষক, জামিয়া আর-রশীদ করাচি

আল-মানহাল পাবলিশার্স

তারিখ-এ-উম্মত-এ-মুসলিমা

সালাতীন-এ-ইসলাম

পঞ্চম থেকে দশম হিজরি শতাব্দী

(দশম থেকে পঞ্চদশ খ্রিস্টীয় শতাব্দী)

সিসিলির ইতিহাস, ক্রুসেডসমূহ,

আতাবেগ আমিরগণ, আইয়ুবী শাসকগণ,

খওয়ারিজম শাহী সালতানাত, তাতার আক্রমণ, মিশরের আব্বাসীয় খিলাফত, মামলুক
সুলতানগণ,

তাতারদের মধ্যে ইসলামের প্রচার, উসমানীয় সালতানাত: প্রতিষ্ঠা থেকে উত্থানকাল পর্যন্ত।

চতুর্থ খণ্ড

গবেষণা

ঐতিহাসিক-এ-ইসলাম মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান মাদাজিল্লুহ

আল-মানহাল পাবলিশার্স

ব্লক এ-১, গুলিস্তান-ই-জোহর, ইউনিভার্সিটি রোড, করাচি

০৩২১-৩১৩৫০০৯, ০৩২১-২০০০৮৭০

www.almanhalpublisher.com

almanhalpublisher@gmail.com

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

সূচিপত্র

পাঠকদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা ৪৮

প্রথম অধ্যায়: ইসলামি রাষ্ট্র সিসিলি ৫০

সিসিলির ইতিহাস ৫১

সিসিলির ভূগোল ৫১

মুসলমানদের আগমনের পূর্বে সিসিলি ৫২

খিলাফতে রাশেদা ও উমাইয়া খিলাফতের যুগে সিসিলি ৫২

বনু আগলাবের শাসনকাল ৫২

সিসিলিতে মুসলমানদের জ্ঞানতাত্ত্বিক পরিবেশ ৫৩

সিসিলি বিজয়ের পূর্ণতা ৫৩

সিসিলিতে মুসলমানদের পতন ৫৫

সিসিলিতে বনু উবাইদের শাসন ৫৬

ইবনে কারহাবের স্বাধীনতা আন্দোলন ৫৬

বনু উবাইদের বিজয় এবং নতুন প্রতিরোধ আন্দোলন ৫৭

আবু আতাফ মুহাম্মদ বিন আশআছ আল-আজদি ৫৮

বনু কালবের আধা-স্বায়ত্তশাসিত শাসন ৫৮

হাসান বিন আলী কালবি ৫৮

আহমদ বিন হাসান বিন আলী ৫৮

রামতার যুদ্ধ ৫৯

ওয়াকআতুল মাজায ৬০

আহমদ বিন হাসানের অপসারণ ৬১

আবুল কাসেম কালবি ৬১

আবুল কাসেম কালবির উত্তরসূরিগণ ৬২

নরমানদের উত্থান ৬২

আফ্রিকা থেকে বনু জুহরির সাহায্য ৬৩

সিজিলিতে অরাজকতা এবং কালবি শাসনের অবসান ৬৩

ঘর পোড়ানো তামাশা ৬৩

ইসলামি সিজিলিকে বাঁচানোর শেষ চেষ্টা ৬৪

রজার-এর ভাই রবার্টের আগমন ৬৪

সানহাজিদের সাহায্য এবং সিজিলিবাসীদের অকৃতজ্ঞতা ৬৫

ইবনে বা'বগের জিহাদ আন্দোলন - বনু উবাইদের জাতিদ্রোহিতা ৬৫

পালেরমো-র পতন ৬৫

প্রতিরোধের শেষ স্ফুলিঙ্গ ৬৬

নরমান শাসনামলে সিজিলির মুসলমানগণ ৬৭

প্রথম রজার: ৪৮৩ হি. থেকে ৪৯৩ হি. (১০৯১ খ্রি. থেকে ১১০১ খ্রি.) ৬৭

ক্রুসেড উসকে দেওয়ার ক্ষেত্রে নরমানদের ভূমিকা ৬৭

সাইমন: ৪৯৩ হি. থেকে ৪৯৯ হি. (১১০১ খ্রি. থেকে ১১০৫ খ্রি.) ৬৮

দ্বিতীয় রজার: ৪৯৯ হি. থেকে ৫৪৯ হি. (১১০৫ খ্রি. থেকে ১১৫৪ খ্রি.) ৬৮

দ্বিতীয় রজারের দ্বিমুখী নীতি ৬৯

উত্তর আফ্রিকায় আক্রমণ ৬৯

আফ্রিকার মুসলিম নারী বন্দীদের মুক্তিতে সিজিলির মুসলমানদের ভূমিকা ৭০

প্রথম উইলিয়াম: ৫৪৯ হি. থেকে ৫৬১ হি. (১১৫৪ খ্রি. থেকে ১১৬৬ খ্রি.) ৭১

উইলিয়াম দ্য গুড: ৫৬১ হি. থেকে ৫৮৫ হি. (১১৬৬ খ্রি. থেকে ১১৮৯ খ্রি.) ৭২

সিজিলিতে ইবনে জুবায়ের আন্দালুসির পর্যবেক্ষণ ও অনুভূতি ৭৩

জার্মান সাম্রাজ্যের যুগে ৭৪

লুসেরায় অবস্থান ৭৪

সুলতান আবু জাকারিয়া ইয়াহিয়া, শেষ আশা ৭৪

লুসেরায় অবস্থান ৭৫

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

ফরাসি উপনিবেশবাদের যুগ—মুসলমানদের সমাপ্তি ৭৫

সিসিলির উলামা ও ফুজলা ৭৬

ইবনে কাহালা: (ম্. ২৮১ হিজরি) ৭৬

ইবনে জাফর: (ম্. ৪৫৫ হিজরি) ৭৬

ইবনে মাগলুব, মায়মুন বিন উমর আল-মাগরিবি: (ম্. ৩১০ হিজরি) ৭৬

সায়েদ আল-রাবি: (ম্. ৪১৭ হিজরি) ৭৬

আবু সাঈদ আল-বারাযি: (ম্. ৪৩০ হিজরির পর) ৭৭

মুহাম্মদ বিন আলী আবু আবদুল্লাহ তামিমি: (ম্. ৫৩৬ হিজরি) ৭৭

ইবনে কাভাহ আল-সিকিল্লি: (ম্. ৫১৫ হিজরি) ৭৭

আবদুল হক মুহাম্মদ বিন হারুন আল-সাহমি আল-সিকিল্লি: (ম্. ৪৬৬ হিজরি) ৭৭

ইবনে রাশিক: (৩৯০ হিজরি থেকে ৪৬৩ হিজরি) ৭৮

ইবনে রাওয়াহা ৭৮

সিসিলির ওপর ইকবালের শোকগাথা (মার্সিয়া) ৭৮

সিসিলির ইসলামি রাষ্ট্রের গভর্নরগণ ৮১

দ্বিতীয় অধ্যায়: ক্রুসেড এবং আতাবেগ শাসকগণ ৮৫

প্রথম ক্রুসেড ৮৬

পিটার দ্য হারমিটের উস্কানি ৮৭

ক্রুসেড বা সলিবি যুদ্ধের অর্থ কী? ৮৯

রুমের সেলজুকদের সাথে যুদ্ধসমূহ ৯০

আন্তাকিয়ার ওপর ক্রুসেডার বাহিনীর দখল ৯০

বাইতুল মুকাদ্দাসের পতন—ফিরিঙ্গিদের লোমহর্ষক অত্যাচার ৯১

মসজিদ আল-আকসা হাতছাড়া হওয়ায় মুসলমানদের দুঃখ ও ক্ষোভ ৯২

সিরিয়ার খ্রিস্টান উপনিবেশসমূহ ৯৩

জেরুজালেমের খ্রিস্টান নবাবগণ ৯৩

আতাবেগ রাষ্ট্র ৯৪

ইমাদ উদ্দিন জেনগি ৯৫

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

জেঙ্গি রাষ্ট্র জিহাদের ময়দানে ৯৫

ফাতহুল ফুতুহ ৯৭

ইমাদউদ্দীন জেঙ্গির হত্যাকাণ্ড ৯৭

এক নজরে ইমাদউদ্দীন জেঙ্গির সীরাত ৯৮

ইমাদউদ্দীন জেঙ্গির উত্তরসূরিগণ ৯৮

নূরউদ্দীন জেঙ্গি ৯৯

দ্বিতীয় ক্রুসেড: ৫৪২ হিজরি (১১৪৭ খ্রিস্টাব্দ) ৯৯

দামেস্ক অবরোধ ১০০

দামেস্কের ওপর নূরউদ্দীনের আধিপত্য ১০০

নূরউদ্দীন জেঙ্গি এবং মিশরের উবাইদি সরকার ১০১

মিশরে শিরকুহ-এর প্রথম অভিযান ১০২

মিশরের দ্বিতীয় অভিযান ১০৩

মিশরের তৃতীয় অভিযান ১০৪

শিরকুহ-এর মন্ত্রিত্ব ও মৃত্যু ১০৫

মিশরে সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর শাসন ১০৫

নূরউদ্দীন জেঙ্গির মৃত্যু ১০৬

নূরউদ্দীন জেঙ্গির সীরাতের কিছু ঈমানদীপ্ত দিক ১০৬

আল-মালিকুস সালিহ ইসমাইল ১০৮

এক নজরে জেঙ্গি বংশের শাসকগণ ১০৯

আতাবক শাসকদের তালিকা ১১০

তৃতীয় অধ্যায়: আইয়ুবী শাসকগণ এবং ক্রুসেড যুদ্ধসমূহ ১১২

সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবী ১১৩

দমইয়াতের ওপর ফিরিজিদের আক্রমণ ১১৪

মিশর থেকে বনু উবাইদ রাষ্ট্রের অবসান ১১৫

ত্রিপোলি (লিবিয়া) পুনরুদ্ধার ১১৬

আরেকটি ব্যর্থ বিদ্রোহ ১১৬

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

চতুর্থ খণ্ড

সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর জীবনে বিপ্লব ১১৭

নিজের জীবনের উদ্দেশ্য চেনা ১১৮

নূরুদ্দীন জঙ্গীর পরে ১১৮

ইস্কান্দারিয়ার যুদ্ধ ১১৯

সিরিয়ার অভিযানসমূহ ১১৯

রামলায় পরাজয় এবং তার প্রতিশোধ ১২০

খলিফা মুস্তাজীর মৃত্যু - আন-নাসিরের খিলাফত ১২২

সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর সিদ্ধান্তমূলক অবস্থানের সুদৃঢ়করণ ১২২

আল-মালিক আস-সালিহের মৃত্যু এবং হালাবের নতুন সরকার ১২২

ইজ্জুদ্দীন মাসউদের সাথে সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর দ্বন্দ্ব ১২২

হিজাজে রেজিনাল্ডের ব্যর্থ আক্রমণ ১২৩

সুলতানের বিরোধীদের পারস্পরিক আঁতাত এবং সম্মিলিত সৈন্য অভিযান ১২৩

হালাব বিজয় ১২৩

ধৃষ্ট খ্রিস্টানদের শাস্তি দেওয়ার অভিযান ১২৪

মসুলের শেষ অবরোধ ১২৪

হিভিনের যুদ্ধ ১২৫

রেজিনাল্ডের পরিণতি ১২৭

ইসলামের গাজীদের প্লাবনসম বিজয়সমূহ ১২৮

বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয় ১২৮

বিজিতদের সাথে সুলতানের উত্তম আচরণ ১৩১

সুলতানের দয়া, লেন পুলের জবানিতে ১৩২

তৃতীয় ক্রুসেড ১৩৩

মধ্য সিরিয়ার খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে অভিযানসমূহ ১৩৪

তৃতীয় ক্রুসেড উসকে দেওয়ার জন্য খ্রিস্টানদের কূটকৌশল ১৩৪

তৃতীয় ক্রুসেড এবং আক্কা রণাঙ্গন ১৩৬

ফ্রান্সের রাজা এবং ইংল্যান্ডের রাজার আগমন ১৩৯

চতুর্থ খণ্ড

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

একজন ইউরোপীয় মহিলার আত্ননাদে সাড়া দেওয়া ১৪০

আক্কার পতন ১৪০

উপকূলের যুদ্ধ ১৪০

আল-কুদসের যুদ্ধ ১৪১

আলোচনা এবং রামলার সন্ধিচুক্তি ১৪২

ক্রুসেডাররা কী হারালো আর কী পেল? ১৪৩

সুলতানের ওসিয়ত ১৪৪

সুলতান সালাহউদ্দিনের ইন্তেকাল ১৪৪

সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সীরাতের কিছু দিক ১৪৭

আকিদা ও আদর্শ ১৪৭

ন্যায় ও বিচার ১৪৭

দুনিয়াবিমুখতা ও অল্পেতুষ্টি ১৪৮

চরিত্র ১৪৮

শরীয়তের অনুসরণ ১৪৯

সালাতের পাবন্দি ১৪৯

কুরআন মাজীদের প্রতি অনুরাগ ১৫০

হাদীসের প্রতি অনুরাগ ১৫০

যুদ্ধের ময়দানে হাদীসের দরস ১৫০

সাহসিকতা ১৫১

জিহাদ - আত্মার খোরাক ১৫১

নৌ-জিহাদের উদ্দীপনা ১৫২

ক্ষমা ও মার্জনা ১৫৩

শত্রুদের সাথে সদাচরণ ১৫৪

মেহমানদারি ১৫৪

উলামায়ে কেরামের সম্মান ও মর্যাদার একটি ঘটনা ১৫৪

সুলতান আইয়ুবীর উত্তরসূরিগণ ১৫৬

তারিখ উম্মতে মুসলিমা (চতুর্থ খণ্ড)

আল-মালিকুল আদিল পৃষ্ঠা ১৫৬

চতুর্থ সলিবি জং পৃষ্ঠা ১৫৭

বাইজেন্টাইন রোমের পতন পৃষ্ঠা ১৫৯

আল-মালিকুল আদিলের পুত্রগণ পৃষ্ঠা ১৬০

পঞ্চম সলিবি জং পৃষ্ঠা ১৬১

আল-মালিকুল আদিলের মৃত্যু এবং তাঁর পুত্রদের ক্ষমতা লাভ পৃষ্ঠা ১৬৩

আল-মালিকুল কামিল মুহাম্মদ পৃষ্ঠা ১৬৩

দমইয়াতের ওপর ফিরিজিদের দখল পৃষ্ঠা ১৬৪

নীলনদ উপত্যকার ঐতিহাসিক যুদ্ধ পৃষ্ঠা ১৬৪

ষষ্ঠ সলিবি জং পৃষ্ঠা ১৬৭

জার্মানদের হাতে বাইতুল মুকাদ্দাস সমর্পণ - উলামাদের প্রতিবাদ পৃষ্ঠা ১৬৮

আল-মুয়াজ্জাম, আল-আশরাফ এবং আল-কামিলের মৃত্যু পৃষ্ঠা ১৬৯

আল-মালিকুল সালিহ নাজমুদ্দিন আইয়ুব পৃষ্ঠা ১৬৯

আস-সালিহ আইয়ুবের গুণাবলি পৃষ্ঠা ১৭০

খাওয়ারিজমি সৈন্যদের সমস্যা কীভাবে সমাধান করা হয়েছিল? পৃষ্ঠা ১৭১

আস-সালিহ আইয়ুব এবং আস-সালিহ ইসমাইলের দ্বন্দ্ব পৃষ্ঠা ১৭২

বাইতুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধার - গাজার যুদ্ধ পৃষ্ঠা ১৭২

আস-সালিহ আইয়ুবের বিজয়সমূহ এবং কীর্তিসমূহ পৃষ্ঠা ১৭৩

সপ্তম সলিবি জং পৃষ্ঠা ১৭৪

আস-সালিহ আইয়ুবের ওসিয়তনামা পৃষ্ঠা ১৭৭

তোরান শাহকে কি উত্তরসূরি নিযুক্ত করা হয়েছিল? পৃষ্ঠা ১৮৫

দমইয়াতে ফিরিজিদের অবস্থা পৃষ্ঠা ১৮৬

শাজারাতুদ দুরের নেতৃত্ব পৃষ্ঠা ১৮৬

আল-মালিকুল মুয়াজ্জাম তোরান শাহ পৃষ্ঠা ১৮৯

ফিরিজিদের সাথে চূড়ান্ত যুদ্ধ পৃষ্ঠা ১৯০

তোরান শাহের হত্যাকাণ্ড এবং আইয়ুবি শাসনের অবসান পৃষ্ঠা ১৯১

চতুর্থ খণ্ড

উন্মত্তে মুসলিমার ইতিহাস

রানী শাজারাতুদ দুরের সাথে ফিরিজিদের সফল আলোচনা ১৯২

আইয়ুবী বংশের গুরুত্বপূর্ণ শাসকদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ১৯৪

চতুর্থ অধ্যায়: খাওয়ারিজম শাহী সালতানাত এবং তাতার ফিতনা ১৯৬

তাতার ফিতনা ১৯৭

হাদীসে তাতার ফিতনার প্রতি ইঙ্গিতসমূহ ১৯৭

তাতারী আক্রমণের ধ্বংসলীলা ১৯৮

খাওয়ারিজম সালতানাত ২০০

খাওয়ারিজম শাহী শাসকগণ ২০০

আনুশতেগিন এবং তার বংশধর ২০১

আলাউদ্দিন তেকিশ: ৫৮৯ হিজরী থেকে ৫৯৬ হিজরী (১১৯৩ খ্রি. থেকে ১২০০ খ্রি.)

..... ২০১

আলাউদ্দিন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহ: ৫৯৬ হিজরী থেকে ৬১৮ হিজরী (১২০০ খ্রি. থেকে

১২২১ খ্রি.) ২০২

তাতারী আক্রমণের সময় মুসলিম বিশ্বের অবস্থা ২০৫

আসমানী নিদর্শনসমূহ ২০৬

আল্লাহর ওলীদের মুখে বিপদাপদ নাযিল হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ ২০৬

বাগদাদ খিলাফত এবং খাওয়ারিজম সালতানাতের মধ্যে উত্তেজনা ২০৭

চেঙ্গিস খানের উত্থান ২০৮

ইয়াসা ২০৯

চীন বিজয় ২০৯

খলীফা নাসিরের দূত প্রেরণ ২০৯

চেঙ্গিস খানের বাণিজ্যিক কাফেলা ২১০

দূতের হত্যাকাণ্ড এবং চেঙ্গিস খানের ক্রোধ ২১১

প্রথম যুদ্ধ ২১১

খাওয়ারিজম শাহের পলায়ন ২১৩

বুখারার পতন ২১৩

সমরকন্দের পতন ২১৫

খাওয়ারিজমের মুসলমানদের হিজরত ২১৫

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

আলাউদ্দিন খাওয়ারিজম শাহের মৃত্যু ২১৬

শিক্ষণীয় স্থান এবং ধ্বংসের জন্য দায়ীরা ২১৬

পশ্চিমী তাতারী ২১৭

রাশিয়া ও ইউরোপে তাতারীদের আরও অগ্রসর হওয়া ২১৮

ধ্বংসের পর ধ্বংস ২১৮

তাতারীদের আতঙ্ক ২২০

খলিফার কৌশল ২২২

সুলতান জালাল উদ্দিন খাওয়ারিজম শাহ ২২৪

সুলতান জালাল উদ্দিনের সিংহাসন আরোহণ (৬১৭ হিজরি - ১২২০ খ্রিস্টাব্দ) ২২৫

জিহাদের নতুন আন্দোলন..... বিজয়ের যুগ ২২৬

গজনি ও পারওয়ানের যুদ্ধসমূহ ২২৬

মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ ২২৯

নীলামের যুদ্ধ: (শাওয়াল ৬১৮ হিজরি - নভেম্বর ১২২১ খ্রিস্টাব্দ) ২২৯

সুলতান জালাল উদ্দিন হিন্দুস্তানে ২৩১

চেঙ্গিস খানের মঙ্গোলিয়ায় প্রত্যাবর্তন: ৬১৯ হিজরি (১২২২ খ্রিস্টাব্দ) ২৩২

দিল্লির শাহের কাছে সাহায্য প্রার্থনা ২৩৩

সুলতানের ইরান যাত্রা এবং প্রতিরক্ষা প্রাচীর নির্মাণ ২৩৪

তাতারীদের প্রতিরোধের জন্য বিশ্বব্যাপী প্রতিরক্ষা প্রাচীর গড়ার পরিকল্পনা ২৩৫

খিলাফত দরবারে দূতিয়ালির ব্যর্থতা এবং বাগদাদী বাহিনীর সাথে যুদ্ধ ২৩৬

উত্তর ইরান ও আজারবাইজানে সুলতানের বিজয়সমূহ ২৩৭

জর্জিয়ার বিজয়সমূহ ২৩৭

খলিফা নাসিরের মৃত্যু ২৩৮

বাতিনী সম্প্রদায়ের দমন ২৩৯

তাতারীদের পুনরায় আক্রমণ - চেঙ্গিস খানের মৃত্যু ২৩৯

জর্জিয়ার ঐতিহাসিক যুদ্ধ ২৪১

সুলতানের বিরুদ্ধে মুসলিম শাসকদের যৌথ অভিযান ২৪১

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

তাতারীদের আক্রমণ এবং সুলতানের ডাক ২৪২

সুলতানের পরিণতি ২৪৩

সুলতানের পর মুসলিম বিশ্বের অবস্থা ২৪৩

সুলতানের সঙ্গীদের পরিণতি ২৪৪

খাওয়ারিজম শাহী সালতানাত ২৪৫

ক্ষমতার কাল ১৫৩ বছর ২৪৫

পঞ্চম অধ্যায়: বাগদাদের পতন ২৪৬

বাগদাদ ট্র্যাজেডি ২৪৭

খলিফা নাসিরের যুগে বাগদাদ ২৪৭

আয-যাহিরের আদর্শ কিন্তু সংক্ষিপ্ত যুগ ২৪৮

মুস্তানসির বিল্লাহর সময়কাল ২৪৯

যোগ্য শাসকরাও কেন রাষ্ট্রকে পতন থেকে রক্ষা করতে পারলেন না? ২৫০

শেষ খলিফা মুসতাসিম বিল্লাহ ২৫১

শেষ যুগে বাগদাদের শিক্ষণীয় অবস্থা ২৫১

শাসকগোষ্ঠীর বিলাসিতা ও আরাম-আয়েশ ২৫২

অনুষ্ঠানাদিতে সালাত আদায়ে অবহেলা ২৫৩

হজ ব্যবস্থাপনা স্থগিত ২৫৩

আসমানী সতর্কবার্তা ২৫৪

ইবনে আলকামির মন্তব্য ২৫৫

উজির এবং আমির দাওয়িদারের মধ্যে দ্বন্দ্ব ২৫৬

কারাকোরাম দরবারের নতুন সিদ্ধান্তসমূহ ২৫৬

খ্রিস্টানদের পক্ষ থেকে তাতারীদের পূর্বদিকের মুসলিম দেশগুলোতে আক্রমণের প্ররোচনা ২৫৭

ফ্রান্সের রাজার নামে হালাকু খানের পত্র ২৫৭

হালাকু খানের সমরকন্দ আগমন ২৫৮

বাগদাদে হালাকু খানের গোয়েন্দাদের আগমন ২৫৮

বাগদাদে রাজনৈতিক ও সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে উত্তেজনা ২৫৮

আমির দাওয়াতদারের গ্রেফতারির আশঙ্কা	২৫৯
উত্তর ইরানে হালাকু খান	২৫৯
বাগদাদে শিয়া-সুন্নি দাঙ্গা	২৬০
ধ্বংসের পরিকল্পনা	২৬০
তাতারীদের সাথে উজিরের আঁতাত	২৬০
বাগদাদের সেনাবাহিনী হ্রাসের ভয়াবহ ষড়যন্ত্র	২৬১
মসুলের শাসক বদরুদ্দিন লুলুর রাজনীতি	২৬২
খলিফার নামে মসুলের শাসকের সতর্কবার্তা সম্বলিত পত্র	২৬২
হালাকু খানের অগ্রযাত্রা ও প্রত্যাবর্তন	২৬২
সেনাবাহিনী হ্রাসের ধারা অব্যাহত	২৬৩
উজিরকে বাগদাদের শাসনভার দেওয়ার হালাকুর প্রতিশ্রুতি	২৬৩
ইরাকি আমিরদের প্রতি হালাকু খানের হুমকি	২৬৪
আক্রমণের অজুহাত	২৬৪
খলিফা কাল্লনিক কথায় মগ্ন রইলেন	২৬৫
কূটনৈতিক ফ্রন্টে খলিফার ব্যর্থতা - অনুপযুক্ত পত্রাবলী	২৬৫
হালাকু খানের চূড়ান্ত আক্রমণ - ইরাকি আমিরদের পারস্পরিক পত্রিনিময়	২৬৫
ইরাকের কিছু আমির এবং বাগদাদের কর্মকর্তাদের পত্রিনিময়	২৬৬
বাগদাদের সামনে হালাকু খান	২৬৬
আক্রমণে আরদুনে জরতাস-এর অংশগ্রহণ - মসুলের শাসকের সহায়তা	২৬৭
খলিফার একটি কৌশল যা ব্যর্থ হয়েছিল	২৬৭
খলিফার হিতাকাঙ্ক্ষীদের সাহায্যের জন্য অস্থিরতা	২৬৮
খলিফার কাছে সেনাপতিদের যুদ্ধের জন্য পীড়াপীড়ি	২৭০
তাতারীদের সাথে তুমুল যুদ্ধ	২৭০
খলিফার পলায়নের পরিকল্পনা যা বাস্তবায়িত হতে পারেনি	২৭১
বাগদাদ অবরোধ, তীর নিক্ষেপ এবং পাথর বর্ষণ	২৭১
আল্লাহ দুর্গসমূহ ছিনিয়ে নেন	২৭২

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

অবরোধ যুদ্ধ এবং পরাজয় ২৭২

আলোচনা এবং ইবনে আলকামির চরম বিশ্বাসঘাতকতা ২৭২

নিষ্ফল কূটনৈতিক প্রতিনিধি দল ২৭৩

শাহজাদা আবু বকরের অভ্যর্থনা। মুসলিম অফিসার ও সৈন্যদের হত্যা ২৭৩

খলিফা হালাকু খানের দরবারে ২৭৪

শহরবাসীকে নিরস্ত্র করা হলো ২৭৫

জামে মসজিদের শেষ খুতবা ২৭৫

বাগদাদে কিয়ামত-এ-সুগরা ২৭৬

হালাকু এবং খলিফা খিলাফত প্রাসাদে ২৭৬

খিলাফত প্রাসাদের নারী ও ধনভাণ্ডার ২৭৭

খিলাফত প্রাসাদে গণহত্যা ২৭৮

সম্মান ও লাঞ্ছনা মালিকুল মুলকের হাতে ২৭৮

মুস্তাসিমের জন্য খাদ্য হিসেবে হীরা-জহরত ২৭৮

মুস্তাসিম বিল্লাহর শেষ মুহূর্তগুলো ২৭৯

খলিফার কাছে একটি পাখি সম্পর্কে হালাকুর জিজ্ঞাসাবাদ ২৭৯

খলিফাকে বাঁচানোর শেষ চেষ্টা যা মুনাফিক উজির এবং তুসি ব্যর্থ করে দেয় ২৭৯

মুস্তাসিমের হত্যা ২৮০

বাগদাদে ধ্বংসের পর ধ্বংস ২৮১

দুর্মূল্য, বিনাশ এবং মহামারি ২৮২

গ্রন্থাগারগুলো নদীতে নিক্ষেপ ২৮২

সাধারণ ক্ষমার ঘোষণার পর শহরের অবস্থা ২৮২

একজন ফকিহর আত্মকাহিনী ২৮২

তাতারীদের কবলে বাগদাদ ২৮৩

পয়েন্ট ২৮৪

ইবনে আলকামির পরিণতি ২৮৪

বিশ্বাসঘাতকের সাথে তাতারীদের আচরণ ২৮৫

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

জিলদ দুয়াম (দ্বিতীয় খণ্ড)

ইবনে আলকামির শিক্ষণীয় মৃত্যু ২৮৫

নাসির তুসির কিছু আলোচনা ২৮৬

নাসির তুসির কালো কীর্তিসমূহ ২৮৬

বাগদাদ ট্র্যাজেডিতে মুসলিম বিশ্বে অস্থিরতা ২৮৮

শেখ সাদী শিরাজীর আরবি শোকগাথা ২৮৯

শেখ সাদীর ফারসি শোকগাথা ২৯০

কাফেরদের মধ্যে আনন্দের উৎসব ২৯১

হালাকু খানের দরবারে বদরুদ্দিন লুলুর উপস্থিতি ২৯২

শেষ খলিফার পরিবার-পরিজনের কাহিনী ২৯৩

মুস্তাসিমের হাশেমি স্ত্রী এবং তাঁর আত্মমর্যাদা ও বুদ্ধিমত্তা ২৯৩

মুস্তাসিমের দুই ছেলে যারা জীবিত ছিলেন ২৯৩

মুস্তাসিমের কন্যাদের অবস্থা ২৯৪

ফাতিমা বিনতে মুস্তাসিম ২৯৪

মজলুমার দোয়া ২৯৪

মুস্তাসিমের নাতনি ২৯৫

সুসংবাদসমূহ ২৯৫

ষষ্ঠ অধ্যায়: ইসলামের নতুন রক্ষক মিশরের মামলুক সুলতানগণ ২৯৬

মামলুকদের উত্থান ২৯৭

রানী শাজারাতুদ দুর ২৯৯

প্রথম মামলুক সুলতান - আল-মালিকুল মুইজ ইজ্জুদ্দিন তুর্কম্যান ২৯৯

মামলুক বাহরিয়া এবং মামলুক মুইজিয়া ৩০০

তুর্কম্যানের হত্যাকাণ্ড - শাজারাতুদ দুরের দুঃখজনক পরিণতি ৩০১

আল-মালিকুল মানসুর নুরুদ্দিন আলী ৩০২

বাগদাদের পতনের পর সিরিয়ায় তাতার বাহিনীর লুটতরাজ ৩০২

আইয়ুবী শাসকদের ওপর হালাকু খানের আক্রমণ ৩০৩

আরবেলের পতন ৩০৪

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

চতুর্থ খণ্ড

মিয়াফারিকিন রণাঙ্গন ৩০৪

মিয়াফারিকিন রক্ষার জন্য ইবনে শাদাদের কূটনৈতিক প্রচেষ্টা ৩০৬

এটি আমার শহর - নববী সুসংবাদ ৩০৮

মিয়াফারিকিন রণাঙ্গনে হালাকু খান ৩০৯

মিয়াফারিকিন জয়ের নিত্যনতুন কৌশল ৩১০

হালাকু ফোরাত নদীর ওপারে - সিরিয়ায় আতঙ্ক ৩১০

হাররানের পতন ৩১১

মারদিনের পতন ৩১১

সাইফউদ্দিন মাহমুদ কুতুজ... ইসলামের নতুন তলোয়ার ৩১২

আল-মালিক আস-সালিহের খিদমতে ৩১২

জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী ৩১৩

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুসংবাদ ৩১৩

মাহমুদ বিন মওদুদ ৩১৪

সিরিয়া ও মিশরের প্রতি তাতারীদের হুমকি ৩১৫

আল্লামা কামালুদ্দিন ইবনুল আদিম (রহ.)-এর দৌত্যগিরি ৩১৫

শায়খুল ইসলাম ইজ্জুদ্দিন ইবনে আবদুস সালাম (রহ.)-এর অভিমত ৩১৫

মিশরে কুতুজের সিংহাসন আরোহণ ৩১৬

কুতুজ নির্বাচনে খাওয়ারিজমি কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ ৩১৬

কিছু আমিরের বিরোধিতা এবং কুতুজের জবাব ৩১৬

কুতুজের পক্ষ থেকে আল-মালিক আন-নাসিরকে জিহাদে সাহায্যের আশ্বাস ৩১৭

আল-মালিক আন-নাসির ও বাইবার্সের মধ্যে মতবিরোধ ৩১৭

হালাবের পতন ৩১৮

আল-মালিক আন-নাসিরের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন - দামেস্কে বিশৃঙ্খলা ৩১৯

কুতুজের বার্তা এবং আল-মালিক আন-নাসিরের মূর্খতা ৩২০

মিয়াফারিকিন রণাঙ্গনের শেষ দৃশ্যপট ৩২০

দুই দাসের বিশ্বাসঘাতকতা - মিয়াফারিকিনের পতন ৩২১

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

চতুর্থ খণ্ড

সিংহের জোড়ার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত জিহাদ ৩২২

হালাকু'র দরবারে মুহাম্মদ আল-কামিলের দুঃসাহসিক বীরত্ব ৩২২

মুহাম্মদ আল-কামিলের শাহাদাত ৩২৩

উসওয়ায়ে হুসাইনী'র ওপর আমল ৩২৩

কিতবুগা নোয়ান..... মানুষরূপী পশু ৩২৩

দামেস্কের পতন ৩২৫

দামেস্কে মুসলমানদের শোচনীয় অবস্থা ৩২৬

সিরিয়ার সুলতান আল-মালিক আন-নাসিরের দেশান্তর ও গ্রেফতারি ৩২৭

সিরিয়ায় চরম দুর্দশা ৩২৭

বাইবার্সের মিসরে প্রত্যাবর্তন ৩২৮

হালাকু খানের পত্র এবং তার উত্তর ৩২৮

সৈফউদ্দীন কুতুজের সেনাপতিদের সাথে পরামর্শ ৩২৯

জিহাদের প্রস্তুতি ৩৩০

তাতারী দূতদের হত্যা ৩৩০

কায়েরো থেকে সৈন্যবাহিনীর যাত্রা - অফিসারদের উৎসাহ প্রদান ৩৩১

সৈন্যবাহিনীর যাত্রা..... আক্রমণের পথ ৩৩২

ফিরিজিদের থেকে নিরাপদ পশ্চাৎভাগের নিশ্চয়তা ৩৩৩

আইন জালুতের অভিমুখে ৩৩৩

কুতুজের উদ্দীপনাময় ভাষণ ৩৩৪

আইন জালুতের যুদ্ধ ৩৩৪

সুলতান কুতুজের বীরত্ব ৩৩৫

বাইসানে দ্বিতীয় যুদ্ধ ৩৩৬

ওয়া ইসলামাহ! ৩৩৭

ফাতহে মুবিন ৩৩৭

কিতবুগা নোয়ানের পরিণতি ৩৩৮

দামেস্কে সুলতান কুতুজের প্রবেশ এবং ঐতিহাসিক সংবর্ধনা ৩৪০

তারীখে উম্মতে মুসলিমা — চতুর্থ খণ্ড

দামেস্কে তাৎক্ষণিক করণীয় কাজসমূহ ৩৪০

কবিদের শ্রদ্ধাঞ্জলি ৩৪০

পশ্চিমা ঐতিহাসিকদের চক্রান্তসমূহ ৩৪১

কিছু সুসংবাদের বর্ণনা ৩৪২

ইউরোপের ওপর মুসলমানদের অবদান ৩৪৩

আইন জালুতের পর

আল-মালিক আন-নাসিরের শাহাদাত ৩৪৫

সুলতান কুতুজের শাহাদাত ৩৪৫

সাইফউদ্দীন কুতুজ ওলামায়ে ইসলামের দৃষ্টিতে ৩৪৫

কবর মুছে গেছে, নাম জীবিত রয়েছে ৩৪৬

শক্তির নীতির ক্ষতি ৩৪৮

শের-ই-বাবর — সুলতান রুকনউদ্দীন বাইবার্স

সুলতান বাইবার্সের প্রাথমিক অবস্থা ৩৪৯

বাইবার্সের সিংহাসন আরোহণ ৩৫০

সুলতান বাইবার্স, সিংহাসন আরোহণের পর ৩৫১

শুবাক বিজয় ৩৫২

খিলাফতের পুনরুজ্জীবন ৩৫৩

খিলাফত পুনরুজ্জীবনের মহান অনুষ্ঠান ৩৫৩

বাইবার্সের জন্য মিশর ও শামের সুলতানের ফরমান ৩৫৪

তাতারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ... প্রথম পর্যায়

মা'রাকা-ই মারকাদ খালিদ বিন ওয়ালিদ — গায়েবি সাহায্যের দৃশ্য ৩৫৫

মামলুকদের ইরাক অভিযান এবং এর তাৎক্ষণিক কারণসমূহ ৩৫৫

খলিফার জিহাদের উদ্দেশ্যে ইরাক যাত্রা ৩৫৬

একটি ভুল পরামর্শের ওপর আমল ৩৫৭

খলিফার তাতারীদের সাথে যুদ্ধ এবং শাহাদাত ৩৫৭

মোসুলের যুদ্ধ ৩৫৮

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস (চতুর্থ খণ্ড)

আস-সালিহ ইসমাইলের শাহাদাত ৩৬১

আল-হাকিমের খিলাফত ৩৬১

নতুন খলিফার জিহাদের খুতবা ৩৬১

তাতারীদের আক্রমণের আশঙ্কা এবং বাইবার্সের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ৩৬২

নতুন মিত্র ও সাহায্যকারীদের অনুসন্ধান ৩৬২

হালাকু খানের সেনাপতিকে নিজের সাথে মেলানোর এক অদ্ভুত ঘটনা ৩৬৩

বাইবার্স এবং বারকা খানের সম্পর্ক ৩৬৪

বারকা ও হালাকুর মধ্যে শত্রুতার কারণসমূহ ৩৬৪

বারকা খান ও হালাকু খানের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধসমূহ ৩৬৫

নওমুসলিম তাতারীদের মিশরে আগমন এবং স্থায়ী বসবাস ৩৬৬

বারকা খানের প্রতি সুলতান বাইবার্সের প্রথম দূতাবাস ৩৬৭

বারকার প্রথম দূতাবাস ৩৬৮

সুলতান বাইবার্সের দ্বিতীয় দূতাবাস ৩৬৯

বারকার দরবারে সুলতানের প্রথম দূতাবাস ৩৬৯

মিশরের দরবারে বারকা খানের দ্বিতীয় দূতাবাস ৩৭০

বারকার প্রতি সুলতানের দ্বিতীয় দূতাবাস এবং রোম সম্রাটের ষড়যন্ত্র ৩৭০

রোম সম্রাটের বিরুদ্ধে সুলতান বাইবার্সের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ৩৭১

সুলতানের দূতের বারকা খানের নিকট উপস্থিতি এবং প্রত্যাবর্তন ৩৭১

ইউরোপীয়দের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ৩৭২

তাতারীদের আরও পরাজয় ৩৭২

ইউরোপের সাথে হালাকু খানের যোগাযোগ এবং বাইবার্সের পাল্টা চাল ৩৭৩

হালাকু খানের মৃত্যু ৩৭৩

আবাকা খানের সিংহাসন আরোহণ - বারকা খানের আরও একটি বিজয় ৩৭৪

ইরাকে বাইবার্সের আক্রমণের পরিকল্পনা ৩৭৪

বারকা খানের মৃত্যু ৩৭৪

ফিরিজিদের বিরুদ্ধে জিহাদ ৩৭৫

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

কায়সারিয়া বিজয় ৩৭৬

আল-বিরাহ পুনর্নির্মাণ ৩৭৭

হাইফা, আসলিথ এবং আরসুফ বিজয় ৩৭৭

সাফাদ দুর্গ দখল ৩৭৮

আক্কার ওপর আক্রমণ ৩৭৯

ইয়াফা এবং শাকিফ আরনুম বিজয় ৩৮০

ত্রিপোলির ওপর আক্রমণ ৩৮০

আন্তাকিয়ার মহান বিজয় ৩৮১

আমার পরোয়া নেই ৩৮১

একটি অদ্ভুত খেলা ৩৮২

ছদ্মবেশ ধারণের কারণ ৩৮৩

হজ সফর ৩৮৪

সিরিয়ায় তুফানি অভিযানসমূহ - আক্কার যুদ্ধ, হিসনুল আকরাদের যুদ্ধ ৩৮৪

অষ্টম ক্রুসেডের উদ্দেশ্যে ইউরোপীয় রাজাদের যাত্রা ৩৮৫

বাতিনী ইসমাইলিদের বিরুদ্ধে অভিযানসমূহ ৩৮৬

অষ্টম ক্রুসেড ৩৮৬

তিউনিসিয়ার যুদ্ধ ৩৮৬

সিরিয়ার যুদ্ধ ৩৮৭

সিরিয়ার শেষ অভিযানসমূহ ৩৮৭

হিসনুল আকরাদ ৩৮৭

সাইপ্রাসে ইসলামি নৌবহর ধ্বংস ৩৮৮

আক্কা ও ত্রিপোলির ওপর আক্রমণ - মাউন্ট ফোর্ট বিজয় ৩৮৮

তাতারিদের বিরুদ্ধে জিহাদের দ্বিতীয় পর্যায় ৩৮৯

তাতারিদের অগ্রযাত্রা ও প্রত্যাবর্তন ৩৮৯

আমির কালাউনের হাতে তাতারিদের পরাজয় ৩৯০

সুলতান বাইবার্সের পুনরায় দামেস্কে আগমন ৩৯০

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

চতুর্থ খণ্ড

ব্রিটেনে আবাকা খানের দূতাবাস ৩৯০

এশিয়া মাইনরের সীমান্তে আক্রমণসমূহ ৩৯১

আল-বিরায় তাতারদের আরও একটি ব্যর্থ আক্রমণ ৩৯১

এশিয়া মাইনরের ওপর আবাকা খানের আধিপত্য ৩৯১

আফ্রিকায় বিজয়সমূহ ৩৯২

একটি ঐতিহাসিক যুদ্ধ - এলবিস্তানের যুদ্ধ ৩৯২

সুলতানের ইশ্তেকাল ৩৯৩

আকস্মিক মৃত্যুর কারণ ৩৯৩

সুলতানের মৃত্যু সম্পর্কে একটি দুর্বল বর্ণনা ৩৯৪

ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে সুলতান বাইবার্স ৩৯৪

নির্মাণ ও উন্নয়নমূলক কাজ ৩৯৫

গুরুত্বপূর্ণ নির্মাণ অভিযান ৩৯৫

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি - জাহাজ নির্মাণ শিল্প ৩৯৬

আলেকজান্দ্রিয়া উপসাগর খনন ৩৯৬

সেতু এবং কাসরুল আবলাক ৩৯৬

আজ-জহিরিয়ার ভিত্তি স্থাপন ৩৯৬

মসজিদে নববীর পুনর্নির্মাণ ৩৯৭

রওজা আতহারের চারপাশের জালি ৩৯৭

হারামাঈন শরীফাইনের খিদমত ৩৯৭

মাদ্রাসা জহিরিয়া ৩৯৭

জামে আল-আযহারের সংস্কার, জামেয়া আল-আযহার প্রতিষ্ঠা ৩৯৭

জামে আল-হুসাইনিয়ার নির্মাণ ৩৯৮

নববিজিত এলাকাগুলোতে মসজিদ নির্মাণ ৩৯৮

বাইতুল মুকাদ্দাসের খিদমতের জন্য প্রতিষ্ঠান ৩৯৮

দামেস্ক জামে মসজিদের নতুন ব্যবস্থাপনা ৩৯৮

শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা বিভাগ ৩৯৮

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

ব্যক্তিগত গুণাবলি

উলামা ও মাশায়েখদের সাথে সম্পর্ক ৪০০

ধর্মীয় সহনশীলতা ৪০০

সালাত আদায়ে পাবন্দি ও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা ৪০০

বন্ধুত্ব রক্ষা করা ৪০১

ন্যায় ও ইনসাফ ৪০১

জনগণের ক্ষতি অসহনীয় ৪০২

ছদ্মবেশে টহল দেওয়া ৪০২

ক্রোধ ও কঠোর শাস্তি ৪০২

ক্ষমা ও মার্জনা ৪০৩

দানশীলতা ৪০৩

কৃতজ্ঞতা বোধ ৪০৪

অনাড়ম্বর জীবন ৪০৪

ছদ্মবেশ ধারণে দক্ষতা ৪০৪

গোপনীয়তা রক্ষা ৪০৫

শরয়ী দণ্ডবিধি কার্যকর করা ৪০৫

নৈতিক অবক্ষয়ের ওপর পাকড়াও ৪০৫

রাজতন্ত্র ও দ্বীন হেফাজতের আবশ্যিকতা ৪০৬

যুদ্ধবিদ্যার প্রসার ৪০৬

বীরদের উৎসাহ প্রদান ৪০৬

শিকার ও চিড়িয়াখানা তৈরিতে আগ্রহ ৪০৬

অতি সাধারণ জীবন ৪০৬

জনপ্রিয়তার অবস্থা ৪০৭

শিক্ষকের আদব ৪০৭

জনগণের কণ্ঠস্বরকে আল্লাহর ঘোষণা মনে করো ৪০৮

প্রাচ্যবিদদের প্রলাপ ৪০৯

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

আল-মালিক আস-সাইদ বারাকা খান ৪১০

আল-মালিক আল-আদিল বদর উদ্দিন সালামিশ ৪১০

সুলতান সাইফ উদ্দিন কালাউন ৪১১

আমির সুনকুরের বুদ্ধিমত্তা ৪১১

খালিদ বিন ওয়ালিদের মাজারের যুদ্ধ ৪১২

আবাকার মৃত্যু ৪১৪

নওমুসলিম মোগল শাহজাদা তাকুদার আহমদ খানের সিংহাসন আরোহণ ৪১৪

আহমদ খানের হত্যাকাণ্ড, আরগুন খানের শাসনকাল ৪১৫

আরমেনিয়ার নাসারাদের সাথে যুদ্ধ ৪১৫

অমুসলিম তাতার এবং ইউরোপের আঁতাত ৪১৫

সিরিয়ায় নাসারাদের ক্রমাগত পরাজয় ৪১৬

ত্রিপোলি বিজয় ৪১৬

আক্কার ওপর আক্রমণ এবং কালাউনের মৃত্যু ৪১৭

কালাউনের যুগের কিছু বৈশিষ্ট্য ৪১৭

খলিল আল-আশরাফ ৪১৮

আক্কা বিজয় ৪১৮

ক্রুসেড যুদ্ধের অবশিষ্টাংশের সমাপ্তি ৪১৮

ক্রুসেড যুদ্ধের মাধ্যমে ইউরোপে জ্ঞানতাত্ত্বিক বিপ্লব ৪১৮

আরমেনিয়ায় বিজয়সমূহ ৪১৯

খলিল আল-আশরাফের হত্যাকাণ্ড ৪১৯

আল-মালিক আন-নাসির মুহাম্মদ বিন কালাউন... প্রথম শাসনকাল ৪১৯

জয়নুদ্দিন কিতবুগা, মিসরের নওমুসলিম তাতার শাসক ৪২০

আল-মালিক আল-মানসুর হুসাম উদ্দিন লাজিন ৪২১

আল-মালিক আন-নাসির মুহাম্মদ বিন কালাউন... দ্বিতীয় শাসনকাল ৪২২

মোগলদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব - গাজান খানের শাসনকাল ৪২৩

মিসরের আমিরদের সাথে গাজান খানের আঁতাত ৪২৩

ইতিহাসে উন্মত্তে মুসলিমা

চতুর্থ খণ্ড

গাজানের আক্রমণ - হিমসের যুদ্ধ ৪২৪

সিরিয়ায় ভয় ও আতঙ্ক ৪২৬

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর সাহসিকতা - গাজানের সাথে কথোপকথন ৪২৭

দামেস্কে মঙ্গোলদের লুটতরাজ - দুর্গ জয়ের প্রচেষ্টা ৪২৮

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এবং মঙ্গোল শাসকের কথোপকথন ৪২৯

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর প্রচেষ্টায় মদের দোকান বন্ধ হওয়া ৪৩০

সিরিয়া থেকে তাতারীদের প্রস্থান ৪৩০

বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযানে ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর প্রচেষ্টা ৪৩১

মুসলমানদের মনোবল বৃদ্ধির জন্য ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর পুস্তিকা ৪৩১

মিশরের সুলতানের কাছে ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর পত্র ৪৩১

জাতিকে ঐক্যবদ্ধ ও জাগ্রত রাখতে ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর প্রচেষ্টা ৪৩৩

তাতারীদের আক্রমণ ৪৩৪

রোজা ভাঙার ফতোয়া ৪৩৪

শাকহাবের যুদ্ধ ৪৩৫

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর বীরত্ব ৪৩৫

তাতারীদের শোচনীয় পরাজয় ৪৩৬

গাজানের মৃত্যু ৪৩৬

বাতিল ফেরকাগুলোর ষড়যন্ত্র, ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর সতর্কতামূলক পত্র

৪৩৬

রাফেজীদের দমনের জন্য সৈন্য অভিযান ৪৩৭

আল-মালিক আন-নাসিরের পদত্যাগ ৪৩৮

রুকনউদ্দিন বাইবার্স জাশনগীরের শাসনকাল ৪৩৯

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর গৃহবন্দিত্ব, জাশনগীরের পতন ৪৩৯

আল-মালিক আন-নাসির বিন কালাউন... তৃতীয় শাসনকাল ৪৪০

জিহাদি অভিযানসমূহ ৪৪০

খ্রিস্টানদের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড ৪৪০

উমাইয়া মসজিদের সাদা পূর্ব মিনার ৪৪১

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর গ্রন্থতালি ও মৃত্যু পৃষ্ঠা ৪৪১

আল-মালিক আন-নাসিরের মৃত্যু পৃষ্ঠা ৪৪১

আল-মালিক আন-নাসিরের যুগের ওপর একটি পর্যালোচনা পৃষ্ঠা ৪৪২

উন্নয়নমূলক কাজ পৃষ্ঠা ৪৪২

বাহরি মামলুকদের পতন পৃষ্ঠা ৪৪৩

আন-নাসিরের পুত্রদের যুগ পৃষ্ঠা ৪৪৩

১. আল-মালিক আল-মানসুর আবু বকর: (জিলহজ ৭৪১ হিজরি থেকে সফর ৭৪২ হিজরি - ৫৯ দিন) পৃষ্ঠা ৪৪৩

২. আল-মালিক আল-আশরাফ আলাউদ্দিন কুজুক: (সফর ৭৪২ হিজরি থেকে শাবান ৭৪২ হিজরি) পৃষ্ঠা ৪৪৩

৩. আল-মালিক আন-নাসির আহমদ: (শাবান ৭৪২ হিজরি থেকে মহররম ৭৪৩ হিজরি) পৃষ্ঠা ৪৪৪

৪. আল-মালিক আস-সালিহ ইসমাইল: (মহররম ৭৪৩ হিজরি থেকে রবিউস সানি ৭৪৬ হিজরি) পৃষ্ঠা ৪৪৪

৫. আল-মালিক আল-কামিল শাবান: (রবিউস সানি ৭৪৬ হিজরি থেকে জমাদিউল আখিরা ৭৪৭ হিজরি) পৃষ্ঠা ৪৪৪

৬. আল-মালিক আল-মুজাফফর আমির হাজ: (জমাদিউল আখিরা ৭৪৭ হিজরি থেকে রমজান ৭৪৮ হিজরি) পৃষ্ঠা ৪৪৪

৭. আল-মালিক আন-নাসির হাসান, প্রথমবার: (রমজান ৭৪৮ হিজরি থেকে জমাদিউল আখিরা ৭৫২ হিজরি) পৃষ্ঠা ৪৪৫

৮. আল-মালিক আস-সালিহ সালিহ: (জমাদিউল আখিরা ৭৫২ হিজরি থেকে শাওয়াল ৭৫৫ হিজরি) পৃষ্ঠা ৪৪৫

আল-মালিক আন-নাসির হাসান - দ্বিতীয়বার: (শাওয়াল ৭৫৫ হিজরি থেকে জমাদিউল আউয়াল ৭৬২ হিজরি) পৃষ্ঠা ৪৪৫

কালো মহামারি পৃষ্ঠা ৪৪৫

আল-মালিক আন-নাসির বিন কালাউনের পৌত্র ও প্রপৌত্রদের যুগ পৃষ্ঠা ৪৪৬

১. মনসুর সালাহউদ্দিন বিন আল-মুজাফফর আমির হাজ: (৭৬২ হিজরি থেকে ৭৬৪ হিজরি) পৃষ্ঠা ৪৪৬

২. আশরাফ শাবান বিন হুসাইন: (৭৬৪ হিজরি থেকে ৭৭৮ হিজরি) পৃষ্ঠা ৪৪৬

৩. আলী বিন শাবান বিন হুসাইন: (৭৭৮ হিজরি থেকে ৭৮৩ হিজরি) পৃষ্ঠা ৪৪৭

৪. আমির হাজ জয়নুদ্দিন বিন শাবান বিন হুসাইন: (৭৮৩ হিজরি থেকে ৭৮৪ হিজরি) পৃষ্ঠা ৪৪৭

এক নজরে বাহরি মামলুক পৃষ্ঠা ৪৪৮

শাসনকাল ১৩৪ বছর পৃষ্ঠা ৪৪৮

চারাকেসা মামলুক পৃষ্ঠা ৪৫১

চারাকেসার প্রথম শাসক - আজ-জাহির বারকুক: (৭৮৪ হিজরি থেকে ৮০১ হিজরি) পৃষ্ঠা ৪৫১

আল-মালিক আন-নাসির ফারাজ বিন বারকুক - প্রথমবার: (৮০১ হিজরি থেকে ৮০৮ হিজরি) পৃষ্ঠা ৪৫২

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

- আব্দুল আজিজ বিন বারকুক আল-মালিক আল-মানসুর: (৮০৮ হিজরি) ৫৩
- ফারাজ বিন বারকুক - দ্বিতীয়বার: (৮০৮ হিজরি থেকে ৮১৫ হিজরি) ৪৫৩
- মুসতাইন বিল্লাহ: (সফর থেকে শাবান ৮১৫ হিজরি) ৪৫৮
- আল-মালিক আল-মুয়াইয়াদ শায়খ মাহমুদী: (৮১৫ হিজরি থেকে ৮২৪ হিজরি) ৪৫৯
- আল-মালিক আল-মুজাফফর বিন মাহমুদী: (মুহাররম থেকে শাবান ৮২৪ হিজরি) ৪৫৯
- আমির তাতার: (শাবান থেকে জিলহজ ৮২৪ হিজরি) ৪৫৯
- মুহাম্মদ বিন তাতার: (জিলহজ ৮২৪ হিজরি থেকে রবিউস সানি ৮২৫ হিজরি) ৪৬০
- সুলতান আশরাফ বার্সবে: (৮২৫ হিজরি থেকে ৮৪১ হিজরি) ৪৬০
- ইউসুফ বিন বার্সবে: (জিলহজ ৮৪১ হিজরি থেকে রবিউল আউয়াল ৮৪২ হিজরি) ৪৬০
- আজ-জাহির চাকমাক: (৮৪২ হিজরি থেকে ৮৫৭ হিজরি) ৪৬০
- ফখরুদ্দিন উসমান বিন চাকমাক: (৮৫৭ হিজরি) ৪৬১
- আল-মালিক আল-আশরাফ সাইফুদ্দিন ইনাল আলাই: (৮৫৭ হিজরি থেকে ৮৬৫ হিজরি) ৪৬১
- আহমদ বিন ইনাল: (৮৬৫ হিজরি) ৪৬২
- খুশ কদম নাসিরি: (৮৬৫ হিজরি থেকে ৮৭২ হিজরি) ৪৬২
- বিলবে আল-মুয়াইয়াদ: (৮৭২ হিজরি) ৪৬২
- আল-মালিক আজ-জাহির তিমুর বুগা: (৮৭২ হিজরি) ৪৬২
- আল-মালিক আল-আশরাফ কাইতবে: (৮৭২ হিজরি থেকে ৯০১ হিজরি) ৪৬২
- মুহাম্মদ আন-নাসির বিন কাইতবে - প্রথমবার: (৯০১ হিজরি থেকে ৯০২ হিজরি) ৪৬৩
- কানসুহ আল-আশরাফি: (৯০২ হিজরি) ৪৬৩
- মুহাম্মদ বিন কাইতবে - দ্বিতীয়বার: (৯০২ হিজরি থেকে ৯০৪ হিজরি) ৪৬৩
- কানসুহ আজ-জাহিরি আবু সাঈদ: (৯০৪ হিজরি থেকে ৯০৫ হিজরি) ৪৬৪
- আল-মালিক আল-আশরাফ জানবালাত: (৯০৫ হিজরি থেকে ৯০৬ হিজরি) ৪৬৪
- আল-মালিক আল-আদিল তুমান বে প্রথম: (এক দিন) ৪৬৫
- কানসুহ বিন আবদুল্লাহ আল-গাউরি: (৯০৬ হিজরি থেকে ৯২২ হিজরি) ৪৬৫
- তুমান বে দ্বিতীয়: (৯২২ হিজরি থেকে ৯২৩ হিজরি) ৪৬৭
- মামলুক যুগের ওপর একটি পর্যালোচনা ৪৬৭

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

মামলুক চেরাকাসিয়া - ১৩৯ বছরের যুগ ৪৬৮

মামলুক যুগ ইলমি ও তামাদুনিক খিদমত ৪৭১

ইলমি কর্মকাণ্ডে আগ্রহ ৪৭১

মসজিদ ও খানকাহ প্রতিষ্ঠা ৪৭২

শিফাখানা ৪৭২

কুতুবখানা ৪৭৩

ফিরকাবন্দি প্রতিরোধ ৪৭৩

হারামাইন শরীফাইনের খিদমত ৪৭৩

সমাজে উলামাদের মর্যাদা ও ধর্মীয় সহনশীলতা ৪৭৪

কায়রোর আবাসীয় খিলাফত ৪৭৫

১. মুস্তানসির বিল্লাহ, আহমদ: (রজব ৬৫৯ হিজরি থেকে মহররম ৬৬০ হিজরি) ৪৭৫

২. আল-হাকিম, আহমদ বিন আবু আলী: (৬৬১ হিজরি থেকে ৭০১ হিজরি) ৪৭৫

৩. আল-মুস্তাকফি, সুলাইমান বিন আল-হাকিম: (৭০১ হিজরি থেকে ৭৩৭ হিজরি) ৪৭৫

৪. আল-ওয়াসিক বিল্লাহ, ইবরাহিম বিন মুতামসিক: (৭৪১ হিজরি) ৪৭৬

৫. আহমদ বিন মুস্তাকফি, আল-হাকিম: (৭৪১ হিজরি থেকে ৭৫৩ হিজরি) ৪৭৭

৬. আল-মুতাদিদ বিল্লাহ, আবু বকর বিন মুস্তাকফি: (৭৫৩ হিজরি থেকে ৭৬৩ হিজরি) ৪৭৭

৭. আল-মুতাওয়াক্কিল, মুহাম্মদ বিন মুতাদিদ - প্রথমবার: (৭৬৩ হিজরি থেকে ৭৮৫ হিজরি) ৪৭৭

৮. মুস্তাসিম, জাকারিয়া বিন ইবরাহিম - প্রথমবার: (৭৭৯ হিজরি) ৪৭৮

• আল-মুতাওয়াক্কিল, মুহাম্মদ বিন মুতাদিদ - দ্বিতীয়বার: (৭৭৯ হিজরি থেকে ৭৮৫ হিজরি) ৪৭৮

৯. আল-ওয়াসিক বিল্লাহ, উমর বিন ইবরাহিম বিন মুতামসিক: (৭৮৫ হিজরি থেকে ৭৮৮ হিজরি) ৪৭৮

• মুস্তাসিম, জাকারিয়া বিন ইবরাহিম - দ্বিতীয়বার: (৭৮৮ হিজরি থেকে ৭৯১ হিজরি) ৪৭৮

• আল-মুতাওয়াক্কিল, মুহাম্মদ বিন মুতাদিদ - তৃতীয়বার: (৭৯১ হিজরি থেকে ৮০৮ হিজরি) ৪৭৮

১০. আল-মুস্তাইন, আব্বাস বিন মুতাওয়াক্কিল: (৮০৮ হিজরি থেকে ৮১৫ হিজরি) ৪৭৯

১১. আল-মুতাদিদ, দাউদ বিন মুতাওয়াক্কিল: (৮১৫ হিজরি থেকে ৮৪৫ হিজরি) ৪৭৯

১২. আল-মুস্তাকফি, সুলাইমান বিন মুতাওয়াক্কিল: (৮৪৫ হিজরি থেকে ৮৫৩ হিজরি) ৪৭৯

১৩. আল-কায়িম বি-আমরিবিল্লাহ, হামজা বিন মুতাওয়াক্কিল: (৮৫৩ হিজরি থেকে ৮৫৯ হিজরি) ৪৮০

- (১৪) আল-মুসতানজিদ, ইউসুফ বিন মুতাওয়াঙ্কিল: (৮৫৯ হি. থেকে ৮৮৪ হি.) ৪৮০
- (১৫) আল-মুতাওয়াঙ্কিল, আব্দুল আজিজ বিন ইয়াকুব বিন মুতাওয়াঙ্কিল: (৮৮৪ হি. থেকে ৯০৩ হি.) ৪৮০
- (১৬) আল-মুতামাসসিক বিল্লাহ, ইয়াকুব বিন আব্দুল আজিজ: (৯০৩ হি. থেকে ৯১৭ হি.) ৪৮০
- (১৭) আল-মুতাওয়াঙ্কিল, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াকুব: (৯১৭ হি. থেকে ৯২৩ হি.) ৪৮০
- খিলাফতে আব্বাসিয়া (মিসর)-এর অবস্থানের ওপর এক নজর ৪৮১
- ছক: খিলাফতে আব্বাসিয়া কায়রো ৪৮৪
- সপ্তম অধ্যায়: মঙ্গোল সাম্রাজ্য এবং ইসলামের দাওয়াত** ৪৮৭
- অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই ৪৮৮
- চারটি ফ্রন্টে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই ৪৯০
- প্রথম ফ্রন্ট: স্বাধীন মুসলিম দেশগুলোতে জিহাদি আন্দোলন ৪৯১
- দ্বিতীয় ফ্রন্ট: তাতারীদের মধ্যে ইসলামের প্রচার ৪৯২
- চেঙ্গিস খান এবং তার উত্তরসূরিগণ ৪৯২
- মঙ্গোলিয়ার খানাতসমূহ ৪৯৩
- ওকতায়ী খান (৬২৪ হি. থেকে ৬৩৯ হি.) ৪৯৩
- তুরাকিনা খাতুন (৬৩৯ হি. থেকে ৬৪৪ হি.) ৪৯৪
- গুয়ুক খান বিন ওকতায়ী (৬৪৪ হি. থেকে ৬৪৫ হি.) ৪৯৫
- মঙ্গু খান বিন তুলি খান (৬৪৫ হি. থেকে ৬৫৫ হি.) ৪৯৫
- আরিক বোকা বিন তুলি (৬৫৫ হি. থেকে ৬৫৮ হি.) ৪৯৫
- কুবলাই খান বিন তুলি (৬৫৫ হি. থেকে ৬৯৩ হি.) ৪৯৫
- কিপচাক খানাত (উর্দু-এ-জাররিন খিল) ৪৯৫
- জোচি খান (৬১৮ হি. থেকে ৬২৬ হি.) ৪৯৫
- বাতু খান (৬২৪ হি. থেকে ৬৫০ হি.) ৪৯৫
- বারকা খান (৬৫২ হি. থেকে ৬৬৫ হি.) ৪৯৬
- ইলখানি সাম্রাজ্য ৪৯৬
- হালাকু খান (৬৫২ হি. থেকে ৬৬৩ হি.) ৪৯৭
- আবাকা খান (৬৬৩ হি. থেকে ৬৮০ হি.) ৪৯৭

চাগাতাই সালতানাত ৪৯৭

ইসলামের দাওয়াতে সমস্যাসমূহ ৪৯৮

তাতারদের ওপর বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ৫০০

তাতারদের ওপর খ্রিস্টধর্মের প্রভাব ৫০০

কিপচাক খানাতে ইসলামের দাওয়াত ৫০২

শাহজাদী খান সুলতান - ইসলামের এক অজ্ঞাতনামা দাঈ যিনি ইতিহাস বদলে দিয়েছেন
..... ৫০২

জোজী খান এবং ইসলাম ৫০৩

বাতু খানের যুগে ৫০৬

বারকা খানের শাসনের পূর্বে ৫০৬

বারকা খান এবং শেখ সাইফুদ্দীন বাখারজি (রহ.) ৫০৭

গোল্ডেন হোর্ড-এ শেখ সাইফুদ্দীন বাখারজি (রহ.)-এর দূত ৫০৭

আউলিয়ায়ে কেরামের সাথে সাক্ষাতের প্রতি বারকা খানের আগ্রহ ৫০৮

শেখ বাখারজি (রহ.)-এর নির্লিপ্ততা ৫০৮

শাহজাদা ফকিরের কুটিরে ৫০৯

ইসলাম প্রচারে বারকা খানের আগ্রহ ৫১০

বারকা এবং সারতাকের দ্বন্দ্ব ৫১০

বারকা খানের দোয়া কবুল হলো ৫১১

বারকা খানের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র ৫১১

বারকা খানের রাজত্ব: (৬৫২ হিজরী থেকে ৬৬৫ হিজরী) ৫১২

বারকা খান এবং ইসলামের সেবা ৫১২

বারকা খানের ধর্মীয় আত্মমর্যাদাবোধের একটি ঘটনা ৫১৪

উজবেক খানের শাসনকাল এবং ইসলাম প্রচার ৫১৫

ইলখানিদের মধ্যে ইসলাম প্রচার ৫১৬

আবাকার যুগে ৫১৬

তেকুদারের যুগে ৫১৬

বাগদাদবাসীর প্রতি সুলতান আহমদ খানের পত্র ৫১৭

তারিখ-এ-উম্মত-এ-মুসলিমাহ

চতুর্থ খণ্ড

সুলতান আহমদ খানের কীর্তিসমূহ ৫১৮

আহমদ খানের বিরুদ্ধে প্রাচ্যবিদদের ভিত্তিহীন অপপ্রচার ৫১৮

মিশরের সুলতানের নিকট তগুদর আহমদ খানের পত্র ৫১৯

সুলতান আহমদ খানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ৫২০

আরগুন খানের রাজত্ব ৫২০

ইহুদি উজির সাদ উদ-দৌলার ইসলাম বিদ্বেষ ৫২১

ইহুদি সাদ উদ-দৌলার হত্যাকাণ্ড এবং আরগুন খানের মৃত্যু ৫২২

কাইখাতুর শাসন ও পরিণতি ৫২২

অমুসলিম মঙ্গোল শাসক এবং ইসলাম ৫২২

গাজান বিন আরগুন ৫২৩

গাজান কীভাবে মুসলমান হলেন? ৫২৪

গাজানের ইসলামের প্রতি অযথা সন্দেহ ও সংশয় ৫২৬

সিরিয়ার ওপর গাজানের আক্রমণ ৫২৬

ইলখানি সাম্রাজ্যে শিয়াদের তৎপরতা ৫২৭

ওলজাইতু, মুহাম্মদ খোদাবন্দ ৫২৮

কাজী মাজদুদ্দীন ইসমাইলের সাহসিকতা ও কারামত এবং খোদাবন্দের রাফেজি মতবাদ থেকে প্রত্যাবর্তন ৫২৯

সিরিয়ার ওপর ইলখানিদের আক্রমণ ৫৩০

রশীদুদ্দীন ফজলুল্লাহ ৫৩০

খোদাবন্দের মৃত্যু এবং রশীদুদ্দীনের হত্যাকাণ্ড ৫৩০

আবু সাঈদ বাহাদুর খান ৫৩১

ইলখানি সাম্রাজ্যে রাফেজি মতবাদ প্রচারের প্রচেষ্টা এবং আহলে সুন্নাত উলামাদের ভূমিকা ৫৩৩

রাফেজিদের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক আধিপত্যের চেষ্টা এবং তার প্রতিরোধ ৫৩৩

নও-মুসলিম ইলখানি এবং মামলুক শাসকদের দ্বন্দ্ব... একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ৫৩৪

চাগতাই সাম্রাজ্যে ইসলাম প্রচার ৫৩৫

চাগতাই সাম্রাজ্যের শাসকদের মধ্যে ইসলাম প্রসারে বিলম্ব কেন হয়েছিল? ৫৩৬

চাগতাই বংশের প্রথম মুসলিম শাসক ৫৩৬

ইতিহাসে উন্মত্তে মুসলিমা চতুর্থ খণ্ড

বরাক খান গিয়াস উদ্দিন ৫৩৭

তালিকাওয়া ৫৩৭

এসান বুগা ৫৩৭

কেবেক খান ৫৩৭

তারমাশিরিন খান ৫৩৮

চাগাতাই এবং ইসলাম বিদ্বেষ ৫৩৮

বুজুন ওগলি ৫৩৯

সুলতান খলিল ৫৩৯

তুগলক তৈমুরের যুগ ৫৪০

শেখ জামাল উদ্দিন রহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং তুগলক তৈমুর ৫৪০

তুগলক তৈমুরের দরবারে শেখ রশিদ উদ্দিন ৫৪১

ঈমানি শক্তি এবং পালোয়ানি শক্তির মুকাবিলা ৫৪২

তৈমুর লঙ ৫৪৩

মঙ্গোলীয় খানাতসমূহে ইসলামের দাওয়াত ৫৪৪

চীনে ইসলামের প্রাথমিক পদচিহ্ন ৫৪৪

চেঙ্গিস খানের যুগে ইসলামের অগ্রযাত্রা ৫৪৫

ইসলাম সম্পর্কে চেঙ্গিস খানের আগ্রহ ৫৪৫

ওকতায়ী খানের যুগে মুসলমানদের প্রতি বিবেচনা ৫৪৬

মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনাকারী ইসলাম বিদ্বেষ্টকে শাস্তি ৫৪৭

ওকতায়ী এক মুসলমানের প্রাণ বাঁচালেন ৫৪৭

ওকতায়ীর আগে এবং পরে মুসলমানদের ওপর কঠোরতা ৫৪৮

তুরাকিনা খাতুনের যুগ এবং ফাতিমা ইরানি ৫৪৮

গিয়ুক খানের যুগ ৫৪৯

মুসলমানদের বিরুদ্ধে খ্রিস্টানদের ষড়যন্ত্র ৫৪৯

ইমাম নূর উদ্দিনের সাথে দুর্ব্যবহার ৫৫০

মঙ্গু খানের আচরণ ৫৫০

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

বৌদ্ধধর্মের জন্য সুযোগ-সুবিধা ৫৫১

গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত মুসলমানদের ইসলামের জন্য প্রচেষ্টা ৫৫১

সৈয়দ আজাল শামসুদ্দিন উমর এবং তাঁর সন্তানদের কীর্তি ৫৫১

চীন ও মঙ্গোলিয়ার শাসক শ্রেণী মুসলমান হয়নি ৫৫২

চীনে ইসলাম সম্পর্কে ইবনে বতুতার মন্তব্য ৫৫৩

ইসলামের আধ্যাত্মিক শক্তির মোজাজা ৫৫৩

টমাস আর্নল্ডের স্বীকৃতি ৫৫৩

আকবর শাহ নজীবাবাদীর মন্তব্য ৫৫৪

মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর মন্তব্য ৫৫৪

হ্যারল্ড ল্যাম্বের আক্ষেপ প্রকাশ ৫৫৪

মঙ্গোলদের ইসলাম গ্রহণের কারণসমূহ ৫৫৪

নওমুসলিম মঙ্গোলদের কীর্তি ৫৫৬

মঙ্গোল খানাতসমূহের তালিকা ৫৫৭

(১) মঙ্গোলিয়া ও চীন সালতানাত ৫৫৭

(২) কিপচাক খানাত ৫৫৭

(৩) ইলখানি সালতানাত ৫৫৯

(৩) চাগতাই খানাত ৫৬০

তৃতীয় ফ্রন্ট..... উম্মাহর সংস্কার ও পথনির্দেশনা ৫৬১

শেখ সাইফুদ্দীন বাখারজি ৫৬২

শেখ মুসলিহুদ্দীন সাদী শিরাজী ৫৬৬

শাইখুল ইসলাম ইজ্জুদ্দীন আব্দুল আজীজ বিন আব্দুস সালাম ৫৬৮

ইলমি মর্যাদা এবং সমাজে তাঁদের মাহাত্ম্য ৫৬৮

বিদআত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জিহাদ ৫৬৯

সুলতানদের সংস্কার ও প্রশিক্ষণ ৫৬৯

শামের শাসক আল-মালিকুল আশরাফকে নসিহত ৫৭০

আস-সালিহ ইসমাইলের দুর্ব্যবহার এবং শাইখুল ইসলামের গ্রেফতারি ৫৭০

শাইখুল ইসলামের মিসর যাত্রা ৫৭১

বিচারকের পদে নিয়োগ - পদত্যাগ করার কারণ ৫৭২

মন্দ কাজ দূর করার প্রেরণা ৫৭২

সপ্তম ক্রুসেডে অংশগ্রহণ এবং অলৌকিক ঘটনার প্রকাশ ৫৭৩

মামলুক যুগে শাইখুল ইসলামের মর্যাদা... মামলুক আমিরদের নিলাম ৫৭৩

হালাকু খানের সাথে যুদ্ধ এবং শাইখুল ইসলামের ফতোয়া ৫৭৪

খিলাফতের পুনর্জাগরণ ৫৭৫

ইন্তেকাল ৫৭৫

রচনা ও সংকলনসমূহ ৫৭৬

মাকাসিদে শরীয়তের ওপর কাজ ৫৭৬

পরহেজগারি ও তাকওয়া - গুণাবলি ও কারামত ৫৭৭

ইমাম শরফুদ্দিন আন-নববী ৫৭৮

বিশ্ববিখ্যাত রচনাবলি ৫৭৮

অকপট সত্যভাষণ ৫৭৮

মাওলানা জালালুদ্দিন রুমি ৫৮১

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. ৫৮২

ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর বহুমুখী ইলমি খিদমত ৫৮৩

একক মতামত ও পরীক্ষাসমূহ ৫৮৪

শেষবারের মতো গ্রেপ্তার এবং কারাগারে ইন্তেকাল ৫৮৪

রচনাবলি ৫৮৫

হিন্দুস্তানে চিশতিয়া মাশায়েখদের কীর্তিগাঁথা ৫৮৮

খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি রহ. ৫৮৮

খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকি রহ. ৫৮৮

সোহরাওয়ার্দিয়া মাশায়েখদের কীর্তিগাঁথা ৫৮৯

নকশবন্দিয়া সিলসিলার খিদমত ৫৯০

চতুর্থ ফ্রন্ট: ইলমি উত্তরাধিকার সংরক্ষণের কাজ ৫৯১

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

নতুন দ্বীনি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ৫৯১

নতুন গ্রন্থ রচনার ধারা ৫৯১

সপ্তম হিজরি শতাব্দীর উলামায়ে কেরামের ইলমি ও তালিফি খিদমত ৫৯২

অষ্টম হিজরি শতাব্দীতে গ্রন্থ রচনা ও সংকলনের উদ্দীপনা ৫৯৩

হাফেজ শামসুদ্দিন আয-যাহাবি রহ.: (৬৭৩ হি. হতে ৭৪৮ হি.) ৫৯৫

শায়খ ইউসুফ আবুল হাজ্জাজ জামালুদ্দিন আল-মিযযি রহ.: (৬৫৪ হি. হতে ৭৪২ হি.) ৫৯৭

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওজিয়্যাহ রহ.: (৬৯১ হি. হতে ৭৫১ হি.) ৫৯৯

ইমাদুদ্দিন হাফেজ ইবনে কাসির দামেশকি রহ.: (৭০১ হি. হতে ৭৭৪ হি.) ৬০০

আল্লামা ইবনে খালদুন রহ.: (৭৩২ হি. হতে ৮০৮ হি.) ৬০১

হাফেজ যাইনুদ্দিন ইরাকি রহ.: (৭২৫ হি. হতে ৮০৬ হি.) ৬০২

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ.: (৭৭৩ হি. হতে ৮৫২ হি.) ৬০২

আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতি রহ.: (৮৪৯ হি. হতে ৯১১ হি.) ৬০৩

ইমাম শামসুদ্দিন সাখাভি রহ.: (৮৩১ হি. হতে ৯০২ হি.) ৬০৪

রেনেসাঁ বা নবজাগরণের কাহিনী, ইবনে বতুতার জবানিতে ৬০৫

অষ্টম অধ্যায়: উসমানীয় সালতানাতের ইতিহাস - প্রতিষ্ঠা কাল হতে চরম উৎকর্ষের যুগ পর্যন্ত ৬১০

উসমানীয় রাষ্ট্র ৬১১

ভৌগোলিক অবস্থা ৬১১

আনাতোলিয়ার ইতিহাস ৬১১

আনাতোলিয়া স্থায়ীভাবে জয় করতে না পারার কারণসমূহ ৬১২

উসমানীয় তুর্কিরা অসম্পূর্ণ কাজ সম্পন্ন করেছে ৬১২

আনাতোলিয়ার সরকারসমূহ ৬১৩

উসমানীয় তুর্কিদের খিদমত ৬১৩

প্রাচ্যবিদ এবং বাতিল ফেরকাদের উসমানীয় সুলতানদের প্রতি বিদ্বেষ ৬১৩

আনাতোলিয়ার রাষ্ট্রসমূহ ৬১৪

মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ ৬১৫

১. বানু কারাসি রাষ্ট্র: ৭০২ হি. হতে ৭৬২ হি. (১৩০৩ খ্রি. হতে ১৩২৫ খ্রি.) ৬১৬

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমাহ (চতুর্থ খণ্ড)

২. ইমারত-ই-আইদিন: ৬৯৯ হিজরি থেকে ৮৫৯ হিজরি (১৩০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৪৫৫ খ্রিষ্টাব্দ) ৬১৬
 ৩. রিয়াসত-ই-বনু আরতনা: ৭২৮ হিজরি থেকে ৭৮২ হিজরি (১৩২৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩৮০ খ্রিষ্টাব্দ) ৬১৭
 ৪. রিয়াসত-ই-বনু হামিদ: ৭০০ হিজরি থেকে ৭৯৩ হিজরি (১৩০১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩৯১ খ্রিষ্টাব্দ) ৬১৭
 ৫. রিয়াসত-ই-বনু আশরাফ: ৬৭৯ হিজরি থেকে ৭৯৩ হিজরি (১২৮০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩৯১ খ্রিষ্টাব্দ) ৬১৮
 ৬. রিয়াসত-ই-বনু সারুখান: ৬৯৯ হিজরি থেকে ৮১৩ হিজরি (১৩০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৪১০ খ্রিষ্টাব্দ) ৬১৮
 ৭. রিয়াসত-ই-বনু মানতাশা: ৬৭৯ হিজরি থেকে ৮২৯ হিজরি (১২৮০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৪২৬ খ্রিষ্টাব্দ) ৬১৯
 ৮. রিয়াসত-ই-বনু ব্রাউনা: ৬৭৬ হিজরি থেকে ৭২২ হিজরি (১২৭৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩২২ খ্রিষ্টাব্দ) ৬১৯
 ৯. রিয়াসত-ই-বনু কারামান: ৬২৮ হিজরি থেকে ৮৯২ হিজরি (১২৫০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৪৮৭ খ্রিষ্টাব্দ) ৬২০
 ১০. রিয়াসত-ই-বনু গেরমিয়ান (বনু জারমিয়ান, বনু গেরমিয়ান): ৬৫৮ হিজরি থেকে ৮৩২ হিজরি (১২৬০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৪২৯ খ্রিষ্টাব্দ) ৬২২
 ১১. রিয়াসত-ই-বনু রামাদান: ৭৫৩ হিজরি থেকে ১০১৭ হিজরি (১৩৫২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৬০৮ খ্রিষ্টাব্দ) ৬২২
 ১২. রিয়াসত-ই-বনু জুল কাদির: ৭৯৯ হিজরি থেকে ৯২৮ হিজরি (১৩৯৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৫২২ খ্রিষ্টাব্দ) ৬২৩
 ১৩. রিয়াসত-ই-বনু জান্দার (বনু ইসফান্দিয়ার, বনু চোপান): ৬০০ হিজরি থেকে ৮৬২ হিজরি (১২০৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৪৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) ৬২৫
 ১৪. রিয়াসত-ই-বনু সাহেব আতা: ৬৭৬ হিজরি থেকে ৭৪৭ হিজরি (১২৭৭ খ্রিষ্টাব্দ) ৬২৫
 ১৫. রিয়াসত-ই-বনু তেক্কে: ৬৯৯ হিজরি থেকে ৮২৬ হিজরি (১৩০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৪২৩ খ্রিষ্টাব্দ) ৬২৫
 ১৬. রিয়াসত-ই-কাজী বুরহান উদ্দিন: ৭৮২ হিজরি থেকে ৮০১ হিজরি (১৩৮০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩৯৯ খ্রিষ্টাব্দ) ৬২৬
 ১৭. রিয়াসত-ই-বনু তাজ উদ্দিন: ৭০৭ হিজরি থেকে ৮১৮ হিজরি (১৩০৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৪১৫ খ্রিষ্টাব্দ) ৬২৬
 ১৮. রিয়াসত-ই-বনু ইনানজ “উমারা-ই-দিনিজলি”: ৬৭৪ হিজরি থেকে ৭৯৬ হিজরি (১২৭৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩৯৪ খ্রিষ্টাব্দ) ৬২৬
 ১৯. রিয়াসত-ই-কুতলু শাহলার: ৭৪০ হিজরি থেকে ৭৯৫ হিজরি (১৩৪০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩৯৩ খ্রিষ্টাব্দ) ৬২৬
 ২০. রিয়াসত-ই-ইকোনিয়ন ৬২৬
 ২১. রিয়াসত-ই-সালাজিকা-ই-রুম ৬২৬
- অমুসলিম রাষ্ট্রসমূহ
১. ইজনিক (বাইজেন্টাইন) ৬২৭
 ২. ট্রাবজোন ৬২৭

তারিখ উম্মত মুসলিমাহ

চতুর্থ খণ্ড

সালাজিকা-ই রুমের ওপর এক নজর ৬২৯

কুতুলমিশ বিন ইসরাঈল ৬২৯

১. সুলাইমান বিন কুতুলমিশ ৬২৯

২. কিলিজ আরসালান ৬৩০

৩. মালিক শাহ বিন কিলিজ আরসালান ৬৩১

৪. রুকন উদ্দিন মাসউদ ৬৩১

৫. কিলিজ আরসালান সানি ৬৩১

৬. গিয়াস উদ্দিন কায়খসরু আউয়াল ৬৩২

৭. রুকন উদ্দিন সুলাইমান ৬৩২

৮. গিয়াস উদ্দিন কায়খসরু আউয়াল, দ্বিতীয়বার ৬৩২

৯. ইজ্জ উদ্দিন কায়কাউস ৬৩৩

১০. আলাউদ্দিন কায়কোবাদ ৬৩৩

১১. গিয়াস উদ্দিন কায়খসরু সানি ৬৩৪

সালাজিকা-ই রুমের পতনের যুগ ৬৩৪

সালাজিকা-ই রুমের শাসন ব্যবস্থা ৬৩৫

সাহিব-ই দিওয়ানের ক্ষমতা ৬৩৫

সামরিক ব্যবস্থা ৬৩৬

নৌবাহিনী ৬৩৬

সালাজিকা-ই রুম সালতানাতের কিছু ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ৬৩৭

উসমানীয়দের পূর্বপুরুষদের আনাতোলিয়ায় আগমন ৬৪০

আরতুগ্রল ৬৪২

সেলজুক জায়গিরদার হিসেবে আরতুগ্রল ৬৪৩

উসমানীয় রাষ্ট্রের উন্নতিতে ইসলামি সংগঠনগুলোর ভূমিকা ৬৪৪

আনাতোলিয়ায় তুর্কমেনদের জীবনের ওপর এক নজর ৬৪৪

উসমান খান গাজী, উসমানীয় সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা ৬৪৬

সালাজিকা-ই রুমের পতন ৬৪৬

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা (চতুর্থ খণ্ড)

ওসমান খান স্বাধীন শাসক হিসেবে ৬৪৭

ওসমান খানের পররাষ্ট্রনীতি ৬৪৭

উসমানীয় রাষ্ট্রের বিস্ময়কর উন্নতির কারণসমূহ ৬৪৭

রাষ্ট্রের সম্প্রসারণ ৬৪৮

বুরসা অভিযান ৬৪৯

ওসমান খানের অসিয়তনামা ৬৫০

ওসমান খানের ইন্তেকাল ৬৫১

ওসমানীয় রাজনীতির ওপর এক নজর ৬৫১

উসমানীয়দের দুই শত্রু ৬৫২

উসমানীয় শব্দের অর্থ ৬৫২

ওরখান ৬৫৩

সীমান্তে রাজধানী ৬৫৩

আনাতোলিয়ায় বিজয়সমূহ ৬৫৪

নির্মাণ কাজ এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পুনর্গঠন ৬৫৪

নতুন মুদ্রা প্রচলন ৬৫৪

আলাউদ্দিন আলী বেগ এবং আলাউদ্দিন পাশা, একটি ভুল ধারণার নিরসন ৬৫৪

উজিরের পদমর্যাদা ৬৫৫

পাশা উপাধি ৬৫৫

আলাউদ্দিন পাশার কীর্তিসমূহ ৬৫৫

জায়গিরদারি প্রথা থেকে উদ্ভূত সমস্যাগুলি ৬৫৬

সমস্যার সমাধান - সেনাবাহিনীর পুনর্গঠন ৬৫৬

ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের মুখে উসমানীয় সেনাবাহিনীর প্রশংসা ৬৫৭

মারমারা সাগরের ওপারে ৬৫৮

গ্যালিপলি বিজয় ৬৬০

রুমেলি ৬৬০

সুলাইমান পাশার আরও বিজয় এবং ইন্তেকাল ৬৬০

চতুর্থ খণ্ড

ইতিহাসে উন্মত্তে মুসলিমা

শাহজাদা মুরাদ খান ৬৬১

ওরখানের মৃত্যু সীরাত ও কীর্তির ওপর এক নজর ৬৬১

মুরাদ খান আউয়াল ৬৬২

প্রাথমিক অভিযানসমূহ ৬৬২

আঙ্গোরার বিজয় ৬৬২

এদরনে (অ্যাড্রিয়ানোপল) বিজয় ৬৬২

ইয়েনি চেরি বাহিনী গঠন ৬৬৩

ইয়েনি চেরির বৈশিষ্ট্যসমূহ ৬৬৪

উসমানীয়দের বিজয় কি ইয়েনি চেরির ওপর নির্ভরশীল ছিল? ৬৬৫

শিশুদের জোরপূর্বক নিয়োগের প্রোপাগান্ডা এবং তার জবাব ৬৬৫

বাইজেন্টাইন ও ইউরোপীয় শক্তির বিরুদ্ধে মুরাদ খানের জিহাদ ৬৬৬

থ্রেস বিজয় ৬৬৬

উসমানীয়দের বিরুদ্ধে ইউরোপের রণপ্রস্তুতি এবং তার কারণ ৬৬৭

মারিৎসার যুদ্ধ ৬৬৭

মারিৎসার যুদ্ধের প্রভাব ৬৬৭

রাজধানী বুরসা থেকে এদরনে স্থানান্তর ৬৬৮

বলকানে বিজয়সমূহ ৬৬৮

সামাকোভের যুদ্ধ ৬৬৮

সার্বিয়া আক্রমণ ৬৬৯

চিরমেনের যুদ্ধ ৬৬৯

ইউরোপে বিজয়ের ধারা ৬৭০

কায়সার ও তার পুত্রের ষড়যন্ত্রসমূহ ৬৭০

সংস্কারের যুগ ৬৭২

আনাতোলিয়ার অভিযানসমূহ - শাহজাদা বায়েজিদের আমীর কারামানের কন্যার সাথে

বিবাহ ৬৭২

হামিদিয়ার দুর্গসমূহ কিনে নেওয়া হলো ৬৭৩

কারামানিদের সাথে সংঘাত এবং কোনিয়া বিজয় ৬৭৩

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

যখন ক্রুসেড শুরু হলো ৬৭৪

ক্রুসেড - কসোভোর যুদ্ধ ৬৭৪

কুরআন মাজীদের সুসংবাদ ৬৭৫

শাহাদাতের ঘটনা ৬৭৫

মুরাদ খানের শেষ কথাগুলো ৬৭৬

মুরাদ খানের সংস্কারসমূহ ৬৭৬

নির্মাণ ও উন্নতি, ধর্মীয় সহনশীলতা, সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ৬৭৭

ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ সুলতান মুরাদের গুণাবলীর স্বীকৃতিদানকারী ৬৭৭

বায়াজিদ ইয়ালদিরিম ৬৭৯

ভাইকে মৃত্যুদণ্ড ৬৭৯

তৈমুর লং-এর আবির্ভাব ৬৭৯

তৈমুরের বিজয়সমূহ ৬৮০

তৈমুরের জুলুম-অত্যাচার ৬৮০

বায়াজিদের বিজয়সমূহ ৬৮১

এশিয়া মাইনর বিজয় ৬৮১

বুলগেরিয়া বিজয় ৬৮২

ক্রুসেড নিকোপোলিসের যুদ্ধ ৬৮২

কনস্টান্টিনোপলের ওপর বায়েজিদের আক্রমণসমূহ ৬৮৫

কায়সার জন পালিও-র সাথে লেনদেন ৬৮৬

ম্যানুয়েলের রাজত্ব এবং কনস্টান্টিনোপল অবরোধ ৬৮৬

সন্ধির শর্তাবলী ৬৮৭

কনস্টান্টিনোপলের দ্বিতীয় অবরোধ ৬৮৭

কনস্টান্টিনোপলের তৃতীয় অবরোধ ৬৮৮

ইউরোপে গ্রিস পর্যন্ত বায়েজিদের অগ্রযাত্রা এবং হঠাৎ প্রত্যাবর্তন - কনস্টান্টিনোপলের

চতুর্থ অবরোধ ৬৮৮

তৈমুরের আক্রমণ ৬৮৯

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

তৈমুর পূর্ব আনাতোলিয়ায় ৬৮৯

কাজী বুরহান উদ্দিনের দরবারে তৈমুরের দূতদের হত্যা ৬৯০

জমিনে একজন বাদশাহর শাসন হবে ৬৯০

ভারতে তৈমুরের আক্রমণ ৬৯১

তৈমুর দ্বিতীয়বার পূর্ব আনাতোলিয়ায় ৬৯২

তৈমুরের কাঙ্ক্ষিত আমিরগণ উসমানীয়দের আশ্রয়ে ৬৯২

বায়াজিদের বিদ্রোহী আমিরগণ তৈমুরের সাহায্যকারী ৬৯২

মামলুক ও উসমানীয়রা কেন ঐক্যবদ্ধ হতে পারল না? ৬৯৩

তৈমুর দ্বিতীয়বার আনাতোলিয়ার সীমান্তে। সিওয়াসের পরিণতি ৬৯৪

তৈমুরের পরিকল্পনা ৬৯৪

তৈমুর সিরিয়ায় ৬৯৫

তৈমুরের আক্রমণের ভয় এবং একজন আলেম-এর সত্যবাদিতা ৬৯৫

সিরিয়ায় তৈমুরের আক্রমণের অবস্থা... হাফেজ ইবনে হাজার রহ.-এর জবানিতে
৬৯৫

তৈমুরের আল্লামা ইবনে শুহনা রহ.-এর সাথে কথোপকথন ৬৯৬

দামেস্কের ধ্বংসলীলা ৬৯৯

দামেস্কের আলেমদের সাথে কথোপকথন ৭০০

বাগদাদের ধ্বংসযজ্ঞ ৭০১

তৈমুরের আনাতোলিয়ায় তৃতীয় আক্রমণ ৭০১

তৈমুরের হুমকিমূলক পত্র ও দাবিদাওয়া ৭০১

বায়াজিদের উত্তর ৭০২

তৈমুরের গোয়েন্দাদের তৎপরতা ৭০২

তৈমুরের প্রতারণামূলক বার্তা ৭০২

উভয় বাহিনীর অগ্রসর হওয়া ৭০৩

কামাখের ওপর তৈমুরের দখল ৭০৪

বায়াজিদের আঙ্কারা থেকে পূর্ব আনাতোলিয়ার দিকে যাত্রা এবং তৈমুরের চাল ৭০৪

আঙ্কারার যুদ্ধক্ষেত্র ৭০৫

উভয় বাহিনীর মোকাবিলা এবং প্রথম দিনের যুদ্ধ পৃষ্ঠা ৭০৬

কথাবার্তা এবং সময় অতিবাহিত করা পৃষ্ঠা ৭০৮

চূড়ান্ত যুদ্ধের দিন পৃষ্ঠা ৭০৮

বায়েজিদ সংকটে পৃষ্ঠা ৭১০

তৈমুর আহত হলেন পৃষ্ঠা ৭১০

বায়েজিদের গ্রেফতারি পৃষ্ঠা ৭১১

আক্ষার যুদ্ধের প্রভাব পৃষ্ঠা ৭১২

বায়েজিদের পরাজয়ের কারণসমূহ পৃষ্ঠা ৭১২

পরাজয়ের পর আনাতোলিয়া এবং উসমানীয় শাহজাদাদের অবস্থা পৃষ্ঠা ৭১৩

উসমানীয়দের জ্ঞানভাণ্ডার এবং সরকারি নথিপত্রের ধ্বংসসাধন পৃষ্ঠা ৭১৩

তৈমুর ও বায়েজিদের পারস্পরিক কথোপকথন পৃষ্ঠা ৭১৩

বায়েজিদের পলায়নের চেষ্টা পৃষ্ঠা ৭১৪

বায়েজিদের মৃত্যু পৃষ্ঠা ৭১৫

বায়েজিদের অবস্থার ওপর এক নজর পৃষ্ঠা ৭১৬

একটি অদ্ভুত ঘটনা পৃষ্ঠা ৭১৭

তৈমুরের পরিণতি পৃষ্ঠা ৭১৭

বায়েজিদকে কি খাঁচায় রাখা হয়েছিল? পৃষ্ঠা ৭১৮

বায়েজিদের চরিত্রের ওপর কিছু প্রশ্ন পৃষ্ঠা ৭১৯

গৃহযুদ্ধের সময়কাল

উসমানীয় শাহজাদারা তৈমুরের করদ রাজ্যে পৃষ্ঠা ৭২০

গৃহযুদ্ধের নয় বছরের সময়কাল: ৮০৫ হিজরি থেকে ৮১২ হিজরি (১৪০২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে

১৪১৩ খ্রিষ্টাব্দ) পৃষ্ঠা ৭২২

ঈসা ও মুহাম্মদ চেলপির দ্বন্দ্ব পৃষ্ঠা ৭২২

ঈসা ও সুলাইমানের ঐক্য। ঈসার পরাজয় ও মৃত্যু পৃষ্ঠা ৭২৩

মুহাম্মদ চেলপি ও সুলাইমান পাশার মুখোমুখি অবস্থান। আনাতোলিয়ায় সুলাইমান পাশার

আক্রমণ পৃষ্ঠা ৭২৩

আক্ষারায় সুলাইমান পাশার দখল পৃষ্ঠা ৭২৩

সুলাইমানের অদূরদর্শিতা এবং বনু কারামানের মুহাম্মদ চেলপির সাথে ঐক্য পৃষ্ঠা ৭২৪

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

চতুর্থ খণ্ড

রুমেলিয়ার ওপর মুসার আক্রমণ এবং সুলাইমান পাশার প্রত্যাবর্তন ৭২৪

মুসার মোকাবিলায় সুলাইমান পাশার পরাজয় ৭২৪

মুসার স্বায়ত্তশাসন - সার্বিয়া ও কনস্টান্টিনোপলের ওপর আক্রমণ ৭২৫

মুহাম্মদ ও মুসার যুদ্ধসমূহ - মুসার পরাজয় ৭২৫

এই গৃহযুদ্ধগুলোর ওপর একটি পর্যালোচনা ৭২৬

মুহাম্মদ চেলবি (প্রথম মুহাম্মদ) ৭২৭

আনাতোলিয়া বিজয় ৭২৭

বিদ্রোহ দমন ৭২৮

শেখ বদরুদ্দিনের ফিতনা ৭২৮

ফজলুল্লাহ তাবরিজির ফিতনা ৭২৯

শাহজাদা মুস্তাফার আবির্ভাব ৭২৯

রোমানিয়ার শাহজাদার সাথে উত্তেজনা ও সন্ধি ৭৩০

হাঙ্গেরির রাজার সাথে সংঘর্ষ ৭৩০

সারায়েভো নির্মাণ ৭৩০

সীমান্ত দুর্গ নির্মাণ - রোমানিয়া ও হাঙ্গেরির ওপর আক্রমণ - ইসহাক বেগের শাহাদাত ৭৩১

ভেনিসের সাথে নৌ-সংঘর্ষ ৭৩১

প্রথম মুহাম্মদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ৭৩২

মৃত্যু ৭৩২

কীর্তিসমূহ ৭৩২

সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ ৭৩৪

কায়সারের ষড়যন্ত্র, মুস্তাফা বিন বায়েজিদের বিদ্রোহ ৭৩৪

শাহজাদা মুস্তাফা বিন মুহাম্মদের বিদ্রোহ ৭৩৫

তুর্কমেন রাষ্ট্রগুলোর ওপর সামরিক অভিযান ৭৩৫

নতুন কায়সারের ষড়যন্ত্র - ইউরোপীয় অধিকৃত অঞ্চলে বিদ্রোহ ৭৩৫

হুনিয়াদির সাথে যুদ্ধ - শান্তি চুক্তি ৭৩৬

সুলতানের নির্জনবাস - খ্রিস্টানদের অঙ্গীকার ভঙ্গ ৭৩৮

উসমানীয়দের ধর্মীয় সহনশীলতার প্রভাব সার্বদের ওপর	পৃষ্ঠা ৭৩৯		
সুলতান মুরাদের নির্জনবাস	তিনবার শাসনভার গ্রহণ	পৃষ্ঠা ৭৪০	
হুনিয়াডের সাথে শেষ যুদ্ধ	সার্বিয়ার অন্তর্ভুক্তি	পৃষ্ঠা ৭৪০	
আলবেনীয় রাজপুত্র সিকান্দার বেগের বিদ্রোহ	পৃষ্ঠা ৭৪১		
সুলতান মুরাদ সানির ইন্তেকাল	পৃষ্ঠা ৭৪২		
সুলতান মুরাদ সানির চরিত্রের এক ঝলক	পৃষ্ঠা ৭৪২		
অমুসলিম ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে সুলতান মুরাদ সানি	পৃষ্ঠা ৭৪৩		
মুহাম্মদ খান (মুহাম্মদ সানি)	ফাতেহ কুস্তনতুনিয়া	পৃষ্ঠা ৭৪৪	
দুগ্ধপোষ্য ভাইকে হত্যার অভিযোগ এবং এর বাস্তবতা	পৃষ্ঠা ৭৪৫		
কায়সারের সাথে সংঘাতের সূচনা	পৃষ্ঠা ৭৪৮		
কুস্তনতুনিয়া	ইতিহাসের আয়নায়	পৃষ্ঠা ৭৪৮	
কায়সারের প্রচেষ্টা	পৃষ্ঠা ৭৪৯		
গোলন্দাজ বাহিনীর প্রাথমিক যুগ	পৃষ্ঠা ৭৫০		
শহরের প্রতিরক্ষামূলক প্রকৃতি	পৃষ্ঠা ৭৫১		
রোমেলি দুর্গ নির্মাণ	পৃষ্ঠা ৭৫১		
সুলতানের অগ্রযাত্রা	কায়সারের রাজধানীতে আক্রমণ	পৃষ্ঠা ৭৫২	
যখন যুদ্ধজাহাজ স্থলপথে চালানো হয়েছিল	পৃষ্ঠা ৭৫৩		
কায়সারকে শেষবারের মতো নিরাপত্তার প্রস্তাব	পৃষ্ঠা ৭৫৪		
চূড়ান্ত আক্রমণ	শেখ শামসুদ্দিনের দোয়া	ফাতেহে মুবিন	পৃষ্ঠা ৭৫৫
সুলতান মুহাম্মদ খান ফাতেহে আয়া সোফিয়া ও কায়সারের প্রাসাদে	পৃষ্ঠা ৭৫৬		
শেখ শামসুদ্দিনের নসিহত	পৃষ্ঠা ৭৫৬		
হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)-এর হারানো কবরের সন্ধান	পৃষ্ঠা ৭৫৬		
কুস্তনতুনিয়ার ওপর মুসলমানদের এগারোটি আক্রমণ এক নজরে	পৃষ্ঠা ৭৫৭		
বিজয়ের পর জনগণের সাথে সুলতানের সদাচরণ	পৃষ্ঠা ৭৫৭		
বিজয়পত্রসমূহ	পৃষ্ঠা ৭৫৭		
কুস্তনতুনিয়া	ইসলামবুল	ইস্তাম্বুল	পৃষ্ঠা ৭৫৮

তারীখে উম্মতে মুসলিমা

সুলতান মুহাম্মদ খান ফাতেহ-এর ইউরোপীয় অভিযানসমূহ ৭৫৯

ক্রুসেড যুদ্ধ ৭৫৯

বেলগ্রেড অবরোধ ৭৫৯

রোমানিয়ার পিশাচতুল্য রাজা ড্রাকুলা ৭৫৯

ড্রাকুলার বিরুদ্ধে আক্রমণ। রোমানিয়া দখল ৭৬১

সার্বিয়া, দক্ষিণ গ্রিস এবং বসনিয়া বিজয় ৭৬২

আলবেনিয়া বিজয়। সিকান্দার বেগের দমন ৭৬৩

উজুন হাসানের ষড়যন্ত্র। ভেনিস বিজয় ৭৬৪

রডস্ দ্বীপে আক্রমণ ৭৬৪

পূর্বীয় অভিযানসমূহ ৭৬৫

ত্রাবজোন বিজয় ৭৬৬

উজুন হাসানের পরাজয় ৭৬৬

কৃষ্ণসাগর ও ক্রিমিয়া অভিযান ৭৬৭

ইতালিতে আক্রমণ ৭৬৭

সুলতান মুহাম্মদ খান ফাতেহ-এর ইন্তেকাল ৭৬৯

সুলতান মুহাম্মদ খান ফাতেহ-এর বিজয়সমূহের একটি পর্যালোচনা ৭৭০

জ্ঞানানুরাগ ও জনকল্যাণমূলক কাজ ৭৭০

আইন প্রণয়ন ৭৭০

সালতানাতের বিভাগসমূহ ৭৭২

সুলতান মুহাম্মদ খান ফাতেহ-এর যুগ... উসমানীয়দের উত্থান ৭৭২

সুলতান মুহাম্মদ খান ফাতেহ... কঠোরতা ও ক্ষতিপূরণ ৭৭৩

সুলতান বায়েজিদ সানি ৭৭৪

শাহজাদা জামশিদের বিদ্রোহ ৭৭৬

ইতালির দরজা হাতছাড়া হয়ে গেল ৭৭৬

সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ-এর পুত্র, ইউরোপীয় শক্তিগুলোর হাতে জিম্মি ৭৭৭

শিক্ষণীয় বিষয় ৭৭৭

৭৭৯

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

চতুর্থ খণ্ড

দ্বিতীয় বায়েজিদের বিজয়সমূহ ৭৮০

ভেনিসের উপকূলীয় বিজয়সমূহ ৭৮০

আন্দালুসের মুসলমানদের সাহায্য ৭৮১

আহমদ পাশার হত্যাকাণ্ড ৭৮১

মিসরের মামলুকদের সাথে সংঘাত ও সন্ধি ৭৮২

মামলুকদের সাহায্য..... ইসলামী ঐক্যের চমৎকার বহিঃপ্রকাশ ৭৮২

বায়েজিদের পদত্যাগ এবং প্রথম সেলিমের স্থলাভিষিক্ত হওয়া ৭৮২

দ্বিতীয় বায়েজিদের সীরাত ৭৮৩

বায়েজিদের যুগে সংঘটিত আন্তর্জাতিক বিপ্লবসমূহ ৭৮৩

দ্বিতীয় বায়েজিদের যুগের ওপর একটি পর্যালোচনা ৭৮৪

উসমানীয় তুর্কি - খিলাফতের পূর্বে ৭৮৫

প্রথম যুগ: শুরু থেকে তৈমুর লঙের আক্রমণ পর্যন্ত ৪৮৫

তারিখ উম্মত-এ-মুসলিমা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

পাঠকদের প্রতি কিছু কথা

তারিখ উম্মত-এ-মুসলিমা-এর তিনটি খণ্ডকে আল্লাহ তাআলা লেখক ও প্রকাশকের প্রত্যাশার চেয়েও অনেক বেশি জনপ্রিয়তা দান করেছেন এবং খুব অল্প সময়ে অনেকগুলো সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। বরেন্য ও প্রথম সারির উলামায়ে কেরাম একে অত্যন্ত পছন্দ করেছেন। এর পাশাপাশি সব দিক থেকে এই দাবি জোরালো হয়ে ওঠে যে, চতুর্থ খণ্ডটি যত দ্রুত সম্ভব প্রকাশিত হওয়া উচিত। লেখক এই তিনটি খণ্ড প্রকাশের আগেই চতুর্থ খণ্ডের কাজ শুরু করেছিলেন, কিন্তু পাঠকদের পক্ষ থেকে ক্রমাগত পিড়াপিড়ি এই কাজের গুরুত্ব আরও তীব্রভাবে অনুভব করিয়েছে। ফলে লেখকের দিন-রাতের সবচেয়ে বড় ব্যস্ততা গত তিন বছর ধরে এটাই ছিল যে, কোনোভাবে যেন চতুর্থ খণ্ডটি সম্পন্ন হয়। এই প্রচেষ্টার ফসল এখন আপনাদের হাতে।

বিগত তিনটি খণ্ডে আপনারা সিরাত নববীয়া, খিলাফত রাশিদা, খিলাফত বনু উমাইয়া, খিলাফত বনু আব্বাস এবং বনু আব্বাসের সমান্তরাল সরকারগুলোর অবস্থা অধ্যয়ন করেছেন। এই খণ্ডে আমরা সেই নামী-দামী সুলতানদের দিকে মনোনিবেশ করছি যারা আব্বাসীয় খিলাফতের পতন যুগে ইতিহাসের দিগন্তে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং দেখতে দেখতেই পৃথিবীর বুকে নিজেদের প্রতাপ ও মহিমা এবং রাজনীতি ও বীরত্বের অম্লান স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করে গেছেন। ইতিহাসের এই অধ্যায়গুলো অত্যন্ত শিক্ষা ও উপদেশমূলক এবং এর প্রতিটি পাতা সংগ্রাম, আত্মত্যাগ, কোরবানি এবং সংকল্প ও অবিচলতার এক একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

এই সময়ে পাঠকরা যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি স্পষ্টভাবে দেখতে পাবেন তা হলো ইসলামি জিহাদের পুনর্জাগরণ, যা দীর্ঘকাল ধরে বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল। সম্ভবত উম্মত এই শিক্ষা আর কখনোই মনে করত না, যদি না তারা সিসিলির পতন, বাইতুল মুকাদ্দাসের ওপর খ্রিস্টানদের দখলদারিত্ব, ক্রুসেড যুদ্ধ এবং তাতারীদের প্রলয়ঙ্করী আক্রমণের সম্মুখীন হতো। মুসলমানরা এই যুগে যে ধ্বংসযজ্ঞের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে অতীতে তার কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। কিন্তু এই অসহায়ত্ব, পতন ও হীনম্মন্যতাই তাদের আত্মমর্যাদা ও গায়রতকে নাড়া দিয়েছে, তাদের আল্লাহর নির্দেশাবলি এবং সিরাত নববীয়ার ওপর নতুন করে চিন্তা করার সুযোগ করে দিয়েছে। তারা তাদের পূর্বসূরিদের ইতিহাস থেকে বীরত্বের পাঠ গ্রহণ করেছে। যার ফলে তাদের মধ্যে ইমাদ উদ্দিন জঙ্গি, নূর উদ্দিন জঙ্গি, সালাহ উদ্দিন আইয়ুবী, জালাল উদ্দিন খাওয়ারিজম শাহ, সাইফ উদ্দিন কুতুজ এবং সুলতান রুকন উদ্দিন বাইবার্দের মতো মুজাহিদ সৃষ্টি হয়েছেন এবং এভাবেই উম্মত মুমূর্ষু অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে আবারও উত্থানের...

দিকে ধাবিত হলো। এরপর সেই ইসলামী শৌর্য ও বীরত্বের বহিঃপ্রকাশ উসমানীয় তুর্কিদের এক বিশাল সাম্রাজ্যের রূপে ঘটেছিল, যা পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে খিলাফতের দায়িত্বও কাঁধে তুলে নিয়েছিল এবং অমুসলিম শক্তিগুলোর সমস্ত ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও গত শতাব্দী পর্যন্ত এই ফরজে কিফায়া পালন করেছে। এই অংশটি ইসলামের সেই সব নামী সন্তান এবং তাদের সাম্রাজ্যগুলোর অবস্থার ওপর ভিত্তি করে রচিত।

এই অংশের বিন্যাস নিম্নরূপ হবে:

- প্রথম অধ্যায়: সিসিলির ইতিহাস
- দ্বিতীয় অধ্যায়: ক্রুসেড এবং আতাবেগ শাসকগণ
- তৃতীয় অধ্যায়: ক্রুসেড এবং আইয়ুবী শাসকগণ
- চতুর্থ অধ্যায়: খোয়ারিজম শাহী শাসকগণ এবং তাতার আক্রমণ
- পঞ্চম অধ্যায়: বাগদাদের পতন
- ষষ্ঠ অধ্যায়: মামলুক সুলতানগণ এবং কায়রোর আব্বাসীয় খলিফাগণ
- সপ্তম অধ্যায়: মঙ্গোল সাম্রাজ্য এবং ইসলামের দাওয়াত
- অষ্টম অধ্যায়: উসমানীয় সাম্রাজ্য: প্রতিষ্ঠা কাল থেকে উত্থান কাল পর্যন্ত

বলতে গেলে এগুলো আটটি অধ্যায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলো ঐতিহাসিক ঘটনাবলির আটটি ভাণ্ডার যাতে হাজার হাজার বর্ণনার সারসংক্ষেপ চলে এসেছে। এর জন্য লেখককে ইতিহাসের বইগুলোর যে দীর্ঘ পাতা উল্টাতে হয়েছে এবং বর্ণনার যেভাবে যাচাই-বাছাই ও অনুসন্ধান করতে হয়েছে, তা ছিল এক ক্লান্তিকর সফর। কিন্তু এর পাশাপাশি এতে বিস্ময়, আগ্রহ, তথ্য এবং শিক্ষার এমন এক জগত আবাদ ছিল যেখানে গিয়ে মানুষ নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে বেখবর এবং দিন-রাত অতিবাহিত হওয়ার অনুভূতি থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

মোদ্দাকথা, অনেক কঠিন ও জটিল পর্যায় অতিক্রম করে এবং দীর্ঘ পরিশ্রম ও ঘাম ঝরানোর পর লেখক এই পাতাগুলো পাঠকদের সামনে পেশ করার যোগ্য হয়েছেন। দোয়া করি যে, আল্লাহ তাআলা আমাদের নিজেদের ইতিহাস সঠিকভাবে বোঝার এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার হিম্মত ও তৌফিক দান করুন।

মুহাম্মদ ইসমাইল রিহান

২৯ জিলহজ ১৪৪১ হিজরি - ২০ আগস্ট ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

ইদারা উলুমুল কুরআন, তহসিল হাসান আবদাল, জেলা অ্যাটক

চতুর্থ খণ্ড

উন্মত্তে মুসলিমার ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়

সিসিলির ইসলামি রাষ্ট্র

২১৩ হিজরি থেকে ৪৮৪ হিজরি

৮২৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০৯১ খ্রিস্টাব্দ

সিসিলির ইতিহাস

সিসিলি (Sicalliyah) ভূমধ্যসাগরের সবচেয়ে বিশাল ও প্রশস্ত দ্বীপ। এখানে মুসলমানরা তৃতীয় হিজরি শতকের শুরুতে শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল, যা ২১৩ হিজরি (৮২৮ খ্রিষ্টাব্দ) থেকে ৪৮৪ হিজরি (১০৯১ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। এই ২৭১ বছরের দীর্ঘ সময়ে মুসলমানরা এই অঞ্চলের অবশিষ্টাংশকে সেই মুশরিকানা সভ্যতা ও সংস্কৃতির শিকল এবং সেই জরাজীর্ণ সভ্যতার অন্ধকার থেকে বের করে আনতে সক্ষম হয়েছিল, যার পেছনে রোমানদের ঐতিহ্যপ্রীতি এবং পৌরাণিক কাহিনীর নেশা কাজ করছিল। এক আল্লাহকে বিশ্বাসীরা এই অঞ্চলকে অনগ্রসরতা ও মূর্খতা থেকে বের করে জ্ঞান-গরিমা, সমৃদ্ধি এবং ধন-সম্পদের কেন্দ্রে পরিণত করেছিল।

সিসিলির ভূগোল:

সিসিলি ইতালির দক্ষিণে এবং তিউনিসিয়ার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। পঁচিশ হাজার সাতশ বর্গকিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট এই দ্বীপটির আকৃতি ত্রিভুজাকার। এই সবুজ-শ্যামল ভূখণ্ডে ডজন ডজন শহর এবং শত শত গ্রাম রয়েছে। পাহাড়, নদী এবং বনভূমিও প্রচুর পরিমাণে আছে। এই দ্বীপের তিনটি কোণে তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শহর রয়েছে, যার প্রতিটি তিন দিক থেকে পানি দ্বারা বেষ্টিত হওয়ার কারণে অপরাজেয় হিসেবে গণ্য হতো। দক্ষিণ-পূর্ব কোণে “সারাকুসা” অবস্থিত, যা অপরাজেয় দুর্গ ও প্রাচীরের কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামরিক কেন্দ্র ছিল। এখানে আলেম ও গুণীজনদের আধিক্য ছিল।

উত্তর উপকূলে অবস্থিত “পালারমো” (Palermo) প্রাচীনকাল থেকেই দেশের রাজধানীর মর্যাদা পেয়ে আসছে। এটি মুসলমানদেরও রাজধানী ছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং শান-শওকতে একে কর্ডোভার সমকক্ষ মনে করা হতো।

উত্তর-পূর্ব কোণে “মেসিনা” অবস্থিত, যাকে একটি ছোট উপসাগর ইতালি থেকে পৃথক করেছে। এটি পালারমোর পর দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বন্দর হিসেবে গণ্য হতো।

দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে “গিরজেন্ট” উপকূল থেকে তিন মাইল দূরত্বে অত্যন্ত মনোরম ও সুন্দর একটি শহর।

পশ্চিম দিকে “মাজারা” (Mazzara) অবস্থিত, যা সিসিলিতে মুসলমানদের প্রথম শহর ছিল। আফ্রিকা থেকে আসা মুসলমানরা প্রথমে এখানেই পৌঁছাতেন। এটি ইসলামি বিজয়ীদের প্রথম প্রবেশপথ ছিল।

“কাসরে ইয়ানা” রোমানদের প্রাচীন ও ঐতিহাসিক শহর ছিল।

“তারমিন” দীর্ঘ সময় পর ২৮৯ হিজরিতে বিজিত হয়েছিল। আগ্নেয়গিরির পাদদেশে অবস্থিত এই শহরটি সোনার খনিতে সমৃদ্ধ ছিল।

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

“কাতানিয়া” ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক শহর। “লেটিনি” সমুদ্র থেকে ছয় মাইল দূরে একটি মনোরম ও সুন্দর শহর ছিল। [১]

মুসলমানদের পূর্বে সিসিলি:

প্রাচীন যুগে এখানে কখনো গ্রীকদের আবার কখনো কার্থেজীয় রাজাদের শাসন ছিল। ৫০৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ইতালির রোম রাষ্ট্র প্রজাতান্ত্রিক রূপ ধারণ করে এবং দুই শতাব্দীর মধ্যে একটি বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত হয়, যার ফলে সিসিলিও এর সম্প্রসারণ অভিযানের আওতায় চলে আসে। অবশেষে ২১২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সিসিলি পুরোপুরি রোমের অংশে পরিণত হয়।

১০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে রোমের বিখ্যাত বীর “সিজার” জন্মগ্রহণ করেন, যিনি রোমে প্রজাতন্ত্রের পরিবর্তে রাজতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করেন। রোমের বিশাল সাম্রাজ্যের যখন পতন শুরু হয়, তখন সিসিলিও রাজনৈতিক সংকটের শিকার হয়। ৬৬৮ খ্রিস্টাব্দে রাজা কনস্টানটাইন দ্বিতীয়-এর হত্যার পর তার পুত্র “মার্টিন” সিসিলির শাসক হন। এটি সেই সময় ছিল যখন ভূমধ্যসাগরে মুসলমানদের অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছিল এবং সিসিলিও এর আওতায় চলে আসে, যা ছিল বাইজেন্টাইন রোমানদের একটি গুরুত্বপূর্ণ নৌ-কেন্দ্র। [২]

খিলাফতে রাশেদা ও খিলাফতে বনু উমাইয়ায় সিসিলি:

হযরত উসমান গনি (রা.)-এর যুগে ৩৩ হিজরিতে (৬৫৩ খ্রি.) সিসিলিতে প্রথম আক্রমণ হয়। [৩] হযরত আমির মুয়াবিয়া (রা.)-এর খিলাফতকালে ৪৬ হিজরিতে (৬৬৬ খ্রি.) এখানে আবদুল্লাহ বিন কায়েসের নেতৃত্বে দ্বিতীয় আক্রমণ হয় যাতে দুইশত যুদ্ধজাহাজ অংশ নিয়েছিল। [৪] এরপর বিভিন্ন উমাইয়া খলিফাদের যুগে এখানে আক্রমণ চলতে থাকে এবং মুসলমানরা প্রতিপক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে থাকে। আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের যুগে মুসা বিন নুসাইর (রা.) ৮৬ হিজরিতে (৭০৫ খ্রি.) এখানে সৈন্য অবতরণ করিয়ে প্রথমবারের মতো একটি উপকূলীয় শহর “ওলভিয়া” জয় করেন। তবে দ্বীপটির ওপর নিয়মিত দখল প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। [৫]

বনু আগলাবের শাসনকাল

সিসিলি বিজয় প্রকৃতপক্ষে বনু আগলাবের কৃতিত্ব। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ইব্রাহিম বিন আগলাব, আব্বাসীয় খলিফাদের পক্ষ থেকে উত্তর আফ্রিকার দেশ তিউনিসিয়ার গভর্নর ছিলেন। ১৮১ হিজরিতে (৭৯৭ খ্রি.) তিনি খলিফা হারুনুর রশিদের কাছ থেকে স্বায়ত্তশাসনের অনুমতি লাভ করেন, তবে আব্বাসীয় খলিফাদের পৃষ্ঠপোষকতা বজায় ছিল এবং প্রয়োজনে তাদের সিদ্ধান্ত কার্যকর করার ক্ষমতা ছিল। এই সমঝোতার মাধ্যমে উত্তর আফ্রিকায় একশত বারো বছর পর্যন্ত বনু আগলাবের শাসন টিকে ছিল। এই বংশ ভূমধ্যসাগরে মুসলমানদের নৌ-শক্তিকে চরম শিখরে পৌঁছে দিয়েছিল। এই নৌ-অভিযানগুলোর ফলেই সিসিলিতে আক্রমণ শুরু করা হয়েছিল।

[১] নেহায়াতুল আরাব ফি ফুনুনিল আদাব লিন-নুওয়াইরি: ১/২৩৪, ত: দারুল কুতুব ওয়াল ওয়াসায়েক আল-কাওমিয়া; মাওসুয়াতুল আরাবিয়া আল-আলামিয়া, অধীনে: সিসিলি।

[২] আল-মুসলিমুনা ফি সিসিলিয়া, লেখক: আহমদ তৌফিক আল-মাদানি, পৃ. ২০ থেকে ৩১, ত: আল-মাতবাতুল আরাবিয়া আল-জাজায়ের, প্রকাশকাল ১৩৬৫ হি.; তারিখ-ই-সিসিলি, লেখক: মাওলানা রিয়াসাত আলী নদভী: ১/১৯ থেকে ৩০, ৫৩ থেকে ৬৮, ত: দারুল মুসান্নিফীন আজমগড়।

[৩] তারিখ-ই-সিসিলি: ১/৭৩ থেকে ৮০ টাকা সহ।

[৪] নেহায়াতুল আরাব: ২৩/২১ থেকে ৫৭।

[৫] তারিখ-ই-খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২৯৩।

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

বনু আগলাবের আমির জিয়াদাতুল্লাহ ২১২ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে (জুন ৮২৭ খ্রি.) কাজী আসাদ বিন ফুরাত রহ.-কে লক্ষরের সিপাহসালার বানিয়ে সিসিলি বিজয়ের জন্য পাঠান। তিনি দশ হাজার মুজাহিদ নিয়ে সমুদ্রগামী জাহাজের মাধ্যমে সিসিলি পৌঁছান। রোমান শাসক মাইকেল দেড় লক্ষ সৈন্য নিয়ে মোকাবিলায় এলেও শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। কাজী আসাদ বিন ফুরাত রহ. বেশ কয়েকটি যুদ্ধে প্রতিপক্ষকে পিছু হটতে বাধ্য করে সিসিলির অনেক শহর জয় করেন এবং সেগুলোকে মুসলমানদের শক্তিশালী ঘাঁটিতে পরিণত করেন। এই অভিযান চলাকালীন ২১৩ হিজরীর রবিউস সানি মাসে (জুলাই ৮২৮ খ্রি.) কাজী সাহেব ইন্তেকাল করেন এবং সিসিলিতেই সমাহিত হন। তাঁর ইন্তেকালের পরও রোমানদের সাথে যুদ্ধ অব্যাহত থাকে।

২১৪ হিজরীর (৮২৯ খ্রি.) অভিযানগুলোতে আন্দালুসের উমাইয়া শাসক দ্বিতীয় আবদুর রহমানও বনু আগলাবকে পূর্ণ সহযোগিতা করেন এবং তিনশ সমুদ্রগামী জাহাজে মুজাহিদদের এখানে পাঠান যারা জিহাদে শরিক হন। বিজয়ের পরিধি ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে।

সিসিলি ছিল একটি বিশাল দ্বীপ যেখানে ডজন ডজন শহর ছিল। “বালার্ম” (পালেরমো) ছিল এখানকার রাজধানী। এছাড়া দক্ষিণ ইতালির কিছু শহরও সিসিলির সাথে সংযুক্ত ছিল। ইতালির নিকটবর্তী হওয়ার কারণে এখানে রোমানরা সবসময় সাহায্য ও রসদ পেত, তাই পুরো দ্বীপ দখল করা সহজ কাজ ছিল না। তবুও বনু আগলাবের প্রত্যেক শাসক সিসিলি পূর্ণ বিজয়ের চেষ্টা চালিয়ে যান। ২১৫ হিজরীতে (৮৩০ খ্রি.) রাজধানী বালার্ম অবরোধ শুরু হয়। পাঁচ বছরের অবরোধের পর ২২০ হিজরীতে (৮৩৫ খ্রি.) এটি জয় করা হয়। ২৩৪ হিজরীতে (৮৪৯ খ্রি.) আহমদ বিন আগলাবের নেতৃত্বে সিরাকিউসও জয় করা হয়। এই যুদ্ধে চার হাজারের বেশি খ্রিস্টান নিহত হয়। ২৪৪ হিজরীতে (৮৫৮ খ্রি.) রোমানদের রাজধানী কাসর ইয়ানাও বিজিত হয়। [১]

সিসিলিতে মুসলমানদের ইলমি পরিবেশ:

সিসিলি গ্রিক ও রোমান যুগে যদিও দার্শনিক, কবি ও চিকিৎসকদের অঞ্চল ছিল, কিন্তু মুসলমানদের আগমনের পূর্বে এই সাহিত্যিক ও শৈল্পিক নিদর্শনগুলো বিলীন হয়ে গিয়েছিল এবং প্রাচীন দালানকোঠা ও ধ্বংসাবশেষ ছাড়া এখানে দেখার মতো কিছু ছিল না। শাসক ও ধর্মীয় অভিজাতরা নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য জনগণকে মূর্খ রাখা অপরিহার্য মনে করত। মেধার ওপর স্থবিরতা বিরাজ করছিল এবং চিন্তা ও দর্শনের ওপর পাহারা বসানো ছিল। বনু আগলাবের যুগে এই দ্বীপে মুসলমানদের পদচারণা যেখানেই পড়েছে, সেখানেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের বসন্ত নেমে এসেছে। বিজয়ীদের সাথে শত শত আলেম এখানে এসে বসবাস শুরু করেন, স্থানে স্থানে মসজিদ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়, যেগুলোর সাথে সংযুক্ত কুতুবখানা ও হুজরাগুলোতে তাফসির, হাদিস, ফিকহ, উসূলে দ্বীন, ইতিহাস এবং কাব্য ও সাহিত্যের ওপর মূল্যবান কাজ হতে থাকে। এখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ছিল আহলে সুন্নাত এবং মালেকি ফিকহের অনুসারী। [২]

সিসিলি বিজয়ের সমাপ্তি:

ইলমি ময়দানে এই সাফল্যগুলো সত্ত্বেও বনু আগলাবের বিজয়ের ধারা একটি পর্যায়ে পৌঁছে থেমে যায়। এখানে...

[১] নেহায়াতুল আরাব: ২৪/১১৫ থেকে ১২৮, পৃষ্ঠা ৩৫৩ থেকে ৩৬২, তাবা দারুল কুতুব কায়রো।

[২] আল-মুসলিমুনা ফি সিকিলিয়া, পৃষ্ঠা ২২২ থেকে ২৩০।

মুসলমানদের আগমনের এক শতাব্দীও পূর্ণ হয়নি যখন প্রাসাদ ষড়যন্ত্র রাজনৈতিক অস্থিরতার লক্ষণ তৈরি করে দিল। স্থানীয় আমিররা কোনো গভর্নরকে শান্তিতে থাকতে দিত না। তিনি খুব শীঘ্রই অপসারিত বা নিহত হতেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রতি দ্বিতীয় বা তৃতীয় বছরে নতুন গভর্নর নিয়োগ করতে হতো। কখনো কখনো এক বছরেই একাধিক গভর্নর পরিবর্তিত হতো। এসব কারণে দ্বীপটি পুরোপুরি বিজয়ে বিলম্ব হতে থাকে। এই সময়ে রোমানরা মাল্টা দ্বীপসহ দক্ষিণ ইতালির কিছু শহর মুসলমানদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়।

তিউনিসিয়ায় বনু আগলাবের বয়োবৃদ্ধ শাসক ইব্রাহিম বিন আহমদ এই পরিস্থিতিতে খুব চিন্তিত ছিলেন। অবশেষে তিনি ২৮৭ হিজরিতে (৯০০ খ্রিষ্টাব্দ) তাঁর প্রৌঢ় পুত্র আবুল আব্বাসকে সিসিলির গভর্নর নিযুক্ত করেন। আবুল আব্বাস ছিলেন অত্যন্ত সাহসী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি বিদ্রোহীদের দমন করে দেখালেন। তিনি দক্ষিণ ইতালিতেও বীরত্ব প্রদর্শন করেন এবং বেশ কিছু শহর জয় করার পর রোম শহরের প্রাচীর পর্যন্ত পৌঁছে যান। পোপ জন বার্ষিক কর দিতে সম্মত হয়ে অত্যন্ত কষ্টে মুসলমানদের শান্ত করেন।

আবুল আব্বাসের অভিযানগুলো চলছিলই যখন রাজধানী তিউনিসে তাঁর পিতা ইব্রাহিম মানসিক রোগে আক্রান্ত হন এবং সেই অবস্থায় তিনি কিছু নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করিয়ে দেন। তাঁর অদ্ভুত ও বিচিত্র সিদ্ধান্তের কারণে তিউনিসের আমিররা অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়েন এবং তাঁরা আব্বাসীয় খলিফা মুতাদিদ বিল্লাহর কাছে এই তথ্য পৌঁছে দেন, যাকে আগলাবি পরিবার নিজেদের অভিভাবক মনে করত। [১]

সেই দিনগুলোতে পশ্চিম আফ্রিকায় ইসমাইলি দাঈ আবু আবদুল্লাহ আল-শিয়ির ফিতনা পশ্চিম থেকে পূর্বের দিকে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছিল। এমন পরিস্থিতিতে তিউনিসে একজন অপ্রকৃতিস্থ শাসকের অবস্থান এই সালতানাত হারানোর নামান্তর ছিল; তাই খলিফা মুতাদিদ বিল্লাহ ইব্রাহিম বিন আহমদকে তিউনিসের রাজমুকুট ও সিংহাসন ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন।

ইব্রাহিম নির্দেশ পালন করেন এবং সিসিলির রণাঙ্গনে ব্যস্ত তাঁর পুত্র আবুল আব্বাসকে ফিরিয়ে এনে নিজের জায়গায় বসিয়ে দেন। এরপর তিনি নিজের চিকিৎসা করান এবং খুব দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন। তিনি মানসিক অসুস্থতার অবস্থায় নেওয়া ভুল সিদ্ধান্তগুলোর কাফফারা আদায়ের জন্য দরবেশ হয়ে যান এবং বাকি জীবন জিহাদের জন্য উৎসর্গ করার সংকল্প করেন। তিনি সুফিদের পোশাকে সিসিলিতে পৌঁছান এবং জিহাদের অসম্পূর্ণ মিশন সম্পন্ন করার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন। তাঁর নাতি (আবুল আব্বাসের পুত্র) আবু মুদার জিয়াদাতুল্লাহও এই অভিযানে তাঁর সাথে ছিলেন। প্রাক্তন বাদশাহর লস্করে আগমনে মুজাহিদদের মনোবল অনেক বেড়ে যায়। জোরদার প্রস্তুতির সাথে রোমানদের সাথে যুদ্ধ শুরু হয় এবং সব জায়গায় বিজয় ও সাফল্য পদচুম্বন করে। [২]

অবশেষে ২৮৯ হিজরিতে (৯০২ খ্রিষ্টাব্দ) সিসিলির শেষ শহর “তাওরমিনা”ও জয় করা হয়। এভাবে সিসিলির সেই অভিযান যা ২১২ হিজরিতে শুরু হয়েছিল, ৭৫ বছর পর ইব্রাহিম বিন আহমদ আগলাবির হাতে পূর্ণতা পায়, যার ফলে রোমানদের ঘরে শোকের মাতম শুরু হয়। অন্যদিকে বৃদ্ধ ইব্রাহিম প্রাণান্তকর অভিযানের কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ১৯ জিলকদ ২৮৯ হিজরিতে (২৩ অক্টোবর ৯০২ খ্রিষ্টাব্দ) ইন্তেকাল করেন।

[১] নেহায়াতুল আরব: ২৩/১৩০ থেকে ১৪৬; আল-কামিল ফিত তারিখ: সন ২৭৮ হি. থেকে ২৮৯ হি.।

[২] পূর্বোক্ত সূত্র।

...প্রাণ অষ্টার নিকট সমর্পণ করলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর নাতি আবু মুদার যিয়াদাতুল্লাহকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে গিয়েছিলেন। [১]

পুরো সিসিলি ২৮৯ হিজরির শেষভাগে বিজিত হয়। হায়! সৌভাগ্যের এই নক্ষত্র যদি অন্তত এক শতাব্দীকাল পর্যন্ত উজ্জ্বল থাকত। কিন্তু আফসোস যে, এই দ্বীপটি যার বিজয়ের কাজ ২৫৬ বছর জিহাদ করার পর সম্পন্ন হয়েছিল, এক বছরও অতিবাহিত হয়নি যে তা পতনের ঝড়ের কবলে পড়ে গেল এবং সিসিলির মুসলমানরা এমন বিশৃঙ্খলায় লিপ্ত হলো যা ধীরে ধীরে তাদের শেষ করে দিল।

সিসিলিতে মুসলমানদের পতন:

পতনের কারণসমূহের ধারা উত্তরাধিকার নীতির অধীনে একজন অযোগ্য যুবককে গভর্নর নিযুক্ত করার মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। আবু মুদার যিয়াদাতুল্লাহ গভর্নরের আসনে বসার পর বিজয় অভিযান বা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় কোনো আগ্রহ দেখাননি, বরং ভোগ-বিলাসে মগ্ন হয়ে পড়েন।

তাঁর পিতা আবুল আব্বাস যখন তাঁর এই আমোদ-প্রমোদের খবর পেলেন, তখন তাঁকে পদচ্যুত করে তিউনিসে ডেকে পাঠান এবং কারাগারে নিক্ষেপ করেন। এরপর তাঁর স্থলে মুহাম্মদ ইবনে সারকুসিকে সিসিলির ওয়ালি নিযুক্ত করেন। কিন্তু আবু মুদার কারাগারেই কিছু ত্রীতদাসকে সাথে নিয়ে ষড়যন্ত্র করেন এবং শাবান ২৯০ হিজরি (মে ৯০৩ খ্রিষ্টাব্দ) মাসে নিজের পিতাকে হত্যা করিয়ে তাঁর স্থলে তিউনিসের শাসনক্ষমতা দখল করেন। এরপর তিনি যা কিছু করেছেন, তা তিউনিসের আগলাবি শাসন এবং মুসলিম সিসিলি উভয়ের জন্যই মৃত্যুর বার্তা হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

তিনি জুলুম ও নির্যাতনের চরম সীমায় পৌঁছে কেবল তাঁর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদেরই নয়, বরং নিজের বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষীদেরও হত্যা করিয়েছিলেন। তাঁর রাতগুলো ভোগ-বিলাসে এবং দিনগুলো দমন-পীড়নমূলক আদেশ জারি করার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হতো।

তিনি সিসিলির শাসক মুহাম্মদ ইবনে সারকুসিকে পদচ্যুত করে আলী বিন মুহাম্মদ আবুল ফাওয়ারিসকে গভর্নর নিযুক্ত করেন। কিছুদিন পর তাকেও সরিয়ে আহমদ বিন আবুল হুসাইন বিন রাবাহকে এই পদে আসীন করেন। এর ফলে সিসিলিতে আবুল ফাওয়ারিস এবং ইবনে রাবাহর মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে তিউনিস ও সিসিলির সমস্ত আমির বনু আগলাবের বিরোধী হয়ে ওঠেন। ইসমাইলি দাঈ আব্দুল্লাহ ইয়ামেনি পরিস্থিতি অনুকূল দেখে তাঁর প্রভু ‘ভণ্ড মাহদী’কে আফ্রিকায় ডেকে পাঠান। এই ‘আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের’ চারপাশে সমবেত হয়ে বারবারদের উদ্দীপনা আকাশচুম্বী হয়ে ওঠে এবং তারা অন্যান্য শহর জয় করতে করতে মুহূর্তের মধ্যে তিউনিসে পৌঁছে যায়।

আরামপ্রিয় আবু মুদার এই তুফান মোকাবিলা করতে অক্ষম ছিলেন। তিনি সমস্ত ধন-সম্পদ উটের পিঠে চাপিয়ে আফ্রিকা থেকে বেরিয়ে যান এবং একের পর এক মঞ্জিল অতিক্রম করে ‘রামলা’য় পৌঁছান এবং জমাদিউল আখিরা ২৯৬ হিজরি (মার্চ ৯০৯ খ্রিষ্টাব্দ) মাসে সেখানেই অজ্ঞাত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

এই পরিস্থিতিতে সিসিলিও অসহায় ও অভিভাবকহীন হয়ে পড়ে। সেখানকার ওয়ালি আহমদ বিন আবি হুসাইন পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার আশ্রয় চেষ্টা করেন, কিন্তু প্রাক্তন গভর্নর আবুল ফাওয়ারিস তাঁকে ক্ষমা করেননি এবং তাঁর শত্রুতায় উবাইদুল্লাহ মাহদীর সাথে আঁতাত করেন।

[১] নিহায়াতুল আরাব: ২৩/ ১৩০ থেকে ১৩৬, আল-কামিল ফিত তারিখ: বছর ২৮৭ হিজরি থেকে ২৮৯ হিজরি। ইব্রাহিম বিন আহমদ আগলাবির বয়স ছিল ৫৩ বছর। তিনি ২৮ বছর শাসন করেছিলেন। শুরুর সাত বছর তিনি খুব ভালো শাসন করেছিলেন কিন্তু পরে ধীরে ধীরে তিনি সম্পদ আহরণের লোভী হয়ে পড়েন। এরপর দিন দিন তাঁর মেজাজ খিটখিটে হতে থাকে, এমনকি তিনি মানসিক রোগীতে পরিণত হন এবং তাঁর হাতে অনেক নিরপরাধ মানুষ নিহত হয়। (আল-বায়ানুল মাগরিব: পৃষ্ঠা ১৩২, ১৩৩) তবে রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি জিহাদের জন্য জীবন উৎসর্গ করে অনেকটা ক্ষতিপূরণ করেছিলেন।

১১ই রজব ২৯৬ হিজরি (৫ই এপ্রিল ৯০৯ খ্রিস্টাব্দ) তারিখে আবুল ফাওয়ারিস আহমদ বিন আবিল হুসাইনের বাড়ি ঘেরাও করে তাকে গ্রেফতার করেন এবং তাকে মাহদির কাছে আফ্রিকায় পাঠিয়ে দেন। এভাবে সিসিলি বনু উবাইদ রাষ্ট্রের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। [১]

সিসিলিতে বনু উবাইদের শাসন

সিসিলি তার পূর্ণ বিজয়ের মাত্র সাত বছর পর আহলে সুন্নাতে হাত থেকে বেরিয়ে ইসমাইলি রাফেজি শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এই পটপরিবর্তনে আলী বিন মুহাম্মদ আবুল ফাওয়ারিসের বিশ্বাসঘাতকতার বড় ভূমিকা ছিল, তাই তার অনুরোধে তাকেই সিসিলির প্রথম ইসমাইলি গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু কিছুকাল পর তাকে অপসারিত করে তার বিশেষ প্রতিনিধি হাসান বিন আহমদকে নিযুক্ত করা হয়, যিনি ইবনে আবিল খিনজির উপনামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ইসমাইলি মতবাদকে সিসিলির রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করেন। [২]

ইবনে কুরহাবের স্বাধীনতা আন্দোলন

সিসিলির মুসলমানরা ইবনে আবিল খিনজিরের বাড়াবাড়িকে চরম ঘৃণার চোখে দেখতেন এবং মাত্র দুই বছর পর ২৯৮ হিজরিতে (৯১১ খ্রিস্টাব্দ) তারা তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। বিদ্রোহ দমন করা হলেও ২৯৯ হিজরিতে (৯১২ খ্রিস্টাব্দ) উবাইদুল্লাহ আল-মাহদি ইবনে আবিল খিনজিরকে সরিয়ে আলী বিন উমর আল-বালওয়িকে এখানকার শাসক নিযুক্ত করেন। তা সত্ত্বেও ইবনে আবিল খিনজির এখানে সুন্নি-শিয়া বিভেদের যে আগুন জ্বালিয়েছিলেন, তা কোনোভাবেই প্রশমিত হয়নি। সিসিলির মুসলমানরা প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করে ইসমাইলি উবাইদি কর্মকর্তাদের সিসিলি থেকে তাড়িয়ে দেন এবং আগলাবি বংশের একজন রাজপুত্র আহমদ বিন যিয়াদাতুল্লাহকে, যিনি ‘ইবনে কুরহাব’ উপনামে পরিচিত ছিলেন, ওয়ালি হিসেবে মেনে নেন। ইবনে কুরহাব খুতবায় আব্বাসীয় খলিফা মুকতাদিরের নাম অন্তর্ভুক্ত করে তার কাছ থেকে সিসিলির শাসনভারের সনদ লাভ করেন। শীঘ্রই তিনি শক্তি সঞ্চয় করে সিসিলির উল্লেখযোগ্য অংশের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেন এবং ইতালিতেও সফল অভিযান পরিচালনা করেন। উবাইদুল্লাহ আল-মাহদি এই আন্দোলনে ভীত হয়ে পড়েন এবং ৩০১ হিজরিতে ইবনে আবিল খিনজিরের নেতৃত্বে সিসিলিতে নৌবাহিনী প্রেরণ করেন। তবে ইবনে কুরহাব খোলা সমুদ্রে এই নৌবহরকে পরাজিত করেন এবং ইবনে আবিল খিনজিরকে হত্যা করেন।

কিন্তু এই বিজয়ের পর ইবনে কুরহাব তড়িঘড়ি করে বনু উবাইদের বিরুদ্ধে আফ্রিকার ওপর আক্রমণ করেন যা ব্যর্থ হয় এবং সিসিলির নৌবহর হাতছাড়া হয়ে যায়। এই পরাজয় সিসিলির আমিরদের ইবনে কুরহাবের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তোলে। তারা বনু উবাইদের হুমকিতেও ভীত ছিল। ফলে তারা ইবনে কুরহাবের পরিবর্তে আবুল গাফফার নামক একজন প্রধানকে তাদের শাসক বানিয়ে নেয়, যিনি ইবনে কুরহাবকে গ্রেফতার করে উবাইদুল্লাহ আল-মাহদির কাছে পাঠিয়ে দেন। সেখানে মহরম ৩০৪ হিজরিতে তার হাত-পা কেটে ইবনে আবিল খিনজিরের কবরের ওপর তাকে হত্যা করা হয়। এভাবে তিন বছর এগারো মাস সিসিলি দখল করে রাখা এই শেষ আগলাবি আমিরের পরিণতি অত্যন্ত বেদনাদায়ক হয়।

[১] নিহায়াতুল আরাব: ২৩/১৩৬ থেকে ১৫৩; আল-কামিল ফিত তারিখ: ২৯০ হিজরি থেকে ২৯৬ হিজরি।

[২] নিহায়াতুল আরাব: ২৩/৩২৬; আল-মুসলিমুনা ফি সিকিলিয়া: পৃষ্ঠা ১২৯, ১৩০।

সিসিলির মুসলমানরা মনে করেছিল যে তারা এখন আবুল গফফারের নেতৃত্বে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে থাকবে এবং ইসমাইলি সরকার ইবনে কুরহাবকে লক্ষ্যবস্তু বানানোর পর সন্তুষ্ট হবে এবং তাদের ওপর আর আক্রমণ করবে না। কিন্তু ইসমাইলিদের নেতা ওবায়দুল্লাহ তাদের আশায় পানি ঢেলে দিলেন এবং আবু সাঈদ মুসা বিন আহমদকে একটি বিশাল বাহিনী দিয়ে সিসিলিতে পাঠালেন। এই অভিযানের ফলে আবুল গফফারের শাসনের অবসান ঘটে এবং সিসিলিতে আবারও ইসমাইলি শিয়ারের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। [১]

এই জালিমরা মুসলমানদের ওপর চরম নির্যাতন চালায়, নিরপরাধদের হত্যা এবং নারীদের সতীত্ব হরণ করতেও দ্বিধা করেনি। হাজার হাজার মুসলিম বন্দীকে আফ্রিকায় পাঠানোর অজুহাতে নৌযানে তোলা হয় এবং তারপর সেই জাহাজগুলো মাঝসমুদ্রে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। শোচনীয়ভাবে পর্যুদস্ত হওয়ার পর সিসিলির মুসলমানরা পরিস্থিতির সাথে আপস করতে বাধ্য হয়। [২]

বনু ওবায়দের বিজয় এবং নতুন প্রতিরোধ আন্দোলন:

আবু সাঈদ মুসার বিজয়ী প্রত্যাবর্তনের পর ৩০৫ হিজরিতে সালেম বিন আবি রশিদকে সিসিলির গভর্নর নিযুক্ত করা হয়, যার শাসনের শুরুর বছরগুলো নরম নীতির কারণে শান্তিতে অতিবাহিত হয়। এই সময়ে ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদির নির্দেশে বনু ওবায়দের বিভিন্ন জেনারেল ৩১০ হিজরি (৯২২ খ্রিস্টাব্দ) থেকে ৩১৭ হিজরি (৯২৯ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত ইতালির বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি অভিযান পরিচালনা করেন। ‘জেনোয়া’তেও আক্রমণ করা হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ছিল দক্ষিণ ইতালির শহর ‘কালোরিয়া’, যা শেষ পর্যন্ত জিজিয়া দিতে সম্মত হয়।

অন্যদিকে সালেম বিন রশিদ কয়েক বছর পর কঠোরতা ও জুলুম-অত্যাচারে নেমে আসেন। তার অত্যাচারে জনগণ উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং স্থানে স্থানে স্বাধীনতার আন্দোলন শুরু হয়। ‘জেরজেন্ট’-এর শাসক এবং ‘বালুত’-এর কেল্লাদারকে বের করে দেওয়া হয়। সালেম এই আন্দোলন দমনের জন্য সেনাবাহিনী নিয়ে বের হন কিন্তু মোকাবিলায় শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। অন্যদিকে রাজধানী বালরম-এও (পালেরমো) মানুষ বিদ্রোহ করে, যাদের নিয়ন্ত্রণ করতে সালেমের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এই সময়ে ৩২২ হিজরিতে (৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ) বনু ওবায়দের নেতা ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদির মৃত্যু হয় এবং তার পুত্র আল-কায়েম কেন্দ্রে তার স্থলাভিষিক্ত হন। প্রতিরোধ গোষ্ঠীর একজন নেতা ইসহাক বাস্তানি আল-কায়েমকে চিঠি লিখে সালেমের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে বাধ্য হওয়ার কথা জানান এবং বলেন যে কেন্দ্রীয় সরকার যদি এই জালিমকে বরখাস্ত করে তবে তারা আনুগত্য করতে প্রস্তুত। আল-কায়েম এই সমস্যা সমাধানের জন্য সালেমকে বরখাস্ত করাই শ্রেয় মনে করেন। ফলে তার স্থলে খলিল বিন ইসহাককে এই পদে নিযুক্ত করা হয়। এটি ৩২৫ হিজরি (৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ)-এর ঘটনা। [৩]

খলিল এখানে নির্মাণ কাজ করান এবং সমুদ্র উপকূলে একটি নতুন শহর ‘খালিসা’ নির্মাণ করেন। কিন্তু তার এবং প্রাক্তন গভর্নর সালেমের মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা সিসিলির জনগণের জীবন দুর্বিষহ করে তোলে। এই উর্বর দেশে অব্যবস্থাপনার কারণে এমন দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় যে মানুষ না খেয়ে মরতে শুরু করে। এই পরিস্থিতিতে তারা সব দিক থেকে হতাশ হয়ে কনস্টান্টিনোপলের কায়সারের কাছে সাহায্য চায়। কায়সার শস্য বোঝাই জাহাজসহ সৈন্যদের সিসিলিতে পাঠান কিন্তু গভর্নর খলিল বিন ইসহাক তাদের মোকাবিলা করে...

[১] আল-মুসলিমুন ফি সিকিলিয়া, পৃ. ১৩০ থেকে ১৩২; আল-কামিল ফিত তারিখ, সন ৩০০ হিজরি।

[২] আল-মুসলিমুন ফি সিকিলিয়া, পৃ. ১৩৩।

[৩] আল-মুসলিমুন ফি সিকিলিয়া, পৃ. ১৩৩, ১৩৫, ১৩৮, ১৩৯।

তাদের বন্দরে নামতে দেওয়া হয়নি। এরপর সে বিদেশি সাহায্যপ্রার্থী আমির ও জনগণের দিকে মনোনিবেশ করল। চার বছর ধরে এই অভিযানগুলো চলতে থাকে, যাতে খলিল দশ লক্ষ মানুষকে হত্যা করে। অবশেষে আফ্রিকার রাজধানী থেকে খলিলের ফিরে আসার নির্দেশ আসে। [১] যাওয়ার সময়ও এই জালিম এই কাজ করল যে, হাজার হাজার মুসলিম শরীফ ব্যক্তিদের জাহাজে ভরে সাথে নিয়ে চলল। কিন্তু এই অসহায়রা কখনোই আফ্রিকায় পৌঁছাতে পারেনি, কারণ খলিল সেই জাহাজগুলোকে গভীর সমুদ্রে ডুবিয়ে দিয়েছিল। [২]

আবু আতাফ মুহাম্মদ বিন আশআছ আল-আজদি:

৩২৯ হিজরিতে (৯৪১ খ্রিস্টাব্দ) আবু আতাফ মুহাম্মদ ইবনে আশআছ আল-আজদি সাকলিয়ার গভর্নর নিযুক্ত হন। তিনি একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন যিনি শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার করেছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত তাকেও রাজধানী বালরামে বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হয় এবং তিনি তা নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেননি। [৩]

বনু কালবের আধা-স্বায়ত্তশাসিত শাসন

৩৩৬ হিজরিতে (৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ) উবাইদি শাসক আল-কায়িমের মৃত্যুর পর আল-মানসুর তার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি আবু আতাফকে বালরামের বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ দেখে সাকলিয়ার জন্য একজন যোগ্য ব্যক্তি নির্বাচন করা জরুরি মনে করেন। অবশেষে লটারি হাসান বিন আলী কালবির নামে উঠল, যিনি ছিলেন একজন সাহসী, বুদ্ধিমান ও চতুর ব্যক্তি এবং রাজনৈতিক ও সামরিক বিষয়ে তার ব্যাপক অভিজ্ঞতা ছিল। [৪]

হাসান বিন আলী কালবি:

হাসান বিন আলী কালবি উত্তর আফ্রিকায় খারিজি নেতা আবু ইয়াজিদের বিদ্রোহ দমনে উল্লেখযোগ্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছিলেন, ফলে তাকে সাকলিয়ার গভর্নর করা হয়। শীঘ্রই এই গভর্নর পদটি এক প্রকার স্বায়ত্তশাসিত শাসনে পরিণত হয় এবং সাকলিয়ার সাথে বনু উবাইদের সম্পর্ক নামমাত্র থেকে যায়। এই পরিস্থিতি হাসান বিন আলীকে অনেক সুবিধা দেয় কারণ সাকলিয়ায় তখনও সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল সুন্নি মুসলমানরা যারা বনু উবাইদের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল। হাসান বিন আলী রাজনৈতিক কৌশল ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে স্থানীয় আমিরদের নিজের পক্ষে নিয়ে আসেন এবং ন্যায়বিচারের মাধ্যমে স্থানীয় বাসিন্দাদের আস্থাও অর্জন করেন। এভাবে তিনি ৩৩৬ হিজরি (৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ) থেকে ৩৪৩ হিজরি (৯৫২ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত অত্যন্ত শান ও প্রশান্তির সাথে শাসন করেন। এই সময়ে তিনি রোমানদের সাথে বেশ কিছু যুদ্ধ করেন এবং সাকলিয়ার শেষ প্রান্ত ও কোণগুলোও জয় করে নেন। এছাড়া তিনি দক্ষিণ ইতালির কিছু দুর্গ ও জনপদও জয় করেন। [৫]

আহমদ বিন হাসান বিন আলী:

হাসান বিন আলীকে ৩৪২ হিজরিতে কিছু অনিবার্য কাজ সম্পাদনের জন্য আফ্রিকায় ফিরে যেতে হয়। যখন ফিরতে দেরি হলো, তখন তিনি বনু উবাইদের কাছ থেকে তার ছেলে আহমদের জন্য সাকলিয়ার শাসনভার মঞ্জুর করিয়ে নেন। এভাবে ৩৪৩ হিজরিতে আহমদ বিন হাসান সাকলিয়ার নতুন গভর্নর হন এবং সাকলিয়ার আমির পদটি এই পরিবারের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। [৬]

[১] আল-মুসলিমুন ফি সাকলিয়া, পৃ. ১৩৯ থেকে ১৪১

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: বছর ৩২৭ হিজরি

[৩] তারিখ ইবনে খালদুন: ৪/ ২৬৬, আল-কামিল ফিত তারিখ: বছর ৩৩৬ হিজরি, নিহায়াতুল আরাব লিন নুওয়াইরি: ২৪/ ২৬৯, তারিখ সাকলিয়া: ১/ ৩৩৭ থেকে ৩৩৯

[৪] পূর্বোক্ত সূত্র

[৫] তারিখ সাকলিয়া: ১/ ৩৫১ থেকে ৩৫৩

[৬] তারিখ সাকলিয়া: ১/ ৩৫১, ৩৫২

রমতা যুদ্ধ

সেই সময়ে জার্মানির রাজা প্রথম অটো ইতালি আক্রমণ করে পোপ নিয়োগ ও অপসারণের ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নেন। এরপর তিনি ইতালির সেই দক্ষিণ জনপদগুলো দখল করে নেন যা সিসিলির অধীনে ছিল। এই সংবাদে সিসিলির খ্রিস্টানরাও উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং তারা তাদের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র ‘তারমিন’-এ বিদ্রোহ করে দেয়। আহমদ বিন হাসান ৩৫১ হিজরিতে এখানে সামরিক অভিযান চালিয়ে বিদ্রোহীদের দমন করেন। ৩৫২ হিজরিতে তিনি একজন সাহসী সেনাপতি হাসান বিন আন্মারকে খ্রিস্টানদের অপর একটি শক্তিশালী ঘাঁটি ‘রমতা’ বিজয়ের জন্য পাঠান। হাসান বিন আন্মার ৩৫২ হিজরির রজব মাসে শহরটি অবরোধ করেন, কিন্তু শহরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত মজবুত হওয়ায় অবরোধ দীর্ঘায়িত হতে থাকে। এই সংবাদ রোমানদের কাছে পৌঁছালে **بازنطينی** (বাইজেন্টাইন) সম্রাট কায়সার নিকোফরাস [১] তার সেনাপতি ম্যানুয়েলকে চল্লিশ হাজার সৈন্য দিয়ে সিসিলির খ্রিস্টানদের সাহায্যের জন্য পাঠান।

এখন একটি বড় যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। আহমদ বিন হাসানের পিতা হাসান বিন আলী কালবি এই সংবাদ শুনে ছেলেকে দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য আফ্রিকা থেকে সিসিলিতে চলে আসেন। ৩৫৩ হিজরির শাওয়াল মাসে রোমান নৌবহর সিসিলিতে পৌঁছায় এবং তারা রমতা থেকে নয় (৯) মাইল দূরে অবস্থিত ‘মেসিনা’ বন্দরকে তাদের কেন্দ্র বানায়। ম্যানুয়েল স্থানীয় খ্রিস্টানদের উত্তেজিত করে সেনাবাহিনীতে নিয়োগ দেন। এভাবে তার সৈন্য সংখ্যা এক লাখে পৌঁছে যায়। মুসলমানরা এই বাহিনীর অগ্রযাত্রার চারটি সম্ভাব্য পথ অবরোধ করে রেখেছিল, কিন্তু ম্যানুয়েল এই তথ্য পেয়ে যান এবং তিনি এমনভাবে অগ্রসর হন যে মুসলমানদের রণকৌশল ব্যর্থ হয়ে যায়। অবশেষে রোমান বাহিনী ‘রমতা’-র কাছে চলে আসে যেখানে মুসলমানদের বাহিনী একত্রিত হচ্ছিল। রোমান বাহিনী তিন দিক থেকে মুসলমানদের ঘিরে ফেলে এবং ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথেই অত্যন্ত ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এই সময়ে হঠাৎ রমতার অবরুদ্ধ খ্রিস্টানরা পেছন দিক থেকে মুসলমানদের ওপর আক্রমণের জন্য বেরিয়ে আসে এবং বাধ্য হয়ে মুসলমানদের একটি বৃত্ত তৈরি করে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করতে হয়। তবে কয়েক ঘণ্টা পর রোমানদের চাপের মুখে তাদের পা টলে যায়। পেছনের দিকে রমতার খ্রিস্টানদের সংখ্যা বেশি ছিল না, তাই অধিকাংশ মুসলমান সেই দিকেই পিছু হটে এবং তাদের ছত্রভঙ্গ করে নিজেদের তাঁবু পর্যন্ত পৌঁছে যায়। কিন্তু সেনাপতি হাসান বিন আন্মার নিজ স্থানে অটল থাকেন এবং তার বিশেষ বাহিনীকে নিয়ে সরাসরি ম্যানুয়েলের বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। এই মুষ্টিমেয় লোকদের সামনে দেখে ম্যানুয়েল কিছু অবজ্ঞাসূচক কথা বলেন, যা মুসলমানদের আত্মমর্যাদাবোধ ও উদ্দীপনাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। ইবনে আন্মার তার সঙ্গীদের নিয়ে রোমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। তার সাহস ও বীরত্ব বাকি বাহিনীকেও সাহস জোগায় এবং পিছু হটে যাওয়া মুসলমানরা দ্রুত ফিরে আসতে শুরু করে। ম্যানুয়েল এটি দেখে তার ঘোড়াকে তাড়া দেন এবং নেজা (বল্লম) হাতে নিয়ে নিজেই মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করেন। কয়েকজন মুসলিম জানবাজ সুযোগ বুঝে তাকে ঘিরে ফেলেন, কিন্তু তাদের তলোয়ার তার লোহার শিরস্ত্রাণ ও বর্মের ওপর লেগে ছিটকে যাচ্ছিল। অবশেষে মুসলমানরা তার ঘোড়াকে মেরে ফেলে এবং এরপর তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে শিরশ্ছেদ করে। [২]

[১] এটি সেই কায়সার নিকোফরাস যে সেই সময়ে সিরিয়ার উপকূলে আক্রমণ করছিল এবং হামদানের শাসক, মুতানাবির প্রশংসিত সাইফুদ দৌলা তার মোকাবিলা করছিলেন।

[২] নিহায়াতুল আরাব লিন নুওয়াইরি: ২৪/৩৭০ থেকে ৩৭২; তারিখ-ই সিসিলি: ১/৩৫৫ থেকে ৩৬২।

তারিখ-ই উম্মত-ই মুসলিমা

মনুয়েলের নিহত হওয়ার ঘটনায় রোমানদের মধ্যে হুলস্থূল পড়ে গেল। তাদের বড় বড় নওয়াব ও নাইটরা প্রতিশোধের নেশায় সামনে এগিয়ে এল কিন্তু মূলোর মতো কাটা পড়ল। বাকি জেনারেলরা বাহিনীকে সামলে নিয়ে পুনরায় পা জমানোর চেষ্টা করল কিন্তু এরই মধ্যে আকাশে মেঘ ছেয়ে গেল এবং মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হলো। মুজাহিদদের তাকবীর ধ্বনি এবং ঘোড়ার হ্রেষারবের সাথে মেঘের গর্জন এক অদ্ভুত পরিবেশ সৃষ্টি করল এবং তলোয়ার ও বর্শার চমক আসমানি বিজলির সাথে মিলে পরিবেশকে অত্যন্ত ভয়াবহ করে তুলল। এই অবস্থায় এই যুদ্ধ আসর পর্যন্ত চলতে থাকল। অবশেষে খ্রিস্টানরা অত্যন্ত জীর্ণ ও বিধ্বস্ত অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করল কিন্তু তাদের পশ্চাতে অবস্থিত একটি গভীর পরিখা তাদের জন্য প্রাণঘাতী প্রমাণিত হলো। সেখান থেকে বের হওয়ার চেষ্টায় তারা একে অপরের ওপর তলোয়ার চালাতে লাগল যখন আরও পলায়নকারীরা এই পরিখায় এসে পড়ছিল। অবশেষে পরিখাটি ভরে গেল এবং বাকি পলায়নকারীরা তাদের স্বজাতীয়দের ঘোড়ার খুরের নিচে পিষ্ট হয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে গেল। মুসলমানরা তাদের পিছু ছাড়ল না এবং তাদের খুঁজে খুঁজে হত্যা করতে থাকল যতক্ষণ না আকাশ একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেল। মুসলমানদের হাতে প্রচুর গণীমতের মাল অর্জিত হলো যার মধ্যে ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন একটি তলোয়ারও ছিল যা কোনো সাহাবীর ছিল। [১] এর হাতলে এই শব্দগুলো খোদাই করা ছিল:

هذا سيف هندی وزنه مائة وسبعون مثقالاً، طالما ضرب بين يديه رسول الله ﷺ

“এটি একশত সত্তর মিসকাল ওজনের হিন্দুস্তানি তৈরি একটি তলোয়ার যা বহুবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপস্থিতিতে ব্যবহৃত হয়েছে।”

এই যুদ্ধের পর ‘রমতা’ আর বেশি প্রতিরোধ করতে পারল না এবং কয়েকদিন পর বিজিত হলো। [২]

ওয়াকআতুল মাজায:

অন্যদিকে রোমানদের অবশিষ্ট সৈন্য এবং তাদের সহযোগিতা প্রদানকারী সিসিলির খ্রিস্টান বিদ্রোহীরা ইতালির বন্দর ‘রিও’-তে গিয়ে আশ্রয় নিল, যদিও ‘রিও’-র গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে সিসিলির এই চুক্তি ছিল যে তারা তাদের শত্রুদের আশ্রয় দেবে না। ফলে আহমদ বিন হাসান কোনো বিলম্ব না করে একটি নৌবহর প্রস্তুত করে ‘রিও’-র দিকে যাত্রা করলেন। এই বাহিনী ঠিক সেই সময় ‘রিও’ পৌঁছাল যখন রোমান এবং তাদের সহযোগী বিদ্রোহীরা নিজেদের নৌযানে বসে কোথাও পালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এখন উভয় নৌবহরের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হলো। এই সময় কিছু মুজাহিদ ডুবুরি খ্রিস্টানদের জাহাজের নিচে গিয়ে ছিদ্র করে দিল এবং দেখতে দেখতে অনেক জাহাজ ডুবে গেল। যুদ্ধ চলতে থাকল এমনকি সমুদ্র রোমানদের রক্তে লাল হয়ে গেল। যারা জীবিত বেঁচে বের হতে পেরেছিল, তাদের একে অপরের কোনো খবর ছিল না। বন্দীদের মধ্যে এক হাজার নওয়াব, জেনারেল এবং নাইট অন্তর্ভুক্ত ছিল, যখন একজন বড় ধর্মীয় নেতাও ছিলেন। এই যুদ্ধ ‘ওয়াকআতুল মাজায’ নামে পরিচিত, যা রোমানদের শক্তির ওপর চরম আঘাত হেনেছিল এবং খ্রিস্টান বিশ্ব দীর্ঘ সময়ের জন্য সিসিলি পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়েছিল। [৩]

[১] সম্ভবত এই তলোয়ারটি সিরিয়ার যুদ্ধসমূহ বা কনস্টান্টিনোপলের প্রাথমিক আক্রমণের সময় রোমানদের হস্তগত হয়েছিল।

[২] নিহাতুল আরাব লিন নুওয়াইরি: ২৩ / ৩৭২, ৩৭৩; তারিখ-ই সিসিলি: ১ / ৩৬৩ থেকে ৩৬৫।

[৩] আল-মুসলিমুনা ফি সিসিলি: ১ / ১৩৮ থেকে ১৫০; তারিখ-ই সিসিলি: ১ / ৩৬৫ থেকে ৩৬৭।

সেই দিনগুলোতে কায়সার নিকফোরের বাহিনী সিরিয়ার উপকূলীয় শহর ‘মাসিসা’ অবরোধ করে রেখেছিল। এই খবর শোনামাত্রই নিকফোর অবরোধ তুলে নিয়ে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেন এবং সিরিয়ার মুসলমানরা একটি বড় বিপদ থেকে সাময়িক মুক্তি পায়। [১]

এই বিজয়ের সংবাদ সিসিলির মুসলমানদের আনন্দিত করে তোলে। যখন খ্রিস্টান আমিরদের বন্দী করে সেখানে আনা হলো, তখন হাসান বিন আলীর ওপর আনন্দের আতিশয্যে মূর্ছা যাওয়ার মতো অবস্থা তৈরি হলো এবং ১৮ই জিলকদ ৩৫৩ হিজরিতে তিনি ৫৩ বছর বয়সে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। [২]

আহমদ বিন হাসানের অপসারণ:

৩৫৮ হিজরিতে রোম সম্রাট এবং বনু উবাইদের মধ্যে সন্ধি হয় এবং উবাইদি শাসক আল-মুইজ বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে সিসিলির দুটি শহর ‘তাবারমিন’ এবং ‘রামতাহ’ তাদের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। আহমদ বিন হাসানের কাছে এটি অসহনীয় মনে হলো এবং তিনি শহরগুলো রোমানদের হাতে তুলে দেওয়ার আগেই তাতে আগুন ধরিয়ে দিলেন। এতে আল-মুইজ তাকে পদচ্যুত করে আফ্রিকায় ডেকে পাঠান এবং হাসান বিন আলীর একজন মুক্ত করা দাস ইয়াইশকে সিসিলির গভর্নর নিযুক্ত করেন। ইয়াইশের নিয়োগের অভিজ্ঞতা ব্যর্থ প্রমাণিত হয় এবং শীঘ্রই ‘বালার্ম’-এ তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হয় যা দাবানলের মতো সিরাকিউস পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্রোহীরা তাদের অধিকাংশ ক্ষোভ স্থানীয় খ্রিস্টানদের ওপর ঝাড়ল কারণ তাদের ধারণা ছিল যে আল-মুইজ তাদের খুশি করার জন্যই আহমদ বিন হাসানকে পদচ্যুত করেছেন। অবশেষে বনু উবাইদ বাধ্য হয়ে ৩৫৯ হিজরিতে আহমদ বিন হাসানকে পুনর্বহাল করে। তিনি তার ভাই আবুল কাসেমকে সিসিলিতে নায়েব হিসেবে পাঠান। তিনি নিজে আফ্রিকাতেই ছিলেন যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সিসিলি রওনা হওয়ার আগেই ৩৫৯ হিজরির শেষ দিকে ইন্তেকাল করেন। [৩]

আবুল কাসেম কালবি:

হাসান কালবির দ্বিতীয় পুত্র আবুল কাসেম, যিনি শাবান ৩৫৯ হিজরিতে (৯৭১ খ্রি.) এখানে নায়েব গভর্নর হিসেবে এসেছিলেন, এখন স্থায়ী গভর্নর হলেন। তিনি বারো বছর শাসন করেন। তার আমলে সিসিলির সরকার অনেকটা স্বায়ত্তশাসিত হয়ে ওঠে। আবুল কাসেম ধর্মীয় গোঁড়ামির উর্ধ্ব এবং জনদরদী মানুষ ছিলেন। তার ধারণা ছিল যে, জনগণের কাছে শাসকের ধর্ম ও বিশ্বাসের চেয়ে ন্যায়বিচার ও ইনসাফ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যদি তাদের পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়, তবে তারা ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর শাসনও মেনে নেয়; কিন্তু যদি তাদের অধিকার খর্ব করা হয়, তবে তারা নিজ ধর্মাবলম্বীর বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করে। এই চিন্তা মাথায় রেখে তিনি নিজেকে একজন সচ্ছ, িত্রবান, ন্যায়পরায়ণ এবং প্রজাবৎসল শাসক হিসেবে গড়ে তোলার দিকে পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করেন। ঐতিহাসিকরা লেখেন যে, তিনি ধৈর্যশীল, শান্তিকামী এবং ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তিনি উলামা এবং জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের কদর করতেন। তিনি রোমানদের সাথে বেশ কয়েকটি যুদ্ধ করেন এবং শেষ পর্যন্ত একটি যুদ্ধেই প্রাণ বিসর্জন দেন। এটি ৩৭২ হিজরির (৯৮২ খ্রি.) ঘটনা। সুন্নি ঐতিহাসিকরাও তাকে সিসিলির অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক হিসেবে গণ্য করেন এবং উল্লেখ করেন যে, তিনি উত্তরাধিকারীদের জন্য কোনো নগদ অর্থ রেখে যাননি। সমস্ত দিরহাম ও দিনার তিনি জীবদ্দশাতেই সদকা ও খয়রাত করে দিয়েছিলেন। এই কারণেই সিসিলিবাসী তার মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকাহত হয়েছিল। [৪]

[১] নিহায়াতুল আরাব লিন-নুওয়াইর: ২৩/৩৭৩

[২] তারিখ-ই-সিকিলিয়া: ১/৩৬৬ থেকে ৩৬৮

[৩] তারিখ-ই-সিকিলিয়া: ১/৩৬৮ থেকে ৩৭৩

[৪] নিহায়াতুল আরাব লিন-নুওয়াইর: ২৩/৩৭৫; আল-মুসলিমুন ফি সিকিলিয়া, পৃষ্ঠা ১৫২ থেকে ১৬০; তারিখ-ই-সিকিলিয়া: ১/৩৭৩ থেকে ৩৮৫

আবুল কাসিম কালবির উত্তরসূরিগণ:

আবুল কাসিমের পুত্র জাবির তার উত্তরসূরি হন, যিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অযোগ্য। এক বছর পর তাকে পদচ্যুত করা হয়। ৩৭২ হিজরি (৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ) সালে তার স্থলে তার চাচাতো ভাই জাফর বিন মুহাম্মদ কালবি এখানকার আমির হন। তিনি একজন যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন যিনি দুই বছর পর ৩৭৫ হিজরি (৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ) সালে ইন্তেকাল করেন। এরপর তার ভাই আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ কালবি আসেন এবং চার বছর শাসন করে ৩৭৯ হিজরি (৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ) সালে মৃত্যুবরণ করেন।

তার পুত্র আবুল ফুতুহ ‘সিকাতুদ দাওলা’ উপাধি ধারণ করে নয় বছর শাসন করেন। তার দরবার জ্ঞান-গুণ এবং কাব্য ও সাহিত্যের মজলিস হিসেবে গণ্য হতো। ৩৮৮ হিজরি (৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ) সালে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হওয়ার কারণে তিনি জীবদ্দশাতেই তার পুত্র জাফরের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করেন, যিনি ‘তাজুদ দাওলা’ এবং ‘সাইফুল মিল্লাত’ উপাধি নিয়ে শাসনভার গ্রহণ করেন।

জাফরের শাসনের ষোলো বছর শান্তিতে অতিবাহিত হয়, কিন্তু এরপর তার ভাই আলী বারবার গোত্রগুলোকে সাথে নিয়ে পরিস্থিতির অবনতি ঘটান। যদিও আলীকে নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছিল, কিন্তু শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি যার একটি বড় কারণ ছিল প্রধানমন্ত্রী হাসান মুহাম্মদ বাঘাই-এর জুলুম-অত্যাচার, যার ফলে জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। এমতাবস্থায় জনগণের আর্তনাদে পক্ষাঘাতগ্রস্ত আবুল ফুতুহ সক্রিয় হন এবং সিংহাসনে আসীন পুত্র জাফরকে পদচ্যুত করে দ্বিতীয় পুত্র আহমদ আল-আকহালকে শাসনভার প্রদান করেন। আহমদ আল-আকহাল ৪১০ হিজরি (১০১৯ খ্রিস্টাব্দ) সালে ‘তাইদুদ দাওলা’ উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে বসেন। তিনি একজন দুর্বল শাসক ছিলেন। তার শাসনামলে বনু কালব রাষ্ট্র পতনের দিকে ধাবিত হয়। [১]

নরমানদের উত্থান

এই সেই সময় ছিল যখন একটি নতুন শক্তির আবির্ভাব ঘটে। এরা ছিল নরমান জলদস্যু যারা ভূমধ্যসাগরে একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করে লুটতরাজ শুরু করেছিল। নরমানরা মূলত নরওয়ের বরফাবৃত অঞ্চলের অধিবাসী ছিল যাদের সাথে সভ্যতা ও সংস্কৃতির কোনো সম্পর্ক ছিল না। তাদের নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতা থেকে পুরো ইউরোপ আশ্রয় প্রার্থনা করত। দীর্ঘকাল ইউরোপের সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোতে লুটতরাজ চালানোর পর তারা ফ্রান্স আক্রমণ করে এবং কিছু এলাকা দখল করে নেয়। ফ্রান্সের শাসকরা নিরুপায় হয়ে একটি করদ রাজ্য হিসেবে তাদের অধিকার স্বীকার করে নেয় এবং এই এলাকাটি নরমান্ডি নামে পরিচিতি পায়। ইউরোপীয়দের সাথে মেলামেশার ফলে নরমানরা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে। তাদের মর্যাদা তখন আরও বৃদ্ধি পায় যখন নরমান সর্দার অ্যাডলফের সাথে রাজপরিবারের এক কন্যার বিবাহ হয়। শীঘ্রই নরমানরা ইতালিরও কিছু এলাকা জয় করে সেটিকে নিজেদের কেন্দ্রে পরিণত করে। এখন ইউরোপীয় শাসকরা নরমানদের বিপজ্জনক নৌ-অভিযানের জন্য ব্যবহার করতে শুরু করে। [২]

সিসিলির শাসক তাইদুদ দাওলার আমলে নরমানরা প্রথমবারের মতো এই দ্বীপে আক্রমণ চালায়। তারা ৪১৬ হিজরি (১০২৫ খ্রিস্টাব্দ) সালে কালুরিয়া দখল করে সেখানকার মুসলিম জনপদকে সম্পূর্ণভাবে তলোয়ারের নিচে পিষ্ট করে এবং তাইদুদ দাওলা তাদের কোনো সাহায্য করতে পারেননি। [৩]

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৮ / ৩৩৫; নিহায়াতুল আরাব লিন নুওয়াইরি: ২৩ / ৩৮১; আল-মুসলিমুনা ফি সিকিলিয়া, পৃ. ১৬০ থেকে ১৬৭

[২] তারিখ-ই-সিকিলিয়া: ১ / ২২৫ থেকে ২২৭; নিহায়াতুল আরাব লিন নুওয়াইরি: ২৩ / ৩৮১

[৩] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৪১৬ হিজরি

আফ্রিকা থেকে বনু জিরির সাহায্য:

সিসিলির মুসলমানরা বনু কালবের অযোগ্য শাসকদের হতাশাজনক কর্মকাণ্ড এবং কাফেরদের মোকাবিলায় তাদের উদাসীনতায় অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল। ফ্লোরিয়ার পতনকে তারা মুসলিম সিসিলির সমাপ্তির পূর্বাভাস হিসেবে গণ্য করেছিল। বনু কালবের পৃষ্ঠপোষক আফ্রিকার বনু উবাইদ তখন তাদের উন্নতির শিখরে ছিল এবং তাদের বিশ্বের প্রথম সারির সরকারগুলোর মধ্যে গণ্য করা হতো। কিন্তু তাদের কাছ থেকে কোনো কল্যাণের আশা ছিল না। এমন পরিস্থিতিতে সিসিলির মুসলমানরা আলজেরিয়ার শাসক পরিবার বনু জিরির কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে এবং তাদের পরিষ্কারভাবে লিখে দেয় যে, তারা যেন সিসিলির শাসনভার নিজেদের হাতে তুলে নেয়, অন্যথায় তারা দ্বীপটি রোমানদের হাতে তুলে দেবে।

আলজেরিয়ার শাসক মুইজ বিন বাদিস এই বার্তা পেয়ে তার পুত্র আবদুল্লাহর নেতৃত্বে একটি আফ্রিকান বাহিনী সিসিলিতে পাঠান, যিনি তায়িদুদৌলা আহমদ আল-কালবিকে ক্ষমতাচ্যুত করে হত্যা করেন। এটি ৪৩২ হিজরি (১০৩৬ খ্রিস্টাব্দ) সালের ঘটনা। সিসিলির জনগণ তায়িদুদৌলাকে হত্যার যোগ্য মনে করত না। তারা অসন্তুষ্ট হয়ে আফ্রিকান বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। এটি দেখে আবদুল্লাহ আলজেরিয়ায় ফিরে যান। মনে রাখা দরকার যে, সিসিলির শাসককে ক্ষমতাচ্যুত ও হত্যা করতে আসা আফ্রিকান বাহিনীতে মাত্র ছয় হাজার সৈন্য ছিল, অর্থাৎ সিসিলির শাসক গোষ্ঠী তখন এতটাই দুর্বল ছিল যে তাকে পরাস্ত করার জন্য এই ছোট বাহিনীই যথেষ্ট ছিল। [১]

সিসিলিতে তওয়ায়েফুল মুলুক এবং কালবি রাজবংশের সমাপ্তি:

আফ্রিকান বাহিনী ফিরে যাওয়ার পর সিসিলির আমিররা নিহত শাসকের ছোট ভাই সামসামুদৌলাকে সিংহাসনে বসান। কিন্তু পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি এবং এই দ্বীপে অনেকগুলো স্বায়ত্তশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, যারা একে অপরের সাথে বিবাদে লিপ্ত ছিল। আবদুল্লাহ বিন মানকুত “মাজার”, “তারাবানিশ”, “শাকা” এবং “মারসি আলী” এর ওপর দখলদার ছিল। ইবনে হাওয়াস “কাসরিয়ানা”, “জেরজেন্ট” এবং “কাসরুনু” এর শাসক ছিল। “কাতানিয়া” এর ওপর ইবনে কালবি এবং “সারকুসা” এর ওপর ইবনে সুমনার আধিপত্য ছিল। রাজধানী পালেরমোতে একটি মজলিসে শুরার শাসন ছিল। ইতালির শাসকরা আগে থেকেই এমন সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। বাইজেন্টাইন সম্রাট মাইকেল চতুর্থ তার সেরা সেনাপতি জর্জ ম্যানিয়াকসের নেতৃত্বে একটি বাহিনী সিসিলিতে পাঠান, যিনি “মেসিনা” দখল করে নেন। এটি ৪২৯ হিজরি (১০৩৮ খ্রিস্টাব্দ) সালের ঘটনা।

এই পরাজয় কালবি রাজবংশের অবশিষ্ট সম্মানকেও ধুলোয় মিশিয়ে দিল। ৪৩১ হিজরি (১০৪০ খ্রিস্টাব্দ) সালে সামসামুদৌলাকে প্রথমে ক্ষমতাচ্যুত এবং পরে হত্যা করা হয়। এভাবে ৯৬ বছর পর্যন্ত ক্ষমতার স্বাদ গ্রহণকারী বনু কালব ইতিহাসের পাতায় হারিয়ে গেল।

ক্রমবর্ধমান তওয়ায়েফুল মুলুক সিসিলির ভিত্তি নাড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি রোমানদের আরও হস্তক্ষেপ করতে প্ররোচিত করল। জেনারেল জর্জ ম্যানিয়াকস উত্তর দিক থেকে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিলেন এবং সিসিলির কিছু স্বায়ত্তশাসিত আমির তাদের বিরোধীদের বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করে যাচ্ছিলেন। [২]

ঘর পোড়ানো তামাশা:

এই ভাগ্য অন্বেষণকারীদের মধ্যে ইবনে সুমনা সবচেয়ে বেশি ধূর্ত ও মক্কার ছিল। অন্য একজন প্রধান ইবনে হাওয়াস তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত...

[১] আল-কামিল ফিত-তারিখ: ৮/৩৩৭, তাবা দারুল কিতাব আল-আরাবি বৈরুত; নিহায়াতুল আরাব লিন-নুওয়াইর: ২৪/৩৪৭-৩৪৮, তাবা দারুল কুতুব কায়রো।

[২] আল-কামিল ফিত-তারিখ: ৮/৩৩৭, তাবা দারুল কিতাব আল-আরাবি; তারিখ-ই-সিকিলিয়া, পৃ. ৩১৩, ৩১৫ ও ৩২২।

ইবনে সুমনা তাকে তার চাটুকারিতার মাধ্যমে বশীভূত করে নেয় এবং তার রাজনৈতিক অবস্থান আরও সুদৃঢ় করার জন্য মায়মুনার বোনকে বিয়ে করে। কিছুকাল পরেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তিক্ত বাকবিতণ্ডা হয়, যাতে ইবনে সুমনা রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে তার দুই কব্জিতে ল্যানসেট চালিয়ে দেয়। সৎ ছেলে এসে তার মায়ের প্রাণ বাঁচায় এবং চিকিৎসকের মাধ্যমে ক্ষতের চিকিৎসা করায়। মায়মুনা মরতে মরতে বেঁচে যায় এবং জ্ঞান ফেরার পর তার ভাই ইবনুল হাওয়াসের কাছে চলে যায়। বোনের এই অবস্থা দেখে তিনি ইবনে সুমনার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরু করেন। ইবনে সুমনা পরাজিত হয় এবং প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে যায়।

এখান থেকেই সিসিলির ইতিহাসের শেষ অধ্যায় শুরু হয়। ইবনে সুমনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর সদ্য স্বাধীন হওয়া খ্রিস্টান রাষ্ট্র মেসিনায় আশ্রয় নেয়। মেসিনার নবাবরা ইবনে সুমনাকে নিজেদের বন্ধু মনে করে সিসিলির মুসলমানদের বিরুদ্ধে নরম্যানদের সাহায্য নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সিসিলিতে আক্রমণের আমন্ত্রণে নরম্যানরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়। তাদের নেতা রজার, ইবনে সুমনার নির্দেশনায় তার নৌবহর নিয়ে রজব ৪৫৩ হিজরি (নভেম্বর ১০৫২ খ্রিস্টাব্দ) সিসিলিতে পৌঁছে যায়। যেখানে মুসলমানরা অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন ছিল এবং খ্রিস্টানরা রজারকে সাহায্য করার জন্য ঐক্যবদ্ধ ছিল। দেখতে দেখতেই রজার উত্তর সিসিলি দখল করে নেয় এবং সেখানকার অসংখ্য মুসলমান, যাদের মধ্যে বড় বড় আলেম, ফযিলাতপূর্ণ ব্যক্তি এবং মাশায়েখ ও নেককার লোক অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, হিজরত করে আফ্রিকায় চলে যান। [১]

ইসলামী সিসিলিকে বাঁচানোর শেষ চেষ্টা:

দক্ষিণ সিসিলির মুসলমানরা নিজেদের পরিণতি সামনে দেখে আবারও আফ্রিকার সানহাজা শাসক মুইজ বিন বাদিসের কাছে সাহায্য চায়। তিনি ইসলামী ভ্রাতৃত্বের প্রমাণ দিয়ে অবিলম্বে তার নৌবহর পাঠিয়ে দেন, কিন্তু ভাগ্য সহায় ছিল না এবং পুরো নৌবহর ভূমধ্যসাগরে ঝড়ের কবলে পড়ে ডুবে যায়। এই দুর্ঘটনার ফলে আলজেরিয়ার নৌ-শক্তি ধ্বংস হয়ে যায়। মুইজ নতুন কোনো অভিযান শুরু করার পরিবর্তে সেই আরব গোত্রগুলোকে দমনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন যারা বিদ্রোহে পারদর্শী ছিল। নৌবহর ডুবে যাওয়ার পর তার বিশ্বাস জন্মেছিল যে এখন বনু জিরি রাষ্ট্র দখল করা খুব সহজ। মুইজ বিন বাদিসকে তাদের রুখতেই তার সমস্ত শক্তি ব্যয় করতে হয়। এই পরিস্থিতিতে সিসিলির মুসলমানরা একেবারে অসহায় ও বন্ধুহীন হয়ে পড়ে। [২]

আল্লামা ইবনুল আসির আল-জাযারি (রহ.) নৌবহরের ধ্বংসের ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে লেখেন:

“এর পর থেকে ফ্রাঙ্করা বিনা বাধায় সিসিলির অধিকাংশ শহর দখল করতে শুরু করে, যাদের রক্ষা করার মতো কেউ ছিল না। কারণ আফ্রিকার শাসক (আল-মুইজ) আরবদের সাথে দ্বন্দ্ব জড়িয়ে পড়েন এবং ৪৫৩ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।” [৩]

রাজারের ভাই রবার্টের আগমন:

এটি সেই বছর ছিল যখন ইতালি থেকে দ্বিতীয় নরম্যান নেতা রবার্ট গুইস্কার্ড নতুন সৈন্য নিয়ে সিসিলিতে পৌঁছান। তিনি ছিলেন রাজারের ভাই এবং...

[১] আল-কামিল ফিত-তারিখ: ৮/৩৩৭, ৩৩৮, দারুল কিতাব আল-আরাবি; নিহায়াতুল আরাব লিন-নুওয়াইরি: ২৪/৩৮১; তারিখ-এ-সিকিলিয়া: ১/৩২২ থেকে ৩২৩।

[২] আল-কামিল ফিত-তারিখ: ৮/৩৩৮; নিহায়াতুল আরাব লিন-নুওয়াইরি: ২৪/৩৮১, দারুল কুতুব আল-কাহিরা।

[৩] আল-কামিল ফিত-তারিখ: ৮/৩৩৮।

অত্যন্ত অভিজ্ঞ যোদ্ধা ছিলেন। তিনি এসেই বেশ কিছু ছোট-বড় দুর্গ দখল করে নেন। রাজধানী বলরম ছাড়াও এখন মুসলমানদের কাছে অবশিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলো ছিল কেবল এগুলো: ‘জরজন্ত, কাসরে ইয়ানা, সিরকুসা, মাজার, তারাবানিশ, আরগুস, নুতাস’। [১]

সনহাজীদের সাহায্য এবং সিসিলিবাসীদের অকৃতজ্ঞতা:

এদিকে আলজেরিয়ার নতুন শাসক তামীম বিন মুইজ এই পরিস্থিতি দেখে আবারও কোমর বেঁধে নামলেন এবং নিজের দুই ছেলেকে সেনাবাহিনী দিয়ে সিসিলির মুসলমানদের প্রতিরক্ষার জন্য পাঠালেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেখানকার সবচেয়ে বড় সর্দার ইবনে হাওয়াস মুসলমানদের সাহায্য করতে আসা এই মেহমানদের নিজের ক্ষমতার জন্য হুমকি মনে করে তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন।

এই লড়াইয়ে যদিও আফ্রিকান মুজাহিদিনরা বিজয়ী হন এবং ইবনে হাওয়াস নিহত হন, কিন্তু এরপরও সিসিলির মুসলিম আমিররা আফ্রিকান মুজাহিদিনদের সন্দেহ ও অবিশ্বাসের চোখে দেখতে থাকেন। শীঘ্রই স্থানীয় লোকজন এবং বিদেশি সাহায্যকারীদের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়ে যায়। অবশেষে ৪৬১ হিজরিতে সিসিলির এই শেষ সাহায্যকারীরা আলজেরিয়ায় ফিরে যান। সিসিলির মুসলমানরাও দেয়াল লিখন (পরিণতি) বুঝতে পেরে হিজরত শুরু করে দেন। অল্প সময়ের মধ্যেই অসংখ্য মানুষ আফ্রিকায় পৌঁছে যান। [২]

ইবনে হাব্বা-র জিহাদ আন্দোলন এবং বনু উবাইদ-এর জাতিদ্রোহিতা:

কিছু মুসলমান তখনও সিসিলির প্রতিরক্ষার জন্য শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত লড়তে চেয়েছিলেন। একজন সাহসী আমির ইবনে হাব্বা ছিলেন এই আন্দোলনের নেতা। মুসলমানরা তাঁর নেতৃত্বে বিভিন্ন স্থানে নরম্যানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত থাকেন এবং অনেক লড়াইয়ে তারা নিজেদের চিরাচরিত বীরত্বের স্বাক্ষর রাখেন। এদিকে মিশরের বনু উবাইদ সাম্রাজ্য ইবনে হাব্বাকে সফলতার দিকে অগ্রসর হতে দেখে তাঁকে হুমকি দিয়ে বার্তা পাঠায় যে, তিনিও যেন বনু উবাইদকে সেভাবেই কর (খরাজ) পাঠান যেভাবে সিসিলির পূর্ববর্তী শাসকরা বনু উবাইদকে কর পাঠাতেন।

ইবনে হাব্বা ছিলেন একজন স্বাধীন নেতা, তিনি বনু উবাইদ-এর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। হায়! তিনি যদি সেই সময় দূরদর্শিতার পরিচয় দিতেন এবং নরম্যানদের পরাজিত করা পর্যন্ত বনু উবাইদ-এর সাথে প্রকাশ্য বিরোধে না জড়াতেন। ইবনে হাব্বা-র প্রত্যাখ্যানের পর বনু উবাইদ সিসিলির এই শেষ রক্ষকের বিরুদ্ধে জোট গঠন করে। তারা নরম্যান সর্দারদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের কাছে বার্তা পাঠায় যে, যেভাবে সম্ভব ইবনে হাব্বাকে সিসিলি থেকে বিতাড়িত করো, আমাদের পক্ষ থেকে পুরো সিসিলি তোমাদের নামে লিখে দেওয়া হলো।

বনু উবাইদ-এর এই কলঙ্কিত কর্মকাণ্ডের জন্য যত আফসোস করা হোক না কেন তা কম হবে। এই বার্তার পর খ্রিস্টান আক্রমণকারীরা নিশ্চিত হয়ে যায় যে, সিসিলির মুসলমানদের আর কোনো বিদেশি সাহায্যকারী নেই। তারা ইউরোপের আনাচে-কানাচে থেকে একত্রিত হয়ে এই দ্বীপে ঢুকে পড়ে। একের পর এক অনেক শহর জয় করে তারা রাজধানী ‘বলরম’ অবরোধ করে। ইবনে হাব্বা অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে শহরটি রক্ষা করতে থাকেন। [৩]

বলরম-এর পতন:

পাঁচ মাসের অবরুদ্ধ যুদ্ধে মুসলমানরা আক্রমণকারীদের এত মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতি করেন যে তারা বিজয়কে স্বপ্ন ও কল্পনা...

[১] তারিখ-ই-সিকিলিয়া: ১/ ৪৩৪

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৮/ ৩৩৮, ত. দারুল কিতাব আল-আরাবি

[৩] তারিখ-ই-সিকিলিয়া: ১/ ৪৩৭-৪৪০

বুঝে নিয়ে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। কিন্তু এরই মধ্যে স্থানীয় খ্রিস্টানরা বিশ্বাসঘাতকতা করে আক্রমণকারীদের প্রাচীরের দুর্বল অংশগুলোর সন্ধান দিয়ে দিল। এরপর নরম্যানরা তাদের পুরো শক্তি সেই দিকে নিয়োগ করল এবং শহরটি তলোয়ারের জোরে জয় করার উপক্রম হয়েছিল, কিন্তু মুসলমানরা সন্ধির শর্তাবলি পেশ করে আলোচনা শুরু করে দিল। মুসলমানদের শর্তগুলো ছিল নিম্নরূপ:

- মুসলমানদের পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা দেওয়া হবে।
- বালার্ম-এর সমস্ত মসজিদ অক্ষুণ্ণ রাখা হবে।
- মুসলমানদের জন্য ইসলামি আইন কার্যকর থাকবে।
- মুসলমানদের মামলাগুলোর ফয়সালা মুসলমান কাজি করবেন।

নরম্যানরা শর্তগুলো মেনে নিল, যার পর বালার্ম-এর দরজা বিজয়ীদের জন্য খুলে দেওয়া হলো। বালার্ম পতনের ট্র্যাজেডি রবিউল আউয়াল ৪৬৩ হিজরি (জানুয়ারি ১০৭১ খ্রিস্টাব্দ) সালে সংঘটিত হয়। [১]

ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা বালার্ম বিজয়কে একটি মহান সাফল্য হিসেবে গণ্য করেন। এই শহরটি ছিল মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির দোলনা। এতে দুইশরও বেশি মসজিদ ছিল। শিক্ষা ও পাঠদানের কাজ পুরোদমে চলত। অন্তত তিনশ শিক্ষক ও মুদাররিস এই শহরে কর্মরত ছিলেন।

বালার্ম পতনের পরপরই ‘মাজার’ এবং ‘তারাবানিশ’-এর শাসক আবদুল্লাহ বিন মানকুত বালার্ম চুক্তির শর্তানুসারে তার শহর দুটি রাজারের হাতে তুলে দেন। [২]

প্রতিরোধের শেষ স্ফুলিঙ্গসমূহ:

রাজার এখন সিকিলিয়াহ-র শাসক ছিলেন। তবে মুসলমানদের প্রতিরোধের চেতনা তখনও শেষ হয়ে যায়নি এবং মজবুত প্রাচীরবেষ্টিত কিছু শহর তখনও তাদের অধীনে ছিল। কিন্তু নরম্যানরা আরও প্রায় পনেরো বছরের জন্য সামরিক অভিযান স্থগিত রাখে, এই সময়ে তারা তাদের অভ্যন্তরীণ মতপার্থক্য মেটাতে এবং বিজিত এলাকাগুলোর শাসনব্যবস্থা পরিচালনায় ব্যস্ত ছিল।

৪৭৮ হিজরিতে রাজার অবশিষ্ট মুসলিম জনপদগুলো জয়ের জন্য বের হন। ৪৭৯ হিজরিতে তিনি উত্তর সিকিলিয়াহ-র দুটি সুদৃঢ় ইসলামি শহর: তাবারমিন এবং সারকুসাহ সেখানকার মুসলমানদের অভূতপূর্ব প্রতিরোধ সত্ত্বেও জয় করে নেন। ৪৮১ হিজরিতে (১০৮৮ খ্রিস্টাব্দ) জারবাজাত-কেও দীর্ঘ অবরোধের পর পদানত করা হয়। কাসর ইয়ানা সবচেয়ে কঠিন ফ্রন্ট হিসেবে প্রমাণিত হয়। তবে তিন বছরের অবরোধের পর ৪৮৪ হিজরিতে (১০৯১ খ্রিস্টাব্দ) এই শহরটিও জয় করা হয়। সবশেষে ‘রাগুস’ এবং ‘নুতুস’ দখল করা হয়। এভাবে পুরো সিকিলিয়াহ-র ওপর খ্রিস্টানরা দখলদারিত্ব কায়েম করে এবং সেখানকার মুসলমানরা নরম্যানদের প্রজায় পরিণত হয়। [৩]

[১] তারিখ-ই-সিকিলিয়াহ: ১/ ৩৩০, ৩৩১

[২] আল-আরব ফি সিকিলিয়াহ, ডক্টর ইহসান আব্বাস (মৃত্যু ১৩২৩ হি.): পৃষ্ঠা ৮৮, ৮৯, তাবা দারুস সাকাফাহ বৈরুত লেবানন: প্রকাশকাল: ১৯৭৫ খ্রি.

[৩] তারিখ-ই-সিকিলিয়াহ: ১/ ৩৩২, ৩৩৩

তারিখে উন্মত্তে মুসলিমা

নরম্যানদের শাসনকালে সিসিলির মুসলমানরা

সিসিলিতে মুসলিম শাসনের যুগ শেষ হয়ে গিয়েছিল, ইসলামি পতাকার পরিবর্তে এখন এখানে নরম্যানদের ঝাণ্ডা উড়ছিল। কিন্তু মুসলমানরা অবশিষ্ট ছিল। নরম্যানদের সিসিলিতে মুসলমানরা কোন কোন পর্যায়ে মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে? আসুন এর ওপর এক নজর দেওয়া যাক।

রাজা প্রথম রজার: ৪৮৪ হিজরি থেকে ৪৯৪ হিজরি (১০৯১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১১০১ খ্রিষ্টাব্দ)

নরম্যান শাসক প্রথম রজার সিসিলি দখলের পর শুরুতে মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতা বজায় রেখেছিলেন, কিন্তু এই সুবিধা দক্ষিণ দিকের শহরগুলো যেমন: পালারমো, গিরজেন্ট এবং নোটো পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। উত্তরের শহরগুলো: কাসর ইয়ানা, মেসিনা এবং সিরাকিউস ইত্যাদিতে তাদের জীবন দুর্বিষহ ছিল। এমন একটি নীতি গ্রহণ করা হচ্ছিল যাতে মুসলমানরা ধীরে ধীরে তাদের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। রজার এই সিলসিলায় নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করেছিলেন:

- নরওয়ে এবং দক্ষিণ ইতালি থেকে নরম্যান এবং অন্যান্য বংশের খ্রিস্টানদের বিপুল সংখ্যায় এখানে এনে বসতি স্থাপন করানো হয়েছিল যাতে এটি খ্রিস্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে পরিণত হয়।
- ইসলামের প্রচারের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল।
- শিল্প-কারখানা, বাণিজ্য এবং জীবিকার সম্মানজনক ক্ষেত্রগুলোর দরজা মুসলমানদের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।
- মুসলিম জমিদারদের থেকে সমস্ত জমি দখল করে নেওয়া হয়েছিল। মুসলমানদের কেবল শ্রমিক ও কৃষক বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। [১]

ক্রুসেড উসকে দেওয়ার ক্ষেত্রে নরম্যানদের ভূমিকা:

সিসিলি দখলের ঘটনা খ্রিস্টান বিশ্বের সাহসকে বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং তারা যত দ্রুত সম্ভব অবশিষ্ট মুসলিম বিশ্বের ওপর আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছিল। সবার আগে তাদের নজর আন্দালুস এবং উত্তর আফ্রিকার মুসলিম দেশগুলোর ওপর পড়েছিল। এর পাশাপাশি তারা সিরিয়া এবং ফিলিস্তিন জয় করে জেরুজালেম পুনরুদ্ধারের স্বপ্নও দেখতে শুরু করেছিল। এই প্রচেষ্টাগুলো সিসিলির কেন্দ্র ‘পালারমো’ জয়ের পরপরই শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং এই সময়ে অবশিষ্ট সিসিলি বিজয়ের কাজ কয়েক বছরের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছিল।

এই দিনগুলোতেই ৪৬৭ হিজরিতে (১০৭৪ খ্রিষ্টাব্দে) উত্তর আন্দালুসের খ্রিস্টান শাসক আলফনসো মধ্য ও দক্ষিণ আন্দালুসের মুসলিম এলাকাগুলোতে আক্রমণ শুরু করেছিলেন, যার ফলে ৪৭৮ হিজরিতে আন্দালুসের কেন্দ্রীয় শহর ‘তলেদো’ হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল।

৪৮০ হিজরিতে কাসরা দ্বীপ থেকে নরম্যানদের একটি শক্তিশালী নৌবহর ‘আলজেরিয়া’র রাজধানী মাহদিয়ার ওপর আক্রমণ চালিয়েছিল,

[১] তারিখ সিসিলি: ১/ ৩৬৭, ৩৬৮; আল-কামিল ফিত তারিখ: সন ৪৮৪ হিজরি

তারিখ মিলাতে মুসলিমা

খিলাফতে বনু আব্বাস

মুসলমানরা পরাজিত হলো এবং বনু জিরি (সানহাজি)-দের এই রাজধানী কিছুদিনের জন্য নরম্যানদের দখলে চলে গেল।

বনু জিরি মাহদিয়া পুনরুদ্ধারের জন্য অপমানজনক শর্তে নরম্যানদের সাথে সন্ধি করল, যার ফলে নরম্যানদের আর এই ভয় রইল না যে সিসিলির মুসলমানরা এখন বহির্বিশ্ব থেকে কোনো সাহায্য পেতে পারবে। ফলে এরপর সিসিলির অবশিষ্ট মুসলিম দুর্গগুলো অত্যন্ত দ্রুততার সাথে জয় করে নেওয়া হলো, এমনকি ৪৮৩ হিজরিতে পুরো সিসিলি নরম্যানদের দখলে চলে এল।

এখন সেখানে খ্রিস্টান নেতাদের একটি ঐতিহাসিক গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো, যেখানে মুসলিম বিশ্বকে পদানত করার সংকল্প নবায়ন করা হলো। প্রতিনিধিরা রজারকে পরামর্শ দিল: “ইঞ্জিলের কসম! আমাদের এবং মুসলমানদের জন্য এটাই উত্তম যে সমস্ত ইসলামি দেশ খ্রিস্টান দেশে পরিণত হোক।” এর অর্থ ছিল যে সমস্ত খ্রিস্টান শাসক মিলে ইসলামি দেশগুলোর ওপর আক্রমণ করবে যাতে মুসলমানরা মসীহের সুসংবাদের যোগ্য হতে পারে।

কিন্তু রজার জানত যে মুসলমানদের একবারে নির্মূল করা সম্ভব নয়। তার ধারণা ছিল যে এই অভিযান বিভিন্ন ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে অব্যাহত থাকলেই কেবল সফল হতে পারে। তাই সে খ্রিস্টান প্রতিনিধিদের প্রস্তাব দিল যে অন্যান্য খ্রিস্টান দেশগুলো মিলে সিরিয়া ও বাইতুল মুকাদ্দাস আক্রমণ করুক, আর সিসিলির খ্রিস্টানদের উত্তর আফ্রিকার জন্য অবসর থাকতে দেওয়া হোক। সে বলল:

“যখন তোমরা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছ, তখন উত্তম হলো তোমরা বাইতুল মুকাদ্দাস দখল করো এবং এই শহরটিকে জালিমদের থেকে মুক্ত করে একটি গৌরবময় স্থান অর্জন করো, কারণ ইতিমধ্যে আমাদের এবং আফ্রিকান দেশগুলোর মধ্যে চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন হয়েছে।”

এরপর রজার এবং তার উত্তরসূরিরা উত্তর আফ্রিকাকে তাদের বিচরণক্ষেত্রে পরিণত করল, যেখানে বনু জিরি রাষ্ট্র বৈদেশিক চাপ এবং অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার শিকার হয়েছিল এবং এর আমিররা একের পর এক উপকূলীয় অঞ্চলে স্বায়ত্তশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠা করছিল। [১]

সাইমন: ৪৯৩ হিজরি থেকে ৪৯৯ হিজরি (১১০১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১১০৫ খ্রিস্টাব্দ)

রজারের মৃত্যুর পর তার পুত্র সাইমন সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি মাত্র চার বছর শাসন করেন এবং পিতার নীতিতে কোনো পরিবর্তন করেননি। [২] মুসলমানদের ওপর জীবনধারণের পথ আগের মতোই সংকীর্ণ রইল। বাস্তবতা হলো, মুসলমানরা সিসিলিকে, যা ছিল কেবল একটি উর্বর ভূমি, নিজেদের রক্ত ও ঘাম দিয়ে সিঁধিত করে ফুলে-ফলে সুশোভিত বাগানে পরিণত করেছিল। এখানকার কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যিক উন্নতি তাদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার কাছে ঋণী ছিল। নরম্যানরা সংস্কৃতি ও সভ্যতার দিক থেকে অত্যন্ত পশ্চাৎপদ ছিল। তাছাড়া তারা ইউরোপ থেকে যেসব খ্রিস্টান জাতিকে এখানে এনে বসতি স্থাপন করিয়েছিল, তারাও ছিল অসভ্য। অথচ মুসলমানরা সিসিলিকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করেছিল, যার কৃষি, বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক ও বিচার বিভাগীয় শাখাগুলো পরিচালনা করা তাতারীদের সাধের বাইরে ছিল। তাই মুসলমানদের কোণঠাসা করার নীতি বেশিদিন স্থায়ী হতে পারেনি। [৩]

রজার দ্বিতীয়: ৪৯৯ হিজরি থেকে ৫৪৯ হিজরি (১১০৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১১৫৪ খ্রিস্টাব্দ)

সাইমনের মৃত্যুর পর তার ভাই রজার দ্বিতীয় শাসক হন, যিনি অর্ধশতাব্দী ধরে শাসন করেন। তাকে ইউরোপের প্রখ্যাত...

[১] তারিখ সাকাল্লিয়া: ১/ ৪৫১, ৪৫২

[২] তারিখ সাকাল্লিয়া: ১/ ৪৭১

[৩] তারিখ সাকাল্লিয়া: ১/ ৪৭০

তারিখ উন্মতে মুসলিমা - সপ্তম খণ্ড

বাদশাহদের মধ্যে গণ্য করা হয়। তার পিতা রজার আউয়ালের মুসলিম বিদ্বেষ সত্ত্বেও যখন তিনি তার ছেলেকে একজন সুসভ্য শাহজাদা হিসেবে দেখতে চাইলেন, তখন তাকে মুসলিম পণ্ডিতদের কাছে শিক্ষা গ্রহণে বাধ্য হতে হলো। কারণ পাদ্রিরা শিক্ষাগত দিক থেকে কোনো পর্যায়েই ছিল না। এই শিক্ষা ও লালন-পালনের কারণে রজার সানি আরবি সাহিত্য, গণিত, ভূগোল এবং ইসলাম সম্পর্কে বেশ ভালোই অবগত ছিলেন। তিনি বুঝতেন যে, মুসলমানদের দমানোর নীতি প্রকৃতপক্ষে দেশকে নিঃস্ব করার নামান্তর। তাই সিংহাসনে আরোহণের পর তিনি মুসলমানদের পুনরায় ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পসহ সকল ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের অনুমতি দেন। এভাবে সিসিলির মুসলমানদের স্বস্তি ফিরে আসে। মুসলমানদের সহযোগিতায় সিসিলি পুনরায় একটি সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত হয় এবং ইউরোপীয় শক্তিগুলো তাকে ঈর্ষার চোখে দেখতে শুরু করে। এর আগে সিসিলির নরম্যান সরকার এবং রোমের গির্জার মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছিল, কিন্তু রজার সানির মর্যাদা এতটাই বৃদ্ধি পায় যে, ৫২৪ হিজরিতে তাকে সিসিলি ও ইতালির সম্রাট উপাধি দেওয়া হয়। রোমের গির্জার পক্ষ থেকে তার রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হয় এবং তাকে ইউরোপের সবচেয়ে সম্মানিত শাসক হিসেবে গণ্য করা হয়। [১]

রজার সানির দ্বিমুখী নীতি:

যদিও রজার সানি রাজনৈতিক স্বার্থে অভ্যন্তরীণভাবে মুসলমানদের প্রতি একটি বিশেষ সীমা পর্যন্ত সহনশীলতা প্রদর্শন করতেন, কিন্তু বহির্বিশ্বে তিনি তার পিতার মতোই মুসলমানদের রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি খর্ব করার মানসিকতা রাখতেন। তাই তার পুরো শাসনামলে প্রতিবেশী মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, যুদ্ধ অথবা প্রতারণামূলক সন্ধি অব্যাহত ছিল।

রজার সানির এই চরিত্রের কারণে খ্রিস্টান বিশ্ব তাকে খ্রিস্টধর্মের সাহায্যকারী হিসেবে প্রসিদ্ধ করে দেয় এবং এই কারণেই রোমের গির্জার পক্ষ থেকে তার রাজ্যাভিষেক হয়েছিল। এখান থেকেই প্রথমবার নরম্যান সরকারের সাথে রোমের গির্জার অংশীদারিত্ব শুরু হয়, যা শীঘ্রই সিসিলিতে খ্রিস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে সুপ্ত ঘৃণার স্ফুলিঙ্গ জ্বালিয়ে দেয়।

রজার সানির শেষ দিনগুলোতে এমন একটি ঘটনা ঘটে যা সিসিলিতে কটরপন্থী পাদ্রিদের প্রভাব-প্রতিপত্তি অনেক বাড়িয়ে দেয়। ঘটনাটি হলো, ৫৩৮ হিজরিতে সিসিলির একজন নৌ-কর্মকর্তা ফিলিপ ‘বুনা’ আক্রমণ করেন এবং সাধারণ মানুষকে হত্যা ও বন্দী করা সত্ত্বেও কিছু মুসলিম উলামা ও মাশায়েখের সাথে সম্মানের সাথে আচরণ করেন এবং তাদের অন্য জনপদে হিজরত করার অনুমতি দেন। পাদ্রিরা এই নিয়ে হাঙ্গামা সৃষ্টি করে এবং ফিলিপের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে যে, তিনি মুসলমানদের প্রতি নমনীয়তা প্রদর্শন করেছেন এবং নিজেও মুসলমান হয়ে গেছেন। মামলাটি রজার সানির সামনে পেশ করা হয় এবং পাদ্রিরা নিজেদের কথা মানিয়ে নিয়ে ফিলিপকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার ব্যবস্থা করে। এরপর সিসিলিতে পাদ্রিদের প্রভাব দিন দিন বাড়তে থাকে এবং মুসলমানদের অবস্থা সংকীর্ণ হতে থাকে। [২]

উত্তর আফ্রিকায় হামলা:

রজার সানি তার শাসনামলে উত্তর আফ্রিকার ছোট ছোট স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর ওপর আক্রমণাত্মক হামলা চালিয়ে যেতেন, যা...

[১] তারিখ-ই-সিকিলিয়া: ১/ ৪৭১ থেকে ৪৭৪

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: বছর ৫৩৮ হিজরি

(দাওলাতে সানহাজিয়া) থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল। যখন বনু জিরি পারস্পরিক চুক্তির বরাত দিয়ে এই আক্রমণগুলোর প্রতিবাদ করত, তখন রজার উত্তর দিত যে এই নতুন রাষ্ট্রগুলো সেই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল না। অন্যদিকে রজার সুযোগ বুঝে এই স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোকেও বনু জিরির বিরুদ্ধে গোপনে সাহায্য করতে থাকত। ৫১১ হিজরিতে আলী বিন ইয়াহইয়া বিন তামীমের কাছে এই আঁতাত প্রকাশ হয়ে পড়ে, যার জবাবে তিনি মুরাবিতুন আমীর আলী বিন ইউসুফ বিন তাশফিনের সাথে যোগাযোগ করে সিসিলির ওপর একটি যৌথ আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। কিন্তু নিজের সংকল্প বাস্তবায়নের আগেই আলী বিন ইয়াহইয়ার আকস্মিক মৃত্যু হয়।

৫১৬ হিজরিতে আলী বিন ইউসুফ বিন তাশফিন সিসিলির ওপর একটি শক্তিশালী আক্রমণ চালিয়ে “নিকোতেরা” শহরটি দখল করে নেন। কিন্তু এতে নরম্যানদের শক্তিতে কোনো হেরফের হয়নি, বরং পরের বছরই তারা মাহদিয়া দখলের জন্য একটি বিশাল নৌবহর পাঠায়। তবে সৌভাগ্যবশত ঝোড়ো বাতাস নরম্যান নৌবহরকে গতিপথ পরিবর্তন করতে বাধ্য করে। নরম্যানরা পান্তেলেরিয়া দ্বীপে অবতরণ করে, যেখানে আগে থেকেই তাদের দখল ছিল কিন্তু জনসংখ্যার অধিকাংশ ছিল মুসলিম। নরম্যানরা তাদের ব্যর্থতার ক্ষোভ মেটাতে সেখানে এমন গণহত্যা চালায় যে নিষ্পাপ শিশুদেরও রেহাই দেয়নি।

নরম্যানরা এর পরপরই মাহদিয়া থেকে দূরে অন্য একটি দুর্গ “দিমাস”-এর ওপর আক্রমণ চালায়। তবে মাহদিয়ার সেনাবাহিনী সময়মতো সাহায্যের জন্য পৌঁছে যায় এবং নরম্যানদের দীর্ঘকাল পর এক অপমানজনক পরাজয় বরণ করে পালিয়ে যেতে হয়। এটি ৫১৭ হিজরির ঘটনা।

এরপরও রজার নিবৃত্ত হয়নি। সে বাহ্যিকভাবে দাওলাতে বনু জিরির দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছিল, কিন্তু পর্দার আড়ালে বনু জিরি থেকে বিদ্রোহী হওয়া ছোট ছোট মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে শক্তিশালী করে বনু জিরিকে দুর্বল করে দিচ্ছিল। ধীরে ধীরে এই স্বাধীন মুসলিম আমীররা নরম্যানদের করদ রাজ্যে পরিণত হয়। এই লোকেরাই উত্তর আফ্রিকায় রজারের বিজয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

৫২৯ হিজরিতে (১১৩৪ খ্রিষ্টাব্দ) রজার জেরবা দখল করে নেয়, যার ফলে তার সাহস অনেক বেড়ে যায়।

দুর্ভাগ্যবশত ৫৩৬ হিজরিতে আফ্রিকায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং বনু জিরিও বাধ্য হয়ে খাদ্যশস্য সংগ্রহের জন্য রজারের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ চুক্তি করতে বাধ্য হয়। এরপর উত্তর আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলোর আমীররা প্রকাশ্যেই রজারের সমর্থক হয়ে যায়। রজার একজনকে সাথে নিয়ে অন্যজনের গর্দান কাটতে থাকে এবং মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর ওপর দখল কায়েম করতে থাকে। ৫৩৯ হিজরিতে (১১৪৪ খ্রিষ্টাব্দ) ব্রেশক, বেজাইয়া এবং সাফাক্স; ৫৪১ হিজরিতে (১১৪৬ খ্রিষ্টাব্দ) ত্রিপোলি (তারাবুলুস আল-গারব) এবং ৫৪২ হিজরিতে (১১৪৭ খ্রিষ্টাব্দ) সে গাবেস দখল করে নেয়। ভূমধ্যসাগরের মুসলিম দ্বীপগুলোও নরম্যানদের দখলে চলে যেতে থাকে। ৫৪০ হিজরিতে (১১৪৫ খ্রিষ্টাব্দ) কারকানাহও তাদের দখলে চলে যায়। এই অধিকৃত মুসলিম এলাকাগুলোতে সাধারণ নাগরিকদের গণহত্যা করা হয়, রক্তের নদী বইয়ে দেওয়া হয় এবং সমস্ত ধন-সম্পদ লুট করে সিসিলিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। [১]

আফ্রিকার মুসলিম বন্দী নারীদের মুক্তিতে সিসিলির মুসলমানদের অংশ:

এই অভিযানগুলোতে বন্দী করা কুমারী মেয়েদের দাসী বানিয়ে সিসিলিতে বিক্রি করে দেওয়া হতো। শুধুমাত্র জেরবা দ্বীপ থেকে বন্দী করা নারীদের সংখ্যা ছিল আট হাজার, যাদের সিসিলিতে এনে দাসী বানানো হয়েছিল। সেখানকার মুসলমানরা যদিও নিজেরা অসহায় ও নিপীড়িত...

[১] তারিখ-ই-সিকিলিয়া: ১/ ৩৫৬, ৩৫৭

ছিলেন, তবে তাদের আত্মমর্যাদাবোধের প্রশংসা করতে হয় যে, তা সত্ত্বেও তারা নিজেদের সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করে সেই মুসলিম বোনদের মুক্ত করতেন। ৫৩৯ হিজরিতে ব্রাশকের বন্দি নারীদের মুক্তি দেওয়ার জন্য সিসিলির মুসলমানরা বিশাল অংকের অর্থ প্রদান করেছিলেন। [১]

এদিকে নরম্যানদের প্লাবন সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, এমনকি ৫৪৩ হিজরিতে দ্বিতীয় রজার বনু জিরির রাজধানী মাহদিয়াও দখল করে নেন এবং ইসলামের এই কেন্দ্রে ক্রুসেডারদের পতাকা উড়তে শুরু করে। এভাবে নরম্যানদের সেই আক্রমণ যা ৪৬৪ হিজরিতে ক্যালব্রিয়া দখলের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল, ১৩৮ বছর সময়ের মধ্যে মাহদিয়া পর্যন্ত পৌঁছে যায়। মুসলমানরা উত্তর আফ্রিকা থেকে সিসিলি ও ইতালি পর্যন্ত যে ক্রমে পৌঁছেছিলেন, খ্রিস্টানরা তার বিপরীত ক্রমে ইতালি থেকে অগ্রসর হয়ে উত্তর আফ্রিকায় প্রবেশ করে।

মাহদিয়ার পর নরম্যানরা মিসর ও সিরিয়া দখল করতে চেয়েছিল, কিন্তু সেই সময়েই দ্বিতীয় রজার এবং কনস্টান্টিনোপলের রাজার মধ্যে মতভেদ দেখা দেয় এবং যুদ্ধের উপক্রম হয়, যার ফলে নরম্যানদের আক্রমণ কয়েক বছরের জন্য থেমে যায়। [২]

প্রথম উইলিয়াম: ৫৪৯ হিজরি থেকে ৫৬১ হিজরি (১১৫৪ খ্রি. থেকে ১১৬৬ খ্রি.)

দ্বিতীয় রজার বার্বাক্যের কারণে তার পুত্র উইলিয়ামের পক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করেন, যিনি ‘উইলিয়াম দ্য ব্যাড’ উপাধিতে পরিচিত হন। শুরুতে তিনি তার পিতার মতো স্থানীয় মুসলমানদের সাথে নরম আচরণ করতে থাকেন। কিন্তু চতুর্থ পোপ অ্যাড্রিয়ান তা সহ্য করতে পারেননি, তিনি স্থানীয় আমিরদের প্ররোচিত করে উইলিয়ামের সিংহাসন উল্টে দেওয়ার চেষ্টা শুরু করেন। এই পরিস্থিতিতে উইলিয়াম অতিষ্ঠ হয়ে ৫৫১ হিজরিতে (১১৫৬ খ্রি.) পোপের সাথে সন্ধি করেন এবং মুসলমানদের প্রতি তার নরম অভ্যন্তরীণ নীতি পরিবর্তন করে ফেলেন। তবে এই কাজটি তিনি ধীরে ধীরে করেন, কারণ তিনি দেখেছিলেন যে প্রথম রজারের আমলে মুসলমানদের হঠাৎ করে সমস্ত বিভাগ থেকে বের করে দেওয়া দেশের জন্য কতটা ব্যয়বহুল হয়েছিল, তাই উইলিয়াম মুসলমানদের জীবনের সমস্ত বিভাগে অন্তর্ভুক্ত থাকতে দেন।

তবে তিনি পাদ্রিদের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে দেন যে তারা যা খুশি করতে পারে। এভাবে সিসিলিতে একই সাথে জীবন দুটি ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে। একদিকে মুসলমানরা সরকারি পদ ও বেসরকারি খাতে সক্রিয় ছিলেন যেখানে সাধারণ খ্রিস্টান ও সরকারি কর্মকর্তারা আপাতদৃষ্টিতে তাদের সাথে কোনো গোঁড়ামি দেখাতেন না, কিন্তু অন্যদিকে পাদ্রিদের পক্ষ থেকে প্রকাশ্য ইসলাম-বিদ্বেষী প্রচারণা অব্যাহত ছিল যা সাধারণ খ্রিস্টান নাগরিকদের ধীরে ধীরে ধর্মান্বিত করে তুলছিল। [৩]

উইলিয়ামের আমলে উত্তর আফ্রিকা নরম্যানদের হাত থেকে বেরিয়ে যায়। এই বিপ্লবের সূচনা উত্তর আফ্রিকার শহর সাফাক্সের গভর্নর ওমর বিন হুসাইনের হাত ধরে হয়েছিল, যিনি নরম্যানদের করদ দাতা ছিলেন। নরম্যানরা তাকে দমন করার জন্য তার পিতা হুসাইনকে সিসিলিতে জিম্মি করে রেখেছিল, কিন্তু একবার হুসাইন সুযোগ পেয়ে কারাগার থেকে তার ছেলের কাছে একটি গোপন বার্তা পাঠান:

“আমি ভোরের প্রদীপ। তুমি সুযোগের অপেক্ষায় থাকো। আমার আনন্দ এতেই যে তুমি দেশের স্বাধীনতার জন্য আমার প্রাণ উৎসর্গ করে দাও।”

[১] তারিখ সাকালিয়া: ১/ ৩৫৭

[২] তারিখ সাকালিয়া: ১/ ৩৭৭ থেকে ৩৭৯

[৩] তারিখ সাকালিয়া: ১/ ৩৫৭, ৩৫৮

ওমর বিন হুসাইন এই গোপন বার্তাটি মনে রেখেছিলেন এবং ৫৫২ হিজরিতে সুযোগ পাওয়া মাত্রই নরম্যানদের থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। নরম্যান দূত তাকে হুমকি দিতে এলে তিনি একটি কৃত্রিম জানাজা তৈরি করে দূতকে দেখান, তার সামনে সেই কৃত্রিম লাশের দাফন করান এবং বলেন: “তোমার বাদশাহকে গিয়ে বলো যে আমার বাবা মারা গেছেন। মনে করো এটি আমার বাবার জানাজা। আমি তার মাথার বিনিময়ে দেশের স্বাধীনতা কিনে নিয়েছি।”

দূত ফিরে গিয়ে উইলিয়ামকে এই ঘটনা শোনান, তিনি হুসাইনকে জেল থেকে বের করে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেন। আল্লাহর সেই বান্দা হাসিমুখে ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করেন কারণ এর বিনিময়ে তিনি নিজ দেশের স্বাধীনতার ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন। এমনই হলো। সাফাকাসের পর ত্রিপোলিতে আবু ইয়াহইয়া বিন মাতরুহ এবং কাবিসে মুহাম্মদ বিন রশিদ স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করেন।

এটি সেই সময় ছিল যখন আল্লাহ মুসলমানদের সাহায্যের জন্য সিরিয়ায় নূরুদ্দিন জংগি এবং মরক্কোতে মুওয়াহহিদিনদের প্রধান আব্দুল মুমিনকে দাঁড় করিয়েছিলেন। নূরুদ্দিন জংগি সিরিয়া দখলের ক্রুসেডারদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেন, অন্যদিকে আব্দুল মুমিন উত্তর আফ্রিকার মুসলমানদের ডাকে সাড়া দিয়ে মরক্কো থেকে আক্রমণ করেন এবং বিভিন্ন রণাঙ্গনে নরম্যানদের পরাজিত করে ৫৫৩ হিজরিতে মাহদিয়াকেও স্বাধীন করে নেন। সানহাজিদের শেষ শাসক হাসান, যিনি মাহদিয়ার পতনের পর দ্বারে দ্বারে ঘুরছিলেন, আব্দুল মুমিনের অনুরোধে আবারও মাহদিয়ার বিশাল প্রাসাদে বসবাস শুরু করেন। এভাবে উত্তর আফ্রিকা নরম্যানদের উপনিবেশ থেকে মুক্তি পায়। [১]

উইলিয়াম দ্য গুড: ৫৬১ হিজরি থেকে ৫৮৫ হিজরি (১১৬৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১১৮৯ খ্রিষ্টাব্দ)

উইলিয়ামের মৃত্যুর পর তার পুত্র দ্বিতীয় উইলিয়াম তেরো বছর বয়সে ক্ষমতায় আসেন। তার লালন-পালনে মুসলিম খাদেম ও আমিররা শরিক ছিলেন, তাই মুসলমানদের প্রতি তার মনে একটি নরম জায়গা ছিল।

তবে এই কোমলতা কেবল এই পর্যন্তই ছিল যে, তিনি প্রাচ্য ও আরবীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে একটি সুন্দর ফ্যাশন হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এবং নির্মাণ, দাপ্তরিক ও শিল্প সংক্রান্ত কাজের জন্য তিনি মুসলমানদের সেবা গ্রহণ করতেন। এছাড়া মুসলমানদের কিছু সীমিত ধর্মীয় স্বাধীনতা ছিল, যেমন তারা মসজিদ নির্মাণ করতে পারত, উচ্চস্বরে আজান দেওয়া যেত, “পার্সোনাল ল”-এর আওতাভুক্ত বিরোধগুলো তারা মুসলিম কাজীর কাছে নিয়ে যেতে পারত।

কিন্তু এই উইলিয়ামই অন্যদিকে ছিলেন একজন কটুর খ্রিষ্টান শাসক। রোমান চার্চের সাথে তার গভীর সম্পর্ক ছিল। পাদ্রিদের আগের মতোই অবাধ স্বাধীনতা ছিল। কটুভাষী খ্রিষ্টানরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শানে প্রকাশ্য অবমাননা করত এবং সরকার তাতে বিন্দুমাত্র বাধা দিত না। সরকার সাধারণত মানুষকে জোরপূর্বক খ্রিষ্টান বানাচ্ছিল না, তবে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণের জন্য ব্যাপক উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছিল। সুন্দরী মুসলিম মেয়েদের অপহরণ করে রাজপ্রাসাদে জোরপূর্বক খ্রিষ্টান বানিয়ে রাখা হতো। এভাবে মুসলমানদের ঈমান পদে পদে বিপদের মুখে ছিল। তাদের জন্য সমস্যা দিন দিন বাড়ানো হচ্ছিল।

[১] তারিখ-ই-সিকিলিয়া: ১/ ৪৫৯ থেকে ৪৬১, টিকাও দেখুন।

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

যার ফলে দুর্বল চিত্তের লোকেরা অন্তত বাহ্যিকভাবে হলেও খ্রিস্টান হওয়ার ঘোষণা দিচ্ছিল। [১]

সিকিলিতে ইবনে জুবায়ের আন্দালুসীর পর্যবেক্ষণ ও অনুভূতি:

বিখ্যাত মুসলিম পর্যটক ইবনে জুবায়ের আন্দালুসী এই যুগেই সিকিলি ভ্রমণে এসেছিলেন। তিনি জানান যে, দ্বিতীয় উইলিয়াম মুসলমানদের কর্মচারী হিসেবে রাখেন এবং তাদের ওপর আস্থা রাখেন। তার কাছে প্রচুর সংখ্যক মুসলিম দাসী রয়েছে যারা ফ্রাঙ্কিশ দাসীদেরও গোপনে দাওয়াত দিয়ে মুসলমান করে নেয়। দ্বীপে প্রচুর ভূমিকম্প হতে থাকে। এমন পরিস্থিতিতে উইলিয়াম সমস্ত কর্মচারীদের বলেন যেন তারা নিজ নিজ উপাস্যকে ডাকে; অধিকাংশ কর্মচারী এমন সময় আল্লাহর জিকির করতে থাকে। তারা রোজা রাখে এবং গোপনে সদকা ও খয়রাত করতে থাকে। রান্নাঘরের তত্ত্বাবধায়কও একজন মুসলিম, এছাড়া অনেক হাবশী মুসলিম গোলাম তার কাছে থাকে। তবে মুসলমানদের ধর্ম প্রচারের স্বাধীনতা নেই।

কিন্তু ইবনে জুবায়ের এই বেদনাদায়ক সত্যটিও লিখেছেন যে, অনেক মুসলমান এখন খ্রিস্টান হওয়াকে প্রাধান্য দিচ্ছে। সরকার ধর্মত্যাগকে এতটাই উৎসাহিত করছে যে, যদি কোনো বাড়িতে বাবা তার সন্তানদের মারধর করে, তবে অনেক সময় সন্তানরা সরাসরি গির্জায় গিয়ে খ্রিস্টান হয়ে যায় এবং সরকার তাকে নিজের আশ্রয়ে নিয়ে সচ্ছল করে দেয়। ইবনে জুবায়ের জানান যে, সিকিলির সাধারণ খ্রিস্টানরা মুসলমানদের সাথে ভালো ব্যবহার করে, কিন্তু তাদের মূর্খ শ্রেণী ইসলাম, মুসলমান এবং পুরো মুসলিম উম্মাহর ঘোর বিরোধী। অনেক মুসলমান খ্রিস্টানদের মতো নাম রেখে নিয়েছে, কিন্তু অন্তরে তারা ঈমানদার। ইবনে জুবায়ের সিকিলির সবচেয়ে প্রভাবশালী মুসলিম নেতা আবুল কাসিম ইবনে হান্মুদের সাথেও সাক্ষাৎ করেন। তিনি লিখেন যে, ইবনে হান্মুদ এই দ্বীপের মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ হৃদয়বিদারক অবস্থা বিস্তারিত বর্ণনা করেন এবং বলেন:

“হায়! আমি এবং আমার পরিবারের লোকেরা যদি বিক্রি হয়ে যেতাম কিন্তু আমরা কোনো মুসলিম দেশে পৌঁছে যেতাম।”

ইবনে হান্মুদ আরও বলেন: “যদি আমি ইসলামের ওপর অটল না থাকতাম, তবে এই দ্বীপের বাকি সমস্ত মুসলমানও খ্রিস্টান হয়ে যেত।”

এক জায়গায় ইবনে জুবায়েরের সাথে আব্দুল মসীহ নামক এক খ্রিস্টানের দেখা হয়। সে নির্জনতার সুযোগ পেয়ে ইবনে জুবায়েরকে জানায় যে সে একজন মুসলিম কিন্তু তা প্রকাশ করতে পারে না। সে বলে:

“আপনি প্রকাশ্যে মুসলিম। যা করতে চান, স্বাধীনভাবে করতে পারেন। কিন্তু আমাদের অবস্থা এই যে, আমরা নিজেদের আকিদা গোপন করতে বাধ্য। আমাদের প্রাণের ভয় থাকে। ইবাদত গোপনে আদায় করি। গোলামির জিঞ্জির আমাদের গলায় রয়েছে।”

ইবনে জুবায়ের লিখেন: “মুসলমানদের এই অবস্থা দেখে আমাদের ওপর কান্নার ভাব প্রবল হয়ে উঠল।” [২]

[১] তারিখ সিকিলি: ১/৪৭৯ থেকে ৪৮২

[২] রেহলা ইবনে জুবায়ের, পৃ. ২৯৮ থেকে ৩০৮, ত. দার বৈরুত

জার্মান এম্পায়ারের যুগে

৫৪৫ হিজরিতে দ্বিতীয় উইলিয়াম মৃত্যুবরণ করেন। তার ছেলে সিসিলি রক্ষা করতে পারেনি এবং জার্মান সম্রাট প্রথম ফ্রেডরিকের ছেলে ষষ্ঠ হেনরি ৫৯১ হিজরিতে (১১৯৩ খ্রিষ্টাব্দ) সিসিলি দখল করে নেন। এভাবে নরম্যানদের শাসনের অবসান ঘটে। সিসিলির মুসলমানরা পরিস্থিতির উত্তাল তরঙ্গের কবলে পড়ে যান। তাদের অবস্থা ছিল ভাঙা জাহাজ থেকে সমুদ্রে পড়ে যাওয়া যাত্রীদের মতো। ধীরে ধীরে সিসিলির পাদ্রি এবং খ্রিস্টান সাধারণ জনগণের মেজাজ তাদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর হয়ে ওঠে। প্রাচ্যে শুরু হওয়া ক্রুসেড যুদ্ধগুলো ছিল এই কঠোরতার একটি বড় কারণ। অন্যদিকে রোমের পোপের প্ররোচনায় সিসিলির খ্রিস্টানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান শুরু করে। ফলে মুসলমানরাও প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারায়। ষষ্ঠ হিজরি শতাব্দীর শেষভাগে বিপুল সংখ্যক মুসলমান শহর ছেড়ে পাহাড়ি এলাকা ও জঙ্গলে আশ্রয় নেয় এবং খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যায়। [১]

লুসেয়ায় অবস্থান:

সপ্তম হিজরি শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে দ্বিতীয় ফ্রেডরিকের শাসনামলে খ্রিস্টানরা আবারও মুসলমানদের গণহত্যার অভিযান শুরু করে, যাতে সেনাবাহিনী পুরোপুরিভাবে শরিক ছিল। জঙ্গল ও পাহাড়ের প্রতিটি কোণ তল্লাশি করা হয় এবং মুসলমানদের প্রতিটি আস্তানা ও দুর্গ ধ্বংস করে দেওয়া হয়। অবশিষ্ট মুসলমানরা ৬২০ হিজরিতে (১২২৩ খ্রিষ্টাব্দ) আলোচনার মাধ্যমে অস্ত্র সমর্পণ করে। চুক্তি অনুযায়ী তাদের মধ্য থেকে কিছু লোককে সিসিলিতে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড দেওয়া হয় এবং বাকিদের দক্ষিণ ইতালির “লুসেয়া” এলাকায় পুনর্বাসিত করা হয়। তারা সাধারণ নাগরিকদের মতো অধিকার লাভ করেনি। তারা অন্য কোথাও বসতি স্থাপন করতে পারত না। [২]

সুলতান আবু জাকারিয়া ইয়াহিয়া, শেষ আশা:

তবে ৬২৫ হিজরিতে (১২২৭ খ্রিষ্টাব্দ) উত্তর আফ্রিকায় সুলতান আবু জাকারিয়া ইয়াহিয়ার শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় [৩], যিনি তিউনিস থেকে...

[১] তারিখ-ই-সিকিলিয়া: ১/৪৯৭ থেকে ৫০২।

[২] তারিখ-ই-সিকিলিয়া: ১/৫০৩, ৫০৪।

[৩] সুলতান আবু জাকারিয়া ইয়াহিয়ার পিতা শেখ আবু হাফস উমর বিন ইয়াহিয়া মুওয়াহহিদুন রাজবংশের পক্ষ থেকে তিউনিসের গভর্নর ছিলেন। তিনি বারবার গোত্রের মাসমুদা শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তার মৃত্যুর পর যখন সুলতান আবু জাকারিয়াকে গভর্নর করা হয়, তখন মুওয়াহহিদুনরা পতনের শিকার হয়ে পড়েছিল। তাই সুলতান আবু জাকারিয়া তিউনিসে একটি স্বাধীন সরকার গঠন করেন এবং নিজেকে আলাদা করে নেন, কারণ মুওয়াহহিদুনরা নিজেদের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে তার মোকাবিলা করতে অক্ষম ছিল। সুলতান আবু জাকারিয়ার আভিজাত্য ও দানশীলতা ছিল সুবিখ্যাত। তিনি আল্লাহর এমন এক বান্দা ছিলেন যিনি রাতে ছদ্মবেশে প্রজাদের অবস্থা জানতেন, অভাবীদের খুঁজে বের করতেন এবং তাদের ঘরে ঘরে সদকা ও উপহার পৌঁছে দিতেন। সুলতানের প্রাসাদে প্রতিদিন তিনটি আলাদা স্থানে দরবার বসত। প্রথম দরবারে সব ধরনের সাধারণ বিষয়ে আলোচনা হতো। দ্বিতীয় দরবারে অর্থ বিশেষজ্ঞ, ফকিহ, সাহিত্যিক ও চিকিৎসকরা থাকতেন, যেখানে বিশেষ বিষয়ে পরামর্শ নেওয়া হতো। তৃতীয় এবং ব্যক্তিগত দরবারটি ছিল প্রাসাদের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে। সপ্তাহের একদিন একটি আলাদা গম্বুজের নিচে কাজীদের উপস্থিতিতে সাধারণ মানুষকে ইনসাফ পৌঁছে দেওয়া হতো। সুলতানের স্বাণশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। একবার তিনি চোখের এমন এক রোগে আক্রান্ত হন যে চোখ খোলা কঠিন হয়ে পড়ে। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষাতের জন্য তাদের পেছনে একজন কর্মচারী আসত। সুলতান তাকে নাম ধরে ডাকলেন। সে বলল: আপনি কি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন? সুলতান বললেন: না, তবে আমি তোমার স্বাণ অনুভব করে তোমাকে চিনেছি। সুলতান একজন বড় সেনাপতি ছিলেন। ৬৪৭ হিজরিতে তার মৃত্যু হয়, সেই সময় তিনি উপকূলীয় শহর বোনা অবরোধ করে রেখেছিলেন। (ফাওয়াত আল-ওয়াফায়াত লি ইবনে শাকির সালাহউদ্দিন: ৪/২৯৩, ত. দার সাদর)।

আলজেরিয়া পর্যন্ত একটি বিশাল সাম্রাজ্য বানিয়ে খ্রিস্টানদের ভীত করে তুলেছিল। ফলে দ্বিতীয় ফ্রেডরিক বাধ্য হয়ে তার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং এই প্রেক্ষিতে ‘নোসেরা’য় বসবাসকারী মুসলমানদের সমান নাগরিক অধিকার প্রদান করেন, যার ফলে তারা পালেরমোতে ফিরে আসে। সিসিলির অবশিষ্ট মুসলমানরা প্রায় দুই দশক শান্তিতে কাটিয়েছিলেন, কিন্তু ৬২৩ হিজরি (১২২৬ খ্রিস্টাব্দ) সালে সুলতান আবু জাকারিয়া ইয়াহিয়ার মৃত্যুর সাথে সাথেই দ্বিতীয় ফ্রেডরিক তার চেহারা থেকে মুসলিম বন্ধুত্বের মুখোশ খুলে ফেলেন। পালেরমোর খ্রিস্টানরা আবারও মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাদের পালিয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করে। তারা ইবনে জুহাস নামক এক সৈনিককে তাদের আমির নিযুক্ত করে দীর্ঘকাল ফ্রেডরিকের বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যান। [১]

নোসেরায় অবস্থান:

এই সংঘাতের অবসান ঘটে একটি চুক্তির মাধ্যমে যার অধীনে মুসলমানদের ‘নোসেরা’ নামক একটি শহরে পুনর্বাসিত করা হয়। এই মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ষাট হাজার। মাল্টা দ্বীপে তখনও কিছু মুসলমান বসবাস করত। তাদেরও ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করে এই শহরে নিয়ে আসা হয়। এটি ইতালির সালের্নো প্রদেশের মাউন্ট নেপলস থেকে ২৩ মাইল দূরে অবস্থিত। জার্মানদের সাথে পোপের শত্রুতা চলছিল, তাই দ্বিতীয় ফ্রেডরিক মুসলমানদের এখানে একটি সীমান্ত সামরিক শক্তি হিসেবে বসতি স্থাপন করেছিলেন যাতে পোপকে চাপে রাখা যায়। পোপও এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন যে কোনোভাবে এখান থেকে জার্মানদের শাসন নির্মূল করা যায়।

৬৪৮ হিজরি (১২৫০ খ্রিস্টাব্দ) সালে দ্বিতীয় ফ্রেডরিকের মৃত্যু হয় এবং পোপ তার উত্তরসূরিদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করেন। তিনি ফ্রান্সের কাছে সিসিলির রাজমুকুট অর্পণের প্রস্তাব দেন যা ফ্রান্সের রাজা নবম লুইয়ের ভাই চার্লস অফ আনজু গ্রহণ করেন এবং ১২৬৬ খ্রিস্টাব্দে (৬৬৫ হিজরি) জার্মানদের পরাজিত করে তাদের শাসনের অবসান ঘটান। এভাবে সিসিলি ফ্রান্সের একটি প্রদেশে পরিণত হয় এবং ‘নোসেরা’র মুসলমানরাও ফরাসিদের প্রজাতে পরিণত হয়। [২]

ফরাসি সাম্রাজ্যবাদ এবং মুসলমানদের অবসান

১২৬৮ খ্রিস্টাব্দে (৬৬৭ হিজরি) সিসিলির শাসনভার দ্বিতীয় চার্লসের হাতে আসে, যিনি পূর্ববর্তী সকল শাসকের চেয়ে বেশি মুসলিম বিদ্বেষ প্রদর্শন করেন। তিনি সিসিলি এবং ইতালির যৌথ শাসক ছিলেন। তিনি নোসেরার মুসলমানদের সামনে দুটি বিকল্প রেখেছিলেন: হয় খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করো নতুবা মৃত্যুকে বরণ করো। এভাবে সেই মুসলমানদের জোরপূর্বক খ্রিস্টান বানানো হয় যারা অস্বীকার করেছিল তাদের হত্যা করা হয়। মোটকথা, সপ্তম হিজরি শতাব্দীর শেষ নাগাদ সিসিলির মুসলমানদের উল্লেখ কেবল ইতিহাসের পাতায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। [১]

যে দ্বীপটির অভিযান ৩৩ হিজরিতে সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর পবিত্র রক্ত দিয়ে শুরু হয়েছিল এবং যার বিজয়ের জন্য কাজী আসাদ বিন ফুরাত (রহ.)-এর মতো বুজুর্গরা বার্ষিক্যের পরোয়া না করে জিহাদ করে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেছিলেন এবং যেখানে...

[১] তারিখ সিসিলি: ১/৫০৫, ৫০৬

[২] তারিখ সিসিলি: ১/৫১৩ থেকে ৫১৭

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস — চতুর্থ খণ্ড

মুসলমানরা প্রায় পাঁচ শতাব্দী পর্যন্ত কোনো না কোনো আকারে সেখানে আবাদ ছিল, যা মুসলিম উম্মাহর জন্য এক অপরিচিত বিষয় হয়ে রয়ে গেছে।

সিকিলিয়ার উলামা ও ফযলা

সিকিলিয়ায় বনু আগলাবের শাসনামলে মালিকি ও হানাফি উলামা ও ফুকাহাদের প্রাধান্য ছিল, যেখানে বনু উবায়দ ও বনু কালবের যুগে ইসমাইলি শিয়াদের একচেটিয়া আধিপত্য ছিল। তবে সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আহলে সুন্নাতেই ছিল। কিছু লোক অবশ্যই ইসমাইলিদের দাওয়াত দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল এবং কেউ কেউ সুযোগ-সুবিধা, উন্নতি ও নিরাপত্তার আশায় ধর্ম পরিবর্তনের মাধ্যমে সুন্নাতের পথ ত্যাগ করেছিল, তবে তা সত্ত্বেও শিয়াতন্ত্র কেবল ক্ষমতার অলিন্দ, উচ্চপদ, আদালত এবং সরকারি বিভাগগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

শিয়া শাসকরা আশ্রয় চেষ্টি করেছিলেন যাতে এই দেশ শিয়া মতাদর্শের রঙে রঞ্জিত হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও শহরগুলোতে ইসমাইলিয়াত খুব একটা জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেনি। এর কারণ ছিল আহলে সুন্নাতের উলামা ও মাশায়েখ, বিশেষ করে মালিকি ফুকাহাগণ মানুষের হৃদয়ে রাজত্ব করতেন। তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি খতম করা সম্ভব ছিল না। [১] ইসলামী সিকিলিয়ার সেই উলামা, ফুকাহা এবং গুণীজনদের তালিকা এত দীর্ঘ যে অবাক হতে হয়। আমরা সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে কেবল কয়েকটি নামের ওপরই সীমাবদ্ধ থাকছি:

ইবনে কাহহালা (মৃত্যু: ২৮১ হিজরি):

ইবনে কাহহালা (রহ.) সিকিলিয়ার প্রখ্যাত কাজীদের মধ্যে একজন ছিলেন। তিনি মালিকি ফিকহের ইমামদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি ইমাম সাহনুন (রহ.)-এর ছাত্র ছিলেন। [২]

ইবনে জাফর (মৃত্যু: ৫৬৫ হিজরি):

ইবনে জাফর (রহ.) এত বড় আলেম ছিলেন যে তাকে হুজ্জাতুদ্দীন বলা হতো। তাফসীর শাস্ত্রে তিনি ‘আল-ইয়ানবু’ লিখেছেন যা একটি বিশাল সংকলন ছিল। মাকামাতে হারিরির দুটি শরহও লিখেছেন, একটি সংক্ষিপ্ত এবং অন্যটি বিস্তারিত। [৩]

ইবনে মাগলুব, মায়মুন বিন উমর আল-মাগরিবি (মৃত্যু: ৩১০ হিজরি):

ইবনে মাগলুব (রহ.) প্রথমে কায়রোয়ান এবং পরে সিকিলিয়ার কাজী নিযুক্ত হন। তিনি অত্যন্ত উচ্চমানের মালিকি ফকিহ ছিলেন। ইমাম মালিক বিন আনাস (রহ.)-এর সুযোগ্য ছাত্র কাজী সাহনুন (রহ.)-এর প্রথম সারির ছাত্রদের মধ্যে তিনি একজন ছিলেন। [৪]

সান্সিদ আল-রুবায়ী (মৃত্যু: ৪১৭ হিজরি):

সান্সিদ আল-রুবায়ী আন্দালুসের প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও কবি ছিলেন। তিনি কর্ডোভার শাসক ইবনে আবি আমির আল-মানসুরের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তার সাহিত্যকর্ম আল-মানসুরের খুব পছন্দ ছিল। আন্দালুসে গৃহযুদ্ধ শুরু হলে তিনি সিকিলিয়ায় চলে আসেন এবং বাকি জীবন এখানেই ইলমি খিদমতে অতিবাহিত করেন। [৫]

[১] তারিখ-ই-সিকিলিয়া: ১/৫১৩, ৫১৫

[৩] ওফায়াতুল আইয়ান লি ইবনে খাল্লিকান: ৪/৩৯৫ থেকে ৩৯৭

[২] আল-আলাম লিজ জিরিকলি: ৩/১২৫

[৪] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১৩/৩৫৫, ত. আল-রিসালা

ব্যস্ত থেকে ইন্তেকাল করেন। [১]

আবু সাঈদ আল-বারাদায়ী: (মৃ. ৪৩০ হিজরীর পর)

তিনি সিসিলির প্রখ্যাত গবেষক ও লেখক ছিলেন। ক্ষমতার অলিন্দে তাঁর বিশেষ গুরুত্ব ছিল। তিনি ‘আল-মুদাওওয়ানাহ’-এর ভাষ্যের একটি সংক্ষিপ্তসার তৈরি করেন যা ‘আত-তাহজীব’ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। [২]

মুহাম্মদ বিন আলী আবু আবদুল্লাহ তামীমী: (মৃ. ৫৩৬ হিজরী)

আবু আবদুল্লাহ তামীমী (রহ.) সিসিলির প্রখ্যাত ইমামদের অন্যতম ছিলেন। শেখ তামীমী ‘আল-মু’লিম বি-ফাওয়াইদ শারহ মুসলিম’ শিরোনামে মুসলিম শরীফের একটি চমৎকার ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেন। উসুল শাস্ত্রে ‘ইজাহুল মাহসুল ফিল উসুল’ তাঁর এক মহান ইলমী শাহকার। তিনি শেখ আবদুল ওয়াহহাবের ‘আত-তালকীন’-এর দশ খণ্ডে একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেন। কাজী আয়াজ (রহ.)-এর মতো মহান উলামায়ে কেরাম তাঁর ছাত্র ছিলেন, যিনি তাঁর উস্তাদের মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থের পরিশিষ্ট হিসেবে ‘ইকমালুল মু’লিম বি-শারহ সহীহ মুসলিম’ রচনা করেন।

শেখ তামীমী (রহ.)-এর ইসলামী আত্মমর্যাদাবোধের একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য যে, তিনি একজন ইহুদি চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসা নিতেন। একবার কঠিন অসুস্থ হয়ে পড়লে ওই ইহুদির চিকিৎসায় তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। ইহুদিটি বলল: “যদি আমার এই দক্ষতা না থাকত, তবে মুসলমানরা আপনাকে হারাত।” এ কথা শুনে শেখ তামীমী (রহ.)-এর অন্তরে আঘাত লাগল যে, সিসিলির মুসলমানদের মধ্যে এমন কোনো চিকিৎসক নেই কেন? এই প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তিনি নিজেই চিকিৎসাশাস্ত্র শিখতে শুরু করেন। কিছুকাল পর তিনি এত বড় চিকিৎসক হয়ে ওঠেন যে, দূর-দূরান্ত থেকে রোগীরা চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্যার জন্য তাঁর কাছে আসতে শুরু করে। [৩]

ইবনে কাত্তাউস সিকিল্লি: (মৃ. ৫১৫ হিজরী)

তিনি একজন প্রখ্যাত আলেম, সাহিত্যিক ও ভাষাবিদ ছিলেন। তিনি ৪৩৩ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ‘কিতাবুল আফআল’ এবং ‘আবনিইয়াতুল আসমা’ তাঁর সর্বাধিক প্রসিদ্ধ রচনা। এ ছাড়া তিনি হুন্দশাস্ত্র এবং কবিদের জীবনীর ওপরও গবেষণামূলক কাজ করেছেন। ৪৬০ হিজরীতে সিসিলিতে নরম্যানদের দখলের পর সেখান থেকে হিজরতকারী উলামায়ে কেরামের মধ্যে তিনিও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি যখন মিশরে পৌঁছান, তখন সেখানকার উলামায়ে কেরাম তাঁর ইলমী কাজ ও খ্যাতিতে মুগ্ধ হয়ে তাঁর সংবর্ধনায় একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। যদিও সে সময় তাঁর বয়স ছিল ৭২ বছর। ইবনে কাত্তাউ (রহ.) তাঁর বাকি জীবন মিশরে অতিবাহিত করেন এবং ৮২ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। [৪]

আবদুল হক মুহাম্মদ বিন হারুন আস-সাহমী আস-সিকিল্লি: (মৃ. ৪৬৬ হিজরী)

তিনি সিসিলিতে শিক্ষা লাভ করেন, এরপর মিশর ও হিজাজ সফর করেন। ইমামুল হারামাইন জুওয়াইনী (রহ.)-এর সাথে তাঁর কিছু সূক্ষ্ম বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল। ‘আন-নুকাত ওয়াল ফুরুক ফি মাসাইলিল মুদাওওয়ানাহ’ এবং ‘তাহজীবুল মাতালিব’ তাঁর ইলমী গভীরতার সাক্ষ্য দেয়। [৫]

[১] আল-আলাম লিজ-জিরিকলি: ১৮৬/৩, ত. দারুল ইলম লিল-মালায়ীন

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৭/২৩৫, ত. আর-রিসালাহ

[৩] তারিখুল ইসলাম লিদ-দাহাবি: ৩২৫/৩৬, ত. তাদমুরি (১১/৬৬১, ত. বাশার)

[৪] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৯/৪৩৫, ত. আর-রিসালাহ

[৫] তারিখুল ইসলাম লিদ-দাহাবি: ৩১/২০১, ২০২, ত. তাদমুরি (১০/২৩৩, ত. বাশার)

ইবনে রশীক: (৩৯০ হি. হতে ৪৬৩ হি.)

এই প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও কবির সম্পর্ক তিউনিসের কাইরোয়ান শহরের সাথে ছিল, কিন্তু তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় সিসিলির মাজার শহরে অতিবাহিত করেন। ইবনে রশীক ফিকহ, ইতিহাস, অভিধান এবং কাব্যকলায় পারদর্শী ছিলেন। ফিকহ ও হাদিসে ‘শরহে মুয়াত্তা মালিক’ এবং অভিধান শাস্ত্রে ‘আশ-শুযুয ফিল লুগাহ’ তাঁর ইলমি শাহকার (অমর কীর্তি) ছিল। ‘আনমুযাজুয যামান ফী শুআরাইল কাইরোয়ান’ শিরোনামে তিনি কাইরোয়ানের কবিদের নির্বাচিত কালাম পেশ করেছেন। ‘আল-উমদাহ ফী মাহাসিনিশ শি’রি ওয়া আদাবিহি’ গ্রন্থে কাব্যচর্চার মূলনীতি, আদব ও কলাকৌশল বুঝানো হয়েছে।

ইবনে রশীক রহ. ইতিহাসের ওপরও কাজ করেছেন। তিনি ‘তারীখুল কাইরোয়ান’ নামে নিজ জন্মভূমির প্রামাণ্য ইতিহাস লিখেছেন এবং ‘মীযানুল আমাল ফী তারীখিদ দুওয়াল’ শিরোনামে বিভিন্ন দেশ ও রাজবংশের অবস্থা সংগ্রহ করেছেন। [১]

ইবনে রওয়াহ:

পরিশেষে এমন একজন মহান আলেমে দ্বীনের কথা উল্লেখ করা হয়, যিনি সিসিলিতে দাসত্বের যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেই সময় সিসিলিতে মুসলমানদের পতন প্রায় সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। শিশুদের খ্রিস্টান বানানোর এক মহোদ্যোগ চলছিল। অন্তত তাদের শাস্তি ও বন্দিত্ব ছিল অবধারিত। এমন এক সংকটময় মুহূর্তে হুসাইন বিন আব্দুল্লাহ নামক এক আলেমকে তাঁর স্ত্রীসহ গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। এটি ৫৬০ হিজরির ঘটনা। সেই সময় তাঁর স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাঁরা দুজনেই শাস্তি ভোগ করতে থাকেন। অবশেষে আল্লাহ তাআলা তাঁদের মুক্তি দান করেন। একটি পুত্রসন্তান জন্ম নিলে তাঁর নাম রাখা হয় আব্দুল্লাহ। পিতামাতা তাঁর জীবন ও ঈমান নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। বেশ কয়েক বছর পর তাঁরা এই অন্ধকার থেকে বের হওয়ার সুযোগ পান।

এভাবে ৫৭০ হিজরিতে তাঁরা মিশরে চলে আসেন—যেখানে সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর শাসন ছিল। এখানে এই শিশু প্রাথমিক শিক্ষার পর তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আবু তাহির সিলাফী রহ.-এর নিকট ইলমে হাদিসে দক্ষতা অর্জন করেন। যখন এই শিশু আলেম হলেন, তখন দুনিয়াতে ‘ইবনে রওয়াহ’ উপনামে পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর মৃত্যু ৬৪৬ হিজরিতে হামায় হয় এবং সেখানেই সমাহিত হন। [২]

সিসিলির ওপর ইকবালের মার্সিয়া:

সিসিলি ইতিহাসের প্রথম দেশ ছিল যা মুসলমানদের হাত থেকে হাতছাড়া হয়ে যায়। এর পরপরই খ্রিস্টানরা বেপরোয়া হয়ে একদিকে উত্তর আফ্রিকা ও আন্দালুসে আক্রমণ শুরু করে এবং অন্যদিকে শাম অভিমুখে ক্রুসেড যুদ্ধের সূচনা করে। উত্তর আফ্রিকায় মুওয়াহহিদিন এবং শামে আইয়ুবীগণ এই সয়লাবের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু আন্দালুস এই বিপ্লবে এতটাই প্রভাবিত হয়েছিল যে তা আর আগের মতো সুসংহত হতে পারেনি এবং পাঁচ শতাব্দী পর সেখান থেকে ইসলামের নাম-নিশানা মুছে যায়। এজন্য সিসিলি পতনের প্রথম ধাপ ছিল, যেখানে আজ খুঁজলেও মুসলমানদের কোনো মহল্লা পাওয়া যায় না।

সিসিলিতে ইসলামের অবসানের সাতশ বছর পর প্রাচ্যের কবি আল্লামা ডক্টর মুহাম্মদ ইকবাল রহ. এই দ্বীপের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন...

[১] ওফায়াতুল আ’ইয়ান লি ইবনে খাল্লিকান: ৪/৮৫, ত ত দার সাদির। নোট: ইবনে রশীক-এর কিতাব ‘মাহাসিনুশ শি’রি ওয়া আদাবিহি’ মাকতাবা দারুল জীল থেকে কিছুকাল আগে প্রকাশিত হয়েছে।

[২] সিয়রু আ’লামিন নুবালা: ২৩/২৭১, ত ত আর-রিসালাহ।

উন্মত্তে মুসলিমার ইতিহাস

চতুর্থ খণ্ড

তখন তাদের অন্তর ভরে এল এবং তারা বিস্মৃত ইসলামী সম্পদ সিসিলিকে এভাবে শ্রদ্ধাঞ্জলি
নিবেদন করলেন:

কেঁদে নাও এখন মন খুলে হে রক্তাশ্রু বিসর্জনকারী চোখ

ঐ দেখা যাচ্ছে হিজাজি সভ্যতার মাজার

এখানে একদা ছিল সেই মরুচারীদের কোলাহল

সমুদ্র ছিল একদা যাদের জাহাজগুলোর ক্রীড়াভূমি

যাদের কারণে সম্রাটদের দরবারে ভূমিকম্প সৃষ্টি হতো

যাদের তলোয়ারে ছিল বিজলির বাসা

যাদের আবির্ভাব ছিল এক নতুন জগতের পয়গাম

যাদের অধৈর্য তলোয়ার প্রাচীন যুগকে গ্রাস করেছিল

যাদের ‘কুম’ (ওঠো) ধ্বনিতে মৃত বিশ্ব জীবিত হয়েছিল

মানুষ কুসংস্কারের জিঞ্জির থেকে মুক্ত হয়েছিল

যাদের শোরগোলের স্বাদ এখনও কানে লেগে আছে

সেই তকবির কি এখন চিরতরে নিস্তব্ধ হয়ে গেছে?

আহ হে সিসিলি! সমুদ্রের সম্মান তোমার কারণে

এই পানির মরুভূমিতে তুমি একজন পথপ্রদর্শকের মতো

তোমার তিল দিয়ে দরিয়ার গাল সুশোভিত থাকুক

তোমার প্রদীপগুলো দিয়ে সমুদ্রযাত্রীরা সান্ত্বনা পাক

মুসাফিরের চোখে তোমার দৃশ্য সর্বদা মনোরম হোক

তোমার উপকূলের পাথরে ঢেউগুলো সর্বদা নৃত্য করুক

তুমি ছিলে সেই জাতির সভ্যতার দোলনা

যাদের বিশ্বদাহী সৌন্দর্য ছিল আগুনের মতো এক দৃশ্য

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

শিরাজের বুলবুল বাগদাদের ওপর বিলাপ করেছিল
দাগ জাহানাবাদের ওপর রক্তের অশ্রু ঝরিয়েছিল
আকাশ যখন গ্রানাডার ঐশ্বর্য ধ্বংস করেছিল
ইবনে বাদরুনের বিষণ্ণ হৃদয় ফরিয়াদ করেছিল
দুঃখ-নসীব ইকবালকে তোমার শোক দান করা হয়েছে
তকদির সেই হৃদয়কে বেছে নিয়েছে যা ছিল তোমার গোপন ব্যথার সাথী
তোমার ধ্বংসাবশেষের মাঝে কার কাহিনী লুকিয়ে আছে?
তোমার তীরের নীরবতার মাঝে রয়েছে এক বর্ণনার ভঙ্গি
তোমার ব্যথা আমাকে বলো, আমিও আপাদমস্তক ব্যথায় জর্জরিত
তুমি যার গন্তব্য ছিলে, আমি সেই কাফেলার ধূলিকণা
প্রাচীন ছবির রঙে রাঙিয়ে আমাকে তা দেখিয়ে দাও
পূর্বসূরিদের দিনগুলোর কাহিনী শুনিতে আমাকে ব্যাকুল করে দাও
আমি তোমার উপহার হিন্দুস্তানের দিকে নিয়ে যাব
আমি নিজে এখানে কাঁদছি, সেখানে অন্যদের কাঁদাব

চতুর্থ খণ্ড

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

সাকলিয়া (সিসিলি) ইসলামি রাষ্ট্রের শাসকগণ

নম্বর শাসক সময়কাল বিশেষ তথ্য

বনু আঘলাবের অধীনস্থ গভর্নর

১ কাজী আসাদ বিন ফুরাত ২১৩ হিজরি (৮২৮ খ্রি.) ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর ছাত্র।
সাকলিয়া বিজয়ী।

২ মুহাম্মদ বিন আবি আল-জাওয়ারি ২১৩ হিজরি থেকে ২১৪ হিজরি (৮২৮ খ্রি. থেকে ৮২৯ খ্রি.) অল্পবয়স্ক ছিলেন, পদচ্যুত করা হয়েছিল।

৩ জুহাইর বিন গাউস..... ২১৪ হিজরি (৮২৯ খ্রি.) সালতানাতের স্থিতিশীলতা, আদর্শ শাসন।

৪ মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আল-আঘলাব ২১৫ হিজরি থেকে ২২১ হিজরি (৮৩০ খ্রি. থেকে ৮৩৬ খ্রি.) অযোগ্য এবং আরামপ্রিয়।

৫ ইব্রাহিম বিন আবদুল্লাহ আবুল আঘলাব ২২১ হিজরি থেকে ২৩৬ হিজরি (৮৩৬ খ্রি. থেকে ৮৫১ খ্রি.) ষোল বছর শাসন করেছেন, দক্ষ প্রশাসক, মুজাহিদ এবং বিজয়ী ছিলেন।

৬ আব্বাস বিন ফজল ২৩৬ হিজরি থেকে ২৪৭ হিজরি..... (৮৫১ খ্রি. থেকে ৮৬১ খ্রি.)
রোমানদের অনেকগুলো দুর্গ জয় করেন।

৭ আহমদ বিন ইয়াকুব ২৪৭ হিজরি (৮৬১ খ্রি.) সংক্ষিপ্ত সময়কাল।

৮ আব্বাস বিন ফজল ২৪৮ হিজরি (৮৬২ খ্রি.) অযোগ্য, মাত্র পাঁচ মাসের গভর্নরি।

৯ খাফাজা বিন সুফিয়ান জমাদিউল আউয়াল ২৪৮ হিজরি থেকে ১লা রজব ২৫৬ হিজরি (জুলাই ৮৬২ খ্রি. থেকে জুন ৮৬৯ খ্রি.) একটানা জিহাদ করতে থাকেন। আমিরদের পারস্পরিক ষড়যন্ত্রে নিহত হন।

১০ মুহাম্মদ বিন খাফাজা রজব ২৫৬ হিজরি থেকে রজব ২৫৭ হিজরি (জুন ৮৬৯ খ্রি. থেকে জুন ৮৭১ খ্রি.) রোমানদের কাছ থেকে মাল্টা দ্বীপ ছিনিয়ে নেন। নিজ ভৃত্যদের হাতে নিহত হন।

১১ রাবাহ বিন ইয়াকুব রজব ২৫৭ হিজরি থেকে রবিউল আউয়াল ২৫৮ হিজরি (জুন ৮৭১ খ্রি. থেকে ফেব্রুয়ারি ৮৭২ খ্রি.) সংক্ষিপ্ত সময়কাল।

১২ হুসাইন বিন রাবাহ ২৫৮ হিজরি (৮৭২ খ্রি.) সংক্ষিপ্ত সময়কাল।

তারিখ-ই-উম্মতে মুসলিমা

চতুর্থ অংশ

১৩. আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ | ২৫৯ হিজরি (৮৭৩ খ্রি.) | সংক্ষিপ্ত সময়কাল

১৪. আহমদ বিন উমর হাবশী | ২৬০ হিজরি থেকে ২৬৩ হিজরি (৮৭৪-৮৭৭ খ্রি.) | ব্যর্থ সামরিক অভিযানের কারণে অপসারিত হন।

১৫. জাফর বিন মুহাম্মদ | ২৬৩ হিজরি (৮৭৮ খ্রি.) | সিরাকিউস অভিযানে রোমানদের ওপর বিজয় লাভ করেন। প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে নিহত হন।

১৬. আগলাব বিন মুহাম্মদ মাজগালাব | ২৬৪ হিজরি থেকে মহররম ২৬৫ হিজরি (সেপ্টেম্বর ৮৭৮ খ্রি.) | সিরাকিউস জয় করেন।

১৭. আবুল আগলাব বিন ইবরাহিম | ২৬৫ হিজরি (৮৭৯ খ্রি.) | জনরোষের কারণে অপসারিত হন।

১৮. হুসাইন বিন রাবাহ (দ্বিতীয়বার) | ২৬৬ হিজরি (৮৮০ খ্রি.) | রোমানদের কাছে পরাজয়ের কারণে অপসারিত হন।

১৯. হাসান বিন আব্বাস | ২৬৭ হিজরি (৮৮১ খ্রি.) | রোমানদের কাছে পরাজয়ের কারণে অপসারিত করা হয়।

২০. আবুল হুসাইন মুহাম্মদ বিন ফজল | ২৬৮ হিজরি থেকে ২৭০ হিজরি (৮৮২-৮৮৩ খ্রি.) | সিসিলিতে রোমানদের নির্মাণাধীন নতুন রাজধানী জয় করেন।

২১. আলী বিন মুহাম্মদ বিন আবিল ফাওয়ারিস | ২৭০ হিজরি (৮৮৩ খ্রি.) |

২২. হুসাইন বিন আহমদ | ২৭০ হিজরি থেকে শাবান ২৭১ হিজরি (৮৮৩ থেকে ফেব্রুয়ারি ৮৮৫ খ্রি.) | অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

২৩. সাওয়াদা বিন মুহাম্মদ | ২৭১ হিজরি থেকে ২৭২ হিজরি (৮৮৫ খ্রি.) |

২৪. আবুল আব্বাস আলী | ২৭৩ হিজরি (৮৮৬ খ্রি.) | দক্ষিণ ইতালির দুটি শহর: সিরাকিউস এবং মেসিনা পুনরায় রোমানদের দখলে চলে যায়।

মুসলিম মিলাতের ইতিহাস

চতুর্থ খণ্ড

২৫. আহমদ বিন উমর হাবশি

২৭৪ হি. থেকে ২৭৭ হি.

(জুলাই ৮৮৭ থেকে ৮৯১ খ্রি.)

২৬. আবুল হুসাইন আহমদ বিন ফজল

২৭৯ হি. থেকে ২৮৩ হি.

(জুন ৮৯২ থেকে ৮৯৭ খ্রি.)

২৭. হাসান বিন আহমদ বিন নাফিজ

২৮৫ হি.

(৮৯৮ খ্রি.)

২৮. আবু মালিক আহমদ বিন উমর হাবশি

২৮৬ হি.

(৮৯৯ খ্রি.)

২৯. আবুল আব্বাস বিন ইবরাহিম আগলাবি

২৮৭ হি. থেকে ২৮৯ হি.

(৮৯৯ থেকে নভেম্বর ৯০২ খ্রি.)

প্রখ্যাত বিজেতা। দক্ষিণ ইতালিসহ পুরো সিসিলি জয় করেন।

৩০. আবু মুদার সারকুসি

২৮৯ হি.

(৯০২ খ্রি.)

আমোদ-প্রমোদে মগ্ন থাকার কারণে অপসারিত হন।

৩১. মুহাম্মদ বিন সারকুসি

২৯০ হি. (৯০৩ খ্রি.)

আবু মুদারের স্থলে সিসিলির ওয়ালি নিযুক্ত হন।

বনু উবাইদের অধীনস্থ গভর্নরগণ

১. আলী বিন মুহাম্মদ বিন আবুল ফাওয়ারিস

শাবান ২৯০ হি.

(জুলাই ৯০৩ খ্রি.)

২. আহমদ বিন আবি হুসাইন বিন রাবাহ

২৯১ হি. থেকে ২৯৬ হি.

(৯০৩ থেকে ৯০৯ খ্রি.)

৩. ইবনে আবি খিনজির - প্রথমবার

২৯৭ হি. থেকে ২৯৯ হি. (৯১০ থেকে ৯১২ খ্রি.)

সিসিলির প্রথম শিয়া গভর্নর।

৪. আলী বিন উমর আল-বালুয়ি

২৯৯ হি. (৯১২ খ্রি.)

নৈরাজ্যের যুগ (তাওয়াইফুল মুলুক)

১. আহমদ বিন কুরহুব

মহররম ৩০০ হি. থেকে জিলকদ ৩০৩ হি.

(সেপ্টেম্বর ৯১২ থেকে জুন ৯১৬ খ্রি.)

আগলাবি শাসন পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন।

২. আবুল খাফফাফ

৩০৩ হিজরির শেষ থেকে ৩০৪ হিজরির শুরু পর্যন্ত

(৯১৬ খ্রি.) কয়েক মাস

আবু সাঈদ শিয়া-র হাতে পরাজিত।

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

বনু উবাইদের অধীনস্থ গভর্নরদের দ্বিতীয় যুগ

১. সালেম বিন আবি রাশেদ | ৩০৪ হি. থেকে ৩২২ হি. (৯১২ খ্রি. থেকে ৯৩২ খ্রি.) |

দীর্ঘকাল শাসন করেছেন।

২. খলিল বিন ইসহাক | ৩২৫ হি. থেকে ৩২৯ হি. (৯৩৭ খ্রি. থেকে ৯৪১ খ্রি.) | দেশে

বিশৃঙ্খলা ও দুর্ভিক্ষ।

৩. আবু আত্তাফ আল-আজদি | ৩২৯ হি. থেকে ৩৩৬ হি. (৯৪১ খ্রি. থেকে ৯৪৮ খ্রি.) |

বনু কলবের শাসকগণ

১. হাসান বিন আলী কলবি | ৩৩৬ হি. থেকে ৩৫৩ হি. (৯৪৮ খ্রি. থেকে ৯৫৩ খ্রি.) |

সিসিলির বনু কলব রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা।

• আহমদ বিন হাসান বিন আলী | ৩৫৩ হি. থেকে ৩৫৮ হি. (৯৬৪ খ্রি. থেকে ৯৬৯ খ্রি.) |

• ইয়াইশ মাওলা হাসান | ৩৫৮ হি. থেকে ৩৫৯ হি. (৯৬৯ খ্রি. থেকে ৯৭০ খ্রি.) |

• আহমদ বিন হাসান - পুনরায় | ৩৫৯ হি. (৯৭০ খ্রি.) কয়েক মাস |

২. আবুল কাসেম বিন হাসান কলবি | ৩৬০ হি. থেকে ৩৭২ হি. (৯৭১ খ্রি. থেকে ৯৮২ খ্রি.) |

ন্যায়পরায়ণ ও জনহিতৈষী।

৩. জাবের বিন আবুল কাসেম | ৩৭২ হি. থেকে ৩৭৩ হি. (৯৮২ খ্রি. থেকে ৯৮৩ খ্রি.)

| অযোগ্য।

৪. জাফর বিন মুহাম্মদ কলবি | ৩৭৩ হি. থেকে ৩৭৫ হি. (৯৮৩ খ্রি. থেকে ৯৮৫ খ্রি.)

| ন্যায়পরায়ণ মেজাজ, জ্ঞানপিপাসু।

৫. আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ কলবি | ৩৭৫ হি. থেকে ৩৭৯ হি. (৯৮৫ খ্রি. থেকে ৯৮৯ খ্রি.)

| প্রজাবৎসল, জ্ঞান ও গুণের পৃষ্ঠপোষক।

৬. আবুল ফুতুহ | ৩৭৯ হি. থেকে ৩৮৮ হি. (৯৮৯ খ্রি. থেকে ৯৯৮ খ্রি.) | প্রশংসনীয়

শাসন, পক্ষাঘাতের কারণে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ।

৭. জাফর বিন আবুল ফুতুহ | ৩৮৮ হি. থেকে ৪১০ হি. (৯৯৮ খ্রি. থেকে ১০১৯ খ্রি.) |

সচ্ছলতার যুগ। নিজের ভাই আলীর বিদ্রোহের মোকাবিলা করেন। শেষে পিতার আদেশে

অপসারিত হন।

৮. আহমদ আল-আখাল কলবি | ৪১০ হি. থেকে ৪২৭ হি. (১০১৯ খ্রি. থেকে ১০৩৬ খ্রি.) |

নরম্যানদের আক্রমণ। কালতুরিয়ার পতন।

৯. হুসাইন বিন আবুল ফুতুহ | ৪২৭ হি. থেকে ৪৩১ হি. (১০৩৬ খ্রি. থেকে ১০৪০ খ্রি.)

| পতন ও সিসিলি রাষ্ট্রের বিলুপ্তি।

নরম্যানদের আক্রমণের সময়কার মুসলিম শাসকগণ

১. ইবনে হাওয়াস, ইবনে সুমনা, আবদুল্লাহ বিন মাউত, ইবনে হাম্মাদ | ৪৩১ হি. থেকে

৪৬৩ হি. (১০৪০ খ্রি. থেকে ১০৭০ খ্রি.) |

চতুর্থ খণ্ড

মুসলিম উন্মাহর ইতিহাস

দ্বিতীয় অধ্যায়

ক্রুসেড এবং আতাবেগ শাসকগণ

৪৮৮ হিজরি থেকে ৫৬৯ হিজরি

নভেম্বর ১০৯৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১১৭৪ খ্রিস্টাব্দ

প্রথম ক্রুসেড

খিলাফতে রাশেদার যুগে মুসলমানরা কায়সারকে পরাজিত করে খ্রিস্টধর্মকে ভূমধ্যসাগরের ওপারে ঠেলে দিয়েছিল। তখন থেকেই ফিলিস্তিনের পবিত্র স্থানগুলো মুসলমানদের অধীনে ছিল। আল-কুদসেই খ্রিস্টানদের কল্পিত মসীহের সমাধি ছিল, যা তাদের কাছে সবচেয়ে পবিত্র স্থানের মর্যাদা রাখে। মুসলমানরা খ্রিস্টানদের এই ধর্মীয় নিদর্শনগুলোকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দিয়েছিল। মুসলিম সমাজে খ্রিস্টানদের কোনো কষ্টের সম্মুখীন হতে হতো না। মুসলিম আমিরদের দরবারে কোনো শিল্পে পারদর্শী খ্রিস্টান ব্যক্তিদের সম্মানজনক পদও দেওয়া হতো। হারুনুর রশিদের যুগে খ্রিস্টান রাজা শার্লমেনের সাথে আল-কুদসে আসা খ্রিস্টান তীর্থযাত্রীদের বিষয়ে যে চুক্তি করা হয়েছিল, মুসলমানরা সেটিও মেনে চলত। কিন্তু খ্রিস্টান তীর্থযাত্রীরা তাদের ধর্মীয় কেন্দ্র মুসলমানদের কাছে দেখে ক্ষুব্ধ হতো। মুসলমানদের সমৃদ্ধি দেখেও তারা ঈর্ষান্বিত হতো এবং তারা এই আবেগ নিয়ে নিজ দেশে ফিরে যেত যে, কোনোভাবে এখানকার সম্পদের ওপর দখলদারিত্ব কায়েম করতে হবে। এই ঈর্ষা এবং দেশ ও সম্পদের লালসা ছিল ক্রুসেডের মূল চালিকাশক্তি।

ক্রুসেডের আনুষ্ঠানিক সূচনার প্রায় দেড় শতাব্দী আগে মুসলমান ও রোমানদের মধ্যে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। চতুর্থ হিজরি শতাব্দীতে আব্বাসীয় খিলাফত ক্ষমতাহীন হয়ে বুয়াইহি শিয়া আমিরদের প্রভাবে চলে এসেছিল [১] এবং এর অধীনস্থ রাষ্ট্রগুলো স্বায়ত্তশাসিত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে রোমান সম্রাটের সেনাপতি দোমেস্তিক সিরিয়ার উপকূলে দখলদারিত্ব কায়েম করে। সাইফুদ দৌলা নামক একজন সাহসী শাসক তার সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যান, কিন্তু ৩৫৬ হিজরি (৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ)-তে তার মৃত্যুর পর খ্রিস্টানদের সাহস বেড়ে যায় এবং ৩৬১ হিজরি (৯৭২ খ্রিস্টাব্দ)-তে তারা দিয়ার বকর পর্যন্ত দখল করে নেয়। এই যুদ্ধগুলো ক্রুসেড ছিল না, তবে এগুলোকে ক্রুসেডের ভূমিকা হিসেবে গণ্য করা হয়। খ্রিস্টানদের এই বিজয়গুলো স্থায়ী হয়নি এবং সেলজুকরা কিছুকাল পর এই এলাকাগুলো মুক্ত করে নেয়।

এই সময়ে খ্রিস্টান তীর্থযাত্রীদের বাইতুল মুকাদ্দাসে আসা অব্যাহত ছিল। তাদের কাফেলাগুলোতে, যাতে বিপুল সংখ্যক দুশ্চরিত্র ও গুপ্তা প্রকৃতির লোক থাকত, তারা পথের ইসলামি শহরগুলোর প্রশাসন ও জনগণকে উত্যক্ত করত এবং নাচতে গাইতে আল-কুদসে প্রবেশ করত। যখন তাদের উচ্ছৃঙ্খলতা সীমা ছাড়িয়ে গেল, তখন মুসলিম শাসকরা তাদের মুসলিম জনপদ এবং আল-কুদসের আদব ও সম্মান রক্ষায় বাধ্য করলেন। যারা আইন লঙ্ঘন করত তাদের সাথে কঠোরতাও করা হতো। এই আচরণকে খ্রিস্টান তীর্থযাত্রীরা জুলুম ও নির্যাতনের নাম দিয়েছিল। [২]

[১] বুয়াইহি শিয়া আমিররা ৩৩৪ হিজরি থেকে ৪৪৭ হিজরি পর্যন্ত আব্বাসীয় খলিফা এবং ইরাক ও ইরানের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছিল, যার বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে অতিবাহিত হয়েছে।

[২] হায়াতে সালাহউদ্দীন আইয়ুবী, সিরাজ দীন আহমদ, পৃষ্ঠা ১০ থেকে ১৫, আল-ফয়সাল লাহোর; আল-হরুবুস সালিবিয়্যাহ, আরুসি আল-মাতওয়ী, পৃষ্ঠা ৪৫।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা | চতুর্থ খণ্ড

এই সময়ে কনস্টান্টিনোপল সেলজুকদের পক্ষ থেকে চরম বিপদের সম্মুখীন ছিল। যখন ৪৬৩ হিজরিতে প্রখ্যাত সেলজুক শাসক আল্প আরসালান কনস্টান্টিনোপলের কায়সার রোমানুস ডায়োজেনিসকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও বন্দি করেন, তখন থেকে কনস্টান্টিনোপলের প্রতিটি শাসক সেলজুকদের আক্রমণের আশঙ্কায় তটস্থ থাকতে শুরু করেন। ৪৭৯ হিজরিতে (১০৮৬ খ্রিষ্টাব্দে) মরক্কোর শাসক ইউসুফ বিন তাশফিন স্পেনে খ্রিস্টানদের এক শিক্ষণীয় পরাজয় উপহার দেন, যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য খ্রিস্টানরা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। ৪৮৪ হিজরিতে তারা সিসিলি দখল করে নেয় এবং তারা এশিয়ায় মুসলমানদের পরাজিত করার ব্যাপারেও আশাবাদী হয়ে ওঠে। [১]

পিটার দ্য হারমিটের উদ্দেশ্য:

সিসিলি দখলের পর সেখানকার বিজেতা প্রথম রজার এক পরামর্শ সভায় খ্রিস্টানদের আল-কুদস (জেরুজালেম) দখলের পরামর্শ দেন, যা অত্যন্ত সমাদৃত হয়। এদিকে একই বছর ফ্রান্সের এক উগ্র মেজাজের সন্ন্যাসী পিটার (পিটার দ্য হারমিট) সন্ন্যাসীদের একটি দলের সাথে আল-কুদস পরিদর্শনে যান। তিনি আল-কুদসে তীর্থযাত্রীদের ওপর আরোপিত বিধিনিষেধগুলোকে চরম ঘৃণার চোখে দেখেন। আল-কুদসের বিশপ (প্রধান পাদ্রি) তাকে মুসলমানদের অত্যাচারের কাল্পনিক কাহিনী শুনিতে আরও উত্তেজিত করে তোলেন এবং বলেন যে, ইউরোপীয় সম্রাটরাই এসে আমাদের মুক্তি দিতে পারেন।

পিটার ইউরোপের রাজাদের জাগ্রত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং বিশপ তাকে ইউরোপীয় রাজাদের নামে কিছু চিঠি দেন, যাতে তাদের সিরিয়া আক্রমণের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। পিটার এই চিঠিগুলো নিয়ে ইতালির রাজধানী রোমে গির্জার প্রধান পোপের সাথে সাক্ষাৎ করেন। শতাব্দীকাল ধরে গির্জা দুই ভাগে বিভক্ত ছিল: একটি ছিল পূর্ব গির্জা যার কেন্দ্র ছিল কনস্টান্টিনোপল। দ্বিতীয়টি ছিল পশ্চিম গির্জা যার কেন্দ্র ছিল রোম। সন্ন্যাসী পিটার রোমের পোপ দ্বিতীয় আরবানের সাথে সাক্ষাৎ করেন, যিনি আল-কুদস পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনাটি অত্যন্ত আগ্রহের সাথে শোনেন এবং পিটারকে আলিঙ্গন করে এই মিশন অর্পণ করেন যে, তিনি ইউরোপের কোণায় কোণায় গিয়ে সাধারণ মানুষ ও শাসকদের সিরিয়া আক্রমণের দাওয়াত দেবেন। পিটার অবিলম্বে ইউরোপ সফরে বেরিয়ে পড়েন এবং তিনি সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলেন। তিনি এও দাবি করেন যে, তিনি জেরুজালেমে যিশুর সমাধি থেকে এই আহ্বান শুনতে পেয়েছেন:

“ওঠো, আমার অনুসারীদের দুঃখ-কষ্টের কথা প্রচার করো, এটাই সময় যে আমার খোদার সাহায্য আসুক এবং পবিত্র স্থানগুলো মুক্ত হোক।”

এদিকে শাওয়াল ৪৮৫ হিজরিতে মালিক শাহ সেলজুকির ইন্তেকালের পর সিরিয়ার সেলজুক সাম্রাজ্য কয়েক টুকরোয় বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। কায়সার “অ্যালেক্সিয়াস” একে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে পোপ ও ইউরোপীয় শাসকদের চিঠি লিখে তাদের দ্রুত সিরিয়া দখলের প্ররোচনা দেন এবং এই আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, যদি ইউরোপ এশিয়ার খ্রিস্টানদের সাহায্যে এগিয়ে না আসে, তবে তুর্কিরা কনস্টান্টিনোপলও দখল করে নেবে। এর পাশাপাশি তিনি নিজ দেশের তরুণীদের রূপ-লাবণ্যের বর্ণনা দিয়ে ইউরোপীয় যোদ্ধাদের এই আশা দেখান যে, তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এই সুন্দরীদের কেবল মনই জয় করতে পারবে না বরং তাদের...

[১] হায়াত-ই-সালাহউদ্দিন আইয়ুবী, সিরাজ উদ্দিন আহমদ, পৃষ্ঠা ১০-১১; আল-হুরুব আল-সালিবিয়্যাহ, আল-আরুসি আল-মাতউয়ি, পৃষ্ঠা ৩৫, দারুল গারব আল-ইসলামি।

শরীরও পুরস্কার হিসেবে পেতে পারে। এই অভিযানে ইউরোপবাসীদের ঠেলে দেওয়ার একটি কারণ এটিও ছিল যে, গির্জার অহেতুক কঠোরতার কারণে খ্রিস্টানদের মধ্যে ধর্মের প্রতি অনীহা তৈরি হয়েছিল। ইউরোপের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতারা অনুভব করেছিলেন যে, যদি তারা মানুষের মনোযোগের মোড় একটি “পবিত্র যুদ্ধ”-এর দিকে ঘুরিয়ে দেন, তবে ধর্মের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতাগুলো মানুষ ভুলে যাবে।

খ্রিস্টান অভিজাতদের এই অভিযানে অংশগ্রহণের একটি কারণ ছিল এই যে, তারা নতুন জায়গিরের জন্য উপনিবেশ খুঁজছিল। ইউরোপীয় বণিকরা নতুন বাজারের চিন্তায় ছিল। মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ধারাবাহিকতা এই উদ্দেশ্যগুলো অর্জনের একটি ভালো অজুহাত হতে পারত। সাধারণ খ্রিস্টানরা পাদ্রিদের উস্কানির কারণে এই অভিযানে অংশ নিতে রাজি হয়েছিল। খ্রিস্টধর্মে “জন্মগত পাপ”-এর বিশ্বাস এই ধর্মের প্রতিটি অনুসারীর মধ্যে অপরাধবোধ তৈরি করে রেখেছিল। পাদ্রিরা যুদ্ধের আগুন জ্বালানোর জন্য ঘোষণা করে দিয়েছিল যে, এই যুদ্ধে অংশগ্রহণের মাধ্যমে মানুষ পাপ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে যায়। এভাবে ক্রুসেডার নেতারা তাদের আসল রাজনৈতিক ও বৈষয়িক উদ্দেশ্যগুলোকে আড়ালে রেখে যুদ্ধগুলোকে ধর্মীয় পোশাক পরিয়ে জনগণকে উত্তেজিত করছিল। [১]

ক্রুসেড যুদ্ধের সাহস বাড়ার একটি বড় কারণ ছিল মুসলমানদের রাজনৈতিক অনৈক্য। পঞ্চম হিজরি শতাব্দীতে যখন ক্রুসেড শুরু হয়, তখন মুসলিম বিশ্ব তিনটি বড় অংশে বিভক্ত ছিল: একটি অংশ ছিল সেটি যেখানে বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফার খুতবা পড়া হতো। এতে হিজাজ, এশিয়া মাইনর, ইরাক, ইরান, খোরাসান এবং ভারতের ডজনখানেক স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্র অন্তর্ভুক্ত ছিল, যাদের মধ্যে সেলজুকদের সবচেয়ে শক্তিশালী মনে করা হতো। দ্বিতীয় অংশটি ছিল উত্তর আফ্রিকা ও মিশরের, যেখানে বনু উবাইদ ‘দৌলতে ফাতিমিয়া’ নামে আলাদা খেলাফত কায়েম করেছিল। তৃতীয় অংশটি মরক্কো ও স্পেন নিয়ে গঠিত ছিল যেখানে মুরাবিতুনদের শাসন ছিল। এখানে আব্বাসীয় খলিফাদের খুতবা তো পড়া হতো কিন্তু কার্যত এই অঞ্চলের বাকি মুসলিম বিশ্বের সাথে কোনো সম্পর্ক ছিল না। সামগ্রিকভাবে মুসলিম বিশ্বের এই তিনটি বড় অংশের মধ্যে কোনো যোগাযোগ ও শৃঙ্খলা ছিল না। মুসলমানদের এই অনৈক্য ইউরোপীয় শক্তিগুলোর ক্রুসেড যুদ্ধে আশাবাদী হওয়ার প্রধান কারণ ছিল।

এই যুদ্ধগুলোর দ্বিতীয় বড় কারণ ছিল মিশরের উবাইদি খলিফাদের আচরণ, যাদের ভয় ছিল যে সেলজুকরা হয়তো তাদের কাছ থেকে মিশর কেড়ে নেবে, কারণ সেলজুকরা সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। এই কারণেই উবাইদি শাসক মুস্তানসির ৪৬৪ হিজরিতে ক্রুসেডারদের সিরিয়া আক্রমণের আমন্ত্রণ জানান যাতে তার বিরোধী সেলজুকরা দুর্বল হয়ে পড়ে। মুস্তানসিরের এও আশা ছিল যে, ক্রুসেডাররা সিরিয়া দখল করে তার এবং সেলজুকদের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়াবে এবং মিশর সেলজুকদের আক্রমণের ঝুঁকি থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে। তবে ইউরোপীয় শক্তিগুলোর তখন আক্রমণের সাহস হয়নি এবং এই সময়ের মধ্যে সেলজুকরা সিরিয়ায় প্রবেশ করে।

মালিক শাহ সিরিয়া অভিযানের দায়িত্ব তার ভাই তাজ আদ-দাওলা তুতুশ-এর ওপর অর্পণ করেছিলেন যে, তিনি যতটুকুই এলাকা জয় করবেন তা তারই বলে গণ্য হবে। ফলে তুতুশ ৪৭১ হিজরি নাগাদ আলেপ্পো ও দামেস্কসহ সিরিয়ার অধিকাংশ এলাকা দখল করে নেন। এর প্রতিক্রিয়ায় মিশরের প্রধানমন্ত্রী বদর জামালি সৈন্য পাঠিয়ে সেলজুকদের সিরিয়া থেকে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করেন কিন্তু তিনি কোনো সাফল্য পাননি।

[১] আল-হরুব আস-সালিবিয়াহ লিল আরুসি আল-মাতউয়ি, পৃ. ২৯ থেকে ৩৫; আল-কামিল ফিত তারিখ, সন ৪৮০ হিজরি থেকে ৪৮৫ হিজরি।

তারিখ-এ-উন্মতে মুসলিমা

৪৮৫ হিজরিতে তুতুশ হিমসও দখল করে নেন। আল-কুদসও তাঁর কাছেই ছিল এবং তাঁর পক্ষ থেকে আমির আরতুক এখানকার শাসক ছিলেন। এটি সেই সময় ছিল যখন পিটার দ্য হারমিট আল-কুদস সফর করে ফিরে গিয়েছিলেন। ওদিকে ক্বাযা ও ক্বদরের পক্ষ থেকে মুসলমানদের এক কঠিন পরীক্ষায় ফেলে দেওয়া হয়েছিল। ৪৮৪ হিজরিতে সিসিলির পতন হয়েছিল এবং ৪৮৫ হিজরিতে সেলজুকদের মহান বাদশাহ মালিক শাহর ইন্তেকাল হয়ে যায়। যার পরপরই তাঁর পুত্রদের মধ্যে: মাহমুদ, বারকিয়ারুক এবং মুহাম্মদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই শুরু হয়ে যায়। এর ফলে ইউরোপীয় ফরাসি এবং মিশরের ওবায়দি উভয়ের মনেই নিজ নিজ জায়গায় ফিলিস্তিন দখলের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়। তিন বছরই অতিক্রান্ত হয়েছিল যে ওবায়দি খলিফা মুস্তানসিরও, যিনি ষাট বছর পর্যন্ত মিশরে শাসন করেছিলেন, ৪৮৭ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। এভাবে মিশরের সরকারও দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে নিজ দেশ রক্ষা করার যোগ্য রইল না। মুস্তানসির নিজেই ফরাসিদের সিরিয়া আক্রমণের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, তিনি বুঝতে পারেননি যে তাঁর সন্তানদের এই বোকামির খেসারত খুব শীঘ্রই দিতে হবে এবং যখন সলিবিরি সিরিয়ার উপকূলে অবতরণ করবে তখন মিশরের স্বাধীনতাও বিপদে পড়বে।

যখন সিরিয়া ও ফিলিস্তিনে মালিক শাহর উত্তরাধিকারীরা একে অপরের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত ছিল, ফিলকদ ৪৮৮ হিজরি (নভেম্বর ১০৯৫ খ্রিষ্টাব্দ) ফ্রান্সে ক্লারমন্ট শহরে একটি বিশাল ধর্মীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যার ডাক দিয়েছিলেন পোপ আরবান দ্বিতীয়। অধিবেশনের শেষ বৈঠকে পিটার দ্য হারমিট এক অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ ভাষণ দিয়ে উপস্থিতদের মধ্যে আগুনের স্ফুলিঙ্গ জ্বালিয়ে দেন। এরপর পোপ আরবান দ্বিতীয় ভাষণ দিয়ে ইউরোপের আমিরদের আল-কুদস পুনরুদ্ধারের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। উপস্থিতরা জেরুজালেম পুনরুদ্ধারের জন্য এতটাই উত্তেজিত হয়ে পড়ে যে সবার মুখ থেকে বেরিয়ে এল:

“এটি খোদার ইচ্ছা।”

পোপ বললেন: “হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে এটিই খোদার ইচ্ছা। তিনি তোমাদের এই শব্দগুলো শিখিয়েছেন, তোমরা একে তোমাদের যুদ্ধের স্লোগান বানিয়ে নাও।”

যখন পোপ বাইবেলে উল্লেখিত একটি বাক্য ব্যবহার করে বললেন: “যে এই যুদ্ধে ক্রুশ তুলে সাথে নেবে না, সে আমার যোগ্য হবে না।” তখন উপস্থিতদের মধ্যে শোরগোল পড়ে গেল।

এই যুদ্ধকে ক্রুসেড (সলিবি জং) নাম দেওয়া হলো। মানুষ তাদের পোশাকে লাল ক্রুশ দিয়ে সাজিয়ে নিল। [১]

সলিবি যুদ্ধগুলোর অর্থ কী?

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে মুসলমানদের সাথে খ্রিস্টানদের শত শত যুদ্ধ হয়েছে কিন্তু প্রতিটি যুদ্ধকে সলিবি যুদ্ধ বলা হয় না। পরিভাষায় সলিবি যুদ্ধ শুধু সেই যুদ্ধগুলোকে বলা হয় যেগুলোর ডাক খ্রিস্টানদের ধর্মীয় নেতা ও পাদ্রিরা দিয়েছিলেন এবং যা ক্রুশের নামে লড়াই হয়েছিল। এই যুদ্ধগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে ৪৮৯ হিজরিতে শুরু হয় এবং ৬৯০ হিজরিতে শেষ হয়। এভাবে এই যুদ্ধগুলো দুই শতাব্দী ব্যাপী বিস্তৃত ছিল।

[১] হায়াত সালাহউদ্দিন আইয়ুবী, সিরাজ উদ্দিন আহমদ, পৃষ্ঠা ২১, বরাতে তারিখ-এ-মুজাহিদ; আল-হরুবে আস-সলিবিয়া লিল আরুসি আল-মাতবি, পৃষ্ঠা ৩৩ থেকে ১৪৩; তারিখ-এ-ইসলাম মঈন উদ্দিন নদভী: ৩/১২৩; বরাতে তারিখ-এ-ইউরোপ, এম. জে. গ্রান্ট, পৃষ্ঠা ৩৫৫।

রোমের সেলজুকদের সাথে যুদ্ধ:

আক্রমণের প্রথম পর্যায়ে পিটার দ্য হারমিট তেরো লক্ষ লোকের এক বিশাল সমাবেশ নিয়ে রওনা হন, কিন্তু এত বড় বাহিনী রসদপত্রের অভাবের কারণে পথেই বিশৃঙ্খলার শিকার হয় এবং অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় কনস্টান্টিনোপলে পৌঁছায়। [১]

ক্রুসেডার বাহিনী বসফরাস প্রণালী পার হয়ে এশিয়া মাইনরে পৌঁছায় এবং রোমের সেলজুকদের এলাকায় মুসলমানদের ওপর চরম জুলুম ও নির্যাতনের সীমা ছাড়িয়ে যায়। ফরাসি ঐতিহাসিক মিশড “তারিখ হরুবে সালিবিয়্যাহ” গ্রন্থে লিখেছেন:

“তারা ক্রুশের নিচে এমন সব অপরাধ করেছে যে, সেগুলোর কথা কল্পনা করলে প্রকৃতিও কেঁপে ওঠে।”

তিনি আরও লিখেছেন:

“ক্রুসেডাররা মানিসার আশেপাশে ভয়াবহ নৃশংসতা চালিয়েছে, শিশুদের টুকরো টুকরো করে এবং মাংসের কিমা বানিয়ে শিকের ওপর গেঁথেছে।” [২]

অবশেষে সেলজুকরা পাল্টা আক্রমণ করে এবং ক্রুসেডারদের পিছু হটিয়ে সমস্ত সীমান্ত এলাকা দখলমুক্ত করে। পিটার অবশিষ্ট লোকদের সাথে নিয়ে অত্যন্ত কষ্টে প্রাণ বাঁচিয়ে ইউরোপে ফিরে যেতে সক্ষম হন। [৩]

ক্লারমন্ট সম্মেলনের আট মাস পর ডিউক গডফ্রে ডি বুলিয়ন ৮০ হাজার পদাতিক এবং দশ হাজার অশ্বারোহী নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। ইতালি ও ফ্রান্সের পঙ্গপালের মতো বিশাল বাহিনীও বেরিয়ে পড়ে। এই বাহিনীর মোট সংখ্যা পাঁচ লক্ষ পদাতিক এবং এক লক্ষ অশ্বারোহীতে পৌঁছায়। [৪]

আন্তাকিয়ার ওপর ক্রুসেডার বাহিনীর দখল:

ক্রুসেডার বাহিনী ১২ জিলকদ ৪৯০ হিজরি (২১ অক্টোবর ১০৯৭ খ্রিস্টাব্দ) আন্তাকিয়ায় পৌঁছায়। স্থানীয় মুসলমানরা সাত মাস পর্যন্ত শহরটি রক্ষা করেন। এই সময়ের মধ্যে ক্রুসেডাররা তারতুস এবং তারপর এডেসসা (আর-রুহা) দখল করে নেয়। এদিকে মিশরের শাসক মুস্তালি উবাইদি সুযোগ বুঝে রবিউল আউয়াল ৪৯০ হিজরি (মার্চ ১০৯৭ খ্রিস্টাব্দ) মাসে “সুর” এবং শাবান (জুলাই) মাসে “আল-কুদস” দখল করে নেন। এরপর তিনি ক্রুসেডার নেতাদের কাছে এই বার্তা পাঠান:

“ক্রুসেডাররা আলে আলীর শত্রু সুন্নি তুর্কিদের বিরুদ্ধে যে বিজয় অর্জন করেছে, তা দেখে আমাদের বিশ্বাস জন্মেছে যে, আল্লাহই আপনাদের এশিয়ায় পাঠিয়েছেন যাতে আপনারা ন্যায়ের মাধ্যম হতে পারেন। আমরা জানি যে ক্রুসেডারদের সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা হলো আল-কুদস জিয়ারত করা। অতএব, আমরা আপনাদের এক মাস সময় দিচ্ছি যাতে আপনারা অস্ত্র ছাড়াই আল-কুদসে প্রবেশ করেন এবং পূর্ণ স্বাধীনতার সাথে জিয়ারত ও ইবাদতের রীতিনীতি পালন করেন। এই অবস্থায় আপনারা খলিফার পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন।”

[১] আল-হরুবে আস-সালিবিয়্যাহ, পৃ. ৪৭ থেকে ৫১

[২] প্রাগুক্ত

[৩] হায়াতে সালাহউদ্দীন আইয়ুবী, সিরাজউদ্দীন আহমদ, পৃ. ৩৩, মিশড-এর উদ্ধৃতিতে পৃ. ৭৩

[৪] আল-হরুবে আস-সালিবিয়্যাহ, পৃ. ৫০, ৫১

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

কিন্তু সে উত্তর পেল:

“আমরা শপথ করেছি যে আমরা জেরুজালেমকে মসীহের অস্বীকারকারীদের থেকে মুক্ত করব। তোমার প্রভুকে বলে দাও যে, আন্তাকিয়ার কাছে যে ক্রুসেডাররা তাবু গেড়েছে তারা মিশরের সরকারকে ভয় পায় না, আর না বাগদাদের খলিফাকে।”

সেলজুক সুলতান এবং অন্যান্য শহরের শাসকরা আন্তাকিয়াবাসীদের সাহায্যের জন্য একটি বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন, কিন্তু এদিকে আন্তাকিয়ার একজন আমির ক্রুসেডারদের শহরে প্রবেশের সুযোগ করে দেন। এভাবে রজব ৪৯১ হিজরি (জুন ১০৯৮ খ্রিস্টাব্দ) তে আন্তাকিয়া খ্রিস্টানদের দখলে চলে যায়। সেলজুক বাহিনী আন্তাকিয়া পুনরুদ্ধারের জন্য পৌঁছালে খ্রিস্টানরা ভীত হয়ে পড়ে, কিন্তু এক পাদ্রি তার বাহিনীর মনোবল বাড়ানোর জন্য গোপনে একটি পুরনো বর্শা মাটিতে পুঁতে দেন এবং বাহিনীর আমিরদের বলেন:

“শুনেছি যে ঈসা মসীহের একটি বর্শা আন্তাকিয়ায় সমাহিত আছে, সেটি খুঁজে বের করো। যদি পাওয়া যায় তবে বিজয় আমাদের ভাগ্যলিপি। আর যদি না পাওয়া যায় তবে ধ্বংস নিশ্চিত।”

পাদ্রির কথা অনুযায়ী বাহিনীর আমিররা তিন দিন রোজা রেখে প্রার্থনা করেন, তারপর পাদ্রির কথামতো খনন করা হলে এক স্থান থেকে সেই বর্শাটি বেরিয়ে আসে। এতে ক্রুসেডারদের মধ্যে এক উদ্দীপনা ছড়িয়ে পড়ে এবং তারা মোকাবিলার জন্য কোমর বেঁধে খোলা ময়দানে বেরিয়ে আসে। যুদ্ধে সেলজুকরা পরাজিত হয় এবং ফিলিস্তিন পর্যন্ত ক্রুসেডারদের পথ পরিষ্কার হয়ে যায়। [১]

বাইতুল মুকাদাসের পতন, ফিরিজিদের লোমহর্ষক অত্যাচার:

ক্রুসেডাররা আল-বিরাহ, মা'রাহ, তারতুস এবং আক্কায় এক লক্ষেরও বেশি মানুষের রক্ত ঝরিয়ে সেখানে দখলদারিত্ব কায়েম করে এবং তারপর অগ্রসর হয়ে ৬ জুন ১০৯৯ খ্রিস্টাব্দে আল-কুদসের সামনে পৌঁছে যায়। বিয়াল্লিশ দিনের অবরোধের পর ২৩ শাবান ৪৯২ হিজরি (১৫ জুলাই ১০৯৯ খ্রিস্টাব্দ) তারা বাইতুল মুকাদাসে প্রবেশ করে এবং রক্তের নদী বইয়ে দেয়। [২]

ফরাসি ঐতিহাসিক “মিশু” এর বর্ণনা হলো:

“ক্রুসেডাররা এমন গোঁড়ামির প্রমাণ দিয়েছে যার কোনো নজির মেলে না। আরবদের উঁচু উঁচু বুরুজ এবং ঘরবাড়ির ছাদ থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছে, আগুনে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে, ঘর থেকে বের করে ময়দানে পশুর মতো টেনে হিঁচড়ে নেওয়া হয়েছে। ক্রুসেডার যোদ্ধারা মুসলমানদেরকে নিহত মুসলমানদের লাশের ওপর নিয়ে গিয়ে হত্যা করত। কয়েক সপ্তাহ ধরে এই গণহত্যার ধারা অব্যাহত ছিল। শুধুমাত্র মসজিদে আকসায় সত্তর হাজারেরও বেশি মুসলমানকে তলোয়ারের নিচে প্রাণ দিতে হয়েছে।”

মাজাদ লিখেছেন:

“রাস্তাঘাট এবং ঘরবাড়িতে মুসলমানদের গণহত্যা চালানো হয়েছে। পরাজিত মুসলমানদের জন্য জেরুজালেমে কোনো জায়গা ছিল না।”

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: বছর ৪৯০ হিজরি, ৪৯১ হিজরি, ৪৯২ হিজরি

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: বছর ৪৯৩ হিজরি

আরও তিনি বলেন:

“যখন খ্রিস্টানরা মসজিদ-ই-উমর (রা.)-এর ওপর দখলদারিত্ব কায়েম করল, যেখানে মুসলমানরা অল্প সময়ের জন্য আশ্রয় নিয়েছিল, সেখানে রক্তপাত ও সাধারণ হত্যাকাণ্ডের দৃশ্য দেখা গেল। অশ্বারোহী ও পদাতিক ক্রুসেডাররা মসজিদে ঢুকে মুসলমানদের সাথে মিশে গেল। এই ভয়াবহ হাঙ্গামায় কান্নাকাটি ও মৃত্যুর চিৎকার ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। বিজয়ীরা পলায়নপরদের পিছু ধাওয়া করে লাশের স্তুপ মাড়িয়ে যাচ্ছিল। রেমন্ড ডি অ্যাগুইলার্স একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে বর্ণনা করেছেন যে, মসজিদের ভেতরে ও প্রাঙ্গণে নিহতদের প্রবাহিত রক্ত আমাদের ঘোড়ার লাগাম পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল।” [১]

ফরাসি ঐতিহাসিক লে বনের বর্ণনা হলো:

“আমাদের লোকেরা শিশুদের টুকরো টুকরো করছিল, যুবক ও বৃদ্ধদের হত্যা করছিল। কোনো প্রাণীকে জীবিত ছাড়ছিল না। দ্রুত অবসর হওয়ার জন্য একই দড়িতে কয়েকজনকে ফাঁসি দিচ্ছিল।”

“শহরের রাস্তায় রক্তের নদী প্রবাহিত হচ্ছিল এবং চারদিকে লাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল।”

“জেরুজালেমের রাস্তায় এবং প্রতিটি স্থানে মাথা ও হাত-পায়ের স্তুপ ছিল। কিন্তু যা কিছু ঘটেছিল তার তুলনায় এটি (আমার এই বর্ণনা) খুবই সামান্য। হাইকালে সুলাইমানিতে (সলোমন টেম্পল) এত বেশি রক্ত প্রবাহিত হয়েছিল যে তাতে লাশগুলো ভাসছিল।”

খ্রিস্টান কমান্ডাররা বিজয়ের পর পোপের কাছে সুসংবাদের বার্তা পাঠিয়েছিলেন এবং তাতে লিখেছিলেন:

“যদি আপনি শত্রুদের সাথে আমাদের আচরণের কথা জানতে চান, তবে সংক্ষেপে এতটুকু লেখাই যথেষ্ট যে, যখন আমাদের সৈন্যরা হাইকালে সুলাইমানিতে (মসজিদ-ই-উমর রা.) প্রবেশ করল, তখন তাদের হাঁটু পর্যন্ত মুসলমানদের রক্ত ছিল।” [২]

কিন্তু এই গণহত্যাও ক্রুসেডারদের ক্রোধ প্রশমিত করতে পারেনি। তৃতীয় দিন ক্রুসেডার নেতারা একটি পরামর্শ সভা করে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, জেরুজালেমের অবশিষ্ট সমস্ত মুসলমান ও ইহুদিদেরও হত্যা করা হবে। ফলে আরও এক সপ্তাহ ধরে স্থানীয় বাসিন্দাদের বেছে বেছে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হলো। একজন প্রত্যক্ষদর্শী আলবার্ট ডি এক্স-এর বর্ণনা অনুযায়ী, শুধু প্রাসাদ, মসজিদ ও অলিগলিতেই লাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল না, বরং জনশূন্য স্থানেও সেগুলোর স্তুপ জমে ছিল। [৩]

মসজিদ আল-আকসা হাতছাড়া হওয়ায় মুসলমানদের শোক ও ক্ষোভ:

সত্তর হাজারের বেশি মুসলমানের মজলুম শাহাদাত এবং কাফেরদের দ্বারা কিবলা-ই-আউয়াল দখলের ঘটনায় সমগ্র মুসলিম বিশ্বে শোকের ছায়া নেমে আসে। কবির অশ্রুসিক্ত মার্সিয়া (শোকগাথা) রচনা করেন। দামেস্কের কাজী বাগদাদের খলিফার দরবারে নিজের দাড়ি ছিঁড়ে ফেলেন এবং দরবারে উপস্থিত সকলে অবোরে কাঁদতে থাকেন। কিন্তু এই বিলাপ ও আত্ননাদ ছিল নিরর্থক। এই ঘটনা মুসলিম শাসকদের সাময়িকভাবে নাড়া দিলেও সেই সাময়িক জোশ ও উদ্দীপনার পর তারা আবার ঠান্ডা হয়ে যান এবং বাস্তবিকভাবে কিছু করা থেকে বিরত থাকেন। খেলাফত-ই-বাগদাদ...

[১] তারিখ-ই-ইসলাম, শাহ মঈনুদ্দিন নদভী, বরাতে তারিখ-ই-ইউরোপ, এ. জে. গ্রান্ট, পৃ. ২৫৭

[২] প্রাগুক্ত

[৩] প্রাগুক্ত

সুলতান বারকিয়ারুক এবং অন্যান্য সেলজুক শাহজাদাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে আল-কুদস পুনরুদ্ধারের জন্য সেনাবাহিনী প্রস্তুত করার তাগিদ দিয়েছিলেন, কিন্তু এই শাসকরা পারস্পরিক দ্বন্দ্ব লিপ্ত ছিলেন এবং এই জাতীয় দায়িত্ব পালনে মনোযোগ দিতে ব্যর্থ হন। উবাইদি শাসক নিজের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য আফজল বিন বদর জামালিকে একটি সেনাবাহিনী দিয়ে আল-কুদসের দিকে পাঠান, কিন্তু এই অভিজ্ঞ সেনাবাহিনী পথেই ক্রুসেডারদের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে পিছু হটে। [১]

সিরিয়ার খ্রিস্টান উপনিবেশসমূহ

বাইতুল মুকাদাসের পতনের পর খ্রিস্টান জাতিগুলো অধিকৃত সিরিয়া ও ফিলিস্তিনকে বিভক্ত করে আল-কুদস, আর-রাহা, ত্রিপোলি, আন্তাকিয়া এবং ইয়াফার পাঁচটি স্থায়ী ক্রুসেডার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। এই রাষ্ট্রগুলো পরবর্তী কয়েক দশকে আরও বিস্তৃত হয়। সিরিয়ার প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বন্দর যা ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত ছিল, ইউরোপীয়দের হাতে চলে যায়। গাজা থেকে শুরু করে আন্তাকিয়ার উত্তর পর্যন্ত সমস্ত উপকূল তাদের দখলে চলে যায়। বিভিন্ন ইউরোপীয় রাজাদের প্রতিনিধিরা তাদের বিজিত অঞ্চলের স্বায়ত্তশাসিত শাসক ছিলেন।

ক্রুসেডার রাষ্ট্রগুলোর শাসকরা আল-কুদসের অধিপতিকে তাদের নেতা হিসেবে স্বীকার করতেন এবং ইউরোপ থেকে আসা নতুন সৈন্যদলের সাহায্যে প্রায়ই কোনো না কোনো সীমান্ত দুর্গে আক্রমণ চালাতেন। লেন পুল এই পরিস্থিতিতে এভাবে বর্ণনা করেছেন:

“ক্রুসেডাররা ইসলামি অঞ্চলগুলোতে এমনভাবে ঢুকে পড়েছিল যেন কাঠের মধ্যে গোঁজ ঠুকে দেওয়া হয়েছে। কিছু সময়ের জন্য মনে হচ্ছিল যে এই গোঁজ ইসলামি সাম্রাজ্যরূপী বৃক্ষকে হিন্নভিন্ন করে দেবে।” [২]

জেরুজালেমের খ্রিস্টান নবাবগণ

আল-কুদস দখলের পর খ্রিস্টানরা এর নাম দেয় জেরুজালেম সাম্রাজ্য। নবাব গডফ্রে ডি বুয়েন, যিনি প্রথম বল্ডউইন উপাধিতে পরিচিত ছিলেন, এই সাম্রাজ্যের প্রথম সম্রাট ছিলেন। তিনি আরসুফও দখল করেছিলেন। উপকূলীয় অন্যান্য শহর: আক্কা, কায়সারিয়া এবং আসকালানের শাসকরা তাকে কর প্রদান করতেন। প্রথম বল্ডউইন দীর্ঘকাল শাসন করার সুযোগ পাননি এবং ৪৯৩ হিজরির শাবান মাসে (জুলাই ১১০০ খ্রিস্টাব্দ) তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

তার স্থলে তার ছোট ভাই, যে এডেসার শাসক ছিল, সিংহাসনে আরোহণ করে। সে ৪৯৭ হিজরিতে আক্কা জয় করে মুসলমানদের ওপর চরম নির্যাতন চালায়। ৫১২ হিজরিতে (১১১৮ খ্রিস্টাব্দ) মিসর আক্রমণ করে ফেরার পথে সে অসুস্থ হয়ে মারা যায়।

এরপর তার চাচাতো ভাই বল্ডউইন ডি বার্গ, দ্বিতীয় বল্ডউইন উপাধিতে জেরুজালেমের সম্রাট হন। তিনি সিরিয়ার মুসলমানদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালান। তিনি মুসলমানদের অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে জেরুজালেম সাম্রাজ্যকে আরও বিস্তৃত ও সুসংহত করেন। টায়ারের মতো শক্তিশালী ইসলামি কেন্দ্রটিও তিনিই দখল করেন। এই সময়ে টেম্পলার এবং হসপিটালার নামক খ্রিস্টান ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর উত্থান ঘটে।

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: বছর ৪৯২ হিজরি থেকে ৪৯৫ হিজরি।

[২] সালাহউদ্দিন, লেন পুল, পৃষ্ঠা ২৩।

*প্যাচ (পাচর): পেরেক, খুঁটি, কাঠের ছোট টুকরো যা কাঠ চেরার সময় ফাটল খোলা রাখার জন্য লাগানো হয়। (ফিরোজুল লুগাত জামে, পৃষ্ঠা ২৮১)

মলা এবং তাদের শক্তি মুসলিম শাসকদের অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। দ্বিতীয় বন্ডউইন ৫২৫ হিজরির রমজান মাসে (আগস্ট ১১৩১ খ্রি.) মৃত্যুবরণ করেন। এরপর তার জামাতা ফিলিপ কাউন্ট অফ আনজু রাজা হন। ৫৩৮ হিজরির রবিউস সানি মাসে (নভেম্বর ১১৪৩ খ্রি.) তার ইন্তেকাল হয়।

ফিলিপের পর তার বড় ছেলে বন্ডউইন মাত্র তেরো বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি তৃতীয় বন্ডউইন উপাধি লাভ করেন। তার শাসনামলেই দ্বিতীয় ক্রুসেড শুরু হয়। তৃতীয় বন্ডউইন সে সময় বিদেশি রাজা ও সেনাবাহিনীগুলোর আতিথেয়তা করেন এবং তাদের নিয়ে দামেস্ক আক্রমণ করেন যা ব্যর্থ হয়। ৫৩৮-৫৫৮ হিজরির (১১৫৩ খ্রি.) মধ্যে তিনি আসকালান দখল করতে সক্ষম হন। ৫৫৬ হিজরির জিলকদ মাসে (নভেম্বর ১১৬১ খ্রি.) তার ইন্তেকাল হয়।

এরপর তার ভাই অ্যামালরিক সিংহাসনে বসেন, যাকে আরব ঐতিহাসিকগণ “মরি” বা “আমরি” নামে স্মরণ করেন। তিনিও মিশর ও সিরিয়ার ওপর ক্রমাগত আক্রমণ চালিয়ে যান। ৫৬৯ হিজরির জিলহজ মাসে (জুলাই ১১৭৪ খ্রি.) তারও ইন্তেকাল হয়।

অ্যামালরিকের পর তার তেরো বছর বয়সী ছেলে চতুর্থ বন্ডউইন উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন। তিনি কুষ্ঠরোগী ছিলেন, তাই আরবরা তাকে “আল-মালিকুল মাজজুম” বলত। তিনি অত্যন্ত যোদ্ধা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। সারাজীবন মুসলিম শাসকদের সাথে যুদ্ধরত ছিলেন। যেহেতু তিনি নিঃসন্তান ছিলেন, তাই ৫৮০ হিজরিতে (১১৮৪ খ্রি.) তার আট বছর বয়সী ভাগ্নে পঞ্চম বন্ডউইনকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে মৃত্যুবরণ করেন।

আমিরগণ পঞ্চম বন্ডউইনের অল্প বয়সের কথা বিবেচনা করে একজন অভিজ্ঞ প্রধান রেমন্ডকে তার অভিভাবক নিযুক্ত করেন, যিনি ত্রিপোলি ও কাইলিনি (তিবরিয়া)-র শাসক ছিলেন। [১] অল্পবয়সী পঞ্চম বন্ডউইন কিছুদিন শাসন করার পর হঠাৎ মারা যান এবং তার স্থলে তার সৎ বাবা গাই, যিনি জেরুজালেমের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ছিলেন, রাজত্ব লাভ করেন। [২]

খ্রিস্টান রাষ্ট্র ও শাসকদের এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এজন্য লেখা হয়েছে যাতে সামনের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বুঝতে কোনো অসুবিধা না হয়, কারণ এই সমস্ত শাসক ইমাদউদ্দিন জঙ্গি, নুরুদ্দিন জঙ্গি এবং সালাহউদ্দিন আইয়ুবির সাথে যুদ্ধরত ছিলেন। এখন আমরা পুনরায় মুসলিম বিশ্বের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে আতাবেকিয়া রাষ্ট্রের অবস্থা ও কীর্তিসমূহের ওপর এক নজর দেব, যা ক্রুসেডারদের ঝড়ের সামনে প্রথম প্রতিরক্ষা প্রাচীর হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল।

আতাবেকিয়া রাষ্ট্র

জেরুজালেম খ্রিস্টানদের দখলে যাওয়ার পর কেবল দামেস্কের শাসক তুঘতেগিন তাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন, অন্যদিকে সেলজুক শাসক সুলতান মাসুদ এবং সুলতান মাহমুদ অন্তহীন গৃহযুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। ৫২৫ হিজরিতে (১১৩১ খ্রি.) সুলতান মাহমুদ পৃথিবী থেকে বিদায় নিলে সুলতান মাসুদ তার চাচা সুলতান সাঞ্জর সেলজুকের মুখোমুখি হন। খলিফা মুসতারশিদ বিল্লাহও এই দ্বন্দ্ব এক পক্ষ ছিলেন। চল্লিশ বছর পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের ওপর এক স্থবিরতা বিরাজ করছিল। এরপর হঠাৎ ইমাদউদ্দিন জঙ্গির রূপে একজন নেতার আবির্ভাব ঘটে।

[১] আরবরা রেমন্ডকে ‘কোমস ইবনে কোমস’ বলত। কোমস বা রেমন্ড কোনো নাম ছিল না বরং এটি একটি উপাধি ছিল যা সেই অঞ্চলের শাসকের জন্য নির্দিষ্ট ছিল যেখানে রেমন্ডের শাসন ছিল।

[২] এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা: ৭/৬২৩, জেরুজালেম সালতানাত।

যিনি মুসলমানদের প্রতিরোধ ক্ষমতাকে জাগ্রত করে ক্রুসেডারদের একের পর এক পরাজয় বরণ করান এবং তাদের মন থেকে সমগ্র ইসলামি বিশ্বকে পদানত করার চিন্তা দূর করে দেন। ক্রুসেডার শক্তিগুলো এখন নিজেদের আত্মরক্ষা করাকেই যথেষ্ট মনে করতে লাগল।

ইমাদউদ্দিন জঙ্গি:

ইমাদউদ্দিন জঙ্গির জন্ম ৪৭৮ হিজরিতে হয়েছিল। তার পিতা আক সানকার ছিলেন মালিক শাহ সেলজুকির একজন বিশ্বস্ত গোলাম। মালিক শাহ যখন তাকে আলেপ্পোর শাসক নিযুক্ত করেন, তখন তার ন্যায়বিচারের প্রশংসা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ৪৮৮ হিজরিতে (১০৯৫ খ্রিষ্টাব্দে) তিনি বাদশাহর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে গিয়ে নিহত হন। সে সময় তার পুত্র ইমাদউদ্দিনের বয়স ছিল দশ বছর। আক সানকারের বন্ধু ‘কারবুকা’, যিনি মসুলের শাসক ছিলেন, এই এতিম শিশুটিকে লালন-পালন করেন। অবশেষে এই শিশুটি সুঠাম যুবক হয়ে মসুলের সেনাবাহিনীতে বীরত্বের স্বাক্ষর রাখতে শুরু করে। তার অসাধারণ যোগ্যতার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। কারবুকার পর মসুলের যত শাসক এসেছেন, সবাই ইমাদউদ্দিন জঙ্গির সাহসিকতার প্রশংসা করেছেন। এরপর তিনি সুলতান মাহমুদ সেলজুকির দরবারের সাথে যুক্ত হন। সুলতান তার যোগ্যতা দেখে ৫১৮ হিজরিতে (১১২৪ খ্রিষ্টাব্দে) তাকে ওয়াসিত ও বসরার জায়গিরদার নিযুক্ত করেন। এখানে একজন সরদার হিসেবে তিনি ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেন।

এরপর সুলতান তাকে তার শাহজাদাদের বিশেষ শিক্ষক নিযুক্ত করেন, যাকে ‘আতালিক’ বা ‘আতাবক’ বলা হতো। এভাবে ইমাদউদ্দিন ‘আতাবক’ উপাধিতে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

[১] এই উপাধিটি এমনভাবে সঁটে গেল যে তার পুরো পরিবারই ‘আতাবক’ নামে পরিচিত হতে লাগল। ইমাদউদ্দিন জঙ্গি সেলজুকি বাদশাহর সেবা করতে গিয়ে বিস্ময়কর কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ৫২০ হিজরিতে (১১২৬ খ্রিষ্টাব্দে) সুলতানের সাথে আব্বাসীয় খলিফা মুসতারশিদের বিরোধের সময় ইমাদউদ্দিন জঙ্গি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বাগদাদের বাহিনীর হাত থেকে ওয়াসিতকে রক্ষা করেন। শুধু তাই নয়, বরং তিনি এত চমৎকার বাহিনী নিয়ে বাগদাদে আসেন যে খলিফা আপস করতে রাজি হয়ে যান। এই ঘটনা সুলতানের দৃষ্টিতে জঙ্গির মর্যাদা অনেক বাড়িয়ে দেয়। সুলতান তাকে বাগদাদের প্রধান প্রশাসক নিযুক্ত করেন। ৫২১ হিজরিতে (১১২৭ খ্রিষ্টাব্দে) সেলজুকি বাদশাহর অধীনে মসুলের শাসক আমির বারসাকি মারা গেলে সুলতান মাহমুদ ইমাদউদ্দিনকে এই পদের জন্য উপযুক্ত মনে করেন। ফলে তাকে মসুল ও অন্যান্য অঞ্চলের শাসক নিযুক্ত করা হয়। এটি ছিল মসুলের আতাবকিয়া রাষ্ট্রের সূচনা। [২]

জঙ্গি রাষ্ট্র জিহাদের ময়দানে:

জঙ্গি মসুলকে শক্তিশালী করে সেই সব বিচ্ছিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর দিকে মনোনিবেশ করেন যাদের শক্তি নিজেদের মধ্যে লড়াই করে নষ্ট হচ্ছিল। তিনি নাসিবিন, সিনজার এবং খাবুর দখল করে তার শাসনসীমা সিরীয় সীমান্তের সাথে মিলিয়ে দেন। ৫২৩ হিজরিতে (১১২৯ খ্রিষ্টাব্দে) তিনি ফোরাত নদী পার হয়ে খ্রিস্টান অধিকৃত অঞ্চলের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানো মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর দিকে অগ্রসর হন। হিসন বাজায়া, হামাত, আলেপ্পো এবং হোমসের মতো গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলো তার সামনে নতি স্বীকার করতে থাকে। এভাবে মসুলের আতাবকিয়া রাষ্ট্রের সীমানা খ্রিস্টান অধিকৃত অঞ্চলের সাথে গিয়ে মিলিত হয়।

[১] ‘আতাবক’ বা ‘আতাবিক’ তুর্কি শব্দ। মূলত এটি ‘আতা’ (পিতা) এবং ‘বেক’ (সরদার) এর সমন্বয়ে গঠিত। ‘ত’ কে ‘ত’ এবং ‘গ’ কে ‘ক’ দিয়ে পরিবর্তন করা হয়েছে। এই শব্দটি ‘বড় সরদার’, ‘সালতানাতের নায়েব’ বা ‘অব্ধবয়সী বাদশাহর অভিভাবক’ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। (ফিরোজুল লুগাত ফারসি উর্দু, পৃ. ১৫৯, ২৩; মু’জামু মাতনিল লুগাহ: ১/৩০১)

[২] ওফায়াতুল আ’ইয়ান: ২/৩২৭, ৩২৮, ত. দার সাদির

৫২৪ হিজরী (১১৩০ খ্রিষ্টাব্দ) তে তিনি ফ্রাঙ্কদের সবচেয়ে শক্তিশালী দুর্গ “হাসান আতারিব” আক্রমণ করেন এবং একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ফ্রাঙ্কদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে দুর্গটি ধ্বংস করে দেন যাতে ভবিষ্যতে খ্রিস্টানরা এখানে পা রাখার সুযোগ না পায়।

খ্রিস্টানদের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ ছিল হারিম, যার অধিপতি সন্ধির আবেদন করেছিলেন। ইমাদউদ্দিনের সেনাবাহিনী ক্লান্ত ছিল, তাই তিনি হারিমের বার্ষিক আয়ের অর্ধেক গ্রহণের চুক্তিতে সন্ধি গ্রহণ করেন। ইমাদউদ্দিনের এই বিজয়ের ফলে আলেপ্পো (হালাব), হামা এবং আশেপাশের অনেক শহর খ্রিস্টানদের অত্যাচার থেকে নিরাপদ হয়ে যায় এবং ওইসব এলাকার জনগণ দীর্ঘকাল পর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। ইমাদউদ্দিন জেঙ্গি নিজের শাসনব্যবস্থা এত চমৎকারভাবে পরিচালনা করেন যে নিজামুল মুলক তুসীর যুগের স্মৃতি সতেজ হয়ে ওঠে।

ফ্রাঙ্কদের বিরুদ্ধে তাঁর জিহাদী কর্মকাণ্ড মানুষের মধ্যে সুপরিচিত ছিল। বাস্তবতা হলো, তিনি বহু বছর পর মুসলিম বিশ্বকে জিহাদের ভুলে যাওয়া পাঠ স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। খ্রিস্টানদের যে শক্তি মুসলমানদের অনৈক্য তাদের জন্য অপরাজেয় করে তুলেছিল, ইমাদউদ্দিন জেঙ্গির একের পর এক আক্রমণে তা নিজের পূর্বের প্রভাব ও প্রতিপত্তি হারাতে শুরু করে।

ইমাদউদ্দিনের এই অভিযানের পর তাঁর অভিভাবক ও পৃষ্ঠপোষক সুলতান মাহমুদ সেলজুকির ইন্তেকাল হয় এবং তাঁর অন্য ভাইদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের এক নতুন ধারা শুরু হয় যাতে ইমাদউদ্দিন জেঙ্গিকেও অংশ নিতে হয়। এবং তাঁর বেশ কয়েক বছর এই ব্যস্ততাতেই অতিবাহিত হয়। সুলতান মাহমুদ সেলজুকির মৃত্যুর পর ৫২৬ হিজরী (১১৩২ খ্রিষ্টাব্দ) তে ইরাক ও খোরাসানের রাজনীতিতে সুলতান সানজার সেলজুকি পুরোপুরি ছেয়ে যান। তিনি সুলতান মাসুদকে পরাজিত করেন এবং বাগদাদকে অনুগত রাখার জন্য ইমাদউদ্দিন জেঙ্গিকে আমন্ত্রণ জানান যে তিনি বাগদাদের প্রধান প্রশাসক হিসেবে সেখানে পৌঁছান। যেহেতু এই সবকিছু খলিফা মুসতারশিদ বিল্লাহর মর্জির বিরুদ্ধে ছিল, তাই তিনি ইমাদউদ্দিন জেঙ্গির বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। ২৭ রজব ৫২৬ হিজরী (১৩ জুন ১১৩২ খ্রিষ্টাব্দ) তে ইমাদউদ্দিন জেঙ্গি এবং বাগদাদী বাহিনীর মধ্যে বড় ধরনের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। ইমাদউদ্দিন জেঙ্গির সাথে বনু আসাদের সরদার দুবাইস বিন সাদাকা তাঁর সেনাবাহিনীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিলেন। যুদ্ধ যখন তুঙ্গে, তখন দুবাইস বিন সাদাকা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে যান। এরপর জেঙ্গিকেও পিছু হটতে হয়। পরবর্তীতে জেঙ্গি খলিফার সাথে সন্ধি করেন এবং খেলাফতের কেন্দ্রের প্রতি পূর্বের ন্যায় সম্মান প্রদর্শন করতে শুরু করেন।

বেশ কিছুকাল পর্যন্ত ইমাদউদ্দিন ফ্রাঙ্কদের মোকাবিলায় কোনো নতুন অভিযান শুরু করার সুযোগ পাননি। তবে তিনি কুর্দিস্তানে নিজের সীমানা বিস্তৃত করেন এবং ৫২৮ হিজরী (১১৩৩ খ্রিষ্টাব্দ) তে কুর্দিদের বেশ কিছু দুর্গ দখল করেন।

দামেস্কের শাসক ইসমাইল বিন বুরি শামসুল মুলুক নিজের সরকারের দুর্বলতার কারণে ফ্রাঙ্কদের ভয়ে ভীত ছিলেন। তিনি জেঙ্গিকে দামেস্ক দখল করার আমন্ত্রণ জানান। ফলে জেঙ্গি দামেস্কের দিকে অগ্রসর হন কিন্তু শামসুল মুলুকের দরবারীরা দামেস্ক জেঙ্গির হাতে তুলে দিতে অস্বীকার করে। এই বিরোধ এতটাই বেড়ে যায় যে শামসুল মুলুক নিজের দরবারীদের হাতেই নিহত হন। নতুন শাসকের নায়েব মুঈনুদ্দিন আনজ শহর রক্ষা করতে শুরু করেন। জেঙ্গি অবরোধ করেন কিন্তু পরবর্তীতে খলিফা মুসতারশিদ বিল্লাহর পক্ষ থেকে সন্ধির আদেশ আসায় তিনি এই অভিযান ত্যাগ করেন। [১]

[১] তারিখ ইবনে খালদুন: ৫/২৭৩ থেকে ২৭৫, ত. দারুল ফিকর বৈরুত।

ফাতহুল ফুতুহ:

কয়েক বছর পর যখন জেনগি অভ্যন্তরীণ জটিল সমস্যাগুলো থেকে অবসর হলেন, তখন তাঁর সামনে সর্বপ্রথম লক্ষ্য ছিল এডেসার খ্রিস্টান সাম্রাজ্য, যা সিরিয়া থেকে এশিয়া মাইনর এবং ইরাক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইমাদউদ্দিন জেনগি এডেসার কেন্দ্র ‘রাহা’ আক্রমণ করেন এবং শহরটি কঠোরভাবে অবরোধ করার পর আটশতম দিনে মিনজানিকের সাহায্যে প্রাচীর ভেঙে ফেলেন। ইসলামী বাহিনী রাহায় প্রবেশ করে এবং প্রচণ্ড যুদ্ধের পর তা দখল করে নেয়। ইমাদউদ্দিন জেনগি শহরবাসীর সাথে অত্যন্ত উদার আচরণ করেন। এই গৌরবময় বিজয় ৬ই জমাদিউল আখির ৫৩৯ হিজরি (২৩শে ডিসেম্বর ১১৪৪ খ্রিস্টাব্দ) তারিখে অর্জিত হয়েছিল। এর গুরুত্ব বিবেচনা করে মুসলিম ঐতিহাসিকগণ একে “ফাতহুল ফুতুহ” নামে স্মরণ করেন। সমগ্র মুসলিম বিশ্বে এই বিজয়ে আনন্দ উদযাপন করা হয় এবং বাগদাদের খলিফা খুতবায় ইমাদউদ্দিন জেনগির নাম অন্তর্ভুক্ত করেন। [১]

রাহা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় খ্রিস্টান বিশ্ব স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিল। খ্রিস্টান ঐতিহাসিকগণ একে সিরিয়ার ক্রুসেডার সাম্রাজ্যের পতনের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য করেছেন। মিকাদ লিখেছেন:

“জেরুজালেম এবং অন্যান্য শহরের নাসারাগণ এযায-এর বিজয় ও ধ্বংসের খবর শুনে নিরাশার অশ্রু বিসর্জন দেয়। ফোরাত নদীর তীর থেকে আসা অশুভ সংবাদগুলো তাদের আরও আতঙ্কিত করে তোলে। হযরত مسیح-এর কবর এবং পাহাড় থেকে তাদের ওপর যেন বজ্রপাত হলো। একটি ধূমকেতু দেখা দিল এবং তীর ভয় ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। প্রাচ্যের নাসারাগণ নিশ্চিত হয়ে গেল যে আকাশ তাদের প্রতিকূল হয়ে গেছে এবং তাদের ওপর ভয়াবহ বিপদ আসতে চলেছে।”

এই পরাজয়ে বিচলিত হয়ে পাদ্রিরা একটি নতুন ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ শুরু করার জন্য জোরালো বক্তৃতা দিতে শুরু করেন। ইউরোপের রাজন্যবর্গ বড় বড় আত্মত্যাগের দাবি করলেও তাৎক্ষণিকভাবে তারা কিছুই করতে পারেনি। [২]

ইমাদউদ্দিন জেনগির শাহাদাত:

এই বিজয়ের দুই বছর পর জেনগি যখন জাবর দুর্গ অবরোধ করে ছিলেন, তখন হঠাৎ কয়েকজন গোলাম তাঁর তাঁবুতে প্রবেশ করে তাঁকে শহীদ করে দেয়। এটি ৫ই রবিউস সানি ৫৪১ হিজরি (১৩ই সেপ্টেম্বর ১১৪৬ খ্রিস্টাব্দ) সন্ধ্যার ঘটনা। এই ষড়যন্ত্রের রহস্য কখনোই উন্মোচিত হয়নি।

মিকাদ লিখেছেন:

“তাঁর মৃত্যুর সংবাদে নাসারাগণ তাদের পরাজয়ের শোক ভুলে যায় এবং এমন আনন্দ প্রকাশ করে যেন মুসলমানদের সমস্ত শক্তি একযোগে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে।” [৩]

তাঁর ইন্তেকালের পর কোনো এক আল্লাহর ওলি তাঁকে স্বপ্নে দেখেন এবং জিজ্ঞাসা করেন: “আপনার সাথে কী আচরণ করা হয়েছে?” জেনগি উত্তর দিলেন: “আল্লাহ রাহা বিজয়ের বিনিময়ে আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।” [৪]

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: বছর ৫৩৯ হিজরি

[২] হায়াতে সালাহউদ্দিন আইয়ুবী, সিরাজ উদ্দিন আহমদ, পৃষ্ঠা ৩৬

[৩] হায়াতে সালাহউদ্দিন আইয়ুবী, সিরাজ উদ্দিন আহমদ: পৃষ্ঠা ৫৫, মিকাদ-এর বরাতে

[৪] আল-কামিল ফিত তারিখ, বছর: ৫৪১ হিজরি

ইমাদ উদ্দিন জঙ্গির সীরাত এক নজরে:

ইমাদ উদ্দিন জঙ্গি অত্যন্ত সাহসী, মহৎ এবং যোদ্ধা মানুষ ছিলেন। তাঁর প্রভাব ও প্রতাপের অবস্থা এমন ছিল যে, একদিন এক সৈন্য নিজের দায়িত্ব পালনে গাফেল হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। চোখ খুলতেই দেখল জঙ্গি তাঁর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। যেই তাঁর দৃষ্টি সেই সিংহপুরুষের সাথে মিলিত হলো, ভয়ে সে সেখানেই প্রাণত্যাগ করল। জঙ্গি কেবল তাঁর সন্তানদের জন্য এক বিশাল রাষ্ট্রই রেখে যাননি, বরং মুসলমানদের জন্য আল-কুদস মুক্তির পথও সুগম করে দিয়েছিলেন। [১]

আল্লামা ইবনুল আসির আল-জাযারি, যিনি নিজেও মসুলের অধিবাসী ছিলেন, তিনি বলেন: “তিনি ছিলেন সুদর্শন, শ্যামলা বর্ণের এবং আকর্ষণীয় চোখের অধিকারী। তাঁর চুলে শুভ্রতা চলে এসেছিল। বয়স ষাট বছর অতিক্রম করেছিল। তাঁর দাফন রাক্কায় সম্পন্ন হয়। নিজের সেনাবাহিনী ও প্রজাদের ওপর তাঁর কঠোর প্রভাব প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি ছিলেন একজন মহান রাজনীতিবিদ। তাঁর কাছে কোনো শক্তিশালী ব্যক্তি কোনো দুর্বলের ওপর জুলুম করতে পারত না। এর আগে শহরগুলো শাসকদের জুলুম, তাদের বারবার পরিবর্তন এবং ফিরিজিদের নৈকট্যের কারণে জনশূন্য হয়ে পড়েছিল। তিনি এই শহরগুলো পুনর্নির্মাণ করে সেগুলোকে মানুষ দিয়ে আবাদ করেছিলেন। আমার পিতা বলতেন যে, আগে মসুলের অধিকাংশ অংশ জনশূন্য ছিল। মানুষ কুচা-ই-তাববাখিনের কাছে দাঁড়ালে প্রাচীন জামে মসজিদ, এর ময়দান এবং রাজকীয় কেল্লা পরিষ্কার দেখতে পেত। মাঝখানে কোনো দালানকোঠা ছিল না। কাউকে জামে মসজিদ পর্যন্ত যেতে হলে সে কোনো দেহরক্ষীকে সাথে নিয়ে যেত, কারণ জামে মসজিদ জনবসতি থেকে দূরে ছিল। কিন্তু এখন এই জামে মসজিদই জনবসতির মাঝখানে অবস্থিত।”

আল্লামা ইবনুল আসির আরও লিখেছেন:

“তিনি নারীদের ব্যাপারে অত্যন্ত আত্মমর্যাদাশীল ছিলেন এবং আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাহসী ছিলেন। তাঁর শহরগুলো শত্রুদের দ্বারা ঘেরাও করা ছিল, প্রত্যেকেই একে লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছিল এবং তাঁর এলাকাগুলো দখল করতে চাইত। কিন্তু জঙ্গি কেবল নিজের এলাকা রক্ষার ওপরই সন্তুষ্ট থাকতেন না, বরং প্রতি বছর শত্রুর শহরগুলো জয় করতে থাকতেন।” [২]

ইমাদ উদ্দিন জঙ্গির উত্তরসূরিগণ:

ইমাদ উদ্দিন জঙ্গির মৃত্যুর পর তাঁর সালতানাত দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়: আলেপ্পোসহ সিরিয়ার প্রদেশগুলো তাঁর ছোট ছেলে নূর উদ্দিন মাহমুদ জঙ্গির অধীনে চলে আসে, অন্যদিকে মসুলে তাঁর বড় ছেলে সাইফ উদ্দিন গাজী স্বাধীন শাসনের দাবিদার হন। দুই দশক পর মসুলের কাছে অবস্থিত “সাপ্পার”ও আতাবেকদের একটি আলাদা স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্রে পরিণত হয়। [৩]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৫৪১ হিজরি।

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৯/ ১৩২, ১৩৩, দারুল কিতাব আল-আরাবি বৈরুত।

[৩] তারিখ ইবনে খালদুন: ৫/ ২৭৯ থেকে ২৮২, দারুল ফিকর।

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

চতুর্থ খণ্ড

নূরুদ্দীন জঙ্গী

ইমাদ উদ্দিন জঙ্গীর উত্তরসূরিদের মধ্যে নূরুদ্দীন মাহমুদ জঙ্গী তাঁর বুদ্ধিমত্তা, সাহসিকতা এবং ধর্মপরায়ণতার কারণে বিশিষ্ট ছিলেন। নূরুদ্দীন ৫৪১ হিজরিতে তাঁর সিংহাসন আরোহন থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত খ্রিস্টানদের সাথে নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। [১]

এডেসা (রোহা)-র প্রাক্তন শাসক কাউন্ট জোসেলিন দ্বিতীয় ইমাদ উদ্দিন জঙ্গীর মৃত্যুর পর সুযোগ বুঝে জমাদিউল আউয়াল ৫৪১ হিজরি (নভেম্বর ১১৪৬ খ্রিস্টাব্দ)-তে পুনরায় এডেসা দখল করে নেন। নূরুদ্দীন এই সংবাদ পাওয়া মাত্রই আলেপ্পো (হালাব) থেকে এডেসার দিকে অগ্রসর হন এবং শহরটি অবরোধ করেন। খ্রিস্টানরা প্রাণ বাঁচাতে শহরের দরজা খুলে দেয় এবং দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পালিয়ে যেতে থাকে, কিন্তু নূরুদ্দীনের বাহিনী তাদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে হত্যা করে। তবে কাউন্ট জোসেলিন প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।

এডেসার বিজয়ের আনন্দ তখন দ্বিগুণ হয়ে যায় যখন নূরুদ্দীনের ভাই সাইফ উদ্দিন গাজী সিরিয়ায় এসে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁকে আলিঙ্গন করে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ থাকার ঘোষণা দেন। [২]

দ্বিতীয় ক্রুসেড: ৫৪২ হিজরি (১১৪৭ খ্রিস্টাব্দ)

সিরিয়ার খ্রিস্টান পাদ্রিরা ইউরোপে পৌঁছে পোপকে মুসলমানদের এই বিজয়ের কাহিনী শোনাতে ইউরোপে যেন আগুন লেগে যায়। মিশাউড লিখেছেন:

“খ্রিস্টান প্রতিনিধিদের বর্ণনা শুনে পোপের চোখে পানি চলে আসে। এডেসার বিপদ এবং জেরুজালেমের ওপর আসন্ন বিপদের অনুভূতি সবার মধ্যে দুঃখ ও ভয়ের সৃষ্টি করে। সমগ্র ইউরোপে আতঙ্ক ও ত্রাসের হাহাকার পড়ে যায়।”

সেন্ট বার্নার্ড নামক এক পাদ্রি জনগণকে উত্তেজিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ৫৪১ হিজরি (১১৪৬ খ্রিস্টাব্দ)-তে ফ্রান্সের ভেজেলে শহরে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে সেন্ট বার্নার্ডের জোরালো বক্তৃতা এক হলস্থূল সৃষ্টি করে। ফ্রান্সের রাজা সপ্তম লুই এবং জার্মানির রাজা তৃতীয় কনরাড সেন্টের হাত থেকে ক্রুশ গ্রহণ করে সেনাবাহিনী প্রস্তুত করেন এবং অসংখ্য মানুষ ক্রুসেডের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। মিশাউড লিখেছেন:

“গ্রামগুলো জনশূন্য এবং দুর্গগুলো খালি হয়ে গেল। এতিম ও বিধবা ছাড়া আর কেউ অবশিষ্ট রইল না।” [৩]

[১] তারিখ ইবনে খালদুন: ৫/২৭৯, ত. দারুল ফিকর

[২] মুফাররিজুল কুরুব ফি আখবারি বানি আইয়ুব, ইবনে ওয়াসিল: ১/১১১, ত. আল-আমিরিয়া কায়রো

[৩] হায়াতে সালাহউদ্দীন আইয়ুবী, সিরাজ উদ্দিন আহমদ, পৃ. ৭৮

মুসলিম উন্মাহর ইতিহাস

চতুর্থ খণ্ড

দামেস্ক অবরোধ:

৫৩২ হিজরি (১১৪৭ খ্রিস্টাব্দ) সালে ফ্রান্সের রাজা লুই সপ্তম-এর নেতৃত্বে চার লক্ষ ফরাসি সৈন্য ইউরোপ থেকে এশিয়া মাইনরে পৌঁছে সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। অন্যদিকে জার্মানির রাজা কনরাড তৃতীয় কনস্টান্টিনোপল থেকে সমুদ্রপথ অবলম্বন করে সিরিয়ার উপকূলীয় শহর এক্কা-তে পৌঁছে যান। এই দুই রাজা জেরুজালেমে এসে একত্রিত হন। এখন যুদ্ধের পরিকল্পনা শুরু হলো। ইউরোপের রাজারা জেরুজালেমের রাজা বাল্ডউইন দ্বিতীয়-এর সাথে পরামর্শ করে সবার আগে দামেস্ক জয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন।

দামেস্কের আমিরদের সাথে খ্রিস্টানদের শান্তি চুক্তি ছিল কিন্তু ক্রুসেডার বাহিনী তার কোনো তোয়াক্কা করেনি। শহরের দক্ষিণ দিকের প্রাচীর গত ক্রুসেডীয় আক্রমণগুলোতে বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তবে শহরের বাগানের ঘন বিন্যাস একে একদিক থেকে সুরক্ষিত করে রেখেছিল। এই নাজুক মুহূর্তে দামেস্কের আমিররা অত্যন্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। দামেস্কের নায়েব হাকেম মুঈনুদ্দিন আনজ নিজের শহর রক্ষার জন্য সাইফউদ্দিন গাজীকে সাহায্যের জন্য ডাকেন। সাইফউদ্দিন গাজী আলেপ্পো থেকে নুরুদ্দিন জঙ্গিকে সাথে নিয়ে হিমস পৌঁছান এবং ক্রুসেডার বাহিনীর মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হন।

মুসলিম শাসকদের এই ঐক্য, প্রবল প্রতিরোধ এবং দামেস্কের শাসকের রাজনৈতিক কৌশলের কারণে ক্রুসেডাররা এমনভাবে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে যে, দীর্ঘ সময় অবরোধ ও সংঘর্ষের পর তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। [১]

ক্রুসেডারদের ফিরে যাওয়ার পরও নুরুদ্দিন জঙ্গির অভিযান থেমে থাকেনি। মহররম ৫৪৫ হিজরি (মে ১১৫০ খ্রিস্টাব্দ) সালে সুলতান আলেপ্পোর উত্তরে কাউন্ট জোসেলিনের গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ আজাজও জয় করে নেন। এই অভিযানে জোসেলিন নিজেও বন্দি হন এবং নয় বছর বন্দি থাকার পর জেলেই মৃত্যুবরণ করেন। [২]

দামেস্কের ওপর নুরুদ্দিনের দখল:

মোসলে নুরুদ্দিন জঙ্গির ভাই সাইফউদ্দিন গাজী জমাদিউল আখিরা ৫৪৪ হিজরি (অক্টোবর ১১৪৯ খ্রিস্টাব্দ) সালে ইন্তেকাল করেন এবং তার স্থলাভিষিক্ত হন কুতুবউদ্দিন মওদুদ। নুরুদ্দিন এবং মওদুদের মধ্যে কিছুদিন রাজনৈতিক বিরোধ চলেছিল কিন্তু এখন উভয়ের সম্পর্ক উন্নত হয়েছিল। সুতরাং নুরুদ্দিনের জন্য দামেস্ক দখলের এর চেয়ে ভালো সুযোগ আর হতে পারত না।

দামেস্কের সরকার তখন এতটাই দুর্বল ছিল যে খ্রিস্টানরা যেকোনো সময় শহর আক্রমণ করতে পারত। যদিও বাহ্যিকভাবে দামেস্কের শাসক নিজের আত্মরক্ষার জন্য ফরাসিদের সাথে সন্ধি করে রেখেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও আশেপাশের এলাকাগুলোতে তাদের লুটতরাজ অব্যাহত ছিল। এই পরিস্থিতি দেখে সফর ৫৪৯ হিজরি (এপ্রিল ১১৫৪ খ্রিস্টাব্দ) সালে নুরুদ্দিন জঙ্গি দামেস্ক অবরোধ করেন। দামেস্কের শাসক মুজিরুদ্দিনের প্রতিরোধের শক্তি ছিল না এবং তার নায়েব মুঈনুদ্দিন আনজ, যিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে শাসন পরিচালনা করছিলেন, পাঁচ বছর আগেই ইন্তেকাল করেছিলেন। তাই দামেস্ক খুব সহজেই নুরুদ্দিন জঙ্গির দখলে চলে আসে। [৩]

[১] কিতাবুর রওজাতাইন ফি আখবারিদ দাওলাতাইন লি আবি শামাহ আল-মাকদিসি (মৃত ৬৬৫ হিজরি): খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৩২, ত. আর-রিসালাহ।

[২] কিতাবুর রওজাতাইন: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৩৫; আল-কামিল ফিত-তারিখ: খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৫৩৩, ৫৩৫।

[৩] আল-কামিল ফিত-তারিখ: খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৫৩৩, ৫৩৯।

নূরুদ্দীন জঙ্গী ও মিসরের উবাইদী সরকার:

মিসর তখন বনু উবাইদের দখলে ছিল। এই বংশ সেখানে আড়াইশ বছর ধরে শাসন করছিল। এর প্রতিষ্ঠাতা উবাইদুল্লাহ তৃতীয় হিজরি শতাব্দীর শেষভাগে উত্তর আফ্রিকার এক বিশাল এলাকায় তার সমর্থকদের জাল বিস্তার করেছিলেন, তার দাওয়াত অসংখ্য মানুষকে প্রভাবিত করেছিল। তিনি মাহদী হওয়ার দাবি করে ২৯৭ হিজরিতে (৯১১ খ্রিষ্টাব্দ) ফাতেমী খিলাফত নামে একটি নতুন খিলাফতের ভিত্তি স্থাপন করেন, যা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদার সাথে সাংঘর্ষিক আকিদা পোষণ করার পাশাপাশি মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ আব্বাসীয় খিলাফতের সমান্তরাল বরং তার বিরোধী ছিল। বনু উবাইদ শুরুতে জোর-জবরদস্তি ও নির্যাতনের মাধ্যমে তাদের প্রত্যেক বিরোধীকে নির্মমভাবে দমন করে, অসংখ্য সুন্নি ফকিহ ও আলেমকে হত্যা করায় এবং জনগণের প্রতিরোধের স্পৃহাকে পুরোপুরি স্তিমিত করে দেয়। দুই শতাব্দী পর্যন্ত তাদের দাপট ও প্রভাব মানুষের ওপর ছেয়ে ছিল। এরপর আরাম-আয়েশ, অগাধ সম্পদ ও সচ্ছলতা ধীরে ধীরে বনু উবাইদকে অলস ও আরামপ্রিয় করে তোলে এবং শেষ পর্যন্ত উবাইদী খলিফারা শাসনের সমস্ত কাজ উজিরদের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজেরা কেবল ভোগ-বিলাসে মগ্ন হয়ে পড়েন। উজিরদের স্বেচ্ছাচারিতা অল্প সময়ের মধ্যেই সরকারকে দুর্বল করে দেয়।

পঞ্চম হিজরি শতাব্দীর মাঝামাঝি এই নাজুক সময়ে আমরা মধ্যপ্রাচ্যের মোহনায় চারটি শক্তিকে সামনে আসতে দেখি: একদিকে ছিল উপকূলীয় সিরিয়া ও আল-কুদস দখলকারী খ্রিষ্টানরা, অন্যদিকে ছিল কনস্টান্টিনোপলের কায়সার, তৃতীয় দিকে ছিল সিরিয়ার সাহসী শাসক নূরুদ্দীন জঙ্গী। চতুর্থ শক্তি ছিল মিসর, যা তখন সামরিক দিক থেকে ওই দুই শক্তির তুলনায় দুর্বলতর কিন্তু আর্থিক দিক থেকে শ্রেষ্ঠ ছিল।

নূরুদ্দীন জঙ্গীর সামনে প্রথম লক্ষ্য ছিল উপকূলীয় সিরিয়া ও বায়তুল মুকাদ্দাসকে খ্রিষ্টানদের থেকে মুক্ত করা। তাই তিনি কায়সারে রোমের সাথে জড়ানো আপাতত কৌশলের পরিপন্থী মনে করতেন। ফলে এই মুজাহিদ কায়সারে রোমের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য এক অদ্ভুত রাজনৈতিক কৌশল অবলম্বন করেন। কনস্টান্টিনোপল থেকে সিরিয়ার সীমান্তের দিকে আসার স্থলপথটি আমেনীয়দের খ্রিষ্টান রাষ্ট্রের মধ্য দিয়ে আসত। নূরুদ্দীন আমেনীয় শাসককে নিজের করদ রাজ্যে পরিণত করে খ্রিষ্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ এই এলাকাগুলো তাকে দান করেন। এর সুবিধা এই হলো যে, কায়সারের জন্য এখন সিরিয়া আক্রমণের জন্য আমেনীয়দের সাথে যুদ্ধ করা অনিবার্য হয়ে পড়ল। যখন আলেপ্পোর দরবারে এই নীতির ওপর আপত্তি তোলা হলো, তখন জঙ্গী জবাব দিলেন: “আমি তাকে তারই জাতির বিরুদ্ধে ব্যবহার করছি যাতে নিজের বাহিনীকে অবসর রেখে অন্য রণাঙ্গনে কাজে লাগাতে পারি এবং নিজের এলাকাগুলোকে রোমানদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারি।”

এই নীতি অত্যন্ত সফল হয়েছিল। ৫৬৮ হিজরিতে (১১৭৩ খ্রিষ্টাব্দ) কায়সার যখন সিরিয়া আক্রমণের জন্য অভিযান চালান, তখন সবার আগে আমেনীয় শাসক মালিহ ইবনে লাউনই তার মোকাবিলা করেন। তার সাথে নূরুদ্দীন জঙ্গীর সৈন্যরাও ছিল। এই যৌথ বাহিনী কায়সারকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে তাড়িয়ে দেয়। এরপর কায়সারে রোমের আর মুসলিম বিশ্বের দিকে অগ্রসর হওয়ার সাহস হয়নি।

[১] বনু উবাইদের শাসনের বিস্তারিত বিবরণ পূর্ণ রেফারেন্সসহ “তারীখে উম্মতে মুসলিমা তৃতীয় খণ্ড”-এ দেখা যেতে পারে।

[২] আল-কামিল ফিত-তারীখ: বছর ৫৬৮ হিজরি।

কায়সারের আক্রমণ প্রতিরোধের এই স্থায়ী ব্যবস্থা করার পর নূরুদ্দীনের আসল দৃষ্টি ছিল শামের ফরাসিদের (ক্রুসেডারদের) ওপর এবং এই দুই যুদ্ধরত শক্তির হার বা জয়ের নির্ভরতা ছিল মিসরের ওপর। নূরুদ্দীন জঙ্গী এবং শামের নাসারা (খ্রিস্টান) উভয়ই জানতেন যে, যে আগে মিসর দখল করবে সেই পুরো শামের মালিক হবে। এদিকে স্বয়ং মিসরের উবাইদী শাসকরা, যারা সে সময় তাদের উজিরদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছিল, কিছু করার সক্ষমতা রাখত না। তাই তারা নিত্যনতুন কৌশলে কখনো ফরাসিদের আবার কখনো নূরুদ্দীন জঙ্গীকে ধোঁকা দিতে থাকে।

সে দিনগুলোতে মিসরের খলিফা ছিলেন আযিদ নামক এক যুবক, অন্যদিকে শাওয়ার সাদী নামক এক চতুর আরব আমির পুরো শাসন ব্যবস্থার ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। ৫৫৮ হিজরি (১১৬৩ খ্রিষ্টাব্দে) তার সাথে সালতানাতের উজির যুরিক বিন তালাই-এর বিবাদ শুরু হয়, যার পরিণতিতে শাওয়ার উজিরকে হত্যা করে নিজেই মিসরের উজিরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই পরিস্থিতিতে শাওয়ারের রাজনৈতিক বিরোধীরা ক্ষোভে ফেটে পড়ে। তারা ‘বারকিয়া’ নামে একটি সশস্ত্র দল গঠন করে যার নেতা ছিল যিরগাম নামক এক সেনাপতি। যিরগাম কয়েক মাস পর তরবারির জোরে উজিরের কার্যালয় দখল করে শাওয়ারকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করে। যিরগাম বনু উবাইদ সালতানাতের প্রতি এতটাই বীতশ্রদ্ধ ছিল যে, সে আমির ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের বেছে বেছে হত্যা করে। এখন সে নামে মিসরের উজির হলেও বাস্তবে ছিল এই দেশের একচ্ছত্র শাসক।

শাওয়ার নিজের প্রাণ বাঁচাতে মিসর থেকে পালিয়ে নূরুদ্দীন জঙ্গী ছাড়া আর কোথাও আশ্রয় খুঁজে পেলেন না। তিনি নূরুদ্দীন জঙ্গীর কাছে আবেদন করলেন যেন তাকে মিসরের উজিরের পদ ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তিনি এই অভিযানের সমস্ত খরচ বহন করবেন এবং প্রতি বছর মিসরের আয়ের এক-তৃতীয়াংশ জঙ্গী দরবারে পেশ করবেন। এদিকে নূরুদ্দীন জানতে পারেন যে, মিসরের নতুন স্বৈরশাসক যিরগাম জেরুজালেমের নতুন বাদশাহকে মোটা অংকের কর প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার সাথে একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি করেছে।

নূরুদ্দীনের জন্য মিসর ও খ্রিস্টান শাসকদের এই ঐক্য কোনোভাবেই সহ্য করার মতো ছিল না, কারণ এই ঐক্য প্রকৃতপক্ষে শাম রাজ্যের বিরুদ্ধে গঠিত হয়েছিল। ফলে জঙ্গী শাওয়ারের প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং তার বিশ্বস্ত জেনারেল আসাদুদ্দীন শিরকুহকে তুর্কিদের একটি বাহিনী দিয়ে মিসরে পাঠান। [১]

শিরকুহ-এর মিসরে প্রথম অভিযান:

৫৫৯ হিজরির জমাদিউল আউয়াল (এপ্রিল ১১৬৪ খ্রিষ্টাব্দে) আসাদুদ্দীন শিরকুহ মিসরের দিকে রওনা হন। প্রথমে তিনি বিলবিস পৌঁছান যেখানে যিরগামের ভাই নাসিরুদ্দীন তার মোকাবিলা করেন কিন্তু পরাজিত হয়ে কায়রোর দিকে পালিয়ে যান। জমাদিউস সানির শেষ দিনগুলোতে আসাদুদ্দীন শিরকুহ কায়রোর প্রাচীরের সামনে ছিলেন। যিরগাম বাধ্য হয়ে মোকাবিলার জন্য বের হন এবং একটি সামান্য যুদ্ধের পর নিহত হন। শিরকুহ পহেলা রজব শাওয়ারকে পুনরায় মিসরের উজির নিযুক্ত করেন। শিরকুহ কয়েক দিন কায়রোর বাইরে অবস্থান করেন যাতে শাওয়ার শাম সরকারকে আয়ের এক-তৃতীয়াংশ কর দেওয়ার প্রতিশ্রুতি পূরণ করেন, কিন্তু শাওয়ার এই উপকারের বদলে জেরুজালেমের রাজা আমালরিককে আসাদুদ্দীন শিরকুহ-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মিসরে ডেকে পাঠান।

(১) আল-কামিল ফিত তারিখ: ৯/৩০৫, দারুল কিতাব আল-আরাবি বৈরুত সংস্করণ।

আমালরিক একটি বিশাল বাহিনী নিয়ে মিসরের দিকে রওনা হলেন। শিরকুহ যখন নাসারাদের আগমনের খবর পেলেন, তখন তিনি কায়রোর আশপাশ থেকে কুচ করে ‘বিলবাইস’ দুর্গে অবস্থান নিলেন এবং আমালরিক সেই দুর্গটি ঘেরাও করলেন।

নূরুদ্দীন জঙ্গী যখন এই সংবাদ পেলেন, তখন তিনি ফিরিজিদের মিসর থেকে ফিরে আসতে বাধ্য করার জন্য সিরিয়ায় তাদের সবচেয়ে শক্তিশালী দুর্গ ‘হারিম’ অবরোধ করলেন। তিন মাসের প্রচণ্ড যুদ্ধের পর অবশেষে রমজান ৫৫৯ হিজরি (আগস্ট ১১৬৪ খ্রিষ্টাব্দ) মাসে হারিম বিজিত হলো। এই যুদ্ধে দশ হাজার খ্রিস্টান নিহত এবং শত শত নাইট বন্দি হয়। এটি ছিল নাসারাদের জন্য এক বিরাট পরাজয়। নূরুদ্দীন জঙ্গী এর পরপরই বানিয়াস অবরোধ করেন। [১]

এই সংবাদগুলো বিলবাইসে শিরকুহকে অবরোধ করে রাখা নাসারাদের মনোবল ভেঙে দিল এবং তারা শিরকুহর সাথে সন্ধি করে এই সিদ্ধান্ত নিল যে, মিসরকে মিসরীয়দের জন্যই ছেড়ে দেওয়া হবে; সেখানে খ্রিস্টানরাও দখল করবে না, সিরিয়াবাসীরাও নয়। উভয় পক্ষ নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যাবে। শিরকুহ এই প্রস্তাব গ্রহণ করে দুর্গ খালি করে দিলেন। প্রস্থানের সময় একজন ইউরোপীয় অফিসার তাকে জিজ্ঞেস করল: “আপনার কি ভয় লাগছে না যে নাসারারা আপনার সাথে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে এবং আপনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে?”

শিরকুহ নির্ভীকভাবে বললেন: “আফসোস যদি তারা এমন করত, তাদের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের সূচনা হতো... তাহলে আমি তাদের এমন দশা করতাম যা দুনিয়া দেখত। আল্লাহর কসম! আমি তলোয়ার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তাম, আমাদের একজন লোকও তাদের কয়েকজনকে হত্যা না করে মরত না। আল্লাহর কসম! আমার এই সৈন্যরা আমাকে বাধা দিচ্ছিল, নতুবা আমি প্রথম দিনই তোমাদের সবার ফয়সালা করে দিতাম।”

ইউরোপীয় অফিসার ঘাবড়ে গিয়ে নিজের বুকে ত্রুশ চিহ্ন আঁকতে লাগল এবং তারপর বলল: “আমি সিরিয়ার নাসারাদের আপনার সম্পর্কে বিস্ময়কর কথা বলতে এবং আপনাকে ভয় পেতে দেখে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম যে হয়তো এটি অতিরঞ্জন। কিন্তু এখন আমি বুঝতে পেরেছি যে তারা ঠিকই বলত।”

শিরকুহ সহি-সালামতে সিরিয়ায় পৌঁছে গেলেন। এই সময়ের মধ্যে সুলতান নূরুদ্দীন নাসারাদের দুর্গ বানিয়াসও দখল করে নিয়েছিলেন। [২]

মিসরের দ্বিতীয় অভিযান:

মিসর থেকে ফেরার পর শিরকুহ সুলতান নূরুদ্দীন জঙ্গীর কাছে বারবার আবেদন করতে থাকেন যেন মিসরীয় উজির শাওয়ারকে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এবং নাসারাদের সাথে বন্ধুত্বের শাস্তি দেওয়ার জন্য সেখানে সৈন্য পাঠানো হয়। অবশেষে তিনি সুলতানকে রাজি করাতে সক্ষম হলেন।

রবিউস সানি ৫৬২ হিজরি (ফেব্রুয়ারি ১১৬৭ খ্রিষ্টাব্দ) মাসে শিরকুহ দুই হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে মিসরের দিকে রওনা হলেন। এই সময়ের মধ্যে শাওয়ার ফিরিজিদের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছিলেন, ফলে জেরুজালেমের রাজা আমালরিক তার বাহিনী নিয়ে নীল নদের পূর্ব তীরে এসে পৌঁছালেন। বনু উবাইদের বাহিনীও তার সাথে এসে যোগ দিল। ২৬ জমাদিউস সানি ৫৬২ হিজরি (১৮ এপ্রিল ১১৬৭ খ্রিষ্টাব্দ) তারিখে উভয় বাহিনী একটি খোলা ময়দানে মুখোমুখি হলো। শিরকুহ দুই হাজার সৈন্য নিয়ে দুই দেশের সম্মিলিত বাহিনীকে এমন শোচনীয় পরাজয় বরণ করালেন যে রণক্ষেত্র...

[১] তারিখ ইবনে খালদুন: ২৮৯/৫, ত. দারুল ফিকর

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ, বছর ৫৫৯ হিজরি; কিতাবুর রওজাতাইন: বছর ৫৫৯ হিজরি

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

চতুর্থ খণ্ড

...লাশের স্তুপ জমে গেল। এই যুদ্ধে শিরকুহ-এর ভ্রাতুষ্পুত্র সালাহউদ্দীন ইউসুফের যোগ্যতা ও বিচক্ষণতারও বড় ভূমিকা ছিল, যিনি সিরীয় বাহিনীর উপ-সেনাপতি ছিলেন।

শিরকুহ এরপর আলেকজান্দ্রিয়া দখল করেন, যেখানে মানুষ মিশরীয় সরকারের বাড়াবাড়ি এবং ফ্রাঙ্কদের সেই নৌবহর নিয়ে আতঙ্কিত ছিল যা যেকোনো সময় আলেকজান্দ্রিয়ার উপকূলে আক্রমণ করতে পারত। শিরকুহ আলেকজান্দ্রিয়ায় সালাহউদ্দীনকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে নিজে উচ্চ মিশরে চলে যান। তাঁর অনুপস্থিতিতে মিশরীয় ও খ্রিস্টান বাহিনী নতুন করে প্রস্তুতি নিয়ে আলেকজান্দ্রিয়া অবরোধ করে। কিন্তু সালাহউদ্দীন অত্যন্ত বীরত্বের সাথে শহরটি রক্ষা করেন এবং আড়াই মাস অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও আত্মসমর্পণ করেননি। অবশেষে শিরকুহ সালাহউদ্দীনের সাহায্যে পৌঁছে যান, যার ফলে অ্যামালরিক এবং তার মিশরীয় মিত্ররা ভীত হয়ে পড়ে এবং তারা সন্ধি করে নেয়। সন্ধি অনুযায়ী অ্যামালরিক শিরকুহকে পঞ্চাশ হাজার দিনার প্রদান করেন।

এরপর ফ্রাঙ্ক ও সিরীয় বাহিনী মিশর থেকে নিজ নিজ দেশে ফিরে যায়, কিন্তু ফ্রাঙ্করা খুব শীঘ্রই চুক্তি লঙ্ঘন করে এবং মিশরে তাদের কর্মকর্তাদের পাঠিয়ে বনু উবাইদকে করদ রাজ্যে পরিণত করে। এখন হাতেগোনা কয়েকজন খ্রিস্টান কর্মকর্তা ও সৈন্য লাঠির জোরে পুরো মিশর শাসন করছিল। তাদের অত্যাচারের সামনে কারও টুঁ শব্দ করার সাহস ছিল না। [১]

মিশরের তৃতীয় অভিযান:

মিশরীয়দের অসহায় দেখে ৫৬৪ হিজরির মহররম মাসে (অক্টোবর ১১৬৮ খ্রিস্টাব্দ) অ্যামালরিক মিশরে বিধিবদ্ধ আক্রমণ করেন। তিনি বিলবাইসের পুরো জনসংখ্যাকে হত্যা করেন এবং তারপর কায়রোর দিকে অগ্রসর হন। মিশরীয় উজির শাওয়ার অ্যামালরিককে থামানোর জন্য কায়রোর বিপরীতে অবস্থিত প্রাচীন ইসলামী শহর ফুসতাত খালি করে দিয়ে তাতে সম্পূর্ণভাবে আগুন ধরিয়ে দেন যাতে অ্যামালরিক সেখানে ঘাঁটি তৈরি করতে না পারেন। ৫৪ দিন পর্যন্ত সেখানে ধোঁয়ার মেঘ ছেয়ে ছিল। যখন আগুনের শিখা ঠান্ডা হলো, তখন আমর ইবনুল আস [রা.] -এর প্রতিষ্ঠিত শহরটি ছাইয়ে পরিণত হয়েছিল। শাওয়ারের এই বোকামিপূর্ণ কৌশল অ্যামালরিককে থামাতে পারেনি এবং তিনি কায়রো পর্যন্ত পৌঁছে যান।

খ্রিস্টানদের কায়রো অবরোধ করতে দেখে উবাইদি শাসক আদিদ তার নারীদের কিছু ছেঁড়া চুল আলেপ্পোতে নূরুদ্দীন জঙ্গীর কাছে পাঠিয়ে দেন এবং ফরিয়াদ করেন: “আমাকে সাহায্য করুন, আমার নারীদের ফ্রাঙ্কদের হাত থেকে বাঁচান। এগুলো রাজপ্রাসাদের নারীদের চুল যা আপনাকে সাহায্যের জন্য ডাকছে।”

উজির শাওয়ারও নূরুদ্দীন জঙ্গীর কাছে সাহায্য চাইতে বাধ্য হন। তিনি দোহাই দেন যে, যদি সিরিয়াবাসী সাহায্য না করে তবে মিশর কাফেরদের দখলে চলে যাবে। নূরুদ্দীন জঙ্গী আবারও শিরকুহকে সেনাবাহিনী দিয়ে মিশরে পাঠান। সালাহউদ্দীন ইউসুফ এবারও সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন কিন্তু তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও যাচ্ছিলেন। তিনি তাঁর চাচা শিরকুহকে বলেছিলেন:

“চাচাজান! আল্লাহর কসম, যদি আমাকে মিশরের রাজত্বও দেওয়া হয় তবুও আমি মিশরে যাব না। আলেকজান্দ্রিয়া অবরোধের সময় আমি যে কষ্ট সহ্য করেছি, তা আমি কখনো ভুলতে পারব না।”

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: বছর ৫৬২ হিজরি।

কিন্তু নূরুদ্দিন জেনগি জোরালো নির্দেশ দিয়ে সালাহউদ্দিনকে সাথে পাঠালেন। আগত সময় বলে দিল যে সুলতান নূরুদ্দিনের সিদ্ধান্ত একদম সঠিক ছিল। সালাহউদ্দিন যে সফরকে নিরর্থক মনে করছিলেন, সেটিই তাঁর সৌভাগ্য এবং মুসলমানদের কল্যাণের এক বড় কারণ হয়ে দাঁড়াল।

সিরীয় বাহিনীর আগমনের খবর শুনে অ্যামালরিক তার ভীরা সৈন্যদের নিয়ে চম্পট দিল। নিজের স্বার্থ হাসিল করার পর মিশরের উজির শাওয়ার আবারও অকৃতজ্ঞতার প্রমাণ দিয়ে সিরীয় আমিরদের এক ভোজসভায় আমন্ত্রণ জানিয়ে হঠাৎ হত্যার পরিকল্পনা করল। সৌভাগ্যবশত শাওয়ারের ছেলে, যে মুসলমানদের ঐক্যের বড় সমর্থক ছিল, বিষয়টি টের পেয়ে গেল এবং সে তার বাবাকে কঠোরভাবে নিষেধ করে বলল: “আপনি যদি এমন কাজ থেকে বিরত না থাকেন, তবে আমি আগেই শিরকুহকে সব বলে দেব।” শাওয়ার বাধ্য হয়ে সেই অশুভ ইচ্ছা থেকে বিরত থাকল।

কিন্তু ইতিমধ্যে শিরকুহর কাছে শাওয়ারের অসৎ উদ্দেশ্য প্রকাশ পেয়ে গিয়েছিল। তাই একদিন সালাহউদ্দিন একজন সিরীয় আমির জুরদিকের সাথে মিলে শাওয়ারকে ঘোড়দৌড়ের প্রস্তাব দিলেন। তিনজনই ঘোড়া ছুটিয়ে অনেক দূরে চলে গেলেন। এখন শাওয়ার একা ছিল। সালাহউদ্দিন ও জুরদিক তাকে ধরে মাটিতে ফেলে দিলেন এবং হেফাজতে নিলেন। ইতিমধ্যে আযিদ এই খবর পেয়ে গেলেন। তিনি শাওয়ারের ওপর এতটাই বিরক্ত ছিলেন যে শিরকুহকে অনুরোধ করলেন যেন শাওয়ারের মাথা কেটে তাঁর কাছে পেশ করা হয়। শিরকুহ তা-ই করলেন। এই ঘটনাটি ১৭ জমাদিউল আখিরা ৫৬৪ হিজরি (১৮ মার্চ ১১৬৯ খ্রিস্টাব্দ) এর। এই ঘটনায় সাধারণ মানুষ আনন্দ প্রকাশ করল কারণ তারা কেবল শাওয়ারের মাধ্যমে খ্রিস্টানদের অসহনীয় কর প্রদান থেকেই অতিষ্ঠ ছিল না, বরং শাওয়ারের হাতে ফুসতাত নগরীতে অগ্নিসংযোগের কারণেও অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ছিল। [১]

শিরকুহর উজির পদ লাভ এবং মৃত্যু:

আযিদ শাওয়ারের স্থলে শিরকুহকে নিজের উজির নিযুক্ত করলেন এবং “আল-মালিকুল মানসুর” উপাধিতে ভূষিত করলেন। কিন্তু মিশরের শাসনভার তাঁর ভাগ্যে মাত্র দুই মাস জুটেছিল। শনিবার ২২ জমাদিউল আখিরা ৫৬৪ হিজরি (২৩ মার্চ ১১৬৯ খ্রিস্টাব্দ) এই প্রখ্যাত সেনাপতি এক আকস্মিক রোগে আক্রান্ত হয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। [২]

মিশরে সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর শাসন:

আযিদ, শিরকুহর মৃত্যুর পর মিশরের উজির পদ তাঁর কোনো সঙ্গীকে দিতে বাধ্য ছিলেন। আযিদ ব্যক্তিগতভাবে সালাহউদ্দিন ইউসুফের যোগ্যতা ও বিচক্ষণতায় বেশি মুগ্ধ ছিলেন। এছাড়া তাঁর দরবারিরাও তাঁকে পরামর্শ দিয়ে বলেছিল: “আপনি যদি ইউসুফকে উজির বানান, তবে তিনি সব দিক থেকে আমাদের অনুগত থাকবেন, কারণ সিরীয় আমিরদের মধ্যে তিনি বয়সে সবচেয়ে ছোট।”

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: বছর ৫৬৪ হিজরি

[২] আল-মুনতাজাম লি ইবনিল জাওযি: বছর ৫৬৪ হিজরি

এই পরামর্শের পর আযিদ সালাহউদ্দীনকে উজির নিযুক্ত করে ‘الملك الناصر’ (আল-মালিকুন নাসির) উপাধি প্রদান করেন। [১]

এখান থেকেই সালাহউদ্দীনের সেই ক্ষমতার যুগ শুরু হয় যা দিন দিন উন্নতি করতে থাকে, এমনকি আল্লাহ বাইতুল মুকাদ্দাসের মুক্তি এবং তৃতীয় ক্রুসেডে ইউরোপীয় শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে আলম-ই-ইসলামের প্রতিরক্ষার কাজ এই মর্মে মুজাহিদকে দিয়েই করিয়ে নেন।

নূরুদ্দীন জঙ্গীর ওফাত:

সুলতান নূরুদ্দীন মাহমুদ জঙ্গী, যিনি শরীয়ত ও সুন্নাহর বাগান সেচ করে আবারও বিগত যুগের আদর্শ মুসলিম শাসকদের স্মৃতি সতেজ করে দিয়েছিলেন, কয়েক মাস পর্যন্ত খুনাক (ডিপথেরিয়া) নামক যন্ত্রণাদায়ক রোগে আক্রান্ত থাকার পর অবশেষে ১১ শাওয়াল ৫৬৯ হিজরিতে এই নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। [২]

নূরুদ্দীন জঙ্গীর সীরাতে কিছু ঈমানদীপ্ত দিক:

মৃত্যুর মাত্র দশ দিন আগে তিনি একজন বিশ্বস্ত আমিরের সাথে জীবনের নশ্বরতা এবং মৃত্যুর হাকীকত নিয়ে আলোচনা করছিলেন। আমির আরজ করলেন: “জানি না আমরা আগামী বছর আবার দেখা করতে পারব কি না?”

সুলতান জঙ্গী বললেন: “এমন বলো না। পবিত্র সেই সত্তা যাঁর জানা আছে যে আমরা আগামী মাসেও দেখা করতে পারব কি না।” [৩]

এই আলোচনার একাদশ দিনে সুলতান জঙ্গী মৃত্যু আহবানে সাড়া দেন।

হৃদয়ের ব্যাকুলতা এমন ছিল যে, নাসারাদের (খ্রিস্টানদের) অপরাজেয় কেন্দ্র হারিম আক্রমণের সময় তিনি অস্থির হয়ে একা একটি টিলায় আরোহণ করেছিলেন। সেখানে সিজদায় মাথা রেখে ব্যাকুলভাবে মুখমণ্ডল মাটিতে ঘষতে থাকেন। মুখ দিয়ে বলছিলেন: “ইয়া আল্লাহ! এই হলো তোমার বান্দা আর এরা হলো তোমার বন্ধু। ইয়া আল্লাহ! এই হলো তোমার বান্দা আর ওরা হলো তোমার শত্রু। সুতরাং তুমি তোমার বন্ধুদের তোমার শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য করো। এই ফালতু মাহমুদ মাঝখানে কোথা থেকে এলো? ইলাহী! চাইলে মাহমুদের সাহায্য করো না কিন্তু তোমার দীনকে তো সাহায্য করো। মাহমুদ কুকুরের কী এমন মর্যাদা যে তাকে সাহায্য করা হবে।”

উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যদি আমি আমার আমলের কারণে সাহায্যের যোগ্য না হই, তবে আমার কারণে মুসলমানদের বঞ্চিত করো না। [৪]

যখন ফরাসিরা মিশরের দমিয়াত শহর আক্রমণ করেছিল, তখন সিরিয়ায় নূরুদ্দীনের অস্থিরতা চরমে পৌঁছেছিল। যখন সালাহউদ্দীন আইয়ুবী শত্রুকে পিছু হটতে বাধ্য করলেন, তখন সেই রাতেই দামেস্কের এক মসজিদের ইমাম স্বপ্নে حضور اکرم ﷺ -এর যিয়ারত লাভ করেন। আপনি ﷺ বললেন: “নূরুদ্দীনকে বলে দাও যে আজ রাতে ফরাসিরা দমিয়াত থেকে ফিরে গেছে।”

ইমাম স্বপ্নেই আরজ করলেন: “আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন কোনো নিদর্শন বলে দিন যাতে তিনি আমার কথা বিশ্বাস করতে পারেন।” حضور اکرم ﷺ ইরশাদ করলেন: “নিদর্শন হলো এই যে, তিনি হারিমের টিলায় সিজদাবনত অবস্থায় বলছিলেন: ইলাহী! মাহমুদের সাহায্য করো না কিন্তু তোমার দীনকে সাহায্য করো। মাহমুদ কুকুরের কী এমন মর্যাদা যে তাকে সাহায্য করা হবে।”

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৫৬৩ হিজরি

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৫৬৯ হিজরি

[৩] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৫৬৯ হিজরি

[৪] কিতাবুর রওজাতাইন ফি আখবারিদ দাওলাতাইন: ১/ ৪১৯, ৪২০, ত. মুআসসাসাতুর রিসালাহ

তারিখে উন্মতে মুসলিমা

চতুর্থ খণ্ড

এটি ছিল তাহাজ্জুদের সময়। ইমাম সাহেব ঘুম থেকে জেগে সরাসরি মসজিদে চলে এলেন। নূরুদ্দীন জেনগি প্রতিদিন এই সময়ে মসজিদে এসে সুবহে সাদিক পর্যন্ত নফল নামাজ আদায় করতেন। কিছুক্ষণ পর তিনি চলে এলেন। ইমাম সাহেব স্বপ্নটি শোনালেন কিন্তু তাতে ‘কুকুর’ শব্দটি পুনরায় বলার সাহস পেলেন না। তখন জেনগি বললেন: “আমাকে পুরো বিষয়টি শোনাও।” ইমাম সাহেব ইতস্তত করতে থাকলেন কিন্তু পরে জেনগির তীব্র পীড়াপীড়িতে পুরো কথাগুলো পুনরায় বললেন এবং নূরুদ্দীনের অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। [১]

সুলতান জেনগি মুসলিম বিশ্বের সেই গুটিকয়েক নেতাদের একজন ছিলেন যাদের চরিত্রে প্রথম যুগের মুসলমানদের ঝলক সুস্পষ্ট ছিল। নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন দিনের অশ্বারোহী এবং রাতের ইবাদতকারী। দীর্ঘদেহী, শ্যামবর্ণ, প্রশস্ত ললাট এবং আকর্ষণীয় অবয়বের অধিকারী এই মুজাহিদ ছিলেন শরাফত ও মহানুভবতার মূর্ত প্রতীক। তাঁর দৃষ্টিতে কোনো বিজয়ীর ত্রোধ ছিল না, আর না তাঁর অভিব্যক্তিতে ছিল কোনো দিগ্বিজয়ীর অহংকার। প্রত্যক্ষদর্শীরা তাঁর আচরণে মমতা ও মাধুর্য মিশে থাকতে দেখত।

চেহারা প্রাকৃতিকভাবেই প্রায় দাড়িহীন ছিল। কেবল চিবুকে অল্প কিছু চুল ছিল যা গান্ধীর্ষ ও সহনশীলতার এই মূর্ত প্রতীকের ওপর বেশ মানানসই লাগত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তির অবস্থা এমন ছিল যে, বড় বড় আমিররা দরবারে নির্বাক হয়ে থাকতেন। শত্রু শত শত মাইল দূরে থাকলেও জেনগির নামে থরথর করে কাঁপত।

সেই যুগে সুলতান জেনগির সালতানাত কয়েকটি বড় ইসলামী সালতানাতের মধ্যে অন্যতম ছিল। সিরিয়া ছাড়াও হারামাইন শরীফাইনের খুতবায় সুলতানের নাম নেওয়া হতো। শেষ বছরে ইয়েমেনে তুরান শাহের দখলের পর যখন সেখানে আব্বাসী খলিফাদের খুতবা শুরু হলো, তখন সুলতানের নামও তাতে অন্তর্ভুক্ত করা হলো। প্রকৃতপক্ষে এই দরবেশসুলভ শাসক সকল মুসলমানের হৃদয়ে রাজত্ব করতেন। প্রতিটি মসজিদে এবং প্রতিটি ঘরে তাঁর জন্য দিনরাত দোয়া করা হতো। বীরত্বের অবস্থা এমন ছিল যে, যুদ্ধগুলোতে নিজে অগ্রণী হয়ে অংশগ্রহণ করতে এবং হাতাহাতি লড়াই করতেও দ্বিধাবোধ করতেন না। ইসলামের এই সন্তান হাতে দুটি ধনুক নিয়ে এবং কোমরে দুটি তুণ বেঁধে শত্রুর ওপর তীরের বৃষ্টি বর্ষণ করে যেতেন। [২]

আল্লামা ইবনুল আসির আল-জাযারি রহমাতুল্লাহ সুলতানের গুণাবলির স্বীকৃতি দিয়ে এমনকি এও বলেছেন: “আমি অতীত বাদশাহদের মধ্যে খুলাফায়ে রাশেদিন এবং উমর ইবনে আবদুল আজিজ ছাড়া নূরুদ্দীন মাহমুদের চেয়ে উত্তম চরিত্রের অধিকারী এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট আর কোনো শাসককে পাইনি।”

এছাড়াও আল্লামা ইবনুল আসির বলেন: “তিনি রাতে অধিক পরিমাণে নফল নামাজ পড়তেন। তাতে জিকির ও অজিফার ইহতিমাম করতেন... তিনি ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ-এর মাযহাব অনুযায়ী ফিকহ সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত ছিলেন... হাদিসে পাক অন্যদের থেকে শুনতেন এবং সওয়াবের নিয়তে নিজেও শোনাতে।” [৩]

[১] মুফাররিজুল কুরুব ফি আখবারি বানি আইয়ুব: ১/১৮২, ত. আল-আমিরিয়াহ

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: সন ৫৬৯ হিজরি

[৩] আল-কামিল ফিত তারিখ: সন ৫৬৯ হিজরি

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

মরহুম সুলতানের যুহুদ-এর অবস্থা এমন ছিল যে, তিনি বাইতুল মাল থেকে কেবল প্রয়োজন অনুযায়ী ভাতা গ্রহণ করতেন। তাঁর স্ত্রী এক মহীয়সী নারী খরচের সংকীর্ণতার অভিযোগ করলে তিনি হিমস-এ নিজের মালিকানাধীন তিনটি দোকান তাঁর নামে করে দেন, যেখান থেকে বার্ষিক ২০ দিনার পাওয়া যেত। কিছুকাল পর স্ত্রী পুনরায় অবস্থার সংকীর্ণতার অভিযোগ করলে সুলতান বললেন:

“আমার কাছে যা আছে তা কেবল এটাই। বাকি যা কিছু আমার হাতে আছে তা মুসলমানদের সম্পদ, আমি কেবল তার কোষাধ্যক্ষ। তোমার খাতিরে খিয়ানত করে আমি জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে চাই না।”

এই মর্যাদা এবং এই গুণাবলি থাকা সত্ত্বেও জিহাদে নিজের প্রাণ বিলিয়ে দেওয়ার অনুভূতি এতটাই প্রবল ছিল যে, কোনো দ্বিধা ছাড়াই শত্রুর ব্যুহতে ঢুকে পড়তেন। একদিন ফকিহ কুতুব নিশাপুরী বললেন: “আল্লাহর দোহাই! নিজেকে বিপদে ফেলবেন না। আপনার কিছু হয়ে গেলে মুসলমানদের শত্রুর তলোয়ার থেকে বাঁচানোর কেউ থাকবে না।”

এ কথা শুনে সুলতান নুরুদ্দিন মাহমুদ তিক্ত স্বরে বললেন: “মাহমুদ কে যে তার ব্যাপারে এমন কথা বলা হচ্ছে? আমার মাধ্যমে এই শহরগুলো এবং ইসলামী নিদর্শনসমূহ কে রক্ষা করছেন? কেবল সেই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই।” [১]

ইসলামের এই বীর সন্তান ৫৮ বছর বয়সে ১১ শাওয়াল ৫৬৯ হিজরিতে ইহকাল ত্যাগ করেন।

নুরুদ্দিন জঙ্গির পর মিশরের নায়েবে হাকাম সালাহউদ্দিন আইয়ুবি জিহাদের মশাল প্রজ্বলিত রাখার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন এবং মিশর ও শামকে ঐক্যবদ্ধ করে ত্রুসেডারদের বিরুদ্ধে এক বিশাল শক্তি গড়ে তোলার দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করেন। [২]

আল-মালিকুস সালিহ ইসমাইল:

নুরুদ্দিন জঙ্গির অসিয়ত অনুযায়ী তাঁর অল্পবয়স্ক পুত্র আল-মালিকুস সালিহ ইসমাইল সিংহাসনে আরোহণ করেন। তবে তিনি ছিলেন অনভিজ্ঞ এবং দুর্বল। রাজকীয় আমিরগণ তাঁকে পুতুলের মতো ব্যবহার করে নিজেদের স্বার্থ হাসিলের চেষ্টা করতে থাকেন। তাঁরা আল-মালিকুস সালিহকে সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবির বিরুদ্ধে উসকে দিয়ে শাম ও মিশরের সরকারের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি করেন। কয়েক বছর ধরে এই দ্বন্দ্ব চলতে থাকে, যাতে সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবি বিজয়ী হন এবং আল-মালিকুস সালিহ-এর শাসন আরও দুর্বল হয়ে পড়ে।

আল-মালিকুস সালিহ গুরুতর অসুস্থ হয়ে ২৫ রজব ৫৭৭ হিজরি (৪ ডিসেম্বর ১১৮১ খ্রিষ্টাব্দ) ইহকাল ত্যাগ করেন। এই যুবক আলেপ্পোবাসীর হৃদয়ে রাজত্ব করতেন। তাঁর প্রতি তাদের ভালোবাসা এমন ছিল যে, তারা তাঁর জন্য সুলতান সালাহউদ্দিনের বিরুদ্ধে লড়তেও প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। ঐতিহাসিকগণ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি মদ্যপান, অশ্লীলতা ও পাপাচার থেকে অনেক দূরে ছিলেন। আল্লামা ইবনুল আসির আল-জাযারি (রহ.)-এর বর্ণনা হলো:

“তিনি ছিলেন ধৈর্যশীল ও দানশীল, কারো প্রতি জুলুম, শ্লীলতাহানি এবং কটু কথা বলা থেকে মুক্ত ছিলেন।” [৩]

[১] আল-কামিল ফিত-তারিখ: বছর ৫৬৯ হিজরি; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: বছর ৫৬৯ হিজরি; কিতাবুর রওজাতাইন ফি আখবারিদ দাওলাতাইন: বছর ৫৬৯ হিজরি।

[২] সালাহউদ্দিন আইয়ুবির বিস্তারিত বিবরণ সামনে আইয়ুবি সালতানাতের অধীনে আসবে।

[৩] আল-কামিল ফিত-তারিখ: বছর ৫৭৭ হিজরি।

উম্মতে মুসলিমার ইতিহাস (চতুর্থ খণ্ড)

হাফিজ ইবনে কাসীর রহমাতুল্লাহ বলেন:

“তিনি সেই বাদশাহদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা অত্যন্ত পবিত্র হিসেবে গণ্য হন, কেউ যদি তার পিতার মতো চরিত্রে সজ্জিত হন তবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।” [১]

আল-মালিকুস সালিহ-এর ইন্তেকালের পর মসুলের শাসক ইজ্জুদীন মাসউদ হালবের নতুন শাসক হন। তার পক্ষ থেকে এখানে ইমাদুদ্দীন সানি শাসন করতে শুরু করেন। [২]

জঙ্গি বংশের শাসকরা এক নজরে:

আতাবেগ বংশ মূলত ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে ইমাদুদ্দীন জঙ্গি এবং নুরুদ্দীন জঙ্গির জিহাদের কারণে খ্যাতি লাভ করে। নুরুদ্দীন জঙ্গির পর জিহাদের নেতৃত্ব সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবী এবং তার উত্তরসূরিদের কাছে চলে যায়, যদিও আতাবেগ পরিবার এরপর মসুল, সিনজার এবং আল-জাজিরার কিছু শহরে সপ্তম হিজরি শতাব্দী পর্যন্ত শাসন করতে থাকে কিন্তু তাদের রাজনৈতিক গুরুত্ব অনেক কমে গিয়েছিল।

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: সন ৫৭৭ হিজরি।

নোট: ‘দাস্তান-ই-ঈমান ফরোশৌ কি’-এর লেখক তাকে একজন পবিত্র মানুষ এবং মদ্যপায়ী ও ব্যভিচারী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সীমা তো এই যে, তার মৃত্যুর কারণও মদ্যপান হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। অথচ এই ধর্মপ্রাণ যুবক এক ফোঁটা মদ পান করার চেয়ে মৃত্যুকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। আল্লামা ইবনুল আসীর রহমাতুল্লাহ লিখেছেন:

“যখন তার রোগ বেড়ে গেল তখন চিকিৎসকরা তাকে ওষুধ হিসেবে মদ পানের পরামর্শ দিলেন, তিনি বললেন: যতক্ষণ পর্যন্ত আলেমদের থেকে ফতোয়া না নেব ততক্ষণ পান করব না। একজন ফকিহ তাকে এমন অবস্থায় এর বৈধতার ফতোয়া দিলেন, তখন তিনি ফকিহকে বললেন: বলুন যদি মৃত্যু নির্ধারিত হয়ে থাকে তবে কি মদ পান করলে তা টলে যাবে? তিনি বললেন না। আল-মালিকুস সালিহ বললেন: তবে আমি হারাম বস্তু ব্যবহার করে আল্লাহর সামনে যেতে চাই না।” (আল-কামিল ফিত তারিখ: সন ৫৭৭ হিজরি)

সুতরাং আল-মালিকুস সালিহ-এর ওপর এ ধরনের অপবাদ ও মিথ্যাচারের কোনো ভিত্তি নেই।

[২] তারীখে ইবনে খালদুন: খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৩০৩, ত: দারুল ফিকর।

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

আতাবেক শাসকদের তালিকা

শাসকের নাম শাসনের শুরু সমাপ্তি কেন্দ্রীয় অঞ্চল বিশেষ কথা

মোসুল ও হালবের আমিরগণ

১. ইমাদ উদ্দিন জঙ্গি ৫২১ হিজরি ৫৪১ হিজরি মোসুল, হালব আতাবেক শাসনের ভিত্তি স্থাপন করেন, ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করেন।

হালবের আমিরগণ

১. নূর উদ্দিন জঙ্গি বিন ইমাদ উদ্দিন ৫৪১ হিজরি ৫৬৯ হিজরি হালব, দামেস্ক ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদ অব্যাহত রাখেন, নতুন এলাকা জয় করেন।

২. আল-মালিকুস সালিহ বিন নূর উদ্দিন ৫৬৯ হিজরি ৫৭৭ হিজরি হালব সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সাথে সংঘাত।

মোসুলের আমিরগণ

১. সাইফ উদ্দিন গাজি বিন ইমাদ উদ্দিন ৫৪১ হিজরি ৫৪৪ হিজরি মোসুল দ্বিতীয় ক্রুসেড যুদ্ধে নিজের ভাই নূরুদ্দিন জঙ্গিকে সাহায্য করেন।

২. কুতুব উদ্দিন মওদুদ বিন ইমাদ উদ্দিন ৫৪৪ হিজরি ৫৬৫ হিজরি মোসুল শুরুতে নিজের ভাই নূরুদ্দিনের প্রতিদ্বন্দ্বী, পরে মিত্র।

৩. সাইফ উদ্দিন গাজি দ্বিতীয় ৫৬৫ হিজরি ৫৭৬ হিজরি মোসুল সুলতান আইয়ুবীর প্রতিদ্বন্দ্বী।

৪. ইজ্জ উদ্দিন মাসুদ বিন মওদুদ ৫৭৬ হিজরি ৫৮৯ হিজরি মোসুল, হালব শুরুতে সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর প্রতিদ্বন্দ্বী, পরে মিত্র।

৫. নূর উদ্দিন আরসালান শাহ ৫৮৯ হিজরি ৬০৭ হিজরি মোসুল

তারীখে উম্মতে মুসলিমা

৬. ইজ্জুদ্দীন মাসউদ সানি | ৬০৭ হি. | ৬১৫ হি. | মোসেল

৭. নুরুদ্দীন আরসালান শাহ সানি | ৬১৫ হি. | ৬১৮ হি. | মোসেল

৮. নুরুদ্দীন মাহমুদ | ৬১৮ হি. | ৬৩১ হি. | মোসেল | আতাবাকান-ই-মোসেলের শেষ শাসক

৯. বদরুদ্দীন লুলু | ৬৩১ হি. | ৬৫৭ হি. | মোসেল | আতাবাকান-ই-মোসেলের শাসনের অবসান ঘটিয়ে ক্ষমতা দখল করেন। অত্যন্ত চতুর ও বুদ্ধিমান রাজনীতিবিদ।

১০. আস-সালিহ ইসমাইল বিন লুলু | ৬৫৭ হি. | ৬৬০ হি. | মোসেল | তাতারীদের হাতে পতন।

উমারা-ই-সিনজার

১. ইমাদুদ্দীন সানি বিন মওদুদ বিন ইমাদুদ্দীন জেনগি | ৫৬৬ হি. | ৫৯৩ হি. | হালাব, সিনজার | শুরুতে সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, পরে মিত্র হন।

২. কুতুবুদ্দীন মুহাম্মদ বিন ইমাদুদ্দীন সানি | ৫৯৩ হি. | ৬১৬ হি. | সিনজার

৩. ইমাদুদ্দীন শাহানশাহ বিন কুতুবুদ্দীন | ৬১৬ হি. | ৬১৮ হি. | সিনজার

৪. মাহমুদ বিন কুতুবুদ্দীন | ৬১৮ হি. | - | সিনজার | আল-মালিকুল আশরাফ আইয়ুবী বিন আল-মালিকুল আদিলের হাতে পতন।

তৃতীয় অধ্যায়

আইয়ুবী শাসকগণ এবং ক্রুসেড

৫৬৭ হিজরি থেকে ৬৪৮ হিজরি

১১৭১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২৫০ খ্রিস্টাব্দ

সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবী

৫৩২ হিজরি (১১৩৭ খ্রি.) থেকে ৫৮৯ হিজরি (১১৯৩ খ্রি.)

সালাহউদ্দীনের পৈতৃক এলাকা ছিল কুর্দিস্তান। তাঁর দাদা শাযী বিন মারওয়ান কুর্দিস্তানের ‘দুবিন’ শহর থেকে বাগদাদে এসেছিলেন। বাগদাদের প্রধান প্রশাসক ‘মুজাহিদউদ্দীন বেহরুজ’ শাযীর বন্ধু ছিলেন। তিনি শাযীকে তিকরিত দুর্গের কেল্লাদার নিযুক্ত করেছিলেন। শাযীর মৃত্যুর পর এই কেল্লাদারির দায়িত্ব তাঁর বড় ছেলে নজমউদ্দীন আইয়ুবকে ৫৩২ হিজরিতে (১১৩৮ খ্রি.) দেওয়া হয়। এই তিকরিত-এই নজমউদ্দীন আইয়ুবের ঘরে সালাহউদ্দীন আইয়ুবী জন্মগ্রহণ করেন, যাঁর নাম তখন ইউসুফ রাখা হয়েছিল।

সালাহউদ্দীনের জন্মের দিন নজমউদ্দীন আইয়ুব এবং তাঁর ভাই শিরকুহকে সরকারি চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল এবং এই পুরো পরিবার তিকরিত থেকে কোনো এক অজানা গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। নজমউদ্দীন এই অবস্থায় শিশুটিকে নিজের জন্য অশুভ মনে করেছিলেন, কারণ তাঁর আগমনে তাঁকে ঘরবাড়িহীন হতে হয়েছিল। কিন্তু তাঁর লেখক তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন: “আপনি এই শিশুর জন্মকে অশুভ মনে করছেন, কিন্তু এতে শিশুর অপরাধ কী? হতে পারে এই শিশুটি একদিন অনেক বড় ও বিখ্যাত বাদশাহ হবে।”

তিকরিত থেকে বের হয়ে নজমউদ্দীন আইয়ুব যখন মোসেলে ইমাদউদ্দীন জঙ্গির কাছে পৌঁছালেন, তখন সেখানে তাঁর অনেক কদর করা হলো। কারণ একবার নজমউদ্দীন আইয়ুব ইমাদউদ্দীন জঙ্গিকে ‘তিকরিত’ দুর্গে আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং তাঁর অনেক খাতির-যত্ন করেছিলেন। ইমাদউদ্দীন জঙ্গি যখন ৫৩৪ হিজরিতে (১১৩৭ খ্রি.) বালবাক জয় করলেন, তখন নজমউদ্দীন আইয়ুবকে সেখানকার কেল্লাদার নিযুক্ত করলেন। [১]

ইমাদউদ্দীনের মৃত্যুর পর নজমউদ্দীন আইয়ুবের ভাই শিরকুহ নূরউদ্দীন জঙ্গির দরবারের সাথে যুক্ত হন। নূরউদ্দীন জঙ্গি মানুষ চিনতে পারতেন এবং বীরদের কদর করতেন, তাই শিরকুহ খুব দ্রুত উন্নতি করে প্রধান সেনাপতি হয়ে যান। সালাহউদ্দীনও দীর্ঘ সময় নূরউদ্দীন জঙ্গির দরবারে অতিবাহিত করেন এবং তাঁর লালন-পালনে নূরউদ্দীন জঙ্গির বড় অবদান ছিল। [২]

নূরউদ্দীন জঙ্গি যখন শিরকুহকে মিশরে পাঠালেন, তখন সালাহউদ্দীনকেও তাঁর সাথে যেতে হলো। শিরকুহর পর সালাহউদ্দীন মিশরের উবাইদি শাসক আল-আদিদ-এর উজির হিসেবে নিজেকে এই পদের যোগ্য উত্তরসূরি প্রমাণ করেন। যদিও আল-আদিদ একজন কটুর ইসমাইলি শিয়া ছিলেন, কিন্তু সালাহউদ্দীন তাঁকে কখনো অভিযোগের সুযোগ দেননি। তিনি খোলা মনে জনগণের জন্য অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতেন এবং তাদের ফরিয়াদ শুনতেন।

[১] কিতাবুর রওজাতাইন ফি আখবারিদ দাওলাতাইনিন নূরিয়্যাহ ওয়াস সালাহিয়্যাহ লি-আবি শামাহ আল-মাকদিসি: ৫২৮ হিজরি, ত. মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ বৈরুত।

[২] আন-নুজুমুয যাহিরাহ ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহিরাহ, লি-জামালুদ্দীন ইউসুফ বিন তাগরি বারদি (মৃ. ৮৭৪ হি.): খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২০১, ত. দারুল কুতুব মিসর।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা | চতুর্থ খণ্ড

কী, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ইনাম ও ইকরাম এবং ইজ্জত ও সম্মানের সাথে নিজের করে নিয়েছিলেন। যদিও মিশরে সোয়া দুই শতাব্দী পর্যন্ত উবাইদি শাসনের প্রভাবে সাধারণ মানুষের মধ্যে শিয়া মতবাদের ঝোঁক তৈরি হয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও মিশরের অধিকাংশ জনসংখ্যা সুন্নিই ছিল। অনেকে কেবল সরকারি চাপের কারণে শিয়া মতবাদ প্রকাশ করত। সালাহউদ্দীন অত্যন্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে কোনো ভেদাভেদ ছাড়াই প্রতিটি শ্রেণি ও মতাদর্শের মানুষের সাথে উদার আচরণ করেন, যার ফলে সব মহলে নতুন উজিরের প্রতি সমর্থন ও আস্থা বাড়তে থাকে।

সালাহউদ্দীন সবার আগে মানুষের আকিদা ও আমল সংশোধনের দিকে মনোযোগ দেন এবং আদর্শিক মেহনতকে বেগবান করেন। দুই শতাব্দী ধরে মিশরে শাসনকারী উবাইদিদের ধর্ম সাধারণ মানুষকেও প্রভাবিত করেছিল, মানুষ সুন্নাহর নিদর্শনের পরিবর্তে বিদআতের অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের মানসিক পরিশুদ্ধির জন্য সালাহউদ্দীন আইয়ুবি জায়গায় জায়গায় দ্বীনি মাদ্রাসা কয়েম করেন।

কায়রো এবং ফুসতাতে শহরের প্রাক্তন প্রশাসকদের বাসভবনের জায়গায় দুটি খানকাহ নির্মাণ করান। সালাহউদ্দীন আইয়ুবি সেখানে ফিকহ-এ শাফেয়ির দুটি মাদ্রাসা কয়েম করেন। অনুরূপভাবে একটি বড় মাদ্রাসা ‘দারুল আদল’ নামে নির্মাণ করেন। আইয়ুবির ভাতিজা তাকিউদ্দীন উমরও কায়রোতে কিছু বাড়ি কিনে একটি শাফেয়ি মাদ্রাসা খোলেন এবং এর আয়ের জন্য সম্পত্তি ওয়াকফ করে দেন। সাধারণ মানুষের মন জয় করতে এবং তাদের মানসিক প্রশিক্ষণের জন্য আদালতগুলোতেও আহলে সুন্নাহ উলামাদের কাজী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। [১]

বনু উবাইদের কিছু আমির একজন সুন্নি উজিরের মিশরের ওপর কর্তৃত্ব সহ্য করতে পারছিল না, তাই তারা খ্রিস্টানদের মিশর আক্রমণের আমন্ত্রণ জানায় এবং অভ্যন্তরীণভাবে বিদ্রোহ করার পরিকল্পনা করে। সালাহউদ্দীন এই সংবাদ পেয়ে যান এবং তিনি এই ষড়যন্ত্রের মূল হোতা ‘তাওয়াশি’কে, যে মিশরের একজন নামকরা হাবশি কর্মকর্তা ছিল, গোপন কর্মীদের মাধ্যমে হত্যা করিয়ে দেন। কায়রোর হাবশিরা তাদের নেতার হত্যার প্রতিবাদে বিদ্রোহ করে, কিন্তু সালাহউদ্দীন অত্যন্ত দ্রুততার সাথে তা দমন করেন। এটি ৫৬৪ হিজরি (১১৬৯ খ্রিস্টাব্দ) এর ঘটনা। [২]

দমিয়াতের ওপর ফরাঙ্গিদের আক্রমণ:

মিশরে সালাহউদ্দীনের ক্ষমতা বৃদ্ধি ফরাঙ্গিদের কাছেও সহনীয় ছিল না। তাই জেরুজালেমের রাজা আমালরিক ৫৬৫ হিজরির (১১৬৯ খ্রিস্টাব্দ) শুরুতে মিশরের উপকূলীয় শহর দমিয়াতের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। তার সাহায্যের জন্য সিসিলির নৌবাহিনীও চলে আসে। সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গি যখন এই সংবাদ পেলেন, তখন তিনি একের পর এক বেশ কয়েকটি সেনাবাহিনী মিশরে পাঠান যাতে তারা ফরাঙ্গিদের মোকাবিলায় মুসলমানদের সাহায্য করতে পারে। অন্যদিকে তিনি নিজে তার বাছাইকৃত সেনাদল নিয়ে সিরিয়ার খ্রিস্টান অধিকৃত এলাকাগুলোতে অতর্কিত হামলা শুরু করেন।

দমিয়াতের অবরোধ প্রায় পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। এই সময়ে সালাহউদ্দীন আইয়ুবি এই রণাঙ্গনে যুদ্ধরত সেনাবাহিনীর জন্য অটেল অর্থ ব্যয় করেন। মুজাহিদদের দৃঢ়তা এবং আল্লাহর সাহায্যের পর গাজওয়া-এ আহজাবের মতো আবহাওয়ার পরিবর্তন...

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ, সন ৫৬৬ হিজরি

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ, সন ৫৬৪ হিজরি

তারিখ উন্মতে মুসলিমা — চতুর্থ খণ্ড

...আকারে অবতীর্ণ হলো তখন কাফেররা ময়দান ছেড়ে পালাতে বাধ্য হলো। [১]

আমালরিকের ইউরোপীয় নৌবহর যা এই যুদ্ধে মিত্র হিসেবে যোগ দিতে এসেছিল, তার পরিণতি সম্পর্কে লেন-পুল লিখেছেন:

“প্রবল বৃষ্টি ও ঝড়ের কারণে প্রায় পুরো গ্রীক নৌবহর ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং যে উপকূলে তারা জয় করতে এসেছিল, সেখানে গ্রীকদের লাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল।” [২]

এই সময়ে আমালরিক নিজের এলাকাগুলোতে সুলতান নূরুদ্দীনের আক্রমণের সংবাদও পেয়েছিলেন। তিনি বাধ্য হয়ে অবরোধ তুলে নিয়ে জেরুজালেমের দিকে রওনা হন। যুদ্ধের পরিণতি সম্পর্কে আল্লামা ইবনুল আসীর (রহ.) লিখেছেন:

“ফরাসিরা ব্যর্থ হয়ে সিরিয়ায় ফিরে গেল, তাদের হাতে কিছুই এল না। যখন তারা নিজেদের শহরে পৌঁছাল, তখন সেগুলোকে (সুলতান নূরুদ্দীন জঙ্গীর হাতে) জনশূন্য দেখতে পেল, তাদের লোকজন নিহত অথবা বন্দী হয়েছিল। তাদের ওপর এই প্রবাদটি সত্য প্রমাণিত হলো যে, ‘উটপাখি শিং খুঁজতে বের হয়েছিল কিন্তু কান হারিয়ে ফিরে এল’ (উটপাখি শিংয়ের সন্ধানে বের হয়েছিল কিন্তু যখন ফিরে এল তখন তার দুই কানও গায়েব ছিল)।” [৩]

৫৬৬ হিজরিতে (নভেম্বর ১১৭০ খ্রিষ্টাব্দ) সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবী সিরিয়ার ফরাসিদের ওপর আক্রমণাত্মক হামলা শুরু করেন। এগুলো ছিল গেরিলা হামলা যা আসকালান, রামলা এবং গাজায় সংঘটিত হয়েছিল। আমালরিক তার শহরগুলো বাঁচাতে বের হয়েছিলেন কিন্তু পরাজিত হন। তিনি কোনোমতে বন্দী হওয়া থেকে বেঁচে পালিয়ে যান। কিছুদিন পর সালাহউদ্দীন আকাবা উপসাগরের মুখে অবস্থিত খ্রিস্টানদের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ও বাণিজ্যিক বন্দর আয়লা আক্রমণ করেন। এই উদ্দেশ্যে সালাহউদ্দীন আইয়ুবী প্রকৌশলীদের এমন নৌজাহাজ তৈরির নির্দেশ দেন যা টুকরো টুকরো অবস্থায় ছিল এবং সেগুলোকে জোড়া লাগানো ও খোলা যেত। এই জাহাজগুলোকে উটের পিঠে করে আকাবা উপসাগরের পথে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে উপকূলে টুকরোগুলোকে জোড়া দিয়ে জাহাজে রূপান্তরিত করা হয় এবং স্থল ও জল উভয় দিক থেকে আক্রমণ করে আয়লার মতো অত্যন্ত সুরক্ষিত শহর খুব দ্রুত জয় করে নেওয়া হয়। [৪]

মিসর থেকে বনু উবাইদ রাষ্ট্রের অবসান:

শরয়ী আইন কার্যকর এবং দ্বীনি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পর সালাহউদ্দীনের জন্য মিসর থেকে উবাইদীদের ক্ষমতা খতম করা মোটেও কঠিন ছিল না। আব্বাসীয় খলিফা মুস্তাদি এবং সুলতান নূরুদ্দীন জঙ্গীর জোরালো তাগিদে ৫৬৭ হিজরির মুহাররম মাসের প্রথম জুমায় (সেপ্টেম্বর ১১৭১ খ্রিষ্টাব্দ) সালাহউদ্দীন আইয়ুবী বনু উবাইদের খুতবা বাতিল করে আব্বাসীয় খলিফাদের খুতবা জারি করেন। এই সংবাদে মুসলিম বিশ্বে আনন্দের ঢেউ বয়ে যায়। বাগদাদে আনুষ্ঠানিকভাবে আলোকসজ্জা করা হয়। সুলতান নূরুদ্দীন জঙ্গী, সালাহউদ্দীন...

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: সন ৫৬৫ হিজরি

[২] সালাহউদ্দীন, লেন-পুল: পৃষ্ঠা ৫৫

[৩] আল-কামিল ফিত তারিখ: সন ৫৬৫ হিজরি

[৪] আল-কামিল ফিত তারিখ: সন ৫৬৭ হিজরি

এবং মিসরের জামে মসজিদগুলোর খতিবদের জন্য খেলাত এবং কালো পাগড়ি পাঠানো হলো।

এই ঘটনার কয়েকদিন পর ১০ই মহররম বনু উবাইদের শেষ শাসক আযিদ দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে তিনি সালাহ উদ্দিন আইয়ুবিকে নিজের কাছে ডেকেছিলেন। সেই সময় তাঁর সাথে তাঁর সন্তানরা ছিল যারা নাবালেগ ছিল, ভবিষ্যতের এই মহান বিজেতার হাতে সোপর্দ করে তাদের ভালোভাবে দেখাশোনার অসিয়ত করেন। সালাহ উদ্দিন আইয়ুবি একজন ঈমানদার মুসলমানের মতো এই ওয়াদা পালন করেন এবং আযিদের সন্তানদের সবসময় বিশেষ খেয়াল রাখতেন।

আযিদের মৃত্যুতে সালাহ উদ্দিন আইয়ুবি রাজ্যের অধিপতি হিসেবে শোক পালনের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেন এবং অত্যন্ত ব্যথিত কণ্ঠে বললেন: “যদি আমি জানতাম যে তিনি এই অসুস্থতায় মারা যাবেন, তবে তাঁর জীবদশায় তাঁর খুতবা বন্ধ করতাম না।”

মোদাকথা, যিলহজ ২৯৭ হিজরিতে মরক্কোর সিজিলমাসা শহর থেকে আত্মপ্রকাশকারী উবাইদি সরকার নিজের শাসনের ২৭০ বছর পূর্ণ করে মহররম ৫৬৭ হিজরিতে একটি ঐতিহাসিক কাহিনীতে পরিণত হলো। [১]

ত্রিপোলি (লিবিয়া) পুনরুদ্ধার:

নরম্যানরা ৫৩১ হিজরিতে উত্তর আফ্রিকার বিখ্যাত শহর ত্রিপোলিকে আল-যিরি থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। তবে ৫৫৫ হিজরিতে মরক্কোর শাসক আব্দুল মুমিন পুরো উত্তর আফ্রিকা থেকে নরম্যানদের বিতাড়িত করেন যার ফলে ত্রিপোলিও মুসলমানদের হাতে ফিরে আসে। এখন এটি একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের রূপ নিয়েছিল যা সিসিলির নরম্যানদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত শক্তিশালী ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারত। তাই সালাহ উদ্দিন আইয়ুবি তাঁর সেনাপতি তাকি উদ্দিন উমরকে তাঁর গোলাম কারাকুশসহ এটি জয় করার অভিযানে পাঠান। কারাকুশ ৫৬৮ হিজরিতে (১১৭৩ খ্রিষ্টাব্দ) এই অভিযানে বের হন। তিনি তিউনিসিয়ায় বসবাসরত আরব গোত্রগুলোকে সাথে নিয়ে এক শক্তিশালী বাহিনী গঠন করেন এবং অবশেষে ত্রিপোলি দখল করে একে মিসরের অন্তর্ভুক্ত করেন। [২]

একটি বড় বিদ্রোহ:

বনু উবাইদের অনুগত আমীররা সুন্নি সরকারকে হটিয়ে পুনরায় শিয়া খেলাফত প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। তাদের মধ্যে উবাইদিদের দাঈ আদ-দুআ ইবনে আব্দুল কাবি, বনু উবাইদের কাজী আল-কুজাত ইবনে কামিল এবং উমারা নামক একজন ইয়েমেনি কবি প্রধান ছিলেন।

তারা সিরিয়ার খ্রিস্টান রাষ্ট্রসমূহ এবং সিসিলির শাসকদের মিসরে আক্রমণ করার আমন্ত্রণ জানায় এবং সিদ্ধান্ত নেয় যে যখন সরকারি বাহিনী কায়রো থেকে বের হয়ে যাবে তখন বিদ্রোহী সেনাপতিরা তাদের সৈন্যদের নিয়ে সালাহ উদ্দিনকে ঘিরে ফেলে হত্যা করবে।

কিন্তু সৌভাগ্যবশত সালাহ উদ্দিন এই ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারেন এবং সমস্ত বিদ্রোহী নেতাদের গ্রেফতার করে মৃত্যুদণ্ড দেন। এই ঘটনা রমজান ৫৬৯ হিজরি (মে ১১৭৪ খ্রিষ্টাব্দ)-এর। [৩]

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৫৬৭ হিজরি

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৫৬৮ হিজরি

[৩] কিতাবুর রওজাতাইন: ২/২৮২ থেকে ২৮৩, ত. আর-রিসালাহ; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৫৬৯ হিজরি

সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর জীবনে বিপ্লব:

সালাহউদ্দীন আইয়ুবী (রহ.) এখন ব্যবহারিক দিক থেকে মিসরের একজন স্বাধীন ও সার্বভৌম শাসক ছিলেন। তিনি কোনো বাধা-বিপত্তি ছাড়াই ধন-সম্পদের এত বিশাল স্তূপ জমা করতে পারতেন যা তাঁর সাত প্রজন্মের জন্য যথেষ্ট হতো। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে, তিনি মিসরের শাসনের মালিক হওয়ার সাথে সাথেই তাঁর মেজাজে দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ও বিমুখতার প্রবণতা সৃষ্টি হলো।

সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর জীবনে এই পরিবর্তন নিঃসন্দেহে একটি বিস্ময়কর বিষয় ছিল। ক্ষমতা নিজের সাথে ভোগ-বিলাসের এমন সব উপকরণ নিয়ে আসে যার আকর্ষণে বড় বড় মানুষের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। এই দিক থেকে সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর মেজাজের এই বিপ্লব ইতিহাসের বিরল ঘটনাগুলোর অন্যতম। এর আগে এমন উদাহরণ আমরা প্রথম শতাব্দীতে হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজীজ (রহ.)-এর জীবনে দেখতে পাই, যিনি খলিফা হওয়ার সাথে সাথেই ভোগ-বিলাস ত্যাগ করে দারিদ্র্য ও অনাহারকে নিজের ভূষণ বানিয়ে নিয়েছিলেন।

তাঁর জীবনীকার কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ (রহ.) লিখেন:

“মিসরের শাসনের লাগাম হাতে নেওয়ার পর তাঁর দৃষ্টিতে দুনিয়া তুচ্ছ হয়ে গেল। কৃতজ্ঞতার অনুভূতি তাঁর হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করল। তিনি পানাহার থেকে তওবা করলেন, ভোগ-বিলাস ও আমোদ-প্রমোদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং একটি গম্ভীর ও কঠোর পরিশ্রমী জীবন বেছে নিলেন, যা দিন দিন বৃদ্ধিই পেতে থাকল।” [১]

সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর মধ্যে এই পরিবর্তন কীভাবে এল? এর আসল কারণ তো ছিল আল্লাহর ইচ্ছা, যা পূর্ণ হওয়ার ছিল। তবে বাহ্যিক কারণগুলোর মধ্যে বড় কারণ ছিল সেই চিন্তা ও ফিকির যা শাসনক্ষমতায় বসার পর তাঁর হৃদয় ও মস্তিষ্কে ছেয়ে গিয়েছিল। তিনি এমন অপ্রত্যাশিতভাবে ক্ষমতা পেয়েছিলেন যা তাঁর কল্পনাতেও ছিল না। তিনি, যিনি স্বভাবজাত ভদ্রতা ও সৌজন্যের অলঙ্কারে সজ্জিত ছিলেন, এই অপ্রত্যাশিত নেয়ামতের ওপর কৃতজ্ঞতার আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়লেন। তিনি ভাবতে লাগলেন যে, এত বড় নেয়ামতের শুকরিয়া কীভাবে আদায় করা যায়? এই প্রশ্নের উত্তরে নবী করীম (সা.)-এর পবিত্র সীরাত, খুলাফায়ে রাশেদীনের অবস্থা এবং সালাফে সালাহীনের জীবন তাঁর সামনে একটি খোলা বইয়ের মতো ছিল।

ইসলামের এই সন্তান অনুভব করলেন যে, তাঁর সফলতা এই সফল ব্যক্তিদের পূর্ণ অনুসরণের মধ্যেই নিহিত। ফলে তিনি সেই পথেই চলার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁর বিশ্বাস হতে লাগল যে, আল্লাহ তাআলা এই নেয়ামত কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যের অধীনে তাঁকে দান করেছেন এবং এই গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য অসাধারণ ত্যাগ, কোরবানি ও সাধনার প্রয়োজন হবে।

তিনি শুরু থেকেই একজন সাহসী ও আত্মমর্যাদাশীল মানুষ ছিলেন। আল-কুদসের ওপর ক্রুসেডারদের আধিপত্য, সিরিয়ার উপকূলীয় অঞ্চলে তাদের দখলদারিত্ব এবং ইসলামী শহরগুলোতে তাদের লুটতরাজকে তিনি অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে দেখতেন। এখন যেহেতু আল্লাহর কুদরত তাঁকে নেতৃত্বের পদে আসীন করেছে, তাই তিনি উম্মাহর প্রত্যাশা পূরণের সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি অত্যন্ত অনিচ্ছার সাথে মিসরে এসেছিলেন, কিন্তু এখানে আল্লাহ তাআলা তাঁর জন্য শাসনের সিংহাসন প্রস্তুত করে রেখেছিলেন।

[১] আন-নাওয়াদিরুস সুলতানিয়া ওয়াল মাহাসিনুল ইউসুফিয়া, ইবনে শাদ্দাদ, পৃষ্ঠা ৮১, তাবা মাকতাবাতুল খানজি মিসর।

নিজের জীবনের উদ্দেশ্য চেনা:

বহু বছর পর ইসলামের এই মহান বিজেতা তার সঙ্গীদের কাছে নিজের মিশরে আসার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলেন:

“যখন আমার চাচা শিরকুহ আমাকে বললেন যে মিশরে যাওয়ার প্রস্তুতি নাও, তখন আমার মনে হলো যেন আমার হৃদয়ে একটি খঞ্জর বিদ্ধ করা হয়েছে।” [১]

একইভাবে তিনি কাজী বাহাউদ্দিন শাদ্দাদ রহ.-কে বলেছিলেন:

“আমার মিশরে আসা একেবারেই আমার সম্মতিতে ছিল না, আমার বিষয়টি ঠিক তেমনই যেমনটি কুরআন মাজিদে এভাবে বলা হয়েছে:

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

(হতে পারে যে তোমরা কোনো কিছু অপছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর)” [২]

সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর কাছে শীঘ্রই এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, কুদরতে ইলাহি তাকে কোন উদ্দেশ্যে মিশরে ডেকে এনে ক্ষমতা অর্পণ করেছেন। এই কাজটি ছিল: ‘আল-কুদস এবং অন্যান্য ইসলামি এলাকাগুলোকে খ্রিস্টানদের অবৈধ দখলদারিত্ব থেকে মুক্ত করা’। তিনি নিজেই বলেছিলেন: “যখন আল্লাহ তাআলা আমাকে মিশরের শাসনভার দান করলেন, তখন আমি বুঝতে পারলাম যে আল্লাহ তাআলা ফিলিস্তিনও আমাকে দেওয়ার ইচ্ছা করেছেন।” [৩]

এটিই ছিল সেই আবেগ ও সংকল্প যার মাধ্যমে ইসলামের এই বীর সেনানির শাসনের সূচনা হয়েছিল। সালাহউদ্দিন আইয়ুবী রহ.-এর শাসন যার ভিত্তি জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর আবেগের ওপর রাখা হয়েছিল, তা এমন এক ‘শাজরায়ে তুবা’ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছিল যাকে বড় বড় তুফানও নিজ স্থান থেকে নাড়াতে পারেনি।

নুরুদ্দিন জঙ্গীর পর:

সুলতান নুরুদ্দিনের ইন্তেকালের পর তার অল্পবয়স্ক পুত্র আল-মালিকুস সালিহ ইসমাইলকে দামেস্কে সালতানাতের আমিরদের এক সভায় নতুন বাদশাহ হিসেবে মেনে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সিরিয়ার আমিররা আল-মালিকুস সালিহের অল্প বয়স ও অনভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে, প্রত্যেকেই নিজেকে আল-মালিকুস সালিহের অভিভাবক অর্থাৎ প্রকৃত শাসক বানাতে চাচ্ছিল। এদিকে খ্রিস্টানরা সীমান্তে আক্রমণ শুরু করে দেয় এবং সিরিয়ার আমিরদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে তাদের সাথে অপমানজনক সন্ধি করতে বাধ্য করে। এই পরিস্থিতিতে সালাহউদ্দিন আইয়ুবী সিরিয়াকে খ্রিস্টানদের হাত থেকে রক্ষা করা নিজের দায়িত্ব মনে করলেন। তিনি সিরিয়ার আমিরদের কাছে পত্র লিখে খ্রিস্টানদের সাথে সন্ধির প্রতিবাদ জানালেন। সেই সাথে আল-মালিকুস সালিহকে এই নিশ্চয়তা দিলেন যে, যদি মিশরীয় বাহিনীকে সুযোগ দেওয়া হয় তবে তারা খ্রিস্টানদের শক্তি ও শৌর্যবীর্যের দস্ত চূর্ণ করে দেবে। [৪]

[১] কিতাবুর রওজাতাইন: ২/৫২, ত. আর-রিসালাহ

[২] আন-নাওয়াদিরুস সুলতানিয়াহ, পৃ. ৮১

[৩] আন-নাওয়াদিরুস সুলতানিয়াহ, পৃ. ৮১

[৪] কিতাবুর রওজাতাইন: সন ৫৬৯ হিজরি, ৫৭০ হিজরি

আলেকজান্দ্রিয়ার যুদ্ধ:

সালাহউদ্দিন আইয়ুবী দামেস্কের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার কথা ভাবছিলেন। কিন্তু সেই দিনগুলিতেই তাকে খ্রিস্টানদের এক নতুন আক্রমণের মোকাবিলা করতে হয় যা ভূমধ্যসাগরের দিক থেকে হয়েছিল। কিছুকাল আগে মিশরের যেসব বিদ্রোহী সর্দারদের হত্যা করা হয়েছিল, তারা সিরিয়া ও সিসিলির খ্রিস্টান শাসকদের মিশর আক্রমণের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। ষড়যন্ত্র ফাঁস হওয়ার খবর সিরিয়ার খ্রিস্টানরা সময়মতো পেয়ে গিয়েছিল, তাই তারা সতর্ক হয়ে যায় এবং মোকাবিলায় বের হয়নি। কিন্তু সিসিলির রাজা এই খবর পাননি। তিনি দুইশ যুদ্ধজাহাজে ৫০ হাজার সৈন্য নিয়ে জিলহজ ৫৬৯ হিজরি (জুলাই ১১৭৪ খ্রিস্টাব্দ) আলেকজান্দ্রিয়া আক্রমণ করেন। সালাহউদ্দিন আইয়ুবী নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছে শত্রুর মোকাবিলা করেন এবং সিসিলির বীরদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন।

[১]

সিরিয়া অভিযান:

যুদ্ধ থেকে অবসর নিয়ে ৫৭০ হিজরিতে সালাহউদ্দিন আইয়ুবী সিরিয়ার দিকে যাত্রা করেন এবং সেখানে সিরিয়ার আমিরদের ঐক্য ও সংহতির মাধ্যমে আল-মালিক আস-সালিহ-এর শাসন মজবুত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সিরিয়ার আমিররা আল-মালিক আস-সালিহকে এমনভাবে প্ররোচিত করে যে তিনি সালাহউদ্দিনের বিরুদ্ধেই চলে যান। এই পরিস্থিতিতে সালাহউদ্দিন সিরিয়ার রাজনীতি সংশোধন এবং একে ত্রুটিমুক্ত করার জন্য সেখানে বিশৃঙ্খল ও পতনোন্মুখ আতাবেকি সালতানাতের পরিবর্তে একটি নতুন শক্তিশালী সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত নেন, কারণ এটি ছাড়া খ্রিস্টান শক্তির মোকাবিলা করা সম্ভব ছিল না।

সিরিয়াবাসীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে পছন্দ করত, তাই দামেস্কে আমিররা সালাহউদ্দিনকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। হিমস, হামাহ এবং আরও অনেক শহরের আমিররা তার সাথে যোগ দেন। [২]

জমাদিউল আখিরা ৫৭০ হিজরি (জানুয়ারি ১১৭৫ খ্রিস্টাব্দ) সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর বাহিনী আলেপ্পো পৌঁছায়, কিন্তু আল-মালিক আস-সালিহ কোনো ধরনের আলোচনার আগ্রহ দেখাননি। আলেপ্পোবাসী প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং মিশরীয় বাহিনীকে শহরের প্রাচীরের কাছে আসতে দেয়নি।

এই সময়ে আলেপ্পোর কিছু আমির বাতেনি নেতাদের মোটা অংকের অর্থ দিয়ে সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর ওপর প্রাণঘাতী হামলা করায়, যা সৌভাগ্যবশত সফল হয়নি। এরপর আলেপ্পোর আমিররা ক্রুসেডারদের সাহায্যের জন্য ডেকে পাঠায়, যার ফলে সালাহউদ্দিনকে আলেপ্পো থেকে প্রস্থান করতে হয়। সালাহউদ্দিন আইয়ুবী যখন দেখলেন যে আল-মালিক আস-সালিহ একজন অকেজো ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছেন, যিনি নির্লজ্জ আমির এবং স্বার্থান্বেষী দরবারীদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছেন, তখন তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং নিজের নামে মুদ্রা জারি করে আনুষ্ঠানিকভাবে সুলতানের মর্যাদা গ্রহণ করেন।

এখন আল-মালিক আস-সালিহ-এর সমর্থক আমির এবং সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর মধ্যে সংঘাত শুরু হয়। মসুলের শাসক সাইফউদ্দিন গাজী সানিও আল-মালিক আস-সালিহ-এর সাথে যোগ দেন। রমজান ৫৭০ হিজরি (এপ্রিল ১১৭৫ খ্রিস্টাব্দ) হামাহ উপত্যকার কুরুনে মিত্রবাহিনী এবং সালাহউদ্দিন...

[১] কিতাবুর রওজাতাইন, ২ / ৩৩৪ থেকে ৩৩৭, ত. আর-রিসালাহ

[২] কিতাবুর রওজাতাইন, ২ / ৩৩৪ থেকে ৩৩৬, ত. আর-রিসালাহ

আইয়ুবীর মধ্যে প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয় যাতে মিত্রবাহিনী আল-মালিক আস-সালিহ-এর চাচা ইজ্জুদীন মাসউদের কমান্ডে ছিল। সালাহউদ্দীন আইয়ুবী মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে মিত্রবাহিনীকে পিছু হটতে বাধ্য করেন এবং বন্দীদের সাথে অত্যন্ত উদার আচরণ করেন। [১]

এরপর সালাহউদ্দীন আবারও আলেপ্পোর দিকে অগ্রসর হন যেখানে উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনা হয় এবং এই শর্তে সন্ধি হয় যে, প্রত্যেকে নিজ নিজ বর্তমান দখলকৃত এলাকার মালিক হবে। [২]

কিন্তু আলেপ্পোবাসী এই চুক্তিটি কেবল সময়ক্ষেপণের জন্য করেছিল। তাই সুলতান ফিরে যাওয়ার সাথে সাথেই তারা কেবল মোসেল নয় বরং সিরিয়ার ক্রুসেডারদের (ফিরাজি) সাথেও যোগাযোগ করে সালাহউদ্দীনের বিরুদ্ধে জোট গঠন করে। এর ফলে শাওয়াল ৫৭১ হিজরি (এপ্রিল ১১৭৬ খ্রিষ্টাব্দ) সালে জাবাবুত তুর্কমান নামক স্থানে আরেকটি যুদ্ধ হয় যাতে মিত্রবাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন সাইফুদ্দীন গাজী। এবারও সালাহউদ্দীন আইয়ুবী বিজয় লাভ করেন। সুলতান বন্দীদের ওপর কোনো কঠোরতা করেননি বরং অত্যন্ত মহানুভবতার পরিচয় দিয়ে তাদের সম্মানসূচক পোশাক (খিলআত) উপহার দিয়ে মুক্ত করে দেন। [৩]

আলেপ্পোর ওপর আক্রমণ আবারও অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সুলতান সালাহউদ্দীন প্রথমে “আযায”-এর দিকে অগ্রসর হন যা আলেপ্পোর উত্তরে খ্রিস্টান রাষ্ট্রগুলোর সীমান্তে সিরীয় মুসলমানদের শেষ বড় ঘাঁটি ছিল। এটি দখলের পর আলেপ্পো তাদের খ্রিস্টান মিত্রদের থেকে আর কোনো সাহায্য পেতে পারত না। আযায অবরোধের সময় আলেপ্পোর আমিরদের প্ররোচনায় বাতিনি খঞ্জরধারীরা আবারও সুলতানের ওপর প্রাণঘাতী হামলা চালায়। সুলতান নিজেও অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে আত্মরক্ষা করেন এবং তাঁর অনুগত সৈন্যরাও সময়মতো পৌঁছে যান। সুলতান আহত হন কিন্তু আল্লাহ তাঁর প্রাণ রক্ষা করেন এবং সমস্ত বাতিনিদের হত্যা করা হয়। আযায দখল শেষ করেই সুলতানের বাহিনী আলেপ্পোর সামনে গিয়ে পৌঁছায়। আবারও একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং সুলতান কেবল ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্তই নেননি বরং আল-মালিক আস-সালিহ-এর অল্পবয়সী বোনের অনুরোধে আযায দুর্গটিও ফিরিয়ে দেন।

পরবর্তী কয়েক বছর সুলতান কখনো মিশরে আবার কখনো সিরিয়ায় অবস্থান করতেন। তাঁর রাজধানী কায়রোই ছিল কিন্তু সিরিয়ার অভিযানগুলো বারবার তাঁকে সেদিকে মনোনিবেশ করতে বাধ্য করত। তিনি মিশরে গেলেই কখনো সিরীয় আমিররা বিদ্রোহ করত আবার কখনো ক্রুসেডাররা সীমান্তে লুটতরাজ শুরু করত। সুলতান মাঝেমধ্যে ক্রুসেডারদের সাথে যুদ্ধবিরতি চুক্তিও করেছিলেন কিন্তু প্রতিবারই এই চুক্তিগুলো ভেঙে ফেলা হয়। [৪]

রামলায় পরাজয় এবং এর প্রতিশোধ:

জমাদিউল আউয়াল ৫৭৩ হিজরি (অক্টোবর ১১৭৭ খ্রিষ্টাব্দ) সালে সুলতান মিশর থেকে যাত্রা করে গাজা এবং আসকালানের ওপর অতর্কিত হামলা শুরু করেন। এই সময়ে রামলার কাছে খ্রিস্টানদের একটি বিশাল বাহিনী হঠাৎ তাঁদের ঘিরে ফেলে। সুলতানের সাথে খুব কম...

[১] কিতাবুর রওজাতাইন: ২/ ৩৫৫ থেকে ৩৮৩, ত. আর-রিসালাহ

[২] কিতাবুর রওজাতাইন ফি আখবারিদ দাওলাতাইন: বছর ৫৭০ হিজরি

[৩] কিতাবুর রওজাতাইন: বছর ৫৭১ হিজরি; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: বছর ৫৭১ হিজরি

[৪] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: বছর ৫৭১ হিজরি, ৫৭২ হিজরি, ৫৭৩ হিজরি; আল-কামিল ফিত তারিখ: বছর ৫৭১ হিজরি, ৫৭২ হিজরি, ৫৭৩ হিজরি; কিতাবুর রওজাতাইন: ২/ ৩১৯ থেকে ৩২৫

সৈন্যরা তাদের মনিবকে রক্ষা করতে গিয়ে কেউ শহীদ হলেন এবং কেউ বন্দী হলেন। সুলতান কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে ঘেরাও থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন এবং অত্যন্ত দুর্গম মরুভূমি পাড়ি দিয়ে কায়রো পৌঁছান। এই দুর্ঘটনায় সুলতানের বেঁচে যাওয়া কোনো অলৌকিক ঘটনার (কারামত) চেয়ে কম ছিল না। সুলতান তার ভাই তুরান শাহকে এই যুদ্ধের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন:

“আমরা এই যুদ্ধে বারবার মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে ফিরেছি। আল্লাহ নিশ্চয়ই আমাদের এই সুযোগে এজন্যই জীবিত রেখেছেন যে, তিনি আমাদের দিয়ে কোনো বড় কাজ করিয়ে নিতে চান।” [১]

রমলায় সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবীকে পিছু হটতে বাধ্য করার পর ক্রুসেডাররা (ফিরিঙ্গি) হামাহ এবং হারিমের মতো ইসলামি শহরগুলোকে হামলার লক্ষ্যবস্তু বানায়। জেরুজালেমের রাজা বন্ডউইন দামেস্কের মহাসড়কে ‘হিসনুল আহজান’ নামে একটি নতুন দুর্গ নির্মাণ শুরু করেন। এই পরিস্থিতিতে সুলতান আল-মালিকুল আদিলকে মিশরে নায়েব নিযুক্ত করে শাওয়াল ৫৭৩ হিজরিতে (মার্চ ১১৭৮ খ্রিষ্টাব্দ) পুনরায় সিরিয়ার দিকে যাত্রা করেন।

জিলকদ ৫৭৪ হিজরিতে (এপ্রিল ১১৮০ খ্রিষ্টাব্দ) জেরুজালেমের রাজা দামেস্কের পার্শ্ববর্তী এলাকায় লুটতরাজ শুরু করেন। এই বাহিনীতে বন্ডউইনের পতাকাতলে খ্রিস্টানদের বহু নামী-দামী আমির সমবেত হয়েছিল, যাদের মধ্যে তোরানের শাসক হামফ্রেও ছিল, যে তার নিষ্ঠুরতার জন্য সর্বত্র পরিচিত ছিল। এই বাহিনীর সাথে সুলতানের সেনাপতি ফাররুখ শাহের বাহিনীর আকস্মিক সংঘর্ষ হয়। ফাররুখ শাহের সৈন্য সংখ্যা এক হাজারের কম ছিল, কিন্তু তিনি বীরত্বের সাথে মোকাবিলা করেন এবং এমন তীব্রভাবে লড়াই করেন যে ক্রুসেডারদের নাস্তানাবুদ করে দেন। জেরুজালেমের রাজা আহত হয়ে পালিয়ে যান এবং হামফ্রে নিহত হন। এই অসাধারণ কৃতিত্বের কারণে ইতিহাসে ফাররুখ শাহের নাম অমর হয়ে যায়। আল্লামা শিহাবুদ্দীন আল-মাকদিসি বলেন:

“ক্রুসেডাররা চরম অপমানের সাথে ফিরে যায়, তাদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না যে আহত হয়নি। প্রতিদিন তাদের কোনো না কোনো আহত অফিসারের মৃত্যুর খবর মুসলমানদের কাছে পৌঁছাচ্ছিল।” [২]

কিছুদিন পর বানিয়াসের সমতল এলাকায় ফাররুখ শাহের বাহিনীর সাথে শত্রুদের আরেকটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। প্রতিপক্ষ বাহিনী দশ হাজার সৈন্যের সমন্বয়ে গঠিত ছিল, যার নেতৃত্বে ছিলেন জেরুজালেমের রাজা বন্ডউইন, যিনি পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। মুসলমানরা জীবন বাজি রেখে পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে লড়াই করেন। এই সময়ে সুলতান সালাহউদ্দীন তার অনুগতদের একটি সাহায্যকারী দল নিয়ে সেখানে পৌঁছান এবং তুমুল যুদ্ধের পর শত্রুকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করতে সক্ষম হন। প্রায় ৭০০ জন বড় বড় খ্রিস্টান শাসক, নাইট এবং নবাব বন্দী হন, যাদের মধ্যে ত্রিপোলির শাসক রেমন্ড, ইবলিনের শাসক বালিয়ান এবং রমলা ও নাবলুসের শাসক ইবনে হিরজানও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তবে জেরুজালেমের রাজা আবারও আহত হওয়া সত্ত্বেও পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। রবিউস সানি ৫৭৫ হিজরিতে (সেপ্টেম্বর ১১৭৯ খ্রিষ্টাব্দ) সুলতান জেরুজালেমের রাজার নবনির্মিত দুর্গ ‘হিসনুল আহজান’ অবরোধ করেন এবং বিজয়ের পর তা সম্পূর্ণ মাটির সাথে মিশিয়ে দেন। [৩] এই একের পর এক বিজয়ের মাধ্যমে রমলার পরাজয়ের প্রতিশোধ যথাযথভাবে নেওয়া হয়।

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৫৭৩ হিজরি

[২] কিতাবুর রওজাতাইন, বছর: ৫৭৩ হিজরি

[৩] কিতাবুর রওজাতাইন, বছর: ৫৭৫ হিজরি

খলিফা মুস্তাদীর মৃত্যু, আন-নাসিরের খিলাফত:

২ যুলকাদা ৫৭৫ হিজরি (৩০ মার্চ ১১৮০ খ্রিস্টাব্দ) মুসলিম বিশ্বের আধ্যাত্মিক অভিভাবক আব্বাসীয় খলিফা মুস্তাদী বি-আমরিলাহর মৃত্যু হয়। ঐতিহাসিকগণ তাকে একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক এবং আল্লাহভীরু মানুষ হিসেবে বর্ণনা করেন। তার স্থলাভিষিক্ত হন খলিফা নাসির লি-দীনিলাহ। আব্বাসীয় খিলাফতে সবচেয়ে দীর্ঘ শাসনকাল খলিফা নাসির পেয়েছিলেন, যিনি আহলে তাশাইয়ু-দের মতাদর্শ গ্রহণ করেছিলেন এবং আহলে সুন্নাতের জন্য অসংখ্য পরীক্ষা ও মুসলিম বিশ্বের জন্য অনেক ফিতনার কারণ হয়েছিলেন। [১]

সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর সিদ্ধান্তমূলক অবস্থানের সুদৃঢ়করণ:

সুলতান সালাহউদ্দীন সিরিয়া, মিশর, ইরাক এবং এশিয়া মাইনরের রাজনীতিতে এখন একটি সিদ্ধান্তমূলক অবস্থান লাভ করেছিলেন। চারপাশের ছোট-বড় শাসকরা পারস্পরিক বিবাদে তার কাছ থেকেই ফয়সালা নিতে শুরু করেছিলেন। ১০ জমাদিউল আউয়াল ৫৭৬ হিজরি (১২ অক্টোবর ১১৮০ খ্রিস্টাব্দ) সানজাহ নদীর তীরে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যাতে সুলতান এবং এশিয়া মাইনরের সুলতান কিলিজ আরসালান ছাড়াও মসুল ও দিয়ার বকরের শাসকরাও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এভাবে এশিয়া মাইনর, কাইফা, দিয়ার বকর, আলেপ্পো এবং অন্যান্য নিকটবর্তী রাষ্ট্রগুলোতে সুলতান সালাহউদ্দীনের সিদ্ধান্তমূলক রাজনৈতিক অবস্থান সুদৃঢ় হয়। [২]

আল-মালিকুস সালিহের মৃত্যু এবং আলেপ্পোর নতুন সরকার:

সুলতান নূরুদ্দীন জঙ্গীর উত্তরসূরি আল-মালিকুস সালিহ গুরুতর অসুস্থ হয়ে রজব ৫৭৭ হিজরি (ডিসেম্বর ১১৮১ খ্রিস্টাব্দ) ইহলোক ত্যাগ করেন। এরপর মসুলের শাসক ইজ্জুদ্দীন মাসউদ নতুন শাসক হিসেবে সেখানে পৌঁছান, যাকে সাইফুদ্দীন গাজী মৃত্যুর সময় মসুলের শাসক বানিয়ে গিয়েছিলেন এবং আল-মালিকুস সালিহ আলেপ্পো তার নামে করে দিয়েছিলেন। এভাবে আলেপ্পো থেকে মসুল পর্যন্ত বিশাল শাসন এলাকা লাভ করে ইজ্জুদ্দীন মাসউদের শক্তি অনেক বৃদ্ধি পায়। [৩]

সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর সাথে ইজ্জুদ্দীন মাসউদের দ্বন্দ্ব:

এর আগে শাবান ৫৭৬ হিজরি (জানুয়ারি ১১৮১ খ্রিস্টাব্দ) সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবী পুনরায় মিশরে পৌঁছেছিলেন। প্রায় সোয়া বছর সেখানে প্রশাসনিক ব্যবস্থা উন্নত করার পর মহররম ৫৭৮ হিজরি (জুন ১১৮২ খ্রিস্টাব্দ) তিনি আবারও মিশর থেকে সিরিয়ার দিকে যাত্রা করেন। এরপর তার আর কখনো মিশরে আসা নসিব হয়নি।

সুলতান শীঘ্রই ফিরিঙ্গিদের এলাকাগুলোতে আক্রমণ শুরু করেন। বছরের পর বছর গেরিলা যুদ্ধ চলতে থাকে। এই সময়ে মসুল ও আলেপ্পোর শাসক ইজ্জুদ্দীন মাসউদ সুলতানের একজন শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আবির্ভূত হন। আরও অনেক আমিরও তার সাথে যোগ দেন, ফলে সুলতানকে বেশ কয়েক বছর সিরিয়া, আল-জাজিরা এবং ইরাকের শাসকদের সাথে অনিচ্ছাসত্ত্বেও যুদ্ধ করতে হয়। এই সময়ে তিনি...

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৫৭৫ হিজরি

[২] আন-নাওয়াদিরুস সুলতানিয়াহ, পৃষ্ঠা ৯৯; আল-কামিল ফিত তারিখ, ৫৭৬ হিজরি সন

[৩] আন-নাওয়াদিরুস সুলতানিয়াহ, পৃষ্ঠা ৪২

বারবার যুদ্ধ এড়িয়ে আলোচনার মাধ্যমে বিষয়গুলো মীমাংসা করার চেষ্টা করেছেন। কোথাও তিনি তাঁর কলমা পাঠকারী প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে চরম শত্রুর মতো আচরণ করেননি, বরং তাদের প্রতি অত্যন্ত উদার মনোভাব পোষণ করেছেন।

রজব ৫৭৮ হিজরি (নভেম্বর ১১৮২ খ্রিষ্টাব্দ) মাসে সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ইজ্জুদ্দিন মাসউদের কেন্দ্র মসুল ঘেরাও করেন। কিন্তু পরে বাগদাদের খলিফার সুপারিশে এই অভিযান ত্যাগ করেন। এর পরপরই সুলতান সিনজার জয় করে আল-জাজিরার ওপর নিয়ন্ত্রণ মজবুত করেন। [১]

রেজিনাল্ডের হিজাজে ব্যর্থ হামলা:

এদিকে কারাকের শয়তান রেজিনাল্ড (আরনাত বার্নস) মক্কা মুকাররমা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। কারাকের জাহাজ নির্মাণ কারখানায় অনেকগুলো জাহাজ খণ্ড খণ্ড আকারে তৈরি করা হয়েছিল, যা মালবাহী পশুর মাধ্যমে আয়লা উপকূল পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া হয়। এই নৌবহর লোহিত সাগরে নামানো হয় এবং ক্রুসেডাররা শাওয়াল ৫৭৮ হিজরি (ফেব্রুয়ারি ১১৮৩ খ্রিষ্টাব্দ) মাসে হিজাজের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। যদি ক্রুসেডার বাহিনী মক্কা মুকাররমা পৌঁছে যেত, তবে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারত। এই মুহূর্তে সুলতানের আমিরুল বাহর (নৌ সেনাপতি) হুসামুদ্দিন লুলু দ্রুত তৎপর হয়ে ওঠেন এবং রাবিগের কাছে যেখান থেকে হিজাজের উপকূলীয় অঞ্চল শুরু হয়, সমুদ্রের দিক থেকে রেজিনাল্ডের নৌবহরকে ঘিরে ফেলেন। রেজিনাল্ড নিজে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও তার অধিকাংশ সঙ্গী নিহত হয় এবং বাকিরা বন্দি হয়। অধিকাংশ বন্দিকে কায়রোতে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, আর কয়েকজনকে ১০ই জিলহজ হাজিদের উপস্থিতিতে মিনার ময়দানে ঠিক সেই সময়ে জবেহ করা হয় যখন হাজিগণ কোরবানি করছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল পবিত্র স্থানগুলোর দিকে কুনজর দেওয়া শত্রুদের জন্য এটি যেন শিক্ষণীয় হয়। [২]

সুলতানের বিরোধীদের জোটবদ্ধ হওয়া এবং সম্মিলিত অভিযান:

৫৭৮ হিজরির শেষ দিনগুলোতে মসুল ও আলেপ্পোর শাসক ইজ্জুদ্দিন মাসউদ খিলাত ও মারদিনের শাসকদের সাথে নিয়ে একটি সম্মিলিত বাহিনী গঠন করেন। এ খবর শুনে সুলতান তৎক্ষণাৎ মোকাবিলার জন্য অগ্রসর হন, যার ফলে মিত্রবাহিনী হতভম্ব হয়ে পড়ে এবং যুদ্ধ না করেই পিছু হটে। সুলতান মহররম ৫৭৯ হিজরি (মে ১১৮৩ খ্রিষ্টাব্দ) মাসে আমিদের অপরাজেয় দুর্গ জয় করেন, যেখান থেকে দশ লক্ষ চল্লিশ হাজার বইয়ের এক বিশাল ভাণ্ডার হস্তগত হয়। সুলতান এই সব বই তাঁর উজির কাজী ফাজিলকে দিয়ে দেন। [৩]

حلب (আলেপ্পো) বিজয়:

সুলতান সফর ৫৭৯ হিজরি (জুন ১১৮৩ খ্রিষ্টাব্দ) মাসে জেঙ্গিদের প্রধান শহর আলেপ্পো অবরোধ করেন এবং শহরের শাসক ইমাদউদ্দিনের সাথে আলোচনার মাধ্যমে এই শহরটি লাভ করেন। বিনিময়ে তাকে সিনজারের শাসনভার প্রদান করেন। ইমাদউদ্দিনের এই সিদ্ধান্ত কেবল উম্মতে মুসলিমার জন্যই নয়, বরং তার নিজের জন্যেও উপকারী প্রমাণিত হয়, অন্যথায় আলেপ্পো একটি স্থায়ী রণক্ষেত্রে পরিণত হতো যেখানে উভয় শাসকের শক্তি অপচয় হতো।

[১] আন-নাওয়াদিরুস সুলতানিয়া, পৃ. ৩২ থেকে ৩৪

[২] কিতাবুর রওজাতাইন: বছর ৫৭৮ হিজরি

[৩] কিতাবুর রওজাতাইন: বছর ৫৭৯ হিজরি

...হতে থাকে। এখন ইমাদউদ্দিন সিনজারে সম্মানের সাথে শাসন করার এবং জিহাদে সুলতানের সাথে থাকার সুযোগ পেলেন যাতে কেবল কল্যাণই ছিল। [১]

ধৃষ্ট খ্রিস্টানদের শাস্তি দেওয়ার অভিযান

এই বিজয়ের পর সুলতান তাঁর আমির ও মিত্রদের কাছে চিঠি পাঠালেন যাতে তাঁরা জিহাদের প্রস্তুতি শুরু করেন, যাতে ধৃষ্ট খ্রিস্টানদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া যায়। সুলতানের প্রস্তুতির কারণে খ্রিস্টান রাষ্ট্রগুলোতে ভয় ও আতঙ্কের ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছিল। আন্তাকিয়ার শাসক ঘাবড়ে গিয়ে সুলতানের সাথে শাস্তি চুক্তি নবায়ন করে নেন।

৫৭৯ হিজরিতে (১১৮৩ খ্রিষ্টাব্দ) সুলতান ক্রুসেডারদের অধিকৃত এলাকাগুলোতে আক্রমণ অব্যাহত রাখেন। সুলতানকে থামানোর জন্য সাফুরিয়ায় পনেরো হাজার খ্রিস্টান সৈন্য একত্রিত হয়ে ফোলার (বালফোর) দিকে অগ্রসর হতে থাকে। জমাদিউল আখিরা ৫৭৯ হিজরিতে (অক্টোবর ১১৮৩ খ্রিষ্টাব্দ) ফোলা থেকে কিছু দূরে উভয় বাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় যাতে খ্রিস্টানদের পিছু হটতে হয়।

সুলতান সালাহউদ্দিন কারাকের ধৃষ্ট রেজিনাল্ডকে শাস্তি দেওয়ার জন্য প্রথমে রজব ৫৭৯ হিজরি এবং পরে জমাদিউল আউয়াল ৫৮০ হিজরিতে একের পর এক এই দুর্গ অবরোধ করেন, তবে সাফল্য আসেনি। [২]

মসুলের শেষ অবরোধ:

রবিউস সানি ৫৮১ হিজরিতে (জুলাই ১১৮৫ খ্রিষ্টাব্দ) সুলতান আবারও মসুল অবরোধ করেন কিন্তু এবারও এই অভিযান ব্যর্থ হয়। শাবান ৫৮১ হিজরিতে (অক্টোবর) তৃতীয়বারের মতো মসুল অবরোধ করেন। মসুলের শাসক ইজুদ্দিন মাসুদ সন্ধির আলোচনা শুরু করেন যা চলছিলই, এমন সময় হঠাৎ সুলতানের গুরুতর অসুস্থতা এই প্রক্রিয়াকে থামিয়ে দেয়। অসুস্থতা আরও বাড়লে রমজান মাসের শেষে হঠাৎ মসুলের অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। হাররানে পৌঁছে অসুস্থতা এতটাই তীব্র আকার ধারণ করে যে তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। এই সময়ে সুলতান নিজের আত্মপর্যালোচনা করেন এবং অনুভব করেন যে তাঁর সময় ও সম্পদের একটি বড় অংশ সমসাময়িক মুসলিম শাসকদের সাথে বিরোধ ও যুদ্ধে ব্যয় হচ্ছে। তাঁর উজির কাজী ফাজিল (রহ.)-এর পরামর্শও এমনই ছিল। তিনি বলেছিলেন:

“এই সময়ে সবচেয়ে বড় নেকি হবে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করে কুফর ও শিরকপন্থীদের বিরুদ্ধে জিহাদের দিকে পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া। আল-কুদসকে মুক্ত করা এবং রিসালাতের অবমাননাকারী খ্রিস্টান আমিরদের শাস্তি দেওয়ার চেয়ে উত্তম কাজ আর কিছু হতে পারে না। অতএব সুলতানের উচিত এর মানত করা এবং আল্লাহ তায়ালার সাথে এই নেক আমলগুলো সম্পন্ন করার দৃঢ় অঙ্গীকার করা।”

সুলতান অবিলম্বে আল্লাহ তায়ালার সাথে অঙ্গীকার করলেন যে তিনি ভবিষ্যতে কোনো মুসলিম শাসকের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ করবেন না এবং কেবল ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করবেন। সুলতান এই সময়ে এই শপথও করেছিলেন যে তিনি কারাকের শাসক রেজিনাল্ড...

[১] কিতাবুর রওজাতাইন: ৫৭৯ হিজরি

[২] কিতাবুর রওজাতাইন: ৫৭৯ হিজরি, ৫৮০ হিজরি

...অবশ্যই হত্যা করবেন, যে হাজীদের হত্যা করার আগে হুজুর আকরাম ﷺ-এর শানে বেয়াদবি করে তাদের বলেছিল: “তোমাদের মুহাম্মদ কোথায়? তাকে ডাকো যেন সে তোমাদের সাহায্য করে।”

জিলহজ ৫৮১ হিজরি (মার্চ ১১৮৬ খ্রিষ্টাব্দ)-এর প্রথম দশকে সুলতানের স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে শুরু করে এবং চারদিকে আনন্দ ও খুশির পরিবেশ তৈরি হয়। সুলতান অসুস্থতা থেকে কিছুটা সুস্থ হতেই মসুলের প্রতিনিধি দলকে সাক্ষাতের সুযোগ দেন এবং মসুলের শাসক ইজ্জুদ্দিন মাসউদের সাথে এই শর্তে সন্ধি করেন যে, মসুলবাসীরা প্রয়োজনের সময় সুলতানকে সৈন্য সরবরাহ করবে।

আল্লাহর সাহায্য শীঘ্রই সুলতান সালাহউদ্দিনকে খ্রিষ্টানদের ওপর জোরালো আঘাত হানার সুযোগ করে দিল। জেরুজালেমের অধিপতি পঞ্চম বন্ডউইন মারা যান এবং তার উত্তরাধিকারের প্রশ্নে সিরিয়ার খ্রিষ্টান আমিররা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন। কিছু আমির প্রাক্তন রাজার সৎ বাবা গাই-কে রাজা বানাতে চেয়েছিলেন এবং কিছু ত্রিপোলির শাসক রেমন্ডকে।

খ্রিষ্টান রাষ্ট্রগুলোর এই রাজনৈতিক সংকট মুসলমানদের জন্য এক বিরাট নিয়ামত হিসেবে প্রমাণিত হলো। সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী অনুভব করলেন যে, আল-কুদসের দরজায় পৌঁছানোর জন্য এর চেয়ে ভালো সুযোগ হয়তো আর কখনো পাওয়া যাবে না। ফলে তিনি আল-কুদসের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য চূড়ান্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। [১]

হিভিনের যুদ্ধ

৫৮৩ হিজরি (১১৮৭ খ্রিষ্টাব্দ)-এ সুলতান আল-কুদস স্বাধীন করার জন্য চূড়ান্ত যুদ্ধের ঘোষণা দেন। পেশাদার সেনাবাহিনী ছাড়াও বিপুল সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক মুজাহিদদের দল সুলতানের শিবিরে এসে পৌঁছায়। সুলতান সফর ৫৮৩ হিজরি (মে ১১৮৭ খ্রিষ্টাব্দ)-এ দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হন এবং কারাক ও শুবাকের ওপর কয়েকটি আক্রমণ চালিয়ে দ্রুত ফিলিস্তিনের দিকে ফিরে আসেন এবং তাবারিয়ার আশেপাশে তার গেরিলা বাহিনী ছড়িয়ে দেন। এই গেরিলা অভিযানের সময় সুলতানের পুত্র আল-মালিকুল আফজাল খ্রিষ্টান যোদ্ধা গোষ্ঠী হসপিটালার এবং টেম্পলারদের একটি দলকে এমনভাবে নিধন করেন যে, সমস্ত খ্রিষ্টান আমিররা আতর্নাদ করে ওঠেন এবং তারা সুলতানের বিরুদ্ধে একটি বিশাল সম্মিলিত বাহিনী গঠন করেন। ত্রিপোলি ও তাবারিয়ার শাসক রেমন্ড সুলতানের সাথে সন্ধি করেছিলেন, কিন্তু পাদ্রিরা তাকেও লজ্জা দিয়ে এই সম্মিলিত ফ্রন্টে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। তারা সবাই প্রথমবারের মতো গাই-কে জেরুজালেমের রাজা হিসেবে মেনে নিতে একমত হয়। [২]

খ্রিষ্টান বাহিনী তাদের সবচেয়ে পবিত্র ধর্মীয় প্রতীক ‘সলিবে সালবুত’ নিয়ে ময়দানে নামে, যা ছিল বিজয়ের প্রতীক; তাদের বিশ্বাস মতে এই ক্রুশেই হযরত ঈসা (আ.)-কে শূলে চড়ানো হয়েছিল। তাবারিয়া থেকে প্রায় ১৮ কিলোমিটার পশ্চিমে উয়ুন সাফুরিয়ার ময়দানে খ্রিষ্টান বাহিনী তাবু স্থাপন করে। জেরুজালেমের রাজা গাই এবং তাবারিয়ার শাসক রেমন্ডসহ হসপিটালার ও টেম্পলাররা...

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: বছর ৫৮০ হিজরি

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: বছর ৫৮৩ হিজরি

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

চতুর্থ খণ্ড

...এর যোদ্ধা এবং আরও ডজনখানেক খ্রিস্টান আমির তাদের বাহিনীসহ এখানে পৌঁছে গেল। রাসুলের অবমাননাকারী রেজি নান্ডও কারাক-এর দুর্গ থেকে বের হয়ে এখানে চলে এল। এভাবে নাসারাদের মোট সংখ্যা প্রায় ৬৩ হাজারে পৌঁছে গেল।

ইসলামী বাহিনী ২১ রবিউল আখের ৫৮৩ হিজরি (৩০ জুন ১১৮৭ খ্রিষ্টাব্দ) তাবারিয়া হ্রদের পশ্চিমে একটি সবুজ-শ্যামল ও উঁচু মালভূমিতে তাবু স্থাপন করল। সামনে প্রায় ৬ মাইল দীর্ঘ এক উন্মুক্ত প্রান্তর ছিল, যার অপর প্রান্তে ফ্রাঙ্করা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সুলতানের ক্যাম্প পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য এই প্রান্তর ছাড়া তাদের কাছে আর কোনো পথ ছিল না। এই প্রান্তরে কোনো ঝরনা বা পুকুর ছিল না। এর কিনারে টিলা এবং ঘন ঝোপঝাড়ের একটি সারি ছিল, যার আড়াল থেকে নাসারাদের ওপর পুরোদমে তীর নিক্ষেপ করা সম্ভব ছিল। উভয় প্রতিপক্ষ অত্যন্ত সতর্ক ও হুঁশিয়ার ছিল। প্রত্যেকেই চাচ্ছিল যেন অপর পক্ষ আগে অগ্রসর হয়। খ্রিস্টানরা অপেক্ষায় ছিল যে, মুসলমানরা বিরক্ত হয়ে নিজেরাই সিরিয়ায় ফিরে যাবে। অবশেষে সুলতান আইয়ুবী তাদের আক্রমণের জন্য উত্তেজিত করতে রেমন্ডের শহর তাবারিয়া দখল করে নিলেন। এই খবর শুনে খ্রিস্টান আমিররা উত্তেজিত হয়ে পড়ল। তারা একে অপরকে লজ্জা দিল এবং রেমন্ডের নিষেধ সত্ত্বেও সামনে এগিয়ে গিয়ে সুলতানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নিল।

২৩ রবিউল আখের ৫৮৩ হিজরি (২ জুলাই ১১৮৭ খ্রিষ্টাব্দ) সকালে খ্রিস্টান বাহিনী তাবারিয়ার দিকে যাত্রা শুরু করল। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, তারা সন্ধ্যা নাগাদ তাবারিয়ার ঝরনাগুলোতে পৌঁছে যাবে। কিন্তু মুজাহিদিনরা ডানে-বামে থেকে নাসারা বাহিনীকে অনবরত তীরের লক্ষ্যবস্তু বানাতে থাকল। ফলে ফ্রাঙ্কদের অগ্রযাত্রা এতটাই ধীর ছিল যে, তারা সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনোমতে পাঁচ মাইল পথ অতিক্রম করতে পারল।

শুক্রবার ২৪ রবিউল আখের ৫৮৩ হিজরি (৩ জুলাই) তারা পুনরায় সফর শুরু করল। সুলতানের সৈন্যরা তাদের ওপর তীর নিক্ষেপ করতে থাকল। প্রচণ্ড গরমে নাজেহাল নাসারারা ওই দিন সন্ধ্যা নাগাদ তাদের সাথে থাকা পানি শেষ করে ফেলল। ওই দিনও তারা মাত্র পাঁচ-ছয় মাইল এগোতে পারল। সন্ধ্যা নাগাদ তাদের দম একেবারে ফুরিয়ে গিয়েছিল।

২৫ রবিউল আখের (৪ জুলাই) সকালে চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরু হলো। খ্রিস্টানরা তাদের তৃষ্ণা মেটানোর জন্য ঝরনা পর্যন্ত পৌঁছাতে চাচ্ছিল, কিন্তু সুলতান বিশাল সৈন্য মোতায়েন করে সেই পথগুলো বন্ধ করে দিয়েছিলেন। সুলতানের নির্দেশে প্রান্তরের শুকনো ঘাসে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হলো, যার ফলে নাসারাদের ঘোড়াগুলো ভড়কে গিয়ে এদিক-ওদিক ছুটতে শুরু করল এবং তাদের সারিতে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। তখন সুলতান নারায়ে তাকবির ধ্বনি দিয়ে একযোগে সর্বাঙ্গিক আক্রমণের নির্দেশ দিলেন।

বিকেল পর্যন্ত প্রচণ্ড যুদ্ধ চলতে থাকল। অবশেষে নাসারাদের সাহস ভেঙে পড়ল। তাদের সবচেয়ে অভিজ্ঞ জেনারেল রেমন্ড আহত হয়ে নিজের বাহিনীসহ পালিয়ে গেল। এরপর সাইদার রাজপুত্রও তার সৈন্যদের নিয়ে পালিয়ে গেল। পাদ্রিরা মহা ক্রুশের দোহাই দিয়ে বাকি আমিরদের পালানো থেকে বিরত রাখল। দীর্ঘক্ষণ রক্তের নদী বইতে থাকল। সূর্য ঢলে পড়ার সময় খ্রিস্টানরা তৃষ্ণায় নিস্তেজ হয়ে পড়ছিল। পরিশেষে খ্রিস্টান রাজা গাই, রেজি নান্ড, হসপিটালার এবং টেম্পলারদের দলসহ একটি টিলায় আশ্রয় নিল। কিন্তু সুলতান তাদের ঘিরে ফেলে একের পর এক আক্রমণে পিষে ফেললেন। সলিবে সুলবুত মাটিতে ফেলে দেওয়া হলো। এর সাথে সাথেই অবশিষ্ট নাসারারা অস্ত্র সমর্পণ করল। বড় বড় শাসক, রাজপুত্র, নবাব, নাইট এবং সর্দাররা মাথা নত করে বন্দি হিসেবে...

...অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সাধারণ বন্দীদের সংখ্যা এত বেশি ছিল যে, মুসলমানরা তাদের ভেড়া-বকরির মতো হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। অন্যদিকে তাদের নিহতদের দ্বারা ময়দান সয়লাব হয়ে গিয়েছিল, জায়গায় জায়গায় লাশের স্তুপ জমে ছিল।

সেই সময়ের একজন ঐতিহাসিকের বক্তব্য হলো:

“নিহতদের সংখ্যা এত বেশি ছিল যে, তাদের দেখে কেউ বিশ্বাস করতে পারত না যে মুসলমানরা কাউকে বন্দী করার জন্য জীবিত ছেড়ে দিয়েছে; আর বন্দীদের সংখ্যা এত বেশি ছিল যে, তাদের দেখে বিশ্বাস হতো না যে মুসলমানরা কাউকে হত্যাও করেছে।”

আল-কুদসের ওপর খ্রিস্টানদের দখলের পর এটি ছিল তাদের সবচেয়ে বড় পরাজয়, যা মুসলমানদের জন্য পরবর্তী সকল বিজয়ের দ্বার উন্মোচন করে দিয়েছিল। [১]

রিজিনাল্ডের পরিণতি:

যুদ্ধের হট্টগোল থামতেই সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর দরবারে জেরুজালেমের প্রাক্তন রাজা গাই, তার ভাই এবং রিজিনাল্ডকে হাজির করা হলো। সুলতান গাইকে কাছে বসালেন এবং বরফ মিশ্রিত ঠান্ডা পানীয় আনিয়ে তাকে পান করালেন। গাই পেয়ালায় অবশিষ্ট পানীয় রিজিনাল্ডকে দিয়ে দিলেন। আরবদের কাছে বন্দীকে পানি পান করানো প্রাণভিক্ষা দেওয়ার সমতুল্য মনে করা হতো, তাই রিজিনাল্ড ভাবল সে মৃত্যুদণ্ড থেকে বেঁচে যাবে। কিন্তু সুলতান দোভাষীর মাধ্যমে গাইকে বললেন: “আমি নিজে তাকে কখনোই পানি পান করাতাম না। তুমি অনুমতি ছাড়াই এই ব্যক্তিকে পানি পান করিয়েছ, তাই সে নিরাপত্তা পাবে না।”

এরপর সুলতান রিজিনাল্ডকে নির্জনে তলব করে তার অপরাধগুলো তুলে ধরলেন এবং তাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিলেন, কিন্তু সে তা মানল না। যেহেতু সে হাজীদের ওপর হামলার সময় হুজুর আকরাম ﷺ-এর শানে বেয়াদবি করে বলেছিল যে, তোমাদের মুহাম্মদকে বলো এসে তোমাদের ছাড়িয়ে নিতে (নাউযুবিল্লাহ), তাই সুলতান তাকে সেই ধৃষ্টতাপূর্ণ বাক্যটি স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন: “ঠিক আছে, তবে নাও! আমি তোমার থেকে মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতিশোধ নিচ্ছি। আমি হুজুর ﷺ-এর প্রতিনিধি হয়ে তাঁর পক্ষ থেকে তাঁর উম্মতের প্রতিশোধ নিচ্ছি।”

এ কথা বলেই সুলতান তলোয়ারের এক আঘাতেই রিজিনাল্ডের কাঁধ থেকে বুক পর্যন্ত চিরে ফেললেন। সুলতানের খাদেমরা আরও আঘাত করে তাকে হত্যা করল এবং লাশ বাইরে ফেলে দিল।

গাই এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে কাঁপছিলেন। সুলতান তাকে আশ্বস্ত করে বললেন: “রাজাদের রীতি নয় যে তারা রাজাদের হত্যা করবেন। কিন্তু এই ব্যক্তির কর্মকাণ্ড সব সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল, তাই তার সাথে যা হওয়ার তা-ই হয়েছে।”

হসপিটালার এবং টেম্পলারদের সর্দার ও যোদ্ধাদেরও কোনো প্রকার ছাড় না দিয়ে হত্যা করা হলো, কারণ এই লোকেরা প্রতিটি যুদ্ধে অগ্রণী ভূমিকা পালন করত। গাই এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বন্দীদের সাথে অবশ্য ভালো ব্যবহার করা হলো এবং তাদের দামেস্কের কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

হিভিনের যুদ্ধে একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটল যে, সুলতানের এক দরিদ্র সৈনিকের ভাগে একজন বন্দী পড়ল, সেই সৈনিককে

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: বছর ৫৮৩ হিজরি; আল-কামিল ফিত তারিখ: বছর ৫৮৩ হিজরি; কিতাবুর রওজাতাইন: বছর ৫৮৩ হিজরি।

জুতোর প্রয়োজন ছিল, তিনি কারো কাছ থেকে জুতো কিনলেন এবং দাম হিসেবে বন্দিকে তাকে দিয়ে দিলেন। লোকেরা এতে বিস্ময় প্রকাশ করল যে, বন্দিকে এত সম্ভায় কেন দিয়ে দিলেন? তিনি বললেন:

“আমি চাই এই ঘটনাটি নাসারাদের অপমানের উদাহরণ হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকুক।”

ক্রুশাটি কাজী ইবনে আসরুন-এর কাছে হস্তান্তর করা হলো। তিনি যখন এটি নিয়ে দামেস্কে প্রবেশ করলেন, তখন এই ঐতিহাসিক দৃশ্য দেখার জন্য মানুষের ঢল নেমে এল। এই ক্রুশাটি দামেস্কের ‘কান্তারিয়া’ নামক স্থানে দীর্ঘ সময় ধরে উল্টো হয়ে ঝুলে ছিল এবং মুসলমানদের তাওহীদের গৌরবময় বিজয় এবং ত্রিত্ববাদের শোচনীয় পরাজয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। [১]

গাজীয়ানে ইসলামের প্লাবনসম বিজয়:

হিভিনের পর সুলতান পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে উপকূলে আক্রমণ করলেন যাতে নাসারাদের সাহায্য ও রসদ সরবরাহের পথ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এভাবে ১লা জমাদিউল আউয়াল ৫৮৩ হিজরি (৯ জুলাই ১১৮৭ খ্রিস্টাব্দ) উপকূলীয় শহর ‘আক্কা’ জয় করা হলো।

এরপর সুলতানের বাহিনী কয়েক ভাগে বিভক্ত হয়ে বন্যার মতো সিরিয়া ও ফিলিস্তিনে ছড়িয়ে পড়ল। সুলতানের ভাই আল-মালিকুল আদিল মাজদাল ইয়াফা এবং উপকূলীয় শহর ইয়াফা দখল করেন। অন্যান্য সেনাপতিরা বিসান, দাবুরিয়া, জেনিন, তুর, জারইন, আল-লাজুুন, আল-ফুলা, আজ-জিব, মালিয়া, আল-বুকাইয়া, মানওয়াত, নাসেরা এবং ইস্কান্দারুনার মতো দুর্গগুলো দেখতে দেখতে জয় করে নিলেন। তাকিউদ্দিন উমর ‘সুর’ (Tyre) অবরোধ করে সেখান থেকে ফরাসিদের সাহায্য ও রসদ সরবরাহের পথ বন্ধ করে দিলেন। নাবলুস, তিবনিন, কায়সারিয়া, জুবাইল, হাইফা, সিদা, বৈরুত এবং আরসুফের মতো গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলোও নতি স্বীকার করল। এই সমস্ত বিজয় এক মাসের সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে অর্জিত হলো। এরপর ২৯শে জমাদিউল আখিরা ৫৮৩ হিজরি (৫ সেপ্টেম্বর ১১৮৭ খ্রিস্টাব্দ) আসকালানও জয় করা হলো, যাকে বাইতুল মুকাদাসের প্রবেশদ্বার মনে করা হতো। এই এলাকাগুলোতে মুসলমানরাও বসবাস করত। বাইতুল মুকাদাসের পতনের পর তাদের তৃতীয় প্রজন্ম নাসারাদের দাসত্বে ছিল। সুলতানের বিজয়ী আগমনে এই অসহায় মানুষদের আনন্দ ও উচ্ছ্বাস ছিল দেখার মতো। দীর্ঘ সময় পর এখানে আবারও আজান ধ্বনিত হলো এবং ইসলামি নিদর্শনসমূহ পুনর্জীবিত হলো। [২]

বাইতুল মুকাদাস বিজয়

এই বিজয়গুলোর পর সুলতান অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বাইতুল মুকাদাসের দিকে যাত্রা করলেন যেখানে সিরিয়ার নাসারাদের অবশিষ্ট সমস্ত শক্তি একত্রিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে পেশাদার সৈন্যও ছিল এবং তীর্থযাত্রীও, সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীও ছিল এবং ধর্মীয় নেতাও। খোদ স্থানীয় বাসিন্দাদের সংখ্যাও কম ছিল না যারা আল-কুদসকে তাদের ধর্মীয় ঐতিহ্য মনে করত এবং কোনো মূল্যেই তা ছেড়ে দিতে প্রস্তুত ছিল না। নাসারাদের গোঁড়া যোদ্ধা গোষ্ঠী টেম্পলার্স, হসপিটালার্স এবং হারবিয়া-এর লোকেরাও এখানে...

[১] কিতাবুর রওজাতাইন: ৩/ ২৮৫ থেকে ২৯৯, ত তুর-রিসালাহ; আল-কামিল ফিত তারিখ, বছর ৫৮৩ হিজরি।

[২] কিতাবুর রওজাতাইন: ৩/ ৩০৮ থেকে ৩২৬, ত তুর-রিসালাহ; আল-কামিল ফিত তারিখ, বছর ৫৮৩ হিজরি।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা | চতুর্থ খণ্ড

প্রচুর সংখ্যায় ছিল। সুলতানের আক্রমণের ভয় থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে লড়াই করার প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছিল। জেরুজালেমের সবচেয়ে বড় পাদ্রি “বতরীক-এ-আজম”-এর উপস্থিতি তাদের মনোবল বৃদ্ধি করছিল। এরপর ইবলিন দুর্গের শাসক বালিয়ান বিন বারজানের রূপে তারা একজন নতুন সামরিক নেতাও পেয়ে গিয়েছিল।

এদিকে সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবি যখন তার জানবাজদের নিয়ে আল-কুদসের দিকে রওনা হলেন, তখন বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়ের গৌরব অর্জনের জন্য সিরিয়া ও মিশরের উলামা, ফুকাহা এবং মাশায়েখদের এক বিশাল দলও এই লশকরে शामिल হলেন। যাত্রার আগে সুলতান আইয়ুবি প্রথা ভেঙে এক দীর্ঘ খুতবা দিয়ে মুসলমানদের সাহস ও আত্মমর্যাদাবোধকে জাগ্রত করলেন। তিনি বললেন:

“যদি আল্লাহ তাঁর শত্রুদের বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে বের করে দেওয়ার তাওফিক আমাদের দান করেন, তবে এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কী হতে পারে। ৯১ বছর হয়ে গেছে যে বাইতুল মুকাদ্দাস কাফেরদের দখলে রয়েছে। এই পুরো সময়ে এক মুহূর্তের জন্যও এখানে এক আল্লাহর ইবাদত হয়নি। মুসলিম বাদশাহদের মনোযোগ এটি ছাড়া অন্য অভিযানে ব্যয় হতে থাকে, এর প্রতি অবহেলায় কয়েক প্রজন্ম অতিবাহিত হয়ে গেছে এবং ফিরিজিরা এর মালিক হয়ে রয়েছে। আমাদের বাইতুল মুকাদ্দাস এবং মসজিদে আকসা বিজয়ের জন্য জান-প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করতে হবে।” [১]

১৫ রজব ৫৮৩ হিজরি (২০ সেপ্টেম্বর ১১৮৭ খ্রিস্টাব্দ) তারিখে ইসলামি লশকর আল-কুদসের সামনে পৌঁছাল। বেশ কয়েক দিন পর্যন্ত শহরের প্রাচীরের সামনে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলতে থাকল। অবশেষে মুসলমানদের মিনজানিকগুলো প্রাচীরের একটি অংশ ধসিয়ে দিল। লেন পুল সেই সময়ের শহরের অভ্যন্তরীণ অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, শহরে ছড়োছড়ি পড়ে গিয়েছিল, গির্জাগুলো মানুষে ভরে গিয়েছিল, দোয়া চলছিল, মানুষ পাদ্রিদের সামনে নিজেদের পাপ স্বীকার করছিল এবং নিজেদের কষ্ট দিয়ে আল্লাহর কাছে রহমতের ফরিয়াদ করছিল। শহরকে রহমতের ছায়ায় আনার জন্য পাদ্রি ও সন্ন্যাসীরা ইঞ্জিল ও ক্রুশ নিয়ে মোনাজাত গাইতে গাইতে শহরে মিছিল বের করল কিন্তু (স্বয়ং লেন পুলের ভাষায়) “আল্লাহ এই শহরের পাপাচার ও কামাসক্তিতে অসন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন, পাপে নিমজ্জিত মানুষের দোয়া তাঁর দরবারে কবুল হয়নি।” [২]

প্রাচীর ভেঙে যাওয়ার পর খ্রিস্টানদের কাছে দুটি পথই খোলা ছিল: তারা আত্মসমর্পণ করবে অথবা লড়াই করতে করতে মারা যাবে। অবশেষে শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধি দল সুলতানের খিদমতে হাজির হলো। প্রতিনিধি দলের সদস্যরা পবিত্র শহর সুলতানের হাতে তুলে দিতে সম্মতি প্রকাশ করল এবং এর বিনিময়ে সুলতানের কাছে জান ও মালের নিরাপত্তা চাইল। কিন্তু সুলতানের ভালোভাবেই মনে ছিল যে, এই ক্রুসেডাররা আল-কুদস দখলের সময় নিরপরাধ মুসলমানদের ওপর কেমন লোমহর্ষক জুলুম চালিয়েছিল। তিনি বললেন:

“আমি তোমাদের কাছ থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস ঠিক সেভাবেই ছিনিয়ে নেব যেভাবে একানব্বই বছর আগে তোমরা মুসলমানদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলে। তখন ক্রুসেডাররা গণহত্যাকে বৈধ মনে করেছিল এবং কোনো প্রাণকে জীবিত ছাড়ে নি। সুতরাং এখন আমি ক্রুসেডারদের পুরুষদের হত্যা করে ধ্বংস করে দেব এবং তাদের নারীদের দাসী বানিয়ে নেব। মন্দের বদলা তার অনুরূপই হয়।”

[১] কিতাবুর রওজাতাইন: সন ৫৮৩ হিজরি

[২] সালাহউদ্দিন লেন পুল, পৃ. ২০১

সুলতান এই উত্তরের মাধ্যমে নিজের কর্তৃত্ব স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন। তবে ফাতহে কুদসের পর তিনি স্থানীয় লোকদের সাথে যে অত্যন্ত উদার আচরণ করেছিলেন, তা সামনে রাখলে পরিষ্কার অনুভূত হয় যে, সুলতান সেই সময় প্রতিনিধি দলের ওপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব এবং নিজের কর্তৃত্বের প্রভাব বিস্তারের জন্য এই কঠোর সিদ্ধান্ত শুনিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন যে, প্রথমে মুসলমানদের ক্রোধ ও শৌর্য-বীর্যের প্রভাব বিস্তার করে শত্রুর অহংকার ও দম্ভের মূর্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া হোক এবং বিজয়ের পর তাদের প্রতি অপ্রত্যাশিত অনুগ্রহ প্রদর্শনের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করা হোক। সুলতানের ঘোষণা খ্রিস্টানদের কাঁপিয়ে দিল। প্রতিনিধি দলের সদস্যরা যখন ফিরে পৌঁছাল, তখন কুদসে এক হাহাকার পড়ে গেল। তখন শহরের অস্থায়ী শাসক বালিয়ান শেষ চেষ্টা হিসেবে নিজে সুলতানের কাছে এল এবং অত্যন্ত অনুনয়-বিনয়ের সাথে শহরবাসীর জন্য নিরাপত্তার আবেদন করল, কিন্তু সুলতানের উত্তর ছিল:

“তোমাদের জন্য কোনো শান্তি নেই, নেই কোনো নিরাপত্তা। এখন লাঞ্ছনাই তোমাদের একমাত্র সঙ্গী।”

অবশেষে বালিয়ান হতাশা ও রাগের মিশ্র আবেগে অভিভূত হয়ে বলল:

“ঠিক আছে, যখন আমরা আপনার নিরাপত্তার ব্যাপারে হতাশ এবং আপনার অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়েছি, তখন আমরা লড়াই করতে করতে মরে যাব। নিজেদের নারী ও শিশুদের আমরা নিজেরাই হত্যা করব, ধন-সম্পদ ও আসবাবপত্রের ভাণ্ডার আগুনে পুড়িয়ে দেব। গম্বুজে সাখরা এবং মসজিদে আকসা ধ্বংস করে দেব। আমাদের কাছে আপনাদের পাঁচ হাজার মুসলমান বন্দি আছে। তাদের সবাইকে হত্যা করব। বলুন, তখন এই বিজয় থেকে আপনারা কী লাভ করবেন?”

সুলতান যখন দেখলেন যে খ্রিস্টানরা হতাশা ও উত্তেজনার চরম পর্যায়ে মসজিদে আকসা পর্যন্ত ধ্বংস করতে প্রস্তুত, তখন তিনি আলোচনার প্রস্তাব গ্রহণ করে নিলেন। এমনিতে সুলতান চেয়েছিলেন ইসলামের শক্তির প্রভাব বিস্তার করে খ্রিস্টানদের হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য করতে এবং এই উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছিল। ফলে সিদ্ধান্ত হলো যে, শহরবাসীদের প্রাণের নিরাপত্তা দেওয়া হবে। তবে তারা বন্দি হিসেবে গণ্য হবে, মুসলমানরা তাদের নির্ধারিত হার বা মুক্তিপণ অনুযায়ী মুক্তি দিতে থাকবে। বালিয়ান, পাদ্রি, হসপিটালারস, টেম্পলারস এবং অন্যান্য যোদ্ধা গোষ্ঠীর সদস্য, پیشہ ور سپاہی (পেশাদার সৈনিক), নাইট, জেরুজালেমের বন্দি রাজা গাই-এর রানি এবং সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তির চুক্তির অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হলেন। সুলতান কোনো চরম শত্রুকেও ব্যতিক্রম করে তার রক্ত ঝরানোর জেদ ধরেননি। ২৭ রজব ৫৮৩ হিজরি (অক্টোবর ১১৮৭ খ্রিস্টাব্দ) তারিখে চুক্তিতে স্বাক্ষর করা হয় এবং শহর মুসলমানদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

এটি ছিল একটি অবিস্মরণীয় দিন। পবিত্র ভূমি সেদিন ইসলামের বিজয়ীদের পদচুম্বন করছিল, মুসলমানদের চেহারা আনন্দ, উল্লাস ও প্রফুল্লতার এমন এক অবস্থা ছিল যা আগে কখনো দেখা যায়নি। কুদসের দুর্গ, প্রাচীর ও বুরুজগুলো থেকে ত্রুশ সরিয়ে ফেলা হচ্ছিল, সেগুলোর জায়গায় লাল হেলালি পতাকা স্থাপন করা হচ্ছিল। গম্বুজে সাখরা থেকে যখন ত্রুশ নামানো হলো, তখন একদিকে মুসলমানদের তাকবির ও তাহলিলের ধ্বনি উচ্চকিত হচ্ছিল এবং অন্যদিকে খ্রিস্টানরা আহাজারি করছিল।

খ্রিস্টানরা মসজিদে আকসার পবিত্রতা ও সৌন্দর্য পদদলিত করে গম্বুজে সাখরা ও মসজিদে আকসার আসল রূপ বিকৃত করে দিয়েছিল। মসজিদের মেহরাব দেয়াল তুলে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল। গম্বুজে সাখরার নিচে গির্জা ও কুরবানগাহ বানিয়ে সেখানে অশালীন ছবির ছড়াছড়ি করা হয়েছিল।

করে দেওয়া হয়েছিল। সেখানে বিদ্যমান পবিত্র পাথর ‘সাখরা শরীফা’র ওপর শূকরের আস্তাবল বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং সাখরাকে মার্বেল পাথরের স্ল্যাব দিয়ে এমনভাবে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল যে তা দেখা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর নির্দেশ অনুযায়ী খ্রিস্টানদের এই সমস্ত নির্মাণ ভেঙে ফেলা হলো, মসজিদের মেহরাব উন্মুক্ত করে দেওয়া হলো, সাখরা শরীফা থেকে মার্বেল পাথরের স্ল্যাবগুলো সরিয়ে ফেলা হলো, মূর্তিগুলো ভেঙে ফেলা হলো, ছবি ও ক্রুশগুলো মুছে ফেলা হলো। কুব্বাতুস সাখরা এবং মসজিদকে সম্পূর্ণভাবে পবিত্র ও পরিষ্কার করা হলো।

মসজিদে আকসায় প্রথম জুমার নামাজ পড়ানোর সৌভাগ্য লাভ করেন দামেস্কের কাজীউল কুজাত মুহিউদ্দিন আবুল মাহালী। তিনি নামাজের আগে প্রাঞ্জল ও অলঙ্কারপূর্ণ আরবিতে এমন চমৎকার খুতবা দিলেন যে মানুষ অভিভূত হয়ে পড়ল। তিনি অত্যন্ত প্রভাবশালী ভঙ্গিতে একটি ভাষণ দিলেন যাতে আনন্দের বহিঃপ্রকাশও ছিল এবং কৃতজ্ঞতার অনুভূতিও। এতে যেমন উদ্দীপনা ছিল তেমনি ছিল গান্ধীর্ষ, যেমন ছিল উৎসাহ প্রদান তেমনি ছিল সতর্কবাণী ও উপদেশ। ভাষণ চলাকালীন উপস্থিতদের অন্তর মোমের মতো গলে যাচ্ছিল, চোখ থেকে অশ্রু বর্ষিত হচ্ছিল এবং হৃদয় কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের আবেগে আপ্লুত ছিল।

এরপর কাজীউল কুজাত দীর্ঘশ্বাস ও কান্নার রোলের মধ্যে এই ব্যাকুল দোয়া করলেন!!

“হে আল্লাহ! এই বাদশাহর শাসনকে টিকিয়ে রাখুন যিনি আপনার মহিমার সামনে অবনত এক বান্দা, আপনার নেয়ামতসমূহের স্বীকৃতিদানকারী এবং আপনার দানের কৃতজ্ঞতা আদায়কারী, যিনি আপনার ধারালো তলোয়ার, যিনি আপনার উজ্জ্বল শিখা। আপনার দ্বীনের রক্ষক। আপনার সীমানার প্রহরী। আপনার বিধানসমূহের দেখাশোনাকারী।

হে আল্লাহ! হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রচেষ্টাকে কবুল করুন, তাঁর আদেশ ও নিষেধসমূহকে পূর্ব থেকে পশ্চিম সারা বিশ্বে কার্যকর করুন। হে আল্লাহ! আপনি ﷺ-এর বরকতে শহরগুলোর কেন্দ্রসমূহকেও কল্যাণময় করে দিন এবং শহরতলীগুলোকেও। দেশের জেলাগুলোকেও সংশোধন করে দিন এবং সীমান্তগুলোকেও। হে আল্লাহ! তাঁদের উসিলায় কাফেরদের বিকৃত চেহারাগুলোকে লাক্ষিত করুন এবং অবাধ্যদের নাক ধুলোয় মিশিয়ে দিন।“ [১]

বিজিতদের সাথে সুলতানের সদাচরণ:

আল-কুদসের অমুসলিমরা চুক্তি অনুযায়ী চল্লিশ দিনের মধ্যে মুক্তিপণের অর্থ পরিশোধ করে পবিত্র ভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য ছিল। মুক্তিপণের অর্থ আদায় এবং খ্রিস্টান জনবসতির স্থানান্তর একটি অত্যন্ত বড় ও জটিল কাজ ছিল, কিন্তু সুলতান সালাহউদ্দিন তা অত্যন্ত সুচারুভাবে সম্পন্ন করেন। প্রত্যেক পুরুষ দশ দিনার, প্রত্যেক নারী পাঁচ দিনার এবং প্রত্যেক শিশু পাঁচ বা দুই দিনার পরিশোধ করে শহর থেকে বের হচ্ছিল। যারা মুক্তিপণ আদায় করছিল তারা সুর অভিযুখে গমনকারী কাফেলাগুলোতে शामिल হচ্ছিল। কাফেলাগুলোকে সুর পর্যন্ত নিরাপদে পৌঁছে দেওয়াও সুলতানের সৈন্যদের দায়িত্ব ছিল। স্থানান্তর প্রক্রিয়ায় সুলতানের বিচক্ষণতা এমন ছিল যে স্থানীয়দের সাথে দুর্ব্যবহারের একটি ঘটনাও ঘটেনি।

খোদ ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা এতে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন এবং সুলতানের এই অতুলনীয় সদাচরণ ও উত্তম ব্যবস্থাপনার

[১] কিতাবুর রওজাতাইন ফি আখবারিদ দাওলাতাইন: বছর ৫৮৩ হিজরি; আল-কামিল ফিত তারিখ: বছর ৫৮৩ হিজরি।

প্রশংসা করেছেন।

সুলতান মুক্তিপণ থেকে প্রাপ্ত এই অর্থ, যা মোট এক লক্ষ দিনার ছিল, কোনো দ্বিধা ছাড়াই রাষ্ট্রের আমীর, উলামা, ফুকাহা, সুফিয়া, মেহমান এবং অভাবীদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। এর মধ্য থেকে তিনি একটি দিনারও নিজের কাছে রাখেননি। পরিশেষে কেবল সেই সব নাসরানিরাই বাকি রয়ে গিয়েছিল যারা মুক্তিপণ আদায় করতে অক্ষম ছিল। চুক্তির অধীনে এরা সবাই গোলাম ছিল, কিন্তু সুলতান এখানেও পূর্ণ উদারতার প্রমাণ দিলেন। বতরিক (প্রধান পাদ্রি) এবং প্রাক্তন শাসক বালিয়ান সুলতানের কাছে আবেদন করলেন যে, তাদের প্রত্যেককে যেন এক হাজার করে লোক দান করা হয়; সুলতান তৎক্ষণাৎ তাদের ইচ্ছা পূরণ করলেন। সুলতান সমস্ত বৃদ্ধদের নিজ থেকেই মুক্ত করে দিলেন। সুলতানের অনেক আমীরও এভাবে সুলতানের কাছে চেয়ে চেয়ে হাজার হাজার নারী-পুরুষকে মুক্ত করে নিলেন। [১]

ক্রুসেড যুদ্ধের একজন বিখ্যাত চরিত্র আর্নল, যিনি এই ঘটনাগুলো স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাঁর বর্ণনা হলো যে, সুলতান নিহত ও বন্দি নাইটদের স্ত্রীদের সাথে অত্যন্ত মহৎ আচরণ করেছিলেন। যখন সেই মহিলারা সুলতানের সামনে নিজেদের দুর্দশার ফরিয়াদ জানাল, তখন সুলতানের চোখে পানি এসে গেল। সেই মহিলাদের স্বামীদের মধ্যে যারা বন্দি ছিল, তাদের তৎক্ষণাৎ মুক্তি দেওয়া হলো। যেসব মহিলার স্বামীরা নিহত হয়েছিল, তাদের মর্যাদানুযায়ী ধন-সম্পদ দিয়ে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে বিদায় জানানো হলো এবং সব উপায়ে তাদের সান্ত্বনা ও সাহস দেওয়া হলো। তারা সুলতানের এই ইহসানে এতই প্রভাবিত হয়েছিল যে, সর্বদা কৃতজ্ঞতাপূর্ণ স্বরে তাঁর দানশীলতার কথা আলোচনা করত। [২]

সুলতানের মেহেরবানি, লেন পুলের জবানিতে:

এই পর্যায়ে লেন পুল প্রথম ক্রুসেড যুদ্ধের সময় কুদস দখলের পর নাসরানিদের দ্বারা মুসলমানদের ওপর করা জুলুমের কথা স্মরণ করে সুলতান সালাহউদ্দিনের রহম ও করমের প্রশংসা না করে থাকতে পারেননি। তিনি বলেন:

“যখন আমরা সুলতানের এই ইহসানগুলোর কথা স্মরণ করি, তখন আমাদের সেই পাশবিক কর্মকাণ্ডের কথা মনে পড়ে যায় যা ক্রুসেডাররা বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়ের সময় করেছিল। যখন গডফ্রে এবং টানক্রেড জেরুজালেমের বাজার দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন সেখানে মুসলমানদের লাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল এবং আহতরা যন্ত্রণায় ছটফট করছিল। যখন ক্রুসেডাররা নিরপরাধ মুসলমানদের কঠোর শাস্তি দিয়ে হত্যা করেছিল এবং মানুষকে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছিল। যখন মুসলমানরা আশ্রয়ের খোঁজে মসজিদে কুদসের ছাদে উঠেছিল এবং নাসরানিরা তাদের সেখানেই তীরের আঘাতে ঝাঁঝরা করে নিচে ফেলে দিয়েছিল। এই ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে তারা খ্রিস্টান জগতের সম্মানে কলঙ্ক লেপন করেছিল এবং এই পবিত্র শহরকে জুলুম ও অপবাদের রঙে রঞ্জিত করেছিল। অথচ মসীহ রহমত ও ভালোবাসার ওয়াজ শুনিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন: ধন্য তারা যারা দয়া করে, কারণ তাদের ওপরও দয়া করা হবে। এই খ্রিস্টানরা সেই বাণী ভুলে গিয়ে মুসলমানদের রক্তে এই পবিত্র শহরকে কসাইখানায় পরিণত করেছিল। এটা ছিল সেই নির্দয় নাসরানিদের সৌভাগ্য যে সুলতান সালাহউদ্দিন তাদের সাথে অনুগ্রহ ও মেহেরবানির আচরণ করেছিলেন।”

[১] সালাহউদ্দিন, লেন পুল, পৃ. ২০২

তারিখ উন্মতে মুসলিমা — চতুর্থ খণ্ড

যদি সালাহউদ্দিনের কীর্তিগুলোর মধ্যে কেবল এই একটি কাজই পৃথিবীতে আলোচিত হতো যে, তিনি কী পদ্ধতিতে জেরুজালেম পুনরুদ্ধার করেছিলেন, তবে এই একটি কীর্তিই এটি প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট ছিল যে, তিনি কেবল তাঁর সময়েরই নন বরং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ উচ্চ সাহসী মানুষ ছিলেন, যিনি শান ও মর্যাদায় অনন্য ও অতুলনীয় ছিলেন। [১]

সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী এই শহরকে পুনরায় ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্রে পরিণত করেন। পুরো বাইতুল মুকাদাসের জন্য হাফেজ, ক্বারী, আলেম, নেককার এবং সুফিদের জামাত গঠন করেন, যারা এখানে সর্বদা জিকির, ইবাদত এবং তিলাওয়াতে মশগুল থাকতেন। আল-কুদসের ব্যবস্থাপনার ব্যয়ের জন্য বড় বড় সম্পত্তি ওয়াকফ করে দেওয়া হয়। এখানে দ্বীনি মাদ্রাসা খোলা হয়, খানকাহ এবং সরাইখানা নির্মাণ করা হয়। সুলতান নূরুদ্দিন জঙ্গি আলেপ্পোতে বাইতুল মুকাদাসের জন্য এমন একটি মিস্বর তৈরি করিয়েছিলেন যার কোনো নজির ছিল না। সুলতান অবিলম্বে আলেপ্পো থেকে সেই মিস্বর আনিয়ে মসজিদে আকসায় স্থাপন করান। আল্লামা ইবনুল আসির বলেন যে, মিস্বর তৈরি এবং তা আল-কুদসে স্থাপনের মধ্যবর্তী সময়ে ২০ বছরেরও বেশি সময় অতিবাহিত হয়েছিল। এটি নূরুদ্দিন জঙ্গির কারামত এবং তাঁর সদিচ্ছার প্রভাব ছিল যে, মৃত্যুর পরেও তাঁর পরিশ্রম ফলপ্রসূ হয়েছিল। [২]

তৃতীয় ক্রুসেড

বাইতুল মুকাদাস বিজয়ের কিছুদিন পর সুলতান উপকূলীয় শহর সুর-এর দিকে অগ্রসর হন, যেখানে ইউরোপ থেকে আসা এক খ্রিস্টান নবাব কনরাড মারকুইস বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়ে অবস্থান নিয়েছিলেন। এই উপদ্বীপ শহরটির তিন দিক সমুদ্রের কারণে আগে থেকেই বড় ধরনের আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত ছিল। সুলতান সালাহউদ্দিন ৯ রমজান ৫৮৩ হিজরি (১২ নভেম্বর ১১৮৭ খ্রিস্টাব্দ) সুর-এ পৌঁছান। শহরের ওপর একের পর এক আক্রমণ এবং বারবার ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার পর সুলতান নৌবাহিনী ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেন।

সুলতানের বার্তায় মিশরীয় নৌবাহিনীর কমান্ডার আবদুস সালাম মাগরিবি তাঁর যুদ্ধজাহাজগুলো সুর-এর যুদ্ধজাহাজগুলোর মোকাবিলায় নিয়ে আসেন, ফলে সুর-এর বাহিনীর প্রতিরক্ষা দুর্বল হয়ে পড়ে। বিজয় ও সাহায্য মাত্র কয়েক কদম দূরে ছিল, কিন্তু একটি সামান্য ভুল যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিল। এক রাতে নৌবাহিনীর প্রহরীদের চোখ লেগে যায় এবং ফিরিঙ্গিরা অত্যন্ত নিঃশব্দে নৌকার মাধ্যমে মুসলমানদের জাহাজ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। মুসলমানরা তাদের জাহাজগুলো বের করে নিয়ে যাওয়ার আশ্রয় চেষ্টা করে, কিন্তু ফিরিঙ্গিরা তাড়া করে তাদের কাছে চলে আসে। পথ রুদ্ধ দেখে মুসলমানরা জাহাজের মুখ উপকূলের দিকে ঘুরিয়ে দেয় এবং সেগুলোকে বালিতে ডুবিয়ে অকেজো করে দেয় যাতে সেগুলো শত্রুর হাতে না পড়ে। এরপর নৌ-শক্তি না থাকার কারণে মুসলমানদের বিজয়ের সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে যায়। [৩]

[১] সালাহউদ্দিন, লেন পুল, পৃ. ২০৪, ২০৫

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: বছর ৫৮৩ হিজরি; কিতাবুর রওজাতাইন: বছর ৫৮৩ হিজরি; আন-নাওয়াদিরুস সুলতানিয়া, পৃ. ৫৫

[৩] আল-কামিল ফিত তারিখ: বছর ৫৮৩ হিজরি

মধ্য সিরিয়ার নাসারাদের বিরুদ্ধে অভিযানসমূহ:

অবশেষে সুলতান অবরোধ তুলে নিয়ে উত্তর সিরিয়ার অন্যান্য শহরের দিকে অগ্রসর হলেন। এখানে তিনি বছরব্যাপী অভিযান পরিচালনা করেন এবং একে একে জাবলা, লাজকিয়া, তারতুস, সাহিউন, বাঘরাস, সারমিনিয়া এবং বারজিয়ার মতো অপরাজেয় দুর্গগুলো জয় করেন। এভাবে আন্তাকিয়া পর্যন্ত সমস্ত উপকূলীয় এলাকা তাঁর দখলে চলে আসে এবং রাজ্যের মাঝখানে অবস্থিত নাসারারা বহিরাগত সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। এরপর সুলতান মধ্য সিরিয়ার দুর্গগুলো দখল করেন, যার মধ্যে সাফাদ এবং হিসন কাওকাব উল্লেখযোগ্য। [১]

এই সময়ে মার্গারিট নামক এক ইউরোপীয় নবাব নৌবহর নিয়ে উপকূলীয় নাসারাদের সাহায্যের জন্য পৌঁছান, কিন্তু তাঁর বাহিনী অবতরণ করার আগেই সুলতান অধিকাংশ শহর জয় করে নিয়েছিলেন। এটি দেখে মার্গারিট সুলতানের সাথে সাক্ষাতের চেষ্টা করেন। উদ্দেশ্য ছিল সুলতানকে এই বিষয়ে রাজি করানো যেন নাসারাদের শহরগুলো পূর্ববর্তী শাসকদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তিনি উপস্থিত হয়ে সুলতানকে অধিকৃত খ্রিস্টান এলাকাগুলোর ব্যাপারে নীতি পরিবর্তনের পরামর্শ দেন। তিনি বলেন:

“আপনি অনেক বড় বাদশাহ, দয়ালু শাসক, আপনার ন্যায়বিচার ও অনুগ্রহের চর্চা সবদিকে রয়েছে। আপনি নাসারাদের যে দশা করার তা করেছেন। এখন তারা বাধ্য ও অসহায় হয়ে পড়েছে। কতই না ভালো হতো যদি উপকূলীয় সিরিয়ার খ্রিস্টান শাসকদের আপনার পৃষ্ঠপোষকতায় রেখে, অনুগ্রহ ও পুরস্কারের সাথে তাদের শহরগুলো ফিরিয়ে দিতেন। এভাবে তারা আপনার আঙাবহ গোলাম হয়ে যাবে। আপনি দূরে থাকুন বা কাছে, তারা আপনার অনুগত থাকবে।”

সুলতান এই প্রস্তাবকে গুরুত্বযোগ্য মনে না করলে মার্গারিট গুরুতর পরিণতির বিষয়ে সতর্ক করে বলেন:

“যদি আপনি এমনটি না করেন, তবে সমুদ্রের ওপারের সমস্ত দেশের সেনাবাহিনী কাতারে কাতার আপনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং ঢেউয়ের মতো ঢেউ উপকূলে ছেয়ে যাবে। উত্তম এটাই যে, আপনি এখানকার স্থানীয় খ্রিস্টান শাসকদের পিছু ছেড়ে দিন এবং তাদের ক্ষমা করুন।”

সুলতান এই হুমকিতে ভীত না হয়ে জবাব দেন:

“আল্লাহ তাআলা আমাদের জমিন জয় করার নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা তাঁর আনুগত্য করতে বাধ্য এবং একে ফরজ মনে করি, জিহাদে সক্রিয় থাকা আমাদের ওপর আবশ্যিক। আল্লাহ তাআলাই আমাদের শহরগুলো জয়ের তৌফিক দিয়েছেন। যদি জমিনের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ছড়িয়ে থাকা সমস্ত সৃষ্টিও আমাদের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়ে যায়, তবুও আমরা মোকাবিলার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার ওপরই ভরসা করি। আমাদের শত্রুদের সংখ্যার কোনো পরোয়া নেই।” [২]

তৃতীয় ক্রুসেড উসকে দেওয়ার জন্য নাসারাদের অপকৌশল:

বাইতুল মুকাদ্দাসের ওপর সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর দখলের খবরে পুরো ইউরোপে অস্থিরতার এক ঢেউ খেলে যায়।

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: বছর ৫৮৪ হিজরি

[২] আন-নাওয়াদিরুস সুলতানিয়া, পৃষ্ঠা ৬৩

ছিল। আল-কুদসের প্রধান পাদ্রী উইলিয়াম সুরি সন্ন্যাসী, ধর্মীয় নেতা এবং অভিজাতদের একটি প্রতিনিধি দলের সাথে কালো শোকের পোশাকে সজ্জিত হয়ে রোমে পৌঁছান এবং পোপের পৃষ্ঠপোষকতায় পুরো ইউরোপ সফর করেন। তিনি মুসলমানদের অত্যাচারের কাল্পনিক কাহিনীর মাধ্যমে বরফশীতল ইউরোপকে একটি জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরিতে পরিণত করেন।

কনরাড ইউরোপের সরলমনা জনগণকে উত্তেজিত করার জন্য এটি প্রচার করে দেন যে, মুসলমানরা মসীহের মাজারের চরম অবমাননা করছে। তিনি একটি বিশাল ছবি তৈরি করান যাতে দেখানো হয়েছিল যে, একজন মুসলিম অশ্বারোহী মসীহের কবরকে ঘোড়া খুর দিয়ে পদদলিত করছে এবং ঘোড়াটি কবরের ওপর প্রস্রাব করছে। এই বিশাল ছবি ইউরোপের কোণায় কোণায় ঘোরানো হয় এবং বড় বড় জনসভায় প্রদর্শন করা হয়। পাদ্রীরা চিত্রশিল্পীদের দিয়ে এমন সব ছবিও আঁকাতেন যাতে একজন আরব ব্যক্তিকে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম-এর সাথে যুদ্ধ করতে দেখানো হতো। কিছু ছবিতে এই দৃশ্য উপস্থাপন করা হতো যে, ঈসা আলাইহিস সালাম সেই আরব ব্যক্তির হাতে প্রহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেছেন এবং তাঁর শরীর থেকে রক্ত বরছে। মানুষ এই ভয়াবহ ছবিগুলো দেখে পাদ্রীদের জিজ্ঞেস করত: “এই ব্যক্তি কে যে যিশু খ্রিস্টকে মারছে?”

পাদ্রীরা উত্তর দিত: “এটি আরবের নবী, যে যিশু খ্রিস্টকে মারছে; দেখো তাকে কত ক্ষতবিক্ষত করেছে। আর এই দেখো! মসীহ তার হাতে মারা গেছেন।”

এটি শুনে মানুষ উচ্চস্বরে কানাকাটি করত। ইউরোপের শাসকরাও এই অস্থিরতা ও চাঞ্চল্যকে একটি নতুন ধর্মীয় যুদ্ধের প্রস্তুতির দিকে মোড় নিতে দেরি করেননি এবং সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ইসলামি বিশ্বকে তছনছ করে দেওয়ার আবেগ যুদ্ধরত ইউরোপীয় সরকারগুলোকে একটি লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ করে দিল। [১]

পোপ ক্রুসেডারদের মনোবল বৃদ্ধির জন্য ঘোষণা করেন যে, পবিত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। তিনি এও বলেন যে, এতে অংশ না নেওয়া ব্যক্তিদের বিবাহ করা এবং আহার করা হারাম হবে। যুদ্ধের খরচ মেটানোর জন্য ‘সালাহউদ্দিন উশর’ (Saladin tenth) নামে ইউরোপে একটি নতুন কর আরোপ করা হয়, যার মাধ্যমে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তার সম্পদের দশমাংশ ক্রুসেডের জন্য দেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। পাদ্রীরা বলছিলেন যে, যে ব্যক্তি এই কর পরিশোধে অবহেলা করবে তাকে খ্রিস্টধর্ম থেকে বহিস্কৃত বলে গণ্য করা হবে। ব্রিটিশ রাজা রিচার্ড সেই দিনগুলিতেই সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। তিনি সবার আগে ক্রুশ তুলে নিয়ে খ্রিস্টধর্মের বিজয়ের জন্য জীবন বাজি রাখার ঘোষণা দেন। এরপর ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ অগাস্টাস, জার্মানির শাসক ফ্রেডরিক বারবারোসা এবং সিসিলির শাসক উইলিয়াম দ্য গুডও একই উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে ইসলামি বিশ্বের ওপর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। [২]

নারীরাও এই যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল ছিল, ফলে অসংখ্য নারী লঙ্করে शामिल হয়।

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: সন ৫৮৫ হিজরি

[২] হায়াতে সালাহউদ্দিন আইয়ুবী, সিরাজ উদ্দিন আহমদ, পৃষ্ঠা ১৪৯, বরাতে: মাজাজ, পৃষ্ঠা ৩৩২

লক্ষ লক্ষ মা তাদের সন্তানদের এই যুদ্ধের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। যারা শারীরিক অক্ষমতা বা অন্য কোনো কারণে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারছিলেন না, তারা নিজেদের পরিবর্তে অন্য ব্যক্তিদের প্রস্তুত করে পাঠিয়েছিলেন। অনেক মানুষ যোদ্ধাদের পুঁজি ও অস্ত্র সরবরাহ করে নিজেদের দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছিলেন।

ক্রুসেডের এই প্রস্তুতি আল-কুদসের ওপর সুলতান আইয়ুবীর দখলের কয়েক মাস পরেই শুরু হয়েছিল, কিন্তু নিয়মিত বাহিনী প্রেরণের প্রক্রিয়া বিলম্বিত হতে থাকে। অবশেষে রবিউল আখের ৫৮৫ হিজরি (মে ১১৮৯ খ্রিস্টাব্দ) মাসে জার্মানির রাজা ফ্রেডরিক বারবারোসা আড়াই লক্ষ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে সর্বপ্রথম যাত্রা শুরু করেন। পশ্চিমা ঐতিহাসিকদের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, বারবারোসা যাত্রার আগে সুলতান আইয়ুবীকে একটি হুমকিমূলক চিঠিও লিখেছিলেন, যাতে অত্যন্ত অহংকার ও দম্ভের সাথে বলা হয়েছিল: “জানা গেছে যে আপনি পবিত্র ভূমিকে অপবিত্র করেছেন এবং এক অপরাধমূলক সাহসিকতার ধৃষ্টতা দেখিয়েছেন। আমরা চিরস্থায়ী সম্রাট এবং ফিলিস্তিনের রক্ষক হিসেবে আপনাকে বারো মাসের সময় দিচ্ছি যাতে আপনি পবিত্র ভূমি খালি করে খ্রিস্টানদের সম্ভ্রষ্ট করেন, অন্যথায় আমরা যুদ্ধের জন্য আসছি।”

এই চিঠিতে সে নিজের সম্পর্কে ভিত্তিহীন আশ্বালন করার পর তার সহযোগী নবাব ও কর্মকর্তাদের তালিকা দিয়ে সুলতানকে ভীত করার চেষ্টা করেছিল। সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবীকে কি এসব কথায় দমানো সম্ভব ছিল? তিনি এই চিঠির কড়া জবাব দেন এবং মুসলমানদের শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে ও নিজের সহযোগীদের নাম উল্লেখ করার পর স্পষ্ট ভাষায় লেখেন: “খ্রিস্টানরা যদি নিজেদের কল্যাণ চায়, তবে তাদের কাছে যে শহরগুলো অবশিষ্ট রয়েছে সেগুলো ছেড়ে দিয়ে ফিরে যাক, অন্যথায় আমরা সেই শহরগুলোও একইভাবে শক্তির জোরে জয় করে দেখাব।” [১]

তৃতীয় ক্রুসেড এবং আক্কার রণাঙ্গন:

সুলতান সালাহউদ্দীন হিত্তিনের ঐতিহাসিক যুদ্ধে জেরুজালেমের রাজা গাই-কে বন্দী করার পর এই প্রতিশ্রুতিতে মুক্তি দিয়েছিলেন যে, সে ভবিষ্যতে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করবে না। কিন্তু গাই মুক্তির পর মুসলমানদের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতিতে লিপ্ত হয়। সে পরাজিত ও বিক্ষিপ্ত খ্রিস্টান সৈন্য এবং স্বেচ্ছাসেবকদের এক বিশাল দলকে নিজের চারপাশে একত্রিত করে। এরপর সে সিরিয়ার উপকূলীয় শহর সুর-এ গিয়ে কনরাড মার্কুইস-এর সাথে জোটবদ্ধ হয়। জমাদিউল আউয়াল ৫৮৫ হিজরি (জুলাই ১১৮৯ খ্রিস্টাব্দ) মাসে গাই তার বাহিনী নিয়ে সুর থেকে আক্কার দিকে রওনা হয়। সেখানে পৌঁছে সে শহরটি অবরোধ করে। এই সময়ে বেশ কয়েকজন ইউরোপীয় নবাব এবং তারপর কনরাড মার্কুইসও তাদের বাহিনী নিয়ে সমুদ্রপথে তার কাছে এসে পৌঁছান এবং আক্কাতে স্থল ও জল উভয় দিক থেকে অবরোধ করা হয়। ক্রুসেডারদের উদ্দেশ্য ছিল উপকূলীয় শহরগুলো জয় করে সেগুলোকে বায়তুল মুকাদ্দাস আক্রমণের জন্য সেনানিবাস হিসেবে ব্যবহার করা।

আক্কার ঐতিহাসিক শহরটি স্থলের একটি দীর্ঘ ও সরু ভূখণ্ডের ওপর অবস্থিত ছিল, যা মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সমুদ্রের অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এটি

[১] হায়াত-এ-সালাহউদ্দীন আইয়ুবী, সিরাজ উদ্দিন আহমদ, পৃষ্ঠা ১৫০।

বনী চারপাশ থেকে উঁচু প্রাচীর দ্বারা ঘেরা ছিল। শহরের প্রাচীর ছিল দ্বিমুখী এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত মজবুত। ক্রুসেডাররা শহরের সামনে মাটির প্রাচীর দিয়ে ঘেরা একটি পাহাড় তৈরি করে আক্কা থেকে উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত ধনুকের মতো ঘিরে ফেলে এবং শহরের ওপর জোরালো আক্রমণ শুরু করে দেয়। ইউরোপীয় সৈন্যদের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকে। সুলতান সালাহউদ্দিনের মনে মুসলিম বিশ্বের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ ছিল। বাহাউদ্দিন ইবনে শাদাদের বর্ণনা অনুযায়ী, সুলতানের অবস্থা তখন এমন ছিল যেন কোনো মায়ের সন্তান হারিয়ে গেছে। সুলতানি বাহিনী প্রায় পাঁচ মাইল দূর থেকে আক্কা অবরোধকারী ক্রুসেডারদের চারপাশে বেষ্টিত তৈরি করে ফেলে। এই অবস্থায় এখানে দুই বছর পর্যন্ত যুদ্ধ চলতে থাকে। হাজার হাজার মুসলমান শহীদ হন, কিন্তু মুসলমানরা ক্রুসেডারদের আক্কা থেকে বায়তুল মুকাদাসের দিকে এগোতে দেয়নি। [১]

২১ শাবান ৫৮৫ হিজরি (৪ অক্টোবর ১১৮৯ খ্রিস্টাব্দ) আক্কার সামনে সেই ঐতিহাসিক লড়াই সংঘটিত হয় যা ‘মারাকায়ে কুবরা’ (মহা যুদ্ধ) নামে পরিচিত। এটি ছিল আক্কা রণাঙ্গনের কঠিনতম লড়াই যাতে উভয় পক্ষ তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মুসলমানরা অনেকবার খ্রিস্টানদের হটিয়ে দেয় এবং অনেকবার খ্রিস্টানরা তাদের পেছনে ঠেলে দিতে সক্ষম হয়।

যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে হঠাৎ মুসলমানদের মূল বাহিনীর (কলব) পা টলে যায়। খ্রিস্টান অশ্বারোহীরা মুসলমানদের ব্যুহ ভেদ করে ডানে-বামে তছনছ করে দেয়। মূল বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্য পলায়ন করে। এই অত্যন্ত নাজুক পরিস্থিতিতেও সুলতান সালাহউদ্দিন মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অটল থাকেন। তিনি বিক্ষিপ্ত সৈন্যদের সংগঠিত করে মুহূর্তের মধ্যে নতুন ব্যুহ রচনা করেন এবং নিজের পাল্টা কৌশলের মাধ্যমে ক্রুসেডারদের পিছু হটতে বাধ্য করেন। [২]

এই রণাঙ্গনে শীতের দিনগুলো ছিল অত্যন্ত তীব্র। এমন আবহাওয়ায় রোগব্যাদি ছড়িয়ে পড়ত এবং যুদ্ধ সাময়িকভাবে থেমে যেত, তবে ছোটখাটো সংঘর্ষ চলতেই থাকত। এই সময়ে জার্মানির সম্রাট এক বিশাল বাহিনী নিয়ে কনস্টান্টিনোপল ও এশিয়া মাইনরের পথে আড়াই লক্ষ সৈন্যসহ সিরিয়ার কাছাকাছি পৌঁছে যান। সুলতান আলেপ্পো ও উত্তরের শহরগুলোর সৈন্যদের গেরিলা আক্রমণের মাধ্যমে জার্মানদের পথ রোধ করার নির্দেশ দেন। এমন অবস্থায় কেবল সিরিয়া ও ফিলিস্তিন নয়, আল-জাজিরা ও ইরাকের মানুষও নিজেদের বিপদের মুখে অনুভব করছিল। আল্লামা ইবনুল আসির সেই ভয় ও আতঙ্কের চিত্র তুলে ধরে বলেন:

“মুসলমানদের অবস্থা ঠিক তেমনই ছিল যেমনটি আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: ‘ইয জাউকুম মিন ফাওকিকুম ওয়া মিন আসফালা মিনকুম ওয়া ইয যাগাতিল আবসারু ওয়া বালাগাতিল কুলুবুল হানাজিরা ওয়া তাযুননুনা বিল্লাহিয যুনুনা’

(যখন কাফিররা তোমাদের ওপর ওপরের দিক থেকে এবং নিচের দিক থেকেও চড়াও হয়েছিল এবং যখন চোখগুলো স্থির হয়ে গিয়েছিল এবং প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছিল আর তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা রকম ধারণা করতে শুরু করেছিলে।)” [৩]

[১] কিতাবুর রওজাতাইন: সন ৫৮৫ হিজরি; আন-নাওয়াদিরুস সুলতানিয়া, পৃষ্ঠা ১২৬ থেকে ১২৯।

[২] কিতাবুর রওজাতাইন: সন ৫৮৫ হিজরি; আন-নাওয়াদিরুস সুলতানিয়া, পৃষ্ঠা ১৭০ থেকে ১৭৭।

[৩] আল-কামিল ফিত তারিখ, সন ৫৮৭ হিজরি; আন-নাওয়াদিরুস সুলতানিয়া, পৃষ্ঠা ১৯০।

কিন্তু আল্লাহ মুসলমানদের সাহায্য করলেন। জার্মানদের একটি বড় অংশ আবহাওয়ার কঠোরতা এবং রোগের শিকার হয়ে পথেই শেষ হয়ে গেল। স্বয়ং জার্মান সম্রাট পথের একটি নদীতে ডুবে মারা গেলেন। অবশিষ্ট বাহিনীকে সুলতানের গেরিলা যোদ্ধারা নিজেদের কবজায় নিয়ে নিল। অতি কষ্টে মাত্র দুই-আড়াই হাজার জার্মান রণক্ষেত্রে পৌঁছাতে সক্ষম হলো।

ক্রুসেডাররা আক্কা জয় করার জন্য নিত্যনতুন কৌশল ব্যবহার করল। তারা বেশ কিছু বিশালকার দাব্বাবা (অবরোধ টাওয়ার) তৈরি করল যা ছিল লোহা ও কাঠের তৈরি ভ্রাম্যমাণ মিনার। এগুলোর ওপর আগুনেরও কোনো প্রভাব পড়ত না। এগুলোর মাধ্যমে ক্রুসেডাররা আক্কার সুউচ্চ প্রাচীর টপকাতে পারত। কিন্তু সুলতানের বাহিনীর এক যুবক আলী বিন আরিফ একটি নতুন রাসায়নিক দ্রবণ তৈরি করলেন। ২৮ রবিউল আউয়াল ৫৮৬ হিজরি (৫ মে ১১৯০ খ্রিষ্টাব্দ) ইবনে আরিফ তাঁর এই অদ্ভুত মিশ্রণটি ব্যবহার করলেন এবং দাব্বাবাগুলোকে পুড়িয়ে ছাই করে দিলেন। ফ্রাঙ্কদের মনোবল ভেঙে পড়ছিল, এমন সময় ফ্রান্সের রাজার ভতিজা হেনরি কাউন্ট অফ শ্যাম্পেইন বিশাল এক সাহায্যকারী বাহিনী নিয়ে এসে পৌঁছালেন। ক্রুসেডাররা আবারও খোলা ময়দানে বেরিয়ে এসে অগ্রসর হলো এবং এভাবে সেই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হলো যার প্রথম দিনের লড়াইকে “معركة مرج عكا” (মারজ আক্কার যুদ্ধ) এবং দ্বিতীয় দিনের লড়াইকে “نوبه الشهر” (নুবাতুশ শাহর) বা “আক্কা নদীর যুদ্ধ” বলা হয়। এই লড়াই তিন দিন পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। এই সময়ে সুলতান তীব্র অসুস্থতা এবং অসহ্য যন্ত্রণা সত্ত্বেও যে সাহস, দৃঢ়তা এবং ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে লশকরে ইসলামের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাকে সুলতানের কারামত হিসেবেই অভিহিত করা যেতে পারে।

সেই সময় সুলতানের অসুস্থতা কতটা তীব্র ছিল, সে সম্পর্কে ইবনে শাদ্দাদ লিখেছেন:

“আমি সুলতানকে মারজ আক্কার রণক্ষেত্রে দেখেছি যে তিনি গুরুতর অসুস্থ ছিলেন। শরীরের কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত প্রচুর ফোঁড়া উঠেছিল, যার কারণে তিনি ঠিকমতো বসতেও পারছিলেন না। যখন তাঁবুতে থাকতেন, তখন এক পাশে ভর দিয়ে আধশোয়া হয়ে থাকতেন। বসার অক্ষমতার কারণে তাঁর সামনে রাখা খাবারের দিকে হাত বাড়ানোও সম্ভব ছিল না। খাবার আনা হলে বলতেন যে মানুষের মাঝে বিলিয়ে দাও। কিন্তু তা সত্ত্বেও সকাল থেকে জোহর নামাজ পর্যন্ত এবং আসর থেকে মাগরিব নামাজ পর্যন্ত ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে অনবরত সারিতে চক্কর দিতেন এবং কষ্টের তীব্রতা ও ফোঁড়ার যন্ত্রণা ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে সহ্য করতেন, যাতে আমরা বিস্ময় প্রকাশ করতাম। কিন্তু তিনি জবাবে বলতেন: ‘যখন আমি ঘোড়ায় সওয়ার হই, তখন এই কষ্ট অনুভব করি না। যখনই নিচে নামি, এই কষ্ট আবার ফিরে আসে।’”

যুদ্ধের সূচনা ১১ শাওয়াল ৫৮৬ হিজরি (১১ নভেম্বর ১১৯০ খ্রিষ্টাব্দ) তারিখে হয়েছিল। শত্রু সামনে এগিয়ে আসছিল। সুলতানের নির্দেশ অনুযায়ী তীরন্দাজদের দলগুলো একের পর এক দ্রুত সামনে এগিয়ে গিয়ে শত্রুর ওপর তীরের বৃষ্টি বর্ষণ করত এবং তারপর টিলার চড়াই-উতরাইয়ে অদৃশ্য হয়ে যেত। যখন ফ্রাঙ্করা সামনে এগিয়ে গেল, তখন সুলতান আইয়ুবী তাঁর বাহিনীর একটি অংশকে অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরিয়ে ফ্রাঙ্কদের পশ্চাতে মোতায়েন করে দিলেন। এভাবে ফ্রাঙ্কদের ফেরার পথ বন্ধ হয়ে গেল, তাদের...

[১] আন-নাওয়াদিরুস সুলতানিয়াহ, পৃষ্ঠা ৭।

...এবং তাদের ছাউনি তোরোনের মাঝখানে মুসলমানদের দলগুলো দাঁড়িয়ে গেল।

পরের দিন উভয় পক্ষ তাদের পূর্ণ শক্তি নিয়ে মুখোমুখি হলো। দুপুর সাড়ে বারোটার দিকে এই অপ্রথাগত যুদ্ধ তার চরম শিখরে পৌঁছে গেল। ইসলামী লস্কর থেকে তাকবীর ও তাহলীলের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল, তীরের শৌ শৌ শব্দে আকাশ প্রকম্পিত হচ্ছিল। খ্রিস্টানরা বিউগল ও বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে তাদের যুবকদের উৎসাহিত করছিল। সুলতান ক্রমাগত সতেজ বাহিনী সামনে পাঠিয়ে ফিরিঙ্গিদের মজবুত ব্যুহ ভাঙার চেষ্টা করছিলেন। তিনি সেদিন শত্রুর বিরুদ্ধে তার পুরো জনশক্তি ব্যবহার করে ফেলেন, এমনকি নিজের ছেলেদেরও এই ভয়াবহ যুদ্ধে নামিয়ে দেন। শেষ পর্যন্ত সুলতানের কাছে কেবল কাজী বাহাউদ্দিন, রাজকীয় চিকিৎসক এবং কয়েকজন গোলাম অবশিষ্ট ছিলেন, যাদের হাতে ছোট-বড় পতাকা উড়ছিল। দূর থেকে দেখলে মনে হচ্ছিল সুলতান একটি বিশাল বাহিনী নিয়ে পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন, যদিও সেখানে সুলতানের কোনো রক্ষীবাহিনীও উপস্থিত ছিল না। যদি ফিরিঙ্গিদের কোনো ছোট দলও এই দিকে চলে আসত, তবে সুলতানের পক্ষে বেঁচে ফেরা কঠিন হয়ে পড়ত। [১]

সুলতানের শরীর এতটাই অসুস্থ ছিল যে তিনি নড়াচড়া করার মতো অবস্থায় ছিলেন না। কাজী বাহাউদ্দিন ইবনে শাদ্দাদ রহ. বর্ণনা করেন যে, যুদ্ধের কিছু ভয়াবহ মুহুর্তে সুলতান এই অনুশোচনায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও কেঁদে ফেলতেন যে তিনি নিজে এগিয়ে গিয়ে যুদ্ধে শরিক হতে পারছেন না। এই সময়ে একজন আমীর সুলতানকে আরজ করলেন: “উভয় লস্করের প্রচুর মানুষ নিহত হচ্ছে।”

জবাবে সুলতান ব্যথিত কণ্ঠে একজন আরব কবির এই পঙক্তিটি পাঠ করলেন:

اُقْتُلَانِي وَ مَالِكًا وَ اُقْتُلَا مَالِكًا مَعِيَ

(আমাকে মালিকসহ হত্যা করো এবং মালিককে আমার সাথে হত্যা করো।) [২]

অবশেষে ফিরিঙ্গিরা পিছু হটে পুনরায় তাদের ছাউনিতে ঢুকে পড়ল। এই দিনের যুদ্ধের ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে কাজী ইবনে শাদ্দাদ রহ. বলেন: “মুসলমানরা সেদিন দুর্দান্ত যুদ্ধ করেছে এবং জিহাদের হক আদায় করে দিয়েছে।” [৩]

শাহ ফ্রান্স এবং শাহ ইংল্যান্ডের আগমন:

ক্রুসেডারদের কাছে আসা সাহায্য তাদের ভেঙে পড়া মনোবল পুনরুদ্ধার করতে থাকে। রবিউস সানি ৫৮৭ হিজরি (মে ১১৯১ খ্রিষ্টাব্দ) মাসে ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ অগাস্টাস এবং এরপর ব্রিটেনের রাজা রিচার্ড তাদের পঙ্গপাল সদৃশ বিশাল বাহিনী নিয়ে এক্কা উপকূলে অবতরণ করেন এবং পুনরায়...

[১] আন-নাওয়াদিরুস সুলতানিয়াহ, পৃ. ২২২ থেকে ২২৭; কিতাবুর রওজাতাইন: বছর ৫৮৬ হিজরি।

[২] আন-নাওয়াদিরুস সুলতানিয়াহ, পৃ. ২২৭ এর অর্থ ছিল যে, যদি আমাদের সাথে ইসলামের এই শত্রুরা খতম হয়ে যায়, তবে আমি নিজের জীবনের বিনিময়েও তা সানন্দে গ্রহণ করতে রাজি আছি।

দ্রষ্টব্য: সুলতান থেকে এই পঙক্তিটি “উকতুলানি” দ্বিবাচন হিসেবে বর্ণিত হয়েছে, যেখানে আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রাযি. থেকে এটি বহুবচন হিসেবে “উকতুলুনি” বর্ণিত হয়েছে। তিনি এই পঙক্তিটি জঙ্গ জামালে মালিক বিন হারিস ওরফে আশতার নাখয়ীর সাথে লড়াই করার সময় পাঠ করেছিলেন। লড়াই করতে করতে তারা দুজনেই নিচে পড়ে গিয়েছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রাযি. এই পঙক্তিটি পড়ে তার সাথীদের ইশারা করছিলেন যেন তারা আক্রমণ করে যাতে মালিক নিহত হয়, যদিও আমি তার সাথে মারা যাই। কিন্তু মানুষ আশতারকে তার আসল নাম “মালিক” হিসেবে চিনত না, তাই তারা অবাক হয়ে ভাবছিল যে ইবনে জুবায়ের রাযি. কোন মালিকের কথা বলছেন। (তারিখে তাবারী: ৩/৫১৯, ৫২০) একটি বর্ণনা অনুযায়ী এই পঙক্তিটি আবদুর রহমান বিন আততাব বিন আসীদ আশতার নাখয়ীর সাথে লড়াই করার সময় পাঠ করেছিলেন। (মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, খণ্ড: ৯/৪৭৭, ৪৭৮, ৩৭৭) এটি নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি যে এটি আসলে কোন কবির কালাম।

[৩] আন-নাওয়াদিরুস সুলতানিয়াহ, পৃ. ২২৭

প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। এখন ক্রুসেডারদের অধিক মনোযোগ ছিল আক্কার প্রাচীর জয় করার দিকে। [১]

এক ইউরোপীয় মহিলার আত্ননাদ:

সেই দিনগুলোতে কোনো এক মুসলিম এক অভিযানে ফ্রাঙ্কদের একটি তাবু থেকে এক দুগ্ধপোষ্য শিশুকে তুলে নিয়ে আসে। শিশুর মা এই শোকে দিশেহারা হয়ে পড়ে, সে কাঁদতে কাঁদতে ক্রুসেডার নেতাদের কাছে যায়। তারা মহিলাকে আশ্বস্ত করে বলল:

“মুসলমানদের বাদশাহ অত্যন্ত দয়ালু, তুমি তার কাছে গিয়ে তোমার সন্তান চাও।”

মহিলা দৌড়ে মুসলমানদের শিবিরের দিকে রওনা হলো। একজন মামলুক অফিসার তাকে সাথে নিয়ে সুলতানের কাছে এলেন। মহিলা যখন তার দুঃখ-বেদনার কথা বর্ণনা করল, তখন সুলতানের ওপর ভাবাবেগ ছেয়ে গেল, চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। তিনি নির্দেশ দিলেন যেন শিশুকে অবিলম্বে খুঁজে বের করে আনা হয়। কর্মচারীরা চারদিকে দৌড়ে গেল। অবশেষে শিশুর সন্ধান পাওয়া গেল। শিশুকে মহিলার কোলে তুলে দেওয়া হলো এবং সে তার কলিজার টুকরোকে বুকে জড়িয়ে ধরে দুধ খাওয়াতে লাগল। সুলতানের নির্দেশে ওই মহিলাকে একটি ঘোড়ায় চড়িয়ে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সাথে তার তাবু পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া হলো। সুলতান এই ঘটনার সমাপ্তি পর্যন্ত সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। যুদ্ধাবস্থায়ও শত্রুদের সাথে এমন উদার আচরণ সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর উচ্চ চরিত্রের এক উজ্জ্বল প্রমাণ। [২]

আক্কার পতন:

অবশেষে ক্রুসেডাররা দিন-রাত পরিশ্রম করে আক্কার পরিখা ভরাট করে ফেলল এবং প্রাচীরের ওপর সরাসরি আক্রমণ করতে শুরু করল। পাথর নিক্ষেপের ফলে আক্কার প্রাচীরে ফাটল ধরে গেল। জমাদিউল উলা ৫৮৭ হিজরি (জুন ১১৯১ খ্রিষ্টাব্দ) মাসে রিচার্ড বাইরের প্রাচীরের সবচেয়ে শক্তিশালী বুরুজ “বুরুজ আল-কিতাল”-এ সুড়ঙ্গ খুঁড়ে তা ধসিয়ে দেয়। যখনই ফ্রাঙ্করা আক্কার ওপর আক্রমণ করত, আক্কাবাসী নাকাড়া বাজিয়ে সুলতানের বাহিনীকে সতর্ক করে দিত। সুলতান পেছন থেকে ফ্রাঙ্কদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন এবং ফ্রাঙ্করা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে লড়াই করত: এক অংশ সুলতানের বাহিনীকে বাধা দিত এবং অন্য অংশ আক্কার প্রাচীর জয় করার চেষ্টা করত।

এই সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও অবশেষে ১৭ জমাদিউল আখিরা ৫৮৭ হিজরি (১১ জুলাই ১১৯১ খ্রিষ্টাব্দ) তারিখে শহরের আমির সাইফুদ্দীন মাশতুব পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে দেখে শহরবাসীর প্রাণের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতিতে আত্মসমর্পণ করেন। [৩]

উপকূলীয় যুদ্ধ:

আক্কা দখলের পর ক্রুসেডার আক্রমণকারীরা রিচার্ডের নেতৃত্বে উপকূল ধরে আল-কুদসের দিকে রওনা হলো। সুলতান পাহাড়ের আড়ালে একটি সমান্তরাল পথে অগ্রসর হতে থাকলেন এবং অতর্কিত আক্রমণের মাধ্যমে তাদের অগ্রযাত্রা রুখতে এবং তাদের খোলা ময়দানে লড়াই করতে প্ররোচিত করার চেষ্টা চালিয়ে গেলেন। অবশেষে ১৪ শাবান ৫৮৭ হিজরি (৩ সেপ্টেম্বর ১১৯১ খ্রিষ্টাব্দ) তারিখে আরসুফের ময়দানে উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হলো। মুসলমানদের একের পর এক আক্রমণে শত্রুদের পশ্চাৎভাগ লগুভগু হয়ে গিয়েছিল।

[১] আন-নাওয়াদিরুস সুলতানিয়া, পৃ. ২৩৮, ২৪৬

[২] আন-নাওয়াদিরুস সুলতানিয়া, পৃ. ২৪০

[৩] কিতাবুর রওজাতাইন ফি আখবারিদ দাওলাতাইন: সন ৫৮৭ হিজরি; আন-নাওয়াদিরুস সুলতানিয়া, ১৫৫ থেকে ২৮২; আল-কামিল ফিত তারিখ: সন ৫৮৭ হিজরি

তারিখ উম্মতে মুসলিমা - চতুর্থ খণ্ড

এই সুযোগে রিচার্ড ক্রুসেডারদের সংগঠিত করে এমন জোরালো পাল্টা আক্রমণ করল যে মুসলমানদের কাতারগুলো ভেঙে গেল। দেখতে দেখতেই যুদ্ধের ময়দানের চিত্র বদলে গেল। আরসুফের এই যুদ্ধ ছিল সুলতানের জীবনের অন্যতম বিপজ্জনক লড়াই। যখন মুসলমানরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাচ্ছিল, তখন মনে হচ্ছিল যে এখন বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত খ্রিস্টানদের পঙ্গপালের মতো বাহিনীকে থামানোর মতো কেউ থাকবে না। কিন্তু সুলতান দৃষ্টান্তমূলক দৃঢ়তা ও উপস্থিত বুদ্ধির প্রমাণ দিয়ে নিজের বাহিনীকে পূর্ণ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করলেন এবং অল্প কিছু সেনাদল নিয়ে পুনরায় কদম জমিয়ে লড়াই শুরু করে দিলেন। মুসলমানদের পুনরায় সারিবদ্ধ হতে দেখে রিচার্ড সতর্ক অবস্থান গ্রহণ করল এবং যুদ্ধ থামিয়ে তাবু গাড়ল। সুলতান সালাহউদ্দিন নিজের সামরিক প্রভাব পুনরুদ্ধার করতে এবং পুনরায় বিন্যাস করতে চব্বিশ ঘণ্টাও সময় নেননি এবং পরের দিনই পুনরায় ময়দানে নেমে প্রতিপক্ষকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান জানানেন। ক্রুসেডারদের পাল্টা কাতারবন্দী হওয়ার সাহস হলো না, বরং রিচার্ড বাহিনীকে বিশ্রাম দেওয়ার পর দ্রুত আসকালানের দিকে রওনা হয়ে গেল।

সুলতান সালাহউদ্দিন সৈন্য স্বল্পতার কারণে আসকালানকে তাৎক্ষণিকভাবে রক্ষা করতে পারছিলেন না। “আসকালান”-এর প্রাচীর ছিল অত্যন্ত উঁচু এবং দুর্গটি ছিল অনেক মজবুত। যদি রিচার্ড আসকালান দখল করে নিত, তবে বায়তুল মুকাদ্দাস আক্রমণের জন্য সে একটি শক্তিশালী ছাউনি এবং ইউরোপ থেকে সাহায্য ও রসদ পাওয়ার জন্য একটি চমৎকার বন্দর পেয়ে যেত। সুলতান সালাহউদ্দিনের হাতে সময় কম ছিল। তাঁর অফিসাররা বায়তুল মুকাদ্দাসকে বাঁচানোর জন্য এই অদ্ভুত পরামর্শ দিলেন যে, আসকালান খালি করে তা ধ্বংস করে দেওয়া হোক। সুলতান প্রথমে এতে রাজি হননি, কিন্তু ইস্তিখারার পর তিনি এই পরামর্শ মেনে নিলেন এবং বললেন:

“আল্লাহর কসম! এই শহরের একটি পাথর উপড়ানোও আমার কাছে নিজের সমস্ত সম্ভানের মৃত্যুর চেয়ে বেশি কষ্টদায়ক। কিন্তু যখন মাশিয়্যাতে ইলাহির ফয়সালা এটাই এবং তিনি মুসলমানদের নিরাপত্তার জন্য একে অনিবার্য করে দিয়েছেন, তখন আমি কী করতে পারি!!”

তাঁর আদেশে আসকালানের জনবসতিকে সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হলো এবং শহরের প্রাচীর, দুর্গ, অন্যান্য ভবন ও বন্দর ধ্বংস করে মাটির স্তুপে পরিণত করা হলো। যখন রিচার্ডের বাহিনী সেখানে পৌঁছাল, তখন তাদের আড়াল দেওয়ার মতো কোনো দেয়াল এবং তাদের ওপর ছায়া দেওয়ার মতো কোনো ছাদও সেখানে অবশিষ্ট ছিল না। রিচার্ড চরম হতাশ হলো এবং সে সেখানে কোনো পরিখা বা অবস্থান তৈরি করতে পারল না। অবশেষে সে রামলায় তাবু গাড়ল। [১]

বায়তুল মুকাদ্দাসের যুদ্ধ:

সুলতান আইয়ুবী এখন তাঁর ঘনিষ্ঠদের নিয়ে সরাসরি বায়তুল মুকাদ্দাস পৌঁছে গেলেন এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার একটি ব্যাপক পরিকল্পনার কাজ শুরু করলেন। সুলতান নিজে এই সমস্ত নির্মাণ কাজ তদারকির জন্য তৎপর থাকতেন এবং স্থপতিদের সাথে কাজ করাতেন। তাঁকে দেখে বড় বড় নামী-দামী ব্যক্তিরও নির্মাণ কাজের পরিশ্রমে অংশ নিচ্ছিলেন। সুলতানের ছেলেরা, সিরিয়া ও মিসরের আমীরগণ, সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ, উলামা ও মাশায়েখ এবং কাজি ও ফকিহগণও এই কাজকে সৌভাগ্য মনে করে শরিক হচ্ছিলেন। মুসলমানদের মধ্যে আল-কুদসের হেফাজত, এই শহরের সেবা এবং নির্মাণ কাজের মেহনত ও পরিশ্রমের জন্য এমন ঈমানি জোশ দেখা যাচ্ছিল...

[১] আন-নাওয়াদিরুস সুলতানিয়াহ, ২৭৮ থেকে ২৯৮।

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

যার মাধ্যমে প্রথম যুগের স্মৃতিগুলো সতেজ হচ্ছিল। সুলতান সালাহউদ্দিন নিজে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে যেতেন এবং ব্যক্তিগতভাবে দূর-দূরান্তের এলাকা থেকে নিজের সওয়ারিতে পাথর বহন করে আনতেন। এটি দেখে সৈন্যরাও তাঁকে অনুসরণ করত।

এই সময়ে শাওয়াল ৫৮৭ হিজরি (নভেম্বর ১১৯১ খ্রিষ্টাব্দ) তে রিচার্ড বাইতুল মুকাদ্দাস আক্রমণের জন্য অগ্রসর হয়, কিন্তু প্রবল বৃষ্টি এবং প্রচণ্ড শীত তাকে ফিরে যেতে বাধ্য করে। ক্রুসেডারদের খাদ্যসামগ্রী নষ্ট হয়ে যায়, তাবু উপড়ে যায়, ঘোড়া এবং অন্যান্য গবাদি পশু মারা যায়। ১১ জিলহজ ৫৮৭ হিজরি (১০ জানুয়ারি ১১৯২ খ্রিষ্টাব্দ) ক্রুসেডার বাহিনী রামলার দিকে ফিরে যায়। রিচার্ড সেনাবাহিনীর মনোবল ধরে রাখার জন্য আসকালানের দিকে যাত্রা করে এবং তা নতুন করে নির্মাণ করতে শুরু করে।

আসকালান নির্মাণ শেষ করে জমাদিউল আউয়াল ৫৮৮ হিজরি (জুন ১১৯২ খ্রিষ্টাব্দ) তে রিচার্ড আল-কুদসের দিকে আক্রমণ চালায় এবং বাইত নুবাহ পর্যন্ত পৌঁছে যায়, যেখান থেকে আল-কুদস মাত্র একদিনের দূরত্বে ছিল। সে দূত পাঠায় যাতে দ্রুত টায়ার (সুর), এক্কা এবং ত্রিপোলির খ্রিস্টানরা এই রণাঙ্গনে পৌঁছাতে পারে এবং আল-কুদসকে এক শতাব্দী আগের মতো শান-শওকতের সাথে পুনরায় জয় করা যায়। এই সময়ে রিচার্ড মিশর থেকে আসা খাদ্যের একটি বিশাল কাফেলা লুণ্ঠন করে মুসলমানদের চরম ক্ষতি সাধন করে।

কিন্তু এদিকে সুলতান পবিত্র শহর রক্ষার জন্য সম্ভাব্য সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন এবং শত্রুর মনোবল ভেঙে দেওয়ার কৌশল নিয়ে নিরন্তর চিন্তা করছিলেন। ক্রুসেডারদের আনন্দ তখন ধূলিসাৎ হয়ে যায় যখন গোয়েন্দারা এসে রিচার্ডকে এই খবর দেয় যে, সুলতান আল-কুদসের চারপাশের দূর-দূরান্ত পর্যন্ত সমস্ত পুকুর ভেঙে দিয়েছেন, ঝরনা এবং পানির আধারগুলো বিষাক্ত করে দিয়েছেন এবং প্রতিটি কুয়া মাটি দিয়ে ভরাট করে দেওয়া হয়েছে। আল-কুদস উপত্যকায় এখন এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে পানি পাওয়া যাবে। প্রচণ্ড গরমের মৌসুমে সেনাবাহিনী পানি থেকে বঞ্চিত থাকলে যুদ্ধের ফলাফল তাই হতো যা হাভিনে হয়েছিল। তাই রিচার্ড হতাশ হয়ে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং ক্রুসেডাররা উপকূলের দিকে যাত্রা শুরু করে।

রিচার্ডের এখন ইংল্যান্ডে ফেরার তাড়া ছিল। সে আসকালানেও থামেনি এবং সরাসরি এক্কায়ে গিয়ে দম নেয়। হ্যারল্ড ল্যান্সের মতে, “সে এক্কার দিকে এমনভাবে ফিরেছিল যেন কোনো বড় বিপদ থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়েছে।”

রিচার্ড এই সময়ে একমাত্র সাফল্য এটি অর্জন করে যে, জাফায় নিজের দখল বজায় রাখে এবং সুলতানের বাহিনী এই শহরে প্রবেশ করেও তা জয় করতে পারেনি, কারণ রিচার্ড এক্কা থেকে নৌবাহিনী নিয়ে সেখানে পৌঁছে যায় এবং শহরটি বাঁচাতে সক্ষম হয়। [১]

আলোচনা এবং রামলার সন্ধিচুক্তি:

পরবর্তী কয়েক সপ্তাহে রিচার্ডের পক্ষ থেকে সন্ধি সংক্রান্ত বেশ কিছু বার্তা আসে। যার কোনোটিতে বন্ধুত্বের প্রকাশ ছিল আবার কোনোটিতে প্রচ্ছন্ন হুমকি দেওয়া হয়েছিল। রিচার্ড সন্ধিও করতে চেয়েছিল কিন্তু নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখে, তাই সে চেয়েছিল মুসলমানরা যেন আসকালান তারই কাছে থাকতে দেয়। রিচার্ডের এই বিভ্রান্তিকর বার্তাগুলোর জবাবে সুলতান তাকে একটি পত্র পাঠান যার প্রতিটি ছত্রে একজন মুমিনের দৃঢ় বিশ্বাস ফুটে ওঠে।

সুলতান লিখেছিলেন:

[১] আন-নাওয়াদিরুস সুলতানিয়া, পৃষ্ঠা ৩০৩ থেকে ৩২৩।

“আসকালান থেকে আমাদের সরে দাঁড়ানোর প্রশ্নই ওঠে না। হ্যাঁ, আপনার জন্য এখানে শীতকাল কাটানো জরুরি কারণ আপনি এই উপকূলীয় শহরগুলো দখল করেছেন ঠিকই, কিন্তু আপনি জানেন যে আপনার চলে যাওয়ার সাথে সাথেই আমরা এই শহরগুলো ছিনিয়ে নেব, বরং আপনার উপস্থিতিতেও আল্লাহ চাইলে আমরা এই শহরগুলো পুনরায় উদ্ধার করতে পারি। যখন আপনি আপনার ঘর থেকে দূরে এবং নিজের দেশ থেকে দুই মাসের দূরত্বের পথ পাড়ি দিয়ে শীতের কঠোরতা সহ্য করতে পারেন, যদিও এটি আপনার ভরপুর যৌবনের সময় এবং ভোগ-বিলাসের দিন, তবে আমার জন্য রণাঙ্গনে শীত বা গ্রীষ্মের ঋতু কাটানোতে কী অসুবিধা হতে পারে যখন আমি নিজের দেশে আছি, আমার সন্তান এবং আমার পরিবারের সদস্যরা আমার সাথে আছে। তাছাড়া আমি একজন বৃদ্ধ মানুষ, দুনিয়ার স্বাদ ত্যাগ করেছি, আমার মন এগুলোতে ভরে গেছে, আমার কাছে শীতের জন্য আলাদা এবং গ্রীষ্মের জন্য আলাদা সৈন্যবাহিনীর ব্যবস্থা আছে। জিহাদ সম্পর্কে আমার বিশ্বাস হলো যে আমি সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদতে মশগুল আছি। আমি জিহাদ সর্বদা জারি রাখব যতক্ষণ না আল্লাহ তাআলা যাকে চান বিজয়ী করেন।”

সুলতানের এই চিঠি প্রকাশ করে যে তিনি সব ধরনের জান-মালের সংকট সহ্য করে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। হ্যাঁ, যদি তিনি সন্ধি চাইতেন তবে তা আল-কুদসের নিরাপত্তার নিশ্চয়তার ভিত্তিতে। অবশেষে রিচার্ড আসকালানের জেদ ছেড়ে দিলেন এবং সন্ধির প্রস্তাব আবারও গ্রহণ করলেন। সুলতান তাঁর ভাই আল-মালিক আল-আদিলের সাথে পরামর্শ করে এই প্রস্তাব গ্রহণ করে নিলেন কারণ সৈন্যরা লড়াই করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, অস্ত্রশস্ত্র শেষ হওয়ার পথে ছিল এবং কোষাগার শূন্য হয়ে গিয়েছিল। যুদ্ধ শত শত বর্গমাইল জুড়ে বিস্তৃত বাগান এবং ফসলি জমি উজাড় করে দিয়েছিল এবং জনগণের জন্য জীবনযাপন কঠিনতর হয়ে উঠছিল।

পরিশেষে ২২ শাবান ৫৮৮ হিজরি (২ সেপ্টেম্বর ১১৯২ খ্রিস্টাব্দ) সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর হলো এবং ক্রুসেডার বাহিনী ফিরে গেল। [১]

ক্রুসেডাররা কী হারাল আর কী পেল?

৫৮৩ হিজরি (১১৮৭ খ্রিস্টাব্দ) থেকে ৫৮৮ হিজরি (১১৯২ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত স্থায়ী এই পাঁচ বছরের যুদ্ধে ইউরোপ তাদের জনশক্তি, আর্থিক সম্পদ, যাতায়াত ব্যবস্থা, অর্থনীতি ও বাণিজ্য এবং শান্তি ও স্বস্তি সবকিছু বাজি রেখেছিল। ইউরোপের সম্ভবত এমন কোনো রাজপুত্র, নবাব বা জমিদার ছিল না যে কোনো না কোনোভাবে ক্রুসেডে অংশ নেয়নি। তাদের অনেক শীর্ষস্থানীয় বড় বড় রাজা এই যুদ্ধের নেতৃত্ব দিতে এসেছিলেন যাদের মধ্যে জার্মানির ফ্রেডরিক বারবারোসা, ফ্রান্সের ফিলিপ অগাস্টাস এবং ব্রিটেনের রিচার্ডের মতো মুকুটধারী সম্রাটরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদের সম্মিলিত শক্তি পুরো এশিয়াকে পদানত করার জন্য যথেষ্ট ছিল। ছোটখাটো ডজনখানেক অখ্যাত শাসকদের বাহিনী তাদের ছাড়াও ছিল যারা এই পুরো যুদ্ধ চলাকালীন নিরবচ্ছিন্নভাবে উপকূলে নামতে থাকে। তারপর জমিদার, নবাব এবং নাইটদের কোনো হিসাবই ছিল না যারা প্রতিটি শাসকের পেছনে সারিবদ্ধভাবে আসত। ইউরোপের ইতিহাসে এত বৈচিত্র্যময় জাতি এবং বিভিন্ন ভাষার সমন্বয়ে গঠিত সৈন্য অভিযানের কোনো উদাহরণ পাওয়া যায় না। ক্রুসেডারদের শিবিরে ফ্রান্স, জার্মানি, অস্ট্রিয়া, স্ক্যান্ডিনেভিয়া, জেনেভা, পিসা, ইতালি, ভেনিস, সিসিলি, ডেনমার্ক, হল্যান্ড...

[১] আন-নাওয়াদির আস-সুলতানিয়া, পৃষ্ঠা ৩২৮ থেকে ৩৩৩

তারিখ-এ-মিল্লাত-এ-মুসলিমা

ওবারফ্রিজল্যান্ডসহ ডজন ডজন রাজ্য ও জাতির লোক দেখা যেত। শুধু পুরুষ নয়, মহিলারাও এই যুদ্ধে শরিক ছিল। ইউরোপের অনেক রাজকুমারী ও অভিজাত মহিলারা ছিলেন যারা ভোগ-বিলাস ও আরাম ত্যাগ করে নিজেদের সৈন্যদের সাহস বাড়ানোর জন্য এই বাহিনীর সাথে চলে এসেছিলেন। হাজার হাজার সাধারণ নারী ও পতিতারাও তাদের সাথে ছিল।

এই সমস্ত ধ্বংসযজ্ঞের বিনিময়ে যদি ফিরিঙ্গিরা কিছু পেয়ে থাকে, তবে তা ছিল উপকূলের একটি ছোট এলাকা যা মুসলমানরা সন্ধির মেয়াদ শেষ হতেই জয় করতে পারত। হিভিনের যুদ্ধের পর ফিলিস্তিন, জর্ডান এবং সিরিয়ার উপকূলের যে বিশাল ও বিস্তৃত এলাকা সুলতান সালাহউদ্দীন মুক্ত করেছিলেন, তার বেশিরভাগ অংশ তখনও মুসলমানদের কাছেই ছিল। সবচাইতে বড় কথা এই যে, বাইতুল মুকাদ্দাস যার জন্য পাঁচ বছর ধরে এই ভয়াবহ যুদ্ধ চলছিল, তা পূর্বের ন্যায় মুসলমানদের হেফাজতেই ছিল।

সুলতানের অসিয়ত:

সুলতান আইয়ুবীর কিছু কথা থেকে মনে হচ্ছিল যে তিনি মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছিলেন। এক রাতে তিনি তার প্রিয় পুত্র আল-মালিক আল-জাহিরকে কুচ-এর (আলেপ্পো অভিযুখে যাত্রা) জন্য বিদায় দেওয়ার পর পুনরায় তাঁবুতে ডেকে পাঠালেন এবং অসিয়তের ভঙ্গিতে বলতে লাগলেন:

“আমি তোমাকে আল্লাহকে ভয় করার অসিয়ত করছি। এটিই সকল কল্যাণের মূল। তোমাকে আল্লাহর হুকুম পালন করার নির্দেশ দিচ্ছি, যা তোমার নাজাতের কারণ হবে।

আমি তোমাকে অন্যায় হত্যা ও রক্তপাত থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে সতর্ক করছি, কারণ রক্ত কখনো ঘুমায় না।

আমার অসিয়ত হলো প্রজাদের মন জয় করার খেয়াল রাখা। তাদের অবস্থার ওপর নজর রাখা—কেননা তুমি আমার পক্ষ থেকে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকেও তাদের আমানতদার।

আমি তোমাকে এই নসিহতও করছি যে, সালতানাতের আমির, সরকারি কর্মকর্তা ও বড়দের মন জয় করা এবং তাদের সম্মান করা। দেখো, আমি যে মর্যাদা পেয়েছি তা মানুষের মন জয়ের কারণেই পেয়েছি। আর দেখো! কখনো কারো প্রতি হিংসা করো না, কারণ শেষ পর্যন্ত সবাইকে মরতে হবে। মানুষের হক ও লেনদেনের বিষয়ে খুব সতর্ক থেকো, কারণ যদি তাদের কোনো হক বাকি থেকে যায় তবে হাশরের ময়দানে তাদের সন্তুষ্টি ছাড়া মাফ পাওয়া যাবে না। হ্যাঁ, যদি আল্লাহর কোনো হক বাকি থেকে যায় তবে তাঁর দরবারে তওবা করলে তিনি মাফ করে দেবেন, কারণ তিনি অত্যন্ত দয়ালু।“ [১]

সুলতান সালাহউদ্দীনের ইন্তেকাল:

ক্রুসেড যুদ্ধের প্রথম দুই বছরে সুলতানকে রমজানের রোজা ছাড়তে হয়েছিল। কিন্তু জীবনের শেষ বছর মে-জুন মাসের প্রচণ্ড গরমে তিনি এই দুই বছরের কাজা রোজা আদায় করেছিলেন। চিকিৎসকরা তাকে নিষেধ করতেন কিন্তু সুলতান পরোয়া করতেন না। প্রতিবার তার উত্তর এটাই হতো: “জানি না ভবিষ্যতে কী হবে, আবার সুযোগ পাব কি না।”

[১] আন-নাওয়াদিরুস সুলতানিয়াহ, পৃ. ৩৫৩

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

চতুর্থ খণ্ড

এরপর রমজান মাস এলে সুলতান সেই মাসের রোজাগুলোও রাখলেন। নিজের স্বাস্থ্যের তোয়াক্কা না করে যুদ্ধাবস্থায় টানা তিন মাস রোজা রাখার কারণে সুলতানের শরীরে ক্লান্তি এবং মেজাজে দুর্বলতা তৈরি হলো, যার প্রভাব শেষ পর্যন্ত রয়ে গিয়েছিল। ১৫ সফর ৫৮৯ হিজরিতে সুলতান হাজীদের অভ্যর্থনা জানাতে দামেস্কের বাইরে বের হলেন। ঘরে ফিরে আসার পর তাঁর শারীরিক অবস্থা আরও খারাপ হয়ে গেল। রোগ দিন দিন বাড়তে থাকল। আমীর, শাহজাদা, বিশেষ দরবারী এবং উলামা ও ফুকাহাগণ সেবা-শুশ্রূষার জন্য সকাল-সন্ধ্যা উপস্থিত হতে থাকলেন। অবশেষে চিকিৎসকরা পারস্পরিক পরামর্শ করে সুলতানকে ফাসদ (রক্তমোক্ষণ) করার সিদ্ধান্ত নিলেন। অসুস্থতার চতুর্থ দিনে ফাসদ করা হলো, কিন্তু এতে সুলতানের অবস্থা আরও অবনতি হলো।

অসুস্থতার ষষ্ঠ দিনে কাজী ইবনে শাদ্দাদ রহ., কাজী ফাজিল রহ. এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সুলতানকে ঠেস দিয়ে বালিশের সাথে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তিনি হালকা গরম পানি পান করতে চেয়েছিলেন যাতে শরীরে প্রশান্তি অনুভব হয়। একজন খাদেম পানি নিয়ে এল। সুলতান পেয়ালা মুখে লাগালেন এবং সাথে সাথেই সরিয়ে নিয়ে বললেন: “পানির তাপমাত্রা অসহনীয়।”

এই বলে কিছুটা ঠান্ডা পানি চাইলেন। পুনরায় পানি আনা হলো। সুলতান তা পান করতে চাইলেন কিন্তু এটি খুব বেশি ঠান্ডা মনে হলো। সুলতান নম্রতার সাথে শুধু এতটুকু বললেন: “সুবহানাল্লাহ! কারো কি এই তৌফিক হতে পারে না যে পানি পরিমিত করে নিয়ে আসবে?”

কাজী ফাজিল এবং ইবনে শাদ্দাদ রহ. এই দৃশ্য দেখে বাইরে বেরিয়ে এলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে তাঁদের হেঁচকি উঠে গেল। কাজী ফাজিল রহ. বলতে লাগলেন: “আল্লাহর কসম! যদি এমন আচরণ কোনো সাধারণ মানুষের সাথেও হতো, তবে সে পেয়ালাটি পানি বহনকারীর মাথায় ছুড়ে মারত।”

সুলতানের অবস্থার কথা শুনে সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অস্থিরতা ছিল অবর্ণনীয়। বাজারে নিশ্চলতা বিরাজ করছিল। কেনাবেচা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ব্যবসায়ীরা বাজার থেকে মালামাল সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। জীবনের শেষ রাতে শেখ আবু জাফর রহ. সুলতানের পাশে বসে তিলাওয়াত করছিলেন। সুবহে সাদেকের কাছাকাছি সময়ে তিনি সূরা হাশরের আয়াতগুলো পড়ছিলেন:

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿١٠﴾ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْنَاهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿١٢﴾

(জাহান্নামী এবং জান্নাতীরা সমান নয়... এই জান্নাতীরাই তাদের কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছাবে। যদি আমি এই কুরআন কোনো পাহাড়ের ওপর অবতীর্ণ করতাম... তবে অবশ্যই তুমি দেখতে সেই পাহাড়কে... যে তা আল্লাহর ভয়ে বিনীত হয়ে ফেটে যেত। আমি মানুষের জন্য এই উদাহরণগুলো বর্ণনা করি যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে। তিনি আল্লাহ, যাঁর ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। তিনি প্রতিটি গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় সম্পর্কে অবগত। তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা।)

যখন শেখ তিলাওয়াত করতে করতে ‘عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ’ পর্যন্ত পৌঁছালেন, তখন সুলতানের এক মুহূর্তের জন্য জ্ঞান ফিরে এল। তাঁর মুখ থেকে বের হলো: “সত্য।” [১]

[১] আন-নাওয়াদিরুস সুলতানিয়াহ, পৃষ্ঠা ৩৬০ থেকে ৩৬৪।

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

চতুর্থ খণ্ড

এদিকে ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়ছিল, ওদিকে সুলতানের নশ্বর জীবনের সময়কাল পূর্ণ হচ্ছিল। তাঁর শিয়রে কুরআন তিলাওয়াত চলছিল, শেখ আবু জাফরের ঠোঁটে সূরা আত-তাওবার শেষ আয়াতের এই অংশটি ছিল: “لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ” (তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আমি তাঁরই ওপর ভরসা করেছি)। আল্লাহর কালামের এই শব্দগুলো শুনে সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর ঠোঁটে একটি হাসি ফুটে উঠল এবং তিনি তাঁর প্রাণ স্রষ্টার কাছে সাঁপে দিলেন। [১] ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

যেমন যেমন সুলতানের মৃত্যুর খবর শহরে ছড়িয়ে পড়ল, চারদিকে আহাজারি ও কান্নার রোল পড়ে গেল। মানুষ দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে কেল্লার দিকে দৌড়ে এল। তারা উচ্চস্বরে কাঁদছিল। সুলতানের ছোট ছোট সন্তানরাও কাঁদতে কাঁদতে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। এই শোকাবহ দৃশ্য দেখে মানুষের হৃদয় ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছিল। জোহরের নামাজ পর্যন্ত এই আহাজারি ও কান্নার ধারা অব্যাহত ছিল। কাজী ইবনে শাদদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন:

“সেদিন এমন অবস্থা ছিল যে, কত মানুষকে আমি বলতে শুনেছি যে, হায়! সুলতানের পরিবর্তে যদি তারা মারা যেত। সেই দিনের আগে আমি কারো বদলে নিজের জীবন দেওয়াকে কেবল একটি প্রবাদ মনে করতাম, কিন্তু সেদিন আমার নিজেরও এমন অবস্থা ছিল যে, যদি আমার বদলে সুলতানের জীবন বেঁচে যেত, তবে আমি সানন্দে জীবন দিয়ে দিতাম।” [২]

জোহরের নামাজের পর সুলতানের দেহ একটি কফিনে রেখে বাইরে আনা হলো। জানাজার ওপর নজর পড়তেই মানুষের চিৎকার বেরিয়ে এল। মানুষ কাঁদতে কাঁদতে বেহুঁশ হয়ে যাচ্ছিল। ইমাদ আসফাহানির মতে:

“কান্নাকাটির অবস্থা এমন ছিল যে মনে হচ্ছিল সারা দুনিয়া এক স্বরে মিলে কাঁদছে।” [৩]

সুলতানের দাফনের সময় সালতানাতের উজির কাজী ফাজিল আসকালানি রহমাতুল্লাহি আলাইহি সুলতান আইয়ুবীর সেই বিশ্ববিখ্যাত তলোয়ারটি আনিয়েছিলেন যা ক্রুসেডার বাহিনীর তছনছ করে দিয়েছিল, তলোয়ারটি সুলতানের সাথেই কবরে রেখে দেওয়া হলো। কাজী ফাজিল রহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন: “সুলতান কিয়ামতের দিন এই তলোয়ারের ওপর ভর দিয়েই উঠবেন।” [৪]

সুলতানের মৃত্যুর বিয়োগান্তক ঘটনা ২৭ সফর ৫৮৯ হিজরি (৪ মার্চ ১১৯৩ খ্রিস্টাব্দ) তারিখে ঘটেছিল। [৫]

সেই রাতে এক আল্লাহর ওলি স্বপ্নে গায়েবি আওয়াজ শুনেছিলেন:

“আজ ইউসুফ বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেল।” [৬]

শেখ ইমাদ আসফাহানিকে এই স্বপ্ন জানানো হলে তিনি বললেন:

“নিঃসন্দেহে আমাদের ইউসুফ আখেরাতের নেয়ামতসমূহের তুলনায় এই দুনিয়ায় থেকে এক প্রকার বন্দিদশাতেই ছিল।” [৭]

[১] আন-নাওয়াদিরুস সুলতানিয়াহ, পৃ. ৩৬৩

[২] আন-নাওয়াদিরুস সুলতানিয়াহ, পৃ. ৩৬৩

[৩] কিতাবুর রওজাতাইন: ৩/৩৬৫, ত. আর-রিসালাহ

[৪] কিতাবুর রওজাতাইন: ৩/৩৬৯, ত. আর-রিসালাহ

[৫] আল-কামিল ফিত তারিখ, সন ৫৮৯ হিজরি

[৬] এটি এই হাদিসের দিকে ইঙ্গিত ছিল: “আদ-দুনিয়া সিজনুল মুমিন ওয়া জামাতুল কাফির” দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা এবং কাফিরের জন্য জামাত। (সুনানে তিরমিজি, হা: ২৩২৪)

[৭] কিতাবুর রওজাতাইন: ৩/৩৭০, ৩৬৯, ত. আর-রিসালাহ

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সীরাতের কিছু দিক

ইউসুফ বিন আইয়ুব সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সত্তা ছিল উচ্চ গুণাবলী এবং উন্নত চরিত্রের এক সমষ্টি। তাঁর সাহস ছিল পাহাড়ের মতো অটল এবং স্বভাব ছিল ফুলের মতো নরম। তিনি ছিলেন একজন খাঁটি মুসলমান। একজন মুমিনের সমস্ত গুণাবলী তাঁর মধ্যে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠত।

আকিদা ও আদর্শ:

সুলতান ছিলেন সহীহ আকিদা ও সুদৃঢ় চিন্তাধারার অধিকারী একজন মুসলমান। তাঁর আকিদা ও আদর্শ ছিল হুবহু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনুসারী। তিনি উসুল ও ফুরু (মূলনীতি ও শাখা-প্রশাখা) উভয় ক্ষেত্রে ফিকহে শাফেয়ীর অনুসারী ছিলেন। [১]

তিনি জ্যোতিষীদের কথাকে অনর্থক মনে করতেন। কুলক্ষণ, অশুভ লক্ষণ এবং সব ধরনের কুসংস্কার থেকে তিনি বহু দূরে থাকতেন। যখনই কোনো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা দেখা দিত, তখন তিনি শরীয়তকে সামনে রাখতেন এবং আল্লাহ তায়ালার ওপর তাওয়াক্কুল করে ফয়সালা করতেন। [২]

আলেমদের মতো কিতাবের ইবারতসমূহ তাঁর মুখস্থ ছিল না, তবে যখনই কোনো আকিদা সংক্রান্ত আলোচনা উঠত, তখন সুলতান বেশ দলিলভিত্তিক আলোচনা করতেন। প্রখ্যাত আলেম দ্বীন শেখ কুতুবুদ্দিন নিশাপুরী (রহ.) সুলতানকে আকিদা সংক্রান্ত একটি পূর্ণাঙ্গ কিতাব লিখে দিয়েছিলেন। সুলতান অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তাঁর ছোট সন্তানদের এই কিতাবটি মুখস্থ করাতেন। [৩]

সুলতান আইয়ুবী দার্শনিক এবং নাস্তিকদের মতাদর্শকে চরম ঘৃণা করতেন। তাঁর কাছে কুরআন, হাদিস এবং ফিকহই ছিল শেষ কথা। শাহাব সোহরাওয়ার্দী নামক এক দার্শনিক যখন নাস্তিক্যবাদী চিন্তাধারা প্রচার করল, তখন সুলতান তাকে মৃত্যুদণ্ড দেন এবং তার লাশ বেশ কয়েকদিন শূলে ঝুলিয়ে রাখেন যাতে দুনিয়াবাসী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। [৪]

আদল ও ইনসাফ:

সুলতান ছিলেন ন্যায়পরায়ণ এবং ইনসাফপ্রিয়। প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার তিনি উন্মুক্ত দরবার বসাতেন যেখানে যে কেউ উপস্থিত হয়ে ফরিয়াদ করতে পারত। দরবারে কাজীগণ ছাড়াও ফকিহ ও আলেমগণ উপস্থিত থাকতেন, যাদের সাহায্যে তাৎক্ষণিকভাবে ফয়সালা করা হতো। সফর হোক বা অবস্থান, শান্তি হোক বা যুদ্ধ—আদালতের কোনো বিরতি হতো না। সাধারণ দরবার ছাড়াও ফরিয়াদিরা উপস্থিত হতে থাকত। সুলতান সব কাজ বন্ধ রেখে অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে তাদের কথা শুনতেন এবং যথাযথ ফয়সালা প্রদান করতেন। কাউকে নিরাশ করতেন না। প্রতিদিন ডজন ডজন আবেদন পেশ করা হতো, সুলতান তাঁর কাতিবের সাথে আবেদনগুলো অধ্যয়ন করতেন। কোনো আবেদনকেই উপেক্ষা করতে দিতেন না। পথেও যদি কোনো ব্যক্তি ফরিয়াদ করত, তবে তার কথা না শুনে তিনি সামনে এগোতেন না। [৫]

[১] আন-নাওয়াদিরুস সুলতানিয়া, পৃ. ২৮; কিতাবুর রওজাতাইন: ৩/৩৮০, ৩৮১, ত. আর-রিসালাহ

[২] কিতাবুর রওজাতাইন: ৩/৩৮০, ত. আর-রিসালাহ

[৩] আন-নাওয়াদিরুস সুলতানিয়া, পৃ. ২৮

[৪] আন-নাওয়াদিরুস সুলতানিয়া, পৃ. ৩৮

[৫] আন-নাওয়াদিরুস সুলতানিয়া, পৃ. ৫

যুহুদ ও কানায়াত:

সুলতান নিঃসন্দেহে তাঁর জীবনে লক্ষ লক্ষ দিরহাম ও দিনার খরচ করেছেন কিন্তু কখনো কিছু জমা করে রাখেননি। আয় কম ছিল না কিন্তু আয়ের চেয়ে বেশি অন্যদের পেছনে খরচ করতে অভ্যস্ত ছিলেন। মানুষকে ইনআম ও ইকরাম দিয়ে ধন্য করতেন এবং এর জন্য ঋণও গ্রহণ করতেন। এই কারণেই যখন তাঁর ইন্তেকাল হয়, তখন তাঁর নিজস্ব কোষাগারে ৪৭ দিরহাম এবং একটি আশরাফি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কোনো ঘর ছিল না, কোনো বাগান ছিল না, কোনো ক্ষেতখামার ছিল না। [১]

ইবনে শাদ্দাদ (রহ.) বলেন যে, সুলতানের অভ্যাস ছিল যে তিনি আর্থিক সংকটের সময়ও ঠিক সেভাবেই খরচ করতেন যেভাবে সচ্ছলতা ও প্রাচুর্যের সময় করতেন। একবার সুলতান বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে দামেস্কের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার সময় প্রতিনিধিদলকে উপহার ও পাথেয় দেওয়ার জন্য কোষাগারে কিছুই ছিল না। অবশেষে সুলতান বাইতুল মালের জায়গির থেকে একটি গ্রাম বিক্রি করালেন এবং সেই সমস্ত অর্থ খরচ করে প্রতিনিধিদলের প্রত্যাশা পূরণ করলেন। একটি দিরহামও নিজের কাছে রাখলেন না।

সুলতানের আমির ও কোষাধ্যক্ষরা তাঁর কাছ থেকে কিছু সম্পদ লুকিয়ে রাখতেন কারণ তারা জানতেন যে সুলতান যদি জানতে পারেন তবে তিনি তা অবিলম্বে কোনো নেক কাজে খরচ করে ফেলবেন এবং জরুরি প্রয়োজনে সমস্যা হবে। [২]

এত দান-সদকা সত্ত্বেও সুলতানের ওপর কখনো জাকাত ওয়াজিব হয়নি। কাজী ইবনে শাদ্দাদ (রহ.) বলেন:

“যে পর্যন্ত জাকাতের সম্পর্ক, সুলতানের ওপর মৃত্যু পর্যন্ত তা ওয়াজিব হয়নি কারণ তিনি কখনো (পুরো বছর) এত সম্পদ জমা করে রাখেননি যে জাকাত ওয়াজিব হয়। নফল সদকা ও খয়রাত এই পরিমাণ করতেন যে তাঁর সমস্ত ধন-সম্পদ তাতেই শেষ হয়ে যেত।” [৩]

আখলাক:

সুলতানের আখলাক সম্পর্কে কাজী ইবনে শাদ্দাদ (রহ.) লেখেন:

“তিনি ছিলেন হাসিখুশি মেজাজের, উত্তম চরিত্রের এবং নেক স্বভাবের। আরবদের বংশলতিকা, ঐতিহাসিক ঘটনাবলি, যুদ্ধের কাহিনী এবং অতীতের অবস্থা তাঁর মুখস্থ ছিল। আরব ঘোড়াগুলোর বংশলতিকাও তাঁর মনে ছিল। দুনিয়ার অদ্ভুত অবস্থা, দুর্ঘটনা ও বিপ্লব সম্পর্কে তিনি ভালোভাবে অবগত ছিলেন। তাঁর মজলিসে বসা ব্যক্তির এমন সব তথ্য পেতেন যা অন্য কোথাও পাওয়া সম্ভব ছিল না। উত্তম চরিত্রের অবস্থা এই ছিল যে, তিনি প্রত্যেকের স্বাস্থ্য, অসুস্থতা ও চিকিৎসা, খাওয়া-দাওয়া এবং খরচ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন। তাঁর মজলিস ছিল অত্যন্ত পবিত্র। তাঁর সামনে কারো মন্দ আলোচনা করা হতো না। তিনি কানকে মন্দ শোনা থেকে পবিত্র রাখতেন। কারো সম্পর্কে ভালো কথা ছাড়া অন্য কিছু বলা তিনি পছন্দ করতেন না। তাঁর জবানও ছিল পবিত্র। কখনো দেখা যায়নি যে তিনি কাউকে গালি দিয়েছেন। কলমের পবিত্রতারও খেয়াল রাখতেন। কখনো কলম দিয়ে এমন কোনো কথা লেখেননি যার দ্বারা কোনো মুসলিম কষ্ট পায়।”

[১] আন-নাওয়াদিরুস সুলতানিয়াহ, পৃ. ২৯

[২] আন-নাওয়াদিরুস সুলতানিয়াহ, পৃ. ৩৮

[৩] আন-নাওয়াদিরুস সুলতানিয়াহ, পৃ. ২৯

তিনি ওয়াদা পালনকারী এবং বিশ্বস্ত মানুষ ছিলেন। যখনই কোনো এতিমকে তাঁর কাছে আনা হতো, তিনি দয়ার আচরণ করতেন। তাকে সান্ত্বনা দিতেন। তাকে খরচ দিতেন। যদি তার পরিবারে কোনো বড় কেউ থাকত, তবে তাকে তার লালন-পালনের দায়িত্ব দিতেন, অন্যথায় নিজেই তার প্রয়োজনের খরচ নির্ধারণ করে দিতেন এবং তাকে এমন কোনো ব্যক্তির কাছে সোপর্দ করতেন যে তার লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষা দিতে পারে। বৃদ্ধ ও মুরাব্বিদের সাথে দেখা হলে কোমলতা প্রদর্শন করতেন, তাঁদের উপহার দিতেন এবং উত্তম আচরণ করতেন। সুলতানের এই চরিত্র মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সাথে ছিল। [১]

শরীয়তের অনুসরণ:

সুলতান আইয়ুবী কবির। ও সগির। সব ধরনের গুনাহ থেকে যথাসম্ভব সম্পূর্ণ বিরত থাকতেন। তবে অন্যদের ক্ষেত্রে সুলতানের কর্মপদ্ধতি ছিল এই যে, কবির। গুনাহের ওপর কঠোরভাবে বাধা দিতেন, আর সগির। গুনাহের ক্ষেত্রে উপেক্ষা করতেন এবং আশা করতেন যে মানুষ এ বিষয়ে নিজেরাই সতর্কতা অবলম্বন করতে শুরু করবে। তিনি তাঁর সঙ্গীদের সঠিক পথের উপদেশ দিতেন এবং সিরাতুল মুস্তাকিমের ওপর অবিচল থাকার নির্দেশ দিতেন। সুলতানের এই প্রশিক্ষণের ফলাফল ছিল এই যে, তাঁর আমির, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং অফিসারগণ সবাই শরীয়তের অনুসরণ এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে খুব গুরুত্ব দিতেন। কাতিব ইমাদ আসফাহানি বলেন:

“সুলতানের সমস্ত গোলাম, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এমনকি অফিসার ও সৈন্যরাও ইবাদতকারী ও পরহেজগারদের চেয়ে বেশি খোদাভীরু ছিলেন। সুলতানের নির্জনতা পবিত্রতার এক পবিত্র দৃশ্য উপস্থাপন করত এবং তাঁর মজলিসগুলো অনর্থক কথা ও ঠাট্টা-তামাশা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। তাঁর মজলিসগুলোতে জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিদের সমাবেশ হতো। আমি তাঁকে কখনো কোনো নিম্নমানের শব্দ বলতে শুনিনি। তাঁর মুখ থেকে কখনো কোনো অশালীন বাক্য বের হয়নি। তিনি কাফের ও বেদ্বীনদের জন্য অত্যন্ত কঠোর ছিলেন, ঈমানদার ও পরহেজগারদের জন্য অত্যন্ত কোমল... সুলতানের সাথে মজলিসে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তির মনে হতো না যে সে কোনো বাদশাহর মজলিসে আছে, বরং তার মনে হতো সে যেন তার কোনো ভাইয়ের কাছে বসে আছে।” [২]

সালাতের পাবন্দি:

সুলতান সালাত মুস্তাহাব ওয়াক্তে আদায় করতে অভ্যস্ত ছিলেন। সুন্নাত ও নফল সালাতেরও গুরুত্ব দিতেন। ফরজ সালাত সর্বদা জামাতের সাথে আদায় করতেন। আল্লামা ইমাদ আসফাহানি রহমাতুল্লাহি আলাইহি, যিনি বছরের পর বছর সফর ও অবস্থান এবং যুদ্ধ অভিযানে তাঁর সাথে ছিলেন, তিনি বলেন:

“আমি কখনো সুলতানকে জামাত ছাড়া সালাত আদায় করতে দেখিনি, যদিও এমন ছিল না যে সুলতানের অপেক্ষার কারণে জামাতে সামান্যতম দেরি করা হতো। সুলতান নিজেই সময়মতো জামাতে শরিক হওয়ার গুরুত্ব দিতেন। যেহেতু সুলতান অধিকাংশ সময় সফরে থাকতেন, তাই সালাত পড়ানোর জন্য কোনো আলেমকে ইমাম নিযুক্ত করে নিতেন যিনি সর্বদা তাঁর সাথে থাকতেন। যদি কখনো কোনো কারণে ইমাম সাহেব যথাসময়ে উপস্থিত না হতেন, তবে সেই সময় সেখানে উপস্থিত আলেমদের মধ্যে যিনি বেশি মুত্তাকি ও পরহেজগার হতেন, সুলতান তাঁকে সালাত পড়ানোর অনুরোধ করতেন।” [৩]

[১] আল-নাওয়াদিরুস সুলতানিয়া, পৃষ্ঠা ৭০

[২] কিতাবুর রওজাতাইন: ৩/৭৭, ত. আল-রিসালাহ

[৩] কিতাবুর রওজাতাইন: ৩/৩৮০, ত. আল-রিসালাহ

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

কাজী ইবনে শাদ্দাদ (রহ.) বলেন:

“তিনি জামাতের সাথে সালাত আদায়ের ব্যাপারে অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন, এমনকি বলা হয় যে, বছরের পর বছর সুলতান জামাত ছাড়া কোনো সালাত আদায় করেননি। তিনি অসুস্থ হলেও নিজের জন্য ইমাম ডেকে পাঠাতেন এবং তাঁর সাথে অতি কষ্টে দাঁড়িয়ে জামাতের সাথে সালাত আদায় করতেন। তিনি সুন্নাত ও নফল সালাতেরও পাবন্দি করতেন। তিনি (তাহাজ্জুদের জন্য) কিছু রাকাত নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন যে, রাতে যদি মাঝপথে চোখ খুলে যেত তবে তা আদায় করে নিতেন। যদি চোখ না খুলত তবে (সুবহে সাদিকের আগে) ফজরের সালাতের পূর্বে তা পড়ে নিতেন। যতক্ষণ সুলতান সজ্ঞানে ছিলেন, কখনো সালাত ত্যাগ করেননি। আমি দেখেছি যে, তিনি মৃত্যুশয্যাতেও দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। কেবল জীবনের শেষ তিন দিন যখন তাঁর ওপর বেইশি আচ্ছন্ন ছিল, তখন তাঁর সালাতগুলো ছুটে গিয়েছিল। সফরকালেও সালাতের ওয়াক্ত হলে সওয়ারি থেকে নেমে সালাত আদায় করতেন।” [১]

কুরআন মাজীদে প্রতি অনুরাগ

সুলতান আইয়ুবীর কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের প্রতি অত্যন্ত আসক্তি ছিল। তিনি হাফেজে কুরআন ছিলেন না, তবে শোনার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। কুরআন মাজীদ শোনার জন্য তিনি সর্বোত্তম কারী তালিশ করতেন। নিজের ইমামতির জন্যও এমন ব্যক্তি খুঁজতেন যিনি কুরআনীয় জ্ঞান এবং কুরআনে অত্যন্ত পারদর্শী হন। নিজের সাধারণ মজলিসেও তিলাওয়াত করাতেন এবং সাধারণত এক থেকে বিশটি আয়াত শুনতেন। রাতে দুই-তিন বা চার পারা শুনতেন। তিলাওয়াত শোনার সময় প্রায়ই তাঁর ওপর ভাবাবেগ আচ্ছন্ন হতো এবং অশ্রু বিসর্জন করতেন। একবার কোথাও যাচ্ছিলেন, তখন এক শিশুকে দেখলেন যে তার পিতার সামনে বসে অত্যন্ত সুন্দর ভঙ্গিতে তিলাওয়াত করছে। সুলতান অত্যন্ত খুশি হলেন, তাকে নিজের দস্তরখানের খাবার পেশ করলেন, পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত করলেন এবং একটি কৃষি জমি তার পিতার নামে করে দিলেন। [২]

হাদীসের প্রতি অনুরাগ:

হাদীস শোনার প্রতিও তাঁর সীমাহীন আগ্রহ ছিল। যখন কোনো আলিম সম্পর্কে শুনতেন যে হাদীস বর্ণনায় তাঁর বিশেষ দক্ষতা রয়েছে, তখন তাঁর থেকে উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করতেন। যদি সেই আলিম দরবারে আসা পছন্দ করতেন, তবে তাঁকে সম্মান ও মর্যাদার সাথে ডেকে পাঠাতেন এবং সমস্ত দরবারী, আমীর ও শাহজাদাদের আদবের সাথে বসিয়ে হাদীস শ্রবণ করতেন। [৩]

যুদ্ধাবস্থায় হাদীসের দরস:

বীরত্ব ও মানসিক একাগ্রতার অবস্থা এমন ছিল যে, যুদ্ধের সময়ও কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত এবং হাদীস শোনার সুযোগ হাতছাড়া হতে দিতেন না। এক যুদ্ধের সময় যখন কাতারবন্দি হয়ে গিয়েছিল, শত্রু সামনে কাতারবদ্ধ ছিল এবং সুলতান নিজের সৈন্যদের সাথে কখনো সামনে এগোচ্ছিলেন, কখনো পেছনে হটছিলেন, তখন কাজী ইবনে শাদ্দাদ (রহ.) আরজ করলেন:

[১] আন-নাওয়াদিরুস সুলতানিয়াহ, পৃ. ২৯

[২] আন-নাওয়াদিরুস সুলতানিয়াহ, পৃ. ৩১

[৩] আন-নাওয়াদিরুস সুলতানিয়াহ, পৃ. ৩১

“প্রত্যেক সম্মানিত ও বরকতময় স্থানে হাদিস শ্রবণ করা হয়েছে, কিন্তু জিহাদের ময়দানে হাদিসের মজলিস অনুষ্ঠিত হয়নি। আপনি যদি পছন্দ করেন তবে এই সময়ে ‘হাদিস’ শোনা যেতে পারে।”

সুলতান আগ্রহ প্রকাশ করলেন এবং হাদিসের সংকলন আনালেন। ইবনে শাদ্দাদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাকে এবং সেখানে উপস্থিত অন্যান্য আমিরদের বেশ কিছু হাদিস পাঠ করে শোনালেন। এভাবে ঘোড়ার পিঠে বসে যুদ্ধ চলাকালীন হাদিস শ্রবণের গৌরব অর্জিত হলো। [১]

বীরত্ব:

সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর বীরত্ব ও সাহসিকতা সম্পর্কে কোনো মন্তব্যের প্রয়োজন নেই, কারণ তিনি উম্মাহর এমন এক সন্তান যার বীরত্ব প্রবাদে পরিণত হয়েছে। সুলতানের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত সাহস ও বীরত্বের এক নতুন শিক্ষা দেয়। ইবনে শাদ্দাদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন:

“সুলতান রহমাতুল্লাহি আলাইহি অত্যন্ত সাহসী এবং মজবুত হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। তিনি যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী এবং অত্যন্ত দৃঢ়পদ ছিলেন। কোনো বিপদই তাকে বিচলিত করতে পারত না। আমি দেখেছি যে তিনি ক্রুসেডারদের বিশাল বাহিনীর মোকাবিলায় অটল ছিলেন। শত্রু ক্রমাগত সাহায্য পাচ্ছিল এবং তাদের সাহায্যকারী বাহিনী একের পর এক আসছিল, কিন্তু সুলতানের সাহস ও ইচ্ছাশক্তিতে কোনো কমতি দেখা যায়নি। একদিন আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত ক্রুসেডারদের সাহায্যের জন্য প্রায় আশি (৮০)টি জাহাজ আক্কায়ে পৌঁছাল। আমি সেগুলো গুনছিলাম, কিন্তু সুলতানকে দেখলাম তিনি আগের মতোই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও উচ্চ সাহসী ছিলেন।” [২]

কাজী বাহাউদ্দীন ইবনে শাদ্দাদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর বক্তব্য হলো:

“তিনি যুদ্ধের তীব্রতার সময় নিজের এবং শত্রুর সারির মাঝখান দিয়ে এমনভাবে যাতায়াত করতেন যে তার সাথে কেবল একজন খাদেম বালক থাকত। এই সময়ে কখনো তিনি সৈন্যদের ডান পাশ থেকে বাম পাশে পাঠাতেন, কখনো সেনাদল বিন্যস্ত করতেন এবং তাদের এগিয়ে যাওয়ার বা পিছু হটার নির্দেশ দিতেন। অনেক সময় তিনি শত্রুর গতিবিধি দেখার জন্য তাদের একেবারে কাছে চলে যেতেন। আমি তাকে কখনো শত্রুর আধিক্যের পরোয়া করতে দেখিনি, তিনি কখনো আক্রমণকারীদের দ্বারা প্রভাবিত হননি। হ্যাঁ, চিন্তা-ভাবনা ও কৌশল অব্যাহত রাখতেন। তার সামনে বিষয়ের সমস্ত দিক উল্লেখ করা হতো এবং তিনি রাগ বা ঘাবড়ে না গিয়ে সমস্ত দিক পর্যালোচনা করে পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নিতেন।” [৩]

জিহাদ, আত্মার খোরাক:

আল্লাহর পথে জিহাদ ছিল সুলতানের জীবনের উদ্দেশ্য এবং তার আত্মার খোরাক। তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এই মহান উদ্দেশ্যের জন্য উৎসর্গীকৃত ছিল। জিহাদের প্রতি তার অনুরাগের কথা উল্লেখ করে কাজী বাহাউদ্দীন ইবনে শাদ্দাদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেন:

[১] আন-নাওয়াদিরুস সুলতানিয়াহ, পৃ. ৫১

[২] আন-নাওয়াদিরুস সুলতানিয়াহ, পৃ. ৫১

[৩] আন-নাওয়াদিরুস সুলতানিয়াহ, পৃ. ৫১

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস (চতুর্থ খণ্ড)

“তিনি জিহাদের অত্যন্ত পাবন্দ ছিলেন। এর অনেক বেশি গুরুত্ব দিতেন। যদি কোনো ব্যক্তি কসম খেয়ে বলে যে, সুলতান জিহাদ শুরু করার পর একটি দিরহাম বা দিনারও জিহাদের প্রস্তুতি ছাড়া অন্য কোনো কাজে ব্যয় করেননি, তবে সে সত্যবাদী হবে। জিহাদ, এর প্রতি ভালোবাসা এবং এর প্রতি অনুরাগ তাঁর পুরো অন্তর ও দেহের ওপর পুরোপুরি ছেয়ে ছিল। তাঁর কাছে জিহাদ সম্পর্কেই কথা হতো, এ নিয়েই চিন্তা-ভাবনা হতো, এর জন্য ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণের ধুন লেগে থাকত, তাঁর মনোযোগের যোগ্য তারাই হতো যারা তাঁকে জিহাদের গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দিত এবং এর ওপর উৎসাহিত করত। জিহাদের ভালোবাসায় সুলতান তাঁর পরিবার-পরিজন, দেশ, ঘর এবং দুনিয়ার সমস্ত স্বাদ ত্যাগ করেছিলেন। এর বদলে তিনি এমন এক তাঁবুর ছায়ায় জীবন অতিবাহিত করার ওপর তুষ্ট ছিলেন যাকে ঝড়ো হাওয়া ডানে-বামে নাড়া দিত। মারজ আক্কার রণাঙ্গনে তাঁর তাঁবু তাঁর ওপর পড়ে গিয়েছিল। যদি তিনি তাঁর সুরক্ষা কেবিনে না থাকতেন তবে জীবিত বাঁচতেন না, কিন্তু এ ধরনের বিপদে জিহাদের প্রতি তাঁর আগ্রহ, দৃঢ়তা এবং মনোযোগ আরও বৃদ্ধি পেত। [১]

যখন কোনো ব্যক্তি তাঁর নিকটবর্তী হতে চাইত, তখন সে তাঁকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করত অথবা তাঁর সামনে জিহাদের কথা বলত। (এই আগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে) তাঁর জন্য জিহাদের ফজিলত সম্পর্কে অনেক বই রচনা করা হয়েছিল। জিহাদের আদব সম্পর্কে একটি বই আমিও রচনা করেছি যাতে জিহাদ সম্পর্কিত সমস্ত রেওয়াজেত একত্রিত করা হয়েছে এবং কঠিন শব্দগুলোর ব্যাখ্যা করে দেওয়া হয়েছে। সুলতান প্রায়ই এটি অধ্যয়ন করতেন। তিনি নিজে এই বই শাহজাদা আফজালকে পড়িয়েছেন। [২]

নৌ-জিহাদের উদ্দীপনা:

সিরিয়ার উপকূলের এক সফরে কাজী ইবনে শাদাদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি সুলতানের সাথে ছিলেন। তিনি সুলতানের সাহসিকতা, সংকল্প এবং উচ্চদৃষ্টির প্রসঙ্গে এই সফরের সময় সুলতানের সাথে তাঁর কথোপকথন নকল করে বলেন:

“শীতের দিন ছিল, সমুদ্রে প্রচণ্ড উত্তাল অবস্থা ছিল। আমি আগে সামুদ্রিক ঝড় দেখিনি তাই আমার ওপর এই দৃশ্য দেখে সমুদ্রের অস্বাভাবিক ভীতি ছেয়ে গেল। আমি মনে মনে ভাবলাম যে, যদি কেউ আমাকে বলে যে তুমি সমুদ্রে এক মাইল সফর করে দেখাও তবে তোমাকে সারা দুনিয়ার রাজত্ব দিয়ে দেওয়া হবে, তবুও আমি এমন ঝুঁকি নেব না। আমি ভাবলাম ওই লোকগুলো কতই না নির্বোধ যারা সামান্য কিছু দিনার ও দিরহামের জন্য সমুদ্রে সফর করে। আমার কাছে তখন ওই আলেমদের কথা খুব ওজনদার মনে হলো যারা সমুদ্র সফরকারীদের শাহাদাতকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন না। এই সমস্ত চিন্তা সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ এবং তা থেকে ভয়ের সৃষ্টি ছিল। আমি যখন এসব ভাবছিলাম তখনই সুলতান ফিরে আমার দিকে তাকালেন এবং বললেন: আপনাকে একটি কথা বলি?

আমি আরজ করলাম: অবশ্যই বলুন।

সুলতান বললেন: “আমার মনে এই কথা আসছে যে, যখন আমি উপকূলের বাকি শহরগুলোও ফিরিঙ্গিদের কাছ থেকে ফেরত...”

[১] আন-নাওয়াদিরুস সুলতানিয়াহ, পৃ. ৫৩

[২] আন-নাওয়াদিরুস সুলতানিয়াহ, পৃ. ৫৩

“...এহণ করি তবে সমস্ত বিজিত এলাকা প্রতিনিধিদের মধ্যে বণ্টন করে দেব, অসিয়ত লিখিয়ে তাদের বিদায় জানাব। তারপর সমুদ্রে বেরিয়ে পড়ব এবং এর দ্বীপগুলো জয় করতে থাকব যতক্ষণ না এই অভিযানে আমার মৃত্যু আসে অথবা পৃথিবীতে কোথাও কুফর অবশিষ্ট না থাকে।” [১]

সুলতানের এই বাক্যগুলো আমার মনে আসা চিন্তাগুলোকে ধুয়ে দিল এবং আমি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠলাম: “আজ পৃথিবীতে সুলতানের চেয়ে বেশি সাহসী এবং তাঁর চেয়ে বেশি আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যের জন্য ব্যাকুল ব্যক্তি আর কেউ নেই।”

সুলতান এটি শুনে জিজ্ঞেস করলেন: “তা কীভাবে?”

আমি আরজ করলাম: “সাহস তো এ থেকেই স্পষ্ট যে, আমি এই সমুদ্র দেখে আতঙ্কিত হচ্ছি আর আপনি এতেই সফরের কথা বলছেন। আর আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যের উদ্দীপনা এ থেকে প্রমাণিত যে, আপনি কোনো একটি বিশেষ এলাকা থেকে আল্লাহর শত্রুদের নির্মূল করে সন্তুষ্ট নন বরং আপনি তো পুরো পৃথিবীকে তাদের থেকে পবিত্র করার জজবা রাখেন।”

তারপর আমি বললাম: আমার মনে যা আসছে তা কি আরজ করব? বললেন: অবশ্যই।

আরজ করলাম: আপনার নিয়ত নিঃসন্দেহে অনেক ভালো কিন্তু আমার রায় হলো আপনি সমুদ্র সফরে আপনার লশকরদের পাঠান কারণ আপনি ইসলামের দুর্গ ও পরিখা, তাই আপনার নিজেকে বিপদে ফেলা সমীচীন হবে না।

সুলতান আমার কথা শুনে জিজ্ঞেস করলেন: আমাকে বলুন তো সবচেয়ে উত্তম মৃত্যু কোনটি?

আমি বললাম: আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত।

সুলতান বললেন: তাহলে বড়জোর এটাই হবে যে আমি সর্বোচ্চ স্তরের মৃত্যু লাভ করব। [২]

ক্ষমা ও উদারতা:

সুলতান অধীনস্থদের ভুলত্রুটির প্রতি ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শনে অভ্যস্ত ছিলেন। একবার কাজী ইবনে শাদ্দাদ (রহ.)-এর খচ্চর বিগড়ে গিয়ে দৌড়ে সুলতানের সওয়ারির সাথে ধাক্কা খেল, সুলতানের উরুতে চোট লাগল কিন্তু তাঁর চেহায়ায় মুচকি হাসি ছিল। একইভাবে একবার বৃষ্টির মৌসুমে কাজী সাহেব সুলতানের সাথে বাইতুল মুকাদ্দাসের গলি দিয়ে যাচ্ছিলেন, সে সময় সেখানে কাদা ছড়িয়ে ছিল। কাজী সাহেবের খচ্চর দ্রুত চলায় কাদা ছিটকে এল যাতে সুলতানের সমস্ত কাপড় নষ্ট হয়ে গেল কিন্তু তিনি হাসতে থাকলেন। কাজী সাহেব সতর্কতাবশত নিজের সওয়ারিকে সুলতানের সওয়ারি থেকে পেছনে নিতে চাইলেন যাতে পুনরায় এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়, কিন্তু সুলতান অনুমতি দিলেন না এবং সাথেই রাখলেন। [৩]

[১] সেই যুগে সিসিলি দ্বীপে একটি শক্তিশালী খ্রিস্টান গোষ্ঠী “নরমানদের” শাসন ছিল যারা উত্তর আফ্রিকা এবং মিশরে সুযোগ বুঝে আক্রমণ করত। একইভাবে রোডস দ্বীপ এবং সাইপ্রাসও নাসারাদের দখলে ছিল, সুলতান এই দ্বীপগুলোসহ কুফরের সমস্ত কেন্দ্রকে পরাভূত করতে চেয়েছিলেন।

[২] আন-নাওয়াদিরুস সুলতানিয়াহ, পৃ. ৫৪-৫৫

[৩] আন-নাওয়াদিরুস সুলতানিয়াহ, পৃ. ৬৩

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

একবার এক গোলাম অন্য এক গোলামের দিকে মোজা ছুড়ে মারল, তা ভুলবশত সুলতান সালাহউদ্দিনের কাছে গিয়ে পড়ল। সুলতান অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে তার সঙ্গীর সাথে কথাবার্তা চালিয়ে গেলেন যেন তিনি কিছুই জানতে পারেননি।

একবার তিনি আওয়াজ দিলেন যে পানি নিয়ে এসো, কেউ শুনতে পেল না। দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার বললেন। এভাবে পাঁচবার আওয়াজ দিলেন কিন্তু কেউ মনোযোগ দিল না। তখন শুধু এতটুকু বললেন: “সাথীরা! আল্লাহর কসম, তৃষ্ণা আমাদের মেরে ফেলছে।” [১]

শত্রুদের সাথে সদাচরণ:

সুলতান নিজের শত্রুদের সাথেও সদাচরণ করতেন। একবার এক ফিরাজি বন্দিকে পেশ করা হলো যে ভয় ও আতঙ্কে কাঁপছিল। সুলতান দোভাষীকে বললেন: “জিঞ্জেরস করো সে কেন ভয় পাচ্ছে?” বন্দি বলল: “প্রথমে তো আমি ভয় পাচ্ছিলাম কিন্তু এখন আপনার দয়ালু চেহারা দেখে নিয়েছি তো ভালো আচরণের আশা জেগেছে।” সুলতানের দয়া হলো এবং তাকে মুক্ত করে দিলেন। [২]

মেহমানদারি:

সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী অত্যন্ত মেহমানদার ছিলেন। তিনি সাধ্যমতো তাদের আপ্যায়ন করতেন, হাসিমুখে দেখা করতেন, তাদের সমস্যা সমাধান করতে এবং আবেদনগুলো পূরণ করতে পূর্ণ চেষ্টা করতেন। তাদের খালি হাতে যেতে দিতেন না। কখনো মেহমানকে পানাহার করানো ছাড়া বিদায় করতেন না। খাদেমদের তাকিদ দেওয়া ছিল যে যখনই কোনো আলেম বা বুজুর্গ আসবেন তখন যেন অবশ্যই সুলতানের সাথে দেখা করানো হয় যাতে সুলতান তাদের যথাযথ সেবা করতে পারেন। [৩]

আলেমদের সম্মান ও মর্যাদার একটি ঘটনা:

একবার কাজী ইবনে শাদদাহ রহ.-এর এক আলেম বন্ধু দূরদূরান্তের এলাকা থেকে এলেন। তিনি হজের জন্য বের হয়েছিলেন, হজের পর বায়তুল মুকাদ্দাস জিয়ারতের জন্য ফিলিস্তিনে এলেন। সেই সাথে তার আকাঙ্ক্ষা ছিল যে সেই মহৎ ব্যক্তিকে এক নজর দেখে নেবেন যিনি বায়তুল মুকাদ্দাসকে মুক্ত করে মুসলমানদের ওপর এহসান করেছেন।

তিনি সুলতানের সেনাশিবিরে পৌঁছালেন এবং কাজী ইবনে শাদদাহ রহ.-এর সাথে বন্ধুত্বের কারণে প্রথমে তার সাথে দেখা করলেন। কাজী সাহেব সুলতানকে তার আগমনের সংবাদ দিলে সুলতান তাকে সেই রাতেই নিজের কাছে ডেকে নিলেন এবং অনেক ইজ্জত ও সম্মান করলেন। রাতে সেই বুজুর্গ কাজী ইবনে শাদদাহের তাঁবুতে অবস্থান করলেন এবং সকাল হতেই সফরের সরঞ্জাম গুছিয়ে নিলেন। কাজী সাহেব জানতেন যে সুলতান তার মেহমানদের বিশেষ করে আলেম ও মাশায়েখদের বিদায় দেওয়ার সময় হাদিয়া দিয়ে থাকেন এবং কারো এটি ছাড়া চলে যাওয়া পছন্দ করেন না, তাই নিজের বন্ধুকে নিষেধ করলেন এবং বললেন যে সুলতানের সাথে বিদায়ী সাক্ষাৎ করে যাবেন। কিন্তু তিনি বললেন: “আমার উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে গেছে। আমি তাকে এক নজর দেখতে চেয়েছিলাম, আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে।” এই বলে তিনি চলে গেলেন।

সুলতান পরে জানতে পারলেন যে তিনি চলে গেছেন, তখন তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন এবং কাজী সাহেবকে তিরস্কার করে বললেন:

[১] তারিখ মুখতাসারুদ দুওয়াল, পৃ. ৩৮৮, ৩৮৯, ত. দারুশ শারক

[২] আন-নাওয়াদিরুস সুলতানিয়াহ, পৃ. ৬৮

[৩] আন-নাওয়াদিরুস সুলতানিয়াহ, পৃ. ৬৬

“এমন একজন লোক আমাদের অনুগ্রহের অংশ না পেয়েই চলে গেল! এটা কীভাবে হলো? আমরা এটা বরদাশত করতে পারছি না।”

সুলতান এতটাই কঠোর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন যে কাজী সাহেবও পেরেশান হয়ে গেলেন। তিনি দামেস্কের কর্মকর্তাদের কাছে চিঠি লিখে নিজের বন্ধুর সাথে যোগাযোগের পথ বের করলেন এবং তাকে বার্তা পাঠালেন যে, সুলতান মুয়াজ্জাম আপনার এভাবে চলে যাওয়ার কারণে আমাদের ওপর অত্যন্ত রাগান্বিত হয়েছেন। আপনি পুনরায় চলে আসুন যাতে সুলতানের রাগ দূর হয়। এই বার্তা পড়ে সেই আলেম কিছুকাল পর পুনরায় সুলতানের কাছে আসলেন। সুলতান অভ্যাস অনুযায়ী তাকে সম্মান ও মর্যাদা দান করলেন। বেশ কয়েকদিন তাঁবুতে রেখে মেহমানদারি করলেন এবং এরপর রাজকীয় পোশাক, সর্বোত্তম সওয়ারি, সফরের খরচ এবং পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব এমনকি প্রতিবেশীদের জন্যও পোশাকের হাদিয়া দিয়ে বিদায় করলেন। [১]

মোদ্দাকথা, সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবী এমন এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন যার নজির ইতিহাসে বিরল। ইসলামের ইতিহাস এই মহান বীরের জন্য সর্বদা গর্ব করবে এবং মুসলমানরা কিয়ামত পর্যন্ত এই মুজাহিদ ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে, যার সীরাতের প্রতিটি ছত্র ঈর্ষণীয় এবং অনুকরণীয়।

[১] আন-নাওয়াদিরুস সুলতানিয়া, পৃষ্ঠা ৬৮।

সুলতান আইয়ুবীর উত্তরসূরিগণ

সুলতান আইয়ুবীর মৃত্যুর পর শাহজাদা আল-মালিক আল-আফজাল শাসনভার গ্রহণ করেন এবং প্রথা অনুযায়ী ন্যায়বিচারের সাথে শাসন করতে শুরু করেন, কিন্তু তার মধ্যে তার পিতার মতো প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা বা প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল না। শীঘ্রই তার নিজের চাচা আল-মালিক আল-আদিল এবং তার ভাইদের সাথে, বিশেষ করে আল-মালিক আল-আজিজের সাথে মতপার্থক্য দেখা দেয়। আল-মালিক আল-আফজালের দুর্বলতা এমন পর্যায়ে ছিল যে, তার সিংহাসন আরোহণের দ্বিতীয় বছর ৫৯০ হিজরি (১১৯৪ খ্রিস্টাব্দ) সালে খ্রিস্টানরা জুবাইল দুর্গ দখল করে নেয় এবং তিনি কিছুই করতে পারেননি। তাকে দুর্বল দেখে সুলতান আইয়ুবীর পুত্র ও ভাইয়েরা নিজ নিজ স্থানে স্বায়ত্তশাসন ঘোষণা করেন। এভাবে সুলতান আইয়ুবীর বিশাল সাম্রাজ্য পাঁচটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। আল-মালিক আল-আফজাল দামেস্কের শাসক হিসেবে বহাল থাকেন, আল-মালিক আল-জাহির আলেপ্পোতে এবং আল-মালিক আল-আজিজ উসমান কায়রোতে স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করেন; বায়তুল মুকাদ্দাসও আল-মালিক আল-আজিজের অধীনে ছিল। সুলতানের এক ভাই আল-মালিক আল-আদিল কারাক ও আল-জাজিরা অঞ্চল দখল করেন। অন্য ভাই সাইফ আল-ইসলাম ইয়েমেন ও জাজিরাতুল আরবের স্বাধীন শাসক হন।

সুলতান আইয়ুবীর পুত্র ও ভাইয়েরা ভাগ্যবান ছিলেন যে তারা বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে মুক্ত শান্তিপূর্ণ দিন পেয়েছিলেন, তারা তাদের মনোযোগ গঠনমূলক কাজের দিকে নিবদ্ধ রেখেছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ তার পিতার মতো বৈদেশিক অভিযানে আগ্রহ দেখাননি। এই শান্তিপূর্ণ সময়ে সিরিয়ার উপকূলে ইউরোপীয় বণিক এবং কুদসের তীর্থযাত্রীরা সর্বোত্তম সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতেন। ইসলামি বিশ্বের অর্থনীতি ও বাণিজ্য উন্নতির দিকে ধাবিত হচ্ছিল। বড় বড় নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছিল। মানুষ সুখী ও সমৃদ্ধ ছিল, তবে শান্তির এই দিনগুলোতেই সুলতানের পুত্রদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই শুরু হয়ে যায়। [১]

আল-মালিক আল-আদিল

(৫৯২ হিজরি/১১৯৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৬১৫ হিজরি/১২১৮ খ্রিস্টাব্দ)

সুলতান আইয়ুবীর আপন ভাই আল-মালিক আল-আদিল ছিলেন অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী সৈনিক এবং বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ। সে সময় তার বয়স ৫৩ বছর হলেও তিনি যুবকদের চেয়েও বেশি শক্তিশালী ছিলেন। সালাহউদ্দিনের আমলেও তিনি অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিলেন। সুলতানের পুত্রদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখে তিনি ধীরে ধীরে রাজনৈতিক বিষয়গুলো নিজের হাতে নিতে শুরু করেন। তিনি আইয়ুবী সাম্রাজ্যের পূর্বদিকের শহরগুলোর...

[১] আন-নুজুমুজ জাহিরাহ: ৬/১০৩; মুফাররিজুল কুরুব, ৩/২৮; আস-সুলুক লি-মা'রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক, তাকিউদ্দিন আল-মাকরিজি: ১/২৩১, তাবা ইলমিয়াহ; দ্য ট্রুসেডস, হ্যারল্ড ল্যান্স: পৃষ্ঠা ১৭৭, ব্যাডফোর্ড লন্ডন, ১৯৩১।

ওয়ালী ছিলেন। দামেস্কের আমির আল-মালিক আল-আফজালের অধিকাংশ সময় ইবাদত ও রিয়াযতে অতিবাহিত হতো এবং রাষ্ট্রীয় বিষয়ের সাথে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না। তার প্রতিনিধিদের অদূরদর্শিতার কারণে প্রজারা অতিষ্ঠ ছিল। এই পরিস্থিতি কায়রোর আমির আল-মালিক আল-আজিজকে দামেস্ক আক্রমণের অজুহাত তৈরি করে দেয়। রজব ৫৯২ হিজরি (১১৯৫ খ্রিস্টাব্দ) সালে যখন দুই ভাইয়ের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়, তখন আল-আদিল আল-মালিক আল-আজিজের পক্ষ নেন। যুদ্ধের ফলে আল-মালিক আল-আফজাল ক্ষমতার বাইরে চলে যান এবং আল-আদিল আল-আজিজকে সাহায্য করার পুরস্কার হিসেবে দামেস্কের শাসনভার লাভ করেন। [১]

চতুর্থ ক্রুসেড:

এই প্রশাসনিক পরিবর্তনগুলো সঠিক সময়ে হয়েছিল কারণ রোমের পোপ আবারও ক্রুসেডার শাসকদের পবিত্র ভূমি আক্রমণের আহ্বান জানিয়েছিলেন। যদি দামেস্কে আল-আফজালের পরিবর্তে আল-আদিল না আসতেন, তবে এই যুদ্ধ জয় করা অত্যন্ত কঠিন হতো। ৫৯৩ হিজরি (১১৯৬ খ্রিস্টাব্দ) সালে জার্মানির রাজা ষষ্ঠ হেনরি ক্রুসেডার বাহিনীকে ভূমধ্যসাগরীয় পথে ইসলামি বিশ্বের ওপর আক্রমণের জন্য পাঠান, তখন এখানে তার মোকাবিলা হয় আল-আদিলের মতো একজন অভিজ্ঞ সৈনিকের সাথে, যিনি সুলতান সালাহউদ্দিনের চেষ্টা মুসলমানদের মধ্যে পুনরায় জাগ্রত করছিলেন।

রামলা চুক্তির অধীনে আক্কা আগে থেকেই ক্রুসেডারদের দখলে ছিল, ক্রুসেডাররা একে ঘাঁটি বানিয়ে বৈরুতের দিকে অগ্রসর হয়। আল-মালিক আল-আদিল অত্যন্ত তৎপরতার সাথে আক্রমণকারীদের মোকাবিলা করেন এবং গেরিলা অভিযানের মাধ্যমে ক্রুসেডার বাহিনীকে সামনে অগ্রসর হতে বাধা দেন। দুই বছর ধরে সংঘর্ষ চলতে থাকে। কায়সারিয়াসহ সিরিয়ার উপকূলীয় ফ্রন্টগুলোতে ক্রুসেডার বীররা কোনো সাফল্য অর্জন করতে পারেনি, তবে ৫৯৪ হিজরি (১১৯৭ খ্রিস্টাব্দ) সালে তারা বৈরুত দখল করে নেয় কিন্তু আল-আদিল পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে তাদের গুরুত্বপূর্ণ শহর ইয়্যুফা জয় করে নেন। ফিরিজিরা এই পরাজয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং অন্যদিকে মোড় নিয়ে ‘তিবনিন’ অবরোধ করে।

আল-মালিক আল-আদিল এই সংবাদ পাওয়া মাত্রই আল-মালিক আল-আজিজকে সাহায্যের জন্য তলব করেন। উভয়ের যৌথ বাহিনী যখন তিবনিন পৌঁছায়, তখন ফিরিজিরা ঘাবড়ে গিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। চাচা ও ভাতিজা পলায়নকারীদের পশ্চাদ্ধাবন অব্যাহত রাখেন এবং তাদের হত্যা ও আঘাত করতে থাকেন যতক্ষণ না ফিরিজিরা সুর দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নেয়। আল-মালিক আল-আদিল ফিরিজিদের ওপর আক্রমণ অব্যাহত রাখেন। এই সময়ে ইতালিতে রাজা ষষ্ঠ হেনরির মৃত্যু ঘটে, অন্যদিকে আক্কায়ে হেনরি অফ শ্যাম্পেন, যিনি ক্রুসেডার বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, উচ্চতা থেকে পড়ে মারা যান। তার এই আকস্মিক মৃত্যুতে খ্রিস্টান বাহিনীর উৎসাহ ফেনার মতো থিতুয়ে যায়। অবশেষে ফিরিজিরা আল-মালিক আল-আদিলের সাথে তিন বছরের জন্য যুদ্ধবিরতি চুক্তি করে।

মোটকথা, চতুর্থ ক্রুসেডে খ্রিস্টান আক্রমণকারীরা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয় এবং সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্যও মুসলমানদের কোনো শহর তাদের দখলে আসেনি, বরং সিরিয়ার উপকূলে তাদের অধিকৃত সীমানা আরও সংকুচিত হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে আল-মালিক আল-আদিল এবং আল-মালিক আল-আজিজ নিজেদের সুলতান সালাহউদ্দিনের যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে প্রমাণ করেছিলেন। [২]

[১] আস-সুলুক লি-মা’রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক লিল-মাকরিজি: ১/ ২৩৩ থেকে ২৩৭, তবা আল-ইলমিয়াহ; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৫৯২ হিজরি।

[২] মুফাররিজুল কুরুব লি-ইবনে ওয়াসিল: ৩/ ৭১ থেকে ৭৬, তবা আল-আমিরিয়াহ; আস-সুলুক লি-মা’রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক লিল-মাকরিজি: ১/ ২৫৩, তবা আল-ইলমিয়াহ।

আল-মালিকুল আজিজ এই বিজয়ের পর মিশরে পৌঁছালে এক কবি তার প্রশংসা করে বললেন:

قَدِمْتَ بِالسَّعْدِ وَبِالْمُغَمِّ كَذَا قُدُومُ الْمَلِكِ الْمُقَدِّمِ

“আপনি সৌভাগ্য ও গনিমতের সাথে এসেছেন। প্রথম সারির বাদশাহর আগমন এমনই হয়ে থাকে।”

يَا قَاتِلَ الْكُفَّارِ وَأَحْزَابِهِ بِالسَّيْفِ وَالْدِّينَارِ وَالذَّرْهَمِ

“হে কাফের ও তাদের মিত্রদের বিরুদ্ধে তলোয়ার, দিনার ও দিরহামের মাধ্যমে লড়াইকারী।”

فَقِصُّكَ الْمَوْرُوثُ عَنْ يُوسُفَ مَا جَاءَ إِلَّا صَادِقًا بِالْذِّمِّ

“আপনি ইউসুফের সেই জামাটি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন যা সত্যিই রক্তে রঞ্জিত।”

তরুণ আইয়ুবী শাহজাদা আল-মালিকুল আজিজ বেশি সময় পাননি এবং তিনি ২০ মাহরম ৫৯৫ হিজরিতে ২৮ বছর বয়সে পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। তিনি একজন সাহসী, দানশীল ও মহৎ শাসক ছিলেন। [১]

এরপর মিশরের শাসনভার তার অল্পবয়সী পুত্র আল-মালিকুল মনসুর লাভ করেন, কিন্তু তিনি শাসনকার্য পরিচালনার যোগ্য ছিলেন না, তাই সালতানাতের আমিরগণ তার ওপর সম্ভ্রষ্ট ছিলেন না। সুলতান আইয়ুবীর পুরনো মামলুক আমিরগণ বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও পারস্পরিক ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। তারা আল-আদিলকে সুলতান সালাহউদ্দিনের নাতিদের চেয়ে বেশি যোগ্য মনে করতেন, তাই তারা সবাই আল-আদিলের চারপাশে সমবেত হলেন। আল-আদিল তাদের এক সভায় বললেন:

“এটা কি লজ্জার বিষয় নয় যে, আমি এই বৃদ্ধ বয়সে একটি শিশুর আতাবাক (অভিভাবক) হব? বাদশাহী উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়ার কোনো বস্তু নয়, বরং এটি শক্তিমানের অধিকার। সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর পর আমিই সালতানাতের হকদার ছিলাম, কিন্তু আমি মরহমের সম্মানে নিজের অধিকার ত্যাগ করেছিলাম। কিন্তু যখন আমি এই পারস্পরিক বিবাদ দেখলাম, তখন আমার আশঙ্কা হলো যে রাজ্য আমার হাত থেকেও যাবে এবং মরহমের সন্তানদের হাত থেকেও। আমি শেষ সীমা পর্যন্ত বিষয়গুলো মীমাংসা করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু যখন দেখলাম যে যতক্ষণ না আমি শাসনভার গ্রহণ করছি, ততক্ষণ এই বিশৃঙ্খলা দূর হবে না।” [২]

আরব, তুর্কি ও কুর্দিদের মধ্যে এই প্রথা চলে আসছিল যে, তারা গোত্রের সবচেয়ে প্রবীণ ব্যক্তিকে সর্দার হিসেবে নির্বাচিত করত। আল-মালিকুল আদিলকেও এই নীতির ভিত্তিতে পুরো আইয়ুবী সালতানাতের শাসক হিসেবে মেনে নেওয়া হলো। আল-মালিকুল আদিল ১১ শাওয়াল ৫৯৬ হিজরি (২৭ জুলাই ১২০০ খ্রিস্টাব্দ) তারিখে মিশরের শাসনভার সরাসরি গ্রহণ করেন। এভাবেই আইয়ুবী শাহজাদাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের অবসান আল-মালিকুল আদিলের বাদশাহীর মাধ্যমে ঘটে এবং মুসলমানরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

আল-আদিল রাজধানী দামেস্ক থেকে কায়রোতে স্থানান্তরিত করেন। তার শাসনকালে আইয়ুবী সালতানাত আবারও স্থিতিশীল হয়ে ওঠে। তিনি দ্রুত তার সালতানাতের সীমানা বৃদ্ধি করেন। এখন তিনি মিশর, সিরিয়া, জর্ডান, হিজাজ ও ইয়েমেনের একচ্ছত্র শাসক ছিলেন।

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ২১/৩৯২, ত-রিসালাহ

[২] আস-সুলুক লি-মা'রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক লিল-মাকরিজি: ১/২৬৩, ত-ইলমিয়াহ

সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর পুত্রদের মধ্যে কেবল আল-মালিক আল-জাহিরই ছিলেন যিনি দীর্ঘকাল রাজত্ব করেছিলেন। তিনি আল-আদিলের জামাতাও ছিলেন। তিনি ৬১৩ হিজরি পর্যন্ত নিজের মৃত্যু অবধি আলেপ্পো এবং এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের শাসক ছিলেন। [১]

আল-আদিল ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান, সাহসী, বিচক্ষণ এবং সুবক্তা। তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের এক অনন্য প্রতিভা। তিনি সচ্চরিত্র এবং সুদর্শন ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ, গান্ধীর্ষপূর্ণ এবং আকর্ষণীয়। তিনি অধীনস্থ এবং প্রজাদের ওপর মুক্তহস্তে ব্যয় করতেন। তিনি সর্বদা কর্মতৎপর থাকতেন। গ্রীষ্মকাল দামেস্কে এবং শীতকাল মিশরে অতিবাহিত করতেন। [২] তাঁর হজমশক্তি এমন ছিল যে, তিনি একাই একটি আস্ত ভুনা দুধা খেয়ে ফেলতেন। [৩]

বাইজেন্টাইন রোমের পতন

সপ্তম হিজরি শতকের (ত্রয়োদশ খ্রিস্টীয় শতক) শুরুতে পোপ ইনোসেন্ট তৃতীয় রোমান চার্চের সিংহাসনে আসীন হন। তিনি পুনরায় ক্রুসেড যুদ্ধের পথ প্রশস্ত করতে শুরু করেন। তবে এবার তাঁর লক্ষ্য কেবল বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয় ছিল না, বরং তিনি সমগ্র পূর্ব খ্রিস্টান বিশ্বকে রোমান চার্চের অধীনে আনতে চেয়েছিলেন, এমনকি বাইজেন্টাইনদের কেন্দ্র কনস্টান্টিনোপল এবং এর আধ্যাত্মিক কেন্দ্র গ্রিসকেও। শত শত বছর ধরে খ্রিস্টান জগত দুটি কেন্দ্রে বিভক্ত ছিল। একদিকে ছিল গ্রিক চার্চের সাথে যুক্ত বাইজেন্টাইনরা এবং তাদের রাজনৈতিক কেন্দ্র ছিল কনস্টান্টিনোপল। অন্যদিকে ছিল ইতালীয়রা যাদের রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক কেন্দ্র ছিল রোম। রোমান চার্চের প্রধান পোপ ইনোসেন্ট তৃতীয় চেয়েছিলেন এই বিভক্তি শেষ হোক এবং সমগ্র খ্রিস্টান জগত একটি চার্চ ও একটি রাজনৈতিক কেন্দ্রের অধীনে এসে মুসলিম বিশ্বকে তাদের লক্ষ্যবস্তু বানাক।

এই সময়ে কনস্টান্টিনোপলে একটি বিপ্লব ঘটে। সেখানে সম্রাট আইজ্যাক, যিনি মুসলমানদের সন্তুষ্টির জন্য সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর সাথে মৈত্রী স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন এবং নিজের রাজধানীতে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন, তাঁকে বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হয়। তাঁকে অন্ধ করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় এবং বিদ্রোহী গোষ্ঠীর নেতা তৃতীয় অ্যালেক্সিয়াস উপাধি নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন। অন্যদিকে, ক্ষমতাচ্যুত সম্রাটের পুত্র পালিয়ে ক্রুসেডার বাহিনীর কাছে পৌঁছান এবং ক্রুসেডার বাহিনীর নেতাদের মুসলিম বিশ্বের আগে কনস্টান্টিনোপল দখল করার জন্য রাজি করাতে সক্ষম হন।

৫৯৯ হিজরিতে (১২০৩ খ্রিস্টাব্দ) ক্রুসেডার বাহিনীর নৌবহর তাদের লক্ষ্যের দিকে রওনা হয়। তারা বাইজেন্টাইন রাজধানী অবরোধ করে। যুদ্ধ চলাকালীন নতুন সম্রাট ভীত হয়ে শহর থেকে পালিয়ে যান। এটি দেখে বাইজেন্টাইনরা বৃদ্ধ ক্ষমতাচ্যুত আইজ্যাককে কারাগার থেকে বের করে পুনরায় সিংহাসনে বসায়। এর পরপরই ক্রুসেডাররা উপকূলে নোঙর ফেলে এবং একজন দূত পাঠিয়ে এই শর্ত মেনে নিতে বাধ্য করে যে, এখন থেকে বাইজেন্টাইন রাজত্ব রোমান চার্চের অধীনে থাকবে। কিন্তু তারা মুসলিম বিশ্বের দিকে রওনা হওয়ার আগেই কনস্টান্টিনোপলের স্থানীয় আমিররা আইজ্যাকের চুক্তি প্রত্যাখ্যান করে এবং রোমানরা বিদ্রোহ করে বৃদ্ধ সম্রাট ও তাঁর পুত্রকে গ্রেপ্তার করে হত্যা করে। এই ঘটনাটি ঘটে ১৪ রবিউস সানি ৬০০ হিজরিতে (১ জানুয়ারি ১২০৪ খ্রিস্টাব্দ)।

[১] আল-ইবার ফি খবর মান গাবার লিয-যাহাবি: ৩/৯৯ থেকে ১৫৯, ত. আল-ইলমিয়াহ।

[২] ওয়াফায়াতুল আইয়ান লি ইবনে খাল্লিকান: ৫/৭৬, ত. দার সাদির।

[৩] আস-সুলুক লি-মা'রিফাত দুওয়ালিল মুলুক লিল-মাকরিজি: ১/৩১২, ত. আল-ইলমিয়াহ।

বাইজেন্টাইন আমিররা এখন ক্রুসেডারদের মোকাবিলা করতে এলেন, কিন্তু এক ভয়াবহ যুদ্ধের পর তারা পরাজিত হলেন এবং ক্রুসেডাররা কনস্টান্টিনোপলে প্রবেশ করল। অসভ্য ও বন্য ক্রুসেডাররা পুরো শহরে লুটপাটের তাণ্ডব চালাল। এভাবে বাইজেন্টাইন রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটল এবং রোমের গির্জা সেই বিস্তৃতি লাভ করল যার স্বপ্ন পোপ ইনোসেন্ট ৩য় দীর্ঘকাল ধরে দেখছিলেন। পোপ গির্জার ক্ষমতাকে অসাধারণ মাত্রায় সুসংহত করে পরবর্তী ক্রুসেড যুদ্ধের পথ প্রশস্ত করলেন। [১]

আল-মালিক আল-আদিলের পুত্রগণ:

আল-মালিক আল-আদিল একটি সমৃদ্ধ রাজ্যের সৌভাগ্যবান শাসক ছিলেন। কয়েকটি পূর্বীয় জেলা বাদে সুলতান আইয়ুবীর সমস্ত বিজিত ভূমি তার অধীনে ছিল। তার পুত্ররাও ছিল তরুণ, বুদ্ধিমান এবং সাহসী। তাদের যোগ্যতা দেখে তিনি এই বিশাল সাম্রাজ্যের প্রদেশগুলো তাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। রাজধানী কায়রোতে আল-মালিক আল-কামিল মুহাম্মদ তার প্রতিনিধি ছিলেন। সিরিয়ায় আল-মালিক আল-মুয়াজ্জাম ঈসা এবং আল-জাজিরায় আল-মালিক আল-আশরাফ। এই তিন পুত্র একই বছরে অর্থাৎ ৫৭৬ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং এখন তাদের বয়স ছিল প্রায় ৩৮ বছর। তারা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে রাষ্ট্রীয় কাজ পরিচালনা করতেন। প্রত্যেকের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ধর্মীয়, জ্ঞানতাত্ত্বিক এবং জিহাদি পরিবেশে হয়েছিল। তারা বড় বড় আলেম ও মুহাদ্দিসদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। প্রত্যেকেই যেমন তলোয়ার চালনায় পারদর্শী ছিলেন, তেমনি ছিলেন বিজ্ঞ আলেম।

আল-মালিক আল-কামিল তার পিতার মতোই বুদ্ধিমান, অভিজ্ঞ এবং দূরদর্শী রাজনীতিবিদ ছিলেন। তার প্রভাব ও চমৎকার ব্যবস্থাপনার কারণে মিশর সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছিল। তিনি শরীয়তের অনুসরণ এবং সুন্নাহর প্রসারে আগ্রহী ছিলেন। সফর ও আবাসে আলেমগণ সর্বদা তার সাথে থাকতেন।

আল-মালিক আল-মুয়াজ্জাম ঈসা হাফেজে কুরআন ছিলেন। তিনি পড়াশোনার এতই অনুরাগী ছিলেন যে সাধারণত কোনো না কোনো কিতাব তার বগলে থাকত। তিনি হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন এবং ‘আল-আকিদাহ আত-তাহাবিয়াহ’-কে আহলে সুন্নাতের মানদণ্ড মনে করতেন। ফিকহ শাস্ত্রে তার এমন দক্ষতা ছিল যে আলেমগণ তাকে ফতোয়া দেওয়ার যোগ্য বলে ঘোষণা করেছিলেন। সেই সাথে তিনি একজন দক্ষ অশ্বারোহী ও তলোয়ারবাজও ছিলেন। তিন হাজার বাছাইকৃত সৈন্যের একটি বিশেষ বাহিনীর কমান্ড তার হাতে থাকত। এই বাহিনীর শৃঙ্খলা ও জাঁকজমক দেখে দুনিয়া অবাক হয়ে যেত। তিনি সাধারণ মানুষের সাথে কোনো আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই মেলামেশা করতেন। তিনি তার চাচা সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর ভক্ত ছিলেন। প্রতি জুমায় তিনি তার কবরে যেতেন।

আল-মালিক আল-আশরাফ মুসা আল-জাজিরা, হাররান, রুহা এবং খিলাতের শাসক ছিলেন। তিনি দানশীল ও মহৎ ছিলেন। মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণে তিনি মুক্তহস্তে ব্যয় করতেন। তিনি দরিদ্র ও দরবেশদের প্রতি সদয় ছিলেন। তিনি হাম্বলী মাযহাবের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। দীর্ঘকাল তিনি ভ্রমণ ও আমোদ-প্রমোদেও আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু পরে আলেমদের বুঝানোর পর তিনি এসব ত্যাগ করেন। এই যোগ্য পুত্রদের নিয়ে আল-মালিক আল-আদিল একটি সন্তোষজনক জীবন অতিবাহিত করছিলেন। কেউ জানত না যে আগামী বছরগুলো কতটা ভয়াবহ হতে যাচ্ছে। [২]

[১] The Crusades by Harold Lamb: p; 187 to 229

[২] সিয়ার আলামুন নুবালা: ২২/১১৫ থেকে ১২০, তরাজিমুল মালিকিল আদিল আবি বকর ওয়া বানিহি, ত. আর-রিসালাহ

পঞ্চম ক্রুসেড:

৬১২ হিজরি (১২১৭ খ্রিষ্টাব্দ) মুসলিম বিশ্বের জন্য দ্বিমুখী বিপদের বার্তা নিয়ে এল। পূর্বে চেন্সিস খানের লাগামহীন শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠল এবং পশ্চিমে ক্রুসেডার যোদ্ধারা নতুন করে সংগঠিত হতে শুরু করল। চেন্সিস খানের আক্রমণ তখনও নিশ্চিত ছিল না, খাওয়ারিজম শাহের সাথে বাণিজ্যিক বিষয়ে তার চুক্তি হয়েছিল। কিন্তু এদিকে পশ্চিমের সীমানা থেকে ক্রুশের পূজারীরা হঠাৎ মুসলিম বিশ্বের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এই যুদ্ধের প্রস্তুতি এভাবে শুরু হয়েছিল যে, ৬০৯ হিজরিতে (১২১২ খ্রিষ্টাব্দ) সন্ন্যাস জীবন যাপনকারী খ্রিস্টান বালকদের একটি বিশাল দল পবিত্র ভূমি জিয়ারতের জন্য কোমর বেঁধে বের হলো। কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছানোর আগেই তারা জলদস্যু, দাস ব্যবসায়ী এবং ডাকাতদের কবলে পড়ল। তাদের একটি জাহাজ ভূমধ্যসাগরে ডুবে গেল। বাকি অবশিষ্ট বালকরা চরম বিপর্যয়ের মধ্যে নিজ দেশে ফিরে এল। পোপ ইনোসেন্ট একটি নতুন অজুহাত পেয়ে গেলেন। তিনি বললেন:

“এটি লজ্জার বিষয় যে, শিশুরা পবিত্র ভূমি উদ্ধারের জন্য বের হচ্ছে অথচ আমরা ঘরে বসে আছি।”

তিনি সেই স্থানের কাছে যেখানে বালকদের জাহাজ ডুবেছিল, একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করালেন এবং ইউরোপে একটি নতুন ক্রুসেড যুদ্ধের ডাক দিলেন। তিনি একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজপুত্র হেনরি ষষ্ঠকে রোমান সাম্রাজ্যের প্রধান নিযুক্ত করলেন এবং রজব ৬১২ হিজরি (নভেম্বর ১২১৫ খ্রিষ্টাব্দ) ইউরোপীয় শাসকদের এক সভায় যুদ্ধের ঘোষণা দিলেন। যাত্রার জন্য সফর ৬১৪ হিজরি (জুন ১২১৭ খ্রিষ্টাব্দ) তারিখ নির্ধারিত হলো। চার বছর পর্যন্ত ইউরোপে অভ্যন্তরীণ বিবাদ নিষিদ্ধ করা হলো। পাদ্রিরা তাদের আয়ের বিশ শতাংশ যুদ্ধের জন্য বরাদ্দ করল। তবে যুদ্ধের যাত্রার আগেই পোপ ইনোসেন্ট মারা যান। যদিও তার তেরো বছরের পোপ শাসনামলে পবিত্র ভূমিতে কোনো খ্রিস্টান আক্রমণ সফল হতে পারেনি, তবুও তার সময়কালকে মধ্যযুগে চার্চের সবচেয়ে গৌরবময় সময় বলা হয়, কারণ তিনি চার্চের ক্ষমতাকে অত্যন্ত বিস্তৃত করে সরকারের উর্ধ্ব নিয়ে গিয়েছিলেন।

ইনোসেন্টের পরেও ক্রুসেড যুদ্ধের প্রস্তুতি অব্যাহত রইল। সবার আগে হাঙ্গেরির রাজা বাহিনী প্রস্তুত করলেন, তারপর জার্মান ফ্রেডরিক দ্বিতীয় এবং কনস্টান্টিনোপলের সম্রাট অস্ত্র ধরলেন। অস্ট্রিয়া, আর্মেনিয়া এবং সাইপ্রাসের নামকরা রাজা, নবাব, নাইট এবং ধর্মীয় নেতারা এই আক্রমণে শরিক ছিলেন। এবার মিশরের উত্তর উপকূলীয় শহর দমিয়াত দখলের মাধ্যমে সামনে অগ্রসর হওয়ার পরিকল্পনা করা হলো। এই ক্রুসেড যুদ্ধ পূর্ববর্তী সকল যুদ্ধ থেকে ভিন্ন ছিল। ইউরোপ বিগত চারটি ক্রুসেড যুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পেরেছিল যে, সরাসরি সিরিয়া আক্রমণ করে বায়তুল মুকাদ্দাস দখল করা অত্যন্ত কঠিন। এর পরিবর্তে এখন তাদের পরিকল্পনা ছিল আইয়ুবী সালতানাতের সামরিক কেন্দ্র মিশর আগে জয় করা হোক, এতে যত বছরই লাগুক না কেন। যখন মুসলমানরা সামরিক শক্তি থেকে বঞ্চিত হবে, তখন বায়তুল মুকাদ্দাস নিয়ে ভাবা যাবে। [১]

মিশরের উত্তরে ভূমধ্যসাগরে যেখানে ক্রুসেডার নৌবহর চলাচল করছিল, দেশটির রাজধানী কায়রো সমুদ্র থেকে প্রায় ১০০ মাইল দূরে ছিল। কায়রোর উত্তরে নীল নদ অনেকগুলো ছোট ছোট শাখায় বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। এই বিশাল নদীর বদ্বীপ...

[১] The Crusades by Harold Lamb: p: 236 to 240.

ছিল। ডেল্টা বা বদ্বীপের শাখাগুলোর মাঝে সবদিকে দোদুল্যমান শস্যক্ষেত ছিল এবং ডজন ডজন খাল জালের মতো ছড়িয়ে ছিল। নদীর শাখা ও খালগুলোর পাড়ে বাঁধ তৈরি করা হয়েছিল, যার উপরিভাগ রাস্তা ও মহাসড়ক হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এটিই ছিল সেই রণক্ষেত্র যেখানে পঞ্চম ক্রুসেড যুদ্ধ সংঘটিত হতে যাচ্ছিল।

যুদ্ধের প্রথম পদক্ষেপ ছিল দমিয়াত দখল করা। এই শহরটি ভূমধ্যসাগরের এমন এক স্থানে অবস্থিত যে, এখানে দখলদার বাহিনী সহজেই ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরের পথগুলোর ওপর নজরদারি করতে পারত; ফলে এটি মুসলিম বিশ্বের জন্য উত্তর-পশ্চিম প্রবেশদ্বার হিসেবে বিবেচিত হতো। দমিয়াতের প্রাচীরের কাছেই নীল নদ ভূমধ্যসাগরে গিয়ে মিশেছে। এখানে দখল করার মাধ্যমে নীল নদের পথ ধরে শুধু পুরো মিশর নয়, বরং পূর্ব আফ্রিকার অন্যান্য দেশ পর্যন্তও সহজেই পৌঁছানো সম্ভব ছিল।

ক্রুসেডার বাহিনী সরাসরি দমিয়াত যাওয়ার পরিবর্তে রমজান ৬১৩ হিজরি (১২১৭ খ্রিস্টাব্দের শুরুতে) আক্কার উপকূলে নোঙর ফেলে এবং দীর্ঘ সময় ধরে বায়সান, বানিয়াস ও সুর-এর আশপাশে হত্যা ও লুণ্ঠন চালাতে থাকে। মুজাহিদে ইসলাম আল-মালিক আল-আদিল এই সুযোগে নিজেকে সালাহউদ্দিনের প্রকৃত ভাই হিসেবে প্রমাণ করেন। তাঁর বয়স তখন ৭৭ বছর হয়েছিল, কিন্তু তিনি সিরিয়ায় পূর্ণ সচেতনতা, সাহস ও কৌশলের সাথে ক্রুসেডারদের সামনে প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রস্তুতি নিতে থাকেন।

ক্রুসেডাররা আক্কা থেকে রওনা হয়ে রবিউল আউয়াল ৬১৫ হিজরি (মে ১২১৮ খ্রিস্টাব্দ) দমিয়াতে পৌঁছে যায়। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল সাইপ্রাসের শাসক রাজা জন অফ ব্রিন, যাকে ইউরোপীয় বিশ্ব আইনগতভাবে জেরুজালেমের রাজাও মনে করত।

আল-মালিক আল-আদিল তাঁর পুত্র আল-মালিক আল-কামিলকে দমিয়াত রক্ষার জন্য পাঠিয়েছিলেন। তিনি নিজে রোমান বাদশাহ কায়কাউসের প্রতিরোধ করার জন্য সিরিয়ায় অবস্থান করেন। কায়কাউস উত্তরের স্থলপথ দিয়ে সিরিয়া আক্রমণ করছিল। আল-আদিল তাঁর দ্বিতীয় পুত্র আল-মালিক আল-শরাফকে পাঠিয়ে তাঁর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন। রবিউস সানি ৬১৫ হিজরি (জুলাই ১২১৮ খ্রিস্টাব্দ) উভয়ের মধ্যে তীব্র লড়াই হয়। অবশেষে আল-আশরাফ রোমান বাদশাহকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে পিছু হটতে বাধ্য করেন।

ওদিকে দমিয়াত রণাঙ্গনে যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল। ইউরোপীয়রা নীল নদের ডেল্টা দিয়ে তাদের যুদ্ধজাহাজ মিশরে প্রবেশ করানোর চেষ্টা করছিল। মুসলমানরা নদীর মোহনায় পানির সমতলে এক পাড় থেকে অন্য পাড় পর্যন্ত শিকলের বেষ্টনী তৈরি করে রেখেছিল। এই শিকল-ফটকের ওপর একটি সুউচ্চ ও বিশাল সেতু ছিল, যা নদীর এক পাড় থেকে দমিয়াতের প্রাচীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সমুদ্র থেকে নীল নদে প্রবেশের জন্য প্রতিটি নৌকাকে এই সেতুর নিচ দিয়ে যেতে হতো। সেতুর ওপর বিপুল সংখ্যক মুসলিম সৈন্য মোতায়েন ছিল। খ্রিস্টানদের নৌবহর আক্রমণ করলে সেতু থেকে তাদের ওপর তীর নিক্ষেপ, অগ্নিসংযোগ ও পাথর বর্ষণ করা হতো। চার মাসব্যাপী ভয়াবহ লড়াইয়ের পর ক্রুসেডাররা সেতুটি দখল করে নেয়। আরও সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্য তারা শিকলের বেষ্টনী ভেঙে ফেলে, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে আল-মালিক আল-কামিল মুহাম্মদ কিছুটা দূরত্বে আরেকটি সেতু নির্মাণ করে সেখানে সৈন্য মোতায়েন করে দিয়েছিলেন। নৌবহর সেখানে পৌঁছামাত্রই পুনরায় প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর ইউরোপীয় নাবিকরা এই সেতুটিও দখল করে নেয়।

আল-মালিক আল-কামিল মুহাম্মাদ প্রতিটি কৌশল ব্যর্থ হতে দেখে একটি অদ্ভুত কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি প্রচুর পরিমাণে মালবাহী বিশাল বিশাল নৌকা তৈরি করালেন এবং সেগুলোতে হাজার হাজার মণ পাথর বোঝাই করে নীল নদের মাঝখানে দুই তীরের মাঝে দাঁড় করিয়ে দিলেন। যখন শত্রুর নৌবহর এই দিকে এল, তখন আল-মালিক আল-কামিল নির্দেশ দিলেন যে নৌকাগুলোর তলায় ছিদ্র করে দেওয়া হোক। নির্দেশ পালন করা হলো, বিশাল নৌকাগুলো নদীর তলদেশে এমনভাবে গিয়ে ঠেকল যে তাদের উপরের অংশ পানির উপরিভাগ স্পর্শ করছিল। হাজার হাজার মণ পাথরের ওজনের কারণে সেগুলোকে নিজ জায়গা থেকে সরানো অসম্ভব ছিল, খ্রিস্টান সৈন্যরা সেগুলোকে সরানোর কোনো কৌশল করতে না পেরে থমকে গেল। [১]

আল-মালিক আল-আদিলের মৃত্যু এবং তার পুত্রদের ক্ষমতা:

নিত্যনতুন যুদ্ধের সাথে এই যুদ্ধ চলতে থাকল এবং অবশেষে ফরাসিরা প্রতিটি বাধা অতিক্রম করে দমিয়াতের প্রাচীর পর্যন্ত পৌঁছে গেল। আল-মালিক আল-কামিল এই পরিস্থিতিতে তার পিতার কাছে সাহায্য চাইলেন। আল-মালিক আল-আদিল যখন এই খবর পেলেন, তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হলেন এবং উম্মতের অবস্থার ওপর আহাজারি করতে করতে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। কয়েক দিন পর ৭ই জুমাদাল আখিরা ৬১৫ হিজরি (৩০ আগস্ট ১২১৮ খ্রিস্টাব্দ) দামেস্কের বাইরে তাঁবুতে অবস্থানরত ইসলামের রক্ষক আল-মালিক আল-আদিল ৭৩ বছর বয়সে মহান আহবানে সাড়া দিলেন। [২]

আল-মালিক আল-কামিল মুহাম্মাদ

(৬১৫ হিজরি (১২১৮ খ্রিস্টাব্দ) থেকে ৬৩৫ হিজরি (১২৩৮ খ্রিস্টাব্দ))

আল-মালিক আল-আদিলের মৃত্যুকে ততক্ষণ পর্যন্ত গোপন রাখা হয়েছিল যতক্ষণ না তার উত্তরসূরি আল-মালিক আল-কামিল মিশরে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। আল-কামিল একজন অভিজ্ঞ সৈনিক ছিলেন, তিনি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে পূর্ণ প্রতিরোধ চালিয়ে যান, তবে এরই মধ্যে তার কিছু আমির আমির ইমাদুদ্দিন ইবন মশতুকের নেতৃত্বে তাকে সরিয়ে তার ভাই আল-মালিক আল-ফাইজকে শাসক বানানোর চেষ্টা শুরু করেন। ফলে আল-মালিক আল-কামিলকে দমিয়াত থেকে এই অবস্থায় সরে যেতে হলো যে ক্রুসেডার বাহিনী নীল নদে প্রবেশের চেষ্টা করছিল। আল-কামিলের অনুপস্থিতি এবং মুসলমানদের মধ্যে এই রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার ক্রুসেডাররা পূর্ণ সুযোগ নিল এবং যুলকাদা ৬১৫ হিজরি (জানুয়ারি ১২১৯ খ্রিস্টাব্দ) তাদের নৌবহর নীল নদে ঢুকে পড়ল। ফরাসিরা উপত্যকায় নামল এবং দমিয়াত অবরোধ করল। এই সময়ে আল-মালিক আল-আদিলের অন্য দুই ছেলে আল-মালিক আল-আশরাফ মুসা এবং আল-মালিক আল-মুয়াজ্জাম ইসা পিতার ইস্তিকালের পর সিরিয়া এবং আল-জাজিরার বিভিন্ন অংশের স্বাধীন বাদশাহ হয়ে গিয়েছিলেন, তবে তাদের মধ্যে এই সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পরামর্শের মাধ্যমে সমাধান করা হবে। [৩]

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: সন ৬১৫ হিজরি থেকে ৬১৮ হিজরি।

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: সন ৬১৫ হিজরি থেকে ৬১৮ হিজরি।

[৩] আস-সুলুক লি মা'রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক লিল মাকরিজি: ১/৩০৭ থেকে ৩১৫, তিব'উল ইলমিয়াহ।

দমইয়াতের ওপর ফিরিজিদের দখল:

দমইয়াতের অবরুদ্ধরা দশ মাস পর্যন্ত ক্রুসেডারদের মোকাবিলা করতে থাকে। আল-মালিক আল-কামিল নীল নদের আশমুম উপত্যকায় অবস্থান করছিলেন। তিনি পেছন থেকে শত্রুদের ওপর আক্রমণ ও লুটতরাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন, যার ফলে দমইয়াতবাসীদের খাদ্য ও রসদ শেষ হয়ে আসছিল। এরপর শীত মৌসুমে অস্বাভাবিক বৃষ্টিপাত শুরু হয়। অবশেষে ২৪ শাবান ৬১৬ হিজরি (৫ নভেম্বর ১২১৯ খ্রিষ্টাব্দ) এক ঝোড়ো রাতের সুযোগ নিয়ে ক্রুসেডাররা দমইয়াতের প্রাচীর দখল করতে সক্ষম হয়। সকাল নাগাদ শহরটি বিজিত হয়ে গিয়েছিল। ফিরিজিরা সেখানে সাধারণ নাগরিকদের হত্যা করে এবং জামে মসজিদকে গির্জায় পরিণত করে। আল-কামিল কিছু দূরেই তাঁবু গেড়েছিলেন, কিন্তু নীল নদের খালগুলোতে বন্যার কারণে তাঁর পক্ষে সামনে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছিল, তাই তিনি একেবারেই অসহায় ছিলেন।

ক্রুসেডারদের দমইয়াত দখলের ফলে মুসলিম বিশ্বের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অনিরাপদ হয়ে পড়ে। দমইয়াত ইউরোপীয় জাতিগুলোর সবচেয়ে শক্তিশালী কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং তারা চারপাশের বিশাল কৃষি অঞ্চল ও জনপদগুলোর ওপর বিনা বাধায় দখল প্রতিষ্ঠা করে। এখন ইউরোপীয় জাহাজগুলো ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরের পথে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত নিজেদের সৈন্য পাঠাতে পারত; তবে তারা কায়রোতে আক্রমণের আগে ইউরোপ থেকে আরও সৈন্য আসার অপেক্ষায় ছিল। দেড় বছর পর্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যে কোনো বড় যুদ্ধ হয়নি। দমইয়াতের দুর্গের দ্বৈত প্রাচীর মুসলমানদের আমলেও অত্যন্ত মজবুত ও সুদৃঢ় ছিল। ফিরিজিরা অটেল অর্থ ব্যয় করে একে আরও উঁচু ও শক্তিশালী করে তোলে, এমনকি একে জয় করা অসম্ভব বলে মনে হতে থাকে। [১]

নীল উপত্যকার ঐতিহাসিক যুদ্ধ:

আল-কামিল এই সময়ে পূর্ব দিগন্তে তাতারদের আগ্রাসনের লেলিহান শিখা দেখছিলেন, যা খোয়ারিজম, মধ্য এশিয়া ও খোরাসানকে ছারখার করে দিচ্ছিল। তবে তিনি নিজেও ক্রুসেডারদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন এবং কায়রোর নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন। রণাঙ্গনের এই নিস্তব্ধতার দিনগুলোতে তিনি অটেল অর্থ ও জনবল ব্যয় করে দমইয়াত থেকে ২৮ মাইল দক্ষিণে নীল নদের বাঁকে উঁচু টিলার ওপর একটি শহর নির্মাণ করেন, যার নাম রাখা হয় ‘আল-মানসুরা’। এই শহরটি মিশরে মুসলমানদের নতুন প্রতিরক্ষা কেন্দ্রে পরিণত হয়।

আল-কামিল ফিরিজিদের সাথে চূড়ান্ত যুদ্ধের আগে তাঁর ভাই আল-মুয়াজ্জাম এবং আল-আশরাফের কাছে সাহায্যের আবেদন জানান। আল-আশরাফের নামে পাঠানো পত্রে তিনি এই কবিতাগুলো লিখেছিলেন:

يَا مُسْعِفِي إِنْ كُنْتَ حَقًّا مُسْعِفِي فَارْحَلْ بِغَيْرِ تَقْيِيدٍ وَتَوَقُّفٍ

“হে আমার সাহায্যকারী! যদি তুমি সত্যিই আমার সাহায্যকারী হও, তবে কোনো বাধ্যবাধকতা বা বিলম্ব ছাড়াই রওনা হও।”

وَاطُوا الْمَنَازِلَ وَالْدِّيَارَ وَلَا تَنْخُ إِلَّا عَلَى بَابِ الْمَلِكِ الْأَشْرَفِ

“মঞ্জিল ও এলাকাগুলো অতিক্রম করে যেতে থাকো এবং আল-মালিক আল-আশরাফের দরজায় না পৌঁছানো পর্যন্ত সওয়ারি থামিও না।”

[১] আস-সুলুক লি-মা’রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩১৬ থেকে ৩২০, ত ত আল-ইলমিয়াহ; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: বছর ৬১৬ হিজরি; দ্য ক্রুসেডস বাই হ্যারল্ড ল্যান্স: পৃষ্ঠা ২৪১ থেকে ২৪৫।

“তোমার মঙ্গল হোক, তার হাত চুম্বন করে আমার পক্ষ থেকে অত্যন্ত আদব ও সম্মানের সাথে বলো।”

“যদি তুমি তোমার ভাইয়ের কাছে দ্রুত চলে আসো, তবে তাকে হিন্দুস্তানি তলোয়ারের ধার এবং নমনীয় বর্শার মুখে পাবে।”

“আর যদি তার সাহায্যে দেরি করো, তবে তার সাথে সাক্ষাৎ কিয়ামতের দিন আমলনামা পেশ করার সময়ই হতে পারবে।”

আল-মালিক আল-আশরাফ এর আগেই বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রাচীর ধ্বংস করে দিয়েছিলেন যাতে যদি ফিরিজিরা সেখানে দখলদারিত্ব কায়েমও করে, তবে তারা যেন তা রক্ষা করতে না পারে এবং যুদ্ধ এমন কোনো চুক্তিতে গিয়ে শেষ হয় যাতে পবিত্র ভূমি উভয় পক্ষের সমান নিয়ন্ত্রণে থাকে। এখন সিরিয়ায় তার বিশেষ কোনো বিপদ ছিল না। তিনি নিজের বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে আল-মানসুরাহ পৌঁছালেন এবং আল-মালিক আল-কামিলের সাথে মিলিত হলেন।

সফর ৬১৮ হিজরি (মে ১২২১ খ্রিষ্টাব্দ) মাসে ফিরিজিদের কাছে ইউরোপ থেকে বিশাল সাহায্য এসে পৌঁছাল এবং দুই লক্ষ দশ হাজার বীর যোদ্ধার সমন্বয়ে গঠিত ক্রুসেডারদের পঙ্গপাল সদৃশ বাহিনী নীল নদের উপত্যকায় সারিবদ্ধ হলো। তারা নীল নদের তীর ধরে কায়রোর দিকে অগ্রসর হতে শুরু করল। আল-কামিল খিলাফত দরবারে খলিফা নাসিরের কাছে সামরিক সাহায্যের আবেদন জানালেন কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। অবশেষে তিনি এই পরিস্থিতিতে নিজের অবস্থান দুর্বল দেখে প্রতিপক্ষকে প্রস্তাব দিলেন যে তারা বাইতুল মুকাদ্দাস এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলো নিয়ে সন্ধি করে নিক, কিন্তু ফিরিজিরা রাজি হলো না এবং অগ্রসর হতে থাকল।

ফিরিজিদের স্থলবাহিনী “আল-মানসুরাহ” পৌঁছে গেল কিন্তু এখানে তাদের থামতে হলো কারণ এই শহরটি নীল নদ এবং “আশমুন তানাহ” (আশমুম নদী) এর মধ্যবর্তী একটি মালভূমির ওপর অবস্থিত ছিল। এই ত্রিভুজাকৃতি দোয়াব অঞ্চলে তাদের অগ্রসর হওয়া অত্যন্ত কঠিন ছিল। তারা কয়েকবার সামনে বাড়ার চেষ্টা করল কিন্তু উঁচুতে অবস্থান নেওয়া মুসলিমরা তীরন্দাজি এবং অগ্নিবর্ষণের মাধ্যমে তাদের প্রতিবারই পিছু হটতে বাধ্য করল। ফিরিজিরা এখানে পৌঁছানোর পরও কায়রো থেকে ৬০ মাইল দূরে ছিল। তারা এখানে পরিখা খনন করে দীর্ঘ অবস্থানের প্রস্তুতি নিল। উভয় বাহিনী নিজ নিজ অবস্থানে থেকে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত পাথর নিক্ষেপ, অগ্নিবর্ষণ এবং তীরন্দাজির মাধ্যমে একে অপরের ক্ষতি করতে থাকল। নীল নদের কারণে শত্রু বাহিনী মুসলমানদের ওপর সরাসরি আক্রমণ চালিয়ে তাদের সংখ্যাধিক্যের সুবিধা নিতে পারছিল না, অন্যদিকে মুসলিম ডুবুরিরা অতর্কিত হামলার মাধ্যমে তাদের যথেষ্ট জানমালের ক্ষতি করছিল।

আল-মালিক আল-কামিলের সময়ের প্রয়োজন ছিল এবং তিনি তা পেয়ে গিয়েছিলেন। তিনি কয়েক মাস ধরে কায়রোতে জাহাজ তৈরি করে সেগুলো নীল নদের অন্য শাখা দিয়ে আলেকজান্দ্রিয়ায় পাঠাচ্ছিলেন। আলেকজান্দ্রিয়ায় মুসলমানদের নৌবহর শক্তিশালী হওয়ার সাথে সাথেই তা দমিয়াত পৌঁছে ফিরিজিদের যুদ্ধজাহাজগুলোর চলাচল বন্ধ করে দিল। তারা সমুদ্র উপকূল এবং নীল নদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে দমিয়াতে ক্রুসেডারদের পেছনের দিকে পৌঁছে গেল। জলপথের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পর আল-কামিল তার বাহিনীকে যেকোনো স্থানে নিয়ে যেতে পারতেন। এই সময়ে আল-কামিলের আহ্বানে তার দ্বিতীয় ভাই আল-মালিক আল-মুয়াজ্জাম ঈসাও দামেস্ক থেকে সতেজ বাহিনী নিয়ে দমিয়াত পৌঁছে গেলেন, এভাবে দমিয়াতের চারদিকে...

মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণ মজবুত হলো।

সেই দিনগুলোতে গোয়েন্দারা আল-মালিক আল-কামিলকে সংবাদ দিল যে, ক্রুসেডার বাহিনীর খাদ্যের সমস্ত বড় মজুদ দমইয়াত শহরের গুদামগুলোতে সংরক্ষিত আছে; তারা নিজেদের সাথে স্বল্প সময়ের জন্য সীমিত খাদ্যশস্য নিয়ে এসেছে, কারণ তাদের শিবিরের চারপাশে নীল নদের উপত্যকায় বিস্তৃত ক্ষেত ও বাগান থেকে তারা টাটকা ফসল পাচ্ছে। বর্তমানে তাদের সমস্ত নির্ভরতা এই ক্ষেত ও বাগানগুলোর ওপর। এটি ছিল আগস্ট মাস এবং প্রবল বৃষ্টিপাত শুরু হয়ে গিয়েছিল। নীল নদ পানিতে কানায় কানায় পূর্ণ ছিল। আল-কামিল আবহাওয়া এবং গোয়েন্দার সময়োপযোগী সংবাদের পূর্ণ সুযোগ নিলেন। তিনি একটি সেনাদলকে গোপনে নদীর ওপারে পাঠিয়ে ক্রুসেডার বাহিনীর আস্তানা থেকে কিছুটা দূরে নদীর বাঁধ ভেঙে দিলেন। নদীর পানি বন্যার আকারে সেই সমস্ত ময়দান, ক্ষেত ও বাগানে ছড়িয়ে পড়ল যা ইউরোপীয় বাহিনীর চারপাশে ছিল; এই আকস্মিক বিপদে ক্রুসেডাররা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। এদিকে সুযোগ বুঝে আল-মালিক আল-কামিল নিজের বাহিনীসহ প্লাবিত এলাকা থেকে সরে গিয়ে নদীর ওপর একটি সেতু নির্মাণ করলেন এবং তা পার হয়ে সেই মহাসড়কটি দখল করে নিলেন যা ছিল ক্রুসেডার বাহিনীর দমইয়াতে ফিরে যাওয়ার একমাত্র পথ।

এখন ক্রুসেডার আক্রমণকারীরা চারদিক থেকে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল; মানজানিক থেকে তাদের ওপর অনবরত পাথর বর্ষণ করা হচ্ছিল, মুজাহিদগণ চারদিক থেকে একের পর এক আক্রমণ করে তীরের বৃষ্টি বর্ষণ করছিলেন। খাদ্যশস্যের অভাবের কারণে দুর্ভিক্ষ মৃত্যু হয়ে ক্রুসেডারদের চোখের সামনে ভেসে উঠল। ক্রুসেডার বাহিনীর প্রধান রাজা জন হতাশ হয়ে দমইয়াতের দিকে পিছু হটলেন, কিন্তু সৈন্য ও ঘোড়াগুলো প্লাবিত খাল, নালা ও কাদার মধ্যে আটকে গেল। অবশেষে রাজা জন মনঃক্ষুব্ধ হয়ে দুই লক্ষ সৈন্যসহ অত্যন্ত লাঞ্ছিত অবস্থায় আত্মসমর্পণ করলেন। তাকে সুলতান আল-কামিলের তাঁবুতে নিয়ে আসা হলো। সুলতান তার সাথে অত্যন্ত উদার আচরণ করলেন এবং দমইয়াত খালি করা ও আট বছর পর্যন্ত যুদ্ধ না করার শর্তে সমস্ত বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। ৯ রজব ৬১৮ হিজরি (২৮ আগস্ট ১২২১ খ্রিস্টাব্দ) বিজয়ী ইসলামী বাহিনী দমইয়াতে প্রবেশ করল। মুসলমানরা শুকরানা নফল নামাজ আদায় করল। আল-মালিক আল-কামিল একটি বিশাল সভার আয়োজন করলেন, যেখানে সাধারণ ও বিশিষ্ট সকলকে সমবেত করা হলো; সেখানে ইউরোপীয় রাজপুত্র, ডজন ডজন ক্রুসেডার পাদ্রী এবং অসংখ্য পরাজিত ইউরোপীয় মাথা নত করে দাঁড়িয়ে ছিল। এটি দেখে রাজেহ আনজালি নামক এক কবি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে এই কবিতাগুলো পাঠ করলেন:

حَبَانَا إِلَهَ الْخَلْقِ فَتَحًا بَدَأَ لَنَا..... مُبِينًا وَإِنْعَامًا وَعِزًّا مُؤَبَّدًا

“সৃষ্টিজগতের রব আমাদের সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছেন এবং তাঁর নেয়ামত ও চিরস্থায়ী সম্মানে ভূষিত করেছেন।”

تَهَلَّلَ وَجْهُ الدَّهْرِ بَعْدَ قُطُوبِهِ..... وَأَصْبَحَ وَجْهُ الشَّرِكِ بِالظُّلْمِ أَسْوَدًا

“কালের কুণ্ঠিত চেহারা খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল এবং শিরকের মুখ অন্ধকারে ঢেকে কালো হয়ে গেল।”

وَنَادَى لِسَانُ الْكَوْنِ فِي الْأَرْضِ رَافِعًا..... عَقِيرَتُهُ فِي الْخَافِقِينَ وَ مُنْشِدًا

“সৃষ্টিজগত তার অবস্থার জবানিতে সেই কম্পমান খ্রিস্টানদের উচ্চস্বরে ডেকে বলতে লাগল।”

তারীখে উন্মতে মুসলিমা

“হে ঈসার উপাসকগণ! দেখ, ঈসা (আল-মালিক আল-মুয়াজ্জাম) এবং তার বাহিনী এবং মুসা (আল-মালিক আল-আশরাফ) ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর (দীনের) খিদমত করছে।”

আল-মালিক আল-কামিল চুক্তি অনুযায়ী শাহ জানসহ সকল যুদ্ধবন্দীকে মুক্তি দেন। [১]

হ্যারল্ড ল্যাঙ্গ এই পরাজয় সম্পর্কে লিখেছেন:

“এখন পর্যন্ত ক্রুসেডাররা আল-কুদস দখলের ব্যাপারে আশাবাদী ছিল। তারা তাদের পরাজয় সম্পর্কে বলত যে, তা ছিল আমাদের পাপের শাস্তি, কিন্তু মানসুরার পরাজয়ের পর তাদের বিশ্বাস টলতে শুরু করে। এর বিপরীতে হতোদ্যম মুসলমানদের আত্মবিশ্বাস ফিরে আসে। মানসুরার যুদ্ধ থেকে এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ক্রুসেডার বাহিনীকে এখনও পরাজিত করা সম্ভব।” [২]

ষষ্ঠ ক্রুসেড

ক্রুসেডাররা আট বছরের যুদ্ধবিরতি চুক্তি করে ফিরে গিয়েছিল, কিন্তু শীঘ্রই তারা একটি অজুহাত দেখিয়ে চুক্তি ভঙ্গ করে। দমইয়াতের যুদ্ধে জার্মানি অংশগ্রহণ করেনি, বরং জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডরিক পথ থেকেই ফিরে গিয়েছিলেন। গির্জা এই কাজের জন্য তাকে কাফির ঘোষণা করে। এখন ফ্রেডরিকের দায়িত্ব ছিল ‘কুফর’ থেকে বের হওয়ার জন্য ক্রুসেডে অংশ নেওয়া। ক্রুসেডারদের কাছে এই যুক্তি ছিল যে, মুসলমানদের সাথে যুদ্ধবিরতির প্রতিশ্রুতি সেই শাসকরা দিয়েছিলেন যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ফ্রেডরিকের এই চুক্তির সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। এই অজুহাতে ৬২৪ হিজরিতে (১২২৭ খ্রিস্টাব্দ) জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডরিক এক বিশাল বাহিনী নিয়ে সিরিয়ার দিকে রওনা হন। সেই সময় তাতারীদের আক্রমণে প্রাচ্যে মুসলমানদের কোমর ভেঙে গিয়েছিল। তাছাড়া মিশর ও ফিলিস্তিনের শাসক আল-মালিক আল-কামিলের সাথে তার ভাই দামেস্কের শাসক আল-মালিক আল-মুয়াজ্জামের বিবাদ চলছিল, তাই মুসলমানদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল ছিল। আল-মালিক আল-মুয়াজ্জাম ফিরিজিদের দখলের ভয়ে আল-কুদসের প্রাচীর ধ্বংস করে দেন, তবুও তিনি তার ভাই আল-কামিলের সাথে মিলে শত্রুর বিরুদ্ধে কোনো ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠন করতে রাজি হননি।

আল-মালিক আল-কামিল যদি একা যুদ্ধ করতেন তবে পরাজয়ের সম্ভাবনা স্পষ্ট ছিল। এই সময়ে ৬২৫ হিজরিতে (১২২৮ খ্রিস্টাব্দ) ফ্রেডরিক আক্কায়ে পৌঁছান। আল-কামিলও তার সেনাবাহিনী নিয়ে আক্কার নিকটবর্তী তালুল আজুলে তার ফেলেন। ফ্রেডরিক আল-কামিলকে এই বার্তা পাঠান:

“দমইয়াতের যুদ্ধের সময় আপনি আমাদের পুরো ফিলিস্তিন দিতে রাজি হয়েছিলেন। আমি নিশ্চিত যে, আপনি আমাকে তার চেয়ে কম প্রস্তাব দেবেন না যা আপনি ফিরিজিদের দিয়েছিলেন। আমাকে হতাশ করা আপনার স্বার্থেও হবে না।”

আল-কামিল কয়েক সপ্তাহ ধরে এই প্রস্তাবটি বিবেচনা করতে থাকেন। অনেক চিন্তাভাবনার পর তিনি সালতানাতের নিরাপত্তার জন্য আল-কুদসের...

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, আল-কামিল ফিত তারিখ, আস-সুলুক লি-মা’রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক-এ ৬১৫ হিজরি থেকে ৬১৮ হিজরির ঘটনাবলী দেখুন।

[২] দ্য ক্রুসেডস বাই হ্যারল্ড ল্যাঙ্গ: পৃষ্ঠা: ২৪৭ থেকে ২৪৯।

[৩] দ্য ক্রুসেডস বাই হ্যারল্ড ল্যাঙ্গ: পৃষ্ঠা: ২৫০।

তত্ত্বাবধানকে অগ্রাধিকার দিলেন এবং যুদ্ধ এড়ানোর জন্য জার্মানদের সাথে সন্ধি গ্রহণ করে নিলেন।

১৮ রবিউল আউয়াল ৬২৬ হিজরি (১৪ ফেব্রুয়ারি ১২২৯ খ্রিষ্টাব্দ) উভয় পক্ষের মধ্যে চুক্তি হলো যে, দশ বছর পর্যন্ত বাইতুল মুকাদ্দাস খ্রিষ্টানদের কাছে থাকবে। আল-কুদস থেকে আকসার বন্দর পর্যন্ত যাতায়াতের একটি পথও তাদের দেওয়া হবে। হারাম, মাসজিদুল আকসা এবং কুব্বাতুস সাখরা মুসলমানদের অধীনে থাকবে, সেখানে আযান ও সালাত জারি থাকবে। এর ব্যবস্থাপনা মুসলমানদের কাছে থাকবে। খ্রিষ্টানরা বাইতুল মুকাদ্দাসের ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীর পুনরায় নির্মাণ করবে না যাতে শহরের স্বাধীন মর্যাদা বজায় থাকে। ফ্রেডরিকের কাছ থেকে নিশ্চয়তা নেওয়া হলো যে, এখানে মাসজিদুল আকসা যিয়ারত করতে আসা মুসলমানদের নিরাপত্তা দেওয়া হবে। এছাড়া ভবিষ্যতে ইউরোপ থেকে মুসলিম বিশ্বের ওপর কোনো আক্রমণ করা হবে না। সংক্ষেপে, মুসলমান ও খ্রিষ্টানরা আল-কুদসকে ভাগ করে একে অসামরিক শহর ঘোষণা করে দিল। [১]

বাইতুল মুকাদ্দাস জার্মানদের হাতে তুলে দেওয়া এবং উলামাদের প্রতিবাদ:

আল-কামিলের এই সিদ্ধান্তে মুসলমানরা অত্যন্ত ব্যথিত হলো, একে একটি অপমানজনক পরাজয়ের সমতুল্য মনে করা হলো এবং এই কারণে আল-কামিলের সুনাম মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলো। যখন আল-কুদসের মুসলিম অধিবাসীদের শহর ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হলো, তখন সেখানে কান্নার রোল পড়ে গেল। স্থানান্তরিত হওয়া মুসলিম উলামা, ইমাম ও মুয়াজ্জিনগণ আল-কামিলের তাঁবুতে চলে এলেন। রাজকীয় তাঁবুর সামনে অবস্থান ধর্মঘট করলেন, মুয়াজ্জিনগণ অসময়ে আযান দিতে শুরু করলেন। আল-কামিল অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি নিজের সাফাই গেয়ে বললেন:

“আমি খ্রিষ্টানদের কেবল কয়েকটি গির্জা, পরিত্যক্ত বাড়ি এবং ধ্বংসস্তুপ দিয়েছি। মাসজিদুল আকসা আগের মতোই আমাদের কাছে আছে। ইসলামি নিদর্শনসমূহ বিদ্যমান আছে। মুসলিম শাসক আল-কুদস জেলায় আগের মতোই বহাল থাকবে।”

কিন্তু মানুষ সন্তুষ্ট হলো না এবং তাকে কটু কথা শোনাতে থাকল।

জার্মান সম্রাট বাইতুল মুকাদ্দাস যিয়ারতের জন্য ব্যাকুল ছিলেন। আল-কামিল তার ব্যবস্থা করে দিলেন। তিনি তার লস্কর ও অনুচরদের সাথে মুসলিম উলামা ও কাযীদের নির্দেশনায় বাইতুল মুকাদ্দাসে পৌঁছালেন। এখানকার প্রাচীন গির্জা ও ঐতিহাসিক স্থানসমূহ যিয়ারত করলেন; যখন তিনি হারাম আকসার কাছে এলেন, তখন কুব্বাতুস সাখরা ও মসজিদের সৌন্দর্য দেখে অবাক হয়ে গেলেন।

এই সফরে তিনি আশ্রয় চেষ্টি করলেন যেন মুসলমানদের নিজের আন্তরিকতা ও প্রতিশ্রুতি রক্ষার বিষয়ে আশ্বস্ত করে যেতে পারেন। যখন তিনি মাসজিদুল আকসার সিঁড়িতে পা রাখলেন, তখন একজন পাদ্রিকে বাইবেল হাতে মসজিদে প্রবেশ করতে দেখা গেল। ফ্রেডরিক তাকে দেখে চিৎকার করে উঠলেন:

“জানো না এখানে আমরা আল-মালিক আল-কামিলের প্রজা। তিনি আমাদের ওপর অনুগ্রহ ও পুরস্কার স্বরূপ এই গির্জাগুলো সোপর্দ করেছেন। তোমাদের কেউ যেন নিজের সীমা অতিক্রম না করে। যদি বিনা অনুমতিতে ভবিষ্যতে কেউ এখানে ঢোকে, তবে তার শিরশ্ছেদ করব।”

এই ধমক শুনে পাদ্রি কাঁপতে কাঁপতে সেখান থেকে পালিয়ে গেল। জার্মান সম্রাট এই রাত পবিত্র শহরে কাটালেন। সেই রাতে কাযী মাসজিদুল আকসার মুয়াজ্জিনকে বাধ্য করলেন যেন তিনি মেহমান শাসকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে ছাদে আযান না দেন। সকাল

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: সন ৬২৬ হিজরি; আস-সুলুক লি-মা'রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক লিল-মাকরিজি: ১/ ৩৫১ থেকে ৩৫৩, ত' আল-ইলমিয়াহ।

জার্মান সম্রাট জিজেস করলেন: “আযানের আওয়াজ শোনা গেল না কেন?” যখন তাকে কারণ জানানো হলো, তখন তিনি বললেন: “আল্লাহর কসম! আমি এখানে রাত কাটিয়েছিলাম যাতে আকসার আযান এবং মুসলমানদের ইবাদতের আওয়াজ শুনতে পাই।”

জমাদিউল আখিরা ৬২৬ হিজরি (মে ১২২৯ খ্রিষ্টাব্দ) সালে দ্বিতীয় ফ্রেডরিক নিজ দেশে ফিরে যান। [১]

আল-মুয়াযযাম, আল-আশরাফ এবং আল-কামিলের মৃত্যু:

আল-মালিক আল-কামিলের বিশ্বাস ছিল যে, এখন ইউরোপের কাছে ইসলামি বিশ্বের দিকে অগ্রসর হওয়ার আর কোনো অজুহাত থাকবে না এবং ক্রুসেড যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে। বাস্তবে এর পরবর্তী ২১ বছর পর্যন্ত কোনো ক্রুসেডার আক্রমণকারী এশিয়ার দিকে আসেনি। তবে ক্রুসেডাররা মুসলমানদের পুরোপুরি পদানত করার আকাঙ্ক্ষা থেকে কখনো সরে আসেনি এবং ২১ বছর পর এই একই মানসিকতা একটি নতুন যুদ্ধের সূচনা করে।

ফ্রেডরিকের সাথে চুক্তির আগে ফিলকদ ৬২৪ হিজরি (নভেম্বর ১২২৭ খ্রিষ্টাব্দ) সালে আইয়ুবী শাহজাদা আল-মালিক আল-মুয়াযযাম ঈসা ইবনে মালিক আল-আদিলের মৃত্যু হয়েছিল। তার রাজধানী দামেস্ক তার অপর ভাই আল-মালিক আল-আশরাফ দখল করে নেন এবং এভাবে তিনি পুরো সিরিয়ার শাসক হয়ে যান। আল-মালিক আল-মুয়াযযামের উত্তরসূরি আন-নাসির দাউদের কাছে ফিলিস্তিন, কারাক এবং পার্শ্ববর্তী কিছু দুর্গ অবশিষ্ট ছিল। [২]

সিরিয়ায় আল-মালিক আল-আশরাফ এবং মিশরে আল-মালিক আল-কামিলের শাসন দীর্ঘকাল স্থায়ী ছিল। ৪ মহররম ৬৩৫ হিজরি (২৭ আগস্ট ১২৩৭ খ্রিষ্টাব্দ) সালে আল-মালিক আল-আশরাফ দীর্ঘকাল ক্ষমতায় থাকার পর পৃথিবী থেকে বিদায় নেন এবং তার ভাই আল-মালিক আস-সালিহ ইসমাইল দামেস্কের শাসক হন। ইসমাইল দুর্বল ছিলেন, তাই তিনি আল-কামিলের চাপে শীঘ্রই দামেস্ক তার হাতে তুলে দিয়ে বালবাক, বুসরা এবং কয়েকটি দুর্গের ওপর সম্ভ্রষ্ট থাকেন। ছয় মাস পর ২২ রজব ৬৩৫ হিজরি (১১ মার্চ ১২৩৮ খ্রিষ্টাব্দ) সালে আল-মালিক আল-কামিলও পরলোকগমন করেন। তিনি মিশরে দশ বছর গভর্নর এবং ত্রিশ বছর বাদশাহ হিসেবে ঈর্ষণীয় শাসন পরিচালনা করেন এবং ন্যায়বিচারের দাবি পূরণ করে চলতেন। আল-মালিক আল-কামিলের সিংহাসন তার পুত্র আল-মালিক আস-সালিহ নাজমুদ্দিন আইয়ুব সানি গ্রহণ করেন। [৩]

আল-মালিক আস-সালিহ নাজমুদ্দিন আইয়ুব

(৬৩৭ হিজরি/১২৪০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৬৪৭ হিজরি/১২৪৯ খ্রিষ্টাব্দ)

আল-মালিক আস-সালিহ নাজমুদ্দিন আইয়ুব ৬০৩ হিজরি (১২০৭ খ্রিষ্টাব্দ) সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তার পিতার জীবদ্দশায় প্রথমে মিশর এবং পরে হিসন কাইফা ও সিনজারের গভর্নর ছিলেন। পিতার মৃত্যুর সময় তিনি সিনজারে ছিলেন, তখন মিশরে তার ছোট ভাই আবু বকর আল-আদিল নিজের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। [৪] আমোদ-প্রমোদে অভ্যস্ত এই বিশ বছর বয়সী যুবক রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্য ছিলেন না। [৫] এটি দেখে আস-সালিহ আইয়ুব মিশরের বিষয়াবলী নিজের হাতে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং এ বিষয়ে আমিরদের সাথে যোগাযোগ করেন। ইতিবাচক সাড়া পাওয়ায়...

[১] আস-সুলুক লি-মা'রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক লিল-মাকরিজি, পৃ. ৩৫৩, ত. আল-ইলমিয়াহ

[২] তারিখুল ইসলাম লিয-যাহাবি: সন ৬২৪ হিজরি

[৩] তারিখুল ইসলাম লিয-যাহাবি: সন ৬৩৫ হিজরি

[৪] তারিখুল ইসলাম লিয-যাহাবি: ওফাত সন ৬৩৭ হিজরি

[৫] মুফাররিজুল কুরুব ফি আখবারি বানি আইয়ুব লি-ইবনে ওয়াসিল: ৫/২৬২, ত. আল-আমিরিয়াহ

তারপর তিনি মিশরের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। পথে দামেস্কের শাসক আল-মালিক আল-জাওয়াদ (বিন মওদুদ বিন আল-মালিক আল-আদিল), যিনি সর্বদা দামেস্কের ওপর মিশরীয় বাহিনীর আক্রমণের আশঙ্কায় থাকতেন, তাকে প্রস্তাব দিলেন যে তিনি যেন তাকে সিঞ্জার দিয়ে দামেস্ক গ্রহণ করেন। আস-সালিহ আইয়ুব এই প্রস্তাবকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করলেন এবং দামেস্কের শাসনভার গ্রহণ করলেন। এটি ৬৩৬ হিজরীর ঘটনা।

আস-সালিহ আইয়ুব সেখানে কয়েক মাস অবস্থানের পর মিশরের আমিরদের সাথে পত্রিনিময় করে মিশরের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। কিন্তু তিনি তখনও পথেই ছিলেন যখন তার চাচা আস-সালিহ ইসমাইল, যিনি বালবাকের শাসক ছিলেন, হঠাৎ দামেস্ক আক্রমণ করেন এবং ৬৩৭ হিজরীর সফর মাসে তা দখল করে নেন। আস-সালিহ আইয়ুব দামেস্কের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে ফিরে আসলেন, কিন্তু দামেস্ক হাতছাড়া হওয়ার খবর শুনেই আমিররা তাকে ছেড়ে পালিয়ে গেল এবং তিনি নাবলুসে তার স্ত্রী উম্মে খলিল (শাজারাতুদ দুর), আমির রুকন উদ্দিন বাইবার্স আল-কাবীর [১] এবং কয়েকজন খাদেমের সাথে একা রয়ে গেলেন। এটি দেখে আন-নাসির দাউদ তাকে কারাক দুর্গে ডেকে নিলেন এবং সম্মান ও মর্যাদার সাথে নজরবন্দি করে রাখলেন। এটি ৬৩৭ হিজরীর ঘটনা। এই সময়ে আল-আদিল আন-নাসির দাউদকে এক লক্ষ আশরাফি প্রদানের প্রস্তাব দেন যাতে তিনি আস-সালিহ আইয়ুবকে তার হাতে তুলে দেন, কিন্তু আন-নাসির দাউদ অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং আস-সালিহ আইয়ুবের সাথে একটি চুক্তি করেন যাতে স্থির হয় যে সিরিয়া হবে আন-নাসির দাউদের এবং মিশর হবে আস-সালিহ আইয়ুবের। আন-নাসির দাউদের এই পদক্ষেপে আল-আদিল অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি তার বিশাল বাহিনী নিয়ে কারাক আক্রমণের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। এই সংবাদে আন-নাসির দাউদ এবং আস-সালিহ আইয়ুব উভয়েই এতটাই ভীত হলেন যে তারা নাবলুসে চলে গেলেন। একদিন আস-সালিহ আইয়ুব নাবলুসের নিকটবর্তী তুর পাহাড়ে আরোহণ করলেন এবং নির্জনে আল্লাহর কাছে অত্যন্ত কাকুতি-মিনতি করে এই দুরবস্থা থেকে মুক্তির জন্য দোয়া করলেন। ওদিকে আল-আদিল আক্রমণ করতে করতে বিলবাইস পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন যে আমিররা তার ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে বিদ্রোহ করে বসল এবং আস-সালিহ আইয়ুবকে ডেকে পাঠাল। আন-নাসির দাউদ এখন আস-সালিহ আইয়ুবকে সাথে নিয়ে মিশরের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। সারা পথ এই আশঙ্কা কাজ করছিল যে এই ডাক কোনো প্রতারণা নয় তো, কিন্তু ভাগ্য আস-সালিহ আইয়ুবের সহায় ছিল। মিশরীয় শিবিরে তাকে জমকালো সংবর্ধনা দেওয়া হলো এবং আমিররা তার বাদশাহীর ঘোষণা দিল। এটি ৬৩৭ হিজরীর জিলকদ মাসের ঘটনা। আস-সালিহ আইয়ুব আল-আদিলকে বন্দি করলেন, অন্যদিকে আন-নাসির দাউদকে বিশ হাজার আশরাফি পাঠালেন, কিন্তু তিনি এই পরিমাণকে কম মনে করে তা প্রত্যাখ্যান করলেন। [২]

আস-সালিহ আইয়ুবের গুণাবলি:

সিংহাসনে আরোহণের সময় আস-সালিহ আইয়ুবের বয়স ছিল ৩২ বছর। তিনি একজন দূরদর্শী, সাহসী এবং বিচক্ষণ মানুষ ছিলেন। আল্লামা মাকরিজি তার সম্পর্কে লিখেছেন:

“তিনি একজন সাহসী এবং সতর্ক শাসক ছিলেন। নিজের শান-শওকত ও মহত্বের কারণে তিনি অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিলেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী, লজ্জাশীল এবং পবিত্র চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। নিচু কাজ থেকে বিরত থাকতেন এবং অসার কথাবার্তা থেকে দূরে থাকতেন। কৌতুক এবং অনর্থক কথাবার্তা থেকে সম্পূর্ণ...”

[১] এই রুকন উদ্দিন বাইবার্স তিনি নন যিনি পরবর্তীতে মিশরের সুলতান হয়েছিলেন, বরং ইনি তিনি যিনি ৬৩২ হিজরীতে গাজার যুদ্ধে লড়েছিলেন যার উল্লেখ সামনে আসছে।

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: বছর ৬৩৬ হি., ৬৩৭ হি.; তারিখুল ইসলাম লিয-যাহাবি, ওফাত বছর ৬৩৭ হি.; মুফাররিজুল কুরুব ফি আখবারি বানি আইয়ুব লি ইবনে ওয়াসিল: বছর ৬৩৫ হি., ৬৩৬ হি., ৬৩৭ হি.। আল-আদিলকে ৬৩৯ হিজরীতে বন্দি অবস্থাতেই হত্যা করা হয়েছিল।

তিনি বিরত থাকতেন। তিনি অত্যন্ত মর্যাদাবান এবং স্বল্পভাষী মানুষ ছিলেন। যখন তিনি ঘর থেকে নিজের কর্মচারীদের কাছে আসতেন, তখন তাকে দেখে সবাই ভয়ে কেঁপে উঠত এবং কারো পাশে দাঁড়িয়ে থাকার সাহস কারো হতো না। যখন তিনি তার সঙ্গীদের মাঝে বসতেন, তখন চুপ থাকতেন। কোনো আনন্দের কথা তাকে বিনোদিত করতে পারত না বা বিচলিত করতে পারত না। সঙ্গীদের অবস্থা এমন হতো যেন তাদের মাথার ওপর পাখি বসে আছে। যখন তিনি তার বিশেষ সঙ্গীদের সাথে কিছু বলতেন, তখন অত্যন্ত গাভীরের সাথে কিছু নির্বাচিত শব্দ বলতেন। এই কথাগুলো কেবল কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্যই হতো। কোনো পরামর্শ হতো অথবা কোনো গুরুত্বপূর্ণ আদেশ হতো। এর চেয়ে বেশি কিছু হতো না। তার সামনে কারো সাহস হতো না যে জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তর দেওয়ার চেয়ে বেশি কিছু বলে। কখনো দেখা যায়নি যে কোনো সহচর তার সামনে নিজে থেকে কথা শুরু করেছে। কারো কোনো সুপারিশ, পরামর্শ বা উপদেশের সাহস হতো না যতক্ষণ না সুলতান নিজে কথা শুরু করতেন।

যখন তিনি একা থাকতেন, তখন কেউ তার কাছে যেতে পারত না। আবেদনপত্রগুলো খাদেমরা তার কাছে নিয়ে যেত এবং তিনি অনুমোদনের মোহর লাগিয়ে দিতেন। এই প্রভাব ও প্রতিপত্তি সত্ত্বেও লজ্জাশীলতার কারণে কারো দিকে চোখ তুলে তাকাতেন না। তার কাছ থেকে কখনো কোনো কর্মচারীর ব্যাপারে কোনো কুরুচিপূর্ণ শব্দ শোনা যায়নি। তার যুগে শহরগুলো শান্তিপূর্ণ এবং রাস্তাঘাট নিরাপদ ছিল। তবে তার আত্মমর্যাদা ও অহমিকা অত্যন্ত প্রবল ছিল, এজন্যই যখন আস-সালিহ ইসমাইল তার ছেলেকে বন্দি করল, তখন তিনি তার মুক্তির জন্য কোনো আবেদন করেননি, এমনকি তার ছেলে বন্দি অবস্থাতেই মারা গেল।

তার জ্ঞান অর্জন এবং বই পড়ার শখ ছিল না। উলামা ও নেককারদের জন্য ভাতা চালু করে রেখেছিলেন কিন্তু তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতেন না, কারণ তিনি নির্জনতাপ্রিয়, শান্ত মেজাজ এবং গাভীর্য ও স্থিরতায় অভ্যস্ত ছিলেন। তার নির্মাণ কাজের প্রতি প্রবল ঝোঁক ছিল। তিনি নিজেই সেগুলোর তদারকি করতেন। মিশরে তার মতো নির্মাণ ও উন্নয়নমূলক কাজ বনু আইয়ুবের অন্য কোনো বাদশাহ করাননি। ফুসতাতের সামনে তিনি “কালআতুর রওজা” নির্মাণ করান যার পেছনে অঢেল সম্পদ ব্যয় করেন। সেখানে এক হাজার তুর্কি গোলাম নিযুক্ত করেন যাদেরকে মামালিক বাহরিয়া বলা হতে লাগল। নীল নদের তীরে তিনি বেশ কিছু অত্যন্ত সুন্দর প্রাসাদ নির্মাণ করান যেগুলোর মুখ ছিল চৌগান (পোলো) ময়দানের দিকে। সুলতানের চৌগানের খুব শখ ছিল। তিনি জাবালে জাওয়ারে জামে ইবনে তুলুনের সামনে “কাবশ” নামক একটি কেল্লা নির্মাণ করান। [১]

খাওয়ারিজমি সৈন্যদের সমস্যা কীভাবে সমাধান করা হয়েছিল?

নিজের যুবরাজ থাকাকালীন সময়ে তিনি খাওয়ারিজমি সৈন্যদের অমীমাংসিত সমস্যাটি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সমাধান করেছিলেন। এই তুর্কি সৈন্যরা সিরিয়া ও মিশরের জন্য মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাদের নেতা সুলতান জালালুদ্দিনের নিখোঁজ হওয়ার পর তাদের কোনো গন্তব্য ছিল না। তারা এদিক-সেদিক লুটতরাজ করে বেড়াত এবং তাদের সাহসিকতার কারণে কারো তাদের সাথে মোকাবিলা করার সাহস হতো না। আস-সালিহ আইয়ুব এই সমস্যাটি এভাবে সমাধান করেন যে, ৬৪৩ হিজরিতে (১২৪৭ খ্রিস্টাব্দে) নিজের পিতা আল-মালিক আল-কামিলের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে...

[১] আস-সুলুক লি-মা'রিফতি দুওয়ালিল মুলুক লিল-মাকরিজি: ১/৩৪২, ত' আল-ইলমিয়াহ, এটি মাকরিজির বক্তব্যের সারসংক্ষেপ, আক্ষরিক অনুবাদ নয়।

করে এই বিভ্রান্ত সৈন্যদের নিজের কাছে নিয়োগ দিলেন। এরপর যখন তিনি শাসক হলেন, তখন তিনি তুর্কি ও খাওয়ারিজমিদের নিয়ে একটি পৃথক বাহিনী গঠন করেন, যা নীল নদের বদ্বীপ অঞ্চলে অবস্থিত কেল্লাগুলোতে মোতায়ন থাকার কারণে “মামালিক বাহরিয়া” নামে পরিচিতি লাভ করে এবং পরবর্তীতে তারা ইসলামি বিশ্বের প্রতিরক্ষায় ঐতিহাসিক বীরত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করে। [১]

আস-সালিহ আইয়ুব এবং আস-সালিহ ইসমাইলের দ্বন্দ্ব:

আস-সালিহ আইয়ুব ক্রুসেডারদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি শত্রুদের ওপর মুসলমানদের প্রভাব বজায় রাখার আশ্রয় চেষ্টা করেন। তাঁর চাচা আস-সালিহ ইসমাইল তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, যিনি ৬৩৭ হিজরিতে (১২৩৯ খ্রি.) তাঁর কাছ থেকে দামেস্ক ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। এখন তাঁর চেষ্টা ছিল যে কোনোভাবে মিসরকেও পদানত করা। ফলে নিজের পাল্লা ভারী করার জন্য তিনি ৬৩৮ হিজরিতে (১২৪০ খ্রি.) সাফাদ ও শাকিফের দুর্গগুলো ক্রুসেডারদের হাতে তুলে দেন, যাতে ক্রুসেডাররা আস-সালিহ আইয়ুবের বিরুদ্ধে তাঁকে সাহায্য করে।

শামের সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম শায়খুল ইসলাম ইজ্জুদ্দিন ইবনে আবদুস সালাম এই চুক্তির প্রতিবাদ করেন, কিন্তু ইসমাইল তাতে কর্ণপাত করেননি এবং সত্য বলার অপরাধে শায়খকে গ্রেপ্তার করেন। মুক্তি পাওয়ার পর তিনি মিসরের সুলতান আস-সালিহ আইয়ুবের আমন্ত্রণে মিসরে চলে যান। আস-সালিহ আইয়ুব তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং পূর্ণ মূল্যায়ন করে তাঁকে মিসরের কাযিউল কুযাত নিযুক্ত করেন। [২]

বাইতুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধার। গাজার যুদ্ধ:

বাইতুল মুকাদ্দাস এই সময়ে একটি স্বাধীন শহর হিসেবে ক্রুসেডারদের অধীনে ছিল। তারা চুক্তিতে নির্ধারিত আদব ও শিষ্টাচার ভুলে গিয়েছিল। তারা মসজিদে আকসায় ঘণ্টা বাজাত এবং কুব্বাতুস সাখরার ওপর উঠে মদ পান করত, কিন্তু তাদের বাধা দেওয়ার কেউ ছিল না। চুক্তি অনুযায়ী ক্রুসেডাররা এর ধ্বংসপ্রাপ্ত বুরুজগুলো মেরামত করতে পারত না, কিন্তু আল-কামিলের মৃত্যুর পর ক্রুসেডাররা এর প্রাচীরগুলোও নির্মাণ করে ফেলেছিল এবং শহরে একটি দুর্গও তৈরি করেছিল। আল-মালিকুল মুয়াযযাম ঈসার পুত্র আন-নাসির দাউদ, যিনি কুদস ব্যতীত ফিলিস্তিনের অধিকাংশ অঞ্চলের শাসক ছিলেন, এই পরিস্থিতিতে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি তাঁর পিতার মতো হানাফি ফকিহ ও তার্কিক এবং তরবারি ও কলমের অধিকারী ছিলেন। তিনি ধর্মীয় আত্মমর্যাদাবোধ প্রদর্শন করে কুদসের ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং মিনজানিকের সাহায্যে দুর্গ ধ্বংস করে অনিষ্টকারী ক্রুসেডারদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দেন।

কিন্তু তাঁর চলে যাওয়ার কিছুকাল পর ক্রুসেডাররা পুনরায় সেখানে ঢুকে পড়ে এবং একইভাবে পবিত্র স্থানগুলোর অবমাননা শুরু করে। অবশেষে আস-সালিহ আইয়ুবের আত্মমর্যাদাবোধ জেগে ওঠে। তিনি নিজেও একটি বাহিনী প্রস্তুত করেন এবং খাওয়ারিজমি সৈন্যদেরও সাহায্যের জন্য ডেকে পাঠান। দশ হাজার খাওয়ারিজমি ৬৪২ হিজরিতে (১২৪৪ খ্রি.) ফোরাত নদী পার হয়ে ফিলিস্তিনে প্রবেশ করে। তাদের সরদার ছিলেন হুসামুদ্দিন বারাকা খান। তাঁরা বালবাক ও গুতা হয়ে বাইতুল মুকাদ্দাস পৌঁছান এবং আক্রমণ চালিয়ে শহরে ঢুকে পড়েন। খ্রিস্টানরা এই আক্রমণের মোকাবিলা করতে পারেনি। তাদের বিশাল একটি অংশ নিহত হয়। বাকিদের বন্দি হতে হয়।

[১] আস-সুলুক লি-মা'রিফতি দুওয়ালিল মুলুক: ১/৪৩১; তারিখ ইবনে আল-ওয়াদি লি-যাইনুদ্দিন ইবনে আল-ওয়াদি: ২/১৬১, ত. আল-ইলমিয়াহ।

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: সন ৬৩৭ হি., ৬৩৮ হি.

যেহেতু খ্রিস্টানরা আল-কুদসের অভিভাবকত্বের চুক্তিতে উল্লিখিত মুসলমানদের অধিকার সংক্রান্ত ধারাগুলো ক্রমাগত লঙ্ঘন করে নিজেরাই প্রতিটি চুক্তি থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছিল, তাই খাওয়ারিজমিরাও তাদের প্রতি কোনো আক্ষেপ করেনি এবং তাদের রক্ত ঝরাতে ও সম্পদ অগ্নিসাৎ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেনি। এই ঘটনায় সিরিয়ার খ্রিস্টান রাষ্ট্রগুলোতে তোলপাড় সৃষ্টি হয়। তারা একে ধর্মীয় বিষয়ের পরিবর্তে জাতীয় সমস্যার রূপ দেয় এবং খাওয়ারিজমিদের থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য দামেস্কের শাসক আস-সালিহ ইসমাইল, হামার শাসক আল-মালিক আল-মানসুর এবং কারাকের শাসক আল-মালিক আন-নাসির দাউদকে নিজেদের সাথে যুক্ত করে নেয়।

এখন একটি নতুন যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়া হলো। এই সময়ে আস-সালিহ আইয়ুব তার সেনাপতি রুকন উদ্দিন বাইবার্স [১]-কে সেনাবাহিনী দিয়ে খাওয়ারিজমিদের সহায়তা করার জন্য মিসর থেকে ফিলিস্তিনে পাঠিয়ে দেন। এই বাহিনী গাজায় এসে অবস্থান নেয়।

জমাদিউল আউয়াল ৬৪২ হিজরি (অক্টোবর ১২৪৪ খ্রিস্টাব্দ) মাসে গাজার ময়দানে প্রতিপক্ষ বাহিনীগুলো মুখোমুখি হয়। হিমস, হামা এবং দামেস্কের মুসলিম সৈন্যরা খ্রিস্টানদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। পাদ্রিরা ক্রুশ উঁচিয়ে তাদের ওপর ছায়া দিচ্ছিল।

অবশেষে এক প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো। খাওয়ারিজমি ও মিসরীয়দের উদ্দীপনা ও আবেগের সামনে খ্রিস্টান এবং তাদের মিত্র মুসলমানদের কোনো কিছুই কাজে আসেনি। সর্বপ্রথম হামার শাসক আল-মালিক আল-মানসুর পালিয়ে যান। তার পেছনে অন্যান্য আমিররাও পালিয়ে যান। খাওয়ারিজমিরা ইউরোপীয়দের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে এবং লাশের স্তুপ বানিয়ে দেয়। ইউরোপীয়দের ৮০০ সৈন্য বন্দি হয়, আর কয়েকজন ছাড়া বাকি সবাই নিহত হয়। খাওয়ারিজমি ও মিসরীয় সৈন্যরা যখন বিজয়ী বেশে ফিরে আসছিল, তখন খ্রিস্টান ও তাদের মিত্রদের ৩০ হাজার লাশ গাজার ময়দানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। [২]

হ্যারল্ড ল্যান্স লিখেছেন: “গাজার যুদ্ধের পর ফিলিস্তিন ও জেরুজালেম চিরতরে খ্রিস্টানদের হাত থেকে বেরিয়ে যায়।” [৩]

আস-সালিহ আইয়ুবের বিজয় ও কীর্তিসমূহ:

আস-সালিহ আইয়ুবের সৌভাগ্যের নক্ষত্র তুঙ্গে ছিল। তিনি ৬৪৩ হিজরিতে (১২৪৫ খ্রিস্টাব্দ) খাওয়ারিজমিদের সাথে নিয়ে দামেস্ক অবরোধ করেন। আস-সালিহ ইসমাইল পালিয়ে গিয়ে আলেপ্পোর শাসক আন-নাসির আইয়ুবির কাছে আশ্রয় নেন এবং সিংহাসন থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হন।

আস-সালিহ আইয়ুব অবরোধ অব্যাহত রাখেন এবং জিলকদ ৬৪৪ হিজরিতে (মার্চ ১২৪৭ খ্রিস্টাব্দ) বিজয়ী বেশে দামেস্কে প্রবেশ করেন। সেই সাথে তিনি বালবাকসহ সিরিয়ার অধিকাংশ জেলা দখল করে নেন এবং বায়তুল মুকাদ্দাসকেও নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এর প্রাচীর ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুলতান সালাহউদ্দিনের আমলের মতো সুদৃঢ় করে দেন।

[১] এই যুদ্ধে মিসরীয় বাহিনীর কমান্ড যে রুকন উদ্দিন বাইবার্স বুনদুকদারির হাতে ছিল, তিনি সেই ব্যক্তি নন যিনি পরে বাদশাহ হয়েছিলেন, বরং তিনি তার সমনাম ও সমউপাধিধারী একজন ভিন্ন আমির ছিলেন যিনি বয়স ও মর্যাদায় বড় ছিলেন। (তারিখুল ইসলাম লিজ-জাহাবি: ৪৭/৪৭, ত কদমরি) তাকে বাইবার্স কাবিরও বলা হতো। ৬৪৩ হিজরিতে আস-সালিহ আইয়ুবের মনে তার প্রতি সন্দেহ জাগে যে তিনি খাওয়ারিজমিদের সাথে মিলে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন, তাই তিনি বাইবার্স কাবিরকে কৌশলে গাজা থেকে মিসরে ডেকে পাঠান এবং কেল্লা আল-জাবালে বন্দি করেন, এরপর তার আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি, সম্ভবত বন্দি অবস্থাতেই তিনি মারা যান অথবা তাকে হত্যা করা হয়। (তারিখ আবুল ফিদা: ১৭৪/২, মুফাররিজুল কুরুব: ৩৫১/৫) যে বাইবার্স বাদশাহ হয়েছিলেন, গাজার যুদ্ধের সময় তার বয়স ছিল সতেরো বছর কারণ তার জন্ম ৬২৫ হিজরিতে। (আন-নুজুমুজ জাহেরা: ৯৫/৭)

[২] আস-সুলুক লি-মা'রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ১/৩১৮ থেকে ৩২০, ত আল-ইলমিয়া

[৩] দ্য ক্রুসেডস বাই হ্যারল্ড ল্যান্স: পৃষ্ঠা: ২৮১

৬৪৩ হিজরি (১২৪৬ খ্রি.)-এ তিনি ‘আস-সালিহিয়া’ নামে মিশরের সীমান্তে সিনাই মরুভূমির তীরে একটি নতুন সামরিক ছাউনি তৈরি করেন যেখানে সেনাবাহিনীর আবাসনসহ প্রতিটি প্রয়োজন মেটানো হয়েছিল। এভাবে সিরিয়া ও মিশরের মধ্যে যাতায়াতকারী সেনাবাহিনীর জন্য চলাচলের ক্ষেত্রে বড় ধরনের সুবিধা তৈরি হয়। পরবর্তী বছরগুলোতে এই শহরটি মুসলমানদের একটি শক্তিশালী সামরিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। [১]

মিশর ও সিরিয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ মজবুত করে আস-সালিহ আইয়ুব ফিলিস্তিন উপকূলকে ক্রুসেডারদের থেকে মুক্ত করার অভিযান শুরু করেন। ১০ সফর ৬৪৫ হিজরি (১৫ জুন ১২৪৭ খ্রি.) তিনি তিবরিয়া দখল করেন এবং জুমাদাল আখিরাহ-এর শেষ দশকে আসকালানও জয় করেন। [২]

সপ্তম ক্রুসেড:

আস-সালিহ আইয়ুবের বিজয়গুলো ইউরোপীয় পাদ্রিদের আবারও উত্তেজিত করে তোলে। ফ্রান্সের শাসক লুই নবম, যাকে খ্রিস্টান জগত ‘সেন্ট লুই’ উপাধিতে স্মরণ করে, পোপের প্ররোচনায় ৬৪৬ হিজরি (১২৪৮ খ্রি.)-এ সপ্তম ক্রুসেডের পতাকা উত্তোলন করে মিশরের উপকূলের দিকে রওনা হন। ধর্মীয় জ্ঞানে পাদ্রিদের সমকক্ষ এই রাজাকে ইউরোপে একজন দরবেশ ও খোদাভীরু মানুষ মনে করা হতো। [৩] তিনি সাইপ্রাসে পৌঁছান এবং শীতকাল কাটিয়ে নিজের নৌবহর নিয়ে মিশরের দিকে রওনা হন। [৪]

আল-মালিক আস-সালিহ আইয়ুব তখন দামেস্কে ছিলেন। তাঁর বাম উরুতে একটি ক্ষত নালিব্রণের রূপ ধারণ করেছিল, যার কারণে ভ্রমণ করা বিপজ্জনক ছিল। তবে ক্রুসেডারদের আক্রমণের খবর পেয়ে তিনি সেই অবস্থাতেই মিশরের দিকে রওনা হন। ফ্রাঙ্কদের লক্ষ্য ছিল দিময়াত। আস-সালিহ আইয়ুব তাদের পৌঁছানোর আগে ১লা মহররম ৬৪৭ হিজরি (এপ্রিল ১২৪৯ খ্রি.) সেখানে পৌঁছে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা জোরদার করেন এবং দুর্গগুলোকে সৈন্য, অস্ত্র ও রসদ দিয়ে পূর্ণ করে দেন। সেই সাথে কায়রোতে তাঁর নায়েব হসামুদ্দিনকে নির্দেশ দেন যেন বেশি বেশি যুদ্ধজাহাজ তৈরি করে উপকূলে পাঠানো হয়। প্রধান সেনাপতি ফখরুদ্দিন শেখকে নির্দেশ দেন যেন তিনি দিময়াতের দক্ষিণ দিকে শহর ও নীল নদের মধ্যবর্তী উপত্যকায় অবস্থান গ্রহণ করেন।

আল-মালিক আস-সালিহ আইয়ুবের শারীরিক অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে থাকে, এমনকি তিনি চলাফেরায় অক্ষম হয়ে পড়েন। নালিব্রণটি নিরাময় অযোগ্য হয়ে শরীরের বাকি অংশকে গলিয়ে দিচ্ছিল। সালতানাতে ঘোষণা করা হলো যে, সুলতানের কাছে কারো কোনো পাওনা থাকলে সে যেন এসে তা গ্রহণ করে। এই ঘোষণার পর অনেক লোক এল এবং তাদের দাবি পূরণ করা হলো।

এটি কুদরতের এক অদ্ভুত পরীক্ষা ছিল যে, তৃতীয় ক্রুসেড সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় লড়েছিলেন। পঞ্চম ক্রুসেডে আল-মালিক আল-আদিল শয্যাশায়ী ছিলেন এবং যুদ্ধের সময়ই তাঁর ইন্তেকাল হয়। এখন সপ্তম ক্রুসেডে আস-সালিহ আইয়ুব চলাফেরায় অক্ষম ছিলেন। এই সময়ে ২১ সফর ৬৪৭ হিজরি (৪ জুন ১২৪৯ খ্রি.) ফ্রান্সের নৌবহর দিময়াত উপকূলে পৌঁছে যায়।

[১] আল-মাওয়াইজ ওয়াল ইতিবার বি-জিকরিল খুতাতি ওয়াল আসার লিল মাকরিজি: ১/৩৩০, ৩৩১, ত. আল-ইলমিয়াহ

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: বছর ৬৪৩ ও ৬৪৫ হিজরি

[৩] তারিখ-ই-ইউরোপ, দ্বিতীয় খণ্ড, ষোড়শ অধ্যায়, রায় জে. গোর, আলিফ, অনুবাদ: মৌলভি হামিদ আহমদ আনসারি, মুদ্রিত: জামিয়া ওসমানিয়া দাক্ষিণাত্য, ১৯৩১ খ্রি.

[৪] তারিখুল ইসলাম লিজ জাহাবি: ৩/৩৫৫, বছর ৬৪৭ হিজরি, ত. বৈরুত

তারিখ উম্মতে মুসলিমা - চতুর্থ খণ্ড

পৌছাল এবং সে উপকূলের দিক থেকে শহরটি অবরোধ করে নিল। সেই সাথে সে আস-সালিহ আইয়ুবের কাছে একটি পত্র পাঠাল যাতে লেখা ছিল:

“আপনি জানেন যে আমি খ্রিস্টধর্মের আমানতদার, যেমন আপনি এই মুহূর্তে মুহাম্মদী ধর্মের আমানতদার। আপনি এটিও জানেন যে বর্তমানে আন্দালুসীয়রা আমাদের কর প্রদান করে এবং উপহার পাঠায়। আমরা তাদের গরুর পালের মতো তাড়িয়ে নিয়ে যাই, পুরুষদের হত্যা করি, নারীদের বিধবা করি এবং তাদের মেয়ে ও শিশুদের দাস-দাসী বানিয়ে নিয়ে যাই। আমরা শহরগুলোকে তাদের থেকে মুক্ত করেছি। আমি যা বলেছি তা স্পষ্ট করার জন্য যথেষ্ট এবং এটি হিতাকাঙ্ক্ষার চরম সীমা। আপনি যদি এখন পাদ্রী ও সন্ন্যাসীদের উপস্থিতিতে মোমবাতি হাতে নিয়ে ক্রুশপূজা স্বীকারও করেন, তবুও আমাকে আপনার কাছে পৌছানো থেকে আটকাতে পারবেন না। আমি আপনার সবচেয়ে প্রিয় স্থানে ঢুকে আপনাকে হত্যা করতে পারি। সুতরাং যখন এই শহরগুলো আমার হাতে আসবে, তখন ভাবুন আপনি আসলে কী পাবেন। হ্যাঁ, যদি আপনি বেঁচে থাকেন এবং শহরগুলো আপনার হয়, তবে আপনি আমার সাথে যা খুশি আচরণ করবেন। যাই হোক, আমি আপনাকে সেই বাহিনীগুলো সম্পর্কে সতর্ক করছি যারা পাহাড় ও উপত্যকা পূর্ণ করার জন্য যথেষ্ট এবং মৃত্যুর তলোয়ারগুলো আপনার দিকে এগিয়ে দিচ্ছে।”

এই পত্র পাঠ করে আস-সালিহ আইয়ুব মুসলমানদের অবমাননার অনুভূতিতে অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়লেন। তিনি “ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন” পাঠ করে কাজী বাহাউদ্দিনকে বললেন কলমদানি তুলে নিতে। তারপর তখনই এই উত্তরটি লিখিয়ে দিলেন:

“বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম। ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন।

আমি তোমার পত্র পেয়েছি। তুমি তোমার বাহিনীর আধিক্য এবং তোমার সৈন্যদের সংখ্যা দিয়ে ভয় দেখাচ্ছ। আমরা তলোয়ার চালনাকারী। আমাদের একজন সেনাপতি শহীদ হলে আমরা অন্যজনকে প্রস্তুত রাখি, যে আমাদের ওপর চড়াও হয় আমরা তাকে ধ্বংস করে দিই। হে প্রতারিত ব্যক্তি! যখন তুমি আমাদের তলোয়ারের ধার, আমাদের যুদ্ধের ক্রোধ, তোমার দুর্গ ও উপকূলের ওপর আমাদের দখল এবং আমাদের হাতে তোমার পূর্বসূরিদের ধ্বংস নিজের চোখে দেখবে, তখন আক্ষেপে নিজের আঙুল কামড়াবে, তোমার পা উপড়ে যাবে। এটি সেই দিন হবে যার শুরু হবে আমাদের বিজয় এবং শেষ হবে তোমার পরাজয়ের মাধ্যমে।

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

(জালিমরা শীঘ্রই জানতে পারবে তারা কোন গন্তব্যে ফিরে যাবে।)

আমরা আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালার এই বাণীর মাধ্যমে কথা শেষ করছি:

كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

(কতই না ক্ষুদ্র দল আল্লাহর নির্দেশে বড় দলের ওপর বিজয়ী হয়েছে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।)

আর আমরা জ্ঞানীদের এই প্রবাদটি স্মরণ করি যে, অবাধ্য ব্যক্তি ধরাশায়ী হয়। তোমার অবাধ্যতাই তোমাকে ভূপাতিত করবে এবং বিপদে ফেলবে।“

জানিয়ে দেবে। আসসালাম।

২২ সফর ৬৪৭ হিজরি (৫ জুন ১২৪৯ খ্রিস্টাব্দ) ফ্রান্সের রাজা সৈন্যবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন এবং নীল নদের পশ্চিমে সমুদ্র উপকূলে নিজের লাল তাবু স্থাপন করেন। নদীর পূর্ব দিকে সেনাপতি ফখরউদ্দিন শেখ মিশরীয় বাহিনীর সাথে তাবু গেড়ে অবস্থান করছিলেন। তিনি নদীর সেতু পার হয়ে ফরাসিদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন, কিন্তু আক্রমণকারীরা পঙ্গপালের চেয়েও সংখ্যায় বেশি ছিল। একটি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর মুসলমানদের পিছু হটতে হয়। এই সংঘর্ষে একজন মেহমান আমির নজমউদ্দিন শহীদ হন।

ইসলামী বাহিনী সেতু পার হয়ে পুনরায় নদীর পূর্ব দিকে চলে আসে। ফখরউদ্দিন শেখ আক্রমণকারীদের থামানো অত্যন্ত কঠিন মনে করে নদীর সেতুটি ভেঙে দেন। তার ধারণা ছিল যে, এখন ফিরিঙ্গিদের নদী পার হতে কয়েক সপ্তাহ সময় লাগবে, তাই দমিয়াত নিরাপদ। ফলে তিনি দমিয়াতের নিকটবর্তী একটি দুর্গ ‘আশমুম তানাহ’-এর দিকে যাত্রা করেন। কিন্তু সরকারি বাহিনীকে শহরের সামনে দিয়ে চলে যেতে দেখে দমিয়াতের রক্ষী কর্মকর্তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন, কারণ নদীর ওপারে শত্রুর বিশাল বাহিনী উপস্থিত ছিল। দমিয়াতের রক্ষীরা শহরের দরজা খোলা রেখেই বাহিনীর পিছু পিছু রওনা হয়। শহরবাসীরাও আতঙ্কিত হয়ে স্থানান্তরে বাধ্য হয়। সারা রাত শহর খালি হতে থাকে এবং সকাল নাগাদ সেখানে একজন মানুষও অবশিষ্ট ছিল না।

পরের দিন রবিবার ২৩ সফর ৬৪৭ হিজরি (৬ জুন ১২৪৯ খ্রিস্টাব্দ) ফিরিঙ্গিরা দেখতে পায় যে ময়দান খালি এবং শহরের দরজাগুলো খোলা। দুপুর পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করে এই ভেবে যে এটি কোনো যুদ্ধকৌশল হতে পারে, কিন্তু যখন নিশ্চিত হওয়া গেল যে ইসলামী বাহিনী চলে গেছে, তখন তারা নদী পার হয়ে শহরে প্রবেশ করে। সমস্ত ধন-সম্পদ, শস্যের বিশাল ভাণ্ডার এবং অস্ত্রের গুদাম যা আস-সালিহ আইয়ুব দীর্ঘ অবরোধ যুদ্ধের জন্য সংগ্রহ করেছিলেন, তা অত্যন্ত সহজেই ফিরিঙ্গিদের হস্তগত হয়।

ফিরিঙ্গিরা এই ঘটনাকে তাদের পাদ্রীতুল্য রাজা সেন্ট লুইসের কেরামত মনে করে অত্যন্ত আনন্দিত হয়। অন্যদিকে মুসলমানরা অবর্ণনীয় শোকের সন্মুখীন হয়। দমিয়াত ছিল মিশর থেকে সিরিয়া পর্যন্ত সমস্ত ইসলামী শহরের প্রবেশদ্বারের মতো। এটি এতই মজবুত শহর ছিল যে, পঞ্চম ক্রুসেডে শত্রু দেড় বছর পর্যন্ত আগ্রাণ চেষ্টা করার পর কোনোমতে এটি দখল করতে পেরেছিল। এবার তো আল-মালিক আস-সালিহ আইয়ুব অতীতের সমস্ত যুদ্ধের চেয়েও বেশি গুরুত্বের সাথে এখানে শস্য ও অস্ত্র মজুদ করেছিলেন। কিন্তু এই শহর একদিনও প্রতিরোধ করতে পারল না।

সুলতান আগে থেকেই বিছানায় তীব্র শারীরিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন, এই সংবাদ তার স্নায়ুর ওপর বজ্রপাতের মতো আঘাত হানে। এত বড় একটি প্রতিরক্ষা কেন্দ্র শত্রুর হাতে তুলে দিয়ে পালিয়ে আসা ক্ষমার অযোগ্য ছিল। তিনি দমিয়াতের রক্ষী কর্মকর্তাদের কঠোরভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তাদের উত্তর ছিল: “আমরা কী করতাম যখন সেনাবাহিনী এবং সমস্ত সেনাপতি ময়দান থেকে সরে গিয়েছিলেন?”

কিন্তু সেনাবাহিনীর ভুল সামনে এনে শহরের রক্ষীরা নির্দোষ প্রমাণিত হতে পারতেন না। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের অনুমতি ছাড়া এত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিরক্ষা শহর শত্রুর জন্য ছেড়ে দেওয়ার কোনো সুযোগ তাদের ছিল না। আস-সালিহ আইয়ুব ফকিহদের কাছ থেকে ফতোয়া নেন এবং তাদের মধ্য থেকে পঞ্চাশজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তাকে বিদ্রোহের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড দেন।

তিনি বাহিনীর সেনাপতি ফখরুদ্দিন ইবনে শাইখের ওপর অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন এবং তাকে ধমক দিয়ে বললেন: “তোমরা কি কিছুক্ষণও শত্রুর মোকাবিলা করতে পারলে না? একজন মেহমান মুজাহিদ নজমউদ্দিন ছাড়া কি আর কেউ প্রাণ দেওয়ার মতো ছিল না?”

সুলতানের রাগ দেখে বাহিনীর আমিররা ঘাবড়ে গেলেন। ভয় ছিল যে ফখরুদ্দিন ইবনে শাইখকে হয়তো হত্যা করা হবে। কিছু আমির গোপন বৈঠকে ফখরুদ্দিনকে পরামর্শ দিলেন যে, সুলতানকে হত্যা করে নিজের প্রাণ বাঁচান। কিন্তু ফখরুদ্দিন ইবনে শাইখ এক ভুলের পর দ্বিতীয় কোনো বোকামি করতে চাইলেন না। তিনি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন।

সুলতান এখন মানসুরায় গিয়ে অবস্থান নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। ত্রিশ বছর আগে আল-মালিক আল-কামিল দমিয়াত ক্রুসেডারদের দখলে যাওয়ার পর নীল নদের তীরে এই সামরিক শহরটি নির্মাণ করেছিলেন। যার অবস্থা এখন কিছুটা জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছিল। সুলতানকে ২৫ সফর (৮ জুন) পালকিতে করে মানসুরার দুর্গে নিয়ে আসা হলো। এখানে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা জোরদার এবং প্রাচীর মেরামতের কাজ দ্রুত শুরু হলো। কায়রো থেকে যুদ্ধজাহাজ আনিয়ে নেওয়া হলো। জিহাদের জন্য সাধারণ আহ্বান জানানো হলো। আশপাশের শহরগুলো থেকে পেশাদার সৈন্য এবং হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক চলে এল, যাদের মধ্যে বড় সংখ্যায় ছিল গেরিলা যুদ্ধে পারদর্শী বেদুইনরা। চার মাস পর্যন্ত এই মুজাহিদিনরা ফ্রাঙ্কদের ওপর নৈশকালীন আক্রমণ চালাতে থাকল। এই সময়ে শত শত শত্রু আহত ও নিহত হলো এবং শত শত বন্দি হয়ে মানসুরা ও কায়রোতে পৌঁছাল। নীল নদ ও সমুদ্রে নৌবাহিনীর সংঘর্ষও চলতে থাকল।

এই ধারা চলতে থাকল যতক্ষণ না ১৫ শাবান ৬৪৭ হিজরি (২২ নভেম্বর ১২৪৯ খ্রিষ্টাব্দ) সুলতান আস-সালিহ আইয়ুব ইন্তেকাল করলেন। তার বয়স ছিল ৪৪ বছর। তিনি ১২ বছর পর্যন্ত একজন সাহসী, ন্যায়পরায়ণ ও আত্মমর্যাদাশীল শাসক হিসেবে শাসন করেছেন। তিনি আইয়ুবী বংশের শেষ শক্তিশালী বাদশাহ ছিলেন, যার মহিমা মিসর থেকে শাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। [১]

আস-সালিহ আইয়ুবের অসিয়তনামা

আল-মালিক আস-সালিহ আইয়ুব মৃত্যুর আগে তার ছেলে তুরান শাহর নামে একটি অসিয়তনামা লিখিয়েছিলেন যা বেশ দীর্ঘ। সেটি এখানে প্রায় পূর্ণাঙ্গভাবে উল্লেখ করা হচ্ছে কারণ এটি একটি বিরল ঐতিহাসিক দলিল। যাতে শাসকদের জন্য যেমন চিরন্তন উপদেশ রয়েছে, তেমনি সেখানে আইয়ুবী সালতানাতের পতনের যুগে সৃষ্টি হওয়া সেই ক্রটিগুলোর ওপরও আলোকপাত করা হয়েছে যার কারণে একটি বিশাল সাম্রাজ্য ভেতর থেকে ঘুণে ধরে গিয়েছিল।

এই অসিয়তনামায় বিগত আইয়ুবী শাসকদের আমলের এবং অতীতে মিসরীয়দের কিছু পরাজয়ের কারণও সামনে আসে যা ইতিহাসের অন্য কোনো উৎসে পাওয়া যায় না। এই শাহকার পত্রে ভবিষ্যতের যুদ্ধের সব সম্ভাবনা সামনে রেখে সব ধরনের নির্দেশনা লিখে দেওয়া হয়েছিল এবং পরবর্তীতে এই পরামর্শগুলো অনুযায়ী কাজ করেই মিসরীয় বাহিনী শত্রুকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছিল। এ থেকে বোঝা যায় যে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মরহুম বাদশাহর দৃষ্টি কতটা গভীর ছিল। মরহুমের ব্যাপারে আমরা আগেই বলেছি যে তিনি শান্ত স্বভাবের মানুষ ছিলেন কিন্তু শেষ মুহূর্তে এই...

[১] আস-সুলুক লি-মা'রিফাত দুওয়ালিল মুলুক লিল মাকরিজি: ১/ ৪৩১ থেকে ৪৪১, ত আল-ইলমিয়াহ।

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

তৃতীয় খণ্ড

দীর্ঘ ওসিয়তনামা লিখিয়ে হয়তো তার উত্তরসূরির জন্য তিনি এমন কিছু বলে গিয়েছেন যা তিনি বহু বছর ধরে তাকে বলতে চেয়েছিলেন।

এখন পত্রের বিষয়বস্তু পেশ করা হলো:

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

পুত্র তুরান শাহ! আল্লাহ তোমাকে নিজের সংশোধনের তৌফিক দান করুন। তুমি জানো যে, আমি তোমাকে ডেকে পাঠাতে এই জন্য দেরি করেছি যে তোমার মধ্যে ছেলেমানুষি, আবেগপ্রবণতা এবং অস্থিরতা রয়েছে। সালতানাত এই বিষয়গুলো সহ্য করতে পারে না। একজন পিতা তার পুত্রের জন্য মঙ্গল ছাড়া আর কিছুই ভাবেন না। তোমার সেই অভ্যাসগুলো যা আমি জানি, সেগুলো ত্যাগ করো। তোমার শাসন টিকে থাকবে। যদি তুমি আমার উপদেশ না মানো এবং নিজের সেই অভ্যাসগুলোর ওপর অটল থাকো, তবে তোমার শাসন চলে যাবে।

নিজের সমস্ত কাজে অবিচল থেকে। সেনাবাহিনীর ব্যাপারে আমার সীরাত অনুসরণ করো। বিষয়গুলোকে সেই পর্যায়েই থাকতে দাও যে পর্যায়ে সেগুলো চলে আসছে।

সমস্ত আমীরদের ব্যাপারে ওসিয়ত হলো যে, তাদের সম্মান ও শ্রদ্ধা করবে। তোমার উদ্ভয়নের ডানা তারাই। তোমার পৃষ্ঠপোষকতা তাদের কারণেই। তাদের অন্তরকে খুশি রাখবে। তাদের সুযোগ-সুবিধা বাড়িয়ে দেবে। প্রত্যেক আমীরের জন্য আরও বিশ জন অশ্বারোহী বাড়িয়ে দেবে। সম্পদ ব্যয় করবে। এভাবে এই লোকেরা তোমাকে ভালোবাসবে এবং এই (ক্রুসেডার) শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষায় তোমার সাথে থাকবে। দমইয়াত (ফিরিজিদের দখলে যাওয়া)-এর ব্যাপারে কাউকে অভিযুক্ত করো না। এটি তাকদীরের ফয়সালা ছিল যাতে কারো কোনো হাত ছিল না।

ভাই ফখরুদ্দিন বিন শায়খ আমার সবচেয়ে পুরনো সঙ্গী। তাকে এমন সম্মান করবে যেমন আমাকে করো। তাকে নিজের পিতা মনে করবে, তার কথা শুনবে এবং মানবে। তার বিরোধিতা করো না। তাকে আরও দুইশ অশ্বারোহী প্রদান করো।

উম্মে খলিল (শাজারা আদ-দুর)-এর ব্যাপারে ওসিয়ত হলো যে, আমার ওপর তার এত বেশি অধিকার ও অনুগ্রহ রয়েছে যা আমি বর্ণনা করতে পারি না। তাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করবে। তাকে নিজের মায়ের মতো মনে করবে এবং তাকে সব ধরনের আরাম পৌঁছাতে কোনো ক্রটি করবে না। তার মনে কখনো কষ্ট দিও না। তার কৌশলের বিরোধিতা করো না। এটি আমার ওসিয়ত, এর লঙ্ঘন করো না।

বাকি সমস্ত পরিবারের সদস্যদের ব্যাপারে ওসিয়ত হলো যে, তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে। আমার ওপর তাদের অনেক বড় অধিকার রয়েছে। তাদের মধ্যে ছোট-বড় কারো সেবা করতে কুণ্ঠাবোধ করো না। যদি তুমি আমার কথা না মানো তবে তোমার থেকে শাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া হবে, কারণ আমি লিখে দিয়েছি যে যদি তুমি লঙ্ঘন করো তবে তোমাকে ত্যাজ্য বলে গণ্য করা হবে।

পুত্র! এই কথা মনে রেখো যে, শাসন ক্ষমতা শুরুতে একটি চারাগাছের মতো হয় যাকে বাতাস এদিক-ওদিক হেলাতে থাকে এবং কখনো কখনো তাকে শিকড়সহ উপড়ে ফেলে। কিন্তু যখন কিছু কাল এবং কিছু বছর অতিবাহিত হয় তখন গাছের শিকড় গভীরে চলে যায়, তখন প্রবল ঝড়ও তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না। আমার সন্তান! আমার ইঙ্গিত বুঝে নাও।

যদি তোমার মন কোনো ব্যক্তির প্রতি সংকুচিত হয়, তবে তাকে সহ্য করো এবং তার সাথে ভালো ব্যবহার করো, সেও তোমার সাথে ভালো সম্পর্ক রাখবে। তোমার শত্রুরাও তোমাকে প্রিয় বানিয়ে নেবে।

শান্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করো না। মনে রেখো, মানুষ একে অপরের বিরোধী হয়। সুতরাং যতক্ষণ না কাউকে তার বিরোধীর সামনে উপস্থিত করছ, ততক্ষণ কারো কথায় বিশ্বাস করো না। যদি কখনো কোনো ব্যক্তি তোমার কাছে (হাত কেটে যাওয়ার অভিযোগ নিয়ে) আসে, তবে সম্ভব যে তার বিরোধী ব্যক্তিটি তার চেয়েও বেশি আহত অবস্থায় আছে। যখন তুমি এই কথাটি মনে রাখবে, তখন তোমার কাছে অভিযোগ ও ফরিয়াদ কমে যাবে।

হে আমার পুত্র! আমি তোমাকে জানাতে চাই যে, যখন শত্রু সুলতান (আল-মালিক আল-কামিল) শহীদের যুগে দমিয়াতের ওপর আক্রমণকারী হয়েছিল, তখন সেখানে শহরের ওয়ালি এবং রক্ষী সৈন্যরা ছাড়া আর কেউ ছিল না। কিন্তু এই লোকেরা কায়রো থেকে সুলতানের আগমন এবং সিরিয়া থেকে সেনাবাহিনী পৌঁছানো পর্যন্ত শহর রক্ষা করেছিল। সেই সময় শহরে এক মাসেরও খাদ্যের মজুদ ছিল না, তবুও শত্রু দমিয়াতের উপকূলে কবজা করতে পারেনি। কিন্তু যখন সেনাবাহিনীর আমিরগণ সুলতান শহীদের সাথে মতবিরোধ করল এবং ইবনে মশতু'ব ও কুরদদের মতো লোকেরা আল-মালিক আল-ফায়েজের সাথে আলাদা দল গঠন করল, তখন সুলতান শহীদ রাগান্বিত হয়ে আশমুমের দিকে চলে গেলেন এবং সেনাবাহিনীও তার পিছু পিছু চলে এল। তারা তাদের তাঁবু ও আসবাবপত্র সেখানেই ফেলে রেখে এল। দমিয়াত থেকে যারা বের হওয়ার তারা বেরিয়ে গেল এবং শহরের ওয়ালিও চলে গেল। শুধু সাধারণ নাগরিকরা সেখানে রয়ে গেল যারা শহরের দরজাগুলো বন্ধ করে দিল এবং তা রক্ষা করতে লাগল, এমনকি (ফিরিজিদের সাথে যুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষের কারণে) তাদের অধিকাংশ মারা গেল এবং বাকিরা নিরুপায় হয়ে পড়ল। শহরের প্রাচীরগুলো শূন্য হয়ে গেল। ফিরিজিরা যারা শহরের দেয়ালে সিঁধ কাটার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিল, তারা দেয়াল টপকে শহরে ঢুকে পড়ল।

আমি তো দমিয়াতকে এতটাই মজবুত করে দিয়েছিলাম যে সেখানে বিশ বছরের জন্য খাদ্যের মজুদ ছিল। নাগরিকদের কাছে যে মজুদ ছিল তা ছিল আলাদা। খাদ্য দপ্তর থেকে জেনে নিও যে সেখানে কী পরিমাণ খাদ্যের মজুদ ছিল। আমি এই শহরকে মিসরের সমস্ত অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দিয়ে সুসংহত করেছিলাম। আমি কোনো অজুহাত বাকি রাখিনি। আমি নিজে অসুস্থতার কারণে আশমুমে একা রয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু যখন আমাদের সৈন্যরা শত্রুকে দেখল এবং নৌকার মাধ্যমে স্থলের দিকে যেতে লাগল, তখন তারা পরাজিত হলো এবং তারা স্থলের এলাকা ফিরিজিদের হাতে সঁপে দিল। তারা নিজেরা নারীদের দমিয়াত থেকে বের করে নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। লোকজন পালিয়ে গেল এবং সৈন্যরাও তাদের পিছু পিছু চলতে লাগল। ফখরুদ্দিন যিনি তাদের আমির ছিলেন, তাদের পেছনে গেলেন এবং তাদের ফিরিয়ে আনলেন। তারা দমিয়াতের প্রতিটি দরজায় একজন করে আমির নিযুক্ত করে দিল। কিন্তু যখন সকাল হলো তখন দেখা গেল শহরে কোনো সৈন্য বাকি নেই। রক্ষী বাহিনী রাতে প্রাচীরের জানালা ভেঙে নিচে নেমে গিয়েছিল। তারা সমস্ত সম্পদ ও মজুদ সেখানেই ফেলে গিয়েছিল যা নাগরিকরা নিজেদের মধ্যে লুটতরাজ ও ছিনতাই করতে লাগল, তারপর তারা দমিয়াত খালি করে দিল এবং পরের দিন সেখানে ফিরিজিরা দখলদার হয়ে গেল। এই সবকিছু আল্লাহর তকদিরে লেখা ছিল। তুমি ধৈর্য ধরলে নিজের উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারবে।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

চতুর্থ খণ্ড

যদি তোমরা এই হতভাগা শত্রুর কাছে অসহায় হয়ে পড়ো এবং এই লোকেরা দমিয়াত থেকে বের হয়ে তোমাদের দিকে চলে আসে এবং তোমাদের তাদের সাথে লড়াই করার শক্তিও না থাকে এবং তোমাদের কাছে (সিরিয়ার) উপকূল, গাজা ও বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে সাহায্য পৌঁছাতে দেরি হয়ে যায়, তবে তোমরা বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে এই শর্তে তাদের তা দিয়ে দাও যে, মিশরের একটি জনপদও তাদের দেওয়া হবে না।

যদি তারা মানসুরাতে তোমাদের ওপর আক্রমণ করে, তবে তোমরা বাহিনীকে সমুদ্রের পেছনে রাখবে। শত্রু এখানে কেবল যুদ্ধজাহাজের মাধ্যমেই আক্রমণ করতে পারবে। তোমরা যতটুকু সম্ভব নিজেদের যুদ্ধজাহাজের বহরকে শক্তিশালী করো। আর শত্রুর পেছনে থাকা জাহাজগুলোতে আগুন লাগিয়ে তাদের রসদ সরবরাহের পথ বন্ধ করে দেওয়ার পূর্ণ চেষ্টা করো। ইনশাআল্লাহ, এই কৌশলই শত্রুর ধ্বংসের কারণ হবে। সুলতান শহীদ (আল-মালিক আল-কামিল) এই একই কৌশলে শত্রুর ওপর বিজয় লাভ করেছিলেন।

দুই হাজার আরব ও খাওয়ারিজমি অশ্বারোহীকে শত্রু ও দমিয়াতের মাঝখানে মোতায়ন করে দিও।

অশ্বারোহী ও পদাতিকদের থেকে ভালোভাবে কাজ নিও এবং তাদের পেছনে প্রচুর খরচ করো।

যদি ইসমাইল ও নাসেরের (বিরোধের) কারণে পূর্ব দিক (সিরিয়া) থেকে তোমাদের কাছে সাহায্য না পৌঁছায় এবং তোমরা তোমাদের সামনে পরাজয় দেখতে পাও এবং শত্রু তোমাদের কাছে তাদের শহরগুলো ফেরত দেওয়ার দাবি করে, তবে (চুক্তি না করলে) সালতানাত হাতছাড়া হয়ে যাবে, তাই এটাই অনিবার্য হবে; কারণ জরুরি অবস্থার বিধান ভিন্ন হয়। [১]

মনে রেখো! মিশর হলো সমস্ত রাজ্যের কেন্দ্র। এর মাধ্যমে তোমরা সমস্ত বাদশাহদের ওপর জয়ী হতে পারো। এটা যদি তোমাদের হাতে থাকে, তবে মনে করো পুরো পূর্ব দিকই তোমাদের কাছে আছে।

তুমি এবং ভাই ফখরুদ্দিন ঐক্যবদ্ধ হয়ে নাসেরের মন জয় করে তাকে সন্তুষ্ট করো। নাসের আমার অসন্তুষ্টির কারণেই আমার থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে তার পক্ষ থেকে আমার কাছে কিছু পত্র এসেছিল, যে অনুযায়ী সে কিছু ভালো কাজ করেছিল। আমি যখন তদন্ত করলাম, তখন জানতে পারলাম যে বিষয়টি তেমন নয়। ফলে আমার ওপর থেকে তার আশা শেষ হয়ে গেল এবং সে গিয়ে ইসমাইল ও মওদুদের সাথে যোগ দিল। এই সব কিছু ইসমাইল ও মওদুদের কারণেই হয়েছে, অথচ নাসের সেসব বিষয়ে তাদের অংশীদার ছিল।

আর হ্যাঁ, নাসের নাবলুসে আমার বিরুদ্ধে যা করেছে, তাতে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) এক বড় রহস্য নিহিত ছিল। আমি তার জন্য কৃতজ্ঞ। সে কারাকে আমার বিরুদ্ধে চলে এসেছিল। সে যদি না আসত, তবে ইসমাইল তা দখল করে নিত।

[১] ইসমাইল বলতে দামেস্কের শাসক আল-মালিক আস-সালিহ ইসমাইলকে বোঝানো হয়েছে, যিনি আল-মালিক আস-সালিহ আইয়ুবের চাচা ছিলেন। তিনি একজন স্বার্থপর ও সুবিধাবাদী শাসক ছিলেন। আল-মালিক আল-কামিলের ইন্তেকালের পর তিনি সিংহাসনকে নিজের হক মনে করে আল-মালিক আস-সালিহ আইয়ুবকে বাদশাহ হওয়া থেকে আটকানোর পূর্ণ চেষ্টা করেন এবং তার কাছ থেকে দামেস্ক ছিনিয়ে নিতেও সফল হন। আস-সালিহ ইসমাইল ফ্রঙ্কদের সমর্থক ছিলেন এবং তার বাড়াবাড়ির কারণে শায়খ ইজুদ্দিন ইবনে আবদুস সালামের মতো আলেমগণ দামেস্ক থেকে হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। নাসের বলতে দাউদ বিন আল-মালিক আল-মুয়াজ্জাম ঈসা (কারাকের শাসক)-কে বোঝানো হয়েছে, যিনি একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। আল-মালিক আস-সালিহ আইয়ুব যখন ক্ষমতা লাভের চেষ্টা করছিলেন, তখন নাসের দাউদ তাকে কারাক দুর্গে বন্দি করে রেখেছিলেন এবং পরে এই চুক্তির ভিত্তিতে তাকে মুক্তি দিয়েছিলেন যে, সিরিয়া তার হবে এবং মিশর আল-মালিক আস-সালিহ আইয়ুবের হবে।

ইতিহাসে উন্মত্তে মুসলিমা — চতুর্থ খণ্ড

যে আমার পশ্চাদ্ধাবন করে আমার জন্য শামের জমিন সংকীর্ণ করে দিয়েছিল। অতঃপর নাসের আমার ব্যাপারে যা কিছু করেছে, তাতেই কল্যাণ নিহিত ছিল। এটাই তো আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত সময় অনুযায়ী মিশরে আমার আগমন এবং এখানে শাসনব্যবস্থা কায়েম করার কারণ হয়েছে। সুতরাং আমি নাসেরের ব্যাপারে ভালো নিয়ত পোষণ করি। যদি তোমাদের উভয়ের মধ্যে ঐক্য হয়ে যায় এবং তোমাদের প্রতি তার নিয়ত পরিষ্কার হয়ে যায় এবং সে তোমাদের সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে, তবে তোমাদের মন শামের উপকূল রক্ষার চিন্তা থেকে মুক্তি পাবে।

নাসেরের গুনাহ ইসমাইলের গুনাহের মতো ছিল না, যে আমার সাথে বিবাদ করেছে, আমার থেকে দামেস্ক ছিনিয়ে নিয়েছে, আমার ছেলেকে বন্দি করেছে এবং আমার বিরুদ্ধে যা করার ছিল তা করেছে। সে শামের দুর্গগুলো দ্বীনের শত্রুদের দিয়ে দিয়েছে এবং আমার বিরুদ্ধে কুফরের সাহায্য চেয়েছে। এভাবে সে আমার থেকে আমার শহরগুলো ছিনিয়ে নিয়েছে। সুতরাং তোমরা নাসেরকে এমনভাবে সন্তুষ্ট করো যাতে তার থেকে সাহায্য নিতে পারো, অর্থাৎ তাকে বুসরা এবং এর পার্শ্ববর্তী কৃষি অঞ্চল দিয়ে দাও। কিন্তু তাকে বালবাকের দুর্গ দিও না। তার সন্তান ও সংশ্লিষ্টদের সাথেও ভালো ব্যবহার করো। মন্দের মন্দ প্রতিদান এবং ভালোর উত্তম প্রতিদান আল্লাহই দেবেন।

সমস্ত বন্দিকে মুক্তি দিয়ে দাও, কেবল তাদের ছাড়া যাদের তোমাদের চাচাকে গ্রেফতার করানোর পেছনে হাত ছিল অথবা যারা দেশে ফাসাদ সৃষ্টিতে লিপ্ত ছিল।

যদি আল্লাহ তোমাদের এই শত্রুর ওপর বিজয় দান করেন এবং তোমরা তাদের থেকে দমিয়াত ছিনিয়ে নাও, আর আল্লাহ চাইলে এমনই হবে, তবে তোমরা একটি বহিঃপ্রাচীরও নির্মাণ করবে যার উচ্চতা হবে একজন মানুষের সমান (কদ-এ-আদম)। [১] এর উপরে এবং নিচে লক্ষ্যভেদের জন্য ছিদ্র থাকবে। প্রাচীরের প্রশস্ততা এমন হতে হবে যেন তার ওপর উঠে পাথর বা দাহ্য পদার্থের মাধ্যমে লড়াই করা যায়। এতে (উপরে ওঠার জন্য ভেতরের দিকে) সিঁড়িও থাকতে হবে। প্রতি দুই সিঁড়ির মাঝে ত্রিশ কদম দূরত্ব থাকবে। এই প্রাচীরকে বুর্জ-এ-সিলসিলার সামনে থেকে শুরু করে সমুদ্রের ডেল্টার সেই স্থান পর্যন্ত নিয়ে যাবে যেখানে ফিরিজিরা অবতরণ করেছিল। এখানে তিনটি শক্তিশালী তীর-ধনুক স্থাপন করবে। তারপর এই বহিঃপ্রাচীরের সামনে একটি পরিখা খনন করাবে যা সমুদ্রের পানি থেকে মিষ্টি পানি (নীল নদের মোহনা) পর্যন্ত দীর্ঘ হবে। যেমনটি সুলতান (আল-মালিক আল-কামিল) শহীদ সেই সময় খনন করিয়েছিলেন যখন শত্রু আক্রমণ করেছিল। এটি এমনভাবে খনন করাবে যেন শত্রু যখন আসবে, তখন তারা মিষ্টি পানি পর্যন্ত পৌঁছাতে না পারে এবং ছাউনি ফেলার জন্য কোনো জায়গা না পায়। বহিঃপ্রাচীরের প্রতি দুই সিঁড়ির মাঝে দুইজন পাথর নিক্ষেপকারী থাকতে হবে যারা শত্রুর ওপর পাথর বর্ষণ করবে। সৈন্যরা সেই শত্রুদের সাথে লড়াই করবে যারা বহিঃপ্রাচীরে চড়বে, আর যারা প্রাচীরের পেছনে (তা থেকে দূরে) থাকবে তাদের মিনজানিক এবং দূরপাল্লার অস্ত্রের মাধ্যমে আঘাত করা হবে। এই প্রাচীরে হাজারো কল্যাণ রয়েছে। এর নির্মাণের কাজকে নিজের...

[১] এখানে আরবি ইবারতটি হলো: “بمشورة تكون طول قامه” যার অনুবাদ ‘কদ-এ-আদম’ (মানুষের সমান উচ্চতা) করা হয়েছে, কিন্তু সম্ভবত এখানে মুদ্রণজনিত ভুল হয়েছে। প্রাচীরের উচ্চতা কদ-এ-আদম অর্থাৎ ছয় ফুট হওয়া কোনোভাবেই যুক্তিযুক্ত নয়। সাধারণ বাড়ির সীমানা প্রাচীরও সাত-আট ফুট উঁচু হয়। এই পত্রেই প্রাচীরের জন্য সিঁড়ির উল্লেখ রয়েছে যা প্রমাণ করে যে, সুলতানের উঁচু দেয়াল প্রয়োজন ছিল, অন্যথায় কদ-এ-আদম দেয়ালের জন্য সিঁড়ির কী প্রয়োজন ছিল? আল্লাহই ভালো জানেন।

উমারা এবং বায়তুল মালের মধ্যে বণ্টন করে দাও। ফিরিজি বন্দীদের দিয়ে এটি নির্মাণ করাও এবং এতে পূর্ণ চেষ্টা করো। তোমরা দমইয়াত সম্পর্কে নিরাপদ হয়ে যাবে।

যদি শত্রু দমইয়াত থেকে বের না হয় এবং নিজের জন্য সাহায্যের অপেক্ষা করতে থাকে, তবে তোমরা স্থলপথ এবং বদ্বীপের (ডেল্টা) দিক থেকে অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর মাধ্যমে শত্রুর ওপর আক্রমণ করো এবং সমুদ্রের দিক থেকে যুদ্ধজাহাজ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ো। আশা করা যায় যে, তোমরা এভাবে বদ্বীপের ওপর দখলদারিত্ব লাভ করবে। যদি তোমরা এটি করতে পারো, তবে তোমরা সমুদ্রের মোহনার ওপর নিয়ন্ত্রণ পেয়ে যাবে এবং ফিরিজিদের (সাহায্য বা রসদবাহী) কোনো জাহাজ না দমইয়াতে পৌঁছাতে পারবে, না সেখান থেকে বের হতে পারবে।

হে বৎস! আমি মুসলমানদের বিষয়াদি তোমার ওপর ন্যস্ত করেছি। এগুলোকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের বিধান অনুযায়ী পরিচালনা করো। মদ্যপান থেকে বেঁচে থেকো। বাদশাহদের ওপর সমস্ত বিপদ-আপদ এরই কারণে আসে। আমার কথার অবাধ্য হয়ে না, অন্যথায় তোমাকে অনুতপ্ত হতে হবে এবং রোগব্যাধি তোমাকে ঘিরে ফেলবে। তোমাকে মদ সেই পান করাতে পারবে যার ওপর তোমার আস্ত্র থাকবে এবং তোমাকে অসুস্থতায় সেই লিপ্ত করবে যে তোমার নিকটতম হবে।

মুসলমান ও নাসারাদের (খ্রিস্টানদের) মদ তৈরি করা থেকে বিরত রাখো। সেনাবাহিনী এবং শহরগুলোকে রোগব্যাধি থেকে মুক্ত রাখো। মদ্যপায়ীর সঙ্গও গ্রহণ করো না, অন্যথায় শয়তান তোমার কাছে এই কাজটিকে শোভনীয় করে তুলবে এবং তুমি অসুস্থ হয়ে পড়বে।

আমি বিষয়গুলো অভিজ্ঞতা করেছি, ভালো-মন্দের অনুসন্ধান করেছি। আমি তো সেই সময় অনুতপ্ত হয়েছি যখন অনুশোচনার কোনো ফায়দা ছিল না। অতএব হে আমার পুত্র! সেই সব জিনিস থেকে বেঁচে থেকো যা থেকে আমি নিষেধ করেছি। এটি একজন অভিজ্ঞ, সত্যবাদী এবং হিতৈষী ব্যক্তির উপদেশ।

সেনাবাহিনীর দপ্তরের দিকে মনোযোগ দাও। এই লোকেরা যারা নাসারা, তারা শহরগুলোকে ধ্বংস এবং সেনাবাহিনীকে দুর্বল করে দিয়েছে। যেন শহরগুলো তাদের মালিকানাধীন, যখন ইচ্ছা বিক্রি করে দেয়। যখন কোনো আমীরকে (সুযোগ-সুবিধার) কোনো পরোয়ানা লিখে দেওয়া হয়, তখন এরা (দপ্তরের নাসারা কর্মচারীরা কাগজের ওপর বিভাগীয় কার্যক্রম করার আগে) দুইশ দিনার বা তার বেশি ঘুষ গ্রহণ করে। যখন কোনো সৈনিক কিছু পায়, তখন তারা তার থেকে একশ বা তার কিছু কম নিয়ে নেয়। যদি কোনো সিপাহীর ভাতা এক হাজার দিনার হয়, তবে তারা এটিকে পাঁচ-ছয় জায়গায় ছড়িয়ে দেয়; কিছু কুসে, কিছু পূর্ব অংশে, কিছু পশ্চিম অংশে। সিপাহীর কাছে ভাতা পৌঁছানোর জন্য চারটি মাধ্যম তৈরি হয়ে যায়। প্রথমে ভাতা এই মাধ্যমগুলোর মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে, তবে কি সিপাহীর জন্য আর কিছু অবশিষ্ট থাকে?

উদাহরণস্বরূপ, কোনো ব্যক্তি যদি সাধারণ সিপাহীদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে সে কঠোর পরিশ্রম সহ্য করে মাত্র তিনটি ভেজাল মিশ্রিত দিরহাম পায়। তবে তার অবস্থা কী হবে? তার পরিবারের সদস্যরা ধ্বংস হয়ে যাবে। কোনো সিপাহী তো কিছু পায়, আবার কেউ এটাও পায় না। সেনাবাহিনীর ধ্বংসের কারণ এটাই। নাসারারাও এমনটি করে এটাই চায় যে, শহরগুলো জনশূন্য হয়ে যাক এবং সেনাবাহিনী দুর্বল হয়ে পড়ুক যাতে শহরগুলো আমাদের হাতছাড়া হতে থাকে।

শাসনব্যবস্থাকে সুলতান সালাহউদ্দীন হানজার পদ্ধতিতে ফিরিয়ে আনা উচিত। যাতে সিপাহীর ভাতা ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়া হতো না বরং তাকে একটি...

তারিখে উন্মত্তে মুসলিমা

চতুর্থ খণ্ড

দুটি নিকটবর্তী দপ্তর থেকে সবকিছু পাওয়া যেত। ফলে শহরগুলো আবাদ ছিল, সেনাবাহিনী এবং কৃষকরা শক্তিশালী ছিল।

যখন মানুষ একটি শহরে বসবাস করে এবং প্রত্যেকে সেই শহরকে এক একটি কোণ থেকে ধ্বংস করতে থাকে, অফিসাররা কৃষকদের ওপর জুলুম করতে থাকে, তখন শহর তো ধ্বংসই হবে। এগুলো সব নাসারাদের কীর্তি।

আমি এই সংবাদ পেয়েছি যে, এই (স্থানীয় নাসারা) লোকেরাই (ভূমধ্যসাগরের) দ্বীপপুঞ্জের ফিরিজি বাদশাহদের কাছে চিঠি লিখে বলেছিল যে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে জিহাদ আপনারা করেননি বরং আমরাই তাদের বিরুদ্ধে দিনরাত জিহাদ করছি। তা এভাবে যে, আমরা তাদের ধন-সম্পদ দখল করে নিচ্ছি, তাদের নারীদের ব্যবহার করছি, তাদের শহরগুলোকে জনশূন্য এবং সেনাবাহিনীগুলোকে দুর্বল করছি। এখন আপনারা এসে এই শহরগুলো জয় করে নিন, আমরা আপনাদের জন্য কোনো বাধা অবশিষ্ট রাখিনি। অতএব (হে বৎস!) তোমার শত্রু তো তোমার সাথেই তোমার দেশে রয়েছে অর্থাৎ এই নাসারারা। তাদের মধ্য থেকে কোনো নও-মুসলিমকে বিশ্বাস করো না। তারা কোনো কারণে মুসলমান হয়, অথচ তাদের ধর্ম তাদের ভেতরে এমনভাবে লুকিয়ে থাকে যেমন জ্বালানির মধ্যে আগুন।

বৎস! আজকাল অধিকাংশ সৈন্যই সাধারণ মানুষ, ব্যবসায়ী এবং ফাসাদ সৃষ্টিকারী প্রকৃতির লোক। তাদের মধ্যে যে কেউ জুব্বা পরে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে এই তুর্কিদের কোনো আমিরের কাছে আসে এবং তাকে কোনো ঘোড়া উপহার দেয়, সে-ই সৈন্য হয়ে যায়। সে যদি তার অফিসারের সামনে কোনো সাহসী ও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী সৈন্যের ভাতার বিরোধিতা করে, তবে সেই অফিসার ওই সাহসী সৈন্যের ভাতা এই সাধারণ ও অকেজো সৈন্যকে দিয়ে দেয়। অধিকাংশ সৈন্যের অবস্থাই এমন। প্রয়োজনের সময় যখন তারা শত্রুকে দেখে তখন পালিয়ে যায় এবং এভাবে নিজেদের লশকরের ব্যুহ ভেঙে দেয়। কারণ এই লোকেরা যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী নয়, এটি তাদের কাজই নয়। সুতরাং সেনাবাহিনীতে কেবল তাকেই নিয়োগ করা আবশ্যিক যে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে নেজাবাজি করতে পারে, চোগান এবং তিরন্দাজি জানে এবং যার সামরিক যোগ্যতা প্রকাশ পায়।

বৎস! আমি যা বলেছি তা মনে রেখো। (সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে) এই সব কথা আমাকে ভাই ফখরুদ্দিন ছাড়া আর কেউ বলেনি। তিনি আমাকে এও জানিয়েছেন যে, তিনি সুলতান সালাহউদ্দিনের নিজ হাতের লেখা একটি পত্র পড়ার সুযোগ পেয়েছেন যাতে লেখা ছিল যে, ফাইয়ুম এবং সামানুদ (মিসরের দুটি জেলা) এবং উপকূলীয় অঞ্চলের সমস্ত আয় নৌবহরের জন্য ওয়াকফ করা হয়েছে। সুতরাং নৌবহর ইসলামের দুটি বাহুর মধ্যে একটি।

নৌবাহিনী যেন তৃপ্ত থাকে তা জরুরি। তুমি যদি নৌ-সৈন্যদের জন্য মাসিক বেতনে দিরহাম নির্ধারণ করে দাও, তবে যুদ্ধ এবং লক্ষ্যভেদে পারদর্শীরা দূর-দূরান্ত থেকে তোমার কাছে চলে আসবে।

প্রয়োজনের সময় (জরুরি অবস্থায়) তো তুমি কেবল তাদেরই পাবে যাদের তুমি জোরপূর্বক নিয়োগ করবে। তাদের যোগ্যতা সম্পর্কে জানা থাকবে না, তারা পরিবার-পরিজন সম্পন্ন হবে এবং (কঠোর পরিশ্রম করে) তাদের অন্নসংস্থান করবে। তুমি তাদের নৌবাহিনীতে নিয়ে যাবে অথচ তারা অকেজো প্রমাণিত হবে। তাদের সন্তানরা না খেয়ে মারা যাবে, তারা আমাদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করবে। এমতাবস্থায় তুমি শত্রুর ওপর কীভাবে বিজয় লাভ করতে পারো?

তারিখ-এ-উম্মত-এ-মুসলিমা

যখন তোমাদের কোনো নৌবহর শত্রুর হাতে চলে যায়, তখন তোমরা এই ক্ষতি পূরণ করার জন্য (জনগণের কাছ থেকে) হাজার হাজার দিনার উসূল করো। প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কতই না শরীফ, ব্যবসায়ী এবং দক্ষ লোক পাকড়াও করা হয়। তাদের পরিবারের সদস্যরা (তাদের ছাড়িয়ে নিতে) শাসকের কাছে আসে। প্রত্যেকে সোনা মেপে দেয় এবং নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে নেয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি একেবারেই দরিদ্র ও অসহায় হয়, তাকে তোমরা নৌবাহিনীতে ঠেলে দাও। আমি সন্তানকে এই পরিস্থিতি সম্পর্কে সতর্ক করছি। ভাই ফখরুদ্দিন আমাকে এই সমস্ত পরিস্থিতি জানিয়েছেন। তিনি তোমাকে যা কিছু বলেন, তা মনোযোগ দিয়ে শুনবে।

সন্তানকে নিম্নলিখিত খাদেমদের সম্পর্কে অসিয়ত করা হচ্ছে:

মহসিন এবং রশীদ যারা প্রথম সারির দুই খাদেম, তাদের বদলি করো না। আমি খাদেম ও মামালিকদের মধ্য থেকে যাকে যে পদোন্নতি দিয়েছি, তা তার আনুগত্য ভালোভাবে পরীক্ষা করার পরেই দিয়েছি। ওস্তাদ দার এবং আমীর জানদার সম্পর্কেও অসিয়ত হলো যে, তাদের বদলি করো না। আমি আমার সমস্ত কাজে তাদের ওপর আস্থা রাখি।

কুর্দি আমীরদের একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রতি কান দিও না।

নাসিরুদ্দিনের কাছে নোংরা ও মিথ্যা কথা রয়েছে, তার অন্তরও ভালো নয়। আমি ভাই ফখরুদ্দিনকে সেই দূতদের সম্পর্কে বলে দিয়েছি যারা দামেস্ক থেকে আলেপ্পো যাওয়ার পথে তার কাছে জিম্মি হয়ে গিয়েছিল। হুসাম একাকীত্বে অভ্যস্ত, কারো সাথে তার কোনো যোগাযোগ নেই।

যদি কোনো দিকে সৈন্যবাহিনী পাঠাতে হয় তবে জিয়াউদ্দিন কাইমারিকে অফিসার বানানো হোক। নাসিরুদ্দিন কখনো সৈন্যবাহিনী নিয়ে যায়নি।

সাইফুদ্দিন কাইমারির সাথে সেই আচরণ করো যা ভাই ফখরুদ্দিন নির্ধারণ করে দেন। তাকে দামেস্কে সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বানাবে। ইবনে ইয়াগমুর তদন্ত কর্মকর্তা থাকবে এবং নাসিরুদ্দিন জনগণের অভিযোগ শোনার কাজে নিযুক্ত হবে। ইবনে ইয়াগমুর তদন্তের কাজ এবং রাজস্ব আদায়ের যোগ্য কিন্তু সৈন্যবাহিনীর আমীর হওয়ার যোগ্য নয়। তার ওপর পূর্ণ ভরসা করো না। তাকে কিছুকাল একটি কাজে নিযুক্ত রাখবে, তারপর সেই দায়িত্ব অন্য কাউকে দিয়ে দেবে। ইবনে ইয়াগমুর দাপ্তরিক কাজের জন্য বেশি উপযুক্ত।

ফখরুদ্দিন উসমানের আত্মীয়দের মধ্যে কেউই সামরিক সেবার যোগ্য নয়।

ইবনুল আজিজ সম্পর্কে আমার রায় হলো যে, তার দলের জবাবদিহি চাওয়া হোক। তাকে তার গোলামদের সাথে একা করে দেওয়া হোক। তার জন্য, তার গোলামদের জন্য এবং ঘরের কর্মচারীদের জন্য ভাতা নির্ধারণ করে দেওয়া হোক যা তাদের বিশেষ লোকদের জন্য যথেষ্ট হয়। ভাই ফখরুদ্দিন ভালোভাবেই জানেন যে দমিয়াতের রণাঙ্গনে এবং এছাড়া সে কী কাণ্ড ঘটিয়েছে। সে কোনো দায়িত্বের যোগ্য নয়।

ওয়াকফ দপ্তরের মুতাওয়াল্লিকে বরখাস্ত করো, তার স্থলে ইবনে নাহভীর নিয়োগ দাও, সেখানে যাতায়াতকারীরা আমার কাছে তার সুপারিশ করেছে। ইবনে জাবাব এবং তার উকিলের কর্মকাণ্ড ভালো নয়। তাকে বরখাস্ত করে দিও। তার স্থলে নাসর ইবনে ফকীহকে নিয়োগ দিও। সে ভালো মানুষ, ফকীহ এবং আল্লাহভীরু।

আমি ভাই ফখরুদ্দিনকে বিশটি মামলুকের একটি তালিকা দিয়েছি। তাদের পদোন্নতি দিও। তাদের প্রত্যেককে একটি পতাকা ও একটি তবল (রগদামামা) দিও। তাদের সাথে উত্তম আচরণ করো।

আমি তোমাকে মামলুকদের সাথে উত্তম আচরণের অত্যন্ত তাকিদ দিচ্ছি। আমি তাদের ওপরই আস্থা রেখে আসছি। তারা আমার কোমর ও বাহু। তাদের অন্তরকে খুশি রেখো। তাদের সাথে ভালো প্রতিশ্রুতি করো। আমার অসিয়তের বিরুদ্ধে যেও না। যদি মামলুকরা না থাকত, তবে আমার এতটুকু শক্তিও ছিল না যে আমি ঘোড়ায় সওয়ার হতাম এবং দামেস্ক বা অন্য কোনো স্থানে পৌঁছাতে পারতাম।

এটি আমার অসিয়ত। প্রতিদিন এটি পাঠ করো। ভাই ফখরুদ্দিনের সাথে পরামর্শ করা ছাড়া কিছু করো না। আল্লাহ কল্যাণের ফয়সালা করবেন। ইনশাআল্লাহ তাআলা।

যদি আলেপ্পোবাসী তোমার কাছে দাবি করে যে কারাক নাসেরকে দিয়ে দেওয়া হোক, তবে তাকে শওবাক দিয়ে দিও। যদি সে এতে সন্তুষ্ট না হয়, তবে উপকূলের আরও কিছু এলাকাও দিয়ে দিও, কিন্তু কারাককে নিজের হাতছাড়া হতে দিও না।

আল্লাহর জন্য, আল্লাহর জন্য আমার অসিয়ত মনে রেখো। তুমি জানো না যে এই দুর্ভাগা শত্রু (ফরাসি) হতে পারে যে মিসরের (কায়রো) দিকে অগ্রসর হবে, তখন কারাক-ই হবে তোমার সেই দুর্গ যেখানে তুমি তোমার পরিবার-পরিজনকে নিরাপদ রাখতে পারবে। মিসরে এমন কোনো কেব্লা নেই। কারাকে তোমার কাছে সমস্ত সৈন্য সমবেত হতে পারবে এবং তুমি আক্রমণ চালিয়ে শত্রুকে মিসর থেকে পিছু হটিয়ে দিতে পারবে। যদি তোমার কাছে কারাকের মতো দুর্গ না থাকে, তবে তোমার সেনাবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে।

আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমার সম্পদ, পরিবার-পরিজন এবং প্রতিটি বস্তু যা নিরাপদ রাখতে হবে, সেখানে স্থানান্তরিত করে দেব। যদি এই কেব্লা আমার কাছে না থাকত, তবে আমার অন্তর মজবুত থাকতে পারত না, আর না পিঠ। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পরিবার ও সাহাবীদের ওপর। [১]

তোরান শাহকে কি উত্তরসূরি নিযুক্ত করা হয়েছিল?

এই অসিয়ত এটাই প্রকাশ করে যে, আল-মালিকুস সালিহ তোরান শাহকে নিজের উত্তরসূরি নির্ধারণ করেছিলেন, কিন্তু কোনো কোনো ঐতিহাসিক বর্ণনা করেছেন যে, মরহুম বাদশাহ তোরান শাহের অস্থিরচিত্ত স্বভাবের কথা বিবেচনা করে পরবর্তীতে অসিয়তনামায় এটি লিখিয়ে দিয়েছিলেন:

“আমার মৃত্যুর পর মিসরের সিংহাসনের ফয়সালা বাগদাদের খলিফা মুসতাসিম বিল্লাহর হাতে থাকবে। তিনি যা চান ফয়সালা করবেন।” [২]

সম্ভবত এটি এজন্য করা হয়েছিল যে, যদি তোরান শাহ অযোগ্য প্রমাণিত হন তবে যেন দোষ পিতার ওপর না আসে। শতাব্দীকাল পর এটিই ছিল প্রথম উদাহরণ যে কোনো বাদশাহ উত্তরসূরি নির্বাচনের ফয়সালা খলিফার হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। তবে অন্যদিকে এটিও বাস্তবতা ছিল যে, মিসরবাসীদের কাছে

[১] নিহায়াতুল আরাব লিন-নুওয়াইরি: ২৯ / ৩৪১ থেকে ৩৫২, তবা দারুল কুতুব কায়রো। আল্লামা নুওয়াইরি এই পত্রটি নকল করার আগে স্পষ্ট করেছেন যে, তিনি পত্রের মূল কপিটি নিজে দেখেছিলেন যা মরহুম সুলতানের নিজ হাতে লেখা ছিল।

[২] আস-সুলুক লি-মা’রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক লিল-মাকরিজি: ১ / ৩৩৩, তবা আল-ইলমিয়াহ।

তুরান শাহের কোনো বিকল্প ছিল না এবং যুদ্ধাবস্থায় তারা খলিফা মুসতাসিম বিল্লাহর সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষাও করতে পারতেন না।

দমিয়াতে ফরাসিদের অবস্থা:

ওদিকে দমিয়াতে ফরাসিরা আরাম ও অপেক্ষার দিন অতিবাহিত করছিল। তারা এই জন্য থেমে ছিল যাতে বর্ষাকাল অতিবাহিত হয়ে যায় এবং তাদের নীল নদের প্লাবনের সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে না হয়, যা পঞ্চম ক্রুসেডে তাদের একেবারে অসহায় করে দিয়েছিল। অবসরের এই দিনগুলোতে ক্রুসেডার বাহিনীর নারী-পুরুষ অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতায় মত্ত ছিল। পশ্চিমা ইতিহাসবিদ জয়েনভিল স্বীকার করেন যে, মানুষ ব্যভিচার ও বিলাসিতায় এতটাই নিমগ্ন ছিল যে তার কোনো সীমা ছিল না। তিনি লেখেন: “আমার আবাসস্থল থেকে যেকোনো পাথর নিক্ষেপ করা হতো, তা অবশ্যই কোনো না কোনো পতিতালয়ে গিয়ে পড়ত।” [১]

সংক্ষেপে, ক্রুসেডাররা তাদের বিলাসপ্রিয়তার কারণে সেই রাজনৈতিক সংকটের সুযোগ নিতে পারেনি যা আইয়ুবী সালতানাত মোকাবিলা করছিল।

শাজারাতুদ দুরের নেতৃত্ব:

আল-মালিকুস সালিহ আইয়ুবের মৃত্যু হারেমে হয়েছিল। দেশ পরিচালনার মতো এখন আর কেউ ছিল না। ফরাসি বাহিনী মাথার ওপর দাঁড়িয়ে ছিল। নতুন শাসক নির্ধারণের জন্য বাগদাদের খলিফার কাছে সংবাদ পৌঁছানো এবং উত্তর পেতে কত সময় লাগত তা জানা ছিল না। এটাও সম্ভব ছিল যে খলিফার সিদ্ধান্ত সালতানাতের আমিররা গ্রহণ করতেন না।

এই নাজুক সময়ে দেশ ও জাতির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ভার রানী শাজারাতুদ দুরের ওপর এসে পড়ে। তিনি একজন দাসী ছিলেন যিনি মরহুম সুলতানের প্রিয়পাত্রী হয়ে অবশেষে তাঁর স্ত্রী হন। তিনি সুলতানের এতটাই প্রিয় ছিলেন যে সফর ও আবাসে সর্বদা সাথে থাকতেন। তাঁর উপস্থিতিতে সুলতান সারাজীবনে দ্বিতীয় বিয়ে করেননি, অথচ সেই যুগে বহুবিবাহ একটি সাধারণ বিষয় ছিল।

শাজারাতুদ দুর রাজনীতির রহস্যে পারদর্শী ছিলেন। তিনি বাজারে ছড়িয়ে পড়া গুজবের খবর রাখতেন এবং প্রতিটি ষড়যন্ত্রের খোঁজ নিতেন। তিনি দেশের পরিস্থিতি এবং সময়ের দাবি খুব ভালোভাবেই বুঝতেন। এই অভিজ্ঞতাগুলো এখন তাঁর কাজে আসছিল।

তিনি একজন দায়িত্বশীল রাজনীতিবিদের প্রমাণ দিলেন। তিনি তাঁর দাসী, গোলাম এবং গোয়েন্দাদের মাধ্যমে ফরাসিদের প্রতিটি মুহূর্তের খবর রাখতেন। তিনি সুলতানের মৃত্যুকে সম্পূর্ণ গোপন রাখলেন যাতে প্রজারা হতাশ, সৈন্যরা নিরুৎসাহিত এবং ফরাসিরা সাহসী হয়ে না ওঠে। সেই সাথে তিনি বিষয়গুলো খলিফার হাতে তুলে দেওয়ার পরিবর্তে তাঁর সৎ ছেলে তুরান শাহকে বাদশাহ নিযুক্ত করা সমীচীন মনে করলেন, তখন তুরান শাহ মিসর থেকে প্রায় এক হাজার কিলোমিটার দূরে এশিয়া মাইনরের হিসন কাইফা দুর্গে ছিলেন।

শাজারাতুদ দুর এই সমস্যারও সমাধান করলেন। তিনি সেনাপতি ফখরুদ্দিন শেখ এবং একজন বিশ্বস্ত আমির জামালুদ্দিন মুহসিনকে ডেকে সুলতানের মৃত্যুর কথা জানালেন এবং তাঁদের তাকিদ দিলেন যেন এই দুর্ঘটনার খবর কেউ না পায়। তিনি সালতানাতের বিষয়াবলী এবং প্রতিরক্ষার দায়িত্ব এই দুজনের ওপর অর্পণ করলেন, তবে নিজেও সুলতানের পক্ষ থেকে মাঝেমধ্যে আদেশ জারি করতে থাকলেন যাতে সুলতানের মৃত্যুর ব্যাপারে কারো মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ না জাগে। হারেমের একজন খাদেম সোহাইল হুবহু সুলতানের মতো লিখতে জানতেন।

[১] দ্য ক্রুসেডস, হ্যারল্ড ল্যাঙ্ক: পৃষ্ঠা ২৯৩

শাজারাতুদ দুরর এর মাধ্যমে আদেশনামা লিখিয়ে রাজকীয় মোহর অঙ্কিত করতেন এবং আমিরদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। এই ফরমানগুলোই কায়রোর আমির হসামুদ্দিনের কাছে পৌঁছাত। তাঁরও সন্দেহ হয়নি যে সুলতান ইন্তেকাল করেছেন। শাজারাতুদ দুররকে যুদ্ধের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। তিনি গোপনে রাজকীয় কোষাগার এবং প্রাসাদের হীরা-জহরত বিক্রি করে যুদ্ধের ব্যয় মেটাতে শুরু করেন।

শাজারাতুদ দুরর সমস্ত বিষয়াদি সুলতানের জীবদ্দশার মতোই স্বাভাবিকভাবে পরিচালনা করতে থাকেন। নিয়ম অনুযায়ী রাজদরবার সজ্জিত হতো। রাজ্যের আমিরগণ উপস্থিত হতেন, দস্তুরখান বিছানো হতো। সুলতান সম্পর্কে এই খবরই দেওয়া হতো যে তিনি অসুস্থ, কারও সাথে দেখা করতে পারবেন না। ২২ শাবান ৬৪৭ হিজরি (২৯ নভেম্বর ১২৪৯ খ্রিস্টাব্দ) শাজারাতুদ দুরর সুলতানের পক্ষ থেকে ফরমান পাঠিয়ে তুরান শাহের জন্য উত্তরাধিকারের বায়আতও গ্রহণ করেন। এর আগেই তিনি বাহরিয়া মামলুকদের সেনাপতি ফারিস আক্তাইকে হিসনে কাইফায় পাঠিয়েছিলেন যাতে তুরান শাহকে রাজধানীতে ডেকে আনা যায়।

এদিকে সুলতানের কোনো এক বুদ্ধিমান সহচর সুলতানের চিঠি এবং রাজকীয় মোহরে সামান্য পার্থক্য অনুভব করে বুঝতে পারেন যে সুলতান আর এই পৃথিবীতে নেই। এই কথা দ্রুত মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে কিন্তু কেউ তা প্রকাশ্যে মুখে আনার সাহস করতে পারছিল না। এদিকে ইউরোপীয় গোয়েন্দারাও এই খবর পেয়ে যায়। ফ্রান্সের রাজা লুই যখনই সুলতানের মৃত্যুর খবর পান, তিনি আল-মানসুরা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। সেই সময় যদিও প্রচণ্ড শীত পড়ছিল কিন্তু বৃষ্টির কোনো আশঙ্কা ছিল না। ২৫ শাবান (২ ডিসেম্বর ১২৪৯ খ্রিস্টাব্দ) ক্রুসেডার বাহিনী নীল নদ বরাবর দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়। সেই সাথে তাদের নৌজাহাজগুলোও নদীতে আসছিল, যখন মুসলমানরা তাদের বাদশাহর মৃত্যুতে শোকাবুদ ছিল।

শাজারাতুদ দুরর খবর পাওয়া মাত্রই জিহাদের অনুপ্রেরণা সম্বলিত একটি দীর্ঘ পত্র লিখিয়ে কায়রো এবং অন্যান্য শহরের মসজিদগুলোতে পাঠিয়ে দেন যাতে তা মিসর থেকে পড়ে শোনানো হয়। পত্রটির সূচনা হয়েছিল এই আয়াতে কারীমা দিয়ে:

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
“তোমরা আল্লাহর পথে বের হয়ে পড়ো, চাই তোমরা হালকা হও কিংবা ভারী এবং আল্লাহর পথে তোমাদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করো; এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানতে।” [১]

এই পত্রটি এতটাই হৃদয়বিদারক ছিল যে যখন কায়রোর জামে মসজিদের মিসর থেকে এটি পাঠ করা হলো, তখন মানুষ অবোরে কাঁদতে লাগল এবং চারদিক থেকে কান্নার আওয়াজ উঠতে লাগল। হাজার হাজার মানুষ মাথায় কাফন বেঁধে কায়রো থেকে রণক্ষেত্রের দিকে বেরিয়ে পড়ল। ১ রমজান ৬৪৭ হিজরি (৭ ডিসেম্বর ১২৪৯ খ্রিস্টাব্দ) ইউরোপীয় বাহিনী আক্রমণ চালিয়ে আল-মানসুরা এবং দমিয়াতের মধ্যবর্তী নীল উপত্যকায় পৌঁছে যায়। এখানে এক ভূমল লড়াই হয় যাতে উভয় পক্ষই সাহস ও বীরত্বের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। বহু মুসলমান শহীদ হন যাদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট নেতা আমির আল-আলামিও ছিলেন। অনেক ক্রুসেডার আমির এবং সৈন্যও নিহত হয়। ৭ রমজান (১৩ ডিসেম্বর) ইউরোপীয়রা আরও অগ্রসর হয়ে ইসলামী শিবিরের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ চলতে থাকে কিন্তু ইউরোপীয়রা আল-মানসুরার দিকে অগ্রসর হতে থাকে যা নীল নদের একটি বাঁকে এমনভাবে অবস্থিত ছিল যে এর উত্তর ও পশ্চিম...

[১] সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত নম্বর: ৪১

অংশগুলো নদীর তীরের সাথে ছিল এবং পূর্ব অংশকে আশমুন নদী নিরাপদ রাখছিল। ১৩ রমজান (১৯ ডিসেম্বর) ফিরিঙ্গিদের স্থলবাহিনী এই নদীর তীরে পৌঁছে গেল, যখন তাদের নৌবাহিনী শহরটিকে উত্তর ও পশ্চিম দিক থেকে ঘেরাও করার চেষ্টা করতে লাগল। [১]

ইসলামী লশকর-এর বড় অংশ পূর্ব দিকে অবস্থান নিল। ক্রুসেডার বাহিনীও সেই দিকে তাবু গাড়ল এবং পরিখা খনন করে এক দীর্ঘ অবরোধের প্রস্তুতি নিল। নীল নদে ক্রুসেডার নৌবহর আশহার-এর ওপর আক্রমণ করতে লাগল, তবে ইসলামী নৌবাহিনী প্রতিরক্ষার জন্য প্রস্তুত ছিল। [২] ক্রুসেডার মানজানিকগুলো শহরের ওপর পাথর নিক্ষেপ শুরু করল, মুসলমানরা জবাবে অগ্নি-পিচকারি ব্যবহার করে সেগুলো জ্বালিয়ে দিল। ফিরিঙ্গিরা আগ্নেয়াস্ত্র সম্পর্কে অবগত ছিল না। তারা আগুনের পিচকারি দেখে আতঙ্কিত থাকত এবং একে ‘গ্রিক ফায়ার’ (ইউনানি আগুন) নাম দিত। ক্রুসেডার ইতিহাসবিদ জঁনুল লেখেন:

“এই আগুন বিদ্যুতের মতো গর্জন করত এবং একটি ডানাওয়ালা ভ্রাগনের মতো ছিল। রাতে এর আলো এত তীব্র হতো যে আমরা আমাদের শিবিরের ভেতরে বসে সবকিছু পরিষ্কার দেখতে পেতাম।” [৩]

যেহেতু মানজানিক ছাড়া বিজয় কঠিন ছিল, তাই ফ্রান্সের রাজা তার কিছু জাহাজ ভেঙে সেগুলোর কাঠ দিয়ে পুনরায় মানজানিক তৈরি শুরু করালেন। কিন্তু নতুন মানজানিকগুলোকেও মুসলিম অগ্নি-যোদ্ধারা ভস্মীভূত করে দিল। [৪]

তৃতীয় ক্রুসেডের মতো এই যুদ্ধেও অতর্কিত নৈশ হামলা এবং গেরিলা অভিযানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। মুসলমানরা সংখ্যায় কম ছিল, তাই তারা খোলা ময়দানের লড়াইয়ের আগে শত্রুকে ছোট ছোট আঘাত দিয়ে দুর্বল ও মনোবলহীন করে দিতে চেয়েছিল। মুজাহিদগণ প্রতিদিন দুই-চারজনের দলে বের হতেন এবং লুকিয়ে থেকে শত্রুদের তীরের লক্ষ্যবস্তু বানাতেন। যে ফিরিঙ্গি হাতে আসত, তাকে ধরে নিয়ে আসতেন। গড়ে প্রতিদিন বিশ-ত্রিশজন ফিরিঙ্গি নিহত ও আহত হতো এবং দশ-পনেরোজনকে বন্দী করা হতো। এই অভিযানগুলোতে মুজাহিদগণ নিজেদের বুদ্ধিমত্তা কাজে লাগিয়ে অদ্ভুত সব কৌশল অবলম্বন করতেন।

আল্লামা মাকরিজি রহমাতুল্লাহি আলাইহি লেখেন:

“এক ব্যক্তি একটি তরমুজ কেটে নিজের মাথা তার ভেতরে ঢুকিয়ে দিল এবং পানিতে ডুব দিয়ে ফিরিঙ্গিদের কাছাকাছি চলে গেল যাতে তারা একে তরমুজ মনে করে। তৎক্ষণাৎ এক ফিরিঙ্গি পানিতে নেমে পড়ল যাতে সেটি নিয়ে নিতে পারে। সে কাছে পৌঁছামাত্রই মুসলমান ব্যক্তিটি তাকে জাপটে ধরল এবং টেনে নিজের শিবিরে নিয়ে এল।” [৫]

রমজান থেকে জিলকদ পর্যন্ত এ ধরনের অভিযান চলতে থাকে। এই সময়ে ইসলামী নৌবাহিনী ফিরিঙ্গিদের একটি যুদ্ধজাহাজ দখল করে একজন নবাবসহ দুইশ শত্রুকে জীবিত গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে একবার অশ্বারোহীরা নদী পার হয়ে শত্রুর ওপর আক্রমণ চালায় এবং চল্লিশজনকে হত্যা করে।

[১] আস-সুলুক লি-মা’রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক লিল-মাকরিজি: ১/ ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৪৯

[২] আস-সুলুক লি-মা’রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ১/ ৩৪৭

[৩] দ্য ক্রুসেডস বাই হ্যারল্ড ল্যাঙ্ক: পৃষ্ঠা: ২৯

[৪] দ্য ক্রুসেডস বাই হ্যারল্ড ল্যাঙ্ক: পৃষ্ঠা: ২৯

[৫] আস-সুলুক লি-মা’রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ১/ ৩৪৭, ত’ আল-ইলমিয়্যাহ

৫ জিলকদ ৬৪৭ হিজরি (৯ ফেব্রুয়ারি ১২৫০ খ্রিস্টাব্দ) মুসলমানদের জন্য কঠিন পরীক্ষার দিন ছিল। কোনো এক বিশ্বাসঘাতক শত্রুকে নদীর একটি অগভীর অংশের সন্ধান দিয়েছিল। এই খবর পাওয়া মাত্রই ক্রুসেডাররা প্রস্তুত হয়ে গেল। [১] পথ পরিষ্কার করার জন্য ফ্রান্সের রাজার ভাই দেড় হাজার বাছাইকৃত অশ্বারোহী নিয়ে অন্ধকার থাকতেই বের হলেন এবং নদী পার হয়ে ফজরের আগেই মুসলমানদের তাঁবু পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। তার পেছনে অনেক সৈন্য নদীতে সেতু নির্মাণে ব্যস্ত হয়ে পড়ল যাতে বাকি সেনাবাহিনীও পার হতে পারে।

মুসলমানরা এই আক্রমণের জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না। নায়েবে সুলতান ফখরুদ্দিন শেখ হামলার ঘোষণা শোনামাত্রই অত্যন্ত অস্থির অবস্থায় ঘোড়ায় চড়লেন। তিনি প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য সৈন্যদের নির্দেশ দিয়ে মাত্র কয়েকজন গোলামকে সাথে নিয়ে বেরিয়ে এলেন এবং যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হলেন।

তাঁর শাহাদাতে মুসলমানদের সাহস ভেঙে গেল এবং তারা এদিক-ওদিক পালাতে লাগল। তাদের অধিকাংশ কায়রোর দিকে চলে গেল। ক্রুসেডাররা তাঁবুতে ঢুকে পড়ল, এখানে তাদের আক্রমণ স্তিমিত হয়ে পড়ল কারণ একদল মুসলিম তীরন্দাজ পাল্টা আক্রমণ শুরু করেছিল, অন্যদিকে আক্রমণকারীদের ঘোড়াগুলো তাঁবুর রশিতে আটকে যাচ্ছিল।

ক্রুসেডারদের কিছু দল কায়রোর দিকে পলায়নরত মুসলমানদের পিছু নিল, কিন্তু বেশিরভাগ মানসুরা শহরে ঢুকে যাকে পেল তাকেই তলোয়ারের লক্ষ্যবস্তু বানাতে লাগল। তবে তারা কিছুটা সামনে এগিয়ে শহরের গলিতে আটকা পড়ে গেল। যখন কৃষ্ণাঙ্গ গোলামরা জানালা থেকে তাদের ওপর তীর বর্ষণ করতে লাগল এবং ছাদ থেকে তাদের ওপর পাথর পড়ল, তখন তাদের প্রাণ বাঁচিয়ে পালানো ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। কিছু ক্রুসেডার এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে সুলতানের প্রাসাদ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। এই মুহূর্তে সুলতানের মামলুক অফিসার রুকনুদ্দিন বাইবার্স তার জানবাজদের নিয়ে এগিয়ে এলেন এবং এমন তীব্র পাল্টা আক্রমণ করলেন যে ক্রুসেডাররা পালাতে বাধ্য হলো। কিছুক্ষণ পর শহরের বিভিন্ন মোড়ে তারা আবার সংগঠিত হলো। ওদিকে মামলুক সৈন্য এবং স্থানীয় মুসলমানরাও তলোয়ার হাতে পৌঁছে গেল এবং হাতাহাতি যুদ্ধ শুরু হলো। মুসলমানরা শহরের অলিগলি সম্পর্কে জানত এবং ক্রুসেডাররা ছিল অপরিচিত। তারা বেশিক্ষণ টিকতে পারল না এবং গুটিকয়েক বাদে সবাই মারা গেল। খুব কম লোকই পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। [২]

এই আক্রমণের খবর বার্তাবাহক কবুতরের মাধ্যমে দ্রুত কায়রোতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল, তাই সেখানে এক হুলস্থূল পড়ে গিয়েছিল। মানসুরা থেকে পিছু হটে আসা লোকদের জন্য কায়রোর দরজা খুলে দেওয়া হয়েছিল। সারারাত পলাতকরা এখানে পৌঁছাতে থাকে এবং মানুষ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিল। তবে সকালে ক্রুসেডারদের পিছু হটার সুসংবাদ পৌঁছালে তাদের সাহস আবার ফিরে আসে। [৩]

আল-মালিকুল মুয়াজ্জাম তুরান শাহ

ওদিকে শাজারাতুদ দুরের আহ্বানে তুরান শাহ ১১ রমজান (৭ ডিসেম্বর) কুচাক থেকে মিশরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন, তার সাথে ছিল মাত্র পঞ্চাশজন অশ্বারোহী। পথে প্রথমে মসুল এবং তারপর আলেপ্পোর স্থানীয় আমিররা তাকে বাধা দেওয়ার এবং হত্যা করার...

[১] আস-সুলুক লি-মা'রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ১/৪৩৭, ত. আল-ইলমিয়াহ

[২] আস-সুলুক লি-মা'রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ১/৪৩৭ থেকে ৩০০; The Crusades by Harold Lamb: p. 298

[৩] আস-সুলুক লি-মা'রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ১/৪৩৭, ৪৩৮

জন্য ফোরাত নদীর কাছে ওত পেতে ছিল কিন্তু সে বেঁচে বেরিয়ে গেল। শত্রুদের থেকে লুকিয়ে থাকার জন্য তাকে আনাহ মরুভূমির পথ বেছে নিতে হয়েছিল, তিন দিনের এই মরুযাত্রায় সে তৃষ্ণায় প্রায় মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। অবশেষে সে দামেস্ক ও আস-সালিহিয়া হয়ে ৩১ জিলকদ ৬৪৭ হিজরি (২৫ ফেব্রুয়ারি) আল-মানসুরায় পৌঁছে গেল। তার আগমনে সুলতানের মৃত্যুর সরকারি ঘোষণা দেওয়া হলো এবং নতুন শাসকের সিংহাসন আরোহণের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলো। [১]

ফিরিজিদের সাথে চূড়ান্ত যুদ্ধ:

নতুন বাদশাহর জিহাদের প্রতি বিশেষ কোনো আগ্রহ ছিল না। তিনি একদিনও ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যাননি। তিনি বড়জোর নৌকায় চড়ে দূর থেকে রণক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ করতেন। [২] তবুও সিংহাসনে একজন বাদশাহর উপস্থিতি মুসলমানদের জন্য উৎসাহব্যঞ্জক ছিল। তারা ফিরিজিদের নাস্তানাবুদ করার জন্য নতুন কৌশল অবলম্বন করলেন। মানসুরায় আক্রমণকারী ফিরিজিদের জন্য খাদ্য ও রসদ নীল নদের পথে দমিয়াত থেকে পাঠানো হচ্ছিল। মুসলমানরা স্থলপথে পদাতিক বাহিনী পাঠাল যারা কয়েক ডজন নৌকা টুকরো অবস্থায় মালবাহী উটের পিঠে চাপিয়ে সাথে নিয়ে গেল। নীল নদের ব-দ্বীপ পর্যন্ত পৌঁছে নৌকাগুলো জোড়া লাগানো হলো। যখন দমিয়াত থেকে ফিরিজিরা খাদ্য ও রসদের নৌবহর ক্রুসেডার শিবিরের দিকে পাঠাল, তখন পেছন থেকে এই নৌকাগুলো সৈন্যসহ পানিতে নামিয়ে দেওয়া হলো এবং ফিরিজি নৌবহরের ফেরার পথ বন্ধ করে দেওয়া হলো।

এদিকে মানসুরা থেকে ইসলামী নৌবহর যাত্রা শুরু করল এবং সামনে থেকে পথ রুদ্ধ করে দিল। ফিরিজিরা উভয় দিক থেকে ঘেরাও হয়ে অসহায় হয়ে পড়ল। এই যুদ্ধে প্রায় এক হাজার ফিরিজি নিহত ও বন্দি হলো। ৫২টি জাহাজ মুসলমানদের হস্তগত হলো যেগুলো খাদ্যে পরিপূর্ণ ছিল। এভাবে নদীপথের ওপর মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণের ফলে দমিয়াত থেকে ফিরিজিদের সরবরাহ লাইন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং পুরো ক্রুসেডার শিবির দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ল। জিলকদ মাসের প্রথম দশকে (মার্চ ১২৫০ খ্রিষ্টাব্দ) ফিরিজিরা দমিয়াত থেকে আরও একটি মালবাহী নৌবহর পাঠাল কিন্তু মুসলমানরা সেটিকেও ঘিরে ফেলল। এই অভিযানে ৩২টি জাহাজ হস্তগত হলো। এই পদক্ষেপগুলো মরহুম বাদশাহর অসিয়তনামা অনুযায়ী কার্যকর করা হয়েছিল।

ফিরিজিরা দুর্ভিক্ষে নাজেহাল হয়ে পড়েছিল। তাই আলোচনার প্রস্তাব দেওয়া হলো, তবে এর কোনো ফলাফল আসেনি কারণ তুরান শাহ আলোচনার জন্য দমিয়াত খালি করার শর্ত দিয়েছিলেন এবং ফ্রান্সের রাজা তা মানতে রাজি ছিলেন না।

ফিরিজিরা আল-মানসুরার সামনে শিবির স্থাপন করে একটি জালে আটকা পড়েছিল। তারা এখন যেকোনো মূল্যে দমিয়াতে ফিরে যাওয়াকে অগ্রাধিকার দিল এবং শিবির খালি করে ৩ মহরমের রাতে অত্যন্ত নিরবে দমিয়াতের দিকে রওনা হলো। কিন্তু মুসলমানরা পুরোপুরি সতর্ক ছিল। তারা সুপরিকল্পিতভাবে তাদের পিছু নেওয়া শুরু করল। ভোরের আলো ফুটতেই দেখা গেল ফিরিজিদের সামনেও ইসলামী বাহিনী এবং পেছনেও। এখন মরণপণ যুদ্ধ ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।

[১] আস-সুলুক লি-মা'রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ১/ ৩৩৮, ৩৩৯, ত. আল-ইলমিয়্যাহ

[২] আর-রওদুজ জাহির ফি সিরাতিল মালিকিজ জাহির, আল্লামা মুহিউদ্দিন বিন আবদুজ্জাহির (মৃ. ৬৯২ হি.), পৃ. ৪৯, ত. রিয়াদ, ১৯৭৬ খ্রি.

৪ মহররম ৬৪৮ হিজরি (৮ এপ্রিল ১২৫০ খ্রিস্টাব্দ) নীল নদের উপত্যকায় চূড়ান্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ফরাসিরা ঘেরাও ভেঙে দিময়াত পৌঁছানোর আশ্রয় চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তরুণ অফিসার রুকন উদ্দিন বাইবার্স বৃন্দুকদারি এবং অন্যান্য মিশরীয় জেনারেলরা তাদের নিজেদের কবজা থেকে বের হতে দেননি। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলা এই ভয়াবহ যুদ্ধে প্রায় ৩০ হাজার ক্রুসেডার নিহত হয় এবং প্রায় এক লক্ষ জীবিত বন্দি হয়। ফ্রান্সের রাজা নবম লুই একটি টিলায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাকে জীবনের নিরাপত্তা দেওয়া হয় এবং শিকল পরিয়ে আল-মানসুরার একটি প্রাসাদে বন্দি করে রাখা হয়। এই বিজয়ে পুরো মুসলিম বিশ্বে আনন্দের জোয়ার বয়ে যায় এবং চারদিক থেকে অভিনন্দন ও মুবারকবাদের বার্তা আসতে থাকে। [১]

তোরান শাহর হত্যাকাণ্ড এবং আইয়ুবী শাসনের অবসান:

আল-মালিকুল মুয়াজ্জম তোরান শাহ তার পিতার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিলেন। তিনি অধ্যয়নপ্রিয় ছিলেন এবং আলেম ও বুদ্ধিজীবীদের সাথে আলোচনা করতেন। কিন্তু প্রশাসনিক দিক থেকে তিনি দুর্বল ও উদাসীন ছিলেন। তিনি এই গৌরবময় বিজয় থেকে কোনো ফায়দা হাসিল করেননি এবং নিজের খেয়াল-খুশিমতো কাজে মগ্ন হয়ে পড়েন। তিনি তার পিতার মূল্যবান উপদেশ অনুযায়ী কোনো কাজ করেননি বরং প্রকাশ্যে তার বিরোধিতা করতে শুরু করেন। তিনি তার সৎ মা শাজারাতুদ দুরের সাথেও দুর্ব্যবহার শুরু করেন, যিনি তার সিংহাসন লাভের পথ সুগম করেছিলেন। এরপর তিনি কেবল তার পিতার ঘনিষ্ঠ কর্মকর্তাদেরই বরখাস্ত করেননি, বরং সেই তুর্কি জেনারেলদের অবদানকেও উপেক্ষা করেন যারা বিজয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। [২] সমসাময়িক ঐতিহাসিক আল্লামা মহিউদ্দিনের মতে, তিনি মদের নেশায় বৃন্দ হয়ে থাকতেন। তিনি মাতাল অবস্থায় দরবারে আসতেন এবং অকারণে নিজের কাপড় ছিঁড়ে ফেলতেন। [৩]

এই আচরণের ফলে সেনাবাহিনী তার বিরুদ্ধে চলে যায়। এই তুর্কি জেনারেলরা, যারা মামলুক নামে পরিচিত ছিল, নিজেদের মধ্যে অত্যন্ত ঐক্যবদ্ধ ছিল। তাদের সর্দার ফারিস উদ্দিন আক্তাই তোরান শাহকে হিসন কাইফা থেকে কায়রোতে এনে সিংহাসনে বসাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, যার বিনিময়ে তোরান শাহ আক্তাইকে হিসন কাইফার গভর্নর বানানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তোরান শাহ এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেননি। তিনি মামলুকদের নিজের ওপর প্রভাবশালী দেখে বিচলিত ছিলেন এবং তাদের দুর্বল করতে চেয়েছিলেন। রাতে তিনি জ্বলন্ত মোমবাতি সামনে রেখে সেগুলোর মাথা কেটে ফেলতেন এবং বলতেন: “মামলুকদের সাথেও আমি এমনই করব।”

মামলুকরা তোরান শাহর সংকল্প বুঝতে পেরেছিল। তাই তারা বিদ্রোহের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। একদিন তোরান শাহ অভ্যাস অনুযায়ী রাজকীয় সিংহাসনে বসে ছিলেন। এমন সময় ২৩ বছর বয়সী তরুণ অফিসার বাইবার্স বৃন্দুকদারি এগিয়ে এসে হঠাৎ তার ওপর তলোয়ার চালিয়ে দেন। তোরান শাহ আত্মরক্ষার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলে তলোয়ারের আঘাতে তার আঙুলগুলো কেটে যায়। তোরান শাহ বুঝতে পারলেন যে বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে পালিয়ে জীবন বাঁচাতে একটি কাঠের বুরুজে (টাওয়ারে) লুকিয়ে পড়েন। তিনি বুঝতে না পেরে চিৎকার করে বলতে লাগলেন: “আমাকে কে আহত করল?” লোকেরা বলল: “কোনো এক বাতিনি ফিদায়ী।”

[১] আস-সুলুক লি-মা'রিফতি দুওয়ালিল মুলুক লিল-মাকরিজি: ১/৩৫৫ থেকে ৩৫৭; নিহায়াতুল আরাব লিন-নুওয়াইরি: ২৯/৩৫৫ থেকে ৩৫৭, তাবা দারুল কুতুব কায়রো।

[২] আর-রওদুজ জাহির ফি সিরাতিল মালিকিজ জাহির, পৃষ্ঠা ৫০।

[৩] আস-সুলুক লি-মা'রিফতি দুওয়ালিল মুলুক লিল-মাকরিজি: ১/৩৫৭, ৩৫৮, তাবা আল-ইলমিয়াহ।

তোরান শাহ বললেন: “না না, আল্লাহর কসম! তারা মামলুক বাহরিয়া ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। আল্লাহর কসম! আমি তাদের কাউকেই বাকি রাখব না।” এরপর তোরান শাহ হাতের ক্ষত ড্রেসিং করার জন্য চিকিৎসককে ডাকলেন। এদিকে মামলুক বাহরিয়ারা নিজেদের মধ্যে বলতে লাগল: “তাকে শেষ করে দাও, অন্যথায় সে তোমাদের নিশ্চিহ্ন করে দেবে।”

মামলুকরা তলোয়ার উঁচিয়ে তোরান শাহের পিছু পিছু দুর্গের বুরুজে ঢুকে পড়ল। তোরান শাহ, যার হাত থেকে তখনও রক্ত ঝরছিল, ভয়ে বুরুজের চুড়ায় উঠে গেলেন এবং সেখানে থাকা একটি কক্ষের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলেন। এটি দেখে মামলুকরা বুরুজে আগুন ধরিয়ে দিল। তোরান শাহ প্রাণ বাঁচাতে ওপর থেকে লাফিয়ে পড়লেন এবং দৌড়ে মামলুকদের সর্দার ফারিস আক্কাইয়ের আঁচল আঁকড়ে ধরলেন এবং আশ্রয় প্রার্থনা করতে লাগলেন। কিন্তু আক্কাইয়ের মনে দয়া হলো না। এটি দেখে তোরান শাহ সমুদ্রের দিকে দৌড়াতে লাগলেন। তিনি চিৎকার করে বলছিলেন: “আমার রাজত্বের প্রয়োজন নেই। আমাকে ছেড়ে দাও। আমাকে দুর্গে যেতে দাও। হে মুসলমানরা! তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ নেই যে আমাকে আশ্রয় দেবে, কেউ নেই যে আমাকে বাঁচাবে?”

কিন্তু তার এই চিৎকার অরণ্যে রোদনে পরিণত হলো। মামলুকরা তার ওপর তীর বর্ষণ করতে লাগল। বাকি সৈন্যরা এই দৃশ্য দেখছিল কিন্তু কারও হস্তক্ষেপ করার সাহস ছিল না। তীরের আঘাতে অল্প সময়ের মধ্যেই তোরান শাহ লুটিয়ে পড়লেন। মামলুকরা সাঁতরে তার কাছে গেল এবং তলোয়ার দিয়ে তার দেহ টুকরো টুকরো করে ফেলল। এই ঘটনাটি ২৬ মহরম ৬৪৮ হিজরি (২০ এপ্রিল ১২৫০ খ্রিস্টাব্দ) এর।

ক্ষতবিক্ষত লাশটি তিন দিন পর্যন্ত সমুদ্র সৈকতে পড়ে রইল এবং ফুলে গেল, কিন্তু কারও দাফন করার সাহস হলো না। অবশেষে বাগদাদের খলিফার দূত, যিনি কায়রোতে এসেছিলেন, সুপারিশ করলেন যার ভিত্তিতে লাশটি দাফন করার অনুমতি দেওয়া হলো।

হত্যাকারী সামরিক কর্মকর্তারা তোরান শাহের স্থলে রানী শাজারাতুদ দুরকে সিংহাসনে বসালেন।

তোরান শাহের মৃত্যুর মাধ্যমে মিশরে আইয়ুবী বংশের শাসনের অবসান ঘটে। এই বংশ প্রায় পৌনে এক শতাব্দী ধরে অত্যন্ত শান-শওকতের সাথে সিরিয়া ও মিশরে শাসন করেছিল এবং ইসলামী সীমান্ত রক্ষার জন্য ঢাল হিসেবে কাজ করেছিল। [১]

রানী শাজারাতুদ দুরের সাথে ক্রুসেডারদের সফল আলোচনা:

শাজারাতুদ দুর কোনো রাজবংশীয় রাজকুমারী ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন একজন দাসী। তিনি ছিলেন একজন চতুর ও বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ। তাকে সিংহাসনে বসানো তার বিশ্বস্ত আমিররাও ছিলেন প্রাক্তন ক্রীতদাস, যারা পদোন্নতি পেয়ে সামরিক জেনারেল হয়েছিলেন, যাদের মধ্যে বাইবার্স, কুতুজ, আক্কাই এবং জানকিশির উল্লেখযোগ্য ছিলেন। তার সিংহাসন আরোহণ মিশরে ক্রীতদাসদের সেই শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করে যা ইতিহাসে ‘দৌলতুল মামালিক’ নামে পরিচিত।

শাজারাতুদ দুর বন্দী ফ্রান্সের রাজার সাথে সরাসরি আলোচনা করেন এবং তার মুক্তির জন্য নিম্নলিখিত শর্তাবলী পেশ করেন:

- ১. সে দামিয়েত্তা খালি করে দেবে।
- ২. চার লক্ষ দিনার মুক্তিপণ আদায় করবে।

[১] নেহায়াতুল আরাব লিন নুওয়াইর: ২৯ / ৩২০ থেকে ৩৬০; আস-সুলুক লি মা'রিফতি দুওয়ালিল মুলুক লিল মাকরিজি: ১ / ৩৫৬-৩৫৮, ত' আল-ইলমিয়াহ।

(৩) দশ বছর পর্যন্ত ফ্রান্সের পক্ষ থেকে পুনরায় আক্রমণ না হওয়ার নিশ্চয়তা দিতে হবে। শাহে ফ্রান্স এই শর্তগুলো মেনে নিলেন। সেই সাথে তিনি ঐ সমস্ত বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যারা বর্তমান এবং বিগত যুদ্ধগুলোতে বন্দী হয়েছিল। এই ফরমায়েশ কবুল করা হলো। ৩ সফর ৬৪৮ হিজরিতে দমিয়াত পুনরায় মুসলমানদের জন্য খুলে দেওয়া হলো, যখন শাহে ফ্রান্সের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করে তাকে মুক্ত করে দেওয়া হলো। শাহে ফ্রান্স আরও কিছু বন্দীদের মুক্তিপণ আদায় করলেন যারা সংখ্যায় ১২ হাজার ১১ জন ছিল। শাহে ফ্রান্স এই কাফেলা নিয়ে রওয়ানা হলেন যা সিরিয়ার উপকূল পর্যন্ত তখনও ফ্রান্সদের দখলে ছিল। খ্রিস্টানদের এই পরাজয়ের এতই প্রভাব পড়ল যে, কিছু শহরের লোকেরা তাদের গির্জাগুলোতে ঝোলানো মরিয়ম ও মসীহ-এর ছবিগুলোকে কালো কালি দিয়ে লেপে দিল। [১]

মিশরে আইয়ুবী সালতানাতের অবসান হওয়া সত্ত্বেও এই বংশের আরও কিছু শাহজাদা আরও কয়েক বছর পর্যন্ত সিরিয়া এবং আল-জাজিরায় শাসন করতে থাকেন, যাদের মধ্যে একজন সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর প্রপৌত্র আল-মালিকুন নাসির হালবের শাসক ছিলেন। তিনি মিশর থেকে আইয়ুবীদের কর্তৃত্ব শেষ হতে দেখে ৬৪৮ হিজরিতে দামেস্কও দখল করে নেন। এভাবে তিনি প্রায় পুরো সিরিয়ার সুলতান হয়ে যান।

এ ছাড়া মিয়াফারকিনে আল-মালিকুল আদিলের পৌত্র মুহাম্মদ আল-কামিলের কর্তৃত্ব অবশিষ্ট ছিল। আইয়ুবী বংশের এই দুই শাসক ৬৫৮ হিজরিতে হালাকু খানের আক্রমণের মোকাবিলা করতে গিয়ে শহীদ হন। [২]

এভাবে আল-ই-নাজমউদ্দীন আইয়ুবীর সেই মহান সাম্রাজ্য যা মিশর ও সিরিয়া থেকে আল-জাজিরা এবং আরমেনিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, অস্তিত্বের পাতা থেকে বিলীন হয়ে ইসলামের ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল পাতায় পরিণত হলো।

[১] নেহায়াতুল আরব লিন নুওয়াইরি ২৯ পৃষ্ঠা ৩৩১ থেকে ৩৬০, ত. দারুল কুতুব কায়রো; আস-সুলুক লি মা'রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক লিল মাকরিজি: ১ পৃষ্ঠা ৩৫৯, ৩৬০, ত. ইলমিয়াহ।

[২] আইয়ুবীদের এই শেষ দুই শাহজাদার অবস্থা ষষ্ঠ অধ্যায়ে মামলুক সুলতানদের অধীনে আসবে। বিস্তারিত জানার জন্য নিচের উৎসগুলোতে ৬৪০ হিজরি থেকে ৬৫৮ হিজরি পর্যন্ত ঘটনাবলী দেখুন: আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া; তারিখুল ইসলাম লিজ জাহাবি; আস-সুলুক লি মা'রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক লিল মাকরিজি।

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

চতুর্থ খণ্ড

আইয়ুবী বংশের গুরুত্বপূর্ণ শাসকদের রূপরেখা

শাসকের নাম শাসনের শুরু সমাপ্তি অঞ্চল বিশেষ কথা

সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর পরিবার

১. সালাহউদ্দীন আইয়ুবী বিন নাজমুদ্দীন আইয়ুব ৫৬৭ হি. (১১৭১ খ্রি.) ৫৮৯ হি. (১১৯৩ খ্রি.) মিশর, শাম, হিজাজ, আল-জাজিরা, কুর্দিস্তান আইয়ুবী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করেন, বাইতুল মুকাদ্দাস জয় করেন।

২. আল-মালিকুল আজিজ উসমান বিন সালাহউদ্দীন ৫৮৯ হি. (১১৯৩ খ্রি.) ৫৯৬ হি. (১২০০ খ্রি.) মিশর নিজের ভাই আল-আফদালের সাথে দ্বন্দ্ব।

৩. আল-মালিকুল আফজাল বিন সালাহউদ্দীন ৫৮৯ হি. (১১৯৩ খ্রি.) ৫৯২ হি. (১১৯৬ খ্রি.) দামেস্ক ভাইদের এবং চাচার সাথে দ্বন্দ্বের পর শাসন থেকে বঞ্চিত হন।

৪. আল-মালিকুজ জাহির বিন সালাহউদ্দীন ৫৮৯ হি. (১১৯৩ খ্রি.) ৬১৩ হি. (১২১৬ খ্রি.) হালব ন্যায়পরায়ণ ও শান্তিপূর্ণ শাসন।

৫. আল-মালিকুল আজিজ বিন আল-মালিকুজ জাহির ৬১৩ হি. (১২১৬ খ্রি.) ৬৩৪ হি. (১২৩৭ খ্রি.) হালব ন্যায় ও ইনসাফের সাথে শাসন করেন।

৬. আল-মালিকুন নাসির বিন আল-মালিকুল আজিজ বিন আল-মালিকুজ জাহির বিন সালাহউদ্দীন ৬৩৪ হি. (১২৩৭ খ্রি.) ৬৫৮ হি. (১২৬০ খ্রি.) হালব, দামেস্ক ৬৪৮ হিজরিতে দামেস্ক দখল করে একে রাজধানী বানান। ৬৫৮ হিজরিতে হালাকু খান তাকে গ্রেফতার করে হত্যা করেন।

এই নকশাটি তারিখ ইবনে খালদুন, তারিখ ইবনে আসির, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া এবং অন্যান্য ইতিহাস গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে।

আল-মালিকুল আদিলের পরিবার

১. আল-মালিকুল আদিল বিন নাজমুদ্দীন আইয়ুব ৫৯৬ হি. (১২০০ খ্রি.) ৬১৫ হি. (১২১৮ খ্রি.) শাম, মিশর, আল-জাজিরা তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম ক্রুসেড যুদ্ধ লড়েন; একজন মহান মুজাহিদ ও রাজনীতিবিদ।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা (চতুর্থ খণ্ড)

২. আল-মালিক আল-কামিল মুহাম্মদ বিন আল-মালিক আল-আদিল

শাসনকাল শুরু: ৬১৫ হিজরী (১২১৮ খ্রি.)

শাসনকাল শেষ: ৬৩৫ হিজরী (১২৩৮ খ্রি.)

অঞ্চল: মিশর

মন্তব্য: পঞ্চম ক্রুসেড বিজয়ী

৩. আল-মালিক আল-আদিল বিন আল-মালিক আল-কামিল

শাসনকাল শুরু: ৬৩৫ হিজরী (১২৩৮ খ্রি.)

শাসনকাল শেষ: ৬৩৭ হিজরী (১২৪০ খ্রি.)

অঞ্চল: মিশর

মন্তব্য: অল্পবয়সী এবং অযোগ্য শাসক

৪. আল-মালিক আল-মুয়াজ্জম ঈসা বিন আল-মালিক আল-আদিল

শাসনকাল শুরু: ৬১৫ হিজরী (১২১৮ খ্রি.)

শাসনকাল শেষ: ৬২৪ হিজরী (১২২৭ খ্রি.)

অঞ্চল: দামেস্ক, আল-কুদস

মন্তব্য: পঞ্চম ক্রুসেডের বীর মুজাহিদ, হানাফী ফকীহ, লেখক

৫. আন-নাসির দাউদ বিন আল-মালিক আল-মুয়াজ্জম ঈসা

শাসনকাল শুরু: ৬২৪ হিজরী (১২২৭ খ্রি.)

শাসনকাল শেষ: ৬৫৬ হিজরী (১২৫৮ খ্রি.)

অঞ্চল: দামেস্ক, কারাক

মন্তব্য: হানাফী ফকীহ, কবি। পিতার বিশাল রাজ্য থেকে দ্রুত বঞ্চিত হন, শুধু কারাক বাকি থাকে।

৬. আল-মালিক আল-আশরাফ বিন আল-মালিক আল-আদিল

শাসনকাল শুরু: ৬১৫ হিজরী (১২১৮ খ্রি.)

শাসনকাল শেষ: ৬৩৫ হিজরী (১২৩৮ খ্রি.)

অঞ্চল: খালাত, দামেস্ক, আল-জাজিরা

মন্তব্য: সুলতান জালালুদ্দিন খোয়ারিজম শাহের কঠোর প্রতিদ্বন্দ্বী

৭. আল-মালিক আল-মুজাফফর শিহাবুদ্দিন গাজী বিন আল-মালিক আল-আদিল

শাসনকাল শুরু: ৬১৫ হিজরী (১২১৮ খ্রি.)

শাসনকাল শেষ: ৬৪৫ হিজরী (১২৪৭ খ্রি.)

অঞ্চল: মিয়াফারিকিন, খালাত, আমিদ

মন্তব্য: বিশৃঙ্খল যুগে শান্তিপূর্ণ শাসন

৮. আল-মালিক আস-সালিহ ইসমাইল বিন আল-মালিক আল-আদিল

শাসনকাল শুরু: ৬৩৫ হিজরী (১২৩৮ খ্রি.)

শাসনকাল শেষ: ৬৪৪ হিজরী (১২৪৬ খ্রি.)

অঞ্চল: দামেস্ক, বালবাক

মন্তব্য: আল-মালিক আল-কামিল এবং তার পুত্র আস-সালিহ আইয়ুবের সাথে শত্রুতা, দুইবার দামেস্ক দখলে সফল, শেষে যাযাবর।

৯. আল-মালিক আস-সালিহ আইয়ুব বিন আল-মালিক আল-কামিল

শাসনকাল শুরু: ৬৩৭ হিজরী (১২৪০ খ্রি.)

শাসনকাল শেষ: ৬৪৭ হিজরী (১২৪৯ খ্রি.)

অঞ্চল: মিশর, শাম, আল-জাজিরা

মন্তব্য: ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধে জিহাদের ধারা পুনরায় শুরু করেন। শাম ও মিশরকে একত্রিত করেন, মুজাহিদ বাদশাহ।

১০. আল-মালিক আল-মুয়াজ্জম তুরান শাহ বিন সালিহ আইয়ুব

শাসনকাল শুরু: ৬৪৭ হিজরী (১২৪৯ খ্রি.)

শাসনকাল শেষ: ৬৪৮ হিজরী (১২৫০ খ্রি.)

অঞ্চল: মিশর, শাম, আল-জাজিরা

মন্তব্য: মিশরে আইয়ুবী বংশের শেষ শাসক। অযোগ্য। মাত্র দুই মাস শাসন করেন। তার পর তার সৎ মা শাজারাতুদ দুর শাসনভার গ্রহণ করেন।

১১. আল-মালিক আল-কামিল মুহাম্মদ বিন আল-মালিক আল-মুজাফফর শিহাবুদ্দিন গাজী বিন আদিল

শাসনকাল শুরু: ৬৪৫ হিজরী (১২৪৭ খ্রি.)

শাসনকাল শেষ: ৬৫৮ হিজরী (১২৬০ খ্রি.)

অঞ্চল: মিয়াফারিকিন, খালাত, আমিদ

মন্তব্য: হালাকু খানের হাতে বন্দি এবং শাহাদাত

চতুর্থ অধ্যায়

খাওয়ারিজম শাহী সালতানাত

এবং তাতার ফিতনা

৫২২ হি. হতে ৬৫৬ হি.

১১২৮ খ্রি. হতে ১২৫৮ খ্রি.

তাতার ফিতনা

আইয়ুবী বংশের পর সিরিয়া ও মিশরে মুসলিম বিশ্ব রক্ষার দায়িত্ব মামলুক সুলতানগণ গ্রহণ করেন। সে সময় মুসলিম বিশ্ব একই সাথে ক্রুসেডার এবং তাতারদের আক্রমণের সম্মুখীন ছিল। মামলুক সুলতানগণ এই উভয় ফ্রন্টে প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলোর সফলভাবে মোকাবিলা করেন এবং তাদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে মুসলমানদের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করেন।

কিন্তু আইয়ুবীদের কাছ থেকে মামলুকদের হাতে কীভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হলো এবং এই নতুন নেতৃবৃন্দ ক্রুসেডারদের আক্রমণ প্রতিহত করার পাশাপাশি কীভাবে “তাতার ফিতনা”-র মোড় ঘুরিয়ে দিলেন তা বর্ণনা করার আগে, “তাতার ফিতনা” সম্পর্কে তথ্য থাকা জরুরি। আবার যেহেতু তাতারদের মোকাবিলা সর্বপ্রথম খোয়ারিজম শাহী শাসকরা করেছিলেন, তাই খোয়ারিজম শাহী বংশের পরিচয়ও অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

হাদিসে তাতার ফিতনার প্রতি ইঙ্গিত:

তাতার ফিতনা ছিল সেই কিয়ামত-এ-সুগরা (ছোট কিয়ামত), যা সপ্তম হিজরি শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে মুসলমানদের ওপর আপতিত হয়েছিল। এই বৈশ্বিক ফিতনা সম্পর্কে স্বয়ং হাদিসে নববীতে স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ইরশাদ করেছিলেন:

“ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না যতক্ষণ না মুসলমানরা তুর্কিদের এমন এক জাতির সাথে যুদ্ধ করবে যাদের মুখমণ্ডল হবে স্তরে স্তরে সাজানো ঢালের মতো। তারা পশমের পোশাক এবং পশমের জুতো পরিধান করবে।” [১]

এছাড়াও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী হলো:

“তোমরা কিয়ামতের আগে এমন এক জাতির সাথে যুদ্ধ করবে যাদের জুতো হবে পশমের। তাদের মুখমণ্ডল যেন স্তরে স্তরে সাজানো ঢালের মতো হবে। তারা লাল বর্ণের মুখমণ্ডল এবং ছোট চোখ বিশিষ্ট হবে।” [২]

এই মর্মের অনেক বর্ণনা সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনানে আবু দাউদ এবং অন্যান্য হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে এবং অধিকাংশ হাদিস ব্যাখ্যাকারী পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে এই হাদিসগুলোর লক্ষ্যবস্তু হিসেবে তাতারদের আক্রমণ এবং তাদের ধ্বংসলীলাকে সাব্যস্ত করেছেন। چنگز প্রখ্যাত হাদিস ব্যাখ্যাকারী মোল্লা আলী কারী রহ. এই বর্ণনাগুলোর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন:

[১] সহীহ মুসলিম, হা: ২৯১২, আল-ফিতান ওয়া আশরাতুস সা’আহ

[২] সহীহ মুসলিম, হা: ২৯১৮, আল-ফিতান ওয়া আশরাতুস সা’আহ

“সবচেয়ে সহজবোধ্য কথা এটাই যে, এই হাদিসগুলোতে চেঙ্গিস ও তার সঙ্গীদের হাতে সংঘটিত ফাসাদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।” [১]

তাতারী হামলার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী ইমাম নববী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন:

“এই তুর্কিদের সাথে যুদ্ধের প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ হয়ে গেছে... এই লোকেরা সেই সমস্ত আলামতসহ আমাদের যুগে পাওয়া গেছে, মুসলমানরা তাদের সাথে বারবার যুদ্ধ করেছে যা এখন পর্যন্ত জারি রয়েছে।” [২]

আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি রহমতুল্লাহি আলাইহি লিখেন:

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সংবাদ অনুযায়ী এই ঘটনাবলির একটি অংশ ৬১৭ হিজরিতে ঘটে গেছে। তুর্কিদের (তাতারীদের) একটি বিশাল বাহিনী আত্মপ্রকাশ করল যারা মাওয়ারাননহর ও খোরাসানের অধিবাসীদের ধ্বংস করে দিল। কেবল তারাই বেঁচে গেল যারা গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল।” [৩]

মনে রাখা প্রয়োজন যে, হাদিসসমূহে তুর্ক শব্দের প্রয়োগ তাতারীদের ওপর এই বিবেচনায় হয়েছে যে, তাতারীরা তুর্ক বিন ইয়াফিস বিন নুহ আলাইহিস সালাম-এর বংশধর হওয়ার দিক থেকে তুর্কি জাতির একটি শাখা ছিল।

তাতারী আক্রমণের ধ্বংসলীলা:

তাতারীদের হামলায় ছয়শ বছরের প্রাচীন ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধুলোয় মিশে গেল। আলম-এ-ইসলামের পশ্চিমাঞ্চলীয় শহরগুলো ছাড়া কোনো এলাকা তাতারী লুটেরাদের হাত থেকে নিরাপদ থাকতে পারেনি এবং যেখানে তাদের কদম পৌঁছেনি সেখানেও তাদের ভয় মানুষকে দিশেহারা করে দিচ্ছিল। প্রত্যেক ব্যক্তি এই বিশ্বাস করে নিয়েছিল যে, তাতারীরা আজ না হয় কাল এখানেও আগুন ও রক্তের হোলি খেলবে। বড় বড় নামী-দামী বাদশাহ, শাহজাদা, সেনাপতি এবং মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ এই তুফানের কবলে পড়লেন। হাজার হাজার দুর্গ এবং লক্ষ লক্ষ জনসংখ্যা বিশিষ্ট বড় বড় শহর নাম-নিশানহীন হয়ে গেল।

তাতারীদের হামলার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী আল্লামা ইবনুল আসীর রহমতুল্লাহি আলাইহি এই দুর্ঘটনার কথা উল্লেখ করে লিখেন:

“এই দুর্ঘটনা সমগ্র দুনিয়ার ওপর ছেয়ে গেছে তবে বিশেষ করে মুসলমানদের ওপর। যদি কেউ এই দাবি করে যে, হযরত আদম আলাইহিস সালাম-এর যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত এমন বিপদ নাজিল হয়নি, তবে সে অবশ্যই সত্যবাদী হবে। কারণ ইতিহাসে এই ঘটনার কাছাকাছি এমনকি এর দশভাগের একভাগও পাওয়া যায় না। বড় বড় দুর্ঘটনার বর্ণনায় ঐতিহাসিকগণ যে মহানতম দুর্ঘটনার কথা উল্লেখ করেন তা হলো বাইতুল মুকাদাসে বুখতে নাসরের হাতে বনী ইসরাঈলের গণহত্যা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাইতুল মুকাদাস সেই শহরগুলোর তুলনায় কিছুই নয় যেগুলোকে এই দুর্ভাগা তাতারীরা ধ্বংস ও বরবাদ করেছে, এই শহরগুলোর প্রত্যেকটি বাইতুল মুকাদাস...”

[১] মিরকাতুল মাফাতিহ ফি শারহি মিশকাতিল মাসাবিহ: ৮/৩৩০৮, ত. দারুল ফিকর বৈরুত

[২] শারহুন নববী আলা সহিহ মুসলিম: ১৮/৩৭, ৩৮, ত. দারুল ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবি

[৩] উমদাতুল কারী শারহ সহিহিল বুখারী: ১৩/২০১, কিতাবুল জিহাদ, বাবু কিতালিত তুর্ক, ত. দারুল ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবি

চেয়ে বহুগুণ বড়, একইভাবে বনী ইসরাঈলের নিহতদের সংখ্যার সাথে তাতারীদের হাতে নিহত ব্যক্তিদের সংখ্যার কোনো তুলনাই হয় না। কারণ এই শহরগুলোর মধ্যে মাত্র একটি শহরের অধিবাসীদের সংখ্যাও বনী ইসরাঈলের সমস্ত নিহতদের চেয়ে বেশি। সম্ভবত বিশ্ববাসী এই জগত ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত এর মতো আর কোনো দুর্ঘটনা দেখবে না, ইয়াজুজ-মাজুজের ধ্বংসলীলা ব্যতীত। (যা এর চেয়েও ভয়াবহ হবে)।

দাজ্জালের আবির্ভাবের কথা বলতে গেলে, সে তো ঐসব লোকদের জীবিত ছেড়ে দেবে যারা তার অনুসারী হবে এবং শুধুমাত্র বিরোধীদের হত্যা করবে। কিন্তু এই তাতারীরা তো কাউকে জীবিত ছাড়েনি, বরং নারী, পুরুষ, শিশু সবাইকে হত্যা করেছে। এমনকি তারা গর্ভবতী নারীদের পেট চিরে শিশুদের বের করে যবেহ করেছে।

ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজিম।

এটি এমন এক বিশাল ফিতনা যার স্ফুলিঙ্গ চারদিকে উড়ছে এবং এর ফাসাদ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। এটি শহরগুলোর ওপর দিয়ে এমন মেঘের মতো বয়ে গেছে যাকে প্রচণ্ড ঝড় তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। [১]

বিখ্যাত ভূগোলবিদ, ঐতিহাসিক ও পর্যটক ইয়াকুত হামাভী (মৃত্যু ৬২৬ হিজরি), যিনি এই আক্রমণের সময় খওয়ারেজম সাম্রাজ্যের ‘মার্ত’ শহরে ছিলেন, তিনি একটি পত্রে এই বিয়োগান্তক ঘটনার ওপর নিজের শোক ও অস্থিরতা প্রকাশ করে লিখছেন:

“এই শহরগুলোতে কাফির ও আল্লাহকে অস্বীকারকারীরা ঢুকে পড়েছে, এই পর্দানশীনদের ওপর পথভ্রষ্ট ও শত্রুদের হুকুম জারি হয়েছে। সেই প্রাসাদগুলো ভুল অক্ষরের মতো মুছে গেছে, এখন সেই স্বদেশ কেবল মানুষের লাশ আর কাকদের আস্তানায় পরিণত হয়েছে। সেখানে শুধু পেঁচার ডাক শোনা যাচ্ছে। এই দেশগুলোর সীমানায় লু-হাওয়ার ঘূর্ণি বইছে। অন্যের মন ভালো করতে যাওয়া ব্যক্তি সেখানে গিয়ে নিজেই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। ধ্বংস ও বরবাদির এই দুর্ঘটনায় সম্ভবত ইবলিসও শোকগাথা পাঠ করবে।” [২]

এই দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বুখারার এক ব্যক্তি প্রাণ বাঁচিয়ে খোরাসানে পৌঁছান। লোকেরা তার কাছে তাতারীদের লুটতরাজ ও ধ্বংসযজ্ঞের অবস্থা জানতে চাইলে তিনি বলেন:

“আমদান ওয়া কানদান ওয়া সোখতান ওয়া কুশতান ওয়া বুরদান ওয়া রাফতান”

(তারা এল, খুঁড়ে ফেলল, পুড়িয়ে দিল, গণহত্যা চালাল, লুট করল এবং চলে গেল।) [৩]

এই বাক্যটি, যাতে তাতারীদের সন্ত্রাস ও ধ্বংসলীলার পুরো কাহিনী লুকিয়ে আছে, প্রবাদের মতো বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিল।

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: সন ৬১৭ হিজরি।

[২] মুজাম্মুল উদাবা লিল হামাভী: ১/ ৩৩-৩৫, প্রাচীন পাণ্ডুলিপি — নোট: এই উদ্ধৃতিটি মুজাম্মুল উদাবার সেই প্রাচীন পাণ্ডুলিপি থেকে নেওয়া হয়েছে যা “জামিয়া মা’হাদুল খলীল আল-ইসলামী করাচি”-র কুতুবখানায় বিদ্যমান। কিছু আধুনিক সংস্করণে এই বক্তব্যটি নেই।

[৩] তারিখ-ই-জাহানগুশা জুওয়াইনি, পৃ. ১৮৯, হার্মিস সংস্করণ; তারিখ-ই-গুজিদাহ, হামদুল্লাহ মুস্তাওফি, পৃ. ৫৮২, ইন্তিশারাত-ই-আমীর কবীর, ইরান। শব্দগুলো জুওয়াইনির।

খাওয়ারিজম সাম্রাজ্য

বর্তমান উজবেকিস্তান প্রজাতন্ত্রের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আমু নদীর কাছে ‘উরগঞ্জ’ নামে একটি শহর রয়েছে। কয়েক শতাব্দী আগে এই শহরটি ‘জুরজানিয়া’ বা ‘উরগঞ্জ’ নামে পরিচিত ছিল। এটি একটি রাজ্যের রাজধানী ছিল যা ইসলামের ইতিহাসে খাওয়ারিজম নামে স্মরণ করা হয়। খাওয়ারিজম অঞ্চলটি সেই সময় থেকে একটি পৃথক রাজ্য হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে যখন পারস্য সম্রাট বাহরাম গুরের এক আত্মীয় এটি দখল করেছিলেন। প্রাচীনকাল থেকেই খাওয়ারিজমের প্রত্যেক শাসককে ‘খাওয়ারিজম শাহ’ বলা হতো। ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী, কায় খসরু ছিলেন প্রথম বাদশাহ যিনি মহাবীর আলেকজান্ডারের আক্রমণের ৯৮০ বছর আগে এই রাজ্যের শাসককে ‘খাওয়ারিজম শাহ’ উপাধি দিয়েছিলেন। প্রাচীনকালে খাওয়ারিজম রাজ্যের দুটি রাজধানী ছিল: একটি ছিল জাইহুন নদীর পূর্ব তীরে যাকে ‘কাথ’ বলা হতো এবং দ্বিতীয়টি ছিল পশ্চিম তীরে যাকে ‘জুরজানিয়া’, ‘গুরগঞ্জ’ বা ‘উরগঞ্জ’ বলা হতো। উরগঞ্জ ছাড়াও খিভা এবং হাজার আস্প-ও এই রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ শহর হিসেবে গণ্য হতো।

উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের শাসনামলে গাজিয়ে ইসলাম কুতাইবা বিন মুসলিম ৯৩ হিজরিতে (৭১৩ খ্রিষ্টাব্দ) এই রাজ্য জয় করে ইসলামী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এই অঞ্চলটি ইসলামের খলিফাদের অধীনে ছিল। যখন খিলাফতের প্রভাব-প্রতিপত্তি হ্রাস পায়, তখন অন্যান্য অনেক সরকারের মতো এখানেও মুসলিম বাদশাহদের স্বায়ত্তশাসিত শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলামী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর ইতিহাসে খাওয়ারিজম ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। ইসলামের কতই না প্রখ্যাত ফকিহ, মুহাদ্দিস, বুদ্ধিজীবী এবং বাদশাহ এই মাটি থেকে উঠে এসেছেন এবং বিশ্বে সূর্য ও চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল হয়েছেন। এই অঞ্চলটি ইলম ও হিকমত, তাজকিয়া ও মারেফাত, তাহজিব ও তামাদুন এবং শিল্প ও কারুশিল্পের কেন্দ্রে পরিণত হয়। [১]

খাওয়ারিজম শাহী শাসকগণ:

সময়ের আবর্তনের সাথে সাথে খাওয়ারিজমের সিংহাসনে একের পর এক বিভিন্ন শাসক অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তবে তারা সবাই ইসলামী খিলাফতের অধীনে একজন প্রাদেশিক গভর্নরের মর্যাদায় ছিলেন। তবে দীর্ঘ সময় পর যখন আব্বাসীয় খলিফাদের শৌর্য-বীর্য লান হতে শুরু করে, তখন এখানকার শাসকরা খিলাফতের আনুগত্য থেকে মুক্ত হয়ে যান। এই স্বায়ত্তশাসিত শাসকদের প্রথম পর্যায় ৩৪০ হিজরি (৯৫১ খ্রিষ্টাব্দ) থেকে আবু সাঈদ আহমদ খাওয়ারিজম শাহ থেকে শুরু করে ৪০৮ হিজরি (১০১৭ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত আবুল হারিস খাওয়ারিজম শাহ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। দ্বিতীয় পর্যায় ৪০৮ হিজরিতে (১০১৭ খ্রিষ্টাব্দ) আলতুন তাশ খাওয়ারিজম শাহ থেকে শুরু হয়ে ৪৩৯ হিজরিতে (১০৪৭ খ্রিষ্টাব্দ) ‘শাহ মালিক খাওয়ারিজম শাহ’-এর মাধ্যমে শেষ হয়। [২] এরপর তৃতীয় পর্যায়ে এই অঞ্চলের ক্ষমতার চাবিকাঠি সেই বংশের হাতে আসে যার সূচনা হয়েছিল ‘আনুশতেগিন খাওয়ারিজম শাহ’ থেকে এবং সমাপ্তি ঘটে ‘সুলতান জালালুদ্দিন মানকুবানি খাওয়ারিজম শাহ’-এর মাধ্যমে।

[১] রওজাতুস সাফা, লেখক: মীর খোয়ান্দ (মৃত্যু ৯০৩ হিজরি): ৩ / ১৯৯ থেকে ২০১, নওল কিশোর সংস্করণ।

[২] তারিখ-ই-বাইহাকি, লেখক: মুহাম্মদ বিন হুসাইন বাইহাকি (মৃত্যু ৪৭০ হিজরি), পৃষ্ঠা ৪৩৫ থেকে ৪৪৫, ফেরদৌস বিশ্ববিদ্যালয় মশহাদ সংস্করণ।

আনুশতগীন ও তাঁর বংশধর:

তৃতীয় যুগের খোয়ারিজমীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা আনুশতগীন ছিলেন জর্জিয়ার উইঘুর গোত্রের একজন তুর্কি গোলাম। তিনি তাঁর মনিব সুলতান মালিক শাহ সেলজুকির এতই আস্থাভাজন ছিলেন যে, সুলতান তাঁকে এক হাজার সৈন্যের অফিসার নিযুক্ত করেছিলেন। ৪৭৫ হিজরি (১০৮২ খ্রিষ্টাব্দ) সালে মালিক শাহের আদেশে আনুশতগীন খোয়ারিজম প্রদেশের প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত হন এবং শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এই দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পালন করেন। আনুশতগীনের জীবদশাতেই তাঁর পুত্র মুহাম্মদ ওরফে কুতুবুদ্দিন পিতার প্রতিনিধি হিসেবে খোয়ারিজমের শাসনকার্য পরিচালনা করছিলেন। ৪৯০ হিজরিতে পিতার মৃত্যুর পর তিনি অত্যন্ত সুচারুভাবে রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেন এবং তাঁর নতুন মনিব তৎকালীন সুলতান শাহ সাঞ্জর বিন মালিক শাহ সেলজুকির প্রতি কায়মনোবাক্যে অনুগত থাকেন।

৫২২ হিজরি (১১২৮ খ্রিষ্টাব্দ) সালে মুহাম্মদ কুতুবুদ্দিন মৃত্যুবরণ করেন এবং খোয়ারিজম শাহী সিংহাসন ও মুকুট তাঁর পুত্র মুজাফফরুদ্দিন আতসিজ-এর হাতে তুলে দেন। এই যুবক ক্ষমতায় এসে সেলজুকি সাম্রাজ্যের পতনের সুযোগ গ্রহণ করেন এবং ৫৩৮ হিজরিতে খোয়ারিজম শাহী রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

২৯ বছর শাসনের পর ৫৫১ হিজরি (১১৫৬ খ্রিষ্টাব্দ) সালে মুজাফফরুদ্দিন আতসিজ পৃথিবী থেকে বিদায় নেন এবং তাঁর পুত্র আবুল ফাতহ ইল আরসালান তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ইল আরসালানের সাত বছরের শাসনকালে খোয়ারিজম সাম্রাজ্যের কোনো উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ ঘটেনি। তিনি ৫৫৮ হিজরি (১১৬৩ খ্রিষ্টাব্দ) সালে পরলোকগমন করেন। [১]

আলাউদ্দিন তেকিশ: ৫৮৯ হিজরি থেকে ৫৯৬ হিজরি (১১৯৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ)

ইল আরসালানের মৃত্যুর সাথে সাথেই তাঁর উত্তরাধিকারী আলাউদ্দিন তেকিশ এবং অপর পুত্র সুলতান শাহের মধ্যে ক্ষমতার জন্য রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয়, যা বিরতি দিয়ে দিয়ে বিশ বছর পর্যন্ত চলতে থাকে এবং অবশেষে ৫৮৯ হিজরিতে সুলতান শাহের স্বাভাবিক মৃত্যু ও আলাউদ্দিন তেকিশের বিজয়ের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। সুলতান তেকিশ খোয়ারিজম রাজ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেই রাষ্ট্রের সীমানা বৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দেন। সেই সময় সেলজুকি সাম্রাজ্য সংকুচিত হয়ে বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। ইরাকে তুঘরিল সানি ছিলেন সেলজুকি ক্ষমতার শেষ প্রতিনিধি। তেকিশ তাঁর এলাকা দখল করে নেন। রে এবং হামাদানের মতো গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোও তাঁর অধিকারে চলে আসে এবং খোয়ারিজম সাম্রাজ্যের সীমানা বাগদাদের সীমানা পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

এখান থেকেই খোয়ারিজম শাহী এবং আব্বাসীয় খিলাফতের মধ্যে সেই দ্বন্দ্ব শুরু হয় যা আর কখনো শেষ হয়নি। আব্বাসীয় খলিফা নাসির খোয়ারিজম শাহের কাছে দাবি করেন যে, ইরাকের কিছু জেলা বাগদাদ খিলাফতের অধীনে দিয়ে দেওয়া হোক। তেকিশ তা মেনে নেননি। উভয় রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ক দিন দিন তিক্ত হতে থাকে। ৫৯২ হিজরি (১১৯৬ খ্রিষ্টাব্দ) সালে হামাদান নামক স্থানে খোয়ারিজমীয় এবং খিলাফতের বাহিনীর মধ্যে এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যাতে বাগদাদের বাহিনী পরাজিত হয়ে পিছু হটতে বাধ্য হয়। [২]

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৭/৪৭৫ থেকে ৫৫৮ হিজরি; তারিখ ইবনে খালদুন: ৫/১০৬ থেকে ১১২; আত-তারিখুস সিয়াসি লিদ-দাওলাতিল খোয়ারিজমিয়া, ড. আফাফ সাইয়েদ সাবরা, পৃষ্ঠা ৩৬ থেকে ৯৫, দারুল কিতাব আল-জামি কায়রো।

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: বছর ৫৫৮ হিজরি থেকে ৫৯২ হিজরি।

সুলতান তাকাশ ২৬ বছর শাসন করার পর ১৯ রমজান ৫৯৬ হিজরি (৩ জুলাই ১২০০ খ্রিস্টাব্দ) দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। হাফেজ ইবনে কাসির রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর সম্পর্কে বলেন:

“তিনি ন্যায়পরায়ণ ও সচ্চরিত্রবান ছিলেন। মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করতেন। ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহির মাযহাবের আলেম এবং দ্বীনের উসুল সম্পর্কে খুব ভালো জানতেন। তিনি খাওয়ারিজমে আহনাফদের জন্য একটি বিশাল মাদ্রাসা নির্মাণ করিয়েছিলেন। এই মাদ্রাসার মাটিতেই তাঁকে দাফন করা হয়।” [১]

আলাউদ্দিন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহ: ৫৯৬ হিজরি থেকে ৬১৮ হিজরি (১২০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২২১ খ্রিস্টাব্দ)

সুলতান তাকাশের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারী কুতুবুদ্দিন মুহাম্মদ তাঁর পিতার উপাধি গ্রহণ করে আলাউদ্দিন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহ নামে সিংহাসনে আরোহণ করেন। যেহেতু তাঁর আসল নাম ছিল কেবল মুহাম্মদ, তাই ঐতিহাসিকগণ কখনো কখনো তাঁকে মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহ নামেও স্মরণ করেন। তিনি তাঁর সময়ের সবচেয়ে বড় মুসলিম বাদশাহ ছিলেন। তিনি কয়েক বছরের মধ্যে ডজনখানেক ছোট ছোট মুসলিম রাষ্ট্রকে নিজের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে খাওয়ারিজমকে মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্যে পরিণত করেন, যা পুরো তুর্কিস্তান ও খোরাসান জুড়ে বিস্তৃত ছিল। বর্তমান উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, আফগানিস্তান এবং ইরান তাঁর প্রদেশ ছিল। পূর্ব-পশ্চিমে এটি পামির পর্বতমালা থেকে ইরাক পর্যন্ত এবং উত্তর-দক্ষিণে আরাল সাগর থেকে সিন্ধু নদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সাম্রাজ্যের শহরগুলো কেবল মুসলিম বিশ্বের নয় বরং সারা বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্য শহর ছিল। এগুলো ছিল তাহজিব-তামাদুন (সংস্কৃতি) এবং ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র। জনসংখ্যার দিক থেকে এগুলো বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল অঞ্চল হিসেবে গণ্য হতো। বুখারা, উরগঞ্জ, সমরকন্দ, নিশাপুর এবং হেরাতের কোনোটির জনসংখ্যাই লাখের কম ছিল না। ইয়াকুত হামাভি, যাঁর সারা জীবন পৃথিবীতে অতিবাহিত হয়েছে, তিনি লিখেছেন:

“আমি খাওয়ারিজমের চেয়ে বেশি মহান, সুন্দর এবং সম্পদশালী স্থান কোথাও দেখিনি।” [২]

এতগুলো বিজিত দেশের অমূল্য ধনভাণ্ডার, তাদের সবুজ বাগান ও শস্যক্ষেতের ফলন, দৈনন্দিন যুদ্ধ ও বিজয়ের ফলে অর্জিত সম্পদ—এই সব গনিমত টেনে টেনে খাওয়ারিজমে জমা করা হচ্ছিল। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দক্ষ ও কারিগর পেশার মানুষ দলে দলে খাওয়ারিজমে আসছিল। এখানে এসে তাদের কারুকার্যের প্রতিভা সঠিক অর্থে বিকশিত হতো। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট জিনিসপত্রে তাদের সূক্ষ্মতা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা খাওয়ারিজমি সমাজব্যবস্থাকে আকাশের উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিল।

এখানে অস্ত্র নির্মাণের নতুন নতুন পদ্ধতি প্রকাশ পাচ্ছিল। খাওয়ারিজমি অস্ত্র নির্মাতারা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এমন নমনীয় তলোয়ার তৈরি করত যা বাঁকিয়ে দ্বিগুণ করা যেত। হালকা শিকলযুক্ত বর্ম তৈরি করা হতো যা পরিধান করে শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নড়াচড়া খুব সহজে করা যেত। মজবুত ইস্পাতের শিরস্ত্রাণ তৈরি করা হতো যা হালকা হওয়া সত্ত্বেও তলোয়ার ও বর্শার মারাত্মক আঘাত অনায়াসেই সহ্য করে নিত। ঢালের ওপর নকশা করার জন্য সোনা ও রূপার

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: বছর ৫৯৬ হিজরি

[২] মুজামুল বুলদান: খাওয়ারিজম অধ্যায়

কাজ হতো। ষষ্ঠ হিজরি শতাব্দীতে সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে অগ্নিবাণ এবং নাফত-এর ব্যবহার অত্যন্ত সফলতার সাথে করেছিলেন। খوارজমি কারিগররা একে কয়েক ধাপ উন্নত করে আরও কার্যকর করে তুলেছিলেন।

প্রায় সমস্ত শহরের প্রতিরক্ষার জন্য পাথুরে প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছিল। অধিক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে অবস্থিত শহরগুলোর চারপাশে দুটি করে প্রাচীরও বিদ্যমান ছিল। সাধারণত শহরের প্রাচীরের পরিধি কয়েক মাইল হতো। শহরের মধ্যবর্তী অংশে একটি কেলাস থাকা বাধ্যতামূলক ছিল যা সাধারণত কোনো উঁচু টিলা বা পাহাড়ের ওপর নির্মাণ করা হতো। শহরের প্রাচীর বিজিত হওয়ার পর কেলাসটি শেষ প্রতিরক্ষা দুর্গ হিসেবে প্রমাণিত হতো। শহরের প্রাচীরগুলোতে বিভিন্ন দিকে বেশ কয়েকটি দরজা খুলত এবং এগুলো মজবুত লোহা দিয়ে তৈরি করা হতো।

আলাউদ্দিন মুহাম্মদ কেলাস এবং প্রাচীর নির্মাণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন, যার ফলে তাঁর শাসনাধীন এলাকাগুলোর প্রতিরক্ষা অত্যন্ত সুদৃঢ় হয়ে গিয়েছিল এবং তাঁর সালতানাতের শহরগুলো এই সক্ষমতা অর্জন করেছিল যে, কয়েক মাস পর্যন্ত বড় থেকে বড় শত্রুকেও প্রাচীরের ভেতরে প্রবেশ করতে দিত না। এর পাশাপাশি আলাউদ্দিন মুহাম্মদ সমস্ত কেলাসে খাদ্য, অস্ত্র এবং সব ধরনের রসদ সামগ্রীর বিশাল ভাণ্ডার জমা করে রেখেছিলেন যা প্রতিটি কঠিন সময়ে কাজে আসত। খারজম-এর সালতানাতের আসল প্রতিরক্ষা শিকল ছিল সিহন নদী এবং জিহন নদীর তীরে তীরে বিস্তৃত বড় বড় প্রাচীরবেষ্টিত শহরগুলোর দুটি সারি। বিনাকাত, তামখন্দ, জান্দ, উত্তার এবং কোকান্দ সিহন নদীর তীরে এবং সমরকন্দ, বুখারা, উরগঞ্জ, বলখ এবং তিরমিজ জিহন নদীর তীরে এমন দুটি দীর্ঘ মজবুত প্রতিরক্ষা রেখা তৈরি করেছিল যা ভেদ করা পূর্ব ও পশ্চিমের আক্রমণকারীদের জন্য সব দিক থেকে অত্যন্ত কঠিন ছিল। অবরোধের ক্ষেত্রে এগুলোর মধ্য থেকে যেকোনো শহর তাৎক্ষণিকভাবে অন্য শহরগুলো থেকে সাহায্য লাভ করতে পারত। [১]

বাহ্যিক উপায় ও উপকরণের দিক থেকে দেখা গেলে সপ্তম হিজরি শতাব্দীর শুরুতে খারজম-এর সামরিক শক্তি ইসলামি বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং যুদ্ধজয়ী শক্তি ছিল, যা সম্প্রতি তুর্কানে খাতা সহ তাদের সমস্ত বিরোধীদের দমন করেছিল এবং কোনো বহিঃশত্রুর কাছে পরাজিত হওয়ার সম্ভাবনা এই সামরিক শক্তির জন্য খুব কম ছিল।

আরব ঐতিহাসিকগণ তাঁদের ইতিহাসে আলাউদ্দিন মুহাম্মদের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ভালো শব্দে উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর পিতার মতো ফিকহ হানাফি-র অনুসারী, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত-এর অনুসারী, বিশুদ্ধ আকিদাসম্পন্ন এবং ধর্মপ্রাণ ছিলেন। আত্মমর্যাদা ও সাহসিকতারও তাঁর মধ্যে কোনো কমতি ছিল না। তাঁর মহত্বের সাক্ষ্য একজন পশ্চিমা ঐতিহাসিকের জবানিতে শুনুন। হ্যারল্ড ল্যাম্ব লিখেছেন:

“ইসলামি বিশ্বের হৃদয়ে সেই সময় আলাউদ্দিন মুহাম্মদ খারজম-এর শাহ আমির-ই-জং হিসেবে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর সালতানাত হিন্দুস্তান থেকে বাগদাদ পর্যন্ত, খারজম-এর সাগর (আরল সাগর) থেকে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেলজুকি তুর্কিরা যারা ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করেছিল এবং মিশরের মামলুক সুলতানগণ যারা দিন দিন উন্নতির পথে ছিল, তারা ব্যতীত বাকি সমস্ত ইসলামি সালতানাতের ওপর মুহাম্মদ খারজম-এর শাহ পুরোপুরি আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। সুলতান মুহাম্মদই মর্যাদায় শাহেনশাহ ছিলেন। আব্বাসীয় খলিফা নাসির তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট ছিলেন, কিন্তু তাঁর শক্তিকে স্বীকার করতেন।” [২]

[১] তারিখ-ই-খারজম-এর শাহী, গোলাম রব্বানী আজিজ, পৃষ্ঠা ৩৪৩ থেকে ৩৫৫।

[২] চেন্সি খান, হ্যারল্ড ল্যাম্ব (উর্দু অনুবাদ: আজিজ আহমদ), পৃষ্ঠা ৭২।

ঐতিহাসিক আবুল ফিদা বলেন:

“খাওয়ারিজম শাহের দরবার সারা বিশ্বের রাজপরিবারগুলোর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গে পরিপূর্ণ থাকত। তাঁর পার্শ্বচর, পাত্রবাহক, অস্ত্রবাহক ও রেকাবধারী—সবাই বিভিন্ন রাজপরিবারের সদস্য ছিলেন এবং তাঁর দস্তুরখান ছিল অত্যন্ত বিশাল ও প্রশস্ত।” [১]

শিহাব উদ্দিন আন-নাসায়ী বর্ণনা করেন:

“তিনি পূর্ববর্তী রাজাদের আমল থেকে চলে আসা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময় নাকাড়া (দামামা) বাজানোর প্রথা নিজের প্রাসাদ থেকে বিলুপ্ত করে সেই শাহজাদাদের জন্য চালু করে দেন, যারা তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে বিভিন্ন প্রদেশে শাসন করছিলেন, যাতে তাঁদের প্রাসাদে এই প্রথা চালু থাকে। নিজের জন্য তিনি ‘নওবতে সিকান্দারি’ প্রবর্তন করেন, যা সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় বাজানো হতো। এগুলো ছিল স্বর্ণনির্মিত সাতাশটি বিশাল নাকাড়া। সেগুলোতে দুর্লভ মণি-মুক্তা খচিত ছিল। এই প্রথা সূচনার দিন সাতাশজন রাজা বা সুলতানদের সন্তানদের (অর্থাৎ রাজপরিবারের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ) একত্রিত করে এই নাকাড়াগুলো বাজানো হয়েছিল যাতে এর ব্যাপক প্রচার হয়। তাঁদের মধ্যে তুঘরিল বিন আরসালান সেলজুকি, সুলতান গিয়াস উদ্দিন ঘুরির বংশধর, বামিয়ানের শাসক মালিক আলাউদ্দিন শাহ, বলখের শাসক মালিক তাজউদ্দিন, তাঁর পুত্র তিরমিজের শাসক মালিক আজম এবং বুখারার শাসক মালিক সাঞ্জারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।” [২]

তাঁর সেনাবাহিনী ও শিবিরের দৃশ্য অত্যন্ত শান-শওকতের পরিচায়ক হতো, কিন্তু তিনি নিজে অত্যন্ত সাধারণ জীবনযাপন করতেন। সোহরাওয়ার্দিয়া তরীকার প্রতিষ্ঠাতা হযরত শেখ শিহাব উদ্দিন সোহরাওয়ার্দি (রহ.) তাঁর সাথে সাক্ষাতের কথা উল্লেখ করে বলেন:

“তিনি একটি সাধারণ সিংহাসনে বসে ছিলেন, বুখারার তৈরি একটি জামা পরিহিত ছিলেন যার মূল্য পাঁচ দিরহামের বেশি ছিল না, প্রতিটি জিনিসের ওপর একটি করে কাপড় ঢাকা ছিল যার মূল্য সম্ভবত এক দিরহাম হবে।” [৩]

আল্লামা ইবনুল আসীর (রহ.) সুলতান মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহের জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

“তিনি একজন বিজ্ঞ ও গুণী মানুষ ছিলেন। ফিকহ, উসূলে ফিকহ এবং অন্যান্য শাস্ত্রে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি উলামায়ে কেরামকে সম্মান করতেন। তাঁদের সাথে ভালোবাসা ও অনুগ্রহের আচরণ করতেন। তিনি তাঁদের মজলিস অধিক পরিমাণে আয়োজন করতেন এবং তাঁদের ইলমি আলোচনায় উপস্থিত থাকতেন। তিনি ক্লাস্তি ও নিরবচ্ছিন্ন সফরের অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। তিনি ভোগ-বিলাস থেকে বিরত থাকতেন। ইন্দ্রিয়সুখ থেকে দূরে থাকতেন। তাঁর চিন্তা রাজ্যের ব্যবস্থাপনা, এর তদারকি এবং প্রজাদের নিরাপত্তার সাথে জড়িত ছিল। তিনি দীনদারদের অত্যন্ত সম্মান করতেন, তাঁদের প্রতি মনোযোগী থাকতেন এবং তাঁদের বরকত হাসিলের জন্য উন্মুখ থাকতেন।” [৪]

[১] আল-মুখতাসার ফি তারিখিল বাশার লি-আবুল ফিদা (মৃ. ৭৩২ হি.): ৩/১৩৯, ত. আল-মাতবাতুল হসাইনিয়া, মিসর।

[২] সিরাতে সুলতান জালাল উদ্দিন মানকুবিরনি, শিহাব উদ্দিন মুহাম্মদ বিন আহমদ আন-নাসায়ী, পৃ. ১৩১, ত. দারুল ফিকরিল আরবি, মিসর, ১৯৫৩ খ্রি।

[৩] তারিখুল ইসলাম লিয-যাহাবি: সন ৬৩১ হি।

[৪] আল-কামিল ফিত তারিখ লি-ইবনুল আসীর: সন ৬১৬ হি।

মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) লিখছেন:

“আরব ঐতিহাসিকগণ আলাউদ্দিন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহের চরিত্র ও নৈতিকতার কোনো বড় দুর্বলতা বা উল্লেখযোগ্য কোনো দোষের দিকে ইঙ্গিত করেন না; বরং সাধারণত তাঁর দ্বীনদারি, বিশুদ্ধ বিশ্বাস এবং সাহসিকতা ও দৃঢ়তার স্বীকৃতি দেন। কিন্তু এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তাঁর সমস্ত যোগ্যতা ও শক্তি সেই ছোট-বড় ইসলামী সালতানাতগুলোকে ধ্বংস করার পেছনে ব্যয় হয়েছিল যা এই বিশাল ও পূর্ব অংশে অবস্থিত ছিল। একদিকে উত্তর ও পশ্চিমে তিনি সেলজুকদের তাদের শেষ সীমানা পর্যন্ত পিছু হটতে বাধ্য করেছিলেন। অন্যদিকে পূর্ব ও দক্ষিণে তিনি সর্বদা ঘুরিদের সাথে যুদ্ধরত ছিলেন এবং তাদেরকেও একটি সীমিত অংশে অবরুদ্ধ হতে বাধ্য করেছিলেন। ইরান ও তুর্কিস্তানের সমরকুশলীদের সেরা অংশটি এই অন্তহীন যুদ্ধবিগ্রহে অংশ নেওয়ার কারণে ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। এই উর্বর ও জনবহুল দেশগুলোর শহর ও জনপদগুলোর পরিবেশ ও মনস্তত্ত্বে যুদ্ধ সর্বদা আচ্ছন্ন হয়ে থাকত।” [১]

এই পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে আলাউদ্দিন খাওয়ারিজম শাহের পক্ষ থেকে আরও কিছু গুরুতর ভুল সংঘটিত হয়, যার অশুভ প্রভাবে তাঁর সমস্ত কীর্তি ধূলিসাৎ হয়ে যায় এবং মুসলিম বিশ্ব পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত ছাইয়ের স্তুপে পরিণত হয়।

তাতার আক্রমণের সময় মুসলিম বিশ্বের অবস্থা:

সপ্তম হিজরি শতাব্দীর এই শোকাবহ দুর্ঘটনার পূর্বে মুসলিম বিশ্বের অবস্থা ছিল একজন মুমূর্ষু রোগীর মতো, যাকে বিভিন্ন ধরনের প্রাণঘাতী রোগ শয্যাশায়ী করে ফেলেছে। ষষ্ঠ হিজরি শতাব্দীর শেষে ইসলামী বিশ্ব চরম বিশৃঙ্খলা ও বিকেন্দ্রীকরণের শিকার ছিল। প্রতিটি প্রদেশে একজন করে স্বাধীন শাসক আসীন ছিলেন। এমনকি খোদ বাগদাদ খিলাফতের প্রভাবের পরিধিও বাগদাদের সীমানার বাইরে ছিল না। খলিফা নাসের, যিনি পারিবারিক উত্তরাধিকার সূত্রে খিলাফতের পদ লাভ করেছিলেন, তাঁর ভ্রাতৃ বিশ্বাস, বিদ্রোহপরায়ণতা, গোঁড়ামি ও সংকীর্ণমনা হওয়ার কারণে একজন সাধারণ শাসক হওয়ার যোগ্যও ছিলেন না। মুসলমানদের ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলো প্রতিদিন একে অপরের মুখোমুখি হয়ে রক্তের নদী বইয়ে দিচ্ছিল। খোদাভীতি ও পরকালমুখিতা অন্তর থেকে বিদায় নিচ্ছিল। দুনিয়াপ্ৰীতি ও মৃত্যুকে অপছন্দ করার ব্যাধি মহামারীর রূপ ধারণ করেছিল। জ্ঞানতাত্ত্বিক উৎকর্ষ তুঙ্গে থাকলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে স্থবিরতা বিরাজ করছিল। সাধারণ মানুষ ও শাসকগোষ্ঠী সবাই জিহাদের আবশ্যিক বিধানকে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে ফেলেছিল। গুটিকয়েক পবিত্র আত্মা ছাড়া আল্লাহর পথে দাওয়াতের কাজ গ্রহণকারী ব্যক্তিদের খুঁজে পাওয়া যেত না। বাতিল ফেরকাগুলোর দাপট সর্বত্র বিরাজমান ছিল। পাপ ও গর্হিত কাজ সাধারণ হয়ে গিয়েছিল। আল্লামা মাকরিজি (রহ.) মিশরের ব্যাপারে—যাকে মুসলিম বিশ্বের তরবারি চালনাকারী বাহু হিসেবে গণ্য করা হতো—লিখছেন যে, সেখানে মজুসিদের উৎসব ‘নওরোজ’ ব্যাপকভাবে পালিত হতো। মানুষ নীল নদের তীরে প্রকাশ্যে অশ্লীলতা ও গর্হিত কাজে লিপ্ত হতো এবং তাদের বাধা দেওয়ার মতো কেউ ছিল না। [২]

[১] তারিখ দাওয়াত ওয়া আজিমত: ১/৩১২

[২] আস-সুলুক লি-মারিফতি দুওয়ালিল মুলুক: ১/২৩৭

এমন পরিস্থিতিতে এমন কোনো সাধারণ দুর্ঘটনার ঘটনা সুনাতুল্লাহর অবিকল অনুরূপ ছিল যা সারা বিশ্বের মুসলমানদের নাড়া দিয়ে তাদের তওবা ও ইনাবেতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে। ফলে দূরদর্শী চোখগুলো পর্যবেক্ষণ করছিল যে, এখন কোনো বড় রক্তক্ষয়ী দুর্ঘটনা ঘটতে চলেছে।

আসমানি নিদর্শনসমূহ:

খোদায়ী ইচ্ছা এই বড় দুর্ঘটনার পূর্বে মুসলমানদের জাগ্রত করার জন্য আসমানি দুর্ঘটনার এক ধারাবাহিক সিলসিলা শুরু করে দিয়েছিল। ৫৯২ হিজরিতে ইরাকে এবং পরবর্তী বছর সিরিয়া ও মিশরে অত্যন্ত ভয়াবহ কালো ঝড় আসে। তুফানি হাওয়া এমন ধ্বংসলীলা চালায় যে, একজন প্রত্যক্ষদর্শী কাজী ফাজেল রহ.-এর ভাষ্যমতে, ‘মনে হচ্ছিল জাহান্নামের একটি উপত্যকা প্রবাহিত হচ্ছে।’ এই তুফানে জাহাজগুলো ডুবে যায়, গাছপালা উপড়ে যায়, ঘরবাড়ি ধসে পড়ে এবং হাজার হাজার মানুষ মারা যায়।

৫৯৭ হিজরিতে মিশরে নীল নদ শুকিয়ে যায়, এমন দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় যে মানুষ মরতে শুরু করে। মৃত্যুর আধিক্যের কারণে মৃতদের কাফন দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। মিশরের বাদশাহ আল-মালিকুল আদিল দুর্ভিক্ষের এক মাসে দুই লক্ষ বিশ হাজার ব্যক্তির কাফন-দাফনের ব্যবস্থা নিজ খরচে করেন। খাদ্য দুস্প্রাপ্য হওয়ার কারণে কুকুর ও মৃত প্রাণী খাওয়ার উপক্রম হয়, এমনকি মানুষ মানুষের লাশ ছিঁড়ে খেতে বাধ্য হয়। একই বছর সিরিয়া, এশিয়া মাইনর এবং ইরাকে ভয়াবহ ভূমিকম্পে লক্ষ লক্ষ মানুষ নিহত হয়, শুধু নাবলুস শহরেই ত্রিশ হাজার মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। ওদিকে হিজাজ ও ইয়ামেনের মধ্যবর্তী এলাকায় মহামারি ছড়িয়ে পড়ে। আঠারোটি জনপদে একজন ব্যক্তিও জীবিত থাকেনি। আবদুল্লাহ বিন হামজার বারো হাজার অশ্বারোহী এবং অসংখ্য পদাতিক সৈন্যের ওপর আসমানি বিজলি পড়ে, অধিকাংশ নিহত হয়। খোরাসান, সিরিয়া, আল-জাজিরা, ইরাক, এশিয়া মাইনর এবং সাইপ্রাসে একের পর এক ভূমিকম্প আসে যাতে প্রচুর মানুষ প্রাণ হারায়।

৫৯৯ হিজরির এক রাতে আকাশ থেকে অনবরত উল্কাপাত হতে থাকে। [১]

আল্লাহর ওলিদের মুখে দুর্ঘটনার অবতরণ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী:

এই সময়ে আল্লাহর কিছু ওলির মুখ থেকে কিছু ভবিষ্যদ্বাণীও প্রকাশ পায়। শেখ নাজমুদ্দিন কুবরা রহ. খাওয়ারিজমের বিখ্যাত সুফি বুজুর্গ ছিলেন। তাঁর খলিফা শেখ মাজদুদ্দিন রহ. অত্যন্ত প্রভাবশালী ওয়াজ করতেন। এক বিশাল জনসমাবেশ তাঁর ওয়াজ শুনতে আসত। আলাউদ্দিন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহের মা তুরকান খাতুন শেখ মাজদুদ্দিন রহ.-এর ভক্ত ছিলেন এবং তাঁর ওয়াজ মাহফিলে শরিক হতেন। কোনো এক হিংসুক খাওয়ারিজম শাহের কান ভারী করল যে, আপনার মায়ের শেখ মাজদুদ্দিনের কাছে আসা-যাওয়া আশঙ্কামুক্ত নয়, সম্ভবত শেখ মাজদুদ্দিন আপনার মাকে বিয়ে করতে চান। খাওয়ারিজম শাহ তা বিশ্বাস করে বসল এবং উত্তেজিত হয়ে শেখ মাজদুদ্দিন রহ.-কে নদীতে ডুবিয়ে মারার নির্দেশ দিল। নির্দেশ অনুযায়ী শেখ রহ.-কে নদীগর্ভে নিক্ষেপ করা হলো।

কিছুক্ষণ পর যখন খাওয়ারিজম শাহের রাগ ঠান্ডা হলো, তখন সে এই কাজের জন্য অনুতপ্ত হলো। একটি থালা মণি-মুক্তায় পূর্ণ করে তার ওপর তলোয়ার...

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: সন ৬০০ হিজরি, খণ্ড ১৩, পৃষ্ঠা ২০৫।

এবং কাফন রেখে শেখ নজম উদ্দিন কুবরা রহ.-এর খানকাহে উপস্থিত হয়ে আবেদন করল:

“হয়তো রক্তপণ হিসেবে এই সম্পদ গ্রহণ করে আমার এই মহাপাপ ক্ষমা করুন অথবা এই তলোয়ার নিয়ে কিসাস হিসেবে আমার মাথা কলম করে দিন।”

শেখ নজম উদ্দিন কুবরা রহ. জালালে (ক্রোধে) এসে উত্তর দিলেন:

“كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا”

“এই বিষয়টি লওহে মাহফুজে লেখা হয়ে গেছে।”

“মজদ উদ্দিনের রক্তপণ এই সোনা-দানা ও মণি-মুক্তা নয়, বরং তার রক্তপণ হলো তোমার পুরো সালতানাত এবং স্বয়ং তোমার মাথা। শুধু তাই নয়, আমার মাথাও কলম হবে এবং আল্লাহর অসংখ্য বান্দার মাথা কলম হতে যাচ্ছে।” [১]

ইতিহাস বলে যে, তাতারী আক্রমণের দিকে ইঙ্গিতকারী এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল।

বাগদাদ খিলাফত এবং খাওয়ারিজম সালতানাতের মধ্যে উত্তেজনা:

বাগদাদ খিলাফত এবং খাওয়ারিজম সালতানাতের মধ্যকার উত্তেজনা তাতারী আক্রমণের প্রথম কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বাগদাদ ছিল আব্বাসীয় খিলাফতের কেন্দ্র, অন্যদিকে ‘খাওয়ারিজম’ ছিল মুসলিম বিশ্বের তরবারি চালনাকারী বাহু। খাওয়ারিজম এবং বাগদাদ খিলাফতের সম্পর্ক দীর্ঘকাল ধরে উত্তপ্ত ছিল এবং উভয় সরকারই একে অপরকে হেয় করার কোনো সুযোগ হাতছাড়া করত না।

এই উত্তেজনার কারণেই খলিফা নাসির খাওয়ারিজমীয় শাসক সুলতান আলাউদ্দিন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহকে হত্যা করার জন্য হাসান বিন সাব্বাহর কুখ্যাত ফেদাইনদের সহযোগিতা গ্রহণ করেছিলেন। ফেদাইন খঞ্জরধারীরা খাওয়ারিজম শাহর ওপর প্রাণঘাতী হামলার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সেই আক্রমণ ব্যর্থ হয়। তবে খাওয়ারিজম শাহর একজন সেনাপতি তাদের হাতে শহীদ হন। খলিফা নাসিরের ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে গেলে সুলতান আলাউদ্দিন মুহাম্মদ খলিফার বিরুদ্ধে সর্বাঙ্গিক প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন।

খলিফা নাসিরের প্রতি খাওয়ারিজম শাহর অসন্তুষ্টির আরেকটি কারণ ছিল এই যে, নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক মুসলিম শাসককে খলিফার পক্ষ থেকে শাসনের অনুমতিপত্র ও খেলাত (সম্মানসূচক পোশাক) প্রদান করা হতো। খলিফা ছোট ছোট শহরের শাসকদের এই সম্মান প্রদান করেছিলেন কিন্তু খাওয়ারিজম শাহকে তা থেকে বঞ্চিত রেখেছিলেন। এছাড়া হাজার সময় খলিফার নির্দেশে বাতেনী শাসকের পতাকাকে খাওয়ারিজমীয় পতাকার সামনে রাখা হয়েছিল, যাকে খাওয়ারিজম সালতানাত নিজেদের অবমাননা মনে করেছিল। ঘৃণার এই স্ফুলিঙ্গ জ্বলতে থাকে, এমনকি ৬১৪ হিজরিতে (১২১৭ খ্রিস্টাব্দ) হঠাৎ খাওয়ারিজম ও বাগদাদের মধ্যে যুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠে। সুলতান আলাউদ্দিন মুহাম্মদ প্রকাশ্যে খলিফা নাসিরের খিলাফত অস্বীকার করেন এবং তিন লক্ষ সৈন্যের বাহিনী নিয়ে বাগদাদের দিকে অভিযান চালান।

খাওয়ারিজম শাহর অগ্রসর হওয়ার সংবাদে খলিফা নাসিরের জ্ঞান হারানোর দশা হলো। তিনি সোহরাওয়ার্দী সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতা, প্রখ্যাত সুফি বুজুর্গ হযরত শেখ শাহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দী রহ.-কে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে খাওয়ারিজম শাহর কাছে পাঠান। কিন্তু খাওয়ারিজম শাহ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

[১] রওজাতুস সাফা, মীর খোয়ান্দ: ৫/৪৫।

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

শেখ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী (রহ.), যিনি উম্মাহর দুটি বড় দলকে পারস্পরিক রক্তপাত থেকে বাঁচানোর নিয়তে এসেছিলেন, অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে ফিরে গেলেন। তাঁর উদ্দেশ্য সফল হওয়ার আগেই ঋতুর মেজাজ বদলে গেল। রাতের বেলা এমন তীব্র তুষারপাত হলো যে খওয়ারেজমী বাহিনীর অগ্রবর্তী দলের অগ্রযাত্রার পথ বন্ধ হয়ে গেল। ফলে খওয়ারেজম শাহ এই অভিযান স্থগিত করে ফিরে যেতে বাধ্য হলেন। [১]

চেঙ্গিস খানের উত্থান

মুসলিম শাসকদের পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহের এই ধারাবাহিকতার সময়, মুসলিম বিশ্ব থেকে হাজার মাইল দূরে, এশিয়ার সুউচ্চ পামির পর্বতশৃঙ্গের ওপারে এক রক্তপিপাসু ও লাগামহীন শক্তি মাথাচাড়া দিচ্ছিল, যার কেন্দ্রস্থল ছিল উত্তর চীনের গোবি (মঙ্গোলিয়া) মরুভূমি। প্রাচীনকাল থেকেই এখানে যাযাবর গোত্রগুলো বসবাস করত, যাদের জীবিকা ছিল শিকার এবং পশুপালন। পানি ও চারণভূমির সন্ধানে পছন্দের স্থানগুলো দখলের লড়াইয়ে এই গোত্রগুলো প্রায়ই নিজেদের মধ্যে মারামারি ও রক্তপাত করত। এই লোকগুলো ছিল লাল ও হলদে বর্ণের, তাদের মুখমণ্ডল ছিল চওড়া ও মাংসল। নাক ছিল ছোট ও চ্যাপ্টা এবং চোয়ালের হাড় ছিল উঁচু, শরীর ছিল মজবুত ও সুঠাম। তাদের অবয়ব অন্যান্য জাতি থেকে এতটাই ভিন্ন ছিল যে, তাদের মধ্যে কোনো অপরিচিত ব্যক্তি বা গোয়েন্দা প্রবেশ করলে তৎক্ষণাৎ চিনে ফেলা যেত। তারা ছিল শামান ধর্মের অনুসারী, যা স্রষ্টার এক অস্পষ্ট ধারণার সাথে মূর্তিপূজা, কুসংস্কার এবং কিছু রীতিনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

এই বন্য গোত্রগুলোর মধ্যে একটি বড় গোত্র ছিল ‘মুঘল’ (মঙ্গোল), যারা বৈকাল হ্রদের আশেপাশের চারণভূমিগুলোতে বসবাস করত। এই সবুজ অঞ্চলটি এই হ্রদ থেকে শুরু করে মাঞ্চুরিয়ার সীমান্তবর্তী পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। [২]

মঙ্গোলদের আদি পিতা ছিলেন তুমানাহ খান, তাঁর দুই ছেলে ছিল: কবল খান এবং কাচুলি বাহাদুর। কবল খানের চতুর্থ বংশধর হিসেবে চেঙ্গিস খান জন্মগ্রহণ করেন। চেঙ্গিস খানের বংশলতিকা হলো: চেঙ্গিস বিন ইয়েসুকাই বিন বারতান বিন তউইলা বিন কবল খান বিন তুমানাহ খান।

চেঙ্গিস খানের আসল নাম ছিল ‘তেমুজিন’, যার আভিধানিক অর্থ ‘কামার’ বা ‘লোহার কারিগর’। তিনি ৫২৯ হিজরি (১১৫৩ খ্রিস্টাব্দ) সালে মঙ্গোল যোদ্ধা ইয়েসুকাইয়ের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। [৩] তাঁর জন্মের সময় মঙ্গোল গোত্র প্রতিবেশী গোত্রগুলোর কাছে পরাজিত ও পর্যুদস্ত ছিল, তাই চেঙ্গিস খানের শৈশব ও কৈশোর চরম দুর্দশার মধ্যে অতিবাহিত হয়। তবে তিনি ধীরে ধীরে নিজের বিচ্ছিন্ন গোত্রকে সংগঠিত করে প্রতিবেশী গোত্রগুলোকে পদানত করেন এবং ৬০২ হিজরি (১২০৬ খ্রিস্টাব্দ) সালে তাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেন।

[১] আল-কামিল ফিত-তারিখ: খণ্ড ১২, সীরাত সুলতান জালালুদ্দীন: পৃষ্ঠা ১৩০-১৩৫।

[২] মঙ্গোল, তাতার এবং মুঘল-এর ব্যাখ্যা: মঙ্গোলিয়ার দিকে সম্পৃক্ত করে এই গোত্রগুলোকে সাধারণত মঙ্গোল বলা হতো, যার মধ্যে অনেকগুলো গোত্র অন্তর্ভুক্ত ছিল: যেমন কিরাইত, মাকরিত, তায়জিউত ইত্যাদি। এই গোত্রগুলোর মধ্যে একটি ছিল ‘তাতার’, যার সদস্য সংখ্যা ছিল অনেক বেশি এবং সম্ভবত ষষ্ঠ হিজরি শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এটিই সবচেয়ে শক্তিশালী গোত্র ছিল। এজন্য আরব ঐতিহাসিকরা এই মঙ্গোল গোত্রগুলোকে চেঙ্গিস খানের নেতৃত্বে মুসলিম বিশ্বের ওপর আক্রমণের সময় ‘তাতার’ শব্দে স্মরণ করেছেন এবং উর্দুতেও সাধারণত তাদের তাতারই বলা হয়। তবে তাতার ও মঙ্গোল দুটি পৃথক গোত্র ছিল এবং চেঙ্গিস খান ও তাঁর পূর্বপুরুষরা মঙ্গোল ছিলেন। এজন্য চেঙ্গিস খানের সালতানাতকে মঙ্গোল সালতানাত বলা হয় এবং অনেক সময় তাঁর সমস্ত অফিসার ও সেনাবাহিনীকে মুঘল বলা হয়, যদিও তাঁর সেনাবাহিনী ও কর্মকর্তাদের মধ্যে সবাই মঙ্গোল বংশোদ্ভূত ছিল না।

[৩] রওজাতুস সাফা: খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১১... তবে উর্দু দায়েরায়ে মাআরিফ ইসলামিয়া পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি চেঙ্গিস খানের জন্ম ৫৬৭ হিজরি অর্থাৎ ১১৬৭ খ্রিস্টাব্দ লিখেছে, যা সঠিক বলে মনে হয় না।

সেখানে তিনি মঙ্গোলিয়ার সমস্ত সরদারদের একত্রিত করে কুরুলতাই (মহাসভা) আয়োজন করেন এবং নিজের নেতৃত্বের অঙ্গীকারের সাথে চেঙ্গিস খান উপাধি গ্রহণ করেন। এভাবে তিনি মঙ্গোলিয়ার সমস্ত গোত্রের সরদার হয়ে যান। তিনি ছিলেন দীর্ঘকায়, সুঠামদেহী এবং পাতলা দাড়িবিশিষ্ট একজন মানুষ। তিনি গোবি মরুভূমিতে ‘কারাকোরাম’ নামক নতুন শহর নির্মাণ করে সেটিকে নিজের রাজধানী বানান। [১]

ইয়াসা:

এই নিরক্ষর ব্যক্তিটি নিজের সাম্রাজ্যের জন্য একটি বিধিবদ্ধ সংবিধান প্রণয়ন করেন যাকে ‘ইয়াসা’ (ইয়াসাক) বলা হতো। তাঁর প্রজাদের প্রত্যেকের জন্য ইয়াসা মেনে চলা বাধ্যতামূলক ছিল। এতে আকিদাহ বা বিশ্বাসের শিক্ষাও ছিল তবে তা সংক্ষিপ্ত। রাজনীতি, ক্ষমতার হস্তান্তর, যুদ্ধের মূলনীতি, সামাজিক শিষ্টাচার, বৈধ ও অবৈধ বিষয় এবং অপরাধের শাস্তিসহ অনেক কিছু এতে ছিল। এগুলোর মধ্যে কিছু বিষয় মঙ্গোল পূর্বপুরুষদের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে ছিল, কিছু ছিল চেঙ্গিস খানের নিজস্ব উদ্ভাবন এবং অনেক বিষয় ছিল কুসংস্কারের ওপর ভিত্তি করে।

ইয়াসাতে আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা এক খোদার ওপর ঈমান আনার শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল কিন্তু এর বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়নি। ইয়াসার আইন অনুযায়ী চেঙ্গিস খানের আদেশের গণ্ডির মধ্যে থেকে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ ধর্ম পালনের স্বাধীনতা ছিল। শত্রুর জন্য গোয়েন্দাগিরি, মিথ্যা সাক্ষ্য, কালো জাদু, চুরি, ব্যভিচার এবং সমকামিতার শাস্তি ছিল মৃত্যু। মাসে তিনবার নেশা করার অনুমতি ছিল। বজ্রপাত এবং বৃষ্টির সময় পানি ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল। অন্য জাতিদের সাথে ধূর্ততা, প্রতারণা এবং ছলচাতুরির অনুমতি ছিল। তাদের গণহত্যা করা বৈধ এবং তাদের নারীদের অবমাননা করা সঠিক ছিল। সংক্ষেপে ইয়াসা ছিল যুক্তিসঙ্গত এবং অসার কথার এক সমষ্টি। [২]

চীন বিজয়:

মঙ্গোলিয়া এবং তিয়ান শান পর্বতমালার কাছে বসবাসকারী যোদ্ধা গোত্রগুলোকে নিজের পতাকাতলে একত্রিত করার পর চেঙ্গিস খান ঝোড়ো বাতাসের মতো সমগ্র উচ্চ এশিয়াকে নিজের কবজায় নিয়ে নেন। তিনি চীনের মহাপ্রাচীর ডিঙিয়ে চীন আক্রমণ করেন এবং কয়েক বছরের মধ্যে তা জয় করে নেন। ৬১২ হিজরি (১২১৫ খ্রিস্টাব্দ) নাগাদ তিনি হাজার বছরের প্রাচীন চীনা রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়েছিলেন। এখন তাঁর আক্রমণের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ময়দান ছিল মুসলিম বিশ্বের জনবহুল রাজ্যগুলোর ধারাবাহিকতা, যাদের পদদলিত করার জন্য তিনি আট লক্ষ যোদ্ধা সম্বলিত বিশ্বের বৃহত্তম সেনাবাহিনী প্রস্তুত করেছিলেন। অন্যদিকে মুসলিম বিশ্বের শাসকরা গাফিলতিতে মত্ত হয়ে একে অপরের টুঁটি চেপে ধরছিলেন এবং তাদের মাথার ওপর ঘুরপাক খাওয়া বিপদের বিন্দুমাত্র অনুভূতিও তাদের ছিল না। [৩]

খলিফা নাসিরের দূতাবাস:

এই পরিস্থিতিতে যখন চেঙ্গিসীয় বিপদের প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের ঐক্য নিঃশ্বাসের মতো জরুরি ছিল, খলিফা নাসির খাওয়ারেজমকে...

[১] উর্দু দায়েরায়ে মাআরিফে ইসলামিয়া (পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি লাহোর), নিবন্ধ: চেঙ্গিস; চেঙ্গিস খান - হ্যারল্ড ল্যাঙ্ক, অনুবাদ: আজিজ আহমদ, পৃষ্ঠা ৫৩৪।

[২] উর্দু দায়েরায়ে মাআরিফে ইসলামিয়া (পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি লাহোর), নিবন্ধ: চেঙ্গিস; চেঙ্গিস খান - হ্যারল্ড ল্যাঙ্ক, অনুবাদ: আজিজ আহমদ, পৃষ্ঠা ৫৫৫ থেকে ৫৯।

মুসলিম বিশ্বে তখনই করার পর তিনি মঙ্গোলিয়ায় ফিরে যান যেখানে ৬২৪ হিজরি (১২২৭ খ্রিস্টাব্দ) সালে তিনি অসুস্থতার কারণে মৃত্যুবরণ করেন। (তারিখে জাহানগুশা: ১/২৩৬, তবা হেমােস) তাঁর বয়স সৌর হিসেবে প্রায় ৭২ বছর এবং চান্দ হিসেবে প্রায় ৭৫ বছর হয়।

[৩] চেঙ্গিস খান: হ্যারল্ড ল্যাঙ্ক, পৃষ্ঠা ৬৫ থেকে ৯৫; সিরাতে সুলতান জালালুদ্দিন, পৃষ্ঠা ৩ থেকে ১২; তারিখে ইবনে খালদুন: ৫/৫৮৩ থেকে ৫৮৫, তবা দারুল ফিকর।

ধ্বংস ও বরবাদ করার কথা চিন্তা করছিল। সে তার উজির ও উপদেষ্টাদের কাছে পরামর্শ চাইল যে, সুলতান আলাউদ্দিন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহর শক্তি দমনের জন্য আমাদের কী করা উচিত। কিছু জাতি-বিক্রেতা উজির বলল: ‘আলমপনাহ! আমাদের রায় হলো আমাদের চেঙ্গিস খানের কাছে সাহায্য চাওয়া উচিত, কারণ সে ছাড়া দুনিয়ার কোনো বিজয়ী খাওয়ারিজম শাহর মোকাবিলা করতে পারবে না।’ [১]

এই সময়ে কিছু বুদ্ধিমান উপদেষ্টা খলিফাকে এই বিপজ্জনক পদক্ষেপ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করলেন এবং বললেন: ‘খলিফাতুল মুসলিমিন! এই কাফের তাতারীদের ঈমানদার মুসলমানদের জান ও ইজ্জত-আব্রু ওপর চাপিয়ে দেওয়া না যুক্তিসঙ্গত, না শরীয়তসম্মত। সম্ভব যে, যখন এই বন্য জাতি খাওয়ারিজম সাম্রাজ্য দখল করে নেবে, তখন তারা খেলাফতের কেন্দ্রের সম্মানও ভুলে যাবে এবং আমাদের জন্য দুর্ভাগ্য ও অনুশোচনার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।’

খলিফা নাসির অবজ্ঞার সাথে উত্তর দিলেন: ‘তাতারী বন্যদের মাঝখানে অবস্থিত শহরগুলো জয় করতে কমপক্ষে পঞ্চাশ বছর অবশ্যই লেগে যাবে। তবে লক্ষ্য তাদের প্রথম আক্রমণেই অর্জিত হয়ে যাবে, অর্থাৎ আলাউদ্দিন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহর সামরিক শক্তি ধ্বংস হয়ে যাবে।’

খলিফা পত্রের বিষয়বস্তু তৈরি করে নিলেন। যেহেতু চেঙ্গিস খানের সাম্রাজ্যে যাওয়ার পথে খাওয়ারিজম পড়ত, তাই এই পত্রকে খাওয়ারিজমি কর্মকর্তাদের তল্লাশি থেকে বাঁচানোর জন্য এক অদ্ভুত পদ্ধতি অবলম্বন করা হলো। দূতের মাথা মুগুন করে পত্রের বিষয়বস্তু খেলাফতের দরবারের মোহরসহ তার মাথায় আগুনের সুঁই দিয়ে খোদাই করা হলো। এই না-মোছা লেখাকে কোনো তেলের সাহায্যে লুকিয়ে দেওয়া হলো। দূতের চুল যখন বেশ বড় হয়ে গেল, তখন তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। এভাবে বার্তাটি নিরাপদে চেঙ্গিস খানের কাছে পৌঁছে গেল। চেঙ্গিস খান, যে মুসলিম বিশ্বের ওপর আক্রমণ করার ব্যাপারে এই জন্য দ্বিধাগ্রস্ত ছিল যে, পাছে মুসলিম সরকারগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে তার মোকাবিলায় না নেমে আসে, এখন সে নিশ্চিত হলো এবং ইসলামি বিশ্বের ওপর আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করল। [২]

চেঙ্গিস খানের বাণিজ্যিক কাফেলা:

চেঙ্গিস খানের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানো প্রথম ইসলামি দেশ ছিল খাওয়ারিজম। চেঙ্গিসী সাম্রাজ্য এবং খাওয়ারিজমকে বরফে ঢাকা পাহাড়ের প্রায় এক হাজার কিলোমিটার প্রশস্ত একটি শৃঙ্খল পৃথক করত। এই আকাশচুম্বী পাহাড়গুলো অতিক্রম করা সহজ ছিল না। তাছাড়া খাওয়ারিজমের সামরিক শক্তিও দুর্বল ছিল না, তাই চেঙ্গিস খান আক্রমণের পূর্বে খাওয়ারিজমের অবস্থান, ভৌগোলিক অবস্থা, সামরিক সম্পদ এবং অন্যান্য বিবরণ সংগ্রহ করা জরুরি মনে করল। এর আগে চীন আক্রমণের জন্যও চেঙ্গিস খান এই পদ্ধতিই অবলম্বন করেছিল। এবার এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সে বাণিজ্যিক কাফেলাগুলোকে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা করল। ৬১৫ হিজরি মোতাবেক ১২১৮ খ্রিস্টাব্দ।

[১] রওজাতুস সাফা: ৫ / ২৫০ ... “সাহেবে রওজাতুস সাফা” এখানে উজিরের নাম উল্লেখ করেননি এবং কেবল “উজিরদের একজন আরজ করল” লিখেছেন। তবে ধারণা করা হয় যে, সে ছিল মুয়াইয়্যিদুদ্দিন কুমি, যে খলিফা নাসিরের শিষ্য উজির ছিল এবং রাষ্ট্রীয় বিষয়াবলির ওপর পুরোপুরি কর্তৃত্বশীল ছিল। সম্ভবত এই কারণেই আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ বলতেন যে, চেঙ্গিস খানকে ইসলামি বিশ্বের ওপর আক্রমণের দাওয়াত দানকারীরা ছিল রাফেজি। ওয়া আজমু মিনহ ইনদা হাযিহিত তায়িফাতি আল্লাতি কানাত মিন আজামিল আসাবাবি ফি খুরুজি জানকিসখান ইলা বিলাদিল ইসলাম। (আল-উকুদুদ দুররিয়াহ, পৃষ্ঠা ২০১)

[২] রওজাতুস সাফা: ৫ / ২৫০

এতে তিনি দূত পাঠিয়ে আলাউদ্দিন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহকে প্রস্তাব দেন যে, উভয় দেশের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য বাণিজ্যিক কাফেলার যাতায়াত শুরু করা হোক। আলাউদ্দিন এই প্রস্তাব গ্রহণ করে বাণিজ্যের জন্য সীমান্ত খুলে দেন।

অল্প সময় অতিবাহিত হওয়ার পর সীমান্ত শহর ওতরার-এর শাসক গায়ের খান খাওয়ারিজম শাহকে অবহিত করেন যে, মঙ্গোলিয়া থেকে আসা ব্যবসায়ীরা শত্রুর হয়ে গোয়েন্দাগিরি করছে এবং সীমান্তে এমন একটি কাফেলাকে আটক করা হয়েছে। খাওয়ারিজম শাহ জবাবে গায়ের খানকে এ বিষয়ে যেকোনো পদক্ষেপ নেওয়ার অনুমতি দেন। ফলে কাফেলার লোকদের হত্যা করে তাদের ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। [১]

দূতের হত্যা এবং চেঙ্গিস খানের ক্রোধ:

চেঙ্গিস খান যখন তার কাফেলা ধ্বংসের খবর পেলেন, তখন তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে সুলতান আলাউদ্দিন মুহাম্মদকে চিঠি লিখলেন:

“যদি এই সবকিছু ওতরার-এর শাসক নিজের ইচ্ছায় করে থাকে, তবে তাকে আমাদের হাতে সোপর্দ করো। আর যদি এটি তোমার আদেশে হয়ে থাকে, তবে তা চরম প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, যার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ হবে। আমি এমন এক বাহিনী নিয়ে আসব যার মোকাবিলা করা সম্ভব হবে না।” [২]

গায়ের খান খাওয়ারিজম শাহের মামা ছিলেন এবং সেনাবাহিনীর একটি বড় অংশ তার গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাই খাওয়ারিজম শাহের পক্ষে তাকে চেঙ্গিস খানের হাতে তুলে দেওয়া অত্যন্ত কঠিন ছিল। [৩] তদুপরি চেঙ্গিস খানের বার্তার শব্দগুলো এমন আতঙ্কসূচক ছিল যে খাওয়ারিজম শাহের মেজাজ বিগড়ে গেল। তিনি কোনো কিছু চিন্তা না করেই চেঙ্গিস খানের দূতের শিরশ্ছেদ করালেন এবং তার সঙ্গীদের দাড়ি মুড়িয়ে এই বার্তার সাথে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন:

“আমি নিজেই তোমার মোকাবিলা করতে আসছি, তুমি যদি দুনিয়ার শেষ প্রান্তেও চলে যাও তবুও আমি তোমাকে শাস্তি দেব এবং তোমার সেই অবস্থাই করব যা তোমার সঙ্গীদের করেছি।”

খাওয়ারিজম শাহের পক্ষ থেকে এই দুর্ব্যবহারের কারণে চেঙ্গিস খান রাগে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। তিনি ঘোষণা করলেন:

“আকাশে যেমন দুটি সূর্য জ্বলে না, তেমনি এই পৃথিবীতে দুজন সম্রাট থাকবে না।”

এরপর তিনি দ্রুতগামী দূত পাঠিয়ে খাওয়ারিজম শাহকে এই শব্দে যুদ্ধের ঘোষণা শোনালেন:

“তুমি যুদ্ধ পছন্দ করেছ, এখন যা হওয়ার তাই হবে।” [৪]

প্রথম যুদ্ধ:

চেঙ্গিস খানের আদেশে তাতার বাহিনী গোবি মরুভূমির দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে একত্রিত হলো এবং শরৎকালে (রজব ৬১৬ হিজরি মোতাবেক সেপ্টেম্বর ১২১৯ খ্রিস্টাব্দ) তিনি বৈকাল হ্রদের পাশ দিয়ে পশ্চিম দিকে যাত্রা শুরু করেন। চেঙ্গিস খানের পরিকল্পনা সব দিক থেকে নিখুঁত ছিল। পথপ্রদর্শক, দোভাষী, চিকিৎসক, অস্ত্র নির্মাতা এবং ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে গোয়েন্দা, আগ্নেয়াস্ত্র ও মিনজানিক (পাথর নিক্ষেপক যন্ত্র) বিশেষজ্ঞ চীনারাও বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। আট লক্ষ সৈন্যের এই বাহিনী দুর্গম বরফাবৃত পাহাড়, সংকীর্ণ গিরিপথ...

[১] তারিখ-ই-জাহান কুশা, আতা মালিক জুওয়াইনি (মৃত্যু ৬৮৩ হি.), পৃষ্ঠা ১৬৭ থেকে ১৬৯, ত. হার্মিস।

[২] তারিখ-ই-গুজিদা, হামদুল্লাহ মুস্তাওফি, পৃষ্ঠা ৪৯৩, ত. ইরান।

[৩] আল-কামিল ফিত তারিখ: সন ৬১৭ হি.

[৪] আল-কামিল ফিত তারিখ: সন ৬১৭ হি.

বরফ জমা নদী ও জলাভূমি অতিক্রম করে (প্রায় দেড় হাজার কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে) আট লাখ যোদ্ধার এই বাহিনী সেই স্থানে পৌঁছাল যেখানে মধ্য এশিয়ার ‘শাহরাহ-এ পিলু’ অবস্থিত ছিল। চেঙ্গিস খান এখানে বাহিনীকে দুই ভাগে বিভক্ত করলেন: এক অংশ তার বড় ছেলে জোজি খানের অধীনে দিয়ে শাহরাহ-এর মাধ্যমে খাওয়ারিজমের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে পৌঁছানোর নির্দেশ দিলেন যাতে সে খাওয়ারিজম শাহকে সেদিকে ব্যস্ত রাখে। এই সময়ে চেঙ্গিস খান নিজে অপরিচিত, নির্জন ও দুর্গম পথ দিয়ে দীর্ঘ পথ ঘুরে বোখারার পেছন দিক থেকে আক্রমণ করতে চেয়েছিলেন।

জোজি খান ‘শাহরাহ-এ পিলু’ দিয়ে দ্রুত গতিতে সফর করে খাওয়ারিজমের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের কাছে পৌঁছে গেলেন। আলাউদ্দিন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহ চেঙ্গিস খানের সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য চার লাখ সৈন্যের বিশাল বাহিনী নিয়ে সীমান্তের দিকে রওনা হয়েছিলেন, কিন্তু তার অগ্রযাত্রা ধীর ছিল। রাজধানী উরগঞ্জ থেকে বের হয়ে তিনি বোখারা পৌঁছালেন। তারপর সমরকন্দ ও জান্দ হয়ে তিনি সির দরিয়া নদীর তীরে তারু ফেললেন। সেখানে তিনি জানতে পারলেন যে চেঙ্গিজের বাহিনীর একটি অংশ পাহাড়ের ওপারে রয়েছে, যারা তাদের রসদ সংগ্রহের জন্য আশেপাশের গ্রামগুলোতে লুটতরাজ চালাচ্ছে।

যদিও এই বিশাল বাহিনীর সাথে পাহাড়ের গোলকধাঁধায় প্রবেশ করা বিপজ্জনক ছিল, কিন্তু সুলতান আলাউদ্দিন মুহাম্মদ তার সেনাপতিদের নিষেধ করা সত্ত্বেও এগিয়ে গিয়ে আক্রমণ করা জরুরি মনে করলেন। ফলে তিনি নদী পার হয়ে আঁকাবাঁকা উপত্যকা ও গিরিপথ দিয়ে অগ্রসর হতে শুরু করলেন। একদিন সফরের সময় একটি সংকীর্ণ উপত্যকায় তার ও তাতার বাহিনীর মুখোমুখি সংঘর্ষ হলো। একটি ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হলো যা মূলত সেই ধ্বংসযজ্ঞের প্রথম ধাপ ছিল, যা মুসলিম বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশি জনসংখ্যাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিল।

এই প্রতিকূল ময়দানে খাওয়ারিজমিরা তাদের সামরিক পেশাদারিত্বের দক্ষতা দেখাতে পারেনি। সংকীর্ণ উপত্যকায় তিল ধারণের জায়গা ছিল না। তাদের অধিকাংশ সৈন্য ময়দান সংকীর্ণ হওয়ার কারণে সামনের সারির সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করতে অক্ষম ছিল।

তাতার সৈন্যরা তাদের হালকা অস্ত্রশস্ত্র এবং দ্রুত গতির যুদ্ধ কৌশলের কারণে খাওয়ারিজমি বাহিনীকে চরমভাবে পিষ্ট করছিল। এমনকি এক পর্যায়ে খাওয়ারিজম শাহের এত কাছে তারা পৌঁছে গিয়েছিল যে তার প্রাণ বাঁচানো কঠিন হয়ে পড়েছিল। [১] আল্লামা ইবনুল আসির (রহ.)-এর মতে:

“উভয় পক্ষ এমনভাবে একে অপরের সাথে জড়িয়ে পড়েছিল যে তলোয়ার চালানো অসম্ভব ছিল। তারা খঞ্জর ও ছুরি দিয়ে একে অপরের ওপর আক্রমণ করছিল। রক্তের নদী এমনভাবে প্রবাহিত হচ্ছিল যে ঘোড়াগুলো পিছলে পড়ে যাচ্ছিল।” [২]

তাতারদের সাথে এই প্রথম লড়াইয়ে কমপক্ষে ২০ হাজার মুসলমান শহীদ হন। খাওয়ারিজম শাহ এবং তার কর্মকর্তাদের স্নায়ুর ওপর এর খুব খারাপ প্রভাব পড়ে এবং তারা তাতারদের দ্বারা ভীষণভাবে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। এরপর খাওয়ারিজম শাহ আর কোনো ময়দানে তাতারদের সাথে লড়াই করার সাহস করতে পারেননি। [৩]

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: সন ৬১৭ হিজরি; তারিখ-ই জাহান কুশা জুওয়াইনি: ১/৩৪৩ থেকে ৩৪৬; হারল্ড ল্যাঙ্গ রচিত চেঙ্গিস খান, পৃষ্ঠা ১০২ থেকে ১০৫।

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: সন ৬১৭ হিজরি।

[৩] আল-কামিল ফিত তারিখ: সন ৬১৭ হিজরি; তারিখ-ই জাহান কুশা জুওয়াইনি: ১/৩৪৭, হারল্ড ল্যাঙ্গ।

খাওয়ারিজম শাহের পলায়ন:

খাওয়ারিজম শাহ তার অবশিষ্ট সৈন্যবাহিনী নিয়ে সীমান্তবর্তী শহরগুলো ছেড়ে সমরকন্দে চলে আসেন। এদিকে চেঙ্গিস খানের নির্দেশে তার ছেলেরা সিহন নদীর উপকূলীয় শহরগুলোতে আক্রমণ চালিয়ে গণহত্যা চালাচ্ছিল। মাথার খুলির মিনার তৈরি করা হচ্ছিল। নদী মুসলমানদের রক্তে লাল হয়ে যাচ্ছিল। সীমান্তবর্তী শহর কোকান্দে (খুজান্দ) সাহসী খাওয়ারিজমি শাসক তৈমুর মালিক মাত্র এক হাজার সৈন্য নিয়ে তাতার আক্রমণকারীদের কয়েক মাস পর্যন্ত আটকে রাখেন। এই সময়ে আলাউদ্দিন খাওয়ারিজম শাহের কাছে তার বাহিনী পুনর্গঠন করার ভালো সুযোগ ছিল, কিন্তু তিনি কিছুই করেননি। ওটরারের সাহসী গভর্নর গায়ের খানও দৃঢ়ভাবে মোকাবিলা করেন এবং কয়েক মাস পর্যন্ত তাতারদের ওটরারের প্রাচীরের সামনে এগোতে দেননি। অবশেষে ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং ক্রমাগত জখম অবরুদ্ধদের কোমর ভেঙে দেয়। কোকান্দের মতো ওটরারের জনপদকেও মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হয়। গায়ের খানের চোখ ও কানে গলিত রূপা ঢেলে তাকে অত্যন্ত নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়, কারণ চেঙ্গিস খানের কাফেলাকে তিনিই হত্যা করিয়েছিলেন। [১]

এই সময়ে আলাউদ্দিন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহ কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় আরও একটি ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। তিনি তার অবশিষ্ট বাহিনীকে ছোট ছোট টুকরো করে বিভিন্ন দুর্গ ও শহরের প্রাচীরে মোতায়েন করে দেন। শাহজাদা জালালুদ্দিন এই রণকৌশলের তীব্র বিরোধিতা করেন কিন্তু খাওয়ারিজম শাহের ওপর এর কোনো প্রভাব পড়েনি। এখন মুসলমানদের কাছে এমন কোনো বড় বাহিনী অবশিষ্ট ছিল না যার মাধ্যমে তারা কোনো ময়দানে তাতারদের দাঁতভাঙা জবাব দিতে পারত। [২]

বুখারার পতন:

তাতার বাহিনীর যে অংশটি “জোচি খান”-এর নেতৃত্বে পূর্ব দিক থেকে এগিয়ে আসছিল, তারা খাওয়ারিজম শাহ এবং তার আমিরদের নিজেদের দিকে মনোযোগী রাখতে সক্ষম হয়, যাদের ধারণাই ছিল না যে চেঙ্গিস খান বাহিনীর একটি বড় অংশ নিয়ে তাদের পেছন দিক থেকে আসছেন। মহররম ৬১৭ হিজরি মোতাবেক মার্চ ১২২০ খ্রিস্টাব্দে চেঙ্গিস খান হঠাৎ বুখারার প্রাচীরের সামনে আবির্ভূত হন। বুখারাবাসী হতভম্ব হয়ে যায়। শহরের রক্ষীবাহিনী বাইরে বেরিয়ে মোকাবিলা করার চেষ্টা করে, কিন্তু পরাজিত হয়। শহরবাসী ভীত হয়ে জান ও মালের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতিতে শহরের দরজা খুলে দেয়। চেঙ্গিস খান সৈন্যদের প্লাবনের মতো শহরে প্রবেশ করেন। তার চতুর ছেলে তুলুই খান তার সাথে ছিল। বুখারার জামে মসজিদ “জামে আল-কাবীর”-এর সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে তিনি ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরেন এবং জিজ্ঞেস করেন: “এটি কি তোমাদের বাদশাহর প্রাসাদ?” লোকেরা বলল: “না, এটি আল্লাহ তাআলার ঘর।” চেঙ্গিস খান ঘোড়াকে ইশারা করলেন এবং মসজিদে প্রবেশ করে সেই মিম্বরে উঠে গেলেন যেখানে কুরআন মাজিদের একটি বড় পাণ্ডুলিপি রাখা ছিল। তিনি ঘোষণা করলেন: “আমার বাহিনীর জন্য খাদ্য এবং তাদের ঘোড়ার জন্য ঘাসের দ্রুত ব্যবস্থা করো। এই মসজিদের মতো বিশাল ভবনগুলো আস্তাবল হিসেবে খালি করে দাও।”

[১] রওজাতুস সাফা: ৫/২৮; তারিখ-ই-জাহানগুশা জুওয়াইনি: ১/১৭০ থেকে ১৭৩, ১৭৭ থেকে ১৭৯, ত: হার্মিস।

[২] সিরাত-ই-জালালুদ্দিন, পৃ. ৯০, ৯১, ত: দারুল ফিকর আল-আরাবি কায়রো; তারিখ-ই-জাহানগুশা জুওয়াইনি: ১/৩৬৯, ত: হার্মিস।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

তারপর সে ঈদগাহে জনগণকে একত্রিত করে বলল:

“হে বুখারাবাসী! আমি অবিনশ্বর আসমানের ক্রোধ। সেই অবিনশ্বর আসমান যার ক্ষমতা মহাবিশ্বের প্রতিটি কোণায় বিদ্যমান, আমি তার পূর্ণ আঘাত। খাওয়ারিজম শাহ গুরুতর অপরাধ করেছে, আমি এজন্য এসেছি যাতে তাকে তার অপরাধের শাস্তি দিয়ে সেভাবেই ধ্বংস করি যেভাবে আমি অন্যান্য রাজাদের পায়ের নিচে পিষ্ট করেছি।”

আতঙ্কিত জনগণ তাদের শস্যের গুদামের দরজা খুলে দিল। তাতারীরা জামে মসজিদসহ সমস্ত মসজিদ ও মাদরাসায় ঘোড়া বেঁধে রাখল। উলামা ও ফকীহদের সেগুলোর পাহারায় বাধ্য করা হলো। আলমারি থেকে কুরআন মাজীদ বের করে সেগুলোতে ঘাস ও খড় ভরে দেওয়া হলো। পবিত্র পাতাগুলো কাফেরদের অপবিত্র পায়ের নিচে পিষ্ট হচ্ছিল। তাতারীরা মসজিদে মদের পেয়ালা পান করছিল এবং বুখারার নর্তকীরা তাদের তলোয়ারের ইশারায় তাদের সামনে গান গাইছিল। মুসলমানরা রক্তাশ্রু বিসর্জন দিয়ে তাদের দ্বীন ও ধর্মের অবমাননার এই দৃশ্য দেখছিল। তাতারীদের লুটতরাজের খোলাখুলি অনুমতি ছিল। সতী-সাধবী নারীদের প্রকাশ্যে শ্লীলতাহানি করা হচ্ছিল। শহরের আমীর ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের থেকে সমস্ত সম্পদ কেড়ে নেওয়া হলো এবং আরও সম্পদের সন্ধানে তাদের নির্যাতন করে করে হত্যা করা হলো। কয়েক দিন এই কিয়ামত চলতে থাকল।

তারপর শহরের সমস্ত অধিবাসীকে একটি খোলা ময়দানে হাঁকিয়ে নেওয়া হলো। নারীদের চুল ধরে টেনে হিঁচড়ে তাদের স্বামীদের থেকে আলাদা করা হলো। আর্তনাদ ও আহাজারির শব্দ আসমান পর্যন্ত পৌঁছাতে লাগল। লজ্জাশীলা ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নারীরা বন্য নেকড়েদের খাবায় ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। কাজী সদরুদ্দিন খান (রহ.), ইমামজাদা রুকনুদ্দিন (রহ.) এবং আরও কয়েকজন ব্যক্তি এই দৃশ্য সহ্য করতে পারলেন না। তারা যন্ত্রণায় ফেটে পড়লেন এবং তাতারী বন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, তাদের দেখে অন্য লোকেরাও আক্রমণ শুরু করল এবং তাতারী সৈন্যদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাদের জাহান্নামে পাঠাতে লাগল। এটি দেখে তাতারীদের সুশৃঙ্খল বাহিনী যারা ময়দান ঘিরে রেখেছিল, তারা সক্রিয় হয়ে উঠল। গণহত্যার জন্য তলোয়ারগুলো খাপমুক্ত হলো। সন্ধ্যা নাগাদ লক্ষ লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে এখানে লাশ ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। নিহতদের মাথার খুলি দিয়ে মিনার তৈরি করা হলো। শহরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে আত্মগোপনকারী ব্যক্তিদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনাও শেষ করে দেওয়া হলো। বুখারার জ্বলন্ত ঘরবাড়ি থেকে ওঠা ধোঁয়ার কালো মেঘ আকাশে এমনভাবে ছেয়ে গেল যে দিনের বেলা সূর্যের আলো ম্লান হয়ে গেল।

অনেক তরুণী এবং দক্ষ ব্যক্তিদের তাতারীরা জীবিত বন্দি করে নিজেদের সাথে নিয়ে গিয়েছিল। তারা তাদের ঘোড়ার সাথে পায়ে হেঁটে চলতে বাধ্য করছিল; যখন ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে এই মজলুম বন্দিরা কদম বাড়াতে অক্ষম হয়ে পড়ত, তখন তাতারী বন্যরা তাদের নির্দয়ভাবে হত্যা করে সামনে এগিয়ে যেত। [১]

সুলতান আলাউদ্দিন মুহাম্মদ সমরকন্দে অবস্থান করছিলেন। যখন তিনি বুখারার ওপর চেন্সিস খানের আকস্মিক আক্রমণের খবর পেলেন, তখন তিনি আতঙ্কিত হয়ে সমরকন্দ থেকে প্রস্থানের প্রস্তুতি নিলেন। তিনি দেখছিলেন যে পূর্ব দিক থেকে যে বাহিনী আক্রমণ করছে... দক্ষিণ-পূর্ব থেকে চেন্সিস খান—

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ, সন: ৬১৭ হিজরি; চেন্সিস খান - হ্যারল্ড ল্যান্স, পৃ. ১১০-১১১; তারিখ-ই-জাহানগুশা জুওয়াইনি: ১/ ১৮২-১৮৯, ত. হেরমেস।

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমাহ

চতুর্থ খণ্ড

...এর দ্বিতীয় সেনাপতি জেবে নোয়ান এগিয়ে যাচ্ছে। এখন চেঙ্গিস খান বুখারা থেকে অবসর হয়ে নিজেই পশ্চিম দিক থেকে সমরকন্দের ওপর আক্রমণকারী হবে। সে এতেই কল্যাণ মনে করল যে, ঘেরাও হওয়ার আগেই যত দ্রুত সম্ভব দূরে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা।

খোয়ারিজম শাহের ভয়ের অবস্থা এমন ছিল যে, সমরকন্দের নগর রক্ষা প্রাচীর থেকে বের হওয়ার সময় সে পরিখার দিকে তাকিয়ে বলল:

“আমাদের ওপর আক্রমণকারী তাতারীরা সংখ্যায় এত বেশি যে, তারা যদি তাদের চাবুক এই পরিখায় ফেলে দেয়, তবে পরিখা কানায় কানায় ভরে যাবে।”

হতাশ ও ভগ্নহৃদয় খোয়ারিজম শাহ তার পেছনে থেকে যাওয়া অফিসারদেরও ভীত-সন্ত্রস্ত করে সমরকন্দের দক্ষিণে খোরাসান (বর্তমান আফগানিস্তান)-এর দিকে পালিয়ে গেল। [১]

সমরকন্দের পতন:

বুখারার পতনের পর রবিউল আউয়াল ৬১৭ হিজরি মোতাবেক মে ১২২০ খ্রিস্টাব্দে তাতারী লশকর বা বাহিনীর তিনটি বড় অংশ দেশের তিনটি সীমান্ত থেকে আক্রমণ চালিয়ে সমরকন্দের একত্রিত হলো। অবরুদ্ধ মুসলমানরা তিন দিন পর্যন্ত শত্রুর সাথে দৃঢ়ভাবে মোকাবিলা করল, কিন্তু শেষ দিনে ভয়াবহ যুদ্ধের সময় একজন বিশ্বাসঘাতক আমির বরতমাশ খান তার ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে চেঙ্গিস খানের সাথে গিয়ে মিলিত হলো। মুসলমানদের কোমর ভেঙে গেল। বাহিনীর পরাজয়ের পর তাতারীরা শহরে প্রবেশ করল। সমরকন্দের প্রাচীর যা তার উচ্চতা ও দৃঢ়তার কারণে সমকালীন বিস্ময়গুলোর মধ্যে গণ্য হতো, তা ধূলিসাৎ করে দেওয়া হলো যাতে ভবিষ্যতে এখানে কোনো পরিখা বা প্রতিরক্ষা ব্যুহ তৈরির সম্ভাবনা না থাকে। এরপর শহরবাসীর ওপর গণহত্যা শুরু হলো এবং তাতারীরা মুসলমানদের লাশে শহরের অলিগলি পূর্ণ করে দিল।

কয়েক দিন পর্যন্ত চেঙ্গিস খান বিশ্বাসঘাতক বরতমাশ খান ও তার সঙ্গীদের খুব খাতির-যত্ন করল এবং তারপর একদিন যখন এই জাতি-বিক্রেতারা গভীর ঘুমে মগ্ন ছিল, তাতারী বাহিনী তাদের টুকরো টুকরো করে ফেলল। চেঙ্গিস খান শত্রুর বিশ্বাসঘাতকদের থেকে কাজ অবশ্যই নিত, কিন্তু তাদের ওপর বিশ্বাস করার পক্ষপাতী ছিল না। [২]

খোয়ারিজমের মুসলমানদের হিজরত:

খোয়ারিজমি বাহিনীর ক্রমাগত পরাজয় এবং তাতারীদের অবাধ অগ্রযাত্রায় সাধারণ মানুষ অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল। ফলে অসংখ্য মানুষ নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে প্রতিবেশী মুসলিম দেশগুলোর দিকে রওনা হলো, কিন্তু তাতারীরা জায়গায় জায়গায় টহল দিচ্ছিল, তাই বিপুল সংখ্যক মুহাজির তাদের হাতে নিহত হলো এবং অসংখ্য মানুষ ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও সফরের কষ্টে পথেই প্রাণ হারাল। তা সত্ত্বেও হাজার হাজার মানুষ হিন্দুস্তান, সিরিয়া এবং এশিয়া মাইনরে পৌঁছাতে সক্ষম হলো, যাদের মধ্যে কাজী মিনহাজুস সিরাজের মতো উলামা ও মাশায়েখও ছিলেন। এ ছাড়া সাদাতে কেরামের অনেক পরিবার এই সময়ে...

[১] তারিখ-ই-জাহান কুশা জুওয়াইনি: ২/৩৩৮, ত: হরমস; রওজাতুস সাফা: ৪/৮২৩

[২] রওজাতুস সাফা: ৫/২৯ থেকে ৩০; তারিখ-ই-জাহান কুশা জুওয়াইনি: ২/১৯৬ থেকে ২০২, ত: হরমস

...হিজরত করে হিন্দুস্তান ও অন্যান্য দেশে বসতি স্থাপন করেন। তাদের বংশধররা আজও সেসব অঞ্চলে বসবাস করছে। [১]

আলাউদ্দিন খাওয়ারিজম শাহের মৃত্যু:

খাওয়ারিজম শাহ তাতারীদের ভয়ে এক শহর থেকে অন্য শহরে পালিয়ে বেড়াতে থাকেন। তার ভীরা উপদেষ্টা এবং বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রীরা তাকে জিহাদ ত্যাগের শিক্ষা দিচ্ছিল। এর ওপর আবার রাজকীয় জ্যোতিষীরা, যাদের ওপর খাওয়ারিজম শাহ আস্থা রাখতেন, তারা বলে দিয়েছিল: “আপনার নক্ষত্র এখন প্রতিকূল অবস্থায় আছে, আপনার কিছুকাল শত্রুর মোকাবিলায় আসা উচিত নয়।”

এসব কথায় প্রভাবিত হয়ে খাওয়ারিজম শাহ কোনো ময়দানেই শত্রুর মোকাবিলা করার সাহস করতে পারেননি। চেঙ্গিস খান তার সেরা অশ্বারোহী বাহিনীকে তার পিছু ধাওয়ার জন্য পাঠিয়েছিলেন। খাওয়ারিজম শাহ তার পরিবারের নারীদের মাজানদারানের দুর্ভেদ্য ও আকাশচুম্বী দুর্গগুলোতে রেখে নিজে কয়েকজন সঙ্গী ও রাজপুত্রসহ তাতারীদের সামনে থেকে পালিয়ে নিজের রাজ্যের শেষ সীমানার বাইরে কাম্পিয়ান সাগরের (খাজার) তীরে গিয়ে পৌঁছান। [২] একটি নৌকায় চড়ে তিনি সাগরের কোনো এক দ্বীপে আশ্রয় নেওয়ার জন্য রওনা হন। পথে তিনি তীব্র শোকে নিজের মাথা নৌকার তক্তার সাথে ঠুকতেন আর বলতেন:

“সুবহানাল্লাহ! নিজের বিশাল সাম্রাজ্যের মধ্যে দুই গজ জমিও আমাদের কাছে অবশিষ্ট রইল না, যেখানে আমরা দাফন হতে পারি।” [৩]

একটি দ্বীপে পৌঁছে খাওয়ারিজম শাহ কিছুকাল অসুস্থতা ও দেশহীনতার কষ্ট ভোগ করতে থাকেন। এরই মধ্যে তিনি খবর পান যে, তাতারীরা মাজানদারানের দুর্গগুলো দখল করে তার মা, তুরকান খাতুন, বেগমগণ এবং রাজকন্যাদের বন্দি করে নিয়েছে।

এই খবরে খাওয়ারিজম শাহের স্নায়ু অবশ হয়ে যায় এবং তিনি এই শোক সহিতে না পেরে পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। [৪]

তার মৃত্যু এমন এক নিঃস্ব অবস্থায় হয়েছিল যে, তার জন্য কাফনের কাপড়ও জুটল না। তার নিজের জামা এবং এক খাদেমের পাগড়িতে জড়িয়ে তার দাফন-কাফন সম্পন্ন করা হয়। [৫]

যে মৃত্যু থেকে তিনি বাঁচতে চেয়েছিলেন, তা সাগরের বিশালতার মাঝেও তাকে এসে ধরল। খাওয়ারিজম শাহ যদি পালিয়ে না গিয়ে দৃঢ়ভাবে মোকাবিলা করতেন, তবে দুটি সাফল্যের যেকোনো একটি অবশ্যই পেতেন: বিজয় অথবা শাহাদাত। কিন্তু জিহাদের পথ ত্যাগ করে তিনি নিজেও ধ্বংস হলেন এবং দেশ ও জাতিকে ধ্বংসের গহ্বরে ঠেলে দিলেন।

শিক্ষণীয় বিষয় এবং ধ্বংসের জন্য দায়ীরা:

যদিও এই বিশ্বব্যাপী ধ্বংসযজ্ঞের কারণসমূহের মধ্যে আলাউদ্দিন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহের বিপজ্জনক রাজনৈতিক ও সামরিক ভুলগুলোর বড় ভূমিকা রয়েছে, তবে এই বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, একক কোনো ব্যক্তির পক্ষে এত বড় পরিসরে...

[১] তবাকাত-ই-নাসিরি: ২/ ১৩৪, ১৩৫, ত. কাবুল; পশ্চিম পাঞ্জাবের জালালপুর জাঁটান (গুজরাট জেলা) শহরের কাছে “মদিনা” নামক একটি গ্রামে খাওয়ারিজমি সাদাতগণ আজও বসবাস করছেন। আশ্চর্যের কিছু নেই যে সুলতান জালালুদ্দিনের কদমও এখানে পড়েছিল।

[২] তারিখ-ই-জাহান কুশা জুওয়াইনি: ২/ ৩৫৬ থেকে ৩৫৮, ত. হারমাস; তারিখুল ইসলাম লিজ-জাহাবি, ওফাত সন: ৬১৭ হিজরি।

[৩] তারিখুল ইসলাম লিজ-জাহাবি, ওফাত সন: ৬১৭ হিজরি।

[৪] তারিখ-ই-জাহান কুশা জুওয়াইনি: ২/ ৩৫৮, ৩৫৯, ত. হারমাস।

[৫] তারিখুল ইসলাম লিজ-জাহাবি, ওফাত সন: ৬১৭ হিজরি।

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

বনু আববাসীয় খিলাফত

মুসলিম জাতির রক্তপাতের জন্য কেবল খারেজম শাহকে দায়ী করা যথেষ্ট নয়। আলাউদ্দিন মুহাম্মদ একাই এই চরম ধ্বংসের অপরাধী ছিলেন না, বরং তার বিশ্বাসঘাতক আমীর ও উজিররাও এই অপরাধে সমান অংশীদার ছিলেন এবং সেই প্রতিবেশী মুসলিম দেশগুলোও যারা এই ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের সময় বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি এবং মজলুমদের সমর্থনে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে বিরত ছিল। বিশেষ করে খলিফা নাসিরের অপরাধমূলক ভূমিকা কোনোভাবেই উপেক্ষা করা যায় না, যিনি সমস্ত বিশ্বের মুসলমানদের আধ্যাত্মিক পিতার মর্যাদা রাখা সত্ত্বেও চেঙ্গিস খানকে খারেজম আক্রমণের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং খিলাফতের মসনদে বসে এই “ঘর পোড়া তামাশা” উপভোগ করেছিলেন।

এর পাশাপাশি স্বয়ং মুসলিম জনসাধারণকেও এই ধ্বংসের দায়ভার থেকে পুরোপুরি মুক্ত ঘোষণা করা যায় না, যাদের অপকর্মের কারণে আল্লাহর এই গজব তাদের ওপর আপতিত হয়েছিল। দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা, ভোগবিলাসে মগ্নতা এবং যুদ্ধবিদ্যার প্রতি ক্রমবর্ধমান অনীহার কারণে তারা অলস ও অকর্মণ্য হয়ে পড়েছিল। নাচ-গান এবং কবিতা চর্চার প্রতি আসক্তি যুবকদের কোমলমতি করে তুলেছিল, ললিতকলার প্রতি আগ্রহ বাড়ার সাথে সাথে ভীরুতা ও উদাসীনতা সাধারণ হয়ে গিয়েছিল। জনসাধারণের যদি তলোয়ার চালনা বা তীরন্দাজিতে কোনো আগ্রহ থেকেও থাকত, তবে তা ছিল কেবল খেলাধুলা পর্যন্তই। কঠোর পরিশ্রমী ইসলামী জীবনযাত্রার পরিবর্তে মুসলমানরা পারস্যের কোমল ও বিলাসপ্রিয় সভ্যতা গ্রহণ করেছিল। এর ফল এই দাঁড়াল যে, আরামপ্রিয় মুসলমানরা কঠোর পরিশ্রমী তাতারদের সামনে স্তূপের মতো লুটিয়ে পড়ল এবং কেউ তাদের সামনে দাঁড়ানোর সাহস করতে পারল না।

প্রকৃতপক্ষে সুলতান আলাউদ্দিন মুহাম্মদ ছিলেন এমন এক জাহাজের অযোগ্য নাবিক, যাকে এর যাত্রীরা আগেই ডুবিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। যখন কোনো জাতির সামাজিক দুর্বলতা, অসহনীয় ত্রুটি এবং সাধারণ অপরাধের কারণে আত্মহত্যার গর্তের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে, তখন জাতির আধ্যাত্মিক নেতা (খলিফা) এবং জাতির শাসকদের পক্ষ থেকেও যদি ক্রমাগত গুরুতর ভুল হতে থাকে, তবে সেই জাতির ধ্বংস হতে আর কোনো বাকি থাকে না। শত শত বছর আগে ঘটে যাওয়া এই বেদনাদায়ক ধ্বংসলীলা আজকের মুসলমানদের জন্য এক শিক্ষণীয় চাবুক। আমরা যদি আমাদের উদাসীনতা থেকে ফিরে না আসি, তবে আমাদের পরিণতিও ভিন্ন হতে পারে না।

পশ্চিমী তাতারী:

আলাউদ্দিন মুহাম্মদ খারেজম শাহের পশ্চাদ্ধাবনে ধাবিত তাতার বাহিনী ইরানের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ জুড়ে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। এই ধ্বংসাত্মক বাহিনী এই তুফানি অভিযানে কোথাও অবস্থান করেনি, বরং বন্যার মতো এক দিক থেকে প্রবেশ করে অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। খারেজম শাহের হাত থেকে ফসকে যাওয়ার পর তাতার যোদ্ধারা মাজান্দারানের দুর্গগুলো জয় করে রাজকীয় হারাম ও কোষাগার দখল করে নিয়েছিল। এই অভিযান থেকে অবসর নেওয়ার পর এই বাহিনী ফিরে যাওয়ার পরিবর্তে একই গতিতে কাস্পিয়ান সাগরের উত্তর দিকে অগ্রসর হতে থাকে। সুবুতাই এবং জেবে নোয়ান তখনও এই বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন। জর্জিয়ার লড়াকু গোত্রগুলোকে পরাজিত করে এই দ্রুতগামী বাহিনী কাস্পিয়ান সাগরের অপর প্রান্তে উত্তর দিকে পৌঁছে গেল।

তারিখ-ই-মিল্লাত-ই-মুসলিমা

যেহেতু জেবে নোয়ান এবং সুবোদাইয়ের নেতৃত্বে এই তাতারীরা মুসলিম বিশ্বের পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়েছিল, তাই আরব ঐতিহাসিকরা তাদের ‘আত-তাতারুল মাগরিবা’ (পশ্চিমী তাতারী) নামে স্মরণ করেন। [১]

রাশিয়া ও ইউরোপে তাতারীদের আরও অগ্রসর হওয়া:

আক্রমণের দ্বিতীয় বছরে পশ্চিমী তাতারীরা উত্তরের দিকে আরও অগ্রসর হয় এবং কাস্পিয়ান সাগরের উত্তরে অবস্থিত লবণাক্ত সমভূমিতে ‘লান’ এবং ‘কিপচাক’ (বর্তমান ইউক্রেন) গোত্রগুলোকে পদদলিত করে। এরপর তারা রাশিয়ার দিকে আক্রমণ চালায়। রুশ শাসকরা তাতারীদের বিপদের মোকাবিলা করার জন্য একটি বিশাল সম্মিলিত বাহিনী গঠন করে এবং কিপচাকের আহত যোদ্ধাদের সাথে নিয়ে নিপার নদীর তীর ধরে তাতারীদের সাথে সংঘর্ষের জন্য এগিয়ে যায়। তাতার আক্রমণকারীরা রুশ রাজা এবং কিপচাকদের এই সম্মিলিত বাহিনীর প্লাবনের সামনে একটি কৌশলের অধীনে পিছু হটতে থাকে। নয় দিন পর্যন্ত এই পিছু হটা অব্যাহত থাকে। অবশেষে একটি উপযুক্ত স্থানে তাতারীরা ঘুরে দাঁড়িয়ে আক্রমণ করে এবং রুশ বাহিনীর শৃঙ্খলা তছনছ করে দেয়। এরপর তাতারীরা ‘জেনেভা’য় প্রবেশ করে এবং সেখানে হত্যা ও লুণ্ঠন চালিয়ে ‘ভলগা নদী’র দিকে অগ্রসর হয়। এখানে নদীর তীরে অবস্থিত ‘বুলগার’ শহরের নাগরিকরা তাদের হাত থেকে বাঁচতে পারেনি এবং তাতারীরা তাদের মনভরে পদদলিত করে। এরই মধ্যে জেবে নোয়ান মারা যান, কিন্তু সুবোদাইয়ের লুণ্ঠনের উন্মাদনা কমেনি। তিনি নিপার নদী পার হয়ে মস্কো এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলোতে হাত সাফ করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। [২]

ধ্বংসের পর ধ্বংস:

তাতার বাহিনীর অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে। সমরকন্দ ও বুখারার হৃদয়বিদারক কাহিনী সর্বত্র পুনরাবৃত্তি হতে থাকে। প্রতিটি শহরে নিহতের সংখ্যা ছিল লক্ষ লক্ষ। ‘রে’ শহরে সাত লক্ষ, মার্ভে তেরো লক্ষ, নিশাপুরে পনেরো লক্ষ এবং হেরাতে ১৬ লক্ষ মানুষকে শহীদ করা হয়। [৩] এই অত্যাচারের বিবরণ দিতে গিয়ে কলম কেঁপে ওঠে এবং হৃদয় প্রকম্পিত হয়।

এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মরহুম উম্মত তাদের ছয়শ বছরের প্রাচীন সমস্ত সঞ্চয় হারিয়ে ফেলে। মসজিদ, মাদ্রাসা, পাঠাগার এবং খানকাহ—সবকিছুই নাম-নিশানহীন হয়ে যায়। প্রথিতযশা ফকীহ, মুহাদ্দিস, সুফী, বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, নামী রাজা, রাজপুত্র, সেনাপতি এবং মুজাহিদ নেতারা এই ধ্বংসযজ্ঞের ঝড়ে ভেসে যান। প্রায় দেড় কোটি মানুষের বিলুপ্তিতে প্রজন্মের পর প্রজন্ম শেষ হয়ে যায়। গোত্রের পর গোত্র ধ্বংস হয়ে যায়। কয়েক বছরের মধ্যে মুসলিম বিশ্বের মানচিত্র এমনভাবে বদলে যায় যা কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না। ইতিহাসের শত শত প্রাণঘাতী শোকের কথা ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে বর্ণনা করা ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনুল আসির এখানে ব্যথায় দিশেহারা হয়ে রক্তমাখা অশ্রু বিসর্জন দিয়ে লেখেন:

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৬১৭ হিজরি

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৬১৭ হিজরি; চেঙ্গিস খান, হ্যারল্ড ল্যান্স, পৃ. ১২৩

[৩] রওজাতুস সাফা, তারিখ-ই-জাহান কুশা জুওয়াইনি এবং আল-কামিল ফিত তারিখ-এ এই অঞ্চলগুলোর যুদ্ধের বিবরণে এই সংখ্যা দেখা যেতে পারে।

“এই দুর্ঘটনার ভয়াবহতা ও আতঙ্কের কারণে আমি বহু বছর ধরে এর আলোচনা থেকে বিরত ছিলাম, এখনও দ্বিধাগ্রস্ত আছি... হ্যাঁ! ইসলাম ও মুসলমানদের মৃত্যুর ঘোষণা দেওয়া কার পক্ষে সম্ভব? কে আছে যে এটি লেখনীর আওতায় আনার সাহস করতে পারে? হায়! আমার মা যদি আমাকে জন্ম না দিতেন, হায়! আমি যদি এই দুর্ঘটনার আগেই মারা যেতাম এবং বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যেতাম... কিন্তু কিছু বন্ধু আমাকে এটি লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছেন, যদিও আমি দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলাম। তারপর আমি ভাবলাম যে না লেখার কোনো ফায়দা নেই। এখন আমি বলছি যে, এটি এমন এক মহা দুর্ঘটনা এবং চরম বিপদ যে পৃথিবীর ইতিহাসে এর কোনো নজির পাওয়া যাবে না। বিগত দিন ও রাত এর উদাহরণ পেশ করতে অক্ষম... যদি কেউ দাবি করে যে হযরত আদম (আ.)-এর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত এমন বিপদ নাজিল হয়নি, তবে সে অবশ্যই সত্যবাদী হবে। কারণ ইতিহাসে এই ঘটনার কাছাকাছি তো দূরের কথা, এর সামান্যতম অংশও পাওয়া যায় না... সম্ভবত দুনিয়াবাসী ইয়াজুজ-মাজুজের ধ্বংসলীলা ছাড়া কিয়ামত পর্যন্ত এমন দুর্ঘটনা আর দেখবে না।” [১]

তিনি আরও সামনে লিখে চলেন:

“তাতারিরা চীনের সীমানা থেকে বের হয়ে এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই এক দিকে আমেনিয়া অতিক্রম করেছে এবং ইরাকে হামাদান থেকেও সামনে তাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। আল্লাহর কসম! আমার এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, দীর্ঘকাল পরে আগত লোকেরা যখন এই দুর্ঘটনার লিখিত বিবরণ পড়বে, তখন তারা একে মিথ্যা এবং অকল্পনীয় মনে করবে। তারা (এই ঘটনাগুলোকে অতিরঞ্জন মনে করার ক্ষেত্রে অপারগ এবং) সঠিক হবে, কিন্তু যখন তারা এমন ধারণা করবে, তখন যেন এই লেখার ওপর নজর দেয় যে আমরা আগেই এই আশঙ্কার কথা প্রকাশ করেছি এবং তা লিখে রেখেছি।” [২]

একজন পশ্চিমা ঐতিহাসিক লিখেছেন:

“এই গণহত্যা মুসলিম বিশ্বের হৃদয়কে এক প্রকার বিরান প্রান্তরে পরিণত করেছে... একাধিকবার এমন হয়েছে যে, যেখানে কোনো শহর আবাদ ছিল (গণহত্যার পর) সেখানে লাঙল চালিয়ে শস্য চাষ করা হয়েছে।” [৩]

মুসলিম বিশ্বের জনবহুল শহরগুলোতে মুসলমানদের এই গণহত্যার সময় আশেপাশের মুসলিম সরকারগুলো নীরব দর্শক হয়ে রইল। খ্বারাজমি (Khwarazmi) বাহিনীর ক্রমাগত পরাজয় এবং সাধারণ মুসলমানদের রক্তের সস্ততা দেখেও তাদের কেউ নিজের ওপর জিহাদ ফরজ মনে করেনি। এই মজলুমদের সাহায্যের জন্য কোনো প্রতিবেশী ইসলামী মর্যাদাবোধের খাতিরে তলোয়ার ধরার সাহস করতে পারেনি। খলিফা নাসির, যিনি নিজেই চেঙ্গিস খানকে এই গণহত্যার দাওয়াত দিয়েছিলেন, মনে মনে এই তামাশা উপভোগ করছিলেন। খলিফার এক উজির সমরকন্দ ও বুখারার জুলুমের কাহিনী শুনে খলিফার কাছে এসে বলতে লাগলেন:

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১০ / ৩৩৩, ত. দারুল কিতাব আল-আরাবি

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১০ / ৩৩৬, ৩৩৭, ত. দারুল কিতাব আল-আরাবি

[৩] চেঙ্গিস খান - হ্যারল্ড ল্যাঙ্ক, পৃ. ১৩২

“হায় আমাদের প্রভু!! তাতারীরা ইসলামী শহরগুলো দখল করে নিয়েছে এবং মুসলমানদের গণহত্যা করেছে।”

খলিফা এ বিষয়ে কোনো মনোযোগ দিলেন না এবং বললেন:

“এ কথা বাদ দাও! আমি এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যায় জড়িয়ে আছি। আমার সেই চিত্রবিচিত্র চড়ুইটি কোথায় গেল? তিন দিন হয়ে গেল আমি সেটিকে দেখিনি।” [১]

এর চেয়ে বড় উদাসীনতার আর কি কোনো উদাহরণ হতে পারে?

শেখ নজম উদ্দিন রাজি রহমতুল্লাহ (মৃত্যু ৬৫৪ হিজরি), যিনি সেই সময়ের একজন মহান সুফি বুজুর্গ এবং এই জুলুমের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, তিনি তাঁর রচিত “মিরসাদুল ইবাদ”-এর ভূমিকায় মুসলিম বাদশাহদের উদাসীনতা ও আত্মমর্যাদাহীনতার সমালোচনা করে লিখেছেন:

“এই অভিশপ্ত ও নীচ তাতারীরা ইসলাম ও মুসলমানদের যে ফিতনা ও ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত করেছে, তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয় এবং এই দুর্ঘটনার খ্যাতি সারা বিশ্বে এতটাই ছড়িয়ে পড়েছে যে এর ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। আমাদের বাদশাহ ও শাসকদের ওপর ইসলাম ও মুসলমানদের হেফাজতের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, কারণ:

“الْأَمِيرُ رَاعٍ عَلَى رَعِيَّتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ”

(শাসক তার প্রজাদের অভিভাবক এবং তাদের অধিকার সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।)

আল্লাহ না করুন, যদি এখনও তাদের হৃদয়ে ইসলামী গায়রাত ও আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত না হয় এবং তারা দ্বীনি উদ্দীপনা ও সাহসিকতা থেকে বঞ্চিত থাকে, যদি এখনও সবাই মিলে সুসংহত শক্তিতে পরিণত না হয়, যদি এখনও *انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ* এর নির্দেশ পালনে কোমর বেঁধে না দাঁড়ায়, নিজেদের জান, মাল ও রাজত্বকে এই ফিতনা দমনের জন্য উৎসর্গ না করে, তবে এমন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে যে ইসলামের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যাবে এবং অধিকাংশ দেশের ওপর আধিপত্য বিস্তারকারী এই ফিতনা অবশিষ্ট মুসলিম বিশ্বকেও গ্রাস করে নেবে এবং সারা দুনিয়া কুফরে ভরে যাবে।

[২] “نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ

তাতারীদের আতঙ্ক:

তাতারীদের লুটতরাজের কারণে মুসলিম বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত এক অদ্ভুত আতঙ্কের পরিবেশ বিরাজ করছিল। তাতারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করা অসম্ভব বলে মনে করা হতে লাগল।

মুসলিম বিশ্বের মহান চিন্তাবিদ হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহমতুল্লাহ লিখেছেন:

“তাতারী আক্রমণ মুসলিম বিশ্বের জন্য এক মহা বিপদ ছিল যার ফলে মুসলিম বিশ্বের ভিত কঁপে উঠেছিল। মুসলমানরা হতভম্ব ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় ছিল। এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত এক ত্রাস ও হতাশার পরিবেশ বিরাজ করছিল। তাতারীদেরকে এক...”

[১] আন-নুজুমুজ জাহেরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহিরা, জামালুদ্দিন ইউসুফ বিন তাগরি বারদি: ৬/২৬২, ত ত দারুল কুতুব মিসর।

[২] মিরসাদুল ইবাদ মিনাল মাবদা ইলাল মা’আদ (ফারসি), পৃ. ১০৯, পাণ্ডুলিপি (কুতুবখানা আস্তানা, কোম, ইরান)।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা — চতুর্থ খণ্ড

তাদেরকে এক অসাধ্য আপদ মনে করা হতো। তাদের মোকাবিলা করা অসম্ভব এবং তাদের পরাজয় অকল্পনীয় মনে করা হতো, এমনকি প্রবাদ হিসেবে এই বাক্যটি প্রসিদ্ধ ছিল:

“إِذَا قِيلَ لَكَ إِنَّ التَّارَ انْهَزَمُوا فَلَا تُصَدِّقْ”

(যদি তোমাকে বলা হয় যে তাতারীরা কোথাও পরাজিত হয়েছে, তবে তা বিশ্বাস করো না।) [১]

শামের শাসক আল-মালিক আল-আশরাফের মজলিসে তাতারীদের মোকাবিলা করার বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল, তখন তিনি হতাশাজনক স্বরে বললেন: “আমি এমন এক জাতি সম্পর্কে আর কী বলতে পারি যাদের কোনো ব্যক্তিকে আজ পর্যন্ত জীবিত বন্দি করা সম্ভব হয়নি। ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়েও তারা অস্ত্র সমর্পণ করে না, লড়াই করতে করতে মারা যায় অথবা বেঁচে পালিয়ে যায়।”

প্রসিদ্ধ ছিল যে, “لَا يُقَالُ كَمْ قُتِلَ مِنْ بَلَدٍ كَذَا، وَإِنَّمَا يُقَالُ كَمْ بَقِيَ”

(এটি বলার প্রয়োজন নেই যে এই শহরে কতজন লোক নিহত হয়েছে, বরং এটি বলা উচিত যে কতজন জীবিত বেঁচেছে।)

ঐতিহাসিকরা বলতেন যে, নিহতদের সংখ্যার আন্দাজ করা সম্ভব নয়, কারণ লাশ গণনাকারীরা গণনা করতে করতে যখন ক্লান্ত হয়ে যেত, তখন তার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি লাশ আরও দৃষ্টিগোচর হতো। মুসলমানরা রুদ্ধশ্বাস ও স্তম্ভিত ছিল। শাসকদের সাহসহীনতার কারণে সবার মনোবল ভেঙে পড়েছিল। তাতারীদের ধ্বংসলীলা কেবল রক্তপাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তারা ছিল আক্ষরিক অর্থেই রক্তপিপাসু। সেই যুগের একজন দার্শনিক মুওয়াফফাক আব্দুল লতিফ বাগদাদী যখন শাম সফরে যান, তখন হালব-এ তিনি এক বিপদগ্রস্ত অথচ সাহসী মহিলার দেখা পান, যাকে তাতারীরা তার স্বামী ও সন্তানসহ বন্দি করেছিল। সেই মহিলা তাকে নিজের আপদকালীন কাহিনী শুনিয়ে বললেন যে, এক তাতারী আমাদের সামনেই আমাদের ছেলেকে জবাই করল এবং তার রক্ত পান করল। পরবর্তীতে সে যখন ঘুমিয়ে পড়ল, তখন আমি তাকে হত্যা করলাম এবং নিজের স্বামীর সাথে পালিয়ে এলাম। [২] মানুষের অবস্থা এমন ছিল যে, ভয় ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার কারণে তাদের মস্তিষ্ক অকেজো হয়ে গিয়েছিল। নিজের প্রাণ বাঁচানো ছাড়া তাদের আর কোনো কিছুই মাথায় আসছিল না। মুওয়াফফাক বাগদাদী লেখেন:

“আমি ওয়াসিত-এর এক ব্যবসায়ীর দেখা পেলাম, সে তাতারীদের হাত থেকে বেঁচে পাহাড়ে গিয়ে লুকিয়ে ছিল এবং অনেক দিন পর বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। সে জানাল যে, জমিন লাশে সয়লাব হয়ে ছিল, গবাদি পশুর পাল এবং ধন-সম্পদের স্তুপ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে ছিল, আমরা দশজন ব্যক্তি জীবিত বেঁচে গিয়েছিলাম। যদি আমাদের বুদ্ধি ঠিক থাকত তবে আমরা এত কিছু সংগ্রহ করে নিতাম যে সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়ে যেত। কিন্তু আমাদের আর কিছুই মাথায় আসেনি, কেবল একটি উটের ওপর যতটা সম্ভব আটা বোঝাই করে পালিয়ে এলাম।” [৩]

আল্লামা ইবনুল আসীর (রহ.) এই শহরগুলোতে গণহত্যার হৃদয়বিদারক কাহিনী লিখতে গিয়ে বলেন:

“এক তাতারী মহিলা একটি ঘরে প্রবেশ করল এবং পরিবারের সদস্যদের একে একে হত্যা করতে লাগল। লোকেরা তাকে...”

[১] তারিখ দাওয়াত ও আজিমত: ১/৩১৫। এর সদৃশ একটি বাক্য আল্লামা ইবনুল আসীর এভাবে বর্ণনা করেছেন: “إِنَّ قِيلَ إِنَّ التَّارَ يَقْتُلُونَ فَصَدِّقُوا، وَإِنْ قِيلَ إِنَّهُمْ” (যদি বলা হয় যে তাতারীরা হত্যা করছে তবে বিশ্বাস করো, আর যদি বলা হয় যে তারা পরাজিত হয়েছে তবে বিশ্বাস করো না)। (আল-কামিল ফিত তারিখ: ১০/৩৫৮)

[২] তারিখুল ইসলাম লিয-যাহাবী: সন ৬১৭ হিজরি

[৩] পূর্বোক্ত সূত্র

তাতারি সৈন্যেরা মনে করছিল (এজন্য তারা হাত তোলার সাহস করেনি) অবশেষে যখন সে হত্যার কাজ থেকে অবসর হয়ে নিজের অস্ত্র নামিয়ে রাখল, তখন এক ব্যক্তি তাকে চিনে ফেলল (যে সে একজন নারী) এবং তাকে হত্যা করল।

আরও লিখছেন:

“এক তাতারি সৈন্য একা একটি গলিতে প্রবেশ করল যেখানে একশ জন লোক ছিল। তাতারি একে একে তাদের সবাইকে হত্যা করতে লাগল। এমনকি তাদের একশ জনের মধ্যে একজনও বাকি রইল না, কেউ তার ওপর হাত তোলার সাহস করেনি। মানুষের ওপর হীনম্মন্যতা ছেয়ে গিয়েছিল। তারা নিজেদের আত্মরক্ষা করতেও চাচ্ছিল না, তারা সংখ্যায় কম হোক বা বেশি। এমন লাঞ্ছনা থেকে আল্লাহর পানাহ।” [১]

আল্লামা ইবনে আসির (রহ.) অত্যন্ত বেদনাদায়ক ভঙ্গিতে লিখছেন:

“আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের এবং ইসলামের জন্য এমন কোনো ব্যক্তিকে সহজ করে দিন যে তাদের হেফাজত ও প্রতিরক্ষা করতে পারে। নিঃসন্দেহে মুসলমানদের যে শত্রুর সাথে পাল্লা দিতে হয়েছে, সে অত্যন্ত শক্তিশালী এবং যে বাদশাহ তাদের ভাগ্যে জুটেছে, তার মনোযোগ নিজের লালসা ও উদরপূর্তি ছাড়া অন্য কিছু দিকে নেই।” [২]

খলিফার কর্মপন্থা:

তাতারিদের জন্য এখন বাগদাদ আক্রমণের পথে দৃশ্যত কোনো বাধা ছিল না। এই পরিস্থিতি খলিফা নাসিরের কাছেও গোপন ছিল না।

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১০/৩৩৮, ত. দারুল কিতাব আল-আরাবি।

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১০/৩৩৭, ত. দারুল কিতাব আল-আরাবি।

তাতারিদের হাতে জানমালের ক্ষতির একটি আনুমানিক হিসাব: যদি সামগ্রিকভাবে দেখা যায় তবে তাতারিরা ৬১২ হিজরি থেকে ৬৫৮ হিজরি পর্যন্ত ৪৬ বছর ধরে চলা এই ধ্বংসযজ্ঞে প্রায় দুই কোটি মুসলমানকে হত্যা করেছিল। যেসব শহরে তাতারিরা ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল, তার মধ্যে কিছু বড় এবং কিছু ছোট ছিল। ১২টি বড় শহর ছিল: বুখারা, সমরকন্দ, উরগঞ্জ, নিশাপুর, রে, হামদান, নিসা, হেরাত, বাগদাদ, ইরবিল, গজনী। (এর মধ্যে লাহোর, মুলতান, শাহপুর (সরগোদা), ইসফাহান, আলেক্সো এবং দামেস্ক অন্তর্ভুক্ত নয় যেখানে পূর্ণ হত্যাকাণ্ড ঘটেনি বরং আংশিক হত্যা বা লুটতরাজ হয়েছিল)। ১২টি বড় শহরের মধ্যে মাত্র ৬টি শহরের নিহতের পরিসংখ্যান পাওয়া যায়:

- “রে”-তে সাত লাখ।
- উরগঞ্জে বারো লাখ।
- মার্ভে তেরো লাখ।
- নিশাপুরে পনেরো লাখ।
- হেরাতে ষোলো লাখ।
- বাগদাদে আঠারো লাখ।

(বালখের শহীদদের মধ্যে শুধু সাদাত, ওলামা ও মাশায়েখের সংখ্যা পাওয়া যায় যা পঞ্চাশ হাজার)।

২৫টি ছোট শহর ছিল: উতারার, জিন্দ, খুজান্দ, তিরমিজ, ফারিয়াব, মায়মানা, আন্দখুই, জুজজান, বাদঘিস, জাবুল, তালকান, বামিয়ান, সিস্তান, কাজভিন, খালাত, দুকাকাত, তিবরিজ, খাবুর, বিলকান, সারাও, মারদিন, মিয়াফারিকিন, আমদ, আসফারাদ, আরদাবিল। এর মধ্যে শুধু কাজভিনের শহীদদের সংখ্যা বর্ণিত আছে যা ৪০ হাজার। (কুর্মান ও খুজদারসহ অনেক ছোট শহর যেখানে পূর্ণ হত্যাকাণ্ড ঘটেনি, এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি)। এছাড়া তুলক, সিফিদ কুহ, ফিরোজ কুহ, কালিয়ুন, আশিয়ার, ফিওয়ারের মতো দুর্গও ছিল যেখানে পূর্ণ বা আংশিক হত্যাকাণ্ড হয়েছিল কিন্তু তাদের কারো নিহতের পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। গ্রামীণ এলাকাগুলোতেও অনেক লোক নিহত হয়েছিল, যাদের পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না কিন্তু কিছু ঐতিহাসিকের বক্তব্য থেকে ধারণা করা যায় যে, একটি দেশের গ্রামীণ এলাকার নিহতের সংখ্যা কয়েক লাখে পৌঁছাত। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন লেখকের কাজ: ‘বখিরে খাওয়ারজম সুলতান জালালুদ্দিন আওর তাতারি ইয়ালগার’। মূল উৎসের জন্য দেখুন: আল-কামিল ফিত তারিখ, তারিখ-ই-জাহান কুশা জুওয়াইনি, তারিখ-ই-হাবিবুস সিয়ান, রওজাতুস সাফা, জামিউত তাওয়ারিখ, তারিখ-ই-গুজিদা, তারিখ-ই-ওয়াসসাফ)।

আমাদের কাছে ১২টি বড় শহরের মধ্যে মাত্র ৬টির পরিসংখ্যান রয়েছে যার মোট শহীদদের সংখ্যা ৮১ লাখ হয়। এভাবে প্রতি শহরের নিহতের গড় সংখ্যা ১৩ লাখ ৫০ হাজার হয়। এর ভিত্তিতে ১২টি বড় শহরের মোট শহীদদের আনুমানিক সংখ্যা ১ কোটি ৬২ লাখ হয়। এর সাথে ২৫টি ছোট শহরকে ২০ হাজারের গড় ধরলে ৫ লাখ সংখ্যা দাঁড়ায়। ছোট ও বড় শহরের নিহতের এই আনুমানিক সংখ্যা ১ কোটি ৬৭ লাখে পৌঁছায়। রণক্ষেত্রে শহীদ হওয়া সৈন্য এবং স্বেচ্ছাসেবক এর বাইরে। আমরা ধারণা করতে পারি যে এই ৪৬ বছরে প্রায় ৫০ লাখ মুসলমান বিভিন্ন যুদ্ধে অবশ্যই শহীদ হয়েছেন। এভাবে এই সংখ্যা ২ কোটি ১৭ লাখে পৌঁছায়। আর যদি গ্রামগঞ্জের নিহতদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় তবে এই সংখ্যা ২ কোটি ছাড়িয়ে যেতে পারে।

ছিল। তিনি এরবিলের শাসককে বলে ‘দরবান্দাত’-এর গিরিপথগুলোতে গেরিলা যুদ্ধে পারদর্শী কুর্দিদের প্রহরা বসিয়ে দিলেন। এর পাশাপাশি খলিফা মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব খাটিয়ে তাতারদের ইরাকে প্রবেশ থেকে বিরত রাখার কৌশল অবলম্বন করেন।

যখন তাতার বাহিনী ইরাক সীমান্তে পৌঁছাল, তখন তাদের প্রতিনিধি প্রথা অনুযায়ী আনুগত্যের আহ্বান জানানোর জন্য রওনা হলো। খলিফা এই খবর শুনে বাগদাদ ও এর আশপাশের এলাকায় ঘোষণা দিয়ে অসংখ্য গ্রামবাসী ও শহরবাসীকে একত্রিত করলেন এবং তাদের অস্ত্র ও পোশাকে সজ্জিত করলেন। এখন দেখতে এটি একটি বিশাল বাহিনী মনে হচ্ছিল। খলিফা এই বাহিনীর এক অংশকে এরবিল এবং অন্য অংশকে দাকুকায়ে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানকার কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হলো যে, যখন তাতার দূত দেখা করতে আসবে, তখন খোলা ময়দানে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে যেখানে নিজেদের বাহিনীর সাথে এই কৃত্রিম বাহিনীকে মিশিয়ে দূতকে আতঙ্কিত করতে হবে।

যখন তাতার দূত এরবিলের বাইরে পৌঁছাল, তখন মাইলের পর মাইল বিস্তৃত এই বাহিনী দেখে সে হতভম্ব হয়ে গেল। দূতকে বাহিনীর সারির মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। এই সময়ে এই চাতুরিও করা হলো যে, দূত যে দলগুলোকে পরিদর্শন করে সামনে এগিয়ে যেত, সেই দলগুলো নিজেদের জায়গা ছেড়ে একটি দীর্ঘ পথ ঘুরে পাহাড় ইত্যাদির আড়াল দিয়ে পুনরায় সামনের সারিতে যোগ দিত। এভাবে চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজারের বাহিনী দূতের কাছে পাঁচ-ছয় লাখের বাহিনী বলে মনে হলো। এরপর দূত দাকুকায়ে পৌঁছাল যেখানে দুর্গের দায়িত্বে ছিলেন খলিফা নাসিরের এক গোলাম। সেখানে আগের চেয়েও বেশি জাঁকজমক প্রদর্শন করা হলো। খলিফার গোলাম শহরের বাইরে একটি অত্যন্ত উঁচু সিংহাসনে বসে ছিলেন যার সামনে বিশ হাজার সৈন্য খোলা তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল এবং চারপাশে অর্ধবৃত্তাকারে অত্যন্ত চমৎকার তাবু খাটানো ছিল। মাঝখানে দুই কিলোমিটার পর্যন্ত গালিচা বিছানো ছিল। দূত সেখানে পৌঁছালে তার জুতো খুলে নেওয়া হলো এবং যখন সে খলিফার গোলামের সিংহাসনের সামনে পৌঁছাল, তখন তাকে সিজদা করতে বাধ্য করা হলো। দূতের আতঙ্কিত হওয়ার অবস্থা ছিল দেখার মতো।

এরপর দূতকে বাগদাদে পাঠানো হলো এবং এদিকে বাগদাদ ও আশপাশের সমস্ত ঘোড়া, খচ্চর, গাধা ও উট একত্রিত করে সেগুলোর ওপর অস্ত্র ও পতাকাসহ অসংখ্য কৃত্রিম সৈন্য বসিয়ে দেওয়া হলো। সেই সাথে আতশবাজির শত শত বিশেষজ্ঞকে ডেকে আনা হলো। দূত সেখানে পৌঁছালে আতশবাজিতে আকাশ-পাতাল লাল হয়ে যাচ্ছিল। এরপর দূত যখন বাগদাদে প্রবেশ করল, তখন খলিফার আসল বাহিনী তাকে অভ্যর্থনা জানাল যার প্রতিটি সওয়ারী হীরা-মুক্তা খচিত রেশমি সোনালি পোশাকে সজ্জিত ছিল। যখন সে খলিফার চৌকাঠ পর্যন্ত পৌঁছাল, তখন তাকে বলা হলো চৌকাঠের নিচের ধাপে চুম্বন করো, কারণ উপরের ধাপটি বাদশাহদের জন্য সংরক্ষিত।

দূতকে অল্প সময়ের জন্য খলিফার সামনে আনা হলো এবং তারপর তাকে এই বলে রাতের অন্ধকারে প্রাসাদের গোপন দরজা দিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হলো যে, শহরবাসী তার আগমনে উত্তেজিত, তাই এখানে তার জীবনের ঝুঁকি রয়েছে। দূত ফিরে গিয়ে যখন এই অবস্থা বর্ণনা করল, তখন তাতাররা বাগদাদ আক্রমণ থেকে বিরত থাকল। [১]

[১] তারিখুল ইসলাম লিখ-যাহাবি: ৩৩ / ৩৮, ৩৯, তাদমুরি। খলিফা নাসিরের এই চাল নিশ্চিতভাবেই চমৎকার ছিল এবং নিরুপায় অবস্থায় এমনটি করা অনিবার্য ছিল। সম্ভবত সেই সময় বাগদাদে কোনো ইবনে আলকামি ছিল না, অন্যথায় রহস্যটি তখনই ফাঁস হয়ে যেত। প্রকৃতপক্ষে প্রতারণা টেকসই কৌশলের বিকল্প হতে পারে না। এই কারণেই শেষ পর্যন্ত বাগদাদের পরিণতি খাওয়ারিজমের চেয়ে ভিন্ন হয়নি।

সুলতান জালাল উদ্দিন খাওয়ারজম শাহ

(৬১৭ হিজরি থেকে ৬২৮ হিজরি / ১২২০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২৩১ খ্রিষ্টাব্দ)

এই যুগের অধিকাংশ সুলতান তাতারী আক্রমণের সামনে আত্মসমর্পণ করেছিলেন এবং জিহাদের চেতনা ভুলে গিয়ে মুসলমানদের এই বিশাল গণহত্যার নীরব দর্শক হয়ে ছিলেন। কিন্তু এই চরম অস্থির সময়ে সাহস, উদ্দীপনা, কর্তব্যবোধ এবং জিহাদের চেতনায় উজ্জীবিত এমন এক চরিত্রের দেখা মেলে, যিনি এই বিশ্বব্যাপী দুর্যোগ থেকে সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে রক্ষার দায়িত্ব একাই নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন এবং মুসলিম শাসকদের ত্রুটি-বিচ্যুতির কাফফারা আদায়ের জন্য জীবন বাজি রেখে এই দায়িত্ব পালনের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। ইতিহাসের এই অমর চরিত্র এবং ইসলামের এই মহান সন্তান ছিলেন ‘সুলতান জালাল উদ্দিন মিনকুবিরনি খাওয়ারজম শাহ’। হতাশার ঘনঘটায় সুলতান জালাল উদ্দিনই ছিলেন সেই মুজাহিদ, যিনি আশার প্রদীপ হয়ে জ্বলে উঠেছিলেন। বর্বরতা ও পাশবিকতার তুফানি ঝড়ে তিনিই ছিলেন সেই ব্যক্তি, যিনি ইসলামের তাঁবুকে উপড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য নিজের সমস্ত শক্তি ব্যয় করেছিলেন এবং মানব ইতিহাসের এই দ্রুততম ও বিপজ্জনক আক্রমণের গतिकে কেবল মন্তরই করেননি, বরং অনেক স্থানে শত্রুকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে তাদের সেই দম্ভও চূর্ণ করে দিয়েছিলেন, যার জোরে তারা সমগ্র মুসলিম বিশ্ব জয়ের স্বপ্ন দেখছিল।

সুলতানের সংগ্রাম কেবল খাওয়ারজমের মুসলমানদের সমর্থন ও সুরক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তাঁর কর্মকাণ্ডের পরিধি মাওরাউন নহর থেকে হিন্দুস্তান পর্যন্ত এবং সিন্ধু উপকূল থেকে ককেশাস পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ঐতিহাসিক প্রমাণের আলোকে পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে বলা যেতে পারে যে, তাতারীদের এই সীমাহীন প্লাবন যা তার জলোচ্ছ্বাসের প্রথম বছরেই চীন থেকে কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত এলাকাগুলোকে গ্রাস করে নিয়েছিল, তা যদি সুলতান জালাল উদ্দিন খাওয়ারজম শাহের রূপ ধারণ করা লৌহপ্রাচীরের সাথে ধাক্কা খেয়ে থেমে না যেত, তবে পরবর্তী দুই-চার বছরের মধ্যে সমগ্র আফ্রিকা ও ইউরোপও এর কবলে পড়ে তছনছ হয়ে যেত। বাস্তবতা হলো এই যে, দশ বছর ধরে চেন্সিসী আক্রমণের সামনে ইস্পাতকঠিন ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে সুলতান জালাল উদ্দিন বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের ওপর এবং সাধারণভাবে বিশ্বের সমস্ত জাতির ওপর এমন এক অনুগ্রহ করেছেন যা ভুলে যাওয়া চরম অবিচার।

এশিয়া মহাদেশের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ জুড়ে বিস্তৃত সুলতান জালাল উদ্দিনের ঐতিহাসিক রণতৎপরতা মূলত এমন এক মহান জিহাদি আন্দোলনের বহিঃপ্রকাশ ছিল, যাকে আমরা গুরুত্বের বিচারে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী রহ.-এর...

তারিখ উন্মতে মুসলিমা - চতুর্থ খণ্ড

সুলতান জালালুদ্দিনের সিংহাসন আরোহণ (৬১৭ হিজরি - ১২২০ খ্রিস্টাব্দ):

সুলতান জালালুদ্দিন মিংবানু ছিলেন আলাউদ্দিন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র। বীরত্ব, মেধা ও সতর্কতা ছিল তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট্য। সমরকলা ও রণকৌশলে সেই যুগে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। তিনি বিলাসিতা ও আরাম-আয়েশ অপছন্দ করতেন এবং সৈনিকসুলভ খেলাধুলার অনুরাগী ছিলেন। পিতার শাসনামলে তিনি আফগানিস্তানের মধ্য ও দক্ষিণ অঞ্চলের (গজনি, কান্দাহার, নিমরোজ ইত্যাদি) গভর্নর ছিলেন। যেহেতু তিনি পিতার অত্যন্ত অনুগত ছিলেন, তাই তাতার ঝড়ের সময় সুলতান আলাউদ্দিন মুহাম্মদ শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য তাঁর বারবার পিড়াপিড়ি সত্ত্বেও তাঁকে নিজের সাথে নিরন্তর সফর ও ক্রমাগত পলায়নের সময় সাথে রাখেন এবং কোনো মুহূর্তেই তাঁর হাতে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব তুলে দেননি।

যখন ৬১৭ হিজরিতে (১২২০ খ্রিস্টাব্দ) কাস্পিয়ান সাগরের (বাহরে খাযার) একটি দ্বীপে সুলতান আলাউদ্দিন মুহাম্মদ মৃত্যুবরণ করেন, তখন সুলতান জালালুদ্দিন খাওয়ারিজম সালতানাতের উত্তরাধিকারী হন। সুলতান জালালুদ্দিনের জন্য এই ধ্বংসপ্রাপ্ত রাজ্যকে নেকড়েদের কবল থেকে বের করে আনা ছিল জীবন বাজি রাখার মতো কাজ; তাই এই সিংহাসন ফুলের শয্যা নয়, বরং কাঁটার বিছানা ছিল। কিন্তু সুলতান জালালুদ্দিন কঠিন পরিস্থিতিতে দমে যাওয়ার পাত্র ছিলেন না। পিতার মতো মুখ লুকিয়ে পালিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে তিনি মুষ্টিমেয় একদল স্বেচ্ছাসেবককে সাথে নিয়ে মুজাহিদসুলভ হুংকারে তাতারদের মোকাবিলায় বেরিয়ে পড়েন।

সৌভাগ্যবশত সেই সময় পর্যন্ত খাওয়ারিজমের রাজধানী “উরগঞ্জ” তার দুর্ভেদ্য প্রাচীর এবং আমু দরিয়ার প্রাকৃতিক পরিখার কারণে তাতারদের আক্রমণ থেকে নিরাপদ ছিল। সুলতান জালালুদ্দিন “উরগঞ্জ” পৌঁছান এবং তাতারদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন। খাওয়ারিজমের চার লক্ষ সৈন্যের বিশাল বাহিনী ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

সুলতান জালালুদ্দিন শত্রুর মোকাবিলায় স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ শুরু করেন, কিন্তু এরই মধ্যে একটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। এমন নাজুক পরিস্থিতিতেও, যখন তাতাররা উরগঞ্জে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল, খাওয়ারিজম দরবারের কিছু প্রভাবশালী সর্দার ও শাহজাদা সুলতানকে ক্ষমতাচ্যুত করে হত্যা করার পরিকল্পনা করে। পরিস্থিতির অবনতি হতে থাকে। অবশেষে সুলতান বাধ্য হয়ে তাঁর তিনশ অনুগত সঙ্গীকে নিয়ে গোপনে “উরগঞ্জ” থেকে বেরিয়ে যান।

পথে “উস্তাওয়া” নামক স্থানে একটি তাতার বাহিনী তাঁদের ঘিরে ফেলে। সুলতান জালালুদ্দিন তাঁর অগ্নি কয়েকজন জানবাজকে নিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করেন এবং লাশের স্তুপ জমিয়ে দেন। সুলতান “উরগঞ্জ” থেকে বের হওয়ার কয়েকদিন পর তাতারদের একটি বিশাল বাহিনী শহর আক্রমণ করে এবং স্থানীয় সর্দার ও জনগণের প্রতিরোধ সত্ত্বেও শহর দখল করে সাধারণ হত্যাকাণ্ডের পর আমু দরিয়ার বাঁধ ভেঙে দেয়, যার ফলে পুরো শহর জনবসতিসহ পানির নিচে তলিয়ে গিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। [১]

[১] সিরাত সুলতান জালালুদ্দিন লিন-নাসাউয়ি, পৃ. ২৩ থেকে ১২২, দারুল ফিকর আল-আরাবি কায়রো; আল-কামিল ফিত-তারিখ সন ৬১৭ হিজরি; নিহায়াতুল আরাব লিন-নুওয়াইরি: ২৭, ২৫২, ২৫৩, কায়রো; তারিখ ইবনে খালদুন: ৫/১৩৬ থেকে ১৩৮, দারুল ফিকর।

জিহাদের নতুন আন্দোলন..... বিজয়ের যুগ:

৬১৮ হিজরীর শুরুতে (মার্চ ১২২১ খ্রিষ্টাব্দ), সুলতান জালালুদ্দিন খোরাসানের দিকে যাত্রা করেন। যারা তাতারীদের আতঙ্কে থরথর করে কাঁপছিল, তারা তাঁর সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে শুরু করল। তবে এত অল্প সময়ে এই অনভিজ্ঞ লোকদের নিয়ে এমন শক্তিশালী বাহিনী গঠন করা সম্ভব ছিল না যা বিশ্বব্যাপী এই তুফানের মোকাবিলা করতে পারে। সুলতান খোরাসানের আত্মমর্যাদাশীল ও লড়াকু মুসলমানদের ওপর বড় আশা পোষণ করতেন যারা প্রতিটি যুগে ইসলামী বিজয়ের অগ্রগামী দল হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। ফলে সুলতান দক্ষিণ খোরাসানের নিমরোজ প্রদেশের ‘বুস্ত’ শহরে তাবু গাড়লেন। সুলতানের আগমনের খবর পেয়েই আমীনুল মুলক দশ হাজার বীরের সাথে উপস্থিত হয়ে জিহাদের জন্য নিজের সেবা পেশ করলেন। সুলতানের পরিকল্পনা ছিল তাতারীদের সাথে মোকাবিলা এমন কোনো স্থান থেকে শুরু করা যেখানে কম থেকে কম জানমালের ক্ষতি স্বীকার করে শত্রুর বেশি থেকে বেশি সৈন্য ধ্বংস করা যায়, যাতে নিজের শক্তি সংরক্ষিত রেখে শত্রুকে ভীত-সন্ত্রস্ত করা যায় এবং সেইসব আতঙ্কিত মুসলমানদের যারা তাতারীদের অপরাজেয় মনে করে নিয়েছে, তাদের ভয় ও ত্রাসের পরিবেশ থেকে বের করে আনা যায়। ফলে তাঁদের সম্মিলিত বাহিনী কান্দাহারের দিকে যাত্রা করল যেখানে তাতারী বাহিনী শহরটি অবরোধ করে রেখেছিল। সুলতান তাদের এমনভাবে ঘিরে ফেলে পরাজিত করলেন যে লাশের স্তুপ জমে গেল। এই বিজয়ে মুসলমানরা এক নতুন জীবন পেল এবং সুলতানের বীরত্বের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। [১]

গজনী ও পারওয়ানের যুদ্ধসমূহ:

কান্দাহারের পর সুলতান জালালুদ্দিন গজনীর দিকে যাত্রা করলেন। এখানে হাজার হাজার উপজাতীয়রা স্বেচ্ছায় মুজাহিদ বাহিনীতে যোগ দিল। কাবুলের শাসক মালিক শীরা এবং খিলজি সরদার সাইফুদ্দিন ইগরাকও এক বিশাল বাহিনী নিয়ে সুলতানের সাহায্যে পৌঁছে গেলেন। চেঙ্গিস খান, যে কান্দাহারের পরাজয়ের পর রাগে ফুঁসছিল, শগি কুতুকু নামক এক বিশ্বস্ত সেনাপতির নেতৃত্বে সুলতানের বাহিনীর মোকাবিলায় এক বিশাল বাহিনী পাঠাল। গজনীর বাইরে পারওয়ান নামক স্থানে উভয় বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ হলো। তিন দিন পর্যন্ত উভয় বাহিনীর মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ চলতে থাকল। চতুর্থ দিনে তাতারীদের দম ফুরিয়ে গেল এবং তারা অসংখ্য লাশ ফেলে রেখে পিছু হটল। সুলতানের নির্দেশে তুর্কি ও আফগান মুজাহিদরা তাদের পিছু ধাওয়া করল এবং পলায়নরত অবস্থায় তাদের অধিকাংশকে মৃত্যুর কোলে পাঠিয়ে দিল। এই স্মরণীয় যুদ্ধ ৬১৮ হিজরীর রজব মাসে (আগস্ট ১২২১ খ্রিষ্টাব্দ) সংঘটিত হয়েছিল।

সুলতান জালালুদ্দিন জানতেন যে চেঙ্গিস খানের সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে মোকাবিলা না করে তাতারীদের চূড়ান্তভাবে পরাজিত করা কঠিন, তাই তিনি চেঙ্গিস খানকে একটি বার্তা পাঠালেন যে সে সময় তালকানে অবস্থান করছিল:

[১] রওজাতুস সাফা: ৫/৩২৭ থেকে ৩৩৩; তারিখ ইবনে খালদুন: ৫/১১৩৭; তারিখ জাহান কুশা জুওয়াইনি, পৃষ্ঠা: ৩৬৭, ৩৭৭; আল-হরমাস (সীরাতে জালালুদ্দিন), পৃষ্ঠা: ১২২ থেকে ১৩৩।

আবদুল্লাহ মুস্তাওয়ীর বর্ণনা অনুযায়ী, এই এক বছরে সুলতান জালালুদ্দিন এবং তাতারীদের মধ্যে সাতটি যুদ্ধ হয়েছিল যার প্রতিটিতেই সুলতান জালালুদ্দিন বিজয়ী হয়েছিলেন। (তারিখ গুজিদাহ, পৃষ্ঠা: ৪৯১; আল-ইত্তিশারাত আমির কবির ইরান)

তারিখে উম্মতে মুসলিমা — চতুর্থ খণ্ড

“আমি তোমাকে মোকাবিলার দাওয়াত দিচ্ছি। আমাকে বলো তোমার কোন ময়দান পছন্দ, যাতে আমি সেখানে পৌঁছে তোমার মোকাবিলা করতে পারি এবং তুমিও সশরীরে ময়দানে নেমে আসো।”

সুলতানের এই সাহসী হুঙ্কারে গোবি মরুভূমির নেকড়ে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে গেল। সে সুলতানের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার পরিবর্তে তার সবচেয়ে ধূর্ত ও নিষ্ঠুর পুত্র তুলি খানের নেতৃত্বে আগের চেয়ে বেশি প্রস্তুতি নিয়ে সুলতানকে দমনের জন্য এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করল। সুলতান তাতারীদের বেশি দূর অগ্রসর হওয়ার সুযোগ না দিয়ে নিজেই অগ্রযাত্রা শুরু করলেন এবং কাবুল থেকে সামনে পারওয়ান জেলায় তাবু স্থাপন করলেন।

এই সময়ে সুলতান খবর পেলেন যে, তাতারীদের আরেকটি বাহিনী পারওয়ান ও বামিয়ানের মাঝে অবস্থিত ওয়ালিয়ান দুর্গে আক্রমণ করেছে। সুলতান তার নির্বাচিত দ্রুতগামী সেনাদল নিয়ে সেদিকে অগ্রসর হলেন এবং দুর্গ অবরোধকারী তাতারীদের ওপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে তাদের প্রায় এক হাজার জনকে হত্যা করলেন এবং বাকিদের পিছু হটতে বাধ্য করলেন। এই বিজয়ে সুলতান প্রচুর গনিমতের মাল লাভ করলেন, যার ফলে অস্ত্রশস্ত্র ও সওয়ারির অভাব পূরণ হয়ে গেল।

সুলতান জালালুদ্দিনের পারওয়ান পৌঁছানোর এক সপ্তাহ পর তুলি খানের নেতৃত্বে তাতারীদের পঙ্গপালের মতো বিশাল বাহিনী উত্তাল প্লাবনের মতো পারওয়ানের সীমানায় প্রবেশ করল। এই বাহিনীর আধিক্য এমন ছিল যে, চারদিকে শুধু মাথা আর মাথাই দেখা যাচ্ছিল। বিজিত প্রদেশগুলোর বিপুল সংখ্যক মুসলিম বন্দিও তাদের সাথে ছিল, যাদের দিয়ে জোরপূর্বক শ্রম নেওয়ানো হতো এবং যুদ্ধের সময় তাদের মাধ্যমে নিজেদের সংখ্যা আরও বেশি দেখিয়ে প্রতিপক্ষের মনে ত্রাস সৃষ্টি করা হতো। তাতারী বাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়ে সুলতান জালালুদ্দিন পারওয়ানের কেন্দ্র চারিকারের উত্তর-পূর্ব দিকে অগ্রসর হলেন এবং প্রায় তিন মাইল পথ অতিক্রম করে এক বিশাল ময়দানে পাহাড়ি এলাকাকে পেছনে রেখে নিজের বাহিনীর ব্যূহ রচনা করতে লাগলেন।

মুজাহিদীনে ইসলামের সংখ্যা ছিল প্রায় এক লক্ষ। তারা অতীতের সকল পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ব্যাকুল ছিল। সুলতান জালালুদ্দিন বাহিনীর ডান পার্শ্বে আমিনুল মুলক এবং বাম পার্শ্বে সাইফুদ্দিন ইগরাককে নিযুক্ত করলেন এবং নিজে বাহিনীর মধ্যভাগে অবস্থান নিলেন। সূর্য কিছুটা উপরে উঠতেই তাতারী বাহিনী ধুলোবালি উড়িয়ে ময়দানের অপর প্রান্তে এসে পৌঁছাল। সুলতান জালালুদ্দিন তাদের আধিক্য দেখে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না, তার নিজের রবের ওপর পূর্ণ ভরসা ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রের প্রাকৃতিক গঠন ও অবস্থান বিবেচনা করে এবং নিজের সৈন্যদের মন থেকে পলায়নের সামান্যতম সংশয়ও দূর করার জন্য সুলতান নির্দেশ দিলেন: “সকল সৈন্য ঘোড়া থেকে নেমে পায়ে হেঁটে যুদ্ধ করো এবং পূর্ণ দৃঢ়তা প্রদর্শন করো।”

তাতারী অফিসাররা মুসলিম সৈন্যদের পায়ে হেঁটে যুদ্ধ করতে দেখে অবাক হয়ে গেল। অবশেষে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল এবং উভয় বাহিনী একে অপরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমিনুল মুলকের নেতৃত্বে ইসলামি বাহিনীর ডান পার্শ্ব অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে মোকাবিলা করছিল। এটি দেখে তাতারী প্রধান সেনাপতি তুলি খান দশ হাজার সতেজ সৈন্য সেই দিকে পাঠিয়ে দিলেন যাতে মুসলমানদের ডান পার্শ্বকে হটাতে...

কেটে তছনছ করে দেওয়া হোক। এভাবে আমিনুল মুলকের বাহিনীর ওপর তাতারী আক্রমণকারীদের চাপ বাড়তে থাকে। এমনকি ইসলামী বাহিনীর ডান পার্শ্বকে উল্টো পায়ে পিছু হটতে হয়।

বাহিনীর কেন্দ্রে অবস্থানরত সুলতান জালালুদ্দিন এই নাজুক পরিস্থিতি দেখামাত্রই কেন্দ্রের নেতৃত্ব একজন বিশ্বস্ত জেনারেলের হাতে ন্যস্ত করেন এবং নিজে তাঁর বিদ্যুৎগতি সম্পন্ন বাহিনীর সাথে ডান পার্শ্বের দিকে ছুটে যান। সুলতানের সময়োচিত আগমানে পিছু হটতে থাকা সৈন্যদের হৃদয় পুনরায় শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং তারা পা জমিয়ে তাতারীদের মোকাবিলায় অটল হয়ে দাঁড়ায়। সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ পূর্ণ তীব্রতায় চলতে থাকে কিন্তু কোনো ফয়সালা হতে পারেনি।

তাতারী যোদ্ধারা ধোঁকাবাজি ও চাতুর্যে নিজেদের কোনো তুলনা রাখত না। এই সুযোগে তারা এক অদ্ভুত চাল চালল। দিনভর লড়াইয়ে হাজার হাজার তাতারী মারা গিয়েছিল। তাতারীরা কাঠের মূর্তি বানিয়ে নিজেদের নিহতদের কাপড় তাদের পরিয়ে দেয় এবং এই উর্দি পরা মূর্তিগুলোকে নিহতদের খালি ঘোড়ার জিনের ওপর বসিয়ে দেয়। এই কৃত্রিম বাহিনীকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে এক স্থানে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। পরদিন সকালে উভয় বাহিনী পুনরায় মুখোমুখি হলো। তাতারী বাহিনীর লোকবলের আধিক্য এবং তাদের কঠোরতা গতদিনের লড়াইয়ে খ্যাতি অফিসারদের বেশ দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল। আজকের লড়াই শুরু হওয়ার আগেই তারা আরও একটি ধাক্কা খেল। দূরের দিগন্তে এক নতুন তাতারী বাহিনীর আগমনের চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল। হাজার হাজার অশ্বারোহী গিরিপথ থেকে বেরিয়ে এই বিশাল ময়দানের শেষ প্রান্তে টহল দিতে দেখা যাচ্ছিল।

অফিসাররা সুলতান জালালুদ্দিনকে এই দৃশ্য দেখিয়ে বললেন:

“তাতারীদের জন্য বিশাল সংখ্যায় সাহায্য এসে পৌঁছেছে। আমাদের বর্তমান সংখ্যা নিয়ে আমরা এই খোলা ময়দানে এত বড় বাহিনীর সাথে লড়াই করতে পারব না। ভালো হবে যদি এখনই পিছু হটে পেছনের পাহাড়ে অবস্থান গ্রহণ করা হয় এবং তীরন্দাজি ও পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করা হয়।”

কিন্তু শাহাদাতের সন্ধান পতঙ্গের মতো ঘুরে বেড়ানো সুলতান জালালুদ্দিনের কাছে চরম প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও শত্রুর সামনে অটল থাকার সাহস ছিল। এই নাজুক পরিস্থিতি দেখে এবং নিজের অফিসারদের পরামর্শ শুনে তিনি শান্তভাবে বললেন:

“আমার চূড়ান্ত নির্দেশ এটাই যে, গতদিনের মতো ঘোড়া থেকে নেমে যাও এবং পদাতিক হয়ে একযোগে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ো।”

সুলতানের নির্দেশ পালনে অফিসাররা নিজ নিজ সৈন্যদের ঘোড়া থেকে নামার সংকেত দিলেন এবং হঠাৎ নারায়ে তাকবীর ধ্বনি তুলে তাতারী বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালিয়ে দিলেন। তুমুল লড়াইয়ের শিখা পুনরায় জ্বলে উঠল। সাইফউদ্দিন ইগরাকের চল্লিশ হাজার খিলজি সৈন্য শত্রুর জন্য অত্যন্ত মারাত্মক প্রমাণিত হচ্ছিল। তাদের শক্তি চূর্ণ করার জন্য তাতারী বাহিনীর বাছাইকৃত বীরদের একটি তুফানি দল তাদের মোকাবিলায় থাকা তাতারী সৈন্যদের সাহায্যে পৌঁছে গেল এবং ইসলামী বাহিনীর বাম পার্শ্ব ও তাতারীদের ডান পার্শ্বের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। এই সুযোগে আফগান তীরন্দাজরা সুযোগ বুঝে তাতারীদের ওপর এমন তীব্রভাবে তীরের বৃষ্টি বর্ষণ করল যে শত্রু মুখ ফিরিয়ে পিছু হটতে শুরু করল। এর সাথে সাথে ইসলামী বাহিনীর বাকি দলগুলোও

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা (মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস) - চতুর্থ খণ্ড

নিজের মোকাবিলায় তাতারী কাতারগুলোকে তছনছ করে দিলেন। তাতারীদের পা উপড়ে গিয়েছিল এবং তারা ময়দান থেকে পলায়নের পথ বেছে নিচ্ছিল। সুলতান জালালুদ্দিন শত্রুকে জীবিত পালানোর সুযোগ দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি ইশারা করলেন এবং কুচ-এর (অভিযানের) দামামা বেজে উঠল। সমস্ত মুজাহিদ সতেজ ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে তাতারী বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবনে রওনা হলেন। পলায়নরত তাতারীরা সামনে গিয়ে লাঞ্ছনা ও অপমানের দাগ মোছার জন্য শেষ চেষ্টা হিসেবে এক ময়দানে ব্যূহ রচনা করল। অশ্বারোহী মুজাহিদরা এখানে পৌঁছানো মাত্রই পুনরায় অত্যন্ত তীব্র লড়াই শুরু হলো। কিন্তু এই লড়াই বেশি দীর্ঘস্থায়ী হতে পারল না। মুসলমানদের প্রচণ্ড আক্রমণে তাতারীদের পা দ্রুতই উপড়ে গেল এবং তারা আবারও পিঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করল। সুলতানি বাহিনী তাদের পশ্চাদ্ধাবন অব্যাহত রাখল এবং এই পশ্চাদ্ধাবনের সময় হাজার হাজার কাফেরকে হত্যা করল। একটি বর্ণনা অনুযায়ী, নিহতদের মধ্যে চেঙ্গিস খানের পুত্র তুলি খানও অন্তর্ভুক্ত ছিল। [১]

মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ

একের পর এক বেশ কিছু ময়দানে তাতারীদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করার পর সুলতান জালালুদ্দিন পূর্ণ বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং এই দুই যুদ্ধের ফলাফলের ফলে চেঙ্গিস খানের মস্তিষ্ক থেকে সারা বিশ্ব তছনছ করার উন্মাদনা বের করে দিয়ে তাকে গোবি মরুভূমির পথ মাপতে বাধ্য করতে পারতেন। কিন্তু আশার এই প্রদীপ্ত প্রদীপকে একটি আকস্মিক দুর্ঘটনার ঝড় হঠাৎ নিভিয়ে দিল। ইসলামী লঙ্করের দুই বড় সরদার: সাইফউদ্দিন ইগরাক এবং আমিনুল মুলক গনিমতের মালে প্রাপ্ত একটি ঘোড়ার মালিকানা নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিবাদে জড়িয়ে পড়লেন। এই সংঘর্ষে সাইফউদ্দিনের ভাই নিহত হলেন। সুলতান জালালুদ্দিন যখন এই পরিস্থিতির কথা জানতে পারলেন, তখন তার হৃদয়ে যেন কিয়ামত নেমে এল। তিনি উভয় পক্ষের মধ্যে মীমাংসা করার আশ্রয় চেষ্টা করলেন, কিন্তু সাইফউদ্দিন ইগরাক, যিনি ক্রোধ ও রাগে নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়েছিলেন, কিছু শুনতেই প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি তার গোত্রীয় যোদ্ধাদের নিয়ে সুলতানের বাহিনী থেকে পৃথক হয়ে গেলেন। অনেক খিলজি ও ঘুরি সরদারও তার অনুসরণ করল। এটি ইসলামী বাহিনীর জন্য এক চরম আঘাত এবং ইসলামের শত্রুদের জন্য এক সুবর্ণ সুযোগ ছিল। চেঙ্গিস খান পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হওয়া মাত্রই তার সমস্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাহিনীকে তলব করলেন এবং প্রলয়ংকরী ঝড়ের মতো গজনির দিকে ধাবিত হলেন। পথে তার পুত্র চাগতাই এবং ওগতাই মধ্য এশিয়ায় মোতায়েনকৃত বাহিনী নিয়ে তার সাথে এসে মিলিত হলো। [২]

معركة نيلام (নীলব-এর যুদ্ধ): (শাওয়াল ৬১৮ হিজরি - নভেম্বর ১২২১ খ্রিস্টাব্দ)

সুলতান জালালুদ্দিন তার অবশিষ্ট ক্লান্ত-শ্রান্ত বাহিনীর সাথে এই বিশাল বাহিনীর মোকাবিলা খোলা ময়দানে করাকে হিকমতের পরিপন্থী মনে করলেন এবং সিন্ধু নদের দিকে যাত্রা করলেন যাতে তা অতিক্রম করে হিন্দুস্তানে প্রবেশ করতে পারেন এবং দিল্লির সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুতমিশের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে পারেন। কিন্তু চেঙ্গিস খান সুলতানের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে পশ্চাদ্ধাবন করে...

[১] রওজাতুস সাফা: ৫/৩৮, ৩৯; তারিখ ইবনে খালদুন: ৫/১১৩০; আল-কামিল ফিত তারিখ, সন ৬১৭ হিজরি; তারিখ-ই-জাহান কুশা, পৃষ্ঠা ৭৮, ৭৯, ৪৭, ত: হারমাস।

[২] রওজাতুস সাফা: ৫/৩৮; তারিখ ইবনে খালদুন: ৫/১১৪১; আল-কামিল ফিত তারিখ, সন ৬১৭ হিজরি; তারিখ-ই-জাহান কুশা জুওয়াইনি, পৃষ্ঠা ৩৮০, ত: হারমাস।

এত দ্রুততা প্রদর্শন করলেন যে সৈন্যদের খাবার রান্নার জন্য কোথাও খামার অনুমতি দিলেন না এবং একদিনে অনেকগুলো মঞ্জিল অতিক্রম করে রাতের অন্ধকারে সুলতানকে সিন্ধু নদের তীরে ‘নীলাব’ (নওশেরা জেলা) নামক স্থানে গিয়ে ধরলেন।

সকাল হলে সুলতান জালাল উদ্দিন নিজেকে তিন দিক থেকে তাতারীদের পঙ্গপাল সদৃশ বিশাল বাহিনীর ঘেরাওয়ের মধ্যে দেখতে পেলেন, আর পেছনে সিন্ধু নদের উত্তাল ঢেউগুলো পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়ছিল। এখন সম্মানের মৃত্যু ছাড়া আর কোনো পথ অবশিষ্ট ছিল না। সুলতান এই অবস্থাতেই নিজের জোয়ানদের কাতার বিন্যস্ত করলেন এবং যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে দিলেন। তিন দিন পর্যন্ত সিন্ধু নদের তীরে এমন ভয়াবহ লড়াই হলো যার সামনে পূর্ববর্তী সকল যুদ্ধ স্নান হয়ে গেল। আল্লামা ইবনুল আসীর রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন: [১]

“সবাই এ কথা স্বীকার করে যে, পূর্ববর্তী সকল যুদ্ধ এই যুদ্ধের সামনে ছিল নিছক একটি তামাশা।” [২]

চেঙ্গিস খানের লক্ষাধিক সৈন্যের বাহিনীর সামনে নিজের জনবল স্বল্পতাকে উপেক্ষা করে অটল থাকা এবং তিন দিন পর্যন্ত পূর্ণ তীব্রতার সাথে প্রতিরোধ অব্যাহত রাখা সুলতান জালাল উদ্দিনের ঈমানি শক্তি, সাহসিকতা এবং রণকৌশলের যথেষ্ট প্রমাণ। তৃতীয় দিন বিকেলে চেঙ্গিস খানের দশ হাজার সৈন্যের একটি সতেজ বাহিনী একটি দুর্গম পাহাড় ঘুরে পেছন থেকে সুলতানের বাম পার্শ্বে আক্রমণ করে তা তছনছ করে দিল। সুলতানের সৈন্য সংখ্যা আগে থেকেই কম ছিল। তিন দিনের লড়াইয়ে অনেকে শহীদ এবং অনেকে আহত হয়েছিলেন। বাম পার্শ্ব ভেঙে পড়ায় সুলতানের মুষ্টিমেয় সৈন্য নিজেদের ভারসাম্য বজায় রাখতে পারল না এবং সুলতানের অধিকাংশ সঙ্গী বিচ্ছিন্ন অবস্থায় লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন।

সুলতান মাত্র সাতশ জানবাজকে সাথে নিয়ে শত্রুর সাথে লড়াই করতে করতে সিন্ধু নদের তীরের দিকে পিছিয়ে যেতে থাকলেন। এই টানাপোড়েন ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে সুলতানের সাত বছরের নিষ্পাপ পুত্র তাতারীদের হাতে ধরা পড়ে গেল। চেঙ্গিস খান তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলল। সুলতান জালাল উদ্দিন রণক্ষেত্রে এমনভাবে মগ্ন ছিলেন যে তার কাছে এমন শোকের ঘটনায় আফসোস করার সময় ছিল না। তিনি তার অবশিষ্ট জানবাজদের সাথে শাহাদাতের মহান মর্যাদা লাভের জন্য রক্তের শেষ বিন্দু পর্যন্ত জিহাদ চালিয়ে যাওয়ার সংকল্প করে শত্রুর সাথে লড়াই করছিলেন। যখন তিনি আল্লাহ আকবার ধ্বনি দিয়ে আহত সিংহের মতো শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন, তখন তাকে ঘেরাও করে রাখা তাতারীরা অনেকগুলো লাশ ফেলে রেখে দূরে পিছিয়ে যেত। কিন্তু শীঘ্রই সতেজ তাতারীরা সামনে এগিয়ে এসে নতুন উদ্যমে তাদের ওপর আক্রমণ করত।

চেঙ্গিস খান বিস্ময়ভরা চোখে তাদের লড়াইয়ের এই দৃশ্য দেখছিল। সে নির্দেশ দিল যে, যেকোনো মূল্যে সুলতানকে জীবিত গ্রেফতার করতে হবে। এই নির্দেশের পর তাতারীরা সুলতানের ওপর সরাসরি কোনো প্রাণঘাতী আক্রমণ করতে ইতস্তত করতে লাগল। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, তার বাকি সঙ্গীদের শাহাদাতের পর সুলতান জালাল উদ্দিন তাদের সামনে নতি স্বীকার করবেন।

সুলতান চেঙ্গিস খানের পরিকল্পনা আঁচ করতে পারলেন। চেঙ্গিস খান তাকে অপমানের শিকলে বেঁধে অটুহাসি হাসবে—এটা তিনি মেনে নিতে পারলেন না। তিনি যেকোনো মূল্যে চেঙ্গিস খানের পরিকল্পনা নস্যাৎ করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

[১] রওজাতুস সাফা: ৩ / ৮২৬; সিরাতে জালাল উদ্দিন, পৃ. ১৫৫; তারিখে জাহান কুশা, পৃ. ৩৮০, ৩৮১, ত হরমস

[২] আল কামিল ফিত তারিখ: সন ৬১৭ হিজরি

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

সুলতান নদীর তীরের পাথরের উচ্চতায় আরোহণ করে পেছনের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। শত্রুদের ঢল বন্যার মতো ধেয়ে আসছিল। অন্যদিকে ত্রিশ-চল্লিশ ফুট গভীরতায় নদীর শীতল পানি এমন প্রবল বেগে আছড়ে পড়ছিল যে, তাতে নামার কথা চিন্তা করলেই বড় বড় বীরদেরও কলিজা পানি হয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু সুলতান জালালুদ্দিন আল্লাহর ওপর ভরসা করে ঘোড়াকে চাবুক মেরে সেই বিপজ্জনক উচ্চতা থেকে দ্বিধাহীনভাবে নদীর উত্তাল ঢেউয়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

এই দৃশ্য দেখে চেঙ্গিস খান বিস্ময়ে নিজের জামার কলার দাঁত দিয়ে চেপে ধরলেন এবং বললেন: “সন্তান হলে এমনই হওয়া উচিত।”

চেঙ্গিস খানের পুত্র এবং আমিরগণ বিস্ময়ে মুখে হাত দিয়ে সুলতানকে নদীর উত্তাল ঢেউয়ের সাথে লড়াই করতে দেখছিলেন। কিছু উৎসাহী সরদার চেঙ্গিস খানের কাছে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে সুলতানকে ধরার অনুমতি চাইলেন, কিন্তু চেঙ্গিস খান তাদের ইচ্ছাকে বোকামি মনে করে বললেন: “তোমরা এই পর্যায়ে বীর নও।”

সিন্ধু নদের তীরের এই ঐতিহাসিক যুদ্ধে যদিও মুসলমানদের পরাজয় হয়েছিল, কিন্তু তাদের কোরবানি বৃথা যায়নি এবং ইতিহাসে এই যুদ্ধের প্রভাব স্থায়ী হয়ে গেছে। এই যুদ্ধে তাতারীরা তাদের সমস্ত শক্তি মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিয়োগ করেছিল, কিন্তু মুসলমানরা সংখ্যায় বহুগুণ কম হওয়া সত্ত্বেও তিন দিন পর্যন্ত তাদের এমন তীব্র মোকাবিলা করেছিল যার উদাহরণ বিরল। যুদ্ধের শেষে কাফেরদের নিহতের সংখ্যা মুসলিম শহীদদের তুলনায় বহুগুণ বেশি ছিল। ফলে এই যুদ্ধে জয়ী হওয়া সত্ত্বেও তাতারীদের জনশক্তির ওপর এক প্রচণ্ড আঘাত লাগে [১], যার কারণে তাদের সেই তুফানি অগ্রযাত্রা যা বড় বড় প্রদেশগুলোকে চোখের পলকে পদদলিত করছিল, এখানে এসে দীর্ঘ সময়ের জন্য থেমে যায় এবং চেঙ্গিস খানের বাহিনীকে পশ্চিম পাঞ্জাবের কিছু শহরে লুটতরাজ করে শীঘ্রই ফিরে যেতে হয়। যদি এই রণাঙ্গনে তাতারীরা সুলতান জালালুদ্দিনের হাতে এমন মারাত্মক আঘাত না পেত, তবে তাদের কয়েক মাসের মধ্যেই দিল্লি, বাগদাদ এবং মিসর দখল করে নেওয়া অসম্ভব ছিল না। এই কারণেই হাফিজ জাহাবী (রহমতুল্লাহি আলাইহি)-র মতো দূরদর্শী ঐতিহাসিক বলে উঠেছেন: “লাও লাহ্ লাদা-শাউ-আদ-দুনইয়া” (যদি সুলতান জালালুদ্দিন না হতেন, তবে তাতারীরা সারা বিশ্বকে পদদলিত করে ফেলত)। [২]

সুলতান জালালুদ্দিন হিন্দুস্তানে:

সুলতান জালালুদ্দিন নদীতে ঝাঁপ দেওয়ার সাথে সাথেই তাঁর অবশিষ্ট অধিকাংশ সঙ্গীও তাঁকে অনুসরণ করেছিলেন, যাদের মধ্যে কেউ কেউ নদীতে ডুবে শহীদ হয়ে যান এবং কেউ কেউ অন্য তীরে সহিহ-সালামত পৌঁছে সুলতানের সাথে মিলিত হন। তাঁদের সংখ্যা ছিল প্রায় পঞ্চাশের মতো। পরবর্তীতে এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায়।

[১] রওজাতুস সাফা আয খাওয়ান্দ মীর: ৩/৮২৬ থেকে ৮২৮; সীরাতে জালালুদ্দিন, পৃ. ১৫৫ থেকে ১৫৭; চেঙ্গিস খান, পৃ. ১৫০ থেকে ১৫৩; তারিখ খাওয়ারজম শাহী আয গোলাম রব্বানী আজীজ, ২১৮ থেকে ২২০; হাবীবুস সিয়া: ২/২৫৮, ২৫৯; তারিখে জাহান কুশা, পৃ. ২১০, ২১১, ত. হরমুজ। ঐতিহাসিকগণ সুলতানের বীরত্বের ওপর চেঙ্গিস ও তার অফিসারদের বিস্ময়ের কথা স্পষ্টভাবে লিখেছেন। মীর খাওয়ান্দ শিরাজী লিখেছেন: “আয কামালে তাহাউয়ুর ও তাজাল্লুদ আস্সুত করদা গিরেবান জামায়ে দানদান গিফাত।” (হাবীবুস সিয়া: ২/২৫৯)। আতা মালিক জুওয়াইনী লিখেছেন: “তামামাতে মুঘলান আয শিফাতে দস্ত বর দাহান নিহাদান্দ” (জাহান কুশা, পৃ. ৩৮৩, ত. হরমুজ)।

[২] সিয়া: আলামিন নুবালা: ২২/৩২৮, ত. মুআসসাসাতুর রিসালা।

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

সুলতান জালালুদ্দীন এখন হিন্দুস্তানের সীমানায় প্রবেশ করেছিলেন। এটি আটক জেলা ছিল। সে সময় হিন্দুস্তানের মধ্যবর্তী অঞ্চলগুলোতে সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুতমিশের শাসন ছিল যার কেন্দ্র ছিল দিল্লি, অন্যদিকে সিন্ধু নদের উপকূলীয় অঞ্চলগুলো বেশিরভাগই হিন্দু রাজাদের দখলে ছিল। সুলতান জালালুদ্দীন এবং তাঁর রিক্তহস্ত সঙ্গীদের জন্য এই মুসলিম বিদ্রোহী হিন্দু রাজাদের পক্ষ থেকে চরম বিপদের আশঙ্কা ছিল, তাই সুলতান অস্ত্র সংগ্রহের পরিকল্পনা করেন। তাঁর কয়েকজন সাহসী সৈন্য আশেপাশের এলাকা পর্যবেক্ষণ করে এসে খবর দিল যে, কিছু দূরে হিন্দু সৈন্যদের একটি দল তাবু গেড়েছে। সুলতান কয়েকজন সৈন্যকে নির্দেশ দিলেন জঙ্গল থেকে গাছের ডাল ভেঙে আনতে। নির্দেশ পালিত হলো। রাতের অন্ধকারে সুলতান এই লাঠিধারী মুজাহিদদের নিয়ে হিন্দু সৈন্যদের ওপর আক্রমণ করলেন এবং অনেককে হত্যা ও অন্যদের পালিয়ে যেতে বাধ্য করে গনিমত হিসেবে সওয়ারি পশু এবং প্রচুর পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র লাভ করলেন।

পার্ব্ববর্তী রাজ্যের হিন্দু রাজার কাছে যখন সুলতানের আগমনের খবর পৌঁছাল, তখন সে পাঁচ হাজার অশ্বারোহী এবং এক হাজার পদাতিক সৈন্য নিয়ে তাঁদের সন্ধানে বের হলো। সুলতান জালালুদ্দীন তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে ঘন জঙ্গলের দিকে পিছিয়ে গেলেন। একটি পাহাড়ের কাছে পৌঁছে সুলতান থামলেন এবং শত্রুকে কাছে আসতে দিলেন। যখন হিন্দু রাজা সামনে এল, তখন সুলতান এমনভাবে তীর ছুড়লেন যে তা রাজার বুকে বিঁধে গেল। এর ফলে তার কয়েক গুণ বড় সৈন্যবাহিনী কয়েকজন মুজাহিদদের সামনে টিকতে পারল না এবং পরাজয় বরণ করে পালিয়ে গেল। এই প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধে এই চমৎকার সাফল্যের পর সুলতান জালালুদ্দীন চার হাজার সদস্যের একটি হিন্দু বাহিনীর ক্যাম্পের ওপর অতর্কিত হামলার পরিকল্পনা করেন এবং একশ বিশ জন জানবাজকে নিয়ে তাদের সামরিক ক্যাম্পে হঠাৎ আক্রমণ করেন। এখানেও হিন্দুরা পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেল এবং সামরিক শিবিরের সমস্ত সাজসরঞ্জাম সুলতানের হস্তগত হলো।

সুলতানের এই জিহাদি অভিযানে আতঙ্কিত হয়ে ওই এলাকার সমস্ত রাজ্যের হিন্দু শাসকরা তাঁর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হলো এবং ছয় হাজার সৈন্যের একটি সম্মিলিত বাহিনী তাদের দিকে পাঠাল। সুলতান জালালুদ্দীনের সঙ্গীদের সংখ্যা তখন পাঁচশর বেশি ছিল না। তবুও এবার সুলতান ময়দানে সুশৃঙ্খলভাবে ব্যূহ রচনা করে শত্রুর মোকাবিলা করলেন এবং বারো গুণ বড় বাহিনীকে নাস্তানাবুদ করে ময়দান ছাড়তে বাধ্য করলেন। [১]

চেঙ্গিস খানের মঙ্গোলিয়ায় প্রত্যাবর্তন: ৬১৯ হিজরি (১২২২ খ্রিস্টাব্দ)

চেঙ্গিস খান এখন নিজ দেশে ফিরে যেতে চাচ্ছিলেন। চীন ও মঙ্গোলিয়ায় তাঁর ফিরে যাওয়া এজন্যও জরুরি হয়ে পড়েছিল যে, সেখানে তাঁর নায়েব মুকালি বাহাদুর মারা গিয়েছিল এবং “হিয়া”র বিজিত রাজ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলছিল। [২] পেশোয়ার হয়ে ফেরার পথে তিনি সমরকন্দের দিকে যাত্রা করলেন। পথে তিনি গজনীর জনবসতি তলোয়ারের আঘাতে ধ্বংস করে দিলেন এবং সুলতান মাহমুদ গজনভীর কবর থেকে তাঁর হাড়গুলো বের করে আগুনে পুড়িয়ে দিলেন। এভাবে তিনি জাবুল, গজনী এবং ঘোরসহ খোরাসানের অবশিষ্ট জনপদগুলোকেও পৃথিবীর বুক থেকে মুছে দিলেন যাতে সুলতান জালালুদ্দীন খোয়ারজম শাহ এই অঞ্চলগুলো থেকে কোনো সাহায্য না পান।

[১] রওজাতুস সাফা: ৩/৮২৮; সীরাতে জালালুদ্দীন, পৃ. ১৫৮ থেকে ১৬৩; তারিখে জাহান কুশা, পৃ. ৩৮৩, ৩৮৪, ত. হরমুজ।

[২] চেঙ্গিস খান, পৃ. ১৫৭।

কোনো সম্ভাবনা বাকি না থাকে। এ পর্যন্ত বিপুল সংখ্যক মুসলিম বন্দি তাতারীদের বাধ্যতামূলক সেবার জন্য তাদের সাথে সাথে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, এখন যেহেতু তাদের আর প্রয়োজন ছিল না, তাই চেঙ্গিস খানের নির্দেশে তাদের গণহারে হত্যা করা হলো। ৬১৯ হিজরি (১২২১ খ্রিস্টাব্দ) এর গ্রীষ্মকাল হিন্দুকুশ পর্বতের পাদদেশে কাটিয়ে চেঙ্গিস খান সমরকন্দে পৌঁছাল এবং কিছু সময় ভ্রমণ ও শিকারে কাটিয়ে উত্তর-পূর্ব দিকে যাত্রা করল। [১] বিজয়ের আনন্দ দ্বিগুণ করার জন্য সে খাওয়ারিজম শাহের মা বৃদ্ধা রানী তুরকান খাতুন এবং রাজপরিবারের অন্যান্য বেগম ও রাজকন্যাদের নির্দেশ দিল যেন তারা পুরো বাহিনীর সামনে সামনে চলে এবং উচ্চস্বরে খাওয়ারিজম শাহ ও তার সিংহাসনের জন্য বিলাপ ও আহাজারি করে। [২] সিহন নদীর তীরে যেখান থেকে চেঙ্গিস খান খাওয়ারিজমে প্রবেশ করেছিল, সেখানে একটি তৃণভূমিতে চেঙ্গিস খান তার বাহিনীর সকল সরদারকে কুরুলতাই (মহাসভা)-এর জন্য তলব করল। এই উৎসবের যে চিত্র হ্যারল্ড ল্যাম্ব এঁকেছেন, তার একটি শিক্ষণীয় উদ্ধৃতি নিচে দেওয়া হলো:

“সে সময় চেঙ্গিস খান মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহের সিংহাসনে বসেছিল, যা সে সমরকন্দ থেকে নিজের সাথে নিয়ে এসেছিল। তার পাশে সেই মৃত মুসলিম বাদশাহর মুকুট ও রাজদণ্ড রাখা ছিল। যখন কুরুলতাই শুরু হলো, তখন খাওয়ারিজম শাহের মা (তুরকান খাতুন)-কে টেনে-হিঁচড়ে আনা হলো, তার হাতে হাতকড়া লাগানো ছিল।” [৩]

৬২০ হিজরি (১২২৩ খ্রিস্টাব্দ) এর শুরুতে যখন বসন্তকাল শুরু হয়েছিল, চেঙ্গিস খান গোবি মরুভূমির দিকে রওনা হলো। [৪] সে নিশ্চিত ছিল যে তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। সিন্ধু নদ থেকে কাস্পিয়ান সাগরের ওপার পর্যন্ত তাতারী পতাকা উড়ছিল এবং মুসলমানদের অবশিষ্ট জনসংখ্যা বিজয়ীদের দাসে পরিণত হয়েছিল। জিলহজ ৬২১ হিজরিতে চেঙ্গিস খান পাঁচ বছর পর তার রাজধানীতে ফিরে পৌঁছাল। তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য যারা এসেছিল তাদের মধ্যে তার নাতি: দশ বছর বয়সী কুবলাই খান এবং নয় বছর বয়সী হালাকু খানও ছিল। [৫]

দিল্লির শাহের কাছে সাহায্যের আবেদন:

এদিকে সুলতান জালালুদ্দিন দিল্লি থেকে দুই-তিন মঞ্জিল দূরত্বে তাবু গেড়ে একজন বিশ্বস্ত উপদেষ্টা সৈয়দ আইনুল মুলককে শামসুদ্দিন ইলতুতমিশের দরবারে পাঠালেন, যাতে দিল্লি সরকারের সামনে তাতারী বিপদের সঠিক চিত্র তুলে ধরে ইসলাম ও মিল্লাতের নামে সাহায্য চাওয়া যায়। ইলতুতমিশের নামে লেখা চিঠিতে সুলতান লিখেছিলেন:

“ইন্না লি কিরামা লিল কারীমি মাহাল্লুন (নিশ্চয়ই শরীফ ব্যক্তি শরীফ লোকদের কাছেই আশ্রয় নেয়)। সময়ের বিবর্তন আমাকে আপনার প্রতিবেশী হওয়ার এবং সাক্ষাতের অধিকার দিয়েছে। এমন মেহমান খুব কমই আসে। যদি আমরা পবিত্র ভালোবাসা ও পূর্ণ ভ্রাতৃত্বের পরিচয় দেই এবং সুসময় ও দুঃসময়ে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সাহায্যের অঙ্গীকার করি, তবে আমাদের সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সহজেই অর্জিত হবে এবং আমাদের শত্রুরা যখন আমাদের ঐক্য ও সংহতির খবর পাবে, তখন তাদের আগ্রাসনের দাঁত ভেঙে যাবে।”

[১] তারিখ-ই-জাহান কুশা জুওয়াইনি, পৃ. ২১৩, ২১৪, ত. হারমাস

[২] তারিখ-ই-জাহান কুশা জুওয়াইনি, পৃ. ৫৩৪, ত. হারমাস; রওজাতুস সাফা: ৫/২১

[৩] চেঙ্গিস খান, পৃ. ১৫৯

[৪] তারিখ-ই-জাহান কুশা জুওয়াইনি, পৃ. ২১৫, ত. হারমাস

[৫] রওজাতুস সাফা: ৫/২১, ত. নওলকিশোর

সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুতমিশ ছিলেন একজন সতর্ক প্রকৃতির শাসক। সুলতান জালালুদ্দিনকে প্রকাশ্যে সাহায্য করা তাঁর জন্য জটিলতা ও সমস্যা সৃষ্টি করতে পারত। তিনি নিজে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্র দমন করে অতি কষ্টে সিংহাসন ও মুকুট সামলেছিলেন। পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে কুবাচার মতো কিছু বিদ্রোহী তখনও তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল। তাঁর প্রতিবেশী হিন্দু রাজারা আগে থেকেই সুলতান জালালুদ্দিনের প্রতি শত্রুতা প্রকাশ করে আসছিল। এছাড়া সুলতান জালালুদ্দিনের বীরত্ব, সামরিক দক্ষতা এবং বিশ্বব্যাপী খ্যাত প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখে ইলতুতমিশের এই ভয়ও ছিল যে, তিনি যদি কোনোভাবে হিন্দুস্তানে পা জমান, তবে দিল্লির সিংহাসনের জন্য এক স্থায়ী হুমকি হয়ে দাঁড়াবেন। এসব কারণ ছাড়াও ইলতুতমিশের সবচেয়ে বড় আশঙ্কা ছিল এই যে, সুলতানকে সাহায্য ও সহযোগিতা করলে তাতারদের হিন্দুস্তান আক্রমণের অজুহাত মিলে যাবে। এটি এমন এক বিপদ ছিল যার কল্পনা মাত্রই সেই যুগের শাসকদের কাঁপিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু এসব সত্ত্বেও যেহেতু সুলতান জালালুদ্দিন একজন প্রতিবেশী মুসলিম শাসক ছিলেন এবং তিনি ইসলাম ও মিল্লাতের নামে সাহায্য চেয়েছিলেন, তাই সুলতান ইলতুতমিশ সরাসরি ভাষায় প্রত্যাখ্যান করাকেও সৌজন্যবোধের পরিপন্থী মনে করলেন। অবশেষে কয়েক দিন চিন্তা-ভাবনার পর তিনি সুলতানের জন্য মূল্যবান উপহারসামগ্রী এবং লস্করের জন্য বিপুল পরিমাণ রসদসহ এই মর্মে একটি ফিরতি বার্তা পাঠালেন:

“হিন্দুস্তানের আবহাওয়া আপনার জন্য প্রতিকূল, এখানে আপনার লস্করের স্বাস্থ্যের ওপর খুব খারাপ প্রভাব পড়বে। ভালো হবে যদি আপনি অন্য কোনো অঞ্চলকে আপনার কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র বানান। তবে আপনি যদি এখানেই থাকতে পছন্দ করেন, তবে আমরা আপনার অবস্থানের জন্য দিল্লির পার্শ্ববর্তী এলাকায় একটি ভূখণ্ড নির্দিষ্ট করে দিতে প্রস্তুত আছি। এছাড়া এই দেশের যে এলাকাগুলো এখনও বিজিত হয়নি, সেগুলো যদি আপনি আপনার নিজ শক্তিতে বিদ্রোহী ও ফিতনাবাজদের থেকে মুক্ত করেন, তবে আমরা সেখানে আপনার শাসন মেনে নেব।”

সুলতান ইলতুতমিশের ফিরতি চিঠি থেকে সুলতান জালালুদ্দিন বুঝতে পারলেন যে, দিল্লি সরকার এই জিহাদে তাঁর সাথে প্রকাশ্যে শরিক হতে প্রস্তুত নয়। এদিক থেকে নিরাশ হয়ে তিনি পশ্চিম পাঞ্জাব ও সিন্ধু অঞ্চলের দিকে মনোনিবেশ করলেন, যাতে নিজ বাহুবলে কিছু এলাকা জয় করে ভবিষ্যতের তুফানের সামনে বাঁধ নির্মাণের চেষ্টা করতে পারেন। [১]

সুলতানের ইরান যাত্রা এবং প্রতিরক্ষা প্রাচীর নির্মাণ:

সুলতান জালালুদ্দিন প্রায় আড়াই বছর হিন্দুস্তানে অবস্থান করেন এবং সিন্ধু ও পাঞ্জাব প্রদেশের বড় একটি অংশ জয় করে তাতারদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য নতুন করে প্রতিরক্ষা প্রাচীর নির্মাণের চেষ্টা করেন। কিন্তু স্থানীয় মুসলিম শাসকদের অসহযোগিতার কারণে তিনি সফল হতে পারেননি। অবশেষে ৬২১ হিজরি (১২২৪ খ্রিস্টাব্দ) সালে তিনি পারস্য ও ইরাকের সেই অঞ্চলগুলোর দিকে যাত্রা করেন, যেগুলো তাতারদের প্রথম দফার আক্রমণের পর পুনরায় আবাদ হতে শুরু করেছিল এবং আশঙ্কা করা হচ্ছিল যে তাতাররা যেকোনো সময় পুনরায় এই প্রদেশ ও শহরগুলো লুণ্ঠন করতে পারে।

[১] সিরাত জালালুদ্দিন, পৃ. ১৬৩, ১৭৫; নিহায়াতুল আরাব লিন-নুওয়াইরি: ২৭/ ২৬০ থেকে ২৬৩; চেঙ্গিস খান, ১৫৩ থেকে ১৫৫।

সুলতান জালালুদ্দিন হিন্দুস্তানি অধিকৃত অঞ্চলগুলোতে একজন গভর্নর নিযুক্ত করলেন এবং নিজে চার হাজার সৈন্য নিয়ে বেলুচিস্তান ও করমান হয়ে শিরাজ পৌঁছালেন। পথে আসা তাতারদের করদ শাসকরা সুলতানের সামনে নতি স্বীকার করতে থাকল। ইসফাহান ও রের বাসিন্দারাও সানন্দে সুলতান জালালুদ্দিনের আনুগত্য স্বীকার করে নিল।

অন্যদিকে সিন্ধু নদের যুদ্ধের কিছুকাল পর চেঙ্গিস খান খোরাসানে তৃতীয়বার গণহত্যা চালিয়ে চীনের দিকে ফিরে গিয়েছিল। সেখানে ‘হিয়া’র বিদ্রোহীদের দমন এবং অন্যান্য অভিযানে ব্যস্ত থাকায় কয়েক বছর সে আর ইসলামি দেশগুলোতে পুনরায় অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পায়নি। তাতার আক্রমণ এভাবে সাময়িকভাবে থেমে যাওয়ার পর খোরাসান, ইরান ও ইরাকে আজমের ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরগুলোতে আবারও জীবনের স্পন্দন দেখা দিতে শুরু করেছিল এবং পালিয়ে যাওয়া বা আত্মগোপনকারী অনেক মানুষ তাদের পৈতৃক শহরের ধ্বংসাবশেষে পুনরায় এসে বসতি স্থাপন করেছিল। কিন্তু এখন তাদের সংখ্যা পূর্বের জনসংখ্যার কয়েক শতাংশও ছিল না। উদাহরণস্বরূপ হেরাতের কথাই ধরা যাক, তাতারদের আক্রমণের আগে এর জনসংখ্যা ছিল লক্ষ লক্ষ, কিন্তু তাদের হাতে পদদলিত হওয়ার পর পনেরো বছর পর্যন্ত এই মহান শহরের জনসংখ্যা চল্লিশ জনের বেশি হতে পারেনি। সুলতান জালালুদ্দিনের দখলকৃত এলাকাগুলোও বেশিরভাগই এমন ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরগুলোর অন্তর্ভুক্ত ছিল, যেখানে কিছু লোক পুনরায় তাদের নীড় তৈরি করেছিল। কিন্তু এই ধ্বংসাবশেষের পশ্চিমে মুসলিম বিশ্বের অর্ধেক অংশ জনসংখ্যা ও সম্পদে ভরপুর ছিল, যার ওপর তাতার আক্রমণকারীদের লোলুপ দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। সবচেয়ে বড় কথা হলো, মুসলমানদের সমস্ত পবিত্র স্থান ও ধর্মীয় কেন্দ্রগুলো এই এলাকাগুলোতেই ছিল এবং তাতাররাও এটি ভালোভাবেই জানত যে, যতক্ষণ মুসলমানদের এই কেন্দ্রগুলো আবাদ আছে, ততক্ষণ এই জাতিকে শেষ করা অসম্ভব।

তাতারদের প্রতিরোধের জন্য বৈশ্বিক প্রতিরক্ষা প্রাচীর গড়ে তোলার পরিকল্পনা:

তৎকালীন মুসলিম বিশ্বে সুলতান জালালুদ্দিনই ছিলেন একমাত্র শাসক যিনি তাতারদের এই মহা ফিতনার ধ্বংসলীলা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অবগত, তাদের ধূর্ততা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি সচেতন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের দাঁতভাঙা জবাব দেওয়ার সবচেয়ে ভালো সক্ষমতা রাখতেন। সময়ের ডাকের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে তিনি একে অত্যন্ত জরুরি মনে করতেন যে, হারমাইন শরিফাইন এবং অবশিষ্ট মুসলিম দেশগুলোর সুরক্ষার জন্য একটি ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠন করা হোক। তাতারদের মোকাবিলায় এই ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে সর্বোত্তমভাবে ব্যবহারের জন্য তাঁর মাথায় এক অদ্ভুত পরিকল্পনা ছিল। আর তা হলো হিন্দুস্তানের সীমান্ত থেকে শুরু করে কৃষ্ণসাগরের উপকূল পর্যন্ত অর্ধচন্দ্রাকৃতির একটি দীর্ঘ প্রতিরক্ষা প্রাচীর তৈরি করা, যা একই সাথে হিন্দুস্তান, পারস্য, বাগদাদ, সিরিয়া, হিজাজ, মিসর এবং এশিয়া মাইনরের মুসলিম জনপদগুলোর জন্য একটি বেষ্টনী হতে পারে।

এই মহান কাজের জন্য অগণিত সম্পদ এবং সীমাহীন আর্থিক ও জনশক্তির প্রয়োজন ছিল। নিঃস্ব অবস্থায় এই পরিকল্পনার নকশা প্রণয়নকারী সুলতান জালালুদ্দিনের জন্য তাঁর উদ্দেশ্য সফল করতে মুসলিম শাসকদের সহযোগিতা লাভ করা অপরিহার্য ছিল। যেহেতু বাগদাদ খিলাফত মুসলিম বিশ্বে কেন্দ্রীয় মর্যাদার অধিকারী ছিল, তাই সুলতান মনে করেছিলেন যে, খলিফা নাসের যদি পূর্বের তিক্ততা ভুলে গিয়ে তাঁর সাহায্যে সম্মত হন, তবে আশপাশের মুসলিম সরকারগুলোও পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি...

...করে তাদের সাথে সহযোগিতার ক্ষেত্রে দ্বিধা করবেন না। এই চিন্তার প্রেক্ষিতে সুলতান খলিফার সাথে সরাসরি যোগাযোগ করা জরুরি মনে করেছিলেন। শীতকাল শুরু হয়ে গিয়েছিল, তাই তিনি উপযুক্ত দিনের অপেক্ষায় ছিলেন।

দরবারে খিলাফতে দূতিয়ালির ব্যর্থতা এবং বাগদাদী বাহিনীর সাথে যুদ্ধ:

৬২১ হিজরীর সফর মাসে (মার্চ ১২২৪ খ্রি.) সুলতান বাগদাদের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন, যাতে খলিফা নাসিরের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নত করার চেষ্টা করা যায়। বাগদাদের কাছাকাছি পৌঁছে সুলতান জিয়াউল মুলককে নিজের দূত বানিয়ে দরবারে খিলাফতে পাঠালেন। জিয়াউল মুলক খলিফার দরবারে সুলতানের আগমনের উদ্দেশ্য এবং এর প্রেক্ষাপট অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তুলে ধরলেন এবং খলিফাকে সুলতানের সদিচ্ছার ব্যাপারে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু আফসোস, খাওয়ারিজম সাম্রাজ্য ধ্বংস হওয়া এবং খাওয়ারিজমের প্রায় এক কোটি মুসলমানের রক্ত ঝরার পরেও খলিফার হৃদয়ে ঘৃণা একইভাবে বিদ্যমান ছিল। আলাউদ্দিন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহের হাড়গুলো পচে যাওয়ার পরেও মুসলিম বিশ্বের নেতা তার সন্তান এবং মুসলিম প্রজাদের প্রতি দয়া করতে প্রস্তুত ছিলেন না।

খলিফার রাগান্বিত হওয়ার একটি কারণ এও ছিল যে, কিছুদিন আগে সুলতানের অগ্রবর্তী বাহিনীর সেনাপতি জাহান পাহলওয়ান ইরানের খুজিস্তান অঞ্চলে আক্রমণ করেছিলেন, যা খিলাফতের প্রভাবাধীন এলাকা হিসেবে বিবেচিত হতো। যদিও সুলতান খুজিস্তানের পরাজিত বাহিনীর সাথে ভালো আচরণ করেছিলেন এবং এই যুদ্ধের সমস্ত বন্দীদের অবিলম্বে মুক্তি দিয়েছিলেন, কিন্তু এই সংঘর্ষের ফলে বাগদাদ ও খাওয়ারিজমের পুরনো বিরোধগুলো পুনরায় সজীব হয়ে উঠেছিল।

এ কারণেই খলিফা সুলতানের শান্তি ও সহযোগিতার বার্তাকে কেবল অবজ্ঞাই করেননি, বরং চরম অসন্তোষ প্রকাশ করে নিজের তুর্কি সেনাপতি ‘কুশতামুর’কে বিশ হাজার সৈন্যসহ সুলতান জালালুদ্দিনের মোকাবিলা করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। সেই সাথে আরবেলের শাসক মুজাফফরুদ্দিন কওকুবরীকে কবুতরের মাধ্যমে সংবাদ পাঠিয়ে নির্দেশ দিলেন যে, তিনি যেন দশ হাজার সৈন্য নিয়ে অন্য দিক থেকে সুলতানের ওপর আক্রমণ করেন। সুলতান জালালুদ্দিন বাগদাদের বাইরে শিবির স্থাপন করে খলিফার উত্তরের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। তিনি বাগদাদী বাহিনীর অগ্রসর হওয়ার খবর পেলেন। সুলতানের যুদ্ধের কোনো ইচ্ছা ছিল না এবং তিনি এর জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুতও ছিলেন না। তার সাথে কেবল দুই হাজার সৈন্যের একটি দল ছিল যা তার সঙ্গী ও নিরাপত্তার জন্য ছিল। সংঘাত এড়ানোর জন্য সুলতান পুনরায় ভুল বোঝাবুঝি দূর করার চেষ্টা করলেন এবং কুশতামুরের দূতের মাধ্যমে এই বার্তা পাঠালেন:

“আমি যুদ্ধের উদ্দেশ্যে আসিনি, খলিফার মেহমান হয়ে উপস্থিত হয়েছি। মেহমানের সাথে এমন আচরণ নির্দয়তা। আমাদের আগমনের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো আমিরুল মুমিনীন নাসিরের অনুগ্রহের ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করা। বর্তমানে যে শক্তিশালী শত্রু ইসলামী জনপদগুলোকে তছনছ ও ধ্বংস করে দিয়েছে, তারা সবদিকে বিজয় লাভ করেছে এবং কোনো বাহিনীই তাদের মোকাবিলা করার ক্ষমতা রাখে না। যদি মুসলিম খলিফা আমাকে সাহায্য করেন এবং আমি তার সন্তুষ্টির সমর্থন লাভ করি, তবে আমি এই তাতার গোষ্ঠীর মোকাবিলা করার এবং তাদের তাড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করছি।”

[১] সীরাতে জালালুদ্দিন, পৃ. ১৭০ থেকে ১৭৭; চেঙ্গিস খান, ৭০১ থেকে ৭২১; আত-তারিখ ইবনে খালদুন: ৫/ ১২৪ থেকে ১৩৪, ত. দারুল ফিকর।

তারিখ-এ-মিল্লাত-এ-মুসলিমা

সুলতানের অনুরোধের কোনো প্রভাব কুশতুমুরের ওপর পড়ল না। সে ভাবল যে সুলতানের মুষ্টিমেয় সঙ্গীদের পিষে ফেলার জন্য তার বিশ হাজার সৈন্যই যথেষ্ট, তাই সে আক্রমণের নির্দেশ দিল। সুলতান মোকাবিলা অনিবার্য দেখে নিজের দেড় হাজার সৈন্যকে কিছু দূরে ওত পেতে বসিয়ে দিলেন এবং নিজে পাঁচশ জানবাঘের সাথে কাতারবন্দী হয়ে প্রতিপক্ষ বাহিনীর মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ালেন। সুলতানের সাথে মাত্র পাঁচশ সৈন্য দেখে কুশতুমুর তুফানি গতিতে আক্রমণ করল।

সুলতান জালালুদ্দিন প্রতিপক্ষের কেন্দ্র ও পার্শ্বভাগগুলোতে কয়েকটি আক্রমণাত্মক হামলা চালানোর পর পূর্বপরিকল্পিত পরিকল্পনা অনুযায়ী পিছু হটার কৌশল অবলম্বন করলেন। কুশতুমুর দ্রুতগতিতে পিছু ধাওয়া করল এবং সেই গিরিপথগুলোতে ঢুকে পড়ল যেখানে সুলতানের পনেরোশ সৈন্য অবস্থান নিয়েছিল। খিলাফত বাহিনী এখানে পৌঁছানো মাত্রই তীর ও পাথরের বৃষ্টির সম্মুখীন হলো। এই আকস্মিক বিপদে তাদের মধ্যে ছড়োছড়ি পড়ে গেল। কুশতুমুর নিহত হলো এবং বাগদাদী লস্কর দ্রুতগতিতে পুনরায় শহরের কেন্দ্রের দিকে পিছু হটে গেল। এই পরাজয়ের খবরে খলিফা নাসির ঘাবড়ে গেলেন। তিনি বাগদাদের ফটকগুলো বন্ধ করে দিয়ে কঠোর পাহারার ব্যবস্থা করলেন এবং দশ লক্ষ দিনার ব্যয়ে ব্যাপক প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। যদিও সুলতান জালালুদ্দিনের বাগদাদ আক্রমণের কোনো ইচ্ছা ছিল না। তিনি খিলাফত বাহিনীকে ঘরের পথ দেখিয়ে দিয়ে ফিরে এলেন। [১]

সুলতানের উত্তর ইরান ও আজারবাইজান বিজয়:

৬২২ হিজরি (১২২৫ খ্রিষ্টাব্দ) সালে সুলতান জালালুদ্দিন মারাগা দখল করেন এবং এরপর বিস্ময়কর গতির সাথে আজারবাইজানে আক্রমণ চালিয়ে তাতারীদের করদ রাজ্য শাসনকর্তা উজবেক মুজাফফরুদ্দিন পাহলওয়ানকে সেখান থেকে বিতাড়িত করেন।

কয়েক বছরের মধ্যে সুলতানের সালতানাত একটি সরু ও দীর্ঘ ভূখণ্ডের আকারে পাঞ্জাব থেকে শুরু করে কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত পৌঁছে গেল। হাজার হাজার মাইল দীর্ঘ এই ভূখণ্ডটি মূলত হিন্দুস্তান থেকে শুরু করে সিরিয়া ও মিসর পর্যন্ত মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর জন্য তাতারী আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার প্রথম প্রতিরক্ষা ব্যুহ ছিল। যা সুলতান জালালুদ্দিন একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু দ্রুতগামী অশ্বারোহী বাহিনীর মাধ্যমে নিজের তত্ত্বাবধানে রেখেছিলেন। এই প্রতিরক্ষা ব্যুহকে শক্তিশালী করার জন্য সুলতান জালালুদ্দিন কুনিয়ার সুলতান আলাউদ্দিন কায়কোবাদ এবং দামেস্কের শাসক আল-মালিকুল মুয়াযযাম আইয়ুবীর সাথে মৈত্রী চুক্তি করেন। খলিফা নাসিরের ইন্তেকালের পর নতুন আব্বাসীয় খলিফা আয-যাহিরও এই জোটে যোগদান করেন। এভাবে মুসলিম বিশ্বকে রক্ষার জন্য একটি সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা প্রাচীর প্রতিষ্ঠিত হলো যার উপস্থিতিতে তাতারী প্লাবনের ঢেউগুলো দীর্ঘ সময় পর্যন্ত পুনরায় সামনে এগোতে পারেনি। [২]

জর্জিয়া বিজয়:

তাতারীদের আক্রমণ থেকে মুসলিম বিশ্বকে রক্ষার জন্য শক্তিশালী ঘাঁটি প্রস্তুত করার পরও সুলতান জালালুদ্দিন...

[১] সিরাতে জালালুদ্দিন, পৃ. ১৭৮ থেকে ১৭০; তারিখে ইবনে খালদুন: ৫/১৩৩; রওজাতুস সাফা: ৫/৩০; তারিখে জাহান কুশা, পৃ. ৩৯২ থেকে ৩৯৩, ত. হরমস।

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: সন ৬২১ হি., ৬২২ হি.; সিরাতে জালালুদ্দিন, পৃ. ২৬২, ২৮০; সেলজুক নামা- ইবনে বিবি (মৃ. ৬৮০ হি.), মুহাম্মদ জাকারিয়া মায়িল কর্তৃক উর্দু অনুবাদ, পৃ. ১৫৩ থেকে ১৫৮, ত. কেন্দ্রীয় উর্দু বোর্ড লাহোর।

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

তারা অলস বসে থাকেনি বরং এখন তাদের মনোযোগ জর্জিয়ার খ্রিস্টানদের দিকে নিবদ্ধ হলো যারা গত প্রায় এক শতাব্দী ধরে আলম-ই-ইসলামের (মুসলিম বিশ্বের) একটি বিশাল অংশে দখলদার ছিল এবং তাদের জুলুম ও অত্যাচারে চারপাশের মুসলিম সরকারগুলো অতিষ্ঠ ছিল। তাতারীদের হাতে আলম-ই-ইসলামের ধ্বংস ও বিপর্যয় দেখার পর জর্জিয়ার খ্রিস্টানরা আলম-ই-ইসলামের বাকি দেশগুলো বিশেষ করে মদিনাতুল ইসলাম বাগদাদের ওপর হামলার পরিকল্পনা তৈরি করেছিল।

সুলতান জালালুদ্দিন তাতারী তুফান রোধ করার পর ৬২২ হিজরি (১২২৫ খ্রিষ্টাব্দ) থেকে ৬২৫ হিজরি (১২২৮ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত জর্জিয়ার ওপর একের পর এক হামলা চালান এবং জর্জীয়দের কোমর ভেঙে দেন। এই সময়ে তিনি গুরুতর অসুস্থও হয়েছিলেন এবং বেশ কয়েকটি ফ্রন্টও ছিল। তার অনুপস্থিতিতে কেরমানের শাসক বুরাক হাজিব বিদ্রোহ করলে সুলতান দ্রুত সেখানে পৌঁছে তা দমন করেন এবং পুনরায় জর্জিয়ার ফ্রন্টে ফিরে আসেন। এই হামলাগুলোতে সুলতান সেই সমস্ত এলাকা পুনরুদ্ধার করেন যা গত শতাব্দীতে ইসলামি অধিকৃত অঞ্চল থেকে বের হয়ে গিয়েছিল। এর মধ্যে প্রথম হামলাতেই সুলতানের সৈন্যদের হাতে সত্তর হাজার জর্জীয় নিহত হয়, যখন দ্বিতীয় হামলায় সুলতান এক লক্ষ জর্জীয়কে জাহান্নামে পাঠিয়ে তাদের রাজধানী তিবলিস (তিফলিস) দখল করে নেন। এভাবে ইসলামি বিশ্বের বিরুদ্ধে জর্জীয়দের ঘৃণ্য পরিকল্পনা ধূলিসাৎ হয়ে যায়। [১]

আল্লামা ইবনুল আসির আল-জাযারি (রহ.) জর্জিয়ার খ্রিস্টানদের হাতে মুসলমানদের লাঞ্ছনা ও অপমানের চিত্র তুলে ধরার পর লিখেছেন:

“আমরা এবং সমস্ত মুসলমান যখন এই পরিস্থিতি শুনতাম তখন আল্লাহর কাছে দোয়া করতাম যে, আল্লাহ তাআলা ইসলাম ও মুসলমানদের এমন একজন পথপ্রদর্শক দান করুন যে তাদের হেফাজত করবে, তাদের সাহায্য করবে এবং তাদের প্রতিশোধ নেবে...। অতঃপর আল্লাহ তাআলা এই অবশিষ্ট অঞ্চলগুলোর ওপর রহমতের দৃষ্টি দিলেন এবং তাদের ‘জালালুদ্দিন’ দান করলেন, যার মাধ্যমে জর্জীয়দের সেই পরিণতি তোমরা দেখেছ যা তারা ভোগ করেছে। তিনি সেই কাফেরদের থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতিশোধ নিচ্ছেন।” [২]

খলিফা নাসিরের মৃত্যু:

সুলতান জালালুদ্দিন জর্জিয়া থেকে তাবরিজে ফিরে আসার পর বেশি দিন অতিবাহিত হয়নি যে, বাগদাদে খলিফা নাসিরের ইন্তেকাল হলো। এটি ৬২২ হিজরির রমজান মাসের শেষ রাতের (১৫ অক্টোবর ১২২৫ খ্রিষ্টাব্দ) ঘটনা। খলিফা নাসির প্রায় সত্তর বছর বয়সে এবং প্রায় ৪৭ বছর রাজত্ব করার পর ইন্তেকাল করেন। বনু উমাইয়া এবং বনু আব্বাসের খলিফাদের মধ্যে আর কেউ এত দীর্ঘ সময় রাজত্ব করার সুযোগ পাননি। কিন্তু আফসোস যে, খলিফা নাসির দীর্ঘ ক্ষমতার নেয়ামত থেকে প্রকৃত অর্থে কোনো ফায়দা নিতে পারেননি এবং আলম-ই-ইসলামের সেই সাহসী নেতৃত্বের প্রয়োজন ছিল যা এই যুগে অপরিহার্য ছিল, বরং তার কর্মকাণ্ড এর বিপরীত ছিল যা তার বদনামের কারণ হয়েছিল। [৩]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৬২২ হিজরি, ৬২৩ হিজরি, ৭২৫ হিজরি; তারিখ-ই-জাহান গুশা, পৃষ্ঠা ৩৯৭ থেকে ৪০৩, ত ত হারমাস; সিরাত সুলতান জালালুদ্দিন, পৃষ্ঠা ১৯ থেকে ২১।

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১০ / ৩৯৬, ত দারুল কিতাব আল-আরাবি।

[৩] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৬২২ হিজরি।

বাতিনি সম্প্রদায়ের দমন:

তাতারীদের প্রথম আক্রমণের ফলেই ইসলামি বিশ্ব এতটাই বিধ্বস্ত, বিশৃঙ্খল, অসংগঠিত এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল যে, সব ধরনের পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় ইসলামি বিশ্বকে ষড়যন্ত্রের জালে আবদ্ধ করার ব্যাপারে অত্যন্ত আশাবাদী ও তৎপর দেখা যাচ্ছিল। বিশেষ করে কাজভিনের নিকটবর্তী “আলমুত” দুর্গের বাতিনি সালতানাত ইসলামি বিশ্বের জন্য একটি প্রবহমান ক্ষত এবং বিষাক্ত ফোঁড়ার রূপ ধারণ করেছিল। এটি ছিল বাতিনি ধর্মের অনুসারীদের কেন্দ্র। তাদের প্রশিক্ষিত এজেন্টরা তাদের ধর্মীয় নেতার প্রশিক্ষণ অনুযায়ী ইসলামি বিশ্বের বড় বড় শহর ও কেন্দ্রগুলোতে গোপনে অবস্থান করত এবং নির্দেশ পাওয়ামাত্রই যেকোনো মূল্যবান ব্যক্তিত্বের রক্ত ঝরিয়ে চোখের পলকে ইসলামি বিশ্বকে অত্যন্ত মারাত্মক আঘাত হানত। কাজভিনের পার্বত্য অঞ্চলে তাদের আকাশচুম্বী দুর্গ ছিল যেখান থেকে তারা তাদের ঘৃণ্য কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছিল।

জর্জীয়দের দমন এবং তিফলিস বিজয়ের পর সুলতান জালালুদ্দিন বাতিনীদের লাগাম টেনে ধরার চেষ্টা করেন। যখন সতর্কবাণী ও উপদেশ তাদের জন্য যথেষ্ট হলো না, তখন সুলতান বজ্র ও বৃষ্টির মতো আক্রমণ চালিয়ে বাতিনি সালতানাতের ওপর হামলা করেন এবং “আলমুত” দুর্গ ছাড়া তাদের বাকি সমস্ত দুর্গ দখল করে তাদের বিশাল এক সংখ্যাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেন। এভাবে বাতিনি ফিতনা, যা প্রায় এক শতাব্দী ধরে ইসলামি বিশ্বের দরবারগুলোর শ্বাসরোধ করে রেখেছিল, তাদের কর্মকাণ্ড অত্যন্ত সীমিত করতে বাধ্য হলো। [১]

আল্লামা ইবনুল আসির রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন:

“সুলতান জালালুদ্দিন বাতিনীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক আকারে অভিযান পরিচালনা করেন এবং তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। প্রকৃতপক্ষে বাতিনীদের অনিষ্ট ও ক্ষতি অনেক বেড়ে গিয়েছিল। তাতারী আক্রমণের পর ইসলামি দেশগুলোতে তাদের লোভ অনেক বেড়ে গিয়েছিল, কিন্তু সুলতান জালালুদ্দিন তাদের জুলুম ও অত্যাচারের পথ রুদ্ধ করে তাদের শিকড় উপড়ে ফেলেন।” [২]

সুলতান জালালুদ্দিন বাতিনীদের শেষ কেন্দ্র আলমুত দুর্গও জয় করে নিতেন, কিন্তু হঠাৎ তাতারীদের অগ্রসর হওয়ার সংবাদ তাকে ফিরে আসতে বাধ্য করল।

তাতারীদের পুনরায় আক্রমণ। চেন্সিস খানের মৃত্যু:

চেন্সিস খানের জীবনের শেষ দিনগুলোতে তাতারীরা আবারও সুলতানের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করে। তাতারীদের এই আক্রমণের আগে মুসলিম শাসকদের সাথে সুলতানের যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, যার মধ্যে তার সাথে সিরিয়ার শাসক মালিকুল মুয়াজ্জাম, আব্বাসীয় খলিফা জাহির এবং এশিয়া মাইনরের শাসক সুলতান আলাউদ্দিন কায়কোবাদ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মালিকুল মুয়াজ্জাম এবং খলিফা জাহির সুলতান জালালুদ্দিনকে নিঃসঙ্গ ও অসহায় অবস্থায় ছেড়ে গিয়েছিলেন। এখন কেবল সুলতান আলাউদ্দিন কায়কোবাদই ছিলেন তার একমাত্র...

[১] সিরাতে জালালুদ্দিন, পৃ. ২২৮ থেকে ২৩০; আত-তারিখ ইবনে খালদুন, ৫ / ৪৬৮ থেকে ৪৬৯, ত. দারুল ফিকর।

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ, ১০ / ৩২৩, ত. দারুল কিতাবিল আরাবি।

তারিখ-এ-উম্মত-এ-মুসলিমা — চতুর্থ খণ্ড

মিত্রহীন হয়ে পড়েছিলেন। তাই তাতারীদের জন্য সুলতান জালালুদ্দিনের ওপর তলোয়ার চালানোর এক সুবর্ণ সুযোগ হাতে এসেছিল, কিন্তু এই অসহায় অবস্থায়ও সুলতান জালালুদ্দিন তাঁর সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে ‘রে’ এর ময়দানে তাতারীদের সাথে তীব্র মোকাবিলা করেন। আল্লাহর সাহায্য মুসলমানদের সাথে ছিল এবং তাতারীরা পরাজিত হয়ে পিছু হটে যায়। [১] চেঙ্গিস খানের জীবদ্দশায় মুসলিম বিশ্বের ওপর তাতারীদের এটিই ছিল শেষ আক্রমণ। এই যুদ্ধের কয়েকদিন পর ৪ রমজান ৬২৪ হিজরিতে ৭৩ বছর বয়সী চেঙ্গিস খান দীর্ঘ অসুস্থতার কারণে গোবি মরুভূমিতে মৃত্যুবরণ করে। [২]

পরের বছর চেঙ্গিস খানের উত্তরসূরি ওকতায়ী খান আরও প্রস্তুতির সাথে দুটি বিশাল বাহিনী তৈরি করে সুলতানের মোকাবিলায় পাঠান। এবার রে এবং ইসফাহানের ময়দানে সুলতান জালালুদ্দিন এবং তাতারী বর্বরদের মধ্যে বেশ কয়েকটি ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। প্রথম দুটি যুদ্ধে সুলতানকে আংশিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে পিছু হটেতে হয়। তৃতীয় যুদ্ধটি ২৪ রমজান ৬২৫ হিজরি (২৬ আগস্ট ১২২৮ খ্রিষ্টাব্দ) ইসফাহানের বাইরে সংঘটিত হয়, যা ইতিহাসের স্মরণীয় যুদ্ধগুলোর অন্যতম।

এই যুদ্ধে সুলতানের সৎ ভাই গিয়াসুদ্দিনের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত লজ্জাজনক। যুদ্ধ শুরু হতেই সে তার সৈন্যদের নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গিয়েছিল, যার ফলে মুসলমানদের জনশক্তিতে উল্লেখযোগ্য ঘাটতি দেখা দেয়। যুদ্ধের শেষ মুহূর্তের পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত অদ্ভুত। রাতের অন্ধকারে উভয় বাহিনী বিশৃঙ্খল ও বিচ্ছিন্নভাবে একে অপরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল এবং শেষ পর্যন্ত মুসলমান ও তাতারী উভয় পক্ষই অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পিছু হটে যায়। [৩]

হাফেজ জাহাবী (রহ.) বলেন:

“এটি এমন এক ভয়াবহ যুদ্ধ ছিল যার উদাহরণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না, কারণ উভয় পক্ষই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পিছু হটে গিয়েছিল।” [৪]

এই যুদ্ধের সময় সুলতানের ভাই গিয়াসুদ্দিনের বিশ্বাসঘাতকতা এবং কিছু কর্মকর্তার আবেগপ্রবণতা ও জেদের কারণে যুদ্ধে মুসলমানদের অপূরণীয় ক্ষতি হয় এবং বড় বড় সেনাপতিরা শহীদ হন। স্বয়ং সুলতান জালালুদ্দিন আট দিন পর্যন্ত নিখোঁজ ছিলেন। যুদ্ধ থেকে বেঁচে যাওয়া মুসলমানরা ইসফাহানের প্রাচীরের ভেতরে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং তাতারীরা শহরের বাইরে অবরোধ করে রেখেছিল। শহরবাসীর অবস্থা হতাশা, অসাড়তা ও ভয়ে অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। ১লা শাওয়াল এই অবস্থাতেই ঈদের নামাজের কাতার সোজা করা হচ্ছিল, এমন সময় সুলতান জালালুদ্দিন দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে শহরে প্রবেশ করেন। তাঁকে জীবিত দেখে মুসলমানরা খুশিতে আত্মহারা হয়ে যায় এবং তাঁকে স্বাগত জানাতে ছুটে আসে। এভাবে ঈদের নামাজের আনন্দ দ্বিগুণ হয়ে যায়।

কয়েক দিনের প্রস্তুতির পর সুলতান জালালুদ্দিন আবারও ইসফাহানের প্রাচীরের বাইরে খোলা ময়দানে তাতারীদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন। ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হয়। এবার আল্লাহর সাহায্য ও সমর্থনে মুসলমানরা এক গৌরবময় বিজয় অর্জন করে এবং তাতারী...

[১] সিরাত-এ-জালালুদ্দিন, পৃ. ২৩২ থেকে ২৩৪; আল-কামিল ফিত-তারিখ: বছর ৬২৫ হিজরি।

[২] রওজাতুস সাফা: ৫/৪১, ত. নওলকিশোর।

[৩] সিরাত-এ-জালালুদ্দিন, পৃ. ২৩৩ থেকে ২৩৬; আল-কামিল ফিত-তারিখ: বছর ৬২৫ হিজরি।

[৪] আল-ইবার ফি খবর মান গাবার: ৩/১৯২, ত. আল-ইলমিয়াহ।

ভীষণভাবে মার খেয়ে পালিয়ে গেল। সুলতান ইসফাহান থেকে রে পর্যন্ত (প্রায় তিনশ কিলোমিটার পর্যন্ত) তাদের পশ্চাদ্ধাবন অব্যাহত রাখলেন এবং বেছে বেছে তাদের হত্যা করলেন। অবশিষ্ট তাতারীরা জাইহুন নদী পার হয়ে ফিরে গেল এবং আগামী তিন বছর পর্যন্ত তাদের নদী পার হওয়ার সাহস হয়নি। [১]

জর্জিয়ার ঐতিহাসিক লড়াই:

সুলতান জালালুদ্দিন তাতারীদের শায়েস্তা করার কাজ থেকে অবসর হলে জানতে পারলেন যে, তাঁর আশেপাশের প্রায় এক ডজন ছোট ছোট স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্র একটি ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠন করে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, সুলতানের একের পর এক বিজয়ে তাঁর সেই প্রতিবেশীরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও অস্থির ছিল, যারা তাতারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার সাহস না থাকায় তাদের মানসিক দাসে পরিণত হয়েছিল। যেহেতু সুলতানের বীরত্ব, সাহস এবং ক্রমাগত সাফল্য এই শাসকদের কাপুরুষতা ও হীনম্মন্যতাকে সারা বিশ্বের সামনে প্রকাশ করে দিয়েছিল, তাই তাদের হিংসা সুলতানের বিরুদ্ধে জোটের রূপ ধারণ করল। এই জোটে জর্জিয়ান, কিপচাক, আরমানি, আলান, লাকজ, সারির, সুনিয়ান, আবখাজ এবং জানিত গোত্রগুলো প্রধান ছিল। সুলতান জালালুদ্দিন তাঁর জানবায যোদ্ধাদের নিয়ে শত্রুর মোকাবিলায় বের হলেন। মিত্রবাহিনী বন্যার মতো ধেয়ে আসছিল। একটি বিশাল ময়দানে উভয় পক্ষ সারিবদ্ধ হলো। মিত্রবাহিনীর নেতৃত্ব ছিল জর্জিয়ানদের হাতে।

সুলতান জালালুদ্দিন যুদ্ধের আগে শত্রুর ডান বাহুতে থাকা বিশ হাজার কিপচাক সৈন্যের সাথে গোপন চিঠিপত্রের মাধ্যমে তাদের মিত্রবাহিনী থেকে আলাদা হতে রাজি করিয়ে নিলেন। কিপচাকরা তাদের পতাকা নিয়ে ময়দান থেকে বেরিয়ে গেল। যুদ্ধের আগে একজন শক্তিশালী মিত্রের বিচ্ছেদ মিত্রবাহিনীর পারস্পরিক আস্থায় প্রচণ্ড ধাক্কা দিল এবং লড়াইয়ের আগেই তাদের মধ্যে হতাশা ছড়িয়ে পড়ল। এবার সুলতান জালালুদ্দিন শত্রুর ওপর আরেকটি মনস্তাত্ত্বিক আঘাত হানলেন। তিনি নিজে ছদ্মবেশে দুই বাহিনীর মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান জানালেন। শত্রুপক্ষ থেকে একে একে পাঁচজন দানবাকৃতির পালোয়ান মোকাবিলায় এল এবং সুলতান জালালুদ্দিন পর্যায়ক্রমে মোকাবিলা করে একে একে সবাইকে মৃত্যুর ঘাটে পৌঁছে দিলেন। শত্রুপক্ষের সৈন্যদের বুক কাঁপছিল এবং তারা বিস্ময়ভরা চোখে তাদের বাছাইকৃত বীরদের লাশ দেখছিল। সুলতান এই মুহূর্তটিরই অপেক্ষায় ছিলেন। তাঁর ইশারায় মুসলমানরা সাধারণ আক্রমণ শুরু করল। ভীত-সন্ত্রস্ত শত্রু কয়েক গুণ বেশি হওয়া সত্ত্বেও কিছুক্ষণ লড়াইয়ের পর পিঠ দেখিয়ে পালিয়ে গেল। [২]

সুলতানের বিরুদ্ধে মুসলিম শাসকদের যৌথ অভিযান:

যদিও তাতারীদের বিরুদ্ধে সফল প্রতিরোধের কারণে সাধারণ মুসলমানরা সুলতান জালালুদ্দিনের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল, কিন্তু আশেপাশের সমস্ত মুসলিম ও অমুসলিম শাসকরা তাঁর বিরুদ্ধে হিংসার আগুনে জ্বলছিল। এছাড়া খোদ সুলতানের...

[১] সীরাতে জালালুদ্দিন, পৃ. ২৩৭, ২৩৮; আল-কামিল ফিত তারিখ: সন ৬২৫ হিজরি।

[২] তারিখ-ই-জাহান কুশা: ২/ ৫০৮ থেকে ৫১১, তবা হারমাস।

তারিখ-এ-উম্মত-এ-মুসলিমা

সুলতান জালালুদ্দিন খাওয়ারিজম শাহ

তাঁর আমিরদের মধ্যেও বিশ্বাসঘাতকের অভাব ছিল না, যারা সুলতানের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে অথবা শত্রুদের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে নিজ প্রভুর বিরুদ্ধে সব ধরনের ষড়যন্ত্রে অংশীদার হয়ে গিয়েছিল। খোদ খাওয়ারিজমি সালতানাতের উজির-এ-আজম সুলতানের বিরুদ্ধে পরিকল্পনায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করছিল। ৬২৭ হিজরিতে খুব কম লোকই এমন অবশিষ্ট ছিল যাদের ওপর সুলতান জালালুদ্দিন আস্থা রাখতে পারতেন। সিরিয়ার শাসক মালিক আল-আশরাফ আগে থেকেই সুলতান জালালুদ্দিনের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। কিছুকাল পর সুলতান জালালুদ্দিনের একমাত্র মিত্র এশিয়া মাইনরের শাহ সুলতান আলাউদ্দিন কায়কোবাদও তাঁর বিরোধী হয়ে যান। সেই সময় এই দুই শাসকই ছিলেন ইসলামি বিশ্বের সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী, সম্পদশালী এবং শক্তিশালী বাদশাহদের অন্তর্ভুক্ত। মালিক আল-আশরাফ এবং সুলতান আলাউদ্দিন কায়কোবাদ সুলতান জালালুদ্দিনের মোকাবিলার জন্য একটি যৌথ বাহিনী গঠন করেন। মিশরের সেনাবাহিনীও তাদের সাথে যোগ দেয়।

২৮ রমজান ৬২৭ হিজরি (১১ আগস্ট ১২৩০ খ্রিস্টাব্দ) ইয়াসি চামান নামক স্থানে সুলতান জালালুদ্দিন এবং মিত্র শাসকদের মধ্যে এক দুঃখজনক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সুলতান জালালুদ্দিন সেই সময় কঠিন অসুস্থতার কারণে শয্যাশায়ী ছিলেন, তাই নিজের সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। এছাড়া সেই সব অভিজ্ঞ সেনাপতি যাদের ওপর সুলতানের ভরসা ছিল, তারা তাতারীদের সাথে পূর্ববর্তী যুদ্ধে শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন। যেন সেনাবাহিনী এখন সেনাপতি ছাড়াই লড়াই করছিল। ফলস্বরূপ তারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়।

খাওয়ারিজমি বাহিনীর হাজার হাজার সৈন্য নিহত হয়। এক বিশাল অংশ বন্দি হয়। অনেকে ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে থাকে। সুলতান জালালুদ্দিন কোনোমতে মাত্র সাতজন লোকসহ প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরে আসেন এবং মিত্র বাহিনী অগ্রসর হয়ে তাঁর বিজিত অঞ্চলের এক বড় অংশ দখল করে নেয়। [১]

তাতারীদের আক্রমণ এবং সুলতানের আহ্বান:

৬২৮ হিজরির শুরুতে সুলতান জালালুদ্দিনের অবস্থা ছিল সামুদ্রিক তুফানে দুলতে থাকা নৌকার সেই মাঝির মতো, যার নিয়ন্ত্রণে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। না তিনি কোনো প্রতিবেশীর সাহায্য পাচ্ছিলেন, না তাঁর তলোয়ার চালনাকারী বাহতে আগের মতো শক্তি অবশিষ্ট ছিল। বছরের পর বছর ধরে চলা নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধ এবং সফরের ক্লান্তি তাঁর স্বাস্থ্যকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। তাঁর উজিররা ছিল বিশ্বাসঘাতক এবং আমিররা ছিল বিদ্রোহী। সৈন্যদের সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছিল। অস্ত্রশস্ত্র, খাদ্য এবং রসদ সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল অপরিপূর্ণ, কোষাগার ছিল শূন্য। সুলতানের শত্রুরা এই সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিল। “আলমুত”-এর বাতিনি শাসক তাতার শাসককে বার্তা পাঠিয়ে এই অনুভূতি জাগিয়ে তুলল যে, এই সুযোগের অবশ্যই সদ্ব্যবহার করা উচিত।

শীতকাল আসার সাথে সাথেই তাতার বাহিনী ব্যাপক প্রস্তুতির পর জাইহুন নদী পার হয়ে গেল। সুলতান যখন খবর পেলেন, তখন নিজের অবস্থায় ছটফট করতে লাগলেন। তাঁর নিকৃষ্টতম শত্রু এমন এক সময়ে তাঁর ওপর আক্রমণ করছিল যখন তাঁর কাছে মোকাবিলার কোনো প্রস্তুতি ছিল না। সুলতানের কাছে এখন এছাড়া আর কোনো পথ অবশিষ্ট ছিল না যে, তিনি তাঁর প্রতিবেশী মুসলিম শাসকদের কাছে ইসলামের নামে সাহায্য প্রার্থনা করবেন। সম্ভবত তাতারীদের তলোয়ার নিজেদের ঘাড়ের কাছে দেখে এই শাসকরা অভিন্ন জাতীয় স্বার্থ...

[১] সিরাতে জালালুদ্দিন, পৃ. ৩০০ থেকে ৩৩০; সেলজুক নামা: ৬০ থেকে ৬৩; আল-কামিল ফিত তারিখ: সন ৬২৭ হিজরি; তারিখুল ইসলাম লিজ জাহাবি, সন ৬২৭ হিজরি।

তাদের সাথে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। তাই তিনি খিলাফতের দরবার থেকে শুরু করে আশেপাশের প্রতিটি ছোট-বড় শাসকের কাছে এই চিঠি লিখলেন:

“তাতার সম্রাটের বাহিনী জাইহুন নদী পার হয়ে গেছে। আমি আপনাদের সবার প্রতিরক্ষার জন্য এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছি এবং অনুরোধ করছি যে, আপনাদের প্রত্যেকে যেন নিজ নিজ পতাকাসহ একটি বাহিনী আমার সাহায্যের জন্য পাঠান, যাতে আমাদের সৈন্যদের মনোবল বৃদ্ধি পায় এবং শত্রুদের দাঁত ভেঙে দেওয়া যায়। এখন আমি চূড়ান্তভাবে সতর্ক করে দিলাম; যদি আপনারা অবহেলা করেন, তবে এর অশুভ পরিণাম নিজেরাই দেখে নেবেন।”

এদিকে তাতার দূতরাও মুসলিম শাসকদের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল এবং সুলতান জালালুদ্দিনকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে ভয়াবহ পরিণতির হুমকি দিচ্ছিল। ভীরা শাসকদের ওপর এই হুমকি কাজ করল, ফলে কেউ সুলতানের অনুরোধকে গুরুত্ব দেওয়ার যোগ্য মনে করল না। ফলস্বরূপ, তাতাররা নিশ্চিত হয়ে সুলতানের অধিকৃত এলাকাগুলোতে আক্রমণ করে দিল, যা প্রকৃতপক্ষে সমগ্র ইসলামি বিশ্বের সীমান্ত ছিল। তারা নির্বিচারে গণহত্যা চালিয়ে সেই সব শহর ও প্রদেশগুলোকে পদদলিত করতে লাগল, যা গত দশ বছরে সুলতান জালালুদ্দিনের তলোয়ারের নিরাপত্তায় আবাদ হয়েছিল। [১]

সুলতানের পরিণতি:

তাতারদের বেশ কয়েকটি বাহিনী কেবল সুলতান জালালুদ্দিনকে খুঁজে বের করার কাজে নিয়োজিত ছিল। সুলতান প্রায় একশ সঙ্গীর সাথে একটি গ্রামে আত্মগোপন করেছিলেন, এমন সময় কোনো এক বিশ্বাসঘাতক খবর দিয়ে দেয়। তাতাররা রাতারাতি আক্রমণ করে সুলতানের অধিকাংশ সঙ্গীকে শহীদ করে দেয়, তবে সুলতান জালালুদ্দিন তার দুই দাসের সাথে সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে সক্ষম হন। কিন্তু কুর্দিস্তানের পাহাড়ে এই দুই দাসও তাদের মনিবকে রক্ষা করতে করতে তার ওপর উৎসর্গিত হয়ে যান। এরপর সুলতান জালালুদ্দিন একাকী কোনো এক অজানা স্থানের দিকে চলে যান। বর্ণনার ভিন্নতার কারণে সুলতান জালালুদ্দিনের পরিণতি সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন। প্রসিদ্ধ বর্ণনা হলো, কুর্দিস্তানি ডাকাতরা তাকে গ্রেপ্তার করে একটি ঘরে বন্দি করে রাখে। পরবর্তীতে এক ক্রুদ্ধ কুর্দি সেই ঘরে প্রবেশ করে সুলতান জালালুদ্দিনকে বর্ষার আঘাতে শহীদ করে দেয়। ঐতিহাসিকদের মতে, এই ঘটনাটি ৬২৮ হিজরির শাওয়াল মাসের মাঝামাঝি / ১২৩১ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসের মাঝামাঝি সময়ের। দ্বিতীয় বর্ণনা অনুযায়ী, কুর্দিরা যাকে সুলতান জালালুদ্দিন মনে করে হত্যা করেছিল, সে আসলে সুলতানের অস্ত্রবাহক ছিল এবং তার পোশাক পরে ছিল। অন্যদিকে সুলতান এক দরবেশের পোশাকে অজানা কোনো স্থানের দিকে চলে গিয়েছিলেন এবং এরপর আর কখনো শত্রুর হাতে ধরা পড়েননি। [২]

সুলতানের পর ইসলামি বিশ্বের অবস্থা:

সুলতান জালালুদ্দিনের শাহাদাত বা নিখোঁজ হওয়ার পর তাতারদের এই দ্বিতীয় আক্রমণ সিরিয়া, ইরাক, আল-জাজিরা এবং অন্যান্য মুসলিম

[১] তারিখ-ই-জাহান কুশা: ২/৫১৮ থেকে ৫২০, ত. হরমস; আল-কামিল ফিত তারিখ: ৬২৮ হিজরি; সিরাত-ই-জালালুদ্দিন, ৩৬২ থেকে ৩৫০।

[২] তারিখ-ই-জাহান কুশা: ২/৫২০ থেকে ৫২৬, ত. হরমস; আল-কামিল ফিত তারিখ: ১০/৩৫০; সিরাত-ই-জালালুদ্দিন, ৩৬৫ থেকে ৩৮০; তারিখুল ইসলাম লিজ-জাহাবি: ৬২৮ হিজরি।

দেশসমূহ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। আল্লামা ইবনে আসির (রহ.) এই দুঘটনার ওপর এভাবে লিখেছেন:

“তাতারিরা হত্যা ও লুণ্ঠন চালিয়ে এমনভাবে সহিহ-সালামতে ফিরে গেল যে তাদের কারো কোনো ভয় ছিল না। একজন অশ্বারোহীও তাদের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। দিয়ার বকর, আল-জাজিরা, আরবিল এবং খালাত-এ তারা যা চেয়েছে তাই করেছে। না কেউ তাদের থামিয়েছে, না কেউ তাদের মোকাবিলায় দাঁড়িয়েছে। ইসলামের সুলতানরা গর্তে লুকিয়ে পড়েছে। এর ওপর বাড়তি বিষয় হলো জালালুদ্দিনের কুশল সংবাদ পাওয়াও বন্ধ হয়ে গেছে।” [১]

এই প্রেক্ষাপটে ডক্টর এডওয়ার্ড ব্রাউন লিখেছেন:

“কাফের লুণ্ঠনকারী মঙ্গোল বাহিনীর সামনে জালালুদ্দিন ছিলেন ইসলামের শেষ রক্ষক।” [২]

দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সুলতান জালালুদ্দিন সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের গুজব ছড়াতে থাকে। তাতারিরা যেখানেই এ বিষয়ে কোনো খবর পেত, তারা সুলতানের সন্ধানে সেই এলাকার প্রতিটি কোণ তল্লাশি করত। কত মানুষকেই সুলতান জালালুদ্দিন মনে করে শহীদ করে দেওয়া হয়েছিল। এমন কিছু লোকও ছিল যারা সস্তা জনপ্রিয়তা পাওয়ার জন্য সুলতান জালালুদ্দিন হওয়ার দাবি করেছিল, কিন্তু শীঘ্রই তাদের মিথ্যা প্রকাশ হয়ে পড়ে। [৩]

সুলতান জালালুদ্দিন যদিও নিজের জীবনে কাফেরদের পরাভূত করতে পারেননি, কিন্তু তিনি প্রকৃতপক্ষে ব্যর্থ হননি। আল্লাহর পথে লড়াইকারী মুজাহিদদের জজবা জয়-পরাজয়ের চেয়েও উর্ধ্ব থাকে। আল্লাহর হুকুম পালন করে তাঁকে সন্তুষ্ট করাই তাদের আসল উদ্দেশ্য হয়, তাই তারা সব অবস্থায় সফল থাকে। সুলতান জালালুদ্দিন এই মহান উদ্দেশ্য অর্জন করে সফলকাম হয়েছেন। আজও তাঁর জীবন জুলুম ও নিপীড়নের রক্তমাখা থাবা থেকে লড়াইরত মুজাহিদদের জন্য অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করছে; অন্যদিকে তাতারিদের সাহায্যকারী জাতি-বিক্রেতা মুসলিম শাসকদের করুণ পরিণতি সেই অদূরদর্শীদের আয়না দেখাচ্ছে যারা ইসলামি ভ্রাতৃত্বকে উপেক্ষা করে অন্যদের ধ্বংসের তামাশা দেখে এবং শেষ পর্যন্ত নিজেরাও ভস্মীভূত হয়ে যায়।

সুলতানের সাথীদের পরিণতি:

সুলতানের নিখোঁজ হওয়ার পর তাঁর উমারা ও সৈন্যরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। কিছু লোক ইসফাহানে অবস্থান করল যতক্ষণ না তাতারিরা ৬৩৯ হিজরিতে সেখানে দখল করে নিল। সুলতানের অনেক সৈন্য সেলজুক রুমের শাসক আলাউদ্দিন কায়কোবাদের বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। ৬৩৪ হিজরিতে কায়কোবাদের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র গিয়াসউদ্দিন কায়খসরু সিংহাসনে আরোহণ করেন, যিনি সন্দেহবশত কিছু খাওয়ারিজমি অফিসারকে বন্দি করেন। বাকি খাওয়ারিজমিরা পালিয়ে গেল এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত যাযাবরবৃত্তি ও লুণ্ঠনে লিপ্ত রইল। অবশেষে মালিক আস-সালিহ নাজমুদ্দিন আইয়ুব, যিনি তাঁর পিতা আল-মালিক আল-কামিলের পক্ষ থেকে হাররান, আমিদ এবং কাইফার শাসক ছিলেন, পিতার অনুমতি নিয়ে তাদের নিজের বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। [৪] এই অফিসারদের মধ্যে ছিলেন বারকা খান খাওয়ারিজমি, সারু খান এবং বারদি খান।

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: সন ৬২৮ হিজরি

[২] তারিখ আদবিয়াতে ইরান: ২/১১১, ত. মারকাজ তাহকিকাত, ইসফাহান

[৩] তারিখে জাহান কুশা জুওয়াইনি, পৃ. ৫২৬, ৫২৭, ত. হারমাস

[৪] তারিখে ইবনে খালদুন: ৫/১৬৭, ১৬৮, ত. দারুল ফিকর

উল্লেখযোগ্য। বারাকা খোয়ারিজমি তাদের সবার সর্দার ছিলেন। তার মর্যাদা তখন আরও বৃদ্ধি পায় যখন তার কন্যার বিয়ে আল-মালিক আস-সালিহ আইয়ুবের সাথে হয়। তবে দীর্ঘ সময় পর বারাকা খোয়ারিজমি আস-সালিহ আইয়ুবের বিরোধী হয়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বী দামেস্কের শাসক আস-সালিহ ইসমাইলের দলে যোগ দেন। এই সংঘাতের ফলে ৬৪৪ হিজরিতে হিমসের কাছে যুদ্ধ হয় যাতে বারাকা খোয়ারিজমি নিহত হন। সারুখান এবং বারদি খান এর এক বছর আগেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তাই অল্প সময়ের মধ্যেই খোয়ারিজমি আমিরদের ঐক্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। [১]

খোয়ারিজম শাহী সালতানাত

শাসনকাল ১৫৩ বছর

(৪৭৫ হিজরি থেকে ৬২৮ হিজরি / ১০৮২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২৩১ খ্রিস্টাব্দ)

নম্বর শাসক শাসনকাল পরিণতি বিশেষ কথা

১ আনুশতিগিন ৪৭৫ হিজরি থেকে ৪৯০ হিজরি (১০৮২ থেকে ১০৯৭ খ্রি.) মৃত্যু খোয়ারিজম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা। সেলজুকদের অধীনে সুবাহদারি।

২ মুহাম্মদ কুতুবুদ্দিন বিন আনুশতিগিন ৪৯০ হিজরি থেকে ৫২২ হিজরি (১০৯৭ থেকে ১১২৮ খ্রি.) মৃত্যু সেলজুকদের অধীনে সুবাহদারি।

৩ আতসিজ মুজাফফরুদ্দিন বিন মুহাম্মদ কুতুবুদ্দিন ৫২২ হিজরি থেকে ৫৫১ হিজরি (১১২৮ থেকে ১১৫৬ খ্রি.) মৃত্যু ৫৩৮ হিজরিতে খোয়ারিজম রাষ্ট্রের স্বাধীনতা।

৪ ইল-আরসালান ৫৫১ হিজরি থেকে ৫৮৭ হিজরি (১১৫৬ থেকে ১১৭২ খ্রি.) মৃত্যু

৫ আলাউদ্দিন তেকিশ ৫৬৭ হিজরি থেকে ৫৯৬ হিজরি (১১৭২ থেকে ১২০০ খ্রি.) মৃত্যু নিজের ভাই সুলতান শাহের সাথে ২০ বছর গৃহযুদ্ধ।

৬ আলাউদ্দিন মুহাম্মদ ৫৯৬ হিজরি থেকে ৬১৮ হিজরি (১২০০ থেকে ১২২১ খ্রি.) মৃত্যু খোয়ারিজম রাষ্ট্রের উত্থান, চেঙ্গিস খানের আক্রমণ।

.

জালালুদ্দিন মিনবারু ৬১৮ হিজরি থেকে ৬২৮ হিজরি (১২২১ থেকে ১২৩১ খ্রি.) শহীদ বা নিখোঁজ চেঙ্গিস খান ও তার পুত্রদের বিরুদ্ধে জিহাদ। শেষ খোয়ারিজমি শাসক।

[১] তারিখুল ইসলাম লিজ-জাহাবি, ওফাত সন ৬৪৪ হিজরি।

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

চতুর্থ খণ্ড

পঞ্চম অধ্যায়

বাগদাদের পতন

৬৫৬ হিজরি

১২৫৮ ইসভি

বাগদাদের ট্র্যাজেডি

তাতারীদের প্লাবন ছিল সীমাহীন, যা মুসলিম বিশ্বের বড় একটি অংশ দখল করার পর মদীনা-তুল-ইসলাম বাগদাদের সামনে বহু বছর পর্যন্ত থমকে ছিল। এই সময়ে মঙ্গোলিয়ায় তাতারীদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব চেঙ্গিস খানের পৌত্র মঙ্গু খানের কাছে ছিল, আর ইরান ও খোরাসানে তার দ্বিতীয় ভাই হালাকু খান শাসক ছিল। কুদরতে খোদাউন্দি গাফলতে নিমজ্জিত খেলাফতের তাজদারদের তাদের ত্রুটি সংশোধনের জন্য দীর্ঘ সময় দিয়েছিল, কিন্তু যখন তারা এই সুযোগ কাজে লাগাল না, তখন প্রকৃতির নিয়ম তাদের দুনিয়ার জন্য এক শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত বানিয়ে দিল।

বাগদাদ খলিফা নাসিরের যুগে:

এই শেষ যুগে বাগদাদের যে অবস্থা ছিল তার ওপরও এক নজর বুলানো জরুরি। আমরা পড়েছি যে ৫৭৫ হিজরিতে খলিফা আন-নাসির বাগদাদের সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন, যিনি প্রায় ৪৭ বছর শাসন করেছিলেন। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে, তার সময়েই আব্বাসীয় খেলাফতের পতনের বীজ বপন করা হয়েছিল। আল্লামা ইবনুল আসির (রহ.) লিখেছেন:

“প্রজাদের সাথে তার আচরণ ছিল অত্যন্ত খারাপ ও যালিমসুলভ। তার সময়ে ইরাক বিরান হয়ে গিয়েছিল। দেশের বাসিন্দারা বিভিন্ন শহর ও দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। খলিফা তাদের সম্পত্তি ও ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছিলেন। তার কাজে ছিল চরম বৈপরীত্য। একদিন এক ফয়সালা করতেন তো পরদিন তার উল্টোটা করতেন। তিনি রমজানে রোজাদারদের জন্য ইফতারের আয়োজন শুরু করেছিলেন, কিছুকাল পর এই সিলসিলা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। হাজীদের মেহমানদারির ব্যবস্থা করেছিলেন, আবার তাও বন্ধ করে দিয়েছিলেন। জনগণের ওপর থেকে কিছু ট্যাক্স মাফ করেছিলেন, আবার তা পুনরায় আরোপ করেছিলেন। তার সমস্ত আগ্রহ ছিল তীরন্দাজি, পোষা পাখি নিয়ে খেলা এবং কবুতরবাজির সাথে জড়িত।” [১]

মোটকথা, এভাবে আসল সামরিক বিদ্যার পরিধি সংকুচিত হতে থাকে, সমাজে তলোয়ার চালনা, নেজাবাজি এবং ঘোড়সওয়ারির মতো যুদ্ধবিদ্যা ও সামরিক খেলার প্রতি ঝোঁক কমে যায় এবং বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ফলাফল এই দাঁড়াল যে, ইরাক থেকে পুরুষোচিত গুণাবলী এবং যুদ্ধবিদ্যা বিলুপ্ত হয়ে গেল। নাসিরের বিনোদনপ্রিয় মেজাজ কেবল সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে জিহাদের অবশিষ্ট স্পৃহাই খতম করে দেয়নি, বরং তাদের এই যোগ্যতাই রাখেনি যে তারা ভবিষ্যতে কোনো পর্যায়ে ইসলামের শত্রুদের দাঁতভাঙা জবাব দিতে পারে।

আল্লামা ইবনে খালদুন (রহ.)-এর মতে, খলিফা নাসিরের এই কর্মকাণ্ডগুলো ছিল রাষ্ট্রের পতন ও ধ্বংসের প্রমাণ। [২]

[১] আল-কামিল ফিত-তারিখ: ৬২২ হিজরি

[২] তারিখ ইবনে খালদুন: ৩/৬৬০, ত. দারুল ফিকর

উন্মতে মুসলিমার ইতিহাস

আন-নাসির অত্যন্ত কৃপণ এবং সম্পদ সঞ্চয়ে চরম লোভী ছিলেন। তিনি খিলাফতের প্রাসাদে একটি বিশাল গোপন (ভূগর্ভস্থ) হাউজ তৈরি করেছিলেন, যাতে কেবল সোনা জমা করা হতো। তিনি সেই হাউজের কিনারে এসে বলতেন:

“এটি পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত কি আমি বেঁচে থাকব?” [১]

এই বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আগেও অতিক্রান্ত হয়েছে যে, আন-নাসির নিজেই চেঙ্গিস খানকে খাওয়ারিজম আক্রমণের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, যার ভয়াবহ ফলাফল এই দাঁড়িয়েছিল যে মধ্য এশিয়া ও খোরাসান থেকে শুরু করে হিন্দুস্তান ও ইরাক পর্যন্ত তাতারদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং এখানকার স্থানীয় মুসলিম জনপদগুলো ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। আরেকটি অত্যন্ত বিপজ্জনক বিষয় ছিল এই যে, আন-নাসিরের যুগে বাগদাদে বিভিন্ন ফিরকার মধ্যে পারস্পরিক মতভেদ তীব্র আকার ধারণ করে; ধর্মীয় বিদ্বেষ এতটাই বৃদ্ধি পায় যে এমনকি শাসক গোষ্ঠী এবং খিলাফতের প্রাসাদেও এই মতভেদের ভিত্তিতে স্থায়ী দল উপদল সৃষ্টি হতে থাকে। তাদের মধ্য থেকেই একটি দল পরবর্তীতে বাগদাদের করুণ ধ্বংস এবং আব্বাসীয় খিলাফতের পতনের তাৎক্ষণিক কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

হাফেজ যাহাবী (রহ.) লিখেন যে, আন-নাসিরের যুগে আশুরার শোক মিছিল (যা এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে বন্ধ ছিল) পুনরায় শুরু হয় এবং শিয়া-সুন্নি দাঙ্গা আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এই ধারার প্রথম মিছিলটি ৫৮২ হিজরির মহররম মাসে বের হয়। শিয়ারা রাস্তায় স্লোগান দিয়ে বলতে থাকে: “এখন আর চুপ থাকা বা তাকিয়া করার কোনো প্রয়োজন নেই।” তারা প্রকাশ্যে সাহাবায়ে কেরামকে অবমাননা করে যার ফলে মানুষ উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। পরবর্তী বছরগুলোতে এটি বাগদাদবাসীর জীবনের অংশ হয়ে দাঁড়ায়। [২]

আয-যাহিরের আদর্শ কিন্তু সংক্ষিপ্ত শাসনকাল:

আন-নাসিরের উত্তরসূরি আয-যাহির তার পিতার বিপরীতে অত্যন্ত মুত্তাকী, সুন্নাহর অনুসারী, ন্যায়পরায়ণ এবং দয়ালু মানুষ ছিলেন। তিনি নিরপরাধ মানুষকে কারাগার থেকে মুক্তি দেন। তাদের ওপর আরোপিত জরিমানা মওকুফ করে দেন। তার যুগে জিনিসপত্রের দাম কমে যায় এবং মানুষ সচ্ছল হতে থাকে। আল্লামা ইবনুল আসীর (রহ.) তার সম্পর্কে লিখেন:

“তিনি খলিফা হয়ে হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) এবং উমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.)-এর যুগের পুনরাবৃত্তি করেন। যদি কেউ বলে যে উমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.)-এর পর তার মতো কোনো খলিফা আসেনি, তবে সে সত্যই বলবে। তিনি তার পিতা এবং তার পূর্ববর্তী খলিফাদের যুগে জবরদখলকৃত সম্পদসমূহ ফিরিয়ে দেন। সমস্ত শহর থেকে ট্যাক্স মওকুফ করে দেন।”

পূর্ববর্তী খলিফার যুগে গোয়েন্দারা বিভিন্ন জনসভায় মানুষের পারস্পরিক কথোপকথন লিখে খলিফার কাছে পাঠাত। আয-যাহির এটি বন্ধ করে দেন এবং বলেন: “মানুষের ব্যক্তিগত মজলিসের কথা জানার আমাদের কী প্রয়োজন? আমাদের শুধু সেই কথাই জানানো হোক যার সম্পর্ক সরকারের সাথে রয়েছে।” বলা হলো: “এভাবে তো মানুষ বিগড়ে যাবে।” আয-যাহির বললেন: “আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি যেন তিনি তাদের সংশোধন করে দেন।”

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১৩/২৬০, সম্ভবত এটি সেই ভূগর্ভস্থ হাউজ ছিল যা ৬৫৬ হিজরিতে হালাকু খান লুণ্ঠন করেছিল।

[২] আল-ইবার ফি খবর মান গাবার: সন ৫৮২ হিজরি।

কিন্তু সেই সময়ের আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের (আহলে আল্লাহ) যেমন আশঙ্কা ছিল, এই নেককার খলিফার খিলাফতের মেয়াদ তেমনই সংক্ষিপ্ত প্রমাণিত হলো এবং তিনি নয় মাস পর ইন্তেকাল করলেন। ইবনুল আসীর (রহ.) লিখেছেন:

“আল্লাহ পাক জানেন যে, যখন থেকে তিনি খলিফা হয়েছেন, আমি সময়ের বিপর্যয় এবং মানুষের ফাসাদ দেখে ভয় পাচ্ছিলাম যে, পাছে তাঁর এই সময়কাল সংক্ষিপ্ত না হয়। আমি আমার বন্ধুদের বলেছিলাম যে, আমাদের এই সময় এবং আমাদের যুগের মানুষ এমন একজন নেককার মানুষের যোগ্য নয়। শেষ পর্যন্ত তাই হলো।” [১]

মুসতানসির বিল্লাহর যুগ:

আল-জাহিরের পর তাঁর পুত্র মুসতানসির খলিফা হন। তিনি শাসনের জন্য ১৭ বছরের দীর্ঘ সময় পান। তিনি একজন যোগ্য, দানশীল, বুদ্ধিমান এবং সতর্ক মানুষ ছিলেন। তিনি একদিকে তাতারীদের সাথেও সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন, অন্যদিকে সুলতান জালালুদ্দিনকেও সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছিলেন। তবে তিনি এ ব্যাপারে আন্তরিক ছিলেন না, তাই শেষ মুহূর্তে তিনি নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেন এবং এভাবে খওয়ারেজম সাম্রাজ্যকে ধ্বংস হতে দেন। কিন্তু এর ফলাফল এই দাঁড়ালো যে, ৬২৮ হিজরিতে সুলতান জালালুদ্দিনের নিখোঁজ হওয়ার পর তাতারীরা বাগদাদের সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে গেল। মুসতানসির বাগদাদ রক্ষার জন্য চিন্তিত ছিলেন, তাই তিনি বিপুল অর্থ ব্যয় করে একটি বিশাল সেনাবাহিনী গঠন করেন যাতে এক লক্ষ অশ্বারোহী ছিল। এভাবে তাতারীদের জন্য বাগদাদ দখল করা সহজ ছিল না। ৬৩৫ হিজরিতে যখন তাতারীরা বাগদাদের পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে লুটতরাজ শুরু করল, তখন খলিফার কয়েকজন সেনাপতি সৈন্য নিয়ে তাদের দিকে অগ্রসর হলেন এবং তাদের পরাজিত ও হত্যা করলেন। [২]

৬৩৮ হিজরিতে তাতারী খাকান ওকতায়ীর পক্ষ থেকে বাগদাদসহ সমস্ত দেশের শাসকদের কাছে এই সতর্কবার্তা পাঠানো হয়েছিল:

“আসমানের রবের প্রতিনিধি, জমিনকে পদানতকারী, পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক খাকানের পক্ষ থেকে এই আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, সমস্ত শহরের প্রাচীরগুলো ভেঙে ফেলা হোক এবং খাকানের আনুগত্য স্বীকার করা হোক।”

কিন্তু মুসলিম শাসকরা এই দূতবার্তাকে উপেক্ষা করেন। এর কারণ সম্ভবত এই ছিল যে, সেই সময় বাগদাদের কাছে একটি বিশাল শক্তি ও সেনাবাহিনী ছিল, যার ফলে মুসলমানদের মধ্যে কিছুটা সাহস ছিল। [৩]

মুসতানসির তাতারীদের হাতে ধ্বংস হওয়া শত শত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষতির ক্ষতিপূরণ হিসেবে ৬৩১ হিজরিতে বাগদাদে ‘মুসতানসিরিয়া’ নামে একটি সুউচ্চ ও শানদার জামিয়া (বিশ্ববিদ্যালয়) নির্মাণ করেন। যেখানে তাফসির ও হাদিসের সাথে চার ইমামের ফিকহের উচ্চতর শিক্ষা দেওয়া হতো। হানাফি, মালিকি, শাফেয়ি এবং হাম্বলি ফিকহের জন্য আলাদা আলাদা বিভাগ ছিল। প্রতিটি বিভাগে একজন ফকিহ প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন এবং সাথে দুইজন সহকারীও ছিলেন। প্রতিটি বিভাগে ৬২ জন ছাত্রের ভর্তির সুযোগ ছিল। হাদিসের উচ্চতর শিক্ষার জন্য দশজন ছাত্র রাখা হতো।

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: বছর ৬২৩ হিজরি।

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: বছর ৬৩১ হিজরি থেকে ৬৩৫ হিজরি, ৬৩০ হিজরি, ৬৫৬ হিজরি; আল-হাওয়াদিসুল জামিয়া ওয়াত তাজারিবুন নাফিয়া ফিল মায়াতুস সাবিআহ, ইবনুল ফুওয়াতি (মৃত্যু ৭২৩ হিজরি), পৃষ্ঠা ৯৬, ৯৭, ইলমিয়াহ সংস্করণ।

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: বছর ৬৩৮ হিজরি।

যেতেন। এই বিভাগে একজন শাইখুল হাদিস এবং দুইজন ইবারত পাঠকারী নিযুক্ত ছিলেন। একটি বিভাগ ছিল চিকিৎসা বিজ্ঞানের, যেখানে একজন দক্ষ চিকিৎসক দশজন ছাত্রকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উচ্চতর শিক্ষা দিতেন। এতিম ছাত্রদের জন্য একটি আলাদা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। সকল ছাত্রের যাবতীয় প্রয়োজনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ছিল। লঙ্গরখানা থেকে রুটি, মাংস এবং হালুয়া বিতরণ করা হতো। মৌসুমী শুকনো ফল ও তাজা ফলও দেওয়া হতো। জামেয়াতে একটি শাফাখানা (চিকিৎসালয়) ছিল যেখানে ছাত্রদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হতো। একটি تَبْ خانِه (পাঠাগার) ছিল যেখানে বিশ্বের দুর্লভ ও দুপ্রাপ্য বইসমূহ সংগ্রহ করা ছিল। খলিফা মাদ্রাসার জন্য বড় বড় জায়গির ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন, তাই ব্যয়ভার সুন্দরভাবে সম্পন্ন হতো।

মুস্তানসিরের এই চেষ্টাও ছিল যেন দেশে সুন্নি-শিয়া বিভেদ বাড়তে না পারে, তাই তিনি উভয় দলকে সম্ভুষ্ট রাখতেন। সামাররায় শিয়াদের দ্বাদশ ইমামের একটি গুহা ছিল। বনু বুওয়াইহ-এর যুগে আরসালান বাসাসিরি নামক একজন শিয়া আমির ৪৫০ হিজরিতে গুহার ওপর একটি ইমারত নির্মাণ করেছিলেন যা শিয়াদের পবিত্র স্থানের মর্যাদা লাভ করেছিল। ৬৪০ হিজরিতে এই ইমারতটি আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডের শিকার হয়। মুস্তানসির এটি পুনরায় নির্মাণ করিয়ে দেন। এই বছরই মুস্তানসির ইন্তেকাল করেন। [১]

যোগ্য শাসকগণও কেন রাষ্ট্রকে পতন থেকে রক্ষা করতে পারলেন না?

যদিও মুস্তানসিরও তার পিতা খলিফা জাহিরের মতো সমাজে সংস্কার এবং রাষ্ট্রীয় উন্নতির আকাঙ্ক্ষী ছিলেন, কিন্তু তার যুগে সমাজের ফাসাদ এবং সময়ের বিপর্যয় এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে তা পরিবর্তন করার জন্য একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন ছিল। ইতিহাসে এমন অনেকবার দেখা গেছে যে, অনেক পতনোন্মুখ রাষ্ট্রের শেষ দিকের কিছু শাসক কেবল নেক সীরাত এবং সচ্চরিত্রই হন না, বরং তারা দেশ ও মিল্লাতের সংস্কার এবং সমাজের প্রশিক্ষণের জন্যও চিন্তিত থাকেন; কিন্তু ততক্ষণে ফাসাদের উপাদান এবং ধ্বংসাত্মক বিপ্লবের কারণসমূহ পূর্ণ হয়ে যায় এবং সাধারণ কোনো সংস্কারমূলক প্রচেষ্টা এখন পরিস্থিতিতে যৌক্তিক পরিণতিতে পৌঁছানো থেকে আটকাতে পারে না। আজ-জাহির এবং আল-মুস্তানসির এমনই খলিফা ছিলেন। একজন সময়ই খুব কম পেয়েছিলেন। দ্বিতীয়জন দীর্ঘ মেয়াদেও সরকারের ভেঙে পড়া দেয়ালগুলোকে খুব বেশি মজবুত করতে পারেননি।

মুস্তানসিরের পর তার ভাই খাফাজি খিলাফতের সঠিক হকদার ছিলেন। তিনি এতই সাহসী, সতর্ক এবং আত্মমর্যাদাশীল মানুষ ছিলেন যে বলতেন:

“যদি খিলাফত আমি পাই তবে আমি জাইহুন নদী পার হয়ে তাতারীদের নাম-নিশানা মিটিয়ে দেব এবং ইসলামি এলাকাগুলো তাদের থেকে উদ্ধার করে ছাড়ব।”

যদি খাফাজি খলিফা হতেন তবে হয়তো বাগদাদের ধ্বংস এত কাছে আসত না, কিন্তু একটি বিগড়ে যাওয়া ব্যবস্থা প্রায়ই বিগড়ে যাওয়ার দিকেই ঝুঁকে থাকে, সংস্কারের দিকে নয়। এর মোড় ঘোরানোর জন্য অনেক বড় সংস্কারমূলক আন্দোলনের প্রয়োজন হয় যার তখন দূর-দুরান্ত পর্যন্ত কোনো নাম-নিশানা ছিল না। তাই খিলাফতের দরবারের সর্বেসর্বা আমিরগণ, যাদের মধ্যে আমির দাওয়াইদার এবং আমির ইকবাল শরাবি উল্লেখযোগ্য, খাফাজিকে ক্ষমতা থেকে দূরে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তারা জানতেন যে খাফাজি খলিফা হলে তাদের মনগড়া কাজ করতে দেবেন না। তাই তারা মুস্তানসিরের পুত্র আবু আহমদ আবদুল্লাহকে খলিফা বানিয়ে নিলেন। [২]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: সন ৬৪১ হিজরি, ২৪০ হিজরি, ত হিজর

[২] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ৪২৮; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: সন ৬৪০ হিজরি, ২৫৬ হিজরি

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

আখেরি খলিফা মুস্তাসিম বিল্লাহ:

১০ জুমাদিউল আখিরা ৬৪০ হিজরিতে মুস্তানসিরের মৃত্যু হলে আমির ইকবাল শারাবি এই খবরটি ততক্ষণ গোপন রাখেন যতক্ষণ না আবু আহমদের খিলাফতের জন্য পথ সুগম হয়। মুস্তানসিরের মৃত্যুর ২০ দিন পর পূর্ণ প্রস্তুতির সাথে তার মৃত্যুর ঘোষণা দেওয়া হয় এবং সাথে সাথেই নতুন খলিফাকে সিংহাসনে বসানো হয়। খাফাজি নিজের জীবনের আশঙ্কা বোধ করেছিলেন, তাই তিনি রাজনীতি থেকে নির্লিপ্ত হয়ে জাজিরাতুল আরবে চলে যান। মুস্তাসিম বিল্লাহ উপাধিতে সিংহাসনে আরোহণকারী এই ব্যক্তি ছিলেন বাগদাদের শেষ আব্বাসীয় খলিফা। খিলাফতের সময় তার বয়স ছিল ৩০ বছর। তিনি কুরআনে মাজিদের হাফেজ ও ক্বারি ছিলেন। জামাতের সাথে নামাজ আদায়ে যত্নবান ছিলেন। ঐতিহাসিকদের মতে, তিনি কখনো মাদকদ্রব্য বা হারাম জিনিসের কাছেও যাননি। প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোজা রাখতেন। তবে তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত সহজ-সরল, অনভিজ্ঞ যুবক। স্বভাবে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কোমলতা, অবহেলা এবং কিছুটা উদাসীনতাও ছিল। তিনি ১৫ বছর শাসনকাল পান, যার মধ্যে সালতানাতের আমিরদের জন্য প্রতিটি দিন ছিল ঈদের মতো এবং প্রতিটি রাত ছিল বাসর রাতের মতো। [১]

শেষ যুগে বাগদাদের শিক্ষণীয় অবস্থা:

মুস্তানসির ও মুস্তাসিমের আমলে বাগদাদের খলিফা ও আমিরদের বাহ্যিক শান-শওকত, ধন-সম্পদ ও বিলাসিতা এবং কৃত্রিমতা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছিল যা ছিল বিস্ময়কর। সত্য কথা বলার লোক কমে গিয়েছিল। তাদের পরিবর্তে এমন সব বাকপটু ও জ্ঞানপাপীদের ভিড় ছিল যারা নিজেদের চাটুকারিতার মাধ্যমে শাসকদের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করতে ব্যস্ত থাকত। শুধু পেশাদার কবিরাই নয়, কিছু আলেমও শাসকদের প্রশংসা ও স্তুতিতে সীমা ছাড়িয়ে যেতেন। ৬৩৩ হিজরিতে খলিফা মুস্তানসির যখন দারুল উলুম মুস্তানসিরিয়া পরিদর্শনে যান, তখন ওয়াজিহ উদ্দিন কাইরওয়ানি নামক এক ফকিহ খলিফার সম্মানে একটি কাসিদা পেশ করেন যাতে এই কবিতাটি ছিল:

لَوْ كُنْتُ يَوْمَ السَّقِيفَةِ حَاضِرًا كُنْتُ الْمُقَدَّمُ وَالْإِمَامَ الْأَرْوَعا

“আপনি যদি সকিফার দিন উপস্থিত থাকতেন (যেদিন হযরত আবু বকর সিদ্দিককে খলিফা নির্বাচিত করা হয়েছিল), তবে আপনিই সবার উপরে থাকতেন এবং অত্যন্ত প্রভাবশালী শাসক হতেন।”

আশ্চর্যের বিষয় হলো, মুসলিম বিশ্বের সেই বৃহত্তম বিদ্যাপীঠে তখন এমন কোনো সত্যবাদী আলেম ছিলেন না যিনি এই ভুল বক্তব্যের প্রতিবাদ করতেন। সৌভাগ্যবশত আইয়ুবী বংশের একজন আলেম শাহজাদা আল-মালিকুন নাসির দাউদ (কারাকের শাসক) মেহমান হিসেবে সেই মজলিসে আমন্ত্রিত ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন: “আপনি ভুল বলছেন। সেই সময় আমিরুল মুমিনিনের মহান পূর্বপুরুষ আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা.) জীবিত ছিলেন, তা সত্ত্বেও হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং প্রভাবশালী শাসক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন।”

এটি শুনে খলিফা মুস্তানসির চমকে উঠলেন। তিনি শাহজাদা নাসির দাউদকে খেলাত প্রদান করলেন এবং সেই ফকিহকে দেশান্তর করে দিলেন। [২]

[১] তারিখুল খুলাফা লিস-সুয়ুতী, পৃ. ৩২৮, ত নওয়ারা; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: সানা ৭৩০ হি. ২৫৬ হিজরি; আসমাতুন নুজুমুল আউয়ালী লিল-ইসামী: ৩/৫১৬, ত আল-ইলমিয়া।

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৭/৩৮৩, ৩৮৫, ত দারুল হিজর।

এই ঘটনা থেকে যেমন খলিফার সত্যনিষ্ঠা প্রকাশ পায়, তেমনি এটিও বোঝা যায় যে সেই সময়ে খলিফাদের চাটুকারিতা কতটা সাধারণ ছিল। খলিফাদের প্রশংসায় দ্বীনের অবমাননা করা যদি সাধারণ বিষয় না হতো, তবে আলেমদের মজলিসে একজন ফকিহ এমন কবিতা বলার সাহস পেতেন না। এর মাধ্যমে সেই যুগের আলেমদের অবস্থাও প্রকাশ পায় যে, তাদের মধ্যে কিছু লোক তোষামোদ করার জন্য সব সীমা অতিক্রম করে যেতেন, অন্যদিকে বাকি আলেমদের খলিফাদের উপস্থিতিতে মুখের ওপর সত্য কথা বলার সাহস হতো না।

শাসনকর্তাদের বিলাসিতা ও প্রাচুর্য

যখন আলেমদের মধ্যেও সত্য বলার রীতি বিলুপ্ত হয়ে যায়, তখন জবাবদিহিতার প্রক্রিয়া নিজেই মৃত হয়ে পড়ে এবং উচ্চবিত্ত শ্রেণী সীমাহীনভাবে স্বাধীন হতে থাকে। সুতরাং বাগদাদেও একই অবস্থা ছিল। খলিফাদের বিলাসিতা ও প্রাচুর্য সর্বোচ্চ শিখর স্পর্শ করছিল। খলিফাদের কথা তো বাদই থাক, তাদের প্রিয় খাদেমদের শান-শওকতেরও কোনো ইয়ত্তা ছিল না। এই লোকেরা সাধারণ গোলাম ও খাদেম হিসেবে প্রাসাদে নিযুক্ত হতো। কেউ ছিল ফরাশ, কেউ সাকি, কেউ তোশকখানার পরিচালক এবং কেউ সিলাহদার। কিন্তু তাদের মধ্যে যে কেউ খলিফার প্রিয়পাত্র হতো, তার যেন ডানা গজিয়ে যেত। এই আদুরে খাদেমদের বিলাসিতার অবস্থা পড়ে মানুষ হতবাক হয়ে যায়।

খলিফা মুস্তানসির তার গোলাম আলাউদ্দিন তাবারসিকে (দুওয়াইদার কাবির) তার বিয়ের সময় এক লক্ষ দিনার (প্রায় ২৫ কোটি টাকা) উপহার দিয়েছিলেন। তাবারসির নিজের সম্পত্তি থেকে বার্ষিক আয় ছিল পাঁচ লক্ষ দিনার (প্রায় ১ আরব ২৫ কোটি টাকা)। [১] ৬৩২ হিজরিতে আমির মুজাহিদুদ্দিন দুওয়াইদারের বিয়ে মসুলের শাসকের মেয়ের সাথে হলে মোহরানা বিশ হাজার দিনার (প্রায় পাঁচ কোটি টাকা) ধার্য করা হয়। [২] ৬৩৩ হিজরিতে আইয়ুবি শাহজাদা আল-মালিকুন নাসির দাউদ বাগদাদে এলে তার সম্মানে আয়োজিত একটি ভোজসভায় বারো হাজার দিনার (প্রায় তিন কোটি টাকা) ব্যয় হয়। [৩] মসুলের শাসক বাগদাদের আমির ইকবাল শারাবির জন্য একটি পাখি পাঠালে আমির সেটি রাজপথে ঝুলিয়ে উপস্থিতদের ওপর দুই হাজার দিনার (প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা) বিলিয়ে দেন। [৪] এরপর পাখি বহনকারীদের তিন হাজার দিনার (প্রায় ৭৫ লক্ষ টাকা) প্রদান করেন। [৫] আমিরদের খাদেম ও গোলামরাও নবাবদের চেয়ে কম ছিল না। আমির ইকবাল শারাবির এক খাদেম জনৈক আমিরের বিয়েতে উপস্থিতদের মাঝে চার হাজার দিনার (প্রায় এক কোটি টাকা) বিলিয়ে দেন। [৬] আব্দুল গনি বিন ফাখির ফরাশ নিরক্ষর ছিল কিন্তু রাজাদের মতো জীবনযাপন করত। তার চাকরদের প্রত্যেকের বেতন ছিল দেড়শ দিনার (প্রায় সাড়ে ৩ লক্ষ টাকা)। [৭]

এর বিপরীতে বাগদাদের সবচেয়ে বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মুস্তানসিরিয়ায় হাদিস ও ফিকহ পড়ানো শিক্ষকদের...

[১] তারিখুল ইসলাম লিয-যাহাবি: খণ্ড ৪৭, পৃষ্ঠা ৪৩৩ (সন ৬৫০ হিজরি), তদমুরি সংস্করণ।

[২] আল-হাওয়াদিসুল জামিয়া ওয়াল তাজারিবুন নাফিয়া লি-ইবনুল ফুওয়াতি: পৃষ্ঠা ৭১, ইলমিয়া সংস্করণ।

[৩] আল-হাওয়াদিসুল জামিয়া ওয়াল তাজারিবুন নাফিয়া: পৃষ্ঠা ৭৪।

[৪] আল-হাওয়াদিসুল জামিয়া ওয়াল তাজারিবুন নাফিয়া: পৃষ্ঠা ৮৭।

[৫] আল-হাওয়াদিসুল জামিয়া ওয়াল তাজারিবুন নাফিয়া: পৃষ্ঠা ৮৫, সন ৬৩৪ হিজরি।

[৬] আল-হাওয়াদিসুল জামিয়া ওয়াল তাজারিবুন নাফিয়া: পৃষ্ঠা ১৯৮।

নোট: ফরাশ বলা হতো তাঁবু খাটানো এবং কাপেট বিছানোর দায়িত্বশীলদের। তার অধীনে অনেক কুলি ও চাকর থাকত যারা তাকে সাহায্য করত। তোশকখানা: সেই ঘর যেখানে আমিরদের পোশাক, বিছানা, লেপ, কস্বল এবং গৃহস্থালির আসবাবপত্র থাকত।

বেতন বারো দিনার (প্রায় তেইশ হাজার টাকা) এর বেশি ছিল না। [১] যেখানে হিফজ ও কিরাতের শিক্ষকদের মাসিক তিন দিনার (প্রায় সাড়ে সাত হাজার টাকা) দেওয়া হতো। [২]

অনুষ্ঠানাদিতে নামাজে অবহেলা:

রাজকীয় শান-শওকতের সবচেয়ে বড় প্রদর্শনী যুবরাজের উত্তরাধিকারী ঘোষণা, নতুন খলিফার সিংহাসন আরোহণ এবং ঈদের অনুষ্ঠানগুলোতে হতো। পুরো শহর মিছিল ও শোভাযাত্রায় মেতে উঠত, যার অনেক প্রহর আমোদ-প্রমোদে কেটে যেত। এই খেলাধুলা ও তামাশায় অপচয় ও লোকদেখানো প্রদর্শনী চরম সীমায় পৌঁছে যেত। সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় ছিল এই যে, এই সময়ে নামাজের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় বিধানের প্রতিও কোনো ভ্রক্ষেপ করা হতো না এবং মানুষের অনেক নামাজ কাজা হয়ে যেত।

৬৩২ হিজরিতে খলিফা মুসতানসিরের পক্ষ থেকে আমির মুজাহিদউদ্দীন দুয়াইদারের সম্মানে যে সংবর্ধনা মিছিল বের করা হয়েছিল, তা সারারাত চলতে থাকে, এমনকি এশার নামাজের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায় এবং সুবহে সাদিক হয়ে যায়। [৩] ৬৩৯ হিজরিতে ঈদের উপলক্ষে যে রাজকীয় মিছিল বের হয়েছিল, তাতে মানুষ এতটাই মগ্ন ছিল যে ঈদের নামাজ আসরের ওয়াক্তে গিয়ে আদায় করা হয়েছিল। [৪]

একইভাবে ৬৪৩ হিজরিতে ঈদুল ফিতরের উৎসব এমন ধুমধাম করে পালন করা হয়েছিল যে ঈদের নামাজ বিলম্বিত হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত মধ্যরাতের কাছাকাছি সময়ে মানুষ ঈদগাহে পৌঁছায় এবং ঈদের নামাজ আদায় করা হয়। [৫] একই বছর ঈদুল আজহার উপলক্ষে যখন বাগদাদের অধিবাসীরা সামরিক কুচকাওয়াজ দেখার জন্য শহরের বাইরে সমবেত হয়েছিল, তখন এই তামাশায় সন্ধ্যা হয়ে যায় এবং ঈদের নামাজ মাগরিবের ওয়াক্তে পড়া হয়। [৬]

হজ পালনে বিঘ্ন:

খলিফাদের প্রাচীন নিয়ম চলে আসছিল যে হজের ব্যবস্থাপনা তাদের পক্ষ থেকেই হতো এবং প্রতি বছর তাদের পক্ষ থেকে আমিরুল হজ নিযুক্ত করা হতো এবং কাবার গিলাফ পরিবর্তন করা হতো। কিন্তু তাতারীদের ভয় এবং অরাজকতার কারণে সপ্তম হিজরি শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ইরাক থেকে হাজীদের কাফেলার যাত্রা নিয়মিত থাকেনি। ৬৩৩ হিজরি থেকে ৬৪০ হিজরি পর্যন্ত টানা সাত বছর এমন কেটেছে যে ইরাক থেকে হাজীদের কোনো কাফেলা মক্কায় আসেনি। একইভাবে ৬৪৩ হিজরি থেকে ৬৪৯ হিজরি পর্যন্ত ছয় বছর এই একই অবস্থা ছিল। [৭] চারদিকে রাজনৈতিক টানাপোড়েন, পারিবারিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং বিশৃঙ্খলার রাজত্ব ছিল, সব দিক থেকে নৈতিক ও ধর্মীয় অবক্ষয় বিরাজ করছিল। অবিবেচনা ও দূরদর্শিতার অভাব দিন দিন বাড়ছিল। শরীয়ত বিরোধী কাজ সাধারণ হয়ে গিয়েছিল। খলিফার জন্য জমিনবুসি (ভূমি চুস্বন), আস্তানা বুসি...

[১] আল-আসজাদুল মাসবুক ওয়াল জাওহারুল মাহকুক ফি আখবারিল খুলাফা ওয়াল মুলুক লিল মালিকিল আশরাফ আল-গাসসানি (মৃ. ৮০৩ হি.), পৃ. ৩৫৮, ত. দারুল বয়ান বাগদাদ (১৯৭৫ খ্রি.)

[২] আল-আসজাদুল মাসবুক ওয়াল জাওহারুল মাহকুক ফি আখবারিল খুলাফা ওয়াল মুলুক, পৃ. ৩৫৯

[৩] আল-হাওয়াদিসুল জামিয়া ওয়াত তাজারিবুন নাফিয়া লি ইবনুল ফুওয়াতি (মৃ. ৭২৩ হি.), পৃ. ৮৬, ত. আল-ইলমিয়া; আল-আসজাদুল মাসবুক ওয়াল জাওহারুল মাহকুক ফি আখবারিল খুলাফা ওয়াল মুলুক, পৃ. ৪৭৭, ৪৭৮

[৪] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া সানা ৬৩৯ হি.

[৫] আল-আসজাদুল মাসবুক ওয়াল জাওহারুল মাহকুক ফি আখবারিল খুলাফা ওয়াল মুলুক, পৃ. ৫৩৩

[৬] আল-আসজাদুল মাসবুক ওয়াল জাওহারুল মাহকুক ফি আখবারিল খুলাফা ওয়াল মুলুক, পৃ. ৫৩৩

[৭] শিফাউল ঘারাম বি আখবারিল বালাদিল হারাম: ২/২৮৬, ২৮৭, লি আবিত তাইয়িব আল-ফাসি (মৃ. ৮৩২ হি.), ত. আল-ইলমিয়া

এবং মেঝেতে নাক রাখার (সিজদা করার) প্রথা প্রচলিত ছিল এবং এই শরীয়ত বিরোধী প্রথার জন্য কোনো লজ্জা অনুভব করা হতো না। ঘুষ গ্রহণ এবং নৈতিক অবক্ষয় বৃদ্ধি পাচ্ছিল; ঠগ, প্রতারক ও ধূর্তদের পাশাপাশি বাতিল ফেরকাগুলোর অনুসারীদের, বিশেষ করে বাতেনি ও রাফেজিদের তৎপরতা তুঙ্গে ছিল। সচ্ছলতা ও ধন-সম্পদের কারণে আমোদ-প্রমোদ এবং খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ অনেক বেড়ে গিয়েছিল। বিলাসিতার উপকরণ, বিশেষ করে বাদ্যযন্ত্রের আসরগুলো আমির-ওমরাহদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নিম্নবিত্তের মানুষ গায়কদের মজলিসে দলে দলে অংশগ্রহণ করত। শাসকদের মধ্যে দুর্নীতি ছিল সাধারণ বিষয়, নতুন নতুন জায়গির লাভের নেশা উন্মাদনার রূপ ধারণ করেছিল এবং অন্যের সম্পদ দখল করা ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।

[১]

এমন ফিতনাপূর্ণ পরিস্থিতিতে যদি আল্লাহর কিছু বান্দা মাদ্রাসা, খানকাহ এবং মসজিদে মানুষকে সংশোধনের জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়েও যাচ্ছিলেন, তবে সেগুলোর প্রভাব ছিল খুবই সামান্য। অধিকন্তু ক্ষতি এই হলো যে, ৬৪৫ হিজরিতে বাগদাদের প্রশাসন সমস্ত ওয়ায়েজদের ওয়াজ করতে নিষেধ করে দেয়, যার ফলে সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টা আরও সীমিত হয়ে পড়ে। [২]

মুসলিম বিশ্বের ওপর পূর্বে তাতারীরা চেপে বসেছিল এবং পশ্চিমে ক্রুসেডারদের আক্রমণ বিরতিহীনভাবে চলছিল, কিন্তু বাগদাদ খিলাফত মুসলিম বিশ্বের অভিভাবকত্বের পরিবর্তে ইসলামী সরকারগুলোকে উৎখাত করার জন্য ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। ফলে উলামা ও মাশায়েখদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও শাসক ও সচ্ছল শ্রেণির মধ্যে যে অবক্ষয় বাসা বেঁধেছিল, তা কমার পরিবর্তে বেড়েই চলছিল। এই পতন ও অধঃপতনের মুখে সেই খোদায়ী সতর্কবাণীগুলোও তাদের জাগ্রত করতে পারেনি, যা আসমানি দুর্যোগ এবং কাফেরদের আধিপত্যের আকারে সামনে এসেছিল। অতঃপর আল্লাহর ইচ্ছায় বাগদাদকে মুসলিম বিশ্বের পাহারাদারি থেকে অব্যাহতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়ে গেল এবং কয়েক বছরের মধ্যে এর চূড়ান্ত কারণগুলো অত্যন্ত দ্রুততার সাথে তৈরি হয়ে গেল।

আসমানি সতর্কবাণীসমূহ:

এর আগে একটি শেষ সতর্কবাণী হিসেবে আল্লাহ তাআলা ইসলামের কেন্দ্র মদিনা মুনাওয়ারার কাছে সেই বিস্ময়কর নিদর্শন প্রকাশ করেছিলেন, যার ভবিষ্যদ্বাণী হজুর আকরাম ﷺ ছয় শতাব্দী আগেই করে গিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন:

“কিয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না হিজাজ থেকে এমন এক আগুন বের হবে যার আলো বসরার উটগুলোর ঘাড়কে আলোকিত করে দেবে।” [৩]

৩ জমাদিউল আখিরা ৬৫৪ হিজরিতে মদিনা মুনাওয়ারায় ভূমিকম্পের কম্পন শুরু হয়। এর সাথে এক অদ্ভুত শৌঁ শৌঁ শব্দ শোনা যাচ্ছিল। দুই দিন ধরে এই ধারা বিরতি দিয়ে চলতে থাকে। এই সময়ে ভূমিকম্পের ১৪টি কম্পন অনুভূত হয়। শুক্রবার ৫ জমাদিউল আখিরা জুমার নামাজের আগে কম্পন বন্ধ হয়ে যায়। জুমার নামাজের পর বনু কুরাইজার নিকটবর্তী আগ্নেয়গিরির পাহাড়গুলো...

[১] তারিখ-এ-দাওয়াত ও আজিমত: ১/৩০৭

[২] আল-হাওয়াদিস আল-জামিয়া, পৃ. ১৭১

[৩] “সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব বলেন: আবু হুরায়রা আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: কিয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না হিজাজ ভূমি থেকে এমন এক আগুন বের হবে যা বসরার উটগুলোর ঘাড়কে আলোকিত করে দেবে।” (সহীহ বুখারী, পৃ. ৭১৮, বাব খুরুজুন নার)

...থেকে ভয়াবহ ধোঁয়া উঠতে শুরু করল যা আকাশকে ঢেকে ফেলল। মাগরিবের সময় ধোঁয়ার পরিবর্তে এমন আগুন প্রকাশ পেল যার শিখা আকাশের সাথে কথা বলছিল। অর্থাৎ প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন যে, মক্কা সহ অনেক শহরে এই শিখা দেখা যাচ্ছিল। এই আগুন আকাশকে লাল করে দিয়েছিল, আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত তায়মা (যা মদিনা থেকে ৪৭৪ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত) পর্যন্ত এমন আলো ছড়িয়ে দিয়েছিল যেন প্রতিটি ঘরে প্রদীপ জ্বলছে। সেই আলোতে সেখানকার মানুষ রাতের বেলা লেখা-পড়া করত। বসরার বেদুঈনরা জানিয়েছে যে, তারা সেই আলোতে তাদের উটের ঘাড় দেখতে পাচ্ছিল।

মদিনা মুনাওয়ারার সমস্ত অধিবাসী মসজিদে নববীতে রওজায়ে রাসুলের কাছে একত্রিত হলো এবং তারা পুরো দিন ও রাত তওবা ও ইস্তিগফারে কাটাল। পরের দিন পাহাড়গুলো লাভা উদগিরণ করতে শুরু করল। এই লাল লাভা ঢেউয়ের মতো প্রবাহিত হচ্ছিল এবং পাথর ও শিলা পর্যন্ত গলিয়ে দিচ্ছিল। জমাট বাঁধার পর এর রঙ কালো হয়ে যেত। লাভা বারো মাইল দৈর্ঘ্য এবং চার মাইল প্রস্থে ছড়িয়ে পড়ল এবং আশেপাশের উপত্যকাগুলো পূর্ণ করে দিল। কয়েকদিন পর পাহাড়গুলো লাভা উদগিরণ বন্ধ করে দিল তবে বায়ুমণ্ডলে এর ঘনত্ব বজায় ছিল। দামেস্ক পর্যন্ত অবস্থা এমন ছিল যে, সূর্য ও চাঁদ উদয় এবং অস্ত যাওয়ার সময় এমন দেখাত যেন সেগুলোতে গ্রহণ লেগেছে। [১]

একই বছর বাগদাদে ভয়াবহ বন্যা দেখা দেয়, বন্যার ঢেউ শহরের কেন্দ্র পর্যন্ত পৌঁছে যায়, খিলাফত প্রাসাদও এর কবলে পড়ে। বন্যার স্রোত বাগদাদের অস্ত্রাগারে এমনভাবে প্রবেশ করে যে অধিকাংশ অস্ত্র নষ্ট হয়ে যায়। উজিরের প্রাসাদসহ তিনশ’র বেশি ঘরবাড়ি ধসে পড়ে। এদিকে ১লা রমজান ৬৫৪ হিজরিতে মসজিদে নববী অগ্নিকাণ্ডের শিকার হয়। পুরো ছাদ এবং অনেকগুলো স্তম্ভ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। রওজায়ে আকদাসের ছাদও ভস্মীভূত হয়। [২]

ইবনে আলকামির উজিরত্ব:

মুস্তাসিম রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীর ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন। তিনি সমস্ত ক্ষমতা আমির মুজাহিদ উদ্দিন দুয়াইদার এবং আমির ইকবাল শারাবিকে দিয়ে রেখেছিলেন। অধিকন্তু ৬৪২ হিজরিতে তিনি উজিরের পদ ইবনে আলকামি-কে দান করেন, যিনি বাগদাদের শিয়া সাহিত্যিক ও পণ্ডিতদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। মুস্তাসিমের তার ওপর এত অগাধ বিশ্বাস ছিল যে, ধীরে ধীরে তিনি সমস্ত রাষ্ট্রীয় কাজ তার হাতে সঁপে দেন। ইবনে আলকামির পুরো নাম ছিল মুয়াইদ উদ্দিন আবু তালিব মুহাম্মদ বিন আলকামি। তিনি ৫৯৩ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। মুস্তানসির বিপ্লবের আমলে তিনি উজিরের দপ্তরের নায়েব এবং জামিয়া মুস্তানসিরিয়ার নির্মাণ কাজের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। তিনি বাহ্যিকভাবে মধ্যপন্থী মেজাজের হলেও প্রকৃতপক্ষে চরমপন্থী রাফেজি ছিলেন। তার চরিত্রে মুনাফিকি কানায় কানায় পূর্ণ ছিল। বাহ্যিকভাবে তিনি খলিফা এবং সুন্নি আমিরদের চাটুকারিতা করতেন কিন্তু অভ্যন্তরীণভাবে তাদের শিকড় কাটতে চাইতেন। তিনি সুন্নাহকে মিটিয়ে দিতে এবং শিয়া মতবাদকে বিকশিত করতে বন্ধপরিকর ছিলেন। এজন্য তিনি তার আমলে রাফেজিদের ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং তাদের আলেমদের পদোন্নতি দেন। তিনি বিখ্যাত শিয়া আলেম ইবনে আবিল হাদিদকে দিয়ে ‘নাহজুল বালাগা’-র ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখিয়েছিলেন। [৩]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৬৫৪ হিজরি; সিমতুন নুজুমিল আওয়ালি লিল ইসামি: ৩/৫১৭; তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ আল-কুবরা লিস সুবকি: ৮/২৬৭

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ২৩/৩৬২; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৬৫৪ হিজরি, ইবনে আলকামির জীবনী; আল-আলাম লিয যিরিকলি: ৫/৩২১, দারুল ইলম লিল মালায়িন; ফাওয়াতুল ওয়াফায়াত লি ইবনে শাকির সালাহ উদ্দিন: ৩/২৫২, সাদির প্রকাশনী

উজির এবং আমির দুইদারের মধ্যে দ্বন্দ্ব:

ইবনে আলকামির সবচেয়ে বেশি বিরোধ ছিল বাগদাদ সেনাবাহিনীর প্রধান কর্মকর্তা মুজাহিদ উদ্দিন দুইদারের সাথে, যাকে সাধারণত দুইদারে সগির বলা হতো। তারা একে অপরকে এক মুহূর্তের জন্যও সহ্য করতে পারতেন না। ইবনে আলকামি উজিরের পদের কারণে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিলেন, অন্যদিকে আমির দুইদার খলিফার পুত্র আবু বকরের ঘনিষ্ঠ হওয়ার কারণে তার ওপর প্রভাবশালী ছিলেন। [১] ৬৫৩ হিজরিতে আমির ইকবাল শারাবীর মৃত্যুর পর মুজাহিদ উদ্দিন দুইদারের মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পায়। [২]

কারাকোরাম দরবারের নতুন সিদ্ধান্তসমূহ:

সেই সময়ে চেঙ্গিস খানের নাতি মঙ্গু খান কারাকোরামের (মঙ্গোলিয়া) সিংহাসনে আসীন ছিলেন। উত্তর ইরানের কাজভিন জেলার একজন আলেম শামস উদ্দিন কাজভিনি [৩] মঙ্গোলিয়া গিয়ে তার সাথে দেখা করেন এবং জানান যে, বাতিনি রাষ্ট্র—যাকে তাতারীরা উপেক্ষা করে আসছে—তা ফিতনা ও ফাসাদের কেন্দ্র। শামস উদ্দিন কাজভিনি এই প্রেক্ষাপটে মোগল সরকারকে অক্ষম ও দুর্বল বলে অভিহিত করেন।

মঙ্গু খান রাগান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন: “আমাদের সরকারে আপনি কী দুর্বলতা দেখতে পেয়েছেন?”

শামস উদ্দিন কাজভিনি বললেন: “একটি গোষ্ঠী যারা খ্রিস্টান, মুসলিম এবং মোগল সবার থেকে আলাদা ধর্ম তৈরি করে রেখেছে, তারা কিছু দুর্গের ওপর দখলদারিত্ব কায়েম করেছে। তারা কিছু কর প্রদান করে আপনাকে ধোঁকা দিচ্ছে। তারা অপেক্ষায় আছে যে, যদি আপনার সরকার সামান্য দুর্বল হয়, তবে তারা সেই দুর্গগুলো থেকে বেরিয়ে অবশিষ্ট মুসলমানদেরও শেষ করে দেবে।”

শামস উদ্দিন কাজভিনি-র এই ফরিয়াদের পর মঙ্গু খান বাতিনিদের দুর্গগুলো ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নেন। [৪]

তাতারীদের কাছে বাতিনিদের দুর্গগুলো নির্মূল করা এজন্য জরুরি ছিল যে, এটি তাদের সম্মানের বিষয়ে পরিণত হয়েছিল, তবে তাদের কাছে এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল ইরাক ও সিরিয়া, যেগুলোতে হাত দিতে তারা দীর্ঘকাল ধরে ইতস্তত করছিল।

[১] ফাওয়াতুল ওয়াফায়াত: ৩/২৫২

[২] সিয়রু আলামিন নুবাল: ২৩/৭০, তাবা আর-রিসালাহ

[৩] সাধারণত মনে করা হয় যে, উত্তর ইরান দ্বিতীয়-তৃতীয় হিজরি শতাব্দী থেকে রাফেজিদের কেন্দ্র ছিল, এজন্য কাজভিনকেও রাফেজিদের আস্তানা মনে করা হয়। কিন্তু বাস্তবতা হলো, সপ্তম হিজরি শতাব্দীতেও উত্তর ইরানের শহরগুলোতে আহলে সুন্নাতের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। পথভ্রষ্ট দলগুলোর যেটুকু প্রভাব ছিল, তা ছিল গ্রামীণ এলাকায়। তাই কাজভিন সম্পর্কে কাজী মিনহাজুস সিরাজ বলেন: “কাজভিন শহরের বাসিন্দারা সবাই সুন্নাত ও জামাতের অনুসারী, পবিত্র মাযহাব ও স্বচ্ছ আকিদার অধিকারী এবং বাতিনি ও মুলহিদদের (ধর্মত্যাগী) গোমরাহির কারণে তাদের মধ্যে সর্বদা যুদ্ধ ও সংঘাত লেগেই থাকত” (তাবাকাতে নাসিরি: ২/১৮১)।

[৪] কাজী মিনহাজুস সিরাজ জুযজানি রচিত তাবাকাতে নাসিরি: ২/১৮১, ১৮২, তাবা কাবুল।

নোট: ভারত ও মোগল সুলতানদের ইতিহাসের ক্ষেত্রে তাবাকাতে নাসিরি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এর লেখক কাজী মিনহাজুস সিরাজের পূর্বপুরুষরা সমরকন্দের ছিলেন। তার জন্ম ৫৮৯ হিজরির দিকে আফগানিস্তানে ঘুরি রাজবংশের কেন্দ্র ফিরোজ কোহ-তে হয়। সুলতান গিয়াসউদ্দিন ঘুরির রানীর স্নেহে তিনি লালিত-পালিত হন। সেখানেই সাত বছর বয়সে ইমাম আলী গজনভীর কাছে কুরআন মাজিদ হিফজ করা শুরু করেন। প্রচলিত ইসলামি জ্ঞান ও শিল্পকলা অর্জনের পর ৬১৩ হিজরিতে তিনি তার পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়ে সরকারি পদে অধিষ্ঠিত হন এবং শাসকদের জন্য কূটনৈতিক দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। ৬১৭ হিজরিতে আফগানিস্তানে তাতারীদের আক্রমণের সময় মাওলানা তুলক দুর্গে অবরুদ্ধ ছিলেন, যেখানে আট মাস অবরোধ চলে এবং অবশেষে তাতারীরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। আফগানিস্তান বিধ্বস্ত হয়ে গেলে ৬২৩ হিজরিতে কাজী সাহেব লাহোরে চলে আসেন। ইলতুতমিশ যখন পাঞ্জাব দখল করেন, তখন কাজী সাহেব দিল্লি দরবারের সাথে যুক্ত হন এবং ইলতুতমিশ তাকে ৬৩০ হিজরিতে গোয়ালিয়রের কাজী নিযুক্ত করেন। তিনি ছয় বছর এই পদে ছিলেন। ইলতুতমিশের পর রাজিয়া সুলতানা সিংহাসনে আরোহণ করলে কাজী সাহেবকে দিল্লিতে ডেকে এনে মাদ্রাসা-ই-নাসিরিয়ার প্রতিষ্ঠা, নির্মাণ... (বাকি অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠার পাদটীকায়)।

তারিখে উন্মত্তে মুসলিমা

চতুর্থ খণ্ড

খ্রিস্টানদের পক্ষ থেকে তাতারদেরকে পূর্বদিকের মুসলিম দেশগুলোতে আক্রমণের প্ররোচনা:

মঙ্গু খানকে প্রাচ্যের ইসলামি দেশগুলোতে আক্রমণের প্ররোচনা দেওয়ার ক্ষেত্রে খ্রিস্টানদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। যেহেতু মঙ্গু খানের সাথে খ্রিস্টানদের সুসম্পর্ক ছিল, এই প্রেক্ষাপটে আর্মেনিয়ার খ্রিস্টান শাসক হেইতুন হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে কারাকোরামে পৌঁছান এবং তার আনুগত্য স্বীকার করে তার কাছে এই আবেদন জানান যে, সে যেন সিরিয়া আক্রমণ করে এবং তাদেরকে বায়তুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধার করে দেয়। মঙ্গু খান এই আবেদনটি গুরুত্ব সহকারে শোনেন কারণ এর মাধ্যমে তিনি এমন কিছু মিত্র পাচ্ছিলেন যাদের সাহায্যে ইরাক ও সিরিয়া বিজয় সহজ হতে পারত। অবশেষে মঙ্গোল খাকান এবং আর্মেনিয়ার রাজার মধ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যাতে আন্তাকিয়া ও ত্রিপোলির শাসক বোহেমন্ডও অন্তর্ভুক্ত হন। [১]

কিন্তু মঙ্গু খান ভালোভাবেই জানতেন যে, খ্রিস্টানদের বায়তুল মুকাদ্দাস ফিরিয়ে দেওয়ার আগে সিরিয়া জয় করা জরুরি এবং এটি ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয় যতক্ষণ না ইরাকে প্রতিষ্ঠিত বাগদাদ খিলাফতকে পদানত করা যায়, যা তাতার সাম্রাজ্যের বিশ্বব্যাপী বিস্তারের পথে একটি বড় বাধা ছিল। ফলে তিনি সমস্ত অমীমাংসিত বিষয়গুলো একসাথে নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত নেন এবং মধ্য এশিয়া ও খোরাসানের শাসনভার তার ভাই হালাকু খানের হাতে অর্পণ করে তাকে এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্যসহ কারাকোরাম থেকে মধ্য এশিয়ায় পাঠিয়ে দেন। মঙ্গু খান ঘোষণা করেন:

“আমরা সিরিয়া ও আর্মেনিয়ায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে খ্রিস্টানদের সাহায্য করব। আমরা আমাদের ভাই হালাকু খানকে খলিফাকে পরাজিত করতে এবং বায়তুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধারের জন্য পাঠাচ্ছি।” [১]

ফ্রান্সের রাজার নামে হালাকু খানের পত্র:

এদিকে হালাকু খান খ্রিস্টান বিশ্বকে তার সামরিক অভিযানের সুসংবাদ দেওয়ার জন্য ফ্রান্সের রাজা সেন্ট লুইসের কাছে একটি প্রতিনিধি দল পাঠান যারা ফ্রান্সের রাজার কাছে হালাকু খানের নিম্নোক্ত পত্রটি পেশ করে:

“আমাদের প্রজাদের মধ্যে প্রচুর সংখ্যক খ্রিস্টান রয়েছে। আমরা আমাদের শক্তি ও কর্তৃত্বের সাথে এই ঘোষণা করছি যে, আমরা মুসলিম দেশগুলোর সমস্ত খ্রিস্টানকে দাসত্ব ও কর প্রদান থেকে মুক্ত করব এবং তাদের সাথে সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে আচরণ করা হবে। তাদের ধন-সম্পদ ও আসবাবপত্রের কোনো ক্ষতি করা হবে না। যে গির্জাগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে, সেগুলো নতুন করে নির্মাণ...”

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার অবশিষ্ট টীকা:

এবং পাঠদান ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার দায়িত্ব তাকে দেওয়া হয়। রাজিয়ার পর বাহরাম শাহ ১২৩৯ খ্রিস্টাব্দে তাকে পুরো হিন্দুস্তানের কাজিউল কুজাত নিযুক্ত করেন কিন্তু কাজি সাহেব এই পদে স্বস্তি পাননি, বিরোধী ও হিংসুকদের কারণে বিরক্ত হয়ে তিনি পদত্যাগ করেন এবং ১২৪৩ খ্রিস্টাব্দে লখনউতে চলে যান, কয়েক বছর পর ফিরে আসেন এবং মাদ্রাসা-ই-নাসিরিয়ার ব্যবস্থাপনা তার ওপর অর্পণ করা হয়। ১২৫৯ খ্রিস্টাব্দে ইলতুতমিশের পুত্র নাসিরুদ্দিন মাহমুদের সাথে যখন সাক্ষাৎ হলো তখন কাজি সাহেবের বড় কদরদানি করা হলো, তাকে পুনরায় কাজিউল কুজাত বানানো হলো এবং সদর-ই-জাহান উপাধি দেওয়া হলো। শেষ বয়সে তিনি এই বাদশাহর নামে ‘তাবাকাত-ই-নাসিরি’ রচনা শুরু করেন এবং ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে তা সম্পন্ন করেন। তার মৃত্যুর তারিখ উল্লেখ নেই তবে ধারণা করা হয় যে ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দের পর তিনি বেশিদিন জীবিত ছিলেন না, এভাবে তার বয়স প্রায় ৭০ বছর হয়েছিল।

বর্তমান পৃষ্ঠার টীকা:

[১] The Crusades by Harold Lamb: p: 338; The Preaching of Islam: 170.

করানো হবে। নাসরানিদের ঘণ্টা বাজানোর স্বাধীনতা থাকবে। [১]

সারকথা, ইসলামি বিশ্বের ওপর এই হামলায় তাতারীদের প্রতি নাসরানিদের আন্তরিক সহানুভূতি ও দোয়া ছিল।

হালাকু খানের সমরকন্দ আগমন:

মঙ্গোলিয়া থেকে হালাকু খানের যাত্রা ২ রবিউল আউয়াল ৬৫১ হিজরিতে হয়েছিল। [২]

শাবান ৬৫৩ হিজরিতে হালাকু খান সমরকন্দে পৌঁছান যেখানে খোরাসানের প্রায় সকল আমির আনুগত্য প্রকাশের জন্য তার কাছে উপস্থিত হন। [৩] জিলহজ ৬৫৩ হিজরিতে হালাকু খানের বাহিনী ইরান ও ইরাক বিজয়ের সংকল্প নিয়ে আমু নদী পার হয়েছিল। [৪]

বাগদাদে হালাকু খানের গোয়েন্দাদের আগমন:

এত বড় বাহিনী থাকা সত্ত্বেও হালাকু খান বাগদাদে হঠাৎ আক্রমণ করতে ইতস্তত করছিলেন, এর আগে তিনি খেলাফতে আব্বাসিয়ার ব্যবস্থাকে গাদ্দারদের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণভাবে দুর্বল করতে চেয়েছিলেন এবং এই সেবা রাফেজিরা আরও ভালোভাবে সম্পন্ন করতে পারত। ফলে হালাকু খান বাগদাদে তার গোয়েন্দাদের প্রেরণ করেন যারা ৬৫৪ হিজরির শুরুর দিকে ইবনে আলকামির সাথে সাক্ষাৎ করে এবং শহরের পরিস্থিতিও পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। [৫] তারা ইবনে আলকামি এবং তার কেনা গোলাম আমিরদের অনেক প্রলোভন দেখায়।

বাগদাদে রাজনৈতিক ও সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে উত্তেজনা:

এখন বাগদাদে হঠাৎ কিছু অদ্ভুত ঘটনা জন্ম নিল। ইবনে আলকামি তার প্রতিদ্বন্দ্বী আমির মুজাহিদ উদ্দিন দাওয়াইদারের বিরুদ্ধে খলিফার কান ভারী করেন এবং এমনকি এই অভিযোগও করেন যে, সে আমাকে এবং আপনাকে হত্যা করার প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে এবং আপনার স্থলে শাহজাদা আবু বকরকে খলিফা বানাতে বদ্ধপরিকর। খলিফা এই অভিযোগে বিশ্বাস করে দাওয়াইদারের প্রতি আস্থাহীন হয়ে পড়েন। [৬]

এই সময়ে হালাকুর নামে পাঠানো ইবনে আলকামির কিছু চিঠি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের হাতে পড়ে যায়। তারা খলিফাকে এই...

[১] The Crusades by Harold Lamb: p: 338, 339

[২] তারিখ হাবিবুস সিয়্যার, গিয়াস উদ্দিন মীর খোয়ান্দ শিরাজি (মৃত্যু ৯৩৩ হি.): ২/ ৩৩৮, ত. ইনতিশারাত খিয়াম

[৩] জামিউত তাওয়ারিখ (আরবি), রশিদ উদ্দিন ফজলুল্লাহ: ২, প্রথম অংশ ২৩৮ থেকে ২৪০

[৪] তারিখ হাবিবুস সিয়্যার: ২/ ৭৭৭

[৫] আস-সুলুক লি-মা'রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ১/ ৩৯০, ৩৯১

নোট: আস-সুলুকের ইবারতে এই ঘটনা ৬৫২ হিজরির অধীনে নকল করা হয়েছে এবং মাসের উল্লেখ করা হয়নি, তবে ঘটনার গতিপ্রকৃতি থেকে স্পষ্ট যে এই সাক্ষাৎ ৬৫৪ হিজরির শুরুর দিকে হয়েছিল।

[৬] তাবাকাতে নাসিরি: ২/ ১৯৩

আরব ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন যে, দাওয়াইদারের ওপর কেবল অভিযোগ আনা হয়েছিল: انه قد نسب اليه العزم على الفتك بالوزير ثم بالخليفه المستعصم بالله (আল-মাসজাদুল মাসবুক, পৃ. ২১৬)

কিন্তু কিছু ইরানি ঐতিহাসিক যেমন রশিদ উদ্দিন ঘটনাটিকে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, এটি অভিযোগ ছিল না বরং প্রমাণিত অপরাধ ছিল এবং দাওয়াইদার অত্যন্ত দুশ্চরিত্র ব্যক্তি ছিলেন যিনি বদমাশদের নিজের চারপাশে জড়ো করেছিলেন এবং তিনি নিশ্চিতভাবেই খলিফাকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। (জামিউত তাওয়ারিখ (আরবি): দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম অংশ, পৃ. ২৬২, ২৬৩)

এই বর্ণনাটি পক্ষপাতদুষ্ট। হালাকুর নামে ইবনে আলকামির চিঠিগুলো আমিরদের হাতে আসার মাধ্যমে এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে দাওয়াইদারও ইবনে আলকামি এবং তাতারীদের যোগাযোগের খবর রাখতেন, কারণ দাওয়াইদার সেই আমিরদের প্রধান ছিলেন, তিনি এই ধরনের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবশ্যই আগে থেকেই অবগত হয়ে থাকবেন। সম্ভবত এই কারণেই তিনি আর সুযোগ না দিয়ে ইবনে আলকামির ওপর চড়াও হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ইবনে আলকামি নিজেকে বাঁচাতে এবং তাকে ফাঁসাতে উল্টো চাল চালেন যে দাওয়াইদার খলিফাকে খতম করতে চান, অথচ পরিকল্পনাটি ছিল স্বয়ং ইবনে আলকামির।

অত্যন্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল কিন্তু খলিফার ওপর ইবনে আলকামির জাদু এমনভাবে কাজ করেছিল যে তিনি বললেন: “এটি দুয়াইদার করেছে হবে, ইবনে আলকামি এমনটি করতে পারে না।” [১]

আমির দুয়াইদারের গ্রেপ্তারের আশঙ্কা:

এখন খলিফার দুয়াইদারের প্রতি কঠোর সন্দেহ স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল যে অবিলম্বে দুয়াইদারের বিরুদ্ধে কোনো আদেশ জারি করা হবে। গ্রেপ্তারের আশঙ্কার পরিপ্রেক্ষিতে দুয়াইদার তার বাহিনীকে সতর্ক করে দিলেন। এদিকে ইবনে আলকামির মনেও এই আশঙ্কা দেখা দিল যে দুয়াইদার তাকে আক্রমণ করতে দ্বিধা করবে না, তাই সেও নিজের চারপাশে অনুগতদের পাহারা বসিয়ে দিল।

রবিউস সানির শেষ রাত থেকে ২০ জমাদিউল আখিরা পর্যন্ত দিনগুলো অত্যন্ত উত্তেজনাকর অবস্থায় অতিবাহিত হলো। এই সময়ে ইবনে আলকামি খলিফাকে দুয়াইদার এবং তার সমর্থক আমিরদের গ্রেপ্তারের আদেশ দেওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকল। এই কানভারী করার জন্য ইবনে আলকামি অদ্ভুত সব যুক্তি দিত এবং মাঝে মাঝে কুরআন মাজিদের কিছু আয়াতও পড়ে শোনাত, যেমন:

“যদি মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে এবং যারা মদিনায় গুজব ছড়িয়ে বেড়ায় তারা বিরত না হয়, তবে আমি অবশ্যই আপনাকে তাদের ওপর প্রবল করে দেব। তারপর তারা আপনার প্রতিবেশী হিসেবে সেখানে অল্প সময়ই থাকতে পারবে।” [২]

অবশেষে কিছু বুদ্ধিমান আমির মধ্যস্থতা করে খলিফাকে দুয়াইদারের ব্যাপারে নরম করলেন। খলিফা ইবনে আলকামিকেও ক্ষমা ও সহনশীলতার উপদেশ দিলেন এবং দুয়াইদারকে নিজের কাছে তলব করলেন। দুয়াইদার প্রাণের লিখিত নিরাপত্তা (আমান) চাইলেন। ২০ জমাদিউল আখিরা খলিফা আমাননামা লিখে দিলেন। এর ওপর দুয়াইদার দরবারে উপস্থিত হলেন এবং ক্ষমা ও মিটমাট হয়ে গেল। [৩]

হালাকু খান উত্তর ইরানে:

এদিকে এই টানাপোড়েন চলছিল আর ওদিকে হালাকু খানের বাহিনী দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছিল। শাবান ৬৫৪ হিজরিতে হালাকু আক্রমণ চালিয়ে উত্তর ইরানের বাতিনি দুর্গগুলো ঘেরাও করে ফেলেছিলেন। [৪]

১লা জিলকদ ৬৫৪ হিজরিতে তিনি শেষ বাতিনি নেতা রুকনউদ্দিন খুরশাহর প্রাণভিক্ষার বিনিময়ে তার কাছ থেকে আলমুতসহ সমস্ত দুর্গের চাবিকাঠি গ্রহণ করেন। এই সমস্ত দুর্গ ধ্বংস করে দেওয়া হলো। বিখ্যাত রাফেজি পণ্ডিত নাসিরুদ্দিন তুসি বাতিনি দলের সাথে কাজ করতেন। হালাকু খান গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যায় তার দক্ষতা দেখে তাকে নিজের সহচর বানিয়ে নিলেন। [৫]

[১] তাবাকাতে নাসিরি, কাজি মিনহাজুস সিরাজ জুজজানি: ২/১৯৩, ত. কাবুল।

[২] সূরা আল-আহজাব, আয়াত নম্বর ৬০... এটি ছিল মুনাফেকির চরম সীমা যে, একজন মুনাফিক নিজের মুনাফেকি আড়াল করার জন্য সেই আয়াত পড়ছিল যা তার মতো লোকদের বিরুদ্ধেই নাজিল হয়েছিল।

[৩] আল-আসজাদুল মাসবুক ওয়াল জাওহারুল মাহকুক লিল আশরাফ আল-গাসানি, পৃ. ৬১২ থেকে ৬১৯।

[৪] জামিউত তাওয়ারিখ (আরবি), রশিদউদ্দিন ফজলুল্লাহ: খণ্ড ২, প্রথম অংশ, পৃ. ২৩৮ থেকে ২৪০, ত. দারু ইহয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ, মিসর।

[৫] জামিউত তাওয়ারিখ (আরবি): খণ্ড ২, প্রথম অংশ, পৃ. ২৫০ থেকে ২৫৫; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৬৫৭ হিজরি; তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ আল-কুবরা: ৮/২৬৮।

বাগদাদে শিয়া-সুন্নি দাঙ্গা:

বাগদাদবাসীরা হালাকু খানের আক্রমণের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি ও বিবাদে লিপ্ত ছিল। [১] ৬৫৪ হিজরির জিলহজ মাসে সেখানে এক ভয়াবহ দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। এর সূত্রপাত এভাবে হয় যে, কারখের কোনো এক শিয়া এক সুন্নি যুবককে হত্যা করে। এর প্রেক্ষিতে খিলাফত দরবারের কিছু কর্মচারী খলিফাকে বিশ্বাস করান যে, শিয়াদের ফিতনা সীমা ছাড়িয়ে গেছে, তাদের কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত। খলিফা এর অনুমতি প্রদান করেন। ফলে সরকারি কর্মকর্তারা কারখের ওপর চড়াও হয়, আর বখাতে লোকেরাও একে লুটতরাজের এক সুবর্ণ সুযোগ মনে করে তাদের সাথে যোগ দেয়। এর ফলে এক হাঙ্গামা সৃষ্টি হয় যাতে উভয় পক্ষের মানুষ নিহত হয়। তবে কারখবাসীদের ক্ষতিই বেশি হয়েছিল, তাদের কিছু নারীকেও অপহরণ করা হয়। [২] ইবনে আলকামীর কিছু আত্মীয়-স্বজনও এই ধরপাকড়ের কবলে পড়ে। [৩] এই অভিযান খলিফার পুত্র আবু বকর এবং আমির দুওয়াইদারের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল। [৪] এই সময়ে যা ঘটেছিল তা ছিল অত্যন্ত দুঃখজনক, যার কোনো যৌক্তিক কারণ পেশ করা সম্ভব নয়। খোদ আহলে সুন্নাতও এই অভিযানে অসন্তুষ্ট হয়েছিল। [৫] খলিফা মুস্তাসিমও বিষয়টিকে এই পর্যায় পর্যন্ত নিয়ে যেতে চাননি। যখন তাকে পরিস্থিতির কথা জানানো হলো, তখন তিনি অভিযান বন্ধ করিয়ে লুট করা মালামাল ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করেন এবং অপহৃত নারীদের উদ্ধার করে ফেরত পাঠান। [৬]

ধ্বংসের পরিকল্পনা:

এই নিন্দনীয় ঘটনার কারণে শিয়াদের সরকারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক ছিল। তবে এই অজুহাতে পুরো বাগদাদ ধ্বংস করার কোনো যৌক্তিকতা ছিল না। কিন্তু যেহেতু ইবনে আলকামী আগে থেকেই সালতানাতের শিকড় কাটার জন্য প্রস্তুত ছিল এবং তাতারী গোয়েন্দাদের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়ে গিয়েছিল, তাই নিজের ধর্মাবলম্বীদের এই দুর্দশার পর সে সিদ্ধান্ত নিল যে, সে যত দ্রুত সম্ভব বনু আব্বাসকে নির্মূল করে খিলাফত আলভী শিয়াদের কাছে হস্তান্তরের চেষ্টা করবে। সে পরিকল্পনা করল যে, সে হালাকু খানকে বলে বাগদাদে আক্রমণ করাবে এবং আব্বাসীয় খিলাফত ধ্বংসের পর নিজে বাগদাদের শাসক হয়ে এখানে শিয়া খিলাফত কায়েম করবে এবং যারা বায়আত গ্রহণ করবে না সেই সুন্নিদের গণহারে হত্যা করাবে। [৭]

তাতারীদের সাথে উজিরের আঁতাত:

সেই দিনগুলোতে হালাকু খান বাতেনীদের দমন করে অবসর হয়েছিল, কিন্তু নিজের রাজধানী সমরকন্দে ফিরে যাওয়ার পরিবর্তে তার...

[১] বাগদাদে শিয়া-সুন্নি উত্তেজনা আগে থেকেই ছিল। মহরমের মাতম মিছিল ফিতনার কারণ হয়ে দাঁড়াত। ৬৪০ হিজরির শুরুতে বাগদাদের মুহতাসিব নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন যে, আশুরার মজলিসগুলো শুধুমাত্র কারখ মহল্লায় অনুষ্ঠিত হবে। (আল-হাওয়াদিসুল জামিয়া: পৃষ্ঠা ১৩৩), ৬৫০ হিজরিতে এই নিষেধাজ্ঞা পুনরায় জারি করা হয়। (আল-মাসজিদুল মাসবুক, পৃষ্ঠা ৫৮৫) এসব কারণে শিয়ারা বেশ বীতশ্রদ্ধ ছিল।

[২] আল-হাওয়াদিসুল জামিয়া ওয়াত তাজারিবুন নাফিয়া লি ইবনিল ফুওয়াতি, পৃষ্ঠা ২২৫, ২২৬, তবা আল-ইলমিয়া।

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: সন ৬৫৬ হিজরি।

[৪] তারিখ ইবনে খালদুন: ৩ / ২২২।

[৫] তাবাকাতে নাসিরি আজ মিনহাজুস সিরাজ জুজজানি: ২ / ১৯২ সাথে টীকা।

[৬] আল-হাওয়াদিসুল জামিয়া, পৃষ্ঠা ২২৫, ২২৬।

[৭] মাওয়ারিদুত লাতাফাহ ফি মান ওয়ালি আস-সালতানাহ ওয়াল খিলাফাহ আজ ইবনে তাগরি বারদি: ১ / ২৩২।

অভিযুক্ত ছিল হামাদানের দিকে। রবিউল আউয়াল ৬৫৫ হিজরিতে তিনি হামাদানে অবস্থান করছিলেন। [১] ইবনে আলকামি মনে করলেন যে, বাগদাদ জয় করে লশকর ফিরে আসা জরুরি। তিনি হালাকু খানকে বাগদাদ আক্রমণের আমন্ত্রণ জানিয়ে লিখলেন:

“এখন আপনি বাগদাদ আক্রমণ করুন, আমি শহরটি আপনার হাতে তুলে দেওয়ার দায়িত্ব নিচ্ছি।” [২]

ইবনে আলকামি এই গোপন বার্তাটি ঠিক সেভাবেই পাঠিয়েছিলেন যেভাবে খলিফা নাসির চেস্টিস খানের কাছে পাঠিয়েছিলেন। অর্থাৎ, দূতের মাথা ন্যাড়া করে তার ওপর আগুনের সুঁই দিয়ে বার্তা খোদাই করে দেওয়া হয়েছিল এবং দূতের চুল বড় হওয়ার পর তাকে পাঠানো হয়েছিল। সাথে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, হালাকু খানের কাছে গিয়ে বলবে: “আমার মাথা ন্যাড়া করে তার ওপর লেখা বার্তাটি পড়ে নিন।” [৩]

দূত হালাকু খানের কাছে পৌঁছাল এবং তাকে জানাল যে, ইবনে আলকামির বার্তা তার মাথায় খোদাই করা আছে। হালাকু খান তার মাথা ন্যাড়া করিয়ে লেখাটি পড়লেন, যাতে বাগদাদ আক্রমণের আমন্ত্রণের পর শেষে লেখা ছিল:

“পড়ার পর পত্রটি ছিঁড়ে ফেলবেন।”

হালাকু খান এই রহস্য বুঝতে পারলেন এবং তৎক্ষণাৎ দূতের শিরশ্ছেদ করালেন। [৪]

বাগদাদের সেনাবাহিনী হ্রাসের ভয়াবহ ষড়যন্ত্র:

ইবনে আলকামির বার্তা হালাকু খানের জন্য অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক ছিল। তিনি নিজেও এটাই স্থির করেছিলেন, কিন্তু যেহেতু মুসতাসিমের পিতা মুসতানসির বাগদাদের জন্য এক লক্ষ অশ্বারোহীর যে বাহিনী তৈরি করে গিয়েছিলেন তা তখনও বিদ্যমান ছিল, তাছাড়া খলিফার আন্তর্জাতিক মর্যাদাও একটি বাধা ছিল, তাই হালাকু খান সতর্কতার সাথে কাজ করে উত্তর পাঠালেন:

“বাগদাদের সেনাবাহিনী সংখ্যায় অনেক। যদি তুমি মনেপ্রাণে আমাদের অনুগত হও, তবে প্রথমে বাগদাদের সেনাবাহিনী কমিয়ে দেখাও। এরপর আমরা আক্রমণ করব।”

ইবনে আলকামি তার চতুরতা ও ধূর্ততার মাধ্যমে তা করে দেখালেন। তিনি খলিফাকে বিশ্বাস করালেন যে, তাতারীদের পক্ষ থেকে বাগদাদের কোনো বিপদ নেই, তাই একটি বিশাল বাহিনী রাজকোষের ওপর অহেতুক বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। [৫] তিনি নির্জনে খলিফার সাথে সাক্ষাৎ করে বলতে লাগলেন:

“আল্লাহর অনুগ্রহে সারা বিশ্বের রাজন্যবর্গ আপনার চৌকাঠে মাথা নত করে এবং নিজেদের খেলাফত দরবারের খাদেম মনে করে। এমতাবস্থায় দূরদর্শিতার দাবি হলো, প্রতি বছর এত বিপুল পরিমাণ অর্থ সেনা কর্মকর্তা ও সৈন্যদের পেছনে ব্যয় না করা। যদি আমরা মুমিনীন অনুমতি প্রদান করেন, তবে এই বান্দা এই খেদমত আঞ্জাম দিতে পারে যে, এই সৈন্যদের কর্মসংস্থানে নিয়োজিত করবে। তাদের উপার্জনে আব্বাসীয় রাষ্ট্রের কোষাগার কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যাবে।”

[১] জামেউত তাওয়ারিখ (আরবি), রশীদ উদ্দিন ফজলুল্লাহ: খণ্ড ২, প্রথম অংশ: পৃষ্ঠা ২৬০, ত. দারু ইহয়াইল কুতুবিল আরাবিয়াহ, মিশর। হামাদান ইরানের একটি প্রদেশ। এটি বাগদাদ থেকে ৬৮৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এটি মধ্য এশিয়া থেকে বাগদাদগামী কাফেলাগুলোর একটি গুরুত্বপূর্ণ যাত্রাবিরতি ছিল।

[২] মাওয়ারিদুত লাতাফাহ ফি মান ওয়ালিয়াস সুলতানাতা ওয়াল খিলাফাহ, ইবনে তাগরি বারদি: ১/২৩২, ত. দারুল কুতুবিল মাসরিয়াহ।

[৩] তাবাকাতুশ শাফিইয়াহ আল-কুবরা, সুবকি: ৮/২৬৩, ত. হাজার; ফাওয়াতুল ওয়াফায়াত, ইবনে শাকির সালাহউদ্দিন: ৩/২৫৩, ২৫৫, ত. সাদির।

[৪] ফাওয়াতুল ওয়াফায়াত: ৩/২৫৩, ২৫৫, ত. সাদির।

[৫] আল-মানহালুস সাফি ওয়াল মুস্তাওফি বাদাল ওয়াফি, ইবনে তাগরি বারদি: ৭/১২৮, ত. আল-হায়আতুল মাসরিয়াহ।

মুস্তাসিম স্বভাবগতভাবে কৃপণ ছিলেন, তাই এই ধ্বংসাত্মক পরামর্শটি তার পছন্দ হলো। তিনি ইবনে আলকামীকে সেনাবাহিনী কমানোর ক্ষমতা দিয়ে দিলেন। [১] তিনি প্রাথমিক পর্যায়ে ১৫ হাজার সৈন্যকে বরখাস্ত করে দিলেন। [২]

মসুলের শাসক বদরউদ্দিন লুলুর রাজনীতি:

মসুলের শাসক বদরউদ্দিন লুলু তার জীবনের সূর্য অস্তমিত হতে দেখছিলেন। তিনি ছিলেন আমেনিয়ার এক গোলামের সন্তান, যিনি ৮০ বছর আগে মসুলের জঙ্গি (Zangi) পরিবারের সেবার মাধ্যমে তার কর্মজীবন শুরু করেছিলেন এবং উন্নতি করতে করতে শেষ পর্যন্ত মসুলের জঙ্গি রাষ্ট্রের সবচেয়ে শক্তিশালী স্তম্ভে পরিণত হয়েছিলেন। সপ্তম হিজরি শতাব্দীর শুরুতে যখন জঙ্গি রাষ্ট্র চরম পতনের শিকার হয়েছিল, তখন বদরউদ্দিন মসুল রাষ্ট্রের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করেন। জঙ্গি পরিবারের অল্পবয়সী ও অনভিজ্ঞ রাজপুত্রদের পুতুল শাসক বানানো এবং নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী গোপন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তাদের পদচ্যুত বা হত্যা করা তার জন্য বাঁ হাতের খেল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই বিচারে ঐতিহাসিকরা তাকে জালেম শাসকদের মধ্যে গণ্য করেন। তা সত্ত্বেও মসুলের জনগণ তাকে পছন্দ করত।

৬৩০ হিজরিতে তিনি জঙ্গিদের নামমাত্র শাসন বজায় রাখার আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে দেন এবং নিজেই শাসক হয়ে বসেন। অধিকাংশ ঐতিহাসিক তার প্রজ্ঞা, ন্যায়বিচার, বিচক্ষণতা ও বদান্যতার প্রশংসা করেন। তিনি মাদ্রাসা ও ওলামাদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। আল্লামা ইবনুল আসির আল-জাযারি তার শাসনামলেই “আল-কামিল ফিত তারিখ”-এর মতো মহান শাহকার (মহাগ্রন্থ) সম্পন্ন করেন এবং বদরউদ্দিন তাকে পুরস্কৃত ও সম্মানিত করেন। বদরউদ্দিন তাতারীদের প্রতিটি আক্রমণ থেকে নিজের শহরকে রক্ষা করেছিলেন। এখন হালাকু খানের আক্রমণের সময় তার বয়স ৯০ বছর ছাড়িয়ে গিয়েছিল এবং তার শাসনের প্রায় অর্ধশতাব্দী পার হয়ে গিয়েছিল। [৩]

খলিফার প্রতি মসুলের শাসকের সতর্কবার্তা সম্বলিত পত্র:

তিনি সর্বদা তার প্রতিবেশীদের সাথে রাজনৈতিক চাল খেলে আসছিলেন। তিনি তাতারীদের সহযোগী ছিলেন, কিন্তু এই সম্ভাবনার ভিত্তিতে যে হয়তো তাতারীরা বাগদাদ জয় না করেই ফিরে যাবে, তিনি খলিফাকেও কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন। ফলে তিনি একদিকে হালাকু খানের তলবে তাকে ইরাক অভিযানের জন্য অস্ত্র সরবরাহ করছিলেন এবং অন্যদিকে খলিফাকে চিঠি পাঠিয়ে তাতারীদের সংকল্প সম্পর্কে অবহিত করছিলেন। [৪] কিন্তু এ ধরনের পত্রগুলো সাধারণত প্রথমে ইবনে আলকামীর কাছে পৌঁছাত এবং তিনি খলিফাকে এগুলোর ঘুণাঙ্করও জানতে দিতেন না। যদি কোনো চিঠি বা বার্তা খলিফার কাছে পৌঁছেও যেত, তবে তিনি ইবনে আলকামীর সাথেই এ বিষয়ে পরামর্শ করতেন। এমন পরিস্থিতিতে ইবনে আলকামী তাকে আশ্বস্ত করতেন যে, এসবই গুজব এবং কোনো ধরনের বিপদ নেই। ফলে বদরউদ্দিনের সতর্কবার্তা সম্বলিত পত্রগুলোও নিষ্ফল প্রমাণিত হলো। [৫]

হালাকু খানের অগ্রযাত্রা ও প্রত্যাবর্তন:

রবিউস সানি ৬৫৫ হিজরি (মে ১২৫৭ খ্রিস্টাব্দ) মাসে হালাকু খান বাগদাদ আক্রমণের জন্য হামাদান থেকে রওনা হলেন। কিন্তু তারপর তিনি হঠাৎ...

[১] তারিখ হাবিবুস সিয়্যার: ২/৩৩৮

[২] আল-মানহালুস সাফি ওয়াল মুস্তাওফি বাদাল ওয়াফি লি-ইবনে তাগরি বারদি: ৭/১২৮, ত. আল-হায়আতুল মিসরিয়্যাহ

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৩/২৫৭; সিয়্যারু আলামিন নুবালা: ২৩/৩৫৬, ৩৫৭

[৪] জাইলু মিরাতিয় যামান লি-কুতুবুদ্দিন আল-ইউনিনি: ১/৮৭, ত. দারুল কিতাবিল ইসলামি কায়রো

[৫] শাযারাতুয যাহাব ফি আখবারি মান যাহাব লি-ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলি (মৃ. ১০৮৯ হি.): ৭/পৃ. ৪৬৮, ত. দারুল ইবনে কাসির; তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ আল-কুবরা: ৮/২৬৯

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

...রাস্তা থেকে ফিরে গেল। [১]

সৈন্যবাহিনীতে হ্রাসের ধারা অব্যাহত:

এদিকে বাগদাদের সৈন্যবাহিনীতে হ্রাসের ধারা অব্যাহত ছিল। ইবনে আলকামি কিছুকাল পর আরও ২০ হাজার অশ্বারোহীকে বরখাস্ত করে দিল। [২] এই ধারা এতটাই এগিয়ে গেল যে, শেষ পর্যন্ত বাগদাদে অশ্বারোহী সৈন্য দশ হাজারের চেয়েও কম রয়ে গেল। বাকি সৈন্যদের কেবল বরখাস্তই করা হয়নি, বরং তাদের বাগদাদে অবস্থানের ওপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল যাতে যুদ্ধের সময় তাদের জরুরি ভিত্তিতে নিয়োগ করা না যায়। সৈন্যবাহিনীর বড় বড় কর্মকর্তাদের অবস্থা এমন হয়েছিল যে, তাদের বাজার ও মসজিদগুলোতে ভিক্ষা করতে দেখা যেত এবং তাদের জন্য কাসিদা (প্রশংসাগীতি) পাঠকারী কবিরা তাদের শোচনীয় অবস্থা দেখে তাদের ওপর মার্সিয়া (শোকগাথা) লিখেছিলেন। [৩] ৬৫৫ হিজরির মাঝামাঝি সময়ে বাগদাদের অধিকাংশ সৈন্য দূর-দূরান্তের এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিল এবং খলিফা নিশ্চিত্তে ভোগ-বিলাসে মগ্ন ছিলেন। [৪]

হালাকু কর্তৃক উজিরকে বাগদাদের শাসনভার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি:

এদিকে ইবনে আলকামির সাথে হালাকুর যোগাযোগ বজায় ছিল। ইবনে আলকামির দাবি ছিল যে, বাগদাদ দখলের পর তাকেই বাগদাদের শাসক বানানো হবে। তাতারীরা তার সাথে এই প্রতিশ্রুতি করেছিল। [৫] বাগদাদের সৈন্যবাহিনীকে ধ্বংস করার পর ইবনে আলকামি হালাকু খানকে পত্র পাঠিয়ে বাগদাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং সৈন্যবাহিনী হ্রাসের সমস্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করল। হালাকু খান শুরুতে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে, এমন পরিস্থিতিতে বাগদাদবাসী তাদের সৈন্যবাহিনীতে এত বেশি হ্রাস কীভাবে করতে পারে। কিন্তু ইবনে আলকামি পুনরায় পত্র পাঠিয়ে তাকে বিশ্বাস করাল যে, বনু আব্বাসের সরকারের সাথে আমার আনুগত্যের সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে গেছে এবং আমি বাগদাদের বাহিনীকে পুরোপুরি ছত্রভঙ্গ...

[১] জামিউত তাওয়ারিখ (আরবি), রশীদ উদ্দিন ফজলুল্লাহ: খণ্ড ২, অংশ ১: পৃষ্ঠা ২৬৭, ত. দার ইহয়াউল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ মিসর। রশীদ উদ্দিন হালাকুর ফিরে যাওয়ার তারিখ ১২ রজব উল্লেখ করেছেন। আলামত থেকে স্পষ্ট যে, এটি ফিরে যাওয়ার শুরু ছিল না, বরং হামাদানে পৌঁছানোর তারিখ ছিল। হালাকু খানের এই আকস্মিক প্রত্যাবর্তনের কারণ কোনো ঐতিহাসিক বর্ণনা করেননি, তবে কিছু বর্ণনায় এর একটি সম্ভাব্য কারণ সামনে আসে। আল্লামা ইবনে তাগরি বারদি লিখেছেন যে, ইবনে আলকামি খলিফাকে সৈন্য সংখ্যা কমানোর পরামর্শ দিয়ে বলেছিলেন: “শত্রু তো ফিরে গেছে।” “وَعُلِيَ إِنْ عَادَ هَلاَكَ الْقِيَامَ بِدَفْعِهِ” “যদি সে পুনরায় ফিরে আসে তবে তাকে প্রতিহত করার দায়িত্ব আমার।” (মাওয়ারিদুত লাতাফাহ ফি মান ওয়ালি আস-সালতানাহ ওয়াল খিলাফাহ, ইবনে তাগরি বারদি: ১/২৩২)। সম্ভবত এটি সেই সময়ের কথা যখন হালাকু খান বাগদাদের কাছাকাছি এসে ফিরে গিয়েছিলেন। সম্ভবত এই প্রত্যাবর্তনে ইবনে আলকামির কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ভূমিকা ছিল যাতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তার ওপর আস্থা তৈরি হয়। হালাকু খান ইবনে আলকামির কথায় ফিরে গিয়েছিলেন নাকি পুরনো কোনো কারণে ফিরে যেতে হয়েছিল, তবে খলিফাকে বিশ্বাস করানো হয়েছিল যে ইবনে আলকামি তার প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে হালাকু খানকে বাগদাদ থেকে ফিরিয়ে দিয়েছে। সাধারণ পরিবেশে ইবনে আলকামির এই দাবির কোনো গুরুত্ব ছিল না যে সে তাতারীদের ফিরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু যখন তার কূটনৈতিক প্রচেষ্টার কারণে হালাকু খানের প্রত্যাবর্তন ঘটল, তখন খলিফা বিশ্বাস করে নিলেন যে ইবনে আলকামি সবসময় বাগদাদকে রক্ষা করতে পারে। এখানে এটি মনে রাখা উচিত যে হালাকুর ফিরে যাওয়াকে ইবনে আলকামি এমনভাবে প্রকাশ করেছিল যেন সন্ধি হয়ে গেছে (যদিও বাস্তবে কোনো চুক্তি বা সন্ধি হয়নি)। কাজী মিনহাজুস সিরাজ লিখেছেন: “وَيُروى أمير المؤمنين چنان نمود که با کفار صلح افتاده است، و او را به لشکر حاجت نیست” (তাবাকাতে নাসিরি: ১৯/৩)। অর্থাৎ ইবনে আলকামি খলিফার কাছে প্রকাশ করেছিল যে কাফেরদের (তাতার) সাথে সন্ধি হয়ে গেছে এবং এখন খলিফার সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজন নেই। সম্ভবত এই কারণেই খলিফা তার ওপর আস্থা করেছিলেন এবং বিপদের আশঙ্কা এতটাই কমে গিয়েছিল যে তিনি সৈন্যবাহিনীর কোনো তোয়াক্কা করেননি।

[২] আল-মানহালুস সাফি ওয়াল মুস্তাওফি বাদাল ওয়াফি, ইবনে তাগরি বারদি: ৭/১২৮, ত. আল-হায়আতুল মিসরিয়্যাহ।

[৩] আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ: ৬৫৬ হিজরি।

[৪] তারিখ হাবিবুস সিয়র: ২/৩৩৮।

[৫] তারিখুল ইসলাম লিজ জাহাবি: ৪৩/৪৮, ত. তাদমুরি।

...এবং অকেজো করে দিয়েছি। এখন আর বিলম্ব করা উচিত নয়।“

হালাকু খানের ইরাকি আমিরদের প্রতি হুমকি:

এর আগে হালাকু খান ইরাকের সমস্ত আমিরদের কাছে হুমকিমূলক পত্র পাঠিয়েছিলেন যে, তারা যেন তাতার সালতানাতের আনুগত্য স্বীকার করে নেয়, অন্যথায় তাদের পরিণতি হবে দৃষ্টান্তমূলক। এই পদক্ষেপটি এজন্য প্রয়োজনীয় মনে করা হয়েছিল যাতে যুদ্ধের সময় খলিফা কোথাও থেকে কোনো সাহায্য না পান। অধিকাংশ ইরাকি আমির হালাকু খানের ক্রোধ থেকে বাঁচতে ইতোমধ্যেই তার আনুগত্যের বলয়ে প্রবেশ করেছিলেন। এভাবে বাগদাদ বাহ্যিক সাহায্যকারীদের থেকেও বঞ্চিত হয়ে পড়েছিল। [১]

আক্রমণের অজুহাত:

হালাকু খানের জন্য পথ সম্পূর্ণ পরিষ্কার ছিল, কিন্তু আক্রমণের আগে তিনি কোনো একটি অজুহাত থাকাকে জরুরি মনে করলেন এবং এই গুজব ছড়িয়ে দিলেন যে, খলিফা বাতিনিয়াদের বিরুদ্ধে অভিযানে তাতারদের কোনো সাহায্য করেননি। এটি ছিল সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অভিযোগ, কারণ তাতারদের কখনোই বাহ্যিক সাহায্যের প্রয়োজন পড়েনি। তবে একে অজুহাত বানিয়ে হালাকু ১০ রমজান ৬৫৫ হিজরিতে খলিফার কাছে এই বার্তা পাঠান:

“আমরা যখন মুলাহিদাদের দুর্গগুলো জয় করছিলাম, তখন আপনি আনুগত্য ও সামরিক সাহায্যের দাবি করেছিলেন, কিন্তু আপনি আনুগত্য প্রকাশ করলেও সৈন্য পাঠাননি। আনুগত্য ও ঐক্যের নিদর্শন ছিল এই যে, বিদ্রোহীদের সাথে মোকাবিলার সময় আপনি আমাদের কাছে সৈন্য পাঠাতেন। আমরা আপনাকে নসিহত করছি যে, আপনি বিদ্রোহ ও শত্রুতা ত্যাগ করুন, চালনি দিয়ে সূর্য ধরার চেষ্টা করবেন না, অন্যথায় আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়বেন।

যাই হোক, যা হওয়ার হয়েছে, এখন খলিফা যদি আমাদের অনুগত হন, তবে দুর্গগুলো ধ্বংস করে দিন, পরিখাগুলো ভরাট করে দিন এবং দেশ আপনার ছেলের হাতে সোপর্দ করে আমাদের কাছে উপস্থিত হোন। যদি তিনি এটি করতে না পারেন, তবে আমির দাওয়াইদার এবং সুলাইমান শাহকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন যাতে আমরা যা বলি তা তারা কোনো কমবেশি ছাড়াই খলিফাকে জানাতে পারে। যদি এই কথাগুলো মেনে নেওয়া হয়, তবে আপনার সাথে আমাদের কোনো শত্রুতা নেই। যদি নসিহত না শোনে, তবে সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করে যুদ্ধের ময়দানে চলে আসুন যাতে আমরা যুদ্ধের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত থাকি। আমরা যখন বাগদাদে আক্রমণ করব, তখন কোনো প্রাচীরই আপনাকে বাঁচাতে পারবে না, চাই আপনি আসমানেই চলে যান না কেন।

যদি আপনি নিজের মাথা এবং নিজের ঘর বাঁচাতে চান, তবে কথা মেনে নিন, অন্যথায় দেখবেন আল্লাহর ইচ্ছা কী।“ [২]

[১] তারিখ হাবিবুস সিয়্যার: ২/৩৩৮... হালাকু খানের ধারণা ছিল যে, কোনো দেশই এত শক্তিশালী হতে পারে না যে তার নিজের বাহিনীর মতো এত বড় বাহিনী থাকবে। ইবনুল আলকামি তাকে সন্দেহ পোষণ করিয়ে বলতে লাগলেন যে, ইবনুল আলকামি খলিফার অনুগত এবং তিনি কেবল বাহিনীতে সংখ্যা কমিয়ে দিচ্ছেন যাতে তাতাররা আত্মতুষ্টির শিকার হয়ে মারা পড়ে। ইবনুল আলকামির জবাব ছিল হালাকু’র এই ধরনের সন্দেহ দূর করার জন্য।

[২] আল-মাসজাদুল মাসবুক ওয়াল জাওহারুল মাহকুক লিল আশরাফ আল-গাসসানি, পৃষ্ঠা ২৬৩।

[৩] জামিউত তাওয়ারিখ (আরবি), রশীদ উদ্দিন ফজলুল্লাহ: খণ্ড ২, অংশ ১: পৃষ্ঠা ২৬৭, ২৬৮, দারু ইহয়াইল কুতুবিল আরাবিয়া, মিশর।

নোট: হালাকু খানের আমির দাওয়াইদার এবং সুলাইমান শাহকে তলব করা কোনো নেক নিয়ত ছিল না, বরং এর উদ্দেশ্য ছিল বাগদাদকে তার যোগ্যতম সামরিক কমান্ডারদের থেকে বঞ্চিত করা। বাগদাদে দাওয়াইদারের অবস্থান এমন এক কাঁটা ছিল যে তিনি ছিলেন ইবনুল আলকামির একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী। যদি তিনি হালাকু’র হাতে পড়ে যেতেন, তবে উজিরের ষড়যন্ত্রের পথ পরিষ্কার হয়ে যেত। আর আমির সুলাইমান শাহের কথা বলতে গেলে, তিনি ছিলেন তুর্কমেন গোত্রগুলোর নেতা এবং অভিজ্ঞ সামরিক কর্মকর্তা। ঐতিহাসিকরা বলেন, তিনি ছিলেন তার সময়ের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, যিনি বহু বছর ধরে বাগদাদকে তাতারদের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন এবং তাদের বারবার পিছু হটতে বাধ্য করেছিলেন। (তাবাকাতে নাসিরি: ১৯২/২) হালাকু খানের এই অবস্থানে পৌঁছানো কেবল আমিরদের তথ্যের ওপর সীমাবদ্ধ ছিল না বরং উজিরের দূতদের মাধ্যমেও সুচারুভাবে সম্পন্ন হয়েছিল। এটি ছিল অযৌক্তিক আচরণ, প্রতারণা এবং ষড়যন্ত্রের এক স্পষ্ট লক্ষণ।

খলিফা কাল্পনিক চিন্তায় মগ্ন ছিলেন:

এদিকে মুস্তাসিম বিল্লাহর সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা লোপ পেয়েছিল। তিনি কেবল ইবনে আলকামির পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছিলেন। ইবনে আলকামি এটাও চাচ্ছিলেন না যে, মুস্তাসিম তাতারীদের আনুগত্য স্বীকার করে নিজের এবং নিজের পরিবারের প্রাণ রক্ষা করুন। তিনি এই বংশের নামনিশানা মিটিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন, তাই তিনি খলিফাকে পরামর্শ দিলেন যে হালাকু খানের আনুগত্য যেন কোনোভাবেই স্বীকার না করা হয়। [১]

তিনি খলিফাকে বাস্তব পরিস্থিতির পরিবর্তে আবেগীয় ও কাল্পনিক কথায় বিভ্রান্ত করে রাখলেন। তিনি বললেন:

“তাতারী বাহিনীর কী সাধ্য যে তারা বাগদাদবাসীদের কোনো ক্ষতি করতে পারে। যদি বাগদাদের নারী ও শিশুরাই ঘরের ছাদ থেকে তাতারীদের ওপর পাথর নিক্ষেপ করে, তবে তাদের লাশ অলিগলি ও বাজারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকবে।” [২]

কূটনৈতিক ফ্রন্টে খলিফার ব্যর্থতা। অনুপযুক্ত পত্রালাপ:

এই প্রতারণামূলক কথায় প্রলুব্ধ হয়ে খলিফা হালাকু খানের নামে এমন একটি পত্র লেখালেন যা বিষয়টিকে চরমভাবে বিগড়ে দিল। এই পত্রটি আল্লামা শরফুদ্দিন ইবনুল জাওজি (রহ.) হালাকুর কাছে নিয়ে যান, যাতে লেখা ছিল:

“হে যুবক! যাকে দুই দিনের শাসন ক্ষমতা ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে, তুমি আমাদের কাছে এমন কিছু চাচ্ছ যা তুমি কখনোই পাবে না। পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সমস্ত বৃদ্ধ ও যুবক আমার গোলাম, কিন্তু আমি যুদ্ধ চাই না। আমি থাকান এবং হালাকু খানের সাথে এক প্রাণ দুই দেহের মতো, যদি তোমরাও আমার মতো ভালোবাসার বীজ বপন করো। পরিখা, দুর্গ এবং আমার প্রজাদের নিয়ে তোমাদের কী কাজ, সুতরাং তোমরা খোরাসানের দিকে ফিরে যাও। কিন্তু যদি তোমরা যুদ্ধই চাও, তবে আমার যুবকরাও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত।”

হালাকু খান এই উত্তর শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন এবং বললেন:

“যখন আল্লাহ কোনো জাতিকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন তাদের মাথায় এমন কাল্পনিক চিন্তা ঢুকিয়ে দেন।” [৩]

এরপর খলিফা কিছু উপহারসহ কাজী বদরুদ্দিনকে দূত হিসেবে পাঠালেন। সেই বার্তায় বলা হয়েছিল:

“অতীতে যখনই কোনো রাজা বাগদাদ আক্রমণ করেছেন, তিনি ধ্বংস ও বরবাদ হয়েছেন। আমাদের বংশের শাসন কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে, এমন বংশের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করা আপনার জন্য সমীচীন নয়।” [৪]

এতে হালাকু খান আরও অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন।

হালাকু খানের চূড়ান্ত আক্রমণ। ইরাকের আমিরদের পারস্পরিক পত্রালাপ:

অবশেষে হালাকু খান দুই লক্ষ যোদ্ধা নিয়ে ইরাকের দিকে রওনা হলেন। [৫] পথে পড়া প্রতিটি শহর এবং প্রতিটি দুর্গ...

[১] আল-আসজাদুল মাসবুক ওয়াল জাওহারুল মাহকুক ফি আখবারিল খুলাফা ওয়াল মুলুক, লিল মালিকিল আশরাফ আল-গাসসানি (মৃ. ৮০৩ হি.), পৃ. ৬২৪, ৬২৫

[২] তারিখ-ই-হাবিবুস সিয়র, গিয়াসুদ্দিন মীর খোয়ান্দ শিরাজি: ২/৩৩৯

[৩] জামিউত তাওয়ারিখ (আরবি): খণ্ড ২, প্রথম অংশ: পৃ. ২৬৯, ২৭১ [৪] জামিউত তাওয়ারিখ (আরবি): খণ্ড ২, প্রথম অংশ: পৃ. ২৭৬

[৫] আল-মানহালুস সাফি ওয়াল মুস্তাওফি বাদাল ওয়াফি, ইবনে তাগরি বারদি: ৭/১২৮, তবা আল-হায়আতুল মিসরিয়্যাহ

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

...শাসকের জন্য দুটি পথই ছিল: হয় হালাকু খানের তাঁবুতে উপস্থিত হয়ে মাথা নত করা, অথবা নিজের জাতিসহ নির্মমভাবে নিহত হওয়া পছন্দ করা। যদি শাসক মাথা নত করত, তবে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হতো এবং তার বাহিনীকে নিজের সাথে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হতো; তবে শহরটি লুণ্ঠন করা হতো এবং দুর্গ ও প্রাচীর ধ্বংস করে দেওয়া হতো। [১]

ইরাকের কিছু আমির এবং বাগদাদের কর্মকর্তাদের চিঠিপত্র:

এই সময়ে হালাকুর আনুগত্য স্বীকারকারী ইরাকি আমিরগণ বাগদাদের কর্মকর্তাদের চিঠি লিখে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে এবং অস্ত্র সমর্পণ করার উপদেশ দিচ্ছিলেন। তাতারীদের আনুগত্য স্বীকারকারী জনৈক আমির সুলতান জুক পুরনো বন্ধুত্বের খাতিরে বাগদাদের সীমান্ত রক্ষক আমির কারাসুনকুরকে চিঠি লিখলেন:

“আমি অনেক চিন্তা-ভাবনা ও প্রচেষ্টার পর হালাকু খানের দরবারের সাথে যুক্ত হয়েছি। সে আমার সাথে ভালো ব্যবহার করছে। তুমি নিজের জীবন বাঁচাও। নিজের সন্তানদের ওপর দয়া করো। নিজের ঘরবাড়ি এই লোকদের হাত থেকে নিরাপদ করো।”

এর উত্তরে কারাসুনকুর জবাব দিলেন:

“তাতারীরা আব্বাসীয় বংশের ওপর আক্রমণ করার কে? আব্বাসীয়দের শাসন পাঁচ শতাব্দী ধরে প্রতিষ্ঠিত। যে কেউ তাদের ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে, সে নিজেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এটা কোনো বুদ্ধির কথা নয় যে তুমি আমাকে তাতার সাম্রাজ্যের সাথে যুক্ত হওয়ার দাওয়াত দিচ্ছ। হওয়া উচিত এই যে, হালাকু খান তুর্কিস্তানে ফিরে যাক, কারণ খলিফাতুল মুসলিমিনের মেজাজ হালাকু খানের অগ্রযাত্রায় অত্যন্ত প্রভাবিত ও ক্ষুব্ধ হচ্ছে। যদি হালাকু খান তার কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়, তবে সে যেন সেনাবাহিনী ফেরত পাঠিয়ে দেয়। আমরা খলিফার কাছে সুপারিশ করব যাতে সন্ধি হয়ে যায় এবং যুদ্ধের দরজা বন্ধ হয়ে যায়।”

সুলতান জুক এই পত্রটি হালাকু খানকে দেখালে সে হেসে উঠল এবং বলতে লাগল: “যদি খোদা আমার সাথে থাকেন, তবে খলিফা এবং তার বাহিনীর ভয় আমার কিসের?” এরপর সে আমির কারাসুনকুরকে বার্তা পাঠাল:

“যদি খলিফা আমাদের অনুগত হয়ে থাকে, তবে বেরিয়ে আমাদের কাছে আসুক। অন্যথায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাক।” [২]

বাগদাদের সামনে হালাকু খান:

আসাদাবাদ পৌঁছে হালাকু খান আবারও খলিফার নামে বার্তা পাঠাল যে, তিনি যেন বাগদাদ থেকে বেরিয়ে তার দরবারে হাজিরা দেন। সৈন্য স্বল্পতার কারণে বাগদাদের আমিরদের যুদ্ধ জয়ের কোনো আশা ছিল না, কিন্তু খলিফাকে হালাকু খানের কাছে পাঠানো ছিল চরম অপমানের বিষয়। তাই আমিরগণ প্রয়োজনীয় মনে করলেন যে, এই মুহূর্তে হালাকু খানকে বিপুল ধন-সম্পদ দিয়ে ফিরে যেতে রাজি করানো হোক এবং এরপর চূড়ান্ত মোকাবিলার জন্য নতুন করে সেনাবাহিনী প্রস্তুত করা হোক। ফলে আল্লামা মুহিউদ্দিন ইবনুল জাওজি রহমাতুল্লাহ রাষ্ট্রদূত হয়ে হালাকু খানের কাছে গেলেন। সেই সময় তাতারী বাহিনী দিনাওয়ার পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল।

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৬৫৬ হিজরি, তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ আল-কুবরা লিস-সুবকি: ৮/২৬৮

[২] জামিউত তাওয়ারিখ (আরবি): খণ্ড ২, প্রথম অংশ, পৃষ্ঠা ২৮৩, ২৮৪

ইবনুল জাওয়াযী (রহ.) খলিফার পক্ষ থেকে হালাকু খানকে এই বার্তা পাঠান যে, তাতারীরা যদি ফিরে যায় তবে তাদের চাহিদামতো অর্থ প্রদান করা হবে। হালাকু খান বুঝতে পেরেছিলেন যে, বাগদাদবাসী সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করার জন্য সময়ক্ষেপণ করতে চাইছে। সে বিদ্রূপের সুরে উত্তর দিল: “এত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পর খলিফার সাথে সাক্ষাৎ না করে আমরা কীভাবে ফিরে যেতে পারি?”

অতঃপর হালাকু খান কিরমান শাহ থেকে রওনা হয়ে ৯ মিলহজ ৬৫৫ হিজরিতে হুলওয়ান নদী পার হলেন।

উর্দুয়ে যররীনের অভিযানে অংশগ্রহণ - হাকমে মুসেলের সহায়তা:

অন্যদিকে ৮০ হাজার মঙ্গলের একটি বাহিনী উত্তর থেকে দক্ষিণের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, যার নেতৃত্বে ছিল তাতারী সরদার বাজু নুয়ান, যে আজারবাইজানে মোতায়েন ছিল। [১] এই বাহিনীতে কাম্পিয়ান সাগরের নিকটবর্তী দশতে কিপচাকে বসবাসকারী মঙ্গলেরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল, যাদের রাজ্য ‘উর্দুয়ে যররীন’ নামে পরিচিত ছিল। [২]

এই বাহিনী মুসেলে পৌঁছালে সেখানকার শাসক বদরুদ্দীন লুলু তাতারীদের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তিনি তার পুত্র আস-সালেহ ইসমাইলের নেতৃত্বে কিছু সৈন্যদল এই বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করে দেন। [৩] সেই সাথে তিনি তাতারীদের জন্য দজলা নদীর ওপর সেতু তৈরি করে দেন। [৪] এভাবে পুরো বাহিনী অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্যে নদী পার হয়ে গেল। [৫]

খলিফার একটি কৌশল যা ব্যর্থ হলো:

খলিফা এই সময়ে একটি কাজ করেছিলেন যে, তিনি উপত্যকাগুলোতে পাহারা বসিয়েছিলেন যাতে তাতারী বাহিনীর গতিবিধি ও তৎপরতার খবর পাওয়া যায়।

[১] জামেউত তাওয়ারীখ (আরবি): খণ্ড ২, অংশ ১: পৃষ্ঠা ২৮২ থেকে ২৮৩।

[২] তবাকাত-ই নাসিরী: ১৯৩/২।

বাজু নুয়ানকে ৬৫০-এর দশকে আজারবাইজান, আরমেনিয়া ও ককেশাস অঞ্চলে মোতায়েন করা হয়েছিল। হালাকু খান যখন রবিউল আউয়াল ৬৫৫ হিজরিতে ইসমাইলীদের দমন করে রওনা হলেন, তখন তিনি বাজু নুয়ানকে তলব করে উল্লিখিত এলাকাগুলো পুরোপুরি জয় না করার জন্য কঠোর তিরস্কার করেন। বাজু নুয়ান ক্ষমা প্রার্থনা করে পুনরায় ওই এলাকাগুলো জয়ের জন্য বেরিয়ে পড়েন। (জামেউত তাওয়ারীখ (আরবি): খণ্ড ২, অংশ ২: পৃষ্ঠা ৪২০)। তবে ৬৫৫ হিজরির শেষের দিকে তাকে বাগদাদ আক্রমণের জন্য পুনরায় তলব করা হয়েছিল।

[৩] যাইল মিরআতুয যামান: ৮৭/১, ৮৮।

রশীদুদ্দীনের বর্ণনা অনুযায়ী, বালগা বিন শিবান বিন জোচী, তাতার বিন সুনকুর বিন জোচী এবং কুলি বিন ওরদা বিন জোচী উর্দুয়ে যররীনের সাহায্যকারী বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। এই বাহিনীর জন্য সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে তারা এরবিল ও মুসেল হয়ে বাগদাদের দিকে অগ্রসর হবে। এটিও স্থির হয়েছিল যে পূর্ব ও উত্তর দিক থেকে আসা বাহিনীগুলো দুই দিক থেকে বাগদাদকে ঘিরে ফেলবে। (জামেউত তাওয়ারীখ (আরবি): খণ্ড ২, অংশ ১: পৃষ্ঠা ২৮১)।

এই মঙ্গলেদের মূল কেন্দ্র ছিল দশতে কিপচাক, যেখানে জোচীর বংশধররা বাগদাদ পর্যন্ত শাসন করত। ইলখানিদের সাথে তাদের সুসম্পর্ক ছিল এবং তারা প্রতিটি বিজিত মালের একটি অংশ উর্দুয়ে যররীনে পাঠাত। (তবাকাত-ই নাসিরী: ১৭৬/২)।

আব্বাসীয় খলিফাদের ধ্বংসযজ্ঞে উর্দুয়ে যররীনের অংশগ্রহণ কিছুটা আশ্চর্যজনক মনে হয়, কারণ আব্বাসীয় খলিফাদের সাথে তাদের সুসম্পর্ক ছিল। (তবাকাত-ই নাসিরী: ২১৪/২)। তাই বাগদাদ অভিযানে তাদের অংশগ্রহণ অদ্ভুত মনে হলেও এটি অসম্ভব নয় যে, হালাকু খান তাদের কাছে প্রকাশ করেননি যে তিনি আব্বাসীয় খেলাফত ধ্বংস করতে যাচ্ছেন। বরং হালাকু খান নিজেই খলিফাকে হত্যার সংকল্প করেছিলেন। ইবনুল আলকামী এবং নাসিরুদ্দীন তুসী খলিফার কাছ থেকে কর নিতে সম্মত ছিলেন, কিন্তু হালাকু খান পুরো আব্বাসীয় বংশের নাম-নিশানা মুছে ফেলার সংকল্প করেছিলেন। সম্ভবত উর্দুয়ে যররীনের শাসকরা খলিফাকে হত্যা এবং খেলাফত ধ্বংসের পরিকল্পনা সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। কিন্তু সেখানে যে নৃশংসতা চালানো হয়েছিল তাতে তারা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। গনিমতের মালের হিস্যা না পাওয়া ছিল এই বিরোধের আরেকটি কারণ। এরপর ইলখানি এবং উর্দুয়ে যররীনের মধ্যে শত্রুতা শুরু হয়, যার বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তী অধ্যায়ে আসবে।

[৪] যাইল মিরআতুয যামান লিকুতুবুদ্দীন আল-ইউনি: ৮৮/১, দারুল কুতুব আল-ইসলামী, কায়রো।

[৫] কাজী মিনহাজুস সিরাজ জুযজানী রচিত তবাকাত-ই নাসিরী: ১৯৩/২, কাবুল সংস্করণ।

একশ সৈন্যকে দরবন্দের পার্বত্য অঞ্চলে মোতায়েন করা হয়েছিল। [১] কিন্তু স্থানীয় কুর্দিরা বিশ্বাসঘাতকতা করে তাতারীদের সেই সৈন্যদের মোরচা পর্যন্ত পৌঁছানোর পথ করে দেয়। এভাবে তারা সবাই সেখানে শহীদ হয়ে যান। [২]

তাতারীদের উত্তর দিকের বাহিনী কোনো বাধা ছাড়াই তিকরিত পৌঁছে যায়। এখানে আবারও নদীর ওপর সেতু নির্মাণ করতে হয়, কিন্তু তিকরিতবাসীরা হঠাৎ আক্রমণ করে সেতুটি পুড়িয়ে দেয় এবং অনেক তাতারীকে হত্যা করে পুনরায় কেল্লাবন্দী হয়ে যায়। বাজি নুয়ানের কাছে শহর জয় করার সময় ছিল না। সে দ্রুততম সময়ে দ্বিতীয় একটি সেতু নির্মাণ করে বাহিনীকে নদী পার করে দেয়। [৩]

এদিকে পূর্ব দিক থেকে হালাকু খানের বাহিনী অগ্রসর হচ্ছিল, যার সাথে শিরাজের শাসক আবু বকর বিন সাদ জাঙ্গিও তার সাহায্যকারী দল নিয়ে যোগ দিয়েছিলেন। [৪] অবশেষে দুই দিক থেকে ধেয়ে আসা তাতারী বাহিনীর প্লাবন তাদের সহযোগী বাহিনীসহ আব্বাসীয় খিলাফতের সীমানায় প্রবেশ করল। [৫]

মুহাম্মদ আল-কামিল খলিফার সাহায্যের জন্য অস্থির:

সেই সময় মুসলিম বিশ্বে যদি কোনো ব্যক্তি তাতারীদের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে বাগদাদকে বাঁচানোর জন্য অস্থির হয়ে থাকেন, তবে তিনি ছিলেন আল-জাজিরার তরুণ শাসক মুহাম্মদ আল-কামিল (আল-মালিক আল-আদিলের নাতি)। সেই সময় তার নিজের রাষ্ট্রও চরম বিপদের মুখে ছিল, কারণ কিছুকাল আগে তাতারী বাহিনী তার রাজধানী মিয়াফারিকিনের আশেপাশে টহল দিয়েছিল। সেই সময় মুহাম্মদ আল-কামিল সরাসরি কারাকোরামের খাকান মঙ্গু খানের সাথে সাক্ষাৎ করে নিজের রাষ্ট্রকে বাঁচানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি অত্যন্ত দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে তার দরবারে পৌঁছেছিলেন। মসুলের শাসক বদরুদ্দিন লুলুর ছেলে আস-সালিহ ইসমাইল এবং মারদিনের শাসকের ছেলে মুজাফফরও সেই সময় মঙ্গু খানের কাছে ছিলেন। সবাই খাকানের কাছে নিজ নিজ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষার প্রত্যাশী ছিলেন। মঙ্গু খান মুহাম্মদ আল-কামিলের রাষ্ট্রের মর্যাদা জানার পর তাকে সমস্ত মেহমান আমিরদের উপরে স্থান দেন এবং বলেন: “তুমি তাদের সবার চেয়ে বেশি সম্মানিত।” এরপর তিনি প্রতিনিধি দলকে হালাকু খানের নামে একটি অভয়পত্র লিখে দেন যে: “ভবিষ্যতে তোমার বিষয়টি তারই হাতে থাকবে।”

মুহাম্মদ আল-কামিল যখন সেখান থেকে ফিরে এলেন, তখন বাগদাদের ওপর তাতারীদের আক্রমণের প্রস্তুতি চলছিল। তিনি দেশে ফেরার কয়েক দিন পর সিরিয়ার শাসক আল-মালিক আন-নাসিরকে তাতারীদের বিরুদ্ধে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করার জন্য দামেস্কে চলে যান। এরই মধ্যে বাগদাদ অবরোধের খবর চলে আসে। এদিকে মসুলের শাসক বদরুদ্দিন লুলুর দূত এসে আল-মালিক আন-নাসিরকে তাতারীদের আনুগত্য...

[১] এশিয়ায় দরবন্দ নামে তিনটি পার্বত্য অঞ্চল বিখ্যাত: একটি ইরানের রাজধানী তেহরানের উত্তরে অবস্থিত যা আলবুরজ পর্বতমালার সাথে মিশেছে, এটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৭০০ মিটার উঁচুতে। দ্বিতীয়টি উত্তর ইরাকের কুর্দিস্তান জেলায় অবস্থিত যাকে “দরবন্দ খান” বলা হয়। তৃতীয় দরবন্দ যাকে “দরবন্দ শাহরিস্তান” বা “বন্দ শিরওয়ান” বলা হয়, তা ককেশাস অঞ্চলের দাগেস্তান প্রজাতন্ত্রে অবস্থিত। এই তিনটি অঞ্চলেই পাহাড়ি পথগুলো এতটাই সংকীর্ণ ও জটিল যে, উঁচুতে বসে থাকা মুষ্টিমেয় কিছু লোক দূরপাল্লার অস্ত্র দিয়ে পুরো বাহিনীকে থামিয়ে দিতে পারে। উল্লিখিত ঘটনায় যে দরবন্দের কথা বলা হয়েছে, তা হলো দরবন্দ খান (উত্তর ইরাক) যেখানে কুর্দিরা বসবাস করত। এই স্থানটি বাগদাদ থেকে ৩৩৩ কিলোমিটার উত্তরে এবং মসুল থেকে প্রায় ৯০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত।

[২] জাইল মিরআতুয যামান লি-কুতুবুদ্দিন ইউনি: ১/৭৪... খলিফা এই সৈন্যদের উত্তর দিক থেকে হালাকু খানের জন্য আসা সেই মঙ্গোল সাহায্যকারী বাহিনীকে থামানোর জন্য নিযুক্ত করেছিলেন যা বাজি নুয়ানের কমান্ডে ছিল। হালাকু খানের বাহিনী যা হামাদান থেকে আসছিল, তাদের পথে দরবন্দ পড়ত না।

[৩] তাবাকাতে নাসিরি: ২/১৯৩

[৪] তাবাকাতে নাসিরি: ২/১৯০

[৫] আল-আসজাদুল মাসবুক লিল-আশরাফ আল-গাসসানি, পৃ. ৬২৬

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

চতুর্থ খণ্ড

প্রস্তুত করতে লাগলেন। এই পরিস্থিতিতে মুহাম্মদ আল-কামিল দামেস্কের দরবারে একটি উদ্দীপনামূলক ভাষণ দেন এবং বলেন:

“এই তাতারীদের ওপর না তো শিষ্টাচার ও কোমলতা প্রভাব ফেলে, আর না তাদের সেবা করার কোনো ফায়দা আছে। তাদের উদ্দেশ্য কেবল মানুষের গণহত্যা করা এবং জমিন দখল করা। আপনারা ৬৪৪ হিজরি থেকে আজ পর্যন্ত তাদের পেছনে ধন-সম্পদ ব্যয় করে যাচ্ছেন; বলুন, আপনাদের আন্তরিকতা ও ভালোবাসা কি তাদের ওপর কোনো প্রভাব ফেলেছে? আপনারা বদরুদ্দিন লুলু এবং তার দূতের কথায় ধোঁকা খাবেন না। সে আপনাদেরকে নিজের স্বার্থের জন্য গ্রাস করতে চায়। আমি আপনাদেরকে তার দূতের ধূর্ততা সম্পর্কে সতর্ক করছি। সে কখনোই আপনাদের শুভাকাঙ্ক্ষী হতে পারে না। সে নিজের স্বার্থের উর্ধ্বে আপনাদের উপকারের কথা ভাববে না। তার উদ্দেশ্য হলো আপনাদের দেশ আপনাদের হাত থেকে বের করে নেওয়া (এবং তাতারীদের হাতে তুলে দেওয়া)।”

“আমি নিজের সম্পর্কে ভালো করেই জানি যে, আমি তাতারীদের সমর্থক হই বা বিরোধী, আমার তকদিরে মৃত্যু লেখা আছে; তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আমি আমার প্রাণ আল্লাহর পথে উৎসর্গ করব।”

“এখন কিসের অপেক্ষা? তাতারীরা বাগদাদ অবরোধ করে ফেলেছে। মুক্তির পথ এটাই যে, সুলতান মুয়াজ্জম তার সেনাবাহিনী নিয়ে মুসলমানদের সাহায্যের জন্য যাত্রা করবেন। আমি আপনাদের আগে আগে চলব। যদি আমরা বাগদাদকে রক্ষা করতে পারি, তবে এটাই উদ্দেশ্য। এমন পরিস্থিতিতে খলিফার কাছে আমাদের মর্যাদাও অনেক বৃদ্ধি পাবে। আর যদি আমরা বাগদাদকে রক্ষা করতে না-ও পারি, তবুও এর প্রতিশোধ অবশ্যই নিতে পারব।”

মুহাম্মদ আল-কামিলের কথায় দামেস্কের দরবারে নিশ্চিন্ততা নেমে এল। অধিকাংশ আমীর এই জিহাদের আহ্বানকে নিজেদের হৃদয়ের আওয়াজ বলে অনুভব করছিলেন, কিন্তু একজন বিশ্বাসঘাতক স্বভাবের জয়নুল হাফিজি এর আগেই কিছু বড় বড় আমীরকে হালাকু খানের সামনে মাথা নত করতে রাজি করিয়ে ফেলেছিল। এই গোষ্ঠীটি আল-মালিকুন নাসিরকে কোনো সাহসী সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত রাখল। অবশেষে আল-মালিকুন নাসির হতাশ হয়ে আল-কামিলকে বললেন:

“আমি তোমাকে আমার দূতের সাথে হালাকু খানের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমার দূত তোমার জন্য সুপারিশ করে দেবে।”

মুহাম্মদ আল-কামিল এটি শুনে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। তিনি উচ্চস্বরে বললেন:

“সুলতান আলী ওয়াকার! আমি আপনার কাছে দ্বীনের দাবি নিয়ে এসেছি আর আপনি আমাকে এর বদলে দুনিয়া সঁপে দিচ্ছেন। যদি আমার উদ্দেশ্য প্রাণ বাঁচানো হতো, তবে তাতারীদের কাছে আমার মর্যাদা আপনার চেয়ে অনেক বেশি। আমি তাদের থাকানের চেহারা দুইবার দেখেছি। [১]”

আন-নাসির লজ্জিত হয়ে বললেন:

“আচ্ছা, যদি তাতারীরা তোমার রাজ্যে আক্রমণ করে, তবে আমি তোমার সাহায্যের জন্য একটি বাহিনী পাঠিয়ে দেব।”

“সেই সময় এমনটা করা নিরর্থক হবে। সেই বাহিনী আমার পর্যন্ত পৌঁছাতেই পারবে না।”

মুহাম্মদ আল-কামিল তিক্ততার সাথে বললেন। [২]

[১] তাতারীদের মধ্যে প্রথা ছিল যে, যে ব্যক্তি থাকানের চেহারা দেখে ফেলত, সে প্রাণের নিরাপত্তা পেয়ে যেত। (তারিখুল ইসলাম লিজ-জাহাবি: ৪৮/৪৪৮, তাজকিরা মিসরি)

[২] আল-আলাকুল খাতিরা ফি জিকর উমরাইশ শাম ওয়াল জাজিরা, ইজ্জুদ্দিন ইবনে শাদ্দাদ, পৃষ্ঠা ১৮৬ থেকে ১৮৮, ত ত শামিলা।

ইতিহাসে উন্মত্তে মুসলিমা - চতুর্থ খণ্ড

সেনাবাহিনীর আমিরদের খলিফার কাছে যুদ্ধের জন্য পীড়াপীড়ি:

এদিকে দামেস্কে এই বিতর্ক চলছিল এবং ওদিকে বাগদাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত ছিল। বাগদাদবাসীর হুঁশ ফিরতে দেরি হয়েছিল, কিন্তু তারা শহর হস্তান্তর করতে প্রস্তুত ছিল না। আমির সুলাইমান শাহ এবং মালিক ইজ্জুদ্দিন দাওয়াদার মুজাহিদুদ্দিন দাওয়াদারের সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন: “পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। শক্তিশালী শত্রু কাছে চলে এসেছে। উজির শত্রুদের সাথে আঁতাত করে রেখেছে। সে আমিরুল মুমিনীনকে দেশের প্রতিরক্ষা থেকে বিরত রেখেছে। এখন আমরা কী করব?”

দাওয়াদার বললেন: “এই বিষয়ে আমার পক্ষে যা বলা সম্ভব ছিল, আমি আমিরুল মুমিনীনের কর্ণগোচর করেছি। কিন্তু তাঁর বুঝে এসব কথা আসে না। বাকি আপনারা চাইলে আমি আপনাদের জন্য আমিরুল মুমিনীনের সাথে একান্তে সাক্ষাতের অনুমতি নিতে পারি যাতে আপনারা আপনাদের আরজি পেশ করতে পারেন।”

দাওয়াদার সুলাইমান শাহ এবং মালিক ইজ্জুদ্দিনের সাথে খলিফার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু খলিফা যথারীতি ইবনে আলকামির সাথে কথা বলার ইঙ্গিত দিলেন। দুই জেনারেল অত্যন্ত হতাশ হয়ে খেলাফত প্রাসাদ থেকে ফিরে এলেন। [১] তবে কিছুক্ষণ পর খলিফা কোনো উপায় না দেখে মুজাহিদুদ্দিন দাওয়াদারকে শত্রুর সাথে লড়াই করার নির্দেশ দিলেন। [২] এই নির্দেশ পাওয়ামাত্রই আমিরগণ অবশিষ্ট সেনাবাহিনীর সাথে প্রাসাদের ভৃত্য ও কর্মচারী এবং বাগদাদ ও শহরতলীর নাগরিকদের মিলিয়ে বিশ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী প্রস্তুত করলেন। [৩]

তাতারিদের সাথে তুমুল যুদ্ধ:

৯ মহরম সংবাদ পাওয়া গেল যে, বাজু নুয়ানের বাহিনী দজলা নদীর দুজাইল খাল পার হয়ে পশ্চিম বাগদাদের কাছে চলে এসেছে। [৪] বাগদাদী বাহিনী দজলা নদীর সেতু পার হয়ে শহরের পশ্চিম দিকে বের হলে তিন মাইল দূরে বাজু নুয়ানের বাহিনীকে পঙ্গপালের মতো ছড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। [৫] এখানে তুমুল যুদ্ধ হলো যাতে উভয় পক্ষ তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করল।

মুসলমানদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিল পদাতিক সৈন্য যারা জীবন বাজি রেখে দৃঢ়ভাবে লড়াই করল। [৬] অবশেষে আল্লাহর সাহায্য শামিল হলো এবং তাতারিরা পিছু হটতে বাধ্য হলো। মুসলমানরা তাদের ধাওয়া করতে শুরু করল। এই সময়ে অনেক শত্রু বন্দী ও নিহত হলো। নিহতদের মাথা কেটে বাগদাদে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। সূর্যাস্ত পর্যন্ত ধাওয়া অব্যাহত থাকল এমনকি মুসলমানরা দজলা নদীর একটি বড় খালের ওপারে বাশিয়াহ এলাকায় পৌঁছে গেল। [৭] মালিক ইজ্জুদ্দিন আরও...

[১] তবাকাত-ই-নাসিরি, কাজী মিনহাজ সিরাজ জুজজানি: ২/১৯৩, ১৯৪, কাবুল সংস্করণ।

[২] আল-হাওয়াদিসুল জামিয়া ওয়াত-তাজারিবুন নাফিয়া, পৃষ্ঠা ২৩২; আকদুজ জুমান ফি তারিখি আহলিয যামান, আইনি: ৬৬৬ হিজরি, দারুল কুতুব ওয়াল ওয়াসায়িক সংস্করণ।

[৩] তবাকাত-ই-নাসিরি: ২/১৯৪... কোনো কোনো ঐতিহাসিক মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা চল্লিশ হাজার উল্লেখ করেছেন। (সিমতুন নুজুমিল আওয়ালি: ৩/৫১৮, আল-ইলমিয়াহ সংস্করণ)। সম্ভব যে এতে বিশ হাজার সৈন্য এবং বিশ হাজার স্বেচ্ছাসেবী ছিল। বিশ হাজার সংখ্যা বর্ণনাকারী রাবিগণ কেবল সৈন্যদের গণনা করেছেন।

[৪] জামিউত তাওয়ারিখ (আরবি): খণ্ড ৩, প্রথম অংশ: পৃষ্ঠা ২৮৫।

[৫] আল-হাওয়াদিসুল জামিয়া ওয়াত-তাজারিবুন নাফিয়া, পৃষ্ঠা ২৩২। [৬] তবাকাত-ই-নাসিরি: ২/১৯৪।

[৭] আল-হাওয়াদিসুল জামিয়া ওয়াত-তাজারিবুন নাফিয়া, পৃষ্ঠা ২৩১, ২৩২। খালের নাম কাজী মিনহাজ সিরাজ “নহর-ই-শির” এবং ইবনুল ফুওয়াতি “নহর-ই-বাশিয়াহ” উল্লেখ করেছেন। দ্রষ্টব্য: তবাকাত-ই-নাসিরি-র কিছু পাণ্ডুলিপিতে “নহর-ই-শির” শব্দ রয়েছে যা লিপিকারের ভুল।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা - চতুর্থ খণ্ড

তিনি পিছু ধাওয়ার ব্যাপারে অটল ছিলেন যাতে শত্রু সামলে ওঠার সুযোগ না পায়, কিন্তু মুজাহিদ উদ্দিন দুয়াইদার একে উপযুক্ত মনে করেননি। অবশেষে রাতে সেই স্থানেই অবস্থানের সিদ্ধান্ত হলো। মুজাহিদিনরা রাতে তাঁবুতে ক্লাস্তি দূর করছিলেন, অন্যদিকে জাতির গাদ্দার ইবনে আলকামি তাদের ধ্বংস করার ফন্দি আঁটছিল। সে তৎক্ষণাৎ রাতের অন্ধকারে তার কিছু অনুচরকে সেই খালের দিকে পাঠিয়ে সেটির বাঁধ ভেঙে দিল। বন্যার স্রোত সরাসরি নিচু এলাকায় অবস্থিত মুসলমানদের তাঁবুর দিকে ধেয়ে এল এবং হাজার হাজার সৈন্য তাতে প্রাণ হারাল। যুদ্ধ সরঞ্জাম ডুবে গেল। [১]

পিছু হটে যাওয়া তাতারীরা যখন মুসলমানদের এই অবস্থার খবর পেল, তখন তারা ফিরে এল। ১০ই মহরম সকালে মুসলমানরা তাতারীদের পুনরায় সামনে দেখতে পেল। বন্যায় বিশ্বস্ত মুসলমানরা এবার আর শত্রু হয়ে লড়তে পারল না এবং শোচনীয় পরাজয়ের সম্মুখীন হলো। আমির দুয়াইদার, সুলাইমান শাহ এবং ইজ্জুদ্দিন অবশিষ্ট সৈন্যদের নিয়ে অত্যন্ত জরাজীর্ণ অবস্থায় বাগদাদে পৌঁছালেন, যেখানে পরাজয়ের খবর ছড়িয়ে পড়েছিল এবং পশ্চিম বাগদাদের মানুষ চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে নদী পার হয়ে পূর্ব অংশের প্রাচীরের পেছনে আশ্রয় নিচ্ছিল। পরের দিন ১১ই মহরম হালাকু খান শহরের পূর্ব দিকে পৌঁছে গেল। [২] ১৫ই মহরম বাজি নুয়ান শহরের পশ্চিম দিকে চলে আসে যেখান থেকে বেসামরিক লোকজনকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। বাজি নুয়ান সেখানে আবাসিক এলাকায় স্বাচ্ছন্দ্যে আস্তানা গেড়ে বসল। [৩] এখন তার এবং খিলাফত প্রাসাদের মাঝখানে দজলা নদী এবং পূর্ব বাগদাদের প্রাচীর ছাড়া আর কোনো বাধা ছিল না। [৪]

খলিফার পলায়নের পরিকল্পনা যা বাস্তবায়িত হতে পারেনি:

প্রতিরোধ নিষ্ফল দেখে আমির মুজাহিদ উদ্দিন দুয়াইদার, আমির সুলাইমান শাহ এবং মালিক ইজ্জুদ্দিন খলিফার সাথে সাক্ষাৎ করে আরজ করলেন: “শত্রু মাথার ওপর চলে এসেছে। আমাদের কাছে অশ্বারোহী সৈন্য খুব কম অবশিষ্ট আছে। শত্রুর অশ্বারোহী বাহিনী হাজার গুণ বেশি। সমীচীন হবে যে, আমিরুল মুমিনীন পরিবার-পরিজনসহ নৌকায় আরোহণ করবেন। ধনভাণ্ডারও নৌকায় তুলে দেওয়া হোক। আমরা সবাই আপনার সাথে থাকব। দজলা নদীর পথে আমরা বসরায় পৌঁছে যাব। সেখানকার দ্বীপগুলোতে নিরাপদ থেকে আমরা নুসরাতে ইলাহিয়ার অপেক্ষায় থাকতে পারব।”

খলিফা কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ইবনে আলকামির পরামর্শ চাইলেন। সে বলল: “এর প্রয়োজন পড়বে না। আমি শত্রুর সাথে সন্ধির পথ বের করে নেব।” এভাবে একটি উপযুক্ত পরামর্শ নষ্ট হয়ে গেল এবং তকদিরে লেখা মর্মান্তিক ঘটনার পথ সুগম হলো। [৫]

বাগদাদ অবরোধ, তীর নিক্ষেপ এবং পাথর বর্ষণ:

১১ই মহরম ৬৫৬ হিজরি (১৯শে জানুয়ারি ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) তাতারীরা বাগদাদকে উভয় দিক থেকে অবরোধ করে ফেলেছিল। ভয় ও আতঙ্ক এবং...

[১] তাবাকাতে নাসিরি: ২/ ১৯৩, ১৯৫... এই যুদ্ধের বিবরণে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। ইবনুল ফুওয়াতীর বর্ণনা অনুযায়ী, তাতারীরা প্রতারণা স্বরূপ নিজেরাই পিছু হটেছিল এবং দুয়াইদার পিছু ধাওয়ার ব্যাপারে অটল ছিলেন। সকালে তাতারী বাহিনী ফিরে এসে আক্রমণ করে। মুসলমানরা পিছু হটার সময় দেখতে পায় যে, খালে বন্যার কারণে পলায়নের পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। এভাবে সেনাবাহিনী ধ্বংস হয়ে যায়। (আল-হাওয়াদিসুল জামিয়া, পৃ. ২৩২) একটি বর্ণনা অনুযায়ী, এই বাঁধ তাতারীরা ভেঙেছিল। (হাশিয়া “আল-হাওয়াদিসুল জামিয়া” পৃ. ২৩২)

[২] তাবাকাতে নাসিরি: ২/ ১৯৩, ১৯৫; জামিউত তাওয়ারিখ (ফারসি): ২/ ২৮৫, ২৮৬, ত. লিডেন

[৩] তাবাকাতুশ শাফিইয়াতিল কুবরা: ৮/ ২৭০; তাবাকাতে নাসিরি: ২/ ১৯৩, ১৯৫; সিমতুন নুজুমিল আওয়ালি: ৩/ ৫১৮, ত. ইলমিয়াহ

[৪] জাইলু মিরআতিয যামান: ১/ ৮৮, ত. দারুল কিতাবিল ইসলামি কায়রো

[৫] তাবাকাতে নাসিরি: ২/ ১৯৫

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

অবরোধের তীব্রতায় শহরবাসীর জ্ঞান হারানোর উপক্রম হয়েছিল। তাতারীরা মিনজানিকের মাধ্যমে শহরের ওপর পাথর বর্ষণ শুরু করে দিল। সেই সাথে হালাকু খানের নির্দেশে তীরের সাথে চিরকুট বেঁধে শহরে নিক্ষেপ করা হতে লাগল, যাতে লেখা ছিল যে, শহরের সেই প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য নিরাপত্তা রয়েছে যে যুদ্ধ করবে না। এই তীর নিক্ষেপ এবং পাথর বর্ষণ থেকে শহরের কোনো কোণই নিরাপদ ছিল না। [১]

আল্লাহ বুদ্ধি ছিনিয়ে নেন:

খলিফা এই সময়ে নিজের কামরায় বসে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করছিলেন এবং তাঁর এক কন্যা তাঁর কাছে ছিল। হঠাৎ একটি তীর রাজপ্রাসাদের জানালা দিয়ে শাঁ শাঁ করে এল এবং কন্যার শরীরে বিঁধে গেল। সে সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। শরীর থেকে প্রবাহিত রক্ত জমিনে একটি লেখা তৈরি করল। খলিফা সেটি পড়ার চেষ্টা করলে সেখানে লেখা ছিল:

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَمْرًا سَلَبَ عَنْ ذَوِي الْعُقُولِ عُقُولَهُمْ.

“যখন আল্লাহ কোনো বিষয়ের ফয়সালা করে নেন, তখন বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি কেড়ে নেন।”

খলিফা এই শব্দগুলো পড়ে অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। [২]

অবরোধ, যুদ্ধ এবং পরাজয়:

২২শে মহরম তাতারীদের পঙ্গপাল সদৃশ বাহিনী বাগদাদের আকাশচুম্বী প্রাচীরের ওপর নিয়মিত আক্রমণ শুরু করে দিল। প্রথম দিনেই তারা শহরের পশ্চিম দিকে অবস্থিত ‘বুরজে আজমি’তে ফাটল ধরাতে সক্ষম হলো। ২৫শে মহরম জুমুআর দিন তারা সেই বুরজটি ধসিয়ে দিল।

সোমবার ২৮শে মহরম তাতারীরা পশ্চিম প্রাচীরে আরোহণ করে সেটি দখল করে নিল। সেই সন্ধ্যায় তাতারীরা পূর্ব প্রাচীরও জয় করে নিল।

বাগদাদে দজলা নদী যাতায়াতের একটি বড় মাধ্যম ছিল। অনেকে মৃত্যুকে সামনে দেখে নদীর মাধ্যমে পালিয়ে যাচ্ছিল। হালাকু তাদের পথ রুদ্ধ করার জন্য বাগদাদের উত্তর ও দক্ষিণে নদীর তীরে গ্রহরী বসিয়ে দিল। ফলে নৌকার মাধ্যমে বের হওয়ার চেষ্টা করা অনেক মানুষকে তাতারীরা পাথর নিক্ষেপ করে নদীতে ডুবিয়ে দিল। পালানোর কোনো পথ না দেখে খলিফা সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে পড়লেন। তিনি বললেন: “এখন আমাকে মাথা নত করতেই হবে।” [৩]

আলোচনা এবং ইবনে আলকামির চরম বিশ্বাসঘাতকতা:

খলিফা আবারও ইবনে আলকামির কাছে পরামর্শ চাইলেন। সে বলল:

“তাতারীদের এই প্রলয়ঙ্করী বাহিনীকে পিছু হটানো সম্ভব নয়। শহরে এত সৈন্য নেই যা প্রতিরক্ষার জন্য যথেষ্ট হবে। জনগণের মধ্যেও...”

[১] জামিউত তাওয়ারিখ (আরবি), রশীদ উদ্দিন ফজলুল্লাহ প্রণীত: খণ্ড ২, প্রথম অংশ: পৃষ্ঠা ২৮৭, ত দারু ইহয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ, মিশর।

[২] তাবাকাতুশ শাফিইয়াতিল কুবরা: ৮/২৭৮, ত হিজর। আল্লামা সুবকী এই ঘটনাটি উদ্ধৃত করে লিখেছেন: এই কারণেই খলিফা উজিরের কথা মেনে তাতারীদের কাছে যেতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। অর্থাৎ এখন যা হওয়ার, তা হয়েই ছাড়বে। লেখক আরজ করছেন যে, খলিফা তখনও সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম ছিলেন, কিন্তু তিনি নিজেকে সেই রক্তমাখা লেখার দৃষ্টান্ত বানিয়ে ছাড়লেন।

নোট: অন্য একটি বর্ণনায় এই ঘটনাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, খলিফা সেই সময় তাঁর প্রিয় দাসী ‘আরাফা’র গান শুনছিলেন, সেই তীরের শিকার হয়েছিল এবং তীরের গায়ে এই চিরকুটটি জড়ানো ছিল: “إِذَا أَرَادَ اللَّهُ لِنَفَاذِ قَضَائِهِ وَفَدَّرَهُ أَذْهَبَ مِنْ ذَوِي الْعُقُولِ عُقُولَهُمْ.” (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: বছর: ৬৫৬ হিজরি)।

[৩] জামিউত তাওয়ারিখ (আরবি): খণ্ড ২, প্রথম অংশ: পৃষ্ঠা ২৮৯, ত দারু ইহয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ, মিশর।

এমন কোনো সাহসিকতা নেই যা দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে কাজ চালানো যেতে পারে। বিচক্ষণতা এতেই রয়েছে যে, আপনি যুদ্ধ বন্ধ করে দিন এবং তাতারীদের জন্য শহরের দরজা খুলে দিন। [১]

খলিফাকে যুদ্ধবিরতিতে রাজি করানোর পর ইবনে আলকামি সন্ধির আলোচনার জন্য হালাকু খানের কাছে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। মুস্তাসিম অনুমতি দিলেন। ইবনে আলকামি আলোচনার অজুহাতে হালাকু খানের কাছে গেলেন এবং তাকে বোঝালেন যে শহর আত্মসমর্পণ করতে প্রস্তুত। হালাকু খান তখনও এই বিষয়ে রাজি ছিলেন যে খলিফাকে অনুগত বানিয়ে বাগদাদের অর্ধেক রাজস্বের বিনিময়ে সন্ধি করে ফিরে যাবেন, কিন্তু ইবনে আলকামি সন্ধি করতে কঠোরভাবে নিষেধ করলেন এবং বললেন:

“যদি সন্ধি হয় তবে বড়জোর বাগদাদ এক-দুই বছর আপনার অনুগত থাকবে। তারপর পরিস্থিতি আগের মতোই হয়ে যাবে।” [২]

ইবনে আলকামি এই বিষয়ের ওপর জোর দিলেন যে আব্বাসীয় খিলাফতের নাম-নিশানা মিটিয়ে দেওয়া হোক। এরপর তিনি হালাকু খানের কাছ থেকে নিজের পরিবার এবং শহরের শিয়া সম্প্রদায়ের জন্য প্রাণের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি নিলেন এবং ফিরে আসলেন। [৩] তার মধ্যে যদি সামান্যতম মানবতা থাকত তবে মানবতার খাতিরে সেই লক্ষ লক্ষ নাগরিকের প্রাণের নিরাপত্তার গ্যারান্টি নিতেন যাদের এই রাজনৈতিক টানাপোড়েনের সাথে কোনো সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু তিনি তো নিজেই এই সংকল্পে অটল ছিলেন যে তার সম্প্রদায় ছাড়া যত মানুষই মারা যাক না কেন তা কমই হবে।

ইবনে আলকামি ফিরে এসে খলিফাকে আশ্বস্ত করলেন যে ভয় পাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। ফলে যুদ্ধ বন্ধ করে দেওয়া হলো। শহরের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হলো এবং প্রাচীরগুলো তাতারী সৈন্যদের হাতে তুলে দেওয়া হলো। [৪]

নিষ্ফল কূটনৈতিক প্রতিনিধি দল:

খলিফার পক্ষ থেকে ফখর উদ্দিন দামঘানি এবং ইবনে দরনুশ কিছু উপহার নিয়ে হালাকু খানের কাছে গেলেন। উপহার নির্বাচনের ক্ষেত্রে কৃপণতা করা হয়েছিল কারণ খলিফাকে অযোগ্য উপদেষ্টারা এই বুঝিয়েছিলেন যে আপনি যদি মূল্যবান উপহার পাঠান তবে তা হালাকু খানকে ভয় পাওয়ার লক্ষণ হিসেবে গণ্য হবে, ফলে সে আরও সাহসী হয়ে উঠবে। যদিও বাস্তব পরিস্থিতি এই যুক্তির সাথে মোটেও মিলছিল না। ফলে এমন নিম্নমানের উপহার দেখে হালাকু খান নরম হওয়ার পরিবর্তে উল্টো আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। এই ঘটনা শুনে পরের দিন ২৯ মহরম খলিফা মূল্যবান উপহারসহ দ্বিতীয় প্রতিনিধি দল পাঠালেন কিন্তু হালাকু খান এতটাই বিগড়ে গিয়েছিলেন যে তিনি উপহারগুলোর দিকে ফিরেও তাকালেন না। [৫]

শাহজাদা আবু বকরের অভ্যর্থনা। মুসলিম অফিসার ও সৈন্যদের হত্যাকাণ্ড:

ইবনে আলকামি এই পরিস্থিতিতে খলিফাকে পরামর্শ দিলেন যে তিনি যেন তার বড় ছেলে আবু বকরকে হালাকু খানের কাছে পাঠান যাতে হালাকু খানের মনোভাব সঠিকভাবে জানা যায়। সেই সাথে ইবনে আলকামি হালাকু খানকে গোপনে বার্তা পাঠালেন:

[১] তারিখ হাবিবুস সিয়্যার, গিয়াস উদ্দিন মীর খোয়ান্দ শিরাজি: ২/৩৪০

[২] নুজহাতুল আনাম ফি তারিখিল ইসলাম, ইবনে দুকমাক সালাহ উদ্দিন, পৃ. ৩৩০; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৬৬৬ হিজরি

[৩] আল-ইবার ফি খবর মান গবার: ৩/৩৭৮, ত. আল-ইলমিয়াহ; তাবাকাতুশ শাফিইয়াহ আল-কুবরা: ৮/২৭১

[৪] জামিউত তাওয়ারিখ (আরবি): ২য় খণ্ড, ১ম অংশ: পৃ. ২৮৯... ঘটনার গতিপ্রকৃতি থেকে বোঝা যায় যে এটি ২৮ মহরমের ঘটনা।

[৫] জামিউত তাওয়ারিখ (আরবি), রশিদ উদ্দিন ফজলুল্লাহ: ২য় খণ্ড, ১ম অংশ: পৃ. ২৮৯, ত. দারু ইহয়াইল কুতুবিল আরাবিয়াহ মিসর

“শাহজাদা আবু বকরকে যেন যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন করা হয়, যাতে খলিফা আপনার ওপর আস্থা স্থাপন করেন এবং আমাদের উদ্দেশ্য সফল হয়।” [১]

৩০শে মহরম খলিফা তাঁর বড় ছেলেকে ইবনে আলকামির সাথে হালাকু খানের দরবারে পাঠালেন। [২]

হালাকু খান ইবনে আলকামির পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁর অসাধারণ আতিথেয়তা করলেন। পুরো সেনাবাহিনী তাঁকে স্বাগত জানাতে বেরিয়ে এল। হালাকু নিজে অভ্যর্থনার জন্য চল্লিশ কদম এগিয়ে এলেন এবং তাঁকে সাথে নিয়ে গিয়ে আসনে বসালেন। তিনি শাহজাদার সাথে অত্যন্ত নম্রভাবে কথা বললেন এবং প্রতারণা ও চাতুর্যের আশ্রয় নিয়ে বললেন:

“আমি তো খলিফার খেদমত করার জন্যই উপস্থিত হয়েছি। আমি জানতে চেয়েছিলাম যে মুসলমানদের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা কে, তখন আমাকে জানানো হলো যে তিনি হলেন খলিফাতুল মুসলিমিন। আমি এখানে এসেছি যাতে খলিফার হাতে ইসলাম গ্রহণ করতে পারি।”

শাহজাদা আবু বকর অত্যন্ত প্রভাবিত হলেন। তিনি ফিরে গিয়ে খলিফাকে সব ঘটনা জানালেন। তাতার বাহিনী যেভাবে হত্যা ও লুণ্ঠন চালিয়ে আসছিল এবং যেভাবে নির্মমভাবে শহর অবরোধ করে রেখেছিল, তা দেখে হালাকু খানের কথায় বিশ্বাস করা ছিল বোকামি। কিন্তু শাহজাদার প্রতি যে আতিথেয়তা দেখানো হয়েছিল, তা হতাশায় নিমজ্জিত খলিফাকেও ভুল ধারণায় ফেলে দিল। সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা খলিফাকে অনেক বোঝালেন যে শত্রুর ওপর যেন বিশ্বাস না করা হয়, কিন্তু তাঁদের সেই আহ্বান অরণ্যে রোদনে পরিণত হলো। [৩]

১লা সফর বৃহস্পতিবার বাগদাদের সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া হলো যেন তারা আমিরদের সাথে হালাকু খানের দরবারে উপস্থিত হয়। আমির মুজাহিদ উদ্দিন দুওয়াইদার এবং সুলাইমান শাহসহ সমস্ত আমির, কর্মকর্তা ও সৈন্যরা সেখানে পৌঁছালেন এবং তাঁদের সবাইকে হত্যা করা হলো। [৪]

হালাকু খানের দরবারে খলিফা:

মুস্তাসিম দেখতে পাচ্ছিলেন যে এখন তাঁর হাতে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। চারদিকে শুধু হতাশা আর হতাশা। তিনি আবারও ইবনে আলকামির কাছে পরামর্শ চাইলেন। সে ধূর্ততা ও নিমকহারামির চরম সীমা অতিক্রম করে বলল:

“হালাকু খান আপনার সাথে সদয় আচরণ করতে প্রস্তুত যে তিনি তাঁর মেয়ের বিয়ে আপনার সাহেবজাদা আবু বকরের সাথে দিতে চান। তাঁর বক্তব্য হলো, তিনি আপনাকে বাগদাদের খলিফা হিসেবে বহাল রাখবেন। বাগদাদের জন্য তাঁর অভিভাবকত্ব ঠিক তেমনই হবে যেমনটি সেলজুক সুলতানদের সময় ছিল। অতএব, আপনার উচিত পরিবার-পরিজনসহ তাঁর কাছে যাওয়া।”

মুস্তাসিম বিল্লাহ চরম নিবুদ্ধিতার পরিচয় দিয়ে এই দুর্ভাগার কথাটিও মেনে নিলেন। [৫]

৪ঠা সফর মুস্তাসিম তাঁর পরিবার-পরিজন এবং সালতানাতের আমিরদের সাথে নিয়ে শহর থেকে বেরিয়ে হালাকু খানের শিবিরের দিকে রওনা হলেন। [৬] ইবনে আলকামি শহরের সাতশ জন উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন সুন্নি আলেম, ফকিহ এবং সুফিদেরও এই বলে সাথে পাঠিয়ে দিলেন যে শাহজাদার...

[১] তাবাকাত-ই নাসিরি, কাজি মিনহাজুস সিরাজ জুযজানি: ২/১৯৫, কাবুল সংস্করণ।

[২] জামিউত তাওয়ারিখ (আরবি), রশিদ উদ্দিন ফজলুল্লাহ: ৩য় খণ্ড, ১ম অংশ: পৃ. ২৮৯, দারু ইহয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ, মিশর।

[৩] তাবাকাত-ই নাসিরি: ২/১৯৫, ১৯৬।

[৪] জামিউত তাওয়ারিখ (আরবি), ৩য় খণ্ড, ১ম অংশ: পৃ. ২৮৯।

[৫] জাইলু মিরাতয যামান লিল ইউনি: ১/৮৮; আল-ইবার ফি খাবারি মান গাবার: ৩/২৪৮; তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ আল-কুবরা: ৮/২৭১।

[৬] তারিখ-ই হাবিবুস সয়ার, গিয়াস উদ্দিন মীর খোয়ান্দ শিরাজি: ৩/৩৩০।

“নিকাহে আপনাদের সবার অংশগ্রহণ জরুরি।” [১]

এই লোকেরা হালাকু খানের ভয়াবহ ছাউনিতে পৌঁছাল যেখানে সৈন্যদের রক্তপিপাসু দৃষ্টি দেখেই মানুষ দিশেহারা হয়ে যেত। দিগন্ত বিস্তৃত শুধু তাঁবু আর তাঁবু ছিল। মাঝখানে হালাকু খানের লাল রেশমি সুউচ্চ তাঁবু দেখা যাচ্ছিল যার চারপাশে প্রদীপ ও ঝাড়বাতি রাতে দিনের পরিবেশ তৈরি করে দিত। [২] খলিফা হালাকু খানের দরবারে পৌঁছালে তার মেজাজ ছিল অন্যরকম। সে খলিফা, তার দুই ছেলে: আবু বকর ও আবদুর রহমান এবং তিনজন খাদেমকে বাদ দিয়ে বাকি সবার গর্দান উড়িয়ে দিল। [৩]

শেখ তাজউদ্দীন সুবকি রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন:

“আমিরুল মুমিনীন নিজে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের একটি প্রতিনিধি দলের সাথে হালাকু খানের দরজায় আসলেন। হালাকু খান খলিফাকে একটি তাঁবুতে রাখলেন এবং উজির ইবনে আলকামি শহরের উলামা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের দাওয়াত দিলেন যে, খলিফা ও হালাকু খানের সন্ধিনামায় সাক্ষী হওয়ার জন্য তারাও যেন আসেন। তারা আসলে তাদের গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হলো। এভাবে একের পর এক দলকে ডাকা হতো এবং শিরশ্ছেদ করা হতো। এরপর খলিফার বিশ্বস্ত আমির ও ঘনিষ্ঠজনদের ডাকা হলো। তাদেরও হত্যা করা হলো।” [৪]

শাহজাদা আবু বকর এই অবস্থা দেখে হালাকু খানকে বললেন:

“আমরা মনে করেছিলাম যে তুমি উচ্চ বংশীয়, আসল পুরুষ এবং বড় বাদশাহ। আমরা এজন্যই তোমার কথার ওপর আস্থা রেখেছিলাম। এখন জানা গেল যে তুমি বাদশাহও নও, পুরুষও নও। তুমি প্রতারণা করেছ যা পুরুষদের স্বভাব নয়, বাদশাহদেরও নয়।” [৫]

হালাকু খানের সামনে এসব বলা অনেক সাহসের ব্যাপার ছিল কিন্তু এখন বলা-কওয়া নিরর্থক ছিল।

শহরবাসীকে নিরস্ত্র করা হলো:

হালাকু খানের আশঙ্কা ছিল যে শহরের জনসংখ্যা অনেক বেশি, এটি দখল করার সময় শহরে লুকিয়ে থাকা সৈন্য ও সাধারণ মানুষের সাথে সংঘর্ষ অবশ্যই হবে এবং এই দ্বন্দ্ব হাজার হাজার তাতারী মারা যেতে পারে। তাই সে খলিফাকে বলল:

“তুমি বাগদাদবাসীকে নির্দেশ দাও যেন তারা অস্ত্র রেখে দেয় এবং দলে দলে বাইরে আসতে থাকে।”

খলিফা একজনকে পাঠিয়ে পুরো শহরে এই ঘোষণা করিয়ে দিলেন। যারা যুদ্ধের যোগ্য ছিল, তারা নিজেদের অস্ত্র ফেলে দিয়ে নিরস্ত্র হয়ে বাইরে আসতে লাগল। তাতারীরা তাদের সবাইকে ঘিরে ধরে হত্যা করতে লাগল। এভাবে শহরে প্রতিরোধের শেষ সম্ভাবনাও শেষ হয়ে গেল। [৬]

জামে মসজিদের শেষ খুতবা:

بغداد اب بالکل بے دست و پا تھا۔ ۲ صفر کو خلافت عباسیہ بغداد کا آخری جمعہ تھا۔
اس دن جامع مسجد میں خطیب

বাগদাদ এখন সম্পূর্ণ অসহায় ছিল। ২ সফর ছিল বাগদাদের আব্বাসীয় খিলাফতের শেষ জুমুআ। সেদিন জামে মসজিদে খতিব...

[১] আল-ইবার ফি খবর মান গবার: ৩/২৭৮, ত. আল-ইলমিয়াহ; তাবাকাতুশ শাফিইয়াহ আল-কুবরা লিস-সুবকি: ৮/২৭১

[২] তাবাকাতুশ শাফিইয়াহ আল-কুবরা লিস-সুবকি: ৮/২৬৮

[৩] তারিখ হাবিবুস সিয়র আজ গিয়াসুদ্দিন মীর খোয়ান্দ শিরাজি: ২/৩২০

[৪] তাবাকাতুশ শাফিইয়াহ আল-কুবরা লিস-সুবকি: ৮/২৭১

[৫] তাবাকাত-ই নাসিরি: ২/১৯৬, ১৯৭

[৬] জামিউত তাওয়ারিখ (আরবি) আজ রশিদ উদ্দিন ফজলুল্লাহ: খণ্ড ৩, অংশ ১: পৃ ২৯১

...খুতবা শুরু করেছিলেন এই শব্দগুলো দিয়ে:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَمَ بِالْمَوْتِ مُشِيدَ الْأَعْمَارِ ، وَحَكَمَ بِفَنَاءِ أَهْلِ هَذِهِ الدَّارِ

(সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি মৃত্যুর মাধ্যমে সুদৃঢ় অট্টালিকা নির্মাণকারীদের ধ্বংস করে দিয়েছেন এবং যিনি এই শহরের অধিবাসীদের বিলীন হয়ে যাওয়ার ফয়সালা করে দিয়েছেন।) [১]

বাগদাদে কিয়ামতে সগরা

৫ সফর তাতারীরা শহরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং চারদিকে ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। [২] অনেক নারী ও শিশু মাথায় কুরআন মাজিদ নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে এই আশায় যে হয়তো তারা নিরাপত্তা পাবে, কিন্তু তাতারী অশ্বারোহীরা তাদের পিষে ফেলে। [৩]

শহরের ছোট-বড়, সাধারণ-বিশিষ্ট, ধনী-দরিদ্র সবাইকেই হত্যা করা হয়। উলামা, খতিব, ক্বারী, ইমাম এবং মুয়াজ্জিনদের খুঁজে খুঁজে জবাই করা হয়। মুসতাসিম বিল্লাহর উস্তাদ শায়খুল ক্বুররা হযরত আবুল হাসান বিন নিয়ার রহ.-কে খিলাফত প্রাসাদে সবার সামনে ধরে তার গলায় খঞ্জর চালানো হয়। সূফী বুজুর্গ শায়খ আলী খাববাজ রহ.-কে হত্যা করে লাশ আবর্জনার স্তুপে ফেলে দেওয়া হয়, যেখানে কুকুর তার গোশত ছিঁড়ে খেতে থাকে। [৪]

অন্ধ হাম্বলী ফকিহ শায়খ ইয়াহইয়া বিন ইউসুফ সরীরী রহ., যাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে শাহাদাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন, তাতারীদের নির্মম তলোয়ারে শহীদ হন। তাঁর বয়স ছিল ৬৮ বছর। হালাকু খান তাঁকে কাছে ডেকে পাঠিয়েছিল কিন্তু তিনি অস্বীকার করেন। তাতারীরা তাঁকে গ্রেপ্তার করতে এলে তিনি পাথরের স্তুপ জমা করে রেখেছিলেন, তাদের ওপর পাথর নিক্ষেপ শুরু করেন যার ফলে বেশ কয়েকজন তাতারী আহত হয়। যখন শত্রু কাছে পৌঁছে যায়, তখন তিনি নিজের সুচালো লাঠি দিয়ে আক্রমণ করে একজনকে হত্যা করেন এবং লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে যান। [৫] সাদাত (সৈয়দ) পরিবারগুলোও এই ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হয়। তাদের মধ্যে অসংখ্য ব্যক্তি শহীদ হন এবং তাদের নারীদের সন্ত্রমহানি করা হয়। [৬]

হালাকু এবং খলিফা, খিলাফত প্রাসাদে:

হত্যা ও লুটতরাজের চার দিন অতিবাহিত হওয়ার পর শুক্রবার ৯ সফর হালাকু খান বাগদাদে প্রবেশ করে। সে খিলাফত প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হয়, যা এ পর্যন্ত হত্যাকাণ্ড ও লুটতরাজ থেকে মুক্ত রাখা হয়েছিল। [৭] সে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সরাসরি খলিফার দরবারে খাসে...

[১] তারিখুল ইসলাম লিয-যাহাবী: ৪/৪৭, ত. তাদমুরী; তারিখুল খুলাফা লিস-সুয়ুতী, পৃ. ৩৩৩, ত. নিয়ার

[২] আল-হাওয়াদিসুল জামিআহ, পৃ. ২৩৬, জামিউত তাওয়ারিখে এই তারিখ বুধবার ৭ সফর বলা হয়েছে। (আরবি সংস্করণ: খণ্ড ২, প্রথম অংশ: পৃ. ২৯১)

[৩] তারিখ ইবনে খালদুন: ৩/৬৬৩, ত. দারুল ফিকর [৪] তারিখুল ইসলাম লিয-যাহাবী: ২৫৬ হিজরী

[৫] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৭/১, ৩৮২, সন ৬৫৬ হিজরী, ত. দারু হাজার। একটি বর্ণনা অনুযায়ী তিনি নিজেই এই পরিণতির ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। (ঐ)

[৬] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: সন ২৫৬ হিজরী; আল-মানহালুস সাফী ওয়াল মুস্তাওফী বাদাল ওয়াফী লি-ইবনে তাগরী বারদী: ২/৮৬, ৮৭, ত. আল-হাইআতুল মিসরিয়্যাহ; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: সন ২৫৬ হিজরী; আল-মাকসাদুল আরশাদ ফী যিকরি আসহাবিল ইমাম আহমাদ লি-বুরহানুদ্দীন ইবনে মুফলিহ (মু. ৮৮৪ হিজরী): ৩/১২৪, ত. মাকতাবাতুর রুশদ রিয়াদ; তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাতিল কুবরা লিস-সুবকী: ৮/১৭১, ত. হাজার

[৭] ফাওয়াতুল ওয়াফিয়াত, লি-ইবনে শাকির সালাহুদ্দীন (মু. ৭৬৪ হিজরী) ৩ পৃ. ২৫৩: ত. দারু সাদির [৮] জামিউত তাওয়ারিখ (আরবি): খণ্ড ২, প্রথম অংশ: পৃ. ২৯১

...প্রবেশ করল যেন খেলাফতের মসনদকে উপহাস করছে। [১] সে সেখানেই সালতানাতের আমীর ও তাতারীদের একত্রিত করে দরবার সাজাল। তারপর সে খলিফাকেও সেখানে আনল, যিনি শহরের বাইরে হালো-আলিয়া নামক একটি পূর্ণাঙ্গ তাঁবুতে বন্দী ছিলেন। মুস্তাসিম বিল্লাহ যখন খানের কাছে পৌঁছালেন, তখন তার অবস্থা ছিল শোচনীয়, তিনি ঠাণ্ডাভাবে কাঁপছিলেন। খেলাফত প্রাসাদে আসার পথে যে রাস্তাগুলো তিনি অতিক্রম করেছিলেন, সেখানে চারদিকে লাশের স্তুপ এবং রক্তের ছিটেফোঁটা দেখার পর তার অবস্থা এমনই হওয়ার কথা ছিল।

হালাকু খান বিদ্রূপের সুরে মুস্তাসিমকে বলল:

“আমরা এখানে তোমার মেহমান আর তুমি মেজবান। আমাদের যোগ্য যা কিছু আছে, তা পেশ করো।”

আতঙ্কের কারণে মুস্তাসিম চিনতে পারছিলেন না কোন চাবি কোন তালার। অবশেষে তাতারীরা নিজেরাই কিছু আলমারির তাল ভেঙে দুই হাজার চমৎকার পোশাক, দশ হাজার আশরাফি (স্বর্ণমুদ্রা), মুক্তাখচিত অলঙ্কার এবং মণি-মুক্তা বের করে আনল। হালাকু অত্যন্ত উদাসীনতার সাথে এই সবকিছু তার আমীর এবং সেখানে উপস্থিত সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করে দিল। তারপর সে মুস্তাসিমকে বলল:

“মাটির উপরে যে ধন-সম্পদ আছে, তা আমাদের খাদেমদের। তুমি আমাদের সেই ধন-সম্পদের কথা বলো যা মাটির নিচে পোঁতা আছে।”

খলিফা জানালেন যে, খেলাফত প্রাসাদের প্রাঙ্গণে একটি ভূগর্ভস্থ চৌবাচ্চা আছে, যা সোনায় পরিপূর্ণ। তাতারীরা সেখানে গেল এবং মাটি খুঁড়ে চৌবাচ্চা পর্যন্ত পৌঁছে গেল। এটি খাঁটি লাল সোনার টুকরোয় পূর্ণ ছিল। প্রতিটি টুকরো ছিল একশ মিসকাল (প্রায় ৪৮৬ গ্রাম) ওজনের। [২]

খেলাফত প্রাসাদের নারী ও ধনভাণ্ডার:

এরপর হালাকু খান খেলাফত প্রাসাদের নারীদের উপস্থিত করার নির্দেশ দিল। তারা ছিল সাতশ নারী এবং প্রায় এক হাজার দাসী। মুস্তাসিম এই পর্যায়ে হালাকু খানের কাছে কাকুতি-মিনতি করে বললেন:

“আমার ওপর এতটুকু অনুগ্রহ করো যে, এই পর্দানশীন নারীদের প্রাণ ভিক্ষা দাও যাদেরকে চাঁদ এবং সূর্যও কখনো দেখেনি।”

হালাকু বলল: “এদের মধ্য থেকে একশ জনকে বেছে নাও।” মুস্তাসিম তাদের মধ্য থেকে নিকটাত্মীয় নারীদের আলাদা করে নিলেন। হালাকু খান রাতে শহরের বাইরে তার শিবিরে ফিরে গেল। পরদিন ১০ই সফর সে মালামাল বহনের লোকবল শহরে পাঠিয়ে দিল, যারা খেলাফত প্রাসাদ সম্পূর্ণ খালি করে সবকিছু হালাকু খানের তাঁবুতে পৌঁছে দেওয়ার কাজ শুরু করল। মোগলদের দরবারী ঐতিহাসিক রশীদ উদ্দিন ফজলুল্লাহ এর চিত্র এভাবে এঁকেছেন:

“খলিফারা পাঁচ শতাব্দী ধরে যা কিছু জমা করেছিলেন, তাতারীরা তা স্তুপ করে রাখল। মনে হচ্ছিল যেন পাহাড়ের ওপর পাহাড়।” [৩]

[১] তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ আল-কুবরা লিস-সুবকি: ৮/২৭১, তবা হিজর

[২] জামিউত তাওয়ারিখ (আরবি): ২য় খণ্ড, প্রথম অংশ: পৃষ্ঠা ২৯১, ২৯২; তারিখ হাবিবুস সিয়্যার: ৩/৯৫; রওজাতুস সাফা: ৫/৮২, তবা নওলকিশোর

[৩] জামিউত তাওয়ারিখ (আরবি) আজ রশীদ উদ্দিন ফজলুল্লাহ: ২য় খণ্ড, প্রথম অংশ: পৃষ্ঠা ২৯১, ২৯২

কসর-এ-খিলাফতে গণহত্যা:

কসর-এ-খিলাফতে অবস্থানরত বনু আব্বাসের গণহত্যা চালানো হয়। প্রত্যেক ব্যক্তিকে নাম ধরে ডাকা হতো যাতে সে পরিবারসহ উপস্থিত হয়। সে তার সন্তানাদি ও ঘরের নারীদের সাথে বের হতো। তাকে কসর-এ-খিলাফতের চত্বরে ছাগলের মতো জবাই করা হতো এবং নারীদের বন্দী করা হতো। কসর-এ-খিলাফতের হারাম থেকে, যেখানে অনুমতি ছাড়া কোনো পাখিও ডানা ঝাপটাতে পারত না, প্রায় এক হাজার পর্দানশীন নারীকে দাসী বানানো হয় এবং তাদের সম্ভ্রম লুণ্ঠন করা হয়। [১]

সম্মান ও লাঞ্ছনা মালিকুল মুলকের হাতে:

মুস্তাসিম এই সময়ে হালাকু খানের তাঁবুতে নজরবন্দি ছিলেন। [২] এই অবস্থায়ও তিনি সমস্ত নামাজ সময়মতো পাবন্দির সাথে আদায় করতেন। একদিন ফজরের নামাজের নিয়ত বাঁধলেন এবং কিরাত শুরু করলে মুখে এই আয়াত চলে এল:

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ
[৩] يَدُكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“আপনি বলুন, হে আল্লাহ! সমস্ত রাজত্বের মালিক, আপনি যাকে চান রাজত্ব দান করেন এবং যার থেকে চান রাজত্ব ছিনিয়ে নেন। আর আপনি যাকে চান সম্মানিত করেন এবং যাকে চান লাঞ্ছিত করেন। আপনার হাতেই রয়েছে সকল কল্যাণ। নিশ্চয়ই আপনি সবকিছুর ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।” [৩]

মুস্তাসিমের ওপর প্রচণ্ড কান্নার ভাব প্রবল হলো। নামাজ শেষ করে তিনি হাত তুলে দীর্ঘক্ষণ আল্লাহর দরবারে রোনাজারি করতে থাকলেন। এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য হলো, এই মোবারক আয়াতের এমন প্রকৃত ও বাস্তব দৃষ্টান্ত হয়তো আর কেউ হবে না। [৪]

মুস্তাসিমের জন্য খাদ্য হিসেবে হীরা-জহরত:

একদিন হালাকু খান নির্দেশ জারি করল যে, এখন থেকে খলিফাকে খাওয়ার জন্য কিছু দেওয়া হবে না। যখন কয়েক প্রহর অতিবাহিত হলো এবং ক্ষুধার তাড়নায় মুস্তাসিমের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ল, তখন তিনি প্রহরীদের কাছে খাবার চাইলেন। তারা হালাকু খানের কাছে এই আবেদন পৌঁছে দিল। হালাকু খান একটি থালায় সোনার কিছু টুকরো এবং কিছু হীরা-জহরত রেখে মুস্তাসিমের কাছে পাঠিয়ে দিল। মুস্তাসিম বলতে লাগলেন: “এই সোনা ও জহরত কি কেউ খেতে পারে?”

এর উত্তরে হালাকু খান বলে পাঠাল: “যে জিনিস তুমি খেতে পারো না, তা নিজের জীবন এবং হাজার হাজার মুসলমানের ওপর খরচ করলে না কেন? এই সোনা-রূপা দিয়ে তুমি কেন সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করলে না যাতে তোমার পৈতৃক সালতানাত শত্রুদের থেকে নিরাপদ থাকতে পারত।” মুস্তাসিম কোনো উত্তর দিতে পারলেন না। তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন এবং অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। [৫]

[১] তারিখুল ইসলাম লিয-যাহাবি: ২৫৬ হিজরি

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৮২/২৩, ত. আর-রিসালাহ

[৩] সূরা আল-ইমরান, আয়াত নম্বর: ২৬

[৪] তারিখ-এ-ওয়াসসাফ, আব্দুল্লাহ বিন ফজলুল্লাহ ওয়াসসাফ (মৃ. ৭৩০ হিজরি), পৃ. ৩৯, ত. বোম্বে

[৫] তারিখ-এ-হাবিবুস সিয়র, গিয়াসুদ্দিন মীর খোয়ান্দ শিরাজি: ৯৬/৩; তারিখ-এ-ওয়াসসাফ, পৃ. ৩০, ৩১, ত. বোম্বে

মুসতাসিম বিল্লাহর শেষ মুহূর্তগুলো:

এখন লাশের দুর্গন্ধের কারণে বাগদাদের ভেতরে বা বাইরে অবস্থান করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। ১৪ সফর ৬৫৬ হিজরিতে হালাকু খান তার লশকর বা সেনাবাহিনীর বড় একটি অংশ নিয়ে বাগদাদ থেকে প্রস্থান করেন এবং এক মঞ্জিল দূরে “জালাহিয়া” নামক স্থানে তাবু ফেলেন। [১]

সেই সন্ধ্যায় হালাকু মুসতাসিমকে তলব করলেন। মুসতাসিম বুঝতে পারলেন যে এখন শেষ সময়। তিনি গোসল করার অনুমতি চাইলেন। হালাকু খান শর্ত দিলেন যে গোসল করার সময় পাঁচজন তাতারী সৈন্য মাথার ওপর দাঁড়িয়ে থাকবে। মুসতাসিম বললেন: “আমি পাঁচজন জল্লাদের উপস্থিতিতে গোসল করতে যেতে পারি না।”

তারপর তিনি অত্যন্ত আক্ষেপের সাথে এই কবিতাটি পড়লেন:

وَأَصْبَحْنَا لَنَا دَارُ كَجَنَّتٍ وَفِرْدَوْسٍ وَأَمْسَيْنَا بِلَا دَارٍ كَأَنَّ لَمْ نَغْنِ بِالْأُمْسِ

“আমরা এমন অবস্থায় সকাল করেছিলাম যে আমরা এমন এক স্বদেশে ছিলাম যা জান্নাতুল ফেরদাউসের মতো ছিল। কিন্তু সন্ধ্যা হতেই আমরা এমন গৃহহীন হয়ে গেলাম যেন আমাদের কোনো আশ্রয়স্থলই ছিল না।” [২]

একটি পাখি সম্পর্কে খলিফার প্রতি হালাকুর জিজ্ঞাসাবাদ:

হালাকু খানের কাছে উপস্থিত হওয়ার দুই-তিন ঘণ্টা আগে খলিফা মুসতাসিম জোহরের সালাত পড়ে অবসর হয়েছিলেন, এমন সময় একটি সাদা পাখি এসে তাঁর তাবুর ওপর কিছুক্ষণ বসল এবং তারপর তাবুর চারপাশে চক্কর দিয়ে উড়ে গেল। হালাকু খানকে খলিফার প্রতিটি নড়াচড়ার খবর দেওয়া হতো। তাই সে খলিফাকে এ বিষয়েও জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল এবং বলল:

“এই পাখিটি কেমন ছিল যা তোমার কাছে এসেছিল?”

মুসতাসিম বিল্লাহ বললেন: “একটি পাখি ছিল যা তাবুর ওপর এসে বসেছিল এবং উড়ে গেছে।”

হালাকু রাগান্বিত হয়ে বলল: “তোমাকে প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে হবে। বলো এটি কোথা থেকে তোমার কাছে এসেছিল? সে তোমাকে কী বলেছিল? আর তুমি তাকে কী বলেছিলে?”

বেচারা খলিফা এই অযৌক্তিক জিজ্ঞাসাবাদের কী উত্তর দেবেন। অবশেষে হালাকু খান বলল:

“তোমরা জাদুকর। এই পাখিটি তোমার কাছে তোমার কোনো সাহায্যকারী পাঠিয়েছিল।” [৩]

খলিফাকে বাঁচানোর শেষ চেষ্টা যা মুনাফিক উজির এবং তুসী ব্যর্থ করে দিয়েছিল:

হালাকু খান তখনো দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন যে মুসতাসিমকে হত্যা করা হবে কি না। কিন্তু ইবনে আলকামি বলল:

“যতক্ষণ না আপনি খলিফাকে হত্যা করবেন, ইরাকের ওপর আপনার নিয়ন্ত্রণ মজবুত হবে না।” [৪]

[১] জামিউত তাওয়ারিখ (আরবি), রশীদ উদ্দিন ফজলুল্লাহ: খণ্ড ২, প্রথম অংশ: পৃষ্ঠা ২৯৩, ত. দার ইহয়াউল কুতুবিল আরবিয়াহ মিসর।

[২] জামিউত তাওয়ারিখ (আরবি): খণ্ড ২, প্রথম অংশ: পৃষ্ঠা ২৯০, ২৯৩।

[৩] নুযহাতুল আনাম ফি তারিখিল ইসলাম, ইবনে দুকমাক সারিমুদ্দিন (মৃ. ৮০৯ হি.), পৃষ্ঠা ২৩৮, ২৩৯, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়াহ বৈরুত, ত. ১৯৯৯ খ্রি।

[৪] সিয়রু আলামিন নুবালা: ২৩ / ১৮৩ মুসতাসিম বিল্লাহর জীবনী, ত. আর-রিসালাহ।

হলাকু খানের দরবারের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু মুসলিম খলিফার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাদের মধ্যে একজন জ্যোতিষী হুসামুদ্দিনও ছিলেন, যিনি খলিফাকে এক মর্মান্তিক পরিণতি থেকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। তিনি হলাকু খানের কাছে বিনীতভাবে আরজ করলেন:

“যখনই কেউ খলিফার ওপর হাত বাড়িয়েছে, সে ধ্বংস হয়েছে। আপনি যদি আক্রমণ করেন তবে সূর্য ঢাকা পড়ে যাবে, বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাবে, তুফান ও ভূমিকম্প আসবে, ঘোড়াগুলো মারা যাবে, সৈন্যরা অসুস্থ হয়ে পড়বে এবং সবচাইতে বড় কথা হলো এই বছরই খাকান মারা যাবেন।”

নক্ষত্রের প্রভাবে বিশ্বাসী হলাকু খান দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গেলেন। সম্ভব ছিল যে তিনি খলিফাকে ছেড়ে দিতেন, কিন্তু জাতির গাদ্দার নাসিরুদ্দিন তুসি বাধা হয়ে দাঁড়াল। সে আশ্বস্ত করল যে এমন কিছুই হবে না।

হলাকু জিজ্ঞেস করল: “তাহলে শেষ পর্যন্ত কী হবে?” তুসি বলল: “খলিফার জায়গায় আপনার শাসন কায়েম হবে।”

হলাকু হুসামুদ্দিনকে তলব করে তার সাথে তুসির বিতর্ক করালেন। তুসি অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও অলঙ্কারপূর্ণ এক বক্তৃতা দিল যা হলাকু খানকে সন্তুষ্ট করার জন্য যথেষ্ট ছিল। তুসি তার বক্তৃতায় বলল:

“জাঁহাপনা! হযরত জাকারিয়া ও ইয়াহইয়ার মতো নবীদের হত্যায় কিছুই হয়নি। মুসলিম উম্মাহ একমত যে কত সাহাবী শহীদ হয়েছেন কিন্তু কোনো বিপর্যয় আসেনি। হুসামুদ্দিন যদি বলে যে এটি আব্বাসীয়দের বৈশিষ্ট্য, তবে দেখুন বনু আব্বাসের পূর্ববর্তী কত খলিফা নিহত হয়েছেন কিন্তু সূর্য বা চন্দ্রের গ্রহণ লাগেনি। তাহির বিন হুসাইন মামুনের আদেশে আব্বাসীয় খলিফা আমিনকে হত্যা করেছিলেন। খলিফা মুতাওয়াক্কিল আব্বাসীকে তার ছেলে ও আমীররা হত্যা করেছিল, মুনতাসির ও মুতাদিদকে তাদের অফিসার ও গোলামরা মেরে ফেলেছিল কিন্তু কোনো ভূমিকম্প বা তুফান আসেনি।” [১]

মুস্তাসিমের হত্যা:

হলাকু খানের ভয় দূর হয়ে গেল কিন্তু মঙ্গোলদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল যে রাজাদের রক্ত জমিনে পড়লে আসমানি বিপদ নাজিল হতে পারে। তাই তাদের প্রথা অনুযায়ী খলিফাকে এমনভাবে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হলো যাতে রক্ত জমিনে না পড়ে। [২]

যখন তাতারী সৈন্যরা মুস্তাসিমকে হত্যা করার জন্য এগিয়ে এল, তখন বনু আব্বাসের এই শেষ দুর্ভাগা খলিফা এমন এক যন্ত্রণাদায়ক চিৎকার দিলেন যে পৃথিবীর যদি হৃদয় থাকত তবে তা ফেটে যেত। [৩] ৪৬ বছর বয়সী মুস্তাসিমকে কার্পেটে মুড়িয়ে বস্তায় বন্দি করে ততক্ষণ পর্যন্ত লাঠি ও লাথি দিয়ে পেটানো হলো যতক্ষণ না তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল। [৪] তার কবরের নাম-নিশানা মুছে ফেলা হলো। তার ছেলে আবু বকরকেও হত্যা করা হলো। বড় ছেলে ২৫ বছর বয়সী আবুল আব্বাস আহমদ এবং মেজ ছেলে ২৩ বছর বয়সী আবদুর রহমানকেও মৃত্যুর সুখা পান করানো হলো।

[১] জামিউত তাওয়ারিখ (আরবি): খণ্ড ২, প্রথম অংশ: পৃষ্ঠা ২৭৯, ২৮০; আত-তারিখ হাবিবুস সিয়্যার, গিয়াসুদ্দিন মীর খোয়ান্দ শাহরাজি: ৩/১০৭। মীর খোয়ান্দ শাহরাজি এই ঘটনাটি বর্ণনা করে লিখেছেন যে, হলাকু খান হুসামুদ্দিনকে কয়েক বছর বন্দি করে রেখেছিলেন যাতে দেখতে পারেন তার ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয় কি না। যখন কিছুই ঘটল না, তখন মহররম ৬৬১ হিজরিতে তাকে হত্যা করা হলো। (তারিখ হাবিবুস সিয়্যার: ৩/১০৭)

[২] নিহায়াতুল আরাব লিন নুওয়াইরি: ৬৩/৩২৪, ত. দারুল কুতুব কায়রো।

[৩] তাবাকাতুশ শাফিয়্যাহ আল-কুবরা: ৮/২৭১, ত. হিজর।

[৪] নুযহাতুল আনাম ফি তারিখিল ইসলাম লি ইবনে দুকমাক, পৃষ্ঠা ২৩০; তাবাকাতুশ শাফিয়্যাহ আল-কুবরা: ৮/২৭১।

ছোট ছেলে মুবারককে বন্দি করা হলো। তিন কন্যা: খাদিজা, মরিয়ম এবং ফাতিমাকে বন্দি করা হলো। [১] এই হৃদয়বিদারক ঘটনাটি ১৪ সফর ৬৫৬ হিজরির সন্ধ্যায় ঘটেছিল। [২] ইম্না লিল্লাহি ওয়া ইম্না ইলাইহি রাজিউন।

খলিফার সাথে নিহত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে প্রখ্যাত ফকিহ ও ওয়ায়েজ, জামিয়া মুস্তানসিরিয়ার শিক্ষক, মাদ্রাসা আল-জাওজিয়ার প্রতিষ্ঠাতা ৭৬ বছর বয়সী শেখ মহিউদ্দিন ইউসুফ বিন আবদুর রহমান ইবনুল জাওজি রহমাতুল্লাহও ছিলেন। [৩] এরপর তাঁর তিন আলেম ও ফাজিল পুত্র: জামাল উদ্দিন, تاج الدين (তাজ উদ্দিন) এবং শরফ উদ্দিন রহমাতুল্লাহকেও একে একে শহীদ করা হয়। [৪]

বাগদাদে ধ্বংস ও বিপর্যয়:

হালাকু চলে যাওয়ার পরও বাগদাদে গণহত্যা অব্যাহত ছিল। অনেক মানুষ মসজিদ, খানকাহ এবং সরাইখানায় ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল, কিন্তু তাতারীরা দরজা ভেঙে বা তাতে আগুন ধরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে। মানুষ পালিয়ে ছাদে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাতারীরা উপরে উঠে তাদের তলোয়ারের আঘাতে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে, যার ফলে ছাদের নর্দমা দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হয়ে ড্রেনে গিয়ে পড়তে থাকে। অনেক মানুষ জীবন বাঁচাতে কুয়া, নালা, আবর্জনার স্তুপ, বন্ধ ঘর এবং ছাদে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাতারীরা শিকারি কুকুরের মতো খুঁজে খুঁজে তাদের ধ্বংস করতে থাকে। বন্ধ ঘর এবং বাড়িগুলোতে আগুন ধরিয়ে বাসিন্দাদের ভেতরেই কয়লা বানিয়ে দেওয়া হয়। [৫] বাগদাদের অলিগলিতে রক্তের নদী বইতে শুরু করে। [৬] চল্লিশ দিন পর্যন্ত হত্যা ও লুণ্ঠনের বাজার গরম ছিল। শহরের ২৫ লক্ষ বাসিন্দার মধ্যে নিহতের সংখ্যা আঠারো থেকে বিশ লক্ষ পর্যন্ত বলা হয়। [৭] এখানে বসবাসকারী ইহুদি, খ্রিস্টান, রাফেজি, ইবনে আলকামির মতো বিশ্বাসঘাতক এবং তাদের অনুসারী ব্যতীত আর কেউ আশ্রয় পায়নি। গণহত্যার আগে তাতারীরা অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের বাড়িতে পাহারাদার বসিয়ে দিয়েছিল। ফলে সেই নির্দিষ্ট মহল্লা, বাড়ি এবং ভবনগুলো ছাড়া বাকি পুরো শহর তলোয়ারের আঘাতে ধ্বংস হয়ে যায়। [৮] ইবনে আলকামির প্রচেষ্টা সত্ত্বেও রাফেজিরা গণহত্যা থেকে পুরোপুরি রক্ষা পায়নি। ‘গমের সাথে ঘুণও পিষ্ট হয়’—এই প্রবাদ অনুযায়ী তাদের হাজার হাজার মানুষ এই ভয়াবহ ঝড়ের কবলে পড়ে মারা যায়। [৯]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: বছর ৬৫৬ হিজরি; তাবাকাতে নাসিরি: ২ / ১৯৮; সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২৩ / ১৮৩; তাবাকাতুশ শাফিয়্যাহ আল-কুবরা: ৮ / ২৭১, ২৭২, ত হিজর

[২] জামিউত তাওয়ারিখ (আরবি) রশিদ উদ্দিন ফজলুল্লাহ রচিত: খণ্ড ২, প্রথম অংশ: পৃষ্ঠা ৩৯৩, ত দারু ইহয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ মিসর

[৩] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২৩ / ৩৭৩, ত আর-রিসালাহ

[৪] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: বছর ৬৫৬ হিজরি

[৫] রওজাতুস সাফা: ৫ / ৮২, ত নওলকিশোর

[৬] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: বছর ৬৫৬ হিজরি

[৭] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৬৫৬ হিজরি। এই সংখ্যাটি হালাকু খানের আদেশে লাশের গণনার ফলে সামনে এসেছিল। (আল-আসজাদুল মাসবুক লিল হাসানি, পৃষ্ঠা ৬৩১; তাবাকাতুশ শাফিয়্যাহ আল-কুবরা লিস সুবকি: ৮ / ২৭১, ত হিজর) তবে এ বিষয়ে অন্যান্য মতও রয়েছে। ইবনে দুকমাক (মৃত্যু ৮০৯ হিজরি) বর্ণনা করেছেন যে, নিহতের সংখ্যা ছিল ২৩ লক্ষ ত্রিশ হাজার। (নুজহাতুল আনাম ফি তারিখিল ইসলাম, পৃষ্ঠা ৩৪০) ইবনুল ফুওয়াতি লিখেছেন যে, নিহতের সংখ্যা আট লক্ষের বেশি ছিল, এই গণনায় কাদা-মাটিতে চাপা পড়া, সুড়ঙ্গ ও কুয়ায় দম বন্ধ হয়ে বা ক্ষুধা-তৃষ্ণা বা আতঙ্কে মারা যাওয়া ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত নয়। (আল-হাওয়াদিসুল জামিয়া, পৃষ্ঠা ২৩৭)

[৮] আল-হাওয়াদিসুল জামিয়া ওয়াত তাজারিবুন নাফিয়া লি ইবনিল ফুওয়াতি, পৃষ্ঠা ২৩৬, ত আল-ইলমিয়্যাহ

[৯] মাওয়ারিদুত লাতাফাহ ফি মান ওয়ালিয়াস সুলতানাতা ওয়াল খিলাফাহ, আল্লামা ইউসুফ বিন তাগরি বারদি রচিত: ১ / ২৩৫, ত দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, ধ্বংস ও মহামারি

হাফিজ ইবনে কাসীর রহ. বলেন:

“এই পুষ্পশোভিত শহর যা পুরো বিশ্বের সবচেয়ে জমজমাট শহর ছিল, তা সম্পূর্ণ জনশূন্য ও ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো। বাজার ও রাস্তাগুলোতে লাশের স্তুপ পাহাড়ের মতো দেখা যাচ্ছিল। বৃষ্টি হলে লাশগুলো বিকৃত হয়ে গেল। শহরে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ায় আবহাওয়া দূষিত হয়ে গেল। মহামারি ছড়িয়ে পড়ল যার প্রভাব সিরিয়া পর্যন্ত পৌঁছাল। এই বাতাস ও মহামারিতে প্রচুর মানুষ মারা গেল। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, ধ্বংস ও মহামারির রাজত্ব ছিল।” [১]

গ্রন্থাগারগুলো নদীতে নিক্ষেপ:

বাগদাদ শহর নয়, বরং ছাইয়ের স্তুপে পরিণত হয়েছিল। হালাকু খানের বর্বরোচিত আক্রমণের ফলে বাগদাদ খিলাফত সমূলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। সেই অগণিত দুর্লভ ও দুস্প্রাপ্য বই যা মাদ্রাসা ও গ্রন্থাগারগুলোর শোভা ছিল কিন্তু তাদের ধারকদের আমলহীনতার ওপর বিলাপ করছিল, তাতারীদের হাতে সেগুলো নদীতে নিক্ষেপ করা হলো। যখন সেগুলো দজলার রক্তরঙা পানিতে পড়ল, তখন সেগুলোর কালিতে অনেক দিন পর্যন্ত নদীর পানি কালো হয়ে ছিল। এই বইগুলো সংখ্যায় এত বেশি ছিল যে নদীতে জায়গায় জায়গায় সেগুলোর স্তুপ সেতুর মতো দেখা যাচ্ছিল, যার ওপর দিয়ে তাতারী পদাতিক ও অশ্বারোহীরা নদীর এপার-ওপার যাতায়াত করত। [২]

সাধারণ ক্ষমার ঘোষণার পর শহরের অবস্থা:

চল্লিশ দিন পর শহরে সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা করা হলো। তখন শত শত মানুষ যারা ভূগর্ভস্থ কক্ষ ও গোপন আশ্রয়স্থলে লুকিয়ে ছিল, তারা বাইরে বেরিয়ে এল। কিন্তু ছয় সপ্তাহের ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং ভয় ও আতঙ্কে তাদের অবস্থা এমন হয়েছিল যে প্রত্যেকেই কক্ষালে পরিণত হয়েছিল। স্ত্রী স্বামীকে, ভাই বোনকে এবং বাবা তার সন্তানদের চিনতে পারছিল না। বাইরে বের হতেই তারা সংক্রামক ব্যাধির শিকার হলো এবং তাদের অধিকাংশই পরপারে পাড়ি জমাল। [৩]

একজন ফকিহ-এর আত্মকথা:

বাগদাদের এই মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি থেকে বেঁচে যাওয়া ইতিহাস বর্ণনাকারী খুব কম ছিল, তাই এই ঘটনাকে আত্মকথার আকারে বর্ণনা করার রেওয়ায়েত বিরল। সৌভাগ্যবশত আমরা এমন একটি বর্ণনা পেয়েছি যা এই ট্র্যাজেডি থেকে বেঁচে যাওয়া একজন ভাগ্যবান ফকিহ জামাল উদ্দিন হাম্বলী রহ. বর্ণনা করেছেন, যিনি একজন আলেম ফখরুদ্দিন হাম্বলীর ছেলে ছিলেন। তিনি বলেন:

“হালাকু খান দুই লক্ষ সৈন্য নিয়ে এল, সে খলিফাকে তলব করল। খলিফার সাথে শহরের কাজী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ যাদের সংখ্যা সাতশ ছিল, তারা তার কাছে গেলেন। তাদের সবাইকে (হালাকুর কাছে উপস্থিত হওয়া থেকে) থামিয়ে দেওয়া হলো। খলিফাকে এবং সতেরো জন ব্যক্তিকে তলব করা হলো যাদের মধ্যে আমার পিতা (ফখরুদ্দিন আবদুল্লাহ বিন আলী বিন মনসুর বিন রতলীন হাম্বলী)-ও ছিলেন।”

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৭/৩৬২

[২] সিমতুন নুজুমিল আওয়ালি ফি আনবাউল আওয়াইল ওয়াত তাওয়ালি লিল ইসামি আল-মাক্বি: ৩/৫১৯, ত. আল-ইলমিয়াহ

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: সন ৬৫৬ হিজরি

(সাতশ জনের মধ্যে) বাকি সবার গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হলো, আর খলিফাকে একটি তাঁবুতে এবং সেই সতেরো জন ব্যক্তিকে একটি আলাদা তাঁবুতে রাখা হলো। আমার পিতা বলতেন যে, রাতের বেলা খলিফা আমাদের তাঁবুতে এসে বলতেন: আমার জন্য দোয়া করো। একদিন খলিফার তাঁবুর ওপর একটি পাখি এসে বসল। হালাকু খলিফাকে ডেকে পাঠাল এবং জিজ্ঞেস করল: “এই পাখিটি কী করতে এসেছিল? সে তোমাকে কী বলছিল?” [১]

তারপর হালাকু খানের সাথে খলিফার কথোপকথন হলো। এরপর সে খলিফা এবং তার পুত্র আবু বকরের ব্যাপারে আদেশ দিল। তাদের প্রহার করা হলো যতক্ষণ না তারা উভয়ে মারা গেলেন। এরপর তাতারীরা সতেরো জন ব্যক্তিকে “তীর” দিয়ে মুক্ত করে দিল। [২]

তাদের মধ্য থেকে দুইজন ব্যক্তি নিহত হলো। [৩] বাকিরা যখন নিজেদের ঘরে পৌঁছাল, তখন দেখল যে তাদের ঘরবাড়ি পুরোপুরি ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে গেছে। আমি “মুগিসিয়া” [৪] -তে আমার পিতার কাছে পৌঁছালাম। তিনি তার বাকি সঙ্গীদের সাথে ছিলেন। (আমার দুর্দশার কারণে) তাদের কেউ আমাকে চিনতে পারল না। তারা বলতে লাগল: “কী কাজ?” আমি বললাম: “আমি ফখরুদ্দিন ইবনে রতলিনের সাথে দেখা করতে চাই। আমি তাকে চিনি।” আমার পিতা আমার দিকে ফিরলেন এবং বলতে লাগলেন: “তোমার তার সাথে কী কাজ?” আমি (তখনও আমার পিতাকে চিনতে পারিনি এবং) বললাম: “আমি তার ছেলে।” তখন তিনি আমাকে (মনোযোগ দিয়ে) দেখলেন এবং যখন চিনতে পারলেন তখন কাঁদতে লাগলেন। আমার কাছে কিছু তিলের দানা ছিল, সেগুলো আমি তাকে দিয়ে দিলাম। [৫]

অনুমান করা যায় যে, যখন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এই অবস্থা ছিল, তখন সাধারণ জনগণের ওপর কী না অতিবাহিত হয়েছে।

বাগদাদ তাতারীদের কবলে:

তাতারীদের শাসনামলে এখন বাগদাদের অবশিষ্ট জনসংখ্যার অবস্থা মৃতদের চেয়েও খারাপ ছিল। আল্লামা তাজউদ্দীন সুবকী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই কবরস্থানের চেয়েও অধম শহরের অবস্থা এভাবে লিখেছেন:

“ধনভাণ্ডার বের করার জন্য শহরের ঘরবাড়ি খুঁড়ে ফেলা হলো, তাতারীরা কোনো ঘরে ঢুকে খনন করে সেখান থেকে গুপ্তধন বের করে নিত, অথচ ঘরের মালিক কসম খেয়ে বলত যে সে বহু বছর ধরে এখানে বসবাস করছে এবং সে কোনো গুপ্তধনের কথা জানে না। শহরের খ্রিষ্টানদের আদেশ দেওয়া হলো যেন তারা প্রকাশ্যে মদ পান করে এবং শূকরের মাংস খায়। মুসলমানদের রমজান মাসে এখানকার খ্রিষ্টানদের সাথে শরিক হয়ে মদ পান করতে, শূকরের মাংস খেতে এবং রোজা ভাঙতে বাধ্য করা হলো। মসজিদগুলোতে মদ...”

[১] এই কথোপকথনের উল্লেখ ঐতিহাসিকদের মধ্যে কেবল ইবনে দুকমাক সারিমুদ্দিন তার কিতাব “নুজহাতুল আনাম ফি তারিখিল ইসলাম”-এ করেছেন। তার উদ্ধৃতিতে এই কথোপকথন পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে আরও বিস্তারিতভাবে অতিক্রান্ত হয়েছে।

[২] সম্ভবত এগুলো বিশেষ ধরনের তীর ছিল যা নিরাপত্তার চিহ্ন হিসেবে তাদের দেওয়া হয়েছিল।

[৩] সম্ভবত পথে ডাকাতদের লুটপাটের কারণে এই লোকগুলো নিহত হয়েছিল।

[৪] মুগিসিয়া বাগদাদ থেকে প্রায় দেড়শ কিলোমিটার দূরে কুফার উপকণ্ঠের একটি জনপদ। জামালুদ্দিন তার পিতার ঠিকানা জিজ্ঞেস করতে করতে সেখানে পৌঁছে গিয়ে থাকবেন।

[৫] সিয়্যারু আলামিন নুবালা: ২৩/১৮৩, ত. আর-রিসালাহ

ঢেলে দেওয়া হয়েছিল এবং আজানের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। এটি সেই বাগদাদ যা আবাদের পর থেকে কখনো দারুল কুফর হয়নি। পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে এমন ট্র্যাজেডি কখনো ঘটেনি। [১]

ইবনুল ফুওয়াতী লিখেছেন:

“যারা হত্যাকাণ্ড থেকে বেঁচে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে লাশের দুর্গন্ধ শৌঁকা বা দূষিত পানি পান করার কারণে মহামারি ছড়িয়ে পড়েছিল। মানুষ দুর্গন্ধ এবং মাছির প্রভাব থেকে বাঁচতে প্রচুর পরিমাণে পেঁয়াজ শুকত, কারণ মাছির আকাশ ছেয়ে ফেলেছিল এবং তারা খাবার ও পানীয়ের ওপর বসে সেগুলো নষ্ট করে দিত। হিল্লাহ, সিব এবং কুফার মানুষ বাগদাদে খাদ্যসামগ্রী নিয়ে আসত। মানুষ এতে উপকৃত হতো। তারা এর বিনিময়ে মূল্যবান বইপত্র এবং পিতলের পাত্র নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করে দিত।” [২]

নুত্তাহ:

বনু সুফিয়ানের প্রথম খলিফা ছিলেন হযরত মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান এবং শেষ খলিফা মুয়াবিয়া বিন ইয়াজিদ। বনু মারওয়ানের প্রথম শাসকের নাম ছিল মারওয়ান বিন আল-হাকাম এবং শেষ শাসকের নাম মারওয়ান বিন মুহাম্মদ। বনু আব্বাসের প্রথম শাসক ছিলেন আবদুল্লাহ আস-সাফফাহ এবং শেষ শাসক আবদুল্লাহ আল-মুসতাসিম। বনু উবাইদের প্রথম শাসক ছিলেন আবদুল্লাহ আল-মাহদী এবং শেষ শাসক আবদুল্লাহ আল-আদিদ। [৩]

ইবনুল আলকামির পরিণতি:

ইবনুল আলকামির বিশ্বাস ছিল যে, আব্বাসীয় খিলাফতের পতনের পর হালাকু খান তাকে নিজের হিতাকাঙ্ক্ষী মনে করে বাগদাদের শাসনভার তার হাতে তুলে দেবেন। কিন্তু হালাকু খান তাকে কোনো পাত্তাই দেননি এবং ইবনে ইমরান নামক এক সাধারণ কর্মকর্তাকে বাগদাদের শাসক নিযুক্ত করেন। [৪]

ইবনুল আলকামির উদ্দেশ্য ছিল বাগদাদে আহলে সুন্নাতের মসজিদ, মাদ্রাসা এবং খানকাহগুলো জনশূন্য হয়ে যাক, আর রাফেজিদের কেন্দ্রগুলো আবাদ থাকুক। সে এও সংকল্প করেছিল যে, বাগদাদে রাফেজিদের একটি বিশাল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণ করবে যাতে সেখান থেকে রাফেজি চিন্তাধারা ও আকিদার ব্যাপক প্রচার হতে পারে। কিন্তু তার এই স্বপ্ন অপূর্ণই থেকে যায়। [৫] উল্টো বাগদাদে রাফেজিদের অনেক উপাসনালয় নাম-নিশানহীন হয়ে যায়। শিয়া ঐতিহাসিক মীর খোয়ান্দ লিখেছেন যে, বাগদাদ লুণ্ঠনের সময় তাতারীদের হাতে কিছু বারো ইমামি (ইসনা আশারিয়া) ইমামের মাজারও অগ্নিদগ্ধ হয়েছিল। [৬]

আল্লামা তাজউদ্দীন সুবকী লিখেছেন:

“ইবনুল আলকামি যে আশা করেছিল তা পূরণ হয়নি। সে তখন অনুতপ্ত হলো যখন অনুতাপের কোনো ফায়দা ছিল না। বর্ণিত আছে যে, একবার তার কাছে (তার পরিবারের পক্ষ থেকে) যব চাওয়া হলো। সে একটি ঘোড়ায় চড়ে বাইরে বের হলো যাতে কিছু...”

[১] তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাতিল কুবরা লিস-সুবকী: ৮/ ২৭১, ২৭২, ২৭৩ ত হিজর।

[২] আল-হাওয়াদিসুল জামিআহ ওয়াত-তাজারিবুন নাফিআহ লি-ইবনিল ফুওয়াতী, পৃ. ২৩৩, ত আল-ইলমিয়াহ... মনে রাখা প্রয়োজন যে, ইবনুল ফুওয়াতী (মৃ. ৭২৩ হি.) হাম্বলি মুহাদ্দিস ও সাহিত্যিক ছিলেন। বাগদাদ পতনের সময় তিনি নিজেও বন্দি হয়েছিলেন এবং পরে নাসিরুদ্দীন তুসীর সুপারিশে মুক্তি পেয়েছিলেন। (ফাওয়াতুল ওয়াফায়াত: ২/ ৩১৯; তাবাকাতুন নাসায়ীন, পৃ. ১৩৭, ১৩৮)।

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৭/ ৩৬৭, ৩৬৮ ত দার হিজর।

[৪] তারিখ-ই-হাবিবুস সিয়র আজ গিয়াসুদ্দীন মীর খোয়ান্দ শিরাজি: ৩/ ৯৬।

[৫] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৭/ ৩৬২।

[৬] রওজাতুস সাফা: ৫/ ৮২, মাতবুআ নওল কিশোর।

জমা করে, তো (তাকে দেখে) কেউ তাকে গালি দিতে লাগল, কেউ তার হাত ধরে টানতে লাগল এবং কেউ তাকে চড় মারতে লাগল। অথচ এর আগে সুলতানরা এসে তার চৌকাঠে চুমু খেত এবং লশকর দিন-রাত তার খেদমতে থাকত। একবার এক মহিলা ঘরের জানালা থেকে তাকে (এই অবস্থায়) দেখে বলতে লাগল: “হে ইবনে আলকামি! আমিরা মুমিনীন (মুসতাসিম)-এর যুগে কি তোমার সওয়ারি এমন ছিল?” ইবনে আলকামি লজ্জায় নিখর ও স্তব্ধ হয়ে গেল। [১]

হাফিজ ইবনে কাসির রহমাতুল্লাহ বর্ণনা করেন যে, এক মহিলা তাকে দেখল যে সে একটি খচ্চরের ওপর সওয়ার এবং একজন ভৃত্য তা হাঁকাচ্ছে। মহিলাটি বিদ্রূপ করে বলল: “হে ইবনে আলকামি! বনু আব্বাস কি তোমার সাথে এমন আচরণ করত?” ইবনে আলকামি মুখ লুকিয়ে সেখান থেকে চলে গেল এবং অনুশোচনার কারণে ঘরে আবদ্ধ হয়ে গেল। [২]

গাদ্দারের সাথে তাতারীদের আচরণ:

তাতারীরা ইবনে আলকামির সাথে যে আচরণ করত, তা একটি ঘটনা থেকে আন্দাজ করা যায়। একবার সে নিজের মেহমানখানায় বসে ছিল, তখন একজন সাধারণ তাতারী তার ঘোড়াসহ ভেতরে ঢুকে পড়ল। ইবনে আলকামির সাহস ছিল না যে তাকে কিছু বলে। তাতারী যে কাজে এসেছিল, সে বিষয়ে ইবনে আলকামির সাথে কথা বলতে লাগল। এই সময়ে ঘোড়াটি অফিসের কার্পেটের ওপর প্রস্রাব করে দিল, যার ছিটে ইবনে আলকামির কাপড়েও লাগল। তখনও তার কিছু বলার সাহস হলো না।

সে ভেতরে ভেতরে অনুশোচনা ও লজ্জায় দগ্ধ হচ্ছিল কিন্তু ওপর দিয়ে এটা প্রকাশ করার চেষ্টা করত যে আমি একজন সফল মানুষ। একবার এক শিয়া তাকে জিজ্ঞেস করল: “জনাব আলী! আপনি যা কিছু করেছেন, তা কি শিয়াদের সম্মানের খাতিরে ছিল? কিন্তু এর ফলে তো অসংখ্য সাদাত কিরামও নিহত হয়েছেন এবং তাদের নারীদের ইজ্জত লুণ্ঠিত হয়েছে?” হতভাগা ইবনে আলকামি উত্তর দিল: “যখন আমার দাওয়াদার এবং তার সমমনা (সুন্নি) লোকেরা নিহত হলো, তখন আর এসব বিষয়ের পরোয়া করা উচিত নয়।” [৩]

এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, ইসলামের এই শত্রুর উদ্দেশ্য কখনোই সাদাত কিরামকে ক্ষমতায় আনা ছিল না, আহলে বাইতের প্রতি ভালোবাসা ছিল নিছক একটি ভণ্ডামি। আসল উদ্দেশ্য ছিল কেবল নিজের শত্রুতা মেটানো এবং এই অপবিত্র উদ্দেশ্য তার কাছে এতটাই কাম্য ছিল যে এর জন্য সাদাত কিরামের রক্ত ঝরে যাওয়া এমনকি তাদের নারীদের ইজ্জত চলে যাওয়ারও তার কোনো পরোয়া ছিল না।

ইবনে আলকামির ইবরতপূর্ণ মৃত্যু:

মুসতাসিমের হত্যার পর ইবনে আলকামি বেশিদিন বেঁচে থাকতে পারেনি। বাগদাদ ধ্বংসের এক বছর পর ৬৫৭ হিজরির শুরুর দিকে হালাকু খান তাকে তলব করল এবং তাকে অত্যন্ত দুশ্চরিত্র, কুচক্রী এবং অকৃতজ্ঞ মানুষ হিসেবে সাব্যস্ত করল যে তার পূর্বতন মনিব...

[১] তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ আল-কুবরা লিস-সুবকি: ৮/ ২৭৩, ২৭৪, তবা হিজর

[২] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৭/ ৩৮০, তবা দার হিজর

[৩] ফাওয়াতুল ওফায়াত লি ইবনে শাকির সালাহ উদ্দিন: ৩/ ২৫৩, তবা দার সাদির

...এর বিরুদ্ধে জঘন্যতম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। তাকে ভালোভাবে লাঞ্ছিত করার পর হালাকু খান শেষে বলল:

“যদি আমরা তোমাকে আমাদের সবকিছু দিয়ে দিই, তবুও তোমার থেকে কোনো কল্যাণের আশা করা যায় না। তুমি না তোমার প্রতি করা অনুগ্রহের হকের প্রতি লক্ষ্য রেখেছ, না তোমাকে দেওয়া পদের কোনো হক আদায় করেছ, আর না তুমি তোমার স্বধর্মীয় লোকদের হকের কোনো তোয়াক্কা করেছ। তুমি তাদের নারী ও সন্তানদের আমাদের দাসে পরিণত করেছ। অতএব, তুমি আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী কীভাবে হতে পারো? তোমার অনিষ্ট থেকে বাকি মুসলিমদের এবং তোমার গোপন ষড়যন্ত্র থেকে তাতারীদের রক্ষা করার জন্য তোমাকে হত্যা করা ছাড়া তোমার সাথে আমাদের করার মতো ভালো আর কিছু নেই।”

এরপর হালাকু খান তাকে জঘন্যতম নির্যাতন দিয়ে হত্যা করাল। [১]

মোদ্দাকথা, এই হতভাগা ‘খাসিরাদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ’ (দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত)-এর বাস্তব নমুনা হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। তার বয়স ছিল ৬৬ বছর। [২]

ইবনে আলকামী ক্ষমতা নিজের বংশে স্থানান্তর করতে চেয়েছিল, কিন্তু এই আকাঙ্ক্ষা আকাঙ্ক্ষাই রয়ে গেল। সে নিজেও এক শিক্ষণীয় দৃষ্টান্তে পরিণত হলো। তার মৃত্যুর কয়েক দিন আগে তার ভাই আলম উদ্দিনও মারা যায়। আর তার ছেলে মুহাম্মদ তার মৃত্যুর কয়েক দিন পর পরলোকগমন করে। এভাবে এই বংশের বীজ মুছে গেল। [৩]

নাসির তুসীর কিছু আলোচনা:

নাসিরুদ্দিন তুসীর আসল নাম ছিল মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন আল-হাসান। সে ৫৯৭ হিজরিতে কোমের নিকটবর্তী তুস জনপদে জন্মগ্রহণ করে। সে ছিল একজন কটুর রাফেয়ী। প্রথমে সে বাতেনী সন্ত্রাসীদের সেবা করত। এরপর হালাকু খানের কর্মচারী হয় এবং কাফেরদেরকে মুসলিম বিশ্বের ওপর বিজয় এনে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সে শরয়ী ইলমের কোনো সেবা করেনি বরং তা মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টায় লিপ্ত ছিল। তার পরামর্শে বাগদাদে আহলে সুন্নাতের সমস্ত কিতাব ভাণ্ডার নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। এভাবে কয়েক শতাব্দীর ইলমী ভাণ্ডার নষ্ট হয়ে যায়। এটি এমন এক ক্ষতি ছিল যা আজ পর্যন্ত পূরণ করা সম্ভব হয়নি। এরপর সে তাতারীদের পৃষ্ঠপোষকতায় মারাঘায় একটি জ্যোতির্বিজ্ঞান কেন্দ্র স্থাপন করে এবং দর্শন, যুক্তিবিদ্যা ও গণিত বিষয়ে বেশ কিছু কিতাব লিখে অনেক খ্যাতি অর্জন করে। তুসী ৬৭২ হিজরিতে মারা যায়। তার কবর ইরানের কাযমিয়া শহরে অবস্থিত। [৪]

নাসির তুসীর কালো অধ্যায়:

শিয়া ঐতিহাসিকরা তুসীকে ইসলামের বীর হিসেবে প্রসিদ্ধ করে রেখেছে। কিছু অনভিজ্ঞ আহলে সুন্নাতও তাকে মহান পণ্ডিত মনে করে, অথচ...

[১] নুযহাতুল আনাম ফি তারিখিল ইসলাম লি ইবনি দুকমাক সালাহুদ্দিন, পৃ. ৩৩০; আল-মানহালুস সাফী ওয়াল মুস্তাওফা বাদাল ওয়াফী: ৩/১২৮, মাওরিদুল লাতাফাহ ফি মান ওয়ালিয়াস সুলতানাহ ওয়াল খিলাফাহ: ১/২৩৫।

ইবনে আলকামীর পরিণতি সম্পর্কে দ্বিতীয় একটি বর্ণনা জানায় যে, বাগদাদের পতনের তিন মাস পর তাতারীদের অবমাননাকর আচরণে হতাশ হয়ে দুঃখ ও ক্ষোভের অবস্থায় ১লা জমাদিউল উলা ৬৫৬ হিজরিতে সে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছিল। (আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ: ৬৫৬ হিজরি, ইবনে আলকামীর জীবনী; তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ আল-কুবরা লিস সুবকী: ৮/২৭৩, ত হিজর)।

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ২৩/৩৬২, ইবনে আলকামীর জীবনী, ত আর-রিসালাহ।

[৩] সিয়রু আলামিন নুবালা: ২৩/৩৬২, ত আর-রিসালাহ।

[৪] তারিখুল ইসলাম লিয যাহাবী: সন ৬৭২ হিজরি।

তার কালো কারনামাগুলো তার ইলমি খিদমতের ওপর প্রবল। এই কারণেই আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. তার কঠোর সমালোচনা করতেন এবং আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রহ. তাকে ‘নাসিরুশ শিরক’ (শিরকের সাহায্যকারী) বলে অভিহিত করতেন। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রহ. তুসীর মুখোশ উন্মোচন করে লিখেন:

“যখন শিরক ও কুফরের সাহায্যকারী, নাস্তিকদের উজির নাসিরুশ শিরক তুসী—যে হলাকু খানের উজির ছিল—তার যুগ এল, তখন সে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী ও দ্বীনদার লোকদের থেকে অন্তরের প্রতিশোধ নিল। সে তাদেরকে তলোয়ারের ভেট বানাল, এমনকি নিজের নাস্তিক ভাইদেরকেও (বাতিনী) হত্যা করাল। নিজের প্রতিশোধ চরিতার্থ করার জন্য সে খলিফা, কাজী, ফকীহ এবং মুহাদ্দিসদের হত্যা করাল। দার্শনিক, জ্যোতিষী এবং জাদুকরদের বাঁচিয়ে রাখল। মাদ্রাসা, মসজিদ এবং এতিমখানার ওয়াকফ সম্পত্তি নিজের দখলে নিয়ে তার খাস মুরিদদের হাতে তুলে দিল। সে তার কিতাবসমূহে দুনিয়াকে অনাদি ও অনন্ত বলে অভিহিত করেছে, আখিরাতকে অস্বীকার করেছে এবং আল্লাহর ইলম, কুদরত এবং তাঁর সামী (সর্বশ্রোতা) ও বাসীর (সর্বদ্রষ্টা) হওয়ার গুণাবলিকে অস্বীকার করেছে। সে বলেছে যে, আল্লাহ এই দুনিয়াতেও নেই এবং এর বাইরেও তাঁর কোনো অস্তিত্ব নেই, আর আরশের ওপর এমন কোনো মাবুদ নেই যার ইবাদত করা যায়। সে নাস্তিকদের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরি করল এবং চেষ্টা করল যেন নাস্তিকদের ইমাম ইবনে সিনার কিতাব ‘আল-ইশারাত’কে কুরআনের মর্যাদা দেওয়া হয়। কিন্তু যখন তা সম্ভব হলো না, তখন সে বলল যে, ‘আল-ইশারাত’ হলো বিশিষ্টজনদের কুরআন আর সাধারণ মানুষের জন্য হলো ওই কুরআন। সে সালাত পরিবর্তন করে দিনে দুই ওয়াক্ত সালাত নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাও সম্ভব হয়নি। পরিশেষে সে জাদু শিখল এবং জাদুকর হয়ে মূর্তিপূজা করতে লাগল... সারকথা হলো, সে নিজে এবং তার অনুসারীরা কাফির ও নাস্তিক ছিল।” [১]

আল্লামা মুহিব্বুদ্দীন আল-খতিব রহ. তুসীর হাতে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধ্বংসের অবস্থা এভাবে বর্ণনা করেন:

“সে এই জেদ ধরল যে, ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের কিতাবগুলো দজলা নদীতে ডুবিয়ে দেওয়া হোক। যখন তা করা হলো, তখন নদীর পানি অনেক দিন ও রাত পর্যন্ত কিতাবগুলোর কালিতে কালো হয়ে প্রবাহিত হতে থাকল। এভাবে ইসলামী উত্তরাধিকার থেকে ইতিহাস, সাহিত্য, অভিধান, কবিতা ও হিকমতের এক বিশাল ভাণ্ডার নষ্ট হয়ে গেল। সেগুলোর সাথে শরয়ী জ্ঞান এবং প্রথম প্রজন্মের পূর্বসূরিদের (আসলাফ) সেই প্রাচীন কিতাবগুলোও ধ্বংস হলো যেগুলোর অনেকগুলো আজ পর্যন্ত অবশিষ্ট আছে এবং এই তামুদুনী (সাংস্কৃতিক) ট্র্যাজেডিতে সেগুলোর মতো আরও অনেক কিছু ধ্বংস হয়ে গেছে যার কোনো নজির নেই।” [২]

[১] ইগাসাতুল লাহফান মিন মাসায়িদিশ শয়তান: ৩/ ১০৩২, তাবা আলমুল ফাওয়াইদ।

[২] আল-খুতুতুল আরীজাহ লিল উসাসিল্লাতি কামা আলাইহা দ্বীনুশ শিয়াহ আল-ইমামিয়াহ আল-ইসনা আশারিয়াহ, পৃ. ৩২-৩৩, তাবা আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ।

রাফেজীদের নায়ক: সাধারণত ইরানি ঐতিহাসিকরা বাগদাদের পতনে নাসিরুদ্দীন তুসী এবং ইবনুল আলকামির সংশ্লিষ্টতার ওপর পর্দা ফেলার জন্য এই ঘটনাগুলোকে সুন্নি ঐতিহাসিকদের মিথ্যা গল্প বলে অভিহিত করেন। অথচ এই সত্যগুলো গত কয়েক শতাব্দীর শিয়া ঐতিহাসিকরাই একইভাবে বর্ণনা করে আসছেন এবং তারা স্পষ্টভাবে লিখেছেন যে, এসবই ইবনুল আলকামি ও তুসীর কীর্তি ছিল। শিয়াদের কিতাবসমূহ দ্রষ্টব্য:

(১) মাজলিসুল মুমিনীন, কাজী নুরুল্লাহ শুস্তারি: খণ্ড ২, পৃ. ২০৪, ২০৫, প্রকাশক কিতাব ফুরুশি ইসলামিয়া তেহরান।

(২) রওজাতুস সাফা, মীর খাওয়ান্দ: খণ্ড ৫/ ২৩৮, প্রকাশক ইনতিশারাতে ইলমি তেহরান; অথবা নওল কিশোর সংস্করণ: ৫/ ৮৩।

(৩) রওজাতুল জাম্মাত, মুহাম্মদ বাকির বিন জয়নুল আবেদিন খাওয়াসারি, পৃ. ৬৫, তাহকীক মুহাম্মদ আলী রওজাতি তেহরান।

নিকট অতীতের শিয়া আলেমরা যখন দেখলেন যে, বাগদাদের পতনের মতো ট্র্যাজেডিতে শিয়া নেতাদের পূর্ণ অংশগ্রহণের বিষয়টি অস্বীকার করা সম্ভব নয়, তখন তারা এই ধরনের অপকর্ম এবং আহলে সুন্নাতের গণহত্যাকে মহান জাতীয় খিদমতের মর্যাদা দিতে শুরু করলেন। আয়াতুল্লাহ খোমেনী তুসীর রাজনীতির প্রশংসা করে লিখেছেন: (বাকি অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠার ঢিকায়)

সপ্তম খণ্ড | তারিখ-এ-মিল্লাত-এ-মুসলিমা

বাগদাদ ট্র্যাজেডিতে মুসলিম বিশ্বে অস্থিরতা

বাগদাদ খিলাফত তার সমস্ত দুর্বলতা ও ত্রুটি সত্ত্বেও মুসলমানদের রাজনৈতিক ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে সমস্ত মুসলমান বনু আব্বাসকে অত্যন্ত সম্মান করত। তদুপরি, বাগদাদ লক্ষ লক্ষ মুসলমানের আবাসস্থল, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূতিকাগার, মসজিদ ও মাদ্রাসা, খানকাহ এবং গ্রন্থাগারের কেন্দ্র হওয়ার কারণে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক ছিল। তাই যখন বাগদাদে তাতারীদের আক্রমণের খবর মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল, তখন চারদিকে শোক ও অস্থিরতার ঢেউ বয়ে গেল। ওলামায়ে কেরাম বাগদাদবাসীর বিজয় এবং তাতারীদের পরাজয়ের জন্য দুআয়ে কুনুতে নাযিলা পাঠের ব্যবস্থা শুরু করলেন। এরপর যখন বাগদাদের ধ্বংসের খবর পৌঁছাল, তখন সমগ্র মুসলিম বিশ্ব ব্যথিত হয়ে উঠল এবং চারদিকে আহাজারি ও হাহাকার শুরু হলো।

তকিউদ্দীন ইসমাইল বিন আবিল ইয়াসর ব্যথিত ও অস্থির হয়ে বলেছিলেন:

لِسَائِلِ الدَّمْعِ عَنْ بَغْدَادَ أَخْبَارُ ... فَمَا وَقُوفُكَ وَالْأَحْبَابُ قَدْ سَارُوا

“অশ্রু বিসর্জনকারীর জন্য বাগদাদ থেকে অনেক খবর রয়েছে। তুমি কেন থেমে আছ অথচ বন্ধুরা চলে গেছে।”

عَلَا الصَّلِيبُ عَلَى أَعْلَى مَنَابِرِهَا ... وَقَامَ بِالْأَمْرِ مَنْ يُحْوِيهِ زُنَارُ

“বাগদাদের সর্বোচ্চ মিন্বরগুলোতে ক্রুশ বুলছে এবং শাসনের দায়িত্বে রয়েছে যুননার (খ্রিস্টানদের কোমরবন্ধ) পরিধানকারী।”

وَكَمْ حَرِيمٍ سَبَتْهُ التُّرْكُ غَاصِبَةً ... وَكَانَ مِنْ دُونِ ذَاكَ السِّتْرِ اسْتَارُ

“কত সতী-সাধবী নারীকে তাতারীরা জবরদস্তি অপহরণ করেছে, অথচ তাদের পর্দার ওপরও পর্দা থাকত।”

وَكَمْ حُدُودٍ أُقِيمَتْ مِنْ سِيُوفِهِمْ ... عَلَى الرِّقَابِ وَحُطَّتْ فِيهِ أَوْزَارُ

“এই কাফেরদের তলোয়ার দিয়ে গর্দান কেটে কত হৃদুদ (শাস্তি) কায়েম করা হয়েছে যার মাধ্যমে মানুষের গুনাহ মাফ হয়েছে।”

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার অবশিষ্ট টীকা:

“খাজা নাসির ধর্মের জন্য যে কাজগুলো করেছেন, সেই কাজগুলোই খাজা নাসিরকে ‘খাজা নাসির’ বানিয়েছে।”

(খাজা নাসির ধর্মের জন্য যে কীর্তিগুলো সম্পাদন করেছেন, সেগুলোর কারণেই খাজা নাসির, খাজা নাসির হয়েছেন।)

এছাড়াও আয়াতুল্লাহ খোমেনী এক জায়গায় লিখেছেন: “বাদশাহদের সাহচর্যের কারণে আমাদের কারো যদি তাকিয়া করার (নিজের আসল ধর্ম গোপন করার) প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তা ততক্ষণ পর্যন্ত জায়েজ নয় যতক্ষণ না জীবনের ঝুঁকি থাকে। হ্যাঁ, যদি কেউ এই বাহ্যিক সাহচর্যের মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রকৃত সাহায্য ও সহযোগিতার কাজ করে তবে তা জায়েজ, যেমনটি আলী বিন ইয়াকতিন এবং নাসিরুদ্দিন তুসী করেছিলেন। তাদের ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।” (আল-হুকুমাতুল ইসলামিয়া, পৃ. ২১২, ২১৩, ত. আল-মাকতাবাতুশ শামিলা)

স্মরণীয় যে, আলী বিন ইয়াকতিন একজন যিন্দিক ছিল যাকে রাফেযীরা তাদের বর্ণনাকারীদের মধ্যে গণ্য করে। সে আব্বাসী আন্দোলনের প্রাথমিক দাঈদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৬৭ হিজরিতে খলিফা হাদী আব্বাসী যখন যিন্দিকদের তদন্ত শুরু করেন, তখন সেও এর কবলে পড়ে এবং তাকে হত্যা করা হয়। (লিসানুল মিজান: ৪/৩০২, ৪৬৮)

একজন ইরানি লেখক আব্দুল ওয়াহিদ ওয়াফায়ী ইবনুল আলকামী এবং তুসীর এই জ্বলুমের প্রশংসা করে লিখেছেন:

“(এই পদ্ধতিতে বনু আব্বাসের ৫২৫ বছরের খিলাফত যা মুসলমানদের জন্য ফিতনা ও ফাসাদের কেন্দ্র ছিল, বিশেষ করে শিয়াদের জন্য, তা উৎখাত হলো।)”

ইকবাল ইয়াগবাহীও একই কথা লিখেছেন, দেখুন তার বই: ‘খোদাওয়ান্দে দানেশ ও সিয়াসাত খাজা নাসিরুদ্দিন তুসী’। (খাজা তুসী ইয়াদে রুহি ও আকিল, পৃ. ৯৫)

বর্তমান পৃষ্ঠার টীকা:

[১] যাইল মিরআতুয যামান: ১/৮৯, ত. দারুল কিতাব আল-ইসলামী কায়রো।

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

“আল্লাহ জানেন যে, আমাদের জাতিকে সেই নেয়ামতসমূহ গাফেল করে দিয়েছিল যা প্রচুর পরিমাণে ছিল।”

“তারা যখন গাফেল ছিল, তখন খোদায়ে জব্বারের পক্ষ থেকে তাদের অবকাশ দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর কুফরি লশকরদের এক নির্দয় সর্দার তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।”

“বনু আব্বাস সবাই বন্দী হয়ে গেল। এরপর আর কখনো ভোরের চেহারায় আলো উদ্ভাসিত হবে না।”

“তাদের পর মানুষের মাঝে আমার আর কিছুই ভালো লাগে না, কেবল সেই কথা ও ঘটনাবলী ছাড়া যা আমি বর্ণনা করতে থাকি।”

“দ্বীন ও দুনিয়ার কোনো মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা আর অবশিষ্ট নেই, যেহেতু সেই লোকগুলো চলে গেছে, বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং ধ্বংস হয়ে গেছে।”

“আমি তাদের ডাকলাম যখন বন্দীরা লাঞ্চিত ছিল এবং লুটেরা শত্রুরা তাদের রক্তপাতের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল।”

“তাদেরকে সেই মৃত্যুর দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল যা তাদের সামনে ছিল, তারা বলছিল: হে মাবুদ! এই লাঞ্ছনার চেয়ে তো আগুন (পুড়ে মরা) ভালো।”

“নবী ﷺ-এর বংশধর এবং আহলে ইলমগণ বন্দী হয়ে গেলেন। তবে কি মনে হয় যে, তাদের পর এই শহরগুলো কাউকে আশ্রয় দিতে পারবে?”

“আমার প্রত্যাশা ছিল না যে আমি বেঁচে থাকব আর তারা চলে যাবে। কিন্তু তাকদীর তা-ই করল যা আমি চাইনি। [১]”

শেখ সাদী শিরাজীর আরবি মার্সিয়া:

হযরত শেখ সাদী শিরাজী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, যিনি তাঁর যৌবনকালে বাগদাদের ওলামায়ে কেরামের নিকট থেকে ফয়েজ হাসিল করেছিলেন, এই দুর্ঘটনায় অস্থির হয়ে এমন এক বেদনাদায়ক মার্সিয়া রচনা করেছেন যা সেই যুগের সকল মুসলমানের হৃদয়ের অনুভূতির প্রতিনিধিত্বকারী বলে মনে হয়। শেখ এ বিষয়ে আরবি ও ফারসি উভয় ভাষায় মার্সিয়া রচনা করেছেন। আরবি মার্সিয়াটি হলো:

“বাগদাদের ধ্বংসের পর তার বাতাসের ঝাপটা যদি আমার কবরের ওপর দিয়ে বয়ে যেত (অর্থাৎ আমি যদি তখন জীবিত না থাকতাম)।”

“বনু আব্বাসের বন্দী হওয়ার সময়ের কথা জিজ্ঞেস করো না। এটি এমন বিষয় নয় যা বর্ণনার সীমানায় আসতে পারে।”

[১] তারিখুল ইসলাম লিয-যাহাবী: ৩৮/৩৮, ত. তাদমুরী; তারিখুল খুলাফা লিস-সুয়ুতী, পৃ. ৩৩৩, ত. নিযার।

“মৃত্যুর পেয়ালা এমনভাবে ঘুরছিল যেন (নিহত) বন্দীদের (ছিন্ন) মস্তকগুলো নেশায় লাফাচ্ছে।”

“মুস্তানসিরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়ালগুলো সেই প্রাজ্ঞ আলেমদের জন্য অঝোরে কাঁদছে যারা ছিল জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মূর্ত প্রতীক।”

“এগুলো কালের ট্র্যাজেডি। হায়! আমি যদি এগুলোর আগেই মারা যেতাম এবং আলেমদের ওপর মূর্খদের এই জুলুম না দেখতাম।”

“কোথায় সেই বনু আব্বাস যাদের নিয়ে কাল গর্ব করত? যারা ছিল পছন্দনীয় চরিত্র এবং উজ্জ্বল ললাটের অধিকারী।”

“মানুষের মাঝে তাদের আলোচনা একটি উপাখ্যানে পরিণত হয়েছে, এটি এমন এক উপাখ্যান যা কানকে বর্শার মতো রক্তাক্ত করে দেয়।”

“তারা সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে থাকল যে, মহানুভবতার খাতিরে সাহায্য করো! কিন্তু সেই চড়ুই পাখিকে কে সাহায্য করবে যা বাজপাখির নখরে বন্দি?”

“এমন সম্মানিত গোত্রের নারীদের মরুভূমির বুকে ছাগলের পালের মতো তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে যারা কখনো ধমক শুনতেও অভ্যস্ত ছিল না।”

“সেই কুমারীরা যারা কখনো পর্দার আড়াল থেকে বের হতো না, তাদের মুখ খোলা অবস্থায় বন্দী করা হয়েছে।” [১]

শেখ সাদীর ফারসি মার্সিয়া:

শেখ সাদী (রহ.) ফারসি ভাষায় যে মার্সিয়া লিখেছেন তা এই ভয়াবহ ঘটনার আরও বেদনাদায়ক চিত্র তুলে ধরে:

“আমিরুল মুমিনীন মুস্তাসিমের শাসন ক্ষমতা চলে যাওয়ায় আকাশ যদি জমিনে রক্তের বৃষ্টি বর্ষণ করে তবে তা যথার্থই হবে।”

“হে মুহাম্মদ (সা.)! কিয়ামতের দিন যদি আপনাকে মাটি থেকে উঠতে হয় তবে এখনই আত্মপ্রকাশ করুন এবং সৃষ্টির ওপর নেমে আসা এই কিয়ামত দেখে নিন।”

[১] কুল্লিয়াতে সাদী, পৃ. ১১৩৯ থেকে ১১৪২, ত. ইনতিশারাতে হার্মিস।

হারামের সুকোমল নারীদের কণ্ঠনালীর রক্ত দেউড়ি ছাড়িয়ে বাইরে বয়ে গেল এবং আমাদের হৃদয়ের রক্ত আস্তিন থেকে ঝরতে লাগল।

হায় আফসোস! কালের আবর্তন এবং দুনিয়ার এই পরিবর্তনের ওপর... কারও কল্পনাতেও ছিল না যে কী থেকে কী হয়ে যাবে।

যে এই সম্মানিত প্রাসাদের শান-শওকত দেখেছে, সে চোখ তুলে দেখুক (যে এই স্থানের কী দশা হয়েছে) যেখানে রোমের কায়সাররা ধূলি চুষন করত এবং চীনের খাকানরা মাটিতে বসে থাকত।

মুস্তফা ﷺ-এর চাচাতো ভাইদের রক্ত সেই মাটিতে ঝরে পড়ল... যেখানে বাদশাহরা কপাল ঠেকাত।

দজলা রক্তের এমন এক নদীতে পরিণত হয়েছে যে, যদি তা নিচু ভূমির দিকে প্রবাহিত হয় তবে বাতহার খেজুর বাগানের মাটিকে রক্ত দিয়ে মেখে দেবে।

ধৈর্য ধরো, কাল হাশরের ময়দানে দেখবে যে, এখানকার কবরে দাফনকৃত ব্যক্তির রক্তাক্ত চেহারায় পুনরুত্থিত হবে। [১]

কাফেরদের মধ্যে আনন্দের উৎসব:

একদিকে যখন এই বিলাপ ও আর্তনাদ চলছিল, অন্যদিকে তখন আনন্দের সানাই বাজানো হচ্ছিল। হালাকু খান বাগদাদের সমস্ত ধনভাণ্ডার লুণ্ঠন করে তার নতুন রাজধানী মারাঘায় স্থানান্তরিত করল। অনেক মূল্যবান মণি-মুক্তা খাকান মঙ্গু খানের কাছে মঙ্গোলিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হলো। মারাঘার বাইরে মঙ্গোলদের সেনাশিবিরে বাগদাদ বিজয়ের উৎসব পালিত হতে থাকল। দূর-দূরান্ত থেকে শাসক ও আমীররা এসে উপহার...

[১] কুল্লিয়াতে সাদী, পৃষ্ঠা ৯৮৩ থেকে ৯৮৫, তাবা ইনতিশারাতে হারমাস।

এবং খরাজ ও প্রশংসা পেশ করতে থাকল। পারস্য থেকে আতাবক আবু বকর বিন সাদ জাঙ্গি বিনীতভাবে উপস্থিত হলেন। সেলজুক রুমের শাসক ইজ্জুদ্দিনও নিজে উপস্থিত হয়ে খেদমত করলেন। [১]

খাজা নাসিরুদ্দিন তুসি এই সুযোগে মুসলমানদের লাঞ্ছনা ও ধ্বংস এবং কাফেরদের আধিপত্য দেখে দেখে খুব খুশি হচ্ছিলেন। তার মাথায় নিত্যনতুন চুটকি আসছিল এবং বিভিন্ন ধরনের মনগড়া গল্প শুনিতে তিনি পূর্ববর্তী সুন্নি বাদশাহদের অপমান করে হলাকু খানের কুফরি সরকারকে আল্লাহর রহমত হিসেবে অভিহিত করছিলেন। এরই মধ্যে তিনি বললেন:

“জালালুদ্দিন খাওয়ারিজম শাহ তাতারীদের কাছে পরাজিত হয়ে তাবরিজে আসেন। তার সৈন্যরা জনগণের ওপর জুলুম করত। যখন তার কাছে অভিযোগ করা হলো, তখন তিনি বলতে লাগলেন: আমরা এখন মুজাহিদ এবং শহরগুলো জয় করছি। শহরগুলোর ব্যবস্থাপনা করা আমাদের দায়িত্ব নয়, যখন আমরা শাসক হব, তখন ফরিয়াদীদের বিচার করব।”

এটি শুনে হলাকু খান গর্বের সাথে বললেন:

“আমরা তো আল্লাহর অনুগ্রহে শহরগুলোর বিজেতাও এবং ব্যবস্থাপকও। আমরা অবাধ্যদের সাথে যুদ্ধ করি এবং অনুগত প্রজাদের বিষয়াদি দেখাশোনাও করি। আমরা জালালুদ্দিনের মতো অক্ষম ও দুর্বল নই।” [২]

বদরুদ্দিন লুলুর হলাকু খানের দরবারে উপস্থিতি:

মসুলের শাসক বদরুদ্দিন লুলু তার ছেলে আস-সালিহ ইসমাইলকে অভিনন্দন জানাতে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু হলাকু খান তাকে খুব অপমান করলেন এবং বললেন: “তোমরা আমাদের বিজয়ের ব্যাপারে সন্দেহের শিকার ছিলে। তোমরা কখনো আমাদের দিকে পা বাড়াতে আবার কখনো পিছিয়ে যেতে এবং দেখতে চাইতে যে বিজয় কার নসিব হয়। যদি খলিফার বিজয় হতো, তবে তোমরা আজ তাকে অভিনন্দন জানাতে আসতে। তোমার বাবাকে বলে দিও যে, তার সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া এবং ইয়াকিনের (দৃঢ় বিশ্বাস) পরিবর্তে জাঙ্গ (সন্দেহ) গ্রহণ করায় আমরা অত্যন্ত বিস্মিত।”

ছেলে এসে এই বার্তা শোনাতে বাবার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল, মৃত্যু চোখের সামনে নাচতে লাগল। অবশেষে হলাকু খানকে সন্তুষ্ট করার জন্য তিনি মসুলের কোষাগারের সমস্ত হীরা-জহরত এবং সোনা-রূপার ভাণ্ডার বের করলেন। শহরের আমিরদের থেকেও জোরপূর্বক অনেক কিছু আদায় করলেন। এমনকি নিজের বেগম ও সন্তানদের অলঙ্কার পর্যন্ত খুলে নিলেন। [৩]

যদিও এই অত্যন্ত বৃদ্ধ লোকটির জন্য সফর করা কঠিন ছিল, তবুও তিনি একটি গরুর গাড়িতে করে মসুল থেকে বেরিয়ে পড়লেন। ২৯ রজব ৬৫৬ হিজরিতে তিনি মারাগার উপকণ্ঠে হলাকু খানের লশকরগাহে (সেনাশিবিরে) পৌঁছালেন। [৪]

[১] জামিউত তাওয়ারিখ (আরবি), রশীদুদ্দিন ফজলুল্লাহ রচিত: খণ্ড ২, অংশ ২: পৃষ্ঠা ৩০১, তাবা দারু ইহয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ মিসর।

[২] জামিউত তাওয়ারিখ (আরবি): খণ্ড ২, অংশ ২: পৃষ্ঠা ৩০১, ৩০২।

সুলতান জালালুদ্দিনের ওপর এই কটাক্ষ ও বিদ্রূপ অতিরঞ্জন এবং বিদ্বেষে ভরপুর। প্রকৃতপক্ষে সুলতান জালালুদ্দিন যথাসম্ভব তার সালতানাতে ন্যায় ও ইনসাফ বজায় রেখেছিলেন। যদি কিছু ক্ষেত্রে সুলতান বা তার বাহিনীর পক্ষ থেকে কোনো বাড়াবাড়ি হয়েও থাকে, তবে তা হলাকু খানের জুলুমের সামনে কিছুই ছিল না। সুতরাং কোনো মুসলমানের জন্য এটি কীভাবে জায়েজ হতে পারে যে, সে সুলতান জালালুদ্দিন বরং যেকোনো মুসলিম শাসকের ওপর হলাকু খানের মতো নিকৃষ্টতম কাফেরকে প্রাধান্য দেবে।

[৩] তারিখ মুখতাসারুদ দুওয়াল, ইবনুল ইবরি রচিত, পৃষ্ঠা ১৭৭, তাবা দারুশ শারক।

[৪] জামিউত তাওয়ারিখ (আরবি), রশীদুদ্দিন ফজলুল্লাহ রচিত: খণ্ড ২, অংশ ১: পৃষ্ঠা ৩০০, তাবা দারু ইহয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ মিসর।

যখন সে মসুলের সমস্ত সোনা ও জহরত হালাকু খানের সামনে পেশ করল, তখন এই জালেমের মেজাজ ঠিক হলো। সে বদরুদ্দিন লুলুর সম্মান বৃদ্ধি করল এবং তাকে সিংহাসনে নিজের পাশে বসাল। বদরুদ্দিন নিজের কোষাগারের সবচেয়ে মূল্যবান মুক্তা নিজ হাতে হালাকু খানের কানে পরিয়ে দিল এবং প্রাণ বাঁচিয়ে আপাতদৃষ্টিতে আনন্দিত মনে মসুল ফিরে এল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হালাকু খানের ভীতি তার ওপর আগের চেয়ে অনেক বেশি চেপে বসেছিল। [১]

শেষ খলিফার পরিবার-পরিজনের কাহিনী

মুস্তাসিমের হত্যার পর তার পরিবার-পরিজনের কী হলো? এ সম্পর্কে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তার তিন ছেলে: আবু বকর, আহমদ এবং আবদুর রহমান তার সাথেই নিহত হয়েছিল। অন্যদিকে পরিবারের কিছু সদস্যকে বন্দী করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে যাদের অবস্থা সম্পর্কে আমরা জানতে পেরেছি, তা নিচে পেশ করা হলো।

মুস্তাসিমের হাশেমি স্ত্রী এবং তার আত্মমর্যাদা ও বুদ্ধিমত্তা:

মুস্তাসিমের একজন হাশেমি স্ত্রী হালাকু খানের বন্দী ছিলেন। হালাকু খান চেয়েছিল খলিফার রানীকে নিজের শয্যাসজ্জিনী করতে। এই হাশেমি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নারী এই লাঞ্ছনা থেকে বাঁচার জন্য সেই হতভাগাকে বিভিন্ন ধরনের চমৎকার ও মূল্যবান উপহার পাঠান এবং এই নোংরা ইচ্ছা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করেন, কিন্তু সে মানল না এবং তাকে জোরপূর্বক নিজের কাছে তলব করল।

রানী তার লালসা থেকে বাঁচার জন্য একটি কৌশল চিন্তা করলেন। তিনি নিজের বিশেষ দাসীকে পুরো পরিকল্পনা বুঝিয়ে দিয়ে তাকে সাথে নিয়ে হালাকুর কাছে গেলেন। তাকে একটি রত্নখচিত তলোয়ার উপহার দিয়ে বললেন: “এই খলিফার তলোয়ার আপনার জন্য নজরানা। এর বৈশিষ্ট্য হলো, এটি খলিফা ছাড়া অন্য কারো হাতে থাকলে এর আঘাতের কোনো প্রভাব পড়ে না।”

হালাকু এই অদ্ভুত দাবির সত্যতা যাচাই করতে চাইল। রানী দাসীকে সামনে দাঁড় করালেন এবং তলোয়ার তার ওপর উঁচিয়ে ধরলেন। দাসী চিৎকার করতে লাগল। রানী বললেন: “তুমি তো জানো যে এই তলোয়ার খলিফা ছাড়া অন্য কেউ ব্যবহার করলে কোনো প্রভাব পড়ে না। আচ্ছা! তুমি যদি ভয় পাও তবে এই তলোয়ার নাও। আমার ওপর আঘাত করে দেখে নাও।”

রানী আগেই দাসীকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যেন পূর্ণ শক্তিতে আঘাত করে। দাসী তলোয়ার চালাল এবং রানীর দেহ দুই টুকরো হয়ে গেল। হালাকু খান তখন বুঝতে পারল যে এটি রানীর কৌশল ছিল। সে সেই পবিত্র নারীর সম্মান নিয়ে খেলার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারল না। [২]

মুস্তাসিমের দুই ছেলে যারা জীবিত ছিল:

মুস্তাসিমের এক ছেলে ছিল আলী, যে দীর্ঘকাল তাতারীদের কাছে বন্দী ছিল। বাগদাদের পতনের ছয় বছর পর এক যুদ্ধে...

[১] তারিখ মুখতাসারুদ দুওয়াল লি ইবনুল ইবরি, পৃ. ৭৭-১

[২] তাবাকাতুশ শাফিইয়াতিল কুবরা লিস সুবকি, ৮/ ২৪৩

...এতে মুসলমানরা বিজয়ী হলে তাকে উদ্ধার করা হয়। [১]

মুস্তাসিমের এক অল্পবয়স্ক পুত্র মুবারককে সাধারণ হত্যাকাণ্ড থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। তাকে সাধারণত মুবারক শাহ নামে স্মরণ করা হতো। হালাকু তাতারীদের মাধ্যমে তার লালন-পালন করান এবং নাসিরুদ্দিন তুসীকে দিয়ে তাকে শিক্ষা দান করান। তার বিবাহও এক তাতারী মহিলার সাথে করানো হয়েছিল যার মাধ্যমে তার দুই পুত্র সন্তান হয়। [২]

মুস্তাসিমের কন্যাদের অবস্থা:

বাগদাদের পতনের সময় মুস্তাসিমের তিন কন্যা: খাদিজা, ফাতিমা এবং মরিয়ম বন্দি হয়েছিলেন। [৩]

খাদিজা বিনতে মুস্তাসিম যিনি ‘বাব জওহর’ উপাধিতে পরিচিত ছিলেন, হালাকুর আদেশে খাকানের নিকট মঙ্গোলিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। খাকান তাকে বিবাহ করেন। তার গর্ভে দুই পুত্র: আব্দুল আজিজ এবং আব্দুল হক জন্মগ্রহণ করেন কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বেই তারা মৃত্যুবরণ করেন। তেরো বছর নির্বাসনে থাকার পর ৬৭১ হিজরিতে তাকে বাগদাদে ফেরত পাঠানো হয়। [৪]

মুহাররম ৬৭৬ হিজরিতে বাগদাদে তার মৃত্যু হয়, জানাজায় বিশাল জনসমাগম হয়েছিল এবং বাগদাদের পতনের ঘটনাবলী স্মরণ করে মানুষ অঝোরে কাঁদতে থাকে। [৫]

ফাতিমা বিনতে মুস্তাসিম:

ফাতিমা বিনতে মুস্তাসিমকে বাগদাদের পতনের পর বন্দি করে বুখারায় পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। সেখানকার বিখ্যাত সুফী বুজুর্গ হযরত বাখরাজি রহমাতুল্লাহি আলাইহি মুক্তিপণ দিয়ে এই মজলুমাকে মুক্ত করেন এবং সম্মানের সাথে নিজের কাছে রাখেন। সেখানেই ৬৫৮ হিজরিতে তার মৃত্যু হয় যাতে বিশাল জনতা অংশগ্রহণ করে। কালাবাদে তাকে দাফন করা হয়। পরবর্তীতে কবরের ওপর গম্বুজ নির্মাণ করা হয়। [৬]

মজলুমার দুআ:

মুস্তাসিমের তৃতীয় কন্যাকে কিছু সুন্দরী দাসীসহ খাকান মঙ্গু খানের দরবারে মঙ্গোলিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল যাতে সে আব্বাসীয়দের ইজ্জতকে নিজের হারেমের শোভা বানাতে পারে। অবশেষে এই কাফেলা সমরকন্দে পৌঁছায় যেখানে কুসাম বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাজার রয়েছে। এখানে পৌঁছে বিনতে মুস্তাসিম তাতারী প্রহরীদের অফিসারকে বললেন:

“আমার পূর্বপুরুষদের মধ্য থেকে একজন বুজুর্গের কবর এই শহরে আছে। যদি তুমি অনুমতি দাও তবে আমি তার জিয়ারত করে নিতাম।”

অফিসার অনুমতি দিয়ে দিল। বিনতে মুস্তাসিম গিয়ে রওজা-এ-কুসাম বিন আব্বাসে হাজিরা দিলেন। সুন্নাহ অনুযায়ী দুআ করলেন এবং...

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: সন ৬৬৩ হিজরি

[২] জামিউত তাওয়ারিখ (আরবি) লেখক রশীদ উদ্দিন ফজলুল্লাহ: খণ্ড ২, প্রথম অংশ: পৃষ্ঠা ২৯৩, ত. দার ইহয়াউল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ মিসর

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৭ / ৩৬১, ত. দার হাজার

[৪] তারিখুল ইসলাম লিজ জাহাবি: ৫১ / ১৩১, ত. তাদমুরি

[৫] তারিখুল ইসলাম লিজ জাহাবি, ওফাত, সন ৬৭৬ হিজরি

[৬] তারিখুল ইসলাম লিজ জাহাবি: ওফাত ৬৫৮ হিজরি, মূল পাঠে কেবল শেখ বাখরাজি লিখিত আছে কিন্তু স্পষ্টত এটাই যে তিনি শেখ সাইফ উদ্দিন বাখরাজি রহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন।

তারিখে উম্মতে মুসলিমা | চতুর্থ খণ্ড

তারপর দুই রাকাত সালাত আদায় করে আল্লাহর দরবারে এভাবে ফরিয়াদ করলেন:

“হে রাব্বুল আলামীন! যদি আপনার দরবারে আমার দাদা আব্বাস-এর কোনো সম্মান থাকে, তবে এই দাসীর প্রাণ আপনার দরবারে কবুল করে নিন এবং আমাকে এই নামাহরামদের থেকে মুক্তি দান করুন।”

এই দুআ কবুল হলো এবং বিনতে মুসতাসিম-এর প্রাণ তখনই ঊর্ধ্বজগতে পাড়ি জমালো।

[১]

মুসতাসিম-এর নাতনি:

মুসতাসিম-এর উত্তরাধিকারী আবুল আব্বাস আহমদের এক কন্যা ছিল রাবেয়া, যে বাগদাদের পতনের সময় অল্পবয়সী ছিল। পরবর্তীতে তার বিবাহ হারুন বিন মুহাম্মদ আল-জুওয়াইনি নামক এক ধনাঢ্য ব্যক্তির সাথে হয়, মোহরানা এক লক্ষ দিনার ধার্য করা হয়েছিল। এই মেয়েটি ‘আস-সাইয়্যিদাতুন নাবাবিয়াহ’ উপাধিতে পরিচিত ছিল। সে সম্মান ও নিরাপত্তার সাথে জীবন অতিবাহিত করে এবং জামাদিউল উলা ৬৮৫ হিজরিতে ইন্তেকাল করে এবং তার মায়ের পাশে সমাহিত হয়। [২]

সুসংবাদসমূহ:

কান্নাকাটি ও আহাজারির এই পরিবেশে গায়েব থেকে এমন সব ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল যে, ধৈর্য ও সহনশীলতার আঁচল যেন হাতছাড়া না করা হয়। মিশরে যখন বাগদাদের ধ্বংসের এই সংবাদ পৌঁছাল, তখন এক আধ্যাত্মিক ব্যক্তির অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ল। তিনি ভাবতে লাগলেন এমনটি কীভাবে হলো। আল্লাহ কেন এমন হতে দিলেন। ভাবতে ভাবতে তার চোখ লেগে এল। স্বপ্নে দেখলেন কেউ বলছে:

“আল্লাহর ওপর আপত্তি করো না। তিনি যা করেন তার কারণ তিনিই ভালো জানেন।” [৩]

সেই ব্যক্তি জাগ্রত হয়ে ইস্তিগফার করতে লাগলেন।

লক্ষণ ও সুসংবাদসমূহ বলে দিচ্ছিল যে, আল্লাহর রহমত অন্য কোনো রূপে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে এবং অচিরেই আল্লাহর সাহায্য মুসলমানদের সঙ্গী হতে চলেছে।

[১] তাবাকাতে নাসিরি: ২/১৯৮, ১৯৯। যদিও বর্ণনায় এই মেয়েটির নাম উল্লেখ নেই, তবে পারিপার্শ্বিকতা থেকে স্পষ্ট যে এই মেয়েটি ছিল মারিয়াম বিনতে মুসতাসিম, কারণ বন্দি হওয়া তৃতীয় মেয়েটি সে-ই ছিল।

[২] তারিখুল ইসলাম লিয-যাহাবি, ওফিয়াত সানা ৬৮৫ হিজরি।

[৩] তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাতিল কুবরা লিস-সুবকি: ৮/২৭৩, ২৭৪, তবা হিজরি।

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইসলামের নতুন রক্ষক

মিশরের মামলুক সুলতানগণ

৬৪৮ থেকে ৯২৩ হিজরি

১২৫০ থেকে ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দ

মামলুকদের উত্থান

সপ্তম হিজরি শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বাগদাদের ধ্বংসযজ্ঞের সময় মুসলিম বিশ্ব অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। কাফের ও মুশরিক তাতারীরা চীনের শেষ সীমানা থেকে শুরু করে সিরিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত এক অপরাজেয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। অন্যদিকে পশ্চিমে ক্রুসেডাররাও সাহস হারায়নি এবং ক্রুসেড যুদ্ধের সাতটি ব্যর্থ অভিজ্ঞতার পরেও তারা মুসলিম বিশ্বকে পদানত করার ব্যাপারে কেবল আশাবাদীই ছিল না, বরং তাতারীদের হাতে মুসলিম বিশ্বের বিপর্যস্ত অবস্থা দেখে তারা মুসলমানদের পুরোপুরি বশীভূত করার নতুন পথ দেখতে পাচ্ছিল। তারা তাতারীদের রাজনৈতিক কেন্দ্রগুলোতে প্রবেশাধিকার লাভ করেছিল। তাদের নারীরা, যারা খাকানসহ অনেক তাতার রাজপুত্রের হেরেমের শোভা ছিল, তারা খ্রিস্টধর্মের প্রচার-প্রসার এবং মুসলমানদের নির্মূল করার জন্য মনস্তাত্ত্বিক ক্ষেত্র প্রস্তুত করার চেষ্টা করছিল।

এই সময়ে আল্লাহর পূর্ণ কুদরত ও সুগভীর হিকমত ইসলাম ও মুসলমানদের রক্ষার জন্য মিশরের মামলুক সুলতানদের দাঁড় করিয়ে দেয়, যারা প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে একদিকে তাতারীদের এবং অন্যদিকে ক্রুসেডারদের সাথে লড়াই করেন এবং মুসলিম বিশ্ব সম্পর্কে তাদের ঘৃণ্য পরিকল্পনা নস্যাত করে দেন।

এটি আল্লাহর এক অদ্ভুত কুদরত ছিল যে, এমন এক সময়ে যখন ইসলাম নিরাশ্রয় এবং মুসলমানরা অসহায় হয়ে পড়েছিল, আল্লাহ বিশ্বের দুটি বৃহত্তম শক্তিকে এমন দুর্বল ও অপরিচিত বান্দাদের হাতে লাঞ্ছিত করলেন যারা দাস ছিলেন এবং বাজারে বিক্রি হতে হতে রাজসিংহাসন পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। এই কারণেই মিশরের এই সুলতানদের মামলুক বলা হয়, যার অর্থ হলো ‘দাস’।

প্রায় একই সময়ে মামলুকদের আরেকটি বংশ একইভাবে হিন্দুস্তানের সীমান্ত রক্ষা করছিল, যারা উপমহাদেশের ইতিহাসে ‘দাস বংশ’ নামে পরিচিত।

পূর্ববর্তী সমস্ত শাসক রাজবংশের বিপরীতে আমরা মামলুকদের মধ্যে উত্তরাধিকারের নীতিকে অত্যন্ত দুর্বল দেখতে পাই, যা অন্যান্য রাজপরিবারে সরকার গঠনের সবচেয়ে শক্তিশালী নীতি ছিল। মামলুকরা এই নীতি পরিবর্তন করে ‘সবচেয়ে যোগ্য এবং সবচেয়ে শক্তিশালী’ হওয়ার নীতি গ্রহণ করে এবং এভাবে মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্ব ও সুরক্ষার জন্য সর্বোত্তম কর্মীবাহিনী প্রদান করে।

এই কারণেই আমরা দেখি যে মিশরের মামলুকদের প্রথম পাঁচজন শাসক: শাজারাতুদ দুর, ইজ্জুদ্দিন তুর্কমানি (আল-মালিকুল মুইজ), সাইফুদ্দিন কুতুজ (আল-মালিকুল মুজাফফর), রুকনুদ্দিন বাইবার্স (আল-মালিকুজ জাহির) এবং সাইফুদ্দিন কালাউন সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যদি তাদের মধ্যে কোনো সাধারণ বিষয় থেকে থাকে, তবে তা ছিল কেবল এই যে তারা সবাই মুক্ত করা দাস এবং মুসলমান ছিলেন।

আল্লামা ইবনে খালদুন (রহ.) মামলুক সুলতানদের পরিচয় অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন, যার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:

“এই ভয়াবহ ঘটনাবলির পর আল্লাহ তাআলা দয়া করে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করা, তাদের ব্যবস্থার প্রতিরক্ষা এবং তাদের সীমান্ত রক্ষার এমন ব্যবস্থা করলেন যে, তিনি মিশরে তুর্কি গোত্রগুলোর মধ্য থেকে এমন সাহসী নেতা তৈরি করে দিলেন যারা দারুল হারব থেকে দারুল ইসলামে গোলাম হিসেবে আসত। দাস ব্যবসায়ীরা এই অল্পবয়সী গোলামদের মিশরীয় শাসকদের সামনে পেশ করত। মিশরীয় শাসকরা তাদের চড়া দামে কিনে নিতেন যাতে তাদের মাধ্যমে নিজেদের শক্তি ও শান-শওকত বৃদ্ধি করতে পারেন। জাতীয় মর্যাদাবোধের কারণে তারা এমন গোলামদের নির্বাচন করতেন যাদের মধ্যে ঈমানি শক্তি, জাতীয় বীরত্ব ও সাহসিকতার লক্ষণ দেখা যেত। তারা রাজপ্রাসাদে এই গোলামদের এমনভাবে লালন-পালন করতেন যাতে তারা একনিষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে গড়ে ওঠে। তাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ওপর পূর্ণ গুরুত্ব দেওয়া হতো। তাদের কুরআন মাজিদের শিক্ষায় সজ্জিত করা হতো। তারা যখন যুবক হতো, তখন তাদের তিরন্দাজি, ঘোড়সওয়ারি, তলোয়ার চালনা এবং অন্যান্য সামরিক বিদ্যা শেখানো হতো। এমনকি তারা মজবুত ও শক্তিশালী হয়ে উঠত এবং নিজেদের প্রভুদের রক্ষা করতে ও নিজেদের যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হতো। যখন এই গোলামরা এই অবস্থানে পৌঁছে যেত, তখন সুলতানরা তাদের বেতন দ্বিগুণ করে দিতেন এবং তাদের জায়গির দান করতেন। এরপর তাদের সালতানাতের উচ্চ পদে পদোন্নতি দেওয়া হতো। এই ধরনের গোলাম নিয়োগের সূচনা সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সময় থেকে হয়েছিল এবং এই ধারা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে।

সপ্তম হিজরি শতাব্দীতে তাতারীদের হাতে ইসলামি বিশ্বের পূর্বাঞ্চল বিশেষ করে তুর্কিস্তান সম্পূর্ণ বিরান হয়ে গিয়েছিল। তাতারীরা তুর্কি গোত্রগুলোর অধিকাংশকে হত্যা করেছিল এবং বাকিদের বন্দি করেছিল। বন্দি তুর্কি শিশুদের প্রায়ই বিক্রি করে দেওয়া হতো এবং তাদের একটি বড় অংশ মিশরের বাজারে পৌঁছে যেত। আইয়ুবীদের শেষ শাসক আল-মালিক আস-সালিহ নাজমুদ্দিন আইয়ুব নিজের বাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য এমন গোলাম নিয়োগের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন যাদের মধ্যে তুর্কিদের বিভিন্ন বংশ অর্থাৎ আরমানি, তুর্কমেনি এবং খোয়ারিজমি অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিচিত্র সেবা এবং প্রভুদের সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে এই গোলামদের কয়েকটি দল ছিল। আল-মালিক আল-আজিজ উসমানের সাথে সম্পৃক্ত দল ‘আল-আজিজিয়া’ নামে পরিচিত ছিল। আল-মালিক আস-সালিহ নাজমুদ্দিন আইয়ুবের সাথে সম্পৃক্ত দল ‘সালিহিয়া’ নামে পরিচিত ছিল। তাদের মধ্য থেকেই একটি দল ‘মালিক বাহরিয়া’ নামে পরিচিত ছিল, কারণ এই লোকেরা নীল নদের দুটি শাখার মাঝখানে অবস্থিত কেল্লাগুলোর সুরক্ষায় নিয়োজিত ছিল এবং রাজ্যকে সামুদ্রিক আক্রমণ থেকে রক্ষা করা তাদের দায়িত্ব ছিল। এই মামলুকদের অফিসারদের মধ্যে ইজ্জুদ্দিন তুর্কমেনি, চাশনিগির তুর্কমেনি, রুকনুদ্দিন বাইবার্স এবং ফারিসুদ্দিন আকতাই উল্লেখযোগ্য ছিলেন। [১]“

[১] তারিখ ইবনে খালদুন: ৫ / ৩২৬ থেকে ৩৩০, ত. দারুল ফিকর।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, এটি আল্লামা ইবনে খালদুনের বক্তব্যের আক্ষরিক অনুবাদ নয় বরং বেশ কিছু পৃষ্ঠায় বিস্তৃত তাঁর বক্তব্যের সারসংক্ষেপ।

মালিকা শাজারাতুদ দুর

(৬৪৮ হিজরি / ১২৫০ খ্রিস্টাব্দ)

আমরা ইতিপূর্বে পড়েছি যে, আল-মালিক আস-সালিহ আইয়ুবের পর আইয়ুবী বংশের শেষ শাসক আল-মালিক আল-মুয়াজ্জাম তুরান শাহ মাত্র দুই মাস ক্ষমতার সুযোগ পেয়েছিলেন। এরপর তার বাড়াবাড়িতে অতিষ্ঠ হয়ে সামরিক জেনারেলরা তাকে হত্যা করে। এই সামরিক জেনারেলরা ছিলেন মামলুক বাহরিয়া বাহিনীর অফিসার ইজ্জুদ্দিন তুর্কমানি, ফারিস আক্কাই এবং বাইবার্স। এই পদক্ষেপের পর চারদিকে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছড়িয়ে পড়ে এবং মিশরে তারা বাদশাহ নির্মাতার মর্যাদা লাভ করেন।

তারা আইয়ুবী বংশের প্রতীক বজায় রাখার জন্য আস-সালিহ আইয়ুবের স্ত্রী মালিকা শাজারাতুদ দুর-কে শাসক নিযুক্ত করেন, যিনি আইয়ুবী শাসক এবং মামলুক শাসনের মধ্যবর্তী যোগসূত্র ছিলেন। কারণ একদিকে তিনি একজন আইয়ুবী শাসক আল-মালিক আস-সালিহ-এর স্ত্রী ছিলেন, অন্যদিকে মামলুকদের মতো তিনিও ছিলেন ক্রীতদাসী। একজন প্রাক্তন দাসীর শাসনের পর, যোগ্যতা ও দক্ষতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হওয়া মুক্ত করা দাসদের সিংহাসন আরোহণের পথ পুরোপুরি সুগম হয়ে যায়। এই দিক থেকে শাজারাতুদ দুরের শাসন ছিল মামলুকদের বিশাল ইমারতের প্রথম ইট।

শাজারাতুদ দুর ৬৪৮ হিজরির মহরম মাসে সিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু তিনি বেশিদিন শাসন করতে পারেননি। একজন নারীর শাসনের ওপর শরয়ী ও ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে আপত্তি উঠতে শুরু করে। যা দেখে অবশেষে তিন মাস পর শাজারাতুদ দুরকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। তার স্থলে মামলুক বাহরিয়া তাদের সবচেয়ে অভিজ্ঞ অফিসার ইজ্জুদ্দিন তুর্কমানিকে মিশরের বাদশাহ নিযুক্ত করে। [১]

প্রথম মামলুক সুলতান - আল-মালিক আল-মুইজ ইজ্জুদ্দিন তুর্কমানি

(৬৪৮ হিজরি থেকে ৬৫৫ হিজরি / ১২৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২৫৭ খ্রিস্টাব্দ)

ইজ্জুদ্দিন আইবাক তুর্কমানি ৬৪৮ হিজরির রবিউস সানি মাসে প্রথম মামলুক সুলতান হিসেবে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি আল-মালিক আল-মুইজ উপাধি গ্রহণ করে মিশরের ক্ষমতা গ্রহণ করেন। এটি ছিল মামলুক শাসনের আনুষ্ঠানিক সূচনা। ইজ্জুদ্দিন তুর্কমানি মদ্যপান ও সঙ্গীতসহ সকল প্রকার মুনকারাত থেকে বেঁচে থাকা একজন ধর্মপ্রাণ, সালেহ এবং ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন। তিনি মিশরে একটি বড় দ্বীনি মাদরাসাও প্রতিষ্ঠা করেন এবং কয়েক বছর অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে শাসন পরিচালনা করেন। তিনি তার নয় বছরের শাসনকালে মিশরকে সিরিয়ার আইয়ুবী আমির এবং তাদের মিত্রদের অত্যাচার থেকে সফলভাবে রক্ষা করেন। সিরিয়ায় সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর প্রপৌত্র আল-মালিক আন-নাসিরের শাসন ছিল। ৬৪৯ হিজরিতে তিনি মিশর আক্রমণ করেন, কিন্তু তুর্কমানি তাকে সামনে এগোতে দেননি। [২]

[১] আস-সুলুক লি-মা'রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ৬৪৮ হিজরি; শাজারাতুজ জাহাব: খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২৬৭।

[২] তারিখুল ইসলাম লিয-যাহাবি: ৬৫৫ হিজরি।

মামলুক বাহরিয়া এবং মামলুক মুইজ্জিয়া:

আল-মালিক আল-মুইজ তুর্কমানি তার বিশেষ মুক্ত করা দাসদের নিজের ঘনিষ্ঠ করে নেন এবং তাদের বড় বড় পদে নিযুক্ত করেন। মামলুকদের এই গোষ্ঠী “মামলুক মুইজ্জিয়া” নামে পরিচিত হতে থাকে, যার মধ্যে সাইফ উদ্দিন কুতুজের অবস্থান ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। মামলুক বাহরিয়ার অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, যাদের সমর্থনে তুর্কমানি ক্ষমতা লাভ করেছিলেন এবং যারা এর আগে তুর্কমানির সমকক্ষ বা কাছাকাছি মর্যাদার ছিলেন, তারা এই পরিস্থিতিতে অসন্তুষ্ট হন এবং তাদের পারস্পরিক বিদ্বেষ আরও শক্তিশালী হতে থাকে। এই কর্মকর্তাদের মধ্যে ফারিস উদ্দিন আকতাই এবং রুকন উদ্দিন বাইবার্স সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন।

ফারিস উদ্দিন আকতাই মামলুক বাহরিয়ার প্রধানের মর্যাদা লাভ করেছিলেন, তিনি নিজেকে “বাদশাহ” বা “বাদশাহ নির্মাতা” মনে করতে শুরু করেছিলেন। তার চলাফেরা ছিল রাজকীয় ঢঙে। তার অনুসারীরা তাকে “আল-মালিক আল-জাওয়াদ” বলে ডাকতে শুরু করেছিল। ইজ্জ উদ্দিন তুর্কমানি এই পরিস্থিতিতে উদ্বেগের সাথে দেখছিলেন। এই আশঙ্কা তখন আরও বেড়ে যায় যখন আকতাই “হামাহ”-এর আইয়ুবি শাসক আল-মালিক আল-মানসুরের বোনকে বিয়ে করেন এবং তুর্কমানিকে বলেন যে তিনি যেন এই রাজকুমারীকে ক্বালাতুল জাবাল-এর রাজপ্রাসাদে বসবাসের অনুমতি দেন, কারণ তিনি আইয়ুবি বংশের রাজকুমারী এবং কায়রোর সাধারণ জনবসতিতে তার বসবাস তার মর্যাদার পরিপন্থী হবে।

তুর্কমানি ভাবলেন যে রাজকুমারীকে বিয়ে করার ফলে আকতাইয়ের মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পাবে এবং যদি তিনি একবার রাজকুমারীকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে আসেন, তবে এই দম্পতিকে প্রাসাদ থেকে উচ্ছেদ করা অত্যন্ত কঠিন হবে। কিন্তু তিনি আকতাইকে সরাসরি মানা করে তার সাথে প্রকাশ্য শত্রুতাও করতে চাচ্ছিলেন না। ফলে তিনি আকতাইকে হত্যার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

একদিন যখন ফারিস উদ্দিন আকতাই যথারীতি ক্বালাতুল জাবাল-এর রাজপ্রাসাদে আসেন, তখন সাইফ উদ্দিন কুতুজসহ বেশ কয়েকজন মামলুক মুইজ্জিয়া ওত পেতে ছিলেন। তারা আক্রমণ করে আকতাইকে হত্যা করেন। এই ঘটনা ৬৫২ হিজরির। [১]

আকতাইয়ের হত্যাকাণ্ড মামলুক মুইজ্জিয়া এবং মামলুক বাহরিয়ার মধ্যে তীব্র তিক্ততা সৃষ্টি করে। মামলুক বাহরিয়ার বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, যাদের মধ্যে বাইবার্স বুনদুকদারি এবং সাইফ উদ্দিন বালবান উল্লেখযোগ্য ছিলেন, এই ঘটনার পরপরই নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে কায়রো থেকে পালিয়ে সিরিয়ায় চলে যান এবং আল-মালিক আন-নাসিরের দরবারের সাথে যুক্ত হন। [২]

সাময়িকভাবে মিশরে তুর্কমানি পূর্ণ ক্ষমতা লাভ করেন এবং তার অবস্থান পুরোপুরি সুসংহত হয়। কিছুকাল পর ৬৫৩ হিজরিতে তিনি প্রাক্তন রানী শাজারাতুদ দুর-কে বিয়ে করে আরও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনের চেষ্টা করেন। [৩] প্রকৃতপক্ষে মামলুকদের সকল গোষ্ঠী শাজারাতুদ দুর-কে তাদের মনিব ও অভিভাবক মরহুম আল-মালিক আস-সালিহ আইয়ুবের বিধবা হিসেবে অত্যন্ত সম্মান করে আসছিল। তুর্কমানি তাকে বিয়ে করে তার রাজনৈতিক অবস্থানের সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করেন।

[১] জাইল মিরআতুয যামান: ১/ ৫৭, ৫৮, ত. দারুল কিতাব কায়রো; মিরআতুল জানান ওয়া ইবরাতুল ইয়াকজান লিল ইয়াফেয়ি: ৩/ ৯৯, ত. আল-ইলমিয়া।

[২] আল-ইবার ফি খবর মান গাবার: ৩/ ২৬৮, ত. আল-ইলমিয়া।

[৩] জাইল মিরআতুয যামান: ১/ ৫৭, ত. দারুল কিতাব কায়রো।

তারিখ উম্মত-ই-মুসলিমা

কিন্তু শাজারাতুদ দুরের সাথে বিবাহ নিজের পায়ে কুড়াল মারার সমতুল্য প্রমাণিত হলো। শাজারাতুদ দুর অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন নারী ছিলেন। তিনি রাষ্ট্রীয় বিষয়ে ধীরে ধীরে হস্তক্ষেপ করে সেগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে নিলেন এবং তুর্কমানি তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কোনো পদক্ষেপ নিতে অক্ষম হয়ে পড়লেন। [১]

তুর্কমানির হত্যাকাণ্ড - শাজারাতুদ দুরের দুঃখজনক পরিণতি:

রবিউল আউয়াল ৬৫৫ হিজরিতে আল-মালিকুল মুইজ ইজ্জুদ্দিন ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে নিহত হন। এর কারণ ছিল এই যে, তিনি মসুলের শাসক বদরুদ্দিন লুলুর মেয়ের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। শাজারাতুদ দুর যখন এটি জানতে পারলেন, তখন তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন এবং নিজের কিছু খাদেমকে তাঁকে হত্যার জন্য প্রস্তুত করলেন। এর পাশাপাশি তিনি এও চিন্তা করেছিলেন যে, ইজ্জুদ্দিনকে হত্যার পর সিরিয়ার শাসক আল-মালিকুন নাসিরের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবেন এবং এভাবে সিরিয়া ও মিসরের রাজ্যগুলো একত্রিত হয়ে যাবে। তিনি আল-মালিকুন নাসিরের কাছে এই বার্তাও পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু আল-মালিকুন নাসির শাজারাতুদ দুরের চতুরতায় ভীত হয়ে পড়লেন এবং তিনি মনে করলেন যে এই বার্তার পেছনে কোনো ধোঁকা রয়েছে, তাই তিনি এই বার্তার কোনো উত্তর দেননি। কোনো না কোনো মাধ্যমে এই খবর মসুলের শাসক বদরুদ্দিন লুলুর কাছেও পৌঁছে গেল। তিনি ইজ্জুদ্দিন তুর্কমানিকে বার্তা পাঠিয়ে সতর্ক করে দিলেন যে শাজারাতুদ দুর আপনাকে হত্যা করে আল-মালিকুন নাসিরের সাথে বিবাহের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছেন। ইজ্জুদ্দিন নিজের মহানুভবতার কারণে শাজারাতুদ দুরের ওপর হাত তোলেননি। তবে তিনি তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট অবশ্যই হয়েছিলেন। উভয়ের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে থাকল। তা সত্ত্বেও তুর্কমানির এই ধারণা ছিল না যে তাঁর স্ত্রী তাঁকে হত্যা করিয়ে দেবেন।

১৪ রবিউল আউয়াল সন্ধ্যায় আল-মালিকুল মুইজ দুর্গে আসলেন এবং গোসলের জন্য হাম্মামে প্রবেশ করলেন, তখন পরিকল্পনা অনুযায়ী শাজারাতুদ দুরের গোলামরা, যারা একটি কোণে লুকিয়ে ছিল, হাম্মামের দরজা বন্ধ করে তাঁর ওপর আক্রমণ করল এবং তাঁর গলা টিপতে শুরু করল। ইজ্জুদ্দিন কিছুই বুঝতে পারলেন না। তিনি চিৎকার ও আর্তনাদ শুরু করলেন এবং শাজারাতুদ দুরকে ডাকতে লাগলেন। স্বামী ইজ্জুদ্দিনকে এই অবস্থায় দেখে শাজারাতুদ দুরের মনেও দয়া জাগল। তিনি গোলামদের বলতে লাগলেন: “একে ছেড়ে দাও।” তারা বলল: “একে যদি ছেড়ে দিই তবে এ আমাদের ছাড়বে না, আপনাকেও ছাড়বে না।” অবশেষে ইজ্জুদ্দিন ছটফট করতে করতে মারা গেলেন। শাজারাতুদ দুর তাঁর একটি আঙুল কেটে সেই রাতেই জনৈক আমির আইবাক আল-হালাবি আল-কাবিরকে পাঠিয়ে দিলেন এবং সেই সাথে এই বার্তাও দিলেন যে সিংহাসন দখল করে নাও। কিন্তু তিনি এই পদক্ষেপ নেওয়ার সাহস করলেন না। সকাল নাগাদ এই খবর ছড়িয়ে পড়ল এবং নিহত সুলতানের মামলুকরা উত্তেজিত হয়ে উঠল। তারা শাজারাতুদ দুরকে রাজপ্রাসাদে নজরবন্দি করে রাখল। যখন মালিকা নিশ্চিত হলেন যে খেলা হাত থেকে বেরিয়ে গেছে, তখন তিনি নিজের সমস্ত হীরা-জহরত হামানদিস্তায় পিষে ধ্বংস করে ফেললেন।

১৯ রবিউল আউয়াল ৬৫৫ হিজরিতে মামলুকরা কিছু দাসীকে তাঁকে হত্যার জন্য নিযুক্ত করল, যারা জুতো দিয়ে আঘাত করে মিসরের প্রাক্তন মালিকাকে মৃত্যুর ঘাটে নামিয়ে দিল। তাঁর নগ্ন লাশ দুর্গের নিচে পরিখায় ফেলে দেওয়া হলো, যা পচে যাওয়ার পর কিছু লোক দাফন করল। [২]

[১] আস-সুলুক লি-মা'রিফতি দুওয়ালিল মুলুক: ১/৩৯৩, ত. আল-ইলমিয়াহ

[২] আস-সুলুক লি-মা'রিফতি দুওয়ালিল মুলুক: সন ৬৫৫ হিজরি

মামলুক শাসকদের মধ্যে ইযযুদ্দিন তুর্কমানির অবস্থান কেবল এই কারণেই স্মরণীয় যে তিনি এই নতুন শাসন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এ ছাড়া ইযযুদ্দিন তুর্কমানির আর কোনো বিশেষ কৃতিত্ব নেই। যেহেতু তিনি নিজেও সেই তুর্কি মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদেরকে আল-মালিকুস সালিহ আশ্রয় দিয়ে নিজের সেবক বানিয়ে নিয়েছিলেন, তাই তাঁর শাসনকালে তুর্কি গোলামদের বেশ কদর করা হয়েছিল। এই তুর্কিদের মধ্যেই তাঁর প্রিয় নায়েব মাহমুদ কুতুয ছিলেন, যিনি ইতিহাসে মামলুকদের নাম চিরস্মরণীয় করে দিয়েছেন।

আল-মালিকুল মানসুর নূরুদ্দিন আলী

রবিউল আউয়াল ৬৫৫ হিজরি থেকে যিলকদ ৬৫৭ হিজরি (এপ্রিল ১২৫৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে নভেম্বর ১২৫৯ খ্রিষ্টাব্দ)

মামলুকরা ইযযুদ্দিন তুর্কমানির মৃত্যুর পর বিলম্ব না করে তাঁর অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র নূরুদ্দিন আলীকে ‘আল-মালিকুল মানসুর’ উপাধি দিয়ে সিংহাসনে বসিয়েছিল যাতে আরও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা না ছড়ায়। তিনি ছিলেন কেবল একজন নামমাত্র শাসক এবং সমস্ত ক্ষমতা মামলুক আমিরদের হাতে ছিল, যাদের মধ্যে নূরুদ্দিন আলীর আতাবক সাইফুদ্দীন কুতুয সবচেয়ে অগ্রগণ্য ছিলেন। [১]

বাগদাদের পতনের পর সিরিয়ায় তাতার বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ:

মিশরে যখন এই ডামাডোল চলছিল, তখন ওদিকে তাতাররা মদিনাতুল ইসলাম বাগদাদে আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। অবশেষে মহররম ৬৫৬ হিজরিতে তাতারদের হাতে বাগদাদ ধূলিসাৎ হয়ে যায় এবং মুসলিম বিশ্বে শোকের ছায়া নেমে আসে। সাড়ে ছয় শতাব্দীর মধ্যে এই প্রথম এমন এক বছর এল যখন মুসলমানদের কোনো খলিফা ছিল না। হাফিজ ইবনে কাসীর রহ. ৬৫৭ হিজরির ঘটনাবলির শুরুতে লিখেছেন:

“এই বছরটি বৃহস্পতিবার এমন অবস্থায় শুরু হয়েছিল যে মুসলমানদের কোনো খলিফা ছিল না।” [২]

দামেস্ক ও আলেপ্পোতে সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর প্রপৌত্র আল-মালিকুন নাসিরের শাসন ছিল। আল-জাজিরার পর সিরিয়া ও মিশরের মুসলমানদের নিজেদের পরিণতি সম্পর্কে কোনো সুধারণা ছিল না, কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে শাসক শ্রেণি তখনও পারস্পরিক দ্বন্দ্ব লিপ্ত ছিল। আল-মালিকুন নাসির মিশরে আক্রমণ করে মামলুকদের নবজাতক রাষ্ট্রকে নিজের দখলে নেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এর একটি বড় কারণ ছিল এই যে, মামলুকদের একজন শক্তিশালী নেতা রুকনুদ্দীন বাইবার্স কিছুকাল আগে মিশর ছেড়ে তাঁর সাথে যোগ দিয়েছিলেন, যিনি মিশরের বর্তমান সরকারের বিরোধী ছিলেন। এর ফলে আল-মালিকুন নাসিরের শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং তিনি মিশর দখল করার আশা করতে থাকেন। তবে এরই মধ্যে হালাকু খানের বিপদ ঘাড়ের ওপর চলে আসে এবং আল-মালিকুন নাসির যখন রঙিন স্বপ্ন থেকে বাস্তবে ফিরে আসেন, তখন বাস্তবতা এতটাই ভয়াবহ ছিল যে তাঁর সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা লোপ পায়। এখন তিনি না মিশর দখলের যোগ্য ছিলেন, আর না তাঁর মধ্যে তাতারদের মোকাবিলা করার সাহস ছিল। [৩]

[১] আস-সুলুক লি-মা’রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ৬৫৫ হিজরি; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৭ / ৩৮৬

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৬৫৭ হিজরি

[৩] সিয়ারু আ’লামিন নুবালা: ২৩ / ৩০৩ থেকে ৩০৫; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৬৫৮ হিজরি

হালাকু খান তাকে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশনামা পাঠাল। খলিফা মুসতাসিমের পরিণতি দেখার পর আল-মালিক আন-নাসির তাতারদের ওপর আস্থা রাখতে পারছিলেন না, কারণ সেখানে যাওয়া ছিল নিজের ধ্বংস ডেকে আনার নামান্তর; তবে হালাকুর সাথে লড়াই করার সাহসও তার ছিল না। তাই তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য তিনি তার অল্পবয়সী ছেলেকে মূল্যবান উপটোকনসহ হালাকুর কাছে পাঠালেন। হালাকু সেই উপটোকনকে কোনো গুরুত্বই দিল না এবং আল-মালিক আন-নাসিরের না আসায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলো। সে ঘোষণা করল যে, এখন সে নিজেই আল-মালিক আন-নাসিরের দেশ আক্রমণ করবে। [১]

সে আল-মালিক আন-নাসিরকে নিম্নোক্ত হুমকি সম্বলিত বার্তা পাঠাল:

“আল-মালিক আন-নাসিরের জানা উচিত যে, আমরা আল্লাহর তলোয়ার দিয়ে বাগদাদ জয় করেছি, এর অশ্বারোহীদের হত্যা করেছি, এর ভবনগুলো ধূলিসাৎ করেছি এবং এর বাসিন্দাদের বন্দি করেছি। আমরা সেখানে খলিফাকে ডেকে কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কিন্তু সে মিথ্যা বলেছিল, যার কারণে সে হত্যার যোগ্য সাব্যস্ত হয়েছিল। সে অগণিত মণি-মুক্তা জমা করেছিল কিন্তু সে ছিল কৃপণ; সে সম্পদ জমা করেছিল কিন্তু সৈন্য প্রস্তুত করেনি। অতএব, তুমি এই পত্র পাঠ করা মাত্রই তোমার লোকবল ও ধনভাণ্ডারসহ পৃথিবীর সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হও। আমাদের দূতদের আগের মতো আটকে রেখো না। হয় নিজেকে পুরোপুরি ধ্বংস করো অথবা সম্পর্ক ছিন্ন করো। আমরা জানতে পেরেছি যে, সিরিয়ার ব্যবসায়ীরা তাদের মালামাল নিয়ে স্থান পরিবর্তন করছে। যদি আমরা তাদের পাহাড়ে পাই তবে তাদের পিষে ফেলব, আর যদি সমতলে পাওয়া যায় তবে তাদের মাটিতে পুঁতে ফেলব। বাঁচার কোনো জায়গা নেই।” [২]

আল-জাজিরায় হালাকু খানের আক্রমণ:

৬৫৭ হিজরির শুরুতে হালাকু খান আল-জাজিরা ও সিরিয়া অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। সে বিজিত অঞ্চলের আমিরদের কাছ থেকে সাহায্য তলব করল এবং বিভিন্ন দিকে অভিযানের মানচিত্র তৈরি করল। সে মোসুলের শাসক বদরউদ্দিন লুলুর কাছে দূত পাঠিয়ে বলে পাঠাল: “যেহেতু তোমার বয়স ৯০ বছর অতিক্রম করেছে, তাই আমরা তোমাকে আমাদের সাথে চলার কষ্ট দিচ্ছি না, তবে তোমার ছেলে আল-মালিক আস-সালিহকে সিরিয়া ও মিসর জয়ের জন্য যুদ্ধ সরঞ্জামসহ পাঠিয়ে দাও।”

আল-মালিক আস-সালিহ এই নির্দেশ অনুযায়ী সেনাবাহিনী নিয়ে হালাকু খানের কাছে উপস্থিত হলেন। হালাকু খান এতে এতই খুশি হলো যে, সুলতান জালালুদ্দিন খাওয়ারিজম শাহের কন্যা, যিনি তার কাছে অবস্থান করছিলেন, তাকে আস-সালিহের সাথে বিয়ে দিয়ে দিল। [৩]

৬৫৭ হিজরির শেষ দিকে তাতার বাহিনী ইরাক ও আল-জাজিরার বিভিন্ন শহর জয়ের জন্য বেরিয়ে পড়ল। তাতার বাহিনী প্রথমে খিলাত ও কুর্দিস্তান অঞ্চলে পৌঁছাল এবং সেখানে যার সাথেই তাদের দেখা হলো, তাকেই মৃত্যুর কোলে পাঠিয়ে দিল। [৪]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: সন ৬৫৭ হিজরি। আস-সুলুক লি-মারিফাত দুওয়ালিল মুলুক: ১/৫০৬, আল-ইলমিয়াহ।

[২] জামিউত তাওয়ারিখ (আরবি), রশীদউদ্দিন ফজলুল্লাহ: খণ্ড ২, অংশ ১, পৃষ্ঠা ৩০৫, দার ইহয়াউল কুতুবিল আরাবিয়াহ, মিসর।

[৩] সুলতান জালালুদ্দিনের এই কন্যার নাম ছিল তুরকান খাতুন। সুলতানের শাহাদাতের সময় তার বয়স ছিল দুই বছর। তাতাররা তাকে মংকে খানের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল যেখানে সে বড় হয়। যখন হালাকু খানকে মধ্য এশিয়ায় পাঠানো হয়, তখন এই মেয়েটিকেও তার সাথে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। (তারিখে জাহানগুশা জুওয়াইনি, ৫৩৫, ৫৩৬, দার হারমাস)।

[৪] জামিউত তাওয়ারিখ (আরবি): খণ্ড ২, অংশ ১, পৃষ্ঠা ৩০৬।

এরবিলের পতন

এরবিলের দুর্গ এশিয়ায় অতুলনীয় বলে বিবেচিত হতো যেখানে যোদ্ধা কুর্দিদের একটি বাহিনী উপস্থিত ছিল। তাতার সর্দার ‘আরকিউ নওয়ান’ এখানে এসে নাজেহাল হয়ে পড়েন। অবশেষে বদরুদ্দিন লুলুর সাথে পরামর্শ করা হলো। তিনি গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বললেন কারণ তারা (কুর্দিরা) গরমে ঘাবড়ে যায়। লুলুর প্রতারণা ও যুদ্ধকৌশলের বদৌলতে ছয় মাসের অবরোধের পর এই দুর্গ জয় করা হয়। [১]

মিয়াফারেকিনের রণাঙ্গন

এর দুই মাস আগে তাতারদের একটি বাহিনী ইলকা নওয়ী এবং হালাকু খানের পুত্র আশমুতের নেতৃত্বে মিয়াফারকিনের প্রাচীরের সামনে পৌঁছে গিয়েছিল, যা আইয়ুবী বংশের একটি শক্তিশালী কেন্দ্র ছিল। [২] এখানে আল-মালিক আল-আদিলের সাহসী নাতি মুহাম্মদ আল-কামিলের শাসন ছিল, যিনি অত্যন্ত ভদ্র, ন্যায়পরায়ণ, আত্মমর্যাদাশীল এবং সাহসী শাসক ছিলেন। [৩] তাঁর যুহদ, ইবাদত ও পরহেজগারির অবস্থা এমন ছিল যে তিনি বাইতুল মাল থেকে কিছুই নিতেন না, বরং নিজে তাঁতে কাপড় বুনতেন এবং তা বিক্রি করে জীবন অতিবাহিত করতেন। [৪]

তিনি কয়েক বছর আগে কৌশলগত কারণে তাতারদের আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন এবং মঙ্গোলিয়া গিয়ে থাকান মঙ্গু খানের কাছ থেকে বিশেষ ছাড়ের সনদ নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু হালাকু খান যখন ৬৫৫ হিজরির শেষের দিকে বাগদাদের দিকে অগ্রসর হন তখন মুহাম্মদ আল-কামিল আসন্ন বিপদ অনুভব করে দামেস্কে গিয়ে আল-মালিক আন-নাসিরকে বলেছিলেন: “সময়ের দাবি হলো আমরা একটি বিশাল বাহিনী নিয়ে খলিফার সাহায্যের জন্য যাই।” আল-মালিক আন-নাসির তখন আল-কামিলকে অনেক সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছিলেন এবং সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন [৫], কিন্তু তাঁর আমল করার তৌফিক হয়নি, যার ফলে আজ তাতার বাহিনী সিরিয়ার সীমান্তের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। এই আক্রমণের একটি কারণ এও ছিল যে, মুহাম্মদ আল-কামিল তাঁর পুরো রাজ্যে মদ্যপানের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন, যার ফলে কিছু মদ্যপ কর্মকর্তা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিল এবং এই শত্রুতার কারণেই তারা তাতারদের মিয়াফারকিন আক্রমণের প্ররোচনা দিয়ে আসছিল। [৬]

মুহাম্মদ আল-কামিল তাঁর রাজ্যের শহর ‘আমদ’-এ ছিলেন যখন তিনি তাতারদের মিয়াফারেকিনের কাছে পৌঁছানোর খবর পান। তিনি তাঁর সেনাদল নিয়ে তাদের বাধা দিতে বের হন, কিন্তু কাছে পৌঁছে দেখেন যে শত্রুর সংখ্যা অনুমানের চেয়ে অনেক বেশি।

[১] জামেউত তাওয়ারিখ (আরবি): খণ্ড ২, প্রথম অংশ: পৃষ্ঠা ২৯৮, ২৯৯; তারিখ ইবনে খালদুন: ৫/ ৩২২, তবা দারুল ফিকর।

[২] জামেউত তাওয়ারিখ (আরবি): খণ্ড ২, প্রথম অংশ: পৃষ্ঠা ৩১৯; জাইলু মিরাতয যামান: ১/ ৯১, তবা দারুল কিতাব আল-ইসলামি কায়রো।

জামেউত তাওয়ারিখ ইত্যাদিতে আল-জাজিরায় হালাকুর বাহিনীর আক্রমণের সূচনা ৬৫৭ হিজরিতে বলা হয়েছে, কিন্তু সমসাময়িক ঐতিহাসিক ও প্রত্যক্ষদর্শী ইবনে শাদদদের মতে মিয়াফারেকিনের অবরোধ ১২ জিলকদ ৬৫৬ হিজরিতে শুরু হয়েছিল। (আল-আলাকুল খাতিরা লি-ইবনে শাদদ, পৃষ্ঠা ১৮৮, তবা আশ-শামেলা)। যেখানে মিয়াফারেকিনের শাসকের কর্তিত মস্তক জমাদিউল আউয়াল ৬৫৮ হিজরিতে দামেস্কে পাঠানো হয়েছিল। এভাবে অবরোধের সময়কাল দেড় বছর হয়, যাকে কোনো কোনো কবি রূপক অর্থে দুই বছর হিসেবেও উল্লেখ করেছেন। (জাইলু মিরাতয যামান: ১/ ৩৫৯)। হাফেজ জাহাবি এই সময়কালকে প্রায় বিশ মাস গণনা করেন। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২৩/ ২০৩)। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী মিয়াফারেকিনের অবরোধের সূচনা শাবান ৬৫৬ হিজরিতে হয়। তবে ইবনে শাদদদের বক্তব্যই অগ্রগণ্য, যা থেকে জানা যায় যে হালাকু বাগদাদ বিজয়ের আট মাস পর আল-জাজিরায় অভিযান শুরু করেছিলেন, তখনই এই বাহিনী জিলকদ মাসের শুরুতে মিয়াফারেকিনে পৌঁছেছিল। এছাড়া কিছু দুর্গ যেমন এরবিল বাগদাদ অভিযানের সময়ই ঘেরাও করা হয়েছিল, যদিও এর বিজয় অনেক দেরিতে হয়েছিল। (জামেউত তাওয়ারিখ (আরবি): খণ্ড ২, প্রথম অংশ: পৃষ্ঠা ২৯৮)।

[৩] সিয়রু আলামিন নুবালা: ২৩/ ২০৩, তবা আর-রিসালা।

[৪] জামেউত তাওয়ারিখ (আরবি) আজ রশিদ উদ্দিন ফজলুল্লাহ: খণ্ড ২, প্রথম অংশ: পৃষ্ঠা ৩২৩।

[৫] জামেউত তাওয়ারিখ (আরবি): খণ্ড ২, প্রথম অংশ: পৃষ্ঠা ৩২২; সিয়রু আলামিন নুবালা: ২৩/ ২০৩, তবা আর-রিসালা, এই সাক্ষাতের বিবরণ আগে অতিক্রান্ত হয়েছে।

[৬] আল-আলাকুল খাতিরা ফি উমারইশ শাম ওয়াল জাজিরা, লি-ইবনে শাদাদ, ১৮৮, তবা আশ-শামেলা।

সে তৎক্ষণাৎ মিয়াফারেকিনের দিকে ফিরে গেল এবং তাতার বাহিনীর আগেই শহরে প্রবেশ করে মোরচাবন্দ হয়ে গেল। [১]

সে তার বাহিনীর আমিরদের জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করল এবং তাদের বলল:

“আমার কোষাগারে যে সোনা-রূপা আছে, তা অভাবীদের জন্য ওয়াকফ। আলহামদুলিল্লাহ! আমি মুসতাসিমের মতো দিরহাম ও দিনারের গোলাম নই, যে তার কৃপণতার কারণে বাগদাদও দিয়ে দিয়েছে এবং নিজের মাথাও।”

তার এই সাহসী কথায় পুরো শহর জীবন বাজি রাখতে প্রস্তুত হয়ে গেল।

এদিকে ইলকা নঈন এবং হালাকু তনয় আশমুত মিয়াফারেকিনের প্রাচীরের সামনে পৌঁছে গেল এবং তারা আল-কামিলকে আনুগত্যের প্রস্তাব দিল এবং প্রাণভিক্ষার নিশ্চয়তা দিল। মুহাম্মদ আল-কামিল উত্তর দিলেন:

“একজন শাসকের জন্য এটি শোভা পায় না যে সে ঠান্ডা লোহায় আঘাত করবে অথবা অসম্ভব কোনো বিষয়ে বিশ্বাস করবে। তোমাদের প্রতিশ্রুতির কোনো বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। আমি তোমাদের মিষ্টি কথায় ধোঁকা খাওয়ার পাত্র নই। তাতার বাহিনীর প্রতি আমার কোনো ভয় নেই। আমি শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়াই করব। আমি এমন ব্যক্তির ছেলের ওপর কীভাবে আস্থা রাখতে পারি যে বাগদাদের খলিফার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।”

পরের দিন মুহাম্মদ আল-কামিল বিদ্যুৎগতি সম্পন্ন অশ্বারোহীদের একটি দল নিয়ে হঠাৎ শহর থেকে বেরিয়ে তাতার বাহিনীর ওপর আক্রমণ করলেন।

তার কাছে বিশ্বের সেরা দুইজন তলোয়ারবাজ ছিল: একজন সাইফউদ্দিন লকবালি, অন্যজন আম্বর হাবশি। তারা চোখের পলকে অনেক শত্রুকে যমপুরীতে পাঠিয়ে দিল। কিছুক্ষণ আক্রমণের পর এই দলটি পুনরায় শহরে ফিরে গিয়ে আত্মগোপন করল এবং শহরবাসীর সাথে মিলে প্রাচীরের বুরুজ থেকে তাতারদের ওপর তীর ও পাথর নিক্ষেপ অব্যাহত রাখল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনও এই জানবাজরা একইভাবে বাইরে বেরিয়ে তাতারদের ক্ষয়ক্ষতি করল। চতুর্থ দিন তাতাররা সাইফউদ্দিন লকবালি ও আম্বর হাবশির মোকাবিলা করার জন্য জর্জিয়ার সবচেয়ে বড় পালোয়ান ‘নাওয়ারি’কে পাঠাল, যার সম্পর্কে প্রসিদ্ধ ছিল যে সে একাই একটি বাহিনীর সমান। কিন্তু কিছুক্ষণ তীব্র লড়াইয়ের পর নাওয়ারিও নিহত হলো।

মিয়াফারেকিনে একটি শক্তিশালী মানজানিক ছিল যার পাল্লা ছিল অনেক দূর পর্যন্ত। শহরবাসী এর মাধ্যমে পাথর নিক্ষেপ করে তাতারদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করতে থাকল। তাতারদের জন্য এই ছোট শহরটি লোহার চিবানো ছোলার মতো কঠিন হয়ে দাঁড়াল। [২] তিন মাস অতিবাহিত হলো কিন্তু এই শহরটি অপরাজেয় রয়ে গেল। অবশেষে তাতাররা মসুল থেকে একটি বিশাল মানজানিক আনিয়ে নিল। [৩] এর সাথে একজন অত্যন্ত দক্ষ মানজানিক চালকও ছিল। সে এই চমৎকার মানজানিকটি মসুলের প্রাচীরে স্থাপিত ভয়াবহ মানজানিকটির ঠিক সোজাসুজি স্থাপন করল। এখন উভয় মানজানিক একই সাথে একে অপরের ওপর পাথর ও অগ্নিবৃষ্টি শুরু করল। উভয় পক্ষের মানজানিক চালকরা দক্ষতায় একে অপরের চেয়ে এগিয়ে ছিল। বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল এই যে, উভয়ের পাথর একসাথে আকাশে উঠত এবং মাঝপথে একে অপরের সাথে ধাক্কা খেয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত। মানুষ মানজানিক চালকদের এই দক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে প্রশংসা করছিল। [৪]

[১] আল-আলাকুল খাতিরা লি ইবনে শাদ্দাদ, পৃ. ১৮৮, ত. আশ-শামেলা।

[২] জামিউত তাওয়ারিখ (আরবি) আজ রশিদ উদ্দিন ফজলুল্লাহ: খণ্ড ২, প্রথম অংশ: পৃ. ৩১৯, ৩২০, ত. দার ইহয়াউল কুতুবিল আরাবিয়া মিসর।

[৩] তাবাকাত নাসিরি: ২/ ২০৩ থেকে ২০৪।

[৪] জামিউত তাওয়ারিখ (আরবি): খণ্ড ২, প্রথম অংশ: পৃ. ৩২০, ৩২১।

সারাদিন এই দৃশ্য চলতে থাকে, তবে শেষ পর্যন্ত মিয়াফারিফিনের মুজাহিদিনরা তাতার বাহিনীর মিনজানিক (ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপক যন্ত্র) পুড়িয়ে দিতে সক্ষম হন। [১]

এরপর মুহাম্মদ আল-কামিল আগের মতোই দুর্গ থেকে বের হয়ে তাতারীদের ওপর আক্রমণ করা এবং তাদের জান-মালের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করা অব্যাহত রাখেন। [২] হালাকু খান এই সংবাদ পেলে তিনি আরতুকু নামক এক সেনাপতিকে সাহায্যকারী বাহিনী দিয়ে পাঠান এবং সেই সাথে ইলকা নোয়ানকে নির্দেশ দেন যেন শহরের অবরোধ দৃঢ়ভাবে অব্যাহত রাখা হয়, যতক্ষণ না শহরের পশুখাদ্য শেষ হয়ে যায়।

আরতুকু সবেমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছে ইলকা নোয়ানকে এই বার্তা দিচ্ছিলেন, এমন সময় শহরের প্রাচীর থেকে আশ্বর হাবশি এবং সাইফ উদ্দিন এমন এক তুফানি আক্রমণ চালালেন যে তাতার বাহিনীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলো। আরতুকু এটি দেখে মদের বোতল মুখে লাগালেন এবং নেশায় চুর হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ইলকা নোয়ানও ঘোড়ায় চড়ে তার বাহিনীকে যুদ্ধ করাতে বের হলেন, কিন্তু আশ্বর হাবশি এবং সাইফ উদ্দিন তাতারীদের ব্যুহ তছনছ করে তার কাছে পৌঁছে গেলেন। তাদের আক্রমণে ইলকা নোয়ান ঘোড়া থেকে নিচে পড়ে যান। তাতারীরা চারদিক থেকে ছুটে এসে তাকে সাহায্য করে ঘোড়ায় চড়িয়ে দেয়। এই সময়ের মধ্যে আশ্বর হাবশি এবং সাইফ উদ্দিন বীরত্বের সাথে লড়াই করে নিরাপদে ফিরে যান। মোটকথা, আক্রমণের এই ধারা অব্যাহত থাকে এবং কাফেররা মুহাম্মদী সিংহদের পরাস্ত করতে সক্ষম হয়নি। [৩]

মিয়াফারিফিনের রক্ষার জন্য ইবনে শাদদাদের কূটনৈতিক প্রচেষ্টা:

মিয়াফারিফিনের ওপর তাতারীদের আক্রমণ সিরিয়ার শাসক আল-মালিক আল-নাসিরকে অস্থির করে তুলেছিল। তিনি আল্লামা ইজ্জুদ্দিন ইবনে শাদদাদকে দূত বানিয়ে একটি প্রতিনিধি দলের সাথে হালাকু খানের কাছে পাঠান যাতে মিয়াফারিফিনের মুক্তির কোনো পথ বের করা যায়। [৪] এই প্রতিনিধি দল ১লা মহরম ৬৫৭ হিজরিতে দামেস্ক থেকে রওনা হয় এবং সফর মাসে হালাকু খানের কাছে পৌঁছায়। ইবনে শাদদাদ আল-মালিক আল-নাসিরের পত্রটি পাঠ করে শোনান, যাতে হালাকু খানকে তার আগমনে অভিনন্দন জানানো হয়েছিল এবং সেই সাথে আল-জাজিরার ওপর তার আক্রমণ ও নিরপরাধ নাগরিকদের গণহত্যার জন্য দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছিল। পত্রে বলা হয়েছিল যে, আইয়ুবী রাষ্ট্র বিশ বছর ধরে কোনো জবরদস্তি ছাড়াই নিজের ইচ্ছা ও পছন্দে তাতারীদের সাথে সহনশীলতার সম্পর্ক বজায় রেখেছে এবং তাদের ক্রমাগত মূল্যবান উপহার ও ধন-সম্পদ পাঠিয়ে আসছে, কিন্তু তাতারীদের পক্ষ থেকে এর জবাবে এখন পর্যন্ত যে আচরণ করা হয়েছে তা হতাশাজনক।

হালাকু খান পত্রটি শুনে প্রতিনিধি দলকে কোনো উত্তর দেননি এবং তাদের অতিথি শালায় ফেরত পাঠিয়ে দেন। পরের দিন তিনি প্রতিনিধি দলকে তলব করেন এবং অত্যন্ত কঠোরভাবে বলেন: ”তোমাদের প্রজারা আমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, যুদ্ধের সূচনা তাদের পক্ষ থেকেই হয়েছে। আমরা আল-জাজিরার ওপর আক্রমণ করেছি শুধুমাত্র এই জন্য যাতে আমরা আমাদের শত্রু আরব এবং তুর্কমেন উপজাতিদের শায়েস্তা করতে পারি।”

আল্লামা ইবনে শাদদাদ উত্তর দিলেন: ”যখন আপনি আমাদের সাথে ন্যায়বিচার করেননি, তখন আমরা বাধ্য হয়ে আপনার আনুগত্যের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে গেছি।”

[১] তাবাকাত-ই নাসিরি: ২/৪০৩

[২] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৬৫৭ হিজরি; সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২৩/৩০২, ত. আর-রিসালাহ

[৩] জামিউত তাওয়ারিখ (আরবি), রশিদ উদ্দিন ফজলুল্লাহ: ২য় খণ্ড, ১ম অংশ: পৃ. ৩২০, ৩২১, ত. দারু ইহয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ মিশর

[৪] ইনি বাহউদ্দিন ইবনে শাদদাদ (মৃ. ৬৩২ হি., লেখক: আন-নাওয়াদিরুস সুলতানিয়াহ) নন, যিনি সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সহচর ছিলেন; বরং ইনি হলেন ইজ্জুদ্দিন ইবনে শাদদাদ (লেখক: সিরাতুল মালিকিজ জাহির)। তিনি ৬১৩ হিজরিতে আলেপ্পোতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬৮৪ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

তিনি প্রথমে আল-মালিক আল-নাসির আইয়ুবী এবং পরে রুকনুদ্দিন বাইবার্সের সহচর ছিলেন।

তারিখে উম্মতে মুসলিমা — চতুর্থ খণ্ড

এটি শুনে তাতারী অফিসাররা রাগান্বিত হয়ে গেল এবং বলল: “তোমরা কতজন মানুষই বা আছ? কে আছে যে খানের সামনে এভাবে কথা বলতে পারে?” এরপর প্রতিনিধি দলকে নিহতদের এক বিশাল স্তুপের সামনে নিয়ে যাওয়া হলো এবং বলা হলো: “যদি তোমরা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় না দাও, তবে তোমাদের অবস্থাও এমনই হবে।”

কয়েকদিন পর হালাকু খানের প্রতিনিধিরা চাইল যে আল্লামা ইবনে শাদ্দাদ তাতারীদের দূত হয়ে মুহাম্মদ আল-কামিলের কাছে যান এবং তাকে আত্মসমর্পণ করতে রাজি করান। তারা আল্লামার কাছে মিথ্যা করে বলল: “মিয়াফারিকিনের শাসক আপনাকে ডাকছেন।”

আল্লামা ইবনে শাদ্দাদ বললেন: “তার সাথে দেখা করার আমার কোনো প্রয়োজন নেই।” তাতারী কর্মকর্তারা বলল: “আপনি আমাদের প্রতিনিধি হয়ে তার কাছে যাবেন।” ইবনে শাদ্দাদ বললেন: “আমার বাদশাহর পক্ষ থেকে আমাকে এর অনুমতি দেওয়া হয়নি।”

তাতারী কর্মকর্তারা বলল: “আপনাকে যেকোনো মূল্যে যেতেই হবে।” ইবনে শাদ্দাদ যখন তাদের জেদ দেখলেন, তখন জিজ্ঞেস করলেন: “তার সাথে দেখা করে আমাকে কী বলতে হবে?” তাতারী কর্মকর্তারা বলল: “আপনি তাকে বলবেন যে, আমি দামেস্কের শাসকের পক্ষ থেকে আপনার সুপারিশকারী হয়ে এসেছি, তবে শর্ত হলো আপনাকে হালাকু খানের দরবারে উপস্থিত হতে হবে এবং তার আনুগত্য স্বীকার করে নিতে হবে।”

আল্লামা ইবনে শাদ্দাদ তাতারীদের হাতের পুতুল হতে পরিষ্কারভাবে অস্বীকার করলেন। এটি দেখে তাতারীরা তাকে লাশে ভরা একটি উপত্যকার কাছে নিয়ে গেল এবং বলতে লাগল: “পরবর্তী মুহূর্তেই আপনার অবস্থাও এমন হতে চলেছে।”

আল্লামা ইবনে শাদ্দাদ নির্ভীকভাবে বললেন: “আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদীর কেউ এড়াতে পারে না।”

তাতারীদের দোভাষী আল্লামাকে জিজ্ঞেস করতে লাগল: “আসলে আমাদের দূত হয়ে যেতে আপনার বাধা কোথায়?”

আল্লামা ইবনে শাদ্দাদ বললেন: “তোমাদের কর্মকর্তারা চায় আমাকে গুটি হিসেবে ব্যবহার করে মিয়াফারিকিনের শাসককে শহরের বাইরে বের করে আনতে এবং তাকে হত্যা করতে, আর শহর দখল করে সেখানে গণহত্যা চালাতে, আর আমি যেন তার মাধ্যম হই।”

দোভাষী আল্লামার এই কথা শুনে ঘাবড়ে গেল এবং বলল: “এই কথা পুনরায় বলবেন না। এই তাতারীরা আপনাকে এখনই হত্যা করে ফেলবে।”

পরিস্থিতির নাজুকতা দেখে ইবনে শাদ্দাদ বাহ্যিকভাবে দূত হতে রাজি হয়ে গেলেন। তাকে অবরুদ্ধ শহরের ফটকে পৌঁছে দেওয়া হলো। তিনি একজন তাতারী অফিসারের সাথে ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং বেশ কয়েকদিন ধরে ক্রমাগত মিয়াফারিকিনের উপ-শাসক ইলমুদ্দিন আসারের সাথে সাক্ষাৎ করতে থাকলেন। এই সাক্ষাৎগুলোতে ইলমুদ্দিন আসার প্রতিনিধি দলকে খাবারের জন্য ঝলসানো মাংস, আস্ত মুরগির রোস্ট এবং হালুয়া পরিবেশন করতে থাকলেন, যদিও শহরে খাদ্যের খুব অভাব ছিল, কিন্তু ইলমুদ্দিন তাতারীদের কাছে এটি প্রকাশ করতে চাচ্ছিলেন যে তাদের কাছে প্রচুর খাদ্য রয়েছে। আল্লামা ইবনে শাদ্দাদ বাধ্য হয়ে এখানে এসেছিলেন এবং দ্বিমুখী কৌশল অবলম্বন করছিলেন। তিনি মিয়াফারিকিনের কর্মকর্তাদের গোপনে বলে দিলেন যে, আপনারা আপনাদের শহরের কল্যাণ ভালো বোঝেন, আপনাদের যা উপযুক্ত মনে হয় তাই করুন। এই সময়ে সাময়িক যুদ্ধবিরতি ছিল, যার সুযোগ নিয়ে মুহাম্মদ আল-কামিল প্রাচীরের ফাটলগুলো বন্ধ করে দিলেন এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত অংশগুলো নতুন করে নির্মাণ করে নিলেন। এদিকে আল্লামা ইবনে শাদ্দাদের কাছে আল-মালিকুন নাসিরের পক্ষ থেকে একের পর এক পত্র আসছিল যে, যেকোনোভাবে তাতারীদের যেন মিয়াফারিকিন থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

অবশেষে ইবনে শাদদদের প্রচেষ্টায় এটি স্থির হলো যে, তাতারীরা এক লক্ষ দিরহাম গ্রহণ করে অবরোধ তুলে নেবে। ফলে তাদের কাছে এই অর্থের একটি কিস্তি পৌঁছে দেওয়া হলো এবং তারা প্রস্থানের প্রস্তুতি নিতে শুরু করল। প্রকৃতপক্ষে তাতারীদের আশঙ্কা ছিল যে, আল-মালিকুন নাসির দামেশকে জিহাদের প্রস্তুতি নিচ্ছেন এবং যেকোনো সময় তিনি মুহাম্মদ আল-কামিলের সাহায্যের জন্য সৈন্য পাঠাতে পারেন। কিন্তু এরই মধ্যে তাতারীদের কাছে মসুলের শাসক বদরুদ্দিন লুলুর একটি গোপন পত্র এসে পৌঁছাল, যাতে জানানো হয়েছিল যে, দামেশকে আল-মালিকুন নাসিরের আমিরগণ তাঁর বিরোধী হয়ে গেছেন এবং সিরিয়ার পরিস্থিতি বাদশাহর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে।

এই সংবাদ পাওয়ামাত্রই তাতারীদের সাহস বেড়ে গেল এবং তারা চুক্তি বাতিল করে পুনরায় অবরোধে অনড় হয়ে বসল। এবার আশমুত বিন হালাকু আল্লামা ইবনে শাদদকে তলব করে জিজ্ঞেস করল: “এই আইয়ুবি আমিররা কেমন? তাদের শক্তি কতটুকু?” তিনি বললেন: “তারা ইসলামি বিশ্বের সবচেয়ে সাহসী মানুষ। এরাই সেই লোক যারা ফ্রঁসকে দিমিয়াতে পরাজিত করেছিল। এখানে তাদের কাছে এক হাজার অশ্বারোহী রয়েছে।” আশমুতের অফিসাররা বলতে লাগল: “না, না, তাদের সংখ্যা এর চেয়ে কম।” আল্লামা বললেন: “আমি তাদের সম্পর্কে বেশি জানি।”

আশমুত আল্লামা ইবনে শাদদকে সিরিয়ায় ফেরত পাঠিয়ে দিল এবং যুদ্ধ জোরদার করার নির্দেশ দিল। কিন্তু সৌভাগ্যবশত সেই দিনগুলোতে সেখানে প্রবল তুষারপাত শুরু হলো এবং একটি মহামারী তাতারীদের অধিকাংশ ঘোড়াকে ধ্বংস করে দিল। পুরো বাহিনীতে কোনোমতে পনেরোশ ঘোড়া অবশিষ্ট রইল। অবশেষে ২৯ রবিউল আউয়াল ৬৭৫ হিজরিতে আশমুত তিন হাজার পদাতিক সৈন্য শহরের অবরোধে রেখে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে গেল। শীতের তিন-চার মাস এভাবেই কেটে গেল। এই অবসরের সুযোগ নিয়ে আল-কামিল শহরের চারপাশে আরও একটি প্রাচীর নির্মাণ করলেন এবং সেই সাথে একটি নতুন পরিখা খনন করে তাতে পাহাড়ি ঝরনার পানি ছেড়ে দিলেন। এর পাশাপাশি তিনি সিরিয়ার বিভিন্ন দরবারে নিজের দূত পাঠিয়ে সাহায্য চাইলেন, কিন্তু সিরিয়াবাসীরা নিজেদের সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত ছিল। ফলে শীত কাটতেই তাতারীরা নতুন প্রস্তুতি নিয়ে মিয়াফারকিনের চারপাশে সমবেত হলো। [১]

এটি আমার শহর—নববী সুসংবাদ:

মিয়াফারকিনের ওপর এই আক্রমণের সময় বদরুদ্দিন লুলুর এক ছেলে, যে মসুলের বাহিনীর সাথে তাতার লশকরে অন্তর্ভুক্ত ছিল, শহরবাসীর প্রতিরোধ দেখে বিস্মিত ছিল। এক রাতে সে স্বপ্নে আকায়ে নামদার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জিয়ারত লাভ করল। দেখল যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিয়াফারকিনের প্রাচীরের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন, কেবলটিকে নিজের বরকতময় আঁচলে আগলে রেখেছেন এবং বলছেন: “এই কেবল আল্লাহর আশ্রয়ে এবং এই শহর আমার আশ্রয়ে রয়েছে।”

সাহেবজাদা জাগ্রত হয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ল। দ্বিতীয় রাতেও সে একই স্বপ্ন দেখল। তৃতীয় রাতেও আবার এমনটিই ঘটল। সকাল হতেই সে কয়েকজন সঙ্গীর সাথে শিকারের অজুহাতে ছাউনি থেকে বের হয়ে পালিয়ে গেল।

[১] আল-আলাকুল খাতিরা লি-ইজুদ্দিন ইবনে শাদদ, পৃ. ১৮৯, ১৯০, ত. শামিলা।

চতুর্থ অংশ

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

বদরুদ্দিন লুলু যখন জানতে পারলেন, তখন তাকে এই বার্তা পাঠালেন:

“এই কাজ করে তুমি আমাকে এবং আমার শহরগুলোকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছ। এমন কেন করলে?”

ছেলে জবাবে সেই স্বপ্নের কথা উল্লেখ করল এবং শেষে লিখল: “আমি রাসূলুল্লাহ-এর সাথে যুদ্ধ করতে পারব না।”

এরপর লুলুর এই ছেলের আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। [১] বদরুদ্দিন লুলুর জীবনকালও শেষ হয়ে এসেছিল। ৩ শাবান ৬৫৭ হিজরিতে তার ইন্তেকাল হয়। [২] বয়স ছিল ৯৬ বছর। [৩] মিয়াফারিকিন এরপরও অপরাজেয় থেকে যায়।

হলাকু খান মিয়াফারিকিন রণাঙ্গনে:

হলাকু খান মিয়াফারিকিন বিজয়ে বিলম্ব হওয়ায় দূতের মাধ্যমে ছেলেকে তিরস্কার করে পাঠালেন এবং বললেন: “আমি কয়েক দিনে বাগদাদ জয় করে নিয়েছিলাম, আর তুমি একটি ছোট শহর এত দীর্ঘ সময়েও জয় করতে পারলে না?”

ছেলে জবাব পাঠাল: “আপনি বাগদাদ ধোঁকার মাধ্যমে জয় করেছিলেন। এই রণাঙ্গনে তলোয়ার চালাতে হচ্ছে।”

হলাকু খান এই জবাবে রাগান্বিত হয়ে নিজেই অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। [৪] তিনি ২২ রমজান ৬৫৭ হিজরিতে তার শিবির থেকে রওনা হলেন। [৫] মিয়াফারিকিন পৌঁছে তিনি সেনাবাহিনীর কমান্ড নিজের হাতে তুলে নিলেন। তিনি কসম খেলেন যে, তিন দিনের মধ্যে এই শহর দখল করে দেখাবেন। কিন্তু তিন দিনের টানা ভয়াবহ যুদ্ধে দশ হাজার তাতারী নিহত হলো এবং মিয়াফারিকিন-এর মুসলমানরা অটল থাকল। এই সময়ে তাতারীরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াইরত অদ্ভুত সাদা পোশাকধারী অশ্বারোহীদের দেখতে পেল, যাদের প্রত্যেকে শত শত তাতারীকে হত্যা করেছিল। অবশেষে হলাকু খান যুদ্ধ থামিয়ে মুহাম্মদ আল-কামিলকে বলে পাঠালেন:

“এই শহরের ওপর আল্লাহর ছায়া রয়েছে। তাই আমি তোমাদের মুক্ত করে দিচ্ছি। তবে একটি আবদার আছে, তা হলো সেই সাদা পোশাকধারীদের আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। আমি দেখতে চাই তারা কেমন মানুষ?”

মুহাম্মদ আল-কামিল জবাব দিলেন: “আমরা এমন লোকদের চিনি না। আমরা জানি না তারা কারা?”

হলাকু বার্তা পাঠাল: “আমি এক হাজার ঘোড়া, এক হাজার উট এবং এক হাজার ছাগল সদকা দিতে চাই। শহরবাসী বাইরে এসে তা গ্রহণ করুক।”

মুহাম্মদ আল-কামিল এই ধোঁকাতেও পা দিলেন না এবং জবাব দিলেন: “আমাদের মধ্য থেকে কেউ বাইরে আসবে না। যদি দিতে চাও তবে তোমাদের লোক এই গবাদিপশু নিয়ে নিজেরাই শহরে চলে আসুক। অন্যথায় আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। এগুলো যেখানে ইচ্ছা দিয়ে দাও।” [৬]

[১] তবাকাত-ই নাসিরি: ২/২০৩, মিয়াফারিকিন রণাঙ্গনে বদরুদ্দিন লুলুর দুই ছেলে এসেছিল: এক সাইফুদ্দিন ইসহাক, দ্বিতীয় আলাউদ্দিন আলী। (আল-আলাক আল-খাতিরা, পৃ. ১৮৯, আল-শামিলা) - সম্ভবত এটি আলাউদ্দিন ছিল। এমনিতে আল-জাজিরা অভিযানে লুলুর ছেলে আল-সালিহ-ও অন্তর্ভুক্ত ছিল কিন্তু সে নিখোঁজ হয়নি। একইভাবে ইসহাকও পরিচিত ছিল।

[২] সিয়ার আলামুন নুবালা: ২৩/৩৫৬, ৩৫৭, ত. আল-রিসালা।

[৩] জামিউত তাওয়ারিখ (আরবি): খণ্ড ২, প্রথম অংশ: পৃ. ৩৩৭।

[৪] তবাকাত-ই নাসিরি: ২/২০৩, ২০২।

[৫] জামিউত তাওয়ারিখ (আরবি): খণ্ড ২, প্রথম অংশ: পৃ. ৩০৫।

[৬] তবাকাত-ই নাসিরি: ২/২০৩ থেকে ২০৪।

এখন তাতারীরা শেষ চাল চালল। আল-কামিলের স্ত্রী ও সন্তানরা অন্য একটি দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিল। তাতারীরা সেটি দখল করার পর আল-কামিলের সন্তানদের বন্দী করল এবং মিয়াফারিকিনের প্রাচীরের সামনে এনে দাঁড় করাল যাতে আল-কামিল তাদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য শহরটি হস্তান্তর করে দেয়। কিন্তু আল-কামিলের উত্তর ছিল: “আমার কাছে তোমাদের জন্য তলোয়ার ছাড়া আর কিছুই নেই।” [১]

মিয়াফারিকিন জয় করার নিত্যনতুন কৌশল:

এখন শহরটি জয় করার জন্য একটি নতুন খেলা খেলা হলো। শরফ উদ্দিন আলাই নামক এক প্রধানকে পাঠানো হলো, যে মিয়াফারিকিনের কর্মকর্তাদের সুসংবাদ দিল যে, সে সত্তর হাজার দিনার দিয়ে হালাকু খানের কাছ থেকে এই শহরটি কিনে নিয়েছে, অতএব যুদ্ধ বন্ধ করা হোক।

কিন্তু তার এই প্রতারণা কার্যকর হওয়ার আগেই বদর উদ্দিন লুলুর পক্ষ থেকেও একজন দূত এসে শহরবাসীকে সুসংবাদ দিল যে, লুলু এই শহরটি হালাকু খানের কাছ থেকে কিনে নিয়েছে। এখন প্রতারণা স্পষ্ট হয়ে গেল। ইলম উদ্দিন আসর দূতকে বললেন:

“তোমার প্রভুর যোগ্যতা আমাদের জানা আছে। আমরা আল্লাহর কাছে প্রাণ উৎসর্গ করার বায়আত গ্রহণ করেছি। আল্লাহর কসম! এই শহর ততক্ষণ পর্যন্ত মাথা নত করবে না যতক্ষণ না এর প্রতিটি পাথর উপড়ে ফেলা হয়।”

মিয়াফারিকিন দখলের মাধ্যমে তাতারীদের জন্য এশিয়া মাইনরের পথও খুলে যেত, তাই এশিয়া মাইনরের সেলজুক শাসক ইজউদ্দিনও এই যুদ্ধ নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। তিনি নিজে সন্ধি করানোর জন্য মিয়াফারিকিন এলেন। মুহাম্মদ আল-কামিলের প্রতিনিধিদের সাথে দেখা করে তিনি বললেন: “বিচক্ষণতা এটাই যে, মুহাম্মদ আল-কামিল হালাকু খানের দরবারে উপস্থিত হোক। আমি হালাকু খানের কাছ থেকে ক্ষমার পরোয়ানা নিয়ে এসেছি।”

মুহাম্মদ আল-কামিলের প্রতিনিধিরা বললেন: “যদি তাতারীরা শহরের অবরোধ তুলে নিয়ে চলে যায়, তবে আমরা নিজেরাই আমাদের বাদশাহকে নিয়ে হালাকু খানের কাছে উপস্থিত হব।”

তাতারী কর্মকর্তারা এই দাবির পেছনের চাল বুঝতে পারল এবং বলল:

“আমরা অবরোধ শেষ করার সাথে সাথেই আল-কামিল পাহাড়ে অবস্থান গ্রহণ করবে।” [২]

হালাকু ফোরাত নদীর ওপারে—সিরিয়ায় আতঙ্ক:

হালাকু বিরক্ত হয়ে মিয়াফারিকিন রণাঙ্গন তার প্রতিনিধিদের হাতে সোপর্দ করল এবং নিজে ফোরাত নদী পার হয়ে আলেপ্পোর দিকে রওনা হলো। যখন তার ফোরাত নদী পার হওয়ার খবর সিরিয়ায় পৌঁছাল, তখন মানুষের মধ্যে ভয়ে নাজেহাল অবস্থা হলো। আল-মালিকুন নাসির তার পরিবার-পরিজনকে নিরাপদ রাখার জন্য ‘কারাক’ দুর্গে পাঠিয়ে দিলেন। দামেস্কের অনেক মানুষ বিশৃঙ্খলার মধ্যে হিজরত করে মিসরের দিকে রওনা হলো, কিন্তু তখন ছিল প্রচণ্ড শীতের মৌসুম, তাই তাদের একটি বড় অংশ পথেই মৃত্যুবরণ করল। অনেক মানুষ ডাকাতদের হাতে সর্বস্ব হারাল। খুব কম লোকই সহিহ-সালামতে মিসর পৌঁছাতে পারল। [৩]

[১] সিয়রু আলমিন নুবালা: ২৩ / ৩০২, ত. আর-রিসালাহ

[২] আল-আলাকুল খাতিরা লি-ইবনি শাদ্দাদ, ১৯০, ১৯১, ত. আশ-শামিলাহ

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: সন ৬৫৭ হিজরি

হাররানের পতন:

এই সময়ের মধ্যে একের পর এক বহু শহর তাতারীদের দখলে চলে গিয়েছিল। জামাদিউল আউয়াল ৬৫৭ হিজরিতে হালাকু খানের বাহিনী হাররান দখল করে নিয়েছিল। এরপর এই বাহিনী মারদিনের দিকে অগ্রসর হয়। [১]

মারদিনের পতন:

মারদিনের প্রাচীরবেষ্টনী এতটাই মজবুত ছিল যে, হালাকু খানের ছেলে আশমুত, যে এটি জয় করতে এসেছিল, সে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। সে তার প্রতিনিধি আরতাকুকে পাঠিয়ে সেখানকার শাসক আল-মালিক আস-সাইদকে এই বার্তা দিল:

“দুর্গ থেকে নেমে এসো। নিজের প্রাণ বাঁচাও। তোমাদের নারী, শিশু ও সম্পদ নিরাপদ করো। অন্যথায় তোমাদের মাথা যদি আকাশ পর্যন্ত উঁচু হয়ে যায়, তবুও তা তাতার বাহিনীর পায়ের নিচেই আসবে।”

আল-মালিক আস-সাইদ জবাবে বলে পাঠিয়েছিলেন:

“আপনারা অন্যদের সাথেও অঙ্গীকার ও চুক্তি করেছিলেন কিন্তু পরে তাদের হত্যা করেছেন। তাই এখন আমি আপনাদের ওপর ভরসা করতে পারছি না। আলহামদুলিল্লাহ! দুর্গটি রসদপত্র এবং সাহসী কুর্দিস্তানি বাহিনীতে পরিপূর্ণ।”

অবশেষে তাতারীরা মিনজানিক (পাথর নিক্ষেপক যন্ত্র) দিয়ে পাথর নিক্ষেপ শুরু করল এবং তীব্র অবরোধমূলক যুদ্ধ শুরু হলো। আট মাস পর্যন্ত আল-মালিক আস-সাইদ বীরত্বের সাথে মোকাবিলা করলেন। কিন্তু এরপর দুর্ভিক্ষ বাহিনীকে দুর্বল করে দিল। আল-মালিক আস-সাইদ নিজেও অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হলেন। তার ছেলে মুজাফফর উদ্দিন অস্ত্র সমর্পণের জন্য জেদ ধরল কিন্তু আল-মালিক আস-সাইদ তা মানলেন না। অবশেষে ছেলে বিষ প্রয়োগ করে বাবাকে হত্যা করল এবং ‘আরতাকু’কে নিজের এই কীর্তির কথা জানিয়ে প্রাণভিক্ষার আবেদন করল, এভাবে যুদ্ধ থেমে গেল।

মুজাফফর উদ্দিন তার ভাইদেরসহ আরতাকুর কাছে উপস্থিত হলে সে কঠোর সুরে বলল:

“কোনো ছেলের জন্য কি তার বাবাকে হত্যা করা বৈধ?”

মুজাফফর উদ্দিন ঘাবড়ে গেল এবং নরম স্বরে বলল: “আমি বাবার সামনে অনুনয়-বিনয় করতে থাকলাম যেন তিনি মানুষের রক্তপাত বন্ধ করেন কিন্তু তিনি মানলেন না। আমি এই কাজটি এজন্য করেছি কারণ আমি জানতাম যে হালাকু খানের সৌভাগ্যের কারণে দুর্গ তো জয় হবেই, কিন্তু যুদ্ধের ফলে হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষ অকারণে মারা যাবে। তাই আমি ভাবলাম যে লক্ষ লক্ষ প্রাণ নষ্ট করার চেয়ে একটি প্রাণ নষ্ট করা উত্তম, বিশেষ করে যখন নিহত ব্যক্তি জালিমও বটে। যা-ই হোক, আমি আমার অপরাধ স্বীকার করছি। এরপরও যদি থাকান আমাকে এই শহরের শাসনে বহাল রাখেন তবে তা হবে তাঁর অনুগ্রহ।”

হালাকু খানের কাছে মুজাফফর উদ্দিনের মুনাবিকসুলভ চরিত্র এবং তোষামোদপূর্ণ উত্তর পছন্দ হলো এবং তাকে মারদিনের শাসনে বহাল রাখা হলো। [২]

[১] আন-নুজুমুজ জাহেরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহিরা: ৭/৭৩

[২] জামিউত তাওয়ারিখ (আরবি), রশীদ উদ্দিন ফজলুল্লাহ: খণ্ড ২, প্রথম অংশ: পৃষ্ঠা ৩২২ থেকে ৩২৬, তাবা দারু ইহয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ মিসর

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

সাইফ উদ্দিন মাহমুদ কুতুজ ইসলামের নতুন তলোয়ার

যিলকদ ৬৫৭ হিজরি থেকে যিলকদ ৬৫৮ হিজরি

এই বিপ্লবগুলোর সময় মিশরে ইজ্জ উদ্দিন তুর্কমানির নাবালক পুত্র নূর উদ্দিন আলী (আল-মালিক আল-মানসুর) সিংহাসনে আসীন ছিলেন এবং একজন সম্মানিত জেনারেল সাইফ উদ্দিন কুতুজ তার আতাবেগ এবং সালতানাতের নায়েব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।

সাইফ উদ্দিন কুতুজের জীবনের কাহিনী ছিল অত্যন্ত অদ্ভুত। মানুষ তাকে ক্রীতদাস মনে করত, অথচ তিনি ছিলেন সুলতান জালাল উদ্দিন খাওয়ারিজম শাহের ভাগ্নে। তিনি খাওয়ারিজম থেকে আসা সেই তুর্কি বালকদের একজন ছিলেন যাদেরকে দাস ব্যবসায়ীরা দাসের হাটে বিক্রি করে দিয়েছিল। তার আসল নাম ছিল মাহমুদ কিন্তু তাকে কুতুজ বলা হতো। তিনি বাজারে বাজারে বিক্রি হতেন এবং দাসত্বের চাবুকের আঘাতে দামেস্কের একজন ব্যবসায়ী ইবনে জাইমের হাতে এসে পৌঁছান। একদিন মনিব কোনো কারণে রেগে গিয়ে তাকে চড় মারেন এবং সেই সাথে তার বাবা-দাদাকে গালিগালাজ করেন। কুতুজ কাঁদতে শুরু করলেন। সারাদিন তিনি খাবার খেলেন না। মনিব তার ফরাশ (কর্মচারীদের কর্মকর্তা) হাজি আলীকে পাঠালেন তাকে সান্ত্বনা দিতে এবং খাবার খাওয়াতে। হাজি আলী গিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং বললেন: “মিয়াঁ! একটি চড় খেয়েই কাঁদতে শুরু করলে?” কুতুজ উত্তর দিলেন: “আমি চড়ের কারণে কাঁদছি না, বরং আমার বাবা-দাদাকে গালি দেওয়ার কারণে কাঁদছি, অথচ তারা আমার মনিবের চেয়েও উত্তম ছিলেন।” হাজি আলী বললেন: “তোমার বাবা কে? তিনি কি কোনো কাফের?”

কুতুজ চোখের পানি মুছতে মুছতে উত্তর দিলেন: “আমি মুসলিম এবং মুসলিমের সন্তান। আমার নাম মাহমুদ বিন মওদুদ, আমি জালাল উদ্দিন খাওয়ারিজম শাহের বোনের ছেলে। আমি রাজপরিবারের সন্তান।” [১] কিন্তু সেই সময় কুতুজের এই রহস্য উন্মোচনের ওপর বিশ্বাস করার মতো কেউ ছিল না।

আল-মালিক আস-সালিহ-এর খিদমতে:

৬৪৩ হিজরিতে যখন আল-মালিক আস-সালিহ মিশরের বাদশাহ হলেন, তখন কুতুজের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলো। তাকে সেনাবাহিনীর জন্য কেনা ক্রীতদাসদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হলো এবং এভাবে তিনি দামেস্ক থেকে আল-মালিক আস-সালিহ নাজমুদ্দিন আইয়ুবের খিদমতে পৌঁছে গেলেন। [২]

[১] আন-নুজুমুজ জাহেরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহিরা: ৭/৮৫; তারিখুল ইসলাম লিজ-জাহাবি, ওফাত: ৬৫৮ হিজরি। হাফেজ জাহাবি এবং আল্লামা ইউসুফ বিন তাগরি বারদি এই ঘটনাটি শামস উদ্দিন আল-জাজারির ইতিহাস থেকে উদ্ধৃত করেছেন। শামস উদ্দিন আল-জাজারি এই ঘটনাটি তার বাবার কাছ থেকে শুনেছিলেন এবং তাকে হাজি আলী নিজে এই ঘটনাটি শুনিয়েছিলেন এবং এটিও বলেছিলেন যে, বাদশাহ হওয়ার পর কুতুজ আমাকে পাঁচশ দিনার উপহার পাঠিয়েছিলেন এবং সেই সাথে বেতনও নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন।

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৭/৩১১, ত. দার হিজর।

জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী

শেখ কুতুবুদ্দিন আল-ইউনিনি (রহ.) কুতুজের শৈশবের একটি ঘটনা অবিচ্ছিন্ন সূত্রের সাথে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন:

“আমীর বদরুদ্দিন ইতবাকি বর্ণনা করেন যে, আমি, কুতুজ এবং বাইবার্স শৈশবে প্রায়ই একসাথে ঘোড়সওয়ারি করতাম।”

একবার আমরা মিশরের একটি রাস্তায় একজন রমলিকে (বালু গণনায় পারদর্শী) দেখলাম। প্রথমে কুতুজ তাকে অনুরোধ করল: “আমার ভাগ্য গণনা করো।” সে গণনা করে বলল: “তুমি মিশরের বাদশাহ হবে এবং তাতারদের পরাজিত করবে।” এ কথা শুনে আমরা তাকে নিয়ে উপহাস করতে লাগলাম। এরপর বাইবার্স বলল: “আমার ভাগ্যও দেখো।” রমলি গণনা করে বলল: “তুমি মিশরের পাশাপাশি অন্যান্য দেশেরও বাদশাহ হবে।” আমরা তাকে নিয়ে আরও বেশি উপহাস করলাম। এবার আমার দুই বন্ধু বলল: “তুমিও তোমার নক্ষত্র জেনে নাও।” আমি রমলিকে বললাম: “আমার ভাগ্যও দেখে দাও।” সে গণনা করে বলল: “তুমি একশ ঘোড়সওয়ারের অফিসার হবে এবং এই পদ তোমার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে না।” এ কথা বলার সময় সে বাইবার্সের দিকে ইশারা করল। এরপর সবকিছু ঠিক তেমনই ঘটল যেমনটি সে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল। [১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুসংবাদ

শৈশবের সেই দিনগুলোতেই কুতুজ স্বপ্নে রহমাতুল্লিল আলামিন ﷺ-এর জিয়ারত লাভ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে সুসংবাদ দিয়ে ইরশাদ করেন: “তুমি মিশরের বাদশাহ হবে এবং তাতারদের পরাজিত করবে।”

কুতুজ যখন জাগ্রত হলেন, তখন তার অন্তর দৃঢ় বিশ্বাসের চিরন্তন উষ্ণতায় ভরে গিয়েছিল। এই স্বপ্ন তাকে সূর্যের আলোর মতো এক নিশ্চিত বিশ্বাস দান করেছিল।

সেই দিনগুলোতে মিশরের এক সেনাপতি “আল-রাহাবি”-র কাছে অন্যান্য মামলুক বালকদের সাথে কুতুজেরও সামরিক প্রশিক্ষণ চলছিল। তার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল “হুসামুদ্দিন বারকা খান” [২]। কুতুজের চুলে উকুন ছিল এবং হুসামুদ্দিন সেগুলো বের করে দিত। কিন্তু তার অভ্যাস ছিল যে, যখনই কোনো উকুন বের হতো, সে কুতুজকে একটি চড় মারত এবং তিরস্কারও করত। একদিন কুতুজের চুলে উকুন একটু বেশিই ছিল। হুসামুদ্দিন সেদিন তাকে খুব চড় মারছিল। এই সময়ে...

[১] যাইল মিরআতুয যামান লিল-ইউনিনি: ১/৩৮৩, দারুল কুতুব আল-ইসলামি কায়রো।

দ্রষ্টব্য: এই ঘটনাগুলো থেকে কেউ যেন মনে না করেন যে, রমলি বা জ্যোতিষীদের গায়েবের (অদৃশ্য) জ্ঞান রয়েছে। তাদের অধিকাংশ তো সম্পূর্ণ প্রতারক এবং তারা রমল বা জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কে কিছুই জানে না। যে ব্যক্তি এই শাস্ত্র জানে, সে নিজেও জানে যে কিতাবের হিসাব কেবল একটি অনুমানের মর্যাদা রাখে, যা কখনো সঠিক হয় আবার কখনো ভুলও হয়। এটি ঠিক তেমনই যেমন একজন দক্ষ চিকিৎসক কোনো রোগীর চেহারা দেখে বলে দেন যে সে এত মাস পর মারা যাবে। একইভাবে পৃথিবীতে এমন কোনো রমলি বা জ্যোতিষী অতিবাহিত হয়নি যার প্রতিটি ভবিষ্যদ্বাণী সঠিক হয়েছে, যেমন কোনো চিকিৎসক এমন নেই যার প্রতিটি রোগ নির্ণয় সর্বদা সঠিক হয়। গায়েবের জ্ঞান কেবল আল্লাহ তাআলারই বৈশিষ্ট্য। শরীয়তে জ্যোতিষীদের কাছে ভাগ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এর কারণ এই নয় যে রমল বা জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, বরং এর উদ্দেশ্য হলো মানুষকে কুসংস্কার থেকে রক্ষা করা, কারণ অধিকাংশ মানুষ জ্যোতিষীদের কথা সঠিক মনে করে তাদের গায়েব জাননেওয়াল মনে করতে শুরু করে। জ্যোতিষীরাও কখনো বলে না যে আমাদের অনুমানে ভুলের সম্ভাবনা আছে, বরং তারা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি আত্মবিশ্বাসের সাথে দাবি করে।

[২] বারকা খান সুলতান জালালুদ্দিন খাওয়ারিজম শাহের অফিসারদের মধ্যে একজন ছিলেন, যিনি সুলতান জালালুদ্দিনের নিখোঁজ হওয়ার পর বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক খ্যাতি অর্জন করেন এবং কিছু এলাকায় তার শাসনও বজায় ছিল। (তারিখুল ইসলাম লিয-যাহাবি, ওফাত: ৬৩৩ হিজরি)। তিনি সুলতানের বোন শিহাবুদ্দিন নাসাউয়ির আত্মীয় ছিলেন এবং তার দরবারের সাথে যুক্ত ছিলেন। তিনি সুলতান জালালুদ্দিনের মামলুকদের সন্তান ছিলেন এবং তাদের সন্তানদের বারকা খানি বলা হতো। (তারিখ ইবনুল ওয়ারদি ২/১৭৭, দারুল ইলমিয়াহ)।

তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল: “আল্লাহর কসম! আমি তো চাই যে বড় হয়ে আমি পঞ্চাশজন অশ্বারোহীর নেতৃত্ব পাই।”

কুতুজ হঠাৎ বলে উঠল: “আশ্বস্ত থাকো। এই পদ আমি তোমাকে দিয়ে দেব।”

হুসামুদ্দিন আরেকটি চড় কষিয়ে দিয়ে বলল: “তুমি আমাকে পঞ্চাশজন অশ্বারোহীর নেতৃত্ব দেবে?”

কুতুজ বলল: “হ্যাঁ।” হুসামুদ্দিন আরেকটি চড় কষিয়ে দিল।

কুতুজ বলল: “তোমার সমস্যা কী যে তুমি মাত্র পঞ্চাশজন সওয়ারের নেতৃত্বেই সন্তুষ্ট হচ্ছ? আল্লাহর কসম! এটা তো আমি তোমাকে দেবই।”

হুসামুদ্দিন অবাক হয়ে বলল: “তুমি আমাকে এই পদ কীভাবে দেবে?”

কুতুজ বলল: “আমি স্বপ্নে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জিয়ারত লাভ করেছি। তিনি আমাকে সুসংবাদ দিয়েছেন যে তুমি মিশরের বাদশাহ হয়ে তাতারীদের পরাজিত করবে, আর রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী সন্দেহ ও সংশয়ের উর্ধ্বে।”

হুসামুদ্দিন স্তব্ধ হয়ে গেল এবং এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হওয়ার অপেক্ষায় রইল। [১]

শৈশবে তাতারীদের ধ্বংসযজ্ঞের প্রত্যক্ষদর্শী দৃশ্যগুলো কুতুজের হৃদয়ে গেঁথে ছিল। সে জানত যে এই তাতারীরাই তার স্বদেশ উজাড় করেছে, তাকে এতিম করেছে এবং হিজরত ও দাসত্বে বাধ্য করেছে। সে মনে মনে তাদের থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার সংকল্প করেছিল। সে যখন যুবক হলো, তখন সেই দিনগুলোতে ইজ্জুদ্দিন তুর্কমানি মিশরে মামলুক শাসনের ভিত্তি স্থাপন করেন। কুতুজ তার সাহস ও বুদ্ধিমত্তার কারণে সুলতান ইজ্জুদ্দিন তুর্কমানির দরবারে এক বিশিষ্ট স্থান লাভ করেন। [২]

মাহমুদ বিন মওদুদ:

একবার রাজকীয় দুর্গে একজন রমলবিদ (গণক) এল। কুতুজ তাকে তার বন্ধু কর্মকর্তাদের মজলিসে বসিয়ে অনুরোধ করলেন যেন সে গণনা করে বলে যে মিশরের পরবর্তী বাদশাহ কে হবে এবং তাতারীদের কে পরাজিত করবে। দীর্ঘক্ষণ গণনার পর সে বলল: “আমার গণনায় আমি কেবল পাঁচটি নুকতাহীন (বিন্দুহীন) অক্ষর দেখতে পাচ্ছি এবং তার পিতার নামও পাঁচটি নুকতাহীন অক্ষরের। আপনার নাম ‘কুতুজ’ তো তিন অক্ষরের। সুলতানের উত্তরাধিকারী ‘আলী’র নামও তিন অক্ষরের।”

কুতুজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বললেন: “তুমি কেন বলছ না যে এই নাম মাহমুদ বিন মওদুদ।”

রমলবিদ বলল: “এটি ছাড়া আর কিছু হতেই পারে না।”

কুতুজ এটি শুনে বললেন: “আমিই মাহমুদ বিন মওদুদ। আমি তাতারীদের পরাজিত করব। আমার মামা সুলতান জালালুদ্দিন খাওয়ারিজম শাহের প্রতিশোধ নেব।”

সঙ্গীরা বলল: “আল্লাহ চাইলে এমনই হবে।” কুতুজ বললেন: “তবে এই বিষয়টি গোপনই রেখো।” [৩]

[১] জাইল মিরআতুয যামান: ১/৩৮৩, মাত. দারুল কিতাব আল-ইসলামি কায়রো

[২] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১৭/৩১১

[৩] জাইল মিরআতুয যামান: ১/৩৬৯, আন-নুজুমুয যাহেরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহিরা: ৭/৮৬

তারিখে উম্মতে মুসলিমা — চতুর্থ খণ্ড

শাম ও মিশরের জন্য তাতারীদের হুমকি:

দিন অতিবাহিত হতে থাকে এবং কুতুযের পদমর্যাদা বৃদ্ধি পেতে থাকে এমনকি আল-মালিক আল-মুইয তুর্কমানি তাকে নিজের নায়েব নিযুক্ত করেন। রবিউল আউয়াল ৬৫৫ হিজরিতে তুর্কমানিকে তার স্ত্রী শাজারাতুদ দুর হত্যা করান এবং কয়েকদিন পর শাজারাতুদ দুরকেও তুর্কমানির গোলামরা হত্যা করে। এভাবে মিশরের সিংহাসন খালি হয়ে যায় যার ওপর তুর্কমানির অল্পবয়স্ক পুত্র আল-মালিক আল-মানসুরকে নামমাত্র শাসক হিসেবে বসানো হয়। তিনি যিলকদ ৬৫৭ হিজরি পর্যন্ত এই পদে বহাল ছিলেন। এই সময়ে তাতারীরা বাগদাদ দখল করে নিয়েছিল এবং এখন শামের ওপর সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এই পরিস্থিতিতে মিশরের সামরিক জেনারেলরা চিন্তিত ছিলেন কারণ শামের পর নিশ্চিতভাবে মিশরের পালা ছিল। এখানে অবস্থা এমন ছিল যে, এক তো যুদ্ধের জন্য কোষাগারে পর্যাপ্ত অর্থ ছিল না; দ্বিতীয়ত, অল্পবয়স্ক ও অনভিজ্ঞ শাসকের নেতৃত্বে তাতারীদের বিরুদ্ধে সফলতার কোনো আশা ছিল না। [১]

ওদিকে শামের শাসক আল-মালিক আন-নাসিরও একই চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। ৬৫৭ হিজরির শেষের দিকে তিনি দামেস্কের বাইরে ‘বারজাহ’-তে ক্যাম্প স্থাপন করে তাতারীদের মোকাবিলার জন্য সৈন্য সংগ্রহ করছিলেন। তার অধীনে প্রায় এক লক্ষ আরব ও অনারব সৈন্য একত্রিত হয়েছিল কিন্তু তার ভয় ছিল যে, তাতারীদের বিশাল বাহিনী এবং তাদের অধীনে অনারব ও জর্জীয় সম্মিলিত বাহিনীর পঙ্গপালের মতো আক্রমণের সামনে এই বিশাল জনসমষ্টিও টিকতে পারবে না। [২]

আল্লামা কামালুদ্দিন ইবনুল আদিম রহ.-এর দূতাবাস:

অবশেষে আল-মালিক আন-নাসির মিশর থেকে সাহায্য নেওয়া জরুরি মনে করলেন এবং আলেপ্পোর সবচেয়ে বড় আলেম কামালুদ্দিন উমর ইবনুল আদিম রহ.-কে (যিনি ‘বুগইয়াতুত তালাব ফি তারিখি হালাব’-এর লেখক) মিশরে পাঠালেন যাতে মিশর সরকার এই নাজুক মুহূর্তে পারস্পরিক বিবাদ ভুলে শামের পাশে দাঁড়ায়। আল্লামা ইবনুল আদিম রহ. যখন এই বার্তা নিয়ে কায়রো পৌঁছালেন, তখন নায়েবে সালতানাত সাইফুদ্দিন কুতুয তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। আল্লামা ইবনুল আদিম রহ. মিশর সরকারকে বললেন:

“তাতারীরা আল-জাজিরার শহরগুলো দখল করে নিয়েছে এবং এখন শামের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তারা ফোরাত নদী পার হয়ে গেছে এবং আলেপ্পোর নিকটবর্তী হয়েছে।”

এই সময়ে মিশরের সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং ওলামা ও ফুকাহাগণ তাতারীদের বিরুদ্ধে জিহাদের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য পারস্পরিক পরামর্শ করছিলেন। আল্লামা ইবনুল আদিম রহ.-ও এই পরামর্শ সভায় শরিক হলেন। [৩]

শায়খুল ইসলাম ইব্রাহীম ইবনে আব্দুস সালাম রহ.-এর মতামত:

পরামর্শ সভায় উত্থাপিত একটি সমস্যা ছিল এই যে, জিহাদের সময় চরম প্রয়োজনে প্রজাদের ওপর কোনো কর আরোপ করে...

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: সন ৬৫৭ হিজরি, ৬৫৮ হিজরি; আস-সুলুক লি-মা’রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক লিল-মাকরিজি: সন ৬৫৭ হিজরি, ৬৫৮ হিজরি।

[২] আস-সুলুক লি-মা’রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ১/৫০৯, ৫১১; আন-নুজুমুয যাহিরা ফি মুলুকি মিসরা ওয়াল কাহিরা: ৭/৭৩।

[৩] আন-নুজুমুয যাহিরা ফি মুলুকি মিসরা ওয়াল কাহিরা লিল-আল্লামা ইউসুফ বিন তাগরি বারদি: ৭/৭৩, ত. দারুল কুতুব মিসর; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া লি-ইবনে কাসির: সন ৬৫৭ হিজরি, ত. দারু হাজার।

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

অর্থ সংগ্রহ করা যেতে পারে। এই মজলিসে মিসরের সবচেয়ে বড় আলেম শায়খুল ইসলাম ইজ্জুদ্দিন বিন আব্দুস সালাম (রহ.)-ও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন:

“জিহাদের জন্য সরকার প্রজাদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে পারে, তবে এর একটি শর্ত রয়েছে। তা হলো, প্রথমে আপনাকে সরকারি কোষাগারে থাকা সমস্ত অর্থ, সোনা-রূপা এবং অলঙ্কার জিহাদের জন্য মুজাহিদদের ঘোড়া, অস্ত্রশস্ত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনে খরচ করতে হবে এবং কোষাগারে যেন কিছুই অবশিষ্ট না থাকে। এভাবে আপনার এবং প্রজাদের অবস্থা যেন সমান হয়। শাসকবর্গ এবং সেনাবাহিনীর কাছে ধন-সম্পদ এবং বিলাসিতার সরঞ্জাম থাকা অবস্থায় সাধারণ মানুষের কাছ থেকে কিছু নেওয়া জায়েজ নয়।” [১]

মিসরে কুতুযের সিংহাসন আরোহণ:

এই পরামর্শ সভায় সরকারের পক্ষ থেকে কুতুযই প্রতিনিধিত্ব করেন, যখন কি না অল্পবয়সী বাদশাহ আল-মালিক আল-মানসুর একেবারেই চুপচাপ ছিলেন কারণ তিনি এসব বিষয় বুঝতেন না। এটি দেখে আল-মালিক আন-নাসিরের দূত আল্লামা ইবনুল আদীয়ম (রহ.) বললেন:

“এমন কঠিন পরিস্থিতিতে একজন শক্তিশালী, সাহসী এবং যোগ্য শাসক ছাড়া কোনো উপায় নেই, যার আনুগত্য মানুষ করবে এবং তিনি জিহাদে তাদের নেতৃত্ব দিতে পারবেন।”

মজলিসের অন্যান্য সদস্যরাও তাকে সমর্থন করেন। আলাপ-আলোচনার পর অবশেষে কুতুযকে নতুন শাসক হিসেবে মেনে নেওয়া হয়। [২]

এই ঘটনাটি ২৪ জিলকদ ৬৫৭ হিজরির। [৩] ইসলামের এই সন্তানকে ‘আল-মালিক আল-মুজাফফর’ উপাধিতে স্মরণ করা হয়।

কুতুযের নির্বাচনে খাওয়ারিজমি কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ:

কুতুযের নির্বাচনে সেই সব খাওয়ারিজমি কর্মকর্তারাও অগ্রণী ছিলেন যারা সুলতান জালালুদ্দিন খাওয়ারিজম শাহের সাথে তাতারীদের বিরুদ্ধে জিহাদে শরিক ছিলেন। তারা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে এবং আত্মগোপনে ছিলেন এবং পরে একত্রিত হয়ে কিছুকাল আগে কায়রোতে চলে এসেছিলেন। তাদের মধ্যে নাসিরুদ্দিন কাইমারি, বারাকাত খান, ইখতিয়ার খান, সাইফুদ্দিন সাদিক খান, নাসিরুদ্দিন কুশলু খান এবং আতলাস খান উল্লেখযোগ্য ছিলেন। কুতুয তখন তাদের অনেক সম্মান করেছিলেন এবং এর প্রতিদান হিসেবে তারা কুতুযকে শাসক বানাতে সাহায্যকারী হিসেবে প্রমাণিত হন। [৪]

কিছু আমিরের বিরোধিতা এবং কুতুযের জবাব:

মিসরের আমিরদের মধ্যে সাইফুদ্দিন কুতুযের একটি বিরোধী দলও বিদ্যমান ছিল। এই লোকেরা তুর্কমেনির উত্তরসূরি আল-মালিক আল-মানসুরের অনুগত ছিল এবং তার জোরপূর্বক অপসারণ ও গৃহবন্দী করার কারণে অসন্তুষ্ট ছিল। এই লোকেরা কুতুযের সিংহাসন আরোহণের সময় উপস্থিত ছিল না বরং শিকার...

[১] আন-নুজুম আয-যাহিরা: ৭/৭৩; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: সন ৬৫৭ হি.; তারিখুল খুলাফা লিস-সুয়ুতী, পৃ. ৩৩২

[২] পূর্বোক্ত সূত্র

[৩] আস-সুলুক লি-মা'রিফাত দুওয়ালিল মুলুক: ১/৫০৭

[৪] জামিউত তাওয়ারিখ (আরবি): খণ্ড ২, প্রথম অংশ, ৩১১

চলে গিয়েছিলেন। যখন তারা ফিরে এলেন, তখন কুতুযের সিংহাসন আরোহণের খবরে অত্যন্ত বিমর্ষ হলেন। কুতুয তাদের বোঝালেন এবং স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, এটি পারস্পরিক মতভেদের সময় নয়, কারণ তাতারীরা সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। “আমার লক্ষ্য কেবল এটাই যে, তাতারীদের মোকাবিলার প্রস্তুতি নেওয়া হোক।” কুতুয বললেন, “যখন আমরা এই শত্রুর শক্তি চূর্ণ করে দেব, তখন তোমাদের এখতিয়ার থাকবে যাকে ইচ্ছা বাদশাহ বানিয়ে নিও।” এ কথা শুনে বিরোধী আমীরগণও সাময়িকভাবে চুপ হয়ে গেলেন। [১]

কুতুযের পক্ষ থেকে আল-মালিক আন-নাসিরকে জিহাদে সাহায্যের নিশ্চয়তা প্রদান:

সাইফ উদ্দিন কুতুয বুঝতে পারলেন যে, আল-মালিক আন-নাসির মিসরের বর্তমান সরকারকে নিজের জন্য হুমকি মনে করছেন এবং এ কারণেই তিনি মিসর আক্রমণের পরিকল্পনা করে আসছিলেন। কুতুয সেই মুহূর্তে মুসলিমদের মধ্যে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিলেন এবং নিজের পক্ষ থেকে সর্বাঙ্গিক ত্যাগের নিশ্চয়তা দিলেন। তিনি তার দূত বুরহান উদ্দিন খিজিরকে সিরীয় দূত আল্লামা ইবনুল আদিম রহ.-এর সাথে আল-মালিক আন-নাসিরের কাছে পাঠালেন, যাতে তাকে এই নিশ্চয়তা দেওয়া হয় যে, তাতারীদের মোকাবিলায় মিসর সিরিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। [২]

তিনি শপথ করে আল-মালিক আন-নাসিরকে লিখলেন:

“আমি আপনার বাদশাহি কখনোই কেড়ে নিতে চাই না। আমি মিসরে আপনার নায়েব হিসেবে কাজ করতে চাই। যখন আপনি মিসরে তাশরিফ আনবেন, তখন আমি আপনাকে সিংহাসনে বসিয়ে দেব। আর যদি আপনি আমাকে বহাল রাখতে চান, তবে আমি আপনার খিদমত করতে থাকব। আপনি চাইলে আমি আমার পুরো বাহিনী নিয়ে আপনার দরবারে উপস্থিত হয়ে আপনাকে সাহায্য করব। আর যদি আপনি আমার আসা অপছন্দ করেন, তবে আমি আপনার পছন্দের আমীরের নেতৃত্বে আপনার কাছে বাহিনী পাঠিয়ে দেব।” [৩]

আল-মালিক আন-নাসির এবং বাইবার্সের মধ্যে বিরোধ:

কুতুযের এই পত্র আল-মালিক আন-নাসিরের আশঙ্কা দূর করে দিল। এরই মধ্যে তিনি সংবাদ পেলেন যে, তাতারীদের দলগুলো হালাবের সীমান্তে অতর্কিত হামলা চালাচ্ছে, যার ফলে অসংখ্য মানুষ স্থানান্তরে বাধ্য হয়েছে। এরপর তিনি খবর পেলেন যে, তাতারীদের একটি বাহিনী হালাবে আক্রমণ চালিয়েছে এবং মোকাবিলায় আসা স্থানীয় বাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে ফিরে গেছে। আল-মালিক আন-নাসির এটি দেখে রুকন উদ্দিন বাইবার্সের সাহায্যে তাতারীদের প্রতিহত করার প্রস্তুতি শুরু করলেন।

তিনি যাত্রা করে বারযাহ-তে ছাউনি ফেললেন এবং সকল নায়েবদের সমবেত হওয়ার নির্দেশ দিলেন। কারাকের শাসক আল-মুগীস উমর এবং সাইফ উদ্দিন কুতুযকে বিশেষভাবে সাহায্য পাঠানোর তাগিদ দিলেন। তবে এই প্রস্তুতি সত্ত্বেও আল-মালিক আন-নাসির এবং তার আমীরগণ হালাকু খানের ভয়ে আতঙ্কিত ছিলেন। একজন দেশদ্রোহী আমীর যয়ন উদ্দিন হাফিযী এই আতঙ্ক বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই...

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: সন ৬৫৭ হিজরি

[২] আন-নুজুমুয যাহিরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহিরা: ৭/৭৩

[৩] আস-সুলুক লি-মা'রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ১/৫০৮, ত. ইলমিয়াহ

[৪] আস-সুলুক লি-মা'রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ১/৫০৮

চতুর্থ খণ্ড

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

আল-মালিক আন-নাসিরের সামনে হলাকু খানের এমন এক অপরাজিত হওয়ার চিত্র তুলে ধরা হয়েছিল যে তার সমস্ত আত্মবিশ্বাস শেষ হয়ে গিয়েছিল। হাফিজি পরামর্শ দিল যে আমাদের যুদ্ধের চিন্তা ত্যাগ করে হলাকু খানের মন জয় করার চেষ্টা করা উচিত এবং তার অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। হাফিজির কথায় আল-মালিক আন-নাসিরের সংকল্প টলে গেল। রুকন উদ্দিন বাইবার্স যখন এটি জানতে পারলেন, তিনি হাফিজিকে কেবল মন্দই বললেন না বরং তাকে প্রহারও করলেন এবং বললেন: “তুমিই মুসলমানদের ধ্বংসের কারণ হবে।” [১]

হাফিজি গিয়ে আল-মালিক আন-নাসিরের কাছে বাইবার্সের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল এবং উভয়ের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টি করে দিল। ঠিক সেই সময় জিহাদের বিরোধী আমিররা আল-মালিক আন-নাসিরকে পদচ্যুত করার ষড়যন্ত্র শুরু করল। দেখতে দেখতে জিহাদের ঐক্যের পরিবেশ শেষ হয়ে গেল। [২] এই সময় আট হাজার তাতারী ‘বালিস’-এর কাছে অবস্থান করছিল। [৩] বাইবার্স চেয়েছিলেন তাদের পিছু হটিয়ে তাতারীদের মনোবল ভেঙে দিতে এবং মুসলমানদের সাহস বৃদ্ধি করতে। তিনি আল-মালিক আন-নাসিরকে বলছিলেন: “আপনি যদি আমাকে মাত্র তিন হাজার অশ্বারোহী দেন তবে আমি এগিয়ে গিয়ে তাতারীদের ওপর আক্রমণ করব।” কিন্তু আল-মালিক আন-নাসিরের দ্বিধা কাটল না। [৪] বাইবার্স বুঝতে পারলেন যে এখন এখানে অবস্থান করা নিরর্থক। তিনি হতাশ হয়ে ফিলিস্তিনের উপকূলীয় শহর গাজায় চলে গেলেন। [৫]

সুকুত-ই-হালাব (হালাবের পতন):

তাতারী বাহিনী ফোরাত নদী পার হয়ে ৬৫৭ হিজরীর জিলহজ মাসের শেষ দশকে হালাব থেকে কিছু দূরে পৌঁছাল এবং একটি জনপদ সালমিয়াতে তাবু গাড়ল। এরপর বাহিনীর একটি অংশ হালাবের দিকে রওনা হলো। [৬] সেখানে সুলতান সালাহ উদ্দিন আইয়ুবীর শেষ বংশধর আল-মালিক আল-মুয়াজ্জাম গভর্নর ছিলেন, যার বয়স ছিল ৮১ বছর। এই শহরটি অত্যন্ত মজবুত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় সমৃদ্ধ ছিল এবং মানুষ জিহাদের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত ছিল। তাতারীদের কাছে আসার খবর শুনেই হাজার হাজার সৈন্য, স্বেচ্ছাসেবক এবং সাধারণ মানুষ শহর থেকে বেরিয়ে সেই দিকে রওনা হলো যেখানে তাতারী বাহিনীর আগমনের অপেক্ষা করা হচ্ছিল। সেখানে পৌঁছে যখন মুসলমানরা তাতারী বাহিনীর বিশালতা দেখল, তখন তারা ভীত হয়ে পিছু হটল এবং পুনরায় শহরে ঢুকে পড়ল। আল-মালিক আল-মুয়াজ্জাম অত্যন্ত সতর্ক শাসক ছিলেন, তিনি অবরোধ করে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিলেন এবং ঘোষণা করে দিলেন যে আজ থেকে কেউ শহরের বাইরে যাবে না। পরের দিন তাতারী বাহিনী শহরের সামনে এসে পৌঁছাল। আল-মালিক আল-মুয়াজ্জাম আবারও তাকিদ দিলেন যে কেউ যেন বাইরে না বের হয়, কিন্তু সেনাবাহিনীর অফিসাররা এই মতের বিরোধিতা করল এবং বলল যে আমরা যদি বাইরে না বের হই তবে শত্রু সাহসী হয়ে উঠবে।

অবশেষে সৈন্য এবং সাধারণ মানুষ শহর থেকে বের হয়ে ‘কোহ-ই-বানকুসা’য় সারিবদ্ধ হলো। তাতারী বাহিনী পাহাড়ের নিচে এসে দাঁড়াল। তাতারীদের কিছু দল সামনে এগিয়ে এল এবং এদিক থেকে ইসলামী বাহিনীর একটি অংশ তাদের ওপর আক্রমণ করল।

[১] আস-সুলুক লি-মা’রিফাত দুওয়াল আল-মুলুক: ১/৫০৯, ত. আল-ইলমিয়াহ।

[২] বালিস: হালাব এবং রাঙ্কার মধ্যবর্তী ফোরাত নদীর তীরে সিরিয়ার একটি ছোট শহর ছিল। ইরাক থেকে সিরিয়া যাওয়ার পথে এটি সিরিয়ার সীমানায় প্রথম শহর ছিল। (মু’জামুল বুলদান: ১/৩২৮, ত. দার সাদির; আল-মাসালিক ওয়াল মামালিক লিল-ইসতাকরি (মৃ. ৩২০ হি.), পৃ. ৬২, ত. দার সাদির)

[৩] আর-রওদ আজ-জাহির ফি সিরাত আল-মালিক আজ-জাহির, পৃ. ৬১, ৬২।

[৪] আস-সুলুক লি-মা’রিফাত দুওয়াল আল-মুলুক: ১/৫০৯, ত. আল-ইলমিয়াহ।

[৫] আন-নুজুম আজ-জাহিরা ফি মুলুক মিসর ওয়াল কাহিরা: ৭/৭৫।

[৬] তারিখুল ইসলাম লিদ-দাহাবি: ওফায়াত: বছর ৬৫৮ হি.।

তাতারীরা হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে পালিয়ে গেল এবং মুসলমানরা অন্ধভাবে তাদের পিছু ধাওয়া করতে থাকল। এমনকি তারা এমন এক এলাকায় পৌঁছে গেল যেখানে হাজার হাজার তাতারী ওত পেতে লুকিয়ে ছিল। এখন মুসলমানদের ওপর অতর্কিত হামলা হলে তাদের পিছু হটতে হলো। তাতারীরা তাদের ঠেলে বানকুসা পাহাড় পর্যন্ত নিয়ে গেল যেখানে ইসলামী লস্করের সংরক্ষিত বাহিনী মোতায়ন ছিল। পরাজয় দেখে তারাও পালিয়ে গেল এবং তাতারীরা আলেপ্পো (হালব) পর্যন্ত পিছু ধাওয়া করতে থাকল। এই ছড়োছড়িতে হাজার হাজার মুসলমান শহীদ হলেন।

সেদিন তাতারীরা শহরের সামনে মোতায়ন রইল। তারপর পরের দিন হঠাৎ তারা ফিরে গেল। জানা গেল যে তাতারী লস্কর আযাযের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আযাযের মজবুত কেল্লা প্রতিরোধ করতে পারল না এবং নিরাপত্তার নিশ্চয়তা নিয়ে আত্মসমর্পণ করল। [১]

২ সফর ৬৫৮ হিজরিতে তাতারী লস্কর আবারও আলেপ্পোর সামনে উপস্থিত হলো। হালাকু চেষ্টা করল যাতে শহরবাসী হুমকির মুখে নতি স্বীকার করে, কিন্তু সে উত্তর পেল যে আমরা কেবল তলোয়ারের ভাষায় কথা বলব। হালাকু এই সাহসিকতায় বিস্মিত হয়ে আক্রমণের নির্দেশ দিল। সাত দিনের অবরোধ ও যুদ্ধের পর শহরবাসী প্রাণের নিরাপত্তার শর্তে দরজা খুলে দিল। হালাকু শহর জয় করার সাথে সাথেই প্রাণভিক্ষার প্রতিশ্রুতি পেছনে ফেলে দিল। পাঁচ দিন ধরে আলেপ্পোতে ভয়াবহ গণহত্যা চালানো হলো। রাস্তাঘাট ও অলিগলিতে সবদিকে কেবল লাশ আর লাশ দেখা যাচ্ছিল। আলেপ্পোর কেল্লাদার কিছুদিন কেল্লায় অবস্থান নিয়ে যুদ্ধ করতে থাকলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকেও হার মানতে হলো এবং ১০ সফর কেল্লাও আত্মসমর্পণ করল। হালাকু শহরের প্রাচীর ও কেল্লা ধ্বংস করে দিল। এখানে এক লক্ষের বেশি নারী ও শিশুকে দাস বানানো হলো। আলেপ্পোর অবস্থা দেখে সিরিয়ার বাকি শহরগুলোর শাসকরা এতই আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন যে তারা নিজেরাই নিজেদের শহরগুলো আক্রমণকারীদের হাতে তুলে দিতে লাগলেন। হামার শাসক শহরের চাবিকাঠি পাঠিয়ে দিলেন এবং হালাকু তার প্রাচীর ও কেল্লাও ধ্বংস করে দিল। [২] শহরের সমস্ত ছোট-বড় মসজিদ, জামেয়া এবং বাগানগুলো তছনছ করে দেওয়া হলো। এভাবে এই অত্যন্ত সুন্দর শহর, যার ওপর জেনগি ও আইয়ুবীরা গর্ব করত, ধ্বংসস্তুপে পরিণত হলো। [৩]

হালাকু খান আল-মালিক আল-মুয়াজ্জমকে, যার অবস্থা বার্ষিক্য এবং অবরোধের কষ্টের কারণে অত্যন্ত জীর্ণ ছিল, কোনো ক্ষতি পৌঁছায়নি কিন্তু তার দিন ফুরিয়ে এসেছিল। কয়েক দিন পর তিনি নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। [৪]

আল-মালিক আন-নাসিরের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন—দামেস্কে বিশৃঙ্খলা:

যখন আল-মালিক আন-নাসির আলেপ্পোর পরিণতির খবর পেলেন, তখন তার ওপর আতঙ্ক ছেয়ে গেল। তিনি যুদ্ধের চিন্তা ছেড়ে দিয়ে দামেস্ককে কারো হাতে সোপর্দ না করেই ১৫ সফর ৬৫৮ হিজরিতে হঠাৎ পরিবার-পরিজনসহ ফিলিস্তিনের দিকে বেরিয়ে গেলেন। এটি দেখে প্রত্যেকেই পালানোর জন্য অস্থির হয়ে উঠল। তাতারীদের সাথে যুদ্ধের জন্য সমবেত হওয়া বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল এবং মানুষ তাদের মালামাল নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করে কাফেলায় शामिल হতে লাগল। প্রচণ্ড শীত পড়ছিল এবং উটের ভাড়া আকাশচুম্বী হয়ে গিয়েছিল।

[১] আন-নুজুমুজ জাহেরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহিরা: ৭/৭৬

[২] আস-সুলুক লি-মা'রিফতি দুওয়ালিল মুলুক: ১/৫১১, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: বছর ৬৫৮ হিজরি

[৩] আস-সুলুক লি-মা'রিফতি দুওয়ালিল মুলুক: ১/৫১১

[৪] আস-সুলুক লি-মা'রিফতি দুওয়ালিল মুলুক: ১/৫১১

ছিলেন। সংক্ষেপে, শহরে কেয়ামত নেমে এসেছিল। [১]

কুতুযের বার্তা এবং আল-মালিক আন-নাসিরের নিবুদ্বিতা:

আল-মালিক আন-নাসির গাজা হয়ে মিসরের দিকে রওনা হলেন, কিন্তু পরে তিনি মিসরের মামলুকদের ব্যাপারে আশঙ্কার শিকার হলেন। এই সময়ে সাইফ উদ্দিন কুতুযের বার্তা এসে পৌঁছাল: “আসুন। আমরা একত্রিত হয়ে তাতারীদের বিরুদ্ধে একপ্রাণ হয়ে যাই।” কিন্তু আল-মালিক আন-নাসির মিসরের কাছাকাছি পৌঁছে থেমে গেলেন। এই পরিস্থিতিতে বিরক্ত হয়ে তাঁর অনেক আমির তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করে মিসরে চলে গেলেন, যেখানে তাঁদের খুব সমাদর করা হলো। অন্যদিকে আন-নাসির একেবারে বন্ধুহীন ও সহায়হীন হয়ে পড়লেন। [২]

মিয়াফারিকিন রণাঙ্গনের শেষ দৃশ্য:

এদিকে মিয়াফারিকিন অবরোধের পনেরো মাস অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল, তা সত্ত্বেও একমুঠো মুসলমান তাতারীদের পঙ্গপালের মতো বাহিনীর সামনে পাহাড়ের মতো অটল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু শহরে খাদ্য শেষ হয়ে আসছিল, গবাদি পশু মারা গিয়েছিল এবং মানুষ মৃত প্রাণী খেতে বাধ্য হচ্ছিল। [৩] শহরের প্রবেশদ্বার “বাব-ই-কর”-এর পাহারার দায়িত্ব আমির সাবিক উদ্দিন লাজিনের ওপর ন্যস্ত ছিল। এক রাতে তিনি গোপনে প্রাচীর থেকে নেমে কোনো জরুরি কাজে নিজের বাড়িতে চলে যান। তাঁর এক গোলাম, যে অবরোধের কঠোরতায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, তাতারীদের খবর দিয়ে দিল যে এই দিক থেকে প্রাচীর খালি পড়ে আছে। ফলে তিনশ তাতারী রাতের অন্ধকারে মই লাগিয়ে প্রাচীরে চড়তে শুরু করল। দিনার নামক এক সৈনিক তাদের গতিবিধি টের পেয়ে গেলেন এবং বর্শা হাতে প্রাচীরের ওপর সতর্ক হয়ে দাঁড়ালেন। যেই প্রথম তাতারী প্রাচীরের ওপর এল, দিনার তাকে বর্শা দিয়ে আঘাত করলেন। তাতারীটি চিৎকার করে তার সঙ্গীদের ওপর গিয়ে পড়ল। শোরগোল শুনে মুহাম্মদ আল-কামিল তাঁর বাহিনীসহ প্রাচীরে পৌঁছে গেলেন এবং তীব্র সংঘর্ষ শুরু হলো, যাতে শত্রুদের বিশটিরও বেশি লাশ প্রাচীর থেকে নিচে পড়ে গেল। যেহেতু দুর্ভিক্ষের কারণে শহরের মানুষ মৃত প্রাণী খাচ্ছিল, তাই আল-কামিল নির্দেশ দিলেন যে শত্রুর কোনো লাশ যেন নিয়ে যেতে না পারে। ফলে সত্তর জন অশ্বারোহী এবং দুইশ পদাতিক সৈন্য বাইরে এলেন এবং তাঁরা তাতারীদের তাড়িয়ে দিলেন এবং লাশগুলো শহরে নিয়ে এলেন। [৪]

এই দিনগুলোতে তাতারীরা তাদের শিবিরের চারপাশে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে নিয়েছিল [৫] যার ফলে তারা রাতের অতর্কিত হামলা থেকে নিরাপদ হয়ে গেল। আশ্বর হাবশি এবং সাইফ উদ্দিনের মতো সাহসী মুজাহিদদের জন্যও এখন ঝটিকা হামলা করা কঠিন হয়ে পড়েছিল কারণ তাঁদের বিদ্যুৎগতির ঘোড়াগুলো ক্ষুধার কারণে মৃত্যুর কাছাকাছি ছিল। অবশেষে তাঁরা ঘোড়া জবাই করে সেগুলোর গোশত খেয়ে জীবনধারণ শুরু করলেন। সেই সাথে তাঁরা মুহাম্মদ আল-কামিলের কাছে অনুমতি চাইলেন যে আমরা পায়ে হেঁটে বেরিয়ে শত্রুর ওপর হামলা করি, কিন্তু তিনি অনুমতি দিলেন না।

[১] আস-সুলুক লি-মা’রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ১/৫০৯, ৫১১

[২] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১৭/৩০০

মাকরিজির মতে, আন-নাসির মিসরের সীমান্তবর্তী জনপদ “কাতিয়া” পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং সাইফ উদ্দিন কুতুয তাঁর লশকর নিয়ে আস-সালিহিয়া পর্যন্ত চলে এসেছিলেন, উভয়ের মনেই একে অপরকে নিয়ে কিছু আশঙ্কা ছিল (কেননা অতীতে আন-নাসির মিসর দখলের চেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন, তাই কুতুযও সতর্ক ছিলেন এবং এদিকে আন-নাসিরের আশঙ্কা ছিল যে মিসরবাসীরা হয়তো আমার কাছ থেকে প্রতিশোধ নেবে)। যার কারণে আন-নাসির সীমান্ত থেকে ফিরে যান। (আস-সুলুক লি-মা’রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ১/৫১৩, ত. আল-ইলমিয়াহ)

[৩] সিয়রু আলামিন নুবালা: ২৩/২০১, ২০২, ত. আর-রিসালাহ

[৪] আল-আলাকুল খাতিরা লি-ইবনি শাদ্দাদ, ১৯১, ত. আশ-শামিলাহ

[৫] সিয়রু আলামিন নুবালা: ২৩/২০১, ২০২, ত. আর-রিসালাহ

তারিখ-এ-উম্মতে মুসলিমা

এই দিনগুলোতে শহরের কিছু মুমূর্ষু মানুষ তাতার বাহিনীর আমিরদের কাছে এই বার্তা পাঠাল:

“এখানকার মানুষ ক্ষুধায় মারা যাচ্ছে। তাতাররা যদি ভেতরে প্রবেশ করে, তবে এখানে লড়াই করার মতো কাউকে পাবে না।” [১]

তবে তাতাররা তখন এই কথা বিশ্বাস করেনি এবং প্রাচীরে চড়ার সাহস দেখায়নি। [২]

দুই দাসের বিশ্বাসঘাতকতা - মিয়াফারকিনের পতন:

কিন্তু কয়েক দিন পর শহরে একটি সাধারণ ঘটনা তাতারদের কাজ সহজ করে দিল। ঘটনাটি হলো, শহরের এক আমির ইফতিখারুদ্দিনের দুই দাসের সাথে মুহাম্মদ আল-কামিলের দাসদের অভদ্রতা। যার ফলে ইফতিখারুদ্দিন তার ঐ দাসদের নির্বোধ বলে গালি দেন এবং তাদের মারধরও করেন। এতে তারা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলো এবং গোপনে তাতারদের সাথে যোগাযোগ করে জিজ্ঞেস করল:

“যদি আমরা শহরটি আপনাদের হাতে তুলে দিই, তবে আমাদের পুরস্কার কী হবে?” উত্তর এল: “পুরো শহর তোমাদের হবে।”

উভয় দাস তাদের এই বার্তা পাঠাল: “২৩ রবিউস সানি বৃহস্পতিবার সেহরির সময় পাহারাদাররা ব্যস্ত থাকবে, আমরা একটি মই স্থাপন করে দেব, আপনারা এর মাধ্যমে প্রাচীরে উঠে আসবেন।”

দুর্ভাগ্যবশত, সেদিন সেহরির সময় অনেক গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা প্রাচীরে উপস্থিত ছিলেন না এবং এই দিকটি সম্পূর্ণ খালি ছিল। তাতাররা ঐ দাসদের নির্দেশিত কোণ থেকে মইয়ের সাহায্যে উপরে উঠে এল। আমির হুসামুদ্দিন আহট শুনে সেদিকে এগিয়ে এলেন এবং বীরত্বের সাথে লড়াই করতে করতে ৭২টি তীরের আঘাত সহ্য করে শহীদ হলেন। ভোরের আলো ফোটার আগেই ছয় হাজার সৈন্য শহরে প্রবেশ করেছিল। মুহাম্মদ আল-কামিল এবং আমির আলম উদ্দিন সাঞ্জারি খবর পাওয়া মাত্রই ঘোড়ায় চড়ে তাতারদের বাধা দিতে বের হলেন, কিন্তু এক তীব্র সংঘর্ষের পর আলম উদ্দিন বন্দী হলেন, আর মুহাম্মদ আল-কামিল ফিরে এসে একটি বুরুজে (দুর্গচূড়ায়) অবরুদ্ধ হয়ে পড়লেন। [৩]

এই সংঘর্ষ শহরের বাইরের এবং ভেতরের প্রাচীরের মাঝখানে হয়েছিল। এখন তাতাররা ভেতরের প্রাচীরে উঠে গেল, কিন্তু শহরে প্রবেশ করার সাহস পাচ্ছিল না। তাদের আশঙ্কা ছিল যে গলিগুলোতে মুসলমানরা ওত পেতে বসে আছে। কয়েক দিন পর যখন তারা কোনো নড়াচড়া অনুভব করল না, তখন তারা ভেতরে প্রবেশ করল। তখন জানা গেল যে শহরের হাজার হাজার রক্ষী এবং নাগরিকদের মধ্যে মাত্র ৯০ জন জীবিত আছে। [৪] শহরটি কবরস্থানের দৃশ্য পেশ করছিল। মানুষের মৃতদেহ স্তুপ হয়ে পড়ে ছিল। [৫]

তাতাররা এখন সেই বুরুজটি ঘেরাও করল যেখানে মিয়াফারকিনের লৌহমানব মুহাম্মদ আল-কামিল শেষ ঘাঁটি গেড়েছিলেন। এখানেও প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো, এমনকি মুহাম্মদ আল-কামিলের সমস্ত সঙ্গী একে একে শহীদ বা বন্দী হলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি তার গোলাম কারাসানকারের সাথে একা রয়ে গেলেন। তাতাররা জীবনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়ে তাকে হেফাজতে নিল। [৬]

[১] জামিউত তাওয়ারিখ (আরবি), রশিদ উদ্দিন ফজলুল্লাহ: খণ্ড ২, অংশ ১, পৃষ্ঠা ৩২১, ৩২২।

[২] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২৩/২০২, ত: আর-রিসালা।

[৩] আল-আলাকুল খাতিরা, ইবনে শাদ্দাদ, পৃষ্ঠা ১৯১, ত: আশ-শামেলা।

[৪] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২৩/২০২, ত: আর-রিসালা।

[৫] জামিউত তাওয়ারিখ (আরবি): খণ্ড ২, অংশ ১, পৃষ্ঠা ৩২২।

[৬] আল-আলাকুল খাতিরা, ইবনে শাদ্দাদ, পৃষ্ঠা ১৯৩, ত: আশ-শামেলা; সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২৩/২০৩, ত: আর-রিসালা।

সিংহ যুগলের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত জিহাদ:

মিয়াফারকিনের শেষ দুই মুজাহিদ: সাইফউদ্দিন এবং আশ্বর হাবশি তখনও আত্মসমর্পণ করতে রাজি ছিলেন না। তাতারীরা শহর থেকে ধন-সম্পদ লুট করছিল এবং এই দুই সিংহ একটি বাড়ির ছাদে উঠে রাস্তা দিয়ে অতিক্রমকারী প্রতিটি সৈন্যের ওপর তীর নিক্ষেপ করছিলেন। অবশেষে তাতারী সরদার ‘আরতাকু’ নিজেই বাছাইকৃত সৈন্যদের একটি দল নিয়ে সেখানে পৌঁছাল এবং তাদের ঘিরে ফেলার চেষ্টা করল। এটি দেখে দুই বীর ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে লড়াই করে অনেক শত্রুকে ধ্বংস করার পর অবশেষে নিজেরাও শাহাদাতের সুখা পান করলেন। [১]

হালাকু’র দরবারে মুহাম্মদ আল-কামিলের নির্ভীক সাহস:

তাতারীরা মুহাম্মদ আল-কামিলকে গ্রেপ্তার করে হালাকু খানের কাছে পাঠিয়ে দিল, যে তখন সিরিয়া থেকে ফেরার পথে ‘সারুজ’-এর কাছে অবস্থান করছিল। [২] হালাকু খান আল-কামিলকে নিজের সামনে পেয়ে বিদ্রূপের সুরে বলল:

“তুমি মঙ্গোলদের আইন জানো। আমাদের কাছে তিনটি গুনাহ মাফ। চতুর্থ গুনাহের শাস্তি হলো মৃত্যু। তোমার প্রথম গুনাহ হলো, আমি হামাদানে তোমাকে মদ পান করানোর চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু তুমি অস্বীকার করেছিলে। দ্বিতীয় গুনাহ হলো, আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম যে আমাদের প্রাচীর ধ্বংস করে তা সেলজুক রুমের শাসক রুকনউদ্দিনের হাতে তুলে দাও, কিন্তু তুমি তাও করেনি। তৃতীয় গুনাহ হলো, আমি তোমাকে নির্দেশ পাঠিয়েছিলাম যে তোমার ভাইদেরসহ আমার কাছে বাগদাদে পৌঁছাও এবং খলিফার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, কিন্তু তুমি টস থেকে মস হওনি। চতুর্থ গুনাহ হলো, আমি তোমার শহর পর্যন্ত এলাম কিন্তু তুমি আমার সাথে দেখা করতে বাইরে এলে না এবং কোনো উপহার পর্যন্ত পাঠালে না, কোনো আতিথেয়তাও করলে না। সম্ভবত তুমি মৃত্যু পর্যন্ত আমার চেহারা না দেখার সংকল্প করেছিলে।”

এটি শুনে আল-কামিল অত্যন্ত ঘৃণার সাথে বললেন: “তুমি কে যে তোমার চেহারা দেখার জন্য আমি কষ্ট স্বীকার করব? তোমার না কোনো দ্বীন আছে, না কোনো প্রতিশ্রুতি। তুমি একজন ধর্মহীন মানুষ যার বিরুদ্ধে জিহাদ ওয়াজিব। আমি তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।”

হালাকু রাগান্বিত হয়ে বলল: “তুমি কোন দিক থেকে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ?”

আল-কামিল বললেন: “আমি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর ওপর ঈমান রাখি। আমার কাছে দ্বীনও আছে এবং আমানতও। ক্ষমতা যা-ই হোক আল্লাহর হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন, যার থেকে ইচ্ছা ছিনিয়ে নেন। আমাদের পরিবারের শাসন ইয়েমেন থেকে তাবরিজ পর্যন্ত ছিল, এখন তা আমাদের থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। একইভাবে আল্লাহ যখন চাইবেন তিনি তোমাদের বিরুদ্ধে এমন লোক পাঠাবেন যারা তোমাদের হত্যা করবেন এবং তোমাদের সন্তানদের গোলাম বানিয়ে নেবেন এবং তোমাদের লশকর থেকে কাউকে ছাড়বেন না।”

হালাকু নিরন্তর হয়ে বলল: “তোমার কথাগুলো তোমার মর্যাদার চেয়েও উঁচু, তুমি একজন ছোট বাদশাহ।” [৩]

[১] জামিউত তাওয়ারিখ (আরবি), রশিদউদ্দিন ফজলুল্লাহ: খণ্ড ২, প্রথম অংশ: পৃষ্ঠা ৩২২, তাবা দারু ইহয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ মিসর।

[২] আল-আলাকুল খাতিরাহ লি-ইবনে শাদ্দাদ, পৃষ্ঠা ১৯২, একটি বর্ণনা অনুযায়ী হালাকু খান তখন ‘রাহা’-তে ছিল। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২৩/২০২, তাবা আর-রিসালাহ) একটি বর্ণনা অনুযায়ী সে তখন ‘তাল বাশার’-এ ছিল। (জামিউত তাওয়ারিখ (আরবি): খণ্ড ২, প্রথম অংশ: পৃষ্ঠা ৩২২) এই সমস্ত স্থান আল-জাজিরার অন্তর্ভুক্ত।

[৩] আল-আলাকুল খাতিরাহ লি-ইবনে শাদ্দাদ, পৃষ্ঠা ১৯৩, তাবা আশ-শামিলাহ।

মুহাম্মদ আল-কামিলের শাহাদাত:

হালাকু তখন মদ পান করছিল। সে ভালো করেই জানত যে মুহাম্মদ আল-কামিল মদ থেকে কঠোরভাবে বিরত থাকেন, কিন্তু উপহাস স্বরূপ সে মদের পেয়ালাটি তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিল। মুহাম্মদ আল-কামিল তিক্ত স্বরে বললেন: “এটি হারাম।”

কিন্তু হালাকু তাঁকে আরও বিরক্ত করার জন্য নিজের স্ত্রীকে বলল: “তাঁকে এই পেয়ালাটি পান করাও।”

মুহাম্মদ আল-কামিল, যিনি জীবন ও মৃত্যুর প্রতি উদাসীন হয়ে গিয়েছিলেন, এই নীচ আচরণের জন্য হালাকু খানের মুখে খুতু নিক্ষেপ করলেন। হালাকু রাগে পাগল হয়ে গেল। সে আল-কামিলকে হত্যা করার নির্দেশ দিল। [১]

এই সিংহহৃদয় ব্যক্তিকে এমনভাবে শহীদ করা হয়েছিল যার পাশবিকতার কোনো উদাহরণ পাওয়া যায় না। তাঁর শরীরের প্রতিটি অঙ্গ একে একে কেটে ফেলা হচ্ছিল এবং কাটা টুকরোগুলো তাঁর মুখেই গুঁজে দেওয়া হচ্ছিল। [২] অবশেষে মুহাম্মদ আল-কামিলের মাথা বিচ্ছিন্ন করা হলো এবং তাঁর কাটা মাথা দামেস্কে পাঠানো হলো, যেখানে ২৭ জুমাদাল উলা ৬৫৮ হিজরিতে বর্শার মাথায় বিদ্ধ করে পুরো শহরে প্রদর্শন করা হলো। [৩]

উসওয়ায়ে হুসাইনী পালন:

মুহাম্মদ আল-কামিলের সাহসিকতাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে একজন কবি বলেছেন:

ابْنُ غَزَا وَجَاهِدَ قَوْمًا..... اَتَخَنُوا فِي الْعِرَاقِ وَالْمُشْرِقَيْنِ

“এক গাজীর পুত্র যুদ্ধ করেছেন এবং এমন এক জাতির বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন যারা ইরাক এবং পূর্ব ও পশ্চিমকে রক্তে রঞ্জিত করেছিল।”

ظَاهِرًا غَالِبًا وَمَاتَ شَهِيدًا..... بَعْدَ صَبْرٍ عَلَيْهِمْ عَامِينَ

“তিনি (শত্রুদের সামনে) দুই বছর পর্যন্ত অবিচল থেকে বিজয়ী ও প্রভাবশালী ছিলেন এবং শহীদি মৃত্যু বরণ করেছেন।”

لَمْ يَشْنَهُ أَنْ طِيفَ بِالرَّأْسِ مِنْهُ..... فَلَهُ أُسْوَةٌ بِرَأْسِ الْحُسَيْنِ

“তাঁর মাথা প্রদর্শিত হওয়া তাঁর জন্য আশ্চর্যের কিছু নয়, কারণ হযরত হুসাইন (রা.)-এর মাথা তাঁর জন্য সর্বোত্তম আদর্শ।” [৪]

কিতবুগা নোয়ান... মানুষরূপী পশু:

হালাকুর কাছে আলেপ্পো পছন্দ হয়েছিল এবং সে সেখানেই অবস্থান করছিল। তার পরবর্তী লক্ষ্য ছিল দামেস্ক, যার জন্য সে তার পুরনো যোদ্ধা সেনাপতি কিতবুগা নোয়ানকে পাঠাল [৫], যার নিষ্ঠুরতা ও ধূর্ততার কাহিনী এতই বিখ্যাত ছিল যে মানুষ তার নাম শুনেই কেঁপে উঠত।

[১] সিয়ার আলামুন নুবালা: ২৩/২০২, ত. আর-রিসালা

[২] সিয়ার আলামুন নুবালা: ২৩/২০২, ত. আর-রিসালা; যাইল মিরআতুয যামান: ১/৩৫৯, ত. দারুল কুতুব আল-কাহিরা

[৩] যাইল মিরআতুয যামান: ১/৩৫৯, ত. দারুল কুতুব আল-কাহিরা। একটি সহীহ বর্ণনা (রাবী সহীহ বুখারী) অনুযায়ী হযরত হুসাইন (রা.)-এর মাথাও দামেস্কে আনা হয়েছিল, যদিও আল্লামা ইবনে তাইমিয়া এটি অস্বীকার করেছেন কিন্তু আলেমদের অবস্থান সতর্কতামূলক। এই আলোচনা “ইযালাতুল শুবুহাত”-এ দেখা যেতে পারে।

[৪] জামিউত তাওয়ারীখ (উর্দু): খণ্ড ২, অংশ ১, পৃষ্ঠা ৩২৩

[৫] তাতারীদের কাছে কিতবুগার প্রভাব এমন ছিল যে, এক মজলিসে যেখানে হিমসের শাসক আল-মালিক আল-আশরাফ উপস্থিত ছিলেন, কিতবুগা তাকে জিজ্ঞাসা করল: “তুমি কার কাছে অনুমতি নিয়ে এখানে এসেছ?” তিনি বললেন: “হজুর পানাহ হালাকু খানের নির্দেশে।” কিতবুগা রেগে গিয়ে বলল: “তোমার ভেতরে সেই বিবেক আছে আর বাইরে এমন সিংহ যে শিরাজের কর আমার পুত্র হালাকু খানকে পাঠায়?” তিনি বললেন: “হালাকু খান সেখানকার বিষয়াবলী সম্পর্কে আমি ছাড়া অন্য কারো সাথে যোগাযোগ করেন না, তিনি আমাকে প্রতিটি অঞ্চলে পাঠান এবং আমার পরামর্শ ছাড়া কোনো সিদ্ধান্ত নেন না।” (আর-রওযুজ যাহির ফি সিরাতিল মালিকিয যাহির, পৃষ্ঠা ৬৬, ৬৭, রিয়াদ)

যাত এবং তাকে আসমানি গজব মনে করত। সে হালাকু খানের দাদা চেঙ্গিস খানের সময় থেকে তাতার বাহিনীতে এক বিশিষ্ট মর্যাদা রাখত, হালাকু খানের সমস্ত বিজয়ের কৃতিত্ব তারই ছিল। হাফিজ ইবনে কাসির রহ. বলেন:

“এই সেই খবিস ছিল যে হালাকু খানের জন্য বিলাদে আজম থেকে শুরু করে শাম পর্যন্ত এলাকা জয় করেছিল। সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এমন সব রণকৌশল প্রয়োগ করেছিল যার উদাহরণ পূর্ববর্তী যুগের ইতিহাসে নেই।”

হাফিজ ইবনে কাসির রহ. তার যুদ্ধকৌশলের কয়েকটি উদাহরণ দিয়েছেন যা নিম্নরূপ:

- ১. সে একটি শহর জয় করার পর সেখানকার লড়াই করার যোগ্য ব্যক্তিদের সাথে নিয়ে অন্য শহর অবরোধ করত। এরপর অবরুদ্ধদের কাছে এই দাবি করত যে, আমাদের সাথে আসা মুসলমানদের তোমাদের শহরে জায়গা দাও যাতে তাদের থাকার কোনো ব্যবস্থা হতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে তার এই দাবি মুসলমানদের জন্য সহানুভূতিশীল মনে হতো, এমনকি অনেক সময় অবরুদ্ধরা নিজেদের জনশক্তি বৃদ্ধির দিকটি বিবেচনা করে একে নিজেদের জন্য উপকারী মনে করত, কিন্তু বাস্তবে এটি ছিল অবরুদ্ধদের পরাস্ত করার একটি কৌশল।
- ২. যদি অবরুদ্ধরা তার কথা মেনে নিয়ে তার সাথে আসা মুসলমানদের শহরে জায়গা দিত, তবে স্বাভাবিকভাবেই অবরুদ্ধদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় খাদ্যের মজুদ দ্রুত শেষ হয়ে যেত এবং অবরোধের সময়কাল স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংক্ষিপ্ত হয়ে আসত।
- ৩. যদি অবরুদ্ধরা তার চাল বুঝতে পেরে এই দাবি না মানত, তবে কিতবুগা তার সাথে থাকা মুসলমানদের তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অগ্রবর্তী দল হওয়ার নির্দেশ দিত এবং ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের লড়িয়ে যেত যতক্ষণ না তারা শহর জয় করত অথবা নিজেরা লড়াই করতে করতে শেষ হয়ে যেত।
- ৪. যদি তারা শহর জয় করতে সফল হতো, তবে কিতবুগা নোয়ান নিজের একজন লোকও না হারিয়ে তার উদ্দেশ্য হাসিল করত। আর যদি তারা লড়াই করতে করতে ধ্বংস হয়ে যেত, তবে তাতেও মুসলমানদেরই বংশ নিধন হতো যা থেকে কিতবুগা নোয়ান একটি চমৎকার তামাশার মতো আনন্দ পেত। এছাড়া এই পারস্পরিক মুসলিম নিধন যুদ্ধে অবরুদ্ধদের শক্তিও কমতে থাকত, যার ফলে এই ধূর্ত যোদ্ধা ন্যূনতম জনশক্তি হারিয়ে বড় বড় শহরগুলো সহজেই জয় করে নিত।
- ৫. তার একটি চাল এমনও ছিল যে, কখনো সে অবরুদ্ধদের হিতাকাঙ্ক্ষীর বেশে এই বার্তা দিত:

“হে শহরবাসী! তোমাদের কাছে পানির মজুদ খুব কম যা শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে এবং তোমাদের কেউ প্রাণের নিরাপত্তা পাবে না। আমরা তোমাদের সমস্ত পুরুষদের হত্যা করব, নারী ও শিশুদের বন্দি করে দাস-দাসী বানিয়ে নেব। অতএব উত্তম এটাই যে, এই খারাপ অবস্থা আসার আগেই সন্ধি হিসেবে শহর আমাদের হাতে তুলে দিয়ে নিজেদের প্রাণ বাঁচাও।”

- ৬. যদি শহরবাসী তার হুমকিতে ভীত না হতো এবং জবাবে বলে পাঠাত যে তোমাদের ভুল ধারণা হয়েছে, আমাদের কাছে পানির পর্যাপ্ত মজুদ রয়েছে, আমরা দীর্ঘ সময় তোমাদের মোকাবিলা করতে পারি... তখন কিতবুগা নোয়ান তাদের বলত:

“আমাকে এই সুযোগ দাও যাতে আমি তোমাদের পানির মজুদ যাচাই করতে পারি, কারণ যদি আমার ধারণা ভুল...”

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: বছর ৬৫৮ হিজরি।

আছে এবং সত্যিই যদি তোমাদের কাছে প্রচুর পানি থাকে, তবে আমাদের দীর্ঘ সময় ধরে অবরোধের কষ্ট সহ্য করার কী ফায়দা? আমরা অবরোধ তুলে নিয়ে চলে যাব।“

শহরবাসীরা এই প্রস্তাবকে অপ্রত্যাশিত নেয়ামত মনে করে জবাবে বলত:

“আপনারা অত্যন্ত আগ্রহের সাথে আপনাদের কয়েকজন বিশ্বস্ত লোককে পাঠিয়ে আমাদের পানির মজুদ যাচাই করে নিন।”

তখন কিতবুগা نَبِيٍّ তার কয়েকজন সৈন্যকে শহরে পাঠিয়ে দিত, তাদের কাছে লম্বা লম্বা বর্শা থাকত। আপাতদৃষ্টিতে এই কয়েকটি বর্শা শহরবাসীদের জন্য কোনো বিপদের কারণ মনে হতো না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলোর মধ্যে পুরো শহরের মৃত্যুর বার্তা লুকিয়ে থাকত। এই বর্শাগুলো ছিল এক ধরনের ইনজেকশন, এগুলোর কাঠ ভেতর থেকে ফাঁপা ছিল। এই ফাঁপা অংশে অত্যন্ত বিষাক্ত তরল পদার্থ ভরে দেওয়া হতো। বর্শাগুলোকে এমন কৌশলে তৈরি করা হয়েছিল যে, প্রয়োজনে বিষকে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে বের করা যেত। শহরবাসীরা এই বর্শাধারীদের ক্ষতিকর মনে না করে তাদের জন্য শহরের দরজা খুলে দিত এবং তাদের নিজেদের পুকুর, কুয়া ও জলাধারগুলোতে নিয়ে যেত। এই ধূর্ত তাতারীরা তাদের বর্শা পানিতে ডুবিয়ে ডুবিয়ে আপাতদৃষ্টিতে পানির গভীরতা পরিমাপ করত এবং সেই সাথে ওই পানিতে বিষ ঢালতে থাকত, এমনকি শহরের সমস্ত পানি বিষাক্ত হয়ে যেত। পরবর্তীতে যখন শহরবাসীরা পানি ব্যবহার করত, তখন তাদের একটি বড় অংশ এতেই মারা যেত এবং বাকিরা আত্মসমর্পণ করত। [১]

দামেস্কের পতন:

এই কিতবুগা نَبِيٍّই এখন দামেস্কে আক্রমণকারী বাহিনীর সেনাপতি ছিল। ৬৫৮ হিজরীর সফর মাসের শেষের দিকে তাতারী বাহিনী দামেস্কে পৌঁছে যায়। শহরে এমন কোনো নেতা ছিল না যে মানুষের নেতৃত্ব দেবে। এমন পরিস্থিতিতে জাতি-বিক্রেতা প্রধান জয়নুদ্দিন হাফিজি মানুষকে বিশ্বাস করাল যে, হালাকু খানের আনুগত্যের মধ্যেই আমাদের কল্যাণ নিহিত। ফলে শহরবাসীরা হতাশ হয়ে শহরের দরজা খুলে দিল এবং কাফের বাহিনীকে স্বাগত জানাল। হালাকু খান শহরবাসীর নামে একটি আমাননামা পাঠিয়েছিল, যা নাগরিকদের সমাবেশস্থল ময়দানে আখজারে পড়ে শোনানো হলো। জয়নুদ্দিন হাফিজি শহরের আমিরদের কাছ থেকে প্রচুর ধন-সম্পদ সংগ্রহ করে তা দিয়ে উপহার সামগ্রী ক্রয় করল এবং হালাকু ও তার সরদারদের কাছে পেশ করে তাদের কাছে নিজের মর্যাদা বৃদ্ধি করল।

দামেস্কের দুর্গাধিপতি বদরুদ্দিন আত্মসমর্পণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না এবং তিনি দুর্গবন্দী হয়ে গিয়েছিলেন। তাতারীরা মাসব্যাপী এটি অবরোধ করে রাখে কিন্তু কোনো ফল হয়নি। অবশেষে কিতবুগা نَبِيٍّ ডজন ডজন মানজানিক গরুর গাড়িতে করে দুর্গের সামনে নিয়ে এল। অনবরত পাথর নিক্ষেপের ফলে দুর্গে ফাটল দেখা দিল এবং অবশেষে ৬৫৮ হিজরীর জমাদিউল আউয়াল মাসের মাঝামাঝি সময়ে দুর্গটি দখল করে নেওয়া হলো। দুর্গাধিপতিকে তার সাথীদেরসহ হত্যা করে দুর্গটি মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হলো। [২] দামেস্কে তাতারীদের দখলের সাথে সাথেই সিরিয়া সম্পূর্ণভাবে তাদের অধীনে চলে এল। বায়তুল মুকাদ্দাস, কারাক এবং শুবাক-এর...

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: সন ৬৫৮ হিজরী

[২] আস-সুলুক লি-মা'রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ১ / ৫১১ থেকে ৫১৩, ত. আল-ইলমিয়াহ

হাকিম আল-মুগীস উমর তাতারীদের আনুগত্য স্বীকার করে নিলেন, এভাবে জর্ডান ও ফিলিস্তিনসহ পুরো শাম তাদের দখলে চলে এল। [১]

দামেস্কে মুসলমানদের শোচনীয় অবস্থা:

দামেস্কের ওপর তাতারীদের দখলের ফলে যেখানে মুসলমানরা শোকে মুহ্যমান ছিল, সেখানে খ্রিস্টানরা আনন্দের উৎসব পালন করছিল। শহরটি ‘ইল সাবান’ নামক এক তাতারী সরদারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল, যে ছিল নাসারাদের সমর্থক এবং মুসলমানদের কটুর শত্রু। নাসারা পাদ্রী ও সন্ন্যাসীরা গিয়ে তার সাথে সাক্ষাৎ করল। সে তাদের অনেক সম্মান করল এবং তাদের উপাসনালয়গুলো পরিদর্শন করল। এভাবে স্থানীয় নাসারাদের পোয়াবারো হলো। খ্রিস্টানদের একটি প্রতিনিধি দল আলেপ্পো গিয়ে হালাকু খানের সাথেও দেখা করল। হালাকু তাদের অনেক খাতির-যত্ন করল এবং অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সাথে ফেরত পাঠাল। এই প্রতিনিধি দলটি আনন্দের বাদ্য বাজাতে বাজাতে শহরে ফিরে এল। [২]

শেখ কুতুবুদ্দিন ইউনিনী রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন:

“দামেস্কের নাসারারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত বেপরোয়া ও অহংকারী হয়ে উঠেছিল এবং কটু কথা বলতে শুরু করেছিল, কারণ (তাতারী শাসক) ইল সাবান এবং অন্যান্য তাতারী সরদাররা তাদের গির্জাগুলোতে যাতায়াত করত। তাদের মধ্যে কিছু নাসারা হালাকু খানের কাছে গেল এবং সেখান থেকে এমন এক ফরমান নিয়ে এল যাতে নাসারাদের প্রতি বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ও বিবেচনার তাকিদ দেওয়া হয়েছিল। (ফিরে আসার সময় এই প্রতিনিধি দলে অন্তর্ভুক্ত) নাসারারা ‘বাব তুমা’ দিয়ে প্রবেশ করল, তারা মানুষের মাথার ওপর ক্রুশ উঁচিয়ে ধরছিল, তাদের বিশেষ স্লোগান দিচ্ছিল এবং চিৎকার করে নাসারা ধর্মের বিজয়ের ঘোষণা দিচ্ছিল ও ইসলামের নিন্দা করছিল। তারা মানুষের ওপর এবং মসজিদের দরজায় মদ ছিটিয়ে দিচ্ছিল। ফলে এই পরিস্থিতিতে মুসলমানরা চরম মর্মান্বিত হলো।”

“বাব তুমা থেকে আসা এই খ্রিস্টানরা যখন শেখ আবুল বায়ান রহমাতুল্লাহি আলাইহির খানকাহ পর্যন্ত পৌঁছাল, তখন তারা আবার তাদের স্লোগান দিল এবং খানকাহর দরজায় মদ ছিটিয়ে দিল। একই কাজ তারা মাসজিদে কাবীর এবং মাসজিদে সগীর-এর সাথেও করল। তারা দোকানে থাকা লোকদের নির্দেশ দিল যেন তারা ক্রুশের সম্মানে দাঁড়িয়ে যায়। যে দাঁড়ায়নি, নাসারারা তাকে মারধর ও অপমান করল। এভাবে তারা পুরো বাজার অতিক্রম করে মারিয়াম গির্জার ছোট বাজারের শেষ পর্যন্ত পৌঁছাল। কিছু খ্রিস্টান সেখানে চকের একটি মঞ্চে উঠে নাসারা ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব এবং ইসলামের নিন্দা বর্ণনা করল।” [৩]

হাফিজ ইবনে কাসীর রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন:

“নাসারারা জামে মসজিদে মদ নিয়ে প্রবেশ করল। তারা এই সংকল্প করেছিল যে, যদি তাতারীদের অবস্থান দীর্ঘস্থায়ী হয় তবে আমরা অনেক মসজিদ ভেঙে ফেলব। যখন শহরে এই অবস্থা হলো, তখন শহরের উলামায়ে কেরাম ও কাজীগণ একত্রিত হলেন এবং কেল্লার তাতারী ওয়ালী ইল সাবানের কাছে গিয়ে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন, কিন্তু তিনি অত্যন্ত অপমানজনক আচরণের সাথে তাদের তাড়িয়ে দিলেন...”

[১] আস-সুলুক লি-মা’রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ১/৫১৩, ত. আল-ইলমিয়াহ

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, সন ৬৫৪ হিজরি, ১৭/৩৩৯

[৩] জাইলু মিরআতিয যামান: ১/১৬২, ১৬৩, ত. দারুল কিতাব আল-ইসলামি কায়রো

...দেওয়া হলো এবং খ্রিস্টানদের তাদের ওপর প্রাধান্য দেওয়া হলো। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। [১]

সুলতান শাম আল-মালিক আন-নাসিরের দরবদর হওয়া এবং গ্রেপ্তারী:

আল-মালিক আন-নাসির মিশরের সীমান্ত থেকে ফিরে এসে “কারাক”-এর সুদৃঢ় দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু যখন তিনি জানতে পারলেন যে তাতারী সরদার কিতবুগা নঈওয় এই দুর্গটি অবরোধ করতে চায়, তখন তিনি ভীত হয়ে সেখান থেকেও পালিয়ে যান, যদিও তিনি যদি সেখানে অবরুদ্ধ থাকতেন তবে তাতারীরা এক-দেড় বছর পর্যন্ত তা জয় করতে পারত না। আল-মালিক আন-নাসির সিনাই মরুভূমিতে এদিক-সেদিক লুকিয়ে বেড়াতে লাগলেন, অন্যদিকে তাতারীরা তাকে জায়গায় জায়গায় খুঁজছিল। এই সময়ে তারা যাযাবর বেদুইনদেরও তাদের লুটতরাজের লক্ষ্যবস্তু বানায়। অবশেষে আন-নাসিরের এক গোলাম হুসাইন কুর্দি তবলদার তাতারীদের সাথে যোগসাজশ করে তাকে গ্রেপ্তার করিয়ে দেয়। [২]

তাকে কিতবুগা নঈওয়-এর কাছে নিয়ে যাওয়া হলো যে “আজলুন” অবরোধ করে রেখেছিল। কিতবুগা তার কাছে দাবি করল যে সে যেন আজলুন-এর দুর্গাধিপতিকে আত্মসমর্পণ করতে রাজি করায়। আল-মালিক আন-নাসির তাই করলেন এবং তাতারীরা আজলুনে প্রবেশ করল, তারা পুরো শহর লুটতরাজ করে ধ্বংস করে দিল। এরপর আল-মালিক আন-নাসিরকে হালাকু খানের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। হালাকু খান তার প্রাণভিক্ষা দিলেন এবং একজন পরজীবীর মতো নিজের সাথে রেখে দিলেন। এভাবে সিরিয়া শাসনকারী আইয়ুবীদের এই বিদগ্ধ পণ্ডিত, সাহিত্যিক ও কবি শাসক এক অপমানজনক জীবন অতিবাহিত করতে বাধ্য হলেন। [৩] হালাকু খান তার সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে তিনি তার সমস্ত শত্রুদের খতম করার পর তাকে সিরিয়ায় নিজের নায়েব নিযুক্ত করবেন, কিন্তু এই ওয়াদা কখনো পূরণ হয়নি। [৪]

সিরিয়ায় চরম দুর্দশা:

তাতারীদের শাসনামলে সিরিয়ার মতো সমৃদ্ধ দেশ এক বছরের মধ্যেই চরম দুর্দশার শিকার হলো। উপকূলের ফিরিজিরা মুসলমানদের পরাধীনতার সুযোগ পুরোপুরি গ্রহণ করল এবং জাল মুদ্রা তৈরি করে তা বাজারে প্রচলিত করে দিল। সেই যুগের একজন আলেম লিখেছেন:

“সিরিয়ার মানুষ চরম দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির শিকার হলো। প্রতিটি জিনিস, চাই তা পানাহারের হোক বা অন্য কোনো ব্যবহারের, দুর্মূল্য হয়ে গেল; রুটি দুই দিরহাম, এক রতল গোশত পনেরো দিরহাম, এক রতল আঙুর দুই দিরহাম। মূল্যবৃদ্ধির একটি কারণ ছিল এই যে, ইয়াফার ফিরিজিরা প্রচুর পরিমাণে দিরহাম তৈরি করেছিল যাতে অনেক বেশি ভেজাল ছিল। বলা হয় যে, একশ দিরহামে মাত্র পনেরো দিরহাম রূপা থাকত, বাকিটা ছিল পিতল।” [৫]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, সন ৬৫৮ হিজরী।

[২] সিয়াকু আলামিন নুবালা: ২৩ / ৩০৩ থেকে ৩০৫, তাবা আর-রিসালাহ; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: সন ৬৫৮ হিজরী।

[৩] তারিখুল ইসলাম লিয-যাহাবী, ওফাত: ৬৫৮ হিজরী।

[৪] জামিউত তাওয়ারিখ (আরবি): খণ্ড ২, প্রথম অংশ: পৃষ্ঠা ৩০৮।

[৫] যাইলু মিরআতিয যামান লিল-ইউনিনী: ১ / ১৩৩, তাবা দারুল কিতাব আল-ইসলামী কায়রো।

দ্রষ্টব্য: এক দিরহাম = ৩ গ্রামের চেয়ে কিছুটা বেশি রূপা। এক রতল = ৩৯৮ গ্রাম (প্রায় এক পাউন্ড)।

বিবার্শের মিশরে প্রত্যাভর্তন:

মুসলমানদের শেষ আশা-ভরসা ছিল মিশরের মামলুকরা, যাদের কিছুকাল আগেই সাইফউদ্দীন কুতুজের মতো সাহসী নেতা নসিব হয়েছিল। এই সময় তাতারীরা সিরিয়ার সমস্ত শহর পদদলিত করে ফেলেছিল এবং এখন তারা ফিলিস্তিনের গাজা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। বিপদের আশঙ্কা অনুভব করে কুতুজ সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করার জরুরি প্রয়োজন অনুভব করেন এবং মিশরের সাবেক সেনাপতি বিবার্শকে ফিরিয়ে আনেন, যিনি কিছুকাল আগে সিরিয়ার সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। কুতুজের আমন্ত্রণে তিনি ২৩ রবিউল আউয়াল ৬৫৪ হিজরিতে মিশরে পৌঁছান। কুতুজ শহরের বাইরে এসে তাকে অভ্যর্থনা জানান। [১]

ওদিকে তাতারীদের একের পর এক বিজয়ে মিশরের ওপর তাৎক্ষণিক হামলার এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছিল। হলাকু খান এবং তার সেনাপতি কিতবুগা নয়ানের নিজেদের বিজয়ের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস ছিল।

হলাকু খানের পত্র এবং তার উত্তর:

হলাকু এই অহংকারে দূতদের সাথে একটি হুমকি সম্বলিত পত্র মিশরে পাঠান [২], যাতে লেখা ছিল:

“পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক, শাহেনশাহে খাকানে আজমের পক্ষ থেকে সাইফউদ্দীন কুতুজের নামে, যিনি গোলামদের বংশ থেকে এবং আমাদের ভয়ে পালিয়ে মিশরে আশ্রয় নিয়েছেন। কুতুজ, তার সকল আমির ও মিশরের অধিবাসী এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের লোকেরা জেনে রাখুক যে আমরা জমিনে আল্লাহর লস্কর। তোমাদের অন্যদের পরিণতি দেখে শিক্ষা নেওয়া উচিত। ধুলোবালি ও অনুশোচনা হওয়ার আগেই নিজেদের ক্ষমতা আমাদের হাতে সোপর্দ করে দাও। আমরা যারা কাঁদে তাদের ওপর দয়া করি না। তোমরা জানো যে আমরা অধিকাংশ শহর জয় করে জমিনকে ফাসাদ থেকে মুক্ত করেছি। এখন তোমাদের কাজ হলো পালানো আর আমাদের কাজ হলো পিছু নেওয়া। কিন্তু কোন জমিন তোমাদের আশ্রয় দেবে? কোন পথ তোমাদের মুক্তি দেবে? আমাদের তলোয়ার থেকে তোমরা বাঁচতে পারবে না। আমাদের আতঙ্ক থেকে কোনো আশ্রয় নেই। আমাদের ঘোড়াগুলো বিদ্যুৎ গতির, আমাদের তীরগুলো বজ্রের মতো এবং আমাদের তলোয়ারগুলো আসমানি বিজলি। আমাদের হৃদয় পাহাড়ের মতো এবং আমাদের সংখ্যা বালুকণার মতো। কেবলো তোমাদের রুখতে অক্ষম এবং সেনাবাহিনী আমাদের সামনে অসহায়। আমাদের সাথে যুদ্ধ চাওয়া মানেই হলো ধ্বংস হওয়া এবং নিরাপত্তা চাওয়া মানেই হলো শান্তি। যদি তোমরা বিরোধিতা করো তবে তোমরা মরবে। সুতরাং নিজেদের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না। আমরা তোমাদের কাফের মনে করি এবং আমরা ফাজের। তোমাদের সংখ্যাধিক্য আমাদের কাছে নগণ্য এবং তোমাদের সম্মানিতরা আমাদের কাছে লাঞ্চিত। এই ফরমানের উত্তর জলদি দাও, এর আগে যে যুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠে এবং তার শিখা তোমাদের দিকে ধাবিত হয়।” [৩]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৬৫৪ হিজরি; আন-নুজুমুজ জাহেরা ফি মুলুক মিসর ওয়াল কাহেরা: ৭/১০১, তাবা দারুল কুতুব মিসর।

[২] এই প্রতিনিধি দলে দূতসহ মোট ৪০ জন লোক ছিল। দেখুন: জামিউত তাওয়ারিখ (আরবি) খণ্ড ২, অংশ ১, পৃষ্ঠা ৩১০।

[৩] আস-সুলুক লি মা'রিফতি দুওয়ালিল মুলুক, পৃষ্ঠা ৫১৩, ৫১৫, তাবা ইলমিয়াহ; তারিখ-ই-ওয়াসসাফ, পৃষ্ঠা ৩৩ থেকে ৩৫, তাবা বোম্বে। এই পত্রটি অত্যন্ত দীর্ঘ এবং হৃদয় ও অন্তর্মিলযুক্ত আরবিতে। “মুফতি ডট আল-হাদিস ডট কম”-এর একটি প্রবন্ধ অনুযায়ী এর পাণ্ডুলিপি মাকতাবাতুল দিরাসাতুল উলইয়া, কুল্লিয়াতুল আদাব, জামিয়া বাগদাদ, ইরাকে (১৫৭৭) সংরক্ষিত আছে। বয়ান-ই-মুরশিদ অনুযায়ী এই পত্র হলাকুর প্রিয় কবি নাসিরুদ্দীন তুসী লিখেছিলেন। (অজাইবুল মাকদুর ফি আখবারে তিমুর, পৃষ্ঠা ১২৮)

সাইফ উদ্দিন কুতুযের সেনাপতিদের সাথে পরামর্শ:

সাইফ উদ্দিন কুতুয সেনাপতিদের বৈঠকে এই পত্রটি পড়ে শোনালেন। হালাকু খানের চিঠির দুটিই জবাব হতে পারে: মৃত্যুর চেয়েও অধম জীবন গ্রহণ করা, অথবা সম্মানজনক মৃত্যুর জন্য বিপদের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়া। কুতুয এই পরিস্থিতি সামনে রেখে সেনাপতিদের সাথে পরামর্শ করলেন এবং বললেন:

“হালাকু খানের বাহিনী খোরাসান থেকে ইরানের দিকে এল, তখন কোনো খলিফা, সুলতান বা শাসক তার মোকাবিলা করার ক্ষমতা রাখতেন না। তিনি সেই সমস্ত দেশ দখল করে নিলেন। তারপর তিনি দামেস্ক পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। যদি তিনি তার ভাই (মঙ্গু খান)-এর মৃত্যুর সংবাদ না পেতেন, তবে মিসরের পরিণতিও বাকি ইসলামি বিশ্বের মতোই হতো। তা সত্ত্বেও তিনি এই দিকে কিতবুকা নোয়ানকে পাঠিয়েছেন, যে একজন রক্তপিপাসু সিংহ এবং গর্তে লুকিয়ে থাকা অজগরের চেয়ে কম নয়। যখন সে মিসরের দিকে মুখ করবে, তখন কারো তার মোকাবিলা করার শক্তি থাকবে না। তাই সময় হাত থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগেই আমাদের কোনো উপায় চিন্তা করা উচিত।”

আশঙ্কা ছিল যে অধিকাংশ সেনাপতি হালাকুর কাছে নিরাপত্তা চাওয়ার পরামর্শ দেবেন, কিন্তু তার আগেই আমির নাসিরুদ্দিন কাইমারি এমন এক প্রজ্ঞাপূর্ণ বক্তব্য দিলেন যাতে ওই সেনাপতিদের যুক্তিগুলোও এসে গেল এবং তিনি সেগুলোর খণ্ডনও করলেন। আমির কাইমারি বললেন:

“হালাকু খান চেঙ্গিস খানের নাতি, তুলুই খানের ছেলে এবং মঙ্গু খানের ভাই; তার খ্যাতি বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। চীন সীমান্ত থেকে সমস্ত এলাকা তার দখলে। তার বিশেষ আসমানি সাহায্য অর্জিত আছে। যদি আমরা তার কাছে গিয়ে নিরাপত্তা প্রার্থনা করি তবে তাতে লজ্জার কিছু নেই। কিন্তু স্বেচ্ছায় বিষ পান করা কোনো বুদ্ধিমত্তার কাজ নয়। আসলে হালাকু খান এমন এক ব্যক্তি যাকে বিশ্বাস করা যায় না। তার কাছে কথা দেওয়ার কোনো মূল্য নেই। সে কোনো প্রতিশ্রুতি বা চুক্তির অনুসারী নয়। সে প্রতারণা করে আলাউদ্দিন খুরশাহ, খলিফা মুসতাসিম, হুসামুদ্দিন আক্কা এবং আরবেলের শাসককে হত্যা করেছে, অথচ সে তাদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। যদি আমরা তার কাছে যাই তবে আমাদের পরিণতিও তাদের চেয়ে ভিন্ন হবে না।”

একথা শুনে কুতুয বললেন: “পরিস্থিতি এই যে দিয়ার বকর, রাবিয়া এবং শামের সমস্ত এলাকা ধ্বংস হয়ে গেছে। বাগদাদ থেকে এশিয়া মাইনর পর্যন্ত কেবল ধ্বংস আর ধ্বংস। সেখানে ফসল, বংশধারা, বীজ এবং পশুর জোড়া দুর্লভ হয়ে পড়েছে। যদি আমরা তাতারদের সাথে যুদ্ধের জন্য এখানে কাতারবন্দি না হই, তবে মিসরও বাকি এলাকাগুলোর মতো উজাড় হয়ে যাবে। এখন তাতারদের মোকাবিলায় আমাদের সামনে কেবল তিনটি পথ আছে: সন্ধি, যুদ্ধ অথবা স্বদেশ ত্যাগ। স্বদেশ ত্যাগ করা আমাদের জন্য সম্ভব নয় কারণ আমাদের জন্য মারাক্কেশ ছাড়া যাওয়ার কোনো আশ্রয়স্থল নেই এবং সেই এলাকা এখন থেকে অনেক দূরে।”

নাসিরুদ্দিন কাইমারি সাথে সাথে কথা বাড়িয়ে বললেন:

“আর তাতারদের সাথে সন্ধি করাও সমীচীন নয় কারণ তাদের প্রতিশ্রুতি ও চুক্তি নির্ভরযোগ্য নয়।”

একথা শুনে কিছু সেনাপতি বললেন: “কিন্তু তাতারদের সাথে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই। এখন আপনিই বলুন কী করতে হবে।”

কুতুয বললেন: “আমার রায় হলো আমরা সবাই একত্রিত হয়ে জিহাদের জন্য কোমর বাঁধি। যদি বিজয় নসিব হয় তবে...”

উদ্দেশ্য। যদি পরাজয় ঘটে তবে আমরা আল্লাহর সৃষ্টির সামনে লজ্জিত হব না।“

সবাই আপাতদৃষ্টিতে এই মতের সাথে একমত হলেন এবং সভা মূলতবি হয়ে গেল। [১]

এখন কুতুজ হালাকুর পত্রের উত্তর দেওয়ার জন্য বাইবার্স বৃন্দুকদারিকে নির্জনে ডেকে পরামর্শ চাইলেন। বাইবার্সের কাছে হালাকু খানের পত্রটি এমন ছিল যে, এর উত্তর মুখে দেওয়া কার্যকর ছিল না।

তিনি বললেন: “আমার মত হলো এই যে, দূতদের হত্যা করা হোক এবং আমরা সম্মিলিতভাবে কিতবুকা নোয়ানের দিকে সৈন্য চালনা করি। জিতি বা হারি, উভয় ক্ষেত্রেই আমাদের ওপর কোনো দোষ আসবে না।” কুতুজ এই মতের সাথে একমত হলেন। [২]

জিহাদের প্রস্তুতি:

কুতুজ সালতানাতের আমিরদের জিহাদের জন্য সমবেত হওয়ার নির্দেশ দিলেন। হামাহ-র শাসক আল-মালিক আল-মানসুরকে এই শব্দগুলোর সাথে তলব পাঠালেন: “এই দিনগুলোতে দস্তুরখান সাজানোর চিন্তা ত্যাগ করো, শুধু প্রত্যেক সৈন্যকে এক টুকরো করে গোশত দিয়ে দাও এবং যত দ্রুত সম্ভব পৌঁছে যাও।” [৩] হিমস-এর শাসক আল-আশরাফ মুজাফফরুদ্দিন মুসা এবং বানিয়াস-এর শাসক আল-মালিক আস-সাইদ বিন আল-মালিক আল-আজিজের কাছে দূত পাঠিয়ে জিহাদের জন্য সাহায্য চাওয়া হলো। যদিও এই দুজনেই হালাকুর করদ রাজ্যে পরিণত হয়েছিলেন, কিন্তু আল-আশরাফ উৎসাহব্যঞ্জক উত্তর দিলেন এবং বললেন: “আল্লাহর শোকর, যিনি কুতুজকে দ্বীনের সাহায্যের জন্য দাঁড় করিয়েছেন।” তিনি দূতের কাছে ওয়াদা করলেন যে, যদি তার বাহিনী তাতারীদের সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে আসে তবে সুযোগ পাওয়ামাত্রই পিছু হটে গিয়ে বাকি লশকরকে হত্যা দ্যম করে দেবে।

কিন্তু আল-মালিক আস-সাইদ কুতুজের দূতকে তাড়িয়ে দিলেন এবং বললেন: “কে আছে যে এই ছোকরার (কুতুজ) আনুগত্য করবে?” [৪]

এদিকে মিসরের সমস্ত প্রদেশ ও শহরগুলোতে ঘোষণা করা হচ্ছিল:

“জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর জন্য বের হও। দ্বীনে মুহাম্মাদীর সাহায্যের জন্য বের হও।”

সমস্ত নায়েবদের নির্দেশ দেওয়া হলো যে, তারা যেন নিজ নিজ এলাকায় সৈন্যদের একত্রিত করেন এবং তাদের জন্য যুদ্ধ সরঞ্জাম, সফরের ব্যবস্থা ও রসদের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করেন; যদি কোনো সৈন্য ভয়ে আত্মগোপন করে তবে তাকে খুঁজে বের করে প্রহার করা হোক। [৫]

তাতারী দূতদের হত্যা:

লশকর রওনা হওয়ার আগে পত্র বহনকারী চারজন দূতকে হত্যা করে তাদের মাথা চৌরাস্তায় ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। তাদের সহকারীদের মধ্য থেকে একজন বালককে, যে অল্পবয়সী ছিল, কুতুজ গোলাম বানিয়ে নিলেন। [৬] যদিও বার্তাবাহককে হত্যা করা সঠিক ছিল না, কিন্তু কুতুজ এবং তার ডান হাত বাইবার্সের সামনে তাতারীদের সেই জুলুম-অত্যাচার ছিল যার কোনো সীমা-পরিসীমা ছিল না; সম্ভবত এই কারণেই তারা হাতে আসা এই তাতারীদের জীবিত ছাড়ার কোনো অবকাশ অনুভব করেননি। এছাড়া তাদের রণকৌশল ছিল এই যে, এক তো...

[১] জামিউত তাওয়ারিখ (আরবি): খণ্ড ২, প্রথম অংশ: পৃষ্ঠা ৩১৩-৩১৪

[২] জামিউত তাওয়ারিখ (আরবি): খণ্ড ২, প্রথম অংশ: পৃষ্ঠা ৩১৩

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: সন ৬৫৮ হিজরি; আন-নুজুমুজ জাহেরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহেরা: ৭/১০১, তবা দারুল কুতুব মিসর

[৪] আস-সুলুক লি-মা’রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক লিল-মাকরিজি: ১/৫১৫, তবা আল-ইলমিয়াহ

[৫] নিহায়াতুল আরাব লিন-নুওয়াইরি: ২৯/৩৭৪

[৬] আস-সুলুক লি-মা’রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক লিল-মাকরিজি: ১/৫১৫

মিশরবাসীদের অন্তর থেকে তাতারীদের ভয় দূর করে দেওয়া হোক, দ্বিতীয়ত তাতারীদের প্রস্তুতির আগেই নিজেদের কাতারবন্দি করে নেওয়া হোক। এজন্য কেবল যে পত্রের কোনো উত্তর দেওয়া হয়নি তা নয়, বরং কাউকে জীবিতও রাখা হয়নি যে সে গিয়ে হালাকু খানকে মিশরের দরবারের সিদ্ধান্ত শোনাবে। [১]

কায়রো থেকে كسرى (সৈন্যবাহিনী) এর যাত্রা। অফিসারদের সাহস প্রদান:

কুতুযের সাহস ও রণকৌশল সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক উঁচুতে ছিল। আল্লাহ এই مردِ مجاهد (মুজাহিদ ব্যক্তি)-এর অন্তরে এই চিন্তা বদ্ধমূল করে দিয়েছিলেন যে, তাতারীদের মিশরের সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছানোর সুযোগ দেওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক হবে। এর পরিবর্তে নিজেরা আক্রমণাত্মক হামলা করলে মুসলমানদের সাহস বৃদ্ধি পাবে এবং শত্রুর ওপর ত্রাস সৃষ্টি হবে। কিন্তু সেনাবাহিনীর অধিকাংশ আমীর কুতুযের কৌশলের ওপর ভরসা করতে পারছিলেন না। তারা মনে করছিলেন যে, কোনোভাবে মিশরের সীমান্ত রক্ষা করা গেলেই অনেক বড় ব্যাপার হবে। কিছু লোক এমনও ছিলেন যারা তাতারীদের সামনে আত্মসমর্পণ করাকেই বাঁচার একমাত্র উপায় মনে করতেন।

১৫ শাবান ৬৫৮ হিজরি (আগস্ট ১২৬০ খ্রিষ্টাব্দ) সৈন্যবাহিনী কায়রো থেকে রওনা হলো এবং আস-সালেহিয়াতে গিয়ে ছাউনি ফেলল। এখানে সৈন্য সমবেত হতে থাকল। অধিকাংশ আমীর এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে ঘাবড়াচ্ছিলেন। কিন্তু রাজকীয় নির্দেশের কারণে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সাথে চলতে শুরু করেছিলেন। কুতুয তাদের সবাইকে ডাকলেন এবং তাদের খোলা মনে নিজেদের মতামত প্রকাশের সুযোগ দিলেন।

এক অদ্ভুত বিষয় সামনে এল যে, প্রায় সকলেই মিশর থেকে বের হয়ে আক্রমণাত্মক হামলা করাকে ভুল কৌশল হিসেবে আখ্যা দিলেন এবং সুলতানের সাথে চলতে ইতস্তত বোধ করলেন। এখন পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক হয়ে পড়ল। যদি বিষয়টি এভাবেই চলত, তবে ইসলামি বিশ্বের প্রতিরক্ষার শেষ ঘাঁটি মিশরও মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে যেত। এমন পরিস্থিতিতে কুতুয তার নেতৃত্বসুলভ ও বাগ্মিতা দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে আমীরদের অধিবেশনে এক উদ্দীপনামূলক ভাষণ দিলেন এবং বললেন:

“হে মুসলিম আমীরগণ! তোমাদের বাইতুল মালের অর্থ ভোগ করতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে। আজ প্রয়োজনের সময় তোমরা জিহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ!! আমি যুদ্ধের জন্য যাচ্ছি। যে জিহাদ করতে চায় সে সাথে আসুক। যে চায় না, সে নিজের ঘরে ফিরে যাক। আল্লাহ তাকে দেখছেন। মুসলমানদের নারীরা যেন দাসী না হয়, তার দায়ভার এই পেছনে থেকে যাওয়া লোকদের ওপরই বর্তাবে।”

হৃদয় নিংড়ানো এই সংক্ষিপ্ত ভাষণ অনেক আমীরের আত্মমর্যাদাকে নাড়া দিল। তারা কুতুযকে সঙ্গ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং মরণপণ যুদ্ধের শপথ নিলেন। এটি দেখে বাকি আমীররাও অনিচ্ছাসত্ত্বেও যুদ্ধের জন্য কোমর বেঁধে নিলেন। সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত হলো যাতে মিশরীয়, শামী, আরব এবং তুর্কমেনরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেই রাতেই কুতুয বাহিনীকে কুচকাওয়াজের নির্দেশ দিলেন এবং সেই সাথে অস্থির আমীরদের আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার জন্য ঘোষণা করলেন: “আমি তাতারীদের সাথে লড়াই করতে নিজেই যাচ্ছি।”

এই ঘোষণার পর কোনো অফিসার বা সৈনিকের পেছনে পড়ে থাকার সাহস রইল না। [২] সবাই বুঝে গেল যে:

হে মন, প্রেমের সওদায় পুরোটাই লাভ... একটি প্রাণের ক্ষতি হবে, তবে এমন ক্ষতি কিছু নয়।

[১] আস-সুলুক লি-মা'রিফতি দুওয়ালিল মুলুক: ১/৫১৫, ত. আল-ইলমিয়্যাহ

[২] আস-সুলুক লি-মা'রিফতি দুওয়ালিল মুলুক: ১/৫১৫, ত. আল-ইলমিয়্যাহ

বাহিনীর যাত্রা..... অভিযানের পথ:

সুতরাং মিশরীয় বাহিনী অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সালিহিয়া থেকে অভিযান শুরু করে এবং সিনাই মরুভূমি অতিক্রম করে উপকূল বরাবর গাজার দিকে অগ্রসর হয়। আজ আমরা যদি ইসলামী বাহিনীর অগ্রযাত্রার মানচিত্র দেখি তবে অবাক হতে হয়। এই বাহিনী এমন এক পথে গিয়েছিল যা কেউ প্রত্যাশা করেনি। পুরো পরিকল্পনাটি ছিল কুতুযের বুদ্ধিমত্তার এক অলৌকিক নিদর্শন, যার ফলে ইসলামী বাহিনী তাদের লক্ষ্য এমন নিরাপত্তার সাথে পৌঁছেছিল যে তাদের কোথাও কোনো বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি। যদিও সেই দিনগুলোতে তাতারীদের দলগুলো সিরিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে আজলুন, সারখাদ এবং বুসরাকে তছনছ করে দিয়েছিল এবং এখন সিরিয়া ও মিশরের মাঝখানে অবস্থিত গাজায় হানা দিচ্ছিল। [১]

তুর্কমেন আমীর এবং রাজপরিবারের অনেক নামী সন্তানদের দল সুলতানের বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুলতান কুতুয অভিজ্ঞ জেনারেল রুকন উদ্দিন বিবাসকে বাহিনীর অগ্রবর্তী দলের নেতৃত্ব অর্পণ করে নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন গাজায় পৌঁছে তাতারীদের অগ্রযাত্রার প্রতিটি খবর বাহিনীর মূল কেন্দ্রে পৌঁছে দেন। বিবাস সিনাই মরুভূমি অতিক্রম করে গাজায় পৌঁছান যেখানে তাতারীদের একটি বাহিনী টহল দিচ্ছিল। [২] এই তাতারীরা কিতবুগা নোয়ানের নিষ্ঠুর ভাই বাইদারার নেতৃত্বে মাত্র কয়েকদিন আগে গাজা এবং আল-খলিলে লুটতরাজ চালিয়ে নারী ও শিশুদের বন্দী করেছিল। [৩] আলেপ্পোতে অবস্থানরত হলাকু খান তো দূরের কথা, কিতবুগা নোয়ানও মিশরীয়দের সিদ্ধান্তের কথা জানত না এবং সে হিমসে অবস্থান করে মিশরীয় দরবারের পক্ষ থেকে আনুগত্যের উত্তরের অপেক্ষায় ছিল। [৪] তাই সীমান্তে মোতায়েন এই তাতার বাহিনী ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। মুসলমানদের অগ্রযাত্রার খবর পাওয়া মাত্রই বাইদারা কিতবুগা নোয়ানকে বার্তা পাঠিয়ে বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেন। সে উত্তর পাঠাল: ‘নিজের জায়গায় থাকো এবং আমার আসার অপেক্ষা করো’। [৫]

এর সাথে সাথেই কিতবুগা দ্রুত দক্ষিণ দিকে ধাবিত হয়। [৬] কিন্তু বিবাসের ঝোড়ে অভিযান বাইদারাকে কোনো সুযোগ দেয়নি। সে হঠাৎ ইসলামী বাহিনীকে নিজের মাথার ওপর দেখে পিছু হটে এবং বিবাস আসী নদী পর্যন্ত তাকে তাড়া করেন। [৭] এই তাতারীদের তাড়িয়ে দিয়ে বিবাস গাজায় শিবির স্থাপন করেন। বাইদারা গাজা থেকে পিছু হটার সময় কিতবুগাকে, যে বালবাক পৌঁছে গিয়েছিল, মিশরীয় বাহিনীর অভিযানের খবর পাঠিয়ে দিয়েছিল। সে রাগান্বিত হয়ে অবিলম্বে চারদিকে ছড়িয়ে থাকা বাহিনীগুলোকে একত্রিত করে এবং বাইদারার সাথে মিশরের সীমান্তের দিকে রওনা হয়। কিতবুগা নোয়ানের সাথে থাকা দেশদ্রোহী মুসলিম আমীররা তাকে পরামর্শ দিয়েছিল যে সে যেন অপেক্ষা করে হলাকু খান থেকে আরও সাহায্য চেয়ে নেয়, কিন্তু কিতবুগার নিজের বর্তমান শক্তি ও আধিক্য এবং নিজের ধূর্ততা ও অভিজ্ঞতার ওপর পূর্ণ আস্থা ছিল, তাই সে থামেনি। [৮] সম্ভবত আলেপ্পোতে অবস্থানরত হলাকু খানও এই খবর দেরিতে পেয়ে থাকবেন যে সীমান্তে উভয় পক্ষের বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেছে। যাই হোক, তাতারীরা নিশ্চিত ছিল যে বরাবরের মতো এবারও তারাই বিজয়ী হবে এবং মুসলমানরা ব্যর্থ হবে।

[১] যাইল মিরআতুয যামান লিল ইউনীনি: ১/৩৫১, ৩৫৮, ত. দারুল কিতাব আল-ইসলামি

[২] আস-সুলুক লি-মা’রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক লিল মাকরিযি: ১/৫১৫, ত. আল-ইলমিয়্যাহ

[৩] যাইল মিরআতুয যামান লিল ইউনীনি: ১/৩৬৫, ত. কায়রো

[৪] যাইল মিরআতুয যামান লিল ইউনীনি: ১/৩৬৫

[৫] আন-নুজুমুয যাহিরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহিরা: ৭/৭৮, ৭৯; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৭/৩০১, ত. দার হাজার

[৬] আস-সুলুক লি-মা’রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ১/৫১৩

[৭] জামিউত তাওয়ারিখ (আরবি): খণ্ড ২, অংশ ১: পৃ. ৩১৩

[৮] জামিউত তাওয়ারিখ (আরবি): খণ্ড ২, অংশ ১: পৃ. ৩১৩

ফিরিজিদের থেকে নিরাপদ পশ্চাৎভাগের নিশ্চয়তা:

এদিকে কুতুজের বাহিনী গাজায় পৌঁছে গিয়েছিল। কুতুজ তাতারীদের যুদ্ধকৌশল সম্পর্কে খুব ভালোভাবেই অবগত ছিলেন। পূর্ববর্তী অনেক যুদ্ধে তাদের পদ্ধতি ছিল এই যে, তারা একই সাথে দুই বা তিন দিক থেকে আক্রমণ করত। এই বিপদের কথা মাথায় রেখে কুতুজের যেকোনো মূল্যে একটি নিরাপদ পশ্চাৎভাগ প্রয়োজন ছিল। এই কৌশলের অংশ হিসেবে গাজা থেকে সামনে অগ্রসর হয়ে ইসলামী বাহিনী উত্তরের উপকূল ধরে আকার (Acre) দিকে যাত্রা করল যেখানে ফিরিজিরা দখলদার ছিল। আকার ফিরিজি আমিররা ইসলামী বাহিনীকে দেখে বাইরে বেরিয়ে এল এবং কুতুজের সাথে সাক্ষাৎ করে সামরিক সহযোগিতার প্রস্তাব দিল।

কুতুজ একজন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদের মতো ফিরিজি আমিরদের সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন করে তাদের খেলাত (সম্মানসূচক পোশাক) প্রদান করলেন, তবে তাদের সাহায্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। কিন্তু তাদের থেকে শপথ নিলেন যে তারা যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকবে। সেই সাথে সতর্ক করে দিয়ে কসম খেয়ে বললেন:

“যদি আমার বাহিনীকে ক্ষতি করার জন্য একজন ফিরিজিও পেছন থেকে আসে, তবে আমি তাতারীদের ছেড়ে আগে তোমাদের খবর নেব।” [১]

এটি ছিল অত্যন্ত উপযুক্ত রণকৌশল। কারণ যেখানে এটি সম্ভব ছিল যে ফিরিজিরা তাতারীদের ধ্বংসযজ্ঞের ভয়ে মুসলমানদের সাথে দিতে চাচ্ছিল, সেখানে এই সম্ভাবনাও ছিল যে সহযোগিতার প্রস্তাব দিয়ে তারা অসতর্ক অবস্থায় পেছন থেকে মুসলমানদের ক্ষতি করতে চায়। কুতুজের হুমকিতে ভীত হয়ে ফিরিজিরা নিরপেক্ষতার প্রতিশ্রুতি দিল এবং তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করল।

আইন জালুতের অভিমুখে:

কুতুজ যুদ্ধের জন্য নিজের পছন্দমতো ময়দান চেয়েছিলেন। তাই আকা থেকে অগ্রযাত্রার দিক পুনরায় পরিবর্তন করলেন এবং সিরিয়ার বড় শহর দামেস্ক বা আলেপ্পোর দিকে যাওয়ার পরিবর্তে অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অগ্রসর হলেন এবং তাবারিয়া হ্রদকে বাম পাশে রেখে আইন জালুতের দিকে যাত্রা করলেন। সেই সাথে অগ্রবর্তী দলের সেনাপতি রুকনউদ্দিন বাইবার্সকে বার্তা পাঠালেন যেন তিনি সামনে এগিয়ে গিয়ে তাতারীদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হন এবং তারপর পিছু হটতে হটতে আইন জালুতে চলে আসেন।

ওদিক থেকে কিতবুগার বাহিনীও এগিয়ে আসছিল। বাইবার্স কুতুজের নির্দেশনা অনুযায়ী একটি দলের সাথে শত্রুর অগ্রবর্তী বাহিনীর মোকাবিলা করলেন এবং কখনো আক্রমণাত্মক হামলা আবার কখনো পিছু হটার রণকৌশল অবলম্বন করে তাদের নিজের পেছনে লাগিয়ে রাখলেন। অবশেষে তাতারীরা তাড়া করতে করতে “আইন জালুত”-এর কাছাকাছি পৌঁছে গেল যেখানে ইসলামী বাহিনী তাদের তাবু গেড়েছিল। [২] বাইবার্স অবিলম্বে সংবাদবাহক পাঠিয়ে সুলতান কুতুজকে তাতারীদের শিবিরের অবস্থান এবং তাদের দুর্বল দিকগুলো সম্পর্কে অবহিত করলেন। [৩] ফলে ইসলামী বাহিনীর অগ্রবর্তী দল সঠিক পরিকল্পনার সাথে তাতারীদের অগ্রবর্তী দলের মোকাবিলায় বেরিয়ে এল এবং তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিল। [৪]

[১] আস-সুলুক লি-মা’রিফতি দুওয়ালিল মুলুক: ১ / ৫১৬, ত. আল-ইলমিয়্যাহ

[২] আস-সুলুক লি-মা’রিফতি দুওয়ালিল মুলুক: ১ / ৫১৬, ত. আল-ইলমিয়্যাহ

নোট: জালুত উত্তর ফিলিস্তিনের একটি ঝরনার নাম, যার কারণে এই স্থানটি আইন জালুত নামে পরিচিত। এই জায়গাটি জর্ডান নদীর পশ্চিম তীরে তাবারিয়া হ্রদের দক্ষিণে অবস্থিত এবং বর্তমানে এটি ইসরায়েলের অংশ। বাইসান, নাবলুস, জেনিন এবং নাসিরা এর চারপাশে অবস্থিত। বাইসান থেকে এটি দশ মাইল উত্তর দিকে।

[৩] আস-সুলুক লি-মা’রিফতি দুওয়ালিল মুলুক: ১ / ৫১৬, ত. আল-ইলমিয়্যাহ

[৪] আর-রওদুজ জাহির ফি সিরাতুল মালিকিজ জাহির, পৃ. ৬৩

কুতুযের উদ্দীপনাময় ভাষণ:

এখন উভয় পক্ষ চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য কাতারবন্দী হতে লাগল। যুদ্ধের আগে কুতুয সেনাবাহিনীর আমিরদের এক জায়গায় একত্রিত করলেন এবং তাদের সামনে একটি উদ্দীপনাময় ভাষণ দিয়ে তাদের রক্তকে উত্তপ্ত করে দিলেন। মুসলমানদের দুঃখজনক পরাজয়, তাতারীদের হাতে তাদের গণহত্যা এবং ইসলামী শহরগুলোর ধ্বংসের কথা উল্লেখ করার পর উপস্থিতদের জিহাদের দাওয়াত দিলেন এবং ফরিয়াদ করলেন যে তারা যেন ইসলাম ও মুসলমানদের সাহায্যের জন্য কোমর বেঁধে নেন, শামকে তাতারীদের কবল থেকে মুক্ত করতে এবং জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর জন্য জীবনের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত হন। কুতুয তাদের জিহাদের ফরজ ত্যাগ করার ব্যাপারে আল্লাহর আজাবের ভয় দেখিয়ে বললেন যে, যদি এখনও এই ফরজ আদায় করা না হয়, তবে নিশ্চিতভাবে আমাদের ঘরবাড়িরও একই পরিণতি হবে।

এই ভাষণের প্রতিটি শব্দ শ্রোতাদের হৃদয়ে গঁথে যাচ্ছিল। মজলিসে আবেগ ও কান্নাকাটির পরিবেশ বিরাজ করছিল। ফুঁপিয়ে কাঁদা এবং চোখের পানি এই বিশ্বাস দিচ্ছিল যে, উম্মত পূর্বের গাফলতির ক্ষতিপূরণ দিতে প্রস্তুত হয়ে গেছে। সমস্ত আমির শপথ নিলেন যে তারা তাতারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে এবং ইসলামী দেশগুলোর প্রতিরক্ষায় কোনো ত্রুটি রাখবেন না। [১]

আইন জালুতের যুদ্ধ:

২৫ রমজান ৬৫৮ হিজরি (৩ সেপ্টেম্বর ১২৬০ খ্রিস্টাব্দ) শুক্রবার সূর্যোদয়ের সময় উভয় বাহিনী মুখোমুখি হলো। তাতারীদের পঙ্গপাল সদৃশ বিশাল বাহিনীতে অনেক ভীত মুসলিম আমিরও তাদের সেনাবাহিনীসহ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাদের মধ্যে আল-মালিক আল-সাইদ (মালিক আল-আদিলের নাতি) এবং আশরাফ (হিমসের শাসক)-এর নাম তালিকার শীর্ষে রয়েছে। [২]

যুদ্ধের মুহূর্ত ঘনিয়ে এলে সাইফউদ্দিন কুতুয তার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের বললেন:

“খবরদার! যতক্ষণ না সূর্য ঢলে পড়ে, ছায়া দীর্ঘ হতে শুরু করে এবং বাতাসের ঝাপটা আসতে শুরু করে, ততক্ষণ যুদ্ধ শুরু করার চেষ্টা করো না। আমি চাই আমরা শত্রুর সাথে সেই সময় সংঘর্ষে লিপ্ত হই যখন মানুষ জুমার নামাজে মশগুল থাকবে এবং খতিব সাহেবগণ আমাদের জন্য দোয়া করতে থাকবেন।” [৩]

পূর্বের পরাজয়গুলো দেখে অনেক মুসলমানের হৃদয় কেঁপে উঠছিল, কিন্তু তারা শেষ বাজি খেলার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন। লশকরে ইসলামের সাহায্য ও সাহস জোগানোর জন্য ফিলিস্তিন ও মিশরের হাজার হাজার কৃষক স্বেচ্ছায় চলে এসেছিলেন, তাদের তাকবির ধ্বনিতে কানে তাল। লেগে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। সেই সাথে সুলতান এবং সালতানাতের আমিরদের পক্ষ থেকে তবল ও বিউগল অনবরত বাজানো হচ্ছিল। এই জোশ ও উদ্দীপনা তাতারীদেরও ভীত করে দিল এবং তারা আগের মতো খোলা ময়দানে এগিয়ে আসার পরিবর্তে নিজেদের পিঠের দিকে একটি পাহাড়ের আড়াল নিয়ে নিরাপদ অবস্থানে নতুন করে কাতারবন্দী হতে লাগল।

[১] আস-সুলুক লি-মা'রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ১/ ৫১৬, আল-ইলমিয়াহ

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: সন ৬৫৮ হিজরি

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ওফাত সন ৬৫৮ হিজরি

দ্রষ্টব্য: এই ইবারতটি “আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া”-এর দার হিজর সংস্করণে নেই, দারুল ফিকর, দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবি এবং মাকতাবায়ে হাক্কানিয়া পেশোয়ারের সংস্করণগুলোতে এই ইবারতটি বিদ্যমান এবং সেখান থেকেই নেওয়া হয়েছে।

সালাত আদায়ের পর যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল এবং উভয় বাহিনী অত্যন্ত তীব্রতার সাথে একে অপরের সাথে লিপ্ত হলো। যদিও সেই সময় সাইফুদ্দিন কুতুজের কোনো অস্থিরতা ছিল না, যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুসংবাদের ওপর তাঁর পূর্ণ আস্থা ছিল, তবুও সুলতান সাইফুদ্দিনের সাহস ও বীরত্ব ছিল তুঙ্গে। উভয় পক্ষই তাদের সমস্ত শক্তি যুদ্ধের অগ্নিকুণ্ডে ঢেলে দিচ্ছিল, যার ফলে মাটি রক্তে লাল হয়ে যাচ্ছিল এবং লাশের স্তুপ জমে যাচ্ছিল। তাতাররা তাদের গত অর্ধশতাব্দীর বিজয়ের অহংকারে অত্যন্ত আক্রোশ ও ক্রোধের সাথে আক্রমণ করছিল। তাদের সাথে নামধারী কিছু মুসলিম শাসকও ছিল যারা তাদের কাফের ও মুশরিক প্রভুদের সম্ভ্রুতি অর্জন এবং পার্থিব ধন-সম্পদ ও পদের লোভে নিজেদের মুসলিম ভাইদের রক্ত ঝরাতে প্রস্তুত ছিল। এই বাতিলপন্থীদের বিপরীতে মুহাজির তুর্কি সৈন্য এবং মিশরের জানবাজ মুজাহিদরা দীন হকের প্রতিরক্ষায় নিজেদের জীবন বাজি রেখে আগুনের এই প্লাবনের সামনে সিসা ঢালা প্রাচীরের মতো অটল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

এই সময় পর্যন্ত যুদ্ধে উভয় পক্ষের পাল্লা সমান ছিল যে, হঠাৎ কিতবুকা নোয়ান একটি যুদ্ধকৌশল অবলম্বন করে মুসলমানদের বাম পার্শ্বে অত্যন্ত তীব্রতার সাথে আক্রমণ করল, যার ফলে সেই দিকের মুজাহিদদের পা টলে গেল এবং তারা পিছু হটতে বাধ্য হলো। এই সময় তুর্কি ও মিশরীয় জেনারেলদের চেহারায় অস্থিরতা ও উদ্বেগের চিহ্ন স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল। তাতারদের প্রচণ্ড চাপে মিশরীয় বাহিনীর কাতারগুলো এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল এবং মনে হচ্ছিল যুদ্ধের মোড় পুরোপুরি তাতারদের পক্ষে ঘুরে গেছে। কিন্তু এই নাজুক সময়েও আল-মালিকুল মুজাফফর সাইফুদ্দিন কুতুজের কপালে দৃঢ়তা ও অবিচলতার আভা স্পষ্ট ছিল। এই বীর পুরুষ যখন শত্রুর আক্রমণাত্মক অগ্রগতি এবং নিজের সঙ্গীদের পিছু হটা দেখলেন, তখন আত্মমর্যাদাবোধে তিনি নিজের মাথা থেকে ইস্পাতের শিরস্ত্রাণ খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং গর্জনকারী সিংহের মতো নিজের বাহিনীর বিশেষ দলগুলো নিয়ে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। রুকনুদ্দিন বাইবার্সও এই সুযোগে অত্যন্ত বীরত্ব প্রদর্শন করলেন এবং তাতারদের ওপর একের পর এক আক্রমণ চালিয়ে তাদের মধ্যে হলস্থূল সৃষ্টি করে দিলেন। পিছু হটতে থাকা মিশরীয় সৈন্যরা যখন তাদের নেতাদের এই সাহস দেখল, তখন তাদের মধ্যেও বীরত্বের আগুন নতুন করে জ্বলে উঠল এবং তারা আবারও দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে গেল। [১]

সুলতান কুতুজের বীরত্ব:

সাইফুদ্দিন কুতুজ এগিয়ে গিয়ে ময়দানের সেই অংশে পা রাখলেন যেখানে হাতাহাতি যুদ্ধ চলছিল। সবাই একে অপরের সাথে লিপ্ত ছিল। এই সময় একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। সে ছিল এক তাতার বালক যাকে হালাকু খানের কুটনৈতিক প্রতিনিধিদলের সাথে আনা হয়েছিল এবং কুতুজ তাকে গোলাম বানিয়ে নিয়েছিলেন। এই সময় সে মুসলিম বাহিনীতে খাদেম হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে সুযোগ বুঝে ধনুক হাতে নিল এবং সুলতান কুতুজকে লক্ষ্য করে তীর ছুড়ল। সুলতান তৎক্ষণাৎ সতর্ক হয়ে ঘোড়া থেকে লাফ দিলেন এবং নিজেকে রক্ষা করলেন।

[১] আস-সুলুক লি-মা'রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ১/৫১৬; আন-নুজুমুজ জাহেরা: ৭/৮১; নিহায়াতুল আরাব লিন-নুওয়াইরি: ২৯/৪৭৩।

...নিয়েছিলেন, আল্লাহ সুলতানকে সুরক্ষিত রেখেছিলেন কিন্তু তীরের আঘাত এতটাই মারাত্মক ছিল যে ঘোড়াটি সেখানেই মারা গেল। সুলতান আশেপাশে নিজের কোনো সৈনিকের কাছে অতিরিক্ত ঘোড়া দেখতে পেলেন না, তাই নিজের সাহায্যের জন্য কাউকে ডাকা সমীচীন মনে করলেন না এবং পায়ে হেঁটেই লড়াই চালিয়ে গেলেন।

ইতিমধ্যে একজন আমিরের নজর সুলতানের ওপর পড়ল, তিনি নিজের ঘোড়াকে তাড়া দিয়ে সরাসরি এদিকে চলে এলেন। কাছে এসে তিনি ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন এবং ঘোড়াটি সুলতানের খিদমতে পেশ করে বললেন:

“আকা! আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিচ্ছি যে আপনি এর ওপর সওয়ার হোন।”

সুলতান সাইফ উদ্দিন কুতুজ শান্তভাবে বললেন: “এমনটা হতে পারে না, এই বিপদের সময় তোমাকে পদব্রজে করে আমি উন্মত্তে মুসলিমাহকে তোমার খিদমত থেকে বঞ্চিত করার ঝুঁকি নিতে পারি না।”

আমির জেদ করতে থাকলেন, কিন্তু কুতুজ নিজের নফসকে তার ওপর প্রাধান্য দেওয়া পছন্দ করলেন না। কিছুক্ষণ পর একটি দল অতিরিক্ত ঘোড়া নিয়ে সেখানে পৌঁছে গেল।

সুলতান কুতুজ কোনো দ্বিধা ছাড়াই তাদের মধ্য থেকে একটি ঘোড়া নিয়ে নিলেন।

সেই সময় একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা অভিযোগের সুরে সুলতানকে সম্বোধন করে বললেন:

“জনাব আলী! আপনি সেই আমিরের ঘোড়ায় কেন সওয়ার হননি? খোদা না করুন যদি শত্রু আপনাকে এই অবস্থায় পেয়ে যেত তবে আশঙ্কা ছিল যে আপনি শহীদ হয়ে যেতেন এবং আপনার পর ইসলামের এই শত্রুদের হাতে ইসলাম দুনিয়া থেকে মিটে যেত।”

সুলতান কুতুজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে উত্তর দিলেন: “না! যেখানে আমার কথা, আমি তো সেই মুহূর্তে মারা গিয়ে সরাসরি জান্নাতে যেতাম, আর রইল ইসলাম, তবে তার রব আল্লাহ বিদ্যমান আছেন যিনি একে মিটে যেতে দেবেন না। দেখো ক্রুসেডারদের সাথে যুদ্ধের ঠিক মাঝখানে আল-মালিক আস-সালিহ আইয়ুবের মৃত্যু হলো, তারপর আল-মালিক আল-মুয়াজ্জাম নিহত হলেন, ফখরুদ্দিন শেখ শহীদ হলেন, মুসলমানরা বিজয় থেকে হতাশ হয়ে পড়েছিল কিন্তু আল্লাহ এরপরও ইসলামের সাহায্য করেছেন। ইসলামের বড় বড় রক্ষকরা দুনিয়া থেকে চলে গেছেন এবং আল্লাহ তাআলা তাদের জায়গায় অন্যান্য ব্যক্তিদের ইসলামের হেফাজতের জন্য দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন এবং ইসলামকে মিটে যেতে দেননি।” [১]

বিসানে দ্বিতীয় যুদ্ধ:

এই সময়ে সুলতান কুতুজের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যুদ্ধের মানচিত্রের ওপর ছিল এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সময়োপযোগী নির্দেশনা দেওয়ার ধারা অব্যাহত ছিল। তারপর হঠাৎ যুদ্ধের ময়দানের চিত্র পাল্টে যেতে দেখা গেল। তাতারীদের পা উপড়ে গিয়েছিল এবং তারা দ্রুত পিছু হটছিল। সুলতান এটি দেখে বাহিনীকে পশ্চাদ্ধাবনের নির্দেশ দিলেন। আইন জালুত থেকে বিসান পর্যন্ত উভয় বাহিনী পলায়ন ও পশ্চাদ্ধাবনের অবস্থায় ছিল। বিসানে পৌঁছে তাতারীরা আবারও একবার ব্যূহ রচনা করল এবং নতুন উদ্যমে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করে দিল। [২]

মুসলমানরাও নিজেদের নতুন ব্যূহ চমৎকারভাবে তৈরি করে নিয়েছিল। কুতুজ বাহিনীর একটি সংক্ষিপ্ত অংশ নিজের কমান্ডে রেখেছিলেন যা শুরুতে তাতারীদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার কথা ছিল। অন্যদিকে অধিকাংশ বাহিনীকে পেছনের উপত্যকাগুলোতে এদিক-ওদিক লুকিয়ে রেখেছিলেন যাতে শত্রুকে পুরোপুরিভাবে

[১] আস-সুলুক লি-মা'রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ১/ ৫১৬, ৫১৭, কায়রো সংস্করণ; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৬৫৮ হিজরি।

[২] আস-সুলুক লি-মা'রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ১/ ৫১৭; আন-নুজুমুজ জাহেরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহিরা: ৭/ ৭৯ থেকে ৮১।

...ঘিরে ফেলে পিষে ফেলা যায়। [১]

যুদ্ধ শুরু হতেই তাতারীরা মুসলমানদের তীরের নিশানায় নিয়ে এল। মনে হচ্ছিল যেন তীরের বৃষ্টি হচ্ছে। কুতুজ কিছুক্ষণ লড়াই করার পর দ্রুত পিছু হটে গেলেন। তাতারীরা মুসলমানদের পরাজিত মনে করে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে তাদের পিছু ধাওয়া করল। এই সময়ে তারা অনেক মুসলমানকে শহীদও করে ফেলল। কিন্তু যেই তারা ওত পেতে থাকা মুজাহিদদের কবলে পড়ল, তাদের তীর চাপের সম্মুখীন হতে হলো।

ওয়া ইসলামাহ:

তাতারীদের কাছে এখন আর কোনো আশ্রয়স্থল ছিল না, অন্যদিকে মুসলমানদের কাছেও এটিই ছিল শেষ সুযোগ। এখানে যুদ্ধের ভয়াবহতা পূর্বের লড়াইয়ের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। কিছুক্ষণের জন্য রণক্ষেত্রের তীব্রতা সবাইকে ডানে-বামে থেকে উদাসীন করে দিল। তাতারীরা এখানে এমন পাগলের মতো লড়াই করল যে মুসলমানদের কাতারগুলো এলোমেলো হতে শুরু করল। উচ্চকণ্ঠ ও সাহসী কুতুজ যখন এটি দেখলেন, তখন তিনি একটি উঁচুতে উঠে এমন জোরালো হুঙ্কার দিলেন যে চারপাশের পাহাড়গুলো পর্যন্ত কেঁপে উঠল:

“ওয়া ইসলামাহ..... ইয়া আল্লাহ! আনসুর আবদাকা কুতুজু আলাত তাতার।”

এই হৃদয়বিদারক হুঙ্কার তিনি তিনবার এমন আত্মিক শক্তি ও অন্তরের আকুলতার সাথে দিলেন যে বহুদূর পর্যন্ত এই আওয়াজ পৌঁছে গেল এবং প্রত্যেকের শিরা-উপশিরায় বিদ্যুৎ খেলে গেল। মুসলমানরা পুনরায় সুসংগঠিত হয়ে চূড়ান্ত আক্রমণ করল এবং তাতারীদের কাছে মনে হলো যেন কোনো সামুদ্রিক তুফান তাদের গ্রাস করে নিয়েছে। তারা খড়কুটোর মতো সেই শ্রোতে ভেসে যেতে লাগল। সাইফউদ্দিন কুতুজ যখন এই দৃশ্য দেখলেন, তখন ঘোড়া থেকে নেমে মাটিতে মুখ ঘষে শুকরিয়ার সিজদা আদায় করলেন। এরপর দুই রাকাত শুকরানা নামাজ পড়লেন। আল্লাহর সাহায্য তাওহীদের সৈনিকদের কপালে চুমু খাচ্ছিল। তাতার বাহিনীর ওপর দুর্ভাগ্য ও বঞ্চনার মেঘ ছেয়ে গিয়েছিল এবং গোবি মরুভূমির ভয়াবহ অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসা অগ্নিঝড়ের ভাগ্যে চিরস্থায়ী পরাজয় লিখে দেওয়া হয়েছিল। [২]

ফাতহে মুবীন: [৩]

এখন তাতারীরা পালিয়ে যাচ্ছিল এবং মুসলমানরা সব দিক থেকে তাদের কচুকাটা করছিল। কিছু তাতারী একটি টিলার ওপর উঠে অবস্থান নিল কিন্তু ইসলামী বাহিনী তাদের চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলে খতম করে দিল। [৪] কিছু তাতারী অশ্বারোহী প্রাণ বাঁচানোর জন্য আখের ক্ষেতে লুকিয়ে পড়েছিল। কুতুজের নির্দেশে ক্ষেতগুলোতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হলো এবং সমস্ত আরোহী পুড়ে মারা গেল। [৫]

[১] জামিউত তাওয়ারীখ (আরবি): খণ্ড ২, প্রথম অংশ: পৃষ্ঠা ৩১৩, ৩১৪

[২] জামিউত তাওয়ারীখ (আরবি): খণ্ড ২, প্রথম অংশ: পৃষ্ঠা ৩১৩, ৩১৪

[৩] আস-সুলুক লি-মা'রিফতি দুওয়ালিল মুলুক: ১ / ৫১৭, ত তাবা আল-ইলমিয়াহ

[৪] আন-নুজুমুজ জাহিরাহ ফী মুলুকি মিসর ওয়াল কাহিরাহ: ৭ / ৯৭

[৫] জামিউত তাওয়ারীখ (আরবি) রশীদউদ্দিন ফজলুল্লাহ প্রণীত: খণ্ড ২, প্রথম অংশ: পৃষ্ঠা ৩১৪

নোট: আরবি ইতিহাস গ্রন্থগুলোতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, যুদ্ধ ২৫ রমজান সূর্য ঢলে পড়ার পর শুরু হয়েছিল। তবে এটি স্পষ্ট নয় যে যুদ্ধ সেই দিনই শেষ হয়েছিল নাকি পরের দিন। আপাতদৃষ্টিতে এটাই বোঝা যায় যে যুদ্ধ সন্ধ্যা নাগাদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে রশীদউদ্দিনের মতে যুদ্ধ ফজর (ফজর) থেকে দুপুর পর্যন্ত চলেছিল। (জামিউত তাওয়ারীখ আরবি, খণ্ড ২ প্রথম অংশ: পৃষ্ঠা ৩১৪) এখানে এমন সম্ভাবনাও আছে যে যুদ্ধের শেষ লড়াই যা বায়সানে লড়াই হয়েছিল এবং যাতে মুসলমানদের ওত পেতে থাকা বাহিনী শত্রুকে ঘিরে ফেলেছিল, তা এক রাতের বিরতির পর পরের দিন ফজরের পর শুরু হয়েছিল এবং দুপুর পর্যন্ত চলেছিল। এই হিসেবে যুদ্ধ প্রথম দিন জোহর থেকে মাগরিব এবং দ্বিতীয় দিন ফজর থেকে জোহর পর্যন্ত হবে। ওয়াল্লাহু আ'লামু বিস-সাওয়াব।

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

ইমাম সুয়ুতী (রহ.) এই যুদ্ধের ফলাফল বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

“তাতাররা লজ্জাজনক পরাজয় বরণ করে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়ায় মুসলমানরা বিজয় লাভ করে। তাতারদের হত্যা করা সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয় এবং তারা এমন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পালিয়ে যায় যে মানুষের সাহস বেড়ে যায়, তারা সহজেই তাদের বন্দী করত এবং হত্যা করত।” [১]

কিতবুগা নোয়ানের পরিণতি:

যুদ্ধের শেষে বন্দীদের সাইফউদ্দীন কুতুজের সামনে পেশ করা হয়। তাদের মধ্যে আল-মালিক আল-সাইদ বিন আব্দুল আজিজ বিন আল-মালিক আল-আদিলও ছিল, যে তাতারদের সমর্থক ছিল। কুতুজ ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে গাদ্দারির অপরাধে তার গর্দান উড়িয়ে দেন। “কিতবুগা নোয়ানের” কোনো হদিস পাওয়া যাচ্ছিল না এবং সুলতান কুতুজ এই ভেবে অস্থির ছিলেন যে সে হয়তো পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। এরই মধ্যে এক তাতার যুবককে বন্দী করে আনা হয় এবং জানানো হয় যে সে কিতবুগা নোয়ানের ছেলে। কুতুজ অধৈর্য হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন: “তোমার বাবা কি পালিয়ে গেছে?” যুবকটি উত্তর দিল: “সে পালিয়ে যাওয়ার মতো লোক নয়।”

একথা শুনে কুতুজ সৈন্যদের নির্দেশ দিলেন যেন নিহতদের লাশগুলো ভালোভাবে তল্লাশি করা হয়।

সৈন্যরা সেই বন্দী যুবককে সাথে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে গেল যেখানে লাশের স্তুপ পড়ে ছিল। তারা দীর্ঘক্ষণ একেকটি লাশ উল্টেপাল্টে দেখতে লাগল। হঠাৎ কয়েকজন নিহতের মাঝখান থেকে এক বৃদ্ধের লাশ বেরিয়ে এল, যা দেখে বন্দী যুবকটি চিৎকার করে উঠল এবং অঝোরে কাঁদতে লাগল। জানা গেল যে, এটাই ছিল “কিতবুগা নোয়ান”, যে তার অপকর্মসহ জাহান্নামে পৌঁছেছে। অধিকতর তদন্তে জানা গেল যে তাকে আমীর আকুশ আল-শামসী হত্যা করেছিলেন। সাইফউদ্দীন কুতুজ যখন “কিতবুগা নোয়ানের” মৃত্যুর খবর পেলেন, তখন তিনি সিজদায়ে শোকর আদায় করে বললেন: “এখন আমি শান্তিতে ঘুমাতে পারব।” [২]

[১] তারিখুল খুলাফা লিস-সুয়ুতী, পৃ. ৩৩৫, মিসর।

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: বছর ৬৫৪ হিজরি; আন-নুজুমুজ জাহিরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহিরা: ৭/৮০।

নোট: কিতবুগার পরিণতি সম্পর্কে রশীদউদ্দীনের বর্ণনা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তার মতে, কিতবুগা জীবিত বন্দী হয়েছিল। তাকে শিকল দিয়ে বেঁধে কুতুজের সামনে আনা হয় এবং কুতুজ তাকে তিরস্কার করার পর হত্যা করেন। রশীদউদ্দীন কুতুজ ও কিতবুগার মধ্যে দীর্ঘ কথোপকথন বর্ণনা করেছেন যা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। যার সারসংক্ষেপ হলো:

- কুতুজ: হে হতভাগা! তুই অনেক রক্তপাত করেছিস এবং মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও প্রতারণার মাধ্যমে বীর ও নেতাদের ফাঁদে ফেলেছিস।
- কিতবুগা: এই বিজয়ে গর্বিত হয়ো না। হালাকু যখনই আমার হত্যার খবর পাবে, তার রাগের সমুদ্র উথলে উঠবে এবং আজারবাইজান থেকে মিশর পর্যন্ত সমস্ত এলাকা মঙ্গোল ঘোড়ার খুরের নিচে পিষ্ট হবে। হালাকু খানের কাছে আমার মতো তিন লক্ষ অশ্বরোহী আছে। তাদের মধ্যে তুমি কেবল একজনই হবে।
- কুতুজ: তোমার অশ্বরোহীদের নিয়ে গর্ব করো না। তারা এই বিজয়গুলো ধূর্ততা ও প্রতারণার মাধ্যমে অর্জন করেছে, পুরুষত্ব ও বীরত্বের মাধ্যমে নয়।
- কিতবুগা: যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ আছে, আমি আমার প্রভুর গোলাম, তোমার মতো প্রতারক নই। যত দ্রুত সম্ভব আমাকে হত্যা করো যাতে আমাকে তোমার আস্থালন শুনতে না হয়।

এর পর তাকে হত্যা করা হয়। (জামেউত তাওয়ারিখ (আরবি), খণ্ড ২, অংশ ১, পৃ. ৩১৫ থেকে ৩১৭)

তবে আরব ঐতিহাসিকদের বর্ণনা বেশি স্পষ্ট। হতে পারে রশীদউদ্দীন যাকে কিতবুগার ছেলে বলে উল্লেখ করেছেন, সে সেই ব্যক্তি যার সংক্ষিপ্ত কথোপকথনের কথা কিছু আরব ঐতিহাসিকও উল্লেখ করেছেন।

কুতুযের এই কথাটি সঠিক প্রমাণিত হলো। কুদরতের হাত এই মুজাহিদকে যে মহান কাজের জন্য সৃষ্টি করেছিল তা পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। হুজুর সরওয়ারে কায়েনাত ﷺ-এর পক্ষ থেকে স্বপ্নে প্রাপ্ত সত্য সুসংবাদ অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। এখন ফিরে আসার সময় হয়ে গিয়েছিল। তবে তাকদিরের এই ফয়সালা দুনিয়ার কাছে গোপন ছিল। মানুষ তখন আনন্দ উদযাপন করছিল এবং বিজয়ী সুলতানকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য অধীর হয়ে ছিল। আল্লামা মাকরিজি (রহ.) মুসলিম বিশ্বে এই বিজয়ের আনন্দের অবস্থা এভাবে লিখেছেন:

“রবিবার ২৭ রমজানের রাতে বিজয়ের খবর দামেস্কে পৌঁছাল, তাতার সর্দার কিতবুগা নোয়ানের মাথা কায়রোতে পৌঁছাল। দামেস্ক থেকে জয়ন হাফিজি এবং তাতার নায়েবরা পালিয়ে গেল এবং তাদের অনুসারীরাও তাদের সাথে পালিয়ে গেল। পথে জমিদাররা তাদের পাকড়াও করল এবং তাদের লুটতরাজ করল। এভাবে দামেস্কের ওপর তাতারদের দখল সাত মাস দশ দিন পর্যন্ত ছিল। এই রবিবারের দিনই সুলতান কুতুয তাবারিয়ায় পৌঁছালেন এবং দামেস্কবাসীদের কাছে একটি পত্র পাঠালেন যাতে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল যে, আল্লাহ তাদের বিজয় দান করেছেন এবং তাতারদের পরাজিত করেছেন। এটিই ছিল প্রথম পত্র যা তাঁর পক্ষ থেকে দামেস্কে এসেছিল। যখন এই পত্রটি এল, তখন মানুষ অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করল এবং খ্রিস্টানদের ঘরবাড়ির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং যতটুকু সম্ভব তাদের ধ্বংস করল। তারা ইয়াকুবিয়া গির্জা এবং মারিয়াম গির্জা গুঁড়িয়ে দিয়ে অগ্নিসংযোগ করল এবং সেখানে কেবল ধ্বংসাবশেষ অবশিষ্ট রইল। মুসলমানরা অনেক খ্রিস্টানকে হত্যা করল এবং বাকি খ্রিস্টানরা লুকিয়ে পড়ল। এর কারণ ছিল এই যে, তাতারদের দখলের সময় খ্রিস্টানরা বারবার মুসলমানদের ওপর হামলার প্রস্তুতি নিয়েছিল, এমন সব মসজিদ এবং আজানের মিনার ধ্বংস করেছিল যা তাদের উপাসনালয়ের কাছে ছিল। তারা প্রকাশ্যে নাকুস বাজাত এবং ত্রুশ নিয়ে বাইরে ঘুরত, রাস্তায় মদ পান করত এবং (মুসলমানদের ওপর) তা ছিটিয়ে দিত। [১]”

রশিদ উদ্দিন ফজলুল্লাহর বর্ণনা হলো:

“মিশরীয়রা মঙ্গোলদের সিরিয়ার চারপাশ থেকে ইউফ্রেটিস নদীর ওপারে তাড়িয়ে দিল। তারপর তারা কিতবুগা নোয়ানের শিবির লুট করে নারী, শিশু এবং খাদেমদের বন্দি করল। তারা মঙ্গোল অফিসার এবং কর্মকর্তাদের হত্যা করল। তবে দামেস্কের মঙ্গোল অফিসাররা নিরাপদ ছিল কারণ তারা রাতেই পরাজয়ের খবর শুনে পালিয়ে গিয়েছিল। [২]”

আল্লামা শিহাবুদ্দিন আল-আদভি (রহ.) লিখেছেন:

“মিশরীয় বাহিনী সেই কাজ করে দেখিয়েছে যা সারা বিশ্বের বাদশাহরা করতে পারেননি, তাদের মধ্যে সুলতান জালাল উদ্দিন খাওয়ারিজম শাহও ছিলেন, আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত নাজিল করুন, যিনি অনেক সংগ্রাম করেছিলেন এমনকি শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন। এই মিশরীয় বাহিনী সুলতান জালাল উদ্দিনের বাহিনীর তুলনায় কিছুই ছিল না। কিন্তু আল্লাহ যাকে চান তাকে তাঁর সাহায্য দ্বারা ধন্য করেন। কতই না ক্ষুদ্র দল আল্লাহর নির্দেশে বড় দলের ওপর বিজয়ী হয়েছে। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। এই ঘটনা হুজুর আকরাম ﷺ-এর মোজেজাগুলোর মধ্যে একটি, যিনি বলেছিলেন: আমার উম্মতের মধ্য থেকে একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত...”

[১] আস-সুলুক লি-মা'রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ১/৫১৭, ত. আল-ইলমিয়াহ

[২] জামিউত তাওয়ারিখ (আরবি) লেখক রশিদ উদ্দিন ফজলুল্লাহ: খণ্ড ২, প্রথম অংশ: পৃষ্ঠা ৩১৬, ত. দার ইহ্যাউল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ মিশর

আপন শত্রুদের ওপর বিজয়ী হতে থাকবে। যারা তাদের ছেড়ে যাবে তারা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, যতক্ষণ না আল্লাহর নির্দেশ আসবে এবং তারা এই অবস্থাতেই থাকবে। [১]

সুলতান কুতুজের দামেস্কে প্রবেশ এবং ঐতিহাসিক সংবর্ধনা:

বুধবার ২৯ রমজান সুলতান কুতুজের বিজয়ী বাহিনী দামেস্কের বাইরে পৌঁছায় এবং ঈদুল ফিতর উদযাপনের পর ৩ শাওয়াল সুলতান দুর্গে পদার্পণ করেন। কদম কদম সাধারণ মানুষের বিশাল জনতা বিজয়ী সুলতানকে ঐতিহাসিক সংবর্ধনা জানায়। [২]

জনগণের আনন্দ ও উল্লাস বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লামা আল-আদভী (রহ.) বলেন:

“এই মহান বিজয়ে মুসলমানরা দ্বিগুণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। কারণ মানুষ তাতারীদের বিরুদ্ধে বিজয়ের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গিয়েছিল। কারণ তারা অধিকাংশ ইসলামী দেশ দখল করে নিয়েছিল, তারা যে অঞ্চলেই আক্রমণ করেছে তা জয় করে ছেড়েছে, যে বাহিনীরই মুখোমুখি হয়েছে তাকে পরাজিত করেছে। ফলে প্রজারা এই বিজয়ে এবং মালিক আল-মুজাফফর কুতুজের দামেস্কে (বিজয়ী হিসেবে) আগমনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিল।” [৩]

দামেস্কে অবিলম্বে করা কাজসমূহ:

সুলতান সেই দিনই দামেস্কের এমন অনেক কর্মকর্তাকে ফাঁসি দেন যারা মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাতারীদের পক্ষ নিয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন ছিল আইবেক হুসাইনি। দ্বিতীয়জন ছিল সিরিয়ার সাবেক শাসক আল-মালিক আন-নাসিরের তবলদার ইউসুফ, যে আল-মালিক আন-নাসিরকে তাতারীদের হাতে গ্রেপ্তার করিয়েছিল। [৪] মুহাম্মদ আল-কামিল শহীদের কাটা মাথা যা তাতারীরা দামেস্কে প্রদর্শন করেছিল, এখন পর্যন্ত বাব আল-ফারাদিসে ঝুলানো ছিল। কুতুজ তা দাফন করান। [৫]

সুলতান সিরিয়ার প্রশাসনিক বিষয়গুলো সংশোধন করেন এবং তাতারীদের হাতে ছড়িয়ে পড়া বিশৃঙ্খলা দূর করেন। জায়গায় জায়গায় নিজের নায়েব ও গভর্নর নিযুক্ত করেন। প্রজাদের সাথে এমন দয়া ও অনুগ্রহের আচরণ করেন যে সবাই তার ভক্ত হয়ে গেল। [৬]

কবিদের শ্রদ্ধাঞ্জলি:

সুলতান কুতুজের এই বিজয়ে বক্তারা আনন্দ প্রকাশ করেন এবং কবিরা কাসিদা পাঠ করেন। আল্লামা আবু শামা আল-মাকদিসি বলেন:

غَلَبَ التَّارُ عَلَى الْبِلَادِ جَاءَهُمْ مِنْ مِصْرَ تُرْكِيٌّ يَجُودُ بِنَفْسِهِ

“তাতারীরা সমস্ত শহর দখল করে নিয়েছিল, তখন মিসর থেকে এক তুর্কি যুবক এল যে নিজের জীবনের বাজি ধরেছিল।”

[১] মাসালিক আল-আবসার ফি মামালিক আল-আমসার (আহমদ বিন ইয়াহইয়া আল-আদভী, মৃত্যু ৭৪৯ হিজরি): ৩/১৮১, ত. আল-মুজাম্মা আল-সাকফি আবু ধাবি।

[২] আস-সুলুক লি-মা’রিফাত দুওয়াল আল-মুলুক: ১/৫১৫, ত. আল-ইলমিয়াহ; মাওয়ারিদ আল-লাতাফাহ: ২/৩২; আন-নুজুম আজ-জাহিরাহ: ৭/৮১, ত. দার আল-কুতুব মিসর।

[৩] মাসালিক আল-আবসার ফি মামালিক আল-আমসার: ৪/৩৮৫, ত. আল-মুজাম্মা আল-সাকফি আবু ধাবি।

[৪] মাসালিক আল-আবসার ফি মামালিক আল-আমসার: ৪/৩৮৫, ত. আল-মুজাম্মা আল-সাকফি আবু ধাবি।

[৫] সিয়র আলাম আন-নুবালা: ২৩/২০৩, ত. আর-রিসালাহ। আল্লামা কুতুবুদ্দিন আল-ইউনিনি বলেন যে এটি একটি আশ্চর্যজনক কাকতালীয় ঘটনা যে মুহাম্মদ আল-কামিল শহীদের মাথা বাব আল-ফারাদিসের সেই মসজিদে সেই কোণায় দাফন করা হয়েছে যেখানে হযরত হুসাইন (রা.)-এর মোবারক মাথা দাফন করা আছে। (যাইল মিরআত আজ-জামান: ১/৩৬০, ত. কায়রো)।

[৬] মাওয়ারিদ আল-লাতাফাহ: ২/৩২।

[৭] আন-নুজুম আজ-জাহিরাহ ফি মুলুক মিসর ওয়াল কাহেরা: ৭/৮১।

তারীখে উম্মতে মুসলিমা চতুর্থ খণ্ড

“তিনি সিরিয়ায় তাদের পদদলিত করেছেন এবং তাদের জনসমষ্টিকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছেন। প্রতিটি জিনিসের জন্য তার স্বজাতীয়ই বিপদ হয়ে থাকে।” [১]

একজন কবি বলেছেন:

“পুরো সিরিয়ায় কুফর ধ্বংস হয়ে গেছে এবং ইসলাম তার পতনের পর আবার নতুন রূপ পেয়েছে।”

“এই বিপ্লব মালিক আল-মুজাফফরের বদৌলতে তাঁর রুখে দাঁড়ানোর ফলে হয়েছে, যিনি অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং ইসলামের তলোয়ার।”

“তিনি এমন এক বাদশাহ যিনি আমাদের কাছে দৃঢ় সংকল্প ও বিচক্ষণতার সাথে এসেছেন, ফলে আমরা তাঁর তামাটে বর্ণের বল্লম এবং উজ্জ্বল তলোয়ারের কারণে সম্মানিত হয়েছি।”

“আল্লাহ আমাদের ওপর এই নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা সর্বদা ওয়াজিব করে দিয়েছেন, যেমনটি তাঁর ফরজ ইবাদতসমূহ আমাদের ওপর আবশ্যিক।” [২]

পশ্চিমা ঐতিহাসিকদের ষড়যন্ত্রসমূহ:

প্রাচ্যবিদরা আইন জালুতের বিজয়ের গুরুত্ব কমিয়ে দেখানোর জন্য ইতিহাসের পাতায় নিজেদের পক্ষ থেকে অনেক মনগড়া কথা ঢুকিয়ে দিয়েছেন। যেমন— হালাকু খান সেই দিনগুলোতে খাকান মঙ্গু খানের মৃত্যুর কারণে কারাকোরাম চলে গিয়েছিলেন এবং পেছনে তাতারী বাহিনী খুব কম ছিল, মুসলমানরা তাতারীদের তুলনায় চার গুণ বেশি ছিল ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব কথার বিন্দুমাত্র কোনো প্রমাণ নেই।

মঙ্গু খানের মৃত্যু ৬৫৫ হিজরিতে হয়েছিল, অথচ আইন জালুতের যুদ্ধ ৬৫৮ হিজরির নবম মাসে সংঘটিত হয়েছিল। যদি হালাকু খান মঙ্গু খানের মৃত্যুতে কারাকোরাম গিয়েও থাকেন, তবে নিশ্চিতভাবেই তিনি সেখানে তিন বছর অবস্থান করেননি, বরং তাঁর প্রত্যাবর্তন ঘটেছিল। আরব ঐতিহাসিক এবং মঙ্গোলদের ইতিহাস লেখকরা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, এই যুদ্ধের সময় হালাকু খান সিরিয়ায় ছিলেন।

প্রাচ্যবিদরা এই যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা এক লক্ষ বলে দাবি করেন, কিন্তু এর কোনো রেফারেন্স তারা দিতে পারেননি। প্রকৃতপক্ষে সেই যুগের কোনো উৎসেই এই যুদ্ধের উভয় পক্ষের সৈন্যসংখ্যা বর্ণিত হয়নি। যদি পূর্ববর্তী যুদ্ধগুলোতে উভয় পক্ষের অনুপাতের দিকে লক্ষ্য করা হয়, তবে এটা মানতেই হবে যে তাতারীরাই বেশি ছিল, কারণ শুরু থেকেই তাদের লক্ষ্যর অনেক বড় হয়ে আসছিল। তাছাড়া এই যুদ্ধে তাতারী বাহিনীর সাথে অনেক মুসলিম শাসকও তাদের সৈন্যবাহিনীসহ অন্তর্ভুক্ত ছিল। এটা সত্য যে কিছু তাতারী অফিসার...

[১] জাইল মিরআতুয যামান: ১/৩৬, কায়রো সংস্করণ উর্দুর প্রবাদ: “লোহা লোহাকে কাটে”। আল্লামা আবু শামা এই কবিতায় এই ভাবার্থই প্রকাশ করেছেন।

[২] জাইল মিরআতুয যামান: ১/৩৬, দারুল কিতাব আল-ইসলামী।

কেন্দ্র থেকে আরও সৈন্য পাঠাতে চেয়েছিলেন কিন্তু তাদের প্রধান কিতবুগা একে প্রয়োজন মনে করেননি। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে তাতারীরা সংখ্যায় অনেক ছিল এবং মুসলিমদের চেয়ে কোনোভাবেই কম ছিল না। যদি কম হতো তবে কিতবুগার জন্য কেন্দ্র থেকে সৈন্য আনানোতে কী অসুবিধা ছিল? এই বিষয়টি নিজেই স্পষ্ট করছে যে তাতারীদের প্রস্তুতি যথেষ্ট ছিল এবং এটাই কারণ যে দুটি ময়দানে তুমুল লড়াই হয়েছে যাতে মুসলিমরা এক-দুইবার পিছু হটেছিল।

কিছু সুসংবাদের বর্ণনা:

আইন জালুতে তাতারীদের পরাজয়ের পূর্বে মুসলিমরা অত্যন্ত ভগ্নহৃদয় ছিল এবং তারা তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখতে পাচ্ছিল। কিন্তু ঠিক সেই দিনগুলোতে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা-র পক্ষ থেকে ক্রমাগত সুসংবাদ প্রকাশ পাচ্ছিল। কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হলো:

- ১. শেখ কুতুবুদ্দিন আল-ইউনিনি (রহ.) শামসুদ্দিন ইবনুল জাযারি (রহ.)-এর পিতা

ইব্রাহিম আল-জাযারির এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন:

“আমি রমজান মাসে (৬৫৮ হিজরি) দ্বিতীয় জুমার নামাজ আদায় করে দামেস্কের জামে মসজিদ থেকে বের হলাম এবং ‘আল-খাযরা’র বাজারে পৌঁছলাম। দেখলাম যে সমস্ত দোকানে মদ রাখা আছে এবং খ্রিস্টানরা সেখানে মদ বিক্রি করছে। কিছু মুসলিমও তাদের সাথে ছিল এবং তারা সেখান দিয়ে অতিক্রমকারী মুসল্লিদের ওপর মদ ছিটাচ্ছিল। আমার পক্ষে এটি সহ্য করা সম্ভব হলো না এবং আমার চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হয়ে গাল ভিজিয়ে দিচ্ছিল। ইতিমধ্যে দামেস্কের একজন ভদ্রলোক হাজী আব্দুল আজিজ সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন; তিনিও সেই বাজার থেকেই আসছিলেন যেখান থেকে আমি এসেছিলাম এবং তার অবস্থাও আমার মতোই ছিল (অর্থাৎ আমাদের দুজনের ওপরই মদ ছিটানো হয়েছিল)। আমরা দুজনেই এক কোণে বসে রুমাল দিয়ে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলাম এবং ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকলাম। ইতিমধ্যে শেখ মুহাম্মদ খালিদি (রহ.) সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমাকে এই অবস্থায় দেখে তিনি বলতে লাগলেন: ‘আরে মিয়াঁ! কেন কাঁদছ? যে কারণে তুমি কাঁদছ, তা শীঘ্রই দূর হতে চলেছে। আমি তোমাকে মুহাম্মদ আত্তারের কাছে পাঠাচ্ছি, তিনি তোমাকে সুসংবাদ দেবেন। আমি এখানে দাঁড়াতে পারছি না।’ এই বলে তিনি আমাকে সেখানে রেখে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর শেখ মুহাম্মদ আত্তার আসলেন এবং বলতে লাগলেন: ‘আমি তোমাকে এবং সমস্ত মুসলিমকে সুসংবাদ দিচ্ছি যে, এই রমজান মাসের গত জুমায় আমি (স্বপ্ন বা কাশফে) দেখলাম যে সমস্ত আশ্বিয়ায়ে কেরাম এবং আউলিয়ায়ে ইযামের রুহ বাইতুল মাকদিসের সাখরা-র কাছে সমবেত হয়েছেন, যাদের মধ্যে হযরত ইব্রাহিম খলিল, হযরত মুসা এবং হযরত ঈসা (আ.) ছিলেন এবং আমাদের হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-ও সেখানে ছিলেন। তারা আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন যেন মুসলিমরা তাতারীদের এই ফিতনা থেকে মুক্তি পায়, কিন্তু এই দোয়া কবুল হলো না। তবে গত রাতে যা জুমার রাত ছিল (আমি স্বপ্ন বা কাশফে দেখলাম), এই মহান ব্যক্তিবর্গ পুনরায় সমবেত হলেন এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, আল্লাহ তা কবুল করে নিলেন। সুতরাং এই রমজান মাস অতিবাহিত হওয়ার আগেই তাতারীরা পরাজিত হবে। তুমি এবং দামেস্কের মুসলিমরা মুসলিম বাদশাহর সাথে ঈদের নামাজ আদায় করবে।’ আমার পিতা বলেন যে, শেখ মুহাম্মদ আত্তার যেমনটি বলেছিলেন ঠিক তেমনই হয়েছিল।” [১]

[১] যাইল মিরআতুয যামান লিল ইউনিনি: ১/ ৩৬৪-৩৬৫, ত. দারুল কিতাব আল ইসলামি।

সিরিয়ার মহান আলেম আল্লামা কামালুদ্দিন ইবনুল আদিম (রহ.) হালাকু খান কর্তৃক সিরিয়া দখলের সময়কাল নিজের চোখে দেখেছিলেন। হালাকু খান তাকে কাজীর পদও প্রস্তাব করেছিলেন, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে ৬৫৭ হিজরিতে কায়রোতে চলে আসেন এবং সেখানেই ইন্তেকাল করেন। [১] তিনি তাতারীদের বিরুদ্ধে জিহাদের বিষয়ে সিরিয়া ও মিশরের মধ্যে দূত হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি সেই সময়ে দেখা একটি স্বপ্ন এভাবে বর্ণনা করেন:

“মক্কা মুকাররমায় অবস্থানরত ইয়েমেনের একজন আল্লাহর ওলি বলেন: ‘আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করার জন্য মসজিদে হারামে রয়েছি, কিন্তু সেখানে বাইতুল্লাহ দেখতে পাচ্ছি না। আমি (দুঃখিত হয়ে) বলতে লাগলাম: ‘ইসলাম মিটে গেল। দ্বীন চলে গেল।’ আমাকে বলা হলো: ‘চুপ করো! তুমি এমন কেন বলছো?’ আমি বললাম: ‘কোথায় গেল সেই বাইতুল্লাহ যা মুসলমানরা তাওয়াফ করত?’ উত্তর এলো: ‘সেটি এখনই আসছে।’ আমি বললাম: ‘এটি কে নিয়ে আসছে?’ উত্তর এলো: ‘মিশরের মানুষ।’ তারপর দেখতে দেখতে বাইতুল্লাহ তার জায়গায় চলে এলো কিন্তু তার ওপর গিলাফ ছিল না। আমি বললাম: ‘এর গিলাফ কোথায়?’ উত্তর এলো: ‘তা এখনই আসতেছে।’ এই প্রশ্নোত্তর চলাকালেই বাইতুল্লাহকে গিলাফ পরিয়ে দেওয়া হলো যার রঙ ছিল সাদা।” [২]

আল্লামা ইবনুল আদিম (রহ.) এই প্রসঙ্গে আরেকজন আল্লাহর ওলির সুসংবাদ এভাবে বর্ণনা করেন:

“আমাকে আবুল আব্বাস হাওরানি বলেছেন যে, একজন নেককার ব্যক্তি তাকে জানিয়েছেন যে তিনি স্বপ্নে দেখেছেন আসমানের দুটি দরজা খুলে গেছে: একটি দরজা দিয়ে অশ্বারোহী ফেরেশতারা অবতীর্ণ হচ্ছেন। তারপর আমি কাউকে বলতে শুনলাম: ‘এই ফেরেশতারা ইসলামের সাহায্যের জন্য আসমান থেকে অবতীর্ণ হয়েছেন।’ দ্বিতীয় দরজা সম্পর্কে বলা হলো: ‘এটি রহমতের দরজা যা অনেক বছর ধরে বন্ধ ছিল। এখন এটি খুলে দেওয়া হয়েছে যাতে মানুষের ওপর রহমত নাজিল হয়।’” [৩]

ইউরোপের ওপর মুসলমানদের এহসান:

আইন জালুতে মুসলমানদের অর্জিত মহান বিজয় এটি প্রমাণ করে দিয়েছে যে, মুসলিম জাতি এখনও জীবিত এবং তারা এখনও শুধু নিজেদেরই রক্ষা করতে পারে না বরং বাকি বিশ্বকেও ধ্বংস ও বিপর্যয় থেকে বাঁচাতে পারে। বাস্তবতা হলো, আইন জালুতের বিজয়ের আগে তাতারীরা পূর্ব ইউরোপে প্রবেশ করেছিল এবং ইউরোপের সমস্ত দরবারে তাদের আতঙ্ক বিরাজ করছিল। হ্যারল্ড ল্যান্স লিখেছেন:

“যে তুফান বিশ বছর আগে ইউরোপকে স্পর্শ করে চলে গিয়েছিল, তা এখন পূর্ব ইউরোপে আঘাত হেনেছিল। এই তুফান রাশিয়ার বিশাল...”

[১] মুকাদ্দিমা বুগইয়াতুত তালাব ফি তারিখি হালাব লি ইবনিল আদিম: ১/ ১২, ত ত দারুল ফিকর

[২] বুগইয়াতুত তালাব ফি তারিখি হালাব লি ইবনিল আদিম: ২/ ১০২০

[৩] বুগইয়াতুত তালাব ফি তারিখি হালাব লি ইবনিল আদিম: ২/ ১০২১

অংশ চতুর্থ

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

সমভূমি এবং পোল্যান্ডের শস্যক্ষেত ও খামারগুলো তখনছ করতে করতে কাপেথিয়ান পর্বতমালা অতিক্রম করে সাইলেসিয়ায় প্রবেশ করেছিল। তার পেছনে ছিল ধোঁয়ার কালো মেঘ এবং আগুনের শিখা। এই তুফান ঝাঁকে ঝাঁকে মঙ্গোলদের রূপে আবির্ভূত হয়েছিল...

মানুষ বলতে লাগল: দুনিয়ার শেষ ফসল কাটার জন্য দাজ্জালের বাহিনী চলে এসেছে। [১]

সে আরও লেখে:

“তাতারিরা পূর্ব ইউরোপে ঢুকে পড়তে থাকল। ডিউক অফ বাভারিয়া এবং মেটাক নাইটরা পরাজিত হলো। হাঙ্গেরির বাহিনীকে পিছু হটতে হলো এবং সেখানকার রণাঙ্গনের বীর পল্ল ডি অবিন সমস্ত টেম্পলারসহ নিহত হলো। ১২৪১ খ্রিস্টাব্দে মঙ্গোলরা নিউস্টাড পর্যন্ত পৌঁছে গেল... জার্মানির রাজা ফ্রেডরিকের কাছে তাতারিদের চরমপত্র পৌঁছাল যে, অবিলম্বে নিজের প্রজাসমূহসহ মঙ্গোলিয়ায় পৌঁছে মহান খানের দাসত্ব গ্রহণ করো এবং সেখানে যে সেবাই পাওয়া যায় তাকে নিজের জন্য সম্মানের কারণ মনে করো।”

ফ্রেডরিক জবাবে এটি লিখতে বাধ্য হলো: “আমি শিকারি পাখি সম্পর্কে খুব ভালো জানি এবং মহান খানের দরবারে বাজপাখি বহনকারীর পদটি আমার জন্য উপযুক্ত হবে।” [২]

তারপর সে ইউরোপীয় রাজাদের ভয়ের চিত্র তুলে ধরে লেখে:

“ফ্রেডরিক রাজা হেনরিকে তার পত্রে লিখেছিলেন: ‘খোদা খ্রিস্টান জগতের পাপের শাস্তি হিসেবে এই তাতারিদের পাঠিয়েছেন।’” [৩]

বিখ্যাত পশ্চিমা ঐতিহাসিক গিবনের বর্ণনা হলো:

“সুইডেনের বাসিন্দারা রাশিয়ার মাধ্যমে তাতারি তুফানের খবর শুনেছিল, তাদের ওপর এতটাই আতঙ্ক ছেয়ে গিয়েছিল যে তারা তাদের ভয়ে নিজেদের নিয়ম অনুযায়ী ইংল্যান্ডের উপকূলে শিকার করতে বের হয়নি।” [৪]

ইউরোপীয় গবেষক জে. জে. স্যাভার্স বলেন:

“এই অত্যন্ত ভয়াবহ বিপদও ইউরোপের জাতিগুলোকে প্রস্তুত করতে পারেনি যে তারা এই কঠিন শত্রুকে দমনের জন্য ঐক্যবদ্ধ হবে।”

“যদি মঙ্গোলদের আক্রমণ না থামত, তবে রোমের খ্রিস্টান জগতের অবস্থা চীন ও ইরানের চেয়ে ভিন্ন হতো না এবং সেখানে জীবন বিলুপ্ত হয়ে যেত। জ্ঞান ও শিল্পের যে বিপ্লব এরপর সেখানে সংঘটিত হয়েছিল, তা অসম্ভব হয়ে পড়ত।” [৫]

সংক্ষেপে, অনেক পশ্চিমা ঐতিহাসিক খোলাখুলিভাবে মুসলমানদের এই উপকারের কথা স্বীকার করেছেন। সুতরাং এই অবস্থায় যখন ইউরোপ এই পশুদের সামনে আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছিল, তখন মজলুম মানবতার প্রতিশোধ নিতে ইসলামের তলোয়ার কোষমুক্ত হলো এবং আইন জালুতের ময়দানে তা তাতারিদের তুফানকে পিছু হটতে বাধ্য করল।

[১] The Crusades by Harold Lamb: p: 271, Badford London, 1931

[২] The Crusades by Harold Lamb: p: 272

[৩] The Crusades by Harold Lamb: p: 271, 272

[৪] তারিখ দাওয়াত ও আজিমত: ১/ ৩১৭, বরাতে: তারিখ ইনহিতাত ও সুকুত-এ-রোমা আজ গিবন

[৫] তারিখ ফুতুহাত-এ-মঙ্গোল, ফারসি অনুবাদ: আবুল কাসেম হালত, পৃ. ৯০, ৯১, ত. মুয়াসসাসা ইনতিশারাত তেহরান

আইন জালুতের পর

আইন জালুতের যুদ্ধের পর সেই যুগের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হঠাৎ দৃশ্যপট থেকে এমনভাবে অদৃশ্য হয়ে গেলেন যেন খোদায়ী ফয়সালায় তাদের ভূমিকা এখানেই শেষ ছিল।

আল-মালিক আন-নাসিরের শাহাদাত:

আইন জালুতে পরাজয়ের পর হালাকু খান তার হেফাজতে থাকা সিরিয়ার প্রাক্তন বাদশাহ আল-মালিক আন-নাসির আইয়ুবিকে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে হত্যা করিয়ে দেয়। একটি বর্ণনা অনুযায়ী, হালাকু নিজে তাকে তীর মেরে শহীদ করে। দ্বিতীয় বর্ণনা অনুযায়ী, সে চারটি গাছের উপরের ডালগুলোকে টেনে এমনভাবে বাঁধিয়ে দেয় যে চারটির মাথা উপরে একে অপরের সাথে মিলে যায়। মাঝখানে আল-মালিক আন-নাসিরকে শোয়ানো হয়, এরপর প্রতিটি গাছ থেকে একটি করে দড়ি বেঁধে আল-মালিক আন-নাসিরের হাত ও পায়ে পরিয়ে দেওয়া হয়। এরপর গাছগুলোকে একত্রিত করে রাখা দড়িটি কেটে দেওয়া হয়। গাছগুলো এক ঝটকায় তাদের পূর্বের অবস্থানে ফিরে আসে এবং সেই সাথে আল-মালিক আন-নাসিরের হাত ও পা আলাদা হয়ে যায়। দেহটি মাঝখানে ছটফট করতে করতে নিশ্বেজ হয়ে যায়। এই বেদনাদায়ক ঘটনা ২৫ শাওয়াল ৬৫৮ হিজরির বলে জানানো হয়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আইয়ুবি বংশের এই শেষ বাদশাহর বয়স ছিল ৩১ বছর। [১] তিনি তলোয়ারের অধিকারী (যোদ্ধা) ছিলেন না কিন্তু নিজের যুগের অন্যতম সেরা কবি ছিলেন। [২]

সুলতান কুতুজের শাহাদাত:

বিজয়ী সুলতান সাইফউদ্দিন কুতুজকে কয়েক সপ্তাহ পর মিশরে ফেরার পথে শহীদ করে দেওয়া হয়। কুতুজের হত্যাকারী কে ছিল? এটি ইতিহাসের বিস্ময়কর বিষয়গুলোর একটি। তিনি ছিলেন সেনাবাহিনীর সেনাপতি রুকনউদ্দিন বাইবার্স। এই অনভিপ্রেত আচরণের কারণ ছিল পদ ও মর্যাদা নিয়ে পুরনো দ্বন্দ্ব। কিছু আধুনিক ইতিহাসবিদ এখানে এই মনগড়া কথাটিও অন্তর্ভুক্ত করেছেন যে, কুতুজ বাইবার্সকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিলেন যা সফল হয়নি। এর ওপর বাইবার্স প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কিন্তু এর কোথাও কোনো প্রমাণ নেই। তবে ইতিহাসবিদরা এ বিষয়ে একমত যে উভয়ের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল।

আসলে এই হত্যার পেছনে পুরনো কারণ ছিল। মূলত মামলুকরা দুটি দলে বিভক্ত ছিল: বড় দল ছিল বাহরি মামলুক, যাতে বড় বড় যুদ্ধাভিজ্ঞ মামলুক আমিররা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং বাইবার্স ছিলেন তাদের নেতা। দ্বিতীয় দলটি ছিল মুইজ্জি মামলুক, যার প্রধান ছিলেন আল-মালিক আল-মুইজ্জি তুর্কমানি, যিনি মামলুক সালতানাতে ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। যেহেতু তিনি বাহরি মামলুকদের ভয় পেতেন, তাই তিনি তাদের মর্যাদা কমিয়ে নিজের মামলুকদের সামনে নিয়ে আসার চেষ্টা করতেন। বাইবার্সসহ বাহরি মামলুকদের অনেক অফিসার আল-মালিক আল-মুইজ্জি তুর্কমানির সময়েই মিশর ছেড়ে সিরিয়ায় চলে গিয়েছিলেন। যার ফলে মুইজ্জি মামলুকদের শক্তি আরও বৃদ্ধি পায়। যাদের মধ্যে সাইফউদ্দিন কুতুজ ছিলেন সবচেয়ে বিশিষ্ট, যাকে ইতিহাসবিদরা “আল-মালিক আল-মুইজ্জির বিশেষ মামলুক” বলে অভিহিত করেছেন।

[১] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২৩/২০৩ থেকে ২০৫; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: সন ৬৫৮ হিজরি।

[২] তার কবিতার নমুনা “যাইল মিরআতুয যামান”-এ দেখা যেতে পারে।

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

তারা করে। আল-মালিক আল-মুইয এবং শাজারাতুদ দুর-এর হত্যার পর মামলুক মুইযিয়ার আধিপত্য সাইফউদ্দিন কুতুযের সিংহাসন আরোহণের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। যদিও সাইফউদ্দিন কুতুয মামলুক বাহরিয়্যার প্রতিটি সম্ভাব্য মনতুষ্টির চেষ্টা করেছিলেন এবং তাদের নেতা বাইবার্সকেও সিরিয়া থেকে ডেকে এনে উচ্চ পদে আসীন করেছিলেন। বাহরিয়্যা মামলুকরা খুশি ছিল না এবং নিজেদেরকে শাসনের অধিক হকদার মনে করত, কারণ কয়েক বছর আগে সপ্তম ক্রুসেডে তারাই ফিরিঙ্গিদের গতিপথ পরিবর্তন করেছিল। তুরান শাহকে হত্যার পর শাজারাতুদ দুরকে সিংহাসনে বসানোর পর তারা নিজেদেরকে ‘বাদশাহ নির্মাতা’ মনে করতে শুরু করেছিল। সাইফউদ্দিন কুতুযকে তারা নিজেদের উচ্চতর মর্যাদার পথে বাধা হিসেবে দেখত। তবে যেহেতু সেই সময় তাতারীদের পক্ষ থেকে জিহাদের এক নাজুক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তাই সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই তুফানের মোকাবিলা করেছিল। কিন্তু এই সমস্যা থেকে অবসর হতেই পুরনো রেষারেষি আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। কিছু তিক্ততা এই রেষারেষিকে গভীর শত্রুতায় পরিণত করেছিল, যার মধ্যে একটি বিষয় ছিল এই যে, কুতুয বাইবার্সের সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে তাতারীদের বিরুদ্ধে বিজয়ের পর তাকে হালাব-এর শাসনভার দেওয়া হবে। কিন্তু এই ওয়াদা পূরণ হয়নি এবং হালাবের ওপর মোসেলের প্রাক্তন শাসক আলাউদ্দিনের ছেলেকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। [১]

এতে বাইবার্স এবং তার সাথী আমিররা ক্ষুব্ধ হয়ে যান। ফেরার পথে লশকর-এ-সালিহিয়ার কাছে কুতুয শিকারের জন্য বনের দিকে রওনা হন। বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত আমিররা সুযোগ বুঝে পিছু নেন। শিকারের এই প্রত্যাবর্তনে এই আমিররাও সাথে ছিলেন। এই সময়ে বাইবার্স কুতুযের কাছে একজন তাতারী দাসী চাইলেন। কুতুয সম্মতি দিলেন। এতে বাইবার্স সুলতানের হাতে চুম্বন করতে চাইলেন। সুলতান হাত বাড়িয়ে দিলে বাইবার্স তাকে জাপটে ধরলেন। এটি ছিল সংকেত যে এখন সুলতানের ওপর আক্রমণ করতে হবে। ফলে বাকি আমিররা তলোয়ার ও তীর দিয়ে এই বীর মুজাহিদকে সেখানেই শেষ করে দিলেন। [২]

এই দুঃখজনক ঘটনা ১৬ ফিলকদ ৬৫৮ হিজরিতে ঘটে। ইন্ন লিল্লাহি ওয়া ইননা ইলাইহি রাজিউন। [৩]

সাইফউদ্দিন কুতুয ইসলামি আলেমদের দৃষ্টিতে:

মিশরের সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম আল্লামা ইযযুদ্দিন বিন আব্দুস সালাম (রহ.) তার মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকাহত হন। তিনি বলতেন:

“আল্লাহ তার যৌবনের ওপর রহমত নাযিল করুন। তিনি যদি দীর্ঘকাল বেঁচে থাকতেন তবে ইসলামের যৌবন ফিরিয়ে দিতেন।”

তিনি আরও বলতেন:

“উমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.)-এর পর মুসলমানদের শাসনকর্তাদের মধ্যে কল্যাণ ও ইনসাফের দিক থেকে কুতুযের সমকক্ষ কেউ ছিল না।” [৪]

শেখ কুতুবুদ্দিন ইউনিনি (রহ.) বলেন:

“তিনি কৃপণও ছিলেন না আবার অপব্যয়ীও ছিলেন না। বরং পরিমিতিবোধ পছন্দ করতেন। আলাউদ্দিন খাওয়ারিজম শাহের পর তিনি ছিলেন প্রথম শাসক যিনি...” [৫]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৭ / ৩১২; তারিখুল ইসলাম লিয-যাহাবি, ওফাত: ৬৫৮ হিজরি।

[২] আন-নুজুমুয যাহিরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহিরা: ৭ / ৮১ থেকে ৮৩, দারুল কুতুব মিসর।

[৩] তারিখুল ইসলাম লিয-যাহাবি: ৪৮ / ৩৫৫, ত: তাদমুরি।

[৪] কিসসাতুত তাতার মিনাল বিদায়া ইলা আইন জালুত, ডক্টর রাগিব আল-সারজানি, পৃষ্ঠা ৪৬৭, ত: মুয়াসসাসাতু ইকরা, কায়রো, সন: ১৪২৭ হিজরি।

তাতারীদের সাথে লড়াই করার সাহস দেখিয়েছেন এবং তাদেরকে এমন শোচনীয় পরাজয় বরণ করিয়েছেন যে ইসলামের ক্ষত পূরণ হয়ে গেছে। [১]

কুতুযের হত্যার পনের বছর পর জন্ম নেওয়া হাফিজ যাহাবী (রহ.) বলেন:

“তিনি ছিলেন একজন সাহসী, বীর এবং সম্মুখপানে অগ্রসর হয়ে আক্রমণকারী ব্যক্তি। তিনি ছিলেন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ। দ্বীন, ইসলাম এবং কল্যাণের কাজই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তাতারীদের বিরুদ্ধে জিহাদে তাঁর কীর্তিসমূহ অত্যন্ত উজ্জ্বল। আল্লাহ তাঁর যৌবনের বিনিময়ে তাঁকে জান্নাত দান করুন।” [২]

অন্য এক স্থানে তিনি লিখেছেন:

“তিনি ছিলেন লালচে গায়ের রঙ এবং ঘন দাড়িবিশিষ্ট একজন সুদর্শন যুবক, তখনও তিনি বাদশাহীর এক বছরও পূর্ণ করেননি। আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত নাযিল করুন।” [৩]

আল্লামা তাজউদ্দীন সুবকী (রহ.), ইমাম সদরুদ্দীন ইবনে মারহাল (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন:

“কুতুয ছাড়া মিশর সালতানাতের সকল বাদশাহ শাফেয়ী ছিলেন। কুতুয ছিলেন হানাফী মাযহাবের অনুসারী।” [৪]

আল্লামা ইউসুফ বিন তাগরি বারদি (রহ.) লিখেছেন:

“মুসলমানদের কাছে কুতুযের হত্যাকাণ্ড অত্যন্ত বেদনাদায়ক মনে হয়েছিল। কারণ তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ তুর্কি শাসক। তাতারীদের গতিপথ ঘুরিয়ে দিতে, তাদের নির্মূল করতে এবং মুসলিম বিশ্বকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করতে তাঁর অনেক বড় ভূমিকা ছিল। আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত করুন।” [৫]

হাফিজ ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন:

“তিনি ছিলেন একজন নেককার ব্যক্তি। অধিকাংশ সময় জামাতের সাথে সালাত আদায় করতেন। মদ এবং এই জাতীয় জিনিসের ব্যবহার করতেন না যেগুলোতে (তৎকালীন সময়ের) বাদশাহরা অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁর মনিবপুত্র মালিকুল মানসুর আলী বিন মুইয তুর্কমানীকে ক্ষমতাচ্যুত করা থেকে শুরু করে যিলকদ মাসের শেষ পর্যন্ত তাঁর শাসনের মেয়াদ ছিল প্রায় এক বছর। আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত নাযিল করুন এবং ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষ থেকে তাঁকে সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুন।” [৬]

তিনি আরও লিখেছেন:

“তিনি ছিলেন সাহসী, যোদ্ধা, প্রচুর পরিমাণে কল্যাণের কাজ সম্পাদনকারী এবং ইসলাম ও মুসলমানদের হিতাকাঙ্ক্ষী। মানুষ তাঁকে ভালোবাসত।” [৭]

[১] যাইল মিরআতুয যামান: ১/৩৮০, কায়রো সংস্করণ। এই ইবারতে “আলাউদ্দিন খাওয়ারিজম শাহ” শব্দটি অনুলিপিকারের ভুল বা লেখকের ভুল। এখানে জালালুদ্দিন খাওয়ারিজম শাহ হওয়া উচিত। কারণ আলাউদ্দিন খাওয়ারিজম শাহ তাতারীদের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছিলেন, পক্ষান্তরে সুলতান জালালুদ্দিন খাওয়ারিজম শাহ তাদেরকে কয়েকবার পিছু হটতে বাধ্য করেছিলেন।

[২] তারিখুল ইসলাম লিয যাহাবী: ৩৮/৩৫৫, তদমুরী সংস্করণ।

[৩] সিয়াকু আলামিন নুবালা: ২৩/২০১, আর-রিসালাহ সংস্করণ।

[৪] তাবাকাতুশ শাফেয়িয়াহ আল-কুবরা: ৮/৩২০... কুতুযের বংশপরিচয় সম্পর্কে ইতিহাসবিদগণ একমত নন। একটি মত হলো তিনি অজ্ঞাত বংশের ছিলেন, একারণে হাফিজ যাহাবী এবং হাফিজ ইবনে কাসীরসহ অনেক ঐতিহাসিক তাঁকে “কুতুয বিন আব্দুল্লাহ” বলে উল্লেখ করেছেন। তবে দ্বিতীয় মতটি, যাকে কুতুযের নিজের বক্তব্যও সমর্থন করে, তা হলো তিনি খাওয়ারিজম পরিবারের একজন শাহজাদা ছিলেন। লেখকের মতে তাঁর হানাফী হওয়াও এই মতটিকে প্রাধান্য দেওয়ার একটি কারণ, কারণ সিরিয়া ও মিশরে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ শাফেয়ী ছিল, এখানকার সকল সুলতান শাফেয়ী ছিলেন এবং কুতুয ছিলেন একমাত্র হানাফী সুলতান। সম্ভবত এর কারণ এটাই ছিল যে তিনি খাওয়ারিজম শাহী বংশের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন যারা বংশপরম্পরায় হানাফী ছিলেন।

[৫] মাওরিদুল লাতাফাহ ফীমান ওয়ালিয়াস সালতানাহ ওয়াল খিলাফাহ: ২/৩২।

[৬] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: বছর ৬৫৮ হিজরি।

...ছিলেন এবং তাঁর জন্য অনেক দোয়া করতেন। [১]

কবর মুছে ফেলা হয়েছে, নাম জীবিত রয়েছে:

সাইফউদ্দিন কুতুজকে হত্যার পর তাঁর লাশ দাফন করা হয়নি। লাশটি বেওয়ারিশ অবস্থায় পড়ে ছিল। অবশেষে কিছু দয়াবান ব্যক্তি এসে তাঁকে ঘরাবি ও সালিহিয়ার মধ্যবর্তী ‘কাসির’ নামক স্থানে দাফন করেন। মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে এই হিতৈষীর কবরে আসত এবং রহমত ও মাগফিরাতের দোয়া করত। শেখ কুতুবউদ্দিন ইউনিনি ৬৫৯ হিজরিতে তাঁর কবর জিয়ারত করেছিলেন। মানুষ এই মুজাহিদের জন্য অনেক দোয়া করত এবং তাঁর হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করত। নতুন শাসক বাইবার্স যখন এই অবস্থা দেখলেন, তখন তিনি কবর থেকে লাশ তুলে কোনো এক অজ্ঞাত স্থানে দাফন করে দিলেন, যার কোনো নাম-নিশানা কেউ খুঁজে পায়নি। সাইফউদ্দিন কুতুজের কোনো সন্তান ছিল না। তাই তাঁর বংশও আর সামনে এগোতে পারেনি। [২] কিন্তু কবর মুছে যাওয়ায় বা নিঃসন্তান হওয়ায় কি কুতুজের মর্যাদায় কোনো ঘাটতি এসেছে?

বাইবার্স কুতুজের কবর মুছে ফেলেনি বরং নিজের সুন্দর পোশাকে একটি অমলিন দাগ লাগিয়ে নিয়েছেন। কুতুজ যদি এক বছরেরও কম সময় শাসন করে নির্মমভাবে নিহত হন, তবে তাতে তাঁর কী ক্ষতি হয়েছে? এই বিষয়টি কি সেই আমিরদের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করেনি যারা এই অপরাধে লিপ্ত ছিল? আল্লাহর এই বান্দা কোনো উত্তরাধিকারী রেখে যাননি, কোনো কবর বা মাজারও রেখে যাননি। কিন্তু আজও কি দুনিয়া তাঁকে ভক্তির সালাম পেশ করে না? এর কারণ হলো, আসল বিষয় হলো মানুষের নিয়ত, তাঁর জজবা, তাঁর কোরবানি এবং তাঁর কাজ। দুনিয়া সেই নামগুলোকেই ভালো শব্দে স্মরণ করে যারা মানবতাকে কিছু দিয়ে যায়। শত শত রাজা-বাদশাহ এসেছেন এবং চলে গেছেন। তাঁদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাদের বংশমর্যাদা অনেক উঁচুতে ছিল, দীর্ঘ সময় শাসন করেছেন এবং বিশেষ অধিক সন্তান রেখে গেছেন, আর তাঁদের কবরের ওপর রয়েছে সুউচ্চ অট্টালিকা। কিন্তু দুনিয়া তাঁদের মধ্যে কতজনকে চেনে এবং কতজন এমন আছেন যাদের কোনো কীর্তি মনে রাখার মতো?

শক্তির নীতির ক্ষতি:

মামলুক সালতানাতের সূচনা হয়েছিল ‘শক্তির নীতি’র ওপর। শাসনের অধিকার তাঁরই ছিল যে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী ছিল। এই শক্তির প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল বাইবার্সের হাতে শেষ আইয়ুবী সুলতান তুরান শাহের হত্যার মাধ্যমে। এরপর এই একই শক্তির নীতি শাজারাতুদ দুর পরীক্ষা করেছিলেন, যিনি আল-মালিক আল-মুইজ আল-তুর্কমানিকে হত্যা করেছিলেন এবং নিজেও নিহত হয়েছিলেন। সাইফউদ্দিন কুতুজের সিংহাসন আরোহণ শুরার নীতির ওপর ভিত্তি করে হয়েছিল, কিন্তু বাইবার্স এই ইসলামি ঐতিহ্য ভেঙে রাজাকে হত্যা করে নিজের শাসন কায়েম করেন। ফলে এরপর মামলুকদের পুরো ইতিহাসে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া এই নীতিই চলতে থাকে। সুতরাং মামলুক যুগে আমিরদের পক্ষ থেকে রাজাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অসংখ্য ঘটনা রয়েছে, যাতে রাজারা নিহত ও অপসারিতও হয়েছেন।

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৬২৮ হিজরি। নোট: আমরা আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়ায় দারুল হিজর সংস্করণ ব্যবহার করে আসছি যাতে এই ইবারতটি এভাবে আছে: “وقد كان شجاعا بطلا كثير الخير ممالا للإسلام وأهله وهم يحبونه” পক্ষান্তরে দারুল ফিকর এবং দারুল ইহয়াউত তুরাস সংস্করণে ইবারতটি এভাবে আছে: “وقد كان شجاعا بطلا كثير الخير ناصحا للإسلام وأهله، وكان الناس يحبونه ويدعون له كثيرا” উল্লিখিত অনুবাদ দারুল ফিকর এবং দারুল ইহয়াউত তুরাস সংস্করণের ইবারত অনুযায়ী করা হয়েছে।

[২] আন-নুজুমুজ জাহেরা ফি মুলুক মিসর ওয়াল কাহিরা: ৭/ ৮৬, ৮৭; তারিখুল ইসলাম লিজ-জাহাবি: ৩৮/ ৩৫৫, ত. তাদমুরি।

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

চতুর্থ খণ্ড

শের-এ-ববর - সুলতান রুকনুদ্দিন বাইবার্স

যিলকদ ৬৫৮ হিজরি থেকে মহররম ৬৭৬ হিজরি (নভেম্বর ১২৬০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে জুন ১২৭৭ খ্রিষ্টাব্দ)

ইসলামী ইতিহাসে এমন কিছু মুহূর্ত দেখা যায় যখন সর্বোচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন একজন শ্রেষ্ঠ শাসক এবং জাতির কল্যাণকামীকে অন্য কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি কেবল পদ ও মর্যাদার লোভে হত্যা করে ফেলে। এমন পরিস্থিতিতে মনে হয় যে, এই দ্বিতীয় শাসক প্রথম জনের বিপরীত হবে এবং রাষ্ট্রকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে। বাস্তবতাও এটাই যে, একজন ভালো মানুষের কাছ থেকে পদ ছিনিয়ে নেওয়া ব্যক্তি সাধারণত খারাপ মানুষ হয় এবং সাধারণত তার নীতিগুলোও বিপরীত ও নেতিবাচক হয়, যা বাস্তবায়নের জন্য সে বৈধ-অবৈধের পার্থক্য ভুলে যায়। কিন্তু কখনো কখনো আল্লাহর কুদরতে কামেলা ঘটনাবলিকে সাধারণ ধারার বিপরীতে পরিচালিত করে। নেতিবাচক পরিস্থিতি থেকে ইতিবাচক ফলাফল বের করে আনে। মানুষ এটি দেখে অবাক হয়ে যায় এবং বিশ্বাস করে নেয় যে, এই দুনিয়া পরিচালনাকারী আসল শাসক তিনিই, যিনি তাঁর সিদ্ধান্তে উপায়-উপকরণ এবং পরিস্থিতির নকশার মুখাপেক্ষী নন। ফলে ইতিহাস কিছু ক্ষেত্রে এমন দৃশ্য দেখায় যে, একজন ঈর্ষণীয় শাসককে জোরপূর্বক সরিয়ে অন্য একজন শাসক সামনে আসে, কিন্তু তার সম্পর্কে করা আশঙ্কাগুলো ভুল প্রমাণিত হয়। নতুন শাসক তার দায়িত্বগুলো এত সুন্দরভাবে পালন করেন যে বিরোধীরাও প্রশংসা না করে থাকতে পারে না। সাইফউদ্দিন কুতুজকে হত্যা করে রুকনুদ্দিন বাইবার্সের বাদশাহ হওয়া এর এক অবিস্মরণীয় উদাহরণ।

যদি এই ধরনের কোনো শাসক কখনো প্রত্যাশার বিপরীতে ভালো প্রমাণিত হয়, তবে এর পেছনে কিছু বিশেষ কারণও থাকে: যেমন সেই শাসক ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত যোগ্যতাসম্পন্ন হয়ে থাকেন। তার প্রশিক্ষণ চমৎকার হয়, তিনি নেককার, দীনদার, সাহসী এবং পরহেজগার হন। ঈমান ও ইয়াকিন এবং ইলম ও আমল দ্বারা সজ্জিত, জাতীয় আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন এবং দেশ ও জাতির চাহিদাসমূহ সম্পর্কে অবগত থাকেন। তবে ক্ষমতার লোভ তার দুর্বলতা হয়ে দাঁড়ায় এবং সে এর জন্য যেকোনো কিছু করতে পারে। কিন্তু যখন আল্লাহ তাআলা তাকে এই পদ দান করেন, তখন তার আর অন্য কোনো কিছুর লোভ থাকে না এবং সে পুরোপুরি আল্লাহর আনুগত্য, মাখলুকের সেবা এবং ইসলাম রক্ষার জন্য কোমর বেঁধে নেমে পড়ে।

এর সাথে আসল বিষয়টি হলো আল্লাহর তাকভিনি ফয়সালা। সেই আল্লাহ যিনি ফাসেক ও ফাজের লোকদের দিয়েও দ্বীনের কাজ করিয়ে নেন, তাঁর জন্য এই দৃশ্য দেখানো কি কঠিন যে, একজন ব্যক্তির অতীত কলঙ্কিত হোক, সে অত্যন্ত ভুল উপায়ে ক্ষমতা দখল করে থাকুক এবং ভবিষ্যতেও অনেক অবৈধ কাজ করতে পারে, কিন্তু কুদরতে ইলাহি তাকে দ্বীন রক্ষার জন্য মনোনীত করে নেয়, তার...

তারিখ-এ-উম্মত-এ-মুসলিমা — চতুর্থ খণ্ড

...যার হৃদয়ের মোড় ঘুরিয়ে দেন এবং তার আমল ও তার শাসনকালকে ঈর্ষণীয় করে তোলেন। সুলতান রুকনুদ্দিন বাইবার্স কুদরতের এমনই এক কারিশমার নাম ছিল।

সুলতান বাইবার্সের প্রাথমিক অবস্থা:

বাইবার্সের জন্ম ৬২৫ হিজরি (১২২৮ খ্রিষ্টাব্দে) কৃষ্ণ সাগরের উত্তরে অবস্থিত কিপচাক মরুভূমিতে (ইউক্রেন) হয়েছিল, যেখানে তুর্কি গোত্রগুলো বসবাস করত। তার বয়স যখন ১৪ বছর, তখন তাতারীরা সেখানে আক্রমণ করে। বাইবার্স বন্দীদের অন্তর্ভুক্ত হন এবং গোলাম হিসেবে বিক্রি হন। আমির আলাউদ্দিন বন্দকদার তাকে দামেস্কের বাজার থেকে ক্রয় করেন, এই সূত্রেই তিনি ‘বাইবার্স বন্দকদারি’ নামে পরিচিত হন। তার অসাধারণ শক্তি, ক্ষিপ্ততা, সাহসিকতা এবং বুদ্ধিমত্তা দেখে মিশরের অধিপতি সালিহ আইয়ুব তাকে পদোন্নতি দেন এবং কিছুকাল পর সেনাবাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করেন। [১] তিনি ছিলেন গন্ডুমি (শ্যামলা) বর্ণের, নীল চোখের অধিকারী, দীর্ঘদেহী এবং উচ্চকণ্ঠের মানুষ। [২]

সুলতান সালিহ আইয়ুবের শাসনামলে সপ্তম ক্রুসেড শুরু হয় এবং এই সময়েই সুলতানের মৃত্যু হয়। তবে রানী শাজারাতুদ দুর যুদ্ধ অব্যাহত রাখেন এবং বাইবার্স সেনাপতি হিসেবে মানসুরা শিবিরের প্রতিরক্ষা এবং শত্রুর শোচনীয় পরাজয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। যুদ্ধের সময় শাজারাতুদ দুর তার সৎ ছেলে তুরান শাহের হাতে রাজত্ব তুলে দিয়েছিলেন, কিন্তু বিজয়ের পর তিনি বিজয়ী জেনারেলদের অবমূল্যায়ন করেন, যাদের মধ্যে বাইবার্স ছিলেন অন্যতম। তিনি সেইসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা নিজেদের ওপর কারো বাড়াবাড়ি সহ্য করতেন না। ফলে তিনি সুলতান তুরান শাহের বিন্দুমাত্র পরোয়া করেননি। রাজপ্রাসাদে সবার সামনে তাকে আহত করেন, এরপর অন্যান্য সৈন্যরা তাকে ধাওয়া করে তলোয়ারের আঘাতে হত্যা করে এবং কারো বাধা দেওয়ার সাহস হয়নি। এভাবেই আইয়ুবি বংশের শাসনের অবসান বাইবার্সের হাতে ঘটে। সে সময় বাইবার্সের বয়স ছিল মাত্র ২৪ বছর। [৩]

মমলুকদের শাসন শুরু হলে প্রথম মমলুক শাসক ইজ্জুদ্দিন তুর্কমানি বাইবার্সের প্রতাপ ও গান্ধীর্ষ্যে ভীত হয়ে পড়েন। উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হলে বাইবার্স কায়রো ত্যাগ করেন এবং সিরিয়ায় গিয়ে আল-মালিকুন নাসিরের সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। কিন্তু যখন আন-নাসির তাতারীদের মোকাবিলা থেকে পিছুটান দেন, তখন বাইবার্স অসন্তুষ্ট হয়ে আলাদা হয়ে যান। শীঘ্রই তিনি মিশরের নতুন শাসক সাইফুদ্দিন কুতুজের আমন্ত্রণে মিশরে ফিরে আসেন এবং আইন জালুতের বিজয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

তাতারীদের মধ্যে বাইবার্সের সাহসিকতা ও যুদ্ধবিদ্যার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তারা তাকে তাদের বিজয়ের পথে এক বড় বাধা মনে করত। আইন জালুতের যুদ্ধের আগে যখন হিমসের শাসক আল-আশরাফ তাতারী সেনাপতি কিতবুগা নুয়ানের কাছে উপস্থিত হয়ে এই বিশ্বাস জন্মানোর চেষ্টা করেন যে তিনি তাতারীদের একজন ভালো সাহায্যকারী হিসেবে প্রমাণিত হবেন, তখন কিতবুগা তাকে ধমক দিয়ে বলেন:

[১] আন-নুজুমুজ জাহেরা: ৭/৯৫, ৯৬; আল-আলাম লিজ-জিরিকলি: ২/৭৯, ত: দারুল ইলম।

[২] কানাল মালিকুজ জাহের আসমার, আজরাকুল আইনাইন, জাহরিয়্যুল সওত, আলাইহি মাহাবাতুন ওয়া জালালাতুন, ওয়া কানা ইলাল তুলিল আকরাব। (আকদুল জুমান: সন ৬৭৬ হিজরি) পশ্চিমা ঐতিহাসিকরা বাইবার্সের শারীরিক বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন যে তিনি একচক্ষু বিশিষ্ট এবং কিছুটা খর্বকায় ছিলেন। যদিও এটি সম্পূর্ণ ভুল। বাইবার্সের উভয় চোখ সুস্থ ছিল, দেহ ছিল দীর্ঘ, তবে খুব বেশি নয়।

[৩] আস-সুলুক লি-মা'রিফতি দুওয়ালিল মুলুক: সন ৬৩৮ হিজরি।

“শুনেছি যে বাইবার্স মিশর থেকে কিছু সৈন্য নিয়ে বের হয়েছে। যদি তুমি সত্যিই সাহসী হও তবে গিয়ে তার মোকাবিলা করো।” [১]

যখন আল্লাহ আইন জালুতে মুসলমানদের বিজয় দান করলেন, তখন নিশ্চিত্ত পরিবেশে মামালিক মুইজ্জিয়া এবং মামালিক বাহরিয়্যার পুরনো দ্বন্দ্ব পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। বিজয়ী বাদশাহর বাইবার্সকে হালাবের গভর্নর না বানানো জ্বলন্ত আগুনে ঘি ঢালার মতো কাজ করল। ফলে বাইবার্সের তলোয়ার পুনরায় কোষমুক্ত হলো এবং সে সাইফউদ্দিন কুতুজকে হত্যা করল। [২]

বাইবার্সের সিংহাসন আরোহণ:

পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে কোনো শক্তিশালী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে শাসক বানিয়ে নেওয়া মামলুকদের ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছিল। যখন নিহত বাদশাহর কাফেলা আস-সালিহিয়া পৌঁছাল, তখন সেখানে সমবেত মামলুক আমিররা জিজ্ঞেস করলেন: “বাদশাহকে কে হত্যা করেছে?”

বাইবার্স নির্ভীকভাবে বলল: “আমি।”

তখন একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা আক্তাই মুজমি [৩] আওয়াজ দিলেন: “তবে তুমিই কুতুজের জায়গায় সিংহাসনে বসো।”

এর অর্থ ছিল এই যে, যে বাদশাহর প্রাণ নিতে পারে সেই সবচেয়ে সাহসী, সবচেয়ে শক্তিশালী এবং শাসনের যোগ্য।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে মামলুক আমিররা একত্রিত হয়ে তাকে বাদশাহ হিসেবে মেনে নিল। এটি ১৯ জিলকদ ৬৫৮ হিজরি (২৪ অক্টোবর ১২৬০ খ্রিস্টাব্দ) এর ঘটনা। সে সময় বাইবার্সের বয়স ছিল ৩৩ বছর।

এখন পর্যন্ত কায়রোতে সাইফউদ্দিন কুতুজের হত্যার খবর পৌঁছায়নি। যখন বাইবার্সের মিছিল সেখানে পৌঁছাল তখন ঘোষণা করা হলো:

“আল-মালিকুল মুজাফফর কুতুজের জন্য রহমতের দোয়া এবং নতুন শাসক বাইবার্সের জন্য কল্যাণের দোয়া করো।”

মানুষ একজন প্রিয় ও যোগ্য শাসকের মৃত্যুতে অত্যন্ত ব্যথিত হলো। তাদের আশঙ্কা হলো যে নতুন শাসক জুলুম ও নিপীড়নে অভ্যস্ত হবে। এই ধারণা অমূলক ছিল না। বাইবার্স নিজেও তার কঠোর স্বভাবের সাথে মিল রেখে প্রথমে নিজের উপাধি আল-মালিকুল কাহির রেখেছিলেন, কিন্তু যখন সঙ্গীরা বললেন যে এই উপাধি ধারণকারী প্রত্যেক শাসক ব্যর্থ হয়েছে, তখন তিনি আল-মালিকুজ জাহির উপাধি গ্রহণ করেন।

তিনি দ্রুতই সেনাপতিত্ব এবং শাসনের মেজাজের পার্থক্য অনুভব করলেন এবং বুঝতে পারলেন যে মানুষের ওপর জুলুম ও নিপীড়নের পরিবর্তে দয়া ও অনুগ্রহের সাথে শাসন করা বেশি সমীচীন। শাসক হওয়ার পর তিনি নিজের মেজাজ নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করতে থাকেন যাতে জনগণ তাকে ভয় পাওয়ার পরিবর্তে তার প্রতি অনুগত হয়। পূর্ববর্তী সরকার জিহাদের জন্য বেশ কিছু কর আরোপ করেছিল। বাইবার্স সেগুলো তাৎক্ষণিকভাবে মওকুফ করে দিলেন। এটি ছিল তার প্রথম পদক্ষেপ যা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা অসন্তোষ দূর করল এবং তারা সন্তুষ্ট হয়ে তাকে দোয়া দিতে লাগল। [৪]

আল্লামা মহিউদ্দিন বিন আব্দুল জাহির রহমাতুল্লাহ বাইবার্সের সিংহাসন আরোহণের প্রাথমিক দিনগুলোর বর্ণনা এভাবে করেন:

[১] আর-রওদুজ জাহির ফি সিরাতিল মালিকিজ জাহির, পৃ. ৬৬, ৬৭

[২] আস-সুলুক লি-মা'রিফতি দুওয়ালিল মুলুক: সন ৬৫৮ হিজরি

[৩] এই আক্তাই ভিন্ন ব্যক্তি, আর ফারিসুদ্দিন আক্তাই যার কথা আগে এসেছে, তিনি আলাদা ছিলেন।

[৪] আস-সুলুক লি-মা'রিফতি দুওয়ালিল মুলুক: সন ৬৫৮ হিজরি

“যখন সুলতান কেল্লায় অধিষ্ঠিত হলেন এবং রাজদরবারে বসলেন, তখন বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছ থেকে বায়াত গ্রহণ করলেন, কেউ বায়াত থেকে পিছপা হয়নি। এভাবে কোনো বিরোধ ছাড়াই সুলতানের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলো। সুলতান নিষেধের কাজগুলো শুরু করলেন, অর্থ ব্যয় করলেন। আদেশ জারি করলেন এবং পদ অর্পণ করলেন, বরখাস্ত ও নিয়োগ দান করলেন, মরক্কো, ইয়েমেন এবং সিরিয়ার শাসকদের কাছে পত্র লিখে নিজের নিরাপত্তা এবং নিজের অধীনস্থদের আনুগত্যের খবর দিলেন। দেশকে সালতানাতে সালিহিয়া (সুলতান আস-সালিহ আইয়ুবের শাসন)-এর রীতিনীতি ও আইন অনুযায়ী পরিচালনা করতে শুরু করলেন। সুলতান আস-সালিহ আইয়ুব শহীদের পছন্দনীয় ও নির্বাচিত গোলামদের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করলেন। এতে সুলতানের দরবারের মর্যাদা বৃদ্ধি পেল এবং মানুষ বুঝতে পারল যে, আল্লাহ এমন এক ব্যক্তিকে শাসন ক্ষমতা দিয়েছেন যিনি রাষ্ট্রের বিষয়াবলী ও আইন সম্পর্কে অবগত এবং মানুষকে তাদের যথাযথ স্থানে রাখেন। সুলতান শরিয়তে মুতাহারা কার্যকর করার আদেশ জারি করলেন এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় বিষয়াবলী গুছিয়ে আনা, বন্ধুদের মুক্তি দেওয়া, শত্রুদের অবস্থা জানা এবং সালতানাতে সালিহিয়ার আইন জারি করা ছাড়া অন্য কোনো কাজে লিপ্ত হননি, এমনকি কাজ সংশোধনকারী এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য তৈরি হয়ে গেল।” [১]

সুলতান বিবার্স, সিংহাসন আরোহণের পর:

সুলতান রুকন উদ্দিন বিবার্সের সিংহাসন আরোহণের মাধ্যমে মিশরে এক নতুন ও উজ্জ্বল যুগের সূচনা হলো। এটি এমন এক যুগ ছিল যাতে মিশর পুরো মুসলিম বিশ্বের রক্ষক, অভিভাবক, ঐক্যের কেন্দ্র এবং রাজনৈতিক অক্ষের মর্যাদা লাভ করে। ইসলামের ইতিহাসে মিশর ভূখণ্ড এর আগে কখনো এমন মহিমা লাভ করেনি। খিলাফতের পুনরুজ্জীবন, তাতারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ, ক্রুসেডারদের হাত থেকে মুসলিম বিশ্বকে রক্ষা, বাতেনি ইসমাইলিদের নির্মূল এবং নিরবচ্ছিন্ন নির্মাণ ও উন্নয়নমূলক কাজ সুলতান বিবার্সের এমন গুরুত্বপূর্ণ কীর্তি যার কারণে এই মহান ব্যক্তির নাম চিরস্মরণীয় হয়ে গেছে। বিবার্সের স্বভাব ছিল কেশরী সিংহের মতো। তার মধ্যে ভয় বলতে কোনো কিছুই ছিল না। প্রাণ দেওয়া বা নেওয়া তার কাছে ছিল সাধারণ ব্যাপার। ঝাঁপিয়ে পড়া, থাবা মারা, এক মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং তা কার্যকর করা ছিল তার অভ্যাস। তিনি ছিলেন এমন এক অশ্বারোহী যিনি তার পথে আসা প্রতিটি বাধাকে দ্বিধাহীনভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে সামনে এগিয়ে যেতেন। তাকে ধোঁকা দেওয়া সম্ভব ছিল না, কিন্তু কেউ তার কৌশল থেকে বাঁচতে পারত না। কেউ বলতে পারত না যে তিনি পরবর্তী মুহূর্তে কী করবেন। মেজাজের এই ক্ষিপ্ততা, সাহসিকতা, গতি এবং অপার কর্মশক্তি তাকে তার সমসাময়িকদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিল। আল্লাহর পূর্ণ কুদরত তাকে এমন এক সময়ে প্রকাশ করেছিল যখন তাতারী এবং ক্রুসেডার উভয়ই মুসলিম বিশ্বকে মিটিয়ে দিতে উদ্যত ছিল। ইমাদ উদ্দিন জঙ্গি, সুলতান নূর উদ্দিন, সালাহ উদ্দিন আইয়ুবী এবং আল-মালিকুল আদিল নিজ নিজ যুগে ক্রুসেডারদের গতিপথ ঘুরিয়ে দিয়ে খ্যাতিমান হয়েছিলেন। জালাল উদ্দিন খাওয়ারেজম শাহ এবং সাইফ উদ্দিন কুতুজ তাতারীদের বিরুদ্ধে জিহাদের ইতিহাস রচনা করে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু বিবার্সের ব্যক্তিত্ব এই দিক থেকে সবচেয়ে উজ্জ্বল যে, তিনি একই সাথে ক্রুসেডার এবং তাতারী উভয় বিশ্বশক্তির মোকাবিলা করেছেন এবং...

[১] আর-রওজুজ জাহির ফি সিরাতিল মালিকিজ জাহির, পৃষ্ঠা ৭০, ৭১।

উভয়কে অনেক ময়দানেই নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছেন। এসব কৃতিত্বের কারণে ইসলামি বিশ্ব তাঁকে “আল-আসাদ আল-যারি” (হিংস্র সিংহ) বলে স্মরণ করে, অন্যদিকে প্রাচ্যবিদরা তাঁকে চিতার সাথে তুলনা করে আসছেন।

শুবক বিজয়:

সুলতান সিংহাসনে আরোহণের পর সাম্রাজ্যকে আরও বিস্তৃত করেন এবং সিরিয়া ও মিসরের মধ্যবর্তী পথগুলো বিরোধীদের থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে নেন। এখানে শুবক দুর্গে তাতারদের অনুগত আল-মালিক আল-মুগীস উমরের শাসন ছিল। বাইবার্স এখানে একটি ঝটিকা বাহিনী পাঠান যারা ১৬ রবিউল আখের ৬৫৯ হিজরিতে দুর্গটি দখল করে নেয়। এখানে সাইফউদ্দিন বালবানকে নায়েব নিযুক্ত করা হয়। [১]

খিলাফতের পুনর্জাগরণ:

বাইবার্সের সিংহাসন আরোহণ এমন এক সময়ে হয়েছিল যখন তিন বছর ধরে মুসলিম বিশ্বে কোনো খলিফা ছিল না। মুসলমানরা রাজনৈতিক কেন্দ্র ও ঐক্য থেকে বঞ্চিত ছিল। সুলতান বাইবার্স বিলম্ব না করে এই দুর্বলতা দূর করার দিকে মনোযোগ দেন এবং খিলাফতের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তির সন্ধান শুরু করেন। সেই দিনগুলোতে একজন বয়োবৃদ্ধ আব্বাসীয় রাজপুত্র আহমদ বিন জাহির মিসরে পৌঁছান। তিনি ছিলেন শেষ খলিফা মুস্তাসিমের আপন চাচা অর্থাৎ মুস্তানসিরের আপন ভাই, জাহির বিল্লাহর পুত্র এবং খলিফা নাসিরের নাতি। সুলতান বাইবার্স তাঁর আগমনে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন এবং একটি বিশাল শোভাযাত্রার মাধ্যমে তাঁকে স্বাগত জানান। রাজপ্রাসাদে মিসরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের বিভিন্ন প্রতিনিধি দলের সাথে তাঁর সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন। সেই সময় মুসলিম বিশ্বে খিলাফতের অভাব সবাই অনুভব করছিল, কিন্তু তিন বছর ধরে এই সমস্যার সমাধান এই কারণে সম্ভব হচ্ছিল না যে এখানে অনেকগুলো প্রশ্ন ছিল: খিলাফতের জন্য সবচেয়ে যোগ্য কে যার ওপর উম্মাহ একমত হতে পারে? খলিফার ক্ষমতা কী হবে? খিলাফতের সুরক্ষা কে এবং কীভাবে করবে? যখন এই আব্বাসীয় রাজপুত্র আবির্ভূত হলেন, তখন বাইবার্স উলামা ও ফুকাহাদের পরামর্শে তাঁকেই খিলাফত অর্পণ করার সিদ্ধান্ত নেন। [২]

এই সিদ্ধান্তের বেশ কিছু কারণ ছিল, যেমন:

- পাঁচ শতাব্দী ধরে মুসলমানরা আব্বাসীয় খলিফাদের ওপর ঐক্যবদ্ধ ছিল। যদি বাগদাদের পতন না হতো, তবে এই খিলাফত চলতেই থাকত। সমীচীন এটাই ছিল যে উম্মাহকে সেই পরিবারের সাথেই সম্পৃক্ত থাকতে দেওয়া হোক যার সাথে সম্পৃক্ত থাকতে তারা অভ্যস্ত ছিল এবং যাদের ওপর তাদের অন্তর সন্তুষ্ট ও মস্তিষ্ক একমত ছিল।
- এটি তো নির্ধারিত ছিল যে খিলাফত কুরাইশ বংশের বাইরে যাবে না, কিন্তু এখন যদি খিলাফত কুরাইশদের অন্য কোনো পরিবারকে দেওয়া হতো, তবে তার যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠত। অন্যান্য শাখাগুলো সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন করতে পারত যে সেই পরিবারের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ কী? আর আমরা কেন বঞ্চিত? এ ধরনের প্রশ্ন বিভেদ সৃষ্টি করত এবং খিলাফতের উদ্দেশ্যই নস্যাৎ হয়ে যেত।
- হালাকু খান বনু আব্বাসের খিলাফত ধ্বংস করেছিল। ইবনে আলকামি এবং নাসির তুসীর মতো বিশ্বাসঘাতকদের লক্ষ্যও এটাই ছিল। এখন আহলে সুন্নাহের জন্য এটি সম্মান ও মর্যাদার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে তারা তাগুত এবং তাদের দোসরদের স্বপ্ন পূরণ হতে দেবে না।

[১] আস-সুলুক লি-মা'রিফাত দুওয়াল আল-মুলুক: ৬৫৯ হিজরি।

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৬৫৯ হিজরি; আস-সুলুক লি-মা'রিফাত দুওয়াল আল-মুলুক: ৬৫৯ হিজরি।

দিন এবং এই আব্বাসী খেলাফতকে জীবিত রাখুন।

সুতরাং এটি নির্ধারিত হয়ে গেল যে খলিফা আব্বাসীই হবেন। পরবর্তী প্রশ্ন ছিল খলিফার ক্ষমতা কতটুকু হবে? ইসলামি বিশ্বের রাজনীতিতে কার্যত কেবল কুরাইশ নয় বরং আরবদের প্রভাবও অনেক আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। সেই সময় ক্ষমতার চাবিকাঠি তুর্কিদের হাতে ছিল। তারা চাইলে নিজেরাই খেলাফতের আসনে বসতে পারত, কিন্তু এতে কুরাইশ হওয়ার শর্ত পূরণ হতো না, ওলামাদের পক্ষ থেকে আপত্তি উঠত এবং উম্মাহ এই খেলাফতের ওপর সন্তুষ্ট হতো না।

যদি কুরাইশদের অর্থাৎ আব্বাসীদের পূর্ণ ক্ষমতাবান খলিফা বানিয়ে বাইবাসের মতো জেনারেলরা নিজেরা ক্ষমতাহীন হয়ে যেতেন, তবে সম্ভবত মিশরের খেলাফতও খুব শীঘ্রই সেই পরিণতির সম্মুখীন হতো যা বাগদাদের হয়েছিল। যদি আব্বাসী পরিবার যোগ্যতা, সাহস ও শক্তির দিক থেকে এই সক্ষমতা রাখত, তবে তারা বাগদাদকেই রক্ষা করতে পারত। সুতরাং তাদের হাতে পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণ করাও বিচক্ষণতার পরিপন্থী ছিল।

এমতাবস্থায় মধ্যপন্থা এটাই ছিল যে, যে শক্তিশালী সামরিক আমিরগণ ইসলামি বিশ্বকে রক্ষা করতে সক্ষম, তারা রাজনৈতিক ও সামরিক বিষয়গুলো নিজেদের হাতে রাখবেন এবং খেলাফতের সুরক্ষাও তারাই করবেন। খলিফার অবস্থান হবে একজন আধ্যাত্মিক অভিভাবকের মতো, যিনি ধর্মীয় দিক থেকে উম্মাহকে দিকনির্দেশনা দিয়ে তাদের আদর্শিকভাবে ঐক্যবদ্ধ রাখবেন। তিনি হবেন একজন পারিবারিক মুরুব্বির মতো যাকে সবাই সম্মান করবে, তার কাছ থেকে দোয়া নেবে এবং পারস্পরিক বিবাদে তার কথাকে গুরুত্ব দেওয়া হবে। সুতরাং খেলাফতের এই নতুন ধারণার সাথে মামলুকরা বনু আব্বাসকে খেলাফত প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।

খেলাফত পুনরুজ্জীবনের মহান অনুষ্ঠান:

১৩ই রজব ৬৫৯ হিজরি সোমবার কায়রোতে এক মহান অনুষ্ঠান আয়োজিত হলো। পুরো কায়রো এমনকি ইহুদি ও খ্রিস্টানরাও এতে শরিক হলো। আহমদ বিন জাহিরকে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সাথে সিংহাসনে বসানো হলো। সুলতান বাইবার্স কোনো বালিশ ছাড়াই সাধারণ মানুষের মতো সামনে মেঝেতে আদবের সাথে বসে পড়লেন। কাজী তাজউদ্দীন মজলিসে উপস্থিত বেশ কয়েকজন আরব ব্যক্তির কাছ থেকে সাক্ষ্য নিলেন যে, এই ব্যক্তি মুসতাসিম আব্বাসীর চাচা এবং জাহির বিল্লাহর পুত্র। এরপর বাগদাদ খেলাফতের কিছু প্রাক্তন খাদেমের মাধ্যমে এর সত্যায়ন করালেন। সাক্ষ্য সম্পন্ন হওয়ার পর প্রথমে কাজী তাজউদ্দীন খলিফার হাতে বায়আত গ্রহণ করলেন। এরপর সুলতান বাইবার্স হাত বাড়িয়ে বললেন:

“আমি আপনার কাছে এই মর্মে বায়আত করছি যে, আমি আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্যাহর ওপর আমল করব। সৎকাজের আদেশ দিতে, অসৎকাজ থেকে বিরত রাখতে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করতে অবিচল থাকব। আল্লাহর সম্পদ হালাল উৎস থেকে গ্রহণ করব এবং সঠিক খাতে ব্যয় করব।”

এরপর শায়খুল ইসলাম আব্দুল আজিজ বিন আব্দুস সালাম (রহ.) বায়আত গ্রহণ করলেন। এরপর সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বায়আত গ্রহণের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এভাবে সাড়ে তিন বছরের বিরতির পর মিশরে খেলাফতের নতুন করে পুনরুজ্জীবন ঘটল। যদিও মিশরের এই নতুন আব্বাসী খেলাফত বাগদাদের খেলাফতের সমকক্ষ ছিল না, কারণ রাজনৈতিক ও সামরিক বিষয়গুলো মামলুক সুলতানদের হাতে ছিল। জুমার দিন খলিফা জামে মসজিদের মিম্বরে খুতবা দেওয়ার সেই রীতি, যা শতাব্দীকাল ধরে খলিফাদের প্রতিনিধিত্ব পালন করে আসছিলেন...

ছিলেন, আবারও শুরু করলেন। খুতবায় সূরা আল-আনআমের আয়াত তিলাওয়াত করলেন, দরুদ ও সালামের পর সাহাবীদের প্রশংসা করলেন এবং বনু আব্বাসের মহত্বের কথা উল্লেখ করলেন। এরপর এমন এক আবেগঘন বক্তৃতা দিলেন যে, মানুষ পূর্বসূরিদের অতীত যুগের কথা স্মরণ করে এবং ইসলামের এই নতুন উজ্জ্বলতা দেখে অঝোরে কাঁদতে লাগল। খলিফা সুলতানের জন্য কল্যাণের দোয়া করলেন। এরপর জুমার নামাজ পড়ালেন। [১]

বাইবার্সের জন্য সুলতানে মিসর ও শামের ফরমান:

খিলাফত প্রতিষ্ঠার পর ৪ শাবান ৬৫৯ হিজরিতে অন্য এক অনুষ্ঠানে খলিফা বাইবার্সকে মিসরের সালতানাতের ফরমান প্রদান করেন। এভাবে বাইবার্স সাংবিধানিকভাবে সুলতানে মিসর ও শাম হিসেবে মর্যাদা লাভ করেন। [২]

তাতারীদের সাথে জিহাদ..... প্রথম পর্যায়

হালাকু খান আইন জালুতের পরাজয়ের খবর শুনে রাগে ফেটে পড়ছিল। সে বাইবার্সের সিংহাসন আরোহণের পর আবারও তার বাহিনী শামের দিকে প্রেরণ করে, কিন্তু সুলতান বাইবার্স সীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। বাইবার্সের শাসনামলে তাতারীরা কয়েকবার আক্রমণ করেছিল কিন্তু সর্বদা ব্যর্থ ও হতাশ হয়ে ফিরে যায়। আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. লিখেছেন:

“হালাকু খান যখন আইন জালুতে তার বাহিনীর পরিণতির খবর পেল, তখন সে অনেক সৈন্য পাঠাল যাতে শামের শহরগুলো পুনরায় মুসলমানদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু তারা তাদের উদ্দেশ্য লাভে বঞ্চিত হলো এবং লাঞ্চিত ও অপমানিত হয়ে ফিরে গেল। কারণ সিংহ থাবা বিস্তারকারী, ধারালো তলোয়ার সুলতান আল-জাহির তাদের সামনে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। তিনি দামেস্ক ও অন্যান্য শহরের সীমান্ত রক্ষার জন্য প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও পূর্ণ প্রস্তুতিসহ বাহিনী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে তাতারীরা তাদের ওপর আক্রমণ করা তো দূরের কথা, কাছেও আসতে পারেনি। তারা দেখল যে সালতানাতের অবস্থা বদলে গেছে, আস্তিন গোটানো হয়েছে, ধারালো তলোয়ার কোষমুক্ত করা হয়েছে, নমনীয় বর্শা প্রস্তুত রয়েছে, ধনুকে ছিলা পরানো হয়েছে, তীরের ফলা লাগানো হয়েছে, ঘোড়াগুলোকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, দামামা বাজার অপেক্ষায় আছে এবং আল্লাহর সাহায্য শামের অধিবাসীদের ওপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাঁর রহমত তাদের ঘিরে রেখেছে। সুতরাং আলহামদুলিল্লাহ, সেই শয়তানরা উল্টো পায়ে ফিরে গেল।” [৩]

معركة مرقد خالد بن وليد رضى الله عنه - গায়েবি সাহায্যের দৃশ্য:

৬৫৯ হিজরিতে (১২৬১ খ্রি.) তাতারীরা কিতবুগার ভাই বাইদারার নেতৃত্বে হিমসের ওপর আক্রমণ করে। কিন্তু এখন মুসলমানরা সিংহহৃদয় হয়ে গিয়েছিল। হামার শাসক আল-মালিক আল-মানসুর এবং হিমসের শাসক আল-মালিক আল-আশরাফ মিলে তাদের প্রতিহত করার সিদ্ধান্ত নেন। ৫ মহররম হিমসের বাইরে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.-এর মাজারের কাছে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাতারীরা ছিল ছয় হাজার আর মুসলমান ছিল মাত্র চৌদ্দশ। কিন্তু তারা...

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৬৫৯ হিজরি; আস-সুলুক লি-মা'রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ৬৫৯ হিজরি

[২] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৬৫৯ হিজরি; আস-সুলুক লি-মা'রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ৬৫৯ হিজরি

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৬৫৮ হিজরি

প্রাণের বাজি রেখে তারা লড়াই করলেন এবং বিজয়ী হলেন। এই যুদ্ধের সেনাপতিগণ অর্থাৎ হামাহ ও হিমসের বিজেতা আমিরগণ সুলতানের পক্ষ থেকে খিলাত (সম্মানসূচক পোশাক) লাভ করেন। এই লড়াইয়ে গায়েবি সাহায্যের অবতরণ সাদা পাখির রূপে হয়েছিল। আমির বদরুদ্দিন কাইমারির বর্ণনা হলো:

“আল্লাহর কসম! আমি নিজের চোখে সাদা রঙের পাখি দেখেছি, যারা নিজেদের ডানা ঝাপটিয়ে তাতারীদের মুখে আক্রমণ করছিল।”

আল্লামা নুওয়াইরি (রহ.)-এর বক্তব্য হলো, এই বিষয়টি এত বেশি মানুষ বর্ণনা করেছেন যে তা তাওয়াতুর (অকাট্য বর্ণনা)-এর পর্যায়ে পৌঁছেছে। লড়াইয়ে মুসলমানদের বিজয় অর্জিত হয় এবং তাতারীরা পিছু হটে। [১]

হিমসের যুদ্ধে পরাজিত তাতার বাহিনী ফেরার পথে আলেপ্পো (হালাব) অবরোধ করে, যা চার মাস পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। অনেক মুসলমান শহীদ হন, তবে শহরটি সুরক্ষিত থাকে। [২]

মামলুকদের ইরাক অভিযান এবং এর তাৎক্ষণিক কারণসমূহ:

মিশরের সুলতান এ পর্যন্ত সিরিয়ার প্রতিরক্ষাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন এবং সতর্কতাবশত ইরাকে সৈন্য পাঠানো থেকে বিরত ছিলেন। তবে পরিস্থিতি এমন হয়ে দাঁড়ায় যে, ৬৫৯ হিজরির শেষের দিকে অবিলম্বে ইরাকের দিকে সৈন্য পাঠাতে হয়।

ইরাকে মোসেলের জাঙ্গি রাজবংশ ষষ্ঠ হিজরি শতাব্দীতে এক অনন্য মর্যাদার অধিকারী ছিল, যাকে সপ্তম হিজরি শতাব্দীতে বদরুদ্দিন লুলু নিজের স্বাধীন সরকারে রূপান্তরিত করেন। তাতারীদের তুফান কয়েকবার মোসেলের প্রাচীরে আঘাত হানে কিন্তু তা জয় করতে পারেনি। হালাকু খান যখন ইরাক আক্রমণ করেন, তখন বদরুদ্দিন লুলু সহযোগিতার পথ অবলম্বন করে নিজের প্রাণ বাঁচান এবং তার পুত্র আস-সালিহ ইসমাইল আল-জাজিরার সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাতারীদের পূর্ণ সমর্থন দেন। অতঃপর যখন শাবান ৬৫৭ হিজরিতে লুলুর মৃত্যু হয়, তখন হালাকু খান মোসেলের শাসনভার আস-সালিহ ইসমাইলের হাতে তুলে দেন। তিনি কিছুকাল তাতারীদের মিত্র হয়ে রইলেন, কিন্তু অনিচ্ছাসত্ত্বেও গড়ে ওঠা এই সম্পর্ক স্থায়ী প্রমাণিত হয়নি। [৩]

ইতিমধ্যে মিশরের মামলুকরা তাতারীদের বারবার পরাজিত করে নিজেদের শক্তির জানান দিয়েছিল। তাই আস-সালিহ ইসমাইল তাতারীদের বিরুদ্ধে মিশরের সুলতানের সাহায্য নেওয়ার কথা ভাবতে শুরু করেন। তিনি ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, হালাকু যেকোনো সময় তার কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিতে পারে। ফলে তিনি তার স্ত্রীকে মিশরে পাঠিয়ে দেন এবং নিজে গোপনে মিশরের উদ্দেশ্যে রওনা হন, যা প্রাচ্যের...

[১] নিহায়াতুল আরাব: ৩০/৩০, ৩১, ত দারুল কুতুব কাহেরা।

[২] আল-বিদায়া: ৬৫৯ হিজরি। কিছু ঐতিহাসিক অবরোধ চলাকালীন শহরে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির বর্ণনা দিতে গিয়ে খাদ্যদ্রব্যের দাম উল্লেখ করেছেন যা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক: যেমন প্রতি রতল গোধাত: ৭ দিরহাম, প্রতি রতল মাছ: ২০ দিরহাম, প্রতি রতল দুধ: ১৫ দিরহাম, প্রতি রতল চাল: ২০ দিরহাম, প্রতি রতল চিনি: ৫০ দিরহাম, প্রতি রতল মধু: ৩০ দিরহাম, একটি মুরগি: ৫ দিরহাম, একটি ডিম: দেড় দিরহাম। (নিহায়াতুল আরাব লিন-নুওয়াইরি: ৩০/ পৃষ্ঠা ৩৩, ত কাহেরা)।
দ্রষ্টব্য: এক রতল = ৪৯৮ গ্রাম অর্থাৎ প্রায় এক পাউন্ড (প্রায় আধা সের) এবং এক দিরহাম = ৩.০৬ গ্রাম রূপা।

[৩] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২৩/৩৫৭। আরব ঐতিহাসিকদের বর্ণনা হলো, আস-সালিহ ইসমাইলের স্ত্রী ছিলেন হালাকু খানের কন্যা, যার সাথে আস-সালিহ-এর মনোমালিন্য হয়। এতে হালাকু খান ক্ষুব্ধ হন এবং সম্পর্কের অবনতি ঘটে। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২৩/৩৫৭)। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আস-সালিহ-এর এই স্ত্রী হালাকু খানের নয় বরং সুলতান জালালুদ্দিনের কন্যা ছিলেন, যাকে মঙ্গু খান লালন-পালন করেছিলেন এবং হালাকু আস-সালিহ-এর সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। (তারিখে জাহান কুশা, পৃষ্ঠা ৫৩৪, ৫৩৫; জামিউত তাওয়ারিখ (আরবি): খণ্ড ২, প্রথম অংশ: পৃষ্ঠা ৩০৫)।

মুসলমানদের আশ্রয়স্থল হিসেবে বিবেচিত হতো। রজব ৬৫৯ হিজরিতে তিনি মিশরে পৌঁছান। তাঁর অপর ভাই মুজাহিদ উদ্দিন ইসহাকও, যিনি আল-জাজিরার কিছু দুর্গের শাসক ছিলেন, তাঁর বার্তার পর পিছু পিছু চলে আসেন। উভয় ভাই সুলতান বাইবার্সের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। সুলতান তাঁদের অত্যন্ত সম্মান ও সমাদর করেন। [১]

খলিফার জিহাদের উদ্দেশ্যে ইরাক যাত্রা:

সেই দিনগুলোতে খলিফা সুলতানকে পরামর্শ দেন যে, তাতারীদের কাছ থেকে ইরাক পুনরুদ্ধার করা উচিত। সুলতান তা মেনে নেন এবং সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করে ৬ শাওয়াল খলিফার সাথে রওনা হন এবং দামেস্ক পর্যন্ত সফরসঙ্গী থাকেন। ৭ জিলকদ দামেস্কে খলিফা ও সুলতানের ঐতিহাসিক সংবর্ধনা হয়। আস-সালিহ ইসমাইল এবং তাঁর ভাইয়েরাও এই অভিযানে সাথে ছিলেন যাতে তাঁরা তাঁদের পৈতৃক শাসন ফিরে পেতে পারেন। [২]

একটি ভুল পরামর্শের ওপর আমল:

সুলতান বাইবার্স চেয়েছিলেন খলিফাকে দশ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী দিতে যাতে তিনি তাতারীদের বাগদাদ থেকে বিতাড়িত করে পুনরায় খেলাফত প্রাসাদ আবাদ করতে পারেন। কিন্তু এই সময়ে বদর উদ্দিন লুলুর এক পুত্র নির্জনে সুলতানের সাথে কথা বলে তাঁর সংকল্প পরিবর্তন করে দেন। তিনি সুলতানকে বলেন: “খলিফা যদি বাগদাদে জেঁকে বসেন, তবে তিনি আপনাকে মিশর থেকে বের করে সেখানেও দখলদার হয়ে যাবেন।” বাইবার্স সন্দেহের শিকার হন এবং তিনি খলিফার বিশেষ কমান্ডে মাত্র তিনশ অশ্বারোহী সৈন্য দিতেই সন্তুষ্ট থাকেন। তবে তিনি শামের বিভিন্ন আমিরদের লিখে পাঠান যে, খলিফা যখনই তোমাদের তলব করবেন, তোমরা সৈন্য নিয়ে অবিলম্বে তাঁর কাছে পৌঁছে যাবে। [৩]

যাই হোক, খলিফা একটি সুসংগঠিত বাহিনীর নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত রইলেন। যদি তিনি একটি শক্তিশালী বাহিনী পেতেন, তবে বাগদাদ জয় করে তাতারীদের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী কেন্দ্র তৈরি করা সম্ভব হতো। এটি জরুরি ছিল না যে পরবর্তীতে খলিফা ও সুলতানের সম্পর্ক খারাপ হবে। উভয় পক্ষ যদি কৃতজ্ঞতা ও নিঃস্বার্থতার পথ অবলম্বন করত, তবে সম্পর্ক আরও ভালো থাকত এবং খলিফাদের অবস্থান এতটা দুর্বল হতো না যেমনটি পরবর্তী মামলুক যুগে ছিল, যা উন্মাহর আকাবির ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য দুঃখের কারণ ছিল।

খলিফার তাতারীদের সাথে যুদ্ধ ও শাহাদাত:

২১ জিলকদ খলিফার বাহিনী দামেস্ক থেকে বাগদাদের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। যেহেতু এই অভিযানের কারণে আস-সালিহ ইসমাইল এবং তাঁর ভাইয়েরা কিছু জনবল ও আর্থিক শক্তি লাভ করেছিলেন, তাই রাহবা নামক স্থানে তাঁরা তাঁদের সমর্থকদের নিয়ে খলিফা মুস্তানসির থেকে আলাদা হয়ে মোসেলের পথে চলে যান, যদিও মুস্তানসির তাঁদের সাথে রাখতে চেয়েছিলেন।

মুস্তানসির ‘আনা’ হয়ে ফোরাত নদী পার হন। এই সময়ে বিভিন্ন আমির তাঁদের ছোট-বড় দল নিয়ে...

[১] জাইল মিরআতুয যামান: ৩/ ১০৬, ত. দারুল কিতাব আল-ইসলামি

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, সন ৬৫৯ হি., ৬৬০ হি.

[৩] জাইল মিরআতুয যামান: ৩/ ১০৮, ত. দারুল কিতাব আল-ইসলামি

[৪] আস-সুলুক লি-মা’রিফতি দুওয়ালিল মুলুক: সন ৬৫৯ হি.

তার সাথে তার পতাকাতলে সমবেত হতে থাকে যতক্ষণ না প্রায় দেড় হাজার সৈন্য সংগৃহীত হলো।

বাগদাদের তাতারী প্রশাসক কারাবুগা যখন এই অভিযানের খবর পেল, তখন সে পাঁচ হাজার অশ্বারোহী নিয়ে আশেপাশের এলাকাগুলো ধ্বংস করতে শুরু করল যাতে ভয়ের কারণে কেউ মুসতানসিরকে সাহায্য না করে। এই সময়ে মুসতানসির ‘হাদিসা’ হয়ে ‘হিত’ নামক স্থানে পৌঁছান, কিন্তু শহরবাসী তাতারীদের প্রতিশোধের ভয়ে খলিফাকে ভেতরে প্রবেশ করতে দেয়নি। এর ফলে খলিফা শহরটি অবরোধ করেন এবং ২৯শে জিলহজ তা জয় করে নেন।

এরপর বাহিনী সামনে অগ্রসর হলো। ৬৬০ হিজরির ৩রা মহরম রাতে ইসলামী বাহিনী আনবারের সামনে রাত কাটায়। পরের দিন কারাবুগা তার বাহিনী নিয়ে ইসলামী বাহিনীর সামনে এসে উপস্থিত হলো। খলিফা তুর্কমেনদের ডান দিকে এবং আরবদের বাম দিকে রাখলেন এবং নিজে বাকি বাহিনীর সাথে মধ্যভাগে (কলব) অবস্থান নিলেন। অবশেষে তুমুল যুদ্ধ শুরু হলো, যার মধ্যে খলিফা নিজেই প্রতিপক্ষের ওপর আক্রমণাত্মক হামলা চালান, যার তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে তাতারীরা ফোরাত নদীর দিকে পিছু হটতে থাকে। মুসলমানদের চাপ এতটাই বৃদ্ধি পায় যে তাতারী বাহিনীর একটি বড় অংশ নদীতে ডুবে যায়। কিন্তু এই সময়ে তাতারীদের সংরক্ষিত বাহিনী, যারা পেছনে লুকিয়ে ছিল, ময়দানে চলে আসে এবং পেছন থেকে মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে আরব ও তুর্কমেনরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে এদিক-ওদিক পালিয়ে যায় এবং এই সংরক্ষিত তাতারী বাহিনী খলিফার দলকে ঘিরে ফেলে, যার মধ্যে বড় বড় আমির ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। অনেক জানবাজ এক দিকে জোরালো আক্রমণ চালায় এবং শত্রুদের নিধন করতে করতে ঘেরাও ভেঙে নিরাপদ এলাকার দিকে চলে যায়। এই বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে আল-হাকিম আব্বাসীও ছিলেন, যিনি পরবর্তীতে খলিফা নির্বাচিত হন।

খলিফা মধ্যভাগের সৈন্যদের সাথে একা রয়ে গেলেন। তিনি শেষ পর্যন্ত অবিচল ছিলেন যখন তার অধিকাংশ সঙ্গী শহীদ হয়ে যান। এরপর খলিফার আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি যে তিনি কোথায় গেলেন। কেউ বলত তিনি যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন, কেউ বলত তিনি আহত অবস্থায় পালিয়ে গিয়ে আরব গোত্রগুলোর কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং সেখানে ক্ষতের যত্নগা সহ্য করতে না পেরে মৃত্যুবরণ করেন। এটা স্পষ্ট ছিল যে তিনি আর পৃথিবীতে নেই, অন্যথায় কোনো না কোনোভাবে মিশরে পৌঁছে খেলাফতের মসনদ গ্রহণ করতেন। [১]

হাফিজ ইবনে কাসির (রহ.) বলেন:

“উত্তম হতো যদি খলিফা পরিস্থিতি অনুকূল হওয়া এবং শাসনব্যবস্থা মজবুত হওয়া পর্যন্ত ইসলামী দেশগুলোতে অবস্থান করতেন, কিন্তু আল্লাহর তকদির ও ইচ্ছা যা থাকে তাই হয়।” [২]

মোসেলের যুদ্ধ:

মোসেলের ওয়ালি আস-সালিহ ইসমাইল এবং তার ভাই খলিফা মুসতানসির থেকে আলাদা হয়ে মোসেলের দিকে রওনা হয়েছিলেন। সিনজারে পৌঁছে আস-সালিহ ইসমাইল মোসেলে অবস্থানরত তার সমর্থকদের সাথে যোগাযোগ করেন যাতে সর্বশেষ পরিস্থিতি জানা যায়। তাদের থেকে জানা গেল যে...

[১] জাইল মিরআতুয যামান: ৩/১০৯ থেকে ১১২, ত. দারুল কিতাব আল-ইসলামী।

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: সন ৬৫৯ হিজরি।

সময় অনুকূল ছিল। আস-সালিহ তার বাকি ভাইদের সিনজারে রেখে নিজে তিনশ সৈন্য নিয়ে ২০ জিলহজ ৬৫৯ হিজরিতে মোসেলে পৌঁছে যান, যেখানে আগে থেকেই চারশ অশ্বারোহী তার সমর্থনের জন্য প্রস্তুত ছিল।

আস-সালিহ-এর স্ত্রী তুরকান বিনতে জালালুদ্দিন যুদ্ধের পক্ষে ছিলেন না, বরং তিনি হালাকু খানের সাথে সন্ধি করার ব্যাপারে জেদ ধরেছিলেন। [১] তিনি আগেই হালাকু খানকে আস-সালিহ-এর পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন, তাই হালাকু খান প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। [২] ফলে খলিফা মুসতানসিরের বাহিনীর সাথে বোঝাপড়া শেষ করেই তিনি তাতার সর্দার ‘সানদাগুন’কে মোসেলে পাঠান, যে মহররমের শুরুতে শহরটি কঠোরভাবে অবরোধ করে এবং ২৩টি মানজানিক দিয়ে পাথর বর্ষণ শুরু করে। শহরে অস্ত্রশস্ত্র বা খাদ্যের কোনো মজুদ ছিল না। [৩] তবে তুর্কমেন ও কুর্দি যুবকদের সংখ্যা ছিল প্রচুর। আস-সালিহ তাদের পেছনে মুক্তহস্তে ব্যয় করতে থাকেন এবং বলতে থাকেন: “সুলতান বাইবার্স যখনই আমাদের অবস্থা জানতে পারবেন, তিনি মিসর থেকে আমাদের জন্য সাহায্য পাঠাবেন।”

কিন্তু এই আশা দ্রুত পূরণ হয়নি। তা সত্ত্বেও মোসেলবাসী পূর্ণ শক্তিতে প্রতিরোধ চালিয়ে যান এবং নিজেদের মানজানিক দিয়ে পাল্টা পাথর বর্ষণ করতে থাকেন। একদিন কুর্দিদের একটি দল শহর থেকে বেরিয়ে তাতারদের ওপর আক্রমণ করে এবং তাদের বেশ ক্ষয়ক্ষতি করে ফিরে আসে। এর জবাবে একদিন ৮০ জন তাতার মোসেলের প্রাচীর উপকানোর চেষ্টা করে, কিন্তু শহরের সতর্ক প্রহরীরা তাদের সবার মাথা কেটে তাতার বাহিনীর দিকে ছুড়ে ফেলে দেয়। তাতার বাহিনীতে এক জাতিদ্রোহী মুসলিম আমির মালিক সদরুদ্দিন অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন। একদিন তিনি তার ‘খুদ’ (ইস্পাতের হেলমেট) খুলে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মোসেলের এক তীরন্দাজ এমন লক্ষ্যভেদী তীর ছুড়লেন যে তা সরাসরি তার খুলিতে গিয়ে বিঁধল। এই অবস্থা দেখে সানদাগুন হালাকু খানের কাছে সাহায্য চাইলেন। ফলে তিনি আরও সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন। [৪]

অবশেষে অবরোধের কয়েক মাস কেটে গেল। এটি দেখে আস-সালিহ আলেপ্পোর শাসক শামসুদ্দিন বারলির কাছে সাহায্য চাইলেন। বারলির কাছে সৈন্য সংখ্যা খুব কম ছিল, কিন্তু মুসলমানদের বিপদে দেখে তিনি স্থির থাকতে পারলেন না এবং তার সংক্ষিপ্ত বাহিনী নিয়ে মোসেলবাসীদের সাহায্যের জন্য সিনজারে পৌঁছে গেলেন। সানদাগুন এই খবর পেয়ে মোসেলের অবরোধ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ঠিক সেই সময় জাইন হাফিজি নামক এক জাতিদ্রোহী সেখানে পৌঁছে যায়, যে তাতারদের জানায় যে মোসেলবাসীদের সাহায্যের জন্য আসা বাহিনীটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র। এটি শুনে সানদাগুন সাহসী হয়ে ওঠেন এবং অবরোধ ছেড়ে দশ হাজার সৈন্য নিয়ে সিনজারের দিকে অগ্রসর হন।

১৪ জমাদিউল আখিরা ৬৬০ হিজরিতে কুরাইতিনে এক ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। বারলির সাথে নয়শ অশ্বারোহী ছিল, যাদের মধ্যে চারশ তুর্কমেন এবং একশ আরব ছিল। এই মুজাহিদরা এগারো গুণ বেশি তাতারদের সাথে অত্যন্ত বীরত্বের সাথে লড়াই করেন এবং তাদের চরম ক্ষয়ক্ষতি করেন, তবে শেষ পর্যন্ত তাতাররা বিজয়ী হয়। ইসলামের অনেক নামকরা আমির শহীদ হন, অন্যদিকে বারলি পায়ে আঘাত পেয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে যেতে সক্ষম হন এবং মিসরে পৌঁছে যান, যেখানে সুলতান বাইবার্স তাকে অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসার নিযুক্ত করেন।

[১] এটিও ইতিহাসের এক অদ্ভুত মোড় যে, খাওয়ারিজমের মহান মুজাহিদের কন্যা তার পিতার শত্রুদের সাথে ছিলেন। একে চরম বাধ্যবাধকতাও বলা যেতে পারে।

[২] জামিউত তাওয়ারিখ (আরবি), রশীদুদ্দিন ফজলুল্লাহ: খণ্ড ২, প্রথম অংশ: পৃষ্ঠা ৩৭, ৩৭, ত দার ইহয়াউল কুতুবিল আরাবিয়া মিসর।

[৩] জাইলু মিরাতিয যামান: ৪/ ১৫৭, ত দারুল কিতাবিল ইসলামী কায়রো।

[৪] জামিউত তাওয়ারিখ (আরবি): খণ্ড ২, প্রথম অংশ: পৃষ্ঠা ৩২৮।

সন্দাঘুন বুদলিকে পরাজিত করার পর পুনরায় মোসলে পৌঁছান এবং তা অবরোধ করেন। [১] সুলতান বাইবার্স মোসলবাসীদের নাজুক অবস্থার কথা জানতে পেরে একটি সাহায্যকারী বাহিনী প্রেরণ করেন। সিনজারের নিকট পৌঁছে সেনাপতি একটি বার্তাবাহক কবুতর মোসলে পাঠান যাতে তার আগমনের সংবাদ ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কবুতরটি তাতারীদের একটি মানজানিকের আঘাতে মারা যায়। মানজানিক চালক কবুতরটি তুলে নিয়ে বার্তাটি দেখে ফেলে এবং সন্দাঘুনের কাছে পৌঁছে দেয়। সে তৎক্ষণাৎ বাইবার্সের সাহায্যকারী বাহিনীকে মোকাবিলা করার জন্য তিনটি দল পাঠায়। এদিকে সাহায্যকারী বাহিনীর সাথে সিনজারের স্বেচ্ছাসেবকরাও যোগ দিয়েছিল। তাতারীরা ওত পেতে থেকে তাদের ঘিরে ফেলে। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর সাহায্যকারী বাহিনীর অনেক সৈন্য শহীদ হন এবং বাকিরা পিছু হটেন। তাতারীরা পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী নিহতদের পোশাক পরিধান করে এবং নিজেদের চুল মুজাহিদদের মতো করে সাজিয়ে নেয়। পরের দিন এই দলটি মোসলের নিকট পৌঁছালে অনেক মোসলবাসী সৈন্য একে ইসলামী বাহিনী মনে করে অভ্যর্থনা জানাতে বেরিয়ে আসে। তাতারীরা তাদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে এবং কাউকেই জীবিত ছাড়েনি। [২]

এদিকে প্রচণ্ড গরমের মৌসুম শুরু হয়ে গিয়েছিল। শহরে মহামারি ছড়িয়ে পড়ছিল এবং খাদ্য ফুরিয়ে যাওয়ার কারণে মানুষ লড়াই করতে অক্ষম হয়ে পড়েছিল। যারা খাবারের সন্ধানে জঙ্গলের দিকে বের হতো তারা তাতারীদের শিকারে পরিণত হতো। সফলতার কোনো চিহ্ন দূর-দুরান্ত পর্যন্ত ছিল না। অবশেষে আস-সালেহ ইসমাইল হতাশ হয়ে আত্মসমর্পণ করার প্রস্তাব দেন এবং বলেন:

“আমি আমার কাজের জন্য অনুতপ্ত। আমি বাইরে আসতে প্রস্তুত তবে আমার দুটি শর্ত আছে: এক, পূর্বের ভুলের জন্য আমাকে জবাবদিহি করা যাবে না। দুই, আমাকে থাকান হলাকুর কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে এবং সুপারিশ করতে হবে যেন আমাকে হত্যা না করা হয়।” [৩]

আরব ঐতিহাসিকদের বর্ণনা অনুযায়ী আস-সালেহ শহরবাসীদের জন্যও নিরাপত্তা চেয়েছিলেন। সন্দাঘুন সমস্ত শর্ত মেনে নেন। ১৫ শাবান ৬৬০ হিজরিতে জান ও মালের নিরাপত্তার শর্তে শহরটি তাতারীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তাতারীরা শহর দখল করার পর শুরুতে সবাইকে নিরাপত্তা দেওয়ার ঘোষণা দেয়। এই সময়ে তারা শহরের প্রাচীর এবং সুরক্ষামূলক পরিখাগুলো ধ্বংস করে দেয়। এরপর তারা হঠাৎ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে শহরবাসীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। নয় দিন পর্যন্ত শহরে হত্যা ও লুণ্ঠনের তাণ্ডব চলতে থাকে এবং এই শহর যার ওপর শতাব্দী ধরে কোনো অমুসলিম শক্তি দখল করতে পারেনি, তা ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে যায়। [৪]

অসংখ্য মানুষ নিহত হন। কেবল তারাই বাঁচতে পেরেছিলেন যারা পাহাড়ের দিকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। শহরের সমস্ত কারিগরদের বাধ্যতামূলক শ্রমের জন্য বন্দী করা হয়। তাতারীরা যখন ফিরে যায় তখন শহরে কোনো মানুষ অবশিষ্ট ছিল না। তবে কিছুকাল পর পাহাড়ে আত্মগোপনকারী লোকদের মধ্যে কিছু লোক ফিরে আসতে সক্ষম হন যাদের সংখ্যা ছিল মাত্র এক হাজারের কাছাকাছি।

[১] আস-সুলুক লি-মা'রিফতি দুওয়ালিল মুলুক: সন ৬৬০ হিজরি; জাইলু মিরাতিয যামান: ২/১৫৭, তাবা দারুল কিতাব আল-ইসলামি।

[২] জামিউত তাওয়ারিখ (আরবি) রশিদ উদ্দিন ফজলুল্লাহ রচিত: খণ্ড ৩, প্রথম অংশ: পৃষ্ঠা ৩২৯, ৩৩০, তাবা দারু ইহযায়িল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ মিসর।

[৩] জামিউত তাওয়ারিখ (আরবি): খণ্ড ৩, প্রথম অংশ: পৃষ্ঠা ৩৩০, ৩৩১।

[৪] জাইলু মিরাতিয যামান: ২/১৫৬ থেকে ১৫৯; আল-ওয়াফি বিল ওয়াফায়াত: ৯/১১৭; সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২৩/৩৫৭, ৩৫৮, তাবা আর-রিসালাহ।

ছিল। পরের কয়েক বছর পর্যন্ত এই লোকেরাই মোসেলের অধিবাসী ছিল। [১]

আস-সালিহ ইসমাইলের শাহাদাত:

আস-সালিহ ইসমাইলকে হালাকু খানের কাছে নিয়ে আসা হলো। তাকে দেখে সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। আদেশ দিল যে, তার শরীরে চামড়া জড়িয়ে উপর থেকে শক্ত করে রশি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হোক, তারপর তাকে ঘাড় পর্যন্ত তেলের পাত্রে ডুবিয়ে দেওয়া হোক এবং পাত্রটি প্রখর রোদে রেখে দেওয়া হোক। আদেশ পালন করা হলো। এটি ছিল প্রচণ্ড গরমের মৌসুম। আস-সালিহ গরম ও তৃষ্ণায় ছটফট করতে থাকলেন, তার শরীর ধীরে ধীরে গলতে লাগল। অবশেষে এক মাস পর্যন্ত এই যন্ত্রণাদায়ক আজাবে লিপ্ত থাকার পর তার রুহ দেহ ত্যাগ করল। হালাকু খান তার তিন বছর বয়সী সন্তানের ওপরও দয়া করেনি। এই মাসুম শিশুকে দুই টুকরো করে মোসেলের দজলা নদীর সেতুর দুই প্রান্তে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। [২] হায়! বদরুদ্দিন লুলু যদি জীবিত থাকত তবে তার আদরের সন্তানের সাথে তাতারীদের আচরণ দেখতে পেত। সে নিজের শাসন বাঁচানোর জন্য তাতারীদের সঙ্গ দিয়েছিল, কিন্তু পাঁচ বছরও পার হতে না হতেই বাগদাদের মতো মোসেলও ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে গেল এবং বনু লুলু ভুল অক্ষরের মতো মুছে গিয়ে এক শিক্ষণীয় উপাখ্যানে পরিণত হলো।

আল-হাকিমের খিলাফত:

এদিকে খলিফা মুস্তানসিরের কোনো খোঁজ না পাওয়ায় মিশরে এক অদ্ভুত অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়েছিল। অবশেষে কয়েক মাস অপেক্ষার পর যখন মুস্তানসিরের মৃত্যু নিশ্চিত হয়ে গেল, তখন সেই যুদ্ধ থেকে বেঁচে আসা আব্বাসীয় বংশের আরেকজন ব্যক্তি আহমদ বিন আলীকে খলিফা নিযুক্ত করা হলো। এই খলিফা ছিলেন খলিফা মুস্তারশিদ বিল্লাহ আব্বাসীয়র প্রপৌত্রের পুত্র (লাক্কড় পোতা)। তিনি পূর্ব রণাঙ্গন থেকে ফিরে মিশরে পৌঁছালে তাকে স্বাগত জানানো হলো। সুলতান বাইবার্স ৮ মহরম ৬৬১ হিজরিতে কায়রোতে একটি সাধারণ সমাবেশের আয়োজন করেন যেখানে আহমদ বিন আলী “হাকিম বি-আমরিব্লাহ” উপাধিতে নতুন আব্বাসীয় খলিফা নিযুক্ত হন। [৩]

নতুন খলিফার জিহাদের খুতবা:

খলিফা হাকিম ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ বাগ্মী এবং মুসলমানদের মধ্যে জিহাদের চেতনা ছড়িয়ে দিতে আগ্রহী ছিলেন। খিলাফতের মসনদে বসার পর তিনি জুমার নামাজের সমাবেশে খুতবা দিতে গিয়ে বলেন:

“হে লোকসকল! জেনে রেখো যে, খিলাফত ইসলামের ফরজসমূহের মধ্যে একটি ফরজ। আর জিহাদ সমস্ত মানুষের ওপর ওয়াজিব। মানুষের ঐক্য ছাড়া জিহাদের পতাকা উত্তোলন করা সম্ভব নয়। নারীরা তখনই বন্দি হয় যখন আল্লাহর হারামকৃত বিষয়গুলো সংঘটিত হয়। রক্ত তখনই সস্তা হয় যখন অপরাধ ব্যাপক হয়ে যায়। সেটি কেমন দৃশ্য ছিল যখন কাফেররা ইসলামি ভূখণ্ডে প্রবেশ করল, এবং তারা জান ও মাল ধ্বংস করল, পুরুষ ও শিশুদের হত্যা করল, খিলাফতের প্রাসাদ এবং খলিফাদের নারীদের...”

[১] জামিউত তাওয়ারিখ (আরবি), রশীদ উদ্দিন ফজলুল্লাহ: খণ্ড ২, অংশ ১: পৃষ্ঠা ৩৩০, ৩৩১, ত. দার ইহ্যাউল কুতুবিল আরাবিয়াহ মিশর।

[২] জামিউত তাওয়ারিখ (আরবি): খণ্ড ২, অংশ ১: পৃষ্ঠা ৩৩১।

নোট: আস-সালিহের এই অল্পবয়সী সন্তানের নাম ছিল আলাউদ্দিন। (আস-সুলুক লি-মা’রিফতি দুওয়ালিল মুলুক: ১/৫৩৫, ত. আল-ইলমিয়াহ)।

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: বছর ৬৬০ হিজরি।

পর্দা উন্মোচন করেছে, যারা বেঁচে ছিল তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিতে রেখেছে, ফলে কান্নাকাটি ও বিলাপের আওয়াজ উচ্চকিত হয়েছে, এই দীর্ঘ সময়ের ভয়াবহতার কারণে আহাজারি ও আর্তনাদ চলতে থাকে, কত বৃদ্ধ ছিল যাদের সাদা দাড়ি রক্তে রঞ্জিত হয়েছে এবং কত নিষ্পাপ শিশু ডুকরে কেঁদেছে কিন্তু তাদের আর্তনাদে কারো দয়া হয়নি। অতএব তোমরা জিহাদের ফরজকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য কোমর বেঁধে নাও:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقْ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

(অতএব তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় করো এবং শোনো ও আনুগত্য করো এবং ব্যয় করো তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণের জন্য এবং যাদেরকে মনের কার্পণ্য থেকে রক্ষা করা হয়েছে, তারাই সফলকাম।) [১]

এখন দ্বীনের শত্রুদের মোকাবিলা এবং মুসলমানদের প্রতিরক্ষার পরিবর্তে ঘরে বসে থাকার কোনো অবকাশ নেই। সুলতান আল-মালিকুজ জাহির সাহায্যকারীর অভাব সত্ত্বেও খিলাফতের সাথে সহযোগিতার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং কুফরের সেই বাহিনীকে বিতাড়িত করেন যারা শহরগুলোতে ঢুকে পড়েছিল। তাঁর ব্যবস্থাপনা ও তদারকিতে খিলাফতের বায়আত মজবুত হয় এবং আব্বাসীয় রাষ্ট্র তাঁর কারণে বিশাল সৈন্যবাহিনীর অধিকারী হয়। আল্লাহর বান্দারা! আল্লাহর এই নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে দেরি করো না এবং নিয়ত খাঁটি রাখো, তোমাদের সাহায্য করা হবে। শয়তানের অনুসারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, তোমরা বিজয়ী হবে। যা ঘটে গেছে তাতে আতঙ্কিত হয়ো না, কারণ যুদ্ধে জয়-পরাজয় লেগেই থাকে। পরিণামে সফলতা মুত্তাকী লোকদের ভাগ্যেই জুটবে। [২]

তাতারীদের আক্রমণের আশঙ্কা এবং বিবারসের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা:

এরপর হালাকু খান সিরিয়ার ওপর এক বড় ধরনের আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু করে দেয়। সিরিয়ায় এই সংবাদে চরম আতঙ্ক ও ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। মানুষ তাদের আসবাবপত্র বিক্রি করে মিশরের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। দুর্গাধিপতিরা তাদের কাছে জমা থাকা শস্যের গুদাম পর্যন্ত বিক্রি করে দেয়। বিবারস এই সংবাদ পেয়ে আলেপ্পো থেকে আমাদ এবং খালাত পর্যন্ত প্রায় দুইশ মাইল এলাকার সমস্ত ঘাসবন পুড়িয়ে দেন কারণ হালাকু খানের বাহিনী ঘোড়াদের তাজা ঘাস খাওয়ানোর জন্য সবসময় ঘাসবনেই তাবু ফেলত। সিরিয়ার সেইসব বাসিন্দা যারা বিপদের মুখে ছিল, তাদের নির্দেশ দেওয়া হয় যেন তারা মিশরের দিকে হিজরত করে, তাদের আর্থিক বোঝা কমানোর জন্য সিরিয়াবাসীদের সমস্ত ট্যাক্স মওকুফ করে দেওয়া হয়। [৩]

নতুন মিত্র ও সাহায্যকারীদের সন্ধান:

সুলতান বিবারসের নীতি ছিল তাতারীদের বিরুদ্ধে যত বেশি সম্ভব মুসলিম শাসক ও আমিরদের সাথে রাখা। সুলতান তাতারীদের বিজিত এলাকা: ইরাক ও ইরানের আমিরদের সাথে গোপন যোগাযোগ রক্ষা করেন, তাদের খেলাত পাঠান এবং উৎসাহ...

[১] সূরা আত-তাগাবুন, আয়াত নম্বর ১৬

[২] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: সন ৬৬০ হিজরি; আস-সুলুক লি-মা'রিফাত দুওয়ালিল মুলুক: সন ৬৬১ হিজরি

[৩] নিহায়াতুল আরাব লিন-নুওয়াইরি: ৩০ / ৬৩, তাবা দারুল কুতুব কায়রো

...দিয়েছিলেন যে তারা যেন হালাকু খানের বিরুদ্ধে মিশর সালতানাতকে সাহায্য করে। শিরাজের আতাবাকি রাষ্ট্র তাতারীদের করদ রাজ্য ছিল। সুলতান ৬৬১ হিজরিতে এর শাসককে হালাকু খানের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য মিশরের সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য উৎসাহমূলক পত্র পাঠান। [১]

কয়েক মাস পর শিরাজ থেকে বেশ কিছু নামী-দামী আমির কায়রোতে উপস্থিত হন। ৩ রজব ৬৬২ হিজরিতে তারা সাক্ষাতের সম্মান লাভ করেন। তাদের মধ্যে সাইফ উদ্দিন আকবারও ছিলেন যিনি সুলতান জালাল উদ্দিন খাওয়ারিজম শাহের জামাদার ছিলেন। প্রতিনিধি দলে আতাবাক সা'দ-এর কয়েকজন গোলামও ছিল। সুলতান তাদের সবাইকে খেলাত প্রদান করেন এবং ইনাম ও ইকরাম দ্বারা ভূষিত করেন। [২]

হালাকু খানের সেনাপতিকে নিজের সাথে মিলিয়ে নেওয়ার এক অদ্ভুত ঘটনা:

সুলতান বাইবার্স হালাকুর শক্তি কমানোর জন্য নিত্যনতুন কৌশলে সেইসব মুসলিম আমিরদেরও নিজের সাথে মেলাতে শুরু করেন যারা অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাতার সালতানাতের অনুগত হয়ে পড়েছিলেন। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন সেনাপতি শামস উদ্দিন, যিনি আব্বাসী খিলাফতের আমলে কুফার শাসক ছিলেন। হালাকু খান তাকে নিজের দরবারের সাথে যুক্ত করে কিছু ইরাকি শহরের শাসক নিযুক্ত করেছিলেন।

সুলতান বাইবার্স তার যোগ্যতার কথা বিবেচনা করে তাকে গোপন বার্তা পাঠিয়ে মিশরে আসার আমন্ত্রণ জানান, কিন্তু তিনি টালবাহানা করতে থাকেন। একদিন সুলতান তার মজলিসে এক আমির ফিলিজ বাগদাদীকে বললেন: “তোমার বন্ধু সেনাপতি শামস উদ্দিন আমাদের এখানে আসতে চলেছে।” ফিলিজ বললেন: “এটা কীভাবে সম্ভব? তিনি তো ইরাক সরকারের একজন সদস্য। কেন তিনি তা ছেড়ে মিশরে আসবেন!”

সুলতান বললেন: “যদি তিনি স্বেচ্ছায় না আসেন, তবে বাধ্য হয়ে আসবেন।”

এখন সুলতান একটি চিঠি তৈরি করালেন যা এমন ছিল যেন শামস উদ্দিনকে নিজের অনুগত মনে করে তার কোনো চিঠির উত্তর দেওয়া হয়েছে। এই চিঠিটি একজন দূতের হাতে দিয়ে ইরাকে পাঠানো হলো। তার পেছনে একজন গোয়েন্দা পাঠানো হলো যাতে দূত যখন হালাকুর শিবিরের কাছে পৌঁছাবে তখন তাকে হত্যা করা হয়। গোয়েন্দা ঠিক তাই করল। তাতারীরা দূতের লাশের তল্লাশি নিলে শামস উদ্দিনের নামে লেখা চিঠিটি উদ্ধার হয়। এই চিঠি যখন হালাকুর সামনে পেশ করা হলো, তখন রাগে তার অবস্থা খারাপ হয়ে গেল। বাইবার্সের পরিকল্পনা অনুযায়ী সে এটাই ভাবল যে শামস উদ্দিন মিশরের গোয়েন্দা। শামস উদ্দিন তখন শিকারে গিয়েছিলেন। হালাকুর দরবারে তার অনুগতরা উপস্থিত ছিল, তাতারীরা তাকে গ্রেপ্তার করতে পৌঁছানোর আগেই একজন বিশ্বস্ত গোলাম শিকারস্থলে পৌঁছে তাকে এই খবর দিয়ে দিল। শামস উদ্দিন বুঝতে পারলেন যে এখন এখানে থাকা মৃত্যুর সমান। তিনি সবকিছু ছেড়েছুড়ে দ্রুত পালিয়ে সরাসরি মিশরে চলে এলেন।

সুলতান তাকে অনেক সম্মান ও সমাদর করলেন। কিছুদিন পর তিনি আরজ করলেন: “সুলতান যদি সুযোগ দেন তবে আমি ইরাক থেকে আমার সম্পদ মিশরে স্থানান্তরের চেষ্টা করব।” সুলতান বললেন: “আমার তোমার মালের প্রয়োজন নেই, তোমার প্রয়োজন।” এই বলে সিরিয়ার নাবলুস শহরের তদারকি তার হাতে সঁপে দিলেন। [৩]

[১] নিহায়াতুল আরাব: ৩০ / ৯০, তবা দারুল কুতুব কায়রো

[২] নিহায়াতুল আরাব: ৩০ / ৯৯, তবা দারুল কুতুব কায়রো

[৩] নিহায়াতুল আরাব: ৩০ / ৫৩, ৫৫, তবা দারুল কুতুব কায়রো

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

চতুর্থ খণ্ড

বিবাস এবং বারকা খানের সম্পর্ক

সুলতান বিবাসের সবচেয়ে শক্তিশালী মিত্র ছিলেন তাতার জাতির একজন নওমুসলিম শাহজাদা। তিনি ছিলেন খাজারের তাতার রাজ্যের বাদশাহ বারকা খান (বারকাই), যিনি চেঙ্গিস খানের বড় ছেলে জোচির সন্তান ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সালতানাত ককেশাস পর্বতমালা থেকে পূর্ব ইউরোপের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁর আপন চাচাতো ভাই হালাকু খানের সাথে তাঁর মতপার্থক্য তৈরি হয়েছিল, যা ক্রমশ শত্রুতা এবং পরবর্তীতে নিয়মিত যুদ্ধে রূপ নেয়।

বারকা এবং হালাকুর মধ্যে শত্রুতার কারণসমূহ:

বারকা খান এবং হালাকু খানের মধ্যে শত্রুতার বেশ কিছু কারণ ছিল:

- হালাকু খান যেভাবে মুসলমানদের গণহত্যা করেছিলেন, তাতে বারকা খান অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ছিলেন। এছাড়া খলিফা মুসতাসিমের হত্যাকাণ্ডের খবর তাঁর জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক ছিল। এই জুলুম ও অত্যাচারের কারণে তিনি হালাকুর ওপর চরম অসন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি বলতেন: “হালাকু খান মুসলমানদের সমস্ত শহর ধ্বংস করে দিয়েছে এবং সমস্ত মুসলিম বাদশাহদের খতম করে দিয়েছে। সে বন্ধু ও শত্রুর মধ্যে কোনো পার্থক্য করেনি। সে চেঙ্গিসী পরিবারের মুরব্বিদের সাথে পরামর্শ না করেই খলিফাকে হত্যা করেছে। আল্লাহ যদি আমাকে সাহায্য করেন, তবে আমি এই নিরপরাধীদের রক্তের বদলা নেব।” [১]
- বারকা খানের দাবি ছিল যে, মঙ্গোলদের দস্তুর (প্রথা) অনুযায়ী নববিজিত এলাকাগুলোর গনিমতের মালের পাঁচ ভাগের এক ভাগ তাঁকে দেওয়া হোক। হালাকু এই বিষয়ে টালবাহানা করছিল। [২]
- গোল্ডেন হোর্ড (উর্দুয়ে জরিন) থেকে সাহায্যের জন্য আসা বারকা খানের চাচাতো ভাই বালঘান বিন শিবান হালাকু খানের কাছে রহস্যজনকভাবে মারা যান। হালাকু এই হত্যার দায় অন্য এক চাচাতো ভাই তুতরের ওপর চাপিয়ে দেন। বারকা হালাকু খানকে তুতরকে শাস্তি দেওয়ার ইখতিয়ার (ক্ষমতা) দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি আশা করেছিলেন যে হালাকু খান নমনীয়তা প্রদর্শন করবেন। কিন্তু হালাকু তুতরকে হত্যা করেন, যার ফলে বারকা খান অত্যন্ত রাগান্বিত হন। [৩]

[১] জামিউত তাওয়ারিখ (আরবি), রশীদ উদ্দিন ফজলুল্লাহ: খণ্ড ২, অংশ ১, পৃষ্ঠা ৪৩২, ত. দার ইহয়াউল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ, মিসর। আয-যাহাবী বলেন: “তাঁর এবং হালাকুর মধ্যে যুদ্ধ বাধার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল খলিফাকে হত্যা করা।” (তারিখুল ইসলাম, আয-যাহাবী: ৩৯/১৯১, ত. তাদমুরি)।

[২] ইজ্জুদ্দিন মুহাম্মদ বিন শাদ্দাদ বলেন: আলাউদ্দিন আলী বিন আব্দুল্লাহ আল-বাগদাদী আমাকে বলেছেন: “তাতাররা যখন বাগদাদ দখল করে, তখন আমি সেখান থেকে বন্দী হই এবং তাদের সাথে ছিলাম, তাদের সাথে মেলামেশা করতাম এবং তাদের খবরাখবর রাখতাম। যখন ৬৬০ হিজরি সাল এলো, তখন বারকার পক্ষ থেকে দুইজন দূত এলো, যাদের একজনের নাম ছিল বালঘা এবং অন্যজনের নাম খাতার। তাদের কাছে একটি পত্র ছিল যার বিষয়বস্তু ছিল এই যে, বিজিত এলাকাগুলো থেকে যা কিছু বাতুর কাছে পাঠানো হতো, তা পাঠানোর যে দস্তুর ছিল—আর দস্তুর ছিল এই যে, জাইহুন নদী থেকে পশ্চিম দিকে তারা যা কিছু জয় করত এবং শাসন করত, তা পাঁচ ভাগে বিভক্ত হতো: এক ভাগ মহান সম্রাটের জন্য, এক ভাগ সেনাবাহিনীর জন্য এবং এক ভাগ বাতুর জন্য। যখন বাতু মারা গেলেন এবং বারকা সিংহাসনে বসলেন, তখন বাতুর কাছে যা পৌঁছাত তার কিছুই হালাকুর পক্ষ থেকে তাঁর কাছে পৌঁছায়নি, এমনকি সিরিয়া থেকেও কিছুই আসেনি...” (জামিউত তাওয়ারিখ আরবি: খণ্ড ২, অংশ ১, পৃষ্ঠা ৩৩২, ৩৩৩)।

[৩] রওজাতুস সাফা: ৫/৮৯, ত. নওল কিশোর... রশীদ উদ্দিনের মতে, বারকার দুই আত্মীয় “তুতর” এবং “বালঘা”—এর কারণে বাতুর মৃত্যুর পর হালাকুর সাথে সম্পর্ক খারাপ হয়েছিল। তিনি লিখেছেন যে, বারকা তাতারদের রক্তের বদলা নেওয়ার জন্য সৈন্য পাঠিয়েছিলেন। (জামিউত তাওয়ারিখ আরবি: খণ্ড ২, অংশ ১, পৃষ্ঠা ৩৩২, ৩৩৩)। তুতরের মৃত্যু সম্পর্কে তিনি বলেন যে, বালঘান বিন শিবান বিন জোচি হঠাৎ হালাকুর কাছে মারা যান। হালাকু তার ওপর জাদুর মাধ্যমে হত্যার অভিযোগ আনেন। তিনি তুতরকে বারকার কাছে পাঠান। বারকা চেঙ্গিসী ইয়াসা (আইন) অনুযায়ী তাকে পুনরায় হালাকুর কাছে সোপর্দ করেন। হালাকু ৬৫৮ হিজরির সফর মাসে তাকে হত্যা করেন। এটি দেখে তুতরের সৈন্যরা হালাকুর লঙ্কর থেকে পালিয়ে যায় এবং দরবন্দ ও জামিল গিলান হয়ে কিপচাকে চলে যায়। (জামিউত তাওয়ারিখ আরবি: খণ্ড ২, অংশ ১, পৃষ্ঠা ৩১৭, ৩১৮)।

হলাকুর দরবারে কিছু জাদুকর ছিল যারা বিদেশি দূতদের ওপর প্রভাব বিস্তার করত। বারকা খান যখন এটি জানতে পারলেন, তিনি তার দূতদের সাথে কিছু দক্ষ জাদুকরও পাঠালেন যাতে হলাকুর জাদুকরদের প্রভাব নষ্ট করা যায়। হলাকু খান বিষয়টি টের পেয়ে যান। তিনি সেই দক্ষ জাদুকরদের হত্যা করান। [১] এরপর বারকার দূতদেরও মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেন। [২]

পরবর্তীতে হলাকু বিষয়টি মিটমাট করার জন্য কিছু দূতকে উপহারসহ বারকা খানের কাছে পাঠান, কিন্তু তিনি উপহার প্রত্যাখ্যান করেন এবং দূতদের হত্যা করেন। [৩] এটি ছিল হলাকুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রকাশ্য ঘোষণা।

বারকা খান ও হলাকু খানের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধসমূহ:

শাওয়াল ৬৬০ হিজরি (সেপ্টেম্বর ১২৬২ খ্রিষ্টাব্দ)-এ হলাকু সিরিয়া ও মিশরের ওপর পুনরায় আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন যে সময় বারকা খানের বাহিনী ককেশাস (কাফকাজ)-এর গিরিপথ দিয়ে আবির্ভূত হয়। এটি দেখে হলাকু সিরিয়া অভিযান স্থগিত করে কাস্পিয়ান সাগরের (বাহিরে খজর) দিকে সৈন্য পাঠান। এই বাহিনী তেরেক নদী পার হয়ে বারকার বাহিনীকে সাময়িকভাবে পিছু হটতে বাধ্য করে, কিন্তু বারকার ভাতিজা নোগাই অবিলম্বে পাল্টা আক্রমণ করেন যাতে হলাকুর বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে তেরেক নদী পর্যন্ত পিছু হটে আসে। সেই সময় শীতকাল ছিল এবং নদী প্রচণ্ড ঠান্ডায় জমে গিয়েছিল। বাহিনীর ভারে বরফ ভেঙে যায় এবং ইলখানি তাতারদের এক বিশাল অংশ ডুবে মারা যায়। হলাকু খানের এক ছেলেও নিহত হয় এবং তিনি নিজে পিছু হটে আজারবাইজানের একটি দ্বীপে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। বারকা খানের বাহিনীও গভীর ক্ষত সহ্য করেছিল। নোগাইয়ের একটি চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। মোদাকথা, এই যুদ্ধ ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। [৪]

হলাকুর পলায়নের পর বারকা খান যুদ্ধক্ষেত্রে লাশের স্তুপ দেখে অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়েন। তার মুখ থেকে বের হয়: “আমার জন্য এটি অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে মঙ্গোলরা একে অপরের তলোয়ারে প্রাণ দিচ্ছে, কিন্তু সেই ব্যক্তির সাথে কী করা যায় যে চেঙ্গিস খানের নিয়ম-নীতি (ইয়াসা) পরিবর্তন করে দিয়েছে।” [৫]

এরপর হলাকুর ইলখানি এবং বারকার গোল্ডেন হোর্ড (জররিন খিল) সালতানাতগুলোর মধ্যে সংঘর্ষের পরিধি পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। হলাকু জর্জিয়া ও আর্মেনিয়ার খ্রিস্টান মিত্রদের সাথে নিয়ে গোল্ডেন হোর্ডের সীমান্তে আক্রমণ শুরু করেন। জবাবে বারকা কেবল রুশদেরই নিজের বাহিনীতে নিয়োগ করেননি, বরং রাশিয়ার পথ দিয়ে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করেন। সমরকন্দ ও বুখারার মুসলমান...

[১] যখন বারকা তার দূতদের পাঠালেন, তখন তাদের সাথে জাদুকরদেরও পাঠালেন যাতে তারা হলাকুর জাদুকরদের নষ্ট করতে পারে। হলাকুর কাছে ‘তাকনা’ নামক এক জাদুকর ছিল। বারকা তার সাথে উপহারও পাঠিয়েছিলেন। যখন দূতরা হলাকুর কাছে পৌঁছাল, তখন তাদের সাথে থাকা ‘কমশতা’ নামক এক জাদুকরী তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে হলাকুকে জানিয়ে দেয়। ফলে তিনি তাদের বন্দি করেন এবং কেল্লায় আটকে রাখেন। পনেরো দিন পর তাদের হত্যা করা হয়। (জায়ল মিরআতুয যামান: ১/১২১, ১২২, ত. কায়রো)

[২] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৭/৪৩৯

[৩] তবাকাত-ই-নাসিরি, কাজী মিনহাজুস সিরাজ জুযজানি: ২/১৯৮, ত. কাবুল

[৪] নেহায়াতুল আরাব লিন-নুওয়াইরি: ২৭/৩২০, ত. দারুল কুতুব, কায়রো; March of The Barbarians, by Harold Lamb: p: 229, 230. আল্লামা নুওয়াইরি এই যুদ্ধের সাল ৬৫৩ হিজরি উল্লেখ করেছেন যা সমস্ত ঐতিহাসিকদের মতের পরিপন্থী। পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে জানা গেছে যে, বাগদাদ পতনের সময় হলাকুর সাহায্যে বারকার সৈন্যরাও শরিক ছিল এবং তখন পর্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল।

[৫] জায়ল মিরআতুয যামান লিল-ইউনিনি: ২/১৬৭, ত. দারুল কিতাব আল-ইসলামি কায়রো। এর দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, বারকা খান ইসলাম গ্রহণ করা সত্ত্বেও ফেডারেশনের বিষয়ে ‘ইয়াসা’র অনুসারী ছিলেন এবং হলাকুর জুলুম যা প্রকৃতপক্ষে ‘ইয়াসা’র সীমা লঙ্ঘন ছিল, তাই বারকা খানকে যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছিল।

দলে দলে তার বাহিনীতে যোগ দিতে লাগল। কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে এই দুই সাম্রাজ্যের মধ্যে ক্রমাগত সংঘর্ষ চলতে থাকে। বারকা খানের সৈন্যরা ঈমান ও দৃঢ় বিশ্বাসে পরিপূর্ণ ছিল, যেখানে হলাকু খানের বাহিনীর সামনে রক্তপাত ছাড়া আর কোনো লক্ষ্য ছিল না। তার সৈন্যরা মনোবল হারিয়ে ছত্রভঙ্গ হতে শুরু করে। অনেকেই সুলতান বাইবার্সের তলোয়ারের ভয়ে ভীত ছিল এবং অনেকে বারকা খানের ইসলাম গ্রহণের পর তাওহীদের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছিল। [১]

হলাকু খানকে পরাজিত করার পর বারকা খানের শক্তি অনেক বৃদ্ধি পায়। তিনি কনস্টান্টিনোপলের আশেপাশেও গেরিলা বাহিনী পাঠান। এটি দেখে কায়সার তার সাথে সন্ধি করেন এবং মূল্যবান উপহার পাঠিয়ে নিজের দেশ রক্ষা করেন। [২]

নওমুসলিম তাতারীদের মিশরে আগমন এবং স্থায়ী বসবাস:

তাতারীরা এখন দুটি স্পষ্ট দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল: ইসলাম বিদ্রোহী এবং ইসলাম বন্ধু। ইসলাম বন্ধু তাতারীরা নিজেদের বারকা খানের সাথে সম্পৃক্ত করত। হলাকু খানের বাহিনীতে বারকা খানের সেই সৈন্যরা উপস্থিত ছিল যাদের পাঁচ বছর আগে ইরাক অভিযানে সাহায্যের জন্য পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু যখন বারকা খান এবং হলাকু খানের মধ্যে শত্রুতার আগুন জ্বলে উঠল, তখন বারকা খান তার সেই সৈন্যদের লিখে পাঠালেন যে, যদি তাদের উর্দুয়ে জরিন-এ ফিরে যেতে সমস্যা হয় তবে তারা যেন মিশরে স্থানান্তরিত হয়।

ফলে প্রথম পর্যায়ে চারজন সরদারের অধীনে দুইশ অশ্বারোহী তাদের পরিবার-পরিজনসহ মিশরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। তারা সিরিয়ায় পৌঁছে স্থানীয় গভর্নরকে জানায় যে, তাদের মনিব এবং হলাকু খানের মধ্যে শত্রুতা তৈরি হয়েছে এবং যুদ্ধে হলাকু খানের ছেলে নিহত হয়েছে। এখন তারা তাদের মনিবের নির্দেশ অনুযায়ী হলাকু খানের সঙ্গ ত্যাগ করেছে এবং মিশরে আশ্রয় নিতে চায়। স্থানীয় গভর্নর সুলতানকে অবহিত করেন। সুলতান নির্দেশ পাঠান যে, এই তাতারীদের যেন পূর্ণ মেহমানদারি ও আপ্যায়ন করা হয় এবং সফরের রসদ দিয়ে মিশরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অবশেষে ২৬ জিলহজ ৬৬০ হিজরিতে তাতারীদের এই দলটি মিশরে পৌঁছে যায়।

সুলতান বাইবার্স নিজে বাইরে এসে তাদের অভ্যর্থনা জানান। শহরের প্রায় সমস্ত অধিবাসী এই দৃশ্য দেখার জন্য বেরিয়ে আসে কারণ ইতিহাসে এটিই ছিল প্রথম ঘটনা যে তাতারীরা কারো কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করেছে। অন্যথায় এর আগে তাদের মধ্যে এমন কোনো উদাহরণ ছিল না। তারা কেবল মারতে বা মরতে জানত। সুলতান তাদের বিশাল ভোজের আয়োজন করেন। তাদের এবং তাদের নারীদের খেলাত প্রদান করেন, পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত করেন, বাসস্থান এবং সওয়ারি সরবরাহ করেন। শীঘ্রই এই তাতারীরা ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেয়। যখন এই উত্তম আচরণের খবর বাকি তাতারীদের কাছে পৌঁছাল, তখন তাদের দলগুলো দলে দলে মিশরের দিকে রওনা হতে লাগল। সুলতান তাদের সবার সাথে সর্বোত্তম আচরণ করেন এবং তাদের মিশরে বসবাসের জন্য সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন। [৩]

এই তাতারীদের ইসলাম গ্রহণের কিছুদিন পর ৮ মহরম ৬৬১ হিজরিতে নতুন খলিফা হাকিমের বায়াত অনুষ্ঠিত হয় যার...

[১] March of The Barbarians, by Harold Lamb: p: 230

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৭/২৪৯, ত. দার হিজর

[৩] আস-সুলুক লি-মা'রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ১/৫৩৩, ৫৩৫, ত. আল-ইলমিয়াহ; নিহায়াতুল আরাব লিন-নুওয়াইরি: ৩০/৬৩, ৬৪, ত. দারুল কুতুব ওয়াল ওয়াসায়িক কায়রো

বিস্তারিত পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। বায়আত অনুষ্ঠানে এই নওমুসলিম তাতারীদেরও শরিক করা হয়েছিল। [১]

হারামাইন শরীফাইনের ইমামদের নিকট বারকা খানের জন্য দোয়ার বার্তা পাঠানো হয়েছিল। ফরমান জারি করা হয়েছিল যে, জুমার খুতবায় খলিফা এবং সুলতান বিবারসের পর বারকা খানের জন্য দোয়া করা হয়। [২]

শরণার্থী তাতারীদের আগমনের ধারা বাড়তে থাকে। ৬৬১ হিজরির রজব মাসের শেষ দিকে তাদের বেশ কিছু দল মিশরে পৌঁছায়। [৩] এরপর ৬৬১ হিজরির জিলহজ মাসের শুরুতে একের পর এক তাদের তিনটি দল আসে। প্রথম দলটি ১৩০ জন ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত ছিল যাদের মধ্যে প্রখ্যাত তাতার সরদারগণ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সুলতান তাদের সকলের সাথে দয়া ও অনুগ্রহের আচরণ করেন এবং তাদের জন্য ঘরবাড়ি তৈরি করে কায়রোতে পুনর্বাসন করেন। সুলতানের উৎসাহে তারা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ইসলামী রীতিনীতি গ্রহণ করে নেন। [৪]

বারকা খানের প্রতি সুলতান বিবারসের প্রথম দূতাবাস:

হালাকু খানের বিরোধিতার কারণে সুলতান বিবারস এবং বারকা খান প্রাকৃতিকভাবে একতাবদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন যাতে ধর্মীয় ঐক্য ছিল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। উভয়ের মধ্যে পত্রালাপ শুরু হয়ে গিয়েছিল। সুলতান বিবারসের পক্ষ থেকে বারকা খানের নামে প্রথম পত্র ৬৫৯ হিজরিতে পাঠানো হয়েছিল যাতে হালাকু খানের বিরুদ্ধে ঐক্যের দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল। [৫]

এরপর ৬৬১ হিজরির মহররম মাসে খলিফা হাকিমের বায়আত গ্রহণ করা হলে এ বিষয়েও বারকা খানকে একটি অবহিতকরণ পত্র পাঠানো হয়। [৬]

বায়আতের পর সেই মজলিসেই সুলতান বিবারস খলিফা হাকিমের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেন যে, বারকা খানের নামে একটি নিয়মিত কূটনৈতিক প্রতিনিধি দল পাঠানো উচিত। [৭]

ফলে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয় এবং সেই মাসেই (মহররম ৬৬১ হিজরিতে) দূতাবাস রওনা করে দেওয়া হয়। কূটনৈতিক প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বের জন্য দুইজন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হয়েছিল: একজন কাজী মাজদুদ্দিন রহ. যিনি একজন অত্যন্ত প্রখ্যাত ফকিহ ছিলেন। [৮] দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন সাইফুদ্দিন গুশতাক যিনি সুলতান জালালুদ্দিন খাওয়ারিজম শাহের জামাদার ছিলেন এবং এই সফরে আসা শহরগুলো ও প্রয়োজনীয় ভাষাগুলো জানতেন। [৯]

এছাড়া ইরাক থেকে আসা সেই তাতারীরা যারা মূলত উর্দুয়ে জরিন-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাদেরও সাথে দেওয়া হয়েছিল।

[১] জাইল মিরআতুজ জামান: ২/১৮৬, ত. দারুল কিতাব আল-ইসলামী; আস-সুলুক লি-মা'রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ১/৫৩৭, ত. আল-ইলমিয়্যাহ।

[২] আস-সুলুক লি-মা'রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ১/৫৫৮, ত. আল-ইলমিয়্যাহ।

[৩] জাইল মিরআতুজ জামান: ২/১৯৫, ত. দারুল কিতাব আল-ইসলামী।

[৪] আস-সুলুক লি-মা'রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ১/৫৬১, ত. আল-ইলমিয়্যাহ; নিহায়াতুল আরাব লিন-নুওয়াইরি: ৩০/৮৯-৯০, ত. কায়রো, আল্লামা নুওয়াইরি এই তাতার আমিরদের নামও উল্লেখ করেছেন।

[৫] আস-সুলুক লি-মা'রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ১/৫৩৯, ত. আল-ইলমিয়্যাহ, তবে অন্য কোনো ইতিহাসবিদের কাছ থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়নি।

[৬] জাইল মিরআতুজ জামান: ২/১৯০, ত. দারুল কিতাব আল-ইসলামী।

[৭] আস-সুলুক লি-মা'রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ১/৫৩৭, ত. আল-ইলমিয়্যাহ।

[৮] আস-সুলুক লি-মা'রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ১/৫৩৯, ত. আল-ইলমিয়্যাহ।

[৯] নিহায়াতুল আরাব লিন-নুওয়াইরি: ৩০/২৩, ত. দারুল কুতুব ওয়াল ওয়াসাইক কায়রো... জামাদার: সেই অফিসার যে বাদশাহর পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থাপক।

যাতে তারা নির্দেশনার দায়িত্ব পালন করতে পারেন। সুলতান এই কূটনৈতিক প্রতিনিধি দলকে কয়েক মাসের পাথেয় এবং সম্ভাব্য সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেছিলেন। [১]

প্রতিনিধি দলের মাধ্যমে বারকা খানের জন্য পাঠানো উপহার সামগ্রীর মধ্যে ছিল জায়নামাজ, উন্নত মানের চাদর, সোনা ও রূপা খচিত মোমদানি, ঝাড়বাতি ও প্রদীপ, খোয়ারিজমে তৈরি ঘোড়ার জিন ও লাগাম, ধনুক, বল্লম, তীর, সর্বোত্তম তলোয়ার, মূল্যবান শিরস্ত্রাণ, হাবশি গোলাম এবং রান্নায় পারদর্শী বাবুর্চিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। [২]

সুলতান বারকা খানের কাছে পাঠানো পত্রে জানিয়েছিলেন যে, মিশরের সালতানাত অত্যন্ত শক্তিশালী এবং এর বিশাল বাহিনী তাতারীদের পরাজিত করেছে। সুলতান হালাকু খানের বিরুদ্ধে জিহাদে বারকা খানকে নিজের মিত্র হিসেবে ঘোষণা করেন এবং বারকাকে জিহাদে লিপ্ত থাকার উৎসাহ প্রদান করে এই দায়িত্ব পালনে অবহেলা করাকে বিপজ্জনক বলে অভিহিত করেন। মিশরে আসা তাতারীদের সম্পর্কে সুলতান লিখেছিলেন: “আপনার সম্মানার্থে আমরা তাদের আতিথেয়তা করেছি।” [৩]

বারকার প্রথম দূতাবাস:

৬৬১ হিজরিতে পরিস্থিতি এমন দাঁড়াল যে, একই সময়ে একদিকে মিশরের সুলতানের দূতগণ গোন্ডেন হোর্ড (সিলসিলায়ে জাররিন খিল) সাম্রাজ্যের দিকে যাচ্ছিলেন এবং অন্যদিকে বারকা খানের দূতগণ মিশরে আসছিলেন। ঘটনাটি ছিল এই যে, মিশরের সুলতানের বীরত্বের খ্যাতি বারকা খানের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল এবং তিনি তার সাথে মিত্রতা করে হালাকু খানের অধ্যায় শেষ করতে চেয়েছিলেন। ফলে মিশরের এই দূতাবাস রওনা হওয়ার কয়েক মাস আগেই বারকা খান মিশরের উদ্দেশ্যে একটি কূটনৈতিক প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিলেন, যার নেতৃত্বে ছিলেন জালালুদ্দিন বিন কাজি এবং শেখ নুরগদ্দিন আলী নামক দুই বিশিষ্ট ব্যক্তি। এই প্রতিনিধি দলের কাছে সুলতান বাইবার্সের নামে বারকা খানের একটি পত্র ছিল যা ১লা রজব ৬৬০ হিজরিতে লেখা হয়েছিল। এই পত্রে বারকা খান নিজের এবং তার জাতির ইসলাম গ্রহণের কথা উল্লেখ করে সুলতানকে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং সামরিক জোটের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। [৪] এই বার্তা নিয়ে বারকা খানের দূত নুরগদ্দিন আলী এবং জালালুদ্দিন কাজি ১১ই রজব ৬৬১ হিজরিতে সুলতান বাইবার্সের...

[১] আস-সুলুক লি-মা’রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ১/ ৫৩৯; নিহায়াতুল আরাব লিন-নুওয়াইরি: ৩০/ ৬৩, তবা দারুল কুতুব ওয়াল ওয়াসায়িক কায়রো।

[২] নিহায়াতুল আরাব লিন-নুওয়াইরি: ২৭/ ৩৬০, তবা দারুল কুতুব, কায়রো।

[৩] নিহায়াতুল আরাব লিন-নুওয়াইরি: ৩০/ ৬৫, কায়রো; আস-সুলুক লি-মা’রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ১/ ৫৩৯।

[৪] আস-সুলুক লি-মা’রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক লিল-মাকরিজি: ১/ ৫৫৮, তবা আল-ইলমিয়াহ।

নোট (১): এখানে মাকরিজি পত্রটি লেখার তারিখ ১লা রজব ৬৬১ হিজরি লিখেছেন এবং তারপর পত্রবাহকের মিশরের দরবারে উপস্থিত হওয়ার ঘটনাও ৬৬১ হিজরির ঘটনাবলীতে উল্লেখ করেছেন। অথচ এটা অসম্ভব ছিল যে, রজব ৬৬১ হিজরিতে লেখা চিঠি কিপচাক থেকে একই বছর মিশরে পৌঁছে যাবে। এই দীর্ঘ দূরত্ব ডাকের জন্য চার-পাঁচ মাসের পথ ছিল, যেখানে কূটনৈতিক প্রতিনিধি দলের জন্য এটি ছিল এক বছরের সফর। সুতরাং এখানে লেখকের ভুল (সহবে কতিব) স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে, তাই আমরা এই তারিখ ১লা রজব ৬৬০ হিজরি লিখেছি। কুতুবুদ্দিন ইউনি নি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, এই দূতগণ ১১ই রজব ৬৬১ হিজরিতে মিশরের দরবারে উপস্থিত হয়েছিলেন। (যাইল মিরআতুয যামান: ২/ ১৯৪, ১৯৫) তাই পত্রটি লেখার বছর ৬৬০ হিজরিই হতে পারে।

নোট (২): এখানে বর্ণনায় একটি বাক্য আছে: “ويخبرون بإسلامه وإسلام قومه” (এবং তারা তার ও তার কওমের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ দিচ্ছিল)। কিছু ঐতিহাসিক যেমন আর্নল্ডের মনে এই বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে যে, বারকা খান সম্ভবত ওই দিনগুলোতেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, যা সম্পূর্ণ ভুল। বাস্তবতা হলো, বারকা খান এবং তার সেনাবাহিনীতে ইসলামের প্রচার এর প্রায় ত্রিশ বছর আগেই শুরু হয়েছিল, যেমনটি বারকা খানের সমসাময়িক কাজি মিনহাজুস সিরাজ বর্ণনা করেছেন। (তাবাকাতে নাসিরি: ২/ ২১৪) তবে সম্ভবত ওই যুগে এই লোকেরা তাদের ইসলাম গ্রহণের কথা খুব একটা প্রকাশ করত না, তাই সাধারণ বিশ্বের কাছে বারকা খান এবং তার আমিরদের মুসলমান হওয়ার খবর ছিল না। এটাও সম্ভব যে, যেহেতু তারা ইসলাম গ্রহণের পরেও “চেঙ্গিসী ইয়াসা” (চেঙ্গিস খানের আইন) মেনে চলত এবং তাদের অনেক আচার-আচরণ কাফেরদের মতোই ছিল, তাই সাধারণ মুসলিম বিশ্ব তাদের মুসলমান হিসেবে গণ্য করার ব্যাপারে সন্দেহ ও সংশয়ে ছিল। ফলে ক্ষমতা গ্রহণের পর বারকা খানকে এই স্পষ্টীকরণ করতে হয়েছিল যে আমরা মুসলমান এবং মিশরে দূতাবাস পাঠানোর একটি উদ্দেশ্য ছিল এই সংবাদটি পৌঁছে দেওয়া।

খিদমতে পৌঁছে নিজের বাদশাহর পত্র পেশ করলেন। বারকা খান লিখেছিলেন:

“আসসালামু আলাইকুম! আল্লাহর শুকর ওয়াজিব। আমরা আপনার কাছে হালাকু খানের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করছি যে চেঙ্গিজী দস্তুর ‘ইয়াসা’ এর বিরোধিতা করেছে। মানুষের প্রাণের যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তা তারই অবাধ্যতার কারণে ছিল। নিঃসন্দেহে আমি এবং আমার চার ভাই মর্যাদার খাতিরে (কাফেরদের সাথে) যুদ্ধ শুরু করেছি যাতে ইসলামের মিনারকে সুদৃঢ় করা যায়। অনুরোধ এই যে, ফোরাত নদীর দিকে একটি সেনাবাহিনী পাঠানো হোক যাতে হালাকু খানের পথ রোধ করা যায়।” [১]

সুলতান এই দূতদের অত্যন্ত সম্মান ও সমাদর করলেন। জুমার দিন এই দূতগণ জামে মসজিদে উপস্থিত হলে খলিফা আল-হাকিম খুতবায় বারকা খানের জন্যও দোয়া করেন। [২]

সুলতান বাইবার্সের দ্বিতীয় দূতাবাস:

সুলতান এই দূতদের মূল্যবান পুরস্কারে ভূষিত করেছিলেন। এই প্রতিনিধি দলের মিসর থেকে উর্দু-এ-জাররিন (গোল্ডেন হোর্ড)-এর উদ্দেশ্যে যাত্রা ১৭ রমজান ৬৬১ হিজরিতে হয়েছিল। সুলতান বারকা খানের জন্য কিছু অসাধারণ উপহারও পাঠিয়েছিলেন যার মধ্যে পবিত্র কুরআনের এমন একটি পাণ্ডুলিপিও ছিল যা হযরত উসমান বিন আফফান (রা.) লিখিয়েছিলেন। অন্যান্য উপহারের মধ্যে ছিল জিরাফ, আরবি ঘোড়া, মিসরীয় গাধা, নীলগাই, বানর, রূপার মশাল, রূপার মোমদানি, মিসরীয় কারখানায় তৈরি কাপড়ের থান, চিনি এবং বিভিন্ন ধরনের জিনিস। [৩]

সুলতান এই প্রতিনিধি দলে নিজের দুই দূত: ইমাদউদ্দিন আব্বাসী এবং ফারিসউদ্দিন মাসউদীকেও অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন যাদের কাছে সুলতানের পত্র ছিল যাতে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার সাথে একমত পোষণ করে এই কথা স্বীকার করা হয়েছিল যে উভয় সালতানাতকে হালাকু খানের বিরুদ্ধে পারস্পরিক সহযোগিতা করতে হবে। সেই সাথে এই শর্ত আরোপ করা হয়েছিল যে হালাকু থেকে উদ্ধারকৃত এলাকার মধ্যে সিরিয়ার নিকটবর্তী জেলাগুলো মিসর সালতানাতের অংশ হিসেবে গণ্য হবে। [৪]

বারকার দরবারে সুলতানের প্রথম দূতাবাস:

ওদিকে মহররম ৬৬১ হিজরিতে রওনা হওয়া মিসরীয় প্রতিনিধি দল আলেকজান্দ্রিয়া থেকে সমুদ্রগামী জাহাজে চড়ে কয়েক সপ্তাহ পর বাইজেন্টাইনদের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল পৌঁছে গিয়েছিল। সেখানে তাদের সাথে বারকা খানের একটি প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ হয় যারা কায়সার-এ-রুমের সাথে আলোচনার জন্য এসেছিল। এই প্রতিনিধি দলকে অবিলম্বে উর্দু-এ-জাররিন সালতানাতে ফিরে যেতে হতো। সুলতান বাইবার্সের কূটনৈতিক প্রতিনিধি দলে কাজী মহিউদ্দিন (রহ.) অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তাই তিনি মিসরে ফিরে যান। অন্যদিকে বাকি দূতগণ বারকা খানের এই প্রতিনিধি দলের সাথে উর্দু-এ-জাররিন সালতানাতে চলে যান। [৫]

[১] যাইল মিরাত আল-জামান: ২/১৯৩, ত. দার আল-কিতাব আল-ইসলামি।

[২] নিহায়াত আল-আরব লিন-নুওয়াইরি: ৩০/৮৭, ত. দার আল-কুতুব, কায়রো।

[৩] যাইল মিরাত আল-জামান: ২/১৯১। লেখক এই জুমার নামাজের তারিখ ১৮ শাবান বলেছেন, এর অর্থ হলো প্রতিনিধি দল এক মাসেরও বেশি সময় মিসরে অবস্থান করেছিল।

[৪] নিহায়াত আল-আরব লিন-নুওয়াইরি: ৩০/৮৭, ৮৮, ত. দার আল-কুতুব, কায়রো; যাইল মিরাত আল-জামান: ২/১৯৭, ত. দার আল-কিতাব আল-ইসলামি।

[৫] যাইল মিরাত আল-জামান: ২/১৯৭, ত. দার আল-কিতাব আল-ইসলামি।

রওনা হয়ে গেলেন। [১] এই কাফেলা কৃষ্ণসাগর অতিক্রম করল। উপকূলে তারা কিপচাক, রুশ এবং আলানি বংশোদ্ভূত লোকদের দেখা পেল। এটি ছিল এক নতুন জগত। প্রতিনিধি দলটি একটি মরুভূমিতে প্রবেশ করল যেখানে স্থানে স্থানে সৈন্যদের এবং গনিমতের মালে পরিপূর্ণ তাঁবু দেখা যাচ্ছিল। তিন সপ্তাহ পর যখন এই মরুভূমি শেষ হলো, তখন একটি হ্রদের তীরে বারকা খানের তাঁবু দেখা গেল।

সুলতানের প্রতিনিধি দল আদব রক্ষা করে নওমুসলিম থাকানের দরবারে উপস্থিত হলো। বারকা খান সাদা পোশাক পরিহিত অবস্থায় রত্নখচিত চন্দন কাঠের সিংহাসনে বসে ছিলেন। তাঁর উভয় পাশে চেয়ারগুলোতে প্রায় ষাটজন সর্দার উপবিষ্ট ছিলেন। [২]

মিসর দরবারে বারকা খানের দ্বিতীয় দূতাবাস:

বারকা খান এবং তাঁর আমিরগণ সুলতানের পত্র শুনে খুশি হলেন এবং ইতিবাচক উত্তরসহ নিজেদের একটি কূটনৈতিক প্রতিনিধি দল পাঠালেন যা ষিলকদ ৬৬২ হিজরিতে কায়রোতে পৌঁছাল। এভাবে বাইবার্স মঙ্গোলদের মিত্র বানানোর ক্ষেত্রে প্রত্যাশা অনুযায়ী সফলতা লাভ করলেন। [৩]

বারকা খান তাঁর এই পত্রে লিখেছিলেন:

“আপনি জানেন যে দ্বীন ইসলামের প্রতি আমার কতটুকু ভালোবাসা রয়েছে। আপনি এটিও জানেন যে হালাকু খান মুসলমানদের ওপর কী ধরনের জুলুম চালিয়েছে। সে মুসলমানদের শহরগুলো দখল করে রেখেছে। আমার অভিমত হলো, আপনি আপনার দিক থেকে তার ওপর আক্রমণ করুন এবং আমি আমার দিক থেকে হামলা করি। এই যুদ্ধ ততক্ষণ পর্যন্ত জারি থাকবে যতক্ষণ না আমরা তাকে খতম করে দিই অথবা অধিকৃত এলাকাগুলো থেকে তাকে বের করে দিই। আর যাই হোক, হালাকুর কাছ থেকে যেসব এলাকা মুক্ত করা হবে, সেগুলো আমি আপনার কাছেই পেশ করব।”

সুলতান বারকা খানকে ধন্যবাদ জানালেন এবং এই মতের সাথে একমত পোষণ করে দূতদের খেলাত প্রদান করলেন। [৪]

বারকার নিকট সুলতানের দ্বিতীয় দূতাবাস এবং কায়সারে রুমের ষড়যন্ত্র:

এই সময়ে সুলতানের সেই প্রতিনিধি দল যারা রমজান ৬৬১ হিজরিতে রওনা হয়েছিল, তারা কনস্টান্টিনোপলে গিয়ে আটকে গিয়েছিল। ঘটনাটি ছিল এমন যে, কায়সার ব্যাসিলিয়াস সেই দিনগুলোতে ফ্রাঙ্কদের সাথে যুদ্ধের জন্য রাজধানী থেকে দূরে একটি রণাঙ্গনে গিয়েছিলেন। তিনি হালাকু খানের সাথে মিত্রতামূলক সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। সুলতানের প্রতিনিধি দলের বারবার কনস্টান্টিনোপল হয়ে বারকা খানের কাছে যাওয়া হালাকু খানকে বাইজেন্টাইন রোম সম্পর্কে সন্দিহান করে তুলতে পারত। অধিকন্তু, সেই দিনগুলোতে হালাকু খানের কিছু দূত কনস্টান্টিনোপলে ছিল। সম্ভবত তারা কায়সারের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিল। যা-ই হোক, কায়সার মিসরীয় প্রতিনিধি দলকে এই বলে আটকে দিলেন যে, তিনি তাদের সাক্ষাতের সুযোগ দিতে চান। ফলে মিসরীয় প্রতিনিধি দল দশ দিনের সফর করে কায়সারের সীমান্তবর্তী দুর্গ “আকশাস”-এ পৌঁছাল। সাক্ষাতের পর কায়সার তাদের বললেন যে, তারা যেন কনস্টান্টিনোপলে গিয়ে অবস্থান করে, তিনি রণাঙ্গন থেকে অবসর হয়ে তাদের পরবর্তী সফরের সমস্ত ব্যবস্থা করে দেবেন।

[১] আস-সুলুক লি-মা'রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ১/৫৫৮, ত. ইলমিয়াহ

[২] নিহায়াতুল আরাব লিন-নুওয়াইরি: ৩০/১০৫, ১০৬, ত. দারুল কুতুব, কায়রো

[৩] নিহায়াতুল আরাব লিন-নুওয়াইরি: ৩০/১০৬; আস-সুলুক লি-মা'রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ৩/১১, ত. ইলমিয়াহ

[৪] হাইল মিরআতুয যামান: ২/১৯৪, ১৯৫, ত. দারুল কিতাবিল ইসলামি; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৬৬১ হিজরি

তারিখ উন্মতে মুসলিমা — চতুর্থ খণ্ড

সুলতানের প্রতিনিধিদল পুনরায় কনস্টান্টিনোপলে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। অবশেষে তারা কায়সারের কাছে অনুরোধ করল যে, তিনি যদি তাদের সফরের ব্যবস্থা করতে না পারেন তবে যেন তাদের ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেন। কায়সার তাদের মধ্য থেকে ইমাদউদ্দিন আব্বাসীকে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিলেন এবং ফারিসউদ্দিনকে আরও অপেক্ষা করতে বললেন। কায়সারের অজুহাত ছিল এই যে, সফরের জন্য এটি এখন উপযুক্ত সময় নয়, কারণ এশিয়া মাইনরের সেলজুক শাসক যখনই খবর পাবেন যে একটি মিশরীয় প্রতিনিধিদল কনস্টান্টিনোপল হয়ে বারকা খানের কাছে যাচ্ছে, তখন তিনি মনে করবেন যে রোমান ও হালাকু খানের মধ্যে সন্ধি হয়ে গেছে, তাই তিনি সাহসী হয়ে বাইজেন্টাইন সীমান্তে আক্রমণ করবেন। যাই হোক, এসবই ছিল অজুহাত। প্রকৃতপক্ষে কায়সার হালাকু খানকে সন্তুষ্ট করার জন্য সুলতানের এই প্রতিনিধিদলকে আটকে রেখেছিলেন যাতে বারকা খানের কাছে পাঠানো বার্তাগুলো বিলম্বিত হয় এবং তাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। এমনটাই হলো। এক বছর কেটে গেল এবং এই প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে সুলতান বিবাসের দেওয়া মূল্যবান পশুগুলো মারা গেল। [১]

সুলতান বিবাসের কায়সারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা:

৬৬২ হিজরির রমজান মাসের মাঝামাঝি সময়ে সুলতান জানতে পারলেন যে, কায়সারের চক্রান্তের কারণে কনস্টান্টিনোপলে রাষ্ট্রদূতের তত্ত্বাবধানে থাকা পশুগুলো মারা গেছে। সুলতান অবিলম্বে কায়রোর পাদ্রি ও সন্ন্যাসীদের তলব করলেন। তাদের সামনে মিশরের সালতানাতের সাথে কায়সারের চুক্তির দলিল পেশ করা হলো, যাতে যাতায়াতের পূর্ণ সুযোগ-সুবিধার প্রতিশ্রুতি ছিল। সুলতান বললেন: “কায়সার আমার রাষ্ট্রদূতদের আটকে রেখেছেন এবং হালাকু খানের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন।” সুলতান পাদ্রিদের জিজ্ঞেস করলেন: “এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণে মসীহ-এর ধর্ম অনুযায়ী কায়সারের ওপর কী বিধান প্রযোজ্য হবে?” সবাই বলল: “সে মসীহ-এর ধর্ম থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে।” সুলতান একজন গ্রীক পাদ্রিকে, যিনি একজন দার্শনিকও ছিলেন, কায়সারের কাছে একটি তিরস্কারমূলক বার্তাসহ পাঠিয়ে দিলেন। [২]

সুলতানের রাষ্ট্রদূতের বারকা খানের দরবারে উপস্থিতি ও প্রত্যাবর্তন:

ইতিমধ্যে বারকা খান কায়সারের এই কর্মকাণ্ড এবং তার পাঠানো মঙ্গোলদের কথা শুনে কায়সারের সীমান্তে আক্রমণ করলেন। কায়সার অবিলম্বে বন্দী মিশরীয় রাষ্ট্রদূত ফারিসউদ্দিনকে মুক্তি দিলেন এবং তাকে মঙ্গোল সেনাপতির কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ফারিসউদ্দিন কায়সারের ইচ্ছা অনুযায়ী মঙ্গোল সেনাপতিকে বললেন: “বাইজেন্টাইন এলাকা সুলতান বিবাসের মিত্রদের অন্তর্ভুক্ত, অতএব বারকা খানের মিত্র হওয়ার কারণে কায়সারের প্রতি সদয় হওয়া উচিত।” মঙ্গোল সেনাপতি তাকে বললেন: “আমাকে এটি লিখিতভাবে দাও।” ফারিসউদ্দিন কায়সারের চাপে এতটাই ছিলেন যে তিনি এটি লিখে দিলেন এবং সাথে ইহাও যোগ করলেন যে আমি নিজের ইচ্ছায় কায়সারের কাছে অবস্থান করছি। মঙ্গোল বাহিনী আক্রমণ থেকে বিরত হয়ে ফিরে গেল। এখন কায়সার ফারিসউদ্দিনকে বারকা খানের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন এবং নিজের একজন রাষ্ট্রদূতকেও সাথে পাঠালেন যার মাধ্যমে বারকা খান ও কায়সারের মধ্যে একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। বারকা খান যখন সুলতানের রাষ্ট্রদূতের কাছে এত দীর্ঘ বিলম্বের কারণ জানতে চাইলেন, তখন তিনি বললেন: “কায়সার আমাকে আটকে রেখেছিলেন।”

[১] জাইল মিরআতুয যামান: ২/১৯৭, ১৯৮, ত. দারুল কিতাব আল-ইসলামী।

[২] আস-সুলুক লি-মা'রিফতি দুওয়ালিল মুলুক: ২/১০৯, ত. আল-ইলমিয়াহ।

বরকা খান অবিলম্বে সেই লেখাটি আনালেন যা ফারিস উদ্দিন মঙ্গোল সেনাপতিকে লিখেছিলেন এবং যা এর বিপরীত ছিল। বরকা খান বললেন: “যদিও তুমি তোমার বাদশাহর উপহার সামগ্রী আমার কাছে পৌঁছাতে অবহেলা করেছ এবং মিথ্যাচারও করেছ, কিন্তু আমি সুলতান বিবারসের সম্মানে তোমার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেব না।”

ফারিস উদ্দিন ৬৬৫ হিজরির জমাদিউল আখিরা মাসে কায়রোতে ফিরে আসেন। সুলতান ইতিমধ্যে সংবাদ পেয়েছিলেন যে, সে কূটনৈতিক মিশন পরিচালনায় চরম অবহেলা করেছে এবং কায়সারের বাধার কারণে যে মালামাল নষ্ট হয়েছিল, তার কোনো ক্ষতিপূরণও দাবি করেনি। ফলে সুলতান তাকে বরখাস্ত করেন এবং সেই উপহার সামগ্রীর মূল্য তার কাছ থেকে আদায় করেন যা ছিল চল্লিশ হাজার দিনার। [১]

ইউরোপীয়দের সাথে সম্পর্ক স্থাপন:

সুলতানের মনে সর্বদা এই আশঙ্কা ছিল যে, হলাকু খান এবং ইউরোপের খ্রিস্টানরা যেন তার বিরুদ্ধে সম্মিলিত যুদ্ধ শুরু না করে দেয়। এই আশঙ্কা দূর করার জন্য সুলতান অত্যন্ত দূরদর্শিতার পরিচয় দেন এবং ইউরোপীয় রাজদরবারগুলোর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের আগে ইউরোপীয় বণিক ও বাজার মালিকদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন। শীঘ্রই ভেনিসে, যা ছিল বণিকদের কেন্দ্র, সুলতানের ভালো প্রভাব তৈরি হয়। তাতারদের রক্তক্ষয়ী কর্মকাণ্ড ইউরোপের সাথে এশিয়ার বাণিজ্য এবং স্থানীয় কৃষিব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। সুলতান সিরিয়ার কেল্লাবন্দি ফিরিজিদের অনুমতি দেন যেন তারা জমি চাষাবাদ করে এবং মুনাফা অর্জন করে। মিসরের বন্দর ও বাজারগুলোতে ইউরোপীয় বণিকদের এমন সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয় যে, কয়েক দশক ধরে ঝিমিয়ে পড়া বাণিজ্য চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

সুলতান সিসিলির বণিক এবং কায়সারের সাথেও বাণিজ্যিক চুক্তি করেন। বাণিজ্যের অনুকূল পরিবেশ তৈরির পর বিবারসের জন্য ইউরোপীয় নবাব ও পুঁজিপতিদের এটা বোঝানো সহজ ছিল যে, ইউরোপ দামেস্ক, কায়রো এবং কনস্টান্টিনোপলের বাজার থেকে যে মুনাফা পাচ্ছে, তা যেকোনো নতুন ক্রুসেডের সম্ভাব্য যুদ্ধলব্ধ মালের চেয়ে অনেক বেশি; তাই এই সুবিধাগুলোকে যুদ্ধের বলি দেওয়া বুদ্ধিমত্তার কাজ নয়। সুলতান সিসিলির রাজা ‘চার্লস কাউন্ট অফ আনজু’-র নামে প্রেরিত পত্রে লেখেন যে, পারস্পরিক বাণিজ্যের মুনাফা এত বেশি যে যুদ্ধের কারণে এতে বিঘ্ন ঘটানো সমীচীন নয়। [২] বিবারসের এই অভিমত সঠিক বলে গৃহীত হয়। ৬৬২ হিজরির রমজান মাসে চার্লসের একটি প্রতিনিধি দল কায়রোতে উপস্থিত হয় যেখানে উভয় রাজ্যের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়। [৩] এর ফলে কয়েক বছর পর যখন পাদ্রিরা নতুন ক্রুসেডের ডাক দেন, তখন ইউরোপীয় বণিকরা এর জন্য চাঁদা দিতে কোনো আগ্রহ দেখায়নি। ফলে ক্রুসেড পিছিয়ে যেতে থাকে।

তাতারদের আরও পরাজয়:

৬৬২ হিজরিতে তাতাররা আবারও কিতবুগা নুয়ানের ভাই বাইদারার নেতৃত্বে সিরিয়া আক্রমণ করে। হিমসের কাছে সংঘর্ষ হয় যাতে মুসলমানরা বিজয়ী হয় এবং বাইদারা নিহত হয়। তাতাররা অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় পালিয়ে যায়।

[১] জাইল মিরআতুয যামান: ৩/ ১৯৭, ১৯৮, ত. দারুল কিতাব আল-ইসলামি

[২] March of The Barbarians by Harold Lamb p: 231, 232

[৩] নিহায়াতুল আরাব লিন নুওয়াইরি: ৩০/ ১০০, ত. দারুল কুতুব

মুসলমানদের সাহস এখন বেড়ে গিয়েছিল, তাতারীরা বিচ্ছিন্নভাবে আক্রমণ করত এবং চোরদের মতো পালিয়ে যেত। ৬৬৫ হিজরিতে তারা রাহবা আক্রমণ করে। নাগরিকরা বীরত্বের সাথে নিজেদের রক্ষা করে এবং তাতারীরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। [১]

হালাকু খানের ইউরোপের সাথে যোগাযোগ এবং বাইবার্সের পাল্টা চাল:

হালাকু খান যখন বাইবার্স এবং বারকা খানকে কারু করা কঠিন দেখলেন, তখন ইউরোপে নতুন মিত্র খোঁজার জন্য কূটনৈতিক অভিযান শুরু করলেন। তিনি নিজে নাসরানিদের সমর্থক ছিলেন, তার স্ত্রী দুকুয (তুকুয) খাতুন ছিলেন নেস্টোরিয়ান নাসরানি। তিনি ব্রিটেনের রাজা এডওয়ার্ড এবং রোমের পোপের কাছে পত্র পাঠান যে, এই সময়ে মিশরের বিরুদ্ধে তাতারী এবং ফ্রাঙ্কদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত। কিন্তু নাসরানিরা সেই দিনগুলোতে পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল, তাই সেখান থেকে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো সামরিক অভিযান সম্ভব হয়নি। তবে হালাকু খান তার ছেলে আবাকাকে কনস্টান্টিনোপলের কায়সারের অবৈধ কন্যা “মারিয়া”র সাথে বিয়ে দিতে সক্ষম হন।

সুলতান বাইবার্সের এই বিষয়ে প্রবল আশঙ্কা ছিল যে, তাতারীরা ইউরোপীয় শক্তিগুলোকে নিজেদের পক্ষে নিয়ে নিতে পারে। তিনি চাননি যে মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে নতুন কোনো ক্রুসেড শুরু হোক, কারণ তখনো তাতারীরা মাথার ওপর চড়াও ছিল এবং সিরিয়ার উপকূলে নাসরানিদের অনেক সুরক্ষিত শহর বিদ্যমান ছিল। এমন পরিস্থিতিতে বাইবার্সের মিত্র বারকা খানও ইউরোপের কোনো রাজদরবারের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়ে গুরুত্বের সাথে চিন্তা করেন যাতে শক্তির ভারসাম্য বজায় থাকে। ফলে তিনি তার ভতিজা নোগাইকে কায়সারের দ্বিতীয় কন্যার সাথে বিয়ে দিতে দেরি করেননি। [২] এভাবে উভয় পক্ষ আবার সমকক্ষ হয়ে গেল।

হালাকু খানের মৃত্যু:

উপর্যুপরি পরাজয়ের কারণে হালাকু খান মৃগী রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। ১৯ রবিউল আউয়াল ৬৬৩ হিজরিতে তিনি ইলখানি সাম্রাজ্যের রাজধানী “মারাগা”য় মৃত্যুবরণ করেন, তার বয়স ছিল ৬০ বছরের বেশি। কিছুদিন পর তার গোঁড়া খ্রিস্টান স্ত্রীও মারা যান। [৩] পশ্চিমা ঐতিহাসিকরা অভিযোগ করেন যে, উভয়কে মুসলিম চিকিৎসকরা বিষ প্রয়োগ করেছিলেন।

কিন্তু সেই যুগের কোনো ঐতিহাসিক নথিতে এর প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে যদি সত্যিই এমনটা হয়ে থাকে, তবে তা ছিল সেইসব অত্যাচারের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া যা অর্ধশতাব্দী ধরে মুসলমানদের ওপর চালানো হচ্ছিল। দুর্বল ও মজলুম ব্যক্তিরা প্রভাবশালী জালেমদের হাত থেকে মুক্তি পেতে গোপন কৌশল অবলম্বন করতে বাধ্য হয়। সুতরাং যদি এমনটা হয়ে থাকে, তবে তা ছিল পিষ্ট হওয়া শাসিত শ্রেণির বাধ্যবাধকতা। এটা নিশ্চিত যে, নাসরানি বিশ্বে এই দুজনের মৃত্যুতে গভীর শোক পালন করা হয়েছিল। হ্যারল্ড ল্যাম্ব লিখেছেন: [৪]

“সমগ্র খ্রিস্টান বিশ্ব খ্রিস্টধর্মের এই দুই রক্ষক ও নেতার মৃত্যুতে বড় ধরনের শোকাহত হয়েছিল।”

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৩/২৬২, ১/১৮৭, March of The Barbarians by Harold Lamb: p: 231, 232

[২] নোট: নোগাই অমুসলিম ছিলেন কিন্তু বারকা খানের সহযোগী ছিলেন। বারকার পর তিনি সাম্রাজ্যের একটি অঞ্চলে স্থায়ী শাসন প্রতিষ্ঠা করেন, তার সৈন্যরা “নোগাই তাতারী” বা “তাতার ক্রিমিয়া” নামে পরিচিত হয়। (March of The Barbarians by Harold Lamb: p: 235) তবে কয়েক বছর পর তিনি ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন। (আস-সুলুক লি-মা’রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ২/১০৯; উকদুজ জুমান লিল আইনি: ৬৬৯ হিজরি)

[৩] পূর্বোক্ত সূত্র

[৪] March of The Barbarians by Harold Lamb: p: 231

আবাক্বা খানের সিংহাসন আরোহণ - বারকা খানের আরও একটি বিজয়:

হালাকুর পর তার পুত্র আবাক্বা খান (আবগা) ইলখানি মঙ্গোল সাম্রাজ্যের শাসক হন। তিনি তার পিতার চেয়েও বড় মুসলমানদের শত্রু ছিলেন। তিনি চরম মাত্রায় খ্রিস্টান অনুরাগী ছিলেন এবং তার স্ত্রীও খ্রিস্টান ছিলেন। তারা উভয়েই মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছিলেন। ফলে আবাক্বা খান বারকা খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সেনাবাহিনী পাঠান, কিন্তু বারকা খান তাকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। [১]

এই বিজয়ে বারকা খান হালাকু খানের হাতে বন্দী অনেক মুসলমানকে মুক্ত করেন। তাদের মধ্যে নিহত খলিফা মুসতাসিম বিল্লাহর পুত্র আলীও ছিলেন। বারকা খান তাকে দামেস্কে পাঠান যেখানে তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। [২]

বিবারসের ইরাক আক্রমণের পরিকল্পনা:

সুলতান বিবারস হালাকুর মৃত্যু এবং বারকা খানের সাম্প্রতিক বিজয়গুলোতে অত্যন্ত আনন্দিত হন। সুলতান পরিকল্পনা করেন যে, একটি বিশাল সেনাবাহিনী সংগ্রহ করে ইরাক পর্যন্ত আক্রমণ চালানো হবে এবং বাগদাদ পর্যন্ত সমস্ত এলাকা তাতারীদের হাত থেকে মুক্ত করা হবে। কিন্তু ক্রুসেডারদের সাথে বিভিন্ন ফ্রন্টে যুদ্ধ চলমান থাকায় বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত এই সংকল্প বাস্তবায়িত হতে পারেনি। [৩]

এদিকে হালাকু খানের উত্তরসূরি আবাক্বা, বারকা খানের কাছে শোচনীয় পরাজয়ের পর বিবারসের সাথে বিবাদে জড়াতে চাননি। ফলে তিনি মূল্যবান উপহার সামগ্রীসহ একটি প্রতিনিধি দল সুলতান বিবারসের দরবারে পাঠান এবং সন্ধির প্রস্তাব দেন। [৪] ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে নীরব যে সুলতান এই প্রস্তাবের কী উত্তর দিয়েছিলেন, তবে এটি নিশ্চিত যে কোনো সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়নি। [৫] যেহেতু সেই সময়ে সুলতানের ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু হয়ে গিয়েছিল (যার বিবরণ সামনে আসছে), সম্ভবত সে কারণেই এই প্রস্তাব কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করাকে কৌশলের পরিপন্থী এবং গ্রহণ করাকে আত্মমর্যাদার পরিপন্থী মনে করা হয়েছিল এবং বিষয়টি অমীমাংসিত রেখে দেওয়া হয়েছিল।

বারকা খানের মৃত্যু:

৬৬৫ হিজরিতে বারকা খান ইন্তেকাল করেন। তার স্থলাভিষিক্ত হন একই বংশের একজন রাজপুত্র মানকু তিমুর (বিন তুগান বিন বাতু বিন জুজি বিন চেঙ্গিস)। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন কি না তা বর্ণিত নেই, তবে তিনি মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর প্রমাণিত হন। [৬]

৬৬৬ হিজরিতে সুলতান বিবারস মানকু তিমুরকে বারকা খানের মৃত্যুতে শোকবার্তা পাঠান, সেই সাথে তাকে সিংহাসন আরোহণের অভিনন্দন জানান এবং উৎসাহিত করেন যেন তিনি হালাকু খানের বংশধরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত রাখেন। [৭] সুলতান বিবারসের সাথে বারকা খানের সম্পর্ক এতটাই গভীর ছিল যে, তার উত্তরাধিকারী আল-মালিক আল-সাইদ, যার বয়স তখন সাত বছর ছিল, “বারকা খান” উপাধিতে পরিচিত হয়ে যান। [৮]

[১] আস-সুলুক লি-মা'রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ২/২৯, ত. আল-ইলমিয়াহ

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৬৬৩ হিজরি

[৩] আস-সুলুক লি-মা'রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ২/৩৮, ত. আল-ইলমিয়াহ

[৪] সন্ধি না হওয়ার প্রমাণ হলো আবাক্বার সেই পত্র যা ৬৭২ হিজরিতে পাঠানো হয়েছিল এবং সামনে মূল পাঠ্যে আসছে।

[৫] আস-সুলুক লি-মা'রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক মাকরিজি: ২/৩৫, ত. আল-ইলমিয়াহ; কিছু স্থানে (যেমন: আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৬৬৫ হিজরি) তাকে বাতু খান বিন তুলি লেখা হয়েছে যা সঠিক নয়।

[৬] আস-সুলুক লি-মা'রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ২/৩৭, ত. আল-ইলমিয়াহ

[৭] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৬৬৭ হিজরি

[৮] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৬৬৭ হিজরি

ফরাসীদের সাথে জিহাদ

বাইবার্স শুরুতে ফরাসীদের সাথে নমনীয় নীতি অবলম্বন করেছিলেন কারণ সেই সময় মুসলমানদের জন্য তাতারীদের পক্ষ থেকে বেশি বিপদ ছিল। বাইবার্স যখন সিরিয়ার উপকূলের দিকে অভিযান চালালেন, তখন আক্কা ও ইয়াকার ফরাসীরা সন্ধির আবেদন করল এবং সেই চুক্তির নবায়ন চাইল যা তাদের সুলতান সালাহউদ্দিনের সাথে ছিল এবং যার দায়িত্ব ফ্রান্সের রাজার ওপর ছিল। বাইবার্স এই সন্ধি মঞ্জুর করে নিলেন। এভাবে সিরিয়া উপকূলের ফরাসী দুর্গগুলো মুসলমানদের তত্ত্বাবধানে চলে এল। এখন ফরাসীদের দায়িত্ব ছিল যে, যখন মুসলমানরা যুদ্ধে সহায়তার জন্য তাদের ডাকবে, তখন তারা উপস্থিত হবে। [১]

কিন্তু সন্ধি বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। সুলতান সিরিয়া উপকূলের ফরাসীদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের খবর দ্রুতগত পাচ্ছিলেন। মরার ওপর খাঁড়ার ঘা এই যে, তারা মুসলমানদের কাছে দাবি করছিল যেন তাদের আরও দুর্গ দেওয়া হয়। এখন তাদের শাস্তি দেওয়া জরুরি ছিল। ৭ রবিউল আউয়াল ৬৬১ হিজরিতে সুলতান মিসর থেকে সিরিয়ার দিকে রওনা হলেন এবং গাজায় অবস্থান করলেন। সফর চলাকালীন শিকারের ব্যস্ততার পাশাপাশি স্থানীয় আমির এবং আরব গোত্রগুলোর শায়খদের সাথে সাক্ষাৎ হলো, হিমসের শাসক আল-মালিকুল আশরাফ উপস্থিত হলেন। সুলতান সবাইকে জিহাদের উৎসাহ দিলেন।

সুলতান কারাক-এর আমির আল-মালিকুল মুগীস সম্পর্কে প্রমাণ পেয়েছিলেন যে, সে তাতারীদের সাথে যোগসাজশ করছে। সে সুলতানের আহ্বানে সাক্ষাতের জন্য এলে তাকে গ্রেপ্তার করা হলো। তার চিঠিগুলো এবং সেই দূতদের পেশ করা হলো যারা তাতারীদের কাছে সংবাদ আদান-প্রদানের মাধ্যমে ছিল। মুগীসকে বন্দি করে কায়রো পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

এই সময়ে কাস্পিয়ান সাগরের দিক থেকে খবর এল যে, গোল্ডেন হোর্ড (তাজ যরীন খাইল)-এর নওমুসলিম তাতারীরা ইলখানি তাতারীদের আরও একবার পরাজিত করেছে। সুলতান পূর্ব সীমান্ত নিয়ে নিশ্চিত হয়ে অবিলম্বে খ্রিস্টানদের মোকাবিলা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। যখন সুলতানি বাহিনী উপকূল পর্যন্ত পৌঁছাল, তখন ফরাসীদের কূটনৈতিক প্রতিনিধিদল উপস্থিত হয়ে সন্ধি নবায়নের আবেদন করল। সুলতান বললেন:

“এই চিন্তা আমাদের আসার আগে কেন আসেনি? আমরা না তোমাদের কোনো ক্ষেত নষ্ট করেছি, না গবাদি পশু লুট করেছি, কিন্তু তোমরা আমাদের বাহিনীর রসদ বন্ধ করতে থাকলে এবং যে খাদেম বা গোলামকে একা পেয়েছ তাদের অপহরণ করতে থাকলে। আমরা বন্দিদের মুক্তির প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য কায়রো থেকে তোমাদের সীমান্ত পর্যন্ত কত বন্দিকে পাঠিয়েছি, কিন্তু তোমরা না নিজের জাতির ওপর দয়া করে সেই বন্দিদের গ্রহণ করার দিকে মনোযোগ দিলে, না আমাদের বন্দিদের মুক্ত করার চিন্তা করলে। আমাদের দূত যারা এশিয়া মাইনর যাচ্ছিল, তোমাদের কথায় সাইপ্রাসের পথ দিয়ে গেল যেখানে তাদের গ্রেপ্তার করা হলো, অথচ আমরা তোমাদের দূত ও বণিকদের সাথে সর্বদা সদ্ব্যবহার করে আসছি। বলো, তোমরা কবে মিসর সালতানাতকে সঙ্গ দিয়েছ? কবে একে কোনো ফায়দা পৌঁছে দিয়েছ? এখন সিরিয়া দেশ আমার হাতে এবং আমার তোমাদের সাহায্যের কোনো প্রয়োজন নেই। আমার এখন একটাই...”

[১] তারিখ ইবনে খালদুন: ৫/৩৩১, তাবা দারুল ফিকর।

দাবি হলো আমাদের সমস্ত বন্দীদের মুক্তি দাও এবং এই সমস্ত শহর যা তোমরা নিয়েছ, আমাদের হাতে তুলে দাও।

ফরাসি দূতরা হতবাক হয়ে গেল এবং বলতে লাগল: “আমরা সমস্ত দাবি ত্যাগ করছি। আপনি শুধু সন্ধি নবায়ন করে দিন।”

সুলতান বললেন: “এই কথা আমার মিসর থেকে রওনা হওয়ার আগে বলতে। এখন এই শীত ও বৃষ্টির মধ্যে সৈন্যবাহিনীকে এখানে নিয়ে আসার পর এর আর কোনো মানে হয় না।” ফরাসি দূতরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল। সুলতান অতর্কিত আক্রমণ করে আক্কা ঘেরাও করলেন। নিজে একটি টিলার ওপর অবস্থান নিলেন এবং সৈন্যদের পরিখা ভরাট করে শহরের প্রাচীর পর্যন্ত পৌঁছানোর নির্দেশ দিলেন। শীঘ্রই সুলতানি বাহিনীর রক্ষী দল শহর রক্ষাকারী বাহিনীকে পিছু হটিয়ে দিল। অনেকে পরিখায় পড়ে গেল এবং বাকিরা শহরে অপরুদ্ধ হয়ে পড়ল। সুলতান নিজের তত্ত্বাবধানে মানজানিক স্থাপন করালেন এবং প্রাচীর ভাঙার জন্য সুড়ঙ্গ খননকারীদের নির্দেশ দিলেন। এই অভিযান চলছিলই যে সুলতানকে কিছু কারণে ফিরে আসতে হলো। [১]

কায়সারিয়া বিজয়:

৪ রবিউল আখের ৬৬৩ হিজরিতে সুলতান ফরাসিদের বিরুদ্ধে জিহাদের দৃঢ় সংকল্প নিয়ে মিসর থেকে যাত্রা করলেন। পথে প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হলো এবং প্রচুর পরিমাণে ভারবাহী পশু মারা গেল। অনেক রসদপত্র পথেই ফেলে আসতে হলো। সুলতান তা সত্ত্বেও অভিযানের গতি কমালেন না। অফিসাররা উটের স্বল্পতার অভিযোগ করলে সুলতান উত্তর দিলেন:

“আমি উট নিয়ে নয়, ইসলামের বিজয়ের চিন্তায় উদ্বিগ্ন।”

২০ রবিউল আখের ৬৬৩ হিজরিতে সুলতানি বাহিনী গাজায় পৌঁছালে গোয়েন্দারা জানাল যে, কায়সারিয়াতে ফরাসিরা পূর্ণ প্রস্তুতিতে আছে এবং ৭টি মানজানিক স্থাপন করেছে। সুলতান কাউকে কিছু না জানিয়ে শিকারের বাহনায় গাজা থেকে বের হয়ে কায়সারিয়ার নিকটবর্তী সিদাতে অবস্থান নিলেন। এখান থেকে হঠাৎ কায়সারিয়ার দিকে অভিযান চালিয়ে শহরের সামনে পৌঁছে প্রাচীর উপকানোর জন্য মই তৈরি করালেন।

৯ জমাদিউল আউয়াল রাতে ইসলামী বাহিনী অত্যন্ত দ্রুততার সাথে শহরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শত্রুপক্ষ এর জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না। অনেক ফরাসি পরিখায় পড়ে গেল। বাকিরা ভয়ে শহরে ঢুকে পড়ল। সুলতান চারটি মানজানিকের মাধ্যমে শহরের ওপর পাথর নিক্ষেপ এবং অগ্নিবৃষ্টি শুরু করালেন। শহরের দরজাগুলো পুড়িয়ে দেওয়া হলো এবং লঙ্করে ইসলাম ভেতরে প্রবেশ করল।

ফরাসিরা কায়সারিয়ার দুর্গে আশ্রয় নিল যার ভিত্তি এত গভীর ছিল যে সুড়ঙ্গ খনন করা অসম্ভব ছিল। সুলতান দুর্গের সামনে অবস্থিত গির্জার মিনারের ওপর মোর্চা তৈরি করলেন যাতে দুর্গের সৈন্যরা প্রাচীরে উঠতে না পারে। এরপর দাবার মাধ্যমে দুর্গে আক্রমণ শুরু করলেন। কয়েকটি হামলায় সুলতান নিজে সরাসরি অংশ নিলেন। ফেরার পথে সুলতানের ঢালে অনেকগুলো তীর বিদ্ধ অবস্থায় দেখা গেল। বৃহস্পতিবার ১৫ জমাদিউল আউয়াল ফরাসিরা অস্ত্র সমর্পণ করল এবং কায়সারিয়ার দুর্গে আজানের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। সুলতানের রণকৌশল ছিল ফিলিস্তিন ও শামের প্রতিটি দুর্গ বিজয়ের পর তা ধ্বংস করে দেওয়া, যাতে কখনও খ্রিস্টানরা একে সামরিক সাহায্য হিসেবে ব্যবহার করতে না পারে। সেগুলোর পরিবর্তে এমন দুর্গ মজবুত করা হতো যা মুসলিম জনবসতির সাথে থাকে এবং মুসলমানদের...

[১] আস-সুলুক লি-মা'রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ১/৫৫১ থেকে ৫৫৫, ত' আল-ইলমিয়্যাহ।

...প্রতিরক্ষার জন্য উপকারী হয়। তাই সুলতান কায়সারিয়া বিজয়ের পর তার দুর্গ ধ্বংস করার নির্দেশ জারি করলেন। [১]

আল-বিরার পুনর্নির্মাণ:

ওদিকে ফোরাত নদীর ওপারে আল-বিরা দুর্গ, যা পূর্ব দিক থেকে আসা আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তাতারীদের আক্রমণে ধ্বংস হয়ে দীর্ঘকাল ধরে জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে ছিল। সুলতানের জন্য ফারাজিদের বিরুদ্ধে জিহাদ চলাকালীন পেছন দিক থেকে তাতারীদের আক্রমণ থেকে সুরক্ষার নিশ্চয়তা প্রয়োজন ছিল। যদিও তাতারীদের শক্তি ভেঙে পড়েছিল, তবুও তাদের লুটতরাজ ও ধ্বংসযজ্ঞের আশঙ্কা বাকি ছিল। তাই সুলতান আল-বিরা দুর্গ অত্যন্ত মজবুতভাবে নির্মাণের নির্দেশ দিলেন এবং তাকিদ দিলেন যেন সেখানে দশ বছরের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য ও শস্য মজুদ রাখা হয়। হামার শাসক আল-মালিক আল-মানসুর এবং আমির ইজ্জুদ্দিন আইগানকে পত্র পাঠালেন যে, সৈন্য নিয়ে আল-বিরা পৌঁছান, অন্যথায় আমি নিজেই একটি দল নিয়ে সেখানে আসছি। আল-বিরার পুনর্নির্মাণের জন্য সুলতান কায়রো থেকে দুই লাখ দিনার এবং দামেস্ক থেকে দুই লাখ দিরহাম আনিয়ে উমরাদের হাতে তুলে দিলেন। সিরিয়ার উমরাগণ যখন আল-বিরা পৌঁছালেন, তখন আশেপাশে ঘুরতে থাকা তাতারীরা আতঙ্কিত হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

আল-বিরা দুর্গের নির্মাণ কাজ অত্যন্ত ধুমধাম ও উৎসাহের সাথে শুরু হলো। লশকরদের উমরাগণও কাঁধে পাথর বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। সুলতান এই সময়ে কায়সারিয়া দুর্গ ধ্বংস করার কাজ শুরু করেছিলেন। হাত জখম হয়ে গিয়েছিল, তবুও কোদাল হাতে নিয়ে নিজের সৈন্যদের সাথে খনন কাজে অংশগ্রহণ অব্যাহত রেখেছিলেন। এই অবস্থায় তিনি আল-বিরার উমরাদের কাছে বার্তা পাঠালেন:

“আলহামদুলিল্লাহ! আমরা আপনাদের ছেড়ে নিজেদের জন্য কোনো আরাম ও নিশ্চিন্ততাকে বেছে নেইনি। এমন নয় যে আপনারা কষ্টে থাকবেন আর আমরা আরামে থাকব। আমাদের সবার অবস্থা একই রকম যে, কেউ দিনরাত জিহাদে লিপ্ত আছে, কেউ পাথর বহন করছে এবং কেউ কুফযারদের মোকাবিলায় পাহারায় নিয়োজিত আছে।”

সুলতান আল-বিরা নির্মাণে অংশগ্রহণকারী সকল উমরা, অফিসার, সৈন্য, পাহারাদার, মজুর এবং সাধারণ মানুষের জন্য পুরস্কার পাঠালেন যাতে তাদের মনোবল অটুট থাকে।

[২]

হাইফা, আশলিখ এবং আরসুফ বিজয়:

কায়সারিয়া বিজয়ের পর সুলতান তাঁর উমরাদের হাইফায় পাঠালেন। ফারাজিরা এতটাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল যে শহর ছেড়ে সমুদ্রপথে পালিয়ে গেল এবং ১৬ই জুমাদাল উলা তারিখে এই শহর যুদ্ধ ছাড়াই বিজিত হলো। একই দিনে উপকূলের আশলিখের শক্তিশালী দুর্গটিও জয় করে তা মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হলো।

১৯শে জুমাদাল উলা তারিখে সুলতান কাউকে নিজের লক্ষ্য না জানিয়ে উপকূল ধরে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করলেন এবং ১লা জুমাদাল আখিরা তারিখে আরসুফ অবরোধ করলেন। এই শহর জয় করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। সুলতান এর জন্য অত্যন্ত অদ্ভুত এক কৌশল অবলম্বন করলেন। এখানে আশেপাশের জঙ্গল থেকে কাঠের স্তূপ সংগ্রহ করা হলো। এরপর শহরের বাইরের পরিখার ভেতর থেকে একটি সুড়ঙ্গ খনন...

[১] আস-সুলুক লি-মা'রিফাত দুওয়ালিল মুলুক: ২/১৯, ১৮, ত. আল-ইলমিয়াহ

[২] আস-সুলুক লি-মা'রিফাত দুওয়ালিল মুলুক: ২/১৯, ১৮, ত. আল-ইলমিয়াহ

শুরু হয়েছিল যা দুর্গের ভেতরের পরিখায় গিয়ে শেষ হতো। এই সুড়ঙ্গগুলোর উপরের অংশ কাঠের তক্তা দিয়ে সুরক্ষিত করা হয়েছিল। এই কাজ দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার, জ্যামিতিবিদ এবং স্থপতিদের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হচ্ছিল।

সুড়ঙ্গ খননের পাশাপাশি শহরের ফটকগুলোতেও আক্রমণ শুরু হলো এবং দুর্গ-বিশ্বংসী যন্ত্রগুলো সচল করা হলো। সুলতান একজন সাধারণ সৈনিকের মতো যুদ্ধের প্রতিটি কাজে অংশ নিতেন; কখনো হাতে তলোয়ার নিয়ে শহরের ফটকে যুদ্ধ লড়তেন, কখনো দুর্গ-বিশ্বংসী যন্ত্রের সাহায্যে আক্রমণে শরিক হতেন, মিনজানিক (পাথর নিক্ষেপক যন্ত্র) টানতেন, সুড়ঙ্গ খুঁড়তেন, মাটি বহন করতেন এবং পাথর তুলতেন। উপকূলীয় অঞ্চলে ফিরিজিদের নৌকাগুলোকে তীরের লক্ষ্যবস্তু বানাতেন। ইতিহাসবিদদের মতে, একদিন সুলতান শত্রুদের ওপর যে তীরগুলো নিক্ষেপ করেছিলেন, তার সংখ্যা ছিল কমপক্ষে তিনশ।

একদিন সুলতান সুড়ঙ্গের ভেতরে থাকাকালীন ফিরিজিরা উপর থেকে খনন করে একটি ছিদ্র করে ফেলে এবং সেখান থেকে প্রথমে বর্শা নিক্ষেপ করে। এরপর আঁকড়া ফেলে সুলতানকে উপরে টেনে তোলার চেষ্টা করতে থাকে। সুলতান হাতাহাতি লড়াই করে নিজেকে বাঁচানোর আশ্রয় চেষ্টা করেন। আমির সানকার উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে সুলতানকে পাথর এগিয়ে দিতে শুরু করেন এবং সুলতান দুইজন আক্রমণকারীকে পাথর মেরে মেরে হত্যা করেন, বাকিরা পালিয়ে যায়। এভাবে আল্লাহ সুলতানকে কাফেরদের বন্দিহ থেকে অল্পের জন্য রক্ষা করেন।

এর পরেও সুলতানের সাহসিকতার অবস্থা এমন ছিল যে, দুই বাহিনীর মাঝখানে একাকী চক্কর দেওয়ার অভ্যাস তিনি ত্যাগ করেননি। কারো সাহস হতো না যে চোখ তুলে তাকাবে। সুলতানের অবস্থা দেখে সমস্ত আমির ও সরদাররাও একইভাবে কঠোর পরিশ্রম ও আত্মোৎসর্গের প্রমাণ দিচ্ছিলেন। এই যুদ্ধে উলামা ও নেককারদের একটি বড় দল शामिल ছিল। এছাড়া পর্দানশীন মহিলারাও শরিক ছিলেন যারা আহতদের সেবা এবং সৈনিকদের পানি পান করানোর দায়িত্ব পালন করছিলেন। সেনাবাহিনীতে মদ্যপান বা অশ্লীলতার কোনো নামগন্ধও ছিল না।

অবশেষে সুড়ঙ্গগুলো দুর্গ পর্যন্ত পৌঁছে গেল এবং ৫ই রজব বৃহস্পতিবার সেনাবাহিনী সুড়ঙ্গ থেকে বের হয়ে অতর্কিত হামলা চালাল। শহরের ফটকগুলো খুলে নেওয়া হলো এবং আরসুফের প্রাচীরে ইসলামি পতাকা উড়তে লাগল। শহরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অকেজো করে দেওয়া হলো। এই অভিযান থেকে অবসর নিয়ে ১১ই শাবান ৬৬৩ হিজরিতে সুলতান কায়রোতে ফিরে আসেন। [১]

কায়সারিয়া ও আরসুফের বিকল্প হিসেবে সুলতান “কাতুন” নামে একটি নতুন দুর্গ নির্মাণ শুরু করেন যা ৬৬৫ হিজরিতে সম্পন্ন হয় এবং পরবর্তীতে জনবসতি ও বাজারের কারণে এটি একটি শহরে পরিণত হয়। [২]

সাফাদ দুর্গ দখল:

পরের বছর ৬৬৪ হিজরিতে সুলতান পুনরায় সিরিয়ার উপকূলীয় ফিরিজি দুর্গগুলোতে লাগাতার অতর্কিত হামলা চালান যার পরিধি ত্রিপোলি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখান থেকে এত বিপুল পরিমাণ গনিমতের মাল অর্জিত হয়েছিল যে গরু ও মহিষের দাম অনেক কমে গিয়েছিল এবং ক্রেতা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না।

[১] আস-সুলুক লি-মা'রিফাত দুওয়ালিল মুলুক: ২/২০, ২১, ত. আল-ইলমিয়াহ

[২] আস-সুলুক লি-মা'রিফাত দুওয়ালিল মুলুক: ২/২৩, ত. আল-ইলমিয়াহ

হয়ে গেলেন। এই অভিযানে সুলতান আক্কার ওপর একটি লোকদেখানো আক্রমণ করলেন যার উদ্দেশ্য ছিল অন্য শহরগুলোর ফরাসিদের নিশ্চিত রাখা। এরপর হঠাৎ আক্কা থেকে রওয়ানা হয়ে ৮ রমজান সাফাদে গিয়ে অবস্থান নিলেন। এই দুর্গটি সুলতান সালাহউদ্দিন জয় করেছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে খ্রিস্টানরা তা পুনরায় দখল করে নেয়। এখানে ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত অবরোধমূলক যুদ্ধ চলতে থাকে। ঈদুল ফিতরের দিন আশঙ্কা ছিল যে সৈন্যরা হারাম আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত হয়ে না পড়ে। সুলতান নির্দেশ দিলেন যে, যদি কেউ মদ পান করে তবে তাকে হত্যা করা হবে। যখন মিনজানিকগুলো দুর্গের প্রাচীর দুর্বল করে দিল, তখন সুলতান দুর্গের প্রাচীরে সুড়ঙ্গ তৈরির নির্দেশ দিলেন এবং বললেন: “প্রথম পাথরটি যে উপড়ে ফেলবে তার জন্য একশ দিনার পুরস্কার, দ্বিতীয় পাথরটি উপড়ে ফেলার জন্য ৯০ দিনার। এভাবে পর্যায়ক্রমে দশম পাথরটি উপড়ে ফেলা ব্যক্তি দশ দিনারের অধিকারী হবে।”

সুলতান নিজের খাদেম ও কর্মচারীদেরও এই কাজে পাঠিয়ে দিলেন। এটি ২ শাওয়ালের ঘটনা। সেদিন দুর্গের প্রাচীরের সামনে অত্যন্ত জোরালো যুদ্ধ হলো। সুড়ঙ্গ তৈরির সময় অনেক মুসলমান শহীদ হলেন। কেউ একজন পড়ে গেলে অন্যজন তার স্থলাভিষিক্ত হতো। অবশেষে ফরাসিরা দুর্গ হাতছাড়া হতে দেখে নিরাপত্তা প্রার্থনা করল। সুলতান এই শর্তে প্রাণের নিরাপত্তা দিলেন যে, খ্রিস্টানরা দুর্গের সমস্ত ধন-সম্পদ ও আসবাবপত্র যে অবস্থায় আছে সেভাবেই রেখে দুর্গ খালি করে চলে যাবে। কোনো কিছু সাথে নিতে পারবে না।

এভাবে ১৮ শাওয়াল ৬৬৪ হিজরিতে সাফাদ জয় হলো। জয়ের পর প্রস্থানকারীরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে অর্থ ও অস্ত্র লুকিয়ে নিয়ে যেতে চাইল। তল্লাশির সময় তারা ধরা পড়ল এবং তাদের হত্যা করা হলো।

সাফাদ জয়ের পর ফরাসিদের অস্ত্রাগার নিজেদের তাঁবুতে স্থানান্তরের সময় এলে সুলতান নিজের কাঁধে অস্ত্র বহন করে নিয়ে যেতে শুরু করলেন। এটি দেখে সবাই তৎপর হয়ে উঠল এবং এক ঘণ্টার মধ্যে পুরো অস্ত্রাগার স্থানান্তরিত হয়ে গেল। সাফাদ জয়ের পর সুলতানের বাহিনী পার্শ্ববর্তী এলাকায় ছড়িয়ে পড়ল এবং প্রায় আরও বিশটি দুর্গ জয় করে নিল। [১]

সাফাদ থেকে মুক্ত হওয়া মুসলিম বন্দিদের কাছ থেকে সুলতান জানতে পারলেন যে, এশিয়া মাইনরের সীমান্তবর্তী এলাকা “কারা”-র আমেনীয় খ্রিস্টানরা মুসলমানদের বন্দি করে ফরাসিদের কাছে বিক্রি করে থাকে। একই তথ্য “সিস” (আমেনিয়া)-এর খ্রিস্টানদের সম্পর্কেও পাওয়া গেল যে, তারা তাতারীদের সিরিয়া দখলের সময় থেকে মুসলিম জনবসতিগুলোর ওপর হামলা এবং নারী ও শিশুদের অপহরণে লিপ্ত রয়েছে। সুলতান অবিলম্বে “কারা” ও “সিস”-এর ওপর আক্রমণ চালিয়ে আমেনীয়দের তাদের অপকর্মের শাস্তি দিলেন। [২]

আক্কার ওপর আক্রমণ:

সুলতান ১৭ জমাদিউল আখিরা ৬৬৫ হিজরিতে একটি সংক্ষিপ্ত বাহিনীর সাথে পুনরায় সিরিয়ার দিকে যাত্রা করলেন। গাজায় ফরাসি আমিররা উপটোকন নিয়ে উপস্থিত হলো এবং সন্ধির প্রস্তাব দিল, কিন্তু কয়েকদিন পরই তারা এদিক-সেদিক লুটতরাজ শুরু করে দিল। সুলতান এর জবাবে আক্কার আশেপাশে এত তীব্র ও দ্রুত ঝটিকা অভিযান চালালেন যে ফরাসিরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। তাদের দূত যখন সন্ধির জন্য এল, তখন সুলতান প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বললেন: “এই অভিযানগুলো তোমাদের লুটতরাজের জবাব।”

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৬৬৪ হিজরি; আস-সুলুক লি-মা’রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ২/ ৩৩ থেকে ৩৫

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৬৬৪ হিজরি

এর পর শাবান ৬৬৫ হিজরিতে সুলতান এক্কার দিকে অগ্রসর হন এবং এর চারপাশের পানির আধার ও চারণভূমি ধ্বংস করে শহরটি অবরোধ করেন। সুলতান নিজে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বর্শা হাতে শহরের কেন্দ্রীয় ফটক পর্যন্ত আক্রমণ পরিচালনা করেন। শহরটি জয় না হলেও দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ইসলামী বাহিনীর প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই সময়ে সুর, সায়েস (আমেনিয়া) এবং বৈরুতের ফরাসি আমিরদের পাশাপাশি হিসনুল আকরাদের টেম্পলাররাও সন্ধির আবেদন নিয়ে আসে। সুলতান কঠোর শর্ত আরোপ করে দশ বছরের জন্য সন্ধি মঞ্জুর করেন। [১]

ইয়াফা ও শাকীফ আরনুম বিজয়:

ফরাসিদের ষড়যন্ত্র অব্যাহত ছিল, তাই সুলতান ৬৬৬ হিজরিতে পুনরায় সিরিয়ার উপকূলে অভিযান চালান এবং ২০ জুমাদিউল আখিরায় মাত্র বারো ঘণ্টার যুদ্ধের পর ‘ইয়াফা’ জয় করেন। এটি সেই শক্তিশালী দুর্গ যা সুলতান সালাহউদ্দিন তিন দিনে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে জয় করেছিলেন, কিন্তু পরে ইংল্যান্ডের রাজা রিচার্ড তা পুনরায় দখল করে নিয়েছিলেন।

ইয়াফার পর পরবর্তী আক্রমণ শাকীফ আরনুমের ওপর হয়। এটি পাহাড়ের ঢালে অবস্থিত অত্যন্ত শক্তিশালী দুর্গ ছিল যা দখল করা অসম্ভব মনে হতো। সুলতান সালাহউদ্দিন অনেক কষ্টে কয়েক মাস অবরোধের পর এটি জয় করেছিলেন, কিন্তু পরে আইয়ুবী শাহজাদারা এটি খ্রিস্টানদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। সুলতান বাইবার্স এটি জয় করার সংকল্প করেন। সৌভাগ্যবশত এখানে আক্রমণের আগে সুলতানের গোয়েন্দারা এক্কার ফরাসিদের একজন বার্তাবাহককে ধরে ফেলে, যে শাকীফ দুর্গের জন্য এই বার্তা নিয়ে যাচ্ছিল যে, ইসলামী বাহিনী শীঘ্রই তোমাদের ওপর আক্রমণ করতে যাচ্ছে।

সুলতান তার পরিবর্তে এক্কার অধিবাসীদের পক্ষ থেকে দুটি জাল চিঠি তৈরি করান: একটি শাকীফের শাসকের নামে, যাতে তাকে তার নায়েবের ষড়যন্ত্রের ভয় দেখানো হয়েছিল। দ্বিতীয়টি নায়েবের নামে ছিল, যাতে তাকে শাসকের প্রতি সন্দিহান করে তোলা হয়েছিল। সুলতানের একজন খ্রিস্টান গোয়েন্দা এই চিঠিগুলো শাকীফ দুর্গে পৌঁছে দেয়। ফলে সেখানে শাসক ও নায়েবের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ সৃষ্টি হয়। যখন সুলতানের বাহিনী শাকীফ পৌঁছাল, তখন খ্রিস্টানরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াইতে পারল না। এখানে ২৬টি মানজানিক থেকে পাথর বর্ষণ করা হয় এবং অবশেষে ২৯ রজব রবিবার এটি পুনরুদ্ধার করা হয়। [২]

ত্রিপোলি আক্রমণ:

এর পর সুলতান ত্রিপোলির দিকে মুখ ফেরান যেখানে প্রিন্স বোহেমন্ডের শাসন ছিল। সে ছিল আন্তাকিয়া ও ত্রিপোলির যৌথ শাসক। তার ইসলাম বিদ্বেষ ছিল সুবিদিত। হাফিজ ইবনে কাসির (রহ.) লিখেছেন:

“আন্তাকিয়া ও ত্রিপোলির শাসক প্রিন্স মুসলমানদের কষ্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে সবার চেয়ে অগ্রগামী ছিল।” [৩]

[১] আস-সুলুক লি-মা’রিফতি দুওয়ালিল মুলুক: ২/৪৪, ত. আল-ইলমিয়াহ।

[২] আস-সুলুক লি-মা’রিফতি দুওয়ালিল মুলুক: ২/৪৮, ৪৯; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৬৬৬ হিজরি।

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৬৬৬ হিজরি।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা | খুতবাতে হাকিম

সুলতান ত্রিপোলি থেকে অর্ধেক মঞ্জিল দূরে ছাউনি ফেললেন। এখানে একটি যুদ্ধ-বুরজ ছিল যা জয় করে সমস্ত পরিখাবদ্ধ ক্রুসেডারদের হত্যা করা হলো। সুলতানি বাহিনী ত্রিপোলির পার্শ্ববর্তী পাহাড়গুলোতে অতর্কিত অভিযান চালিয়ে প্রচুর গনিমত লাভ করল। এই সময়ে তারতুস ও সাফিতার শাসকরা তিনশ মুসলিম বন্দীকে মুক্ত করে সন্ধির প্রস্তাব দিল। সুলতান কৌশলগত কারণে তা গ্রহণ করে নিলেন। ত্রিপোলির ওপর সুলতানের আক্রমণ ছিল নিছক একটি ধোঁকা। আসল লক্ষ্য কী ছিল তা কারো জানা ছিল না। [১]

আনতাকিয়ার মহান বিজয়:

একদিন ত্রিপোলির সামনে থেকে ইসলামের লঙ্কর হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল। আফরিস খুশি হলো যে জান বাঁচল, কিন্তু সুলতান কিছু দূরে গিয়ে বাহিনীকে তিন ভাগে বিভক্ত করে তিনটি ভিন্ন দিকে আক্রমণ শুরু করলেন। এক অংশ নিজের নেতৃত্বে নিয়ে ‘আফামিয়া দুর্গ’ আক্রমণ করলেন। দ্বিতীয় অংশ ‘সুয়াইদিয়া’ ঘেরাও করল। তৃতীয় অংশ ‘দারব সাক’ দুর্গে আক্রমণ করল।

কিন্তু এই তিনটি আক্রমণও ছিল লোকদেখানো। কয়েক দিন পর এই তিনটি বাহিনী আবার অদৃশ্য হয়ে গেল এবং ১লা রমজান হঠাৎ তাদের আসল লক্ষ্য আনতাকিয়ার সামনে সমবেত হলো। এই ঐতিহাসিক শহরটি ছিল বিশ্বের প্রশস্ততম ও শক্তিশালী প্রাচীরবেষ্টিত শহরগুলোর অন্যতম। এর প্রাচীর বারো মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল যাতে ১৩৬টি বুরজ এবং ২৪ হাজার বাতায়ন ছিল। ক্রুসেডাররা পঞ্চম হিজরি শতাব্দীতে কুদস দখলের আগে এটি ছিনিয়ে নিয়েছিল। সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীও এটি পুনরুদ্ধার করতে পারেননি। এখানে এক লক্ষ সশস্ত্র ক্রুসেডার সমবেত ছিল। সুলতান চেষ্টা করেছিলেন যাতে যুদ্ধ ছাড়াই শহরটি জয় করা যায়, কিন্তু অনেক বোঝানো সত্ত্বেও ক্রুসেডাররা মানল না। অবশেষে ৪ঠা রমজান শহরের ওপর আক্রমণ শুরু হলো, প্রচণ্ড যুদ্ধের পর মুসলমানরা নিকটবর্তী পাহাড় থেকে রশি ফেলে শহরের দেয়ালে উঠে পড়ল এবং হাতাহাতি যুদ্ধের পর শহরটি দখল করে নিল। মুসলিম আমিররা শহরটি কঠোরভাবে অবরোধ করে রেখেছিলেন যাতে কেউ পালিয়ে যেতে না পারে। সালতানাতের আমিরগণসহ আট হাজার লোক দুর্গে আশ্রয় নিল এবং নিরাপত্তা প্রার্থনা করল। সুলতান আবেদন মঞ্জুর করে দুর্গের দরজাগুলো খুলিয়ে নিলেন। এভাবে ১৪ই রমজান ৬৬৬ হিজরিতে এই মহান বিজয় সম্পন্ন হলো।

এখান থেকে বিপুল সংখ্যক মুসলিম বন্দীকেও উদ্ধার করা হলো যাদের অধিকাংশ ছিল আলেপ্পোর বাসিন্দা। আনতাকিয়ার বিজয় ছিল এক বিশাল সুসংবাদ যার বিজয়বার্তা পুরো মুসলিম বিশ্বে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। আনতাকিয়ার শাসক আফরিস বোহেমন্ড যখন ত্রিপোলিতে এই সংবাদ পেল, তখন শোকে তার অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ল। [২]

আমার পরোয়া নেই:

সিস (আমেনিয়া)-র খ্রিস্টান শাসক তাকফুর হিতুম তাতারীদের মিত্র ছিল, সে কিছুকাল আগে মুসলমানদের কাছ থেকে দারব সাক, বাহনাসা, মারজাবান এবং রুহবান দুর্গগুলো ছিনিয়ে নিয়েছিল। জবাবে সুলতান এক যুদ্ধে তার ছেলেকে বন্দী করেছিলেন। তাকফুর তার মুক্তির জন্য বড় থেকে বড় মূল্য দিতে প্রস্তুত ছিল কিন্তু সুলতান নগদ অর্থের পরিবর্তে দুটি দাবি রাখলেন:

[১] আস-সুলুক লি-মা’রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক, ২ / ৩৯, ত. ইলমিয়াহ

[২] আস-সুলুক লি-মা’রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক, ১ / ৩৯, ৫০, ত. ইলমিয়াহ

১. তিনি যেন কোনোভাবে আলেপ্পোর আমির সুনকুর আশকারকে মুক্ত করেন, যাকে তাতারীরা বন্দি করে রেখেছিল।

২. মুসলমানদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া চারটি দুর্গ: দারব সাক, বাহানসা, মারজবান এবং রা'বান ফেরত দিতে হবে।

তাকফুর শর্তগুলো মেনে নিলেন এবং তাতারীদের সাথে আলোচনা করে সুনকুর আশকারকে নিজের কাছে স্থানান্তরিত করালেন। কিন্তু এখন তিনি দ্বিতীয় শর্ত থেকে পিছু হটে গেলেন। তিনি কেবল সুনকুরের মুক্তির ব্যাপারে সম্মতি প্রকাশ করলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে সুলতান ফিরতি বার্তায় লিখলেন:

“যখন আপনি আপনার পুত্র এবং উত্তরাধিকারীর বন্দিত্ব সহ্য করতে পারছেন, তখন আমিও আমার বন্ধু সুনকুরের বন্দিত্বের পরোয়া করি না, যার সাথে আমার কোনো রক্তের সম্পর্কও নেই। আপনি চুক্তি থেকে বিচ্যুত হয়েছেন, আমরা নই। আমরা আমাদের অঙ্গীকারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আপনি সুনকুরের সাথে যা খুশি করতে পারেন।”

যখন তাকফুর এই বার্তাটি পড়লেন এবং একই সাথে আন্তাকিয়ার পতনের খবর পেলেন, তখন তিনি ভীত হয়ে পড়লেন। তিনি মুসলমানদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া সমস্ত দুর্গ ফেরত দিলেন এবং সুনকুরকেও মুক্তি দিলেন।

সুলতান বিনিময়ে কেবল চুক্তি অনুযায়ী তার পুত্রকেই মুক্ত করেননি, বরং তার ভতিজা এবং দাসদেরও ছেড়ে দিলেন। [১]

এক অদ্ভুত খেলা

৬৬৭ হিজরিতে সুলতান দামেস্ক থেকে বের হওয়ার সময় এক অদ্ভুত খেলা খেললেন। কয়েকজন ছাড়া সমস্ত আমিরকে মিশরে পাঠিয়ে দিলেন এবং পেছনে নিজেকে এতটাই অসুস্থ জাহির করলেন যে চারদিকে খবর ছড়িয়ে পড়ল সুলতানের শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে।

সুলতান খিরবাতুল লুসুস-এ তাবু ফেললেন এবং কয়েক দিনের জন্য নিখোঁজ থাকার এবং হঠাৎ মিশরে উপস্থিত হওয়ার পরিকল্পনা করলেন। এই গোপন কথাটি পুরো সালতানাতে কেবল একজন ব্যক্তি আমির শামস উদ্দিনকে জানানো হয়েছিল।

১৬ শাবান সুলতান আমির আইদামুর, আমির জারাক এবং আমির বারীদকে গোপনে আদেশ দিলেন যে তারা যেন আলেপ্পোর উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান, তবে রওনা হওয়ার আগে রাজকীয় তাবুর পেছনে এসে কিছু নির্দেশনা নিয়ে যান। রাজকীয় তাবু একটি ঘেরাও করা জায়গায় ছিল যার দরজায় কড়া পাহারা ছিল। সুলতানকে এই ঘেরাও থেকে এমনভাবে বের হতে হতো যাতে পাহারাদাররাও চিনতে না পারে। সুলতান মাথায় একটি জীর্ণ রুমাল বাঁধলেন, খাদেমদের মতো আলখাল্লা পরলেন। কাপড়ের একটি পুঁটলি কাঁধে নিলেন এবং একজন বিশ্বস্ত দাসকে ডেকে বললেন:

“আমি কুলি সেজে তাবু থেকে বের হব, তুমি আগে আগে চলবে। পাহারাদাররা জিজ্ঞেস করলে বলবে যে এই লোকটি কাপড় নিতে এসেছিল।”

সুলতান নিজের পাহারাদারদের চোখে ধুলো দিয়ে বাইরে বের হতে মাত্র কয়েক মুহূর্ত সময় নিলেন।

সুলতান এই অবস্থাতেই সেই কর্মকর্তাদের সাথে গিয়ে মিলিত হলেন যাদের আলেপ্পো যাওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। কেউ সুলতানকে চিনতে পারল না। কিছুক্ষণ পর সুলতান এক কর্মকর্তাকে চুপিচুপি বললেন: “আমাকে চিনতে পারছ?” কর্মকর্তার চোখ বিস্ময়ে ছানাবড়া হয়ে গেল। তিনি বললেন: “হ্যাঁ হ্যাঁ, আল্লাহর কসম!” এই বলে তিনি ঘোড়া থেকে নামতে চাইলেন যাতে আদব প্রদর্শন করতে পারেন, কিন্তু সুলতান ইশারায় নিষেধ করলেন। কিছুক্ষণ পর সুলতান দ্বিতীয় কর্মকর্তাকে একইভাবে খোঁচা দিয়ে বললেন: “আমাকে চিনলে?”

[১] আস-সুলুক লি-মা'রিফতি দুওয়ালিল মুলুক: ২/ ৫১, ত. আল-ইলমিয়াহ।

সেও অবাক হয়ে গেল এবং ঘাবড়ে গিয়ে বলল: “আখুন্দ! এটা কী!!” সুলতান বললেন: “চুপ থাকো।”

কারো জানা ছিল না যে সুলতানের উদ্দেশ্য কী এবং গন্তব্য কোথায়। সুলতান একজন ভৃত্যের চরিত্রে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য রাজকীয় ঘোড়া ব্যবহার করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেননি। মধ্যরাতে তারা পথের একটি চৌকি “কাসীর”-এ পৌঁছালেন। সুলতান এখানকার নাযিমের (তত্ত্বাবধায়ক) কাছে নিজের জন্য একটি ঘোড়া চাইলেন। সে ধমক দিয়ে বলল: “এগুলো সুলতানের ঘোড়া। কারো সাধ্য নেই যে এগুলোর ওপর সওয়ার হতে পারে। পালাও, নতুবা হত্যা করা হবে।”

বায়সান পৌঁছে এখানকার নাযিমের সাথে সাক্ষাতের চেষ্টা করলেন। প্রহরীরা কাফেলাটিকে চৌকির ভবনের ভেতরে নিয়ে গেল, এখানে নাযিম পা ছড়িয়ে ঘুমাচ্ছিল। সুলতান তার পায়ের দিকে বসে নিজের এক সঙ্গীকে রসিকতা করে বললেন:

“এই দেখো! মানুষ আমার দরজায় আসে আর আমি এই নাযিমের দরজায় এসেছি। কিন্তু সে আমার দিকে ঝুঞ্জেপও করছে না। হ্যাঁ, দুনিয়া পরিবর্তনশীল।” নাযিম জাগ্রত হলে সুলতান পানির একটি পাত্র চাইলেন। সে অবজ্ঞার সাথে বলল:

“এখানে কোনো পাত্র নেই! পানি পান করতে হলে বাইরে গিয়ে পান করো।”

অবশেষে সুলতানের এক সঙ্গী পানি এনে দিলেন। এখানে সুলতান সওয়ার হওয়ার জন্য একটি অসুস্থ ঘোড়াও পেয়ে গেলেন। এই কাফেলা আরিশ পৌঁছালে সুলতান খাওয়ার জন্য যবের দানা বের করলেন। দানা পরিষ্কার করতে করতে এক অদ্ভুত সুরে বললেন:

وَأَيْنَ الْخَلْقُ الْوَقُوفُ فِي الْخِدْمَةِ؟ هَكَذَا تَخْرُجُ الْمُلُوكُ مِنْ مُلْكِهِمْ وَمَا يَدُومُ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَهُ

“কোথায় সেই মানুষগুলো যারা খিদমতে দাঁড়িয়ে থাকত? এভাবেই বাদশাহরা তাদের বাদশাহি ছেড়ে চলে যান। চিরস্থায়ী বাদশাহি তো কেবল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার।”

এই গোপন বেশে একদিন এশার পর এই কাফেলা কায়রোর দুর্গে পৌঁছাল। প্রহরীরা তাদের আটকে দিল যে, কেল্লাদারের অনুমতি ছাড়া প্রবেশের অনুমতি নেই। সুলতান দুর্গের গোপন দরজাগুলো চিনতেন, তাই কেল্লাদারের বাধা সত্ত্বেও ভেতরে প্রবেশ করা কঠিন হলো না।

সুলতান দুই দিন পর্যন্ত নিজেকে কারো কাছে প্রকাশ না করে সালতানাতের আমিরদের এবং নিজের উত্তরাধিকারীর চালচলন পর্যবেক্ষণ করলেন। যখন দেখলেন যে সবাই নিজ নিজ দায়িত্ব ঠিকঠাক পালন করছে, তখন একদিন খুব ভোরে আমিরদের সামনে আত্মপ্রকাশ করলেন। সবাই অবাক হয়ে গেল। তারা ভাবল বাইবার্সের বেশে কোনো ছদ্মবেশী সামনে এসেছে। আমিররা তাদের তলোয়ার খাপ থেকে বের করতে শুরু করল কিন্তু... কয়েক মুহূর্ত পর গভীরভাবে লক্ষ্য করে নিশ্চিত হলো যে, ইনি সুলতান বাইবার্স ছাড়া আর কেউ নন।

সবাই লজ্জিত হয়ে অভিবাদন জানাল। [১]

ছদ্মবেশ ধারণের কারণ:

পশ্চিমা ঐতিহাসিকদের মতে, সুলতান প্রথমে অসুস্থ হওয়া এবং পরে নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার এই কৌশল এজন্য অবলম্বন করেছিলেন যাতে তার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে সিরিয়ার ক্রুসেডাররা (ফিরিজি) সীমান্ত আক্রমণ শুরু করে দেয়, আর এভাবে শান্তি চুক্তি ভঙ্গের সূচনা তাদের পক্ষ থেকেই হয়।

[১] আস-সুলুক লি-মা'রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ২/৫৫ থেকে ৫৮, ত আল-ইলমিয়াহ।

...এবং মুসলমানদের তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বৈধতা মিলে যায়। [১]

তবে এটি নিছক একটি অভিযোগ। মুসলিম ঐতিহাসিকদের মতে, সুলতান এমনটি করেছিলেন যাতে তাঁর আমির ও উত্তরাধিকারীর আনুগত্য দেখে নেওয়া যায়। একটি মত এমনও আছে যে, সুলতানের উদ্দেশ্য ছিল কিছু দিন ফকির ও অজ্ঞাতনামা হয়ে থেকে আল্লাহর নেয়ামতসমূহ নিয়ে চিন্তা করা যে, সবকিছু তাঁরই দেওয়া। যদি তিনি তা ছিনিয়ে নেন, তবে বান্দা কী আর তার কী-ই বা অবশিষ্ট থাকে। যেমনটি সুলতানের এই উক্তি থেকে প্রকাশ পায়: “বাদশাহরা তাদের বাদশাহি ছেড়ে চলে যান। অবশিষ্ট থাকার মতো বাদশাহি তো কেবল আল্লাহরই।” [২]

হজ সফর:

সুলতানের অভ্যাসে আরাম ছিল না। নিরন্তর কর্মতৎপরতা তাঁর দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। মিশরে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি পর্যালোচনা করার পর সুলতান একদিন পুনরায় সিরিয়ার (শাম) উদ্দেশ্যে সফরের প্রস্তুতি নিলেন। সিরিয়ায় পৌঁছে ঘিলকদ মাসে হঠাৎ গোপনে হিজাজের দিকে রওনা হলেন এবং হজ করার সৌভাগ্য অর্জন করলেন। [৩]

সিরিয়ায় তুফানি অভিযান। আক্কার যুদ্ধ, হিসনুল আকরাদের যুদ্ধ:

সুলতান হজ থেকে ফেরার সফর এত দ্রুত সম্পন্ন করেন যে, ২ মহররম ৬৬৮ হিজরিতে রাজকীয় কাফেলা দামেস্কে প্রবেশ করেছিল। মানুষ এই দ্রুততায় অবাক হয়ে গেল। সুলতান এখান থেকে সরাসরি আলেপ্পোর (হালাব) দিকে রওনা হলেন। ৩ সফর মিশরে প্রত্যাবর্তন হলো।

এদিকে তাতার এবং ইউরোপীয় শাসকদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতির পত্রিনিময় চলছিল। সুলতান সংবাদ পেলেন যে, হলাকুর উত্তরসূরি আবাকার সাহায্যের জন্য ইউরোপ থেকে একটি সেনাবাহিনী রওনা হয়েছে, যাকে সিরিয়া ও এশিয়া মাইনরের সীমান্তবর্তী এলাকা সিস (আর্মেনিয়া) পৌঁছে তাতার বাহিনীর সাথে একীভূত হতে হবে।

সুলতান পুনরায় সিরিয়ার দিকে লাগাম ঘোরালেন। ১৩ রবিউস সানি রাজকীয় কাফেলা দামেস্কে ছিল। এই সময়ে দ্বিতীয় সংবাদ পাওয়া গেল যে, তাতারদের সাহায্যের জন্য রওনা হওয়া ইউরোপীয় নৌবহর ঝড়ের কবলে পড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। এভাবে সুলতান এই দিক থেকে অবসর পেলেন। তবে এই সময়ে আরেকটি ইউরোপীয় বাহিনী আক্কার নবাবের সাহায্যের জন্য চলে এসেছিল, যার ফলে সেখানকার খ্রিস্টানরা সাহসী হয়ে আক্কা উপত্যকায় ব্যুহ রচনা করতে শুরু করেছিল। সুলতান জেনিন ও সাফাদের বাহিনীকে সেখানে পৌঁছানোর নির্দেশ দিলেন এবং নিজে গোপনে দামেস্ক থেকে বের হয়ে হঠাৎ আক্কার সামনে এসে সেই বাহিনীগুলোর নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। [৪]

আক্কার ফিরিজিরা সুলতানের আগমনের খবর পেয়ে ঘাবড়ে গেল। রাজকীয় বাহিনী কয়েক দফা সংঘর্ষে তাদের নাস্তানাবুদ করে দিল এবং আক্কাবাসীরা লাশের স্তুপ ফেলে রেখে কেল্লাবন্দি হয়ে গেল। সুলতান আশেপাশের এলাকায় আরও অতর্কিত হামলা চালালেন। পুরো সিরিয়ায় এক তুফানি সফর করলেন। কেউ জানত না সুলতান কোন দিকে যাচ্ছেন। কোনো স্থানে এক-দুই দিনের বেশি অবস্থান করতেন না। সুলতান একদিন সাফাদে অতিবাহিত করলেন, সেখানে আক্কার নিহত নাইটদের মস্তক প্রদর্শন করলেন। এরপর দামেস্কে এসে বিজয়ী...

[১] The Crusades by Harold Lamb: p: 35

[২] আস-সুলুক লি-মা'রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ২/ ৫৭, ত. আল-ইলমিয়াহ

[৩] নিহায়াতুল আরাব: ৩০/ ১৬৬, ১৬৭, ত. দারুল কুতুব ওয়াল ওয়াসাইকিল কাওমিয়াহ কায়রো

[৪] আস-সুলুক লি-মা'রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ২/ ৬৩, ৬৪

জেনারেলদের খেলাত দিলেন। পরবর্তী দিনগুলোতে সুলতানকে প্রথমে “হামা” এবং তারপর “কাসরুত তাব”-এ দেখা গেল। সুলতান সেনাবাহিনীকে ছাউনিতে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এখন সাথে কোনো জাঁকজমক বা সরঞ্জাম ছিল না। একটি ছোট দল নিয়ে সুলতান তীব্র শীতের মৌসুমে দুর্ভেদ্য মারকাব দুর্গের ওপর দুইবার আক্রমণ করেন, তবে প্রবল বৃষ্টি ও তুষারপাতের কারণে তা জয় করা সম্ভব হয়নি।

৩ জমাদিউল আখিরাতে সুলতান ২০০ সৈন্য নিয়ে নিজের পথ পরিবর্তন করলেন। এক জায়গায় তিনি মাত্র ৪০ জন বাছাইকৃত অশ্বারোহীকে সাথে নিলেন এবং হঠাৎ টেম্পলারদের সবচেয়ে শক্তিশালী কেন্দ্র “হিসনুল আকরাদ”-এর ওপর আক্রমণ করলেন। এটি একটি পাহাড়ের ওপর অবস্থিত ছিল এবং এর চারপাশে তিনটি প্রাচীর একে অপরাজেয় করে তুলেছিল। এটি এতই বিশাল, মজবুত ও সুউচ্চ যে আজও তা দেখে বিস্ময় জাগে। টেম্পলাররা প্রথম ক্রুসেড যুদ্ধের পর এটি নির্মাণ করেছিল। দেড় শতাব্দীর ইতিহাসে এটি কখনো বিজিত হয়নি। সুলতান সালাহউদ্দিনের বাহিনীও এটি জয় করতে সফল হয়নি।

সুলতান বাইবার্স দুর্গের সামনে দাঁড়িয়ে বারবার প্রতিপক্ষকে আহ্বান জানানেন। টেম্পলাররা এই অপমান সহ্য করতে না পেরে দুর্গ থেকে বেরিয়ে পরিখা পার হয়ে সুলতানের সামনে চলে এল। সুলতান সিংহের মতো আক্রমণ করলেন এবং তাদের সারি তছনছ করে দিলেন। বাকিরা উল্টো পায়ে পালিয়ে গেল, কিন্তু কিংকর্তব্যবিমূঢ় হওয়ার কারণে বেশিরভাগই পরিখায় গিয়ে পড়ল। সুলতান উপহাস করে উচ্চস্বরে বললেন: “ফিরিঙ্গি সাহেবদের জন্য রাস্তা ছেড়ে দাও, তাদের বাইরে আসতে দাও। আমরা তো মাত্র চল্লিশ জন অশ্বারোহী।”

কিন্তু কেউ সামনে এল না। সুলতান নিজের শক্তির প্রভাব বিস্তার করার পর দামেস্কে ফিরে যাওয়া জরুরি মনে করলেন, কারণ ইউরোপের দিক থেকে কিছু অত্যন্ত উদ্বেগজনক খবর আসছিল। [১]

ইউরোপের রাজাদের অষ্টম ক্রুসেড যুদ্ধের জন্য যাত্রা

সুলতানের সাম্প্রতিক বিজয়সমূহ, বিশেষ করে আন্তাকিয়া বিজয় পোপ এবং ফ্রান্সের রাজা নবম লুইকে বিচলিত করে তুলেছিল। ফলে ইউরোপে অষ্টম ক্রুসেড যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হলো। বৃদ্ধ লুই আরও একবার মুসলিম বিশ্ব জয়ের স্বপ্ন দেখে পাদ্রিদের শুভকামনা ও সন্ন্যাসীদের দোয়ার সাথে ক্রুসেড যুদ্ধে লড়ে বের হলেন। এটি সেই লুই ছিলেন যিনি ৬৪৮ হিজরিতে সপ্তম ক্রুসেড যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং জীবিত বন্দী হয়েছিলেন।

গোয়েন্দারা এই খবর দিচ্ছিল যে, তার সাথে তার ভাই সিসিলির রাজা “চার্লস অফ আনজু” ছাড়াও “আরাগন”-এর রাজা, “নাভারে”-এর রাজা এবং তাদের পেছনে ব্রিটেনের রাজা এডওয়ার্ডও নিজের সেনাবাহিনী নিয়ে আসবেন। সুলতান ১৮ জমাদিউল আখিরা ৬৬৮ হিজরি (১২ জানুয়ারি ১২৭০ খ্রিস্টাব্দ) দামেস্ক থেকে হিসনুল আকরাদে পৌঁছালেন। সংবাদদাতাদের কাছ থেকে খবর পাওয়া গেল যে, ফ্রান্সের রাজা নবম লুই ইউরোপীয় আমিরদের সাথে ভূমধ্যসাগরে যাত্রা শুরু করেছেন, কিন্তু জানা নেই যে তার লক্ষ্য কোন উপকূল। সুলতান এই খবর শোনামাত্রই উপকূলীয় এলাকায় কড়া পাহারা এবং যুদ্ধজাহাজগুলোকে সক্রিয় করে দিলেন। [২]

[১] আস-সুলুক লি-মা’রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ২/৬৩, ৬৫, ত. আল-ইলমিয়্যাহ।

[২] আস-সুলুক লি-মা’রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ১/৬৬০, ত. আল-ইলমিয়্যাহ।

বাতিনি ইসমাইলিদের বিরুদ্ধে অভিযান:

ক্রুসেডার বাহিনী পৌঁছানোর আগে সুলতানকে একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য পূরণ করতে হতো, অর্থাৎ সিরিয়ায় সক্রিয় ইসমাইলি গোষ্ঠীর নির্মূল। এই লোকেরা সর্বদা বহিরাগত আক্রমণকারীদের সহায়ক হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। তাদের উপস্থিতিতে সুলতানের পক্ষে সিরিয়ার প্রতিরক্ষা মজবুত রাখা কঠিন ছিল। যদিও উত্তর ইরানে অবস্থিত বাতিনিদের প্রধান কেন্দ্র “আলমুত” তাতারদের হাতে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সিরিয়ার পাহাড়ি ও উপকূলীয় অঞ্চলে তাদের দ্বিতীয় কেন্দ্র “মাসিয়াফ” তখনও অবশিষ্ট ছিল, যেখানে তাদের নেতা নাজমুদ্দিন হাসান অবস্থান করছিলেন। সুলতান ক্রুসেডার বাহিনী পৌঁছানোর আগে এই কেন্দ্রের দিকে মনোযোগ দেন। সুলতানের প্রতিনিধিরা মাসিয়াফ ঘেরাও করেন এবং অবশেষে রজব ৬৬৮ হিজরিতে তা জয় করে নেন। নাজমুদ্দিন হাসানকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার বয়স ৯০ বছর হয়েছিল। সুলতান তাকে জায়গির দান করে জীবনধারণের সুব্যবস্থা করে দেন। এভাবে বাতিনি গোষ্ঠীর শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। [১]

অষ্টম ক্রুসেড

এই সময়ের মধ্যে সুলতান বাইবার্স বুঝতে পেরেছিলেন যে ফ্রান্স থেকে রওনা হওয়া ক্রুসেডার বাহিনীর গন্তব্য সিরিয়া নয় বরং মিসর। এই কারণে সুলতান অত্যন্ত দ্রুততার সাথে মিসরের দিকে রওনা হন। ২ শাওয়াল ৬৬৮ হিজরি (২৪ মে ১২৭০ খ্রিস্টাব্দ) সুলতানের কাফেলা মিসরে ছিল। [২]

তিউনিসিয়ার যুদ্ধ:

এদিকে যা ঘটল তা হলো, লুই নবম যুদ্ধের সূচনার জন্য মিসরের কোনো বন্দরের পরিবর্তে তিউনিসিয়ার উপকূলকে পছন্দ করলেন। আরব ঐতিহাসিকরা এই বিষয়ে নীরব যে ফ্রান্সের রাজা কেন তিউনিসিয়ার দিকে মুখ ফিরিয়েছিলেন? ধারণা করা হয় যে, মানসুরায় গতবার গ্রেপ্তার হওয়ার অপমান তিনি ভুলতে পারেননি এবং বাইবার্সের উপস্থিতিতে মিসরে কোনো বিজয়ের ব্যাপারে তিনি আশাবাদী ছিলেন না।

তবে পশ্চিমা ঐতিহাসিকরা কিছুটা ভিন্ন গল্প শোনান। তাদের মতে, সুলতান বাইবার্স তিউনিসিয়ার আমিরকে পরিকল্পনা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি যেন ফ্রান্সের রাজাকে মূল্যবান উপহার পাঠিয়ে আস্থায় নেন এবং তাকে বিশ্বাস করান যে তিনি তিউনিসিয়া তার হাতে তুলে দিতে প্রস্তুত। ফ্রান্সের রাজা এই প্রলোভনে পড়ে সিরিয়া বা মিসরের পরিবর্তে একটি নিকটবর্তী উপকূলে অবতরণ করাকে অগ্রাধিকার দেন, কারণ তার ধারণা ছিল যে তিনি এখানে যুদ্ধ না করেই দখল করতে পারবেন। যাই হোক, ফ্রান্সের রাজার এই সিদ্ধান্তটি সম্পূর্ণ ভুল ছিল।

তার নৌবহর জিলকদ ৬৬৮ হিজরি (জুলাই ১২৭০ খ্রিস্টাব্দ) তিউনিসিয়ার উপকূলে নোঙর ফেললে তাকে কঠোর প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়। এরপর তার বাহিনীতে প্লেগ মহামারি ছড়িয়ে পড়ে। ব্যর্থ অবরোধ করা ছাড়া তিনি আর কিছুই করতে পারেননি এবং অবরোধ...

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৬৬৮ হিজরি

[২] আস-সুলুক লি-মা’রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ২ / ৬৬, ত. ইলমিয়াহ

...চলাকালীনই অসুস্থ হয়ে মারা যান। [১]

সিরিয়ার যুদ্ধ:

সুলতান বাইবার্স ইউরোপের ব্যর্থ আক্রমণের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন। তিউনিসিয়ায় ক্রুসেডারদের আক্রমণ কায়রোতে জিহাদের উদ্দীপনা নতুন করে জাগিয়ে তুলেছিল। সুলতান নবম লুইয়ের মৃত্যুর খবর শোনামাত্রই একদল উৎসাহী মুসলমানকে সাথে নিয়ে সফর ৬৬৯ হিজরিতে পুনরায় মিসর থেকে সিরিয়ার দিকে যাত্রা করেন এবং আসকালানের অবশিষ্ট প্রাচীরগুলো ধ্বংস করে দেন যাতে ফরাসিরা সেটিকে ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করতে না পারে। কারণ ফরাসি রাজার ব্যর্থ অভিযান সম্পন্ন করার জন্য ব্রিটিশ শাসক ‘এডওয়ার্ড’-এর নৌবহর সিরিয়ার উপকূলের দিকে আসছিল।

অবশেষে ব্রিটেনের রাজা সিরিয়ার উপকূলে সৈন্য অবতরণ করান কিন্তু তিনি আক্রমণ করার সাহস পাননি। ৬৭০ হিজরিতে (১২৭২ খ্রিষ্টাব্দ) তিনি কায়সারিয়া উপকূলে সন্ধি চুক্তি করেন এবং ক্রুসেডার যোদ্ধারা ফিরে যায়। এটি ছিল ক্রুসেড যুদ্ধের শেষ আক্রমণ যা তিউনিসিয়ার ব্যর্থ অবরোধ, নবম লুইয়ের মৃত্যু এবং কায়সারিয়া চুক্তির মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। ‘সেন্ট লুই’-এর পর আর কোনো ইউরোপীয় রাজার ক্রুসেডের নামে অস্ত্র ধরার সাহস হয়নি। এভাবে অষ্টম ক্রুসেডের মাধ্যমে ক্রুসেড যুদ্ধের ধারাবাহিকতা সমাপ্ত হয়। [২]

আস্কার ফরাসিরা এই পরাজয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের কাছে বন্দি সমস্ত মুসলমানকে হত্যা করে। সুলতান এর জবাবে কায়রোতে বন্দি আস্কার সমস্ত খ্রিস্টানকে, যাদের সংখ্যা ছিল একশ জন, মৃত্যুদণ্ড দেন। এটি রবিউল আউয়াল ৬৬৯ হিজরির ঘটনা। [৩]

সিরিয়ার শেষ অভিযানসমূহ

৮ রজব ৬৬৯ হিজরিতে সুলতান পুনরায় দামেস্কে পদার্পণ করেন। ইসলামি বাহিনী বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হয়ে উপকূলে পৌঁছায় এবং ‘জাবলাহ’, ‘লাতাকিয়া’, ‘মারকাব’, ‘আরকা’ এবং অন্যান্য দুর্গবেষ্টিত শহরগুলোতে অতর্কিত আক্রমণ চালাতে থাকে। এরপর বাহিনীগুলো একত্রিত হয়ে ‘সাফিতা’ এবং ‘মাজদাল’ জয় করে। ‘তারতুস’ এবং ‘মারকাব’-এর নবাবরা অর্ধেক ফসল প্রদানের চুক্তিতে সন্ধি করেন। [৪]

হিসন আল-আকরাদ:

এরপর ১৯ রজব টেম্পলারদের অপরাজেয় কেন্দ্র ‘হিসন আল-আকরাদ’ ঘেরাও করা হয়। সুলতান এক মাসের কঠোর অবরোধ এবং পাথর নিক্ষেপের পর ১৫ শাবান শহর এবং ২৫ শাবান দুর্গ জয় করেন। এখানকার খ্রিস্টানদের নির্বাসিত করা হয়। গির্জাকে জামে মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়। এখানে ইমাম ও কাজী নিযুক্ত করা হয়। [৫]

[১] The Crusades by Harold Lamb: p: 351 to 353; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, সন: ৬৬৮ হিজরি

[২] The Crusades by Harold Lamb: p: 355, 356

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: সন ৬৬৯ হিজরি

[৪] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: সন ৬৬৯ হিজরি

[৫] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: সন ৬৬৯ হিজরি

সাইপ্রাসে ইসলামী নৌবহর ধ্বংস:

এরই মধ্যে সুলতান সংবাদ পেলেন যে, সাইপ্রাস দ্বীপের খ্রিস্টানরা আক্কাবাসীদের সাহায্যের জন্য একটি নৌবহর পাঠিয়েছে। সুলতান সাইপ্রাসবাসীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য সেখানে ৭০টি যুদ্ধজাহাজ প্রেরণ করেন। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস যে, সাইপ্রাসের কাছে ঝড়ের কারণে এই জাহাজগুলো একে অপরের সাথে ধাক্কা খায়। ১৪টি জাহাজ ধ্বংস হয়ে যায়, শত শত মুসলমান ডুবে যান এবং বেঁচে যাওয়া ১৮০০ ব্যক্তিকে সাইপ্রাসবাসীরা বন্দি করে নেয়। [১]

আক্কা ও ত্রিপোলিতে আক্রমণ - মাউন্টফোর্ট বিজয়:

সুলতান এই ব্যর্থতায় নিরুৎসাহিত না হয়ে পূর্ণ প্রস্তুতির সাথে আক্কার শহরতলিতে আক্রমণ করেন এবং ১লা শাওয়ালের মধ্যে আশেপাশের সমস্ত জনপদ জয় করে নেন। [২]

আক্কার সামনে টিউটনিক নাইটদের শক্তিশালী দুর্গ মাউন্টফোর্টও দখল করা হয়। [৩] পরবর্তী লক্ষ্য ছিল ত্রিপোলি। এখানকার শাসক আফরিস বোহেমন্ড নতি স্বীকার করে দশ বছরের জন্য সন্ধি করেন। ফিরে আসার আগে সুলতান বাতেনি ইসমাইলিদের দুর্গ “আল-উলাইকা” জয় করেন এবং বাতেনিদের বন্দি করেন। [৪]

সুলতান কায়রো ফিরে গিয়ে সর্বপ্রথম সাইপ্রাসে ডুবে যাওয়া নৌবহরের বিকল্প তৈরির দিকে মনোযোগ দেন এবং ৪ঠা মহরম ৬৭০ হিজরিতে নিজেই একটি নতুন যুদ্ধজাহাজ সমুদ্রে ভাসিয়ে সেটির পরীক্ষা করেন। [৫]

এখন সুলতানের সিরিয়ার উপকূলীয় অভিযানগুলো সম্পন্ন হয়েছিল। পরবর্তী বছরগুলোতে তাঁর অধিকাংশ মনোযোগ উন্নয়নমূলক কাজ এবং তাতারীদের মোকাবিলা করার দিকে নিবদ্ধ ছিল। সিরিয়ার ফরাসিরা (ক্রুসেডাররা), যারা একটি সীমিত ভূখণ্ডে সংকুচিত হয়ে পড়েছিল, তারা এখন আর কোনো প্রতিরোধের যোগ্য ছিল না। হ্যারল্ড ল্যান্স সিরিয়ার ফরাসিদের বিরুদ্ধে সুলতানের অভিযানগুলোর ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে লেখেন:

“বাইবার্সের এই অভিযানগুলো আপাতদৃষ্টিতে অগোছালো এবং বিশৃঙ্খল মনে হলেও গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে এগুলোর মৌলিক বিন্যাস ও নিয়মতান্ত্রিকতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমে তিনি ফিলিস্তিন উপকূলকে আতলিখের শক্তিশালী দুর্গ পর্যন্ত পরিষ্কার করেন। এরপর উত্তর সিরিয়ায় আক্রমণ চালিয়ে আন্তাকিয়া জয় করেন। এভাবে তিনি উর্বর ভূমি এবং উত্তর উপকূলের পথ ও কেন্দ্রগুলোর ওপর আধিপত্য বিস্তার করেন। এরপর তিনি ক্রুসেডারদের শেষ শক্তিশালী দুর্গগুলো জয় করে পাহাড়ের পাদদেশ থেকে ক্রুসেডার দুর্গগুলোর অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিলীন করে দেন। অবশেষে ক্রুসেডারদের কাছে ত্রিপোলি থেকে আক্কা পর্যন্ত একটি সংকীর্ণ ভূখণ্ড অবশিষ্ট ছিল। ক্রুসেডারদের পেছনে ছিল সমুদ্র এবং সামনে ইসলামী সালতানাত। তারা উপকূল থেকে অভ্যন্তরীণ অঞ্চলে প্রবেশ করার যোগ্য ছিল না। তাদের রাজ্যের প্রশস্ততা এতটাই সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল যে, মাত্র আধা ঘণ্টা ঘোড়সওয়ারির পর ফরাসি আরোহীরা নিজেদের মুসলমানদের ঘেরাওয়ার মধ্যে দেখতে পেত।” [৬]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৮/২৬৯

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৮/২৬৯

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৮/২৬৯

[৪] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৮/২৭০

[৫] দ্য ক্রুসেডস বাই হ্যারল্ড ল্যান্স: পৃষ্ঠা ৩৫৪

[৬] দ্য ক্রুসেডস বাই হ্যারল্ড ল্যান্স: পৃষ্ঠা ৩৫৪

তাতারীদের বিরুদ্ধে জিহাদের দ্বিতীয় পর্যায়

ফরাসিদের (ফ্রাঙ্কদের) দমন করার পর সুলতানের পূর্ণ মনোযোগ তাতারীদের মোকাবিলা করার দিকে নিবদ্ধ হলো। কয়েক বছর আগে আবাগা খান সেই সন্ধি ভেঙে দিয়েছিল যা ৬৬৭ হিজরিতে স্থাপিত হয়েছিল; যখন সুলতান ফরাসিদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, তখন সে সুলতানকে হুমকি দিয়ে একজন দূত পাঠিয়েছিল। তার দূত সুলতানকে তার প্রভুর মৌখিক বার্তা পৌঁছে দিয়ে বলেছিল:

“তুমি একজন গোলাম, তোমাকে সিওয়াসে বিক্রি করা হয়েছিল। তুমি পৃথিবীর বাদশাহর মোকাবিলায় কেন অবাধ্যতা করছ?”

এর পর আবাগা খানের লিখিত বার্তা পড়ে শোনানো হলো যাতে লেখা ছিল:

“খাকান আবাগা পূর্ব দিক থেকে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি সমস্ত দেশ জয় করেছেন। কেউ তার বিরোধিতা করার সাহস করেনি। যে অবাধ্যতা করেছে তাকে হত্যা ও ধ্বংস করা হয়েছে। যদি তুমি আকাশে চড়ে বসো বা মাটির নিচে লুকিয়ে যাও, তবুও আমাদের হাত থেকে বাঁচতে পারবে না। উত্তম এটাই যে তুমি আমাদের সাথে সন্ধি করে নাও।”

সুলতান এই বার্তাকে ফাঁকা হুমকির চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেননি। প্রতিপক্ষের পক্ষ থেকে নিজে থেকে সন্ধির প্রস্তাব দেওয়াই প্রমাণ করছিল যে সুলতানের শক্তি স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু সেই সময় সুলতানের ফরাসিদের সাথে যুদ্ধ চলছিল, তাই তাতারীদের সাথে অবিলম্বে যুদ্ধ শুরু করা সমীচীন ছিল না। যাই হোক, সুলতান সংক্ষিপ্ত কিন্তু স্পষ্ট জবাব দিয়ে দূতকে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। [১]

সুলতান তার জবাবে বলেছিলেন:

“আমরা ইরাক, আল-জাজিরা এবং এশিয়া মাইনরের সেই সমস্ত শহর পুনরুদ্ধার করতে চাই যেগুলোর ওপর তাতারীরা দখলদারিত্ব কায়েম করে আছে।”

এই ঘটনা ৬৬৭ হিজরির। [২] এখন ৬৭০ হিজরিতে সুলতান ফরাসিদের অভিযান থেকে অবসর পেয়েছিলেন।

তাতারীদের অগ্রযাত্রা এবং পশ্চাদপসরণ:

এদিকে তাতারীদের নতুন অগ্রযাত্রার খবর পাওয়া গেল। ইলখানি শাসক আবাগা খান তার পিতা হালাকু খানের লক্ষ্যগুলো পূরণ করতে চেয়েছিলেন। তাতারীদের মিত্র দশ হাজার রোমান ‘আইন তাব’, ‘ফুসতুন’, ‘হারাম’, ‘কাতুন’ এবং ‘আনতাকিয়া’ পর্যন্ত লুটতরাজ চালিয়েছিল। ভয়ের কারণে ইরাক ও সিরিয়ার সীমান্ত থেকে লোকজন মধ্য সিরিয়ার দিকে চলে আসছিল। এই পরিস্থিতিতে ৬৭০ হিজরির মহররম মাসের শেষ দিকে সুলতানের বাহিনী উত্তর সিরিয়ায় পৌঁছে গেল। এটি দেখে তাতারী এবং রোমান উভয়ই নিজ নিজ এলাকার দিকে পিছু হটে গেল। সুলতান তার আমিরদের কঠোরভাবে তিরস্কার করলেন যে তারা কেন তাদের এলাকা রক্ষার দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করেনি। [৩]

[১] আস-সুলুক লি-মা’রিফাত দুওয়ালিল মুলুক: ২/৫৫-৫৬, ত. দারুল ইলমিয়াহ।

[২] যাইল মিরআতুয যামান: ২/৩০৭, ত. দারুল কিতাব আল-ইসলামী।

[৩] আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ: সন ৬৭০ হিজরি।

আমীর কালাউনের হাতে তাতারীদের পরাজয়:

পরের বছর তাতারীরা আবার আক্রমণ করে এবং আল-বিরাহ অভিমুখে যাত্রা করে। সুলতান খবর পাওয়া মাত্রই ৪ সফর ৬৭১ হিজরিতে কায়রো থেকে দামেস্কে পৌঁছে চূড়ান্ত যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করেন। অবশেষে একটি বিশাল বাহিনী প্রস্তুত হয়ে ইরাকের দিকে রওনা হয়। ৫ জমাদি-উল-আউয়াল সুলতানের ডান হাত আমীর সাইফ উদ্দিন কালাউন সসৈন্যে ফোরাত নদী পার হন। তাতারীদের একটি বাহিনী নদীর ওপারে মুসলমানদের পথ রোধ করার জন্য দাঁড়িয়ে ছিল। অন্যটি আল-বিরাহ শহর অবরোধ করে রেখেছিল। কালাউন প্রথমে নদী পার হয়ে তাতারীদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং তাদের একটি অংশকে পিষে ফেলেন। তাতার সেনাপতি আহত হন এবং কোনোমতে প্রাণ বাঁচিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। ইসলামী বাহিনী এবার আল-বিরাহ অভিমুখে যাত্রা করে। এই খবর পাওয়া মাত্রই তাতারীরা পালিয়ে যায়। সুলতান আল-বিরাহ পৌঁছে সীমান্ত ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করেন। এই সময়ে সিরিয়ায় বাতেনী ইসমাইলীদের দমন অভিযান অব্যাহত ছিল এবং তাদের শেষ তিনটি দুর্গ: “কাদমুস”, “কাহাফ” এবং “মানিকা”ও জয় করা হয়। এই অভিযানগুলো জমাদি-উল-আখিরা মাসে সম্পন্ন হয়। রাজকীয় বাহিনী একদল তাতার বন্দীকে সাথে নিয়ে দামেস্কে ফিরে এলে তাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। [১]

সুলতান বাইবার্সের পুনরায় দামেস্কে আগমন:

সফর ৬৭২ হিজরিতে সুলতানকে পুনরায় দামেস্কে দেখা যায়, কারণ হালাকু খানের ছেলে আবাকা খান নিজেই ইরান থেকে সৈন্য নিয়ে বাগদাদে চলে এসেছিল। সুলতান মিশর থেকে আরও সৈন্য আনিয়ে নেন। মুসলমানদের এই প্রস্তুতির খবর পেয়ে তাতারীদের অগ্রসর হওয়ার সাহস হয়নি। [২]

ব্রিটেনে আবাকা খানের দূতাবাস:

আবাকা খান এখন ইউরোপীয় রাজাদের সাথে নিয়ে একটি চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরু করার পরিকল্পনা করতে থাকেন। তিনি পোপের কাছে তার দূত পাঠান। এরপর দূতরা ব্রিটেনের শাসক রাজা এডওয়ার্ডের সাথে দেখা করেন, যিনি কয়েক বছর আগে ফিলিস্তিনে সুলতান বাইবার্সের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। দূতরা রাজা এডওয়ার্ডের কাছে আবাকা খানের একটি পত্র পেশ করেন যাতে রাজাকে ফিলিস্তিন বিজয়ের জন্য পারস্পরিক চুক্তির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই দূতাবাস নিষ্ফল প্রমাণিত হয়। রাজা এডওয়ার্ড সে সময় তার সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ সমস্যায় ঝুঁকুনিতে জর্জরিত ছিলেন। যদিও ফিলিস্তিন দখলের আকাঙ্ক্ষা তার মন থেকে মুছে যায়নি, কিন্তু অভ্যন্তরীণ সমস্যার কারণে তিনি আবাকা খানের প্রস্তাবের কোনো ইতিবাচক উত্তর দিতে পারেননি। তিনি ফিরতি চিঠিতে লিখিয়েছিলেন:

“জেরুজালেমকে খ্রিস্টধর্মের শত্রুদের হাত থেকে মুক্ত করার সংকল্প অত্যন্ত বরকতময়। আমরা আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ। তবে আমরা এখনই নিশ্চিতভাবে বলতে পারছি না যে আমরা কখন ফিলিস্তিনে আসব।”

এই ঘটনাটি ৬৭৩ হিজরি (১২৭৪ খ্রিস্টাব্দ) এর। [৩]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: বছর ৬৭১ হিজরি

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: বছর ৬৭২ হিজরি

[৩] দ্য ক্রুসেডস বাই হ্যারল্ড ল্যাঙ্ক: পৃষ্ঠা; ৩৫৫, ৩৫৬

হ্যারল্ড ল্যাম্ব এই দূতিয়ালির ব্যর্থতায় দুঃখ প্রকাশ করে লিখেছেন:

“পরিস্থিতির এক অদ্ভুত পরিহাস ছিল যে, যখন ইউরোপের খ্রিস্টান শাসকরা তাদের নিজ নিজ দেশের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব লিপ্ত ছিল এবং ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের প্রতি তাদের কোনো আগ্রহ ছিল না, সেই সময়ে তাতাররা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল এবং জেরুজালেমকে মুসলমানদের কাছ থেকে পুনরুদ্ধার করার জন্য কোমর বেঁধে লেগেছিল।” [১]

এশিয়া মাইনরের সীমান্তে আক্রমণ:

৬৭৩ হিজরির শাবান মাসে সুলতান মিসর থেকে এক দীর্ঘ সফর শুরু করেন এবং উত্তর সিরিয়ার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এশিয়া মাইনরে আক্রমণ চালান এবং সিস, মাসিসা ও আদনার দুর্গম এলাকাগুলো জয় করেন। এই অভিযান রমজানের শেষ দশকে শুরু হয়ে দুই মাস অব্যাহত থাকে। জিলহজ মাসে সুলতান দামেস্কে ফিরে আসেন। [২]

আল-বিরায় তাতারদের আরও একটি ব্যর্থ আক্রমণ:

তাতাররা আবারও আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ৬৭৪ হিজরির জমাদিউল আখিরা মাসে তারা রোমানদের সাথে নিয়ে আল-বিরায় পুনরায় আক্রমণ করে। এই বাহিনীতে ১৫ হাজার তাতার এবং ১৫ হাজার রোমান ছিল। ২৩টি মানজানিক দিয়ে শহরের ওপর পাথর বর্ষণ শুরু করা হয়। কিন্তু আল-বিরার সেনাবাহিনী ছিল উচ্চ সাহসী। তাদের গেরিলা দলগুলো অতর্কিত নৈশ হামলা চালিয়ে শত শত শত্রুকে হত্যা করে, রসদ লুট করে এবং মানজানিকগুলো পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। তাতারদের পক্ষ থেকে বসানো একটি ইউরোপীয় মানজানিকে একজন দক্ষ মুসলিম বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বাধ্য হয়ে ও অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেই কাফেরদের সাথে চলে এসেছিলেন, কিন্তু মনেপ্রাণে ইসলামের সমর্থক ছিলেন। আল-বিরার একজন সৈনিক প্রাচীরের ওপর মানজানিক বসিয়ে তাতারদের ইউরোপীয় মানজানিকটি ধ্বংস করার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু লক্ষ্যভেদ ঠিকমতো হচ্ছিল না। অবশেষে তাতারদের মানজানিক চালক চিৎকার করে বললেন: “যদি আল্লাহ তোমার একটি হাত ভেঙে দিতেন, তবে আল-বিরাবাসী তোমার মতো আনাড়ির হাত থেকে মুক্তি পেত।”

দেখতে এটি একটি বদদোয়া মনে হলেও বাস্তবে এটি ছিল পাথর নিক্ষেপ শিল্পের একটি সূক্ষ্ম রহস্য। আল-বিরার মানজানিক চালক বুঝতে পারলেন যে, কোণ (angle) এক হাত কমিয়ে লক্ষ্যভেদ করা উচিত। তিনি তাই করলেন এবং লক্ষ্য একদম ঠিক জায়গায় লাগল এবং তাতারদের মানজানিকটি ভেঙে গেল। [৩]

তাতার ও রোমানরা এগারো দিনের অবরোধের পর ১৯ জমাদিউল আখিরা ৬৭৪ হিজরিতে ব্যর্থ ও হতাশ হয়ে ফিরে গেল।

এর আগেই সুলতান প্রতিপক্ষকে ঘিরে ফেলার জন্য আল-বিরার দিকে রওনা হয়েছিলেন, কিন্তু যখন খবর পেলেন যে শত্রু ফিরে গেছে, তখন তিনি বাহিনীকে কায়রোতে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেন। [৪]

এশিয়া মাইনরের ওপর আবাকা খানের আধিপত্য:

তাতারদের লক্ষ্য এখন এশিয়া মাইনরের দিকে নিবদ্ধ হলো, যেখানে তৃতীয় খসরু বিন কিলিচ আরসালান চতুর্থ সিংহাসনে আসীন ছিলেন।

[১] The Crusades by Harold Lamb: p: 356

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: বছর ৬৭৩ হিজরি

[৩] তারিখুল মালিকিজ জাহির - ইব্রুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে শাদ্দাদ (মৃত্যু ৬৮৩ হিজরি), পৃষ্ঠা ১২৭, প্রকাশক Franz Steiner Verlag, 1983

[৪] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: বছর ৬৭৪ হিজরি

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস — চতুর্থ খণ্ড

...এর শাসনকাল ৬৬৩ হিজরি থেকে ৬৮১ হিজরি পর্যন্ত ছিল। তিনি অল্পবয়সী, অনভিজ্ঞ এবং দুর্বল শাসক ছিলেন, তাই আবাকা খান সহজেই এশিয়া মাইনরের (ইশিয়ায়ে কুচক) বড় অংশের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেন এবং সেলজুক শাসকের মর্যাদা কেবল নামমাত্র রয়ে যায়। [১]

আফ্রিকায় বিজয়সমূহ:

এই বছর সুলতানের মিশরীয় বাহিনী আফ্রিকায় বিজয় লাভ করে। সুদান এবং বিলাদুন নুবাহর অঞ্চলগুলো দীর্ঘকাল পর মুসলমানদের হস্তগত হয়। এখানকার রাজা বন্দী হন এবং অধিবাসীদের ওপর জিজিয়া ধার্য করা হয়। এভাবে মামলুক সালতানাত অত্যন্ত বিস্তৃত হয়। [২]

একটি ঐতিহাসিক যুদ্ধ - আল-বিস্তিনের যুদ্ধ:

১৩ মহররম ৬৭৫ হিজরিতে সুলতানকে পুনরায় দামেস্কে দেখা যায়। এখান থেকে রাজকীয় বাহিনী আলেপ্পোর (হালাব) দিকে রওনা হয় যাতে আমেনীয় খ্রিস্টানদের তাতারীদের পক্ষ নেওয়ার শাস্তি দেওয়া যায়। এই বাহিনী রোমানদের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীকে পিষ্ট করে এবং বিপুল সংখ্যক রোমানকে বন্দী করে। তাদের মধ্যে অনেক বন্দী ইসলাম গ্রহণ করেন।

১২ রবিউস সানি সুলতান আলেপ্পোতে তাঁর উত্তরাধিকারী আল-মালিক আস-সাজ্জদের বিয়ে সালতানাতের প্রখ্যাত আমির সাইফউদ্দিন কালাউনের কন্যার সাথে সম্পন্ন করান। শাওয়াল মাসে রাজকীয় কাফেলা দামেস্কে ছিল।

সুলতান তাতারীদের সাথে একটি চূড়ান্ত মোকাবিলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। জিলকদ মাসের শুরুতে আলেপ্পো পৌঁছে বাহিনী যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয় এবং অত্যন্ত দ্রুততার সাথে দরবন্দের গিরিপথগুলো অতিক্রম করে যা তাতারীদের সীমান্ত ছিল।

এখানে ৯ জিলকদ তাতারীদের অগ্রবর্তী বাহিনীর সাথে সংঘর্ষ হয় যা তিন হাজার অশ্বারোহীর সমন্বয়ে গঠিত ছিল। সুলতানের আমির সুনকুর আশকার তাদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন, কিন্তু মূল তাতার বাহিনী যাতে এগারো হাজার অশ্বারোহী ছিল, তারা পেছনে আসছিল। রাজকীয় বাহিনী পাহাড় অতিক্রম করে “আল-বিস্তিন” এর ময়দানে অবতরণ করে। রোমানরাও তাতারীদের সাহায্য করতে আসছিল কিন্তু সুলতানকে আসতে দেখে তারা ফিরে যায়। তাতারীরা সুলতানকে সামনে দেখে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে আক্রমণ করে। বেশি চাপ ছিল মুসলমানদের বাম পার্শ্বের ওপর যা এই আক্রমণে সামলে উঠতে পারেনি। কাতারগুলো এলোমেলো হয়ে গেলে সুলতানের রাজকীয় নিশানও স্থানচ্যুত হতে শুরু করে। তাতারীরা আক্রমণ চালিয়ে কাতারগুলো ছিন্নভিন্ন করে দেয় এবং এরপর ডান পার্শ্বের ওপর আক্রমণ করে। এই অবস্থা দেখে সুলতান তাঁর বিশেষ বাহিনীর সাথে ডান পার্শ্বের সাহায্যে যেতে চাইলেন, কিন্তু ফিরে তাকিয়ে দেখলেন বাম পার্শ্বও ধ্বংস হওয়ার পথে। সুলতান আমিরদের একটি দলকে তার সাহায্যের জন্য পাঠান এবং কিছুক্ষণ পর নতুন করে পুরো বাহিনীকে সংগঠিত করে একযোগে আক্রমণ করেন।

তাতারীরা মুসলমানদের চাপ দেখে ঘোড়া থেকে নেমে পদব্রজে যুদ্ধ করতে শুরু করে। উভয় পক্ষ যুদ্ধের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। অবশেষে আল্লাহর সাহায্য অবতীর্ণ হয় এবং তাতারীরা চারদিক থেকে ঘেরাও হয়ে যায়। মুসলমানরা তাদের লাশের স্তুপ বানিয়ে দেয়। শত শত তাতারী বন্দীও হয়। এই যুদ্ধে মুসলমানদের নামকরা আমিরগণ বীরত্ব প্রদর্শন করেন এবং শহীদ হন।

[১] জাইল মিরআতুয যামান লিল-ইউনিনি: সন ৬৭৪ হিজরি

[২] তারিখুল খুলাফা লিস-সুয়ুতি, পৃ. ৩৩৮, ত. নিজার

মুসলমানদের বিজয়ী বাহিনী ভূমধ্যসাগরের উপকূল ধরে ফিরে এলে রোমানরা তাদের ভয়ে কায়সারিয়া খালি করে দেয়। সুলতান কোনো যুদ্ধ ছাড়াই এটি জয় করেন এবং ১৪ই জিলকদ সেখানে জুমার নামাজ আদায় করেন।

ইসলামি বাহিনী উপকূল থেকে ফিরে যাওয়ার পর তাতারী খাকান আবাকা ছদ্মবেশ ধারণ করে নিজেই যুদ্ধক্ষেত্রে চলে আসে। নিজের বাহিনীর এই দশা দেখে সে দিশেহারা হয়ে পড়ে। সে ক্ষিপ্ত হয়ে ‘কায়সারিয়া’ এবং ‘আরজানুর রুম’-এর লোকদের সাধারণ গণহত্যার নির্দেশ দেয় এবং প্রায় দুই লক্ষ মানুষকে মৃত্যুর কোলে ঘুম পাড়িয়ে দেয়।

অন্যদিকে বিজয়ের পর সুলতানি বাহিনী দামেস্কে পৌঁছে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে খবর পাওয়া যায় যে, আবাকা নিজেই যুদ্ধক্ষেত্রে চলে এসেছে। সুলতান বাহিনী বিন্যস্ত করে আবাকার সাথে সরাসরি মোকাবিলা করার জন্য পুনরায় কুচকাওয়াজের নির্দেশ দেন। কিন্তু এরই মধ্যে গোয়েন্দাদের পক্ষ থেকে সর্বশেষ খবর আসে যে, আবাকা পূর্বদিকের দেশগুলোতে ফিরে গেছে। এর ফলে কুচকাওয়াজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। [১]

সুলতানের ইন্তেকাল

সুলতানের বিরুদ্ধে তলে তলে ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে গিয়েছিল। সুলতান বেশ কয়েকবার সময়মতো সেগুলোর প্রতিকার করেন এবং দায়ীদের শাস্তি দেন। ৬৭৪ হিজরিতে মিশরে অবস্থানকালে এমন বেশ কয়েকজন আমির ধরা পড়ে যারা তাতারীদের নিজেদের সমর্থনের আশ্বাস দিচ্ছিল এবং তাদের সিরিয়া ও মিশর আক্রমণের আমন্ত্রণ জানাচ্ছিল। সুলতান তাদের মৃত্যুদণ্ড দেন। [২]

হঠাৎ মৃত্যুর কারণ:

দামেস্কে ফিরে আসার পর সিরিয়ার আমিরদের সাথে সাক্ষাৎ চলছিল যারা তাতারীদের বিরুদ্ধে বিজয়ের জন্য অভিনন্দন জানাতে আসছিলেন। এমনই এক মজলিসে ১৪ই মহররম ৬৭৬ হিজরিতে সুলতান কোনো পানীয় পান করেন। মজলিস শেষ হওয়ার সাথে সাথেই সুলতানের শরীরে ব্যথা শুরু হয়। সকালে বমি শুরু হয়ে যায়। সেই সময় চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই তিনি কোনো ওষুধ সেবন করেন যার ফলে অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। অবশেষে চিকিৎসকরা আসেন এবং পরীক্ষার পর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, পাকস্থলীতে বিষ ছড়িয়ে পড়েছে। জোলাপ দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। পাতলা পায়খানার ওষুধ দেওয়া হয় কিন্তু এতে চরম দুর্বলতা দেখা দেয়, জ্বর জেঁকে বসে এবং মুখ দিয়ে রক্ত আসতে শুরু করে। এই অসুস্থতায় অবশেষে সুলতান বাইবার্স ২৭শে মহররম ৬৭৬ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

সুলতানের দাফন দামেস্কে সম্পন্ন হয়। তাঁর বয়স ছিল প্রায় ৫১ বছর। মৃত্যুর খবর গোপন রাখা হয়েছিল। যখন কায়রোতে সুলতানের পুত্র আল-মালিক আল-সাইদের হাতে বায়আত সম্পন্ন হয়, তখন সুলতানের মৃত্যুর ঘোষণা দেওয়া হয়। [৩]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: সন ৬৭৫ হিজরি

[২] আস-সুলুক লি-মা’রিফাতিল দুওয়ালিল মুলুক: সন ৬৭৩ হিজরি

[৩] তারিখুল মালিকিজ জাহির ইবনে শাদ্দাদ, পৃষ্ঠা ২২৩ থেকে ২২৫; আস-সুলুক লি-মা’রিফাতিল দুওয়ালিল মুলুক মাকরিজি: সন ৬৭৬ হিজরি

সুলতানের মৃত্যু সংক্রান্ত একটি দুর্বল বর্ণনা:

সুলতানের মৃত্যু সম্পর্কে একটি বর্ণনা এমনও রয়েছে যে, তিনি আইয়ুবী বংশের রাজপুত্র আল-মালিক আল-কাহির বিন আল-মালিক আল-মুয়াযযাম ঈসাকে হত্যা করার জন্য তাকে একটি বিষযুক্ত পানীয়র পেয়ালা পেশ করেন। কিছুক্ষণ পর সুলতান ভুলবশত নিজেও সেই পেয়ালা থেকে পানীয় পান করেন। উভয়ই তৎক্ষণাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। আল-মালিক আল-কাহির সেই রাতেই মৃত্যুবরণ করেন এবং সুলতান কয়েক দিন পর। এই বর্ণনাটি হাফিজ ইবনে কাসীর (রহ.) কোনো সমালোচনা ছাড়াই উদ্ধৃত করেছেন, তবে এটি গ্রহণ করা প্রশ্নসাপেক্ষ কারণ:

- আল-মালিক আল-কাহিরের সাথে সুলতানের কোনো শত্রুতা ছিল না। যুক্তির নিরিখে এটি কঠিন মনে হয় যে, সুলতান এমন একজন নিরীহ মানুষকে ভরা মজলিসে বিষ পান করানোর চেষ্টা করবেন।
- যদিও তকদিরের লিখন অনুযায়ী মৃত্যুর যেকোনো উসিলা হওয়া অসম্ভব নয়, তবে সুলতানের মতো একজন চতুর ব্যক্তির পক্ষে এটি সুদূরপরাহত যে, তিনি সেই পেয়ালা থেকেই পান করবেন যাতে তার নিজের নির্দেশেই বিষ মেশানো হয়েছিল।
- সুলতানের মজলিসের উভয় জীবনীকার: ইযযুদ্দীন ইবনে শাদাদ এবং আল্লামা মুহিউদ্দীন তাদের ইতিহাসে সুলতানের মৃত্যুর কারণ হিসেবে অসুস্থতার কথাই উল্লেখ করেছেন। বিষপানের উক্ত ঘটনার কোনো উল্লেখ করেননি।

যদি মৃত্যুর কারণ সত্যিই বিষপান হয়ে থাকে, তবে যুক্তিযুক্ত কথা হলো কোনো শত্রু সুলতানকে হত্যা করার জন্য পানীয়তে বিষ মিশিয়ে থাকবে, কারণ আমিরদের মধ্যে সুলতানের বিরোধী পক্ষ বিদ্যমান ছিল যারা এর আগে কয়েকবার সুলতানকে হত্যা করে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেছিল। এটি তাদেরই কাজ হবে। সুলতান জানতেন না যে পেয়ালায় বিষ আছে। ফলে সম্মান প্রদর্শনার্থে বিষযুক্ত পানীয়র নিজের বিশেষ পেয়ালাটি প্রথমে মেহমানকে বাড়িয়ে দেন এবং এরপর নিজের অজান্তেই তা থেকে নিজেও পান করেন। এভাবে প্রথমে মেহমান এবং এরপর সুলতান পরলোকগমন করেন। ওয়াল্লাহু আলাম।

ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে সুলতান বাইবার্স:

হাফিজ ইবনে কাসীর (রহ.) সুলতানের জীবনীর ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন:

“আল-মালিক আয-যাহির তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান, সাহসী, উচ্চাভিলাষী এবং গভীর স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। তিনি রাষ্ট্রের জন্য চিন্তিত থাকতেন, ইসলামের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং শাসকসুলভ গুণাবলীতে ভূষিত ছিলেন। ইসলাম ও ইসলামপন্থীদের বিজয় ও সাহায্যের মতো নেক কাজই ছিল তার লক্ষ্য।”

এরপর তিনি তার বিজয়সমূহ এবং নির্মাণকাজের কথা উল্লেখ করে লিখেছেন:

“তিনি আল্লাহর পথে জিহাদে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও এমন সব চমৎকার স্মৃতিচিহ্ন ও ইমারত রেখে গেছেন যা খলিফাদের এবং বনু আইয়ুবের যুগেও নির্মিত হয়নি। তিনি এক বিশাল সেনাবাহিনী গঠন করেন এবং তার কাছে আসা তিন হাজার তাতারীকেও জায়গির ও চাকরি প্রদান করেন। তিনি পানাহারের বিষয়ে পরিমিতিবোধ সম্পন্ন ছিলেন এবং তার সেনাবাহিনীর অবস্থাও ছিল তদ্রূপ।”

তিনিই আব্বাসীয় খেলাফত বিলুপ্ত হওয়ার পর পুনরায় তা জীবিত করেন, যদিও তিন বছর পর্যন্ত মুসলমানরা খলিফা ছাড়াই ছিল। তিনি প্রতিটি মাযহাব অনুযায়ী আলাদা আলাদা কাযিউল কুযাত নিয়োগ করেন। তিনি ছিলেন সচেতন, সাহসী ও বীর। তিনি...

শত্রুদের সাথে দিনরাত মোকাবিলা করেও তিনি ক্লান্ত হতেন না। বরং তিনি ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুদের মুখোমুখি হতেন এবং তাদের ঐক্য ও সংহিতিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে, আল্লাহ এই শেষ যুগে তাকে ইসলাম ও মুসলমানদের সাহায্যের জন্য দাঁড় করিয়েছিলেন। তিনি ধর্মহীন অর্থাৎ ফিরিস্টি, তাতার এবং মুশরিকদের গলায় কাঁটা হয়ে বিঁধে ছিলেন। তিনি মদ্যপান বন্ধ করে দিয়েছিলেন এবং পাপাচারীদের শহর থেকে বহিস্কার করেছিলেন। তিনি মন্দ ও বিশৃঙ্খলার কোনো কিছু দেখলেই পূর্ণ শক্তি দিয়ে তা নির্মূল করার চেষ্টা করতেন। তিনি তিন ছেলে ও সাত মেয়ে রেখে গেছেন। তার বয়স ৫০ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে ছিল। [১]

আল্লামা মাকরিজি (রহ.) লিখেছেন:

“আল্লাহ মানুষের অন্তরে এই কথা গেঁথে দিয়েছিলেন যে, শত্রুদের বিতাড়িত করার ক্ষেত্রে সুলতান একাই বহু সৈন্যবাহিনীর সমান। আর তার নামই শত্রুদের সব দিক থেকে পিছু হটতে বাধ্য করে।” [২]

নির্মাণ ও উন্নয়নমূলক কাজ

সুলতান বাইবার্স কেবল জিহাদই করেননি, বরং তার শাসনকালে প্রচুর উন্নয়নমূলক কাজও করিয়েছেন এবং নিঃসন্দেহে এর কঠোর প্রয়োজনও ছিল। কারণ তাতার ও ক্রুসেডারদের আক্রমণে মুসলিম বিশ্বের অনেক শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। অনেক জনবহুল শহরে জরুরি অবস্থার কারণে বছরের পর বছর ধরে কোনো উন্নয়নমূলক কাজ হয়নি। কত প্রাচীন ইমারত এমনকি পবিত্র স্থানগুলোরও নির্মাণ ও মেরামতের প্রয়োজন ছিল। বাইবার্স এই সমস্ত প্রয়োজনের দিকে মনোযোগ দেন।

গুরুত্বপূর্ণ নির্মাণ অভিযান:

শাসনের প্রথম বছর ৬৫৯ হিজরিতেই তিনি সালতানাতের আমিরদের বেশ কয়েকটি আলাদা দল গঠন করে বহুমুখী উন্নয়নমূলক কাজের অভিযান শুরু করেন। এই অভিযানের প্রধান লক্ষ্যগুলো ছিল নিম্নরূপ:

- মসজিদে নববীর পুনর্নির্মাণ
- বাইতুল মুকাদ্দাসের পুনর্নির্মাণ
- মিসরের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি “কালআতুর রওজা” যা বিগত যুদ্ধগুলোতে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, তা নতুন করে নির্মাণ করা
- গিজায় নীল নদের ওপর সেতু নির্মাণ
- আলেকজান্দ্রিয়া শহরের প্রাচীর পুনর্নির্মাণ
- ভূমধ্যসাগরের উপকূলে “রশিদ”-এ একটি আকাশচুম্বী মিনার নির্মাণ: যাতে ক্রুসেডারদের জাহাজের ওপর নজর রাখা যায়

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৬৭৬ হিজরি

[২] আস-সুলুক লি-মা’রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ২/৬৩, ত. ইলমিয়াহ

- দমইয়াত সমুদ্র উপসাগরের মোহনা সংকীর্ণ করার বিস্ময়কর পরিকল্পনা: যাতে ফিরিজিদের জাহাজ শহরের কাছে আসতে না পারে।
- সিরিয়ার নিম্নোক্ত দুর্গগুলোর মেরামত ও সুদৃঢ়করণ: দামেস্ক দুর্গ, সালাত দুর্গ, আজলুন দুর্গ, সারখাদ দুর্গ, বসরী দুর্গ, শায়জার দুর্গ, সালিবিয়া দুর্গ, শামীশ দুর্গ, হিমস দুর্গ। এই সমস্ত দুর্গের প্রাচীর মজবুত করা হয়েছে, পরিখা পরিষ্কার করা হয়েছে, বুরুজ মজবুত ও উঁচু করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটিতে প্রয়োজন অনুযায়ী সৈন্য মোতায়েন করে শস্য ও অস্ত্রশস্ত্রে পূর্ণ করা হয়েছে।
- আইন জালুতের ময়দানে বিজয়ের স্মারক নির্মাণ।
- সিরিয়ার কৃষকদের সচ্ছল করার জন্য তাদের মধ্যে শস্য বিতরণ।

এই উদ্দেশ্যগুলোর জন্য বাইবার্স অটেল পুঁজি সরবরাহ করেছিলেন। এই পরিকল্পনাগুলো কয়েক বছরে সম্পন্ন হয়েছিল। [১]

যোগাযোগ ব্যবস্থায় উন্নতি - নৌযান শিল্প:

ডাক ও সংবাদ আদান-প্রদানের দ্রুততম ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল, যার গতির আন্দাজ এখান থেকে করা যায় যে, কায়রোর কেল্লাতুল জাবালে অবস্থিত ডাক বিভাগ থেকে পাঠানো বার্তা চার দিনে দামেস্কে পৌঁছে যেত। প্রতি সপ্তাহে দুবার সিরিয়া ও মিশরের খবর আদান-প্রদান হতো, যেখানে আগে কমপক্ষে দশ দিনের সফর ছিল। নৌ শক্তি বৃদ্ধি করা হয়েছিল। যুদ্ধজাহাজ তৈরির কাজ ত্বরান্বিত করা হয়েছিল। বাইবার্সের কাছে নৌবাহিনীর গুরুত্ব এত বেশি ছিল যে, তিনি নিজেই জাহাজ তৈরির কারখানায় গিয়ে নিজের তত্ত্বাবধানে এই কাজ করাতেন। [২]

আলেকজান্দ্রিয়া উপসাগর খনন:

আলেকজান্দ্রিয়া উপসাগরে পানির স্তর কমে গেলে সুলতান অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তা খনন করান যাতে তা পুনরায় জাহাজ চলাচলের উপযোগী হয়। [৩]

সেতু ও কাসরে আবলাক:

৬৬৫ হিজরিতে ‘বিসওয়াস’-এর কাছে ‘বুহাইরা আবি আল-মুনজা’-এর ওপর একটি সেতু নির্মাণ করান যা তৎকালীন সময়ের এক মহান সেতু হিসেবে গণ্য হতো। দামেস্কের ময়দানে আখজারের সাথে বারদা নদীর তীরে সাদা ও কালো মার্বেল পাথরের একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করান যা ‘কাসরে আবলাক’ নামে পরিচিত হয়। এর চারদিকে বাগান ও নহরের বেষ্টিত ছিল। এই প্রাসাদ ৬৬৫ হিজরিতে নির্মিত হয়েছিল। দেড় শতাব্দী পর্যন্ত পুরো সিরিয়ায় এমন মনোরম ইমারত আর দ্বিতীয়টি ছিল না। ৮০৩ হিজরিতে তৈমুর লং এটি ধ্বংস করে দেন। [৪]

জাহিরিয়া প্রতিষ্ঠা:

সিরিয়ার সাদিরের কাছে আব্বাসিয়া নামে একটি জনপদ ছিল। সুলতান এর কাছে ‘জাহিরিয়া’ নামে আরও একটি জনপদ গড়ে তোলেন যাতে একটি জামে মসজিদও নির্মাণ করান। [৫]

[১] আস-সুলুক লি-মা’রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক, সন ৬৫৯ হিজরি।

[২] আস-সুলুক লি-মা’রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ২/৭, তাবা’ আল-ইলমিয়াহ।

[৩] আস-সুলুক লি-মা’রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ২/৫৩, তাবা’ আল-ইলমিয়াহ।

[৪] আস-সুলুক লি-মা’রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ২/৩৮, তাবা’ আল-ইলমিয়াহ।

[৫] আস-সুলুক লি-মা’রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক, সন ৬৬০ হিজরি।

মসজিদ নববীর পুনর্নির্মাণ:

মসজিদ নববীর সর্বশেষ সম্প্রসারণ ও সংস্কার দ্বিতীয় হিজরি শতকের মাঝামাঝি সময়ে খলিফা মাহদী করেছিলেন। পাঁচ শতাব্দী ধরে সেই ইমারতটিই চলে আসছিল। ৬৫৫ হিজরিতে আগ্নেয়গিরির লাভার কারণে মসজিদের ছাদ পুড়ে গিয়েছিল। তাতারীদের আক্রমণের সম্মুখীন হওয়ার কারণে খলিফা মুসতাসিম এদিকে মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ পাননি। পরবর্তীতে সুলতান সাইফউদ্দিন কুতুজ ৬৫৮ হিজরিতে একটি বৃহৎ প্রকল্পের অধীনে মসজিদের পুনর্নির্মাণ শুরু করেন, যা সুলতান বাইবার্স সম্পন্ন করেন। ইঞ্জিনিয়ার, কাঠমিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি, নকশাকার এবং অন্যান্য কারিগরি বিশেষজ্ঞদের একটি দল সমস্ত সরঞ্জামসহ সমুদ্রপথে মদিনায় পাঠানো হয়। ছাদ নতুন করে তৈরি করা হয় এবং মসজিদকে সব দিক থেকে সুন্দর করে তোলা হয়। [১]

রওজা আতহারের চারপাশে জালি:

৬৬৭ হিজরিতে সুলতান রওজা আকদাসের সুরক্ষা ও সম্মানের কথা বিবেচনা করে এর চারপাশে প্রথমবারের মতো একটি জালিযুক্ত ধাতব বেষ্টনী তৈরি করেন যা প্রায় বারো ফুট উঁচু ছিল। [২]

হরমাইন শরীফাইনের খিদমত:

মদিনা মুনাওয়ারার অধিবাসী এবং যিয়ারতকারীদের জন্য একটি বড় শফিখানা (হাসপাতাল) প্রতিষ্ঠা করেন যেখানে রোগীদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হতো। মসজিদে হারাম এবং মসজিদ নববীতে আলোর জন্য প্রতি বছর বিপুল পরিমাণে মোমবাতি এবং প্রদীপের জন্য জলপাই তেল পাঠানো হতো। হরমাইনের ফকীর ও দরিদ্রদের জন্য প্রতি বছর গমের একটি বিশাল চালানও পাঠানো হতো। [৩]

মাদরাসা জাহিরিয়া:

সুলতান কায়রোতে একটি নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মাদরাসা জাহিরিয়ার ভিত্তি স্থাপন করেন। এতে তিনি হানাফী ও শাফেয়ী উলামা ও ফকীহদের সমান পদমর্যাদা প্রদান করেন। ৫ সফর ৬৬১ হিজরিতে এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়, যার শান-শওকত দেখে একজন কবি বলেছিলেন:

الا هكذا تبني المدارس من بني ... ومن يتغالى في الثواب وفي الثنا

শোনো! মাদরাসা নির্মাতারা এবং সওয়াব ও প্রশংসায় উচ্চ মর্যাদা লাভকারীরা এভাবেই মাদরাসা নির্মাণ করে থাকেন। [৪]

মসজিদ “জামে আল-আজহার” এর সংস্কার, জামেয়া আল-আজহারের প্রতিষ্ঠা:

বনু উবাইদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মসজিদ “জামে আল-আজহার” ছিল কায়রোর প্রথম মসজিদ, যা জওহর উবাইদী নির্মাণ করে এখানে জুমার নামাজ শুরু করেছিলেন। দীর্ঘকাল এটি রাফয (শিয়া মতবাদ) প্রসারের কেন্দ্র ছিল। হাকেম উবাইদী যখন নতুন জামে মসজিদ নির্মাণ করেন, তখন জুমার নামাজ সেখানেই হতে থাকে এবং জামে আল-আজহার জনশূন্য হয়ে পড়ে।

[১] আস-সুলুক লি-মা'রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ১/৫৬২; তারিখুল মাক্কাতিল মুশাররাফাহ ওয়াল মাদিনাতিল শারিফাহ লি-ইবনি জিয়া, পৃ. ২৮৯, ত. আল-ইলমিয়াহ

[২] ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তফা লিস-সামহদী (মৃ. ৯১১ হি.): ২/১৫৯, ১৬০, ত. আল-ইলমিয়াহ

[৩] তারিখুল মালিকিজ জাহির লি-ইবনি শাদ্দাদ, পৃ. ৩০২, ৩০৩

[৪] আস-সুলুক লি-মা'রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ২/৩, ত. আল-ইলমিয়াহ

সুলতান বাইবার্স এই মসজিদের আমূল সংস্কার করে একে এক মনোরম রূপ দান করেন। ১৮ই রবিউস সানি ৬৬৫ হিজরিতে উলামা ও ফকিহদের অনুমতিক্রমে এখানে পুনরায় জুমার নামাজ শুরু করা হয়। এর জন্য বিভিন্ন লোকের দখলে থাকা বিভিন্ন জায়গির ওয়াকফ করা হয়। সুলতান এর জন্য আলাদাভাবে নগদ অর্থও বরাদ্দ করেন। সুলতান এখানে একটি দরসগাহও কায়েম করেন, যাতে মুদাররিস, ফকিহ ও কুররাদের নিয়োগ দেওয়া হয়। এই দরসগাহই পরবর্তীতে “জামেয়াতুল আজহার” নামে পরিচিত হয় এবং আজ পর্যন্ত তা বিদ্যমান রয়েছে। [১]

জামে আল-হুসাইনিয়ার নির্মাণ:

সুলতান মিসরে “জামে আল-হুসাইনিয়া” নামে একটি নতুন জামে মসজিদও নির্মাণ করান। ৬৬৬ হিজরিতে যখন ইয়াফা বিজিত হয়, তখন এর দুর্গের কাঠ জাহাজের মাধ্যমে মিসরে পাঠানো হয়, যা এই মসজিদ নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছিল। [২]

নববিজিত এলাকাগুলোতে মসজিদ নির্মাণ:

সিরিয়ার নববিজিত এলাকাগুলোতে সুলতান সর্বত্র জামে মসজিদ নির্মাণ করান এবং সেখানে খ্রিস্টানদের শাসনামলে প্রচলিত মন্দ প্রথা ও অনাচার নির্মূল করেন। [৩]

বাইতুল মুকাদাসের খিদমতের জন্য প্রতিষ্ঠান:

বাইতুল মুকাদাস জিয়ারতের জন্য যারা পায়ে হেঁটে যেতেন, তাদের জন্য একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান কায়েম করা হয়েছিল যা এই ধরনের জিয়ারতকারীদের জন্য পাথেয়, জুতো এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যবস্থা করত। এই প্রতিষ্ঠানের আয়ের জন্য সিরিয়ায় জায়গির ওয়াকফ করা হয়েছিল। [৪]

জামে দামেস্কের নতুন ব্যবস্থাপনা:

জামে দামেস্কে মুজাওয়ির এবং স্থায়ীভাবে অবস্থানকারী ইবাদতকারীদের ভিড় হয়ে গিয়েছিল, যার ফলে মসজিদে জায়গা সংকীর্ণ হয়ে পড়ছিল। সুলতান মসজিদে কারো অবস্থানের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। এভাবে মসজিদে মুসল্লিদের জন্য অধিক জায়গার সংস্থান হয়। [৫]

উন্নত গোয়েন্দা বিভাগ:

সুলতান বাইবার্স মামলুক সালতানাতে গোয়েন্দা বিভাগকে অত্যন্ত সক্রিয় করে তুলেছিলেন। দেশের ভেতরে ও বাইরে সর্বত্র তথ্যদাতা নিযুক্ত ছিল এবং সুলতান সময়মতো গুরুত্বপূর্ণ খবর পেতেন। সুলতান অনেক ক্ষেত্রে নিজের গোয়েন্দাদের মাধ্যমে গোপন অভিযান পরিচালনা করতেন।

[১] আস-সুলুক লি-মা’রিফাত দুওয়ালিল মুলুক: ২/৩২, ত. আল-ইলমিয়াহ; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: সন ৬৬৫ হিজরি। কিছু লোক ফাতেমিদের আল-আজহারের প্রতিষ্ঠাতা মনে করেন, এটি ভুল। ফাতেমিরা শুধু একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিল যার নাম ছিল “জামে আল-আজহার”। দরসগাহ সুলতান বাইবার্স কায়েম করেছিলেন যা “জামেয়াতুল আজহার” নামে পরিচিত হয়।

[২] আস-সুলুক লি-মা’রিফাত দুওয়ালিল মুলুক: ২/৩১, ৩৮, ত. আল-ইলমিয়াহ।

[৩] আস-সুলুক লি-মা’রিফাত দুওয়ালিল মুলুক: ২/৩৮, ত. আল-ইলমিয়াহ।

[৪] আস-সুলুক লি-মা’রিফাত দুওয়ালিল মুলুক: ২/১৩, ত. আল-ইলমিয়াহ।

[৫] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: সন ৬৬৫ হিজরি।

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস - চতুর্থ খণ্ড

কাজও খুব ভালোভাবে নিতেন। এই চালগুলোর মাধ্যমে কখনো সুলতানের শত্রুরা নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ে লিপ্ত হতো এবং সুলতানের বিরোধীরা তাঁর সমর্থক হয়ে যেত। আপনারা ইতিপূর্বে পড়েছেন যে, সুলতান কীভাবে হালাকু খানের একজন যোগ্য মুসলিম আমিরকে গোয়েন্দাদের সাহায্যে নিজের দরবারে আসতে বাধ্য করেছিলেন এবং তাকে বিন্দুমাত্র সন্দেহ হতে দেননি যে এটি সুলতানের একটি পরিকল্পনা ছিল। এই গোয়েন্দাদের মাধ্যমেই সুলতান মাঝেমাঝে জাতি-বিক্রেতা আমীরদেরকে তাদের পরিণতির দিকে পৌঁছে দিতেন। এর একটি উদাহরণ পেশ করা হলো।

জাইন হাফিজি নামক এক জিন্দিক হেকিম ছিল যে হালাকু খানের কর্মচারী ছিল। সে ধন-সম্পদ ও পদের লোভে নিজের ঈমান বিক্রি করে দিয়েছিল। মোসুলের ওপর তাতারীদের আধিপত্য বিস্তারে সে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। দামেস্কের ওপর তাতারীদের আক্রমণের সময় সে মুসলমানদের অনেক কষ্ট দিয়েছিল।

অবশেষে সুলতান বাইবার্স তার কাজ শেষ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। সুলতান এমন কিছু চিঠি তৈরি করলেন যাতে সুলতান জাইন হাফিজিকে নিজের বিশেষ ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি হিসেবে সম্বোধন করে তাতারীদের বিরুদ্ধে কিছু বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। সুলতানের গোয়েন্দারা গোপন কৌশলের মাধ্যমে এই চিঠিগুলো একের পর এক হালাকু খানের লোকদের হাতে পৌঁছে দিল। হালাকু খানের কাছে যখন এই চিঠিগুলো পৌঁছাল, সে জাইন হাফিজিকে তলব করল এবং বলল:

“তোমার বিশ্বাসঘাতকতা এবং হুকুমতগুলোর সাথে প্রতারণা আমার কাছে প্রমাণিত হয়েছে। প্রথমে তুমি বালবাকের শাসকের চিকিৎসক ছিলে। তারপর হিমস দুর্গের কর্মচারী ছিলে। তারপর আল-মালিক আন-নাসিরের ভৃত্য হলে এবং সবার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলে। তারপর আমার দরবারে আসলে এবং আমি তোমার সাথে ভালো ব্যবহার করলাম কিন্তু তুমি আমাকেও ধোঁকা দিলে। তুমি মিশরের সুলতানের সাথে চিঠিপত্র আদান-প্রদান করছ।”

একথা বলে হালাকু খান তাকে নিকৃষ্টতম শাস্তি দিয়ে হত্যা করাল এবং তার সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজনকেও ধ্বংস করে দিল। [১]

হাফিজ ইবনে কাসীর (রহ.) তার পরিণতির কথা উল্লেখ করে লিখেছেন:

“وَكَذَلِكَ نُؤَيِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ”

(আর এভাবেই আমি জালেমদেরকে তাদের আমলের কারণে একে অপরের ওপর চাপিয়ে দিই।) [২]

যাই হোক, যে কেউ কোনো জালেমকে সাহায্য করে, আল্লাহ সেই জালেমকেই তার ওপর চাপিয়ে দেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ জালেমদের মাধ্যমে জালেমদের থেকে প্রতিশোধ নেন। তারপর তিনি সমস্ত জালেমদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। আমরা আল্লাহর ক্রোধ, তাঁর শাস্তি এবং তাঁর বান্দাদের অনিষ্ট থেকে তাঁর দরবারে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। [৩]

[১] তারিখুল ইসলাম লিদ-জাহাবি, ওফাত সন: ৬৬২ হিজরি।

[২] সূরা আল-আনআম, আয়াত নম্বর ১২৯, অনুবাদ: হযরত মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি।

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৭/৫৮৭, দার হিজর। ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে এই ধরনের গোপন পদক্ষেপ গ্রহণ করা শরীয়ত বিরোধী নয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) কাব বিন আশরাফের মতো ইসলামের শত্রুকে এভাবেই হত্যা করিয়েছিলেন। সুলতান বাইবার্সের এই পদক্ষেপকে হাফিজ ইবনে কাসীর (রহ.) কর্তৃক উদ্ধৃত করাও প্রকাশ করে যে আসলাফ এই ধরনের পদক্ষেপকে রাজনৈতিক শরীয়তের অংশ মনে করতেন।

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

ব্যক্তিগত গুণাবলি

সুলতান বাইবার্স ছিলেন একজন অত্যন্ত শক্তিশালী, বুদ্ধিমান ও সচেতন মানুষ। তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত পুরোপুরি কর্মব্যস্ততায় অতিবাহিত হতো।

উলামা ও মাশায়েখদের সাথে সম্পর্ক:

তিনি উলামা, ফুকাহা, মাশায়েখ ও দরবেশদের অত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং তাঁদের সম্মান ও মর্যাদাদানে কোনো ত্রুটি করতেন না। শেখ খিজির বিন আবু বকর রহ.-এর সাথে তাঁর সংশোধনমূলক সম্পর্ক ছিল। দামেস্কে শেখ ইউসুফ খুজামি, শেখ আলী তুর্কমানি এবং শেখ ইবরাহিম আরমানি রহ.-এর সাথে প্রায়ই তাঁর বৈঠক হতো। একইভাবে নাবলুসের শেখ কুফায়ি এবং আলেকজান্দ্রিয়ার শেখ কাবারি রহ.-এর খিদমতে তিনি উপস্থিত হতেন। নিজের অভিযানগুলোর জন্য তাঁদের কাছে দোয়ার আবেদন করতেন। আল-কুদস, হিমস, দামেস্ক, বালবাক এবং হামাতে তিনি মাশায়েখ ও ফুকরাদের জন্য অনেক খানকাহ নির্মাণ করেছিলেন। উলামা ও ফুকাহাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন এবং প্রায়ই তাঁদের থেকে পরামর্শ নিতেন। হারামাঈন শরিফাইনের বুজুর্গ ও খাদেমদের ওপর অত্যন্ত উদারভাবে ব্যয় করতেন। [১]

ধর্মীয় সহনশীলতা:

তাঁর স্বভাবে ধর্মীয় সহনশীলতা ছিল। মিসরে চার মাযহাবের জন্য আলাদা আলাদা কাজিউল কুজাত নিযুক্ত করেছিলেন। শাফেয়িদের জন্য তাজউদ্দীন আবদুল ওয়াহাব, হানাফিদের জন্য শামসুদ্দীন সুলাইমান, মালিকিদের জন্য শেখ সুবকি এবং হাম্বলিদের জন্য শেখ মুহাম্মদ আল-মাকদিসি রহ.। হাফেজ ইবনে কাসির রহ. বিচার বিভাগের এই পুনর্গঠনে আনন্দ প্রকাশ করে লিখেছেন: “এটি এমন এক কীর্তি যার দৃষ্টান্ত পূর্ববর্তী যুগে পাওয়া যায় না। আর আলহামদুলিল্লাহ আজ পর্যন্ত এই নিয়মই চলে আসছে।” [২]

সালাতের পাবন্দি ও পাপাচার থেকে বিরত থাকা:

সফর হোক বা অবস্থান, সুলতান অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতেন। সকল আমির, কর্মচারী ও সৈন্যদেরও সালাতের পাবন্দি করতে বাধ্য করেছিলেন। এর জন্য তিনি পরিদর্শক ও সংবাদদাতা নিযুক্ত করেছিলেন যাতে দেখা যায় যে মানুষ সময়মতো গুরুত্বের সাথে সালাত আদায় করছে কি না। পুরো সালতানাতে কর্মচারীদের প্রতিটি দলের জন্য সালাত পড়ানোর ইমাম এবং কুরআন শেখানোর জন্য কারি নিযুক্ত করেছিলেন। সুলতানের সমসাময়িক ঐতিহাসিক ইবনে শাদ্দাদ রহ.-এর বক্তব্য হলো, সুলতান সারা জীবনে কখনো মদ পান করেননি। পুরো সালতানাতে মদ নিষিদ্ধ ছিল। একইভাবে দেহব্যবসা ও ব্যভিচারের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা ছিল। কারো সাহস হতো না যে ইসলামি সীমা লঙ্ঘন করবে এবং বিপথগামী হবে। [৩]

[১] তারিখুল মালিকিজ জাহির লি ইবনে শাদ্দাদ, পৃ. ২৭২ থেকে ২৭৬

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: সন ৬৬৩ হিজরি, ৬৬৪ হিজরি

[৩] তারিখুল মালিকিজ জাহির লি ইবনে শাদ্দাদ, পৃ. ৩০০ থেকে ৩০২

বন্ধুত্ব রক্ষা করা:

সুলতান দাসত্ব থেকে রাজত্ব পর্যন্ত সফর করেছিলেন। এই সময়ে তিনি ভালো-মন্দ সব ধরনের মানুষের মুখোমুখি হয়েছিলেন। তিনি বন্ধুদের বন্ধু ছিলেন। স্বার্থপর ও মতলববাজ ছিলেন না। তিনি সম্পর্ক বজায় রাখতে জানতেন, ছিলেন বিনয়ী, লজ্জাশীল এবং সাহসী।

আমির বদরুদ্দিন শামসি তাঁর দুধভাই এবং শৈশবের বন্ধু ছিলেন। শৈশবে দুজনেই বন্দী হন এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। কুদরতে ইলাহি সিওয়াসের গোলামের বাজারে তাঁদের পুনরায় একে অপরের সাথে দেখা করিয়ে দেন। দীর্ঘ সময় পর হালবে পুনরায় তাঁদের দেখা হয়। এরপর উমরাগণ তাঁদের ক্রয় করলে তাঁরা আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। দীর্ঘ সময় পর অবশেষে আল-মালিক আস-সালিহ আইয়ুবের সেনাবাহিনীতে তাঁরা পুনরায় একত্রিত হন। এরপর দুজনেই একে অপরের সাথে বন্ধুত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন এবং সর্বদা একসাথে থাকেন। বাইবার্স যখন সুলতান হলেন, তখনও এই বন্ধুর সাথে তাঁর সেই অকৃত্রিম সম্পর্ক বজায় ছিল এবং তাঁর সাথে সর্বদা উত্তম আচরণ করতেন।

বাইবার্স দীর্ঘ সময় আইয়ুবি সুলতানদের অধীনে কর্মরত ছিলেন। যখন তিনি বাদশাহ হলেন, তখন আইয়ুবি শাহজাদা ও উমরাদের সাথে সর্বদা ভালো ব্যবহার করতেন। তাঁদেরকে তাঁদের শহরের শাসনভার ও পদে বহাল রাখেন। তাঁদেরকে ইনাম ও ইকরাম প্রদান করতেন এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁদের সম্মান বৃদ্ধি করা সুলতানের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল।

আমির সানকার আশকারও তাঁর পুরনো বন্ধু ছিলেন। দুজনেই যৌবনের অভিযানে একসাথে ছিলেন। রাজত্ব লাভের পরও তাঁদের সম্পর্কের কোনো পরিবর্তন হয়নি। যখন সানকার আশকার তাতারীদের হাতে বন্দী হন, তখন সুলতান তাতারীদের মিত্র আরমেনিয়ার খ্রিস্টান শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন এবং সন্ধির বিনিময়ে তাতারীদের কাছ থেকে নিজের বন্ধুকে মুক্ত করে আনেন। আমির সাইফুদ্দীন কালাউনও তাঁর দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত সঙ্গী বরং ডান হাত ছিলেন। বাইবার্স রাজত্ব পাওয়ার পর তাঁর মেয়ের সাথে নিজের উত্তরাধিকারীর বিয়ে দিয়ে বন্ধুত্বকে আত্মীয়তায় রূপান্তর করেন। [১]

ন্যায়বিচার ও ইনসাফ:

যদিও তিনি কঠোর শাসন ও ধরপাকড়ে অভ্যস্ত ছিলেন এবং অপরাধীদের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতেন, কিন্তু সাধারণ জনগণের ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের ছিলেন। তিনি বাদশাহ হয়েও একজন সাধারণ মানুষ এবং একজন সৈনিকের মতো জীবন অতিবাহিত করতেন। তাঁর মেজাজও ছিল সাধারণ মানুষের মতো। এই কারণে জনগণের কষ্ট তাঁকে মানসিকভাবে ব্যথিত করত এবং এর প্রতিক্রিয়ায় তিনি দায়িত্বশীলদের সাথে কঠোর আচরণ করতেন। মজলুমের সাহায্য ও ফরিয়াদ শোনার জন্য তিনি সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন।

আল্লামা ইবনে শাদ্দাদ লেখেন:

“সুলতানের ইনসাফের অবস্থা এমন ছিল যে, তাঁর আমলে কোনো আমির তো দূরের কথা, এমনকি কোনো ইহুদি বা নাসারাও কারো ওপর জুলুম করার সাহস পেত না। যখনই কোনো ইহুদি, নাসারা বা কোনো সাধারণ মানুষ সুলতানের কাছে অভিযোগ নিয়ে আসত, সুলতান তৎক্ষণাৎ ইনসাফ করতেন। তাঁর ইনসাফের কারণে সমস্ত প্রদেশের প্রজারা সন্তুষ্ট ছিল। প্রতি বছর মহররম, রজব, রমজান এবং জিলহজ মাসে...”

[১] তারিখুল মালিকুজ জাহির, পৃ. ২৯০ থেকে ২৯৩।

সমস্ত শহরের কারাগারগুলোতে বন্দীদের মামলাগুলো নতুন করে পর্যালোচনা করে অনেককে মুক্তি দেওয়া হতো। [১]

জনগণের ক্ষতি অসহনীয়:

নির্দেশ ছিল যে, যাত্রাপথে কোনো সৈন্য বা অফিসার যেন কারো ক্ষেত বা বাগানের সামান্যতম ক্ষতি না করে। একবার কিছু সৈন্য একটি ক্ষেতে ঢুকে পড়েছিল। সুলতান অভিযোগ পাওয়ামাত্র তাদের সবার নাক কেটে দেওয়ার নির্দেশ দেন।

আলম উদ্দিন হামভী নামক একজন অফিসারের মাধ্যমেও অনুরূপ কাজ সংঘটিত হয়েছিল। সুলতান তাকে এই শাস্তি দেন যে, তাকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে পায়ে হাঁটিয়ে নেওয়া হয় এবং ঘোড়ার জিনটি ক্ষেতের ক্ষতিপূরণ হিসেবে জমির মালিককে দিয়ে দেওয়া হয়। [২]

ছদ্মবেশে টহল দেওয়া:

সুলতান প্রায়ই ছদ্মবেশে মানুষের সাথে মিশে যেতেন এবং তার প্রতিনিধিদের কর্মকাণ্ডের খোঁজখবর নিতেন। যদি জানা যেত যে কোনো প্রতিনিধি জুলুম করছে, তবে সুলতান তাকে কঠোর শাস্তি দিতেন। একবার তিনি পশ্চিমা শহরগুলোর দিকে বের হলেন এবং ‘ওয়াসিম’ নামক একটি জনপদে অবস্থান করলেন। জানতে পারলেন যে, স্থানীয় শাসক ইবনে হাম্মাম, তার প্রতিনিধি এবং গোলামরা মানুষের ওপর জুলুম করছে। সুলতান তাকে গ্রেপ্তার করে শাসন করলেন এবং তার স্থলে অন্য একজন আমিরকে নিযুক্ত করলেন। [৩]

এক রাতে সুলতান ছদ্মবেশে কায়রোর বাজারে চক্কর দেওয়ার সময় দেখলেন যে, একজন অফিসার এক নারীকে অপমান করছে। আশেপাশে কিছু লোক দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছে, কেউ তাকে বাধা দিচ্ছে না।

সুলতান তাদের সবাইকে ভালোভাবে চিনে নিলেন। পরের দিন সবাইকে ডাকলেন এবং জল্পাদকে তলব করে সবার একটি করে হাত কেটে দিলেন। অফিসারকে তার দুশ্চরিত্রের জন্য এবং বাকিদের জুলুমের ওপর নীরব থাকার জন্য শাস্তি দেওয়া হলো। [৪]

ক্রোধ ও কঠোর শাস্তি:

কখনো কখনো তিনি শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বন করতেন, তবে ভুলের কথা অনুধাবন করানো হলে তিনি অবশ্যই তা সংশোধনের চেষ্টা করতেন। প্রায়ই তিনি শাস্তি দেওয়ার সময় কারো পরোয়া করতেন না, তবে কখনো কখনো সুপারিশ গ্রহণ করে নমনীয়তাও প্রদর্শন করতেন। একজন আতাবিকের হাতে অনিচ্ছাকৃতভাবে এক ব্যক্তি নিহত হয়। আতাবিক রক্তপণ দিয়ে উত্তরাধিকারীদের সন্তুষ্ট করেন। তা সত্ত্বেও সুলতান যখন এই সংবাদ পেলেন, তখন তিনি ওই আতাবিকের ওপর অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন। সুলতানকে বোঝানো হলো যে, উত্তরাধিকারীরা রক্তপণ গ্রহণ করে রক্ত মাফ করে দিয়েছে। বেশ কয়েকজন দরবারী ওই আতাবিকের জন্য সুপারিশ করার পর সুলতানের রাগ প্রশমিত হয়। [৫]

একবার সিরিয়া সফর থেকে ফেরার পথে সংবাদ পাওয়া গেল যে, কায়রোতে কয়েকদিন আগে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। সরকারি

[১] তারিখুল মালিকিজ জাহির লি-ইবনে শাদ্দাদ, পৃ. ২৮৩, ২৮৪

[২] আস-সুলুক লি-মা’রিফতি দুওয়ালিল মুলুক: ৩/৩৮, ত. আল-ইলমিয়াহ

[৩] আস-সুলুক লি-মা’রিফতি দুওয়ালিল মুলুক: ৩/২, ত. আল-ইলমিয়াহ

[৪] আস-সুলুক লি-মা’রিফতি দুওয়ালিল মুলুক: ২/৩৯, ৪০, ত. আল-ইলমিয়াহ

[৫] আস-সুলুক লি-মা’রিফতি দুওয়ালিল মুলুক: ১/৫৬১, ত. আল-ইলমিয়াহ

নোট: “আতাবিক” তুর্কি শব্দ। এটি মূলত “আতা” (পিতা) এবং “বিক” (সরদার) এর সমন্বয়ে গঠিত। “আতা” অর্থ পিতা এবং “বিক” অর্থ সরদার। এই উপাধি “বড় সরদার”, “নায়েবে সুলতান” বা “অল্পবয়স্ক বাদশাহর অভিভাবক”-এর জন্য ব্যবহৃত হয়। (ফিরোজুল লুগাত ফারসি-উর্দু, পৃ. ২৩, ১৫৯; মু’জামু মাতনিল লুগাত: ১/১৩০)

কর্মকর্তাদের মতে এই কাজ কিছু স্থানীয় ইহুদি ও খ্রিস্টান করেছিল। সুলতান অপরাধীদের তলব করলেন এবং জনগণের সমাবেশে তাদের কাঠের স্তূপের ওপর বেঁধে দিলেন। তারপর নির্দেশ দিলেন যেন তাদের পুড়িয়ে ফেলা হয়। আমির ফারিস উদ্দিন সামনে এগিয়ে এসে সুপারিশ করলেন এবং বললেন: “এইবার তাদের এই শর্তে ক্ষমা করে দেওয়া হোক যে, তারা সমস্ত আর্থিক ক্ষতির ক্ষতিপূরণ দেবে এবং ভবিষ্যতে কখনও এমন কাজ করবে না।”

সুলতান সুপারিশ গ্রহণ করলেন এবং অপরাধীদের থেকে জরিমানা নিয়ে তাদের ছেড়ে দেওয়া হলো। [১]

ক্ষমা ও মার্জনা:

মেজাজে একেবারেই সংকীর্ণতা ছিল না। তাকে সাধারণত জালিম ও স্বৈরাচারী হিসেবে প্রচার করা হয়েছে যা ভুল। যদিও তার থেকে কিছুটা জোর-জুলুম অবশ্যই প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু অন্যদিকে এমন ঘটনাও প্রচুর রয়েছে যখন তিনি বড় বড় শত্রুদের ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং বিন্দুমাত্র পরোয়া করেননি। তার বাদশাহ হওয়ার আগের ঘটনা যে, তিনি মিসর থেকে পালিয়ে দামেস্কে পৌঁছান যেখানে আল-মালিক আন-নাসিরের রাজত্ব ছিল। সেখানকার একজন আমির শামস উদ্দিন সুনকুর বাদশাহকে তাকে হত্যা করার জন্য প্ররোচিত করেন। তবে আল্লাহ বাইবার্সকে সেই শত্রুদের হাত থেকে বাঁচিয়ে নেন। সালতানাত লাভের পর বাইবার্স শামস উদ্দিন সুনকুরের এই কাজের জন্য কোনো জিজ্ঞাসাবাদ করেননি বরং তাকে ক্ষমা করে দেন। [২]

বদান্যতা:

স্বভাবগতভাবে তিনি উদার ও দানশীল ছিলেন। লাখ লাখ দিনার ও দিরহাম একযোগে দিয়ে দিতেন এবং কোষাগারে ঘাটতির বিন্দুমাত্র পরোয়া করতেন না। উমারা এবং সরকারি কর্মচারীদের জন্য খিলাত, উত্তম পোশাক, অস্ত্রশস্ত্র, সওয়ারি এবং অন্যান্য পুরস্কারের ধারা সর্বদা জারি থাকত। [৩]

মিসরে শস্যের দাম বেড়ে গেলে সুলতান খুব চিন্তিত হলেন। দরিদ্রদের বিনামূল্যে শস্য সরবরাহ করার ঘোষণা দিলেন। কেল্লার সামনে এক বিশাল জনসমাবেশ হলো। সুলতানের কাছে বাইতুল মালে এত শস্য ছিল না। তিনি বললেন:

“আল্লাহর কসম! যদি এত সৃষ্টির জন্য আমার কাছে শস্য থাকত তবে সব বিলিয়ে দিতাম।”

যেহেতু মানুষ সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত দাঁড়িয়ে ছিল, তাই সুলতান বললেন:

“সবাইকে এই মুহূর্তে আধা দিরহাম করে দিয়ে বিদায় করা হোক যাতে আজকের রুটির ব্যবস্থা করে নিতে পারে।”

তারপর তাদের সবার নাম তালিকাভুক্ত করালেন এবং আমির সারিমকে বললেন:

“এদের মধ্য থেকে একশ জন দরিদ্রের দায়িত্ব তুমি নাও। তাদের আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য খাবার খাওয়াবে।”

আমির সারিম বললেন: “অবশ্যই এমনটাই হবে।” সুলতান সমস্ত দরিদ্রদের তার আমিরদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন এবং তাকিদ দিলেন যে, প্রত্যেককে যেন তিন মাসের শস্য যেকোনোভাবে সরবরাহ করা হয়। [৪]

[১] আস-সুলুক লি-মা'রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ২/ ৪২৩, ৫, ত. আল-ইলমিয়াহ

[২] তারিখুল মালিকিজ জাহির লি-ইবনি শাদ্দাদ, পৃ. ২৯

[৩] তারিখুল মালিকিজ জাহির লি-ইবনি শাদ্দাদ, পৃ. ২৮৭

[৪] আস-সুলুক লি-মা'রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ২/ ৬০, ত. আল-ইলমিয়াহ

রমজানে সুলতান প্রতিদিন ৩০ জন গোলাম আজাদ করতেন এবং রান্না করা গোশত ও রুটি মানুষের মাঝে বিতরণ করতেন। [১]

এহসান শিনাসি:

যে তাঁর সাথে ভালো ব্যবহার করত, তিনি তাকে বাড়িয়ে প্রতিদান দিতেন। যখন তিনি আইন জালুতের যুদ্ধে বিজয়ের পর তাতারীদের পিছু ধাওয়া করে ফিরছিলেন, তখন এই অভিযানে ঘোড়াগুলো ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তিনি হামাতের এক অফিসারের কাছে একটি ঘোড়া চেয়েছিলেন। সে ওজর পেশ করল। অন্য একজন আমির তাওয়াশি যখন জানতে পারলেন, তখন তিনি ঘোড়া সরবরাহ করলেন। বাইবার্স এই কথা মনে রেখেছিলেন। যখন তিনি সালতানাত লাভ করলেন এবং আমির তাওয়াশি হামাতের প্রতিনিধি হয়ে কায়রোতে আসলেন, তখন সুলতান তাকে দেখামাত্রই নিজে দাঁড়িয়ে সালাম দিলেন এবং তাকে বুকে জড়িয়ে নিলেন। [২]

বে-তাকাল্লুফ জিন্দেগি:

স্বভাবে কোনো আড়ম্বর ছিল না, তবে সীমানা রক্ষার সতর্কতায় কোনো কমতি হতে দিতেন না। এই যুগে তাতারীদের দলবদ্ধভাবে দলে দলে এসে ইসলাম গ্রহণ করার ধারা চলছিল। একবার তাতারী ও তুর্কিদের একটি বিশাল কাফেলা কায়রোর কাছে পৌঁছাল। সুলতান তাঁর আমিরদের বললেন:

“এত বড় জনসমাগমের আগমন আশঙ্কা মুক্ত নয়। আমার অভিমত হলো, তাদের শহরে প্রবেশের আগে আমরা নিজেরা বাইরে গিয়ে দেখে আসি। যদি তারা আনুগত্যের সাথে এসে থাকে তবে তো ঠিক আছে। অন্যথায় আমরা সশস্ত্র হয়ে মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাকব। আর আমি তোমাদের মধ্য থেকে একজন ব্যক্তি মাত্র। আমার জন্য একটি ঘোড়াই যথেষ্ট। বাকি আমার কাছে যা কিছু ঘোড়া, উট এবং সম্পদ আছে, তা সবই আল্লাহর পথে জিহাদের নিয়তে ওয়াকফ।” [৩]

বেশ পরিবর্তন করায় দক্ষতা:

৬৬৭ হিজরিতে আলেমদের একটি প্রতিনিধি দল এবং তিনশ মামলুকদের সাথে হজ পালন করেন। যাতায়াত ও চলাচল এতটাই গোপন ছিল যে, সুলতানের ফিরে আসা পর্যন্ত মানুষ জানতে পারেনি সুলতানের অবস্থান কোথায় ছিল, হিজাজে, মিসরে নাকি শামে? প্রকৃতপক্ষে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ ছাড়া আর কেউ জানত না। সুলতান ১ জিলকদ তারিখে কারাক দুর্গ থেকে তাঁর সফর শুরু করেন এবং ২৯ জিলহজ ফিরে আসেন। সফরের আগে কেউ জানত না যে কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা। সাথে হালকা আসবাবপত্র এবং পাথেয় হিসেবে শুধু যবের থলে ছিল।

১৫ জিলকদ কাফেলা মদিনায় পৌঁছাল এবং ৫ জিলহজ মক্কায়। সুলতান সাধারণ মানুষের মতো হজ পালন করলেন, কোনো হাজিব বা পাহারাদার ছিল না। একাকী নামাজ আদায় করলেন এবং একইভাবে তাওয়াফ ও সাঈসহ সমস্ত আরকান সম্পন্ন করলেন। হজের পর মানুষ যখন ইহরামের চাদর ধোয়ার জন্য সুলতানের দিকে ছুড়ে দিচ্ছিল, সুলতান নিজে চাদরগুলো ধুয়ে তাদের ফেরত দিচ্ছিলেন এবং কপালে...

[১] আস-সুলুক লি-মা'রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ২/৯, ত. ইলমিয়াহ

[২] তারিখুল মালিকিজ জাহির, লি-ইবনি শাদ্দাদ, পৃ. ২৯৫

[৩] আস-সুলুক লি-মা'রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ২/১০, ত. ইলমিয়াহ

ভাঁজ পর্যন্ত পড়েনি। যখন কাবা শরীফের দরজায় ওঠার সুযোগ হলো, তখন সুলতান কত যে ঘিয়ারতকারীকে হাত ধরে ধরে উপরে টেনে তুললেন এবং বাইতুল্লাহর দরজার ভেতর দিয়ে উঁকি দেওয়ার সুযোগ করে দিলেন। এই সময়ে কিছু হাজী সুলতানের ইহরাম আঁকড়ে ধরে উপরে ওঠার চেষ্টা করতে লাগলেন। এই টানাটানিতে সুলতানের চাদর ছিঁড়ে গেল, কিন্তু চেহারার হাসি অটুট ছিল। তিনি কাবা শরীফকে গোলাপ জল দিয়ে গোসল করালেন এবং নিজ হাতে তাতে সুগন্ধি লাগালেন। আসা-যাওয়ার পথে মদীনা মুনাওয়ারায় রওজায়ে আকদাসে হাজিরা দিলেন। হারাইমাইন শরীফাইনের পরিচালক, বুজুর্গ, খাদেম এবং সাধারণ নাগরিকদের সাথে অত্যন্ত উদারতা ও অনুগ্রহপূর্ণ আচরণ করলেন। [১]

গোপনীয়তা:

সুলতানের স্বভাবে গোপনীয়তা, ক্ষিপ্ততা এবং অপ্রত্যাশিতভাবে অন্যদের অবাক করে দেওয়ার এক অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। এই বিস্ময়কর মানুষটি ছদ্মবেশ ধারণ করে যেকোনো স্থানে পৌঁছে যাওয়া, নিজের চলাফেরা গোপন রাখা এবং হঠাৎ কোথাও উপস্থিত হওয়ার এক ঐতিহ্য কায়েম করেছিলেন। এর প্রভাব ছিল এই যে, মানুষ অধিকাংশ সময় সতর্ক থাকত। বিরোধীরা ভয় পেত যে, না জানি সুলতান কখন মাথার ওপর চড়াও হন। হিংসুকরা নিজেদের মুখ বন্ধ রাখত এই ভয়ে যে, পাশ দিয়ে অতিক্রমকারী ব্যক্তিটি সুলতান নিজেই কি না।

হজের সফর শেষে সুলতান যখন দামেস্কে পা রাখলেন, তখন এই আগমন এতটাই গোপন ছিল যে, যখন দামেস্কের রাজদরবারে ডাক বিভাগের সেই পত্রটি পড়া হচ্ছিল যাতে সুলতানের শীঘ্রই দামেস্কে পৌঁছানোর সুসংবাদ ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে সুলতানকে শহরের কেন্দ্রীয় বাগান ‘ময়দানে আখজার’-এ পায়চারি করতে দেখা গেল। রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা দৌড়ে এলেন এবং সুলতানকে আগে থেকেই উপস্থিত দেখে অবাক হয়ে গেলেন।

একইভাবে হালাবে (আলেপ্পো) প্রবেশ ঘটেছিল যে, সুলতানকে শহরে প্রবেশ করার সময় কেউ চিনতে পারেনি। এই সফরেই সুলতান পুনরায় দামেস্ক হয়ে বাইতুল মুকাদ্দাস সফর করেন। হজ থেকে শুরু করে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত প্রায় তিন মাসের এই সফরে সুলতান নিজের জামা পর্যন্ত পরিবর্তন করেনি। [২]

শরয়ী দণ্ডবিধি কার্যকর করা:

কঠোর শাস্তিগুলো বাদ দিলে তিনি বাকি জীবনে শরীয়তের অনুসারী ছিলেন এবং প্রজাদেরকেও শরীয়ত পালনে বাধ্য করতেন। মদের দোকান, বেশ্যাবৃত্তি এবং পাপাচারের সমস্ত কর্মকাণ্ড কেবল আইনত নিষিদ্ধই ছিল না, বরং এগুলোতে লিপ্ত ব্যক্তিদের প্রতি কোনো শিথিলতাও প্রদর্শন করা হতো না। হুদুদ (শরয়ী দণ্ড) কার্যকর করা হতো এবং যেসব অপরাধের জন্য শরীয়ত কোনো ‘হদ’ নির্ধারণ করেনি, সেখানে ‘তায়ীর’ (বিচক্ষণতামূলক শাস্তি) কার্যকর করা হতো। সাধারণত পাপাচার থেকে বিরত না হওয়া ব্যক্তিদের শহর থেকে বহিষ্কার করা হতো, তবে জিহাদ চলাকালীন মদ্যপানের জন্য মৃত্যুদণ্ডের হুমকিও দেওয়া হতো। [৩]

নৈতিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা:

নারীদের মধ্যে পুরুষদের সাদৃশ্য অবলম্বনের অভ্যাস ছড়িয়ে পড়েছিল। সুলতান ফরমান জারি করলেন যে, কোনো নারী পুরুষদের...

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৬৬৭ হিজরী; আস-সুলুক লি-মা’রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ২/৬১, তাবা’ আল-ইলমিয়্যাহ।

[২] আস-সুলুক লি-মা’রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ২/৬৩, তাবা’ আল-ইলমিয়্যাহ।

[৩] আস-সুলুক লি-মা’রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ২/৩৪, ৩৮, তাবা’ আল-ইলমিয়্যাহ।

...পাগড়ির মতো যেন না বাঁধে এবং তাদের আকৃতি যেন গ্রহণ না করে। [১]

রাজত্ব এবং দ্বীন রক্ষার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক:

সুলতানের নিকট রাজত্ব ছিল দ্বীন রক্ষারই দ্বিতীয় নাম। হজের সফরেও রাষ্ট্রীয় বিষয়াদির তদারকি অব্যাহত ছিল। মক্কা থেকে ইয়ামেনের শাসকের নিকট এক পত্রে লিখেছিলেন:

“বাদশাহ সেই, যে আল্লাহর পথে জিহাদের হক আদায় করে এবং ইসলামের হেফাজতের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে। যদি তুমি সত্যিই বাদশাহ হও, তবে তাতারীদের বের করে দাও।” [২]

যুদ্ধবিদ্যার প্রসার:

তিনি যুদ্ধবিদ্যা প্রচলনের খুব অনুরাগী ছিলেন। নিজে এসব খেলায় অংশ নিতেন, যার ফলে সাধারণ ও বিশিষ্ট সকলের মধ্যে তলোয়ার চালনা, নেজাবাজি এবং অন্যান্য সামরিক খেলার প্রতি আগ্রহ সাধারণ হয়ে গিয়েছিল। আল্লামা মাকরিজি লিখেছেন:

“সুলতান কায়রোর বাইরে ঈদগাহে তিরন্দাজি ও যুদ্ধবিদ্যার মেলার আয়োজন করেছিলেন। তিনি নিজে জোহরের পর সেখানে আসতেন এবং তিরন্দাজি ও নেজাবাজি করতেন এবং এশার পর ফিরে যেতেন। তিনি মানুষকে তিরন্দাজি ও নেজাবাজির প্রতি উৎসাহিত করতেন, এমনকি আমির ও গোলামদের মধ্যে এমন কেউ বাকি ছিল না যে এই শখগুলো গ্রহণ করেনি।” [৩]

বীরদের উৎসাহ প্রদান:

সুলতান উৎসাহ প্রদানের জন্য নিত্যনতুন পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। যেমন সাফাদ দুর্গ আক্রমণের সময় সুলতান একটি তাঁবুতে দস্তুরখান বিছিয়েছিলেন যাতে পানীয় ও উন্নত মানের খাবার ছিল। সেখানে শল্যচিকিৎসক ও চিকিৎসকগণও উপস্থিত ছিলেন। জিহাদে অংশগ্রহণকারী উলামা ও ফুকাহাদের মধ্যে যারা আহত হতেন, তাদের সেখানে নিয়ে আসা হতো। সেখানে চিকিৎসাও হতো এবং সুলতানের সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্যও নসিব হতো।

[৪]

শিকার এবং চিড়িয়াখানা নির্মাণে আগ্রহ:

তিনি শিকার করার জন্য বাহানা খুঁজতেন এবং প্রায়ই এক শহর থেকে অন্য শহরে সফরের সময় শিকারের কাজও শুরু করে দিতেন। কখনো শিকারের অভিযানের মাধ্যমে শত্রুকে বিভ্রান্ত করতেন এবং এই বাহানায় হঠাৎ তাদের মাথার ওপর পৌঁছে যেতেন। [৫]

পশু পালনেরও শখ ছিল, কায়রোর কালআতুল জাবালে একটি চিড়িয়াখানা নির্মাণ করেছিলেন। এতে সাধারণ পশু ছাড়াও পনেরটি উটপাখি এবং তিনশ হরিণ ছিল। কিছু জিরাফও ছিল। এগুলোর দেখাশোনার জন্য চমৎকার ব্যবস্থা ছিল। [৬]

সাদাসিধে জীবন:

সুলতান নিজের জন্য কোনো শান-শওকত গ্রহণ করেননি। তিনি একজন সাধারণ সৈনিকের মতোই থাকতে পছন্দ করতেন। সৈনিক এবং...

[১] আস-সুলুক লি-মা'রিফাত দুওয়ালিল মুলুক: ৩/২, ত. ইলমিয়্যাহ

[২] আস-সুলুক লি-মা'রিফাত দুওয়ালিল মুলুক: ২/৫৫, ত. ইলমিয়্যাহ

[৩] তারিখুল মালিকিজ জাহির লি-ইবনে শাদ্দাদ, পৃ. ২৯৮

[৪] আস-সুলুক লি-মা'রিফাত দুওয়ালিল মুলুক: ২/৬৩, ৭৯; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: সন ৬৭০ হিজরি

[৫] আস-সুলুক লি-মা'রিফাত দুওয়ালিল মুলুক: ২/৬১, ত. ইলমিয়্যাহ

[৬] আস-সুলুক লি-মা'রিফাত দুওয়ালিল মুলুক: ২/৩৩, ত. ইলমিয়্যাহ

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

চতুর্থ খণ্ড

শ্রমিকদের সাথে মিলে কাজ করতে তিনি আনন্দ পেতেন। ৬৬৪ হিজরির সফর মাসে আলেকজান্দ্রিয়া পৌঁছে তিনি নিজে খালের খনন কাজে অংশ নেন। একই বছর রমজান মাসে সাফাদ অবরোধ করলে প্রাচীর ভাঙার জন্য দামেস্ক থেকে মানজানিক আনান। উটচালক ও কুলিরা সেগুলো জাসর ইয়াকুবের পথ দিয়েই আনতে পারত। এটি এতই দুর্গম এলাকা ছিল যে সবাই ক্লান্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিল এবং সংবাদ পাঠান যে এই কাজ সম্ভব নয়। সুলতান নিজের বাহিনীসহ সেখানে পৌঁছে সেই বলদ গাড়িগুলোকে পাহাড়ের চড়াইয়ে টেনে তুলতে শুরু করলেন যেগুলোর ওপর মানজানিকের অংশগুলো বোঝাই ছিল। বাকি সৈন্যরা মাঝেমধ্যে ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নিত এবং পালাক্রমে গাড়ি টানত, কিন্তু সুলতান একবারও দম নেননি যতক্ষণ না মানজানিক সাফাদ দুর্গের সামনে এনে স্থাপন করা হলো। [১]

জনপ্রিয়তার অবস্থা:

সুলতানের জনপ্রিয়তা পুরো মুসলিম বিশ্বে ছিল এবং তাঁর বিজয়ের প্রভাব সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। কায়রোতে প্রায়ই বিদেশি রাষ্ট্রদূতরা উপস্থিত হতেন এবং সুলতানের অনুগ্রহ কামনা করতেন। কূটনৈতিক প্রতিনিধিদলের আধিক্যের আন্দাজ এই কথা থেকে করা যায় যে, ৬৭৩ হিজরির রজব মাসে সুলতান যখন সিরিয়ার একটি অভিযান থেকে কায়রোতে ফিরলেন, তখন দেখলেন যে ২৫টি দেশের রাষ্ট্রদূত মেহমানখানায় অপেক্ষা করছেন। সুলতান তাঁদের সাক্ষাতের সুযোগ দিলেন, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করলেন এবং তাঁদের পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত করলেন। [২]

উস্তাদের প্রতি আদব:

সেই যুগে মুক্ত করা গোলামরা তাদের প্রাক্তন মনিবকে ‘উস্তাদ’ বলত এবং তাঁকে অত্যন্ত সম্মান করত। সুলতান বাইবার্স সম্পর্কে আপনারা পড়েছেন যে, তিনি সুলতান আস-সালিহ আইয়ুবের খিদমতে আসার আগে কিশোর বয়সে আমির আলাউদ্দিন বুনদুকদারের গোলাম ছিলেন এবং সেই সূত্রেই ‘বাইবার্স বুনদুকদারি’ নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর মনিব আমির বুনদুকদার অত্যন্ত কঠোর মেজাজের ছিলেন। যখন বাইবার্সের কোনো ভুল হতো, তখন তিনি তাঁকে কঠোর শাস্তি দিতেন। তাঁর প্রাসাদের আঙিনায় একটি কুল (বরই) গাছ ছিল। মাঝেমধ্যে তিনি বাইবার্সকে সেই কুল গাছে ঝুলিয়ে রাখতেন।

বাইবার্স সুলতান হওয়ার পরও আমির বুনদুকদার দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। বাইবার্স মাঝেমধ্যে তাঁর সাথে দেখা করতে যেতেন এবং সাধ্যমতো তাঁর খিদমত করতেন। একবার বুনদুকদার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বাইবার্স তাঁর আমিরদের সাথে নিয়ে তাঁকে দেখতে গেলেন। বুনদুকদার বিছানায় পড়ে ছিলেন। নিজের প্রাক্তন ছোট খাদেমকে এই অবস্থানে দেখে তাঁর ওপর এক অদ্ভুত অনুভূতি ছেয়ে গেল। তিনি কুল গাছের দিকে ইশারা করে বললেন: “বাইবার্স! তুমি কি এই গাছটিকে চিনতে পারছ?”

বাইবার্স অত্যন্ত আদবের সাথে বললেন: “হ্যাঁ উস্তাদ! যদি এটি না হতো, তবে আমি এই অবস্থানও পেতাম না।”

এর অর্থ ছিল এই যে, আপনি যদি আমার লালন-পালন ও শাসনে কঠোরতা না করতেন, তবে আমি বাদশাহ হওয়ার যোগ্য হতে পারতাম না। [৩]

এ থেকে সুলতানের ইতিবাচক চিন্তা ও কৃতজ্ঞতারোধের আন্দাজ করা যায়।

[১] আস-সুলুক লি-মা'রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ২/৩৩, ত. আল-ইলমিয়্যাহ

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৬৭৩ হিজরি

[৩] মুখতারুল আখবার লি-বাইবার্স আল-মানসুরি, পৃ. ১২

মানুষের কণ্ঠস্বরকে আল্লাহর ঘোষণা মনে করে:

যদিও নিজের সংকল্প গোপন রেখে দ্রুত লক্ষ্য অর্জন করা সুলতানের অভ্যাস ছিল, কিন্তু কখনো কখনো তাঁর সমস্ত সতর্কতা বিফলে যেত। এই প্রসঙ্গে একটি চমৎকার ঘটনা পেশ করা হলো। ৬৬০ হিজরিতে সুলতান বাইবার্স দামেস্কের শাসক তাইবার্সের কিছু অপছন্দনীয় আচরণের কারণে হঠাৎ তাকে পদচ্যুত করার সিদ্ধান্ত নেন। অভ্যাস অনুযায়ী সুলতান এই কাজটি অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে করতে চেয়েছিলেন। সুলতানের একজন আমিরের বর্ণনা হলো:

“আমি দুপুরে কায়রোতে আমার বিশ্রামাগারে ছিলাম, তখন সুলতানের পক্ষ থেকে ডাক এলো। এই ধরনের অস্বাভাবিক ডাকে আমার বিশ্বাস হলো যে শাস্তি দেওয়া হবে। আমি পরিবার-পরিজনকে বিদায় জানালাম এবং কেবল পৌঁছলাম। দেখলাম আমার মতো আমির ইজুদ্দিন দামিয়াতিকেও ডাকা হয়েছে। আমরা দুজনেই নিশ্চিত হলাম যে আমাদের গ্রেপ্তার করা হবে। আমরা সুলতানের কাছে পৌঁছলাম, সেখানে আর কেউ ছিল না। সুলতান দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানালে আমাদের ভয় দূর হয়ে গেল। সুলতান আমাদের এত কাছে বসালেন যে আমাদের হাঁটু তাঁর হাঁটুর সাথে মিশে গেল। তখন সুলতান পকেট থেকে কুরআন মাজিদ বের করে আমাদের থেকে শপথ নিলেন যে আমরা গোপনীয়তা ফাঁস করব না এবং যা আদেশ দেওয়া হবে তা মেনে চলব। আমরা শপথ নিলে সুলতান গোপনীয় ভঙ্গিতে বললেন: ‘তোমরা দুজনেই এই মুহুর্তে দামেস্কে যাও এবং যাওয়ার পথে গাজার সেনাবাহিনী সাথে নিয়ে নাও। দামেস্কের শাসক আলাউদ্দিন তাইবার্সকে গ্রেপ্তার করে, তার জায়গায় এখন তোমরা শাসক। যদি এই অভিযানের আগে এই গোপন কথা আল্লাহর সৃষ্টির কারো মুখে আসে, তবে আমি তোমাদের দুজনকে হত্যা করাব।’

আমরা দুজনে কেবল থেকে বের হলাম, তখন পথে আমাদের দেখে এক ব্যক্তি অন্যজনকে বলতে লাগল: ‘এই দুজনে দামেস্কের শাসককে গ্রেপ্তার করতে দামেস্কে যাচ্ছে।’ আমাদের দুজনের চেহারা ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। আমরা শপথ করলাম যে এখন আর বাড়ি যাব না। তখনই সওয়ারি আনিয়ে সিরিয়ার দিকে রওনা হলাম এবং সুলতানের আদেশ পূরণ না করা পর্যন্ত দম নিলাম না।“

এই ঘটনার পরিশিষ্ট হলো এই যে, দামেস্কের শাসক নিয়ম অনুযায়ী তাদের অভ্যর্থনা জানাতে শহরের বাইরে এলে ওই দুই আমির মুসাফাহা করার সময় হঠাৎ তাকে গ্রেপ্তার করে ফেলেন। এরপর ওই দুজনের একজন অর্থাৎ আলাউদ্দিন রুকনি সুলতানের আদেশ অনুযায়ী দামেস্কের নতুন শাসক নিযুক্ত হন। কিছুদিন পর পদচ্যুত শাসকের একজন সঙ্গী রশীদ একটি অদ্ভুত রহস্য উন্মোচন করেন এভাবে:

“যখন প্রাক্তন শাসক মিসর থেকে আপনাদের আগমনের খবর শুনলেন, তখন আমাকে ডাকলেন এবং বললেন: ‘তাদের জন্য দস্তুরখান বিছাও এবং নিজেও শরিক থেকে তবে সতর্ক হয়ে। আমি খাবারে শরিক হতে পারব না।’ আমি জিজ্ঞেস করলাম: ‘কেন এমন হবে?’ আমির বললেন: ‘কারণ তারা আমাকে গ্রেপ্তার করতে এসেছে।’ আমি বললাম: ‘আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করুন।’ এই বলে আমি কাঁদতে লাগলাম। আমির বললেন: ‘এটা তো হবেই। তুমি নিজের চিন্তা করে যে তোমার কী হবে।’ আমি বের হলাম এবং নিয়ম অনুযায়ী ওই আমিরদের জন্য দস্তুরখান বিছালাম। এরপর তাই হলো যা আমির বলেছিলেন।”

আল্লামা নুওয়াইরি রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই ঘটনাবলি বর্ণনা করে বলেন:

“এই কথাটি আল্লাহ মিশরীয় জনগণের মুখে জারি করে দিয়েছিলেন। প্রায়ই এমন হয় যে, মানুষ যা বলে তা-ই হয়ে যায়।” [১]

প্রাচ্যবিদদের প্রলাপ:

প্রাচ্যবিদরা যদিও বাইবার্সের কীর্তিগাঁথা বর্ণনা করতে বাধ্য হন, কিন্তু তাদের চেষ্টা থাকে যে কোনোভাবে ইসলামের এই সিংহের ব্যক্তিত্বকে কলঙ্কিত করে দেখানো। ফলে সাধারণত সুলতান বাইবার্সের চিত্রায়ণ এমনভাবে করা হয় যে, তিনি একচক্ষু বিশিষ্ট ছিলেন, এক ধরনের ভাঁড় ছিলেন। নৈতিক মূল্যবোধের প্রতি উদাসীন ছিলেন। নিজের সঙ্গীদের সাথে হাম্মামখানায় হামলা চালাতেন, সুন্দরী নারীদের অপহরণ করে নিয়ে যেতেন, তারপর তাদের অলঙ্কার দিয়ে হাসপাতাল নির্মাণ করাতেন। মদের দোকান বন্ধ করে দিয়েও তিনি পারিবারিক জীবনে মদ্যপান করতেন। নিজের বিনোদনের জন্য বালকদের সাথে বন্ধুত্ব পাতাতেন।

ইতিহাসে এসব জিনিসের কোনো প্রমাণ নেই। বাইবার্সের উভয় চোখই সুস্থ ছিল। তিনি অত্যন্ত মর্যাদাবান এবং পবিত্র চরিত্রের মানুষ ছিলেন। মদ্যপান, নাচ-গান, ভোগ-বিলাস এবং কাম-লালসা থেকে তিনি দূরে ছিলেন।

বাইবার্সের যদি কোনো মন্দ দিক বা ত্রুটি প্রমাণিত থাকে, তবে তা কেবল এইটুকু যে, তিনি পূর্ববর্তী দুই বাদশাহ: তুরান শাহ এবং সাইফউদ্দিন কুতুজকে হত্যা করেছিলেন এবং এই যে, তিনি কিছু ক্ষেত্রে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কঠোর শাস্তি কার্যকর করতেন। এই দুটি ত্রুটিপূর্ণ বিষয় ছাড়া বাইবার্সের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে যত নেতিবাচক বিষয় প্রচার করা হয়েছে, সেগুলো সবই প্রাচ্যবিদদের প্রলাপ এবং তাদের অন্তরের কলুষতার বহিঃপ্রকাশ, যার উল্লেখ কোনো দুর্বল ঐতিহাসিক বর্ণনায়ও পাওয়া যায় না।

[১] নেহায়াতুল আরাব: ৩০/ ৬০ থেকে ৬২, কায়রো সংস্করণ।

আল-মালিক আল-সাইদ বারাকাহ খান

সফর ৬৭৬ হিজরি থেকে রবিউস সানি ৬৭৮ হিজরি (জুলাই ১২৭৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে সেপ্টেম্বর ১২৭৯ খ্রিষ্টাব্দ)

সুলতান বাইবার্স তাঁর পুত্র আল-মালিক আল-সাইদ বারাকাহ খানকে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেছিলেন, কিন্তু মামলুক আমিরদের মন তখনো বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের নীতি গ্রহণ করতে পারেনি। আল-মালিক আল-সাইদ সিংহাসনে আরোহণ করলেও তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র আঠারো বছর, রাজ্য পরিচালনার কোনো অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল না। খুব শীঘ্রই তাঁর অযোগ্যতা প্রকাশ পেয়ে গেল এবং সবাই দেখতে পেল যে তাঁর মধ্যে তাঁর বিখ্যাত পিতার মতো কোনো গুণ নেই। যখন রাজপ্রাসাদের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং সামরিক জেনারেলদের মধ্যে একটি বিরোধ দেখা দিল, তখন এই নতুন শাসক তা মীমাংসা করতে পারলেন না। তিনি রাজকীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পক্ষ নিলেন, যার ফলে সামরিক জেনারেলরা অসন্তুষ্ট হলেন। অবশেষে সিংহাসনে আরোহণের মাত্র দুই বছর দুই মাস পর রবিউস সানি ৬৭৮ হিজরিতে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। এর কিছুদিন পরেই তাঁর আকস্মিক মৃত্যু ঘটে। [১]

আল-মালিক আল-আদিল বদর উদ্দিন সালামিশ

রবিউস সানি থেকে রজব ৬৭৮ হিজরি (সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর ১২৭৯ খ্রিষ্টাব্দ)

আল-মালিক আল-সাইদের স্থলে তাঁর ভাই বদর উদ্দিন সালামিশকে আল-মালিক আল-আদিল উপাধি দিয়ে সিংহাসনে বসানো হয়, যাঁর বয়স ছিল মাত্র সাত বছর। মামলুক জেনারেল সাইফ উদ্দিন কালাউনকে তাঁর আতাবেগ নিযুক্ত করা হয়। নতুন মুদ্রার এক পাশে কমবয়সী বাদশাহর এবং অন্য পাশে কালাউনের নাম খোদাই করা হলো। খুতবায় খলিফার সাথে তাঁদের উভয়ের নাম নেওয়া হতে লাগল। কিন্তু এই পরিস্থিতি সালতানাতকে দুর্বল করে দিতে পারত। তাই মাত্র তিন মাস পর সাইফ উদ্দিন কালাউন নাবালক বাদশাহকে ক্ষমতাচ্যুত করে শাসনভার নিজের হাতে তুলে নেন। [২]

[১] আস-সুলুক লি-মা'রিফতি দুওয়ালিল মুলুক: বছর ৬৭৬ হিজরি, ৬৭৮ হিজরি; আন-নুজুমুজ জাহেরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহিরা: বছর ৬৭৬ হিজরি, ৬৭৮ হিজরি।

[২] আস-সুলুক লি-মা'রিফতি দুওয়ালিল মুলুক: বছর ৬৭৮ হিজরি; আন-নুজুমুজ জাহেরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহিরা: বছর ৬৭৮ হিজরি।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

সুলতান সাইফউদ্দিন কালাউন

রজব ৬৭৮ হিজরি থেকে যিলকদ ৬৮৯ হিজরি (ডিসেম্বর ১২৭৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ডিসেম্বর ১২৯০ খ্রিষ্টাব্দ)

আমির সাইফউদ্দিন কালাউন ২০ রজব ৬৭৮ হিজরিতে ‘আল-মালিকুল মানসুর’ উপাধি নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কুতুজ এবং বাইবার্‌সের মতো তিনিও দাসত্ব থেকে রাজকীয় পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন। আস-সালিহ আইয়ুব তাকে এক হাজার দিনারে ক্রয় করেছিলেন। এরপর ধীরে ধীরে তিনি উন্নতি করে মামলুক আমিরদের অন্তর্ভুক্ত হন। তিনি বাইবার্‌সের বন্ধু ছিলেন এবং যখন তারা উভয়ে বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয় হলেন, তখন এই সম্পর্ক আরও মজবুত হয়। নিঃসন্দেহে তিনি তার পূর্বসূরিদের মতো উচ্চ গুণাবলীতে ভূষিত ছিলেন। [১]

আমির সুনকুরের বুদ্ধিমত্তা:

সুলতান বাইবার্‌সের কিছু অনুগত কালাউনের শাসন মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাদের মধ্যে বাইবার্‌সের বন্ধু আমির সুনকুর আশকার অগ্রগণ্য ছিলেন, তিনি সিরিয়ায় কালাউনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্যের খবর পাওয়া মাত্রই তাতারীরা যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। তারা সুনকুরকে সাথে নিয়ে মিশরে আক্রমণের সংকল্প করেছিল। কালাউন যখন এই খবর পেলেন, তখন তিনি সুনকুরকে একটি চিঠি লিখলেন:

“তাতারীরা ইসলামী শহরগুলোতে আক্রমণ করতে আসছে। উত্তম হবে যে আমরা ঐক্যবদ্ধ হই। যাতে আমাদের যুদ্ধের কারণে মুসলমানরা ধ্বংস না হয়। যখন তাতারীরা আমাদের দেশ দখল করবে, তখন তারা আমাদের কাউকেই ছাড়বে না।”

সুনকুর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলেন এবং এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিজের দুর্গগুলো মিশরীয় কর্মকর্তাদের হাতে তুলে দিলেন। [২]

এই সময়ে তাতারীরা সুযোগ বুঝে হঠাৎ আলেপ্পো আক্রমণ করে বসে। ২১ রবিউস সানি ৬৭৯ হিজরিতে তাদের বাহিনী অতর্কিতে শহরে ঢুকে পড়ে। তারা জামে মসজিদ, রাজপ্রাসাদ, আমিরদের অট্টালিকা এবং অনেক মাদ্রাসা অগ্নিসংযোগ করে পুড়িয়ে দেয়। পুরো শহরে এক হাঙ্গামা সৃষ্টি হয়। মানুষ প্রাণ বাঁচাতে গোপন আশ্রয়স্থলে লুকিয়ে পড়ে। দুই দিন পর্যন্ত তারা শহরে লুটতরাজ চালাতে থাকে। এই সময়ে তারা খবর পায় যে, সাইফউদ্দিন কালাউন এবং আমির সুনকুরের মধ্যে সন্ধি হয়ে গেছে। অধিকন্তু একজন মুসলমান, যার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত জোরালো ছিল, জামে মসজিদের মিনারে চড়ে উচ্চস্বরে ঘোষণা করলেন:

“আল্লাহর সাহায্য এসে পৌঁছেছে, আল্লাহর সাহায্য এসে পৌঁছেছে। হে মুসলমানগণ! এদেরকে ধরে ধরে দাসীদের মতো কুঠুরিতে বন্দি করো।”

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ওফাত সন ৬৮৯ হিজরি

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: সন ৬৭৯ হিজরি

এই বলতে বলতে তিনি নিজের রুমাল উড়িয়ে শহরের বাইরের দিকে ইশারা করছিলেন। তাতারীরা ভাবল যে মুসলমানদের সাহায্যকারী বাহিনী কাছে চলে এসেছে। তারা এদিক-ওদিক না তাকিয়েই দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পালিয়ে গেল। [১]

এই সময়ে কালাউন ৬৭৯ হিজরীর জমাদিউল আখিরা মাসে মিশরীয় বাহিনী নিয়ে তাতারীদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য সিরিয়ায় পৌঁছে গিয়েছিলেন।

ওদিকে তাতারীরা হলাব (আলেপ্পো) পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু যখন তারা কালাউন ও সুনকুরের ঐক্যের খবর পেল, তখন তাদের সাহস দমে গেল এবং তারা পিছু হটে নিজেদের সীমান্তের দিকে ফিরে গেল। [২]

কালাউন প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সুনকুরকে আন্তাকিয়া ও কাফর তাব প্রদান করে তাকে নিজের অনুগত করে নিলেন। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন এবং বিরোধীদের বশ করতে জানতেন। তিনি আবারও সিরিয়া ও মিশরকে ইসলামি বিশ্বের এক মজবুত দুর্গে পরিণত করলেন। [৩]

مركة مرقد خالد بن وليد (খালিদ বিন ওয়ালিদ-এর মাজারের যুদ্ধ):

ওদিকে ইলখানি মঙ্গোল সাম্রাজ্যের শাসক আবাকা ইসলামের এই দুর্গ ধ্বংস করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিল। সে ৬৮০ হিজরীতে তার ভাই মঙ্কু তিমুরের নেতৃত্বে পঞ্চাশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের এক বাহিনী সিরিয়ায় পাঠাল এবং নিজেও ছদ্মবেশে গোপনে এই বাহিনীর পেছনে রওনা হলো যাতে নিজের বীরদের রণকৌশল দেখতে পারে। সামনে এগিয়ে যাওয়ার পর আর্মেনিয়ার খ্রিস্টানরাও এই বাহিনীর সাথে যোগ দিল এবং শেষ পর্যন্ত এক লক্ষেরও বেশি যোদ্ধার এই পঙ্গপাল সদৃশ বাহিনী ৬৮০ হিজরীর জমাদিউল আখিরা মাসে ফোরাত নদী পার হয়ে সিরিয়ার সীমান্তে প্রবেশ করল।

মুসলিমরা আমির কালাউন ও সুনকুর আশকারের নেতৃত্বে পুরোপুরি মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত ছিল। তারা শত্রুকে হিমস পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ার সুযোগ দিল। এই সময়ে বেদুইনদের গেরিলা দলগুলো তাতারীদের ওপর অতর্কিত নৈশ হামলা চালাতে থাকল। অবশেষে ১৫ই রজব সকালে হিমসের বাইরে খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর মাজারের কাছে উভয় পক্ষ মুখোমুখি হলো। যুদ্ধ শুরু হতেই তাতারীদের মায়সারা (বাম পার্শ্ব) মুসলমানদের মায়মানার (ডান পার্শ্ব) ওপর আক্রমণ চালাল। ইসলামি মায়মানা অত্যন্ত বীরত্বের সাথে এই আক্রমণ প্রতিহত করল এবং এরপর এমন প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণ করল যে তাতারীদের মায়সারা পিছু হটে তাদের কলব (মূল বাহিনী)-এর সাথে গিয়ে মিশল, যা মঙ্কু তিমুরের নেতৃত্বে ছিল।

অন্যদিকে তাতারীদের মায়মানা (ডান পার্শ্ব) মুসলমানদের মায়সারার (বাম পার্শ্ব) বাম অংশকে পিছু হটে বাধ্য করেছিল। সকাল থেকে জোহর পর্যন্ত এমন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হলো যে রক্তের নদী বয়ে গেল। পরিস্থিতি এমন ছিল যে, দামেস্কের জামে মসজিদে মানুষ মুসহাফ-এ-উসমানি হাতে তুলে নিয়ে কান্নাকাটি করে দোয়া করছিল। ময়দানে মুসলমানরা নগ্ন মস্তকে কুরআন হাতে নিয়ে কেঁদে কেঁদে আল্লাহকে স্মরণ করছিল। প্রত্যেকের মুখে ইসলামি বাহিনীর বিজয়ের প্রার্থনা ছিল।

দুপুর নাগাদ তাতারীদের পাল্লা ভারী হয়ে গিয়েছিল এবং মুসলমানদের হাজার হাজার লাশ পড়ে গিয়েছিল। তাতারীরা মুসলমানদের মায়সারাকে তছনছ করে দিয়েছিল, মুসলমানদের একটি বড় অংশ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাচ্ছিল এবং তাতারী মায়মানার...

[১] জাইল মিরআতুয যামান: ৩/৩৪, ৩৫, ত. দারুল কিতাব আল ইসলামি কায়রো।

[২] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া: বছর ৬৭৯ হিজরী।

[৩] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া: বছর ৬৮০ হিজরী।

তারিখে উন্মত্তে মুসলিমা — চতুর্থ খণ্ড

অশ্বারোহীরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করছিল। পলায়নকারী মুসলমানরা দামেস্ক, সাফাদ দুর্গ, হিমস এবং গাজার দিকে চলে গিয়েছিল। তবে পরাজয়ের এই সমস্ত লক্ষণ সত্ত্বেও আমির কালাউনের অধীনে লশকর বা বাহিনীর মূল অংশ (কলব) রণক্ষেত্রে সিসা ঢালা প্রাচীরের মতো অটল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। রাজকীয় নিশান ও ঝাণ্ডা নিজ নিজ স্থানে সমুন্নত ছিল, আর নাকাড়া ও বিউগল অনবরত বাজছিল। তাতারীদের পুরো চাপ ছিল কলবের ওপর। কিছুক্ষণ পর তাদের সংখ্যার আধিক্য কলবের বাম পার্শ্বকেও টলিয়ে দিল, তবুও আমির কালাউনের পা টলেনি। এটি দেখে বাকি আমিরদের মধ্যেও আত্মমর্যাদাবোধ জেগে উঠল এবং তারা সব দিক থেকে উথলে পড়ে নিজ নিজ বাহিনীসহ আমিরের পাশে এসে দাঁড়ালেন। সবাই মিলে জীবন বাজি রেখে লড়াই করলেন এবং এমন তীব্রতার সাথে একের পর এক আক্রমণ করলেন যে তাতারীদের পিছু হটতে হলো। হাজি ইজ্জুদ্দিন জামাদার নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাতারী সেনাপতি মাসু তিমুর পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন এবং বর্শা বিদ্ধ করে তাকে আহত করলেন, এরপর নিজেও তলোয়ার ও বর্শার আঘাতে জর্জরিত হয়ে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করলেন।

এই সময়ে ইসলামী বাহিনীর ডান পার্শ্বের (মায়মানা) আমির ঈসা বিন মুহান্না তার অশ্বারোহীদের নিয়ে তাতারীদের বাম পার্শ্বের (মায়সারা) ওপর অত্যন্ত আক্রমণাত্মক হামলা চালালেন, যার ফলে তাদের কাতারগুলো তছনছ হয়ে গেল। ওদিক থেকে বনু তাগলিবের আরবরা, যারা এতক্ষণ ওত পেতে লুকিয়ে ছিল, ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাতারীরা ভাবল যে মুসলমানরা নতুন সাহায্য (কুমক) পেয়ে গেছে এবং তারা সব দিক থেকে ঘেরাও হতে চলেছে। ফলে তারা দ্রুত রণক্ষেত্র ছেড়ে পালাতে শুরু করল। সুলতান কালাউন পশ্চাদ্ধাবনের নির্দেশ দিলেন এবং মাইলের পর মাইল তাতারীদের লাশের স্তুপ পড়ে রইল। তাতারী বাহিনীর ডান পার্শ্ব (মায়মানা) যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে পালিয়ে যাওয়া মুসলমানদের পশ্চাদ্ধাবন করে হিমস পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল এবং শহরের দরজা বন্ধ দেখে আশপাশে লুটতরাজ করছিল। এরপর এই বীররা বৃক্ষশোভিত উপত্যকায় নেমে পানাহারে মগ্ন হয়ে গেল। তাদের ধারণা ছিল যে কিছুক্ষণ পর বাকি বাহিনীও তাদের সাথে এসে মিলিত হবে। বিকেল বেলা যখন তাদের গোয়েন্দা সংবাদ দিল যে তাতারী লশকর রণক্ষেত্র থেকে পিছু হটেছে, তখন তারা অবাক হয়ে গেল এবং দ্রুত ফিরে চলল। যখন তারা পুনরায় রণক্ষেত্রের কাছে পৌঁছাল, তখন সুলতানের পুরো লশকর তাতারীদের পরাজিত করে তাদের পশ্চাদ্ধাবনে বেরিয়ে গিয়েছিল এবং ময়দানে সুলতানের সাথে মাত্র এক হাজার অশ্বারোহী ছিল।

সুলতান যখন তাতারীদের ডান পার্শ্বকে (মায়মানা) হিমসের দিক থেকে আসতে দেখলেন, তখন তিনি পতাকা ও রাজকীয় নিশান গুটিয়ে ফেলার এবং নাকাড়া বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন। তখন সূর্য অস্ত যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। যখন তাতারী মায়মানা কাছের উপত্যকাগুলো অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে গেল, তখন সুলতান পেছন থেকে এমন তীব্র আক্রমণ করলেন যে লাশের পাহাড় জমে গেল এবং খুব কম লোকই বেঁচে ফিরতে সক্ষম হলো। এভাবে রণক্ষেত্র পূর্ণাঙ্গভাবে মুসলমানদের দখলে রইল।

পরের দিন সংবাদ এল যে পশ্চাদ্ধাবনের সময় নিহত তাতারীদের সংখ্যা রণক্ষেত্রে নিহতদের চেয়েও বেশি। তবে অনেক পলাতক তাতারী ফোরাত নদীর নিকটবর্তী ঘাসবনে লুকিয়ে আছে। সুলতানের নির্দেশে সেই বনে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হলো এবং সেখানে লুকিয়ে থাকা অধিকাংশ শত্রু মারা পড়ল।

২২ রজব ৬৮০ হিজরিতে বিজয়ী মুসলমানরা এমনভাবে দামেস্কে প্রবেশ করলেন যে তাদের বর্শার ফলায় তাতারীদের...

...কাটা মাথা ছিল। এই মহান বিজয়ে সমস্ত ইসলামী শহরে আনন্দ উদযাপন করা হয়েছিল এবং সুলতান কালাউনকেও কুতুজ ও বাইবার্সের মতো শাসকদের মধ্যে গণ্য করা হতে লাগল।

আবাকার মৃত্যু:

তাতারীদের সেনাপতি মাস্খু তিমুর যুদ্ধ থেকে কোনোমতে প্রাণ বাঁচিয়ে ইরাকে ফিরে যেতে সক্ষম হন। তিনি আহত ছিলেন, সফরের সময় একদিন গোসল করে বের হওয়ার পরই অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং নাসিবিনে পৌঁছে মারা যান। লোকজনের ধারণা ছিল যে, কেউ গোসলের পানিতে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল।

খাকান আবাকা ফোরাতে নদীর তীরে এই পরাজয়ের খবর শোনে এবং উল্টো পায়ে বাগদাদ হয়ে হামাদানে পৌঁছান। এই পরাজয় তার স্নায়ুর ওপর অত্যন্ত খারাপ প্রভাব ফেলেছিল। মনের প্রশান্তি পাওয়ার জন্য তিনি হামাদানের গির্জায় যান এবং নাসারাদের উৎসবে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু মানসিক বিকৃতি দিন দিন বাড়তে থাকে।

অবশেষে ২০ জিলকদ তিনি উন্মাদ অবস্থায় মারা যান। বয়স ছিল ৫০ বছর এবং শাসনের মেয়াদ ছিল ১৮ বছর। [১]

নওমুসলিম মুঘল শাহজাদা তাকুদার আহমদ খানের সিংহাসন আরোহণ:

আবাকার মৃত্যুতে ইলখানি মুঘলদের কুরুলতাই (বৃহৎ পরামর্শ সভা) অনুষ্ঠিত হয় এবং ৬৮১ হিজরীর শুরুতে আবাকার ছোট ভাই “তাকুদার”-কে সিংহাসনে বসানো হয়। তিনি কয়েক বছর আগেই গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাই সালতানাতের দায়িত্ব গ্রহণ করেই তিনি নিজের নাম “আহমদ খান” রাখেন। তিনি মুঘলদের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী মিশরের সালতানাতের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং সুলতান কালাউনকে নিজের ইসলাম গ্রহণ ও জনকল্যাণমূলক কাজের সংবাদ জানিয়ে এক পত্রে লেখেন:

“কুরুলতাই অনুষ্ঠিত হয়েছিল যাতে সমস্ত ভাই, পুত্র, লশকরদের আমীর এবং ভূখণ্ডে সংবাদ প্রদানকারী বাহিনীর রায় ছিল এই যে, আমাদের বড় ভাইয়ের অভিযান পূর্ণ করা হোক। কিন্তু যখন আমরা এ বিষয়ে চিন্তা করলাম, তখন একে সাধারণ কল্যাণের পরিপন্থী মনে করলাম। ঘৃণার কারণসমূহ শেষ হয়ে গেছে, এবং আমরা আলোচনার মাধ্যমে পর্দা সরিয়ে দিয়েছি। যখন আল্লাহ মিশরের সুলতানকে দুনিয়ার সংশোধনের তাওফিক দান করেছেন, তখন ওয়াজিব হলো যে ঐক্য ও সংহতির দরজা খুলে দেওয়া হোক যাতে শহরগুলো আবাদ হয় এবং তলোয়ারগুলো খাপে ঢুকে যায়।”

সাইফউদ্দীন কালাউন এই পত্রে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করে আহমদ খানকে জবাবে সিংহাসন আরোহণ ও ইসলাম গ্রহণের জন্য মোবারকবাদ জানান এবং তার সংস্কারমূলক কাজের প্রশংসা করে লেখেন: [২]

“একজন মুত্তাকী এবং জাতির দরদী বাদশাহর নীতি এমনই হওয়া উচিত। যখন আপনিও এই দ্বীনে দাখিল হয়েছেন, তখন সমস্ত কলুষতা মুছে গেছে এবং পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নিঃসন্দেহে যে ব্যক্তি ঐক্য ও সংহতির পথ অবলম্বন করে এবং শান্তির দিকে ঝুঁকে পড়ে, সে পথভ্রষ্ট হতে পারে না।”

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: সন ৬৮০ হিজরী; নিহায়াতুল আরাব লিন নুওয়াইরি: ৩১/৩০ থেকে ৩৭, কায়রো সংস্করণ; তারিখ মুখতাসারুদ দুওয়াল, পৃষ্ঠা ৫১২, দারুশ শারক সংস্করণ।

[২] তারিখ মুখতাসারুদ দুওয়াল, পৃষ্ঠা ৫০৫; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: সন ৬৮০ হিজরী।

কিন্তু সুলতান একই সাথে এই পত্রে আহমদ খানকে ইহাও স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, এখনও আর্মেনিয়া থেকে ইসলামী শহরগুলোর ওপর আক্রমণ ও লুণ্ঠন অব্যাহত রয়েছে, যদিও এই এলাকাটি মঙ্গোলদের করদরাজ্য এবং এর কর তাদের কাছেই যায়। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত এই কর্মকাণ্ড বন্ধ না হবে, ততক্ষণ শান্তি স্থায়ী হতে পারে না। এই পত্রটি ১ রমজান ৬৮১ হিজরিতে লেখা হয়েছিল। [১]

আহমদ খানের হত্যাকাণ্ড, আরগুন খানের শাসন:

আহমদ খান নিজে সাইফউদ্দীন কালাউনের ইচ্ছা অনুযায়ী ইসলামী শহরগুলোর ওপর মঙ্গোল ও তাদের মিত্রদের আক্রমণ বন্ধ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তখনও মঙ্গোলদের একটি বড় অংশ মানসিকভাবে তার সাথে ছিল না। অনেক শাহজাদা, যাদের মধ্যে তার ভতিজা আবাকার পুত্র আরগুনও অন্তর্ভুক্ত ছিল, তারা ইসলাম বিদ্রোহী ছিল এবং তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল।

অবশেষে এই শাহজাদারা তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার এবং হত্যা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। আহমদ খান বিষয়টি জানতে পেরে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে শুরু করেন। এর ফলে মঙ্গোলদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত আরগুন খানের সমর্থকরা জয়ী হয় এবং আহমদ খানকে ক্ষমতাচ্যুত করে তাকে শহীদ করে দেওয়া হয়। এই বেদনাদায়ক ঘটনাটি ২ জমাদিউল আখের ৬৮৩ হিজরির। [২]

আরগুন খানের সিংহাসন আরোহণ মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত উদ্বেগজনক প্রমাণিত হয়। তদুপরি সে মসুলের এক ইহুদি চিকিৎসক সাদউদ্দৌলাকে নিজের উজির নিযুক্ত করে, যে তার মতোই মুসলমানদের কটুর বিরোধী ছিল। [৩]

আর্মেনিয়ার নাসারাদের সাথে যুদ্ধ:

সাইফউদ্দীন কালাউন আর্মেনিয়ার খ্রিস্টানদের পক্ষ থেকে উত্তর সিরিয়ার ওপর আক্রমণের বিষয়ে অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন। এমনই এক আক্রমণে নাসারারা আলেপ্পোর জামে মসজিদে প্রবেশ করে ভাঙচুর চালিয়েছিল। অবশেষে কালাউন আর্মেনীয় খ্রিস্টানদের শাস্তি দেওয়ার জন্য উত্তরের দিকে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন, যারা আর্মেনিয়ায় প্রবেশ করে নাসারাদের শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। এই অভিযানে তাতারীদের একটি বাহিনীর সাথেও মোকাবিলা হয়, মুসলমানরা তাদেরও বিতাড়িত করে। সুলতান কালাউনের নির্দেশে আলেপ্পোর মসজিদটি পুনরায় নির্মাণ করে আগের চেয়েও সুন্দর করে তোলা হয়। [৪]

অমুসলিম তাতারী ও ইউরোপের আঁতাত:

আরগুন তার পিতার মতোই খ্রিস্টান ঘেঁষা এবং কঠোর ইসলাম বিদ্রোহী ছিল। সে একাকী কালাউনের মোকাবিলা করতে ভয় পেত, তাই ইউরোপবাসীদের বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়ে সাহায্যের প্রলোভন দেখিয়ে উস্কানি দিতে শুরু করল যাতে তারা পশ্চিম দিক থেকে মুসলিম বিশ্বের ওপর আক্রমণ করে। সে রোমের পোপ অনোরিয়াস চতুর্থকে তার পত্রে একটি নতুন ক্রুসেডের আহ্বান জানিয়ে লিখেছিল:

“খোদা, রোমের পোপ এবং চেস্টিস খানের সাহায্যে আমরা মুসলমানদের বের করে দিতে পারি।”

[১] তারিখ মুখতাসারুদ দুওয়াল, পৃ. ৫১৬, ত. দারুশ শারক

[২] তারিখ মুখতাসারুদ দুওয়াল, পৃ. ৫২৬-৫২৭, ত. দারুশ শারক

[৩] তারিখ ইবনে খালদুন: ৫ / ১১৬, ১১৭, ত. দারুল ফিকর

[৪] তারিখ ইবনে খালদুন: ৫ / ৩৫৮, ত. দারুল ফিকর

সে একজন সন্ন্যাসীকে নিজের দূত বানিয়ে ইউরোপে পাঠিয়েছিল, যে বাইজেন্টাইন সম্রাটের দরবার থেকে শুরু করে রোমের গির্জাগুলো পর্যন্ত সফর করেছিল। গির্জার প্রধান কার্ডিনালদের সাথে সাক্ষাৎ করে সে ফ্রান্সের রাজার সাথে দেখা করতে প্যারিসে গিয়েছিল এবং ব্রিটেনের রাজার কাছেও উপস্থিত হয়েছিল। সে এক বছর পর্যন্ত ইউরোপীয় শাসকদের মেহমান হিসেবে ছিল। এই সময়ে তার মাধ্যমে আরগুন খানের পত্রগুলো ঐ শাসকদের কাছে পৌঁছাতে থাকে। শেষ চিঠিতে আরগুন খান ফ্রান্সের রাজা ফিলিপকে লিখেছিলেন:

“আমাদের অনুরোধ হলো যে, আপনারা শীতের শেষ মাসে যাত্রা শুরু করবেন এবং বসন্তের প্রথম মাসের ১৫ তারিখে দামেস্কের কাছে ছাউনি ফেলবেন। সেই সময়ে আপনাদের সৈন্যবাহিনী চলে আসলে আমরা আপনাদেরকে বায়তুল মুকাদ্দাস পুনরায় জয় করে দেব। কিন্তু আপনারা যদি না পৌঁছান, তবে আমাদের সৈন্য পাঠানো ফলপ্রসূ হবে না।”

আল্লাহর অদৃশ্য ব্যবস্থাপনায় বিশ্ব কুফরি শক্তির এই আঁতাত সফল হতে পারেনি। ইউরোপীয় শাসকরা নিজেদের অভ্যন্তরীণ বিবাদে লিপ্ত ছিল এবং আরগুন খানের আকাঙ্ক্ষা তার মনেই রয়ে গেল।

পরবর্তীতে পশ্চিমা বিশ্ব এই সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার কারণে আক্ষেপ করতে থাকে এবং তাদের এই দুঃখ আজও তাদের ইতিহাসে প্রতিফলিত হয়, যেমনটি প্রাচ্যবিদ হ্যারল্ড ল্যাম্ব এই পরিস্থিতির ওপর দুঃখ প্রকাশ করে লিখেছেন:

“ইউরোপের রাজারা নিজেদের অভ্যন্তরীণ বিবাদে এতটাই মগ্ন ছিলেন যে, এখন এশিয়া সফর করে জেরুজালেম পর্যন্ত পৌঁছানো তাদের কাছে দুঃসাধ্য মনে হচ্ছিল। এটি ইতিহাসের এক পরিহাস যে, এই কয়েক মাসে দুই শতাব্দীর ক্রুসেড যুদ্ধের সমস্ত প্রচেষ্টা বৃথা হয়ে গেল।” [১]

আরগুন খান ইউরোপীয় বাহিনীর জন্য অপেক্ষা করতে করতে হতাশ হয়ে পড়ল। সে খ্রিস্টধর্মের পরিবর্তে হিন্দু ধর্মের প্রতি আগ্রহ দেখাতে শুরু করল। অদৃশ্য শক্তি অর্জনের জন্য সে জাদু-টোনা এবং তিলসমী কর্মকাণ্ডের চক্রে পড়ে গেল। কিন্তু রবিউল আউয়াল ৬৯০ হিজরিতে যখন ভারতের এক যোগী তাকে সর্বদা সুস্থ রাখার একটি ওষুধ তৈরি করে দিল, তখন সে সেটি ব্যবহার করতেই অসুস্থ হয়ে পড়ল এবং কয়েক দিন পর প্রাণ হারাল। [২]

সিরিয়ায় খ্রিস্টানদের ক্রমাগত পরাজয়:

সিরিয়ার উপকূলে কিছু দুর্গ তখনও ফ্রাঙ্কদের দখলে ছিল। ৭ রবিউল আউয়াল ৬৮৪ হিজরিতে সুলতান হসপিটালারদের শক্তিশালী ঘাঁটি ‘হিসনুল মারকাব’ জয় করে নেন এবং এখানকার ফ্রাঙ্কদের জীবনের নিরাপত্তা দিয়ে ত্রিপোলি যাওয়ার অনুমতি দেন। [৩]

ত্রিপোলি বিজয়:

ত্রিপোলির ঐতিহাসিক শহরটি ছিল সুলতানের আসল লক্ষ্য, যা প্রথম ক্রুসেড যুদ্ধের পর সাত বছরের দীর্ঘতম অবরোধের...

[১] March of The Barbarians, by Harold Lamb: p: 234

[২] তারিখ-ই-ওয়াসসাফ, লেখক: আবদুল্লাহ বিন ফজলুল্লাহ ওয়াসসাফ: ২/২৪৫, বোম্বে সংস্করণ; তারিখ ইবনে খালদুন: ৫/৭১১, দারুল ফিকর সংস্করণ। দ্রষ্টব্য: তারিখ ইবনে খালদুনে আরগুনের মৃত্যুর তারিখ ভুল লেখা হয়েছে “ফামাতা সানাতা সাবয়িন” (অর্থাৎ সত্তর হিজরিতে মারা গেছেন), সম্ভবত এটি অনুলিপিকারের ভুল।

[৩] নিহায়াতুল আরাব লিন নুওয়াইরি: ৩১/৩৯, দারুল কুতুব কায়রো সংস্করণ।

...এর পর ৫০৩ হিজরিতে মুসলমানদের থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল। পৌনে দুই শতাব্দী অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল, এই সময়ের মধ্যে সালাহউদ্দিন আইয়ুবী এবং রুকনউদ্দিন বাইবার্সও এটি পুনরুদ্ধার করতে পারেননি। এই সৌভাগ্য আমির কালাউনের নসিবে ছিল। রবিউল আউয়াল ৬৮৮ হিজরিতে সুলতান ত্রিপোলি (طرابلس) অবরোধ করেন এবং এক মাস ধরে অনবরত পাথর নিক্ষেপ করে এর মজবুত প্রাচীরগুলো ভেঙে ফেলেন। অবশেষে রবিউস সানি ৬৮৮ হিজরিতে ত্রিপোলি নতি স্বীকার করে এবং এই জেলার অন্যান্য দুর্গগুলোও জয় করা হয়। এটি ছিল এক মহান বিজয় যার ফলে পুরো সালতানাতে আনন্দ উদযাপন করা হয়। কালাউন ক্রুসেডারদের লোভাতুর দৃষ্টি প্রতিহত করার জন্য ত্রিপোলির দুর্গটি ধ্বংস করে দেন এবং এখানকার মুসলিম জনবসতির কাছে ‘হিসনুল আকরাদ’ থেকে কিছুটা দূরত্বে ‘ত্রিপোলি’ নামে একটি নতুন দুর্গ নির্মাণ করান। [১]

আক্কার ওপর আক্রমণ এবং কালাউনের মৃত্যু:

এই বিজয়ের পরের বছর আমির সাইফউদ্দিন কালাউন আক্কার ওপর আক্রমণের জন্য কিছু সৈন্য পাঠান যারা সেখানে মিনজানিক স্থাপন শুরু করে। সুলতান বাকি সৈন্যবাহিনী নিয়ে আক্কা অভিমুখে যাত্রার জন্য কায়রোর বাইরে তাঁবু গেড়ে অবস্থান করছিলেন, ঠিক সেই অবস্থায় তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে। ৬ জিলকদ ৬৮৯ হিজরিতে তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। [২]

কালাউনের যুগের কিছু বৈশিষ্ট্য:

কালাউনের যুগে মামলুকদের অধীনে মুসলিম বিশ্ব শান্তি ও শৃঙ্খলার এক নতুন যুগে প্রবেশ করে। তাতারীদের শক্তি ভেঙে পড়েছিল। ক্রুসেড যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছিল, সিরিয়ার ক্রুসেডাররা তাদের দুর্গের মধ্যে গুটিয়ে গিয়েছিল। সিরিয়া ও মিশরে উলামা ও ফকিহদের মজলিসগুলো আগের চেয়ে বেশি আবাদ ছিল। খানকাহগুলোর জৌলুস বেড়ে গিয়েছিল। গত শতাব্দীর তুলনায় এখন মাদরাসা কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। সুলতান ও আমিরগণ ইসলামের প্রতিটি খিদমতকে নিজেদের জন্য গৌরবের বিষয় মনে করতেন এবং জনকল্যাণমূলক কাজে মুক্তহস্তে ব্যয় করতেন।

কালাউন এই দিক থেকে সমস্ত মামলুক সুলতানদের মধ্যে স্বতন্ত্র যে, তাঁর বংশেই সালতানাত সবচেয়ে বেশি সময় স্থায়ী হয়েছিল। তাঁর মধ্যে অনেক গুণ ছিল, তবে শেষ দিকে তিনি সচ্ছল শ্রেণির ওপর ভারী জরিমানা আরোপ করেন এবং তাদের কঠোর শাস্তি দেন। [৩] বাইবার্সের সময় থেকে মিশরে বসবাসকারী নওমুসলিম তাতারীদের সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করার ধারা শুরু হয়েছিল। কালাউন তা অব্যাহত রাখেন। এভাবে নওমুসলিম তাতারীরা মিশরীয় সেনাবাহিনীর একটি শক্তিশালী বাহতে পরিণত হয়। [৪] তিনি কারমুন-এর কন্যা এক তাতারী মেয়েকে বিয়েও করেছিলেন যার গর্ভে তাঁর বড় ছেলে আলাউদ্দিন আলী আল-মালিক আল-সালেহ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। [৫]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: বছর ৬৮৮ হিজরি; তারিখ ইবনে খালদুন: ৫/৩৬৩

[২] আল-বিদায়া: বছর ৬৮৮ হিজরি; তারিখ ইবনে খালদুন: ৫/৩৬৩, তাবা দারুল ফিকর

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: বছর ৬৮৮ হিজরি, ৬৮৯ হিজরি

[৪] আত-তাওয়ায়েফ আল-মুগুলিয়াহ ফি মিসর, ডক্টর সালাহউদ্দিন মুহাম্মদ নূর, পৃষ্ঠা ৩৬, তাবা আল-ইসকান্দারিয়া

[৫] ইকদুল জুমান লিল আইনি: বছর ৬৭৬ হিজরি

খলিল আল-আশরাফ

(৭ যিলকদ ৬৮৯ হিজরি হতে মহররম ৬৯৩ হিজরি) (ডিসেম্বর ১২৯০ খ্রিষ্টাব্দ হতে ডিসেম্বর ১২৯৩ খ্রিষ্টাব্দ)

কাল্লাউনের পর ৭ যিলকদ ৬৮৯ হিজরিতে তার পুত্র খলিল আল-আশরাফ সিংহাসনে আরোহণ করেন, যিনি রাষ্ট্র পরিচালনার গুণাবলীতে সমৃদ্ধ ছিলেন। তিনি পিতার অসম্পূর্ণ অভিযান সম্পন্ন করতে দেরি করেননি এবং পরবর্তী বছর ৬৯০ হিজরির শুরুতে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে কায়রো থেকে আক্কায় পৌঁছে কঠোরতম অবরোধ করেন। এই শহরটি ৫৮৭ হিজরিতে ক্রুসেডাররা সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল এবং এটি ক্রুশের কবলে ১০৩ বছর অতিবাহিত করেছিল। এই জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য সিরিয়া ও মিশরের উলামা ও ফুকাহাগণ দলে দলে পৌঁছেছিলেন এবং সব ধরনের সেবা প্রদান করেছিলেন, এমনকি মিনজানিকগুলো টেনে আক্কা পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার কাজেও শরিক ছিলেন। [১]

আক্কা বিজয়:

আক্কার অবরোধ ৪ রবিউস সানি ৬৯০ হিজরিতে শুরু হয়। দেড় মাস পর্যন্ত যুদ্ধ চলতে থাকে। ইসলামী বাহিনী অনবরত পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে প্রাচীরের অপরাজেয় বুরুজগুলো ভেঙে ফেলে এবং পরিখা মাটি দিয়ে ভরাট করে তা অতিক্রম করে। এরপর ক্ষতিগ্রস্ত বুরুজগুলো ধসিয়ে দেওয়া হয় এবং শুক্রবার ১৭ জমাদিউল আখিরাতে মুজাহিদগণ ধ্বংসপ্রাপ্ত বুরুজগুলো দিয়ে শহরে প্রবেশ করেন। প্রতিপক্ষ কেল্লা এবং অভ্যন্তরীণ বুরুজগুলোতে অবরুদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ করে, কিন্তু দশ দিন পর তাদের শক্তি ভেঙে পড়ে।

সোর এবং সিদনের ক্রুসেডাররা যখন তাদের সবচেয়ে শক্তিশালী দুর্গের পতনের খবর পেল, তখন তারা এতটাই আতঙ্কিত হলো যে শহরগুলো খালি করে পালিয়ে গেল। খলিল আল-আশরাফ বিলম্ব না করে এই সমস্ত শহর দখল করে নেন এবং সেগুলোর প্রাচীর ও কেল্লাগুলো ধ্বংস করে পুরো সিরিয়া উপকূল থেকে ক্রুসেডারদের ঘাঁটির অবসান ঘটান। এভাবে ক্রুসেডাররা যারা ৪৯০ হিজরিতে সিরিয়ায় এসেছিল, দুই শতাব্দী পর এখান থেকে সম্পূর্ণভাবে বিতাড়িত হলো। হাফিজ ইবনে কাসির রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৬৯০ হিজরির ঘটনার অধীনে লেখেন:

“এই বছর শুরু হলে আক্কা এবং দীর্ঘকাল ধরে ক্রুসেডারদের দখলে থাকা উপকূলীয় এলাকাগুলো বিজিত হয় এবং তাদের কাছে এখানে একটি পাথরের জায়গাও অবশিষ্ট রইল না। সমস্ত প্রশংসা ও অনুগ্রহ আল্লাহরই জন্য।” [২]

ক্রুসেড যুদ্ধের অবশিষ্টাংশের সমাপ্তি:

মুসলিম বিশ্বের সাথে সংযুক্ত সর্বশেষ খ্রিস্টান রাষ্ট্র আক্কার পতনের সাথে সাথেই ৪৮৯ হিজরিতে শুরু হওয়া দুইশ বছরের ক্রুসেড...

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: বছর ৬৮৯ হিজরি, ৬৯০ হিজরি

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: বছর ৬৯০ হিজরি

যুদ্ধের অবশিষ্টাংশের নাম-নিশানা পর্যন্ত মুছে গেল। নিঃসন্দেহে এই যুদ্ধগুলোর ফলাফল মুসলমানদের পক্ষেই ছিল এবং ইউরোপীয় জাতিগুলোর জন্য লাঞ্ছনা, অপমান, ব্যর্থতা এবং জান-মালের ক্ষতি ও পূর্ণ পরাজয় ছাড়া আর কিছুই অর্জিত হয়নি। যুদ্ধের এই দীর্ঘ সিলসিলায় মুসলমানদের বহু প্রজন্ম জিহাদ করেছে। এই সময়ে তাদের ওপর অনেক বড় বড় ধৈর্য-পরীক্ষার মুহূর্ত এসেছে, হিম্মত ভেঙে দেওয়ার মতো বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে। শাহাদাত, বন্দিত্ব এবং পিছু হটার ঘটনাও তাদের ভাগ্যে জুটেছে, কিন্তু তারা চরম সাহস ও বীরত্বের সাথে জিহাদ অব্যাহত রেখেছে এবং অবশেষে ইসলামের ভূখণ্ডকে দখলদার নাসারাদের হাত থেকে মুক্ত করে দম নিয়েছে। এর পর কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের ইসলামের ভূখণ্ডের দিকে চোখ তুলে তাকানোর সাহস হয়নি, বরং তাদের সাহস ইউরোপের শেষ সীমানা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

ক্রুসেড থেকে ইউরোপে জ্ঞানতাত্ত্বিক বিপ্লব:

হ্যাঁ! অগণিত ক্ষতি সহ্য করা সত্ত্বেও একদিক থেকে এই যুদ্ধগুলো ইউরোপের জন্য উপকারী ছিল। এই দুই শতাব্দীতে ইউরোপ মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছে। ইউরোপের শ্রেষ্ঠ মস্তিষ্কগুলো এটা বুঝে নিয়েছিল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কারিগরি দিক থেকে মুসলমানদের সমকক্ষ না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সফলতা অর্জন করা সম্ভব নয়। ফলে তারা প্রথমবারের মতো মুসলিম দেশগুলোর মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে অথবা আগে থেকে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে উন্নত করে আধুনিক চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলে। জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন, গণিত এবং পদার্থবিজ্ঞানের ওপর মুসলিম পণ্ডিতদের লেখা অতুলনীয় বইগুলো সেখানে পড়ানো হতে থাকে। এই বইগুলো বোঝার জন্য সেখানকার জ্ঞানপিপাসুরা আরবি ভাষা শেখে এবং নিজেদের জন্য আরবি ভাষা শেখার এমন ব্যবস্থা করে যাতে ছাত্ররা সরাসরি এই জ্ঞান-বিজ্ঞানকে মূল উৎস থেকে পড়তে পারে। এরপর বই অনুবাদের কাজ শুরু হয় এবং মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বইগুলো ইউরোপের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষায় স্থানান্তরিত হতে থাকে। এখান থেকেই ইউরোপ উন্নতির সেই রাজপথে পা রাখে যা কয়েক শতাব্দীর মধ্যে তাকে বিশ্বজয়ী করে তোলে।

আর্মেনিয়ায় বিজয়:

পরবর্তী বছর খলিল আল-আশরাফ উত্তর সিরিয়াকে আর্মেনীয় খ্রিস্টানদের হাত থেকে নিরাপদ করার জন্য সেখানে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন এবং কেল্লাতুল রুম জয় করেন। ৬৯২ হিজরিতে তিনি পুনরায় অভিযানের প্রস্তুতি নেন, তবে আর্মেনিয়ার শাসক ভীত হয়ে বেহনা, তাল হামদুন এবং মারআশ-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটিগুলো হস্তান্তর করে সন্ধি করে নেন। [১]

খলিল আল-আশরাফের হত্যাকাণ্ড:

সম্ভবত খলিল আল-আশরাফের বিজয়ের পরিধি আরও বৃদ্ধি পেত, কিন্তু ১৫ মহররম ৬৯৩ হিজরিতে তিনি দরবারের আমিরদের এক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে নিহত হন। খলিল আল-আশরাফ মাত্র তিন বছর শাসন করেছিলেন, কিন্তু ইতিহাসে তার নাম এজন্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে যে, সিরিয়ার উপকূলকে বিদেশী শক্তি থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করার কৃতিত্ব তারই। [২]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: বছর ৬৯১ হিজরি, ৬৯২ হিজরি।

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৬৯৩ হিজরি।

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

আল-মালিক আল-নাসির মুহাম্মদ বিন কালাউন প্রথম শাসনকাল

মহরম ৬৯৩ হিজরি থেকে মহরম ৬৯৪ হিজরি (ডিসেম্বর ১২৯৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ডিসেম্বর ১২৯৪ খ্রিস্টাব্দ)

১৬ মহরম ৬৯৩ হিজরিতে নিহত সুলতানের স্থলে তাঁর ভাই মুহাম্মদ বিন কালাউনকে ‘আল-মালিক আল-নাসির’ উপাধি দিয়ে সিংহাসনে বসানো হয়। তিনি ১৫ মহরম ৬৮৪ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং সিংহাসনে আরোহণের সময় তাঁর বয়স ছিল পূর্ণ ৯ বছর। [১]

আল-মালিক আল-নাসির মুহাম্মদ বিন কালাউন ইতিহাসের সেই অনন্য শাসকদের একজন, যারা তিনবার শাসন করার সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি দুইবার অপসারিত হন। তৃতীয়বার তাঁর শাসনকাল মৃত্যু পর্যন্ত স্থায়ী ছিল।

প্রথম শাসনকাল ছিল প্রায় এক বছরের। এই সময়ে তিনি নামমাত্র বাদশাহ ছিলেন, শাসনের বিষয়াবলি আমিরদের হাতে ছিল, কিন্তু তারা এতেও সন্তুষ্ট ছিল না। অবশেষে ১০ মহরম ৬৯৪ হিজরিতে বেশ কয়েকজন আমির তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে যা ব্যর্থ হয়। তাঁর অনুগত আমিররা বিদ্রোহীদের হত্যা করে। কিন্তু এর পরপরই অনুগত আমিরদের প্রধান জয়নুদ্দিন কিতবুগা দুর্বল শাসককে সালতানাতের জন্য অতিরিক্ত বোঝা হিসেবে গণ্য করেন এবং তাঁকে অপসারিত করে গৃহবন্দী করে দেন। [২]

[১] নেহায়াতুল আরাব লিন-নুওয়াইরি: ৩১/ ২৬৭, তবা দারুল কুতুব কায়রো।

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৬৯৩ হিজরি, ৬৯৪ হিজরি।

জয়নুদ্দীন কিতবুগা, মিশরের নওমুসলিম তাতারী শাসক

মহররম ৬৯৪ হিজরি থেকে মহররম ৬৯৬ হিজরি (ডিসেম্বর ১২৯৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে নভেম্বর ১২৯৬ খ্রিষ্টাব্দ)

১১ মহররম ৬৯৪ হিজরিতে কিতবুগার মিশর ও শামের সুলতান হওয়া ছিল ইতিহাসের এক অদ্ভুত মোড়। এই নতুন বাদশাহ, যিনি আল-মালিকুল আদিল উপাধিতে মিশর ও শাম শাসন করেছিলেন, তিনি ছিলেন একজন তাতারী সৈন্য, যিনি ৬৩৩ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ২৫ বছর বয়সে আইন জালুতের যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। আইন জালুতের যুদ্ধের আগে তাতারীদের মধ্যে এটি প্রসিদ্ধ ছিল যে, কিতবুগা নামের এক ব্যক্তি মিশর শাসন করবে। তাই হালাকু খান কিতবুগা নুয়ানকে সেনাপতি করে পাঠিয়েছিলেন। যখন তিনি যুদ্ধে নিহত হলেন, তখন তাতারীরা অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিল যে, সেই বিখ্যাত ভবিষ্যদ্বাণী কীভাবে ভুল প্রমাণিত হলো। ৬৫৯ হিজরিতে তাতারীরা হিমসে দ্বিতীয়বার পরাজিত হয়। এই যুদ্ধের বন্দীদের মধ্যে এই ছোট কিতবুগাও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাকে মিশরে সামরিক দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়। ২৫ বছর পর তিনি পদোন্নতি পেতে পেতে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছান যে, মিশর ও শামের সমস্ত শাসনব্যবস্থা তার হাতে চলে আসে। [১] এর মাধ্যমে ইসলামের সেই সহনশীলতার আন্দাজ করা যায়, যা সাত শতাব্দী পরেও মুসলিম সমাজে এই পর্যায় পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল যে, শত্রু জাতির একজন বন্দী মুসলিম সালতানাতের ক্ষমতার মসনদে পৌঁছে গিয়েছিলেন। কিতবুগা এই পদটি তার যোগ্যতার ভিত্তিতে লাভ করেছিলেন। হাফিজ ইবনে কাসির রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার প্রশংসা করে লিখেছেন:

“তিনি অত্যন্ত ভালো শাসক ছিলেন। চরিত্র, ন্যায়বিচার এবং ইসলামের বিজয়ের উদ্দীপনায় তিনি সমস্ত আমিরদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।” [২]

তার শাসনামলে বিপুল সংখ্যক তাতারী মিশরে আসে এবং ইসলামে দীক্ষিত হয়ে এখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। এখানকার পরিবারগুলোর সাথে তাদের বৈবাহিক সম্পর্কও গড়ে ওঠে এবং এভাবে একটি মিশ্র সমাজ অস্তিত্ব লাভ করে। [৩]

কিতবুগা শাসনের জন্য মাত্র দুই বছর সময় পেয়েছিলেন। এরপর আমিররা তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলে বিদ্রোহ করে যে, তিনি তাতারীদের সাথে গোপন যোগাযোগ রক্ষা করছেন। কিতবুগা এই পরিস্থিতি দেখে ক্ষমতা ছেড়ে দেন এবং গোপনে শামের দিকে পালিয়ে যান। এটি ৭ মহররম ৬৯৬ হিজরির ঘটনা। [৪]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: বছর ৬৯৩ হিজরি

[২] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: বছর ৬৯৩ হিজরি

[৩] তারিখ ইবনে খালদুন: ৫ / ৪৬৮, ত. দারুল ফিকর... মিশরীয় মামলুক সালতানাতে তাতারীদের অনুপ্রবেশ ও প্রভাব সম্পর্কে মিশরীয় ঐতিহাসিক ডক্টর সালাহউদ্দীন বিন মুহাম্মদ নুরের গবেষণামূলক প্রবন্ধ “আত-তাওয়ায়েফুল মুগুলিয়াহ ফি মিসর” (প্রকাশিত: মুনশাতুল মাআরিফ ইস্কান্দারিয়া) পাঠযোগ্য।

[৪] আস-সুলুক লি-মা’রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ২ / ২৭৩, ২৭৪, ত. আল-ইলমিয়াহ

আল-মালিক আল-মানসুর হুসামুদ্দিন লাজিন

মহরম ৬৯৬ হিজরি থেকে রবিউল আখের ৬৯৮ হিজরি (ডিসেম্বর ১২৯৬ খ্রি. থেকে ফেব্রুয়ারি ১২৯৯ খ্রি.)

১৮ মহরম ৬৯৬ হিজরিতে মামলুকরা তাদের একজন আমির হুসামুদ্দিন লাজিনকে এই শর্তে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন যে, তিনি নিজের জন্য কোনো বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করবেন না, আমিরদের পরামর্শ ছাড়া কোনো আদেশ জারি করবেন না এবং নিজের বিশেষ লোকদের সালতানাতের কর্মকর্তাদের ওপর প্রাধান্য দেবেন না। এই শর্তগুলোর ওপর হুসামুদ্দিন লাজিনের কাছ থেকে দুবার শপথ নেওয়া হয়েছিল। এরপর তার বায়াত গ্রহণ করা হয়। [১]

লাজিন মরহুম সুলতান কালাউনের গোলাম ছিলেন, তাকে এক হাজার দিরহামে কেনা হয়েছিল। তিনি আল-মালিক আল-মানসুর উপাধি নিয়ে শাসন শুরু করেন। তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ এবং ইনসাফপ্রিয় মানুষ ছিলেন। নির্মাণকাজে তার আগ্রহ ছিল, তিনি দীর্ঘকাল ধরে পরিত্যক্ত জামে মসজিদ তুলুনিয়াকে ২০ হাজার দিনার (প্রায় ৫০ কোটি টাকা) ব্যয়ে নতুন করে নির্মাণ করান এবং সেখানে একটি দরসগাহও শুরু করেন যেখানে তাফসির, হাদিস এবং ফিকহ শিক্ষা দেওয়া হতো। [২]

এই সময়ে সাবেক বাদশাহ আল-মালিক আন-নাসির বিন কালাউন কারাক দুর্গে বন্দি ছিলেন। এই পরিস্থিতিতে মিশরের আমিরদের মধ্যে এই আন্দোলন শুরু হয় যে, আল-মালিক আন-নাসিরকে কায়রোতে এনে সিংহাসনে বসানো হোক। যদিও তিনি তখনো সালতানাত চালানোর যোগ্য ছিলেন না, তবে বর্তমান আমিরদের চেয়ে সালতানাত পরিচালনার জন্য বেশি যোগ্য ছিলেন। এই আন্দোলন খুব দ্রুত জোরদার হয় এবং অনেক আমির হুসামুদ্দিন লাজিনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে লিপ্ত হন। অবশেষে ১০ রবিউল আখের ৬৯৮ হিজরিতে হুসামুদ্দিন লাজিনকে তার কয়েকজন অনুগত আমিরসহ হত্যা করা হয়। তিনি দুই বছর দুই মাস শাসন করেছিলেন। [৩]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: বছর ৬৯৬ হিজরি; নিহায়াতুল আরাব: ৩১/৩১৩, ত. দারুল কুতুব কায়রো

[২] তারিখ ইবনে খালদুন: ৫/৪৬৯, ত. দারুল ফিকর

[৩] তারিখ ইবনে খালদুন: ৫/৪৭১ থেকে ৪৭৪, ত. দারুল ফিকর; আস-সুলুক লি-মা'রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ২/৩০০, ৩০১, ত. ইলমিয়া

আল-মালিক আন-নাসির বিন কালাউন..... দ্বিতীয় শাসনকাল

জুমাদিউল উলা ৬৯৮ হিজরি থেকে শাওয়াল ৭০৮ হিজরি (মার্চ ১২৯৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে এপ্রিল ১৩০৯ খ্রিষ্টাব্দ)

৪ঠা জুমাদিউল উলা ৬৯৮ হিজরিতে আল-মালিক আন-নাসির কায়রো পৌঁছান। তখন তার বয়স ছিল পনেরো বছর। সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এক বিশাল শোভাযাত্রা তাকে স্বাগত জানায় এবং পুনরায় সিংহাসন আরোহণের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। প্রকৃতপক্ষে আল-মালিক আন-নাসিরের প্রকৃত শাসনকাল এখন থেকেই শুরু হয়েছিল। তার পরিবার প্রজাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু ছিল, তাই মানুষ তাকে পছন্দ করত। [১]

মঙ্গোলদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব - গাজান-এর শাসন:

এই সময়ে মিশরের প্রতিদ্বন্দ্বী মঙ্গোল সালতানাতে অনেক পরিবর্তন এসেছিল। খ্রিস্টানদের প্রতি অনুরাগী আরগুন খান বিন আবাকা ইউরোপ থেকে সাহায্য আসার অপেক্ষায় থাকতে থাকতে ৬৯০ হিজরিতে মারা যান। তার ছেলে শাহজাদা গাজান সিংহাসনের দিকে তাকিয়ে ছিলেন, কিন্তু তার আপন চাচা কায়খাতু খান, যিনি মুসলমান হয়েছিলেন, ক্ষমতা দখল করেন। কিন্তু মঙ্গোলদের মধ্যে তখনও ইসলামের দাওয়াত বেশি ছড়ায়নি, তাই কায়খাতুর শাসনকাল মাত্র তিন বছর স্থায়ী হয়েছিল। মঙ্গোল সরদাররা বিদ্রোহ করে এই নওমুসলিম শাসককে হত্যা করে।

কায়খাতুর পরিবর্তে হালাকু খানের এক পৌত্র বাইদু খান বিন তরাকাই বিন হালাকু সিংহাসনে বসেন। এই সময়ে কেবল চেঙ্গিস খান নয়, বরং হালাকু খানের বংশও অনেক বিস্তৃত হয়েছিল। শাহজাদাদের এক দীর্ঘ সারি ছিল এবং শাসনের জন্য অনেকেরই দাবি ছিল। তাই খুব শীঘ্রই বাইদু খানের সাথে তার ভতিজা গাজান বিন আরগুনের দ্বন্দ্ব শুরু হয়, যিনি নিজেকে ইলখানি সালতানাতে সবচেয়ে যোগ্য মনে করতেন। এক বছরও পার হয়নি যে, গাজান বিজয়ী হয়ে বাইদু খানকে হত্যা করেন এবং ফিলহজ ৬৯৪ হিজরিতে ইলখানি মঙ্গোল সালতানাতে অধিপতি হন। গাজান ইসলাম গ্রহণ করে নিজের নাম ‘মাহমুদ’ রেখেছিলেন। সিংহাসনে বসার সাথে সাথেই তিনি মুদ্রায় কালিমা তাইয়েবা অঙ্কন করার এবং ইসলামী নিদর্শনসমূহকে সাধারণ করার নির্দেশ দেন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করা সত্ত্বেও তার মধ্যে তার পূর্বপুরুষদের মতো রক্তপাত ও লুটতরাজের স্বভাব প্রবল ছিল এবং অন্যান্য দেশ জয়ের নেশা তাকে শান্তিতে থাকতে দিচ্ছিল না। নিজের প্রপিতামহ হালাকু খানের মতো তিনিও প্রথম লক্ষ্য হিসেবে শাম ও মিশরকে নির্ধারণ করেন। [২]

গাজান-এর মিশরের আমিরদের সাথে ষড়যন্ত্র:

মামলুক শাসনে বারবার শাসক পরিবর্তনের ফলে একটি রাজনৈতিক সংকট তৈরি হয়েছিল, সরকার দুর্বল হয়ে পড়ছিল। গাজান...

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: সন ৬৯৮ হিজরি

[২] তারিখ ইবনে খালদুন: ৫/৬১৭, ৬১৮; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৭/২৬৬, তাবা’ দার হিজর

চতুর্থ খণ্ড | মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

সুযোগের সদ্ব্যবহার করল এবং অধিকতর চতুরতা এই যে, বিধিবদ্ধ আক্রমণের পূর্বেই মামলুক আমিরদের নিজের সাথে মেলাতে শুরু করল। বেশ কয়েকজন মামলুক জেনারেলের সাথে তার পত্রালাপ হলো যারা তাকে আনুগত্যের নিশ্চয়তা দিল, অনেক আমির তার দরবারের সাথে যুক্ত হয়ে গেল। গাজান তাতার সাম্রাজ্যের সাথে তাদের সম্পর্ক আরও মজবুত করার জন্য তাদের তাতার নারীদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনেও কোনো দ্বিধা করল না। [১]

গাজানের আক্রমণ: হিমসের যুদ্ধ:

৬৯৯ হিজরিতে গাজান মামলুক সালতানাতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল এবং তার বাহিনী সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হতে লাগল। এই সংবাদে ইসলামি শহরগুলোতে ভয় ও আতঙ্কের ঢেউ বয়ে গেল কারণ তাতারদের পূর্ববর্তী বিজয়ের তিক্ততম অভিজ্ঞতা সম্পর্কে সবাই অবগত ছিল। উত্তর সিরিয়ার শহরগুলো: হালাব এবং হামার মানুষ পালিয়ে গিয়ে সাম্রাজ্যের মধ্যাঞ্চলে আশ্রয় নিতে লাগল। তবে সুলতান নাসির মুহাম্মদ বিন কালাউন দ্রুত মিশর থেকে সৈন্য নিয়ে সিরিয়া প্রতিরক্ষার জন্য পৌঁছে গেলেন। ৮ রবিউল আউয়াল রাজকীয় বাহিনী দামেস্কে প্রবেশ করল। নতুন মুজাহিদ নিয়োগ করে দামেস্ক থেকে বাহিনী রওনা হলো। সিরিয়ার উলামা, ফুকাহা এবং শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সাথে ছিলেন। মসজিদগুলোতে দোয়া করা হচ্ছিল এবং কুন্তে নাজেলা পড়া হচ্ছিল।

কিন্তু যুদ্ধের পূর্বেই বাহিনীতে ভীর্ণতা ছড়িয়ে পড়েছিল। এর প্রথম কারণ ছিল এই যে, গাজানের ইসলাম গ্রহণের পর তাতাররা বিপুল সংখ্যায় ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিল। মোকাবিলায় আসা তাতার বাহিনীর অধিকাংশ এই নওমুসলিমদের নিয়ে গঠিত ছিল। তাই সিরিয়া ও মিশরের অনেক সৈন্য মানসিকভাবে এই নওমুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রস্তুত ছিল না।

দ্বিতীয় কারণ ছিল এই যে, যে সকল আমির মামলুকদের থেকে বিদ্রোহী হয়ে গাজানের সাথে যোগ দিয়েছিল, তাদের সেখানে প্রচুর পুরস্কৃত করা হয়েছিল, গাজানের এই দানশীলতা ও অনুগ্রহ তাকে সুখ্যাতিও দান করেছিল। এর বিপরীতে কয়েক মাস আগে সিরিয়ার সীমান্ত বাহিনী ইরাকে তাতারদের সীমানায় আক্রমণ করেছিল যাতে সেখানে বসবাসরত মুসলমানদেরও জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। এই ঘটনার ফলে একদিকে যেমন গাজান আক্রমণের অজুহাত পেয়ে গিয়েছিল, অন্যদিকে খোদ সিরীয় মুসলমানরা নিজেদের সরকার ও বাহিনীকে সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু বানাতে শুরু করেছিল। সুলতানের পক্ষ থেকে যুদ্ধের আগে আর্থিক অনুদান কমিয়ে দেওয়াও সৈন্যদের হতাশ করেছিল। ফলে এই পরিবেশে এই কথাগুলো ছড়িয়ে পড়েছিল যে মামলুকরা তাতারদের কাছে পরাজিত হবে।

অবশেষে ২৭ রবিউল আউয়াল সুলতানের বাহিনী বের হলো এবং প্রতিপক্ষের খবর সংগ্রহ করতে করতে হিমসের বাইরে তাবু ফেলল। ওদিক থেকে তাতাররা অগ্রসর হয়ে আসছিল। এক রাতে খবর পাওয়া গেল যে তাতাররা সালামিয়ার নিকটবর্তী ওয়াদি খাজানদারে পৌঁছে গেছে। সুলতানি বাহিনী এ কথা শুনে খুব ভোরে কুচ করল এবং একদিনেই অত্যন্ত দ্রুততার সাথে তিন মঞ্জিল পথ অতিক্রম করে শত্রুর নাগাল পেল।

সুলতানকে বাহিনী থেকে দূরে একটি উঁচু টিলায় রাখা হলো যাতে যুদ্ধে পরাজয় হলেও সুলতান ঘেরাওয়ের মধ্যে না পড়েন। এখন উভয় পক্ষ কাতারবন্দি হচ্ছিল। গাজানের সাথে মিশর দরবারের সাথে সংশ্লিষ্ট অনেক আমিরও ছিলেন যাদের মধ্যে সাইফউদ্দিন কিবচাক,

[১] মুখতারুল আখবার, লাইবারস আল-মানসুরি (মৃত্যু ৭২৫ হি.), পৃ. ১০৭, আদ-দারুল মিসরিয়্যাহ আল-লুবনানিয়্যাহ, ১৯৯৩ খ্রি.

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

বখতর এবং ফারস আল-জাহিরি বিশিষ্ট ছিলেন। তাদের মাধ্যমে গাজান মিসরীয় ও শামী বাহিনীর গুণাবলী এবং দুর্বলতা সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত হয়েছিলেন। তিনি তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে তারা যেন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে শত্রুর আক্রমণের অপেক্ষা করে। ভাগ্যের পরিহাস এই যে, ঠিক আক্রমণের সময় মিসরীয় সেনাপতি বাইবার্সের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে এবং তাকে চারপাইয়ে করে শিবিরের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। তার অনুপস্থিতিতে মামলুকরা প্রতিপক্ষের ওপর আক্রমণাত্মক হামলার সিদ্ধান্ত নিল। ঘোষণা ঘোষণা করল: “বর্শা ফেলে দাও, তলোয়ার বের করো।”

পুরো বাহিনী বর্শা ফেলে দিল, কিন্তু শীঘ্রই প্রমাণিত হলো যে এই নির্দেশ অত্যন্ত ক্ষতিকর ছিল। অশ্বারোহীরা যখন ঘোড়াগুলোকে দ্রুত ছোটানোর জন্য চাবুক মারল, তখন তারা মাটিতে পড়ে থাকা বর্শার ফলায় বিদ্ধ হয়ে আহত হতে লাগল এবং কাটা পড়ল।

দ্বিতীয় ভুলটি ছিল এই যে, তীরন্দাজরা এমনভাবে দাহ্য তরল নিক্ষেপ করতে শুরু করল যাতে শত্রু যখন তাদের সীমানায় আসবে তখন তারা আক্রান্ত হবে। কিন্তু শত্রু তার নিজ স্থানেই স্থির ছিল এবং তাদের নিজেদের বাহিনীই এগিয়ে যাওয়ার সময় এর কবলে পড়ে গেল।

আক্রমণাত্মক হামলার এই রণকৌশল এই দিক থেকেও সঠিক ছিল না যে, বাহিনী তিনটি মঞ্জিল অতিক্রম করে এসেছিল, ফলে তারা অত্যন্ত ক্লান্ত ছিল। এরপর যখন অশ্বারোহী মুজাহিদরা শত্রুর কাছাকাছি পৌঁছাল এবং তাদের অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে স্থির ও অটল অবস্থায় দেখল, তখন তারা ভীত হয়ে পড়ল এবং তাদের আক্রমণের ধার কমে গেল। নও-মুসলিমদের ওপর আক্রমণের ধারণাও তাদের উৎসাহকে স্তিমিত করে দিচ্ছিল।

এই সময়ে মঙ্গোল বাহিনী পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। দীর্ঘক্ষণ ধরে তুমুল যুদ্ধ চলতে থাকে। এই সময়ে মামলুকদের বাম পার্শ্বের বাহিনী এক জোরালো আক্রমণে তাতারদের ডান পার্শ্বের বাহিনীকে পিছু হটিয়ে দেয়। মনে হচ্ছিল মামলুকরা আজ আইন জালুতের ইতিহাস পুনরাবৃত্তি করবে। কিন্তু গাজান যখন এটি দেখলেন, তখন তিনি একটি বিশেষ দল নিয়ে ডান পার্শ্বের বাহিনীকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেলেন এবং তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করলেন।

তার নির্দেশে মঙ্গোল তীরন্দাজরা মামলুকদের ডান ও বাম পার্শ্ব তীরের বৃষ্টি শুরু করল, যার ফলে সারিতে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। সামনের সারিতে থাকা ত্রিপোলির শাসক সাইফউদ্দিন কারাত শিব সবার আগে তীরের আঘাতে আক্রান্ত হন। তিনি যুদ্ধের আগে এক বন্ধুকে বলছিলেন: “গত রাতে আমি স্বপ্নে দেখেছি যে একটি পাখি আমাকে বলছে, পড়ো:

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

(হে আমাদের রব! আমাদের অন্তরগুলোকে বক্র করে দিও না আমাদের হেদায়েত দান করার পর এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের রহমত দান করো। নিশ্চয়ই তুমি মহান দাতা।)

[১]

আমি যখন এই আয়াতটি পড়লাম, তখন সেই পাখিটি আমাকে তার ডান ডানায় বসিয়ে উপরে নিয়ে গেল এবং একটি বাগানে পৌঁছে দিল। আমি এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা এটাই মনে করি যে আমি শাহাদাত লাভ করব।“

তীরের বৃষ্টি শুরু হওয়ার সাথে সাথেই তার ঘোড়াটি হোঁচট খেল। এরপর তাতারদের সাধারণ আক্রমণ শুরু হলো। তাদের বাম পার্শ্বের বাহিনী মামলুকদের ডান পার্শ্বের বাহিনীকে তছনছ করে দিল। সাইফউদ্দিন ঘোড়া থেকে নেমে তলোয়ার চালাতে লাগলেন এবং অত্যন্ত...

[১] সূরা আল-ইমরান, আয়াত নম্বর ৮

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

বীরত্বের সাথে লড়াই করতে করতে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করলেন। মামলুকদের ডান পার্শ্বের বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

সুলতান মুহাম্মদ বিন কালাউন তখন তাঁর দেহরক্ষীদের সাথে ময়দানে রক্তের নদী প্রবাহিত হতে দেখছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে, কিন্তু আমিরগণ তাঁকে বাধা দিলেন এই আশঙ্কায় যে, তাঁর কোনো ক্ষতি হলে সব কিছু ওলটপালট হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত তা-ই হলো যার আশঙ্কা ছিল। মামলুকদের পা এমনভাবে টলে গেল যে তারা আর স্থির হতে পারল না। এই দৃশ্য দেখে সুলতান কাঁদতে কাঁদতে আকাশের দিকে তাকালেন এবং বলতে লাগলেন: “হে আল্লাহ! আমাকে মুসলমানদের জন্য অমঙ্গলের কারণ করবেন না।”

সুলতানের দেহরক্ষীরা তাঁকে কোনোমতে রক্ষা করে বালবাক দুর্গে পৌঁছে দিতে সক্ষম হলেন।

আমির বদরুদ্দিন সিলাহ আহত অবস্থায় ছিলেন। পরাজয় দেখে তিনি তাঁর বিদ্যুৎগতিসম্পন্ন ঘোড়াটি আনালেন যার কোনো তুলনা ছিল না। তিনি যখন তাতে সওয়ার হতে যাচ্ছিলেন, তখন সঙ্গীরা বললেন: “ঘোড়াটি অত্যন্ত শক্তিশালী, আপনি এই অবস্থায় একে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করবেন?”

তারা মনে করছিল যে আমির পলায়নের জন্য ঘোড়ায় সওয়ার হচ্ছেন, কিন্তু আমির ঘোড়ার লাগাম শত্রুর দিকে ঘুরিয়ে দিলেন এবং হাঁক দিলেন: “যে শাহাদাত চায় সে আমার পেছনে চলে আসুক।”

অফিসাররা তাঁকে থামানোর চেষ্টা করলেন কিন্তু তিনি বললেন: “আল্লাহর কসম! আমি তো কতকাল ধরে এই দিনটির অপেক্ষায় ছিলাম।”

আমির কাওয়ামুদ্দিন বললেন: “আপনি লশকর বা বাহিনীর তত্ত্বাবধায়ক, আমাদের এমন কোনো আমির নেই যিনি আহত হননি। অধিকাংশ মামলুক শহীদ হয়ে গেছেন। আমাদের নিজেদের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া জায়েজ নয়।”

বদরুদ্দিন উত্তর দিলেন: “যখন কিছুই অবশিষ্ট নেই, তবে আজকের দিনে কেন পেছনে পড়ে থাকব।”

এই বলে তিনি ঘোড়াটিকে শত্রুর দিকে ছুটিয়ে দিলেন। কিন্তু এক মামলুক তাঁর প্রাণ বাঁচানোর জন্য সাথে দৌড়ে এল এবং ঘোড়াটির মুখ হিমসের দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে একটি চাবুক মারল। ঘোড়াটি বিদ্যুতের মতো লাফিয়ে উঠল এবং চোখের পলকে ধুলো উড়িয়ে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। যখন সেটি হিমসের নিকটবর্তী একটি খালের পানিতে নামল, তখন আমির ডুবতে ডুবতে বেঁচে গেলেন। কিছু গোলাম সময়মতো পৌঁছে তাঁর প্রাণ বাঁচালেন এবং তাঁকে অন্য একটি ঘোড়ায় সওয়ার করে দুর্গে নিয়ে গেলেন।

২৮ রবিউল আউয়াল ৬৯৯ হিজরিতে সংঘটিত এই যুদ্ধের ফলাফল ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। মামলুকদের বড় বড় আমিরগণ রণক্ষেত্রে প্রাণ হারালেন। পলায়নের সময় অনেককে ধরে হত্যা করা হলো। ছাউনিতে থাকা অস্ত্রের ভাঙার এবং অটেল মূল্যের সাজসরঞ্জাম শত্রুর হস্তগত হলো। গাজান মামলুকদের পশ্চাদ্ধাবন করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তাঁর উপদেষ্টারা এই বলে তাঁকে থামিয়ে দিলেন যে, হতে পারে প্রতিপক্ষ বাহিনী কোনো চাল চালছে। [১]

শামে ভয় ও আতঙ্ক:

পরাজয়ের খবরে দামেস্ক ও এর আশপাশের এলাকায় হাহাকার পড়ে গেল। লশকরের অবশিষ্ট লোকজন দামেস্কে পৌঁছালে সেখানে চরম অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ল। ভয় ছিল যে তাতারীরা আগের মতোই গণহত্যা চালাবে। অবশ্য কিছু লোকের ধারণা ছিল যে গাজান একজন মুসলমান...

[১] ইব্রদুল জুমান লিল আইনি: সন ৬৯৯ হিজরি; আন-নুজুমুজ জাহেরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহেরা: ৮/১২২।

তাই সে সবাইকে জান ও মালের নিরাপত্তা দেবে। কিছু ভ্রান্ত ধারণায় নিমজ্জিত লোক এমনও ভাবছিল যে গাজান আমাদের মালামাল দিয়ে ভরিয়ে দেবে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই ছিল আতঙ্কিত। শহর প্রশাসনের মধ্য থেকে কেবল দুর্গাধিপতি তার কিছু সঙ্গীর সাথে দুর্গে অবস্থান করছিলেন। বাকি অধিকাংশ কর্মকর্তা, কাজী, অফিসার এবং সৈন্যরা শহর ছেড়ে চলে গিয়েছিল। উলামা, ফুকাহা এবং সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে যাদের সামর্থ্য ছিল তারা হিজরত করেছিল। পেছনে বখাটেদের পোয়াবারো হলো এবং লুটতরাজ সাধারণ বিষয়ে পরিণত হলো। কয়েদিরা জেল ভেঙে বাইরে বেরিয়ে এল এবং বাগানের দরজা ও জানালা উপড়ে নিয়ে গেল। [১]

:امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جرأت - غازان سے گفتگو

সবচেয়ে বড় বিপদ ছিল এই যে, তাতারীরা যেকোনো সময় দামেস্কে প্রবেশ করতে চাচ্ছিল এবং তাদের আতঙ্কে প্রতিটি মানুষ থরথর করে কাঁপছিল। এই পরিস্থিতিতে দামেস্কের এক বরেণ্য ইলমি ব্যক্তিত্ব ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ. অবস্থার সংশোধনের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলেন। তিনি শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের একটি প্রতিনিধি দলের সাথে গাজানের সাথে দেখা করতে গেলেন যাতে তার কাছ থেকে দামেস্কবাসীর জন্য জানের নিরাপত্তা লাভ করা যায়।

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ. যখন গাজানের সাথে দেখা করতে গেলেন, তখন তাকে ন্যায় ও ইনসাফ সম্পর্কে আয়াত ও হাদিসসমূহ স্পষ্টভাবে শোনালেন। তিনি গাজানকে বললেন: ‘তোমার দাবি হলো তুমি একজন মুসলমান, আমি জানতে পেরেছি যে তোমার সাথে ইমাম এবং মুয়াজ্জিনও রয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তুমি আমাদের মুসলমানদের ওপর চড়াও হয়েছে।’

গাজান মনোযোগ দিয়ে তার কথাগুলো শুনছিল। সে লোকজনকে জিজ্ঞেস করল যে, এই আলেম কে? আমি আজ পর্যন্ত এর চেয়ে বেশি সাহসী এবং মজবুত হৃদয়ের অধিকারী কোনো ব্যক্তিত্ব দেখিনি। তখন লোকজন ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ.-এর ইলমি শ্রেষ্ঠত্বের কথা উল্লেখ করল। এই সাক্ষাতে মেহমানদারিরও আয়োজন ছিল। প্রতিনিধি দলের সবাই তাতে শরিক হলেন কিন্তু ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ. খাবারে হাত দিলেন না। যখন কারণ জিজ্ঞেস করা হলো, তখন তিনি বললেন:

‘এই খাবার কি জায়েজ? এটি তো গরিব মুসলমানদের লুণ্ঠিত ভেড়া-বকরি এবং তাদের কাঠের জ্বালানি দিয়ে রান্না করা হয়েছে।’

গাজান দোয়ার আবেদন করলে ইমাম সাহেব রহ. বললেন:

‘ইয়া আল্লাহ! যদি এই যুদ্ধের মাধ্যমে গাজানের উদ্দেশ্য আপনার দ্বীনের উচ্চতা এবং আপনার পথে জিহাদ হয়, তবে তাকে সাহায্য করুন; আর যদি দুনিয়ার রাজত্ব এবং লোভ-লালসা উদ্দেশ্য হয়, তবে আপনিই তার ব্যবস্থা নিন।’

গাজান এই শব্দগুলোর ওপর আমিন আমিন বলতে থাকল [২], অন্যদিকে প্রতিনিধি দলের অন্যান্য উলামারা তাদের কাপড় গুটিয়ে নিচ্ছিলেন এই ভেবে যে, এখনই নির্দেশ আসবে আর এখনই শাইখের গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হবে। গাজান ইমাম সাহেবের সুপারিশে অনেক কয়েদিকে মুক্তি দিল এবং তাদের সম্মান ও মর্যাদার সাথে এই নিশ্চয়তা দিয়ে বিদায় করল যে, সিরিয়াবাসীদের শান্তি দেওয়া হবে। এই মজলিস থেকে বের হয়ে তার কিছু সঙ্গী তার ওপর চড়াও হলেন এবং বললেন: ‘আপনি তো আমাদের ধ্বংস করতে কোনো কমতি রাখেননি। এখন আমরা আপনার সাথে যাব না।’

[১] আন-নুজুমুজ জাহেরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহেরা: ৮/১২৩; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: বছর ৬৯৯ হিজরি।

[২] মনে রাখতে হবে যে, গাজান তাতারী হওয়া সত্ত্বেও আরবি বুঝত, তাই এমনটি ভাবা উচিত নয় যে সে ইমাম সাহেবের দোয়া না বুঝে আমিন বলছিল।

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

তিনি বললেন: “আমি নিজেও তোমাদের সাথে যেতে চাই না।”

প্রতিনিধি দলের সদস্যরা দামেস্কের উদ্দেশ্যে রওনা হলে পথে ডাকাতদের কবলে পড়েন, যারা তাদের পোশাক পর্যন্ত কেড়ে নেয়। যখন ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) কিছু সময় পর ফিরে আসছিলেন, তখন তাঁর সত্যবাদিতার খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং পথে মানুষ বরকত লাভের জন্য তাঁর চারপাশে সমবেত হচ্ছিল। তিনি এমন শান-শওকতের সাথে দামেস্কে পৌঁছালেন যে তিনশ ব্যক্তি তাঁর সফরসঙ্গী ছিল। [১]

দামেস্কে মঙ্গোলদের লুটতরাজ। দুর্গ জয়ের প্রচেষ্টা:

গাজান খান সাইফউদ্দিন কিবচাককে দামেস্কে নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি দামেস্কের পক্ষ থেকে জনগণের জান ও মালের নিরাপত্তার সুসংবাদ শুনিয়েছিলেন। তবে এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হয়নি। যদিও পূর্ববর্তী সময়ের মতো ব্যাপক গণহত্যা হয়নি, তবুও হাজার হাজার মানুষকে বন্দী করা হয় এবং হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়। নারীদের পর্দা লুণ্ঠিত হয়, সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েদের দাসী বানানো হয়। কুতুবখানা (লাইব্রেরি) এবং ওয়াকফকৃত ভবনগুলো লুট করা হয়। তাতারীরা জামে মসজিদে প্রবেশ করে মদ পান করে এবং নারীদের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। সরকারি গবাদি পশু, শস্য এবং অস্ত্রের গুদামগুলো দখল করে নেওয়া হয়। দামেস্ক থেকে কমপক্ষে ২০ হাজার গবাদি পশু হাঁকিয়ে তাদের তাঁবুতে নিয়ে যাওয়া হয়। সরকারি কোষাগার থেকে যে পরিমাণ সম্পদ লুট করা হয়েছিল তার মূল্য ছিল কমপক্ষে ৩৬ লক্ষ দিরহাম (প্রায় ৯০০ কোটি টাকা)। প্রতিটি নাগরিকের ওপর মাথাপিছু কর ধার্য করা হয়, সে ধনী হোক বা দরিদ্র। শহরের প্রতিটি বাজার থেকে জোরপূর্বক লক্ষ লক্ষ দিনার আদায় করা হয় এবং যারা দিতে অস্বীকার করত তাদের কঠোরভাবে প্রহার করা হয়।

শহরের আশপাশেও তাতারীদের লুটতরাজ অব্যাহত ছিল। বড় বড় আলেমদের গলায় দড়ি দিয়ে টেনে নেওয়া হচ্ছিল। দামেস্কসহ পার্শ্ববর্তী জনপদগুলোতে যুদ্ধে নিহত সৈন্য ও সাধারণ নাগরিকদের সংখ্যা এক লক্ষ পর্যন্ত অনুমান করা হচ্ছিল। বন্দীর সংখ্যা এগারো হাজারের কম ছিল না। চারদিকে তাতারীরা দখলদারিত্ব কায়েম করেছিল। কেবল দামেস্কের সুউচ্চ দুর্গটি তাদের হাত থেকে নিরাপদ ছিল এবং ‘সানজার মানসুরি আরজাওয়াশ’ সেখানে দুর্গাধিপতি হিসেবে অবস্থান করছিলেন। তাঁর এই দৃঢ়তার পেছনে ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.)-এর উৎসাহব্যঞ্জক বার্তার ভূমিকা ছিল। তিনি দুর্গাধিপতিকে বলে পাঠিয়েছিলেন যে, যতক্ষণ একটি পাথরও অবশিষ্ট আছে, ততক্ষণ দুর্গ সমর্পণ করবেন না। আক্রমণকারীরা মানজানিক (পাথর নিক্ষেপক যন্ত্র) স্থাপন শুরু করলে দুর্গ থেকে পাল্টা অগ্নিবর্ষণ করা হয় এবং মানজানিকগুলো পুড়ে যায়। এ খবর শুনে গাজান নিজে দুর্গ জয়ের জন্য দামেস্কে পৌঁছান। তিনি পরিখা খননের নির্দেশ দেন, যার গভীরতা এত বেশি ছিল যে তা ভরাট করতে কমপক্ষে এক মাস সময় লাগত। অবশেষে গাজানের নির্দেশে তাঁর নায়েব সাইফউদ্দিন কিবচাক দুর্গের দেয়ালের কাছে গিয়ে সাক্ষাৎ করেন এবং অস্ত্র সমর্পণের শর্তে প্রাণভিক্ষার প্রতিশ্রুতি দেন, অন্যথায় ভয়াবহ পরিণতির হুমকি দেন।

দুর্গাধিপতি অত্যন্ত সাহসী ছিলেন। তিনি কঠোর স্বরে বললেন: “কে সেই ব্যক্তি যে দুর্গের কাছে আসার সাহস করে? আমি তাকে তীরে বিদ্ধ করব। গাজানকে গিয়ে বলো সে যেন দুর্গের কাছে এসে নিজের পরিণতি দেখে নেয়।”

[১] আল-আলামুল আলিয়াহ ফি মানাকিবি ইবনে তাইমিয়াহ লি-আবি হাফস আল-বাযযার, পৃ. ৬৯ থেকে ৭২, তাবা আল-মাকতাবুল ইসলামি বৈরুত; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৭/১৭, তাবা দারু হাজার; আল-উকুদুদ দুররিয়াহ ফি মানাকিবি ইবনে তাইমিয়াহ লি-ইবনে আব্দুল হাদি আদ-দিমাশকি (মৃ. ৭৪৪ হি.), পৃ. ১৩৩, তাবা দারুল কুতুবিল আরাবি বৈরুত।

গাজান দ্রুত মানজানিক (পাথর নিক্ষেপক যন্ত্র) স্থাপনের নির্দেশ দিলেন। প্রকৌশলীরা সেগুলো তৈরিতে লেগে গেলেন। দুর্গাধিপতি গোয়েন্দাদের মাধ্যমে জানতে পারলেন যে মানজানিক তৈরির কাজ কোথায় হচ্ছে। তিনি রাতে কয়েকজন বাছাইকৃত সৈন্য পাঠালেন যারা মানজানিক নির্মাতাদের খঞ্জর দিয়ে হত্যা করল এবং মানজানিকগুলোতে পেট্রোলিয়াম তেল দিয়ে আগুন ধরিয়ে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। এভাবে দুর্গ জয়ের অভিযান দীর্ঘায়িত হতে থাকল। এই সময়ে মানুষ আতঙ্কিত হয়ে ঘরে লুকিয়ে ছিল। মসজিদগুলো জনশূন্য হয়ে পড়েছিল। জুমার নামাজেও শহরের সবচেয়ে বড় মসজিদ জামে উমাবীতে একটি কাতারও খুব কষ্টে পূর্ণ হতো। কাউকে যদি ঘর থেকে বের হতে হতো, তবে সে জীর্ণ পোশাক পরে ফকিরের বেশে বের হতো এবং কাজ শেষ করেই দ্রুত ফিরে আসত। সব সময় এই আশঙ্কা লেগে থাকত যে কখন না জানি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যায়।

জমাদিউল আউয়ালের মাঝামাঝি সময়ে গাজান তার সেনাবাহিনীর বড় একটি অংশ নিয়ে ইরাকে ফিরে গেলেন, তবে তার সেনাবাহিনীর একটি অংশ দুর্গটি ঘিরে রাখল এবং বুলাই নামক এক তাতারী সর্দারের নেতৃত্বে একটি দল দামেস্কের উপকণ্ঠে ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে থাকল।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি ওলামাদের একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে বুলাইয়ের সাথে তার তাঁবুতে গিয়ে সাক্ষাৎ করলেন এবং মানুষের প্রতি দয়া করার কথা বললেন। তাঁর সুপারিশে বিপুল সংখ্যক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হলো। [১]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং মোগল শাসকের কথোপকথন:

বুলাই এই সাক্ষাতে ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে কিছু প্রশ্নও করেছিলেন। তিনি অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ ও যুক্তিপূর্ণ উত্তর দিয়েছিলেন। বুলাই জিজ্ঞেস করলেন: “তুমি ইয়াজিদ সম্পর্কে কী আকিদা পোষণ করো?”

ইমাম সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন: “আমরা তাকে গালিও দেই না, আবার তাকে ভালোবাসিও না। কারণ সে এমন কোনো নেক লোক ছিল না যে আমরা তাকে ভালোবাসব। আর আমরা নির্দিষ্ট কোনো মুসলমানকে গালিও দেই না।”

বুলাই বললেন: “তুমি কি ইয়াজিদের ওপর লানত করো না? সে কি জালেম ছিল না? সে কি হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করায়নি?”

ইমাম সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন:

“আমরা জালেমদের সম্পর্কে তাই বলি যা কুরআন মজিদ বলেছে: **الَّا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ** (জেনে রেখো! জালেমদের ওপর আল্লাহর লানত)। তবে আমরা কাউকে নির্দিষ্ট করে তার ওপর লানত করি না, যদিও কিছু আলেম ইয়াজিদের ওপর লানতও করেছেন। এটি এমন একটি মাসআলা যাতে ইজতিহাদের অবকাশ রয়েছে, কিন্তু আমাদের নিকট প্রথম মতটিই উত্তম। হ্যাঁ, যে ব্যক্তি হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করেছে বা এতে সাহায্য করেছে অথবা এতে সন্তুষ্ট হয়েছে, তার ওপর আল্লাহ, ফেরেশতা এবং সমস্ত মানুষের লানত হোক, আল্লাহ তাআলা তার কোনো আমল কবুল না করুন।” [২]

[১] উকদুল জুমান লিল আইনি: সন ৬৯৯ হিজরি; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া সন ৬৯৯ হিজরি; আস-সুলুক লি-মা’রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক লিল মাকরিজি: সন ৬৯৯ হিজরি।

[২] এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, ইমাম ইবনে তাইমিয়া ইয়াজিদের ওপর লানত করাকে মুজতাহাদ ফিহি (গবেষণাসাপেক্ষ) মাসআলা মনে করতেন অর্থাৎ লানত জায়েজ মনেকারীদেরও তিনি আহলে হক হিসেবে স্বীকার করতেন। তবে লানত থেকে বিরত থাকাকেই তিনি রাজেহ (অধিকতর সঠিক) মাযহাব হিসেবে গণ্য করতেন যেমনটি জমহুর আহলে সুন্নাহের অভিমত। কিন্তু আজকাল “কিছু মহোদয়ের” নিকট ইয়াজিদের ওপর লানত করা হারাম হওয়া একটি অকাট্য মাসআলা এবং লানত জায়েজ মনেকারীদের যারা সুন্নি মনে করে তারাও তাদের নিকট রাফেজি মতবাদের আড্ডা হয়ে গেছে। জানা নেই এই মহোদয়গণ ইমাম ইবনে তাইমিয়া সম্পর্কে কী ফতোয়া দেবেন!!

বুলাই জিজ্ঞেস করল: “তোমরা কি আহলে বাইতকে ভালোবাসো?”

তিনি বললেন: “তাদের ভালোবাসা আমাদের নিকট একটি ফরজ ও ওয়াজিব কাজ, যার ওপর সওয়াব পাওয়া যায়।” [১] এরপর ইমাম সাহেব (রহ.) এর প্রমাণ হিসেবে ‘হাদিসে গাদিরে খুম’ শোনালেন। তারপর বললেন:

“আমরা প্রতিটি নামাজে দরুদ পড়ি যাতে ‘আল্লাহুমা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ’ পাঠ করি।”

বুলাই বলতে লাগল: “তাহলে আহলে বাইতকে কে ঘৃণা করে?”

ইমাম সাহেব (রহ.) বললেন: “যে তাদের ঘৃণা করে, তার ওপর আল্লাহ, ফেরেশতাকুল এবং সমস্ত মানুষের লানত।”

এরপর ইমাম সাহেব (রহ.) উজিরকে জিজ্ঞেস করলেন: “এই তাতারী হয়ে ইয়াজিদ সম্পর্কে কেন জিজ্ঞেস করছে?”

উজির বললেন: “তাতারীদের বলা হয়েছে যে, সিরিয়াবাসীরা নাসিবী।” ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) উচ্চস্বরে বললেন:

“এটি মিথ্যা, যে এটি বলেছে তার ওপর আল্লাহর লানত। দামেস্কে কোনো নাসিবী নেই। যদি এখানে কেউ হযরত আলী (রা.)-এর কোনো অবমাননা করে, তবে মানুষ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। হ্যাঁ, পূর্ববর্তী সময়ে এটি বনু উমাইয়ার কেন্দ্র ছিল। সেই সময় কিছু উমাবী হযরত আলী (রা.)-এর প্রতি শত্রুতা পোষণ করত এবং তাকে মন্দ বলত, কিন্তু এখন এখানে এ ধরনের লোকদের মধ্যে কেউ অবশিষ্ট নেই।” [২]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর প্রচেষ্টায় মদ্যশালা বন্ধ:

এই সময়ে নতুন শাসক সাইফুদ্দীন কবজক মদ্যশালাগুলো খুলে দিয়েছিলেন, যা তার আয়ের একটি বড় উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একটি মদ্যশালা দৈনিক এক হাজার দিরহাম ট্যাক্স প্রদান করত। ইবনে তাইমিয়া (রহ.) শাসকের সাথে দেখা করলেন এবং তাকে বোঝালেন যে, এটি সম্পূর্ণ নাজায়েজ কাজ। সে মেনে নিল এবং ইমাম সাহেব (রহ.) তার অনুমতি নিয়ে বেশ কিছু মদ্যশালায় গিয়ে মদ নষ্ট করে দিলেন। [৩]

তাতারীদের সিরিয়া ত্যাগ:

রজবের শুরু পর্যন্ত তাতারীরা দামেস্ক ও এর আশপাশের এলাকা দখলে রেখেছিল। এই সময়ে আল-মালিকুন নাসির কালাউন কায়রো পৌঁছে প্রচুর অর্থ ও সম্পদ ব্যয় করে একটি নতুন যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করেছিলেন। দামেস্কে সংবাদ পৌঁছাল যে, মিসরের সুলতান নতুন সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসছেন। এটি শোনার সাথে সাথেই তাতারীরা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে দামেস্ক ও এর আশপাশের এলাকা খালি করে ফোরাত নদীর দিকে যাত্রা করল। সেই সময় দামেস্কে কোনো শাসক বা প্রশাসক ছিল না, ছিল না পুলিশ বা সেনাবাহিনী। শহরে তখনও মদের কিছু দোকান অবশিষ্ট ছিল। তাতারীরা চলে যাওয়ার সাথে সাথেই দ্বীনদার মুসলমানদের সাহস হলো যে, এই মন্দ কাজগুলোর প্রতিকার করা দরকার। ফলে ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) তার ছাত্র ও সাথীদের নিয়ে শহর সফর করলেন, মদ্যশালাগুলোতে গিয়ে মদ ঢেলে দিলেন, মদের পাত্র ও কলসগুলো ভেঙে ফেললেন এবং এই মন্দের সাথে জড়িতদের কঠোর তিরস্কার করলেন। এই পদক্ষেপের ফলে শহরের ভদ্রলোকেরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

[১] আজকালকার সমস্ত নামধারী গবেষক ‘হাদিসে গাদিরে খুম’ নিয়ে অসন্তুষ্ট এবং এর থেকে দলিল গ্রহণ করাকে ফরজ সাব্যস্ত করেন। এই ফতোয়ার আওতায় ইমাম ইবনে তাইমিয়াও আসেন।

[২] মাজমুউল ফাতাওয়া লি ইবনে তাইমিয়া: ৩/৩৮৭ থেকে ৩৮৮, এই ঘটনাটি স্বয়ং ইমাম ইবনে তাইমিয়ার জবানিতে বর্ণিত। এর দ্বারা এটি প্রমাণিত হয় যে, ইমাম ইবনে তাইমিয়ার নিকটও উমাবী যুগে সিরিয়ায় নাসিবীয়াত বিদ্যমান ছিল এবং খোদা কিছু উমাবী শাসক এই রোগে আক্রান্ত ছিলেন। সুতরাং উমাবীদের থেকে নাসিবীয়াতকে ঢালাওভাবে অস্বীকার করা সঠিক নয়।

[৩] আকদুল জুমান লিল আইনি: সন ৬৯৯ হিজরি; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া সন ৬৯৯ হিজরি; আস-সুলুক লি মারিফতি দুওয়ালিল মুলুক: সন ৬৯৯ হিজরি।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা - চতুর্থ খণ্ড

তাতারীরা শহরের প্রাচীর জায়গায় জায়গায় ধ্বংস করে দিয়েছিল। কেবল দারুস সাকর মানসুরি ঘোষণা করেছিল যে, শহরের লোকেরা পালানো শহরের প্রাচীরে পাহারা দেবে। এই কাজে ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. অগ্রণী ছিলেন। তিনি সারা রাত প্রাচীরের চারপাশে টহল দিতেন এবং মানুষকে আল্লাহর পথে জিহাদ ও পাহারার ফজিলত শোনাতেন এবং হিম্মত ও দৃঢ়তার তালকিন করতেন। [১]

বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযানে ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর প্রচেষ্টা:

শামের জুরদ ও কাসরাওয়ান অঞ্চলের গোত্রগুলোর মধ্যে বাতেনিয়া ও ইসমাইলিয়ার মতো শিয়া ফেরকা ছাড়াও খ্রিস্টানরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল, যারা দীর্ঘকাল ধরে স্থানীয় সরকারগুলোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ছিল। তারা তাতারীদের পূর্ণ সহযোগিতা করেছিল এবং যখন মামলুক সৈন্যরা পরাজিত হয়ে তাদের এলাকা দিয়ে যাচ্ছিল, তখন এই পাহাড়ী লোকেরা তাদের ঘেরাও করে হত্যা ও লুণ্ঠন করতে কোনো কসুর করেনি। তাতারীরা দামেস্ক থেকে চলে যাওয়ার পর এবং সরকারি শৃঙ্খলা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. পাহাড়ী লুটেরাদের দমনেও অংশ নেন। যখন জিলকদ ৬৯৯ হিজরিতে সরকারি বাহিনী এই এলাকাগুলোতে অভিযান চালায়, তখন ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. একদল স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে তাদের সাথে বের হন। পাহাড়ের অনেক বিদ্রোহী ও লুটেরা সর্দার তাঁর ব্যক্তিত্বে প্রভাবিত হয়ে তাঁর হাতে তওবা করে এবং বাহিনীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া মালামাল ফেরত দেয়। [২]

মুসলমানদের অন্তরকে শক্তিশালী করার জন্য ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর রিসালা:

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. সেই দিনগুলোতে একটি সংক্ষিপ্ত রিসালা লিখেছিলেন যা সাম্প্রতিক পরাজয়ের কারণসমূহ, শোকাতপ্ত হৃদয়ের সান্ত্বনা এবং জিহাদের অনুপ্রেরণায় ভরপুর ছিল। তিনি তাতে লিখেছিলেন:

“গত বছর মুসলমানদের পরাজয়ের কারণ ছিল প্রকাশ্য গুনাহ ও মন্দ কাজসমূহ, যেমন নিয়তের কলুষতা, অহংকার ও দম্ভ, জুলুম, নির্লজ্জতা, কিতাব ও সুন্নাহর প্রতি উদাসীনতা, আল্লাহর ফরজসমূহ পালনে অবহেলা এবং আল-জাজিরা ও রোমে মুসলমানদের ওপর বাড়াবাড়ি। সুতরাং এটি আল্লাহর হিকমত ছিল যে, তিনি মুসলমানদের এই বিপদে লিপ্ত করেছেন যাতে তাদের পরিশুদ্ধি ঘটে এবং তারা তাদের রবের দিকে মনোনিবেশ করে। এতে এই হিকমতও ছিল যে, ইসলামের শত্রুদের অবাধ্যতা, ধূর্ততা, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এবং শরীয়ত থেকে বিমুখতা স্পষ্ট হয়ে যায় যাতে মুসলমানরা আল্লাহর সাহায্যের হকদার হয় এবং শত্রু প্রতিশোধ নেয়।” [১]

মিশরের সুলতানের নামে ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর মকতুব:

পরবর্তী মাসগুলোতে তাতারীদের পুনরায় আক্রমণের গুজব ছড়াতে থাকে এবং দামেস্কের মানুষ ভয় ও আতঙ্কের মধ্যে ছিল। অন্যদিকে মিশরের আল-মালিকুন নাসির কালাউনের বাহিনী আসতে দেরি হচ্ছিল। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. মনে করতেন যে, মিশর থেকে একটি বিশাল বাহিনী এসে স্থায়ীভাবে শামের সীমান্তে অবস্থান করা এবং এখানকার প্রতিরক্ষা করা জরুরি।

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: সন ৬৯৯ হিজরি

[২] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া সন ৬৯৯ হিজরি

[৩] আল-উকুদুদ দুররিয়া ফি মানাকিবি ইবনে তাইমিয়া, ইবনে আব্দুল হাদি, পৃষ্ঠা ১৩৬, দারুল কাতিব আল-আরাবি, বৈরুত

তারীখে উম্মতে মুসলিমা

সামলে নিলেন। তিনি মিশরের সুলতানের নামে একটি দীর্ঘ পত্র লিখলেন যা ব্যাপক খ্যাতি লাভ করে, এতে তিনি তাতার ফিতনার ধ্বংসলীলা এবং মুসলমানদের সাম্প্রতিক পরাজয়ের দিকে ইঙ্গিত করে সান্ত্বনা স্বরূপ লিখলেন:

“এই ফিতনা যা ছড়িয়ে পড়েছে, যদিও তা হৃদয়বিদারক, তবে ইনশাআল্লাহ এর উদাহরণ সেই ওষুধের মতো যা রোগীকে পান করানো হয়। এর মাধ্যমে পূর্ব ও পশ্চিমের সকল মুসলমান সেই খারেজীদের প্রকৃত রূপ জানতে পেরেছে যারা কালিমা পাঠ করা সত্ত্বেও শরীয়ত থেকে বিমুখ। যারা মনে মনে ইসলামী লশকর থেকে অসন্তুষ্ট ছিল, তারা আবার এর সমর্থক হয়ে গেছে। মুসলমানরা ঘুম থেকে জেগে উঠেছে এবং সুলতানের পক্ষ থেকে জিহাদের প্রস্তুতি ও এর জন্য সম্পদ উৎসর্গ করার বিষয়ে তারা আনন্দিত।”

তিনি জিহাদের জন্য এই সময়কে অত্যন্ত উপযুক্ত ঘোষণা করে লিখলেন:

“এই সময় উম্মতের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ যে, পূর্ব ও পশ্চিমের মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ। পূর্বের শহরগুলোর মুসলমানরা আল্লাহর লশকরের অপেক্ষায় আছে। মসুল, আল-জাজিরা এবং কুর্দিস্তানের বিপুল সংখ্যক মুসলমান জিহাদের জন্য প্রস্তুত।”

তিনি প্রকাশ করেন যে, এই মুহূর্তে গাজান তার রাজ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দলের সম্মুখীন। এরপর লিখলেন:

“মুসলমানদের জন্য এটা বৈধ নয় যে তারা শত্রুদের নিজেদের ভূমিতে প্রবেশের অপেক্ষা করতে থাকবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর খলিফাগণ শত্রুর দিকে লশকর পাঠাতেন, শত্রু তাদের ভূখণ্ডের দিকে অগ্রসর হোক বা না হোক। জনাব রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ওফাতের অসুস্থতার সময়ও বলেছিলেন যে, উসামার লশকরকে রওনা করে দাও। একইভাবে হযরত আবু বকর (রা.) করেছিলেন।”

তিনি শরয়ী মাসআলা বর্ণনা করে বললেন:

“মুসলমানদের ওপর আবশ্যিক যে তারা বছরে অন্তত একবার শত্রুর ভূমি পদদলিত করবে। এমনটি না করলে তারা গুনাহগার হবে। অভিজ্ঞতা সাক্ষী যে, যতক্ষণ মুসলমানরা কাফেরদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে, ততক্ষণ তারা বিজয়ী হয়েছে।”

এরপর সুলতানের কাছে লশকর অভিযানের উপকারিতা বর্ণনা করে লিখলেন:

“এর প্রথম উপকারিতা এই হবে যে, মুসলমানদের অন্তর মজবুত থাকবে এবং তারা নির্মাণ কাজ ও চাষাবাদে মশগুল হতে পারবে। অন্যথায় যতক্ষণ শত্রু আক্রমণ করতে আসবে, ততক্ষণ তারা ভীত থাকবে।”

দ্বিতীয় উপকারিতা এই যে, (শামের) উত্তরের শহরগুলো যেমন আলেপ্পো ইত্যাদিতে অর্থনৈতিক দিক থেকে সর্বোত্তম সম্পদ রয়েছে যা থেকে লশকর উপকৃত হবে।

তৃতীয় উপকারিতা এই যে, এই শহরগুলোতে আপনার সাহায্যকারী ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের অন্তর মজবুত থাকবে এবং শত্রুর ওপর প্রভাব পড়বে। অন্যথায় মানুষ শত্রুর সাথে মিশে যাবে, কারণ মানুষ তারই সাথে থাকে যার আধিপত্য চলে। সুতরাং যদি ফৌজের একটি অংশ সর্বদা সীমান্তে অবস্থান করে, তবে তা খুব ভালো হবে।

চতুর্থ উপকারিতা এই হবে যে, যদি বাহিনী আল-জাজিরার ওপর আধিপত্য বিস্তার করে সেখানে মুসলমানদের কষ্ট না দিয়ে সরকারি সম্পদ উদ্ধার করে নেয়, তবে তা অত্যন্ত লাভজনক হবে। আর যদি তারা সেখানে অবস্থান করে, তবে ওই অঞ্চলের আমিরগণও তাদের সাথে এসে মিলিত হবে। কারণ...

যে রাফেজি ও নাসারাদের ব্যতীত সবার অন্তর এমনিতেও মুসলমানদের সাথেই আছে।

[১]

যখন শাসকদের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব অব্যাহত থাকল, তখন ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. সুলতানের সাথে দেখা করতে নিজেই মিশরের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। তিনি ১১ জমাদি উল আউয়াল ৭০০ হিজরিতে কায়রো পৌঁছালেন। সুলতানের সাথে সাক্ষাতে তিনি বললেন:

“যদি শাম আপনার সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত না-ও হতো, তবুও যদি শামের মানুষ আপনার কাছে সাহায্য চাইত, তবে তাদের সাহায্য করা আপনার ওপর ওয়াজিব ছিল। এখন তো শাম আপনার শাসনের অংশ। যদি আপনি এর হেফাজতের পরোয়া না করেন, তবে পরিস্কার বলে দিন। আমরা নিজেরাই নিজেদের ব্যবস্থা করে নেব এবং এমন একজন শাসক নিজেই নির্বাচন করব, যে বিপদের সময় দেশ রক্ষা করবে এবং শান্তির সময় তা থেকে ফায়দা হাসিল করবে।”

আল-মালিক আন-নাসির তাঁর কথায় খুব প্রভাবিত হলেন, তিনি জিহাদের দৃঢ় সংকল্প করলেন। তবে আপাতত তিনি বৃষ্টি ও শীতের কারণে তাৎক্ষণিকভাবে সৈন্য পাঠাতে অপারগতা প্রকাশ করলেন। [২]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. কিছুকাল সুলতানের মেহমান হিসেবে থাকলেন। যখন তিনি দামেস্কে ফিরে এলেন, তখন সংবাদ পেলেন যে তাতার সম্রাট গাজান নতুন সৈন্যবাহিনী নিয়ে ইরাকে পৌঁছে গেছে। ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. মানুষকে সাহস দিলেন এবং সুসংবাদ দিলেন যে মিশরের সুলতান শীঘ্রই সৈন্যবাহিনী নিয়ে শাম আসছেন, কিন্তু অপেক্ষার দিনগুলো দীর্ঘ হতে থাকল।

এরই মধ্যে ১৮ জমাদি উল আউয়াল ৭০১ হিজরিতে মিশরে আব্বাসীয় খলিফা হাকিমের মৃত্যু হলো। তিনি মহররম ৬৬১ হিজরিতে খেলাফতের মসনদে বসেছিলেন। এভাবে তিনি চল্লিশ বছর তিন মাস এই মসনদ অলঙ্কৃত করেন। এরপর তাঁর পুত্র আবু রবি সুলাইমান খেলাফত লাভ করেন, তিনি মুস্তাকফি বিল্লাহ উপাধি নিয়ে এই মসনদে আসীন হন। [৩]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর জাতিকে ঐক্যবদ্ধ ও জাগ্রত রাখার প্রচেষ্টা:

মিশরীয় বাহিনীর আসতে দেরি হতে থাকল, কিন্তু ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. জনগণ ও সেনাবাহিনীর মনোবল অটুট রাখলেন। তিনি কসম খেয়ে বলতেন: “এবার আমরা অবশ্যই বিজয়ী হব, কারণ আমরা মজলুম আর মজলুমের সাহায্য অবশ্যই হয়।”

তিনি এই আয়াত পাঠ করতেন:

ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لِيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ

“অতঃপর যার ওপর জুলুম করা হয়েছে... আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন... নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।” [৪]

এ থেকে দলিল পেশ করে তিনি বলতেন: “আল্লাহর এই ওয়াদার অধীনে আমাদের বিজয় সুনিশ্চিত, এতে কোনো সন্দেহ নেই।”

[১] “রিসালা ইলাস সুলতান আল-মালিক আন-নাসির ফি শানিত তাতার” থেকে সংক্ষেপিত, ত. আল-মাকতাবাতুশ শামিলা।

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: বছর ৭০০ হিজরি; আল-উকুদুদ দুররিয়া ফি মানাকিবি ইবনে তাইমিয়া, ইবনে আব্দুল হাদি, পৃষ্ঠা ১৩৫, ত. দারুল কাতিব আল-আরাবি।

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: বছর ৭০১ হিজরি।

[৪] সূরা আল-হজ, আয়াত নম্বর ৬০।

এই সময় একটি বিতর্ক শুরু হলো যে তাতারীরা কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেছে, তাই তারা কাফির নয় এবং তারা বিদ্রোহীও নয় কারণ তারা কখনো কোনো ইসলামী সরকারের অধীনে ছিল না। তাই তাদের ওপর বিদ্রোহের বিধান প্রয়োগ করা যায় না। সুতরাং তাদের সাথে যুদ্ধ করা কি শরীয়তসম্মত হবে কি না? এই বিতর্কে আলেমগণ নিজেরাই দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়লেন।

এর জবাবে ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ. অত্যন্ত জোরালো ভাষায় বললেন যে, তাতারীরা সেই খারেজীদের পর্যায়ভুক্ত যারা হযরত আলী এবং হযরত মুয়াবিয়া রা.-এর মোকাবিলায় নিজেদেরকে শাসনের অধিকতর যোগ্য মনে করে বিদ্রোহ করেছিল। তাতারীরাও খারেজীদের মতো নিজেদেরকে অন্য মুসলমানদের তুলনায় শাসনের অধিকতর হকদার মনে করে, তারা মুসলমানদের ওপর পাপ ও জুলুমের অভিযোগ আনে কিন্তু নিজেরা তাদের চেয়েও বড় অপরাধে লিপ্ত। ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ. এ ব্যাপারে পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে বলতেন: “যদি তোমরা আমাকে তাতারীদের সারিতে মাথায় কুরআন রাখা অবস্থায়ও দেখো, তবে আমাকে হত্যা করে ফেলো।”

এই জবাবে সবাই আশ্বস্ত হলো, সন্দেহ ও সংশয় দূর হয়ে গেল এবং তারা সবাই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল।

৭০২ হিজরীর শাবান মাসে মিসরীয় বাহিনী দামেস্কে পৌঁছাল। ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ. তাঁবুতে গিয়ে সুলতানের সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং আল্লাহর কসম খেয়ে বললেন: “বিজয় আমাদেরই হবে।” আমীরগণ তাঁকে মনে করিয়ে দিলেন যে ‘ইনশাআল্লাহ’ বলুন।

তিনি বলতে লাগলেন: “আমি ইনশাআল্লাহ দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলছি, দ্বিধার সাথে নয়।”

সুলতান তাঁকে অনুরোধ করলেন যেন তিনি রাজকীয় পতাকার নিচে অবস্থান করেন, কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন:

“সুন্নত হলো এই যে, ব্যক্তি জিহাদে নিজ গোত্রের সারিতে অবস্থান করবে।” [১]

তাতারীদের আক্রমণ:

ওদিকে গাজান এক লক্ষ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী মামলুকদের মোকাবিলায় পাঠিয়ে দিল। সে তার সেনাপতি কুতলু শাহকে নির্দেশ দিয়েছিল যেন সে হিমস-এর আগে না বাড়ে এবং মামলুকদের অগ্রযাত্রার অপেক্ষা করে। কিন্তু মামলুকরা দামেস্কের কাছাকাছি অবস্থান করছিল এবং শত্রুকে এগিয়ে আসার জন্য প্ররোচিত করছিল। অবশেষে কুতলু শাহ আর অপেক্ষা করতে পারল না এবং সে অগ্রসর হয়ে দামেস্কের নিকটবর্তী মারজ আস-সাফহার উপত্যকায় পৌঁছে গেল। [২]

রোজা ভাঙ্গার ফতোয়া:

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ. শামী (সিরীয়) বাহিনীর সাথে ছিলেন। তিনি ফতোয়া দিলেন যে, যার রোজা আছে সে যেন রোজা ভেঙে ফেলে যাতে জিহাদের জন্য শক্তি অর্জিত হয়। তিনি নিজে মুজাহিদ ও আমীরদের কাছে গিয়ে তাদের ইফতার করাতেন এবং এই হাদীস শোনাতে:

إِنَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُوِّكُمْ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ، فَأَفْطِرُوا

“তোমরা সকালে শত্রুর মোকাবিলা করতে যাচ্ছ। রোজা না রাখার অবস্থায় তোমরা অধিক শক্তিশালী হবে। অতএব ইফতার করে নাও (রোজা ভেঙে ফেলো)।” [৩]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৭০২ হিজরী।

[২] মুখতারুল আখবার লিবাই বারস মানসুরী (মৃত্যু ৭২৫ হি.), পৃ. ১২৫, ১২৬, ত. আল-ইদারা আল-মিসরিয়্যাহ আল-লুবনানিয়্যাহ।

[৩] সহীহ মুসলিম, হাদীস নম্বর: ১১২০, কিতাবুস সাওম, বাব আজরুল মুফতির।

মারকায়ে শাকহাব:

শনিবার ২ রমজান ৭০২ হিজরি (২০ এপ্রিল ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দ) সকালে দামেস্কের মানুষ মসজিদের মিনার ও ছাদে আরোহণ করে নগ্ন মস্তকে আল্লাহর কাছে বিজয় ও সাহায্যের দোয়া করছিল। দক্ষিণে ধূলিঝড়ের মেঘ উড়তে দেখা গেল এবং মানুষ বুঝতে পারল যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। [১] দামেস্ক থেকে ৩৭ কিলোমিটার দূরে “শাকহাব” এর ময়দানে এক লক্ষ বিশ হাজার তাতারির মোকাবিলায় সিরীয় ও মিশরীয় বাহিনী দাঁড়িয়ে ছিল। যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল এবং উভয় পক্ষ একে অপরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। উভয় পক্ষের সৈন্যরা তলোয়ার ও বর্শার নৈপুণ্য দেখাতে লাগল। [২]

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহর বীরত্ব:

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ. যিনি তখন চল্লিশ বছর বয়সের ছিলেন, যুদ্ধের এই ভয়াবহ মুহূর্তগুলোতে নিজের জীবন বাজি লাগিয়ে দিলেন।

তঁার এক সঙ্গী বলেন:

“ইবনে তাইমিয়াহ রহ. আমাকে বললেন: আমাকে ময়দানের সেই অংশে নিয়ে চলো যেখানে মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আমি তঁাকে সামনের সারিতে নিয়ে গেলাম। সামনে থেকে শত্রুরা ধূলিঝড়ের মেঘের মতো ধেয়ে আসছিল এবং সৈন্যদের চকচকে অস্ত্র দেখা যাচ্ছিল। আমি বললাম: এই তো মৃত্যু একেবারে সামনে, এখন আপনি যা করার করুন। তিনি আকাশের দিকে তাকালেন এবং তঁার ঠোঁট নড়তে লাগল। আমার ধারণা তিনি শত্রুর বিরুদ্ধে বদদোয়া করছিলেন। [৩] তারপর তিনি রণক্ষেত্রে ঢুকে পড়লেন এবং যুদ্ধের তীব্রতা আমাদের আলাদা করে দিল।” [৪]

তাতারিরা তাদের সর্দার কতলু শাহ এবং তিতিকের নেতৃত্বে অত্যন্ত জোশ ও খরোশের সাথে বারবার আক্রমণ করল। তাদের এই তুফানি আক্রমণ ঠেকানো সহজ ছিল না। দেখতে দেখতে শত শত মুসলমান শহীদ হয়ে গেলেন। মাইমানাহর (ডান পার্শ্ব) আমির হুসামুদ্দিন, আমির মুবারিজুদ্দিন এবং শামসি হাজিবসহ সুলতানি বলয়ের প্রায় এক হাজার বাছাইকৃত অফিসার ও সৈন্য শহীদ হয়ে গেলেন। এটি দেখে মামলুকদের কালব (মূল বাহিনী) নড়ে উঠল এবং মাইমানাহর সাহায্যে এগিয়ে এল।

ওদিকে লশকর বা বাহিনীর মাইসারাহও (বাম পার্শ্ব) নিজের জায়গা ছেড়ে কালবের পেছনে চলে এল। সমস্ত মামলুক আমিররা নিজেদের দলগুলোকে একত্রিত করে একটি বৃত্ত তৈরি করলেন যার মাঝখানে আববাসি খলিফা মুস্তাকফি বিল্লাহ এবং আল-মালিকুন নাসির কালাউন ছিলেন। সুলতান অত্যন্ত বীরত্বের পরিচয় দিলেন এবং নিজের ঘোড়ার পা শিকল দিয়ে বেঁধে দিলেন যাতে পলায়নের কোনো পথ না থাকে। তাতারিরা সর্বাঙ্গক চেপ্টা করেও এই সীসা ঢালা প্রাচীরকে টলাতে পারল না। [৫] ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ. যুদ্ধের এই ভয়াবহতম মুহূর্তে সারির মাঝখানে দৌড়ে সৈন্যদের সাহস বাড়াচ্ছিলেন এবং উচ্চস্বরে জিহাদ ও শাহাদাতের ফজিলত...

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: বছর ৭০২ হিজরি

[২] মুখতারুল আখবার লিবাইরাস আল-মানসুরি, পৃষ্ঠা ১২৬, আল-ইদারা আল-মিসরিয়্যাহ

[৩] আল-উকুদুদ দুররিয়্যাহ ফি মানাকিব ইবনে তাইমিয়াহ লিবন আবদিল হাদি, পৃষ্ঠা ১৯৩, দারুল কাতিব আল-আরাবি

[৪] মুখতারুল আখবার, পৃষ্ঠা ১২৭

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

...শুনাচ্ছিলেন, ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়ার পরিণাম সম্পর্কে সতর্কবাণী স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন। [১]

তাতারিদের শিক্ষণীয় পরাজয়:

এখন মামলুকদের আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু হলে তাতারিদের ব্যুহ দ্রুত ভেঙে পড়তে লাগল। মিশরীয় ও শামী (সিরীয়) বাহিনী তাদের সব দিক থেকে আঘাত করতে ও ছিন্নভিন্ন করতে শুরু করল। তাতারিরা ছত্রভঙ্গ হয়ে বিভিন্ন দিকে পালিয়ে গেল। তাদের অধিকাংশ সেনাদল কোহে গাবাগিব-এ অবস্থান নিল এবং নিজেদের চারপাশে আগুন জ্বালিয়ে দিল। সুলতানি বাহিনী এই পাহাড়গুলো ঘেরাও করে ফেলল এবং পরের দিন জোহর পর্যন্ত তাদের ওপর তীর নিক্ষেপ করতে থাকল। অবশেষে তাতারিরা ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় অতিষ্ঠ হয়ে পড়ল।

কুতলু শাহ নিরুপায় হওয়ার আগে হঠাৎ তার বাহিনীকে পাহাড় থেকে নিচে নামিয়ে দ্রুত উত্তর-পূর্ব দিকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। মামলুকরা সেই মুহূর্তে তাদের চলে যেতে দিল কিন্তু শীঘ্রই তাদের পিছু ধাওয়া শুরু করল এবং পরবর্তী রাত পর্যন্ত তাদের লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে রাখল। সুলতান পরের দিন পিছু ধাওয়ার জন্য সতেজ বাহিনী পাঠিয়ে দিলেন যারা রাহবা পর্যন্ত তাতারিদের অনুসরণ করল। অনেক তাতারি ফোরাত নদী পার হওয়ার সময় ডুবে মারা গেল। তারা যখন ওপারে পৌঁছাল, তখন এক লক্ষের মধ্যে মাত্র ত্রিশ হাজার অবশিষ্ট ছিল।

মামলুকদের বিজয়ী বাহিনী দামেস্ক হয়ে যখন কায়রো পৌঁছাল, তখন তাদের ঐতিহাসিক সংবর্ধনা দেওয়া হলো। আজলুনের খতিব আব্দুল ওয়াহিদ তাবরিজি (রহ.) বললেন:

اللَّهُ أَكْبَرُ جَاءَ النَّصْرُ وَالظَّفَرُ..... وَالْحَمْدُ لِلَّهِ هَذَا كُنْتُ أُنْتَظِرُ

“আল্লাহ্ আকবার! সাহায্য ও বিজয় এসে পৌঁছেছে। আল্লাহর শোকর, আমি তো এরই অপেক্ষায় ছিলাম।”

كَانَ اللَّهُ مِصْرَ جُنْدَهَا نَبْلٌ..... لَا رَيْبَ فِيهِ وَجَدَ اللَّهُ مُنْتَصِرُ

“এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মিশর আল্লাহর তুণ যার বাহিনীকে তীরের মতো ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আর আল্লাহর বাহিনী প্রতিশোধ নিয়েই ছাড়ে।” [২]

গাজানের মৃত্যু:

এই পরাজয়ের পর গাজানও বেশিদিন বেঁচে থাকতে পারেনি এবং পরের বছর ৭০৩ হিজরিতে ইহলোক ত্যাগ করল। [৩]

বাতিল ফেরকাগুলোর ষড়যন্ত্র। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর সতর্কতামূলক পত্র:

তাতারিদের পিছু হটা সত্ত্বেও সিরিয়ায় তাদের সমর্থক এবং মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা রাফেজি ফেরকা, নুসাইরি, বাতিনি এবং ইসমাইলিদের রূপে বিদ্যমান ছিল। তারা কঠিন লড়াইয়ের মুহূর্তে সর্বদা ইসলামের মোকাবিলায় কুফরি শক্তির...

[১] আল-উকুদুদ দুররিয়্যাহ ফি মানাকিব ইবনে তাইমিয়া, পৃ. ১৯৩, ত. দারুল কতিব আল-আরাবি।

[২] মুখতারুল আখবার লি-বাইবার্স আল-মানসুরি, পৃ. ১২৮, ত. আল-ইদারাতুল মিসরিয়্যাহ আল-লুবনানিয়্যাহ।

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৭০৩ হি.

সাথ দিয়েছিল এবং নাজুক মওকাগুলোতে সব সময় মুসলমানদের পিঠে খঞ্জর মেরেছিল। তারা তাতারীদের দাওয়াত দিয়েছিল এবং তাদের ইসলামী শহরগুলোতে আক্রমণের জন্য উস্কানি দিয়েছিল। তারা সাইপ্রাসের নাসারাদের মিত্র ছিল যারা প্রায়ই সিরিয়া উপকূলে আক্রমণ করত।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর হৃদয়ে এই পরিস্থিতির কারণে অত্যন্ত ক্ষোভ ছিল, তাই তাতারীদের ফিরে যাওয়ার পর তিনি মিশরের সুলতান আল-মালিক আল-নাসির কালাউনকে একটি পত্র লিখে এই আশ্বিনের সাপদের অবিলম্বে দমন করার জন্য জোর দেন। তিনি তার পত্রে তাদের কু-আকিদা বর্ণনা করার পর তাদের বাড়াবাড়ির কথা উল্লেখ করে লিখেন:

“যখন তাতারীরা সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হলো, তখন এই কুখ্যাত লোকেরা ইসলামী বাহিনীর ওপর অনেক জুলুম-অত্যাচার করল। এরাই সাইপ্রাসের খ্রিস্টানদের কাছে বার্তা পাঠিয়ে তাদের সিরিয়া উপকূলের একটি অংশ দখল করতে এবং সেখানে ত্রুশ উত্তোলন করতে উৎসাহিত করেছিল। তারা মুসলমানদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া ঘোড়া, অস্ত্রশস্ত্র এবং এত বিপুল সংখ্যক যুদ্ধবন্দী সাইপ্রাসবাসীদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিল যে তার পরিমাণ কেবল আল্লাহই জানেন। বিশ দিন পর্যন্ত সেখানে গোলামদের বাজার বসানো হয়েছিল যেখানে মুসলিম বন্দী, ঘোড়া এবং অস্ত্রশস্ত্র সাইপ্রাসবাসীদের কাছে বিক্রি করা হচ্ছিল। তাতারীদের আগমনে তারা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিল এবং যখন তাতারীদের মোকাবিলায় মিশরের ইসলামী বাহিনী রওনা হলো, তখন তাদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। যখন আল্লাহ তাআলা সুলতানের আগমনে মুসলমানদের সুস্পষ্ট বিজয় দান করলেন, তখন তাদের ঘরে শোকের মাতম শুরু হলো। এর চেয়েও বড় কথা হলো, তারাই চেন্সিস খানকে ইসলামী দেশগুলোতে আক্রমণের দাওয়াত দিয়েছিল। [১] হালাকু খান কর্তৃক বাগদাদ দখল এবং আলেপ্পো ও সালিহিয়ার ধ্বংসের কারণও এরাই ছিল। এ ছাড়া তাদের ইসলাম বিদ্বেষ ও মুসলিম হত্যার আরও অনেক ঘটনা রয়েছে। তাদের প্রতিবেশী মুসলমানরা চরম বিপদের শিকার। প্রতি রাতে তাদের দলগুলো পাহাড় থেকে নেমে আসে এবং এমন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে যা কেবল আল্লাহই জানেন। তারা ডাকাতি করে, শরীফদের কষ্ট দেয় এবং অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়। সাইপ্রাসের খ্রিস্টানরা যখন তাদের এলাকায় আসত, তখন তারা মুসলমানদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে তাদের মেহমানদারি করত। যে কোনো নেককার মুসলমান তাদের হাতে পড়ত, তারা তাকে হত্যা করত অথবা তার সবকিছু লুট করে নিত। খুব কম লোকই তাদের হাত থেকে রক্ষা পেত।” [২]

রওয়াফেজদের দমনের জন্য সৈন্য অভিযান:

আল-মালিক আল-নাসির ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর অনুরোধে পার্বত্য রওয়াফেজদের বিরুদ্ধে সৈন্য অভিযানের অনুমতি দেন। ২ মহররম ৭০৫ হিজরিতে প্রথমে ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) দামেস্কের একদল স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে এই অভিযানে বের হন। তিনি কিছু স্থানে রওয়াফেজ আলেমদের সাথে মুনাজারাও করেন এবং তাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে তাদের কু-আকিদা প্রমাণ করে দেন। যারা তওবা করল তারা রক্ষা পেল। যারা বিদ্রোহে অটল ছিল, তাদের দমনের জন্য দামেস্ক থেকে তুর্কি অফিসারদের বাহিনী পৌঁছে গেল এবং এই পুরো এলাকা ফিতনাবাজ লোকদের থেকে পবিত্র করা হলো। [৩]

[১] চেন্সিস খানকে আহ্বানকারী আন-নাসির এবং তার উজির মুয়াইয়্যাদ আল-দিন উভয়ই শিয়া ছিল। সম্ভবত মুয়াইয়্যাদ আল-দিন এই ষড়যন্ত্রে পুরোপুরি তার প্রভুর অংশীদার ছিল।

[২] আল-উকুদ আদ-দুররিয়া ফি মানাকিব ইবনে তাইমিয়া, পৃ. ২০১, ত. দারুল কাতিব আল-আরাবি।

[৩] আল-উকুদ আদ-দুররিয়া ফি মানাকিব ইবনে তাইমিয়া, পৃ. ২০২।

আল-মালিক আন-নাসিরের পদত্যাগ:

তরুণ বাদশাহ আল-মালিক আন-নাসির কালাউন তাতারীদের বিরুদ্ধে বিজয় এবং প্রজাদের সাথে সদ্ব্যবহারের কারণে অত্যন্ত জনপ্রিয় শাসক ছিলেন। কিন্তু সালতানাতে কিছু শীর্ষস্থানীয় আমীর তাঁর এই জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েন। তাদের মধ্যে সালতানাতে নায়েব বাইবার্স জাশনগির ছিলেন অগ্রগণ্য। তাঁর প্রাসাদের ষড়যন্ত্র আল-মালিক আন-নাসিরকে রাজনীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তোলে।

৭০৮ হিজরীর রমজান মাসে তিনি হজের উদ্দেশ্যে রওনা হলে সিরিয়ার কারাক দুর্গে অবস্থান করেন এবং তাঁর পরিবার-পরিজনকেও সেখানে ডেকে নেন। কিছুদিন পর্যন্ত তিনি সেখান থেকেই সরকারি সিদ্ধান্ত জারি করতে থাকেন, কিন্তু শীঘ্রই তিনি অনুভব করেন যে তাঁর শাসন ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ানো উচিত। অবশেষে তিনি কারাক দুর্গের সীমিত শাসনভার গ্রহণ করার এবং রাজসিংহাসন ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

আল-মালিক আন-নাসিরের এই দ্বিতীয় শাসনকাল ৬ জুমাদাল উলা ৬৯৮ হিজরী থেকে ২৩ শাওয়াল ৭০৮ হিজরী পর্যন্ত ছিল, অর্থাৎ প্রায় সাড়ে দশ বছর। [১]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৭০৭ হিজরী, ৭০৮ হিজরী।

রুকন উদ্দিন বাইবার্স জাশনগীরের শাসনকাল

শাওয়াল ৭০৮ হিজরি থেকে রমজান ৭০৯ হিজরি (এপ্রিল ১৩০৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে মার্চ ১৩১০ খ্রিষ্টাব্দ)

আল-মালিকুন নাসিরের স্বেচ্ছায় পদত্যাগের পর ১৩ শাওয়াল ৭০৮ হিজরিতে তার নায়েব বাইবার্স জাশনগীর ক্ষমতার দখল নেন। জাশনগীর তার নায়েব থাকাকালীন সময়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং প্রভাবশালী আমির হিসেবে গণ্য হতেন, কিন্তু নিজে ক্ষমতা গ্রহণ করে তিনি তার মর্যাদা হারিয়ে ফেলেন। মিসর বা শামের অভিজাত শ্রেণি, উলামায়ে কেরাম এবং সাধারণ নাগরিকরা আল-মালিকুন নাসিরের স্থলে তার সিংহাসনে আরোহণ পছন্দ করেননি। মানুষ তার বিরুদ্ধে সাহসী হয়ে ওঠে, আমির ও জেনারেলরা বিদ্রোহী হয়ে যায়, পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য তার কোনো প্রচেষ্টাই কার্যকর হয়নি এবং চারদিকে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়তে থাকে। মোদাকথা, তার শাসনকাল কোনো দিক থেকেই ঈর্ষণীয় ছিল না। [১]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর নজরবন্দি, জাশনগীরের পতন:

জাশনগীর আরও জুলুম এই করলেন যে, হিংসুকদের কথায় প্রভাবিত হয়ে ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-কে শহর থেকে বহিষ্কার করে আলেকজান্দ্রিয়ায় নজরবন্দি করে রাখেন। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) তখনই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, জাশনগীরের শাসনের খুব শীঘ্রই পতন ঘটবে। বাস্তবেও তাই হলো।

জাশনগীরের শাসনের এক বছরও পার হয়নি যে, সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আল-মালিকুন নাসিরের দিনগুলোর কথা স্মরণ করতে শুরু করেন। কায়রো থেকে প্রায় একশ আমির ও জেনারেল জাশনগীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আল-মালিকুন নাসিরের কাছে কারাক-এ পৌঁছান এবং তাকে পুনরায় রাজনীতির ময়দানে নামতে রাজি করান। আল-মালিকুন নাসির দেশের শোচনীয় অবস্থা দেখে পুনরায় ক্ষমতার লাগাম ধরার সিদ্ধান্ত নেন। ৭ শাবান ৭০৯ হিজরিতে তিনি যখন দামেস্কে পৌঁছান, তখন তার গুণমুগ্ধ সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাকে স্বাগত জানাতে দলে দলে বেরিয়ে আসেন। এরপর আল-মালিকুন নাসির মিসরের দিকে যাত্রা করেন। সালতানাতের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, সর্দার এবং উলামা ও ফুকাহাদের এক বিশাল জামাত তার সাথে ছিল। জাশনগীর রক্তপাত পছন্দ করতেন না। তিনি পরিস্থিতির গতিপ্রকৃতি দেখে ১৬ রমজান নিজেই পদত্যাগ করেন এবং পালিয়ে যান। আল-মালিকুন নাসির কায়রো পৌঁছালে মিসরের জনগণ তাদের প্রিয় শাসককে ঐতিহাসিক সংবর্ধনা প্রদান করে। [২]

[১] আল-মাওয়াযিজ ওয়াল ইতিবার বি জিকরিল খুতাবি ওয়াল আসার লিল মাকরিজি: ৩/ ২৮৭, ত ত আল-ইলমিয়াহ

[২] দুওয়ালুল ইসলাম মাআয যাইল লিয যাহাবি: ২/ ২৩১, ত ত দার সাদির; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া বছর: ৭০৯ হিজরি; আল-আলাম লিয যিরিকলি: ২/ ৭৯

আল-মালিক আন-নাসির বিন কালাউন তৃতীয় শাসনামল

শাওয়াল ৭০৯ হিজরি থেকে জিলহজ ৭৪১ হিজরি (মার্চ ১৩১০ খ্রিস্টাব্দ থেকে জুন ১৩৪১ খ্রিস্টাব্দ)

১লা শাওয়াল ৭০৯ হিজরিতে আল-মালিক আন-নাসির বিন কালাউন এগারো মাসের নির্জনবাসের পর পুনরায় শাসনের লাগাম হাতে নেন। সিংহাসনে আরোহণের পরের দিনই তিনি আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর মুক্তির আদেশ জারি করেন এবং যখন তিনি আলেকজান্দ্রিয়ার দুর্গ থেকে কায়রো পৌঁছান, তখন তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়।

[১] আল-মালিক আন-নাসির তখন ২৫ বছর বয়সী ছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা এখন আগের চেয়ে বেশি ছিল, তাই এই তৃতীয় শাসনামলে তাঁর ব্যক্তিত্বে অসাধারণ দৃঢ়তা দেখা যায়। তিনি তাঁর বিরোধী আমিরদের খুব দ্রুত দমন করেন। বিবারস জাশনগিরকে থেপ্তার করে সুলতানের সামনে পেশ করা হয়। আল-মালিক আন-নাসির তাকে তার পূর্ববর্তী কর্মকাণ্ডের কথা মনে করিয়ে দিয়ে লজ্জিত করেন এবং তারপর তাকে হত্যা করান। [২]

আল-মালিক আন-নাসিরের এই তৃতীয় শাসনামল শাওয়াল ৭০৯ হিজরি থেকে জিলহজ ৭৪১ হিজরি পর্যন্ত ৩২ বছর ২ মাস ব্যাপী ছিল। এই সময়ে পরিস্থিতি সামগ্রিকভাবে শান্তিপূর্ণ ছিল। এটি ছিল অষ্টম হিজরি শতাব্দীর শুরু এবং মুসলিম বিশ্ব দুই শতাব্দীর যুদ্ধবিগ্রহের পরিবেশ থেকে বেরিয়ে এসে এখন একটি নিরাপদ ও স্থিতিশীল যুগে প্রবেশ করছিল। ক্রুসেড যুদ্ধ এবং তাতার আক্রমণের ধ্বংসলীলার পর এটি ছিল মুসলমানদের দ্বিতীয় রেনেসাঁ বা পুনর্জাগরণের সময়।

জিহাদি অভিযান

আল-মালিক আন-নাসির বিন কালাউনের সময়কাল ছিল শান্তি ও নিরাপত্তার, তবে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী মাঝে মাঝে কাফেরদের সীমান্তে অভিযান পাঠানো হতো। ৭১৫ হিজরিতে একটি বড় অভিযান এশিয়া মাইনরের রোমান অঞ্চলে পাঠানো হয় এবং মালাতিয়া জয় করে দরবান্দ অঞ্চলে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে ফিরে আসে। [৩] একইভাবে ৭৩৫ হিজরিতে ‘সিস’ (আর্মেনিয়া)-এর খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী পাঠানো হয়। [৪]

খ্রিস্টানদের নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড

খ্রিস্টানরা ক্রুসেড যুদ্ধে পরাজিত ও ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েছিল, তবে তাদের গুপ্তচররা ইসলামি শহরগুলোতে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছিল।

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, সন: ৭০৯ হিজরি।

[২] আস-সুলুক লি-মা’রিফাত দুওয়ালিল মুলুক লিল-মাকরিজি: ২/৪৪৭ থেকে ৪৪৯, ত. আল-ইলমিয়াহ।

[৩] দুওয়ালুল ইসলাম মা’আদ দাইল লিজ-জাহাবি: সন ৭১৫ হিজরি।

[৪] দুওয়ালুল ইসলাম মা’আদ দাইল লিজ-জাহাবি: সন ৭৩৫ হিজরি, ত. দার সাদির।

ছিলেন। কায়রোতে তারা বেশ কয়েকবার অগ্নিসংযোগ করেছিল, প্রথমে এগুলোকে দুর্ঘটনা মনে করা হয়েছিল কিন্তু শীঘ্রই তদন্তে জানা গেল যে এটি খ্রিস্টানদের কারসাজি। অপরাধীদের ধরা হলে তাদের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে দাহ্য পদার্থ উদ্ধার করা হয় এবং ফলস্বরূপ তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। [১]

৭৩৫ হিজরিতে হামার বাজারে অগ্নিকাণ্ডে আড়াইশ দোকান পুড়ে যায়। একই বছর আন্তাকিয়াতেও এমন ঘটনা ঘটে যার কোনো অপরাধীর হদিস পাওয়া যায়নি। পাঁচ বছর পর দামেস্ক ও কায়সারিয়াতেও অগ্নিকাণ্ড ঘটে। দামেস্কের জামে মসজিদের পূর্ব মিনার ভস্মীভূত হয়ে যায়। গোয়েন্দা বিভাগ অপরাধীদের শনাক্ত করে। এটি খ্রিস্টানদের একটি দল ছিল। মূল অপরাধীদের ফাঁসি দেওয়া হয় এবং বাকি সহযোগীদের ওপর দশ লক্ষ দিরহাম জরিমানা ধার্য করা হয় যাতে ক্ষতির পূরণ করা যায়। [২]

জামে উমাবীর সাদা পূর্ব মিনার:

সুলতান আল-মালিক আল-নাসির এই অর্থ দিয়ে জামে উমাবীর পূর্ব কোণে একটি নতুন সাদা মিনার নির্মাণ করান। ইসলামের পূর্ববর্তী ইতিহাসে এত উঁচু ও সুন্দর মিনার আর ছিল না। বলা হয় যে এটিই সেই মিনার যার ওপর হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম অবতরণ করবেন, যেমনটি হাদিসে এসেছে:

“افينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق”

(তিনি দামেস্কের পূর্ব দিকের সাদা মিনারে অবতরণ করবেন।) [৩]

হাফিজ ইবনে কাসীর রহমাতুল্লাহি আলাইহি এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন:

“এটি সেই মিনার যা আমাদের যুগে খ্রিস্টানদের অর্থ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে কারণ তারা এটি পুড়িয়েছিল, তাই তাদের অর্থ দিয়েই এটি পুনরায় তৈরি করা হয়েছে। সুতরাং তাদের ধ্বংসের জন্য এর ওপরই হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম অবতরণ করবেন।” [৪]

امام ابن تيميه رحمه الله کی گرفتاری اور وفات

মধ্যবর্তী কিছু বছরে আল-মালিক আল-নাসিরের মেজাজে কিছুটা পরিবর্তন আসে। ৭২৬ হিজরিতে হিংসুকদের প্ররোচনায় প্রভাবিত হয়ে তিনি ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে কায়রোর দুর্গে বন্দি করেন যেখানে তিনি জিলকদ ৭২৮ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। [৫]

الملك الناصر کی وفات:

কিছু দিন পর ২৮ জিলহজ ৭৪১ হিজরিতে আল-মালিক আল-নাসির মুহাম্মদও ইন্তেকাল করেন। তার বয়স ছিল ৬০ বছর।

হাফিজ জাহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এ সম্পর্কে বলেন:

[১] দুওয়ালুল ইসলাম মাআয যাইল লিয যাহাবী: সন ৭২১ হিজরি, তাবা দার সাদির

[২] দুওয়ালুল ইসলাম মাআয যাইল লিয যাহাবী: সন ৭৩৫ হিজরি, ৭৪০ হিজরি, ৭৪১ হিজরি

[৩] সহীহ মুসলিম, পৃষ্ঠা ২৯৩, বাব যিকরুদ দাজ্জাল

[৪] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১২/৫৯১, সন ৯৬ হিজরি, তাবা দার হিজর

[৫] দুওয়ালুল ইসলাম মাআয যাইল লিয যাহাবী: সন ৭২৬ হিজরি, ৭২৮ হিজরি

“মুসলমানদের জন্য তাঁর মৃত্যু ছিল এক বড় শোকের বিষয়, কারণ তারা তাঁর মধ্যে সব ধরনের কল্যাণ দেখেছিল। কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত নাযিল করুন এবং বিনিময়ে তাঁকে জান্নাত দান করুন।” [১]

আল-মালিক আন-নাসিরের শাসনামলের ওপর একটি পর্যালোচনা:

“যদিও এই যুগ প্রাসাদ ষড়যন্ত্র, বিরোধীদের সাথে সংঘাত, তিক্ত রাজনৈতিক বিবাদ এবং বিরোধীদের বিরুদ্ধে দমনমূলক কর্মকাণ্ড থেকে একেবারেই মুক্ত ছিল না। তবুও সামগ্রিকভাবে এই যুগটি ছিল ঈর্ষণীয়। ইসলামী নিদর্শনসমূহের পুনর্জাগরণ এবং শরীয়তের শ্রেষ্ঠত্ব দেখে মুসলমানদের চোখ জুড়িয়ে যেত। মদ্যপান এবং অন্যান্য অশ্লীলতা ও গর্হিত কাজের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি ছিল। আল-মালিক আন-নাসির খাদ্যশস্য ও অন্যান্য পণ্যের ওপর থেকে পূর্ববর্তী অনেক কর বিলুপ্ত করে জনগণকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। শহরগুলোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখা হতো। বেওয়ারিশ কুকুরগুলোকে মেরে গর্তে পুঁতে ফেলা হতো।” [২]

উন্নয়নমূলক কাজ:

“আল-মালিক আন-নাসির নির্মাণ ও উন্নয়নমূলক কাজের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। দামেস্কের জামে উমায়্যির পূর্ব মিনারটি তাঁর এক চিরস্মরণীয় কীর্তি।” [৩] “তিনি মাদ্রাসা ও খানকাহ নির্মাণের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। ৭০৩ হিজরিতে তিনি মাদ্রাসা-ই-নাসিরিয়া নির্মাণ করেন, যেখানে চার ইমামের ফিকহ শিক্ষা দেওয়া হতো। এই মাদ্রাসার ভিত্তি আদিল কিতবুগা স্থাপন করেছিলেন, তবে এর সমাপ্তি আল-মালিক আন-নাসিরের শাসনামলে হয়েছিল।” [৪] “৭২৫ হিজরিতে তিনি মিশরে সিরিয়াকুসের বিখ্যাত খানকাহ নির্মাণ করেন, যেখানকার শায়খকে ‘শায়খুশ শুযুখ’ বলা হতো। একটি বড় খাল খনন করা হয়েছিল যা মাত্র দুই মাসে সম্পন্ন হয় এবং এটি ‘খালিজে নাসিরি’ নামে পরিচিতি লাভ করে।” [৫]

“আল-মালিক আন-নাসিরের পর অনেক সুলতান এসেছিলেন, কিন্তু সেই পরবর্তী শাসকদের গত শতাব্দীর মতো ভয়াবহ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়নি, আর না তারা কোনো ইতিহাস সৃষ্টিকারী ভূমিকা রেখেছিলেন। তারা কেবল গতানুগতিক ধারার ধারাবাহিকতা ছিলেন; অন্যান্য শাসক রাজবংশের মতো তাদের মধ্যেও ভালো, মন্দ এবং মিশ্র চরিত্রের লোক পাওয়া যায়।”

[১] দুওয়ালুল ইসলাম মাআয যাইল লিয যাহাবি: ৭৪১ হিজরি

[২] দুওয়ালুল ইসলাম মাআয যাইল লিয যাহাবি: বছর ৭২০ হিজরি, ৭২৪ হিজরি, ৭২৯ হিজরি

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১২ / ৫৯১

[৪] হসনুল মুহাদারা ফি তারিখি মিসর ওয়াল কাহিরা লিস সুযুতি: ২ / ২৬৫, ত ত দারু ইহয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ মিসর

[৫] হসনুল মুহাদারা ফি তারিখি মিসর ওয়াল কাহিরা লিস সুযুতি: ২ / ২৬০, ত ত দারু ইহয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ মিসর

বাহরি মামলুকদের পতন

মামলুক সুলতানদের যুগ অত্যন্ত দীর্ঘ এবং এই সিলসিলার বাদশাহ ও শাসকগণ সংখ্যায় অনেক। তবে ইতিহাস সৃষ্টিকারী ভূমিকা তারাই পালন করেছেন যাদের কথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। আল-মালিকুন নাসির মুহাম্মাদের সময়কাল ছিল মামলুকদের উত্থানের যুগ। যেহেতু “প্রত্যেক পূর্ণতারই পতন আছে” এই নীতি প্রতিটি যুগে এবং প্রতিটি জিনিসের ক্ষেত্রে সত্য প্রমাণিত হয়, তাই পরবর্তী দশকগুলোতে মামলুকদের সূর্যও অস্তমিত হতে শুরু করে। এই পতনের একটি বড় কারণ ছিল বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের নীতির পুনরাবৃত্তি। তাদের আগে মামলুকদের প্রতিটি শাসক যোগ্যতা ও শক্তির ভিত্তিতে ক্ষমতায় আসতেন। কিন্তু আল-মালিকুন নাসিরের পর বংশানুক্রমিকতা শিকড় গেড়ে বসে।

নাসিরের পুত্রদের যুগ

নাসিরের মৃত্যুর সাথে সাথেই মামলুক সালতানাতে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। অর্থাৎ পূর্ববর্তী শাসকের পুত্র ও পৌত্রদের শাসনের। আল-মালিকুন নাসিরের পর তার আটজন পুত্র ৭৪২ হিজরি থেকে ৭৬২ হিজরি (১৩৪০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩৬১ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত প্রায় ২১ বছর একে একে শাসন করেন। তারা সবাই ছিলেন অল্পবয়সী এবং অনভিজ্ঞ। আমিররা তাদেরকে হাতের পুতুলে পরিণত করেছিলেন। দরবারীদের ষড়যন্ত্রের কারণে তাদের কারোর শাসনই স্থায়িত্ব লাভ করতে পারেনি।

তাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

১. আল-মালিকুল মানসুর আবু বকর: (জিলহজ ৭৪১ হিজরি থেকে সফর ৭৪২ হিজরি - ৫৯ দিন)

সিংহাসনে আরোহণের দুই মাস পার হতেই আমিররা তার বিরুদ্ধে জঘন্য অভিযোগ এনে বিদ্রোহ করে, যার ফলে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন। তাকে তার বেশ কয়েকজন ভাইসহ “কুস” নামক স্থানে বন্দি করা হয়। তার এক ভাই আল-মালিকুল আশরাফকে সিংহাসনে বসানো হয়। [১]

২. আল-মালিকুল আশরাফ আলাউদ্দিন কুচুক: (সফর ৭৪২ হিজরি থেকে শাবান ৭৪২ হিজরি)

সিংহাসনে আরোহণের সময় তার বয়স ছিল পাঁচ বা সাত বছর। তিনি ছিলেন কেবল একজন নামমাত্র শাসক। শাসন চলত আমির কুসুনের নির্দেশে। তিনি জবাবদিহিতার নামে বিরোধী আমিরদের কোণঠাসা করে রেখেছিলেন। পাঁচ মাস পর আমির কুসুনের বিরোধী আমিররা বিদ্রোহ করে এই নামমাত্র শাসককে ক্ষমতাচ্যুত করে। [২]

[১] আন-নুজুমুজ জাহেরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহেরা: বছর ৭৪১ হিজরি, ৭৪২ হিজরি।

[২] আন-নুজুমুজ জাহেরা: বছর ৭৪২ হিজরি; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: বছর ৭৪২ হিজরি।

৩. আল-মালিকুন নাসির আহমদ: (শাবান ৭৪২ হিজরি থেকে মহররম ৭৪৩ হিজরি)

কুচকের পরিবর্তে তার ভাই আহমদকে সিংহাসনে বসানো হয়েছিল। লম্বা দাড়ি, লম্বা জুলফি, ভারী দেহ এবং অসাধারণ শারীরিক শক্তির অধিকারী এই যুবকটিও একজন ব্যর্থ শাসক প্রমাণিত হন। উমারাদের (আমিরদের) গ্রেপ্তার করা মামুলি ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অবশেষে উমরাগণ একমত হয়ে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। [১]

৪. আল-মালিকুস সালিহ ইসমাইল: (মহররম ৭৪৩ হিজরি - রবিউস সানি ৭৪৬ হিজরি)

আল-মালিকুস সালিহ একজন নেককার ও সৎ যুবক ছিলেন। তিনি সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোজা রাখতেন। উমরাগণ তাকে এই ভেবে শাসনের সুযোগ দিয়েছিলেন যে, তিনি কোমল হৃদয়ের অধিকারী, তাই তাদের পূর্বের মতো কঠোরতার সম্মুখীন হতে হবে না। অধিকতর সতর্কতার জন্য তার সিংহাসন আরোহণের সময় এই প্রতিশ্রুতিও নেওয়া হয়েছিল যে, তিনি কাউকে কষ্ট দেবেন না এবং অপরাধ ছাড়া উমারাদের ধরপাকড় থেকে বিরত থাকবেন। আল-মালিকুস সালিহের যুগ শান্তিপূর্ণ ছিল কিন্তু ক্ষমতা উমারাদের হাতেই ছিল। তিনি তিন বছর তিন মাস সিংহাসনে আসীন ছিলেন। রবিউস সানি ৭৪৬ হিজরিতে তিনি কঠিন অসুস্থতার পর ইন্তেকাল করেন। [২]

৫. আল-মালিকুল কামিল শাবান: (রবিউস সানি ৭৪৬ হিজরি - জমাদিউল আখিরা ৭৪৭ হিজরি)

তিনি ছিলেন একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব যিনি শাসনের কাজ নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন, যার ফলে বিরোধী উমারাদের দমন করেছিলেন, কিন্তু একই সাথে তিনি জুলুম ও অত্যাচারের অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি মদ্যপান ও গান-বাজনার অত্যন্ত শৌখিন ছিলেন। নারীদের খুব বেশি তোষামোদ করতেন। এই চরিত্রের কারণে সরকারি শাসন ব্যবস্থা স্থবির হয়ে পড়ে এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে রাজ্য ধ্বংসের দিকে ধাবিত হতে থাকে। অবশেষে ১লা জমাদিউল আখিরা ৭৪৭ হিজরিতে উমরাগণ বিদ্রোহ করেন। শাবান তাদের মোকাবিলা করতে না পেরে পালিয়ে আত্মগোপন করেন। তবে উমরাগণ তাকে খুঁজে বের করে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। ৩ জমাদিউল আখিরা তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। তার শাসনকাল ছিল এক বছর ৫৮ দিন। [৩]

৬. আল-মালিকুল মুজাফফর আমির হাজ্জ: (জমাদিউল আখিরা ৭৪৭ হিজরি থেকে রমজান ৭৪৮ হিজরি)

সিংহাসন আরোহণের সময় আমির হাজ্জের বয়স ছিল ১৫ বছর। তিনি এক বছর তিন মাস শাসন করেন। তিনি কবুতর উড়ানোর অত্যন্ত শৌখিন ছিলেন, যা উমারাদের চিন্তিত করে তুলেছিল। অবশেষে একদিন একজন আমির তাকে তিরস্কার করেন এবং তার অনুপস্থিতিতে তার দুটি কবুতর মেরে ফেলেন। এতে এই যুবক বাদশাহ সেই আমিরকে হত্যার নির্দেশ দেন। ওই আমিরের সমর্থক উমরাগণ এটি সহ্য করতে পারেননি এবং রাজপ্রাসাদের ভেতরে হাঙ্গামা শুরু হয়ে যায়। বাদশাহর সমর্থক ও বিরোধীদের মধ্যে লড়াই হয় যাতে বাদশাহ গ্রেপ্তার হন। বিরোধী উমরাগণ তাকে হত্যা করেন। [৪]

[১] আন-নুজুমুজ জাহিরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহিরা, লি-জামালিদ্দিন ইউসুফ ইবনে তাগরি বারদি: বছর ৭৪২ হিজরি, ৭৪৩ হিজরি, তাবা (প্রকাশনা) দারুল কুতুব মিসর।

[২] আন-নুজুমুজ জাহিরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহিরা: বছর ৭৪৩ হিজরি, ৭৪৬ হিজরি; আল-মাওয়াযিজ ওয়াল ইতিবার লিল-মাকরিজি: ৩/৩১৮।

[৩] আন-নুজুমুজ জাহিরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহিরা: বছর ৭৪৬ হিজরি, ৭৪৭ হিজরি; আল-মাওয়াযিজ ওয়াল ইতিবার লিল-মাকরিজি: ৩/৩১৮।

[৪] শাজারাতুজ জাহাব ফি আখবারি মান জাহাব: ৮/ পৃষ্ঠা ২৬৩, তাবা (প্রকাশনা) দারুল কুতুব মিসর; আল-মাওয়াযিজ ওয়াল ইতিবার লিল-মাকরিজি: ৩/৩১৯।

আল-মালিকুন নাসির হাসান, প্রথমবার: (রমজান ৭৪৮ হিজরি হতে জমাদিউল আখিরা ৭৫২ হিজরি)

তাকে এগারো বছর বয়সে সিংহাসনে বসানো হয়েছিল। তিনি তিন বছর নয় মাস নামমাত্র শাসন করেন। অবশেষে আমিরদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে এই বিষয়ে ঐক্যমত হয় যে, তার ভাই সালিহকে শাসনভার দেওয়া হোক। [১]

আল-মালিকুস সালিহ সালিহ: (জমাদিউল আখিরা ৭৫২ হিজরি হতে শাওয়াল ৭৫৫ হিজরি)

তিনি চৌদ্দ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিন বছর চার মাস পর আমিররা তার প্রতিও বিরক্ত হয়ে ওঠেন। ফলে তাকে পদচ্যুত ও গৃহবন্দী করা হয়। তার পরিবর্তে তার ভাই হাসানকে পুনরায় সিংহাসনে বসার সুযোগ দেওয়া হয়। [২]

আল-মালিকুন নাসির হাসান - দ্বিতীয়বার: (শাওয়াল ৭৫৫ হিজরি হতে জমাদিউল আউয়াল ৭৬২ হিজরি)

হাসান যখন দ্বিতীয়বার সিংহাসনে বসেন তখন তিনি যুবক হয়ে গিয়েছিলেন। তবে তার এই শাসনকালও নামমাত্র ছিল। তিনি ছয় বছর সাত মাস শাসন করেন। অবশেষে আমিররা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাকে হত্যা করে এবং তার নিজের বাড়িতেই তাকে দাফন করে। [৩]

হাসান তার অন্য ভাইদের তুলনায় উত্তম শাসক প্রমাণিত হয়েছিলেন। তিনি একটি বিশাল মাদ্রাসা নির্মাণ করেছিলেন যা ‘মাদ্রাসা সুলতান হাসান’ নামে পরিচিত ছিল। আল্লামা মাকরিজি বলেন যে, পুরো মুসলিম বিশ্বে এই মাদ্রাসার মতো বিশাল কোনো মাদ্রাসা ছিল না। [৪]

সারকথা হলো, মরহুম আল-মালিকুন নাসিরের আটজন পুত্র পর্যায়ক্রমে শাসনভার লাভ করেন। তাদের মধ্যে তিনজন নিহত হন, চারজন পদচ্যুত হন এবং একজন অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। [৫]

কালো মহামারি:

এই সময়ের সবচেয়ে ভয়াবহ ঘটনা ছিল প্লেগ বা মহামারির সেই দুর্যোগ যা ৭৪৯ হিজরিতে ফিলিস্তিনের গাজা শহর থেকে শুরু হয়েছিল এবং খুব দ্রুত অনেক দেশকে গ্রাস করে নিয়েছিল। লাখ লাখ মানুষ এর শিকার হয় এবং মুসলিম বিশ্বের জনবহুল এলাকাগুলোতে জানাজা দেওয়ার মতো লোকও কম পড়ে গিয়েছিল। একে ‘আল-ওয়াবাউল আসওয়াদ’ (কালো মহামারি) নাম দেওয়া হয়েছিল।

আল্লামা মাকরিজির বর্ণনা অনুযায়ী, এই মহামারি পূর্ব ও পশ্চিমকে গ্রাস করে নিয়েছিল। শুধু মানুষই নয়, বরং পশু-পাখি, বন্যপ্রাণী এমনকি মাছও এর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ধ্বংস হয়েছিল। সর্বপ্রথম এটি উত্তরে কিপচাক ভূখণ্ডে প্রকাশ পায় এবং মঙ্গোলদের সাম্রাজ্যে হাহাকার সৃষ্টি করে। মঙ্গোলদের ঘোড়াগুলো এর শিকার হয়, যাদের হাড়ের স্তুপ সব জায়গায় দেখা যেত। এরপর এর প্রভাব কনস্টান্টিনোপল, সিরিয়া এবং মিশরে পৌঁছে। প্লেগের প্রভাব এভাবে প্রকাশ পেত যে মানুষের কুঁচকি ও বগলে ছোট ছোট দানা বের হতো, কিছুক্ষণ পর সে রক্ত বমি করতে শুরু করত এবং দেখতে দেখতেই মারা যেত। [৬]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: বছর ৭৫২ হিজরি, আল-মাওয়াইজ ওয়াল ইতিবার লিল মাকরিজি: ৩/৪১৯

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: বছর ৭৫৩ হিজরি, আল-মাওয়াইজ ওয়াল ইতিবার লিল মাকরিজি: ৩/৪১৯

[৩] শাজারাতুজ জাহাব ফি আখবারি মান জাহাব: ৮/৩২৬

[৪] আস-সুলুক ফি মারিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ৪/২৫২, ২৫৩, তাবা ইলমিয়্যাহ

[৫] আস-সুলুক লি মারিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: বছর ৭৪১ হিজরি হতে ৭৬২ হিজরি, আন-নুজুমুজ জাহিরাহ: বছর ৭৪১ হিজরি হতে ৭৬২ হিজরি

[৬] আস-সুলুক লি মারিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: বছর ৭৪৯ হিজরি

অবশেষে আল্লাহর দরবারে দোয়ার মাধ্যমে এই বিপদ দূর হলো। বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা এই মহামারীর সময় সিরিয়ায় ছিলেন। তিনি লিখেন: “রবিউল আউয়াল ৭৪৯ হিজরির শুরুতে খবর এলো যে গাজায় প্লেগ মহামারী ছড়িয়ে পড়েছে এবং প্রতিদিন এক হাজারেরও বেশি মানুষ মারা যাচ্ছে। এই খবর শুনে আমি হিমসে চলে গেলাম, কিন্তু সেখানেও মহামারী ছড়িয়ে পড়েছিল। যেদিন আমি সেখানে পৌঁছলাম, সেদিন প্রায় তিনশ মানুষ মারা গিয়েছিল। আমি হিমসে না থেমে বরং দামেস্কে চলে গেলাম। সেখানে মানুষ তিন দিন রোজা রেখেছিল। জুমার দিন সবাই মসজিদে একত্রিত হয়ে দোয়া করল। আল্লাহ তাআলা মহামারী কমিয়ে দিলেন। আমি দামেস্ক থেকে আজলুন এবং তারপর বাইতুল মুকাদাসে পৌঁছলাম—সেখানেও মহামারী শেষ হয়ে গিয়েছিল।” [১]

আল-মালিকুন নাসির বিন কালাউনের পৌত্র ও প্রপৌত্রদের যুগ

সুলতান হাসানের পর আল-মালিকুন নাসির বিন কালাউনের পুত্রদের যুগ শেষ হয়ে পৌত্র ও প্রপৌত্রদের যুগ শুরু হয়, যা ৭৬২ হিজরি থেকে ৭৮৪ হিজরি (১৩৬১ খ্রি. থেকে ১৩৮২ খ্রি.) পর্যন্ত জারি ছিল। এই ২১ বছরে চারজন শাসক অতিবাহিত হন। তারা সবাই অল্পবয়সী ও অযোগ্য ছিলেন, তাই তারা হাতের পুতুল হয়ে রইলেন। মাথার ওপর কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব না থাকায় আমীররা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত থাকতেন। [২]

এই পৌত্র ও প্রপৌত্রদের অবস্থা নিচে বর্ণনা করা হলো:

১. মনসুর সালাহউদ্দিন বিন আল-মুজাফফর আমির হাজ (৭৬২ হিজরি থেকে ৭৬৪ হিজরি):

নাসিরের পৌত্রদের মধ্যে প্রথম সুলতান ছিলেন মনসুর সালাহউদ্দিন বিন আমির হাজ, যিনি ১৪ বছর বয়সে সিংহাসনে বসেন। তিনি ছিলেন উদাসীন ও বিলাসপ্রিয়, অধিকাংশ সময় নাচ-গানের আসরে কাটাতেন এবং এমনকি সালাতও নষ্ট করে ফেলতেন। [৩]

২. আশরাফ শাবান বিন হুসাইন (৭৬৪ হিজরি থেকে ৭৭৮ হিজরি):

নাসিরের পৌত্রদের মধ্যে দ্বিতীয় সুলতান আশরাফ শাবান বিন হুসাইন ১০ বছর বয়সে বাদশাহ হন এবং ৭৬৪ হিজরি থেকে ৭৭৮ হিজরি (১৩৬৩ খ্রি. থেকে ১৩৭৬ খ্রি.) পর্যন্ত শাসন করেন। তার শাসনকাল তুলনামূলকভাবে ভালো ছিল এবং দীর্ঘ সময় স্থায়ী হয়েছিল।

তার শাসনামলের একটি দুঃখজনক ঘটনা হলো আলেকজান্দ্রিয়ার ওপর সাইপ্রাসের খ্রিস্টান শাসক পিটার লুসিগনানের আক্রমণ। শুক্রবার ১২ মহরম ৭৬৭ হিজরি (১০ অক্টোবর ১৩৬৫ খ্রি.) খ্রিস্টানরা শহরবাসীর প্রতিরোধ ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়ে এবং সাধারণ মানুষকে গাজর-মুলার মতো কেটে ফেলল। তিন দিন পর্যন্ত কেয়ামত চলতে থাকে। মসজিদ, সরকারি ভবন, জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান এবং আলিশান ইমারতগুলো ধ্বংস করে দেওয়া হয়। কায়রো থেকে সাহায্যকারী বাহিনী পৌঁছানোর আগেই পিটার পাঁচ হাজার শহরবাসীকে বন্দী করে বিপুল পরিমাণ গনিমতের মালসহ ফিরে যায়। এই আক্রমণ সফল হওয়ার কারণ ছিল শহরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল ছিল। [৪]

[১] রেহলা ইবনে বতুতা লি আবি আব্দুল্লাহ ইবনে বতুতা (মৃ. ৭৭৯ হিজরি): ৩/১৭৯, ত. একাডেমি আল-মাগরিবিয়া আর-রিবাত।

[২] আস-সুলুক লি মা'রিফতি দুওয়ালিল মুলুক: ৪/২১ থেকে ৮৩ হিজরি।

[৩] আন-নুজুমুজ জাহেরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহেরা: ১১/৭; আল-মাওয়াইজ ওয়াল ইতিবার লিল মাকরিজি: ৩/৪১৯।

[৪] আস-সুলুক লি মা'রিফতি দুওয়ালিল মুলুক: ৪/৭৬ হিজরি; আল-ইলমাম বিল আ'লাম লিল নুওয়াইরি আল-ইসকান্দারি: ১/৩২৬।

৭৭৮ হিজরিতে আশরাফ শাবান খলিফা মুতাওয়াঙ্কিল বিন মুতাদিদ-এর সাথে সফর করেন। তার অনুপস্থিতিতে বিরোধী আমিররা তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার ষড়যন্ত্র করে। শাবান এই খবর পাওয়া মাত্রই কায়রো ফিরে আসেন। খলিফাও কায়রো ফিরে আসেন। কিন্তু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল। বিদ্রোহীরা শাবানকে ক্ষমতাচ্যুত করে এবং তার পরিবর্তে খলিফাকে সুলতানি ক্ষমতা দেওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু খলিফা তা অস্বীকার করেন। শাবান নিজের জীবন বিপন্ন দেখে আত্মগোপন করেন, তবে বিদ্রোহী আমিররা তাকে খুঁজে বের করে ফাঁসি দেয়। এটি ৭৭৮ হিজরির জিলকদ মাসের ঘটনা। [১] এরপর আল-মালিক আন-নাসির বিন কালাউনের প্রপৌত্রদের যুগ শুরু হয়।

আলী বিন শাবান বিন হুসাইন: (৭৭৮ হিজরি থেকে ৭৮৩ হিজরি)

শাবানের পরিবর্তে তার পুত্র আলীকে আল-মালিক আল-মানসুর উপাধি দিয়ে সিংহাসনে বসানো হয়। তার বয়স ছিল মাত্র সাত বছর। তিনিও কেবল নামমাত্র শাসক ছিলেন। চার বছর তিন মাস প্রতীকীভাবে সিংহাসনে থাকার পর ১৩ সফর ৭৮৩ হিজরিতে তার মৃত্যু হয়। [২]

আমির হাজ জয়নুদ্দিন বিন শাবান বিন হুসাইন: (৭৮৩ হিজরি থেকে ৭৮৪ হিজরি)

আন-নাসিরের বংশের শেষ সুলতান জয়নুদ্দিন আমির হাজ ছিলেন, যিনি রবিউল আউয়াল ৭৮৩ হিজরিতে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সে সময় তার বয়স ছিল এগারো বছর। তার শাসনের দেড় বছরও পার হয়নি যে, ১৯ রমজান ৭৮৪ হিজরিতে মামলুকদের একটি শক্তিশালী গোষ্ঠী, যারা ‘চেরাকাসিয়া’ বা ‘বুরজিয়া’ নামে পরিচিত ছিল, তাদের নেতা বারকুকের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করে। [৩]

জমাদিউল আখিরা ৭৯১ হিজরিতে বারকুকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয় এবং বিরোধী আমিররা তাকে সরিয়ে আমির হাজকে পুনরায় সিংহাসনে বসায়। আমির হাজ আরও আট মাস শাসন করেন, তবে সফর ৭৯২ হিজরিতে বারকুক পুনরায় ক্ষমতা দখল করে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। এর সাথেই ‘মামালিক বাহরিয়া’ শাসনের অবসান ঘটে। [৪]

[১] সিমতুন নুজুমিল আউয়ালি ফি আনবায়িল আওয়াইল ওয়াত তাওয়ালি লিল-আসামী আল-মাক্কি: ৩/৩৫, ৩৬; তারিখুল খুলাফা লিস-সুয়ুতী, পৃ. ৩৫২, ত. নিযার।

[২] সিমতুন নুজুমিল আউয়ালি: ৩/৩৬, ত. ইলমিয়া; আল-মাওয়াইজ ওয়াল ইতিবার লিল-মাকরিজি: ৩/৪১৯, ৪২০।

[৩] আস-সুলুক লি-মা’রিফতি দুওয়ালিল মুলুক সানাহ ৭৮৩ হিজরি; আল-মাওয়াইজ ওয়াল ইতিবার লিল-মাকরিজি: ৩/৪২০।

[৪] সিমতুন নুজুমিল আউয়ালি: ৩/৩৬; আল-মাওয়াইজ ওয়াল ইতিবার লিল-মাকরিজি: ৩/৪২০।

চতুর্থ খণ্ড

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

বাহরি মামলুক এক নজরে

শাসনকাল ২৬৪ বছর

৬৪৮ হিজরি থেকে ৭৮৪ হিজরি

১২৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩৮৯ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর শাসক শাসনকাল পরিণতি বিশেষ তথ্য

১ শাজারাতুদ দুর মহররম থেকে রবিউস সানি ৬৪৮ হিজরি (এপ্রিল থেকে জুলাই ১২৫০ খ্রি.) অপসারিত সপ্তম ক্রুসেড

২ আল-মালিকুল মুইজ ইজ্জুদ্দিন তুর্কমানি ৬৪৮ হিজরি থেকে রবিউল আউয়াল ৬৫৫ হিজরি (১২৫০ খ্রি. থেকে এপ্রিল ১২৫৭ খ্রি.) নিহত মামলুক সালতানাতে প্রতিষ্ঠাতা

৩ নুরুদ্দিন আলী বিন ইজ্জুদ্দিন ৬৫৫ হিজরি থেকে ৬৫৭ হিজরি (১২৫৭ খ্রি. থেকে ১২৫৯ খ্রি.) অপসারিত অল্পবয়স্ক - নামমাত্র শাসক

৪ সাইফুদ্দিন কুতুজ ৬৫৭ হিজরি - ১২৫৮ খ্রি. নিহত আইন জানুতের যুদ্ধে তাতারদের পরাজয়

৫ বাইবার্স আউয়াল আল-মালিকুজ জাহির রুকনুদ্দিন ৬৫৮ হিজরি থেকে ৬৭৬ হিজরি (১২৫৯ খ্রি. থেকে ১২৭৭ খ্রি.) মৃত্যু ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন জিহাদ, কায়রোতে আব্বাসীয় খিলাফতের পুনর্জাগরণ

৬ আল-মালিকুস সাঈদ বারাকাহ বিন বাইবার্স ৬৭৬ হিজরি থেকে ৬৭৮ হিজরি (১২৭৭ খ্রি. থেকে ১২৭৯ খ্রি.) অপসারিত নামমাত্র শাসক

৭ সালামিশ বিন বাইবার্স রবিউস সানি থেকে রজব ৬৭৮ হিজরি (সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর ১২৭৯ খ্রি.) অপসারিত নামমাত্র শাসক

৮ সাইফুদ্দিন আল-মানসুর কালাউন ৬৭৮ হিজরি থেকে ৬৮৯ হিজরি (১২৭৯ খ্রি. থেকে ১২৯০ খ্রি.) মৃত্যু মুজাহিদ ও কুশলী শাসক - তাতারদের পরাজিত করেন

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

- ৯. আল-আশরাফ খলিল বিন কালাউন | ৬৮৯ হিজরি থেকে ৬৯৩ হিজরি (১২৯০ থেকে ১২৯৩ খ্রিস্টাব্দ) | হত্যা | ক্রুসেডারদের থেকে সিরিয়ার উপকূল সম্পূর্ণ মুক্ত করেন।
- ১০. আন-নাসির মুহাম্মদ বিন কালাউন - প্রথমবার | ৬৯৩ হিজরি থেকে ৬৯৪ হিজরি (১২৯৩ থেকে ১২৯৪ খ্রিস্টাব্দ) | পদচ্যুত | অল্পবয়সী নামমাত্র শাসক।
- ১১. আল-আদিল কিতবুগা | ৬৯৪ হিজরি থেকে ৬৯৬ হিজরি (১২৯৪ থেকে ১২৯৬ খ্রিস্টাব্দ) | পদচ্যুত | মিশরের একমাত্র তাতার শাসক।
- ১২. হুসামুদ্দীন লাজিন | ৬৯৬ হিজরি থেকে ৬৯৮ হিজরি (১২৯৬ থেকে ১২৯৮ খ্রিস্টাব্দ) | হত্যা |
- আন-নাসির মুহাম্মদ বিন কালাউন - দ্বিতীয়বার | ৬৯৮ হিজরি থেকে ৭০৮ হিজরি (১২৯৮ থেকে ১৩০৮ খ্রিস্টাব্দ) | পদত্যাগ | তাতারদের কাছে পরাজয়, তারপর বিজয়।
- ১৩. বাইবার্স সানি আল-মালিকুল মুজাফফর জাশনগির | ৭০৮ হিজরি থেকে ৭০৯ হিজরি (১৩০৮ থেকে ১৩০৯ খ্রিস্টাব্দ) | পদত্যাগ, তারপর হত্যা | ব্যর্থ শাসনকাল।
- আন-নাসির মুহাম্মদ বিন কালাউন - তৃতীয়বার | ৭০৯ হিজরি থেকে ৭৪১ হিজরি (১৩০৯ থেকে ১৩৪০ খ্রিস্টাব্দ) | মৃত্যু | দীর্ঘতম এবং সফলতম শাসনকাল। মৃত্যুর তারিখ: ২৮ জিলহজ।
- ১৪. আবু বকর বিন নাসির - সাইফুদ্দীন | ৭৪১ হিজরি থেকে ৭৪২ হিজরি (১৩৪০ থেকে ১৩৪১ খ্রিস্টাব্দ) | পদচ্যুত | আন-নাসিরের পুত্রদের শাসনকাল শুরু।
- ১৫. কুজুক বিন নাসির - আলাউদ্দীন | ৭৪২ হিজরি (১৩৪১ খ্রিস্টাব্দ) | পদচ্যুত | নামমাত্র শাসনকাল।
- ১৬. আহমদ বিন নাসির - শিহাবুদ্দীন | ৭৪২ হিজরি থেকে ৭৪৩ হিজরি (১৩৪১ থেকে ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দ) | পদচ্যুত | নামমাত্র শাসনকাল।
- ১৭. ইসমাইল বিন নাসির - ইমাদুদ্দীন | ৭৪৩ হিজরি থেকে ৭৪৬ হিজরি (১৩৪২ থেকে ১৩৪৫ খ্রিস্টাব্দ) | মৃত্যু | নামমাত্র শাসনকাল।
- ১৮. আল-কামিল শাবান আউয়াল বিন নাসির | ৭৪৬ হিজরি থেকে ৭৪৭ হিজরি (১৩৪৫ থেকে ১৩৪৬ খ্রিস্টাব্দ) | হত্যা | নামমাত্র শাসনকাল।
- ১৯. আল-মুজাফফর হাজ্জি আউয়াল বিন নাসির | ৭৪৭ হিজরি থেকে ৭৪৮ হিজরি (১৩৪৬ থেকে ১৩৪৮ খ্রিস্টাব্দ) | হত্যা | নামমাত্র শাসনকাল।

তারীখে উম্মতে মুসলিমা

২০. হাসান বিন নাসির - প্রথমবার

৭৪৮ হিজরী থেকে ৭৫২ হিজরী (১৩৪৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩৫১ খ্রিষ্টাব্দ)

পদচ্যুত। নামমাত্র শাসন।

২১. সালেহ বিন নাসির সালাহউদ্দীন

৭৫২ হিজরী থেকে ৭৫৫ হিজরী (১৩৫১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩৫৪ খ্রিষ্টাব্দ)

পদচ্যুত। নামমাত্র শাসন।

হাসান বিন নাসির - দ্বিতীয়বার

৭৫৫ হিজরী থেকে ৭৬২ হিজরী (১৩৫৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩৬০ খ্রিষ্টাব্দ)

হত্যা। নির্মাণ কাজে আগ্রহ।

২২. আল-মনসুর মুহাম্মদ বিন হাজি

৭৬২ হিজরী থেকে ৭৬৪ হিজরী (১৩৬০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩৬২ খ্রিষ্টাব্দ)

পদচ্যুত। আন-নাসিরের নাতিদের মধ্যে প্রথম শাসক। দুই বছর নামমাত্র শাসন।

২৩. আল-আশরাফ শাবান সানি

৭৬৪ হিজরী থেকে ৭৭৮ হিজরী (১৩৬২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩৭৬ খ্রিষ্টাব্দ)

হত্যা। ১৪ বছর পর্যন্ত ভালো শাসন করেছেন। বয়স ২৪ বছর।

২৪. আল-মনসুর আলী বিন শাবান

৭৭৮ হিজরী থেকে ৭৮৩ হিজরী (১৩৭৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩৮২ খ্রিষ্টাব্দ)

মৃত্যু। ৫ বছর পর্যন্ত নামমাত্র শাসন। বয়স ১৩ বছর।

২৫. আস-সালেহ, হাজি সানি বিন শাবান (মামলুক বাহরিয়্যার শেষ শাসক)

রবিউল আউয়াল ৭৮৩ হিজরী থেকে রমজান ৭৮৪ হিজরী (১৩৮১ খ্রিষ্টাব্দ - ১৩৮২ খ্রিষ্টাব্দ)

পদচ্যুত। মামলুক বাহরিয়্যার শেষ প্রতীকী শাসক। বয়স ৩ বছর। বারকুক পদচ্যুত করেন।

আল-মালিক আজ-জাহির বারকুক (চেরকাসীয়দের প্রথম শাসক)

১৯ রমজান ৭৮৪ হিজরী থেকে ৫ জমাদিউল আখিরা ৭৯১ হিজরী (ডিসেম্বর ১৩৮২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে জুন ১৩৮৯ খ্রিষ্টাব্দ)

গ্রেপ্তার। ৭৯১ হিজরীতে হাজি সানি পুনরায় ক্ষমতা ফিরে পান এবং বারকুক গ্রেপ্তার হন।

আস-সালেহ, হাজি সানি বিন শাবান, দ্বিতীয়বার

জমাদিউল আখিরা ৭৯১ হিজরী থেকে ১০ সফর ৭৯২ হিজরী (জুন ১৩৮৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ফেব্রুয়ারি ১৩৯০ খ্রিষ্টাব্দ) [১] মাত্র আট মাস।

পুনরায় সাত মাস শাসক ছিলেন। এরপর পদচ্যুত। বারকুক পুনরায় ক্ষমতা দখল করেন এবং মামলুক বাহরিয়্যা যুগের সমাপ্তি ঘটে।

[১] মাখাজ: আস-সুলুক লি-মারিফাতিল দুওয়ালিল মুলুক; আন-নুজুমুজ জাহেরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহিরা; তারীখে ইবনে খালদুন; তারীখুল খুলাফা।

মমালিক চেরাকাসিয়া

মমলুক সুলতানগণ নিজ নিজ শাসনামলে ত্রীতদাস ক্রয় করে তাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের পর নিজেদের ঘনিষ্ঠ করে নিতেন। এই কারণে মিশর ও শামের সালতানাতে মমলুকদের বেশ কিছু গোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল যারা নিজ নিজ প্রভুদের নামে পরিচিত হতো; কেউ জহিরি নামে পরিচিত ছিল, কেউ আশরাফি, কেউ মানসুরি এবং কেউ সালিহি।

৬৮০ হিজরি (১২৮১ খ্রিষ্টাব্দ) সালে সুলতান আল-মানসুর কালাউন নিজের শক্তি সুসংহত করার জন্য অনুগতদের একটি নতুন দল গঠনের পরিকল্পনা করেন। এর জন্য তিনি কাস্পিয়ান সাগরের উত্তরে এবং কৃষ্ণ সাগরের পূর্বে বসবাসকারী চেরাকাস (Circassian) গোত্র থেকে ত্রীতদাস ক্রয় করেন, যাতে তাদের মধ্যে এমন কেউ না থাকে যে আগে থেকেই কোনো মিশরীয় বা শামি আমিরের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। কম দাম হওয়ার কারণে কালাউন এই ধরনের তিন হাজার ত্রীতদাস ক্রয় করেন এবং তাদের একটি বুর্জ (দুর্গ)-এ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। এই কারণে তাদের “মমালিক বুর্জিয়া”ও বলা হতে থাকে।

কালাউনের পুত্র আল-মালিক আন-নাসিরের শাসনামলে এই চেরাকাসি ত্রীতদাসরা উন্নতি করে আমিরের মর্যাদা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এবং তার পৌত্রদের আমলে তারা পুরো রাজ্যের সর্বসর্বা হয়ে ওঠে। অবশেষে যখন তারা শাসকদের দুর্বল ও অযোগ্য দেখল, তখন বিদ্রোহ করে নিজেদের রাজত্ব কায়েম করে নিল। এভাবে মমলুক বাহরিয়ার পরিবর্তে মমলুক চেরাকাসিয়ার যুগ শুরু হয়। [১]

চেরাকাসিয়ার প্রথম শাসক - আজ-জহির বারকুক: (৭৮৪ হি. হতে ৮০১ হি.)

তাদের মধ্যে প্রথম ছিলেন আমির বারকুক। তিনি ৭৮৪ হিজরিতে মমলুক বাহরিয়ার শেষ ও অপ্রাপ্তবয়স্ক শাসক হাজি সানিকে অপসারিত করে নিজে ক্ষমতা দখল করেন। ক্ষমতার লাগাম নিজের হাতে নিয়ে তিনি প্রকৃতপক্ষে সময়ের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন পূরণ করেছিলেন, কারণ প্রায় চল্লিশ বছর ধরে নামমাত্র সুলতানদের শাসন দেশকে অত্যন্ত দুর্বল করে দিয়েছিল।

বারকুকের শাসনের সপ্তম বছরে মমলুক বাহরিয়ার সমর্থক আমিররা বিদ্রোহ করে তাকে থেপ্তার করে নেয় এবং তার স্থলে পূর্বতন শাসক হাজি সানিকে পুনরায় সিংহাসনে বসায়। কিন্তু আট মাস পর বারকুক পুনরায় ক্ষমতা লাভ করেন।

এবার তার শাসনকাল দীর্ঘ ছিল। তিনি একজন ক্ষমতাধর সুলতান হয়ে মিশরকে পুনরায় শক্তিশালী ও সুসংহত করেন। [২] তার আমলে পূর্ব দিক থেকে মঙ্গোল বিজেতা তৈমুরের আবির্ভাব ঘটে, যে হিন্দুস্তান বিজয়ের পর শাম ও মিশর বিজয়ের সংকল্প করেছিল।

[১] সিমতুন নুজুমিল আউয়ালি ফি আনবাইল আওয়াইল ওয়াত তাওয়ালি লিল ইসামি (মৃ. ১১১১ হি.): ৩/৩৮, ত. আল-ইলমিয়াহ।

[২] সিমতুন নুজুমিল আউয়ালি: ৩/৩৮ হতে ৪১; আল-মাওয়াইজ ওয়াল ইতিবার লিল মাকরিজি: ৩/৩২০, ৩২১।

চতুর্থ খণ্ড | তারিখ উন্মতে মুসলিমা

আয-যাহির বারকুককে পত্র পাঠিয়ে ভয়ভীতি প্রদর্শন ও হুমকি প্রদান করল। সে তার পত্রে বলেছিল:

“আমরা আল্লাহর ত্রোদ থেকে সৃষ্ট এক সেনাবাহিনী। আমরা তাদের ওপর চড়াও হই যারা আল্লাহর ত্রোদের শিকার হয়। আমরা কারো আত্মনাদে নরম হই না। কারো কান্নায় আমাদের মনে দয়া জাগে না। আল্লাহ আমাদের অন্তর থেকে দয়া কেড়ে নিয়েছেন। আমাদের কাছে তার জন্য কেবল ধ্বংসই রয়েছে যে আমাদের আনুগত্য করবে না।”

আয-যাহির বারকুক তার এই আত্মশালনের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে লিখলেন:

“যদি আল্লাহ তোমাদের অন্তর থেকে দয়া কেড়ে নিয়ে থাকেন, তবে এটাই সবচেয়ে বড় দোষ। তোমরা কি সশস্ত্র অশ্বারোহীদের ভেড়া-ছাগল দিয়ে ভয় দেখাচ্ছ? যদি আমরা তোমাদের হত্যা করি তবে তা হবে এক বড় পুরস্কার। আর যদি আমরা নিহত হই তবে জান্নাত আমাদের থেকে মাত্র এক মুহূর্তের দূরত্বে থাকবে। তোমরা কি আমিরুল মুমিনীন খলিফাকে আনুগত্য করতে চাও? তোমাদের কথা শোনার যোগ্যও নয়, মানার যোগ্যও নয়।” [১]

যাইহোক, তৈমুর দ্রুত আক্রমণ করতে পারেনি এবং বারকুক শাওয়াল ৮০১ হিজরি (১৩৯৯ খ্রিষ্টাব্দে) ইন্তেকাল করেন। তার শাসনামল ছিল ১৭ বছর। [২]

আল-মালিকুন নাসির ফারাজ বিন বারকুক - প্রথমবার: (৮০১ হিজরি হতে ৮০৮ হিজরি)

বারকুকের মৃত্যুর পর তার পুত্র ফারাজ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সদকা-খয়রাত ও জনকল্যাণমূলক কাজে প্রচুর অংশগ্রহণ করতেন। তার শাসনের এক বছর পূর্ণ হতেই মসজিদে হারামে আগুন লেগে যায়। ঘটনাটি ছিল এই যে, মসজিদে হারামের সাথে লাগোয়া ‘রিবাত রাশাত’ নামক একটি খানকাহ ছিল যেখানে সুফিদের জন্য আলাদা আলাদা কক্ষ ছিল। কোনো এক ব্যক্তি তার কক্ষে প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখে গিয়েছিলেন। তার শিখা দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে যার ফলে খানকাহে আগুন লেগে যায় এবং তা ছড়িয়ে মসজিদে হারামের ছাদ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। ছাদের উচ্চতার কারণে তা নেভানো কঠিন হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত পুরো ছাদ ভস্মীভূত হয়ে যায়। ফারাজ একজন আমিরকে নিযুক্ত করে খুব অল্প সময়ের মধ্যে মসজিদে হারামের ছাদ নতুন করে তৈরি করে দেন। একইভাবে খানকাহটিও পুনরায় নির্মাণ করা হয়। [৩]

ফারাজের ক্ষমতা গ্রহণের দ্বিতীয় বছর তৈমুর লং সিরিয়া আক্রমণ করেন। এই আক্রমণে মঙ্গোলরা রবিউল আউয়াল ৮০৩ হিজরিতে আলেপ্পো জয় করে সেখানে মুসলমানদের ব্যাপক গণহত্যা চালায়। এরপর তারা দামেস্ক পর্যন্ত পৌঁছে যায়। মঙ্গোলদের থামানো কারো সাধ্যের মধ্যে ছিল না। ফলে জমাদিউল আখিরা ৮০৩ হিজরিতে দামেস্কও পদানত হয় এবং সেখানে মঙ্গোলরা চরম নির্যাতন চালায়। [৪]

ফারাজ বিন বারকুক মঙ্গোলদের আক্রমণের খবর পেয়ে মিসর থেকে সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হন, কিন্তু মঙ্গোলরা যুদ্ধ এড়িয়ে এশিয়া মাইনরের দিকে চলে যায়। ফারাজ বিন বারকুক সিরিয়ার শাসনব্যবস্থা নতুন করে বিন্যস্ত করেন এবং আমির তাগরি বারদিকে সিরিয়ার গভর্নর নিযুক্ত করেন। মোটকথা, মামলুকরা তাদের প্রতিরক্ষার জন্য সদা প্রস্তুত ছিল। তারা যদি সতর্ক না থাকত, তবে মঙ্গোলদের সিরিয়া ও মিসর দখল করে নেওয়া মোটেও অসম্ভব ছিল না। [৫]

[১] আজাইবুল মাকদুর ফি আখবারে তৈমুর, ইবনে আরবশাহ, পৃ. ১৩৭, ১৩৮, কলকাতা সংস্করণ।

[২] সিমতুন নুজুমিল আউয়ালি: ৩/৩১।

[৩] ইনবাউল গুমর বি-আবনাউল উমর, ইবনে হাজার: সন ৮০৩ হিজরি, তুরাস পুনরুজ্জীবন কমিটি সংস্করণ।

[৪] সিমতুন নুজুমিল আউয়ালি: ৩/৩৩, আল-ইলমিয়াহ সংস্করণ।

[৫] আন-নুজুমুয যাহেরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহিরা: সন ৮০৩ হিজরি।

ফারাজ বিন বারকুকের শাসন ছয় বছর পর্যন্ত স্থিতিশীল ছিল। এরপর সালতানাতের আমিররা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে, যার ফলে অতিষ্ঠ হয়ে তিনি রবিউল আউয়াল ৮০৮ হিজরিতে আত্মগোপন করেন। [১]

আবদুল আজিজ বিন বারকুক আল-মালিক আল-মানসুর: (৮০৮ হিজরি)

ফারাজের আত্মগোপনের পর আমিররা তার স্থলে তার ভাই আবদুল আজিজকে আল-মালিক আল-মানসুর উপাধি দিয়ে সিংহাসনে বসান, যার অল্পবয়স্ক হওয়ার কারণে শাসনব্যবস্থা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়। [২]

ফারাজ বিন বারকুক - দ্বিতীয়বার: (৮০৮ হিজরি থেকে ৮১৫ হিজরি)

তিন মাস আত্মগোপনে থাকার পর ফারাজ জমাদিউল আখিরা মাসে তার অনুগত আমিরদের সাথে প্রকাশ্যে আসেন। বিরোধীরা পালিয়ে যায় এবং ফারাজ পুনরায় রাষ্ট্রীয় বিষয়াবলি নিজের হাতে তুলে নেন। পরবর্তী বছরগুলোতে তিনি বিরোধী আমিরদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করেন, কিন্তু আমিরদের ষড়যন্ত্র শেষ হয়নি। অবশেষে বাদশাহ একে একে আমিরদের গ্রেপ্তার ও হত্যা করার প্রক্রিয়া শুরু করেন। এটি দেখে কিছু আমির পালিয়ে সিরিয়ায় চলে যান, যেখানে সুলতানের অনুগত এবং বিরোধী আমিরদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছিল।

৮১৩ হিজরিতে ফারাজ বিন বারকুকও বিদ্রোহী আমিরদের পশ্চাদ্ধাবনে সিরিয়ায় পৌঁছান। তিনি বিরোধী আমিরদের ওপর, যাদের মধ্যে শায়খ মাহমুদি এবং নওরোজ অগ্রগণ্য ছিলেন, অত্যন্ত কষ্টে নিয়ন্ত্রণ লাভ করেন। অবশেষে বিচ্যুত আমিররা বাদশাহর আনুগত্যের দৃঢ় শপথ গ্রহণ করেন। বাদশাহ আমির তাগরি বিরদি-কে (আন-নুজুমুজ জাহিরার লেখকের পিতা) সিরিয়ায় নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন এবং সাময়িকভাবে কিছুটা শান্তি প্রতিষ্ঠা করে মিশরে ফিরে আসেন। তবে এখানে এসেও তার শান্তিতে থাকা নসিব হয়নি। আমিররা অঙ্গীকার রক্ষা করেনি। তারা না বাদশাহর অনুগত হলো, আর না নিজেরা ঐক্যবদ্ধ থাকল। তাদের মধ্যে পারস্পরিক কলহ ও বিবাদ তুঙ্গে ছিল। বাদশাহ অত্যন্ত সন্দেহপ্রবণ মেজাজের হয়ে গিয়েছিলেন এবং সন্দেহের বশবর্তী হয়ে হত্যা করা তার জন্য সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। প্রতিদিন গোয়েন্দারা কোনো না কোনো আমিরের ষড়যন্ত্রের খবর নিয়ে আসত এবং প্রতিনিয়ত হত্যা ও গ্রেপ্তারের আদেশ জারি হতে থাকত। [৩] আল্লামা ইউসুফ বিন তাগরি বিরদি [৪] লেখেন:

“এই ভঙ্গকৃত শপথগুলোর কারণে এই সকল আমির অল্প সময়ের মধ্যে মৃত্যুর মুখে পতিত হন। আমি তাদের মধ্যে এমন কোনো আমিরের কথা জানি না যে বিছানায় মৃত্যুবরণ করেছে। বরং তারা সবাই বিভিন্নভাবে নিহত হয়েছে, কারণ তারা আল্লাহর (নামে নেওয়া শপথ ভঙ্গ করে আল্লাহর) প্রতি ধৃষ্টতা দেখিয়েছিল। তারা আল-মালিক আন-নাসির (ফারাজ বিন বারকুক)-এর খারাপ আচরণের কারণে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করত, আবার পুনরায় তার আনুগত্যের দিকে ফিরে আসত; শপথ ও ওয়াদার বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা করত না। তারা এই কাজটিকে খেলায় পরিণত করেছিল। এটি তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। অবশেষে আল্লাহ তাদের একে অপরের ওপর চাপিয়ে দিলেন। তারা তাদের শক্তি, তীব্র যুদ্ধংদেহী মনোভাব এবং চরম সাহসিকতা সত্ত্বেও এমনভাবে মিটে গেল যেন তারা কখনো ছিলই না। বাদশাহ তাদের পর এমন সব লোককে পদে আসীন করলেন যারা তাদের সমকক্ষ তো দূরের কথা, কোনো বিচারেই তাদের ধূলিকণার সমানও ছিল না।” [৫]

[১] সিমতুন নুজুমিল আওয়ালি: ৪/৪৩৪

[২] আন-নুজুমুজ জাহিরা: সন ৮১৩ হিজরি, ৮১৩ হিজরি

[৩] আন-নুজুমুজ জাহিরা: ১৩/১২৯

জিলকদ ৮১৩ হিজরিতে সুলতান ফারাজ রাজকীয় আমিরদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আবারও অভিযানের প্রস্তুতি নেন এবং এর আগে তিনি তার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী খুন্দ বিনতে সারাক এবং আমির ইবনে আল-তাবলাভিকে হত্যা করান। এই ঘটনাটি অত্যন্ত লোমহর্ষক। আল্লামা ইউসুফ বিন তাগরি বারদির মতে, সুলতান বেগম বিনতে সারাককে তালাক-ই-রাজয়ী দিয়েছিলেন, যার পর বেগম তার ব্যক্তিগত বাড়িতে চলে গিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও সুলতানের বেগমের প্রতি ঝোঁক ছিল, কিন্তু কেউ সুলতানের কাছে অভিযোগ করে যে, ইবনে আল-তাবলাভি নামক এক অফিসার বেগমের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করে থাকে। বিভিন্ন আলামত থেকে এই বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছিল, যেমন তল্লাশি চালিয়ে ইবনে আল-তাবলাভির কাছ থেকে বেগমের আংটি উদ্ধার করা হয়েছিল। [১] এই খবর পেয়ে সুলতান বেগমকে তার কাছে আসার নির্দেশ পাঠান। বেগম খুশি হলেন যে সুলতান হয়তো তালাক প্রত্যাহার করছেন। তিনি মেহেদি লাগালেন, চমৎকার পোশাক পরলেন এবং সেজেগুজে সুলতানের প্রাসাদে প্রবেশ করলেন।

সুলতান তখন প্রাসাদের বাগানে বসে ছিলেন। যখন কর্মচারীরা সুলতানকে খবর দিল যে বেগম আসছেন, তখন সুলতান উঠে বাগানের প্রবেশদ্বারের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং সেখানে একটি চত্বরে গিয়ে বসলেন। বেগমের জানা ছিল না সুলতানের মেজাজ কেমন। তিনি এসে সুলতানের হাত ধরে দস্তবুসি (হাত চুম্বন) করতে লাগলেন। সেই সময় প্রাসাদের বেগমগণ, রাজকুমারী এবং দাসীরাও রানীর অভ্যর্থনার জন্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সুলতান তাদের সবার সামনে চিৎকার করে বললেন:

“ওরে ব্যভিচারিণী! বাদশাহদের সওয়ারিতে কি এখন বালাসিরা সওয়ার হবে?” [২] [৩]

বেগম নিজের সাফাইয়ে কিছু বলার আগেই সুলতান খাপ থেকে নিমচা [২] বের করে বেগমের হাতে আঘাত করলেন, যার ফলে বেগমের এক হাতের আঙুলগুলো কেটে পড়ে গেল যা মেহেদিতে রাঙানো ছিল।

বেগম একটি চিৎকার দিয়ে বাগানের দিকে দৌড় দিলেন। সুলতানও তার পেছনে ছুটলেন এবং নিমচা দিয়ে তার কাঁধে আঘাত করলেন, যার ফলে মাংসের একটি টুকরো আলাদা হয়ে গেল। বেগম নিজের প্রাণ বাঁচাতে দৌড়াতে থাকলেন, সুলতানও দৌড়াতে দৌড়াতে তাকে একের পর এক আঘাত করতে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত বেগম একটি বারান্দায় (সে-দরি) ঢুকে পড়লেন। সুলতান সেখানে ঢুকে উপর্যুপরি আঘাতে তার প্রাণ কেড়ে নিলেন। কারো সাহস ছিল না যে তাকে বাঁচাবে। বাগানের প্রবেশদ্বার এবং বারান্দার দেয়ালে জায়গায় জায়গায় রানীর রক্তের ছিটে লেগে গিয়েছিল।

সুলতান বেগমের মাথা কেটে ফেললেন যার কানে তখনও বদখশানি দুল জ্বলজ্বল করছিল। সুলতান বিনুনি করা চুল ধরে মাথাটি তুললেন এবং নিজের বসার জায়গায় গিয়ে বসলেন। মাথাটি একটি থালা দিয়ে ঢেকে সামনে রাখলেন এবং ইবনে আল-তাবলাভিকে তলব করলেন। সে উপস্থিত হলে সুলতান তাকে সামনে বসালেন এবং তারপর হঠাৎ থালাটি সরিয়ে বললেন: “এই মাথাটি কি চিনতে পারছ?”

ইবনে আল-তাবলাভি দৃষ্টি নিচু করে নিলেন। সুলতান চোখের পলকে নিমচা দিয়ে আঘাত করলেন এবং তার নত হওয়া ঘাড় উড়িয়ে দিলেন।

[১] শরিয়ত অনুযায়ী সামান্য এইটুকু বিষয়ে অবৈধ সম্পর্ক (ব্যভিচার) প্রমাণিত হয় না। এর জন্য শরিয়ত অনুযায়ী অপরাধীর নিজস্ব স্বীকারোক্তি অথবা চারজন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য শর্ত। এখানে এটি পুরোপুরি সম্ভব ছিল যে রানী কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ এই অফিসারের ওপর ন্যস্ত করেছিলেন এবং আংটিটি এই জন্য দিয়েছিলেন যাতে প্রয়োজনের সময় ওই অফিসারের অন্যদের থেকে কাজ নিতে সুবিধা হয়। কিন্তু সুলতান বেগম এবং ওই অফিসারকে সাফাই পেশ করার সুযোগই দেননি এবং নিজের হাতে উভয়কে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে হত্যা করেছেন যা ছিল স্পষ্ট জুলুম।

[২] নিমচা: এক ধরনের ছোট তলোয়ার যা পোশাকের মধ্যে লুকিয়ে রাখা সহজ ছিল।

[৩] বালাসি মিশরের সাঈদ অঞ্চলের একটি শহর। সম্ভবত আমির ইবনে আল-তাবলাভি এই শহরের বাসিন্দা ছিলেন।

তারপর তার লাশকে রানীর লাশের সাথে একটি লেপের মধ্যে পেঁচিয়ে দাফন করে দেওয়া হলো। [১]

সুলতানের সিরিয়া সফরের উদ্দেশ্য ছিল তার শ্যালক আমির নওরোজকে নিয়ন্ত্রণে আনা। সফরের আগে তিনি কাজীদের একত্রিত করলেন এবং তাদের সামনে আমির নওরোজের বোন সারাকে তালাক দিয়ে দিলেন। তারপর এই অসহায় নারীকে বাধ্য করলেন যেন তিনি একজন সামরিক কর্মকর্তা মুকবিল রুমির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। সারা এর জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না, কিন্তু সুলতান তাকে হত্যার হুমকি দিলেন এবং জোরপূর্বক এই বিয়ে করিয়ে দিলেন। [২]

এই জঘন্য পদক্ষেপের পর সুলতান চাই জিলহজ এক বিশাল লস্কর ও অনুসারীদের বহর নিয়ে মিসর থেকে রওনা হলেন। তিনি খলিফা মুসতাইন বিল্লাহকেও সাথে নিলেন। দরবারি জ্যোতিষী শেখ বুরহানউদ্দিন গণনা করে জানালেন যে, সুলতানের এই সফর অত্যন্ত সৌভাগ্য ও সফলতার কারণ হবে। [৩] তবে সুলতানের মেজাজ ঠিক ছিল না। গাজা পৌঁছাতে পৌঁছাতে তিনি কত যে মামলুককে সরিয়ে দিয়েছিলেন। এটি দেখে আমিরগণ সুলতানের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়লেন। অগ্রগামী দলের অধিকাংশ আমির পালিয়ে সিরিয়ায় সুলতানের বিরোধী আমির নওরোজের দলে গিয়ে যোগ দিলেন। সুলতানও পিছু পিছু মঞ্জিল অতিক্রম করতে করতে জিলহজ মাসের শেষ তারিখে দামেস্কে পৌঁছালেন।

এখানে তিনি একটি পরামর্শ সভা আহ্বান করলেন যে, বিদ্রোহী আমিরদের ব্যাপারে কী করা উচিত। সিরিয়ার বয়োবৃদ্ধ গভর্নর আমির তাগরি বারদি বললেন: “সুলতান! আপনি পাঁচশ ব্যক্তিকে হত্যা করিয়েছেন, কিন্তু তাতে কী লাভ হয়েছে? আপনি যে ঘোড়ায় সওয়ার হয়েছেন, সেটিই অবাধ্য হয়ে গেছে।”

সুলতান বললেন: “যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। ভবিষ্যতের ব্যাপারে পরামর্শ দিন।”

আমির তাগরি বারদি বললেন: “আমার একটি পরামর্শ আছে, সেটি মেনে নিলে পরিস্থিতি ঠিক হয়ে যাবে।”

সুলতান জিজ্ঞেস করলেন: “সেটি কী?”

আমির বললেন: “আপনি পুনরায় মিসরে ফিরে যান। যারা আপনার প্রতি অনুরাগী তারা আপনার কাছে ফিরে আসবে। যারা আপনাকে ভয় পায়, তারা এখানেই থেকে যাবে এবং বিরোধী আমিরদের সাথে মিশে যাবে। আপনি মিসরে পৌঁছে সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা দিন। আমিরদের হত্যার ধারা বন্ধ করুন এবং তাদের সাথে সদাচরণ শুরু করুন। আপনার অতীত আচরণের জন্য তাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। এমন আচরণ করুন যাতে সবাই আপনার সদৃষ্টির ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারে। তবেই আপনার প্রজারা সন্তুষ্ট হবে এবং আপনার আনুগত্যে ফিরে আসবে। যখন এক হাজার আমির আপনার অনুগত হয়ে যাবে, তখন আপনি তাদের সাহায্যে শত্রুদের পরাস্ত করতে পারবেন। এখন তো বিরোধী আমিরদের সংখ্যা অনেক বেশি। সিরিয়া তাদের ছাড়া চলতে পারবে না। যদি তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তবে সিরিয়া অনেক ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। আর যদি তারা ঐক্যবদ্ধ হয় তবে আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে মিসরে ঢুকে পড়বে।”

সুলতানের সকল সহচর এই পরামর্শের প্রশংসা করলেন কিন্তু সুলতান চুপচাপ রইলেন। বেশ কিছুক্ষণ পর তিনি বললেন:

[১] লাশের সাথে এই জঘন্য আচরণ ছিল মানবতা ও ভদ্রতার গালে চপেটাঘাত। পরবর্তীতে খোদ সুলতানের লাশের সাথে যা ঘটেছিল, সম্ভবত এটি তারই প্রতিশোধ ছিল।

[২] আন-নুজুমুজ জাহেরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহিরা: ১৩/১৩২, ১৩৩।

[৩] আল্লামা ইউসুফ বিন তাগরি বারদি এই ঘটনা বর্ণনা করে বলেন: “এটি সুলতানের জন্য সবচেয়ে অশুভ সফর ছিল। হায়! আমি যদি জানতে পারতাম যে বুরহানউদ্দিন এরপর এই বিদ্যার পারদর্শিতার দাবি ছেড়েছিলেন কি না? আমি এই জ্যোতিষীদের নীচতায় অবাক হই যে, তাদের বিদ্যার অসারতার এমন প্রকাশ্য প্রমাণ ঘটার পরেও তারা এই বিদ্যার ওপর জেদ ধরে থাকে এবং পাগড়ি উঁচিয়ে চলে।” (আন-নুজুমুজ জাহেরা: ১৩/১৩৬)

“আতা! [১] আমি তাদের এই জন্য হত্যা করেছি যে আমার মর্যাদা মহান। এখন যদি আমি এখান থেকে ফিরে যাই তবে আমার মর্যাদা কোথায় বাকি থাকবে? আমি তাদের সম্পর্কে ততটা অনভিজ্ঞ নই যতটা অন্যরা। আল্লাহর কসম! তারা আমার সামনে আহত শিকারের মতো। আল্লাহর কসম! যদি আমার সাথে দশজন **كلمة** (গোলাম) থাকে তবে আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করব।”

আমীর তগরি বরদি বললেন: “তাহলে বুঝে নিন যে এখন তারা আপনার সাথে যুদ্ধ করেই ছাড়বে।”

৬ মহরম ৮১৫ হিজরিতে সুলতান দামেস্ক থেকে হিমসের দিকে রওনা হলেন। বিদ্রোহী আমীররা উত্তরের দিকে পিছু হটতে থাকল। এমনকি সুলতান বালবাক পৌঁছে গেলেন। এখানে সুলতান খবর পেলেন যে বিদ্রোহী আমীররা ওয়াদিউল লুজুনের দিকে চলে গেছে। সুলতান রাগান্বিত হয়ে তাদের পিছু নিলেন এবং এত দ্রুত অভিযান চালালেন যে তার অধিকাংশ সৈন্য পেছনে পড়ে রইল এবং তিনি মাত্র কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে ১৩ মহরমের সন্ধ্যায় শত্রুর মাথার ওপর গিয়ে দাঁড়ালেন।

বিরোধী আমীররা সুলতানের সাথে লড়াইতে চাচ্ছিল না। তাদের একজন নেতা শেখ মাহমুদী মনে করেছিলেন যে সুলতান আগামীকাল আক্রমণ করবেন এবং তার আগে আমাদের রাতের বেলাতেই হালবের দিকে পালিয়ে যাওয়া উচিত।

অন্যদিকে সুলতান তখনই আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তার সেনাপতি দমরদাশ মুহাম্মদী বললেন:

“জনাব আলী! এখন ঘোড়াগুলোকে বিশ্রাম নিতে দিন। যুদ্ধ আগামীকাল করা যাবে।”

সুলতান বললেন: “রাতে তারা পালিয়ে যাবে।”

সেনাপতি বললেন: “যখন মুখোমুখি হবে তখন তারা কোথায় পালাবে? তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তাদের ঘোড়াগুলো জবাব দিয়ে দিয়েছে।”

কিন্তু সুলতান সেনাপতির কথায় কর্ণপাত না করে যুদ্ধের দামামা না বাজিয়েই নিজের ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। সুলতানের সৈন্যরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও আক্রমণে শরিক হলো কিন্তু অন্ধকারের কারণে তাদের অনেকে কাদায় আটকে গেল। অন্যদিকে বিদ্রোহী আমীররা মৃত্যু নিশ্চিত দেখে মাথায় কাফন বেঁধে ময়দানে নেমে এল। সুলতানের বাহিনীকে দেখামাত্রই তারা পরাজিত হলো। আমীর মুকবিল রুমীসহ অনেক আমীর নিহত হলেন। খলিফা বিদ্রোহীদের হাতে বন্দি হলেন। সুলতান কিছুক্ষণ লড়াই করার পর অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় পালিয়ে গেলেন এবং ১৫ মহরম দামেস্ক পৌঁছে গেলেন। আমীররা পরামর্শ দিলেন যে এখন সরাসরি মিশরে চলে যাওয়া উচিত কিন্তু সুলতান মানলেন না এবং বিদ্রোহী আমীররাও পিছু ধাওয়া করতে করতে দামেস্ক পৌঁছে গেল।

১৮ মহরম যুদ্ধ শুরু হলো যা দীর্ঘস্থায়ী হলো। অবশেষে বিদ্রোহীরা খলিফা মুস্তাইন বিল্লাহর ওপর, যিনি তাদের সাথে বন্দি ছিলেন, চাপ সৃষ্টি করল যে তিনি সুলতানকে পদচ্যুত করবেন এবং খলিফা হওয়ার পাশাপাশি বাদশাহও হয়ে যাবেন। খলিফা এই প্রস্তাব শুনে ঘাবড়ে গেলেন যে এমন না হয় এই বিষয়টি সম্পন্ন হওয়ার আগেই সুলতান বিজয়ী হয়ে ফিরে আসেন এবং সিংহাসনের পরিবর্তে তখত-ই-দার (ফাঁসির মঞ্চ) নসিব হয়। তিনি পরিষ্কার অস্বীকার করলেন।

[১] এটি তুর্কি ভাষার শব্দ যা “আতা” বা “বাবা” এর সমার্থক। আমীর তগরি বরদির বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়ার কারণে সুলতান তাকে “আতা” বলতেন।

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

চতুর্থ খণ্ড

এটি দেখে আমিরগণ একটি চাল চাললেন। তারা খলিফার বৈপিত্র্যে ভাই নাসিরুদ্দিন মুবারক শাহকে সাথে নিয়ে খলিফার পক্ষ থেকে সালতানাতের আমিরদের নামে একটি জাল পত্র তৈরি করালেন, যাতে সুলতানের বাড়াবাড়ি ও দুর্নীতির কথা উল্লেখ করার পর সবাইকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল যে তারা যেন খলিফাকে সুলতান মেনে নিয়ে বায়াত গ্রহণ করেন এবং এতে কেউ যেন দ্বিধা না করেন। [১]

যখন খলিফা এই পত্রটি প্রকাশিত হওয়ার খবর পেলেন, তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে এখন পিছু হটা তাৎক্ষণিক আত্মহত্যার শামিল হবে। তিনি বিদ্রোহী আমিরদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিলেন যে তারা সর্বদা তার আনুগত্যে অবিচল থাকবেন। সবাই দৃঢ় শপথ করে তার বায়াত গ্রহণ করল। ২৫ মহরম এক অনুষ্ঠানে খলিফার পক্ষ থেকে সুলতান ফারাজ বিন বারকুকের অপসারণের ঘোষণা দেওয়া হলো এবং বলা হলো যে খলিফা নিজেই সুলতান হয়েছেন। এখন ফারাজকে সাহায্য বা সমর্থন করা জায়েজ নয়। আমিরদের মধ্যে যারা খলিফার বায়াত গ্রহণ করবে তারা নিরাপদ থাকবে। যখন এই খবর শহরে পৌঁছাল, তখন সেখান থেকে অনেক আমির আন্তরিকভাবে খলিফার সাথে যোগ দিলেন।

এখন বিদ্রোহীদের পাল্লা ভারী হয়ে গেল এবং তারা সুলতানের বাহিনীকে পরাজিত করল। ৯ সফর তারা শহর দখল করে নিল। সুলতান পালিয়ে হালাব যাওয়ার চেষ্টা করলেন কিন্তু সফল হতে পারলেন না এবং শেষ পর্যন্ত দুর্গে অবরুদ্ধ হয়ে পড়লেন। বিদ্রোহীরা তাকে প্রাণের নিরাপত্তা দেওয়ার ওয়াদা করল, যার ভিত্তিতে সুলতান দুই দিন পর নিজেকে তাদের হাতে সঁপে দিলেন। কিছু আমির সুলতানকে আলেকজান্দ্রিয়ায় নজরবন্দি করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কারো কারো মত ছিল তার জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দেওয়ার। [২]

ফলে ১৬ সফর রাতে কয়েকজন আমির জল্লাদদের সাথে নিয়ে দুর্গে সুলতানের কাছে পৌঁছালেন। সুলতান তাদের ভাবভঙ্গি দেখে উদ্দেশ্য বুঝে ফেললেন এবং অস্থির অবস্থায় তাদের সাথে ধস্তাধস্তিতে লিপ্ত হলেন। জল্লাদগণ এটি দেখে খঞ্জর বের করল এবং তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তিনি প্রাণ বাঁচানোর জন্য এদিক-ওদিক দৌড়াতে লাগলেন। জল্লাদরাও পেছনে দৌড়াতে দৌড়াতে তার ওপর খঞ্জর দিয়ে আঘাত করতে লাগল। সুলতান হাত দিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করলেন কিন্তু খালি হাতে কিছুই হলো না। পাঁচটি আঘাত খেয়ে সুলতান মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। এক গোলাম এগিয়ে এসে তার গলা টিপে ধরল। যখন সে মারা গেল বলে মনে হলো, তখন সুলতানের শরীরে নড়াচড়া দেখা গেল। সে আবারও গলা টিপে ধরল এবং ফিরে যেতে লাগল। সুলতানের শরীরে আবারও নড়াচড়া দেখা গেল। গোলাম তৃতীয়বার গলা টিপে ধরল এবং সাথে সাথেই খঞ্জর দিয়ে কণ্ঠনালী কেটে ফেলল। তারপর তার পোশাক খুলে নিল এবং নগ্ন লাশটি পা ধরে টেনে নিয়ে আবর্জনার স্তুপে ফেলে দিল। সালোয়ার ছাড়া শরীরে কোনো কাপড় ছিল না। চোখগুলো খোলা রয়ে গিয়েছিল। পরের দিন কিছু লোক দয়াপরবশ হয়ে তার তাজহিজ ও তাকফিন করল। [৩] আমির ইউসুফ বিন তাগরি বারদির বোন, যিনি মিশরে সুলতানের হাতে মালিকা বিনতে সারাক-এর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, তিনি সুলতানের হত্যার সময় দামেস্কে ছিলেন। [৪] তিনি বলেন:

[১] আন-নুজুমুজ জাহেরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহিরা: ১৩/ ১৩৩ থেকে ১৪৭

[২] আন-নুজুমুজ জাহেরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহিরা: ১৩/ ১৮৯ থেকে ১৯৮

[৩] আন-নুজুমুজ জাহেরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহিরা: ১৩/ ১৩৮

[৪] কারণ তিনি তার পিতা আমির তাগরি বারদির কঠিন অসুস্থতার কারণে তাকে দেখতে সুলতানের সাথেই মিশর থেকে শাম দেশে এসেছিলেন। আমির তাগরি বারদি সুলতানের বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধে পিছু হটে দামেস্কে আসার পরের দিন ১৬ মহরম ইস্তিকাল করেছিলেন। অর্থাৎ সুলতানের হত্যার ঠিক এক মাস আগে তার মৃত্যু হয়েছিল।

“যখন জল্লাদরা সুলতানকে হত্যা করার জন্য দামেস্কের দুর্গে প্রবেশ করল, তখন তারা সুলতানকে খঞ্জর দিয়ে আঘাত করছিল, আর সুলতান তাদের সামনে সেভাবেই দৌড়াছিলেন যেভাবে বিনতে সরক সুলতানের সামনে দৌড়াছিল এবং সুলতান তাকে নিচ থেকে আঘাত করছিলেন। সুলতানের রক্ত দুর্গের বুরুজের দেয়ালে সেভাবেই লেগে ছিল যেভাবে বেগম বিনতে সরকের রক্ত বাগানের দেয়ালে অঙ্কিত হয়েছিল।” [১]

ফারাজের মোট শাসনকাল চৌদ্দ বছর এক মাস হয়। [২]

মুস্তাইন বিল্লাহ: (সফর থেকে শাবান ৮১৫ হিজরি)

ফারাজ বিন বারকুকের হত্যার পর আব্বাসীয় খলিফা মুস্তাইন বিল্লাহ সর্বসম্মতিক্রমে খলিফা হওয়ার পাশাপাশি সুলতানও হয়েছিলেন। আমির নওরোজ এবং শেখ মাহমুদি ছিলেন তাঁর দুই শক্তিশালী আমির, কিন্তু অভ্যন্তরীণভাবে তারা উভয়েই হিংসার শিকার ছিলেন এবং সবচেয়ে শক্তিশালী আমির হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন। শেখ মাহমুদি বেশি চতুর ছিলেন। তিনি আমির নওরোজকে বললেন:

“আমি চাই সিরিয়াতেই (শাম) থাকতে এবং সিরিয়া ছাড়াও আল-জাজিরা ও মিশরের সীমান্ত অঞ্চলের গভর্নরশিপও আমার কাছে থাকুক। আপনি খলিফার সাথে মিশরে চলে যান এবং সেখানে আতাবক (নায়েব) হিসেবে থাকুন।”

নওরোজ তার সঙ্গীদের সাথে এ বিষয়ে পরামর্শ করলেন। সবাই বলল:

“এটাই উত্তম। এভাবে রাজধানী শাসনের ক্ষমতা আপনার হাতে থাকবে।”

কিন্তু আমির নওরোজ বললেন: “যদি শেখ মাহমুদি সিরিয়ায় থেকে যান, তবে তিনি নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে অনেক শক্তিশালী হয়ে উঠবেন এবং তারপর আমাকে তাড়া করে মিশরে এসে হানা দেবেন। যদি মিশরে যাওয়া বেশি লাভজনক হতো, তবে শেখ মাহমুদি তা ছেড়ে সিরিয়ার গভর্নরশিপ পছন্দ করতেন না। সুতরাং, এটাই ভালো যে আমি তাকে মিশরে পাঠিয়ে দিই এবং নিজে সিরিয়ার গভর্নরশিপ গ্রহণ করি।”

সঙ্গীদের বোঝানো সত্ত্বেও আমির নওরোজ নিজের এই মতের ওপর অটল রইলেন।

পরের দিন খলিফার দরবার শুরু হতেই নওরোজ নিজে উদ্যোগী হয়ে খলিফার কাছে সিরিয়ার গভর্নরশিপ চাইলেন। খলিফা আবেদন মঞ্জুর করলেন। এখন খলিফার সাথে মিশরে যাওয়ার দায়িত্ব শেখ মাহমুদির ভাগে পড়ল। শেখ মাহমুদি এটাই চেয়েছিলেন। তিনি আমির নওরোজকে বোকা বানিয়ে কোনো বিবাদ ছাড়াই নায়েবে খেলাফতের পদ লাভ করলেন।

আমির নওরোজকে সিরিয়ার গভর্নর বানিয়ে খলিফা মিশরের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন এবং হ্রা রবিউস সানি কায়রো পৌঁছালেন। তিনি যখন রাজপ্রাসাদে বসবাস শুরু করলেন, তখন শেখ মাহমুদির বিশ্বাস হলো যে খলিফা সত্যিই সুলতানের মতো শাসন করবেন। তিনি খলিফার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করলেন। প্রতিটি সুলতান যে রাজকীয় প্রটোকল পেতেন, তা এই বলে প্রথম দিনই বন্ধ করে দিলেন যে সেনাবাহিনী দীর্ঘ সফর করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। অথচ তিনি নিজের প্রটোকল জারি রাখলেন। তিনি আমিরদের বাধ্য করলেন যেন তারা খলিফার পরিবর্তে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়। [৩]

[১] আন-নুজুমুজ জাহিরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহিরা: ১৩/ ১২৩

[২] আন-নুজুমুজ জাহিরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহিরা: ১৩/ ১৯৯ থেকে ২০২

[৩] সিমতুন নুজুমিল আওয়ালি: ৩/ ৩৩, ৩৪

ইতিহাসে উন্মত্তে মুসলিমা

চতুর্থ খণ্ড

ইসলামি বিশ্বে আলেম ও মাশায়েখগণ মুসতাইন বিল্লাহর রাজসিংহাসনে আরোহণে অত্যন্ত আনন্দিত ছিলেন। হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) একটি কাসিদার মাধ্যমে তাঁর অনুভূতি প্রকাশ করেছেন, যার কয়েকটি পঙক্তি নিম্নরূপ:

الْمُلْكُ فِينَا ثَابِتُ الْأَسَاسِ بِالْمُسْتَعِينِ الْعَادِلِ الْعَبَّاسِيِّ

ন্যায়পরায়ণ খলিফা মুসতাইন আব্বাসীর কারণে আমাদের রাজত্বের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়েছে।

رَجَعْتُ مَكَانَةَ آلِ عِمِّ الْمُصْطَفَى لِحِلِّهَا مِنْ بَعْدِ طُولِ تَنَاسٍ

দীর্ঘকাল বিস্মৃতির পর মোস্তফা (সা.)-এর চাচাতো ভাইদের মর্যাদা স্বস্থানে ফিরে এসেছে।

ذُو الْبَيْتِ طَافَ بِهِ الرِّجَالُ فَهَلْ يَرَى مِنْ قَاصِدٍ مُتَرَدِّدٍ فِي الْإِيَّاسِ

এই খলিফা এমন এক পরিবারের সদস্য, যাঁকে (প্রয়োজনীয়) মানুষ প্রদক্ষিণ করতে থাকে।

তুমি কি এমন কোনো ব্যক্তিকে দেখেছ যে প্রয়োজন পূরণের নিয়তে এখানে এসেছে অথচ নিরাশ হয়ে ফিরে গেছে? [১]

কিন্তু এই আনন্দ অস্থায়ী প্রমাণিত হলো। শেখ মাহমুদীর ষড়যন্ত্র বাড়তে থাকল। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছাল যে, ৮১৫ হিজরীর শাবান মাসে শেখ মাহমুদী খলিফাকে সরিয়ে ‘আল-মালিকুল মুয়াইয়্যাদ’ উপাধি নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন। [২]

আল-মালিকুল মুয়াইয়্যাদ শেখ মাহমুদী: (৮১৫ হি. থেকে ৮২৩ হি.)

শেখ মাহমুদী বারকুকের মাওয়ালিদের (মুক্তদাস) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। গের্টে বাতের ব্যথায় আক্রান্ত হওয়ার কারণে তিনি চলাফেরায় অক্ষম ছিলেন, কিন্তু নিজের বুদ্ধিমত্তা ও কৌশলগত শক্তির কারণে তিনি সবার ওপর প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। তিনি বেশ কয়েক বছর শাসন করেন।

সিরিয়ায় আমির নওরোজের সমর্থক উমরাগণ তাঁর বিরুদ্ধে কাতারবন্দী হন, কিন্তু শেখ মাহমুদী সিরিয়ায় গিয়ে তাঁদের সাথে একাধিক যুদ্ধ করেন এবং শেষ পর্যন্ত সবাইকে পরাস্ত করে দম নেন। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচার এবং মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। আট বছর পাঁচ মাস শাসন করার পর তিনি ৯ মহরম ৮২৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। [৩]

আল-মালিকুল মুজাফফর বিন মাহমুদী: (মহরম থেকে শাবান ৮২৪ হি.)

শেখ মাহমুদীর পর তাঁর দেড় বছর বয়সী পুত্রকে ‘আল-মালিকুল মুজাফফর’ উপাধিসহ প্রতীকী বাদশাহ হিসেবে মেনে নেওয়া হয়। আজ-জাহির বারকুকের একজন মুক্তদাস তাতার প্রধান প্রশাসক হিসেবে রাষ্ট্রীয় বিষয়াবলি পরিচালনা করতে থাকেন। এই শিশুটি মাত্র সাড়ে ছয় মাস নামমাত্র বাদশাহ ছিল। [৪]

আমির তাতার: (শাবান থেকে জিলহজ ৮২৪ হি.)

২৮ শাবান ৮২৪ হিজরীতে আমির তাতার আল-মালিকুল মুজাফফরকে ক্ষমতাচ্যুত করে নিজে রাজত্ব গ্রহণ করেন। তিন মাস পর ২৬ জিলহজ... [৫]

[১] তারিখুল খুলাফা লিস-সুয়ুতী, পৃ. ৩৫৩, ত. নিয়ার

[২] সিমতুন নুজুমিল আওয়ালী লিল-ইসামী আল-মাক্কী: ৩/৩৬, ত. ইলমিয়্যাহ

[৩] সিমতুন নুজুমিল আওয়ালী: ৩/৩৫৭; আল-মাওয়াযিজ ওয়াল ইতিবার লিল-মাকরিজী: ৩/২২৫

[৪] সিমতুন নুজুমিল আওয়ালী: ৩/৩৭৭; আল-মাওয়াযিজ ওয়াল ইতিবার লিল-মাকরিজী: ৩/২২৫

[৫] সিমতুন নুজুমিল আওয়ালী: ৩/৩৮৪

তিনি ক্রুসেডার গোষ্ঠী হসপিটালারদের একটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধকেন্দ্র রোডস দ্বীপে ৮৪৩ হিজরি, ৮৪৭ হিজরি এবং ৮৪৮ হিজরিতে (১৪৪০, ১৪৪৩ এবং ১৪৪৪ খ্রিস্টাব্দ) তিনটি আক্রমণ করেন এবং তাদের শক্তি চূর্ণ করে দেন। প্রথম আক্রমণটি ছিল শত্রুর শক্তি পরিমাপ করার জন্য। দ্বিতীয় আক্রমণটি সুসংগঠিত ছিল না এবং সফল হয়নি। তৃতীয় আক্রমণে চকমক আমির ইনাল আলাই-এর নেতৃত্বে একটি বিশাল বাহিনী পাঠান, যাতে অনেক স্বেচ্ছাসেবকও অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৬ রবিউল আউয়াল বাহিনী কায়রো থেকে রওনা হয় এবং আলেকজান্দ্রিয়া হয়ে সমুদ্রপথে রোডসের দিকে অগ্রসর হয়। দিময়্যাত থেকে আসা নৌবাহিনীও তাদের সাথে যোগ দেয়। এই উভয় বাহিনী ত্রিপোলিতে নোঙর ফেলে এবং সেখানে ছাউনি গেড়ে রোডস আক্রমণ করে।

ইসলামী বাহিনীর একটি অংশ স্থলপথে আমির ইনাল-এর নেতৃত্বে রোডসের দুর্গের খ্রিস্টানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, অন্যদিকে অপর অংশ আমির ইয়ালবুগার নেতৃত্বে নৌজাহাজে টহল দিতে থাকে যাতে ইউরোপীয় শাসকদের পক্ষ থেকে কোনো সাহায্য আসলে তা পথেই আটকে দেওয়া যায়। এই দূরদর্শিতা সফল প্রমাণিত হয়। কয়েক দিন পর একটি ইউরোপীয় নৌবহর সেখানে এসে পৌঁছায়। মুসলিম নৌবহর সেটিকে আর সামনে এগোতে দেয়নি এবং এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর পিছু হটতে বাধ্য করে।

ওদিকে রোডসের দুর্গে ক্রমাগত আক্রমণ চলতে থাকে। খ্রিস্টানরা এখানে জানমালের ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। অনেক মুসলমানও শহীদ হন। যাই হোক, কয়েক সপ্তাহের যুদ্ধের পরও এই দুর্গ জয় করা সম্ভব হয়নি। অবশেষে ইসলামী লস্কর ফিরে আসে এবং ১২ রজব কায়রো পৌঁছায়। [১]

চকমকের শাসন সফলভাবে চলছিল কিন্তু তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়ে পড়েন। অবশেষে ২৩ মহররম ৮৫৭ হিজরিতে তিনি তার ছেলের পক্ষে পদত্যাগ করেন। বারো দিন পর তিনি ইন্তেকাল করেন। [২]

ফখরুদ্দিন উসমান বিন চকমক: (৮৫৭ হিজরি)

চকমকের ছেলে উসমান যখন সিংহাসনে বসেন তখন তার বয়স বিশ বছরের কিছু কম ছিল। সেই সময় আমিররা আনুগত্য প্রকাশ করেছিল কিন্তু বারো দিন পর চকমকের মৃত্যুর সাথে সাথেই আমিররা বিদ্রোহ শুরু করে। অবশেষে উসমানকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয় এবং আমির ইনাল আলাই সিংহাসনে আরোহণ করেন। [৩]

আল-মালিকুল আশরাফ সাইফ উদ্দিন ইনাল আলাই: (৮৫৭ হিজরি থেকে ৮৬৫ হিজরি)

ইনাল আলাই বরকুকের একজন ক্রীতদাস ছিলেন যাকে তার ছেলে ফারাজ মুক্ত করে দিয়েছিলেন। তিনি দীর্ঘদেহী ছিলেন কিন্তু প্রাকৃতিকভাবেই তার দাড়ির চুল খুব কম ছিল। ৮ রবিউল আউয়াল ৮৫৭ হিজরিতে তিনি শাসনভার গ্রহণ করেন এবং ন্যায় ও ইনসাফের সাথে দেশ পরিচালনা করেন। তিনি আট বছর পর্যন্ত ভালোভাবে শাসন করেন। গুরুতর অসুস্থতার কারণে ১৪ জমাদিউল উলা ৮৬৫ হিজরিতে তিনি তার ছেলে আহমদের পক্ষে উত্তরাধিকারের ওসিয়ত করেন এবং পরের দিন ইন্তেকাল করেন। [৪]

[১] আন-নুজুমুজ জাহিরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহিরা: সন ৮৪৩ হিজরি, ৮৪৪ হিজরি, ৮৪৮ হিজরি।

[২] সিমতুনুজুমিল আওয়ালি: ৩/৫০৪।

[৩] সিমতুনুজুমিল আওয়ালি: ৩/৫১।

[৪] সিমতুনুজুমিল আওয়ালি: ৩/৫১, ৫২; আন-নুজুমুজ জাহিরা: ১৬/২১৮, ২১৯।

আহমদ বিন ইনাল: (৮৬৫ হিজরি)

আহমদ বিন ইনালের শাসনকাল ছিল মাত্র পাঁচ মাস। আমিররা বিদ্রোহ করে তাকে আলেকজান্দ্রিয়ার দুর্গে বন্দি করে। আমির খুশ কদম নাসিরি তার স্থলাভিষিক্ত হন। [১]

খুশ কদম নাসিরি: (৮৬৫ হিজরি থেকে ৮৭২ হিজরি)

খুশ কদম ছিলেন আল-মালিক আল-মুয়াইয়্যাদের মুক্ত করা গোলাম। তিনি প্রায় সাড়ে ছয় বছর শাসন করেন। তার শাসনামল ভালো বা মন্দের বিচারে বিশেষ কোনো গুরুত্ব বহন করে না। [২]

বিলবে আল-মুয়াইয়্যাদ: (৮৭২ হিজরি)

রবিউল আউয়াল ৮৭২ হিজরিতে তার মৃত্যুর পর বিলবে আল-মুয়াইয়্যাদ সিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু দুই মাস পর তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। [৩]

আল-মালিক আল-জহির তিমুরবুগা: (৮৭২ হিজরি)

এখন আল-মালিক আল-জহির তিমুরবুগাকে বাদশাহ করা হয়, যিনি ছিলেন একজন দক্ষ অশ্বারোহী, নিপুণ তীরন্দাজ এবং অতুলনীয় তীর নির্মাতা, কিন্তু তিনি ভালোভাবে শাসন করতে পারেননি। ৫৮ দিন পর আমিররা তাকেও সরিয়ে দেন। [৪] এরপর আমির খায়ের বেগ সিংহাসনে বসেন, কিন্তু এক রাত পরেই তাকে বরখাস্ত করা হয়। [৫]

আল-মালিক আল-আশরাফ কাইতবে: (৮৭২ হিজরি থেকে ৯০১ হিজরি)

কাইতবে ছিলেন আশরাফ বাসবের কেনা গোলাম, যিনি পরে চাকমাকের মালিকানায় আসেন এবং মুক্ত হন। তিনি ছিলেন একজন নেককার ও দ্বীনদার মানুষ। যৌবনের শুরুতে তিনি মালপত্র বহনের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। একবার রমজানের শেষ রাতগুলোতে তিনি তার এক মামলুক বন্ধুর সাথে উটের ওপর মালপত্র বোঝাই করছিলেন, তখন তার মনে হলো আজ হয়তো শবে কদর, কেন আমরা সবাই দোয়া করছি না? কাইতবে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! আমাকে মিশরের শাসক বানিয়ে দিন। তার বন্ধু আমীরি ও জায়গিরের জন্য দোয়া করলেন। উটচালকের কাছে জিজ্ঞেস করা হলো, তুমি কী দোয়া করবে? সে বলল: “আল্লাহ যেন ঈমানের সাথে মৃত্যু দেন।” পরবর্তীতে কাইতবে বাদশাহ হন এবং তার বন্ধু সরকারি আমির হন। কাইতবে বলতেন: “সেই উটচালক আমাদের দুজনের ওপর টেক্সা দিয়ে গেছে।”

সুলতান কাইতবের শাসনামল ছিল চেরকাসীয় মামলুকদের স্বর্ণযুগ। চারদিকে শান্তি-শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধি বিরাজ করছিল। জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য সুলতানের নাম সুপরিচিত। তিনি তার সাড়ে ২৯ বছরের দীর্ঘ শাসনকালে মাদ্রাসা, মসজিদ, লাইব্রেরি, খানকাহ এবং মুসাফিরখানা নির্মাণে ব্যস্ত ছিলেন। হারামাইন শরিফাইনের জন্য তার খিদমত স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি হারামাইন শরিফাইনের বাসিন্দাদের ওপর থেকে সমস্ত কর প্রত্যাহার করেন। মসজিদ-ই-খাইফকে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে পুনর্নির্মাণ করেন এবং এর ওপর একটি চমৎকার গম্বুজ তৈরি করেন। হাজিদের জন্য আরাফাতে সহজে পানি সরবরাহের স্থায়ী ব্যবস্থা করেন। [৬] মক্কা এবং...

[১] সিমত আল-নজুম আল-আওয়ালি লিল-ইসামী আল-মাক্বি: ৩/৫৩, ত. আল-ইলমিয়্যাহ; আল-মাওয়াইজ ওয়াল ইতিবার লিল-মাকরিজি: ৩/৩২৬

[২] সিমত আল-নজুম আল-আওয়ালি: ৩/৫৩; আল-মাওয়াইজ ওয়াল ইতিবার লিল-মাকরিজি: ৩/৩২৬

[৩] সিমত আল-নজুম আল-আওয়ালি: ৩/৫৩; আল-মাওয়াইজ ওয়াল ইতিবার লিল-মাকরিজি: ৩/৩২৬

[৪] আল-নজুম আল-জাহিরা ফি মুলুক মিসর ওয়াল কাহিরা: ৮৭২ হিজরি

[৫] সিমত আল-নজুম আল-আওয়ালি: ৩/৫৩

[৬] সিমত আল-নজুম আল-আওয়ালি: ৩/৫৩ থেকে ৬০

তারিখ উম্মতে মুসলিমা | চতুর্থ খণ্ড

মদিনায় নতুন মাদরাসা কায়েম করেন। ৮৮৬ হিজরিতে মসজিদে নববীতে অগ্নিকাণ্ডের কারণে মারাত্মক ক্ষতি হলে সুলতান কাইতবাই-এর নির্দেশে মসজিদটি নতুন করে নির্মাণ করা হয় এবং রওজা আতহারের ওপর অবস্থিত গম্বুজটিও নতুন নকশা অনুযায়ী আগের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর ও মজবুত আকারে তৈরি করা হয়। এটিই সেই ‘গম্বুজে খিজরা’ যা রিসালাতের দরবারের আশিকদের জন্য নূরের জ্যোতি। [১]

আল্লামা ইসামী মক্কী (রহ.) সুলতান কাইতবাই-এর প্রতি চমৎকার শ্রদ্ধা নিবেদন করে লেখেন:

“তিনি ছিলেন মহাকালের কণ্ঠহারের মধ্যম মণি। তিনি প্রজাদের হৃদয়ের সবচেয়ে কাছের, পরিস্থিতিতে সর্বোত্তম এবং দানে সর্বোচ্চ ছিলেন। বুদ্ধিমত্তায় শ্রেষ্ঠ, আভিজাত্যে পূর্ণতর, নেক কাজ ও জনকল্যাণমূলক কাজে সবার অগ্রগামী এবং নির্মাণ ও ওয়াকফ সংক্রান্ত কাজে সবার চেয়ে এগিয়ে ছিলেন। তিনি ছিলেন দীর্ঘতম সময়ের শাসক, ক্ষমতার দিক থেকে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী। তাঁর যুগে সালতানাত ছিল সেই কনের মতো যে বিয়ের পোশাক ও অলঙ্কারে সজ্জিত।” [২]

২৬ জিলকদ ৯০১ হিজরিতে কাইতবাই ইন্তেকাল করেন এবং তাঁর পুত্র মুহাম্মদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। [৩]

মুহাম্মদ আন-নাসির বিন কাইতবাই। প্রথমবার: (৯০১ হিজরি থেকে ৯০২ হিজরি)

মুহাম্মদ বিন কাইতবাই ‘আল-মালিক আন-নাসির’ উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন। মাত্র ছয় মাস অতিবাহিত হয়েছিল যখন মরহুম সুলতান কাইতবাই-এর একজন মামলুক কানসুহ ২৮ জমাদিউল উলা ৯০২ হিজরিতে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। [৪]

কানসুহ আল-أشرفী (আল-আশরাফী): (৯০২ হিজরি)

কানসুহ ‘আল-মালিক আল-আশরাফ’ উপাধি নিয়ে শাসক হন কিন্তু এগারো দিন পর আমিরগণ তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। তিনি পালিয়ে ফিলিস্তিনে চলে যান এবং সেখানেই নিখোঁজ হন। [৫]

মুহাম্মদ বিন কাইতবাই। দ্বিতীয়বার: (৯০২ হিজরি থেকে ৯০৪ হিজরি)

জমাদিউল আখিরা ৯০২ হিজরিতে মুহাম্মদ বিন কাইতবাইকে পুনরায় সিংহাসনে বসানো হয় কিন্তু শীঘ্রই তাঁর অপকর্মগুলো সামনে আসতে শুরু করে। তিনি খেলাধুলা, জাদুকরী প্রদর্শনী, লম্পট সঙ্গীদের মজলিস, জঘন্যতম জুলুম এবং বিভিন্ন ধরনের নির্লজ্জতায় অভ্যস্ত ছিলেন। [৬]

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত শাসন ব্যবস্থা বারবার এই দৃশ্য দেখিয়েছে যে, দেশের সর্বোচ্চ পদ ‘যোগ্যতা’ (merit) অনুযায়ী দেওয়া হয়নি, যার ফলে একজন শ্রেষ্ঠ শাসকের পর নিকৃষ্টতম ব্যক্তি শাসনভার গ্রহণ করেছে এবং অত্যন্ত স্থিতিশীল সালতানাত ধ্বংস হয়ে গেছে। সুলতান আশরাফ কাইতবাই-এর মধ্যে যত গুণ ছিল, মুহাম্মদ আন-নাসির ততটাই অযোগ্য ও জালেম ছিলেন। তাঁর কর্মকাণ্ড সালতানাতের আমিরদের উত্তেজিত করতে থাকে। [৭]

[১] মুফাকাহাতুল খিলান ফি হাওয়াদিসিজ জামান লি ইবনে তুলুন আল-হানাফি (মৃ. ৯৫৩ হি.): ১/ ৩১, ত. আল-ইলমিয়াহ

[২] সিমতুন নুজুমিল আওয়ালি: ৩/ ৫৬; ওয়াফাউল ওয়াফা বি আখবারি দারিল মুস্তফা লিস সামহুদি: ২/ ১৫৯, ত. আল-ইলমিয়াহ

[৩] সিমতুন নুজুমিল আওয়ালি: ৩/ ৫৯

[৪] প্রাগুক্ত (পূর্বের রেফারেন্স অনুযায়ী)

[৫] শাজারাতুজ জাহাব: ১০/ ৩৩, ত. দার ইবনে কাসির

[৬] শাজারাতুজ জাহাব: ১০/ ৩৩, ত. দার ইবনে কাসির

[৭] শাজারাতুজ জাহাব: ১০/ ৩৩; সিমতুন নুজুমিল আওয়ালি: ৩/ ৫৯

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

তার মামা কানসুহ ছিলেন একজন অশিক্ষিত গ্রাম্য লোক, নিজের মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা জানতেন না। তিনি অল্প কিছুকাল আগে কায়রোতে এসেছিলেন এবং সেনাবাহিনীতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ লাভ করেছিলেন। তিনি তার ভাগ্নের কর্মকাণ্ডে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি তুমান বাই নামক এক কর্মকর্তাকে ভাগ্নেকে হত্যার দায়িত্ব দেন। ১৫ রবিউল আউয়াল ৯০৪ হিজরিতে যখন বাদশাহ শহরের বাইরে ভ্রমণে ও বিনোদনে ব্যস্ত ছিলেন, তখন দশজন সৈন্য পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাকে হত্যা করে তার লাশ কায়রোতে পৌঁছে দেয়। [১]

কানসুহ আল-জাহিরি আবু সাঈদ: (৯০৪ হিজরি হতে ৯০৫ হিজরি)

কানসুহ নিজের ভাগ্নেকে হত্যা করে নিজে বাদশাহ হন, কিন্তু অশিক্ষিত হওয়ার কারণে তার পক্ষে শাসনকার্য পরিচালনা করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। [২] জান বালাত নামক এক আমির তার প্রিয়পাত্র ছিলেন। কানসুহ নিজের বোনকে তার সাথে বিয়ে দিয়ে তার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কও তৈরি করেছিলেন। এটি দেখে আমির তুমান বাই তাদের উভয়ের মধ্যে ঘৃণা ছড়াতে শুরু করেন। তার ষড়যন্ত্র সফল হয় এবং জান বালাত কানসুহ আল-জাহিরির ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে ৩ জিলকদ ৯০৫ হিজরিতে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। কানসুহ আল-জাহিরি বাধ্য হয়ে সিংহাসন ত্যাগ করেন। তার শাসনকাল ছিল এক বছর সাত মাস। [৩]

আল-মালিকুল আশরাফ জান বালাত: (৯০৫ হিজরি হতে ৯০৬ হিজরি)

তিনি কাইতবে-র প্রিয় দাসদের মধ্যে একজন ছিলেন। কাইতবে তাকে কুরআন মাজিদ এবং গণিত শাস্ত্রের শিক্ষা দেওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা করেছিলেন। তার শাসনের সূচনা ভালো প্রত্যাশার সাথে হয়েছিল। তিনি কায়রোর বাইরে একটি মাদ্রাসা নির্মাণ করেছিলেন যা “মাদ্রাসা জান বালাতিয়া” নামে পরিচিত হয়। জান বালাতের শাসনের মাত্র ছয় মাস অতিবাহিত হয়েছিল যখন তুমান বাই বিদ্রোহ করে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। তাকে আলেকজান্দ্রিয়ায় বন্দি করে রাখা হয় এবং কয়েকদিন পর তাকে হত্যা করা হয়। প্রথমে তাকে তার মনিব কাইতবে-র পাশে দাফন করা হয়েছিল, কিন্তু পরে কায়রোর বাইরে দাফন করা হয়। পুনরায় দাফনের জন্য যখন তাকে বের করা হয়, তখন তার দেহ সম্পূর্ণ অক্ষত ও সহিহ-সালামত ছিল। [৪]

[১] শাজারাতুজ জাহাব: ১০/৩৪, ত. দার ইবনে কাসির; মুফাকাহাতুল খিলান ফি হাওয়াদিসিজ জামান লিশামসুদ্দিন আস-সালেহি (মু. ৯৫৩ হি.), পৃ. ১৬৭, ত. ইলমিয়্যাহ।

[২] সিমতুন নুজুমিল আওয়ালি: ৪/৬০, ত. ইলমিয়্যাহ।

[৩] শাজারাতুজ জাহাব: ১০/৩১।

[৪] শাজারাতুজ জাহাব: ১০/৪১।

নোট: এখন আমরা ইতিহাসের সফর করতে করতে দশম হিজরি শতাব্দীতে প্রবেশ করেছি যা ইসলামি ইতিহাস রচনার পতনের যুগ। এখানে আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, আল-কামিল ফিত তারিখ, তারিখুল ইসলাম জাহাবি বা তারিখ ইবনে খালদুন-এর মতো কোনো ব্যাপক গ্রন্থ আমাদের কাছে নেই। যদি আসমির ‘সিমতুন নুজুমিল আওয়ালি’, ইবনে তুলুন হানাফির ‘মুফাকাহাতুল খিলান’ এবং ইবনে ইমাদের ‘শাজারাতুজ জাহাব’ না থাকত, তবে সম্ভবত এই যুগের ওপর লেখা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ত। উৎসের স্বল্পতার কারণে এই শতাব্দীগুলোর ইতিহাস অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে, এমনকি এই যুগের শাসকদের সিংহাসন আরোহণ এবং ক্ষমতাচ্যুতির সঠিক তারিখ জানাও কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে জান বালাতের ক্ষমতাচ্যুতির তারিখ এখন পর্যন্ত কোথাও পাওয়া যায়নি। তবে আসমির মতে, তিনি আল-আশরাফের পর মাত্র একদিন শাসনকর্তা ছিলেন। (সিমতুন নুজুমিল আওয়ালি: ৪/৬১)। অন্যদিকে ইবনে ইমাদের মতে, তুমান বাইয়ের পর আসা শাসক কানসুহ ঘুরি-র সিংহাসন আরোহণ সোমবার ১ শাওয়াল ৯০৬ হিজরিতে হয়েছিল। (শাজারাতুজ জাহাব: ১০/৪১)। এ থেকে বোঝা যায় যে, জান বালাতের শাসনকাল ৫ জিলকদ ৯০৫ হিজরি থেকে রমজান ৯০৬ হিজরির মাঝামাঝি পর্যন্ত ছিল। অর্থাৎ তার মেয়াদ দশ মাসের কিছু বেশি ছিল। এই হিসেবে আল্লামা আসমির বক্তব্য (فاقام نصف سنة وتسعة عشر) এ স্পষ্ট অসঙ্গতি দেখা যায়। একইভাবে শাজারাত-এর বক্তব্য (في اوائل سنة خمس وتسعمائة... وخلع بعد ستة اشهر) ও অসঙ্গতিপূর্ণ মনে হয়, কারণ যদি জান বালাতের শাসনকাল জিলকদ ৯০৫ হিজরি থেকে রমজান ৯০৬ হিজরির শেষ পর্যন্ত হয়, তবে তা ছয় মাস বা সাড়ে নয় মাস নয় বরং প্রায় দশ মাস হয়।

তার মামা কানসুহ ছিলেন একজন অশিক্ষিত গ্রাম্য লোক, যিনি নিজের মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা জানতেন না। তিনি কিছুকাল আগে কায়রোতে এসেছিলেন এবং সেনাবাহিনীতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তিনি তার ভাগ্নের কর্মকাণ্ডে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি একজন অফিসার তুমান বায়েকে ভাগ্নেকে হত্যার দায়িত্ব অর্পণ করেন। ১৫ রবিউল আউয়াল ৯০৪ হিজরিতে বাদশাহ যখন প্রমোদ ভ্রমণের জন্য শহরের বাইরে ছিলেন, তখন নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী দশজন সৈন্য তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাকে হত্যা করে তার লাশ কায়রোতে পৌঁছে দেয়। [১]

কানসুহ আল-জাহিরি আবু সাঈদ: (৯০৪ হিজরি হতে ৯০৫ হিজরি)

কানসুহ নিজের ভাগ্নেকে হত্যা করিয়ে নিজে বাদশাহ হন, কিন্তু অশিক্ষিত হওয়ার কারণে তার পক্ষে শাসনকার্য পরিচালনা করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। [২] জান বালাত নামক এক আমির তার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। কানসুহ তার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনের জন্য নিজের বোনকে তার সাথে বিবাহ দেন। এটি দেখে আমির তুমান বায়ে তাদের উভয়ের মধ্যে বিদ্বেষ ছড়াতে শুরু করেন। তার ষড়যন্ত্র সফল হয় এবং জান বালাত কানসুহ আল-জাহিরির ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে ২ জিলকদ ৯০৫ হিজরিতে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। কানসুহ আল-জাহিরি সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হন। তার শাসনকাল ছিল এক বছর সাত মাস। [৩]

আল-মালিকুল আশরাফ জান বালাত: (৯০৫ হিজরি হতে ৯০৬ হিজরি)

তিনি কাইতবে-র প্রিয় দাসদের মধ্যে একজন ছিলেন। কাইতবে তাকে কুরআন মাজিদ ও গণিত শিক্ষা দেওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা করেছিলেন। তার শাসনের সূচনা ভালো প্রত্যাশার সাথেই হয়েছিল। তিনি কায়রোর বাইরে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেছিলেন যা “মাদরাসা জান বালাতিয়্যাহ” নামে পরিচিত হয়। জান বালাতের শাসনের মাত্র ছয় মাস অতিবাহিত হয়েছিল যখন তুমান বায়ে বিদ্রোহ করে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। তাকে আলেকজান্দ্রিয়ায় বন্দি করা হয় এবং কয়েকদিন পর হত্যা করা হয়। প্রথমে তাকে কায়রোতে তার মনিব কাইতবে-র পাশে দাফন করা হয়েছিল, কিন্তু পরে কায়রোর বাইরে দাফন করা হয়। পুনরায় দাফনের জন্য যখন লাশ বের করা হয়, তখন তা সম্পূর্ণ অক্ষত ও সহিহ-সালামত ছিল। [৪]

[১] শাজারাতুজ জাহাব: ১০/৪২, ত. দার ইবনে কাসির; মুফাকাহাতুল খিল্লান ফি হাওয়াদিসিজ জামান লিশ শামসুদ্দিন আস-সালিহি (মৃ. ৯৫৩ হি.), পৃ. ১৬৭, ত. ইলমিয়্যাহ; সিমতুন নুজুমিল আওয়ালি: ৪/৬০, ত. ইলমিয়্যাহ।

[২] সিমতুন নুজুমিল আওয়ালি: ৪/৬০।

[৩] শাজারাতুজ জাহাব: ১০/৪১।

[৪] শাজারাতুজ জাহাব: ১০/৪১।

নোট: এখন আমরা ইতিহাসের সফরে দশম হিজরি শতাব্দীতে প্রবেশ করেছি, যা ইসলামি ইতিহাস রচনার পতনের যুগ। আল-জাহাবির ‘তারিখুল ইসলাম’ বা ইবনে খালদুনের মতো ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস গ্রন্থ আমাদের কাছে সহজলভ্য নয়। যদি ইসামির ‘সিমতুন নুজুমিল আওয়ালি’, ইবনে তুলুন হানাবির ‘মুফাকাহাতুল খিল্লান’ এবং ইবনে ইমাদের ‘শাজারাতুজ জাহাব’ না থাকত, তবে সম্ভবত এই শতাব্দীগুলোর ইতিহাস লেখা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ত। তথ্যসূত্র এতই কম যে, এই যুগের অনেক শাসকের সিংহাসন আরোহণ ও ক্ষমতাচ্যুতির সঠিক তারিখ জানাও কঠিন হয়ে পড়ে। যেমন জান বালাতের ক্ষমতাচ্যুতির তারিখও এখন পর্যন্ত কোথাও পাওয়া যায়নি। তবে ইসামির বর্ণনা অনুযায়ী তার পরবর্তী শাসক তুমান বায়ে মাত্র একদিন শাসন করেছিলেন (সিমতুন নুজুমিল আওয়ালি: ৪/৬১)। অন্যদিকে ইবনে ইমাদের বর্ণনা অনুযায়ী তুমান বায়ের পরবর্তী শাসক কানসুহ আল-গাউরি সোমবার ১ শাওয়াল ৯০৬ হিজরিতে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন (শাজারাতুজ জাহাব: ১০/৪১)। এ থেকে জানা যায় যে, জান বালাতের শাসনকাল ২ জিলকদ ৯০৫ হিজরি থেকে ৯০৬ হিজরির রমজানের শেষ পর্যন্ত ছিল। অর্থাৎ তার শাসনকাল দশ মাসের কিছু বেশি ছিল। এই দিক থেকে আল্লামা ইসামির বক্তব্য (فالقام نصف سنة وتسعة عشر يوما) ও অসংগতিপূর্ণ মনে হয়, কারণ যদি জান বালাতের শাসনকাল ২ জিলকদ ৯০৫ হিজরি থেকে ৯০৬ হিজরির রমজানের শেষ পর্যন্ত হয়, তবে তা ছয় মাস বা আধা বছর নয় বরং প্রায় দশ মাস হবে।

তারিখ মিল্লাত

যোগ্য লোকের অভাবের কারণে মামলুকরা এখন কোনো যোগ্য শাসক খুঁজে পাচ্ছিল না। মামলুক আমিররা সংখ্যায় এত বেশি ছিল যে তাদের মতামত একজনের ওপর একমত হতো না। কিছু আমির একজনকে পছন্দ করে সিংহাসনে বসাতেন, কিন্তু কয়েক দিন পরেই অন্য আমিররা তাকে অযোগ্য মনে করে সরিয়ে দিতেন।

আল-মালিকুল আদিল তুমান বাই আউয়াল: (এক দিন)

‘আল-মালিকুল আদিল’ উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসা এই ব্যক্তিটি ছিল অত্যন্ত ফিতনাবাজ। সে নিজের ক্ষমতা লাভের জন্য দুটি সরকারের পতন ঘটিয়েছিল, কিন্তু যখন সিংহাসনে আরোহণ করল, তখন সে মাত্র এক দিনের স্বাদ লাভ করতে পারল। পরের দিন আমিররা তাকে হত্যা করে ফেলল। প্রকৃতপক্ষে মামলুক রাষ্ট্র পতনের শিকার হয়ে গিয়েছিল এবং পৃথিবীর মানচিত্র থেকে তাদের মুছে যাওয়ার সময় চলে এসেছিল।

কানসুহ বিন আব্দুল্লাহ ঘুরি: (৯০৬ হিজরি থেকে ৯২২ হিজরি)

কানসুহ বিন আব্দুল্লাহ ছিলেন একজন বৃদ্ধ, দুর্বল এবং নিঃস্ব সামরিক কর্মকর্তা। বয়স ছিল প্রায় ৭৫ বছর। মামলুকরা এটাই দেখে তাকে সিংহাসনে বসানোর চেষ্টা করেছিল যে তাকে সরানো সহজ হবে। কিন্তু তাকে যতটা আনাড়ি মনে হচ্ছিল, তিনি ততটাই বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি আমিরদের বললেন: ‘আমি এই শর্তে এই পদ গ্রহণ করব যে তোমরা আমাকে হত্যা করবে না। যখনই আমাকে সরাতে চাইবে, আমাকে জানিয়ে দিও। আমি তোমাদের কথার সাথে একমত হব এবং চুপচাপ কোথাও চলে যাব।’ আমিররা তার সাথে এই অঙ্গীকার করল এবং ২ শাওয়াল ৯০৬ হিজরিতে কানসুহ সিংহাসনে আরোহণ করলেন। তার শাসনের সূচনা ভালো প্রত্যাশার সাথে হয়েছিল। তার মজলিসগুলোতে প্রায়ই তাফসির, হাদিস, ফিকহ এবং ইতিহাসের ওপর আলোচনা হতো।

মনে হচ্ছিল যে এত দুর্বল আমির মাত্র কয়েক দিনের মেহমান হবেন, কিন্তু প্রত্যাশার সম্পূর্ণ উল্টো তিনি শাসনভার সামলে নিলেন এবং আমিরদের সমুদ্র রাখলেন। তার রাজনীতির ধরন এমন ছিল যে তিনি নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করতেন না, আবার অধীনস্থদের ওপর কঠোরতাও করতেন না। জনগণ এবং সেনাবাহিনী যারা বারবার বাদশাহ পরিবর্তনের কারণে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, তারা তার আগমনে খুশি ছিল। তিনি নির্মাণ ও জনকল্যাণমূলক কাজের শৌখিন ছিলেন। তিনি মিসরের হাজিদের জন্য খলিজে আকাবার পথ খুলে দিয়ে তাদের সফর সংক্ষিপ্ত করে দিয়েছিলেন। মক্কা মুয়াজ্জামায় তার নির্মাণাধীন স্মৃতিচিহ্নগুলো দীর্ঘকাল ধরে সদকায়ে জারিয়া হিসেবে বিদ্যমান ছিল। তিনি একটি জামে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন এবং সাথে নিজের জন্য একটি মাকবারাও নির্মাণ করেছিলেন, কিন্তু তার কপালে সেখানে দাফন হওয়া লেখা ছিল না।

কানসুহর শুরুর বেশ কয়েক বছর এভাবেই শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে অতিবাহিত হলো, কিন্তু এরপর একটি ফিতনা পরিস্থিতিকে অবনতির দিকে ঠেলে দিল। শুরুতে কানসুহর বিরোধী আমিরদের পক্ষ থেকে এটি শুরু হয়েছিল, কিন্তু পরে কানসুহ নিজেও পুরোপুরি দোষী হয়ে পড়লেন। ঘটনাটি ছিল এই যে, একবার কিছু আমির যারা শাসনে রদবদল করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল, তারা কানসুহকে জোরপূর্বক পদচ্যুত করার ষড়যন্ত্র করল। কানসুহ খবর পেয়ে গেলেন। তিনি সমস্ত আমিরকে একত্রিত করলেন এবং তাদের মাঝে মাটির ওপর বসে পড়লেন। অথচ নিয়ম ছিল যে...

[১] সিমতুন নুজুমিল আউয়ালি: ৪/৬১

[২] সিমতুন নুজুমিল আউয়ালি: ৪/৬১

[৩] সিমতুন নুজুমিল আউয়ালি: ৪/৬১, ৬২

[৪] শাজারাতুজ জাহাব ফি আখবারি মান জাহাব: ১০/৩১, তবা দার ইবনে কাসির

[৫] দ্রষ্টব্য: মাজালিসুস সুলতানিল ঘুরি লিদ-দুকতুর আব্দুল ওয়াহাব আজ্জাম, তবা মাকতাবাতুস সাকাফাতুদ দিনিয়াহ, ১৩৩১ হিজরি

বাদশাহর উপস্থিতিতে আমিররা দাঁড়িয়ে থাকতেন। কানসুহ-র এই ভঙ্গিতে সবাই বিস্মিত হলেন।

কানসুহ তাদের বললেন: “আমি আপনাদের সবাইকে একটি প্রশ্ন করি। কিছু লোক একজন ব্যক্তির কাছে গেল এবং তাকে দিরহামের একটি সিলমোহরযুক্ত থলি আমানত হিসেবে সাঁপে দেওয়ার চেষ্টা করল। সেই ব্যক্তি বলল যে, আমি এই আমানত একটি শর্তে রাখব, তা হলো এটি ফেরত নেওয়ার দায়িত্ব আপনাদের। যখন আপনারা ফেরত চাইবেন, আমি কোনো ওজর-আপত্তি বা ঝগড়া ছাড়াই তা দিয়ে দেব। তারা এতে রাজি হলো। কিছুকাল পর তারা তার কাছে এসে বলল যে, আমরা এই আমানত আপনার সাথে লড়াই-ঝগড়া করে নিতে চাই। সেই ব্যক্তি বলল যে, এই নিন আপনাদের আমানত, এটি ঝগড়া ও লড়াই ছাড়াই নিয়ে নিন। কিন্তু তারা বলল যে, আমরা লড়াই-ঝগড়া করেই নেব। এখন বলুন তো, এই দুই পক্ষের মধ্যে কে সঠিক আর কে ভুল?”

আমিররা কানসুহ-র ইঙ্গিত বুঝতে পারলেন। তারা তাদের ভুলের জন্য ক্ষমা চাইলেন।

কানসুহ বললেন: “আমি তোমাদের সাথে এই জন্যই বসেছি যাতে তোমরা জানতে পারো যে আমি তোমাদেরই একজন। আমি কোনো বিষয়েই শ্রেষ্ঠ নই। এই সালতানাত তোমাদের মধ্যে যে চায় আমি তার হাতে সাঁপে দিচ্ছি। আমি বিন্দুমাত্র ঝগড়া করব না। আমি তো কেবল একজন সৈনিক।”

এতে সব আমির তার হাত চুম্বন করলেন, আনুগত্যের অঙ্গীকার করলেন এবং অনুরোধ করলেন যেন তিনি বাদশাহ হিসেবে বহাল থাকেন।

যদি বিষয়টি এখানেই শেষ হয়ে যেত, তবে ইতিহাসে এটি একজন বাদশাহর মহানুভবতা ও উত্তম কৌশলের এক চমৎকার উদাহরণ হয়ে থাকত। কিন্তু এরপর কানসুহ যা করলেন, তা এই সুন্দর কাহিনীকে কলঙ্কিত করে দেয়। কানসুহ আমিরদের সামনে এমন ভাব দেখালেন যে তিনি তাদের ওপর মোটেও অসন্তুষ্ট নন, কিন্তু ভেতর থেকে তিনি তাদের ওপর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ছিলেন। তিনি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত সকল আমিরকে কালো তালিকায় (ব্ল্যাক লিস্ট) রাখলেন। আমিররা এই ভেবে নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছিলেন যে বাদশাহ ও আমাদের মধ্যে আর কোনো মনোমালিন্য নেই, কিন্তু বাদশাহ একটি পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন। তিনি কিছুকাল পর গোপন কৌশলের মাধ্যমে একে একে কালো তালিকাভুক্ত আমিরদের শেষ করতে শুরু করলেন। কখনো তিনি দুই আমিরের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করে তাদের আপসে লড়াই করিয়ে দিতেন, কখনো কাউকে খাবারে বিষ দিয়ে মেরে ফেলতেন। এভাবে তিনি অল্প সময়ের মধ্যে মামলুকদের প্রথম সারির সকল আমির থেকে মুক্তি লাভ করলেন।

এরপর তিনি বাইরে থেকে নতুন গোলাম আনিয়ে তাদের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসিয়ে শাসনের ওপর চাপিয়ে দিলেন। এই অনভিজ্ঞ নব্য-ধনীরা জনগণের ওপর নিয়ন্ত্রণ পেয়ে নিজেরা অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ল এবং মানুষের ওপর জুলুম করতে শুরু করল। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, যার পোশাক, সওয়ারি বা ঘরবাড়ি থেকে সচ্ছলতার ছাপ পাওয়া যেত, তাকে সরকারের কাছে ঋণ দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হতো। এভাবে তার অনেক সম্পদ হাতিয়ে নেওয়া হতো। কোনো ধনী ব্যক্তির মৃত্যু হলে তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সম্পদ বন্টনের আগেই সরকার তা নিজের হেফাজতে নিয়ে নিত।

কানসুহ এসব দেখেও দেখেও না দেখার ভান করে রইলেন, কারণ তার জন্য এটাই যথেষ্ট ছিল যে এই আমিররা তার সাথে গাদ্দারি করবে না এবং তার গদি মজবুত থাকবে। এভাবে কানসুহ অত্যন্ত দাপটের সাথে ষোলো বছর রাজত্ব করেন। [১]

[১] সিমতুন নুজুমিল আউয়ালি: ৪/ ৬১ থেকে ৬৩।

কিন্তু এই কৃত্রিম স্থিতিশীলতা সার্কাসীয় রাষ্ট্রকে অভ্যন্তরীণভাবে সম্পূর্ণ ফোকলা করে দিয়েছিল। কানসুহ দ্বিতীয় যে বড় ভুলটি করেছিলেন তা হলো, নিজের শাসন টিকিয়ে রাখার জন্য ইরানের বাদশাহ শাহ ইসমাইল সাফাভির সাথে বন্ধুত্ব করা, যিনি ছিলেন আহলে সুন্নাতের ঘোর বিরোধী এবং এশিয়া মাইনরে উদীয়মান উসমানীয় রাষ্ট্রের চরম শত্রু। এভাবে মিসর ইরানের মিত্র হয়ে উসমানীয় রাষ্ট্রের মুখোমুখি দাঁড়ায়। উসমানীয় রাষ্ট্রের প্রধান সুলতান সেলিম আউয়াল কানসুহকে সতর্ক করেছিলেন যেন তিনি ইসমাইল সাফাভির সাথে জোট হিন্ন করেন, কারণ এটি উসমানীয় রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ ছিল। কিন্তু কানসুহ তা মানেননি। অবশেষে সেলিম আউয়ালের বাহিনী এশিয়া মাইনর থেকে সিরিয়ার দিকে রওনা হয়। এদিকে কানসুহও এক বিশাল বাহিনী নিয়ে কায়রো থেকে সিরিয়া সীমান্তের দিকে অগ্রসর হন। মারজ দাবিক নামক স্থানে উভয় বাহিনীর মধ্যে এক ভয়াবহ যুদ্ধ হয়, যাতে তুর্কিরা বিজয়ী হয় এবং সার্কাসীয়রা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। কানসুহ নিহত হন এবং তার বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এই ঘটনাটি ২৫ রজব ৯২২ হিজরির। কানসুহর বয়স ছিল ৮০ বছর। [১]

তুমান বাই সানি: (৯২২ হি. থেকে ৯২৩ হি.)

কানসুহর পর কায়রোর সিংহাসনে জনৈক আমির তুমান বাইকে বসানো হয়। সেলিম আউয়াল তাকে আনুগত্য স্বীকার করার প্রস্তাব দেন, কিন্তু তিনি তা মানেননি। অবশেষে তুর্কি বাহিনী অগ্রসর হয়। প্রথমে সিরিয়ায় উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হয়। মিসরীয় বাহিনী পরাজিত হয়ে পিছু হটে। তুর্কি বাহিনী তাদের পিছু ধাওয়া করে কায়রো পৌঁছে যায়। মহররম ৯২৩ হিজরিতে মিসরীয় বাহিনীর প্রতিরোধের ক্ষমতা শেষ হয়ে যায় এবং তুর্কি বাহিনী শহরে প্রবেশ করে। তুমান বাই গ্রেপ্তার হন। ২১ রবিউল আউয়াল ৯২৩ হিজরিতে তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়। এভাবে সার্কাসীয়দের শাসনের অবসান ঘটে এবং সেই সাথে ১৮৩ বছরের শাসনকাল শেষ হয়। [২]

মملوك যুগের ওপর একটি পর্যালোচনা:

১৮৮০রা মিসর ও সিরিয়ার শাসনভার এমন এক পরিস্থিতিতে গ্রহণ করেছিল যখন তাদের পূর্বে তাতারীদের ফিতনা সমস্ত দেশকে তহনছ করে দিয়েছিল এবং ভূমধ্যসাগর থেকে ইউরোপীয় শক্তিগুলো ক্রমাগত ইসলামি বিশ্বের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছিল। ১৮৮০রা এই উভয় শক্তিকে পরাজিত করে দেখিয়েছিল এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মিষ্টিতে ইসলামিয়াকে একটি বিজয়ী শক্তি হিসেবে টিকিয়ে রেখেছিল।

১৮৮০দের উভয় গোষ্ঠী: বাহরিয়া এবং সার্কাসীয়দের মধ্যে মহান সব শাসক অতিবাহিত হয়েছেন, যাদের কীর্তি আজও ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। হারমাইন শরিফাইনের জন্য তাদের খিদমত পূর্ববর্তী সকল মুসলিম শাসকের তুলনায় অনন্য হিসেবে প্রতীয়মান হয়।

১৮৮০দের আসল শক্তি ছিল তাদের ইসলামি আত্মমর্যাদাবোধ এবং বংশানুক্রমিক শাসন পদ্ধতির পরিবর্তে ‘মেরিট’ বা যোগ্যতার ভিত্তিতে শাসকদের নিয়োগ ও অপসারণ। কিন্তু প্রথমে বাহরিয়া ১৮৮০রা এই নীতিগুলো থেকে সরে আসে এবং পতনের শিকার হয়। এরপর সার্কাসীয়রা তাদের স্থলাভিষিক্ত হয় এবং সঠিক নীতিগুলো মেনে চলার চেষ্টা করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারাও স্থবিরতার শিকার হয়ে একটি ব্যর্থ ব্যবস্থার ধারাবাহিকতায় পরিণত হয়। ফলে ঐশী বিধান তাদের নেতৃত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে এই দায়িত্ব অন্য জাতির হাতে সঁপে দেয়।

[১] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানিয়াহ, ফারিদ বেগ, পৃ. ১৯২, তাবা দারুন নাফায়েস বৈরুত।

[২] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানিয়াহ, পৃ. ১৯৩ থেকে ১৯৫।

তারিখ উম্মত-এ-মুসলিমা

মামলুক চেরকাসীয় - ১৩৯ বছরের যুগ

৭৮৪ হি. থেকে ৯২৩ হি. ১৩৮২ খ্রি. থেকে ১৫১৭ খ্রি.

নম্বর শাসক শাসনকাল পরিণতি বিশেষ কথা

১ আল-জাহির বারকুক - সাইফুদ্দীন রমজান ৭৮৪ হি. থেকে শাওয়াল ৮০১ হি. (১৩৮২ খ্রি. থেকে ১৩৯৯ খ্রি.) ইন্তেকাল চেরকাসীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা

২ ফারাজ বিন বারকুক আন-নাসির, প্রথমবার শাওয়াল ৮০১ হি. থেকে রবিউল আউয়াল ৮০৮ হি. (১৩৯৯ খ্রি. থেকে ১৪০৫ খ্রি.) স্বেচ্ছায় অপসারিত ছয় বছর পাঁচ মাস শাসন করেছেন

৩ আল-মালিক আল-মানসুর আব্দুল আজিজ বিন বারকুক রবিউল আউয়াল থেকে জমাদিউল আখিরা ৮০৮ হি. - সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর ১৪০৫ খ্রি. অপসারিত তিন মাস শাসন করেছেন

.

ফারাজ বিন বারকুক আন-নাসির, দ্বিতীয়বার জমাদিউল আখিরা ৮০৮ হি. থেকে সফর ৮১৫ হি. (ডিসেম্বর ১৪০৫ খ্রি. থেকে জুন ১৪১২ খ্রি.) হত্যা

.

.

খলিফা মুসতাইন বিল্লাহ সফর থেকে শাবান ৮১৫ হি. (জুন থেকে ডিসেম্বর ১৪১২ খ্রি.) অপসারিত চেরকাসীয় শাসন সাময়িকভাবে ছয় মাস স্থগিত ছিল

৪ শায়খ মাহমুদী, আবুল নাসর আল-মুয়াইয়্যাদ শাওয়াল ৮১৫ হি. থেকে মহররম ৮২৪ হি. (১৪১২ খ্রি. থেকে ১৪২১ খ্রি.) ইন্তেকাল চেরকাসীয় শাসন পুনরায় শুরু - খলিফা ক্ষমতাহীন

৫ আহমদ বিন শায়খ মাহমুদী - আল-মুজাফফর মহররম থেকে শাবান ৮২৪ হি. (ফেব্রুয়ারি থেকে আগস্ট ১৪২১ খ্রি.) অপসারিত সাত মাস নামমাত্র শাসন

৬ আল-জাহির তাতার শাবান থেকে জিলহজ ৮২৪ হি. (আগস্ট থেকে ডিসেম্বর ১৪২১ খ্রি.) ইন্তেকাল চার মাস নামমাত্র শাসন

৭ মুহাম্মদ বিন তাতার আস-সালিহ জিলহজ ৮২৪ হি. থেকে রবিউল আউয়াল ৮২৫ হি. (ডিসেম্বর ১৪২১ খ্রি. থেকে মার্চ ১৪২২ খ্রি.) অপসারিত তিন মাস শাসন করেছেন

তারীখে মিলাতে ইসলামিয়া

খণ্ড চতুর্থ

ক্রমিক নাম শাসনকাল সমাপ্তি মন্তব্য

৮ বাসর্বে আশরাফ সাইফ উদ্দিন রবিউল আউয়াল ৮২৫ হিজরি থেকে জিলহজ ৮৪১ হিজরি (মার্চ ১৪২২ খ্রি. থেকে জুন ১৪৩৮ খ্রি.) মৃত্যু ১৬ বছর ৮ মাস শাসন করেছেন। দুর্বল সালতানাতকে শক্তিশালী করেছেন। সাইপ্রাসের ওপর তিনটি আক্রমণ করেছেন।

৯ ইউসুফ বিন বাসর্বে আল-আজিজ জিলহজ ৮৪১ হিজরি থেকে রবিউল আউয়াল ৮৪২ হিজরি (জুন থেকে সেপ্টেম্বর ১৪৩৮ খ্রি.) অপসারিত তিন মাস শাসন করেছেন।

১০ চাকমাক আজ-জাহির সাইফ উদ্দিন রবিউল আউয়াল ৮৪২ হিজরি থেকে মহররম ৮৫৭ হিজরি (সেপ্টেম্বর ১৪৩৮ খ্রি. থেকে ফেব্রুয়ারি ১৪৫৩ খ্রি.) মৃত্যু ১৫ বছর শাসন করেছেন। ৮০ বছর বয়সে। রোডস দ্বীপের ওপর তিনটি আক্রমণ করেছেন।

১১ উসমান চাকমাক, আল-মানসুর ফখর উদ্দিন মহররম থেকে রবিউল আউয়াল ৮৫৭ হিজরি (ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ ১৪৫৩ খ্রি.) অপসারিত দেড় মাস শাসন করেছেন।

১২ ইনাল আল-আলাঈ আশরাফ সাইফ উদ্দিন রবিউল আউয়াল ৮৫৭ হিজরি থেকে জমাদিউল আউয়াল ৮৬৫ হিজরি (মার্চ ১৪৫৩ খ্রি. থেকে মার্চ ১৪৬১ খ্রি.) মৃত্যু আট বছর দুই মাস শাসন করেছেন।

১৩ আহমদ বিন ইনাল, আল-মুয়াইয়াদ শিহাব উদ্দিন জমাদিউল আউয়াল থেকে রমজান ৮৬৫ হিজরি (মার্চ থেকে জুলাই ১৪৬১ খ্রি.) অপসারিত চার মাস শাসন করেছেন।

১৪ খুশকদম, আজ-জাহির সাইফ উদ্দিন রমজান ৮৬৫ হিজরি থেকে রবিউল আউয়াল ৮৭২ হিজরি (জুলাই ১৪৬১ খ্রি. থেকে অক্টোবর ১৪৬৭ খ্রি.) মৃত্যু সাড়ে ছয় বছর শাসন করেছেন।

১৫ বিলবে মুয়াইয়াদি, জাহির সাইফ উদ্দিন রবিউল আউয়াল থেকে জমাদিউল আউয়াল ৮৭২ হিজরি (অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর ১৪৬৭ খ্রি.) অপসারিত দুই মাস শাসন করেছেন।

১৬ তিমুরবুগা, আজ-জাহির জমাদিউল আউয়াল থেকে রজব ৮৭২ হিজরি (ডিসেম্বর ১৪৬৭ খ্রি. থেকে ফেব্রুয়ারি ১৪৬৮ খ্রি.) অপসারিত দুই মাস শাসন করেছেন।

১৭ খায়ের বেগ এক রাত অপসারিত

.

১৮ কাইতবে আশরাফ সাইফ উদ্দিন রজব ৮৭২ হিজরি থেকে জিলকদ ৯০১ হিজরি (ফেব্রুয়ারি ১৪৬৮ খ্রি. থেকে আগস্ট ১৪৯৬ খ্রি.) মৃত্যু আদর্শ শাসক। ২৯ বছর শাসন। দেশ সুসংহত। গুনাতে খাজরার প্রতিষ্ঠাতা।

চতুর্থ খণ্ড

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

ক্রমিক নং শাসকের নাম শাসনকাল মন্তব্য

১৯ মুহাম্মদ বিন কাইতবাই আন-নাসির— প্রথমবার ২৬ জিলকদ ৯০১ হিজরি থেকে ২৮ জমাদিউল আউয়াল ৯০২ হিজরি (আগস্ট ১৪৯৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ফেব্রুয়ারি ১৪৯৭ খ্রিস্টাব্দ) পদচ্যুত, ছয় মাস শাসন করেছেন।

২০ কানসুহ আল-আশরাফি ৯০২ হিজরি— ১৪৯৭ খ্রিস্টাব্দ (এগারো দিন) পদচ্যুত—
নিখোঁজ

মুহাম্মদ বিন কাইতবাই আন-নাসির— দ্বিতীয়বার ১০ জমাদিউল আখিরা ৯০২ হিজরি থেকে ১৫ জিলকদ ৯০৪ হিজরি (ফেব্রুয়ারি ১৪৯৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে জুলাই ১৪৯৯ খ্রিস্টাব্দ) নিহত ৯০৪ হিজরি, অত্যন্ত অযোগ্য এবং দুশ্চরিত্র।

২১ কানসুহ আবু সাঈদ জিলকদ ৯০৪ হিজরি থেকে জমাদিউল আখিরা ৯০৫ হিজরি (জুলাই ১৪৯৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে জানুয়ারি ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ) পদচ্যুত ৯০৫ হিজরি, এক বছর সাত মাস শাসন করেছেন।

২২ জান বালাত আল-আশরাফ জিলকদ ৯০৫ হিজরি থেকে রমজান ৯০৬ হিজরি (১৪৯৯ খ্রিস্টাব্দ) পদচ্যুত, নিহত, দশ মাস শাসন করেছেন।

২৩ আল-আদিল তুমান বাই আউয়াল একদিন নিহত

২৪ আল-আশরাফ কানসুহ আল-গাউরি শাওয়াল ৯০৬ হিজরি থেকে রজব ৯২২ হিজরি (মে ১৫০-১ খ্রিস্টাব্দ থেকে আগস্ট ১৫১৬ খ্রিস্টাব্দ) যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত, ১৭ বছর শাসন করেছেন, উসমানীয় তুর্কিদের সাথে যুদ্ধ।

২৫ তুমান বাই সানি, আল-আশরাফ রজব ৯২২ হিজরি থেকে মহররম ৯২৩ হিজরি (আগস্ট ১৫১৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ফেব্রুয়ারি ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দ) গ্রেফতার, নিহত, শেষ মামলুক শাসক, উসমানীয় তুর্কিদের হাতে নিহত।

মামলুক যুগ..... জ্ঞানতাত্ত্বিক ও তামাদুনিক খিদমতসমূহ

মিশর ও শামে বাহরি মামলুকদের যুগ ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তামাদুনের (সভ্যতার) এক স্বর্ণযুগ। বড় বড় উলামা, মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ এই যুগেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আল্লামা ইজ্জুদীন বিন আবদুস সালাম, আবু শামাহ আল-মাকদিসি, আল্লামা ইবনে মানযুর, ইবনে দাকীকুল ঈদ, ইমাম নববী, ইবনে খাল্লিকান, আল্লামা ইবনে তাইমিয়া, আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম, ইমাম মিশযী, হাফিজ যাহাবী, আল্লামা মুগলতাই, হাফিজ ইবনে হাজার, হাফিজ ইবনে কাসীর, আল্লামা মাকরিযী, আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী, ইমাম বুসিরী এবং আল্লামা কালকাশান্দি (রহ.)-এর মতো প্রখ্যাত জ্ঞানতাপসগণ সেই সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো ছড়াতে নিমগ্ন ছিলেন। হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ (শুরুহ), উসূলে হাদীস, ইসলামী ফিকহ, ইলমুর রিজাল, তাবাকাত এবং ইতিহাসের ওপর এই যুগে এমন বিশাল ও তথ্যবহুল কিতাবসমূহ রচিত হয়েছে যার দৃষ্টান্ত অতীতে পাওয়া যায় না। মিশর ও শাম এই যুগে জ্ঞানতাত্ত্বিক, তামাদুনিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে মুসলিম বিশ্বের হৃদপিণ্ডে পরিণত হয়েছিল। তাতারীদের হাত থেকে রক্ষা পেতে এই অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণকারীদের মধ্যে হাজার হাজার আলিম ও বিদ্বৎ পরিবারও অন্তর্ভুক্ত ছিল, যাদের মেধা ও যোগ্যতা এই যুগে সমগ্র বিশ্বের জন্য জগত-আলোকিতকারী সূর্যের রূপ ধারণ করেছিল। তাদের মধ্যে শত শত উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন মাশায়েখ ও সুফী কিরামও ছিলেন, যাদের ঈমানী ও আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টাসমূহ মিশর ও শামকে একটি পবিত্র সমাজে রূপান্তরিত করে দিয়েছিল।

জ্ঞানতাত্ত্বিক কর্মকাণ্ডে আগ্রহ:

মামলুক সুলতানগণ উলামা ও মাশায়েখদের জ্ঞানতাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ডে পূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। আল্লামা ইবনে খাল্লিকান, আল্লামা মুহিউদ্দীন এবং ইজ্জুদীন ইবনে শাদাদের মতো ঐতিহাসিকগণ সুলতান রুকনুদ্দীন বাইবার্সের যুগের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন, যিনি ইতিহাস রচনার প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন এবং সর্বদা ঐতিহাসিকদের উৎসাহিত করতেন এবং তাদের নিকট থেকে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী শুনতেন ও লিখিয়ে নিতেন। তিনি বলতেন:

“سَمِعَ التَّارِخَ اعْظَمَ مِنَ التَّجَارِبِ”

(ঐতিহাসিক ঘটনাবলী শ্রবণ করা অভিজ্ঞতার চেয়েও অনেক বড়।) [১]

মামলুক আমীরগণ হাদীস, ফিকহ, ইতিহাস ও সাহিত্য চর্চায় ব্যাপক উৎসাহ প্রদান করতেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা কেন্দ্র খোলার আগ্রহে মামলুকগণ আইয়ুবী শাসকদেরও পেছনে ফেলে দিয়েছিলেন। বাইবার্স জামে আযহার খোলার পর সেখানে দরস ও তাদরীসের (শিক্ষাদান) ধারা শুরু করেন, যা প্রথমে ‘আল-জামিআহ আল-জাহিরিয়াহ’ এবং পরবর্তীতে ‘আল-জামিআহ আল-আযহার’ নামে খ্যাতি লাভ করে। ৬২৫ হিজরী এবং ৬৭১ হিজরীতে এই মসজিদ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পুনর্নির্মাণ হয় এবং পরবর্তীতে সম্প্রসারণ ও সংস্কারের ধারা অব্যাহত থাকে। [২]

[১] আন-নুজুমুয যাহিরাহ ফী মুলুকি মিসরা ওয়াল কাহিরাহ: ৭/১৮২

[২] আল-মাওয়াযিয়ু ওয়াল ইতিবার বি যিকরিল খুতাত ওয়াল আসার লিল মাকরিযী: ৩/৫৫, ৫৬

জামিয়া আল-আযহার ছাড়াও মামলুকরা সালতানাতের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। কালাউন ‘মাদরাসা মানসুরিয়া’ এবং নাসির বিন কালাউন ‘মাদরাসা নাসিরিয়া’ নির্মাণ করেন। [১] সুলতান কাইতবাই বাইতুল মুকাদ্দাসে একটি বিশাল দরগাহ (শিক্ষা কেন্দ্র) স্থাপন করেন। [২] সুলতান শাবান বিন হুসাইন কায়রোর কালাআতুল জাবালের সামনে একটি শিক্ষা কেন্দ্র খোলেন। [৩] আল-মালিক আল-আশরাফ জানবালাত কায়রোতে একটি নতুন মাদরাসা নির্মাণ করেন যা ‘মাদরাসা জানবালাতিয়া’ নামে পরিচিত ছিল। [৪] সুলতান হাসান বিন নাসির ৭৫৭ হিজরিতে বিশ্বের সবচেয়ে বড় মাদরাসা নির্মাণ শুরু করেন যার নির্মাণ কাজ তিন বছরে সম্পন্ন হয়। এর ওপর দুই কোটি ষোল লক্ষ দিরহাম (প্রায় সাড়ে পাঁচ আরব রূপি) ব্যয় হয়। নির্মাণের দৈনিক খরচ ছিল বিশ হাজার দিরহাম যার কারণে সুলতানকে একবার বলতে হয়েছিল:

“যদি এই ভয় না থাকত যে বাদশাহ তার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে অক্ষম হয়ে গেছেন, তবে আমি এর নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দিতাম।” [৫]

সালতানাতের আমীরগণও জ্ঞানচর্চার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আমীর জামালুদ্দিন মাহমুদের নির্মিত মাদরাসা মাহমুদিয়া তার সময়ের অন্যতম সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। [৬] সাইফুদ্দিন মানজাক বাইতুল মুকাদ্দাসে ‘মাদরাসা মানজাকিয়া’ নির্মাণ করেন। [৭] হাজী মালিক চোকান্দার আল-নাসির বিন কালাউনের যুগে বাইতুল মুকাদ্দাসে একটি দরগাহ নির্মাণ করেন যা মাদরাসা মালকিয়া নামে পরিচিত হয়। [৮]

মসজিদ ও খানকাহ প্রতিষ্ঠা:

ধর্মীয় পরিবেশের কারণে প্রচুর পরিমাণে মসজিদও নির্মিত হতো। কায়রো এবং এর আশেপাশে শত শত মসজিদ ছিল। শুধুমাত্র জামে মসজিদের সংখ্যা একশত ত্রিশ পর্যন্ত পৌঁছেছিল। [৯] মামলুকরা খানকাহগুলোরও পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তাদের যুগে ডজন ডজন নতুন খানকাহ প্রতিষ্ঠিত হয়। বাইবার্স জাশনিগির তার সংক্ষিপ্ত শাসনকালে কাসরে ওয়াজারাতকে খানকাহতে রূপান্তরিত করেন যা এক সময় পর্যন্ত মিশরের সবচেয়ে বড় খানকাহ হিসেবে বিবেচিত হতো। [১০] আশরাফ বাসবাই আমিদ-এ একটি ভবনকে খানকাহ হিসেবে ওয়াকফ করেছিলেন। [১১]

হাসপাতাল:

মামলুকরা স্বাস্থ্য খাতের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দিয়েছিলেন। সুলতান কালাউন কায়রোতে একটি বিশাল হাসপাতাল ‘মারিস্তান আল-কাবীর আল-মানসুরি’ প্রতিষ্ঠা করেন। যার প্রাঙ্গণের দৈর্ঘ্য ছিল সোয়া পাঁচশ গজ এবং প্রস্থ ছিল দুইশ গজ। এর নির্মাণ কাজ ৬৮৩ হিজরিতে শুরু হয়ে এগারো মাসে সম্পন্ন হয়।

[১] হসনুল মুহাদারা ফি তারিখি মিসর ওয়াল কাহিরা লিস সুযুতী: ২/২৬৫, ২৬৩, ত: দারু ইহয়াইল কুতুবিল আরাবিয়া

[২] মুফাকাহাতুল খিলান ফি হাওয়াদিসিজ জামান লি ইবনি তুলুন আল-হানাতী (মৃ. ৯৫৩ হি.): ১/৩১, ত: আল-ইলমিয়া; আল-উনসুল জলীল বিতারিখিল কুদসি ওয়াল খলীল লি আবিল ইয়ামান আল-উলাইমী (মৃ. ৯২৮ হি.): ২/৩৩৫, ত: মাকতাবাতু দানদিস - আশ্মান

[৩] আল-মাওয়াযিজ ওয়াল ইতিবার বিজিকরিল খুতাতি ওয়াল আসার লিল মাকরিযী: ২/২৮৩

[৪] শাজারাতুজ জাহাব: ১০/৩১, ত: দারু ইবনি কাসীর

[৫] হসনুল মুহাদারা ফি তারিখি মিসর ওয়াল কাহিরা লিস সুযুতী: ২/২৬৯, ত: দারু ইহয়াইল কুতুবিল আরাবিয়া

[৬] আল-মাওয়াযিজ ওয়াল ইতিবার (আল-খুতাতি লিল মাকরিযী): ৩/২৫০, ২৫১

[৭] আদ-দারিস ফি তারিখিল মাদারিস লি আব্দুল কাদির আন-নুয়াইমী (মৃ. ৯২৭ হি.): ১/২৬১, ত: আল-ইলমিয়া

[৮] আল-উনসুল জলীল বিতারিখিল কুদসি ওয়াল খলীল লি আবিল ইয়ামান আল-উলাইমী (মৃ. ৯২৮ হি.): ২/৩৮, ত: মাকতাবাতু দানদিস - আশ্মান

[৯] আল-মাওয়াযিজ ওয়াল ইতিবার (আল-খুতাতি লিল মাকরিযী): ৩/৩ থেকে ৫

[১০] হসনুল মুহাদারা ফি তারিখি মিসর ওয়াল কাহিরা: ২/২৬৫

[১১] আদ-দারিস ফি তারিখিল মাদারিস লি আব্দুল কাদির আন-নুয়াইমী (মৃ. ৯২৭ হি.): ২/১১১, ত: আল-ইলমিয়া

হলো, দশ হাজার দিরহাম এর বার্ষিক ব্যয়ের জন্য ওয়াকফ ছিল। এখানে বিভিন্ন রোগের জন্য আলাদা আলাদা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত ছিল। যেমন: চোখের বিভাগ, সার্জারি বিভাগ, পেটের রোগের বিভাগ, জ্বরের বিভাগ ইত্যাদি। প্রতিটি বিভাগে নারী ও পুরুষদের জন্য আলাদা আলাদা অংশ ছিল। সেবার জন্য নার্স এবং পরিচারক নিযুক্ত ছিল। ভবনটি চারটি চত্বরের ওপর ভিত্তি করে ছিল। ওষুধ তৈরি, ওষুধের মজুদ, ওষুধের বিতরণ, রোগী ও কর্মীদের জন্য খাবার ও পরিষ্কার পানির সরবরাহ এবং হিসাব-নিকাশের খাতার জন্য আলাদা আলাদা ভবন ছিল। এতে একটি তিব্বিয়া (চিকিৎসা) কলেজ ছিল যাতে চিকিৎসা বিজ্ঞান ও সার্জারির শিক্ষা দেওয়া হতো। অন্যান্য মামলুক সুলতানরাও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যার মধ্যে শেখ মাহমুদ আল-মুয়াইয়াদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালটি বিখ্যাত ছিল। [১]

কুতুবখানা:

মামলুক শাসনামলে স্থানে স্থানে কুতুবখানা (লাইব্রেরি) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রতিটি মাদরাসার সাথে একটি লাইব্রেরি তৈরি করা হতো। কায়রোর কেব্লা-এ-জাবালের কুতুবখানাটি তার সময়ের অন্যতম বৃহৎ কুতুবখানা ছিল যা প্রতিটি বিষয়ের বিরল ও দুপ্রাপ্য বই দ্বারা সজ্জিত ছিল। সুলতান রুকন উদ্দিন বাইবার্সের মাদরাসা-এ-জাহিরিয়ার কুতুবখানাটি অত্যন্ত বিখ্যাত ছিল। কালাউন-এর মাদরাসা-এ-মানসুরিয়া এবং মুহাম্মদ বিন কালাউন-এর মাদরাসা-এ-নাসিরিয়ার কুতুবখানায় তাফসির, হাদিস, ফিকহ, আদব, ইতিহাস এবং তিব্ব সহ বিভিন্ন বিজ্ঞানের হাজার হাজার বই মজুদ ছিল। মাদরাসা ছাড়াও খানকাহ এবং জামে মসজিদগুলোর সাথেও লাইব্রেরি থাকত। [২]

দলাদলি রোধ:

মামলুক সুলতানগণ ধর্মীয় দিক থেকে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। উম্মতের মধ্যে দলাদলি রোধ করার জন্য তাদের মতে এটি জরুরি ছিল যে চিন্তাধারাকে চার ইমামের অনুসরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হোক। چنانچه সুলতান বাইবার্সের সময় থেকে এই আইন করা হয়েছিল যে কেবল সেই ব্যক্তিকেই কাজী, খতিব, শিক্ষক বা ইমাম-এ-মসজিদ নিযুক্ত করা হবে যে চার ইমামের যেকোনো একজনের অনুসারী হবে। যে ব্যক্তি এই চার ইমামের পথ থেকে সরে গিয়ে অন্য কোনো দলের দিকে নিজেকে সম্পৃক্ত করত, আদালতে তার সাক্ষ্যও গ্রহণ করা হতো না। [৩]

যদিও শিয়া এবং অন্যান্য দলগুলো সিরিয়া ও মিশরে বিপুল সংখ্যায় বিদ্যমান ছিল এবং সরকারের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না যে তারা চার দেয়ালের ভেতরে কী করছে, কিন্তু যদি সরকারের কাছে খবর পৌঁছাত যে কেউ ভ্রান্ত আকিদা প্রকাশ করেছে, তবে তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হতো এবং তওবা না করা পর্যন্ত তাকে ছাড়া হতো না। [৪] হযরত আবু বকর এবং হযরত উমর (রা.)-এর অবমাননার জন্য মৃত্যুদণ্ড নির্ধারিত ছিল। [৫]

হারামাইন শরিফাইনের খিদমত:

মামলুক সুলতানদের হারামাইন শরিফাইনের প্রতি গভীর ভক্তি ছিল। বিশেষ করে মসজিদে নববী এবং রওজা আতহারের দেখাশোনার জন্য তাদের অবদান অবিস্মরণীয়। তাদের আগে সুলতান নুরুদ্দিন জঙ্গি রওজা আতহারের সুরক্ষার জন্য মাটির নিচে...

[১] আল-মাওয়াইজ ওয়াল ইতিবার বিজিকরিল খুতাতি ওয়াল আসার লিল মাকরিজি: ২/২৬৮

[২] আল-মাওয়াইজ ওয়াল ইতিবার লিল মাকরিজি: ২/২১২; আন-নুজুমুজ জাহেরা: ৮/৩৩; নিহায়াতুল আরাব লিন নুওয়াইরি: ৩১/১০৯, ত. কায়রো

[৩] আল-মাওয়াইজ ওয়াল ইতিবার বিজিকরিল খুতাতি ওয়াল আসার লিল মাকরিজি: ৩/১৬১

[৪] আদ-দুরারুল কামিনা ফি আয়ানিল মিয়াতিত সামিনা লি ইবনে হাজার আসকালানি: ২/২৯৯, ৫/২০১, ৪/৪৭

[৫] আদ-দুরারুল কামিনা: ৩/১১৩

সিসা ভর্তি পরিখা তৈরি করা হয়েছিল, যার ওপর চন্দনের বেষ্টনী স্থাপন করা ছিল। সুলতান রুকন উদ্দিন বাইবার্স ৬৬৮ হিজরিতে হজের সময় লক্ষ্য করেন যে, দর্শনার্থীরা পবিত্র কবরের খুব কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, যাতে বেয়াদবি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তিনি চন্দনের বেষ্টনীর চারপাশে প্রায় বারো ফুট উঁচু একটি জালিদার প্রাচীর নির্মাণ করে দেন, যার ভেতরে বাইতে ফাতিমা আজ-জাহরা-ও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এরপর থেকে আজ পর্যন্ত কোনো মানুষের এই প্রাচীর অতিক্রম করার সুযোগ হয়নি। আল-আদিল কিতবুগা ৬৯৪ হিজরিতে এই প্রাচীরকে উঁচু করে মসজিদের ছাদের সাথে মিলিয়ে দেন। দুই শতাব্দী পর সুলতান আশরাফ কাইতবে ৮৯২ হিজরিতে রওজায়ে আকদাসের চারপাশে মার্বেল পাথরের একটি বেষ্টনী তৈরি করেন এবং এর চারপাশে ইম্পাতের জালি স্থাপন করে দেন। রওজায়ে পাকের ওপর গম্বুজ নির্মাণও মামলুক সুলতানদের একটি কীর্তি। সর্বপ্রথম ৬৭৮ হিজরিতে সুলতান কালাউন রওজার বেষ্টনীর চারপাশে মার্বেল পাথরের স্তম্ভের একটি বৃত্ত তৈরি করেন এবং তার ওপর ছাদ দিয়ে রওজায়ে আতহারের প্রথম গম্বুজ নির্মাণ করেন, যা কাঠের ছিল এবং কিনারাগুলোতে সিসার পাত ছিল। তাঁর পুত্র আন-নাসির মুহাম্মদ এই গম্বুজটি পুনরায় নির্মাণ করান। এরপর আজ-জাহির চাকমাক তাঁর আমলে নতুন করে গম্বুজ নির্মাণ করান। ৮৮৬ হিজরিতে সুলতান আশরাফ কাইতবে গম্বুজটি অক্ষুণ্ণ রেখে তার ওপর সাদা ও কালো মার্বেল পাথরের একটি বড় গম্বুজ এমনভাবে নির্মাণ করান যে, পুরনো গম্বুজটি তার ভেতরে চলে আসে। ছয় বছর পর এই বাদশাহ উভয় গম্বুজের ওপর একটি তৃতীয় অত্যন্ত সুন্দর ও সুমহান গম্বুজ নির্মাণ করান যা এখন গম্বুজে খাজরা নামে পরিচিত এবং দর্শনার্থীদের তৃষ্ণার্ত চোখে শীতলতা দান করে। সেই সময় সুলতান কাইতবে এই গম্বুজের রঙ নীল রেখেছিলেন। সাড়ে তিন শতাব্দী পর উসমানীয় তুর্কি সুলতানগণ ১২৩৩ হিজরিতে এর ওপর সবুজ রঙ চড়িয়ে দেন যা আজ পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে। [১]

সমাজে উলামাদের মর্যাদা ও ধর্মীয় সহনশীলতা:

সমাজে মুফতি ও উলামাদের যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। তাঁরা সরকারি পদক্ষেপ বাতিল করানোর সাহস রাখতেন। যখন ৬৮০ হিজরিতে সাইফ উদ্দিন কালাউন তাতারীদের বিরুদ্ধে এক বড় যুদ্ধের জন্য সিরিয়ায় সৈন্য সমাবেশ করেন, তখন স্থানীয় খ্রিস্টানদের পক্ষ থেকে বিদ্রোহের আশঙ্কা ছিল। সুলতান অনেক খ্রিস্টান নাগরিককে গ্রেপ্তার করে গলায় ফাঁসির দড়ি পরিয়ে দেন যে, কালিমা পড়ে নতুবা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও। বাধ্য হয়ে তারা কালিমা পড়ে প্রাণ বাঁচায়। যুদ্ধের পর তারা আদালতে মামলা দায়ের করে যে, আমাদের জোরপূর্বক মুসলমান বানানো হয়েছে, তাই আমাদের পৈতৃক ধর্ম গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হোক। কাজী জামাল উদ্দিন মালিকি পূর্ণ নিরপেক্ষতার সাথে মামলার শুনানি করেন এবং অকাট্য সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে জোরপূর্বক ইসলাম গ্রহণ প্রমাণিত হওয়ায় তাদের পুনরায় পৈতৃক ধর্ম গ্রহণের অনুমতি দেন। ফলে তাদের অধিকাংশ পূর্বের ধর্মে ফিরে যায়। [২]

[১] ওফাউল ওফা বি আখবারি দারিল মুস্তফা লিস সামহুদি (মৃ. ৯১১ হি.): ৪/ ১৫৭ থেকে ১৬০, ত ত আল-ইলমিয়াহ

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: সন ৬৮০ হি.

খিলাফতে আব্বাসিয়া কায়রো

৬৫৮ হিজরিতে বাগদাদের আব্বাসীয় খিলাফতের পতনের পর সাড়ে তিন বছর পর্যন্ত খিলাফত স্থগিত ছিল। অবশেষে কায়রো খিলাফতের কেন্দ্র হওয়ার গৌরব অর্জন করে। বেঁচে যাওয়া কিছু আব্বাসীয় শাহজাদাকে সেখানে খিলাফতের মসনদে বসানো হয়। এই খলিফাদের ক্ষমতা ছিল নামমাত্র। যখনই কোনো খলিফার বায়াত নেওয়া হতো, তখনই তিনি ঘোষণা করতেন যে আমি খলিফা হিসেবে রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী বাদশাহর হাতে সোপর্দ করেছি। [১] কায়রোতে সতেরোজন আব্বাসীয় খলিফা অতিবাহিত হয়েছেন যাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেওয়া হলো:

১. মুসতানসির বিল্লাহ, আহমদ: (রজব ৬৫৯ হি. থেকে ৩ মহররম ৬৬০ হি.)

হালাকু খানের হাতে বাগদাদ ধ্বংসের সময় একজন আব্বাসীয় শাহজাদা আহমদ বিন জাহির বের হয়ে ইরাক, আরব ও শামের মধ্য দিয়ে মিশরে পৌঁছান। সেখানে মামলুক সুলতান রুকন উদ্দিন বাইবার্স উলামা ও কাজীদের পরামর্শে ১৩ রজব ৬৫৯ হিজরিতে তাকে খিলাফতের পদে অধিষ্ঠিত করেন। কিছুকাল পর মুসতানসির তাতারদের ইরাক থেকে বিতাড়িত করার জন্য সৈন্য পরিচালনা করেন। ৩ মহররম ৬৬০ হিজরিতে তাতারদের সাথে এক যুদ্ধ হয় যাতে মুসলমানরা পরাজিত হয় এবং খলিফা নিখোঁজ হয়ে যান। তার খিলাফতের মেয়াদ ছিল মাত্র ছয় মাস। [২] এক বছর পর্যন্ত মানুষ এই অপেক্ষায় ছিল যে খলিফার কোনো খবর পাওয়া যাবে, কিন্তু কিছুই জানা যায়নি।

২. আল-হাকিম, আহমদ বিন আবু আলী: (৬৬১ হি. থেকে ৭০১ হি.)

মুসতানসিরের নিখোঁজ হওয়ার এক বছর পর ৮ মহররম ৬৬১ হিজরিতে আহমদ নামক আরেকজন আব্বাসীয় শাহজাদাকে খিলাফত অর্পণ করা হয়, যিনি ‘হাকিম’ উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ খতিব। তার খুতবা মুসলমানদের মধ্যে জিহাদের চেতনা জাগ্রত করত। কিছুকাল পর হাকিমের সহচরদের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপের কথা প্রকাশ পেতে থাকে, যার ফলে ৬৬৩ হিজরিতে সুলতান বাইবার্স হাকিমের সাথে সাক্ষাতের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। ৪০ বছর খিলাফতের পর ১৮ জমাদিউল আউয়াল ৭০১ হিজরিতে হাকিমের মৃত্যু হয়। [৩]

৩. আল-মুসতাকফি, সুলাইমান বিন আল-হাকিম: (৭০১ হি. থেকে ৭৪০ হি.)

হাকিমের পর তার ২৬ বছর বয়সী পুত্র সুলাইমান ‘আল-মুসতাকফি’ উপাধিতে ভূষিত হয়ে খলিফা হন। তিনি ছিলেন একজন জ্ঞানী, ফাজিল, ক্যালিগ্রাফার এবং সাহসী ব্যক্তি। পোলো খেলা এবং তীরন্দাজিতে তিনি পারদর্শী ছিলেন। উলামা, কবি এবং সাহিত্যিকদের তিনি নিজের মজলিসে রাখতেন এবং তাদের পুরস্কৃত করতেন। সুলতান আল-নাসির মুহাম্মদ বিন কালাউনের সাথে তার অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। দুজনে মিলে ভ্রমণ ও বিনোদনের জন্য বের হতেন এবং পোলো খেলতেন।

[১] আল-আলাম লিল-জিরিকলি: ১/১৩৩, তরজমা আল-হাকিম আল-আব্বাসি, দারুল ইলম।

[২] জাইল মিরাত আল-জামান লিল-ইউনিনি: ২/৯৫; তারিখুল খুলাফা, আস-সুয়ুতী, পৃ. ৩৩৬, ত. নজার।

[৩] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ৩৩৭, ত. নজার।

খেলতেন কিন্তু ৭৩৬ হিজরিতে সুলতান খলিফার ওপর হঠাৎ অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে গেলেন। তিনি খলিফাকে একটি বুরুজে বন্দি করে দিলেন। এরপর যিলহজ ৭৩৭ হিজরিতে তাকে পুরো পরিবারসহ, যারা প্রায় একশ জন ছিলেন, কুস-এর কেল্লায় নজরবন্দি করে দিলেন। ঐতিহাসিকগণ সুলতানের অসন্তুষ্টির এই কারণ লিখেছেন যে, সুলতানের সামনে একটি চিরকুট পেশ করা হয়েছিল যাতে খলিফার স্বাক্ষর ছিল এবং তাতে নির্দেশ লেখা ছিল যে, সুলতান কালাউন যেন অমুক বিষয়ে মজলিসে শরহে উপস্থিত হন। এতে সুলতান আল-মালিকুন নাসির বিন কালাউন ক্ষুব্ধ হয়ে যান।

কিন্তু শুধুমাত্র এই সামান্য বিষয়টি সুলতানকে এত বেশি রাগান্বিত করার জন্য যথেষ্ট হতে পারে না। নিশ্চিতভাবেই পর্দার আড়ালে কিছু উস্কানিও চলে আসছিল, যেমনটি কিছু ঐতিহাসিক স্পষ্ট করেছেন যে, সুলতানকে ইব্রাহিম বিন মুতামাসসিক আব্বাসি, যে একজন দুশ্চরিত্র আব্বাসি শাহজাদা ছিল, খলিফার বিরুদ্ধে উস্কে দিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে ইব্রাহিমের দাদা খলিফা আল-হাকিম নিজের জীবদ্দশায় তার পুত্র মুতামাসসিককে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন, কিন্তু মুতামাসসিক পিতার জীবদ্দশাতেই মারা যান। এর ওপর খলিফা আল-হাকিম এই ইব্রাহিমকেই, যে মরহুম মুতামাসসিকের পুত্র ছিল, উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন। কিন্তু কিছুকাল পর যখন তার কাছে প্রকাশ পেল যে নাতি ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে, তখন তিনি উত্তরাধিকার বাতিল করে তার দ্বিতীয় পুত্র মুসতাকফিকে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন এবং আল-হাকিমের পর তিনিই খলিফা হন। এতে ইব্রাহিম তার চাচা মুসতাকফির শত্রু হয়ে যায়, কারণ সে খিলাফতের পদকে নিজের অধিকার মনে করত। ফলে সে সুলতানকে খলিফার বিরুদ্ধে উস্কে দিয়ে নিজের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে চেয়েছিল। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছাল যে, সুলতান খলিফা মুসতাকফির পরিবর্তে তাকেই খলিফা বানানোর সিদ্ধান্ত নিলেন এবং খলিফাকে বন্দি করলেন।

শাবান ৭৪০ হিজরিতে খলিফার সেখানেই মৃত্যু হয়। তিনি ছিলেন শেষ খলিফা যার নাম জুমুআ ও দুই ঈদের খুতবায় নেওয়া হতো। এরপর খুতবায় শুধুমাত্র সুলতানের নাম নেওয়া হতে লাগল। [১]

আল-ওয়াসিক বিল্লাহ, ইব্রাহিম বিন মুতামাসসিক: (৭৪১ হিজরি)

মরহুম খলিফা মুসতাকফি কুস-এ নজরবন্দি থাকাকালীন চল্লিশজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি এবং স্থানীয় কাজী ও কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে তার পুত্র আহমদকে খিলাফতের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেছিলেন, কিন্তু সুলতান নাসির বিন কালাউন এই দিকটিকে গুরুত্ব দেওয়ার যোগ্য মনে করেননি এবং তার পরিবর্তে দুশ্চরিত্র আব্বাসি শাহজাদা ইব্রাহিম বিন মুতামাসসিককে খলিফা বানানোর সংকল্প করেন, তবে বিরোধিতার আশঙ্কায় তা প্রকাশ করেননি। এক মাস পর্যন্ত খিলাফতের মসনদ শূন্য ছিল। ১৩ রমজান ৭৪০ হিজরিতে সুলতান তার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এতে দরবারের ওলামায়ে কেরাম বাধা হয়ে দাঁড়ান এবং বলেন যে, এটি খিলাফতের রীতির পরিপন্থী, পূর্ববর্তী খলিফা চল্লিশজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ও কাজীদের উপস্থিতিতে তার পুত্র আহমদকে উত্তরাধিকারী বানিয়েছিলেন। তাই এই বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা উচিত।

সুলতান কিছুদিনের জন্য আবার থেমে গেলেন এবং এই ঘোষণা জারি করলেন যে, জুমুআর নামাজের খুতবায় শুধুমাত্র সুলতানের নাম নেওয়া হবে, খলিফার উল্লেখ করা হবে না। সেই সাথে তিনি নির্দেশ দিলেন যে, কুস থেকে মরহুম খলিফার পুত্র আহমদকে পুরো পরিবারসহ কায়রোতে ফিরিয়ে আনা হোক। অবশেষে যিলকদ মাসে আহমদ কায়রো পৌঁছান এবং সুলতানের কাছে নিজের পদ দাবি করেন। সুলতান ভ্রক্ষেপ করলেন না কারণ তিনি ইব্রাহিমকে মসনদে বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন। ওলামাদের সমমনা করার জন্য তিনি ইব্রাহিমকে ডেকে তিরস্কার করলেন।

[১] তারিখুল খুলাফা লিস-সুয়ুতী, পৃ. ৩৩০, ৩৩২, ৩৩৩, ত. নিয়ার।

ইব্রাহিম অনুশোচনা প্রকাশ করেন এবং তওবা করার ঘোষণা দেন। এখন সুলতান আপত্তি জানানো আলেমদের এই বলে চুপ করিয়ে দিলেন যে, ইব্রাহিম তওবা করে পবিত্র হয়ে গেছেন, তাই এখন তাকে অযোগ্য মনে করা যাবে না। ফলে ৬ জিলকদ ৭৪০ হিজরিতে তার খেলাফতের ঘোষণা দেওয়া হয়। [১]

কিন্তু শীঘ্রই বোঝা গেল যে তিনি চরম পর্যায়ের অযোগ্য। ঐতিহাসিকদের মতে, তিনি কবুতর উড়ানো এবং মোরগ লড়াইয়ের শৌখিন ছিলেন। লেনদেনে প্রায়ই প্রতারণা করতেন। পাপাচারী ও দুশ্চরিত্র লোকদের সাথে উঠাবসা করতেন। [২]

সুলতান আল-মালিক আন-নাসির বিন কালাউন যখন মৃত্যুশয্যা় আক্রান্ত হলেন, তখন তিনি নিজের সিদ্ধান্তের জন্য অনুতপ্ত হলেন। তিনি তার উত্তরসূরি সুলতান আবু বকর বিন নাসিরকে অসিয়ত করলেন যে, তিনি যেন খেলাফতের এই পদটি এর যোগ্য ব্যক্তিদের কাছে ফিরিয়ে দেন। ২৮ জিলহজ ৭৪১ হিজরিতে সুলতানের মৃত্যু হয় এবং আবু বকর বিন নাসির সিংহাসনে আরোহণ করেন। এক বছর পর্যন্ত তিনি এই অযোগ্য খলিফাকে সুযোগ দেন, কিন্তু যখন কোনো উন্নতি দেখা গেল না, তখন জিলহজ ৭৪২ হিজরিতে তিনি ফকিহদের কাছে ফতোয়া চাইলেন যে, খেলাফতের প্রকৃত হকদার কে?

কাজী ইজ্জুদ্দিন ইবনে জামাআ বললেন: “খলিফা মুসতাকফি ইন্তেকালের পূর্বে নিজের ছেলে আহমদের পক্ষে অসিয়ত করেছিলেন। শহরের চল্লিশজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি এর সাক্ষী। আমার নায়েবের মতে, কুস-এ এই বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে।”

সুলতান এই ব্যাখ্যার পর ইব্রাহিমকে অপসারিত করেন এবং আহমদের হাতে খেলাফতের বায়আত গ্রহণ করেন। [৩]

৫. আহমদ বিন মুসতাকফি, আল-হাকিম: (৭৪২ হিজরি থেকে ৭৫৩ হিজরি)

১১ জিলহজ ৭৪২ হিজরিতে মরহুম খলিফা মুসতাকফির পুত্র আহমদকে খলিফা নিযুক্ত করা হয়। তিনি বহু গুণের অধিকারী ছিলেন। আলেম ও গুণীজনরা তাকে খুব পছন্দ করতেন। তিনি প্রাঞ্জল ও মর্মস্পর্শী খুতবা দিতেন। ৭৫৩ হিজরিতে তার ইন্তেকাল হয়। [৪]

৬. আল-মুতাদিদ বিল্লাহ, আবু বকর বিন মুসতাকফি: (৭৫৩ হিজরি থেকে ৭৬৩ হিজরি)

আহমদ বিন মুসতাকফির ইন্তেকালের পর তার ভাই আবু বকরকে আল-মুতাদিদ বিল্লাহ উপাধিসহ খেলাফতের মসনদে বসানো হয়। তিনি বিনয়ী, ধর্মপ্রাণ এবং জ্ঞানানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। জমাদিউল আউয়াল ৭৬৩ হিজরিতে তার ইন্তেকাল হয়। [৫]

৭. আল-মুতাওয়াঙ্কিল, মুহাম্মদ বিন মুতাদিদ—প্রথমবার: (৭৬৩ হিজরি থেকে ৭৮৫ হিজরি)

মুতাদিদের পর তার পুত্র মুহাম্মদ জমাদিউল আউয়াল ৭৬৩ হিজরিতে আল-মুতাওয়াঙ্কিল উপাধি নিয়ে খেলাফতের মসনদে বসেন। তিনি ২৫ বছর খলিফা ছিলেন। এর মধ্যে তিনি দুইবার অপসারিত হন। অপ্রাপ্তবয়স্ক সুলতান আলী বিন শাবানের আতাবেগ আমির ইতবাক ৪ রবিউল আউয়াল ৭৭৯ হিজরিতে তাকে এই অভিযোগে অপসারিত করেন যে, তিনি নিজের ছেলেকে উত্তরাধিকারী বানাতে চান। এখন মুতাওয়াঙ্কিলের পরিবর্তে জাকারিয়া বিন ইব্রাহিম (মুসতাসিম)...

[১] আস-সুলুক লি-মা'রিফাত দুওয়ালিল মুলুক: ৩/২৮৭, ২৮৮, ত. আল-ইলমিয়াহ।

[২] তারিখুল খুলাফা লিস-সুয়ুতি, পৃ. ৩৩৩, ত. নিজার।

[৩] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ৩৩৩; আল-মাওয়াইজ ওয়াল ইতিবার লিল-মাকরিজি: ৩/৪২৪।

[৪] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ৩৪৪; আল-আলাম লিয-যিরিকলি: ১/১৩২, ১৩৩, ত. দারুল ইলম লিল-মালয়িন; আল-মাওয়াইজ ওয়াল ইতিবার লিল-মাকরিজি: ৩/৪২৪।

[৫] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ৩৫১; আল-আলাম লিয-যিরিকলি: ২/৬৩, ত. দারুল ইলম লিল-মালয়িন; আল-মাওয়াইজ ওয়াল ইতিবার লিল-মাকরিজি: ৩/৪২৪।

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

...ঐকমত্য এবং বায়‘আতের প্রক্রিয়া ছাড়াই খলিফা বানিয়ে দেওয়া হলো। [১]

৮. মুস্তাসিম, যাকারিয়া বিন ইবরাহিম। প্রথমবার: (৭৭৯ হিজরি)

যাকারিয়া বিন ইবরাহিম (মুস্তাসিম)-এর খিলাফতের ওপর উমারা (আমিরগণ) এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অসন্তুষ্ট ছিলেন, ফলে বিশ দিন পর তাকে পদচ্যুত করা হলো। [২]

আল-মুতাওয়াঙ্কিল, মুহাম্মদ বিন মুতাদিদ। দ্বিতীয়বার: (৭৭৯ হিজরি থেকে ৭৮৫ হিজরি)

সরকার বিরোধীদের চাপ কমাতে বাধ্য ছিল। ফলে ২৩ রবিউল আউয়াল ৭৭৯ হিজরিতে মুতাওয়াঙ্কিলের খিলাফত পুনর্বহাল করা হলো। [৩]

৭৮৪ হিজরিতে বিপ্লব ঘটে এবং বাহরি মামলুকদের স্থলে চেরকাসীয় মামলুকদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই শাসনের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান বারকুক ৭৮৫ হিজরিতে খলিফা আল-মুতাওয়াঙ্কিলের ওপর অসন্তুষ্ট হন, কারণ তিনি খবর পেয়েছিলেন যে খলিফা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করছেন। ১লা রজব সুলতান খলিফাকে ডেকে এনে সেই সব উমারাদের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেন যারা এই অভিযোগ করেছিল। খলিফা কঠোরভাবে এই অভিযোগ অস্বীকার করেন, অন্যদিকে উমারাগণ তাদের কথায় অটল থাকেন। সুলতান খলিফার ওপর এতটাই রাগান্বিত হলেন যে তলোয়ার কোষমুক্ত করলেন। খলিফার শিরশ্ছেদ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, কিন্তু উলামায়ে কেরাম মধ্যস্থতা করলেন এবং সুলতানকে বুঝিয়ে শান্ত করলেন। সুলতান ফকীহদের কাছে খলিফাকে হত্যার ফতোয়া চাইলেন, কিন্তু তারা তা অস্বীকার করলেন এবং খলিফার প্রতিরক্ষা করতে লাগলেন। অবশেষে সুলতান খলিফাকে অপসারিত করে একটি দুর্গে বন্দি করে দিলেন। [৪]

৯. আল-ওয়াসিক বিল্লাহ, উমর বিন ইবরাহিম বিন মুতামসিক: (৭৮৫ হিজরি থেকে ৭৮৮ হিজরি)

এখন উমর বিন ইবরাহিমকে ‘আল-ওয়াসিক বিল্লাহ’ উপাধি দিয়ে খিলাফতের আসনে বসানো হলো। তিনি তিন বছর খলিফা থাকার পর ১৯ শাওয়াল ৭৮৮ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। [৫]

মুস্তাসিম, যাকারিয়া বিন ইবরাহিম। দ্বিতীয়বার: (৭৮৮ হিজরি থেকে ৭৯১ হিজরি)

ওয়াসিকের ইন্তেকালের পর উমারাগণ সুলতান বারকুককে পরামর্শ দিলেন যেন তিনি মুতাওয়াঙ্কিলকে পুনরায় খলিফা বানান, কিন্তু বারকুক তা মানলেন না এবং ওয়াসিকের ভাই যাকারিয়া (মুস্তাসিম)-কে খলিফা বানিয়ে দিলেন, যিনি প্রথমবার ৭৭৯ হিজরিতে মুতাওয়াঙ্কিলের অপসারণের পর মাত্র বিশ দিন খলিফা ছিলেন।

মুস্তাসিম দুই বছর আট মাস এই পদে বহাল ছিলেন। ৭৯১ হিজরিতে বারকুকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পরিবেশ তৈরি হয়। অবশেষে বারকুক উমারাদের সন্তুষ্ট করার জন্য প্রাক্তন খলিফা মুতাওয়াঙ্কিলের সাথে করা আচরণের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করেন এবং রবিউল আউয়াল ৭৯১ হিজরিতে তিনি মুস্তাসিমকে অপসারিত করেন। তিনি নিজ ঘরে নির্জনবাস গ্রহণ করেন এবং ২৪ জুমাদাল উলা ৮০১ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। [৬]

আল-মুতাওয়াঙ্কিল, মুহাম্মদ বিন মুতাদিদ। তৃতীয়বার: (৭৯১ হিজরি থেকে ৮০৮ হিজরি)

১৪ রবিউল আউয়াল ৭৯১ হিজরিতে মুতাওয়াঙ্কিল তৃতীয়বারের মতো খিলাফতের আসনে বসেন। তাঁর পুরো শাসনকাল সুলতানদের গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। [৭]

[১] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ৩৫৩; আদ-দাইলুত তাম আলা দুওয়ালিল ইসলাম: ৭৭৯ হিজরি।

[২] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ৩৫৩, ত ত নজার।

[৩] আস-সুলুক লি-মা‘রিফতি দুওয়ালিল মুলুক: ৭৭৯ হিজরি।

[৪] আদ-দাইলুত তাম আলা দুওয়ালিল ইসলাম: ৭৭৯ হিজরি, ৭৮৪ হিজরি, ৭৮৫ হিজরি।

[৫] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ৩৫৩; আল-আ‘লাম লিয-যিরিকলি: খণ্ড ৫, পৃ. ৩৯।

[৬] আস-সুলুক লি-মা‘রিফতি দুওয়ালিল মুলুক: ৭৯১ হিজরি, ৮০১ হিজরি।

বরকুকের স্থলে হাজী বিন শাবান সিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু আট মাস পর বরকুক পুনরায় ক্ষমতা দখল করেন। বরকুক মারা গেলে তার পুত্র ফারাজ ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তৈমুর লঙের সিরিয়া আক্রমণ এই সময়েই হয়েছিল। এই সমস্ত ঘটনা খলিফা মুতাওয়াক্কিলের এই তৃতীয় মেয়াদে ঘটেছিল। তবে এই সময়ে কেউ খলিফাকে পদচ্যুত করার চেষ্টা করেনি। মুতাওয়াক্কিল এই পদে থাকাবস্থায় ১৮ রজব ৮০৮ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। [১] মুতাওয়াক্কিলের অনেক সন্তান ছিল। তার পাঁচ পুত্র: আল-মুসতাসীন আব্বাস, আল-মুতাদিদ দাউদ, আল-মুসতাকফী সুলাইমান, আল-কায়েম হামজা এবং আল-মুসতানজিদ ইউসুফ খলিফা হয়েছিলেন। এই সম্মান অন্য কোনো খলিফার ভাগ্যে জোটেনি। [২]

১০. আল-মুসতাসীন, আব্বাস বিন মুতাওয়াক্কিল: (৮০৮ হিজরি হতে ৮১৫ হিজরি)

মুতাওয়াক্কিল মৃত্যুর পূর্বে তার পুত্র আব্বাসের জন্য উত্তরাধিকারের অসিয়ত করে গিয়েছিলেন, ফলে পিতার মৃত্যুর পর শাবান ৮০৮ হিজরিতে আব্বাস ‘আল-মুসতাসীন বিল্লাহ’ উপাধি নিয়ে খলিফা হন। [৩]

সুলতান ফারাজ বিন বরকুকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহী আমিরগণ মহররম ৮১৫ হিজরিতে মুসতাসীনকে খলিফার পাশাপাশি বাদশাহ হিসেবেও মেনে নেন। খলিফা এই বায়াতের পূর্বে আমিরদের কাছ থেকে আনুগত্যের অত্যন্ত দৃঢ় শপথ গ্রহণ করেন। এভাবে খেলাফতের পদটি আবারও প্রাচীন রূপে ফিরে আসে। সমস্ত ফরমান খলিফার অনুমোদন ও মোহরসহ জারি হতে শুরু করে। উলামা ও গুণীজন এতে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন, যাদের মধ্যে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ. অন্যতম ছিলেন।

তবে কিছু দিন পরেই মামলুকদের প্রভাবশালী আমির শাইখ মাহমুদী খলিফার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করতে শুরু করেন। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, খলিফার কোনো আদেশনামা শাইখ মাহমুদীর অনুমোদন ছাড়া জারি হতে পারত না। অবশেষে শাবান ৮১৫ হিজরিতে শাইখ মাহমুদী জোরপূর্বক সালতানাতের বিষয়াবলি নিজের দখলে নিয়ে নেন এবং বাদশাহ হয়ে বসেন। খলিফাকে পূর্বের ন্যায় ক্ষমতাহীন করে দুর্গে নজরবন্দি করা হয়। পরে তাকে পদচ্যুত করে আলেকজান্দ্রিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মুসতাসীন সেখানেই ৮৩৩ হিজরিতে প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। [৪]

১১. আল-মুতাদিদ, দাউদ বিন মুতাওয়াক্কিল: (৮১৫ হিজরি হতে ৮৪৫ হিজরি)

শাইখ মাহমুদী খলিফা মুসতাসীনকে পদচ্যুত করে ৮১৫ হিজরিতে দাউদ বিন মুতাওয়াক্কিলকে খলিফা নিযুক্ত করেন, যিনি ‘আল-মুতাদিদ’ উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি অত্যন্ত দানশীল, বুদ্ধিমান এবং দক্ষ প্রশাসক ছিলেন। তার মজলিসগুলো অত্যন্ত মার্জিত ও চিত্তাকর্ষক হতো। তিনি অনেক জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। দীর্ঘ অসুস্থতার পর ৪ রবিউল আউয়াল ৮৪৫ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তার বয়স ছিল ৭০ বছরের কাছাকাছি। [৫]

১২. আল-মুসতাকফী, সুলাইমান বিন মুতাওয়াক্কিল: (৮৪৫ হিজরি হতে ৮৫৪ হিজরি)

তিনি একজন নেককার, দ্বীনদার ও ইবাদতগুজার ব্যক্তি ছিলেন। অধিকাংশ সময় নীরব থাকতেন। গুনাহ থেকে কঠোরভাবে বেঁচে চলতেন। তার সন্তানরাও মুত্তাকী ও দ্বীনদার ছিল। জিলহজ ৮৫৪ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। বয়স ছিল ৬৩ বছর। [৬]

[১] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ৩৫১, ৩৫২; আয-যাইলুত তাম আলা দুওয়ালিল ইসলাম লিস-সাখাবী: সন ৭৯১ হিজরি; আল-মাওয়াইজ ওয়াল ইতিবার লিল-মাকরিযী: ৩/৩২৩

[২] তারিখুল খুলাফা লিস-সুয়ুতী, পৃ. ৩৫১, ত ত নযযার

[৩] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ৩৫৩ হতে ৩৫৬

[৪] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ৩৫৮, ৩৫৯

[৫] আয-যাইলুত তাম আলা দুওয়ালিল ইসলাম লিস-সাখাবী: সন ৮০৮ হিজরি

[৬] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ৩৫৬, ৩৫৭; আল-আলাম লিয়-যিরিকলী: ২/২৩৩

১৩. আল-কায়িম বি-আমরিলাহ, হামজা বিন মুতাওয়াঙ্কিল: (৮৫৩ হিজরি থেকে ৮৫৯ হিজরি)

খলিফা হওয়ার সময় তার বয়স ছিল ৬৩ বছর। জিহ্বায় কিছুটা জড়তা ছিল। পূর্ববর্তী খলিফাদের বিপরীতে তিনি ছিলেন প্রভাবশালী, সাহসী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি। কিন্তু সুলতানদের সামনে তারও কোনো প্রভাব চলেনি। ৮৫৯ হিজরিতে মিশরের বাদশাহ আল-মালিক আল-আশরাফ ইনালের সাথে তার মনোমালিন্য হয়। সুলতান ৮৫৯ হিজরির জমাদিউল আখিরা মাসে তাকে পদচ্যুত করে আলেকজান্দ্রিয়ায় বন্দি করেন। ৮৬৩ হিজরিতে সেখানেই তার মৃত্যু হয়। তার ভাই প্রাক্তন খলিফা মুসতাইনও একইভাবে পদচ্যুত ও বন্দি হয়ে আলেকজান্দ্রিয়ায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন। দুই ভাইয়ের কবরও পাশাপাশি। [১]

১৪. আল-মুসতানজিদ, ইউসুফ বিন মুতাওয়াঙ্কিল: (৮৫৯ হিজরি থেকে ৮৮৪ হিজরি)

তিনি বার্ষিক্য অবস্থায় ৩ রজব ৮৫৯ হিজরিতে খেলাফতের আসনে বসেন। প্রায় ২৫ বছর এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শেষ দুই বছর পক্ষাঘাতের কারণে অক্ষম অবস্থায় অতিবাহিত হয়। অবশেষে মহররম ৮৮৪ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। বয়স ৯০ বছরের বেশি ছিল। [২]

১৫. আল-মুতাওয়াঙ্কিল, আব্দুল আজিজ বিন ইয়াকুব বিন মুতাওয়াঙ্কিল: (৮৮৪ হিজরি থেকে ৯০৩ হিজরি)

তিনি উচ্চতর নৈতিকতা ও সর্বোত্তম গুণের অধিকারী ছিলেন। সচ্চরিত্র ও অমায়িক ব্যবহারের কারণে জনগণের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি উচ্চমানের সাহিত্যিকও ছিলেন। প্রায় ১৯ বছর এই পদে ছিলেন। ২৯ মহররম ৯০৩ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। [৩]

১৬. আল-মুসতামসিক বিলাহ, ইয়াকুব বিন আব্দুল আজিজ: (৯০৩ হিজরি থেকে ৯১৭ হিজরি)

১ সফর ৯০৩ হিজরিতে খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং পনেরো বছর খলিফা ছিলেন। তার সময়ে মামলুক চেরকাসীয়দের সাম্রাজ্য টালমাটাল ছিল। একের পর এক ছয়জন সুলতান ক্ষমতায় আসেন। প্রথমে মুহাম্মদ বিন কাইতবে, তারপর কানসুহ আশরাফি, তারপর কানসুহ আবু সাঈদ, তারপর জানবালাত, তারপর তুমান বে এবং সবশেষে কানসুহ ঘুরি। অন্যদিকে তুর্কিদের উসমানীয় সাম্রাজ্য দিন দিন উন্নতির দিকে ধাবিত হচ্ছিল। এমন পরিস্থিতিতে মামলুকদের আশ্রয়ে থাকা আব্বাসীয় খলিফাদের আসনও বিপদের সম্মুখীন ছিল। [৪]

১৭. আল-মুতাওয়াঙ্কিল, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াকুব: (৯১৭ হিজরি থেকে ৯২৩ হিজরি)

উসমানীয় সুলতান প্রথম সেলিম যখন ৯২৩ হিজরিতে মিশর দখল করেন, তখন ফেরার পথে শেষ আব্বাসীয় খলিফা মুহাম্মদ আল-মুতাওয়াঙ্কিল এবং মিশরের কাজি আল-কুজাতকে সাথে করে ইস্তাম্বুলে নিয়ে যান। সেখানে এক অনুষ্ঠানে খলিফা মুতাওয়াঙ্কিল রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর তবারুকাৎ এবং পবিত্র চাদর, যা খেলাফতের নিদর্শন ছিল, প্রথম সেলিমের হাতে তুলে দেন। এভাবেই মুতাওয়াঙ্কিলের মাধ্যমে আব্বাসীয় খেলাফতের সূর্য চিরতরে অস্তমিত হয়। [৫]

[১] তারিখুল খুলাফা লিস-সুয়ুতী, পৃ. ৩৫৯, ত. নিয়ার; আয-যাইলুত তাম সুন্নাহ ৮৫৯ হি.

[২] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ৩৫৯, ৩৬০; আয-যাইলুত তাম সুন্নাহ ৮৫৯ হি., ৮৮৩ হি.

[৩] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ৩৬০, ৩৬১

[৪] আল-আলাম লিয-যিরিকলী: ৮/২০০, ত. দারুল ইলম লিল-মালায়ীন

[৫] আল-আলাম লিয-যিরিকলী: ৩/২৯, ত. দারুল ইলম লিল-মালায়ীন; আদ-দাওলাতুল আলিয়াতুল উসমানিয়াহ লিদ-দুকতুর ফরীদ বেগ, পৃ. ১৯৩, ১৯৫

আববাসীয় খিলাফতের (মিসর) মর্যাদার ওপর এক নজর

মামলুক বাহরিয়া ও মামলুক চেরাকাসিয়াদের যুগে কায়রো বনু আববাসের খলিফাদের রাজধানী ছিল। যদিও রাজনীতিতে এই খলিফাদের কোনো ভূমিকা ছিল না, তবুও এর ফলে খিলাফতের পদটিকে সম্পূর্ণ নিরর্থক মনে করা মোটেও সঠিক নয়। প্রাচ্যবিদদের (মুস্তাশরিকিন) লেখায় মিসরের আববাসীয় খিলাফতের প্রতি এক ধরনের উপহাস ও বিদ্রূপ ফুটে ওঠে। তারা বলে যে, এই খলিফাদের কেবল বরকতের জন্য খিলাফতের আসনে বসানো হতো এবং উম্মতের জন্য নেক দোয়া করা ছাড়া তাদের আর কোনো দায়িত্ব ছিল না। প্রাচ্যবিদরা একে মুসলমানদের একটি সেকেলে প্রথা হিসেবে গণ্য করেন যে, তারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে একটি অকেজো পদকে নিজেদের ওপর চাপিয়ে রেখেছিল, যার কোনো কাজ ছিল না এবং অকারণে এর পেছনে সরকারি অর্থ ব্যয় করা হতো।

এই প্রাচ্যবিদদের কাছে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তারা কি ব্রিটিশ রাজমুকুটকেও (Crown) মূল্যহীন ও অকেজো মনে করেন? অথচ দেশের রাজনৈতিক ও সামরিক বিষয়ে রাজা বা রানীর কোনো সম্পর্ক নেই এবং পার্লামেন্ট সমস্ত বিষয়ে সার্বভৌম এবং সমস্ত দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিসভার ওপর ন্যস্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও আজও ব্রিটিশ সমাজে রাজমুকুট ও সিংহাসনকে দেশের মর্যাদা ও গৌরবের প্রতীক হিসেবে একটি মহান মর্যাদা দেওয়া হয় এবং রাজপরিবারের জন্য সরকারি কোষাগার থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়।

নিঃসন্দেহে মিসরের আববাসীয় খলিফারা তাদের কর্মক্ষমতার দিক থেকে অত্যন্ত দুর্বল ছিলেন এবং সাধারণত রাজনীতির সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও উম্মতের আধ্যাত্মিক পৃষ্ঠপোষক হিসেবে তারা একটি সম্মানজনক ও মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান রাখতেন। মামলুক সুলতানরা নিজেদেরকে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত করেছিলেন, আর খলিফাদের কাজ ছিল উম্মতকে সঠিক আকিদা ও আমলের ক্ষেত্রে সঠিক পথের দিকনির্দেশনা দেওয়া। কর্মক্ষেত্রের এই বিভাজন ছিল এক ধরনের সমঝোতা যা খলিফা ও মামলুক সুলতানদের মধ্যে শুরু থেকেই নির্ধারিত ছিল। এই সমঝোতা অনুযায়ী খলিফারা রাষ্ট্র, রাজনীতি এবং জিহাদ ও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় সুলতানদের হাতে ন্যস্ত করেছিলেন।

তবুও প্রত্যেক নতুন শাসক সিংহাসনে আরোহণের আগে বর্তমান খলিফার কাছ থেকে এই ক্ষমতাগুলো নবায়ন করে নিতেন। [১]

[১] আল-হাকিম বিন মুসতাকফির খিলাফতনামা-এর মূল পাঠ্যে নিম্নোক্ত শব্দগুলো এই বিষয়টিই প্রকাশ করছে:

“আর জিহাদের ব্যাপারে আমীরুল মুমিনীন কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তির প্রচেষ্টাই যথেষ্ট, যিনি তাঁর পক্ষ থেকে সিংহাসনের বাইরের সমস্ত বিষয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত। আমীরুল মুমিনীন—আল্লাহ তাঁর রাজত্ব ও ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করুন—তাঁর পক্ষ থেকে এমন এক চোখ নিযুক্ত করেছেন যা কখনো ঘুমায় না, এবং এমন এক তলোয়ার অর্পণ করেছেন যার বিজলি যদি শত্রুদের ওপর এক রাতের জন্যও না চমকায় তবে তাদের কল্পনাগুলো তাদের ওপর বিজয়ী হয়ে যাবে। আমীরুল মুমিনীন শীঘ্রই শত্রুদের দ্বারা বিজিত অঞ্চলগুলো পুনরুদ্ধার করবেন। তিনি এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন যে, পরাজিত শত্রুদের বিরুদ্ধে স্থল ও সমুদ্রে আক্রমণ অব্যাহত রাখতে হবে, এবং যাদের ওপর বিজয় লাভ করা হবে তাদের হত্যা বা বন্দী করা থেকে বিরত হওয়া যাবে না, এবং কোনো শিকল বা বেড়ি খোলা যাবে না। তিনি তাদের ওপর স্থলপথে ঈগলের মতো দ্রুতগামী ঘোড়সওয়ার এবং সমুদ্রপথে কাকের মতো কালো জাহাজ প্রেরণ করতে থাকবেন, যার প্রতিটি একজন দক্ষ শিকারি বীরকে বহন করবে। তিনি সেই সব রাজ্য রক্ষা করবেন যার সীমানা পদদলিত হওয়ার উপক্রম হয়েছে, এবং সেই সব প্রধান শহরগুলো রক্ষা করবেন যা পতাকাবাহী ও সিংহহৃদয় বীরদের মিলনস্থল এবং আমীর, সেনাবাহিনী ও সৈন্যদের ঘাঁটি।”

(তারিখুল খুলাফা, পৃষ্ঠা ৩৩৯)

শুধু মিশরই নয়, বহির্বিশ্বের ইসলামি রাষ্ট্রগুলোও খলিফার কাছ থেকে তাদের শাসনের অনুমোদন একইভাবে গ্রহণ করত যেভাবে তারা বাগদাদের খলিফাদের কাছ থেকে গ্রহণ করত। এমনকি হিন্দুস্তানের মুসলিম বাদশাহরাও সালতানাতের সনদ গ্রহণের জন্য কায়রোতে তাদের দূত পাঠাতেন। [১]

এখানে এই দিকটিও স্মরণযোগ্য যে, দূরবর্তী দেশগুলোতে যদিও খলিফার চূড়ান্ত অপসারণ ও নিয়োগ বাদশাহর হাতে ছিল, তবে রীতি এটাই ছিল যে, এই অপসারণ ও নিয়োগের ক্ষেত্রে উলামা ও ফুকাহাদের ঐকমত্যের প্রতি খেয়াল রাখা হতো। তাছাড়া, পূর্ববর্তী খলিফা যদি কাউকে খেলাফতের উত্তরাধিকারী (ওয়ালি-এ-আহদ) মনোনীত করে যেতেন, তবে খেলাফতের প্রথম হকদার তিনিই হতেন এবং কোনো অনিবার্য কারণ ছাড়া তাকে অপসারিত করা হতো না। এই কারণেই যখন কোনো উপলক্ষে কোনো খলিফার নিয়োগ কেবল বাদশাহর ইচ্ছায় হতো, যেখানে পূর্ববর্তী খলিফার অসিয়ত এবং উলামা ও ফুকাহাদের ঐকমত্যের তোয়াক্কা করা হতো না, তখন সমাজে এর ওপর কঠোর সমালোচনা হতো এবং বাদশাহকে আজ হোক বা কাল তার সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে আসতে হতো। [২]

উলামা ও ফুকাহাগণ খেলাফতের মসনদের জন্য সাধারণত এমন ব্যক্তিত্বের ওপর একমত হতেন যিনি ইলম ও ফজল (জ্ঞান ও মর্যাদা), পরহেজগারি এবং সচ্চরিত্রতায় অনন্য হতেন। এই দীর্ঘ সময়ে কেবল একজন খলিফা ওয়াসিক এমন অতিবাহিত হয়েছেন যিনি বিলাসপ্রিয় ও দুশ্চরিত্র ছিলেন এবং এর কারণও কেবল এটাই ছিল যে, অল্প বয়সেই তার দাদা খলিফা হাকিম তার প্রতি সুউচ্চ প্রত্যাশা রেখে তাকে খেলাফতের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেছিলেন। এবং আরও এই যে, তৎকালীন মামলুক সুলতান মুহাম্মদ আন-নাসির বিন কালাউনও তার খেলাফতের ব্যাপারে একমত হয়েছিলেন। কিন্তু খলিফা হওয়ার পর যখন তার দোষত্রুটিগুলো সামনে এল, তখন উলামায়ে কেরাম তীব্রভাবে তার বিরোধিতা করলেন এবং মসজিদে তার নামে খুতবা পাঠ করতে অস্বীকার করলেন। ফলাফল এই দাঁড়াল যে, এক বছরের মধ্যেই তাকে অপসারিত হতে হলো এবং তার স্থলে হাকিম সানি খলিফা নিযুক্ত হলেন, যার সম্পর্কে উলামায়ে কেরাম লিখেছেন যে, তিনি ছিলেন রাতের তাহাজ্জুদ গুজার এবং দিনের সিপাহি। [৩]

সংক্ষেপে এই যে, এই যুগের অধিকাংশ খলিফা দ্বীনদারি এবং ইলম ও আদবের (জ্ঞান ও সাহিত্য) প্রতি আগ্রহের ক্ষেত্রে বনু আব্বাসের স্বর্ণযুগের মসনদ অলংকৃতকারীদের উত্তরসূরি ছিলেন। অবশ্য তাদের ক্ষমতা ছিল অত্যন্ত সীমিত, যা তারা ইতিবাচক কাজে ব্যয় করতেন। তারা ইলমি কর্মকাণ্ডের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। উলামা, ফুকাহা এবং কাজীদের সাথে সুসম্পর্ক রাখতেন এবং দ্বীনি খিদমতে উৎসাহ প্রদানের জন্য তাদের উপটৌকন প্রদান করতেন। [৪] কোনো কোনো খলিফা সামরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে সেগুলোকে উৎসাহিত করার চেষ্টা করতেন। [৫] কোনো কোনো খলিফা গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধগুলোতে মুজাহিদদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শরিক হতেন এবং তাদের উপস্থিতি মুসলমানদের মধ্যে এমন উদ্দীপনা সৃষ্টি করত যে, তারা তাতারীদের পঙ্গপাল সদৃশ বাহিনীর সাথে নির্ভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। [৬] কোনো কোনো খলিফা হাদিস শ্রবণ করতেন এবং এর দরসও (পাঠ) দিতেন। [৭] কোনো কোনো খলিফা জুহদ (দুনিয়াবিমুখতা) ও ইবাদতে প্রসিদ্ধ ছিলেন, যেমনটি খলিফা মুস্তাকফি বিল্লাহ সানি সম্পর্কে বলা হতো যে, তিনি বালেগ হওয়ার পর কখনো কবির গুনাহে লিপ্ত হননি। তিনি হাফেজ ইবনে হাজার রহ.-এর সমসাময়িক ছিলেন। ইমাম সুয়ুতী রহ.

[১] দেখুন খলিফাদের অবস্থা: মুস্তাকফি, হাকিম সানি, মুস্তাইন, মুতাজিদ ইত্যাদি (তারিখুল খুলাফা, ৩৩০ থেকে ৩৫৬, ত. নিযার)

[২] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ৩৫২, ত. নিযার

[৩] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ৩৩৩ থেকে ৩৩৫, ত. নিযার

[৪] আদ-দুরারুল কামিনাহ: ১/২৩১, তারজুমাতুল মুস্তাকফি বিন আল-হাকিম

[৫] আদ-দুরারুল কামিনাহ: ১/৩২, ত., তারজুমাতুল কায়িম বি-আমরিল্লাহ

[৬] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ৩৩০, ত. নিযার; আদ-দুরারুল কামিনাহ: ১/২৩১, ত., তারজুমাতুল মুস্তাকফি বিন আল-হাকিম

[৭] আদ-দুরারুল কামিনাহ: ১/৩২, ত., তারজুমাতুল হাকিম বিন আল-মুস্তাকফি

তঁার পিতা তঁার নিকটতম আলেমদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মুস্তাকফী সম্পর্কে ইমাম সুযুতী (রহ.)-এর বক্তব্য হলো:

“আমরা তঁার ঘরে এবং তঁার অনুগ্রহের ছায়ায় লালিত-পালিত হয়েছি, তঁার সন্তান-সন্ততি দ্বীনদারী, ইবাদত এবং কল্যাণের দিক থেকে সর্বোত্তম। আমি মনে করি না যে, উমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.)-এর সন্তানাদি ব্যতীত পৃথিবীর বুকে অন্য কোনো খলিফার সন্তানাদি এই খলিফার পরিবার-পরিজনের চেয়ে বেশি ইবাদতগুজার অতিবাহিত হয়েছে।” [১]

সুলতান আল-মালিকুজ জাহির বারকুক খলিফা মুস্তাকফীকে অত্যন্ত সম্মান করতেন, যখন তঁার মৃত্যু হলো তখন সুলতান নিজে জানাজায় কাঁধ দিয়েছিলেন এবং কবর পর্যন্ত গিয়েছিলেন। [২]

যদিও কায়রোর আব্বাসী খলিফাগণ রাজনৈতিক বিষয়াবলি থেকে দূরে ছিলেন, তবে চেরকাসীয়দের দ্বিতীয় শাসক ফারাজ বিন বারকুকের শাসনামলে খলিফা মুস্তাইন বিল্লাহ রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্ব গ্রহণের একটি সুযোগ পেয়েছিলেন। এটি সেই সময় ছিল যখন মামলুক সরদাররা সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিল। এই সুযোগে ৮১৫ হিজরীর মহরম মাসে সালতানাতের আমীরগণ একটি দৃঢ় অঙ্গীকারের মাধ্যমে এই সংবিধান অনুমোদন করেছিলেন যে, সরকারের ক্ষমতা খলিফার হাতে থাকবে এবং সুলতান নায়েব (প্রতিনিধি) হিসেবে কাজ করবেন।

এই সিদ্ধান্তে মুসলিম বিশ্বের আলেম ও ফকীহগণ অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.), যিনি সেই যুগের সবচেয়ে বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ছিলেন, এই আনন্দদায়ক বিপ্লবের ওপর একটি কাসিদা লিখেছিলেন। কিন্তু আফসোস যে, মাত্র কয়েক দিন পরেই সালতানাতের আমীরগণ তাঁদের অঙ্গীকার থেকে বিচ্যুত হয়ে তাঁদের মামলুক সরদার শেখ মাহমুদী আল-মুয়াইয়্যাদের সাথে হাত মেলান, যিনি খলিফাকে বাধ্য করে কেবল সালতানাতের ক্ষমতা পুনরায় মামলুকদের নামে লিখিয়ে নেননি বরং খলিফাকে পদচ্যুতও করেছিলেন। মুস্তাইন এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে সিরিয়ার ফকীহদের কাছে ফতোয়া চেয়েছিলেন, সবাই ফতোয়া দিয়েছিলেন যে শেখ মাহমুদীর জন্য খলিফাকে পদচ্যুত করা জায়েজ ছিল না। তবে এই ফতোয়াকে গুরুত্ব না দিয়ে শেখ মাহমুদী মুস্তাইনকে বন্দি করে ফেলেন। [৩]

খলফায়ে বনু আব্বাসের এই সময়কাল মুতাওয়াঙ্কিল সানি (তৃতীয়) পর্যন্ত চলেছিল। অবশেষে উসমানীয় তুর্কিদের প্রখ্যাত শাসক সুলতান সেলিম আউয়াল ৯২৩ হিজরীতে মিশরের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে খলিফার কাছ থেকে ইস্তফা গ্রহণ করেন এবং খিলাফতকে নিজের বংশে স্থানান্তরিত করেন। কায়রোর আব্বাসী খিলাফত এবং মামলুক শাসনের অবসান একই সাথে ঘটেছিল। এভাবে ২৬৪ বছর পূর্ণ করে কায়রোর আব্বাসী খিলাফতের সমাপ্তি ঘটে। এর সাথে যদি বাগদাদের আব্বাসী খিলাফতের সময়কাল যোগ করা হয়, তবে বনু আব্বাসের খিলাফতের সময়কাল ৯০৭ বছর পর্যন্ত পৌঁছায়। এভাবে এটি বলা যথার্থ যে, উম্মাহর ইতিহাসে বনু আব্বাসের খিলাফতের সময়কাল সবচেয়ে দীর্ঘ।

[১] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ৩৫৯, ত ত নজার

[২] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ৩৫৯, ত ত নজার

[৩] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ৩৫৩ থেকে ৩৫৬, ত ত নজার

দ্রষ্টব্য: বাহরি মামলুক, চেরকাসীয় মামলুক এবং মিশরের বনু আব্বাস খলিফাদের অবস্থা বর্ণনায় আমরা সংক্ষেপ করেছি। কারণ হলো, আমাদের লক্ষ্য হলো মুসলিম উম্মাহর শিক্ষণীয় ইতিহাস লেখা। সুতরাং শাসকদের সেই সমস্ত অবস্থা সামনে আনা আমাদের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, যা আমীরদের পারস্পরিক রেষায়েষি, কর্মকর্তাদের পদচ্যুতি ও নিয়োগ, পারস্পরিক মতভেদ, প্রাসাদ ষড়যন্ত্র, শাহজাদা, উজির এবং সালতানাতের আমীরদের ব্যক্তিগত অবস্থা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাছাড়া এই পরিস্থিতিগুলোতে একই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে এবং পাঠক শিক্ষা গ্রহণের পরিবর্তে এই বিষয়বস্তু থেকে অত্যন্ত বিরক্ত হন।

ছক: কায়রোর আব্বাসীয় খেলাফত

রজব ৬৫৯ হিজরী থেকে ৯২৩ হিজরী

১২৬০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দ

২৬৪ বছর

নসর খলিফা খেলাফতের সময়কাল পরিণতি সমসাময়িক সুলতানগণ বিশেষ কথা

১ মুস্তানসির বিল্লাহ রজব ৬৫৯ হিজরী থেকে মহরম ৬৬০ হিজরী (জুন থেকে ডিসেম্বর ১২৬১ খ্রিষ্টাব্দ) জিহাদে নিখোঁজ বিবাস আউয়াল খেলাফতের পুনরায় সূচনা

২ হাকেম আউয়াল মহরম ৬৬১ হিজরী থেকে জমাদিউল আউয়াল ৭০১ হিজরী (১২৬২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩০২ খ্রিষ্টাব্দ) মৃত্যু বিবাস আউয়াল, বারকা, সালামিশ, কালাউন, নাসির বিন কালাউন, কিতবুগা, লাজিন ৪০ বছরের দীর্ঘ খেলাফত

৩ মুস্তাকফী আউয়াল জমাদিউল আউয়াল ৭০১ হিজরী থেকে শাবান ৭৪০ হিজরী (১৩০২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩৪০ খ্রিষ্টাব্দ) নজরবন্দি অবস্থায় মৃত্যু চাশনিগির, নাসির বিন কালাউন ৩৫ বছরের দীর্ঘ খেলাফত

৪ ওয়াসিক বিল্লাহ জিলকদ ৭৪০ হিজরী থেকে জিলহজ ৭৪১ হিজরী (১৩৪০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩৪১ খ্রিষ্টাব্দ) অপসারিত নাসির বিন কালাউন উসমানীয় তুর্কিদের উত্থান

৫ হাকেম সানি জিলহজ ৭৪১ হিজরী থেকে জমাদিউস সানি ৭৫৩ হিজরী (১৩৪১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩৫২ খ্রিষ্টাব্দ) মৃত্যু আবু বকর, কুচুক, আহমদ, ইসমাইল, শাবান, হাজি আউয়াল, হাসান, সালেহ আল-মালিক আন-নাসিরের আটজন নামমাত্র শাসক পুত্রের শাসনামলে মর্যাদা ও স্থিরতার সাথে সময় অতিবাহিত করেন।

চতুর্থ খণ্ড

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

নাম সময়কাল অবস্থা সমসাময়িক শাসক মন্তব্য

৬. মুতাজিদ আউয়াল জুমাডিউল আখিরা ৭৫৩ হিজরী থেকে জুমাডিউল উলা ৭৬৩ হিজরী (১৩৫২ থেকে ১৩৬২ খ্রিষ্টাব্দ) মৃত্যু হাসান বিন নাসির

৭. মুতাওয়াঙ্কিল আউয়াল, প্রথমবার জুমাডিউল উলা ৭৬৩ হিজরী থেকে রবিউল আউয়াল ৭৭৯ হিজরী (১৩৬২ থেকে ১৩৭৭ খ্রিষ্টাব্দ) অপসারিত মনসুর মুহাম্মদ বিন হাজি, আল-মালিকুন নাসির সানি, মনসুর বিন শাবান, হাজি সানি, জহির বরকুক আল-মালিকুন নাসিরের চার নাতি-পুত্রের শাসনামলে মর্যাদা ও একাগ্রতার সাথে সময় অতিবাহিত করেন। এই সময়েই চেরকাসীয়রা প্রভাবশালী হয়ে ওঠে এবং তাকে অপসারিত করে।

৮. মুস্তাসিম, জাকারিয়া, প্রথমবার ২০ দিন, রবিউল আউয়াল ৭৭৯ হিজরী (আগস্ট ১৩৭৭ খ্রিষ্টাব্দ) অপসারিত

মুতাওয়াঙ্কিল আউয়াল, দ্বিতীয়বার ২৩ রবিউল আউয়াল ৭৭৯ হিজরী থেকে ১লা রজব ৭৮৫ হিজরী (১৩৭৭ থেকে ১৩৮৩ খ্রিষ্টাব্দ) অপসারিত

৯. ওয়াসিক সানি ১লা রজব ৭৮৫ হিজরী থেকে ১৯ শাওয়াল ৭৮৮ হিজরী (১৩৮৩ থেকে ১৩৮৬ খ্রিষ্টাব্দ) মৃত্যু জহির বরকুক তৈমুর লঙের আক্রমণ

মুস্তাসিম জাকারিয়া, দ্বিতীয়বার ১৯ শাওয়াল ৭৮৮ হিজরী থেকে ৩ রবিউল আউয়াল ৭৯১ হিজরী (১৩৮৬ থেকে ১৩৮৯ খ্রিষ্টাব্দ) অপসারিত জহির বরকুক

মুতাওয়াঙ্কিল আউয়াল, তৃতীয়বার ৩ রবিউল আউয়াল ৭৯১ হিজরী থেকে ১৮ রজব ৮০৮ হিজরী (১৩৮৯ থেকে ১৪০৬ খ্রিষ্টাব্দ) মৃত্যু জহির বরকুক, ফারাজ বিন বরকুক দীর্ঘ খিলাফতকাল

১০. মুস্তাইন রজব ৮০৮ হিজরী থেকে মহররম ৮১৫ হিজরী (১৪০৬ থেকে ১৪১২ খ্রিষ্টাব্দ) অপসারিত ফারাজ বিন বরকুক, শায়খ মাহমুদী খিলাফতের সাথে সালতানাতকে একীভূত করার প্রচেষ্টা

মিশরের আববাসীয় খলিফাগণ

- ১১ | মুস্তাইন | শাবান ৮১৫ হি. থেকে ৪ রবিউল আউয়াল ৮৩৫ হি. (১৪১২, ১৪৩১ খ্রি.) | ওফাত | আহমদ বিন শায়খ, তাতার, মুহাম্মদ বিন তাতার, আশরাফ কাইতবাই | ২৩ বছর দীর্ঘ খিলাফত
- ১২ | মুতাদিদ সানি | ৪ রবিউল আউয়াল ৮৩৫ হি. থেকে ২৯ জিলহজ ৮৪৫ হি. (১৪৩১, ১৪৪১ খ্রি.) | ওফাত | জকমক |
- ১৩ | কায়েম | ২৯ জিলহজ ৮৪৫ হি. থেকে জমাদিউল আখিরা ৮৫৯ হি. (১৪৪১ থেকে ১৪৫৫ খ্রি.) | মাযুল | জকমক, উসমান বিন জকমক, ইনাল আলাই |
- ১৪ | মুসতানজিদ | ৩ রজব ৮৫৯ হি. থেকে ১৪ মহররম ৮৮৩ হি. (১৪৫৫ থেকে ১৪৭৮ খ্রি.) | ওফাত | আশরাফ ইনাল, আহমদ বিন ইনাল, খুশকদম, বিলবাই, তমরবুগা, খায়রবেগ, আশরাফ কাইতবাই | ২৫ বছর দীর্ঘ খিলাফত
- ১৫ | মুতাওয়াঙ্কিল সানি | ১৬ মহররম ৮৮৩ হি. থেকে ২৯ মহররম ৯০৩ হি. (১৪৭৮ থেকে ১৪৯৭ খ্রি.) | ওফাত | আশরাফ কাইতবাই, মুহাম্মদ কাইতবাই আন-নাসির |
- ১৬ | মুস্তামসিক | ৯০৩ হি. থেকে ৯১৭ হি. (১৪৯৭ থেকে ১৫১১ খ্রি.) | ওফাত | মুহাম্মদ কাইতবাই নাসির, কানসুহ আশরাফি, জানবালাত আশরাফ, আদিল তুমান বাই, কানসুহ ঘুরি | ২১ বছর খিলাফত, মামলুকদের পতনের যুগ
- ১৭ | মুতাওয়াঙ্কিল সালিহ | ৯১৭ হি. থেকে ৯২৩ হি. (১৫১১ থেকে ১৫১৭ খ্রি.) | ইস্তীফা | কানসুহ ঘুরি, তুমান বাই সানি | শেষ আববাসীয় খলিফা, সুলতান সেলিম আউয়ালের পক্ষে পদত্যাগ করেছেন।

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

চতুর্থ খণ্ড

সপ্তম অধ্যায়

মঙ্গোল সালতানাত

এবং

ইসলামের দাওয়াত

৬১৮ থেকে ৭৬৫ হিজরি

১২২১ থেকে ১৩৬৪ ঈসাব্দ

অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই

মুসলিম বিশ্বের ওপর মঙ্গোলদের দখলের পর সপ্তম হিজরি শতাব্দীকে মুসলিম বিশ্বের ইতিহাসে এই দিক থেকে সবচেয়ে নাজুক এবং কঠিনতম সময় বলা যেতে পারে যে, একটি অত্যন্ত যুদ্ধবাজ এবং নির্দয় জাতির সর্বাঙ্গিক আক্রমণ মুসলিম বিশ্বকে ভৌগোলিকভাবে তছনছ করে দিয়েছিল এবং মুসলমানদের এত বড় পরিসরে গণহত্যা করেছিল যে তাদের বড় বড় প্রদেশ এবং দেশগুলো জনসংখ্যা থেকে প্রায় শূন্য হয়ে গিয়েছিল। এই যুগের একজন বুজুর্গ বলেন যে, মক্কায় আমার সাথে ইরাকের একজন আলেম নূরুদ্দীন বিন জাজ্জাজ-এর দেখা হয়, যাঁর সাথে তাঁর ভাতিজাও ছিল। তিনি জানালেন যে, শুধু ইরাকেই ২৪ হাজার আলেম নিহত হয়েছেন এবং আমি ও আমার এই ভাতিজা ছাড়া আর কোনো আলেম জীবিত নেই। [১] তাতারীরা ৬১৬ হিজরি থেকে ৬৫৮ হিজরি পর্যন্ত ৪২ বছরের সময়কালে মুসলিম বিশ্বের প্রায় ৫০ লক্ষ বর্গকিলোমিটার এলাকা দখল করেছিল [২] এবং এই সময়ে কমবেশি পৌনে দুই কোটি মুসলমানকে শহীদ করেছিল। [৩]

অন্যদিকে একই সময়ে মুসলমানদের অবশিষ্ট প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করার জন্য সমস্ত বিভ্রান্তিকর শক্তি ইসলামের আদর্শিক সীমানা পদদলিত করতে উঠেপড়ে লেগেছিল। তাতারীরা নিজেরা শামান ধর্মের অনুসারী ছিল, যা কোনো আসমানি কিতাব বা পয়গম্বরে বিশ্বাসী ছিল না, বরং খোদার অস্পষ্ট ধারণার সাথে মূর্তিপূজা, কুসংস্কার এবং কিছু রীতিনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। খ্রিস্টানরা যারা ক্রুসেড যুদ্ধে আইয়ুবী বংশের প্রতিরোধ শক্তির মোকাবিলা করতে পারেনি, তারা মিশনারি প্রোগ্রামের অধীনে অধিকৃত ও অনধিকৃত মুসলিম এলাকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ছড়িয়ে পড়ে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করছিল, তাদের তাতার শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। চেঙ্গিস খান এবং তার উত্তরসূরীরা খ্রিস্টান পাদ্রী ও ধর্মপ্রচারকদের সম্মান ও শ্রদ্ধা করত এবং তাদের প্রচারের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করত। চেঙ্গিস খানের কিছু ছেলে খ্রিস্টান নারীদের বিয়ে করেছিল। হালাকু খানের মা এবং তার স্ত্রী উভয়ই খ্রিস্টান ছিলেন। খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকদের বিশেষ আশা ছিল যে তাতার শাসকদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ক্রুশের কোলে এসে পড়বে। বৌদ্ধ ধর্মের ধর্মীয় নেতাদেরও পোয়াবারো হয়েছিল এবং তারা সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে মূর্তিপূজা প্রচারের জন্য আশ্রয় চেষ্টা করছিল। চেঙ্গিস খান বৌদ্ধ ধর্মীয় নেতাদের প্রতি গভীর ভক্তি রাখতেন। রাফেজি মতবাদের পতাকাবাহীরাও তাতার শাসকদের সমর্থন লাভ করেছিল।

[১] রেহলা ইবনে বতুতা: ৩/২৩, ত: একাডেমি আল-মাগরিবিয়া রাবাত।

[২] মুসলিম বিশ্বে তাতারীদের অধিকৃত দেশগুলো বর্তমান যুগে তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, কিরগিজিস্তান, আফগানিস্তান, ইরান, ইরাক এবং সিরিয়ার পুরো এলাকা নিয়ে গঠিত ছিল। এর পাশাপাশি পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া, পঞ্জাব এবং বেলুচিস্তানের ওপরও কিছুকাল তাদের আধিপত্য ছিল। তুরস্কের পূর্ব অঞ্চল কিছুটা তাদের দখলে এবং কিছুটা তাদের আক্রমণের মুখে ছিল। এই সমষ্টি প্রায় এতটাই হয়।

[৩] এই হিসাব বিভিন্ন শহরে নিহতদের প্রাপ্ত সংখ্যার গড় বের করে করা হয়েছে, যার বিস্তারিত চতুর্থ অধ্যায়ের ২২০ পৃষ্ঠার ২ নম্বর টীকায় উল্লেখ করা হয়েছে।

তারিখ-ই উম্মত-ই মুসলিমা (মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস)

এই পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছিল যে, আগামী শতাব্দীর মধ্যে ভৌগোলিক ও আদর্শিক উভয় ফ্রন্টেই ইসলাম সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হবে এবং বিশ্বে ইসলামের নাম নেওয়ার মতো কাউকে খুঁজেও পাওয়া যাবে না। যেসব ঐতিহাসিক সেই যুগের ইতিহাস সংকলন করছিলেন, তারা এই ধরনের আশঙ্কায় ঘেরা ছিলেন এবং তাদের আশা ছিল না যে তাদের ইতিহাস পাঠকারী আগামী প্রজন্ম দেখবে যে, মরক্কো পর্যন্ত এবং ভারত মহাসাগর থেকে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত সবদিকে ইসলামী পতাকা উড়ছে এবং এই সমস্ত দেশগুলোতে এবং এগুলোর প্রতিটি কোণায় মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ ও পাঠাগার আবাদ রয়েছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, পরবর্তী শতাব্দীতে গত শতাব্দীর সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ও বিপদাপদ—যার ফলে ইসলাম মুছে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল—তার কোনো বিশেষ প্রভাব অবশিষ্ট দেখা যায় না। ইতিহাসের এই অদ্ভুত বিপ্লব এবং বিস্ময়কর অলৌকিক ঘটনা, যা ঐতিহাসিকদের সমস্ত অনুমানকে ভুল প্রমাণিত করেছে, তা কীভাবে ঘটল? এই রহস্য সমাধানের জন্য আমাদের মুসলিম বিশ্বের ওপর তাতারীদের আধিপত্যের পর মুসলমানদের মানসিক অবস্থা, তাদের মনস্তত্ত্ব, তাদের অতুলনীয় ধৈর্য ও সহনশীলতা, রণকৌশল এবং সেই প্রচেষ্টাসমূহ পর্যালোচনা করতে হবে, যা তারা অসহায়ত্ব ও নিঃস্বতার সেই যুগে ইসলামের প্রচার ও সুরক্ষার জন্য চালিয়ে গিয়েছিলেন।

সপ্তম শতাব্দীর শুরুতে সংঘটিত এই রক্তক্ষয়ী বিপ্লব মুসলমানদের মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে কতটা গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছিল? এর আন্দাজ কেবল তিনিই করতে পারেন যিনি মুসলমানদের দুঃখকে নিজের দুঃখ মনে করেন এবং যিনি সংবেদনশীল মন ও দরদী হৃদয়ের অধিকারী। সেই সময়ের মুসলমানরা বর্তমান যুগের মুসলমানদের তুলনায় যে কোনো বিচারেই শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাদের মধ্যে ধর্মীয় চেতনা, জাতীয় মর্যাদা এবং ধর্মীয় আত্মমর্যাদাবোধ আজকের মুসলমানদের চেয়ে বেশি ছিল। যদিও তারা অভ্যন্তরীণ ভাঙন এবং আধ্যাত্মিক দুর্বলতার শিকার ছিলেন, তবুও তারা বিশ্বে একটি উন্নত শির, মর্যাদাবান এবং আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। সপ্তম হিজরী শতাব্দীর শুরুতে যখন তারা জাতি হিসেবে উন্নতির সেই শিখর থেকে মাথা নিচু করে নিচে আছড়ে পড়ল এবং তাদের বাহ্যিক কাঠামোও ধ্বংস হতে দেখা গেল, তখন তাদের অবশিষ্ট ব্যক্তিদের ওপর এই তীব্র ধাক্কার ফলে যত নেতিবাচক প্রভাবই পড়ত, তা কমই ছিল। এই মুহূর্তে তারা যদি হতাশা ও নিরাশার চাদর গায়ে জড়িয়ে নিতেন এবং দ্বীনের সুরক্ষা ও প্রচার থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে গিয়ে অখ্যাত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতেন, তবে মানব মনস্তত্ত্বের আলোকে এত বড় সামষ্টিক ক্ষতির পর তাদের কাছ থেকে এটাই প্রত্যাশিত ছিল। তারা যদি নিরাশার বিষ পান করে সামষ্টিক মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতেন, তবে তা যুক্তিসঙ্গত ছিল। যদি এত বড় গণহত্যা থেকে বেঁচে যাওয়া মুসলমানরা নিজেদের বিবেকের কণ্ঠরোধ করে অন্য কোনো ধর্মের সাথে যুক্ত হয়ে যেতেন, তবে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া অন্যান্য ধর্মের ইতিহাস বিবেচনায় নিলে এটিও অসম্ভব ছিল না।

কিন্তু এখানে আমরা একটি বিস্ময়কর পার্থক্য অনুভব করি। তা হলো, যদিও দুঃখ ও শোকে মুসলমানদের অবস্থা শোচনীয় ছিল এবং জাগতিক কার্যকারণের সীমানায় আশার কোনো আলো দূর-দুরান্ত পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল না, তবুও তারা হতাশার সেই চরম সীমায়...

...পৌঁছাননি যেখানে বান্দা স্রষ্টার রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যায়, যেখানে অন্তর কুফরের দ্বারা কলুষিত হতে শুরু করে এবং জিহ্বায় আল্লাহর প্রতি অভিযোগ ও অনুযোগের শব্দ চলে আসে। এটি ছিল সেই বিপদগ্রস্ত মানুষদের ওপর আল্লাহ তাআলার বিশেষ মেহেরবানি যে, তারা আল্লাহর ওপর ঈমানের দৌলত থেকে বঞ্চিত হননি। তারা আল্লাহর রহমতের সাথে আশা টিকিয়ে রেখেছিলেন, কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর ওয়াদাগুলোর ওপর তাদের বিশ্বাস অটুট ছিল। এই বিপদগুলো নিরাশার বিষ মিশিয়ে তাদের ঈমানকে ঘোলাটে করতে পারেনি, বরং এই পরীক্ষার অগ্নিকুণ্ড থেকে তাদের ঈমানের রঙ, যা বস্তুবাদের ময়লা-আবর্জনায় ম্লান হয়ে গিয়েছিল, আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

এই পরিস্থিতিতে বাহ্যত কিছু করা অসম্ভব মনে হচ্ছিল, কিন্তু মুসলমানরা রব্বুল আলামীনের সাহায্যের ওপর ভরসা করে চরম অসহায়ত্বের মাঝে রাতের ক্রন্দন এবং দিনের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামকে নিজেদের অভ্যাসে পরিণত করে ইসলামের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রাম শুরু করে দিলেন। এই প্রচেষ্টা ও তৎপরতাগুলো কোনো সুসংগঠিত পরিকল্পনা বা কোনো একক ব্যক্তির নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছিল না, আর না এগুলোর সম্পর্ক কোনো বিশেষ দেশ, কোনো বিশেষ এলাকা বা কোনো একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের সাথে ছিল। বরং একটি সাধারণ জাগরণ এবং অভ্যন্তরীণ আবেগের বশবর্তী হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত ও অঞ্চলে অবস্থিত অধিকৃত ও স্বাধীন মুসলিম দেশগুলোর একনিষ্ঠ মুসলমানরা নিজ নিজ অবস্থান থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বীনের হেফাজত ও পাহারাদারির জন্য নিজেদের সাধ্যমতো চেষ্টা শুরু করে দিলেন। তাদের এই প্রচেষ্টাগুলো, যা বাহ্যত সুঁই দিয়ে পাহাড় ছিদ্র করার সমতুল্য ছিল, সেগুলোর ওপর আল্লাহ জাল্লা শানুহুর বিশেষ রহমত নিপতিত হলো এবং ধীরে ধীরে পরিস্থিতির পরিবর্তন হতে শুরু করল।

প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত ইসলামের আদর্শিক ও ভৌগোলিক সীমান্তে বারবার এমন ধ্বংসাত্মক হামলা হয়েছে যে, যদি রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে এই দ্বীন রক্ষার ও সাহায্যের ওয়াদা এবং এর রক্ষণাবেক্ষণ ও বিকাশের জন্য দাওয়াত ও জিহাদের বিস্তারিত ও সর্বব্যাপী ব্যবস্থা না থাকত, তবে নিশ্চিতভাবেই অন্যান্য প্রাচীন ধর্মের মতো ইসলামও অনেক আগেই বিলুপ্ত হয়ে যেত। কিন্তু “দাওয়াত ও জিহাদের ব্যবস্থা” দ্বীনের ফল-মূলের বিনাশ এবং এর শাখা-প্রশাখা ঝলসে যাওয়া সত্ত্বেও এর কাণ্ড ও শিকড়কে উপড়ে যেতে দেয়নি। যখনই এর ভৌগোলিক সীমান্তে শত্রুরা আক্রমণ করেছে, তার প্রতিক্রিয়ায় উম্মতে মুসলিমাহর এক সৌভাগ্যবান দল জিহাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে এবং তারা সফলতার সাথে আলম-এ-ইসলামের ভৌগোলিক সীমান্ত রক্ষা করেছে। ইসলামের আদর্শিক সীমান্তে যখনই বাতিলপন্থীরা হামলা চালিয়েছে, উম্মতের দৃঢ়সংকল্প সংস্কারক ও দাঈগণ তার মোকাবিলায় দাঁড়িয়ে গেছেন এবং তারা প্রতিটি যুগে ইসলামকে তার আসল রূহের সাথে সংরক্ষিত রেখেছেন।

অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই চার ফ্রন্টে:

ইসলামের অস্তিত্ব রক্ষা ও বিকাশের জন্য মুসলমানদের এই তৎপরতাগুলোকে আমরা চার ভাগে বিভক্ত করতে পারি:

- স্বাধীন মুসলিম দেশগুলোতে জিহাদ আন্দোলন
- তাতারীদের ইসলামের দাওয়াত
- মুসলমানদের সংস্কার ও দিকনির্দেশনা
- ইলমি ঐতিহ্য সংরক্ষণের কাজ

প্রথম ফ্রন্ট..... স্বাধীন মুসলিম দেশগুলোতে জিহাদ আন্দোলন

তাতারীদের ভয়াবহ আক্রমণের সামনে কেবল দুটি দেশ নিজেদের রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল: একটি মিশর, অন্যটি হিন্দুস্তান। যদিও তাতারী বাহিনী এই উভয় দেশের সীমান্তে আক্রমণ ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিল এবং অর্ধ শতাব্দী পর্যন্ত এই উভয় মুসলিম সালতানাতের অস্তিত্ব বিপদের মুখে ছিল, কিন্তু আংশিক ক্ষতি সত্ত্বেও এখানকার শাসকরা তাদের দেশগুলোকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। আল্লাহ তাআলা মিশর ও হিন্দুস্তানকে এমন যোগ্য নেতৃত্ব দান করেছিলেন যারা তাতারী আক্রমণের মোকাবিলায় পূর্ণাঙ্গ প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন এবং পূর্ববর্তী মুসলিম শাসকদের ত্রুটিগুলো পুষিয়ে দিয়েছিলেন। মিশরে সুলতান সাইফউদ্দীন কুতুজ এবং তাঁর পরে আল-মালিকুজ জাহির রুকনুদ্দীন বাইবার্স আল-বুন্দুকদারী, সাইফউদ্দীন কালারউন এবং মুহাম্মদ আন-নাসির পূর্ণ সাহসিকতার সাথে কেবল মিশরের প্রতিরক্ষা করেননি বরং তাতারীদের সিরিয়ার সমস্ত অধিকৃত এলাকা থেকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য করেছিলেন [১]।

হিন্দুস্তানে সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুতমিশ এবং তাঁর উত্তরসূরীরা দিল্লি সালতানাতের (যা গঙ্গা-যমুনা উপত্যকা থেকে পাঞ্জাব ও সিন্ধু পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল) প্রতিরক্ষার জন্য ব্যাপক সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। ৬৩৯ হিজরী (১২৪১ খ্রিষ্টাব্দ) সালে তাতারীরা লাহোরে আক্রমণ করেছিল যাতে মুসলমানদের অনেক ক্ষতি হয়েছিল এবং লাহোর শহর আংশিকভাবে ধ্বংস হয়েছিল, কিন্তু তাতারীরা সেখানে স্থায়ী দখল প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। হিন্দুস্তানের মুসলিম সালতানাতের ওপর তাতারীদের আক্রমণ এর পরেও অব্যাহত ছিল, কিন্তু গিয়াসউদ্দীন বলবন, জালালউদ্দীন খলজী এবং আলাউদ্দীন খলজীর মতো সাহসী বাদশাহরা তাদের কোনো প্রচেষ্টাই সফল হতে দেননি। এই ধারায় আলাউদ্দীন খলজীর ভূমিকা সবচেয়ে উজ্জ্বল, যিনি ছয়টি যুদ্ধে তাতারীদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে হিন্দুস্তান সম্পর্কে তাদের সংকল্প চিরতরে বদলে দিয়েছিলেন [২]।

এটিও ইতিহাসের এক বিস্ময় যে তাতারী আক্রমণকারীরা বড় বড় খানদানী বাদশাহ এবং খোয়ারিজম ও বাগদাদের মতো শক্তিশালী ইসলামী সালতানাতগুলোকে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল, কিন্তু মিশর ও হিন্দুস্তানের তুলনামূলক কম শক্তিশালী এবং গোলাম বংশের সাথে সম্পৃক্ত শাসকদের মোকাবিলায় তারা সর্বদা পরাজয়ের মুখ দেখেছে।

[১] তাতারীদের বিরুদ্ধে জিহাদে মামলুক সুলতানদের বীরত্বগাথার বিবরণ আপনারা গত পৃষ্ঠাগুলোতে পড়ে এসেছেন। অন্যদিকে হিন্দুস্তানের মুসলিম বাদশাহদের প্রতিরক্ষামূলক প্রচেষ্টার কথা পঞ্চম খণ্ডের “হিন্দুস্তানের সুলতানগণ” অধ্যায়ে আসবে।

[২] তারিখ-ই-ফিরিশতা, মুহাম্মদ কাসিম ফিরিশতা (উর্দু অনুবাদ: মুশফিক খাজা: ১/৩৩৩ থেকে ৩৭২, আল-মিজান লাহোর)।

দ্বিতীয় ফ্রন্ট..... তাতারীদের মধ্যে ইসলাম প্রচার

তাতারীদের ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করা এবং তাদের ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার কাজটি ছিল অত্যন্ত কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ। সেই তাতারীরা যারা মুসলমানদের গণহত্যা করছিল, যাদের তলোয়ার মুসলমানদের রক্তে রঞ্জিত ছিল, তাদের ইসলামের দিকে ডাকা কতটা কঠিন ও ধৈর্যসাপেক্ষ কাজ হবে?? যে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তিই তা অনুমান করতে পারেন। এই বিষয়ে আলোচনার পূর্বে মঙ্গোল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন শাখাগুলোর ওপর এক নজর বুলিয়ে নেওয়া প্রয়োজন, কারণ প্রতিটি শাখায় ইসলাম প্রচারের কাহিনী ভিন্ন ভিন্ন।

চেঙ্গিস খান এবং তাঁর উত্তরসূরিগণ

মঙ্গোল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তেমুজিন, যিনি ৫২৯ হিজরিতে (১১৫৪ খ্রিস্টাব্দে) মঙ্গোলিয়ার গোবি মরুভূমিতে জন্মগ্রহণ করেন। [১] তিনি মঙ্গোলিয়ার বিভিন্ন গোত্রকে বশীভূত করার পর ৬০২ হিজরিতে চেঙ্গিস খান উপাধি গ্রহণ করেন এবং কয়েক বছর পর মুসলিম বিশ্বের ওপর আক্রমণ চালিয়ে বড় বড় রাজ্যগুলোকে তছনছ করে দেন এবং সেগুলোর স্থলে এক বিশাল মঙ্গোল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর চার পুত্র ছিল: সবার বড় ছিল জোচি খান (দোশি)। এরপর ছিল চাগাতাই খান। তারপর ওগতাই খান। সবার ছোট ছিল তোলুই খান। চেঙ্গিস খান তাঁর অধিকৃত অঞ্চলগুলোকে চার ভাগে বিভক্ত করে এই চার পুত্রের নামে করে দিয়েছিলেন।

- ওগতাই মেজ ছেলে হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত মধ্যপন্থী মেজাজের এবং বুদ্ধিমান ছিলেন। তাই তিনি কারাকোরামের (মঙ্গোলিয়া) সিংহাসন লাভ করেন। এখানকার মঙ্গোল শাসকদের ‘খান-ই-আজম’ বা ‘খাকান-ই-আজম’ বলা হতো। এছাড়াও এই রাজারা ‘খানান-ই-কারাকোরাম’ নামেও পরিচিত ছিলেন।
- বড় ছেলে জোচি কাস্পিয়ান সাগরের আশেপাশে একটি বিশাল স্বাধীন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা ‘গোল্ডেন হোর্ড’ (সোনালী বাহিনী) নামে পরিচিত ছিল। এই সাম্রাজ্য তাঁর বংশধরদের মধ্যে চলতে থাকে।
- চাগাতাইয়ের শাসনাধীন ছিল মধ্য এশিয়া ও খোরাসানের অঞ্চলসমূহ।
- তোলুইয়ের বংশধরদের কাছে ছিল ইরানের অধিকৃত অঞ্চলসমূহ।

পরবর্তীতে এই চারটি দেশে আরও বিভাজন ঘটে। একই অঞ্চলে সিংহাসনের একাধিক দাবিদারও তৈরি হয়। তবে এই সমস্ত দেশ একটি ফেডারেশনের (মহাসংঘ) অধীন ছিল, যার প্রধান ‘খান-ই-আজম’ মঙ্গোলিয়ায় থাকতেন। শাহজাদাদের মধ্যে মতভেদের ক্ষেত্রে খান-ই-আজমের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হতো। [২]

[১] রওজাতুস সাফা: ১/১১

[২] তারিখ মুখতাসারুদ দুওয়াল লি-ইবনুল ইবরি, পৃ. ২২৭, ত. দারুশ শারক বৈরুত।

মঙ্গোলিয়ার খানাতসমূহ

ওকতায়ী খান (৬২৪ হিজরি থেকে ৬৩৯ হিজরি):

মঙ্গোলদের মধ্যে এটি নির্ধারিত ছিল যে শাসন ক্ষমতা শাসক পরিবারের মধ্যেই থাকবে, কিন্তু কোনো শাসকের মৃত্যুর পর তার উত্তরসূরি নির্বাচন তাদের এক বিশাল মজলিসে শুরার মাধ্যমে হতো, যেখানে পুরো সালতানাতের প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানো হতো। এই শুরাকে ‘কুরালতাই’ বলা হতো। এর আয়োজন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনেক সময় কয়েক মাস লেগে যেত, তখন পরবর্তী শাসকের সিদ্ধান্ত হতো। চেঙ্গিস খানের পর কুরালতাইয়ে আলোচনার ফলে তার মেজ ছেলে ওকতায়ী খানকে পিতার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসেবে মেনে নেওয়া হয় এবং তিনি তাতারদের কেন্দ্র কারাকোরামে মহান খাগান হন। তিনি ৬২৪ হিজরি থেকে ৬৩৯ হিজরি পর্যন্ত শাসন করেন। [১]

তার শাসনামলে মঙ্গোল বাহিনী তিন দিকে অগ্রসর হয়ে অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছেছিল, যার বিবরণ নিম্নরূপ:

- খওয়ারেজম সাম্রাজ্যের পতন (৬২৮ হিজরি): চেঙ্গিস খানের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী সুলতান জালালুদ্দিন খওয়ারেজম সাম্রাজ্যকে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যা ইরান থেকে জর্জিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ওকতায়ী খান জুরমাগুন নামক একজন অভিজ্ঞ সেনাপতির নেতৃত্বে একটি বাহিনী এই অভিযানে পাঠান, যার ফলে সুলতান জালালুদ্দিন খওয়ারেজমি পরাজিত হন এবং খওয়ারেজম শাহী সাম্রাজ্য চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এর পরবর্তী ত্রিশ বছর (সাইফুদ্দিন কুতুয়ের আবির্ভাব পর্যন্ত) মুসলিম বিশ্বে এমন কোনো জেনারেল ছিল না যে তাতারদের মোকাবিলায় সীমান্ত রক্ষা করতে পারত। সুলতান জালালুদ্দিন খওয়ারেজমির পরাজয়ের ফলে তাতাররা তাদের সবচেয়ে বড় শত্রুর হাত থেকে মুক্তি পায়। [২]

- কিন সাম্রাজ্য বিজয় (৬২৮ হিজরি): উত্তর চীনের ‘কিন সাম্রাজ্য’ চেঙ্গিস খানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। চেঙ্গিস খান মৃত্যুর আগে এর ওপর আক্রমণের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন কিন্তু জীবন তাকে অবকাশ দেয়নি। ওকতায়ী সিংহাসনে আরোহণের পর এই অসম্পূর্ণ কাজ সম্পন্ন করেন এবং কিন সাম্রাজ্যকে নতুন করে পদানত করেন। এই অভিযান ৬২৮ হিজরি (১২৩১ খ্রিস্টাব্দ) এ সমাপ্ত হয়।

- ইউরোপ ও পশ্চিম রাশিয়া বিজয় (৬৩৩ হিজরি থেকে ৬৪১ হিজরি): চেঙ্গিস খানের আমলে তার সেনাপতি সুবুতাই এবং জেবে নোয়ান রাশিয়া ও ইউরোপে অভিযান চালিয়েছিলেন কিন্তু কিছু বিজয়ের পর বাহিনী ফিরে আসে এবং অভিযান অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ওকতায়ী কিন সাম্রাজ্য নির্মূল করার পরপরই কুরালতাই ডেকে ইউরোপ আক্রমণের জন্য দেড় লক্ষ সৈন্যের একটি বাহিনী গঠন করেন, যার সাধারণ নেতৃত্ব ছিল জোরিন খিল (গোল্ডেন হোর্ড) এর রাজা বাতু খানের হাতে। তার পরিবর্তে তার ভাই বারকা খান, ওরদা, সেবান তার সহযোগী ছিলেন। এছাড়াও অন্যান্য শাখার নামী শাহজাদারা যেমন ওকতায়ীর ছেলে গুয়ুক এবং কাদান, এবং তোলুই খানের ছেলে মংকে খানও এই অভিযানে শরিক ছিলেন। তাছাড়া ইউরোপে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রধান সেনাপতি সুবুতাইও তাদের সাথে ছিলেন। [৩]

[১] জামিউত তাওয়ারিখ (ফারসি), রশীদ উদ্দিন ফজলুল্লাহ: ২/৩ থেকে ৮৫, লিডেন সংস্করণ।

[২] তারিখ ফুতুহাত মঙ্গোল, পৃষ্ঠা ৭৯, ৮০।

[৩] তারিখ ফুতুহাত মঙ্গোল, পৃষ্ঠা ৭৭, ৭৮।

৬৩৩ হিজরি (১২৩৬ খ্রিস্টাব্দ) বসন্তকালে এই বাহিনী অগ্রসর হলো এবং ইউরোপের সীমান্তে পৌঁছে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হয়ে গেল। সুবুতাই ভলগা নদী পার হয়ে বুলগেরিয়াকে পুনরায় জয় করলেন। মোংকে খান কাস্পিয়ান সাগরের উত্তরে বসবাসকারী কিপচাক গোত্রগুলোকে লক্ষ্যবস্তু বানালেন যারা ভলগা নদীর নিচু এলাকায় বসবাস করত। কিপচাক সর্দার বাচমান মোংকে খানের সাথে বীরত্বের সাথে লড়াই করলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজিত ও নিহত হলেন। কিপচাকদের ৪০ হাজার পরিবার তাদের অন্য এক সর্দার ‘কুতান’-এর নেতৃত্বে হিজরত করে হাঙ্গেরিতে চলে গেল। অবশিষ্ট কিপচাক গোত্রগুলো এরপরও মঙ্গোলদের প্রতিরোধ করতে থাকে, যাদেরকে বারকা খান ৬৩৫ হিজরিতে (১২৩৮ খ্রিস্টাব্দ) পরাজিত করেন।

এরপর তাতারীরা রাশিয়ার দিকে মনোনিবেশ করল। রুশ রাজপুত্ররা এর আগে তাদের হাজার বছরের ইতিহাসে মাত্র কয়েকবার ইউরোপের দিক থেকে সুইডেন, ফ্রান্স এবং জার্মান জাতিগোষ্ঠীর আক্রমণের শিকার হয়েছিল কিন্তু প্রতিবারই তারা পশ্চিমা আক্রমণকারীদের পিছু হটতে বাধ্য করতে সক্ষম হয়েছিল। এটিই ছিল প্রথমবার যে তাদের ওপর পূর্ব দিক থেকে আক্রমণ হচ্ছিল, যার কারণে তারা অত্যন্ত ভীত ছিল। তারা ঐক্যবদ্ধ হতে পারল না এবং অবশেষে তাতারীরা ৬৩৫ হিজরি (ডিসেম্বর ১২৩৭ খ্রিস্টাব্দ) প্রচণ্ড শীতের মধ্যে পশ্চিম রাশিয়ার কেন্দ্রীয় রাজ্য ‘রিয়াজান’ দখল করে নিল। বসন্তকাল আসার আগেই পশ্চিম রাশিয়ার বাকি শহরগুলোও বিজিত হয়ে গেল।

এই সময়ে মোংকে খান দানিযুব (Dniپر) নদী পার হয়ে ‘ইউক্রেন’-এ আক্রমণ চালিয়েছিলেন। জমাদিউল আউয়াল ৬৩৮ হিজরি (ডিসেম্বর ১২৪০ খ্রিস্টাব্দ) এই রাজ্যের রাজধানী ‘কিয়েভ’ পদানত হলো এবং তাতারীরা এখানে লাশের স্তুপ জমিয়ে দিল।

এই বিজয়ের পর তাতারীরা ইউরোপের দিকে অগ্রসর হলো যেখানে এক অদ্ভুত আতঙ্কের পরিবেশ বিরাজ করছিল। তাতারীদের ভয়ে জেলেরা উপকূলে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল যার ফলে বাজারে মাছ পাওয়া যাচ্ছিল না। সবার আগে হাঙ্গেরির পালা এল যার শাসকরা কিপচাকদের আশ্রয় দিয়ে মঙ্গোলদের সাথে শত্রুতা তৈরি করেছিল। ৬৩৮ হিজরিতে (১২৪১ খ্রিস্টাব্দ) সুবুতাই, গিয়ুক এবং বাতু খান আলাদা আলাদা দিক থেকে হাঙ্গেরিতে আক্রমণ করলেন এবং এর শহরগুলোকে পদানত করে দানিযুব নদী পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। হাঙ্গেরির মতো শক্তিশালী দেশ বিজয়ের পর তাতারীরা আরও অগ্রসর হলে ফ্রান্স এবং জার্মানি সহ সমস্ত ইউরোপীয় দেশ তাদের জন্য উন্মুক্ত ছিল যেখানে রাজপুত্র এবং নবাবরা চরম মতভেদ ও ভয়-ভীতির শিকার ছিল কিন্তু সম্ভবত তাতারীদের কাছে সামনের বিশ্বের কোনো তথ্য ছিল না। তাই তাদের বিজয়ের ধারা এখানেই থেমে গেল। [১]

ওগতাইয়ের শাসনামলে অধিকাংশ বিজিত অঞ্চলে কেবল শান্তি ও নিরাপত্তাই বজায় ছিল না বরং এখানে উন্নতি ও সমৃদ্ধির প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়েছিল। তবে খোরাসান ও তুর্কিস্তানে অবস্থানরত তাতারী সর্দাররা আশেপাশের মুসলিম রাজ্যগুলোতে আক্রমণ অব্যাহত রেখেছিল। [২]

তুরাকিনা খাতুন (৬৩৯ হিজরি থেকে ৬৪৪ হিজরি)

ওগতাইয়ের পর আকস্মিকভাবে তার স্ত্রী তুরাকিনা সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অত্যন্ত চতুর ও অভিজ্ঞ নারী ছিলেন। তিনি অন্তর্বর্তীকালীন শাসক হিসেবে পাঁচ বছর সফলতার সাথে শাসন করেন। [৩]

[১] তারিখ ফুতুহাত-ই-মুঘল, পৃ. ৮১ থেকে ৯০।

[২] জামিউত তাওয়ারিখ (ফারসি), রশীদ উদ্দিন ফজলুল্লাহ: ২/২ থেকে ৮৫, লিডেন।

[৩] জামিউত তাওয়ারিখ (ফারসি), রশীদ উদ্দিন ফজলুল্লাহ: ২/২৩৭ থেকে ২৪০, লিডেন।

ইতিহাসে উন্মতে মুসলিমা (চতুর্থ খণ্ড)

গেয়ুক খান বিন ওকতাই (৬৪৪ হিজরি থেকে ৬৪৬ হিজরি)

পাঁচ বছর পর তুরাকিনা কুরাইলতাই ডেকে তার ছেলে গেয়ুক খানকে সিংহাসনে বসান। গেয়ুক খানের রাজ্যাভিষেক খুব ধুমধাম করে হয়েছিল কিন্তু তিনি মাত্র এক বছর শাসন করতে পেরেছিলেন। [১]

মঙ্গু খান বিন তুলি খান (৬৪৮ হিজরি থেকে ৬৫৭ হিজরি)

গেয়ুক খানের মৃত্যুর পর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব চেঙ্গিস খানের ছোট ছেলে তুলির বংশে স্থানান্তরিত হয়। তুলির চার ছেলে ছিল: মঙ্গু, হালাকু, কুবলাই (কুবিলা) এবং আরিক বোকা। মঙ্গু খানকে সর্বসম্মতিক্রমে মঙ্গোলিয়ার খাগান হিসেবে মেনে নেওয়া হয়। তিনি তার ভাই হালাকু খানকে ইরান ও খোরাসান এবং ইরাকের শাসক নিযুক্ত করেন এবং তাকে ‘ইলখান’ অর্থাৎ ‘ছোট খান’ উপাধি দেন। এভাবে ইরান ও খোরাসানের মঙ্গোল সরকার ‘ইলখানি সালতানাত’ নামে পরিচিত হতে থাকে। মঙ্গু ৬৪৬ হিজরি থেকে ৬৫৭ হিজরি পর্যন্ত শাসন করেন। [২]

আরিক বোকা বিন তুলি (৬৫৭ হিজরি থেকে ৬৫৯ হিজরি)

মঙ্গু খানের মৃত্যুর পর তার ভাই আরিক বোকা সিংহাসন দখল করেন কিন্তু এতে তার বড় ভাই কুবলাই খানের সাথে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয়। অবশেষে শাহজাদারা কুবলাই খানের ওপর একমত হন। [৩]

কুবলাই খান বিন তুলি (৬৫৭ হিজরি থেকে ৬৯৩ হিজরি)

এখন কুবলাই খান চীনের খাগান হলেন। তিনি কারাকোরাম ছেড়ে চীনে একটি নতুন শহর ‘খান বালিগ’ (বর্তমান বেইজিং) আবাদ করে সেটিকে রাজধানী বানান। তিনি বৈদেশিক বিজয়ের দিকেও মনোযোগ দেন এবং সিয়াম (থাইল্যান্ড) ও বার্মাও জয় করেন। তার শাসনের সময়কাল ৬৫৭ হিজরি থেকে ৬৯৩ হিজরি পর্যন্ত ছিল। এই ৩৮ বছরে মঙ্গোলদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে ইউরোপ থেকে প্রতিনিধি দল এসে খাগানকে সালাম পেশ করত। [৪]

খানাতে কিপচাক (উর্দুয়ে জরিন খিল)

জোজি খান (৬১৮ হিজরি থেকে ৬২৬ হিজরি):

চেঙ্গিস খানের বড় ছেলে জোজি (দুশি)-র অংশে কাস্পিয়ান সাগরের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় এলাকাগুলো এসেছিল যা ককেশাস থেকে পূর্ব ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই এলাকাটি ‘খানাতে কিপচাক’ এবং এই সালতানাত ‘গোল্ডেন হোর্ড’ (উর্দুয়ে জরিন) নামে পরিচিত ছিল। সোভিয়েত রাশিয়ার রাজ্যসমূহ: চেচনিয়া, দাগেস্তান, তাতারস্তান, গুর্জিস্তান এবং ইউক্রেনের এলাকাগুলোও খানাতে কিপচাকের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

জোজি তার বাবা এবং ভাইদের মেজাজের সাথে খাপ খেতেন না। তিনি কোমল স্বভাবের এবং শান্তিপ্ৰিয় ছিলেন এবং বাকি ভাইদের থেকে আলাদা ছিলেন।

[১] জামিউত তাওয়ারিখ (ফারসি): ২/ ২৪০ থেকে ২৫২, লিডেন

[২] জামিউত তাওয়ারিখ (ফারসি): ২/ ৩৭৪ থেকে ৩৯০, লিডেন

[৩] তাবাকাতে নাসিরি: ২/ ১৭৮ থেকে ১৮৯

[৪] জামিউত তাওয়ারিখ (ফারসি): ২/ ৩৯১ থেকে ৫২০, লিডেন

আলাদা থাকতেন। যদিও তিনি সাহসী ও রক্তপিপাসু ছিলেন, তবে তিনি নীতিবান ও স্পষ্টবাদী স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। উরগঞ্জ বিজয়ের সময় তিনি শহরবাসীদের জীবনের নিরাপত্তা দিয়েছিলেন, যেখানে তাঁর ভাইয়েরা সাধারণ গণহত্যার ওপর জোর দিচ্ছিলেন। এই বিষয়ে কেবল তাঁর ভাইদের সাথেই তাঁর বিবাদ হয়নি [১], বরং তাঁর পিতার কাছ থেকেও তাঁকে কঠোর তিরস্কার শুনতে হয়েছিল। তখন থেকে তিনি তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে মুসলিম বিশ্বের পরিবর্তে কাস্পিয়ান সাগরের উত্তর দিকে রাশিয়া ও ইউরোপের দিকে অগ্রসর হন।

সভ্য জগত থেকে বিচ্ছিন্ন ঘাসযুক্ত প্রান্তর ও উপত্যকা নিয়ে গঠিত এই অঞ্চলটি ককেশাস ও কিপচাক থেকে শুরু করে ইউরোপের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এটি তাঁর পছন্দ হয় এবং তিনি শেষ পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন। চেঙ্গিস খানও একেই শ্রেয় মনে করেছিলেন যে তাকে আলাদা রাখা হোক, তাই তিনি এই বিশাল অঞ্চলটি তাঁর নামে করে দেন। এভাবে একটি পৃথক রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় যা “গোল্ডেন হোর্ড” (উর্দু-এ-জররীন) নামে পরিচিত হয়। এই সালতানাত এতই বিশাল ছিল যে এর সীমানা অতিক্রম করতে চার মাস সময় লাগত [২] এবং তাঁর শক্তি এতটাই ছিল যে স্বয়ং চেঙ্গিস খানও তাঁকে ভয় পেতেন [৩]।

এই কারণেই চেঙ্গিস খান তাঁর শেষ দিনগুলোতে তাঁকে তলব করেছিলেন, কিন্তু তিনি অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেন। এতে চেঙ্গিস খানের সন্দেহ আরও বেড়ে যায়। এর কিছুদিন পরেই জোচী চল্লিশ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই মৃত্যুবরণ করেন [৪]। বলা হয় যে, বিদ্রোহের আশঙ্কায় চেঙ্গিস খান তাঁকে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করিয়েছিলেন [৫]। তবে চেঙ্গিস খানও এরপর বেশিদিন জীবিত থাকতে পারেননি এবং সেই বছরই মৃত্যুবরণ করেন।

বাতু খান (৬২৩ হিজরী থেকে ৬৫৩ হিজরী):

জোচীর সাতজন পুত্র ছিল, যাদের মধ্য থেকে চেঙ্গিস খান বাতু খানকে তাঁর উত্তরসূরি নিযুক্ত করেছিলেন। বাতু খান সিংহাসনে আরোহণ করে রাশিয়া ও ইউরোপের একটি বড় অংশ জয় করেন। ৬৩৯ হিজরীতে যখন তিনি ইউরোপ অভিযান থেকে ফিরে আসেন, তখন ভলগা নদীর পূর্ব তীরে “সরাই” (Serai) নামে একটি শহর আবাদ করে সেটিকে গোল্ডেন হোর্ডের রাজধানী ঘোষণা করেন [৬]।

বারকা খান (৬৫৩ হিজরী থেকে ৬৬৫ হিজরী):

৬৫৩ হিজরীতে বাতু খান মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর স্থলে তাঁর পুত্র সারতাক এবং তারপর সারতাকের পুত্র “উলাঘচি” সিংহাসনে বসেন, কিন্তু দুই বছরের মধ্যে তারা একে একে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। এখন জোচীর মেজ পুত্র বারকা খান বাদশাহ হন, যিনি সিংহাসনে আরোহণের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীতে এই শাসন বারকা খানের বংশধরদের মধ্যেই কায়েম থাকে [৭]।

[১] সীরাত সুলতান জালালুদ্দিন, পৃষ্ঠা ১৭১।

[২] রওজাতুস সাফা: ৫/৪৩৫; জামিউত তাওয়ারিখ (ফারসি): ২/১১২২; চেঙ্গিস খান বাই হ্যারল্ড ল্যান্স: অধ্যায় ১৭, পৃষ্ঠা ১৩৩; তারিখুল ইসলাম লিজ জাহাবি: ৩৯/১৯০, তদমুরী সংস্করণ।

[৩] তবাকাত-ই-নাসিরী মিন মিনহাজুস সিরাজ: ২/১৪৯, কাবুল সংস্করণ।

[৪] জামিউত তাওয়ারিখ (ফারসি) আজ রশীদ উদ্দিন ফজলুল্লাহ: ২/১৩৩, লাইডেন সংস্করণ।

[৫] তবাকাত-ই-নাসিরী: ২/১৫০।

[৬] তারিখ ফুতুহাত-ই-মুঘল, পৃষ্ঠা ১৫১।

[৭] জামিউত তাওয়ারিখ (ফারসি): ২/১৩৭, ১৩৮, লাইডেন সংস্করণ।

ইলখানি সালতানাত

ইলখানিদের মধ্যে নিম্নোক্ত শাসকগণ অতিবাহিত হয়েছেন:

হালাকু খান (৬৫৩ হিজরি থেকে ৬৬৩ হিজরি):

চেঙ্গিস খানের নাতি হালাকু বিন তুলি খান ইরান ও খোরাসান থেকে ইরাক পর্যন্ত যে শাসনব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন, তা ইলখানি সালতানাত নামে পরিচিত ছিল। যেহেতু ইলখানিদের সীমানা মুসলমানদের খেলাফতের রাজধানীর সাথে মিলিত ছিল, তাই দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ইলখানিরা মুসলমানদের কঠোর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। বাগদাদের ধ্বংস এই ইলখানি তাতারীদের হাতেই হয়েছিল। এরপর যখন খেলাফত কায়রোতে স্থানান্তরিত হলো, তখন তাদের সালতানাতের সাথে মিশরের যুদ্ধ চলতে থাকে। তাদের রাজধানী ছিল আজারবাইজানের মারাগা শহর। ইলখানি সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা হালাকু খান ৬৬৩ হিজরিতে মারা যান। তার বয়স ৬০ বছরের বেশি ছিল। [১]

আবাকা খান (৬৬৩ হিজরি থেকে ৬৮০ হিজরি):

হালাকুর পর তার পুত্র আবাকা খান (আবগা) ইলখানি মোগল সালতানাতের শাসক হন। তার স্ত্রী ছিলেন একজন ইউরোপীয় রাজকুমারী, যার প্রভাবে তিনি নিজেও খ্রিস্টধর্মের নিকটবর্তী হয়েছিলেন। আবাকা সিরিয়া ও মিশরের ওপর বেশ কয়েকবার আক্রমণ করেন কিন্তু ব্যর্থ হন। তিনি সতেরো বছর শাসন করেন এবং ৬৮০ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। [২] এরপর এই রাজ্য গৃহযুদ্ধের শিকার হয়ে অন্যান্য মোগল পরিবারগুলোর মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায়।

চাগতাই সালতানাত

চেঙ্গিস খানের পুত্র চাগতাই খানের সালতানাত চীনের সীমান্ত এবং পামির মালভূমি থেকে শুরু করে মধ্য এশিয়া ও খোরাসান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। চাগতাই খান ৬৩৮ হিজরিতে মারা গেলে তার সালতানাত চরম রাজনৈতিক অস্থিরতার শিকার হয়। এই অবস্থায় তার পুত্র কারাখলা খান সিংহাসনে আরোহণ করেন, যিনি ৬৫২ হিজরি পর্যন্ত শাসন করেন। এরপর চাগতাই সালতানাতের সংকট এতটাই বৃদ্ধি পায় যে, কিছু সময়ের জন্য কারাখলার স্ত্রী আরগুনা খাতুনকে শাসনকার্য পরিচালনা করতে হয়। এরপর চাগতাইয়ের নাতি আলগু খান সিংহাসনে বসেন এবং ৬৬৪ হিজরি পর্যন্ত শাসক হিসেবে থাকেন। শীঘ্রই এই সালতানাত চাগতাইয়ের নাতি-পুতিদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে ছোট ছোট রাষ্ট্রের রূপ ধারণ করে। [৩]

[১] আস-সুলুক লি-মা'রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ২/ ২৯, ত. আল-ইলমিয়াহ।

[২] THE PREACHING OF ISLAM: 175, 176, by T.W. Arnold, LONDON: CONSTABLE & COMPANY. 1913. দাওয়াত-ই-ইসলাম, শেখ মুহাম্মদ এনায়েত উল্লাহ, পৃষ্ঠা ২৩০, পাঞ্জাব ওয়াকফ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত। (এটি আর্নল্ডের উপরোক্ত বইটির উর্দু অনুবাদ)। নিহায়াতুল আরাব লিন-নুওয়াইরি: ২৭/ ৩৯৫ থেকে ৪০০, ত. দারুল কুতুব ওয়াল ওয়াসাইক কায়রো। নোট: আবাকা খানকে আরব ঐতিহাসিকগণ “আবনা” বা “আবগা” নামেও স্মরণ করেছেন।

[৩] জামিউত তাওয়ারিখ (ফারসি): ২/ ১৮৩ থেকে ১৮৯, ত. লিডেন; তারিখ ইবনে খালদুন: ৫/ ৫৯৯ থেকে ৬০১, ত. দারুল ফিকর।

ইসলাম প্রচারে প্রতিকূলতা

মঙ্গোলিয়া এবং কিপচাক খানাভের সালতানাতগুলো ইসলামি বিশ্বের সীমানার বাইরে ছিল, যেখানে ইলখানি এবং চাগাতাইরা ইসলামি বিশ্বের এক বিশাল এলাকা দখল করে রেখেছিল। সামগ্রিকভাবে মঙ্গোল ফেডারেশন মুসলমানদের জন্য একটি অন্ধকার কারাগারের চেয়ে কম ছিল না। মুসলমানদের জন্য এখানে দাওয়াত ও তাবলিগি কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা, নিজের জীবন ও ঈমান রক্ষা করাও সহজ ছিল না। মুসলমানরা তাতারদের অত্যাচারের মূল লক্ষ্য ছিল এবং তাদের সবচেয়ে বড় সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল যারা এখন পরাজিত হয়ে দাসে পরিণত হয়েছিল। মুসলমানদের প্রতি এই তীব্র ঘৃণার পরিবেশে কোনো তাতারকে ইসলামের দাওয়াতের প্রতি মনোযোগী করা বাহ্যিক প্রেক্ষাপটে অসম্ভব ছিল। তাতারদের ইসলামের দিকে আহ্বান করা এজন্য আরও কঠিন হয়ে পড়েছিল যে, খ্রিস্টধর্ম এবং বৌদ্ধধর্মের ধর্মীয় নেতাদের তাতার শাসকদের দরবারে প্রবেশাধিকার ছিল এবং তারা ক্রমাগত তাদের নিজ নিজ ধর্মের দিকে দাওয়াত দিচ্ছিল। চেঙ্গিস খানের পুত্রদের শাসনামলে তাতারদের মধ্যে খ্রিস্টধর্মের প্রতি স্পষ্ট ঝোঁক ছিল। এর সবচেয়ে বড় কারণ ছিল খ্রিস্টানরা তাতারদের সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বী নয় বরং মিত্র ছিল। মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড যুদ্ধ অব্যাহত রাখার কারণে মুসলিম বিদ্রোহে তাতারদের সাথে তাদের ব্যবহারিক অংশীদারিত্ব ছিল। খ্রিস্টানদের সাথে তাতারদের সম্পর্ক এতটাই গভীর ছিল যে তারা খ্রিস্টান নারীদের বিয়ে করেছিল। চেঙ্গিস খানের এক স্ত্রী খ্রিস্টান ছিলেন। তার উত্তরসূরি ওগতাই খানও এক খ্রিস্টান নারীকে বিয়ে করেছিলেন, যার গর্ভ থেকে পরবর্তী খাগান গুয়ুক খান জন্মগ্রহণ করেন, যিনি নিজেও খ্রিস্টধর্ম দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত ছিলেন। তার উত্তরসূরি মংকে খানের স্ত্রীও খ্রিস্টান ছিলেন। [১] তার পুত্র আবাকা খানের বিয়ে কনস্টান্টিনোপলের খ্রিস্টান রাজকুমারীর সাথে হয়েছিল। [২] খ্রিস্টান পাদ্রিরা চেঙ্গিস খানের পুত্রদের দরবারে উপস্থিত থাকতেন এবং তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতেন। বৌদ্ধধর্মের ধর্মীয় নেতারাও তাতারদের কাছে সম্মানিত ছিলেন, যাদের প্রচেষ্টায় চেঙ্গিস খানের বংশধররা বৌদ্ধধর্মের দিকে আবৃষ্ট হয়েছিল। [৩]

তা সত্ত্বেও ইতিহাসের প্রতিটি ছাত্র যখন মুসলিম সুলতান এবং তাতারদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অবস্থা পড়ে, তখন হঠাৎ চেঙ্গিস খানের নাতি ও পুত্রদের ইসলামের কোলে আশ্রয় নিতে দেখে অবাক হয়ে যায়। ইসলামের ইতিহাসবিদ হযরত মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) তাতারদের ধ্বংসলীলা ও লুটতরাজের উল্লেখ করার পর লেখেন:

“নিকটবর্তী ছিল যে সমগ্র ইসলামি বিশ্ব এই বিপদের বন্যায় ভেসে যাবে, এবং যেমনটি সেই সময়ের দূরদর্শী লেখকরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে ইসলামের নাম-নিশানা মুছে যাবে, হঠাৎ তাতারদের মধ্যে ইসলাম প্রচার শুরু হয়ে গেল, এবং যে কাজ মুসলমানদের তলোয়ার এবং মুসলিম বাদশাহরা করতে পারেননি, তা ইসলামের দায়ী (আহ্বানকারী) এবং আল্লাহর মুখলিস বান্দারা সম্পন্ন করলেন।” [৪]

[১] ইনতিশারুল ইসলাম বাইনাল মুগুল, পৃ. ৩১, ৩২

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: হিজরি ৬৬৩ সাল

[৩] ইনতিশারুল ইসলাম বাইনাল মুগুল, পৃ. ৩১ থেকে ৩৪

[৪] THE PREACHING OF ISLAM 170, 171

...এবং স্বয়ং ইসলাম তার রক্তপিপাসু শত্রুদের হৃদয়ে স্থান করে নিতে শুরু করল। ইতিহাসের সবচেয়ে অদ্ভুত ঘটনা ও সত্যগুলোর মধ্যে একটি হলো এই অপরাজেয় জাতির ইসলামের কাছে বশীভূত হওয়া এবং মুসলমানদের বিজয়ীর ইসলামের কাছে বিজিত হওয়া। তাতারিদের এক বছরের মধ্যে বিদ্যুৎ ও ঝড়ের মতো বিশাল ইসলামী বিশ্বে ছড়িয়ে পড়া এবং তলোয়ারের জোরে মুসলিম বিশ্ব জয় করা ততটা আশ্চর্যজনক ঘটনা নয়, কারণ সপ্তম শতাব্দীর মুসলিম বিশ্ব সেই সব দুর্বলতা ও ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিল যা সাধারণত সভ্যতা ও সংস্কৃতির চরম উন্নতির পর জাতিগুলোর মধ্যে সৃষ্টি হয় এবং তাদের ভেতর থেকে ফোকলা করে দেয়। এর বিপরীতে তাতারিরা ছিল সতেজ, পরিশ্রমী, যাযাবর জীবনে অভ্যস্ত এবং রক্তপিপাসু ও হিংস্র। কিন্তু অদ্ভুত ঘটনা এবং ইতিহাসের রহস্য হলো এই যে, তাদের চরম উত্থানের সময়ে এই আধা-বন্য জাতি তাদের বিজিত ও সহায়-সম্মলহীন মুসলমানদের দ্বীনের অনুসারী হয়ে গেল, যারা তাদের সব ধরনের বস্তুগত ও রাজনৈতিক শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল এবং যাদের অনুসারীদের তাতারিরা চরম লাঞ্ছনা ও ঘৃণার চোখে দেখত। [১]

تاتاریوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ آج اس راہ میں درپیش مشکلات کا اندازہ پوری طرح کرنا بہت مشکل ہے۔ مگر اس کی ایک جھلک پروفیسر ٹی ڈبلیو آرنلڈ کے ان الفاظ میں دیکھی جا سکتی ہے:

তাতারিদের ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করা কোনো সহজ কাজ ছিল না। আজ এই পথে আসা বাধা-বিপত্তিগুলোর পুরোপুরি আন্দাজ করা খুবই কঠিন। তবে এর এক বলক প্রফেসর টি. ডব্লিউ. আর্নল্ডের এই শব্দগুলোতে দেখা যেতে পারে:

“মুসলিম ধর্মপ্রচারকদের এই কাজ এই কারণে আরও কঠিন ছিল যে, সেই সময় ইসলামকে দুটি শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর মোকাবিলা করতে হচ্ছিল, অর্থাৎ: বৌদ্ধ ধর্ম এবং খ্রিস্টধর্ম। ইসলাম এবং এই উভয় ধর্মই সেই বন্য বিজয়ীদের নিজেদের অনুসারী করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিল যারা এই ধর্মগুলোর অনুসারীদের পদদলিত করে রেখেছিল। এই ধর্মগুলোর পারস্পরিক প্রতিযোগিতা এমন এক দৃশ্য উপস্থাপন করে যার নিজের বিশ্ব ইতিহাসে নেই।” [২]

তিনি আরও লেখেন:

“মোগলদের শাসনকালের প্রাথমিক যুগে বৌদ্ধ ধর্ম এবং খ্রিস্টধর্ম ইসলামের এমন শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল যাদের মোকাবিলায় ইসলামের সফল হওয়া আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হতো। কারণ তাতারি আক্রমণের ঝড়ে মুসলমানরা অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি ক্ষতি সহ্য করেছিল। পশ্চিম এশিয়ার সেই জনবহুল শহরগুলো যা একসময় ইসলামী ধর্মীয় ব্যবস্থা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র ছিল, পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয়েছিল এবং মুসলমানদের আলেম ও গুণীজনদের হয় হত্যা করা হয়েছিল অথবা গোলাম বানিয়ে নেওয়া হয়েছিল। যদিও মোগল শাসকরা সাধারণত সব ধর্মের সাথে সহনশীল আচরণ করত, কিন্তু তাদের মধ্যে এমন কেউ কেউ ছিল যারা ইসলামের প্রতি কমবেশি ঘৃণা ও শত্রুতা পোষণ করত।” [৩]

[১] তারিখ দাওয়াত ওয়া আজিমত: ১/ ৩২৩, ৩২৪

[২] THE PREACHING OF ISLAM 169 (দাওয়াত ইসলাম, পৃ. ২৪১)

[৩] THE PREACHING OF ISLAM 172, 173 (দাওয়াত ইসলাম, পৃ. ২৪৬)

এখানে “কেউ কেউ” শব্দটি পর্যালোচনার দাবি রাখে। প্রাথমিক দশকগুলোর অধিকাংশ মোগল শাসক অর্থাৎ চেন্সিস খান, চাগতাই খান, গুয়ুক খান এবং হালাকু খান প্রমুখ ইসলামের ঘোর শত্রু ছিলেন। কেবল ওগতাই খান এবং জোচি খানকে ব্যতিক্রম ধরা যেতে পারে।

[৪] THE PREACHING OF ISLAM 169 (দাওয়াত ইসলাম, পৃ. ২৪২)

তাতারিদের ওপর বৌদ্ধধর্মের প্রভাব:

তাতারিরা শুরু থেকেই বৌদ্ধধর্ম দ্বারা প্রভাবিত ছিল। তাদের রাজ্যের চারপাশে জাপান, কোরিয়া এবং তিব্বতের মতো দেশগুলো ছিল যা বৌদ্ধধর্মের দুর্গ ছিল। স্বয়ং চীনে বৌদ্ধধর্মের পণ্ডিতদের সব জায়গায় পাওয়া যেত। চেঙ্গিস খান এবং তার পুত্রদের দরবারে বৌদ্ধধর্মের ধর্মীয় নেতাদের অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদা দেওয়া হতো। আর্নল্ড লেখেন:

“চেঙ্গিস খানের উপস্থিতিতে বৌদ্ধধর্মের পণ্ডিতরা শামানদের সাথে ধর্মীয় বিষয়ে বিতর্ক করতেন।” [১]

চেঙ্গিস খানের পর বৌদ্ধ নেতাদের মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পায় এবং মঙ্গোলিয়া খানাত অনেকাংশে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে চলে আসে। আর্নল্ড লেখেন:

“কুবলাই খানের যুগে চীনের মঙ্গোলদের ওপর বৌদ্ধধর্মের শক্তিশালী প্রভাব শুরু হয় কারণ তারা চারদিক থেকে বৌদ্ধধর্মের অনুসারীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। ফলে চতুর্দশ শতাব্দীর শুরুতে বৌদ্ধধর্ম তাদের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করে। তাদের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য তিব্বতের লামারা অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে কাজ করেন।” [২]

তাতারিদের ওপর খ্রিস্টধর্মের প্রভাব:

অন্যদিকে খ্রিস্টান বিশ্ব, যারা মুসলিম বিশ্বের ওপর তাতারি আক্রমণের সময় পশ্চিম থেকে ক্রুসেডের এক অন্তহীন ধারা শুরু করেছিল, তাতারিদের খ্রিস্টান করার জন্য পুরোপুরি সক্রিয় ছিল। আর্নল্ড লেখেন:

“যদিও মঙ্গোল সাম্রাজ্যের পূর্ব অংশে বৌদ্ধধর্ম প্রাধান্য লাভ করেছিল, কিন্তু শুরুতে খ্রিস্টান গির্জার প্রভাবও কম ছিল না এবং খ্রিস্টানদের অনেক আশা ছিল যে মঙ্গোলরা আমাদের ধর্ম গ্রহণ করবে। ফলে সপ্তম শতাব্দীতে নেস্টোরিয়ান সম্প্রদায়ের ধর্মপ্রচারকরা এশিয়া জুড়ে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে উত্তর চীন পর্যন্ত খ্রিস্টধর্ম প্রচার করেছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে তাদের বিচ্ছিন্ন দলগুলো পাওয়া যেত। প্রেস্টার জন, যার সম্পর্কে মধ্যযুগে অনেক কাহিনী প্রচলিত ছিল, তাকে একটি খ্রিস্টান তাতারি গোত্র কেরাইত-এর নেতা মনে করা হতো যারা বৈকাল হ্রদের দক্ষিণে বসবাস করত। যখন চেঙ্গিস খান এই জাতির ওপর বিজয় লাভ করেন, তখন তিনি তাদের নেতার মেয়েকে বিয়ে করেন এবং তার ছেলে ওকতাই-ও একই পরিবারের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। ওকতাই-এর ছেলে গিউক খাকান যদিও নিজে খ্রিস্টান ছিলেন না, কিন্তু খ্রিস্টানদের প্রতি অত্যন্ত সদয় ছিলেন। তার প্রধানমন্ত্রী এবং বিশ্বস্ত লেখকও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তার দরবারে নেস্টোরিয়ান পাদ্রিরা অত্যন্ত মর্যাদা লাভ করতেন এবং তিনি পোপ ইনোসেন্ট চতুর্থ-এর দূতদের সাক্ষাতের সুযোগ দিয়েছিলেন। পূর্ব ও পশ্চিমের খ্রিস্টান দেশগুলো তাতারিদের কাছ থেকে এই আশা পোষণ করছিল যে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করবে। এটি ছিল আর্মেনিয়ার খ্রিস্টান রাজা হেথুম যিনি মঙ্গু খানকে এই বিষয়ে উৎসাহিত করেছিলেন যে তিনি হালাকু খানের নেতৃত্বে সেই সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন যা শেষ পর্যন্ত বাগদাদ ধ্বংস করেছিল। হালাকু খানের স্ত্রী খ্রিস্টান ছিলেন তাই তিনি...”

[১] THE PREACHING OF ISLAM 169, 170 (দাওয়াত-ই-ইসলাম, পৃ. ২২২)

[২] পূর্বোক্ত সূত্র

খ্রিস্টানদের প্রতি সাধারণভাবে এবং নেস্টোরিয়ানদের প্রতি বিশেষভাবে অত্যন্ত দয়া লু ছিলেন। যে সকল মঙ্গোল জর্জিয়া ও আর্মেনিয়ায় বসতি স্থাপন করেছিল, তাদের অধিকাংশ লোককে ওই দেশগুলোর খ্রিস্টানরা নিজেদের ধর্মে নিয়ে আসে এবং তাদের দীক্ষান্নান (ব্যাপ্টিজম) করায়। [১] খ্রিস্টের জন্মের মহিমা ও শান-শওকতের যে বিস্ময়কর কাহিনী ইউরোপে প্রচলিত ছিল, তার কারণে ইউরোপের খ্রিস্টানরা রঙিন স্বপ্ন দেখছিল এবং তাদের মধ্যে এই ধারণা জন্মেছিল যে মঙ্গোলরাও খ্রিস্টান। আর এই ধারণা তাদের মনে এই ভুল খবরের কারণে আরও দৃঢ় হয়েছিল যে, অনেক মঙ্গোল রাজপুত্র খ্রিস্টান হয়ে গেছেন এবং তারা খ্রিস্টধর্মের অত্যন্ত সক্রিয় সমর্থক। এই ধরনের বিভ্রান্তির ভিত্তিতেই ফ্রান্সের রাজা সেন্ট লুই উইলিয়াম রুব্রুককে থাকানের দরবারে নিজের দূত হিসেবে পাঠিয়েছিলেন, যাতে তিনি থাকানকে তাকিদ দেন যে, তিনি খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন, তা যেন পূর্ণ উদ্যমে অব্যাহত রাখেন। কিন্তু শীঘ্রই এই বিষয়টি উন্মোচিত হয়ে গেল যে, এই খবরগুলো প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ছিল। তবে উইলিয়াম দেখেছিলেন যে, মঙ্গু খানের দরবারে খ্রিস্টধর্মের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল এবং কিছু মঙ্গোল খ্রিস্টানও হয়ে গিয়েছিল। যার কারণে খ্রিস্টান পাদ্রিরা এই আশা নিয়ে বসে ছিলেন যে, অন্যান্য মঙ্গোলরাও তাদের ধর্ম গ্রহণ করে নেবে। [২]

ধন্য আল্লাহর সেই বান্দাদের হিম্মত, যারা রাতের নির্জনতায় আল্লাহ তাআলার সামনে কান্নাকাটি করে এবং সিজদায় অশ্রু বিসর্জন দিয়ে কেবল তাঁর গায়েবি সাহায্য ও সহযোগিতার ওয়াদার ওপর ভরসা করে আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হওয়া এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এগিয়ে চলা শুরু করেছিলেন। তারা রোমহর্ষক বিপদের উপত্যকা অতিক্রম করে এবং অতুলনীয় সংকল্প ও দৃঢ়তার সাথে অসহনীয় মুসিবতের মোকাবিলা করে অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও হিকমতের সাথে এই মহান উদ্দেশ্যে নিয়োজিত ছিলেন। এই কাজ কতটুকু নিভূতে এবং কতটুকু গোপনে সম্পন্ন হয়েছিল? এর আন্দাজ কেবল এই কথা থেকেই করা যেতে পারে যে, ঐতিহাসিকগণ তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এই ময়দানে কাজ করা দাঙ্গ ও মুবাল্লিগদের মধ্যে হাতেগোনা কয়েকজন ছাড়া আর কারও পরিচয় জানতে ব্যর্থ হয়েছেন। মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. লিখেছেন:

“এই ঘটনাটি যতটা অদ্ভুত ও মহিমাম্বিত, ততটাই বিস্ময়কর বিষয় হলো ইতিহাসে এর বিস্তারিত বিবরণ ও খুঁটিনাটি খুব কম পাওয়া যায়। আর যাদের হাতে এই কীর্তি সম্পাদিত হয়েছে, ইতিহাসের দপ্তরে তাদের খুব কমই হদিস মেলে। যে সকল মুখলিস ব্যক্তি এই রক্তপিপাসু তাতার জাতিকে ইসলামের অনুসারী বানিয়েছেন, তাদের মধ্যে খুব কম লোকের নামই দুনিয়ার মানুষের জানা আছে।” [৩]

আল্লাহর এই বান্দারা যেখানেই ছিলেন, নিজ নিজ অবস্থা ও পরিবেশ অনুযায়ী এই অভিযান চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ইসলামের বিশ্বজনীন বার্তার আবে-হায়াত ফোঁটায় ফোঁটায় তাতারীদের কানে ঢালতে থাকলেন। তাছাড়া মুসলমানদের তাহজিব ও তামাদুন স্বয়ং তাতারীদের জন্য প্রভাব বিস্তারকারী ছিল। ফলাফল এই দাঁড়াল যে, এক শতাব্দী অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই তাতারীরা সামষ্টিকভাবে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল।

[১] اصطباع (ইসবাত/ব্যাপ্টিজম): খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের সময় মাথায় পানি ছিটানোর প্রথা পালন করা। (ফিরোজুল লুগাত জামে)

[২] THE PREACHING OF ISLAM 169, 170, 171, (দাওয়াত-এ-ইসলাম, পৃ. ২৩৩)

[৩] তারিখ দাওয়াত ওয়া আজিমত: ১/৩৩৩

খানাত-ই কিপচাকে ইসলামের দাওয়াত

“শাখে জররীন খেল”-এর তাতারদের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত প্রচারকারীদের মধ্যে সবার আগে একজন বন্দীর কথা উল্লেখ করা জরুরি, যার অবস্থা পড়ার পর অনুভূত হয় যে, আল্লাহর ইচ্ছায় তাতার জাতির উচ্চবিত্তদের মধ্যে হকের বাণী ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তাকে শিকলবদ্ধ অবস্থায় এই কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

শাহজাদী খান সুলতান - ইসলামের এক অজ্ঞাতনামা মুবাশ্শিগা যিনি ইতিহাস বদলে দিয়েছিলেন:

এই বন্দী কোনো সাধারণ নারী ছিলেন না, বরং একজন শাহজাদী ছিলেন। তিনি ছিলেন খাওয়ারিজমের বাদশাহ আলাউদ্দিন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহের কন্যা এবং ইসলামের মুজাহিদ জালালুদ্দিন খাওয়ারিজম শাহের বোন, “خان سلطان” (খান সুলতান)। চেঙ্গিস খান যখন খাওয়ারিজম আক্রমণ করে তা তখনই করে দেয় এবং আলাউদ্দিন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহ তাতারদের হাত থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে কাস্পিয়ান সাগরের একটি দ্বীপে চলে যান, তখন তিনি তার পরিবারের নারী ও শিশুদের মাজান্দারানের একটি মজবুত দুর্গে রেখে গিয়েছিলেন। এই নারীদের মধ্যে খাওয়ারিজম শাহের বৃদ্ধা মাতা মালিকা তুরকান খাতুন এবং তার কন্যা শাহজাদী খান সুলতানও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাতাররা রাজপরিবারের সদস্যদের সেখানে অবস্থানের খবর পেয়ে সেই দুর্গ অবরোধ করে। দুর্গটি অত্যন্ত মজবুত ছিল, কিন্তু এর সুউচ্চ প্রাচীর ক্ষুধা ও তৃষ্ণাকে প্রতিহত করতে পারেনি। যখন দুর্গের পুকুরগুলো পানি শূন্য হয়ে গেল এবং অবরুদ্ধ ব্যক্তিরা এক এক ফোঁটা পানির জন্য ছটফট করতে লাগল, তখন তারা বাধ্য হয়ে নিজেদের শত্রুদের হাতে সঁপে দিল। তাতাররা এই বন্দীদের ওপর নানা ধরনের জুলুম-নির্যাতন চালানোর পর চেঙ্গিস খানের কাছে পাঠিয়ে দিল। সে অত্যন্ত নির্মমভাবে সকল শিশুকে হত্যা করল এবং নারীদেরকে নিজের পুত্র ও সরদারদের মধ্যে বণ্টন করে দিল। [১] মালিকা তুরকান খাতুনকে চেঙ্গিস খান নিজের সাথে গোবি মরুভূমিতে নিয়ে গিয়েছিল, যেখানে ৬৩০ হিজরিতে মৃত্যুর ফেরেশতা এসে তাকে দুঃখ ও কষ্টের শিকল থেকে মুক্ত করেন। [২] এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, লাঞ্ছনার তীক্ষ্ণ হুল এবং জুলুম ও নির্যাতনের চাবুক আল্লাহর এই বান্দীদের কষ্ট দিচ্ছিল, কিন্তু শারীরিক কষ্ট ও মানসিক যন্ত্রণা তাদের ঈমান ও ইসলাম থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি।

শাহজাদী খান সুলতানকে চেঙ্গিস খানের বড় ছেলে জোচি খান নিজের কাছে রেখে স্ত্রী বানিয়ে নেয়। এই কু-আকিদা ও মূর্খ শত্রুদের মাঝে তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ছিল এক আযাব, কিন্তু আল্লাহর এই বান্দী এই সমস্ত কষ্ট ও পেরেশানিকে...

[১] সীরাত সুলতান জালালুদ্দিন, পৃ. ৯৫ থেকে ৯৭; তারিখ-ই জাহান-গুশা জুওয়াইনি, পৃ. ৫৩৪, ত. হার্মিস; রওজাতুস সাফা: ৪/৮২৫।

[২] সীরাত সুলতান জালালুদ্দিন, পৃ. ৯৫ থেকে ৯৮; তারিখ-ই জাহান-গুশা জুওয়াইনি, পৃ. ৫৩৪, ত. হার্মিস।

ভাগ্যের লিখন এবং রবের ফয়সালা মনে করে তা সহ্য করে নিলেন এবং ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে সময়ের প্রতিকূল পরিস্থিতির মাঝে নিজের ভাগ্যের বিবর্তন অবলোকন করতে থাকলেন। ধৈর্যের ফল মিষ্টি হলো। ধীরে ধীরে তার ওপর কঠোরতা কমে গেল। তার গর্ভে জোজির সন্তানও জন্ম নিল। [১]

জোজি খান এবং ইসলাম:

এই সময়ের মধ্যে তার স্বামী জোজি খানের মানসিকতায় অনেক পরিবর্তন এসেছিল এবং সে মুসলমানদের ব্যাপারে অনেক নরম হয়ে গিয়েছিল। তাতারীদের হাতে মুসলমানদের ওপর চালানো নির্যাতনের কারণে সে অত্যন্ত লজ্জিত ছিল। এটা অসম্ভব নয় যে, এটি ছিল সেই শাহজাদীর ব্যক্তিত্বের প্রভাব। মনে হয় যে, জোজি এই স্ত্রীকে খুব ভালোবাসতে শুরু করেছিল। এই কারণেই শাহজাদীকে কেবল নামাজ, তিলাওয়াত এবং অন্যান্য ধর্মীয় ইবাদতের অনুমতিই দেওয়া হয়নি, বরং জোজি নিজে তাকে তাকিদ দিয়েছিল যেন সে তার সন্তানদের কুরআন মাজিদ শিক্ষা দেয়। জোজি খান শাহজাদীর ভাই সুলতান জালালুদ্দিনের সাথে আত্মীয়তা এবং মিত্রতার সম্পর্ক স্থাপন করতে ইচ্ছুক ছিল। খান সুলতান তার ভাইকে জোজির এই নেক ইচ্ছা সম্পর্কে একটি পত্রও লিখেছিলেন। [২]

এই সময়ে জোজির ঘরে একটি পুত্র সন্তান জন্ম নেয় যার নাম রাখা হয় বারকা খান। তার জন্মের পরপরই জোজি বলেছিলেন: “আমি চাই এই শিশুটি বড় হয়ে মুসলমান হোক। তার নাভিও যেন একজন মুসলমান ধাত্রী কাটে এবং তাকে দুধও যেন একজন মুসলমান ধাত্রী পান করায়।” ফলে বারকা খানের লালন-পালন মুসলমান ধাত্রীদের হাতেই সম্পন্ন হয়। [৩]

সে শৈশব থেকেই ইসলামী শিক্ষা ও দীক্ষায় কিছুটা সজ্জিত হয়ে গিয়েছিল। যেমনটি কাজী মিনহাজুস সিরাজ লিখেছেন: “যখন সে জ্ঞান ও বুদ্ধির বয়সে পৌঁছাল, তখন একদল মুসলমান আলেমকে একত্রিত করে তাদের মধ্য থেকে একজনকে নির্বাচন করা হলো যাতে তাকে কুরআনের শিক্ষা দেওয়া হয়। কিছু নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী বলেন যে, তার কুরআন শিক্ষা খুজান্দ শহরে হয়েছিল।” [৪]

যদিও কিছু বর্ণনা থেকে জানা যায় যে সে যৌবনে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, যেমনটি বর্ণিত আছে যে, একদিন বুখারা থেকে বণিকদের একটি কাফেলা গোল্ডেন হোর্ড (উর্দুয়ে জরিন) গোত্রে আসে। তাতে দুইজন মুসলমান বণিক ছিল। বারকা খান তাদের সাথে একান্তে সাক্ষাৎ....

[১] সিরাত সুলতান জালালুদ্দিন লিন-নাসাউয়ি, পৃ. ৩০১।

[২] সিরাত সুলতান জালালুদ্দিন লিন-নাসাউয়ি, পৃ. ৩০১।

জোজি শাহজাদী খান সুলতানকে তার ভাই সুলতান জালালুদ্দিনের সাথে পত্রালাপের অনুমতি দিয়েছিলেন এবং ভাই-বোনের মধ্যে চিঠিপত্র আদান-প্রদান চলত, কিন্তু ইতিহাসে তার কোনো রেকর্ড বর্ণিত নেই। কেবল একটি পত্র সংরক্ষিত আছে যা সুলতান জালালুদ্দিন ৬২৬ হিজরিতে খালাত অবরোধের সময় পেয়েছিলেন, যার মূল পাঠের সারমর্ম সুলতান জালালুদ্দিনের মুন্সি নাসাউয়ি নকল করেছেন। এই চিঠিতেই বোন ভাইকে জানিয়েছিলেন যে, খাকান (জোজি) আমাকে সন্তানদের কুরআন পড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনি আপনার সাথে আত্মীয়তা ও শান্তি চুক্তির প্রত্যাশী। (সিরাত সুলতান জালালুদ্দিন, পৃ. ৩০০) কিন্তু চুক্তির দিকে কোনো অগ্রগতি হতে পারেনি। মনে রাখা প্রয়োজন যে, যখন এই পত্র সুলতান জালালুদ্দিনের কাছে পৌঁছায়, তখন জোজি খানের মৃত্যুর দুই বছর অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল এবং কিপচাক সিংহাসনে বাতু খান আসীন ছিলেন। সম্ভবত দুতের অসাধারণ সমস্যা ও বাধার কারণে এই পরিমাণ বিলম্ব হয়েছিল। আপনারা আগে পড়েছেন যে, বাইবার্সের একটি দূতাবাস মিশর থেকে গোল্ডেন হোর্ড পর্যন্ত পৌঁছাতে দুই বছরের বেশি সময় লেগেছিল।

[৩] তাবাকাত-ই-নাসিরি, কাজী মিনহাজুস সিরাজ জুজজানি: ২/১৫০, তাবা কাবুল।

[৪] তাবাকাত-ই-নাসিরি: ২/২১৩।

এখানে একটি সংশয় দেখা দিতে পারে যে, খুজান্দ মাওয়ারাননাহরে অবস্থিত, অথচ জোজির রাজ্য ছিল মাওয়ারাননাহর থেকে উত্তর-পশ্চিমে। উত্তর হলো, গোল্ডেন হোর্ড دشت-ই-কিপচাকের সাথে আরল সাগরের কিছু দক্ষিণ শহরের ওপরও কর্তৃত্ব লাভ করেছিল, যেমনটি সমরকন্দে বারকা খানের হস্তক্ষেপের একটি ঘটনা থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। (তাবাকাত-ই-নাসিরি: ২/২১৫, ২১৬) একইভাবে বুখারাও তার জায়গিরের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল, যেমনটি আল্লামা আইনি কর্তৃক বর্ণিত কিছু ঘটনা এর প্রমাণ। (ইকদ আল-জুমান: সন ৬৫২ হিজরি)

এবং তাদের কাছে ইসলাম সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করলেন। এই বণিকরা তার প্রশ্নগুলোর উত্তর এত চমৎকারভাবে দিলেন যে, বারকা খানের মনে ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না। ফলে তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। [১] তবে এই বর্ণনা যদি সঠিক হয়, তবে এর অর্থ সম্ভবত এই হবে যে, বারকা খান সেই সময় ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছিলেন। [২] অন্যথায় ইসলামের দীক্ষা তিনি শৈশব থেকেই পেয়েছিলেন, যেমনটি কাজী মিনহাজুস সিরাজ স্পষ্ট করেছেন এবং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এতে শাহজাদী খান সুলতানের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

শাহজাদী খান সুলতানের অবস্থা সম্পর্কে এর চেয়ে বেশি উল্লেখ পাওয়া যায় না; ইতিহাস তার এই শেষ কীর্তির কথা উল্লেখ করে তার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব। জানা যায়নি যে, শাহজাদী এই অভিযান চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ কতদিন পেয়েছিলেন এবং কবে তার মৃত্যু হয়েছিল? ইতিহাস থেকে ইহাও জানা যায় না যে, তার ঘরোয়া মন্তব্য দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তার জীবদ্দশায় কোনো তাতারী বাদশাহ বা শাহজাদী ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন কি না? ইতিহাসে ইহাও স্পষ্ট নয় যে, শাহজাদী খান সুলতানের কাছে কুরআন পাঠকারীদের মধ্যে তাজ জরিন খিলের উত্তরাধিকারী বাতু খান এবং বারকা খান অন্তর্ভুক্ত ছিলেন কি না?

[১] THE PREACHING OF ISLAM: 174, 175; ‘দাওয়াত-ই-ইসলাম’ পৃ. ২২৯, ২৩৮। আনন্ড এই ঘটনার জন্য আবু আল-গাজী বাহাদুর খানের ‘তারিখ-ই-মুঘল’ (ফরাসি অনুবাদ ১৮১২)-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এখন পর্যন্ত আমার মূল উৎস পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব হয়নি।

[২] কাজী মিনহাজুস সিরাজের মতে, বারকা খানের জন্ম ইসলামী বিশ্বে তাতারীদের আক্রমণের যুগে হয়েছিল। “ثبات چنین روایت کنند که ولادت این برکادر” (তাবাকাত-ই-নাসিরি: ১৫০/২)। ইসলামী বিশ্বে তাতারী বিজয়ের প্রথম পর্যায় ছিল ৬১৬ হিজরি থেকে ৬১৮ হিজরি পর্যন্ত। সুতরাং বারকা খানের জন্ম এই সময়ের মধ্যেই হয়ে থাকবে। এই সময়ের মধ্যেই ৬১৭ হিজরির মাঝামাঝি সময়ে শাহজাদী খান সুলতান তাতারীদের হস্তগত হন। তার বন্দি হওয়ার তারিখ সুনির্দিষ্ট নয়, তবে এই ঘটনা নিশ্চিতভাবে সুলতান আলাউদ্দিন মুহাম্মদের মৃত্যুর (শাবান ৬১৭ হিজরি) কয়েক সপ্তাহ আগে ঘটেছিল, কারণ তিনি তার নারীদের বন্দি হওয়ার খবরে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলেন। (তারিখ-ই-জাহান গুশা জুওয়াইনি: ৩৫৮/২, তিবরিস)। যেহেতু ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী শাহজাদী বন্দি হওয়ার পর খুব একটা বিলম্ব না করেই জোচির সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন, তাই বলা যেতে পারে যে ৬১৭ হিজরির শেষ নাগাদ তিনি জোচির স্ত্রী হয়ে গিয়েছিলেন। এই ভিত্তিতে যদি ৬১৮ হিজরিতে বারকার জন্ম হয়ে থাকে, তবে তিনি জোচির যেকোনো স্ত্রীর সন্তান হতে পারেন, তবে এটি যুক্তিসঙ্গতভাবে অসম্ভব নয়। ইতিহাসে উল্লেখ নেই যে বারকা খান শাহজাদী খান সুলতানের গর্ভজাত জোচির সন্তান ছিলেন: “واستخلصها دوشی خان لنفسه واستولدها” (সিরাত সুলতান জালালুদ্দিন আল-মানকুবিরনি, পৃ. ৩০১)। তবে সন্তানদের মধ্যে বারকা খান অন্তর্ভুক্ত নন। ইতিহাস এ বিষয়ে নীরব। কিছু ঐতিহাসিক বারকার মৃত্যুর কথা উল্লেখ করে বলেছেন: “وهو في عشر الستين” (জাইল মিরাত আল-জামান: ২/৩৬৫; আল-নুজুম আল-জাহিরা ৬৬৫ হিজরি), যার সারমর্ম হলো মৃত্যুর সময় তার বয়স পঞ্চাশ বছরের বেশি ছিল। এটি থেকে বোঝা যায় যে বারকা ৬৬৫ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। যদি সেই সময় তার বয়স পঞ্চাশ বছরের বেশি হয়, তবে তার জন্ম ৭১৫ হিজরির আগে হয়। অথচ শাহজাদী খান সুলতান ৬১৭ হিজরিতে জোচির বিবাহে আসেন, যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে বারকা খান শাহজাদী খান সুলতানের সন্তান হতে পারেন না।

অন্যদিকে কাজী মিনহাজুস সিরাজ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, বারকার জন্ম ইসলামী বিশ্বে তাতারী আক্রমণের সময় হয়েছিল, যখন জোচি ইসলাম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং বারকার লালন-পালনের দায়িত্ব মুসলিম ধাত্রীদের ওপর অর্পণ করেছিলেন। এই হিসাব অনুযায়ী বারকার মোট বয়স পঞ্চাশ বছরের কম হয় (৬১৬ হিজরি থেকে ৬২৫ হিজরি পর্যন্ত ইসলামী বিশ্বে তাতারীদের আক্রমণ প্রায় এই সময়কাল)। এই আলোচনা থেকে এটি নিশ্চিত হওয়া যায় না যে বারকা খান জোচির কোন স্ত্রীর সন্তান ছিলেন, তবে এটি নিশ্চিত যে বারকার জন্মের সময় শাহজাদী খান সুলতান জোচির বিবাহে ছিলেন, যার ইসলামী চিন্তাধারার প্রভাব জোচিকে ইসলামের নিকটবর্তী করেছিল।

ফাওয়ায়েদ (উপকারিতা):

(১) রশিদউদ্দিনের মতে, ৬২৩ হিজরিতে যখন জোচি মারা যান, তখন তার বয়স ছিল চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছরের মধ্যে। (জামি আল-তাওয়ারিখ, ফারসি: ১৩৩/২, লাইডেন)। অর্থাৎ তার জন্ম ৫৮২ হিজরি থেকে ৫৯৩ হিজরির মধ্যে হয়েছিল।

(২) বারকা খানের বড় ভাই বাতু খানের মোট বয়স ছিল ৪৮ বছর, যিনি ৬৫০ হিজরিতে মারা যান। (জামি আল-তাওয়ারিখ, ফারসি: ৭৩/২, লাইডেন)। অর্থাৎ বাতুর জন্ম ৬০২ হিজরিতে এবং পিতার মৃত্যুর সময় তার বয়স ছিল ২২ বছর।

(৩) বারকার এক বড় ভাই ছিল যার নাম “ওরদা”। সামগ্রিকভাবে তারা চৌদ্দ ভাই ছিলেন। বাতু ছিলেন দ্বিতীয় এবং বারকা ছিলেন তৃতীয়। (জামি আল-তাওয়ারিখ: ৯২, ৯১/২, লাইডেন)।

তবে লক্ষণগুলো নির্দেশ করে যে, শাহজাদী খান সুলতান জোজি-র পুরো পরিবারের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। যখন ঐতিহাসিকরা বাগদাদের পতনের কিছুকাল পর জোজি খানের পুত্র বারকা খানকে হঠাৎ ইসলামের ঘোষণা দিয়ে নিজের চাচাতো ভাই হালাকু খানের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য তলোয়ার হাতে তুলে নিতে দেখেন, তখন তারা উপলব্ধি করেন যে, আল্লাহর সেই বান্দী এই শত্রু জাতির সন্তানদের হৃদয়ে ইসলাম ও ঈমানের যে বীজ বপন করেছিলেন, তা কেমন এক বিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়েছে এবং কত চমৎকার ফল দান করেছে। তিনি জানতে পারেন যে, শাহজাদী খান সুলতান ‘সরাই মহল’-এর এক কোণে অত্যন্ত ইখলাস ও আন্তরিক আবেগের সাথে শিশুদের যে কুরআনের শিক্ষা দিয়েছিলেন, তার প্রভাব ধীরে ধীরে প্রকাশ পেতে শুরু করেছিল এবং তরুণ তাতার শাহজাদাদের মধ্যে ইসলামী চিন্তা-চেতনা বিকশিত হতে থাকে।

প্রকৃতপক্ষে এই প্রভাব খোদ জোজি-র জীবনেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। জোজি তার জীবনের শেষ বছরগুলোতে মুসলমানদের ওপর চালানো নির্যাতনের কারণে অত্যন্ত লজ্জিত ছিলেন এবং এর ক্ষতিপূরণ হিসেবে তার প্রতিদ্বন্দ্বী খাওয়ারিজমীয়দের বন্ধু বানাতে এবং নিজের স্ত্রী শাহজাদী খান সুলতানের পরিবারের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী ছিলেন। এই ইচ্ছাই তার হত্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যেহেতু চেঙ্গিস খানের উপস্থিতিতে এই লক্ষ্য পূরণ অসম্ভব ছিল, তাই জোজি তার পিতাকে হত্যার পরিকল্পনা করেন। এই ঝোঁকের বশবর্তী হয়ে তিনি একবার তার বিশ্বস্ত সঙ্গীদের বলেছিলেন:

“আমাদের পিতা পাগল হয়ে গেছেন। তিনি এত মানুষকে হত্যা করেছেন এবং এত বড় বড় সাম্রাজ্য ধ্বংস করে দিয়েছেন। আমার কাছে এটাই সমীচীন মনে হয় যে, শিকারের সময় পিতাকে হত্যা করে সুলতান মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহের পরিবারের সাথে আত্মীয়তা স্থাপন করি। এই ভূখণ্ডকে পুনরায় আবাদ করি এবং মুসলমানদের সাহায্য করি।” [১]

[১] তাবাকাত-ই-নাসিরি, মিনহাজ-ই-সিরাজ জুজজানি: ২/১৫০, তাবা কাবুল।

জোজি-র এই উক্তিগুলো নিয়ে চিন্তা করলে এটাও যুক্তিযুক্ত মনে হয় যে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। অন্যথায় একজন কাফের তাতার শাসকের কী এমন দায় পড়েছিল যে, তিনি মুসলমানদের গণহত্যার পাপে কেবল অনুতপ্তই হবেন না, বরং এর প্রতিকারের জন্য ফিতনার মূল হোতা—যিনি তার নিজের জন্মদাতা পিতা—তাকে হত্যার পরিকল্পনা করবেন? জোজি-র সময়ে সুলতান আলাউদ্দিন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহের উত্তরাধিকারী ছিলেন সুলতান জালালুদ্দিন। জোজি-র হৃদয়ে এই মুজাহিদ ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা, বাস্তবচ্যুত মুসলমানদের পুনর্বাসন করা এবং তাদের আশ্রয় দেওয়ার মতো কঠিন লক্ষ্য পূরণের প্রেরণা কি কেবল তার পিতা ও ভাইদের প্রতি ঘৃণা থেকে সৃষ্টি হয়েছিল, নাকি এর পেছনে কোনো ঈমানি প্রদীপও প্রজ্বলিত ছিল? নিজের নবজাতক সন্তানের মুসলমান হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা এবং স্ত্রীকে কুরআনের শিক্ষা প্রচারের নির্দেশ দেওয়া কি এটা প্রমাণ করে না যে, জোজি-র হৃদয়ে ইসলামের সত্যতা স্থান করে নিয়েছিল?

তাহাড়া রশিদউদ্দিন জোজি-র সন্তানদের বর্ণনা করতে গিয়ে তার চৌদ্দজন পুত্রের কথা উল্লেখ করেছেন এবং একাদশ পুত্রের নাম মুহাম্মদ জানিয়েছেন। (জামেউত তাওয়ারিখ ফারসি: ২/৯১) এমন কোনো স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় না যে, তার আসল নাম অন্য কিছু ছিল এবং ইসলাম গ্রহণের পর এই নাম রাখা হয়েছিল। সুতরাং এটাই প্রতীয়মান হয় যে, এটি তার জন্মগত নাম ছিল। যে পিতা তার তৃতীয় পুত্রের জন্মের সময় তার মুসলমান হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন, কয়েক বছর পর ঈমানের আরও উন্নতির ফলে তিনি যদি তার একাদশ পুত্রের নাম ‘মুহাম্মদ’ রাখেন, তবে তাতে আশ্চর্যের কী আছে?

আর এটা স্পষ্ট যে, তার এই পরিবর্তনের পেছনে তার স্ত্রী শাহজাদী খান সুলতান ছাড়া আর কে হতে পারে? সেই যুগে দশত-ই-কিপচাকে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত এমন কোনো মুসলমান ছিল না যার দ্বারা জোজি প্রভাবিত হতে পারেন। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, এটি সেই মুসলিম স্ত্রীরই কারিশমা ছিল যিনি এই অত্যন্ত শক্তিশালী বাদশাহকে প্রভাবিত করেছিলেন। অতএব এটা খুবই সম্ভব যে, জোজি গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এটাও অসম্ভব নয় যে, প্রথমে তিনি নিজে তার স্ত্রীর কাছে কুরআন পড়েছিলেন এবং আল্লাহর কালামের প্রভাবই তাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল যাতে তিনি তার স্ত্রীকে পরিবারের অন্যান্য শিশুদের কুরআন শেখানোর নির্দেশ দেন। সভ্য জগত থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে তৃণভূমির তাঁবুতে শাসনকারী এই বাদশাহর ইসলাম গ্রহণ যদি প্রকাশ না পেয়ে থাকে, তবে তার পেছনে জোরালো কারণ ছিল। সেই সময় মঙ্গোলদের নেতা ‘আজম’ চেঙ্গিস খান জীবিত ছিলেন, যার কাছে ইসলামের কোনো স্থান ছিল না। জোজি-র ইসলাম গ্রহণকে তিনি প্রকাশ্য বিদ্রোহ মনে করে মঙ্গোলদের সম্মিলিত শক্তি নিয়ে গোল্ডেন হোর্ড (উর্দু-এ-জররিন)-এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন। ইসলামের দাওয়াতকে পর্যায়ক্রমে এগিয়ে নেওয়ার জন্য পিতাকে অজ্ঞাত রাখা এবং তার ক্রোধ থেকে বাঁচতে গোপনে কাজ করা জরুরি ছিল। এই দিকগুলো বিবেচনা করলে, জোজি ইসলাম গ্রহণ করার পরও যদি তা গোপন রেখে থাকেন, তবে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। সম্ভবত জোজি যদি আরও দুই-তিন দশক সময় পেতেন, তবে তার পুত্রদের মতো কোনো এক সময় তিনিও ইসলামের ঘোষণা দিতেন, কিন্তু সম্ভবত তিনি সেই সময় পাননি।

চেঙ্গিস খানকে পথ থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি তাঁর বিশ্বস্ত সঙ্গীদের কাছে মনের যে কথা বলেছিলেন, তা তাঁর ভাই চাগাতাইয়ের কাছে পৌঁছে যায়, যিনি ছিলেন মুসলমানদের ঘোর শত্রু। তিনি অবিলম্বে চেঙ্গিস খানকে অবহিত করেন। একটি বর্ণনা অনুযায়ী, চেঙ্গিস খান একজন গুপ্তচর পাঠান যে জোজির খাবারে বিষ মিশিয়ে দেয়, এভাবে জোজির মৃত্যু ঘটে। [১]

বাতু খানের যুগে:

জোজি খানের বড় ছেলে বাতু খান ৬২৪ হিজরিতে তাঁর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন। তিনি সাম্রাজ্যকে আরও বিস্তৃত করে একদিকে দক্ষিণ রাশিয়া এবং অন্যদিকে পশ্চিমে পোল্যান্ডও জয় করেন। ৬৩৯ হিজরিতে তিনি বুদাপেস্ট জয় করেছিলেন। [২]

তাঁর সমসাময়িক কাজী মিনহাজুস সিরাজ রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন:

“তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং মুসলিম-বান্ধব ছিলেন। তাঁর ছায়াতলে মুসলমানরা সুখ-শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করছিল। তাঁর সেনাশিবির ও গোত্রগুলোতে জামাতের সাথে সালাত কায়েম ছিল। ইমাম ও মুয়াজ্জিন সব জায়গায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁর পুরো শাসনকাল এবং জীবনকালে তাঁর আদেশে অথবা তাঁর অনুসারী ও সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে মুসলিম দেশগুলোর কোনো ক্ষতি হয়নি। তুর্কিস্তানের মুসলমানরা তাঁর সমর্থনের ছায়াতলে অনেক স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি লাভ করেছিল। ইরানের যে কোনো প্রদেশ যা মঙ্গোলদের অধীনে আসত, তাতে বাতু খানের অংশ নির্ধারিত থাকত। মঙ্গোলদের সমস্ত সেনাপতি তাঁর অনুগত ছিল এবং তাঁকে তাঁর পিতার মতো মনে করত। যখন গুয়ুক খান মারা গেলেন এবং জাহান্নামবাসী হলেন, তখন চাগাতাইয়ের ছেলেরা ছাড়া সমস্ত মঙ্গোল আমীর তাঁর কাছে আবেদন করেন যে তিনি যেন মঙ্গোল সিংহাসনের (কারাকোরাম) শাসনভার গ্রহণ করেন এবং রাজা হন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি, যার ফলে মঙ্গোল আমীররা তোলুইয়ের ছেলে মঙ্গু খানকে সিংহাসনে বসান।” [৩]

বাতু খানের এই গুণাবলি তাঁকে মুসলমানদের একজন একনিষ্ঠ শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে প্রমাণ করে এবং এই সম্ভাবনাও তৈরি হয় যে সম্ভবত তিনি গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। সেই সময়ের কিছু লোক এমনটাই বলতেন। چنگাজ কাজী মিনহাজুস সিরাজ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন:

“আমি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের কাছ থেকে শুনেছি যে বাতু গোপনে মুসলমান ছিলেন কিন্তু এই কথা প্রকাশ করতেন না। তিনি পুরোপুরিভাবে ইসলামপন্থীদের আকিদা পোষণ করতেন। তিনি কমবেশি আটাশ বছর শাসন করেছেন। যদি তিনি ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকেন তবে আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন, আর যদি কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকেন তবে আল্লাহ তাঁর আজাব কমিয়ে দিন।” [৪]

বারকা খান শাসনের আগে:

বাতু খান তাঁর ছোট ভাই বারকা খানকে অনেক সম্মান করতেন, যাঁকে তাঁর পিতা জন্মের পরপরই মুসলমান বানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি যখন প্রাপ্তবয়স্ক হলেন, তখন সেনাশিবিরে যত মুসলমান ছিল, তাদের সবাইকে তাঁর বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হলো।

[১] মিনহাজুস সিরাজ জুজজানি রচিত তাবাকাতে নাসিরি: ২/১৫০, কাবুল সংস্করণ।

[২] হাফেজ আহমদ হামদি রচিত আদ-দাওলাতুল খুওয়ারেজমিয়াহ ওয়াল মুগুল, পৃষ্ঠা ২৭৯, দারুল ফিকর আল-আরাবি কায়রো সংস্করণ।

[৩] তাবাকাতে নাসিরি: ২/১৭৬।

[৪] তাবাকাতে নাসিরি: ২/১৭৬।

গেলেন। [১] বাতু খান বরকে-কে রাষ্ট্রীয় কার্যাদি পরিচালনায় সহযোগী করে রেখেছিলেন এবং এর জন্য তাকে জায়গির, কর্মকর্তা ও সৈন্য প্রদান করেছিলেন। এই প্রতিনিধিত্বের (নায়েবে) সময়কালে বরকে খান তার দূতদের অন্যান্য দেশেও পাঠাতেন।

বরকে খান এবং শেখ সাইফউদ্দিন বাখরযী রহ.:

বরকে খানের ইসলামি তরবিয়তে বুখারার একজন মহান সূফী বুজুর্গ শেখ সাইফউদ্দিন বাখরযী রহ.-এর অনেক বড় অবদান ছিল, যিনি খাওয়ারিজমের মাশায়েখদের শিরোমণি শেখ নাজমুদ্দিন কুবরা রহ.-এর খলিফা ছিলেন। তিনি অত্যন্ত মুত্তাকী, পরহেজগার এবং ইবাদতগুজার ও জাহিদ মানুষ ছিলেন। ৬১৬ হিজরিতে যখন চেঙ্গিস খান মুসলিম বিশ্বের ওপর হামলা করে, তখন বুখারা ছিল এই আক্রমণের শিকার হওয়া প্রথম বড় ইসলামি শহর। চেঙ্গিজী হামলায় এটি এমনভাবে ধ্বংস ও বরবাদ হয়েছিল যে সমস্ত দালানকোঠা পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া সমস্ত অধিবাসী তাতারীদের হাতে শহীদ হয়েছিল। বুখারা ধ্বংসের কয়েক মাস পর তাতারীরা খাওয়ারিজমের রাজধানী উরগঞ্জ অভিমুখে অগ্রসর হয়, যেখানে শেখ নাজমুদ্দিন কুবরা রহ. তাঁর খলিফাদের নিয়ে নিজ খানকায় অবস্থান করছিলেন। তিনি তাঁর খলিফাদের বিভিন্ন দেশে পাঠিয়ে দেন এবং নিজে উরগঞ্জে থেকে জিহাদ করতে করতে শহীদ হন। [২]

শেখ বাখরযী রহ. তাঁর মুর্শিদের পক্ষ থেকে বুখারার ধ্বংসাবশেষে বসতি স্থাপনের নির্দেশ পেয়েছিলেন। তিনি এখানে চলে আসেন। মুসলিম বিশ্বের এই মহান শহর তখন আর শহর ছিল না বরং কবরস্থানে পরিণত হয়েছিল। এর ভস্মীভূত ও বিধ্বস্ত জনপদগুলোর উপকণ্ঠে শেখ রহ. একটি ছোট খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আল্লাহ প্রদত্ত সংকল্প ও সাহস এবং পূর্ণ ঈমানের বলে তাতারীদের তলোয়ারের নিচে সেই আতঙ্কজনক পরিবেশে অত্যন্ত কঠিন সময় অতিবাহিত করেন।

৬২২ হিজরিতে তিনি এখানে দরসে বুখারী শুরু করেন। এখন দূর-দুরান্ত থেকে মানুষ শেখ রহ.-এর নিকট থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য উপস্থিত হতে শুরু করে এবং নিজেদের আকিদা ও আমল সংশোধন করে ফিরে যেত। অনেক মানুষ শেখের সান্নিধ্যকে সৌভাগ্য মনে করে এখানেই বসবাস শুরু করে। এভাবে শেখের বরকতে বুখারা পুনরায় আবাদ হতে শুরু করে। [৩]

উর্দু-এ-জররীন (গোল্ডেন হোর্ড)-এ শেখ সাইফউদ্দিন বাখরযী রহ.-এর দূত:

শেখ সাইফউদ্দিন বাখরযী রহ.-এর খ্যাতি এখন মঙ্গোলদের মধ্যে দূর-দুরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি অত্যন্ত হিকমত ও ইখলাসের সাথে ইসলামের দাওয়াতের কাজ একটি মিশনের মতো আঞ্জাম দিচ্ছিলেন। তিনি তাঁর একজন ছাত্রকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য বাতু খানের সালতানাতে পাঠান। এই ছাত্র সেখানে বরকে খানের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং উর্দু-এ-জররীন দরবারে ইসলামের বাণী পৌঁছে দেন এবং... [৪]

[১] তবাকাত-ই-নাসিরী, মিনহাজুস সিরাজ জুযজানী: ২/২১৩, ত. কাবুল। এখানে লেখকের বক্তব্য “যখন তিনি সাবালকত্বে পৌঁছালেন, তখন তুশির লশকরগাহে যা কিছু ছিল তা মুসলিম ছিল এবং আছে...” ভ্রান্তিহীন নয়। যেহেতু জোচির মৃত্যু (৬২৩ হি.) বরকের সাবালক হওয়ার আগে হয়েছিল, তাই একে বাতু খানের সময়ের ঘটনা হিসেবে গণ্য করা উচিত। “লশকরগাহ-এ-তুশি” দ্বারা এটি আবশ্যিক হয় না যে তুশি (জোচি) সেই সময় জীবিত ছিলেন। বরং প্রবল ধারণা এই যে, এখানে বাতু খানের লশকরগাহকে “লশকরগাহ-এ-তুশি” হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

[২] তবাকাত-ই-নাসিরী: ২/২১৩।

[৩] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২৩/৬৩, ৩৬৫, ত. আর-রিসালা।

[৪] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২৩/৩৬৫, ত. আর-রিসালা।

ইসলামী শিক্ষাগুলোকে স্পষ্ট করেছেন। এই ওয়াজ ও বয়ানের সেখানে বড় প্রভাব পড়েছিল। বারকা খান এরপর তার মোগল অফিসার ও সৈন্যদের ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে বড় তৎপরতা দেখান। [১] তার প্রচেষ্টার সফলতার আন্দাজ এই কথা থেকে করা যায় যে, ৬৩১ হিজরিতে বারকা হিন্দুস্তানে একটি প্রতিনিধি দল পাঠান যারা সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুতমিশের দরবারে উপস্থিত হয়েছিল। সুলতান তাদের গোয়ালিয়রে পাঠিয়ে দেন যেখানে সেই সময়ে কাজী মিনহাজুস সিরাজ রহ. চিফ জাস্টিস হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি লিখেন:

“এই লোকগুলো মুসলিম ছিল এবং প্রতি জুমুআয় অধমের (লেখকের) পেছনে জামে মসজিদে নামাজ আদায় করতে আসত। সুলতান রাজিয়ার সময় পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত ছিল।” [২]

বারকা খানের আল্লাহর ওলিদের সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ:

এই যৌবনকালে বারকা খানের আগ্রহ ও কর্মকাণ্ডের এর চেয়ে বেশি উল্লেখ পাওয়া যায় না। সম্ভবত এই সময়টি তিনি মোগলদের অভ্যাস অনুযায়ী যুদ্ধবিদ্যা এবং শিকার ও অশ্বারোহণের মতো কাজে দক্ষতা অর্জন করে কাটিয়েছেন। এটাও স্পষ্ট যে, কুরআন মাজিদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করা সত্ত্বেও বারকার মনে দ্বীনের পূর্ণাঙ্গ চিত্র আসেনি এবং তার শিক্ষা ও দীক্ষায় অনেক মৌলিক দুর্বলতা বাকি ছিল। তিনি যে অঞ্চলে বসবাস করতেন, সেখানে মুসলমানদের কোনো শহর ছিল না। ইসলামী শিক্ষা অর্জন এবং আত্মশুদ্ধির মাধ্যমগুলো দুস্প্রাপ্য ছিল। বারকা খান নিশ্চিতভাবেই এই অভাব অনুভব করতেন, তাই তিনি মধ্য এশিয়ার মহান ওলি ও মাশায়েখদের জিয়ারতের সংকল্প করেন [৩] যাদের মধ্যে শেখ সাইফউদ্দিন বাখারজি রহ. তালিকার শীর্ষে ছিলেন। প্রথমে তিনি একজন দূত পাঠিয়ে শেখ রহ.-এর কাছে বায়আত হন কিন্তু জিয়ারতের আগ্রহ কমেনি। [৪]

শেখ বাখারজি রহ.-এর অমুখাপেক্ষিতা:

অধিক ভক্তি প্রকাশের জন্য তিনি শেখ সাইফউদ্দিন বাখারজি রহ.-এর কাছে বুখারার গ্রাম ও বনাঞ্চলের একটি জায়গিরনামা পাঠান যার মাধ্যমে সেই পুরো অঞ্চলের আয়ের মালিক শেখ বাখারজি রহ.-কে সাব্যস্ত করা হয়। বারকার উদ্দেশ্য ছিল যে, এভাবে শেখের নিরাপত্তা ও মর্যাদা অর্জিত হবে এবং জায়গিরের সম্পদ শেখ মেহমান, দরবেশ এবং উলামা ও নেককারদের সেবায় খরচ করতে পারবেন। যখন দূত গিয়ে তাকে এই জায়গিরনামা দিল তখন শেখ রহ. জিজ্ঞেস করলেন: “এটা কী?”

দূত বলল: “এটা আপনার হাতে থাকলে আপনার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সব ধরনের নিরাপত্তা লাভ করবে।”

শেখ রহ. বললেন: “এই দলিলটি ওই গাধার গলায় বেঁধে দাও। তারপর তাকে জঙ্গলের দিকে তাড়িয়ে দাও। যদি সেই গাধাটি পালাতে না পারে তবে আমি এটি গ্রহণ করব। আর যদি এই দলিল গাধাকে পালানো থেকে আটকাতে না পারে তবে আমাকে কী উপকার দেবে।”

[১] আকদুল জুমান লিল আইনি: সন ৬৫২ হিজরি। আল্লামা আইনি এই সব তথ্য “তারিখে তাবারুস”-এর বরাতে নকল করেছেন যাতে এটাও আছে যে, বারকা খান এই ছাত্রের হাতেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন: “ফাসলামা আলা ইয়াদিহি”। সম্ভব যে বারকা খান এর আগে শুধু ইসলামের প্রতি অনুরাগী ছিলেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি ইসলাম এই সময়েই গ্রহণ করেছেন এবং এটাও সম্ভব যে এটি ইসলামের নবায়ন (তাজদীদ) ছিল।

[২] তাবাকাতে নাসিরি, মিনহাজুস সিরাজ জুযজানি: ২/২১৩, তবা কাবুল।

[৩] তাবাকাতে নাসিরি: ২/২১৩।

[৪] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২৩/৩৬৬, তবা আর-রিসালাহ।

দূত ফিরে এসে বারকা খানকে শায়খের নির্লিপ্ততার এই ঘটনা শোনালেন। বারকা খানের শায়খ (রহ.)-এর প্রতি অদেখা ভক্তি তো আগে থেকেই ছিল। এখন তা বহুগুণ বৃদ্ধি পেল। তিনি বললেন: “এখন আমি নিজেই শায়খের খিদমতে যাব।” [১]

শাহজাদা ফকীরের কুটিরে:

অবশেষে তিনি তার বড় ভাই বাতু খানের কাছ থেকে বুখারা যাওয়ার অনুমতি নিলেন। বাতু খান যদিও বাহ্যত ইসলাম গ্রহণ করেননি, তবুও শায়খ বাখারজি (রহ.)-এর প্রতি তার ভক্তি ছিল। তিনি এই বিষয়ে আনন্দ প্রকাশ করলেন যে, বারকা একজন সত্যনিষ্ঠ দরবেশের মুরিদ হতে চান। এখন বারকা খান কয়েকজন সঙ্গীসহ এই দীর্ঘ সফরে রওনা হলেন। অবশেষে তিনি নিজের রাজধানী ‘সরাই বাতু’ থেকে যাত্রা করে কয়েক মাসের সফর শেষে জান্দ ও উত্তরার হয়ে বুখারা পৌঁছালেন। [২]

একজন শাহজাদা, যাকে দুনিয়ার প্রতিটি নেয়ামত ও প্রতিটি আরাম-আয়েশ হাসিল ছিল, আজ তিনি এমন এক সম্পদের খোঁজে বুখারার দরবেশের চৌকাঠে কড়া নাড়তে এসেছেন, যা থেকে বাদশাহদের ভাণ্ডারও শূন্য ছিল। বারকা খান যখন শায়খের হুজরার চৌকাঠে পৌঁছালেন, তখন মধ্যরাত অতিবাহিত হয়ে গেছে। বাইরে তুষারপাত হচ্ছিল, কিন্তু বারকা খান দরজায় কড়া নেড়ে শায়খকে বিরক্ত করা সমীচীন মনে করলেন না এবং বাইরেই নামাজের নিয়ত বাঁধলেন। রক্ত জমাট করা ঠান্ডায় তিনি সারা রাত নফল নামাজ পড়তে থাকলেন।

পূর্ব দিগন্তে ভোরের শুভ্রতা প্রকাশ পেলে শায়খের খানকাহর দরজা খুলল। [৩] শায়খ আমির ও কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করা পছন্দ করতেন না। কিন্তু কিছু মুরিদ সুপারিশ করলেন যে, বারকাকে সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া হোক। তারা বললেন: “এটি একটি বড় দেশের শাহজাদা। অনেক দূর থেকে শায়খের খিদমতে এসেছেন। শায়খের বরকত লাভ করতে এবং আলাপচারিতার সৌভাগ্য অর্জন করতে চান। তার সাথে দেখা করতে কোনো বাধা নেই।” [৪] অবশেষে শায়খ সাক্ষাতের অনুমতি দিলেন। [৫]

বারকা খান অত্যন্ত আদবের সাথে ভেতরে প্রবেশ করলেন। শায়খ বাখারজি (রহ.) অত্যন্ত স্নেহ ও ভালোবাসার সাথে তাকে স্বাগত জানালেন। বারকা খান আত্মহারা হয়ে শায়খের কদমে লুটিয়ে পড়লেন এবং তার কদমবুসি করতে লাগলেন। [৬]

তিনি শায়খ (রহ.)-এর হাতে ইসলামের তাজদীদ করলেন। শায়খ তাকে খাবার খাওয়ালেন। [৭]

[১] উকদ আল-জুমান: সন ৬৫২ হিজরি

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ২৩/৩৬৬, ত. আর-রিসালাহ

হাফেজ যাহাবি এই সফরের সময়কাল সম্পর্কে লিখেছেন: “وقد سافر من ستين سنة نيف واربعين الى بخارى لزيارة الشيخ سيف الدين البخاري” (সিয়রু আলামিন নুবালা: ২৩/৩৬৬) [অনুবাদ: তিনি সাতসিন থেকে চল্লিশ বছরের কিছু বেশি বয়সে শায়খ সাইফ উদ্দিন বাখারজির সাথে সাক্ষাতের জন্য বুখারা সফর করেন।] ধারণা করা যায় যে, সে সময় বারকা খানের বয়স ত্রিশ বছরের কাছাকাছি ছিল। শায়খ বাখারজির জন্ম ৫৮৬ হিজরিতে। যখন বারকা খান তার খিদমতে আসেন, তখন শায়খের বয়স পঞ্চাশ থেকে ষাট বছরের মধ্যে ছিল।

নোট: “সাতসিন” সরাই বাতুর দ্বিতীয় নাম ছিল অথবা এটি তার একটি মহল্লা ছিল। সরাই বাতুকে শুধু “সরাই”ও বলা হতো। একে জুজির পুত্র বাতু খান ১২৪০ খ্রিস্টাব্দে নিজের রাজধানী হিসেবে কাস্পিয়ান সাগরের উত্তরে এবং ভলগা নদীর বদ্বীপে আবাদ করেছিলেন। বর্তমানে এই এলাকাটি দক্ষিণ রাশিয়ার “আস্ত্রাখান” জেলার অন্তর্ভুক্ত। এর পরে সালতানাতের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর ছিল “বুলগার”। (ভুল বোঝাবুঝি যেন না হয়। এটি বুলগেরিয়া রাষ্ট্র নয়, বরং রাশিয়ার একটি শহর)।

[৩] উকদ আল-জুমান লিল আইনি: সন ৬৫২ হিজরি

[৪] সিয়রু আলামিন নুবালা: ২৩/৩৬৬, ত. আর-রিসালাহ

[৫] সিয়রু আলামিন নুবালা: ২৩/৩৬৬, ত. আর-রিসালাহ

[৬] উকদ আল-জুমান লিল আইনি: সন ৬৫২ হিজরি

বেরকে খানের সাথে তার কিছু সমমনা আমীরও এসেছিলেন। তারা সবাই শায়খের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। বেরকে খান শায়খ (রহ.)-এর কাছে কিছু দিন অবস্থান করেন এবং দ্বীনের প্রয়োজনীয় শিক্ষা লাভ করেন। তার সাতজন স্ত্রী ছিল। শায়খ (রহ.)-এর নির্দেশে তিনি চারজন ব্যতীত বাকি সবার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। শায়খ (রহ.) কিছু ওজিফা এবং কিছু দোয়া লিখে তাকে ও তার সাথীদের দেন এবং সেগুলো নিয়মিত পাঠ করার তাকিদ দেন। বেরকে খান শায়খের কাছে দীর্ঘ সময় থাকতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শায়খ (রহ.) অনেক মصلحتের কারণে তাকে দ্রুত ফিরে যাওয়ার তাকিদ দেন এবং বলেন:

“আমি চাই তুমি তোমার সালতানাতে থাকো।” [১]

ইসলাম প্রচারে বেরকে খানের আগ্রহ:

নিজ দেশে ফিরে গিয়ে বেরকে খান দীর্ঘ সময় নীরবে দ্বীনের দাওয়াত অব্যাহত রাখেন। তার স্ত্রী জগ খাতুনও ইসলাম গ্রহণ করেন এবং একটি তাঁবুকে মসজিদ হিসেবে ব্যবহার করে নারীদের মধ্যে ইসলামের দাওয়াতের কেন্দ্র বানিয়ে নেন। [২]

বেরকে খান আব্বাসী খলিফা মুসতাসিমের সাথেও যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং দুইবার খলিফার পক্ষ থেকে তাকে সম্মানসূচক পোশাক (খিলআত) পাঠানো হয়। ধীরে ধীরে তার সমমনা আমীরদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। কাজী মিনহাজুস সিরাজের মতে, বাতু খানের শাসনামলে বেরকে খানের বাহিনী ত্রিশ হাজার সৈন্যের সমন্বয়ে গঠিত ছিল, যেখানে জামাতের সাথে সালাত আদায় করা হতো। [৩]

বেরকে ও সারতাকের দ্বন্দ্ব:

কিন্তু বেরকে খুব সতর্কতার সাথে কাজ করছিলেন এবং তার প্রয়োজনও ছিল, কারণ তাতারীদের শাসক গোষ্ঠী তার ইসলাম গ্রহণে খুশি ছিল না। তার বড় ভাই বাতু খানের ছেলে সারতাক কেবল খ্রিস্টানদের গভীর বন্ধুই ছিল না, বরং খ্রিস্টধর্মের প্রতিও আগ্রহ দেখাচ্ছিল এবং ইউরোপের শাসকরা তার উত্তরসূরি হওয়ার সম্ভাব্য ঘোষণাকে গির্জার বিজয়ের পূর্বাভাস মনে করে তার রাজত্বের অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু এখানে ইতিহাস এক অদ্ভুত মোড় নিল। ৬৫০ হিজরিতে ৪৮ বছর বয়সী বাতু খান তার কোনো উত্তরসূরি ঘোষণা করার আগেই মৃত্যুবরণ করেন। [৪]

তার ছেলে সারতাক, যে নেস্টোরিয়ান খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল, সে সময় কারাকোরামে মাস্খু খানের কাছে ছিল। মাস্খু খান তাকেই বাতু খানের উত্তরসূরি নিযুক্ত করেন। এই পরিস্থিতিতে খ্রিস্টান বিশ্ব অত্যন্ত আনন্দিত হয়, এমনকি ফ্রান্সের রাজা তার এক বিশেষ প্রতিনিধি উইলিয়াম অফ রুব্রুককে সারতাকের কাছে পাঠান যাতে সে তাকে খ্রিস্টধর্মে মজবুত করতে পারে এবং তার...

[১] সিয়্যারু আলামিন নুবালা: ২৩/৩৬৬, ত. আর-রিসালাহ

[২] আস-সুলুক লি-মা’রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ১/৩৮৬, ত. আল-ইলমিয়্যাহ

[৩] তবাকাত-ই-নাসিরি, মিনহাজুস সিরাজ জুজজানি: ২/২১৩, ত. কাবুল

[৪] বাতু খানের সমসাময়িক ঐতিহাসিক কাজী মিনহাজুস সিরাজ লেখেন: “কিছু নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন যে, বাতু গোপনে মুসলমান হয়েছিলেন কিন্তু তিনি তা প্রকাশ করতেন না, যদিও তিনি পুরোপুরি মুসলমানদের মতো আকিদা পোষণ করতেন।” (তবাকাত-ই-নাসিরি: ২/১৭৬, ত. কাবুল)

হতে পারে তিনি সারতাকের খ্রিস্টানপ্রীতি দেখে ইচ্ছাকৃতভাবে তার উত্তরসূরি হওয়ার ঘোষণা দেননি যাতে বেরকে খান সামনে এগিয়ে আসার সুযোগ পান।

সাম্রাজ্যে খ্রিস্টানদের উপাসনালয়গুলো খুলে দিলেন। সারতাক এখন তার রাজধানীতে পৌঁছে সিংহাসনে বসার জন্য তাড়াহুড়ো করছিলেন। তিনি হাজার হাজার মাইল দীর্ঘ এই সফর দ্রুততার সাথে শুরু করেন এবং অবশেষে নিজের রাজ্যে পৌঁছে যান। [১]

বারকা খানের দোয়া যা কবুল হয়েছিল:

কিন্তু সারতাক তার চাচা বারকা খানের সাথে দেখা করতে ইতস্তত বোধ করলেন এবং নিজের সেনাশিবিরকে অন্য দিকে নিয়ে যেতে লাগলেন। বারকা খান তাকে বার্তা পাঠালেন: “আমি তোমার বাবার স্মৃতিভিষিক্ত। তুমি কেন অপরিচিতদের মতো আচরণ করছ? কেন কাছে আসছ না?”

সারতাক উত্তর পাঠালেন: “তুমি মুসলমান আর আমি খ্রিস্টান। আমি কোনো মুসলমানের চেহারা পর্যন্ত দেখতে চাই না।”

সারতাকের এই আচরণ গোল্ডেন হোর্ডকে (উর্দু-এ-জাররিন) দুই ভাগে বিভক্ত করার দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। স্পষ্টতই এর ফলাফল শীঘ্রই বা দেরিতে একটি বড় যুদ্ধের রূপ নিত। মঙ্গোলদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তখনও পর্যন্ত কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের অনুসারী ছিল না, তাই তাদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের সম্ভাবনা ছিল অত্যন্ত প্রবল, বিশেষ করে গোল্ডেন হোর্ড এর জন্য ছিল অত্যন্ত উর্বর ক্ষেত্র। কিন্তু এই সময়ে তাদের নিজেদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ হওয়া ইসলাম প্রচারের জন্য ক্ষতিকর হতে পারত। এই প্রেক্ষাপটে বারকা খানের অস্থিরতা ছিল স্পষ্ট, যিনি সারতাকের সাথে যুদ্ধ না করেই এই অঞ্চলে ইসলামের পথ সুগম করতে চেয়েছিলেন। এই দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের মধ্যে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানানো ছাড়া তিনি আর কোনো উপায় দেখতে পেলেন না। তিনি নির্দেশ দিলেন যেন সেনাশিবিরে তার আশেপাশে কাউকে দেখা না যায়।

সারা রাত তিনি নির্জনে আল্লাহর দরবারে অত্যন্ত কাকুতি-মিনতি করে দোয়া করে কাটালেন। তিনি দোয়ায় বলছিলেন:

“হে আল্লাহ! যদি দ্বীনে মুহাম্মদী এবং ইসলামি শরীয়ত সত্য হয়, তবে সারতাকের ব্যাপারে তুমিই ফয়সালা করে দাও।”

তিন রাত তিনি এভাবেই দোয়া করে কাটালেন। চতুর্থ দিন সারতাক পেটের ব্যথায় আক্রান্ত হয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। [২] পিতার মৃত্যুর পর তিনি মাত্র দেড় বছর জীবিত থাকতে পেরেছিলেন। [৩]

বারকা খানের বিরুদ্ধে আরও একটি ষড়যন্ত্র:

মঙ্গু খান কোনোভাবেই এই বিশাল সাম্রাজ্য নও-মুসলিম বারকা খানের হাতে যেতে দেখতে পারছিলেন না। তিনি সারতাক খানের মৃত্যুর খবর পাওয়া মাত্রই বাতু খানের এক নাতি উলাঘচি-কে শাসনের ফরমান লিখে পাঠালেন। কিন্তু এখন কুদরতের অদৃশ্য হাত মুসলমানদের সাহায্যের জন্য সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। বারকা খানের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানো সমস্ত শত্রু একে একে সরে যেতে লাগল এবং কিছুকাল পর উলাঘচিও মৃত্যুবরণ করলেন। [৪]

باتو خان كے بھتیجے طغائی کی بیوی براق شین چاہتی تھی کہ وہ اپنے لڑکے ‘تندان منگو’ کو تخت پر بٹھا دے مگر مغل امراء نے اس کی رائے مسترد کر دی۔ براق شین نے ناراض —ہو کر ہلاکو خان کو ایک خفیہ مراسلہ بھیجا جس میں اسے کہا گیا تھا کہ

[১] মঙ্গোল বিজয়ের ইতিহাস, জে. জে. স্যাভার্স (ফার্সি অনুবাদ: আবুল কাসেম হালত): পৃষ্ঠা ১৫২, মুয়াসসাসা ইনতিশারাত আমির কবির তেহরান: ১৩৪৩ হিজরি।

[২] তাবাকাত-ই-নাসিরি, মিনহাজুস সিরাজ জুযজানি: ২/ ২১৭, ২১৮।

[৩] ইকদুল জুমান লিল আইনি: ৬৫২ হিজরি।

[৪] জামিউত তাওয়ারিখ (ফার্সি), রশিদ উদ্দিন ফজলুল্লাহ: ২/ ১৩৮, লাইডেন।

সে যদি অবিলম্বে আক্রমণ করে, তবে এই রাজ্য কোনো বাধা ছাড়াই তার হস্তগত হবে। সৌভাগ্যবশত এই ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যায়। মোগল আমীররা বুরাক শিনকে ধরে ফেলে এবং পানিতে ডুবিয়ে দেয়। বারকা খান ছাড়া উত্তরের এই সাম্রাজ্যের আর কোনো দাবিদার ছিল না। ফলে ৬৫২ হিজরিতে বারকা খান তার পিতার সিংহাসন ও মুকুট গ্রহণ করেন। [১]

বারকা খানের রাজত্ব: (৬৫২ হি. থেকে ৬৬৫ হি.)

বারকা খান দ্রুতই তার শাসন মজবুত করে নেন। তার যদি কোনো ভয় থেকে থাকে, তবে তা ছিল কেবল থাকানে আজম মাস্জু খানের পক্ষ থেকে। কিন্তু মহররম ৬৫৫ হিজরিতে অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণে মাস্জু খান মারা যান [২], যার পরপরই মঙ্গোলিয়ায় কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দাবিদার তাতার শাহজাদাদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় যা বছরের পর বছর চলতে থাকে। [৩] এই বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে বারকা খান নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করার সুযোগ পান।

ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা অভিযোগ করেন যে, সারতাক এবং তার পরে নির্বাচিত শাসকের মৃত্যু বারকা খানের ষড়যন্ত্রের ফল, কিন্তু এটি ভুল। এ বিষয়ে বারকা খানের সমসাময়িক ঐতিহাসিক কাজী মিনহাজুস সিরাজ জুযজানি (রহ.)-এর নির্ভরযোগ্য বর্ণনা রয়েছে, যার মতে বারকা খান আল্লাহর দরবারে এই সমস্যা সমাধানের প্রার্থনা করেছিলেন, যার পর সারতাক হঠাৎ মৃত্যুবরণ করেন। যাই হোক, বারকা খানের শাসন মুসলমানদের জন্য এক অপ্রত্যাশিত নেয়ামত হিসেবে প্রমাণিত হয়, যা একদিকে মুসলমানদের মৃতপ্রায় অস্তিত্বকে অবলম্বন দেয় এবং অন্যদিকে খ্রিস্টধর্মের দিকে ধাবিত তাতারদের ইসলামের পথে নিয়ে আসে। [৪]

বারকা খান ও ইসলামের খিদমত:

বারকা খান ইসলামি নিদর্শনসমূহ প্রচলিত করেন এবং উলামা, কুররা, হুফফাজ ও আইম্মাদের নিজ দেশে আমন্ত্রণ জানিয়ে ইসলামের দাওয়াতকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেন। তার সমসাময়িক ঐতিহাসিক কাজী মিনহাজুস সিরাজ জুযজানি (রহ.) তার রাজত্বে ইসলামি নিদর্শনের অবস্থা এভাবে বর্ণনা করেন:

“বারকা খানের লশকর বা বাহিনীর নিয়ম হলো, প্রত্যেক অশ্বারোহীর কাছে একটি জায়নামাজ থাকে। যখনই সালাতের সময় হয়, লশকর তা আদায়ে মশগুল হয়ে যায়। পুরো বাহিনীতে কোনো মদ্যপ নেই। বড় বড় মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফকিহ এবং মুনাযির বারকা খানের কাছে থাকেন। তার কাছে দ্বীনি কিতাবের বিশাল ভাণ্ডারও রয়েছে। তার উঠাবসা ও কথোপকথন অধিকাংশ সময় উলামাদের সাথেই হয়, যারা তার দরবারের সাথে যুক্ত থেকে ইলমে শরীয়ত সম্পর্কে আলোচনা করেন। বারকা খান অত্যন্ত দৃঢ় ও আত্মমর্যাদাশীল মুসলমান।” [৫]

এই দ্বীনি আত্মমর্যাদা ও গায়রতই ছিল যে, যখন সময় এলো তখন এই মুজাহিদ পুরুষ ইসলামের হেফাজতের জন্য নিজের স্বগোত্রীয় তাতারদের...

[১] উকুদুল জুমান ফি তারিখি আহলিল জামান, বদরুদ্দিন আইনি: সন ৬৫২ হি.; জামিউত তাওয়ারিখ (ফারসি): ২ / ১৩৭, ১৩৮, ত ত. লিডেন

[২] জামিউত তাওয়ারিখ (ফারসি): ২ / ৩৩, ১৩৮, ত ত. লিডেন

[৩] তারিখ ইবনে খালদুন: ৫ / ৫৯৮, ত ত. দারুল ফিকর

[৪] তাবাকাতে নাসিরি, মিনহাজুস সিরাজ জুযজানি: ২ / ২১৭, ২১৮

[৫] তাবাকাতে নাসিরি: ২ / ২১৩, ত ত. কাবুল

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

চতুর্থ খণ্ড

-এর বিরুদ্ধে জিহাদ করতেও দ্বিধাবোধ করেননি। ৬৫৮ হিজরিতে হালাকু খান বাগদাদ ধ্বংস করার পর দামেস্ক, হালাব এবং অন্যান্য ইসলামি শহরগুলোতে ধ্বংসলীলা চালিয়েছিল। খলিফা মুসতাসিমকে হত্যা করা ছিল খানের জন্য অসহনীয়। [১] হালাকু খান বারকা খানের কিছু আত্মীয়-স্বজন ও দূতদেরও হত্যা করেছিল। ফলে যখন বাগদাদকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করার পর হালাকু মঙ্গোল প্রথা অনুযায়ী লুণ্ঠিত সোনা-দানা ও মণি-মুক্তার কিছু অংশ সালতানাতের সকল শাখায় পাঠিয়েছিল, তখন সেই সূত্রে বারকা খানের কাছেও কিছু উপহার পাঠিয়েছিল। বারকা খান কেবল সেই উপহারগুলোই প্রত্যাখ্যান করেননি, বরং হালাকু খানের দূতদেরও হত্যা করেছিলেন। [২] এটি ছিল জোভাইল খানদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা। ৬৫৮ হিজরিতে যখন আইন জালুতে হালাকু খান শোচনীয় পরাজয় বরণ করেন, তখন তিনি এর প্রতিশোধ নিতে পুনরায় মিশরে আক্রমণ করার ইচ্ছা পোষণ করেন। কিন্তু তিনি কিছু করার আগেই হঠাৎ বারকা খান ককেশাস সীমান্ত অতিক্রম করে হালাকু খানকে নিজের দিকে মনোনিবেশ করতে বাধ্য করেন এবং তার বাহিনীকে পরাজিত করেন।

এদিকে ৬৫৯ হিজরিতে আল-মালিকুজ জাহির রুকনুদ্দিন বাইবার্স মিশরের শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি হালাকু খানের বিরুদ্ধে একটি ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠনের জন্য বারকা খানের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। এই ফ্রন্টটি এভাবে গঠিত হয়েছিল যে, সেই দিনগুলোতে দুইশ তাতার সৈন্য হালাকু খানের কাছ থেকে দলত্যাগ করে সিরিয়া হয়ে মিশরে চলে এসেছিল। সুলতান বাইবার্স তাদের অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করেন এবং তারা ইসলাম গ্রহণ করেন। [৩] এরপর সুলতান বারকা খানের নামে বন্ধুত্ব, শুভকামনা এবং ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান সম্বলিত একটি পত্র লিখেন এবং তা এই নওমুসলিম তাতারদের মাধ্যমে বারকা খানের কাছে পাঠিয়ে দেন।

এই সময়ে বারকা খানের পক্ষ থেকেও সুলতান বাইবার্সের কাছে একটি প্রতিনিধি দল পাঠানো হয়েছিল, যারা এই বার্তা পৌঁছে দিয়েছিল যে, আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে হালাকু খানের বিরুদ্ধে জিহাদ করা উচিত। এভাবে দুই সালতানাতের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হলো। এখন বড় সংখ্যায় তাতার প্রতিনিধি দল মিশরে আসতে থাকে এবং ইসলাম গ্রহণ করে নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যেতে থাকে। [৪] যদিও হালাকু খানের বিরুদ্ধে যৌথ আক্রমণের পরিকল্পনা পূর্ণতা পায়নি, কারণ বারকা খানের সাথে বন্ধুত্বের পরপরই সুলতান বাইবার্সকে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে বেশ কিছু যুদ্ধ লড়তে হয়েছিল এবং সেই অভিযানগুলো শেষ হওয়ার আগেই বারকা খান ইন্তেকাল করেন। এদিকে হালাকু খানও মারা যান, তাই গোল্ডেন হোর্ড (অর্ডু-এ জরিন) এবং মিশর সালতানাতের পক্ষ থেকে হালাকু খানের রাজ্যের ওপর যৌথ আক্রমণের আর বিশেষ প্রয়োজন রইল না।

অমুসলিম তাতার এবং ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধে অভিযানের ফলে বারকা খানের সাম্রাজ্য তার বাবা ও দাদার সাম্রাজ্যের চেয়ে অনেক বেশি বিশাল ও বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। ইউক্রেন, বিলাদ-এ খজর ও কিপচাক ছাড়াও পূর্ব ইউরোপ, পশ্চিম রাশিয়া, উত্তর-পূর্ব এশিয়া, কুচাক এবং মাওরাউনহর-এর জুন্দ, বুখারা, সমরকন্দ ও খাওয়ারিজম এলাকাগুলোও তার অধীনে ছিল। খোরাসান ও মধ্য এশিয়ার অনেক শহর থেকে এমন...

[১] এবং তার ও তার চাচাতো ভাই হালাকু খানের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, আর তিনি তাকে খলিফা মুসতাসিম বিপ্লব ও অন্যদের হত্যার কারণে হত্যা করেন।

(আন-নুজুমুজ জাহিরাহ: সন ৬২৫ হি.)।

[২] তাবাকাতে নাসিরি: ২/১৯৮। এই বিরোধের সকল কারণ গত অধ্যায়ে বাইবার্স ও বারকার সম্পর্কের অধীনে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

[৩] তারিখুল ইসলাম লিজ জাহাবি, সন ৬৬০ হি.; আস-সুলুক লি-মারিফতি দুওয়ালিল মুলুক: সন ৬৬০ হি.।

[৪] এর বিস্তারিত বিবরণ গত অধ্যায়ে সুলতান বাইবার্সের অবস্থার অধীনে অতিক্রান্ত হয়েছে।

...এমনকি যে এলাকাগুলো তার দখলে ছিল না, সেখানেও জুমার খুতবায় তার জন্য দোয়া করা হতো। [১]

বারকা খানের দ্বীনি গায়রাতের একটি ঘটনা:

কাজী মিনহাজুস সিরাজ জুযজানী (রহ.) বারকা খানের দ্বীনি গায়রাতের একটি ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, সমরকন্দে একজন নাসরানি যুবক ইসলাম গ্রহণ করল, যাতে মুসলমানরা অত্যন্ত আনন্দিত হলো এবং তাকে অনেক সম্মান ও সমাদর করল। কিছুদিন পর সমরকন্দে এমন একজন মঙ্গোল শাসক নিযুক্ত হলো যে নাসরানিয়্যাতের প্রতি অনুরাগী ছিল। এলাকার নাসরানিরা তার কাছে গিয়ে বলল: “মুসলমানরা আমাদের সন্তানদের নাসরানিয়্যাত থেকে বিচ্যুত হওয়ার এবং দ্বীনে মুহাম্মাদীর অনুসরণের তালকিন দিচ্ছে। যদি এই দরজা খুলে যায়, তবে আমাদের পরিবার-পরিজন মসীহী দ্বীন থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে। আপনি এই বিষয়টি মীমাংসা করুন।”

মঙ্গোল শাসক সেই নওমুসলিম যুবককে ডেকে পাঠাল। প্রথমে নম্রতা, মমতা এবং পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে তাকে ইসলাম ত্যাগ করার প্ররোচনা দিল। যখন সে রাজি হলো না, তখন তার ওপর সম্ভাব্য নিকৃষ্টতম নির্যাতন চালানো হলো। কিন্তু সেই নওমুসলিম কালিমায়ে তাওহীদের ওপর অটল থাকল। অবশেষে মঙ্গোল শাসক জনসাধারণের সামনে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিল এবং সে ঈমানের ওপর ইস্তেকামাতের এক দৃষ্টান্ত হয়ে শহীদ হয়ে গেল। সমরকন্দের উলামায়ে কেরাম যখন এই দৃশ্য দেখলেন, তখন একটি লিখিত দলিলে এই ঘটনার সাক্ষীদের স্বাক্ষর নিলেন এবং একটি প্রতিনিধি দল গঠন করে বারকা খানের কাছে গিয়ে এই ঘটনা শোনালেন। বারকা খান দ্বীনি হামিয়্যাত থেকে অস্থির হয়ে পড়লেন। তিনি সমরকন্দে একজন মুসলমান মঙ্গোল শাসক নিযুক্ত করলেন এবং সেই নওমুসলিম যুবকের হত্যাকাণ্ডে জড়িত সকল ব্যক্তিকে হত্যা করালেন। [২]

ইসলামের এই মহান খাদেম রবিউল আখির ৬৬৫ হিজরি (১২৬৬ খ্রিষ্টাব্দ) সালে ইন্তেকাল করেন। [৩]

শেখ কুতুবুদ্দিন ইউনিনী (রহ.) বারকা খানের সালতানাতের বর্ণনা এভাবে দিয়েছেন:

“তার দেশ অত্যন্ত বিশাল কিন্তু আমাদের দেশ থেকে অনেক দূরে। তার সিপাহি প্রচুর। তার দেশ কিছু কারণে হালাকু খানের দেশ থেকেও বড়, কারণ তার শহর, সিপাহি এবং ধনভাণ্ডার বেশি। তবে হালাকু খানের লশকর অধিকৃত দেশগুলোতে লুটতরাজ করে ধনী হয়ে গিয়েছিল।” [৪]

এরপর সামনে বারকা খানের দ্বীনদারির অবস্থা এভাবে বর্ণনা করেন:

“বারকা খান মুসলমানদের অত্যন্ত ভালোবাসতেন। উলামাদের তাজিম ও তাওকির করতেন। সালেহ মুসলমানদের প্রতি আকিদাত রাখতেন। মুসলিম মাশায়েখদের কাছ থেকে বরকত হাসিল করতেন এবং তাদের মালফুযাত ও বাণীসমূহ বারকা খানের কাছে মনোযোগ দিয়ে শোনা হতো। উলামাদের সম্মান তার দেশে অনেক বেশি ছিল। হালাকু এবং তার মধ্যে যুদ্ধের সবচেয়ে বড় কারণ একটি তো এই ছিল যে, হালাকু খলিফা মুসতাসিম বিল্লাহকে হত্যা করেছিল। দ্বিতীয়টি হলো, বারকা খান আল-মালিকুজ জাহির বাইবার্দের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক রাখতেন এবং তার দূতদের অনেক তাকরীম করতেন। হিজাজের লোকেরা তার কাছে গেলে তিনি তাদের সাথে হুসনে সুলুক...”

[১] তবাকাত-ই-নাসিরী, মিনহাজুস সিরাজ জুযজানী: ২/ ২১৮, ত. কাবুল

[২] তবাকাত-ই-নাসিরী: ২/ ২১৫ থেকে ২১৭

[৩] যাইলু মিরাতিয যামান: ২/ ২৬০; তারিখুল ইসলাম লিয যাহাবী: ২৩/ ৩৬৬, ত. তাদমুরী

[৪] যাইলু মিরাতিয যামান: ২/ ৩৬৩

করতেন এবং তাদেরকে প্রচুর ধন-সম্পদ দান করতেন এবং তাদের সম্মান ও সদাচরণের ক্ষেত্রে চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতেন। বারকা-র লস্করের অনেক সৈন্য ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাদের মসজিদগুলো তাঁর দিয়ে তৈরি হতো যা তারা নিজেদের সাথে বহন করে সফর করতেন। এই মসজিদগুলোর জন্য ইমাম সাহেবগণ এবং মুয়াজ্জিন সাহেবগণ নিযুক্ত ছিলেন। যখনই বাহিনী কোনো স্থানে থামত, সেখানেই এই মসজিদগুলো স্থাপন করা হতো এবং সেগুলোতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা হতো। [১]

তিনি বারকা খানের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন:

“তিনি ছিলেন সাহসী, দানশীল, সতর্ক, ন্যায়পরায়ণ এবং সচ্চরিত্রবান মানুষ। রক্তপাত এবং শহর ধ্বংস করাকে তিনি ঘৃণা করতেন। তিনি ছিলেন ধৈর্যশীল, দয়ালু এবং ক্ষমাশীল শাসক।” [২]

উজবেক খানের শাসনকাল এবং ইসলামের প্রসার:

বারকা খানের পর আধা শতাব্দী পর্যন্ত তার উত্তরসূরিদের মধ্যে কেউ মুসলিম ছিলেন এবং কেউ অমুসলিম। মুসলমানদের মধ্যে তদা মঙ্গু খান, যিনি ৬৮২ হিজরিতে শাসক হয়েছিলেন, উল্লেখযোগ্য। [৩] তিনি ৬৮৪ হিজরিতে হাঙ্গেরি এবং ৬৮৬ হিজরিতে পোল্যান্ড ও ট্রান্সিলভেনিয়া জয় করেন। বলকান, সার্বিয়া এবং বুলগেরিয়াও তার দখলে চলে আসে। এই বিজয়াভিযানগুলোর পর তার রাজ্য ইউক্রেনের উচ্চভূমি থেকে দানিউব নদীর বদ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। [৪]

৭১২ হিজরিতে (১৩১৩ খ্রিষ্টাব্দ) এই বংশের রাজপুত্র মুহাম্মদ উজবেক খান বিন তুঘরুল সিংহাসনে আরোহণ করেন, যার বংশধরদের থেকেই বিখ্যাত উজবেক গোত্রের জন্ম হয়। মুহাম্মদ উজবেক তার যৌবনে চারজন ইরানি আলেম: শেখ সাইয়্যিদ মুহাম্মদ, শেখ কুলকাত, শেখ আহমদ এবং শেখ হাসান কারকানের দাওয়াতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তার সিংহাসনে আরোহণের পর এত ব্যাপক হারে ইসলামের প্রসার ঘটে যে, এক বছরের মধ্যে কোনো তাতার রাজপুত্র ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত থাকেনি। ফলে উজবেক খান মিশরের মামলুকদের কাছে এক পত্রে লিখেছিলেন যে, এখন কিপচাক দেশে কোনো মূর্তিপূজারি অবশিষ্ট নেই। উজবেক খান ত্রিশ বছর রাজত্ব করেন এবং তার সালতানাতকে একটি শ্রেষ্ঠ ইসলামি রাষ্ট্রের হাঁচে ঢালার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। তার শাসনকাল খানাতে কিপচাক-এর স্বর্ণযুগ হিসেবে পরিচিত। তিনি রাজধানী সরাই-তে একটি বড় মাদ্রাসা এবং তেরোটি জামে মসজিদ নির্মাণ করান। মঙ্গোল রাজকুমারীরাও মসজিদ নির্মাণে অংশ নিয়েছিলেন। এই যুগে মধ্য এশিয়া, ইরান এবং ইরাক থেকে অনেক আলেম, ফকিহ এবং মাশায়েখ কিপচাক দেশে আসেন, যাদের মধ্যে শেখ জাদা খোরাসানি, কাজী শামসুদ্দিন সায়েলি হানাফি, শেখ খিজির শাফেয়ী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে অসংখ্য স্থানীয় যুবক অন্যান্য ইসলামি দেশ সফর করে উচ্চতর দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করেন এবং নিজ দেশে ফিরে এসে জায়গায় জায়গায় মাদ্রাসা কায়ম করেন। একইভাবে এখানে প্রচুর পরিমাণে খানকাহ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আত্মশুদ্ধির ধারা ব্যাপকতা লাভ করে। কিপচাক মরুভূমিতে সরাই, বুলঘার, ক্রিমিয়া, সুদাক (সোলদাইয়া), আজাক, মাজার এবং হাজি তারখান-এর মতো শহরগুলো ইসলামি উলূমের কেন্দ্রে পরিণত হয়, যেখান থেকে বড় বড় আলেমদের জন্ম হয়। [৫]

[১] জাইল মিরাত আল-জামান: ৩/৩৬৪, ৩৬৫, ত. দারুল কিতাব আল-ইসলামি

[২] জাইল মিরাত আল-জামান: ২/৩৬৫

[৩] আকদ আল-জুমান লিল আইনি: সন ৬৮২ হিজরি

[৪] ইনতিশার আল-ইসলাম বাইনাল মুঘুল, পৃ. ১১৯

[৫] ইনতিশার আল-ইসলাম বাইনাল মুঘুল, পৃ. ১২৩, ১২৫, ১৫৫, ১৬০

ইল খানিদের মধ্যে ইসলামের প্রসার

ইরান, ইরাক, আর্মেনিয়া এবং পূর্ব এশিয়া মাইনর দখলকারী ইল খানি মঙ্গোলরা ইসলামের ঘোর শত্রু ছিল। মঙ্গোলদের এই শাখাটি, যার প্রতিষ্ঠাতা ছিল হালাকু খান, বাগদাদকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছিল। ইরান, ইরাক, আল-জাজিরা এবং সিরিয়া তার নিষ্ঠুরতার শিকার হয়েছিল। হালাকু খান তার প্রতিদ্বন্দ্বী: মিশরের মামলুক এবং গোল্ডেন হোর্ড (উর্দুয়ে জরিন)-এর মোকাবিলা করার জন্য আর্মেনিয়ার খ্রিস্টান শাসক এবং ক্রুসেডারদের সাথে জোট গঠন করেছিল। তার প্রিয়তমা স্ত্রীও খ্রিস্টান ছিলেন, যিনি তাকে খ্রিস্টানদের প্রতি অনুরাগী করে তুলেছিলেন। ফলে ইল খানি দরবারে খ্রিস্টানদের ব্যাপক প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। এসব কারণেই এখানে ইসলামের প্রসার কিছুটা দেরিতে হয়েছিল।

আবাকার শাসনামলে:

৬৬৩ হিজরিতে হালাকু খানের মৃত্যুর পর তার পুত্র আবাকা সিংহাসনে আরোহণ করেন। যদিও তিনি নিজে খ্রিস্টান ছিলেন না, তবে তিনি কনস্টান্টিনোপলের এক খ্রিস্টান রাজকুমারীকে বিয়ে করেছিলেন। তার দরবার পাদ্রীদের দ্বারা পূর্ণ থাকত। তিনি ইউরোপীয় রাজাদের: সেন্ট লুইস (ফ্রান্সের রাজা), চার্লস (সিসিলির রাজা) এবং জেমস (উত্তর আন্দালুসের আরাগন রাজ্যের রাজা)-এর কাছে দূত পাঠিয়ে তাদের সাথে মুসলমানদের বিরুদ্ধে জোট গঠন করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যেই ৬৭২ হিজরিতে (১২৭৪ খ্রিস্টাব্দে) তিনি ১৬ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল ফ্রান্সের লিয়ন রাজ্যে পাঠিয়েছিলেন। সেখানে সেই প্রতিনিধি দলের প্রধান তার বেশ কয়েকজন সঙ্গীসহ খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং বাপ্টিস্ম নেন। [১]

তেকুদারের শাসনামলে:

খ্রিস্টান বিশ্ব ধারণা করছিল যে ইল খানিদের শাসনাধীন ইরান ও ইরাক খুব শীঘ্রই খ্রিস্টান রাষ্ট্রে পরিণত হবে, কিন্তু ঐশ্বরিক ইচ্ছার এক অলৌকিক ঘটনা তাদের প্রত্যাশাকে ধূলিসাৎ করে দিল। কারণ আশ্চর্যজনকভাবে এই সময়ে ইসলামী শিক্ষার মুগ্ধকর সুবাস হালাকুর দ্বিতীয় পুত্র “তেকুদার”-কে তার অনুরাগী করে তুলেছিল, যার জন্ম হয়েছিল ৬৫১ হিজরিতে এবং তার পিতা হালাকু খানের মৃত্যুর সময় তার বয়স ছিল তেরো বছর। [২] পশ্চিমা ঐতিহাসিকরা বিস্ময়ের সাথে বলেন যে, “তেকুদার” খ্রিস্টধর্মের কোলে বেড়ে উঠেছিলেন, হালাকু খানের ঘনিষ্ঠ পাদ্রীরা তাকে শৈশবেই বাপ্টিস্ম দিয়েছিলেন এবং তার নাম “নিকোলাস” প্রস্তাব করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে তার ঝোঁক ইসলামের দিকে হতে থাকে এবং তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। [৩]

[১] THE PREACHING OF ISLAM: 175, 176; দাওয়াত-ই-ইসলাম, পৃ. ২২৯

[২] ইনতিশারুল ইসলাম বাইনাল মুগুলা, ডক্টর রজব মুহাম্মদ আব্দুল হালিম, পৃ. ৭৯, দারুন নাহদাহ আল-আরাবিয়াহ কায়রো, ১৯৮২ খ্রি.

[৩] THE PREACHING OF ISLAM: 175, 176; দাওয়াত-ই-ইসলাম, পৃ. ২৩০

তাকে ইসলামে দীক্ষিত করার ব্যক্তিটি ছিলেন একজন সাধারণ মানুষ, আব্দুর রহমান আল-রাফেয়ী। তিনি ছিলেন একজন রোমান দাসের পুত্র এবং খলিফা মুসতাসিম বিল্লাহর দরবারে কাপেট বিছানো এবং তাঁবু খাটানোর দায়িত্ব পালন করতেন। বাহ্যত তিনি একজন সাধারণ মানুষ ছিলেন, কিন্তু যখন তিনি ইসলামের দাওয়াতকে নিজের জীবনের উদ্দেশ্য বানিয়ে নিলেন, তখন আল্লাহ এক জাতির মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে তার মাধ্যমে অনেক বড় কাজ নিলেন।

আব্দুর রহমান আল-রাফেয়ীকে বাগদাদ পতনের সময় বন্দী করা হয়েছিল। পরবর্তীতে তাতারীরা তাকে নিজেদের কর্মচারী হিসেবে রেখে দেয়। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন এবং বিভিন্ন উপায়ে তাতারীদের ওপর নিজের প্রভাব বিস্তার করতে থাকেন। তাতারীদের মধ্যে তার যুহদ ও ইবাদতেরও অনেক খ্যাতি ছিল। তারা তাকে “শেখ” বলে ডাকত, যদিও তিনি কোনো আলেম বা সুফী ছিলেন না।

যখন হালাকু খানের পুত্র আবাকা বাদশাহ হলেন, তখন তিনি আব্দুর রহমানের মর্যাদা আরও বাড়িয়ে দিলেন। এই সময়েই আব্দুর রহমান শাহজাদা তেকুদারের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পান। আব্দুর রহমান মাঝেমাঝে তাকে ইসলামের সৌন্দর্য সম্পর্কে অবহিত করতে থাকেন, যার ফলে শেষ পর্যন্ত একদিন তেকুদার ইসলাম গ্রহণ করেন। [১]

আবাকা খান সতেরো বছর রাজত্ব করার পর ৬৮০ হিজরিতে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলে ত্রিশ বছর বয়সী শাহজাদা তেকুদারই ইরান ও ইরাকের এই বিশাল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হন। তেকুদার ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন এবং নিজের ইসলামী নাম আহমদ খান রাখেন। আর্নল্ড লিখেছেন:

“তিনি যথাসম্ভব এই চেষ্টা করেন যে সমস্ত খ্রিস্টান যেন মুহাম্মদী দ্বীন গ্রহণ করে। যখন তারা অবাধ্যতা প্রদর্শন করল এবং তিনি তাদের বাধ্য করতে সাহস পেলেন না, তখন তিনি তাদের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে এবং তাদের ইনাম-ইকরাম ও উপহার প্রদান করে তাদের ধর্ম পরিবর্তনের চেষ্টা করেন। ফলে তার যুগে অনেক খ্রিস্টান মুসলমানদের দ্বীন গ্রহণ করে।” [২]

সুলতান আহমদ খানের বাগদাদবাসীর নামে পত্র:

তেকুদার আহমদ খান সিংহাসনে আরোহণের পরপরই বাগদাদবাসীর নামে নিম্নোক্ত ঐতিহাসিক পত্র প্রেরণ করেন:

“আমরা সিংহাসনে আসীন হয়েছি। আমরা মুসলমান, তাই বাগদাদবাসীদের এই সুসংবাদ পৌঁছে দাও। মাদ্রাসা, ওয়াকফ এবং সমস্ত জনকল্যাণমূলক কাজ আব্বাসী খলিফাদের যুগের মতো জারি রাখা হচ্ছে। মসজিদ ও মাদ্রাসার প্রত্যেক হকদারকে তার হক পৌঁছে দেওয়া হবে। মানুষ ইসলামী আইনের বাইরে যাবে না।

হে বাগদাদবাসী! তোমরা মুসলমান এবং আমরাও। আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এই ফরমান শুনেছি যে, মুসলিমদের এই জামাত কিয়ামত পর্যন্ত সর্বদা বিজয়ী ও সফল থাকবে। আমরা জেনেছি যে এই খবর সত্য এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) সত্যবাদী। আল্লাহ এক, অদ্বিতীয়, অমুখাপেক্ষী। সুতরাং আপনারা নিশ্চিত থাকুন এবং এই কথাগুলো অন্যান্য শহরেও লিখে পাঠান।” [৩]

[১] আল-হাওয়াদিসুল জামিয়া ওয়াত তাজারিবুন নাফিয়া লি ইবনিল ফুওয়াতি, পৃ. ২৯৮, ২৯৯

[২] THE PREACHING OF ISLAM 176; দাওয়াত-ই ইসলাম, পৃ. ২৩০

[৩] নিহায়াতুল আরাব লিন নুওয়াইরি: ২৭ / ৩০২, ত. দারুল কুতুব

তারিখে উন্মতে মুসলিমা

সুলতান আহমদ খানের কীর্তিসমূহ

সুলতান আহমদ খান আব্দুর রহমান রাফিকে ওয়াকফ মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। এর আগে ওয়াকফ বিভাগ থেকে ইহুদি ও খ্রিস্টান চিকিৎসক এবং জ্যোতিষীদের বৃত্তির জন্য একটি বিশাল অংকের অর্থ ব্যয় করা হতো। এখন এই বৃত্তিগুলো বন্ধ করে সেই পরিমাণ অর্থ হাজীদের জন্য অধিকতর সুযোগ-সুবিধা প্রদানে ব্যয় করা হতে লাগল। আতা মালিক জুওয়াইনী (তারিখে জাহানগুশা-র লেখক), যিনি মঙ্গোলদের হাতে বন্দী ছিলেন, তাকে মুক্তি দিয়ে বাগদাদের প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়। [১]

তেগুদার আহমদ খান দিনের একটি নির্দিষ্ট সময় উলামা ও মাশায়েখদের সাহচর্যে কাটাতেন এবং তাঁদের ইলমি দরস শুনতেন। তাঁর নির্দেশে অনেক মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মিত হয়। ইসলামী বিধান বাস্তবায়নের জন্য কাজী নিযুক্ত করা হয়। তিনি মঙ্গোলদের মধ্যে ইসলামের প্রসারের জন্য মঙ্গোল রাজকন্যাদের সাথে মুসলিম আমীরদের বিবাহের ব্যবস্থা করেন। [২]

পূর্বে তাতাররা আসা-যাওয়া করা কাফেলাগুলোর ওপর কড়া নজরদারি করত এবং সামান্য গোয়েন্দাগিরির সন্দেহে মুসাফির ও বণিকদের হত্যা করত। এ কারণে আরব বণিকরা ইলখানি সালতানাতের দিকে যেতে ভয় পেত। আহমদ খান এই সমস্ত জুলুম বন্ধ করে দেন এবং সন্দেহের বশবর্তী হয়ে হত্যা করা নিষিদ্ধ করেন। বণিকদের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন এবং কাফেলাগুলোকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেন। যার ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই প্রাচ্যের বাণিজ্য চাঙ্গা হয়ে ওঠে। [৩]

আহমদ খানের বিরুদ্ধে প্রাচ্যবিদদের ভিত্তিহীন অপপ্রচার

প্রাচ্যবিদরা এই ধারণা দেন যে, তেগুদার তাঁর জাতিকে জোরপূর্বক মুসলিম করার চেষ্টা করেছিলেন এবং যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি তাদের ওপর জুলুম চালিয়েছিলেন। এ বিষয়ে তাঁরা ইতিহাসের বই থেকে একটি উদ্ধৃতি পেশ করেন যাতে উল্লেখ আছে যে, তাঁর নির্দেশে অনেক মূর্তিপূজার ঘর ও গির্জা ধ্বংস করা হয়েছিল এবং সেগুলোর স্থলে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল। [৪]

ফলে এ ধরনের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রাচ্যবিদরা কেবল এই নওমুসলিম বাদশাহর ওপরই নয় বরং ইসলাম ধর্মের ওপরও আপত্তির ঝড় তুলতে শুরু করেন। অথচ এখানে সেই সব মূর্তিপূজার ঘর ও গির্জা ধ্বংসের কথা বলা হয়েছে, যেগুলো অমুসলিম তাতাররা তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় মসজিদগুলো ধ্বংস করে নির্মাণ করেছিল। [৫]

এই কারণেই ঐতিহাসিক উৎসগুলো ইলখানি সালতানাতে অবস্থিত অমুসলিমদের বিখ্যাত উপাসনালয়গুলো ধ্বংসের উল্লেখ থেকে মুক্ত। আহমদ খানের আগে এবং পরেও এই উপাসনালয়গুলো একইভাবে বিদ্যমান দেখা যায়। যদি আহমদ খান অমুসলিমদের...

[১] তারিখে হাবিবুস সিয়া: ৩/১১৮, ১১৯।

[২] আল-ইনতিশারুল ইসলাম বাইনাল মুগল, পৃষ্ঠা ১৮১।

[৩] এই বিষয়গুলোর প্রমাণ সেই চিঠিতে পাওয়া যায় যা সুলতান আহমদ মিশরের সুলতানকে লিখেছিলেন, যার একটি অংশ হলো: “এবং আমরা সীমান্তগুলোতে সৈন্য মোতায়েন করেছি যাতে তারা প্রান্তিক এলাকাগুলোতে হস্তক্ষেপ করতে না পারে এবং তাদের সম্পদ রক্ষা করতে পারে। যদি আমরা কোনো গোয়েন্দাকে ফকিরের বেশে পাই যার উদ্দেশ্য ধ্বংসাত্মক কাজ করা, তবে তার রক্ত ঝরানোতে কোনো বাধা নেই, কারণ আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা রক্ষা করা এবং আমাদের কাছে যা পৌঁছেছে তা কার্যকর করা আমাদের দায়িত্ব। আর গোয়েন্দাদের দ্বারা সাধারণ মুসলমানদের যে ক্ষতি হয় তা গোপন নয়। যদি আমাদের সৈন্যরা কাউকে ফকির, দরবেশ বা নেককার লোকের বেশে দেখে এবং তাদের সম্পর্কে সন্দেহ হয়, তবে তাদের হত্যা করা হয়েছে এবং তাদের সাথে যা করার করা হয়েছে। আল্লাহর প্রশংসায় আমাদের পক্ষ থেকে রাস্তা খুলে দেওয়া এবং বণিকদের যাতায়াতের অনুমতি দেওয়ার পর প্রয়োজন শেষ হয়েছে।” (তারিখে মুখতাসারুদ দুওয়াল লি ইবনুল ইবরী, পৃষ্ঠা ৪৯১)।

[৪] তারিখে হাবিবুস সিয়া: ৩/১১৯।

[৫] আল-ইনতিশারুল ইসলাম বাইনাল মুগল, পৃষ্ঠা ১৮০, ১৮১।

উপাসনালয়গুলো ধ্বংস করে মসজিদ নির্মাণ করা হলে এগুলো সবচেয়ে বেশি পরিচিত হতো, কিন্তু তা হয়নি। এর অর্থ এই ছাড়া আর কিছুই নয় যে, মূর্তিপূজার ঘর এবং গির্জাগুলো মন্দিরে রূপান্তরিত হয়নি বরং আহমদ খানের সমসাময়িক খ্রিস্টান ঐতিহাসিক ইবনে আল-ইবরী (মৃত্যু ৬৮৫ হিজরি) তার প্রজাদের প্রতি তার আচরণের সাক্ষ্য এভাবে দেন:

“তিনি পরিমিত ব্যয়ের সাথে খরচ করতেন, প্রজাদের প্রতি সহনশীলতা এবং উদারতা প্রদর্শনের গুণাবলীতে ভূষিত ছিলেন। তিনি কোষাগার থেকে অনেক কিছু বের করে তা তার রাজপুত্র, আমির এবং সৈন্যদের জন্য ব্যয় করতেন। তিনি মঙ্গোল এবং সমস্ত জাতির সাথে অনুগ্রহ ও মমতার আচরণ করতেন, বিশেষ করে খ্রিস্টান নেতাদের সাথে।” [১]

এই সাক্ষ্যের মাধ্যমে প্রাচ্যবিদদের উভয় আপত্তিই শেষ হয়ে যায়। এটি স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, আহমদ খান মঙ্গোলদের ওপর জুলুম ও নিপীড়ন করে তাদের জোরপূর্বক মুসলমান বানাননি বা খ্রিস্টানদের ওপর কোনো বাড়াবাড়ি করেননি। বরং বাস্তবতা ছিল এর বিপরীত। আর এটাই ছিল কারণ যে তার আচরণের ফলে অমুসলিমরা ইসলামের নিকটবর্তী হয়েছিল। যদি তিনি জালেম ও অত্যাচারী হতেন, তবে ইসলাম কখনোই ছড়িয়ে পড়ত না বরং তাতারীরা দিন দিন ইসলাম থেকে দূরে সরে যেত। প্রতিটি যুগে ইসলামী জিহাদ জুলুম ও নিপীড়নের দুর্গগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে, যেখানে হৃদয় জয় করার কাজ ইসলামী আখলাকই করেছে। এখানেও তেমনই হয়েছিল।

মিশরের সুলতানের কাছে তাকুদার আহমদ খানের পত্র:

আহমদ খান মিশরের সালতানাতের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং জমাদিউল আউয়াল ৬৮১ হিজরিতে মিশরের সুলতান সাইফউদ্দিন কালাউনের কাছে তার ঐতিহাসিক পত্রে লেখেন: [২]

“আল্লাহ তাঁর হেদায়েতের আলোতে আমাদের যৌবনের প্রারম্ভেই তাঁর একত্ববাদ স্বীকার করার এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর রিসালাতের সাক্ষ্য দেওয়ার তৌফিক দান করেছেন। [৩] আল্লাহ যাকে চান, তার বক্ষ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। অতএব, আমরা সর্বদা দ্বীনের শ্রেষ্ঠত্ব এবং মুসলমানদের কল্যাণ কামনার দিকে ঝুঁকে থাকি। অতঃপর আল্লাহ আমাদের পিতা ও বড় ভাইয়ের পর আমাদের হাতে রাজত্ব অর্পণ করেছেন। ইসলাম সেই সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয় যা মুসলমান হওয়ার আগে সংঘটিত হয়েছে। এখন আল্লাহ আমাদের হেদায়েত দিয়েছেন যেন আমরা সত্য এবং সত্যপন্থীদের অনুসরণ করি... আমরা আল্লাহর অনুগ্রহে দ্বীনের নিদর্শনগুলোকে সমুন্নত করেছি এবং প্রতিটি হুকুম জারি করার ক্ষেত্রে এই বিষয়টি নজরে রেখেছি এবং শরীয়ত-ই-মুহাম্মাদীর আইনগুলোকে...”

[১] তারিখ মুখতাসার আদ-দুওয়াল, পৃষ্ঠা ২৮৯, দারুশ শারক বৈরুত।

[২] আল-ইনতিশার আল-ইসলাম বাইনাল মাগুল, পৃষ্ঠা ১৮১।

[৩] এখানে পত্রের শব্দগুলো হলো: “কাদ কানা আরশাদানা ফী উনফুওয়ানিস সিবা ওয়া রায়আনিল হুদাস ইলাল ইকরারি বি-রুবুবিয়্যাতিহি ওয়াল ইতিরাফি বি-ওয়াদানিয়াতিহি ওয়াশ শাহাদতি লি-মুহাম্মাদিন আলাইহি আফদালুস সালাতি বি-সিদকি নুবুওয়াতিহি।” আর্নল্ড “উনফুওয়ানিস সিবা ওয়া রায়আনিল হুদাস”-এর অনুবাদ “early youth and vigour” করেছেন। (THE PREACHING OF ISLAM, p. 230) যার অনুবাদ কিছু অনুবাদক “শৈশব” এবং কেউ “যৌবন” করেছেন। আর্নল্ডের অনুবাদ তার জায়গায় সঠিক হলেও উর্দু অনুবাদে “শৈশব” সঠিক নয়, বরং সঠিক অনুবাদ “যৌবনের প্রারম্ভ” হওয়া উচিত। এই সময়কাল বারো থেকে আঠারো বছর পর্যন্ত ধরা হয় যাকে “টিন এজ”ও বলা হয়। তাকুদারের ইসলাম গ্রহণ এই সময়েই হয়েছিল। তার পিতা হালাকু খানের মৃত্যুর সময় তাকুদারের বয়স ছিল তেরো বছর। এর পর আব্দুর রহমান রাফেয়ী তাকে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে ন্যায়বিচারের দাবি অনুযায়ী জারি করা হয়েছে। আমরা সকল প্রজাদের অন্তরকে খুশি করেছি এবং যাদের দ্বারা পূর্বে কোনো মন্দ কাজ বা ভুল সংঘটিত হয়েছিল, তাদের সবাইকে এই বলে ক্ষমা করে দিয়েছি যে, আল্লাহও তোমাদের পূর্বের ভুলগুলো ক্ষমা করে দিন। আমরা মুসলমানদের ওয়াকফসমূহ, যার মধ্যে মসজিদ, মাকবারা এবং মাদ্রাসা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, সেগুলোর সংস্কার করেছি এবং সমস্ত দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও মুসাফিরখানা যেগুলোর চিহ্ন মুছে গিয়েছিল, সেগুলো পুনরায় আবাদ করেছি এবং ওয়াকফের আয় তাদের প্রাচীন নিয়ম ও ওয়াকফকারীদের শর্ত অনুযায়ী হকদারদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। আমরা নির্দেশ দিয়েছি যে, আমাদের কর্মকর্তারা যেন হাজীদের বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেন এবং তাদের জন্য সফরের সরঞ্জাম সরবরাহ করেন এবং তারা যে পথ দিয়ে সফর করেন, সেগুলোকে আবাদ ও বিপদমুক্ত রাখেন, হাজীদের কাফেলাগুলোকে পূর্ণ সুযোগ-সুবিধার সাথে রওনা করান। আমরা দেশে যাতায়াতকারী সকল বণিকদের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করেছি যে, তারা তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে যেভাবে ইচ্ছা সফর করতে পারে এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নিযুক্ত সেনাবাহিনী, কমান্ডার ও কর্মকর্তাদের কঠোরভাবে নিষেধ করেছি যেন তারা বণিকদের যাতায়াতে কোনো প্রকার বাধা সৃষ্টি না করে, যাতে শহর ও দেশ আবাদ হয়, ফিতনা ও ফাসাদ নির্মূল হয়, তলোয়ারগুলো কোষবদ্ধ থাকে এবং সকল অধিবাসী আরাম ও আয়েশে জীবন অতিবাহিত করতে পারে এবং মুসলমানদের ঘাড় থেকে অপমান ও লাঞ্ছনার জোয়াল নেমে যায়। [১]

সুলতান আহমদ খানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ:

সেই সময় পর্যন্ত তাতারীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মুসলমান হয়নি, ফলে নওমুসলিম তাতারী শাহজাদা আহমদ খান তকুদারকে অমুসলিম তাতারীদের বিরোধিতা, ষড়যন্ত্র, বিদ্রোহ এমনকি সশস্ত্র যুদ্ধেরও সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এখন তার ভতিজা আরগুন খান থাকানে আজম কুবলাই খানের কাছে অভিযোগ পাঠাল যে, তকুদার তার পৈতৃক ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে। ফলে কুবলাই খানের প্ররোচনায় ৬৮৩ হিজরিতে আরগুন খান তকুদারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে সফল হয়। এর ফলে আহমদ খানকে শহীদ করে দেওয়া হয় এবং আরগুন নিজে ক্ষমতা দখল করে। [২]

আরগুন খানের রাজত্ব:

আরগুন খান মুসলমানদের বিরোধী ছিল। সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইউরোপের রাজাদের সাথে জোটবদ্ধ হওয়ার ব্যাপক চেষ্টা চালায়। সে “বুসকেরিল” নামক একজন জেনোভা অধিবাসীর মাধ্যমে পোপের কাছে একটি পত্র পাঠায় যাতে বলা হয়েছিল:

“আমি শীঘ্রই ফিলিস্তিনে সৈন্য পরিচালনা করতে যাচ্ছি। আমার এক পুত্র খ্রিস্টান।”

এই পত্রে অনুরোধ করা হয়েছিল যেন ইউরোপের রাজারা তার সাহায্যের জন্য সিরিয়া আক্রমণ করেন। কিছুকাল পর সে চাগান নামক একজন মঙ্গোল সর্দারকে, যে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল, একই অনুরোধ সম্বলিত দ্বিতীয় একটি তাগিদনামা দিয়ে পোপ...

[১] তারিখ ওসাফ, আব্দুল্লাহ বিন ফজলুল্লাহ ওসাফ (৬২৩ হি. থেকে ৭৩০ হি.), পৃ. ১১০, ত. ইসফাহান।

[২] তারিখ ইবনে খালদুন: ৫ / ৬১৬, ত. দারুল ফিকর; তারিখ হাবিবুস সিয়র: ৩ পৃ. ১২১ থেকে ১২৫; তারিখ ওসাফ: ১৩৫ থেকে ১৪৭; THE PREACHING OF ISLAM 178: দাওয়াতে ইসলাম, পৃ. ২৩২, ত. হকুমতে পাঞ্জাব।

...এর কাছে পাঠালেন। জবাবে পোপ নিকোলাস আরগুন খানকে বাপ্তিস্ম নেওয়ার নির্দেশ দেন। যাই হোক, ইউরোপে কোনো ক্রুসেডার বাহিনী প্রস্তুত হতে পারেনি। [১] এই যুগে বৌদ্ধ, শামানি, ইহুদি এবং খ্রিস্টানরা রাষ্ট্রীয় বিষয়ে আধিপত্য বিস্তার করে। মুসলমানদের সব দিক থেকে দমন করা হয়। সাত বছর ধরে এই ধারা অব্যাহত থাকলেও ইসলামের অগ্রযাত্রা থেমে থাকেনি। [২]

ইহুদি উজির সাদ উদ-দৌলার ইসলাম বিদ্রোহ:

আরগুন খান সাদ উদ-দৌলা নামক এক ইহুদিকে সালতানাতের নায়েব নিযুক্ত করেন, যে বাগদাদের শাসনভার তার এক ভাইকে এবং উত্তর ইরানের শাসনভার তার অন্য ভাইকে প্রদান করে। পারস্যেও সে তার এক আত্মীয়কে গভর্নর নিযুক্ত করে। তার অহংকার এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে, মাঝে মাঝে সে দরবারের আদব-কায়দাও উপেক্ষা করত। একবার সে আরগুন খানের সাথে দাবা খেলার সময় পা ছড়িয়ে বসেছিল। কোনো মজ্জোল আমির আপত্তি করলে সে হাঁটুতে ব্যথার অজুহাত দেখায়। [৩]

শুরুতে সাদ উদ-দৌলা মুসলিম আমির ও বিদ্বানদের সাথে সদয় আচরণ করে। [৪] সে মুসলমানদের ধোঁকায় রেখে তাদের শিকড় কাটতে চেয়েছিল। তার দান-দক্ষিণায় মুগ্ধ হয়ে অনেক আরব ও ফারসি কবি তার প্রশংসায় কাসিদাও লিখে ফেলেন। অবশেষে সাদ উদ-দৌলা আন্দাজ করল যে, এখন ইসলামকে মিটিয়ে দেওয়ার উপযুক্ত সময় এসেছে। ফলে সে মুসলমানদের জীবন অতিষ্ঠ করতে শুরু করে। [৫] সে ইসলাম এবং জনাব রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি কটাক্ষও করতে থাকে। তারপর সেই দিন এল যখন সাদ উদ-দৌলা আরগুন খানের তোষামোদ করে বলল:

“নবুওয়াতের পদমর্যাদা চেঙ্গিস খানের উত্তরাধিকার সূত্রে আপনিই লাভ করেছেন। আরবদের পয়গম্বর মানুষের ঘাড়ে তলোয়ার রেখে জোরপূর্বক মুসলমান করেছিলেন। (নাউযুবিল্লাহ) এখন আপনি যদি সাহস করেন এবং অনুমতি প্রদান করেন, তবে একটি নতুন দ্বীন প্রচার করা উচিত যার মাধ্যমে প্রাচীন ধর্মীয় কর্তৃত্বের মূলোৎপাটন করা সম্ভব হবে।”

আরগুন খান, যে আগে থেকেই মুসলমানদের শত্রু ছিল, এতে রাজি হয়ে গেল। তার আদেশে অনেক মুসলমানকে হত্যা করা হয়। সে বিচার বিভাগ এবং অর্থ বিভাগের সমস্ত পদ থেকে মুসলমানদের বরখাস্ত করে এবং দরবারে তাদের প্রবেশের ওপরও নিষেধাজ্ঞা জারি করে। [৬] এখন সাদ উদ-দৌলা আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল এবং গোপনে আরগুন খানকে এই বিষয়েও রাজি করাল যে, পবিত্র কাবা শরীফকে প্রাচীন আমলের মতো পুনরায় মূর্তিপূজার ঘরে পরিণত করা হোক (আল-ইয়াযু বিল্লাহ) এবং পুরো সালতানাতে বৌদ্ধ ধর্ম চালু করা হোক। [৭]

[১] The Crusades by Harold Lamb: p. 362 — এছাড়াও গত অধ্যায়ে সুলতান কালাউনের অবস্থার অধীনে এই বিষয়টি দেখুন। হ্যারল্ড ল্যাম্ব “March of the Barbarians”-এ এর ওপর আরও আলোকপাত করেছেন।

[২] ইনতিশারুল ইসলাম বাইনাল মুগ্গল, পৃ. ১৮৫

[৩] তারিখ হাবিবুস সিয়্যার, গিয়াসউদ্দিন মীর খোয়ান্দ শিরাজি: ৩/ ১৩১

[৪] তারিখ হাবিবুস সিয়্যার: ৩/ ১৩১

[৫] তারিখুদ দাওলাতুল মুগ্গলিয়া ফিল ইরান, ডক্টর আব্দুল আজিজ আব্দুল সালাম ফাহমি, পৃ. ১৭৬, তবা দারুল মাআরিফ, মিশর

[৬] তারিখ হাবিবুস সিয়্যার: ৩/ ১৩১, ১৩২; THE PREACHING OF ISLAM: দাওয়াতে ইসলাম, পৃ. ২২৭

[৭] তারিখ হাবিবুস সিয়্যার: ৩/ ১৩১, ১৩২

সাদ আদ-দাওলা ইহুদির হত্যা এবং আরগুন খানের মৃত্যু:

সুতরাং এই বিষয়ে জাজিরাতুল আরবের আশেপাশে বসবাসরত ইহুদিদের কাছে গোপন পত্রও পাঠানো হয়েছিল এবং কাফেররা একটি তাগুতি বিপ্লব ঘটানোর প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছিল। কিন্তু অন্যদিকে ইসলাম যে দ্রুতগতিতে তাতারদের নিজেদের করে নিচ্ছিল, কাফেরদের কাছে তার কোনো প্রতিকার ছিল না। প্রকৃতপক্ষে সাদ আদ-দাওলা ধারণা করতে পারেননি যে খোদ মঙ্গোলদের মধ্যে ইসলামের প্রতি দরদীরা কতটা শক্তি সঞ্চয় করে ফেলেছে। তাতার আমিরদের থেকে সাদ আদ-দাওলার ষড়যন্ত্র গোপন থাকেনি। তারা একজন ইহুদির এই পর্যায়ে ক্ষমতাধর হওয়া সহ্য করতে পারছিলেন না। তাদের মধ্যে মুসলিম আমিরগণ ধর্মীয় আবেগের কারণে সাদ আদ-দাওলার বিরোধী হয়ে গিয়েছিলেন। ফলে তারা সবাই সাদ আদ-দাওলার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করতে লাগলেন। যখন আরগুন খান মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তখন বিরোধী আমিরগণ সুযোগ পেয়ে সাদ আদ-দাওলা এবং তার সহযোগীদের গ্রেফতার করলেন এবং কয়েক দিন পর সাদ আদ-দাওলাকে হত্যা করলেন। মৃত্যুশয্যা শায়িত আরগুন খান যখন সাদ আদ-দাওলার মৃত্যুর খবর পেলেন, তখন তার অবস্থা আরও অবনতি হলো এবং ৭ই রবিউল আউয়াল ৬৯০ হিজরিতে তিনিও পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। [১]

কাইখাতুর শাসন ও পরিণতি:

এরপর হালাকু খানের এক পৌত্র কাইখাতু বিন আবা কা সিংহাসন আরোহণ করলেন। তিনি ছিলেন বিলাসপ্রিয় এবং দুশ্চরিত্র মানুষ। তিনি প্রচুর মদ্যপান করতেন এবং সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মেয়ে ও ছেলেদের নিজের লালসার লক্ষ্যবস্তু বানাতে। [২] তিনি মঙ্গোল সালতানাতে ইসলামের প্রচার-প্রসার পুরোপুরি বন্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন। সরকারি আদেশ জারি করা হয়েছিল যে, কোনো ব্যক্তি যেন মঙ্গোলদের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত না দেয়। [৩] অবশেষে মঙ্গোল আমিরগণ তার ওপর অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। এবং হালাকু খানের আরেক পৌত্র বাইদু খান বিন তারগাই সফর ৬৯৪ হিজরিতে বিদ্রোহ করলেন। [৪] তিনি জমাদিউল আখিরাতে এই জালিম বাদশাহকে গ্রেফতার করে হত্যা করলেন এবং নিজের শাসন প্রতিষ্ঠা করলেন। [৫]

অমুসলিম মঙ্গোল শাসক এবং ইসলাম:

ইসলামের দাঈ এবং ইসলামের অনুরাগী নও-মুসলিম তাতাররা এই কঠিন সময়েও কেবল অবিচলই থাকেননি বরং ক্রমাগত অগ্রসর হতে থাকেন এবং সত্যের অন্বেষণকারীরা দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আসতে থাকেন। আরগুন, কাইখাতু এবং বাইদু ৬৮৩ হিজরি থেকে ৬৯৪ হিজরি পর্যন্ত শাসন করেন। এই এগারো বছরে শাসনকারী এই তিনজন ইলখানি শাসকই ছিলেন অমুসলিম, যাদের ইসলামের প্রতি কোনো সহানুভূতি ছিল না। এই কারণেই খ্রিস্টান বিশ্ব বড় আশা করছিল যে ইলখানিরা খ্রিস্টান হয়ে যাবে, কিন্তু এই অমুসলিম মঙ্গোল শাসকদের চেষ্টা সত্ত্বেও তারা ইসলামকে মিটিয়ে দিতে পারেনি। মঙ্গোলদের মধ্যে ইসলাম এতটাই শিকড় গেড়েছিল যে এর বিরুদ্ধে প্রতিটি চেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছিল। [৬] বরং কখনো কখনো এই অমুসলিম মঙ্গোল শাসকরা...

[১] তারিখ হাবিবুস সিয়র: ৩/১৩১ থেকে ১৩৩; তারিখ ওয়াসসাফ: ২/২৪২ থেকে ২৪৫; তারিখ ইবনে খালদুন: ৫/৬১৭, ত. দারুল ফিকর।

[২] তারিখ হাবিবুস সিয়র: ৩/১৩৩, ১৩৪, ১৩৮, ১৩৯; তারিখ ইবনুল ওয়ারদি: ২/২৩২, ত. আল ইলমিয়াহ।

[৩] THE PREACHING OF ISLAM: 178; দাওয়াতে ইসলাম, পৃ. ২৩৩।

[৪] তারিখ হাবিবুস সিয়র: ৩/১৩৮, ১৩৯।

[৫] ইন্তিশারে ইসলাম বাইনাল মুঘল, পৃ. ১৮৬, ১৮৭।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও মুসলমানদের মন রক্ষা করতে হতো, যেমনটি ৬৮৯ হিজরির ঈদুল ফিতরের সময় যখন তাবরিজের উলামা ও ফুকাহাগণ ঈদগাহে এক বিশাল সমাবেশের আয়োজন করেছিলেন, তখন আরগুন খান তাঁদেরকে খিলআত (সম্মানসূচক পোশাক) দিয়ে ভূষিত করেছিলেন। [১] আরগুনের স্ত্রীদের মধ্যে একজন নারী মুসলিম ছিলেন যিনি রোমের সেলজুক বংশের রাজকুমারী ছিলেন [২], যার ফলে তাঁর পরিবারে ইসলামের প্রচার শুরু হয় এবং আরগুনের এক নাতি ইসলাম গ্রহণ করেন যিনি আমির হোসেন নামে পরিচিত হন। [৩]

কাইখাতুও মঙ্গোল শাহজাদা ও আমিরদের মধ্যে ইসলাম ছড়িয়ে পড়তে দেখে একটি নির্দিষ্ট সীমার বাইরে যাওয়ার সাহস করতে পারেননি। তাঁর দরবারে মুসলিম মঙ্গোল আমির ও উলামাগণও উপস্থিত ছিলেন। মুসলিম মঙ্গোলদের মধ্যে একজন বিখ্যাত নরদার হাসান বিন বুকু কাইখাতুর শৈশবের সাথী ছিলেন। [৪] কাইখাতু উলামা ও হাশেমি শরীফদের সব ধরনের কর থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন। [৫] তাঁর দুই স্ত্রী মুসলিম ছিলেন: একজনের নাম ছিল আয়েশা, আর অন্যজন ছিলেন কেরমানের মুসলিম শাসক কুতুবুদ্দিনের কন্যা এবং তাঁকে ‘খাতুন’ বলে ডাকা হতো। [৬] কাইখাতু বিশেষ ধরনের ‘কারেন্সি নোট’ও চালু করেছিলেন যার মান ছিল আধা দিরহাম থেকে দশ দিরহাম পর্যন্ত। এই নোটগুলোতে খাতাই লিপিতে কালিমা তায়িবা খোদাই করা ছিল। [৭]

তাঁর শাসনামলে উজিরের পদটি একজন আলেম কাজী সদরুদ্দিন আহমদ জানজানির কাছে ছিল, যাকে সদর-ই-জাহান উপাধি দেওয়া হয়েছিল। ইলখানিদের রাজধানী তাবরিজে বাদশাহর প্রতিনিধিত্ব তাঁর ওপরই ন্যস্ত ছিল। তাঁর ভাই, যাকে ‘কুতুব-ই-জাহান’ উপাধিতে ডাকা হতো, কাজীউল কুজাত নিযুক্ত ছিলেন, অন্যদিকে তাঁর চাচাতো ভাই ‘কাওয়ামুল মুলক’কে বাগদাদের ওয়ালি নিযুক্ত করা হয়েছিল। [৮]

গাজান বিন আরগুন:

বাইদু খানের সিংহাসন আরোহণের কিছুকাল পরেই ইলখানি সিংহাসনের আরেকজন দাবিদার সামনে আসেন। তিনি ছিলেন আরগুন খানের পুত্র গাজান। তাঁর সম্পর্কে কেউ এই প্রত্যাশা করতে পারেনি যে ইসলামের প্রতি তাঁর কোনো আগ্রহ থাকতে পারে। আর্নল্ড লিখেছেন:

“গাজানের শিক্ষা ও লালন-পালন বৌদ্ধ ধর্ম অনুযায়ী হয়েছিল। তিনি খোরাসানে বৌদ্ধদের জন্য অনেক মন্দিরও নির্মাণ করেছিলেন। ইরানে মঙ্গোল শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বৌদ্ধ ধর্মের অনেক পুরোহিত ইরানে চলে এসেছিলেন। গাজান তাঁদের সাহচর্য খুব উপভোগ করতেন। মনে হয় যে স্বভাবগতভাবেই ধর্মের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। কারণ তিনি তাঁর সময়ের বিভিন্ন ধর্মের আকিদা-বিশ্বাস নিয়ে পড়াশোনা করেছিলেন এবং তিনি প্রতিটি ধর্মের আলেমদের সাথে ধর্মীয় বিতর্ক করতেন।” [৯]

[১] জামিউত তাওয়ারিখ (আরবি), রশীদুদ্দিন ফজলুল্লাহ: খণ্ড ২, দ্বিতীয় অংশ: পৃ. ১৫৭, ত. দার ইহয়াউল কুতুবিল আরাবিয়া মিসর

[২] জামিউত তাওয়ারিখ (আরবি): খণ্ড ২, দ্বিতীয় অংশ: পৃ. ১২৩

[৩] জামিউত তাওয়ারিখ (আরবি): খণ্ড ২, দ্বিতীয় অংশ: পৃ. ১২৫; ইনতিশারুল ইসলাম বাইনাল মুগ্গল: পৃ. ১৮৬, ১৮৭

[৪] জামিউত তাওয়ারিখ (আরবি): খণ্ড ২, দ্বিতীয় অংশ: পৃ. ১৮৬

[৫] ইনতিশারুল ইসলাম বাইনাল মুগ্গল, পৃ. ১৮৬, ১৮৭

[৬] জামিউত তাওয়ারিখ (আরবি): খণ্ড ২, দ্বিতীয় অংশ: পৃ. ১৭০

[৭] তারিখ হাবিবুস সিয়র, গিয়াসুদ্দিন মীর খোয়ান্দ শিরাজি: ৩/ ১৩৭, ১৩৮

[৮] জামিউত তাওয়ারিখ (আরবি): খণ্ড ২, দ্বিতীয় অংশ: পৃ. ১৭৯; তারিখ হাবিবুস সিয়র: ৩/ ১৩৭, ১৩৮

[৯] THE PREACHING OF ISLAM: 178; দাওয়াত-ই-ইসলাম, পৃ. ২৩৩

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

গাজান কীভাবে মুসলমান হলেন?

কিন্তু অন্তরকে কুফরের অন্ধকার থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য কেবল অধ্যয়ন, পর্যবেক্ষণ বা বিতর্কই যথেষ্ট নয়, বরং এর জন্য নবীসুলভ দাওয়াতের পদ্ধতির প্রয়োজন হয়। এই কাজটি একজন শাফেয়ী আলেম শেখ সদরুদ্দিন মুহাম্মদ বিন হামুইয়াহ (রহ.) এবং গাজানের প্রিয় উজির আমির নওরোজ বেগের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছিল। শেখ নওরোজ বেগকে এই বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন যেন তিনি তার মনিবকে ইসলামের দাওয়াত দেন। নওরোজ বেগ ইসলামী জ্ঞান সম্পর্কে বেশ অবগত ছিলেন, অধ্যয়নে অভ্যস্ত ছিলেন এবং সুফিয়ায়ে কেরামের খিদমতে নিয়োজিত থাকতেন। তিনি এই যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন যে ইলখানি শাহজাদাকে ইসলামের গুণাবলী বুঝিয়ে বলতে পারেন। ফলে তিনি শাহজাদাকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করতে শুরু করলেন। তিনি শাহজাদাকে এটিও স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে, ইসলামের বরকতে প্রজাসাধারণ এবং বিশেষ করে যারা আপনার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তারা আপনার দিকে ধাবিত হবে। আমির নওরোজ বেগের প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হলো এবং গাজান ইসলাম গ্রহণ করতে প্রস্তুত হলেন। [১]

আমির নওরোজ বেগ চেয়েছিলেন যে গাজানের ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য যেন শেখ মুহাম্মদ বিন হামুইয়াহ শাফেয়ী এবং একজন বিজ্ঞ আলেম আলম উদ্দিন বিন বারজালি (রহ.)-এর হাতে হয়। সৌভাগ্যবশত সেই দিনগুলোতে বাগদাদের একজন বুজুর্গ শেখুশ শুয়ুখ সদরুদ্দিন জুওয়াইনি (রহ.)-ও সেখানে আগমন করেন। ফলে গাজান এই তিন বুজুর্গের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। সেই সাথে...

[১] আকদুল জুমান লিল-আইনি: সন ৬৯৫ হিজরি। মনে হয় যে, গাজান মানসিকভাবে এবং বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও ইসলাম গ্রহণ করতে এই কারণে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন যে, তার অমুসলিম মোঘল সেনাবাহিনী প্রথা অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাবে। কিন্তু যখন আমির নওরোজ বেগ তাকে বোঝালেন যে, মুসলমান হওয়ার ফলে তিনি দুর্বল হবেন না বরং আরও শক্তিশালী হবেন এবং মোঘলদের অত্যাচারে জর্জরিত মুসলমানরা তার সমর্থক হয়ে যাবে, তখন গাজানের অন্তর মজবুত হলো। মনে রাখা দরকার যে, কাউকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার সময় এই ধরনের উপকারের কথা উল্লেখ করা সুম্মতে নববীর পরিপন্থী নয় এবং এর কারণে কোনো নওমুসলিমের ইসলাম গ্রহণকে সন্দেহের চোখে দেখা যায় না। রাসূলুল্লাহ (সা.) কুরাইশদের দাওয়াত দেওয়ার সময় বিজয় ও রাজত্বের সুসংবাদ দিয়েছিলেন:

যখন উমর বিন খাতাব (রা.) ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন তা কুরাইশদের ওপর ভারী হয়ে পড়ল এবং মুমিনরা আনন্দিত হলেন। কুরাইশদের নেতৃবৃন্দ ও গণ্যমান্য ব্যক্তির ওয়ালিদ বিন মুগিরার কাছে গিয়ে বলল: হে আবু তালিব, আমাদের কাছে চলুন; আপনি আমাদের নেতা এবং আমাদের বড়। আপনি জানেন এই নির্বোধরা কী করেছে। আমাদের এবং আপনার ভতিজার মধ্যে যে বিবাদ রয়েছে তা মিটিয়ে দিন। আবু তালিব রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন: হে আমার ভতিজা, আপনার কওমের এই লোকেরা আপনাকে একটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করছে, আপনি তাদের প্রতি সম্পূর্ণ বিমুখ হবেন না। তিনি বললেন: তারা আমাকে কী জিজ্ঞাসা করছে? তারা বলল: আমাদের উপাস্যদের আলোচনা ত্যাগ করুন এবং আমাদের ও আপনার উপাস্যদের ছেড়ে দিন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: আপনারা কি আমাকে এমন একটি শব্দ দেবেন যার মাধ্যমে আপনারা আরবদের মালিক হবেন এবং অনারবরা আপনাদের অনুগত হবে? আবু জাহেল বলল: তোমার পিতার কসম, আমরা তোমাকে এর দশগুণ দেব। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: আপনারা বলুন ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’। তারা এটি শুনে ঘৃণাভরে প্রস্থান করল এবং বলল: সে কি সমস্ত উপাস্যকে এক উপাস্য বানিয়ে ফেলেছে? এটি তো এক আশ্চর্যজনক বিষয়।

(আসবাবুন নুযুল লি-আবিল হাসান আলী বিন আহমদ আল-ওয়াহিদী আন-নিশাপুরি (মৃত্যু ৪৬৮ হি.), পৃ. ৩৮১, ত. আল-ইলমিয়াহ)
রাসূলুল্লাহ (সা.) এমন অনেক ব্যক্তিকে ইসলামের সত্যতা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যারা মানসিক দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য পার্থিব উপকারেরও প্রত্যাশী ছিল। সীরাতে নববীতে এমন একটি স্বতন্ত্র দলের উল্লেখ পাওয়া যায় যাদের ‘মুয়াল্লাফাতুল কুলুব’ বলা হয় এবং কুরআনে মাজীদেও তাদের কথা উল্লেখ আছে। (সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৬০)

স্মর্তব্য যে, আর্নল্ড গাজানের ইসলাম গ্রহণের ঘটনাকে একজন পশ্চিমা ঐতিহাসিক ‘সি. ডি. অ্যাকসন’-এর বরাতে উদ্ধৃত করেছেন, তিনি লিখেছেন:
“দূরদর্শিতার সাথে কাজ করে একজন মুসলমান আমির নওরোজ বেগ, যিনি গাজানের ঘনিষ্ঠ ছিলেন, তাকে একান্তে ডেকে নিয়ে বললেন: এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আপনিই সেই বাদশাহ যিনি এই জামানার নিকটবর্তী সময়ে আবির্ভূত হবেন, যাতে তিনি দ্বীন ইসলামের হেফাজত ও সুরক্ষা করেন এবং এর হারানো শান-শওকত ফিরিয়ে আনেন। আপনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন তবে আপনি সমগ্র ইরানের শাসক হবেন এবং মোঘলরা ইসলামের কাফেরদের জোয়াল থেকে মুক্ত হয়ে আপনার সমর্থক হয়ে যাবে এবং মহান আল্লাহ এই সত্য দ্বীনের হেফাজতকারী হিসেবে আপনাকে ফাতহ ও নসরত দান করবেন। মোটকথা, গাজান মুসলমান হওয়ার ঘোষণা দিলেন এবং তার অফিসার ও সৈন্যরাও তার অনুসরণ করল। তিনি আলেম ও দরিদ্রদের মধ্যে সদকা বিতরণ করলেন, মসজিদে হাজিরা দিলেন এবং আউলিয়ার মাজার জিয়ারত করলেন।”

(THE PREACHING OF ISLAM p. 179, দাওয়াতে ইসলাম, পৃ. ২৩৩, ২৩৪) যেহেতু লেখক কোনো ইসলামী উৎসের উদ্ধৃতি দেননি, তাই এই বর্ণনার সমস্ত বিষয়বস্তুর ওপর নির্ভর করা যায় না। তবে যে বিষয়গুলো মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সেগুলো নিঃসন্দেহে নির্ভরযোগ্য।

অনেক মঙ্গোল আমীরও ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হন। এই ঘটনাটি ৬৯৪ হিজরীর শাবান মাসের শেষ দশকের।

গাজান একজন আলিমকে এই দায়িত্ব অর্পণ করেন যেন তিনি তাকে দ্বীনের শিক্ষা প্রদান করেন। সাধারণ মানুষের ওপর জুলুমের ধারা বন্ধ করে দেওয়া হয়, ইসলামের নিদর্শনসমূহ (শাআইর) ব্যাপকতা লাভ করে এবং মসজিদসমূহ নির্মিত ও আবাদ হতে শুরু করে।

রমজান মাসে গাজান রোজা রাখেন। ঈদুল ফিতরের দিন এলে ঈদের সালাতের জন্য এক বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় এবং গাজানও তাতে শরিক হন। তিনি ইহুদি ও নাসারাদের ওপর জজিয়া ধার্য করেন। [১]

গাজানের ইসলাম গ্রহণের ফলে মুসলিম বিশ্বে আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়, যার উল্লেখ হাফিজ ইবনে কাসির রহমাতুল্লাহি আলাইহি এভাবে করেন:

“এই বছর তাতারীদের বাদশাহ গাজান বিন আরগুন ইসলাম গ্রহণ করেন এবং আমীর তুজুন (নওরোজ বেগ)-এর হাতে ইসলামের ঘোষণা দেন। (গাজানের সালতানাতে বসবাসকারী) সকল তাতারী বা তাদের অধিকাংশ লোক ইসলামে দাখিল হয়ে যায়। গাজানের ইসলাম গ্রহণের দিন মানুষের ওপর সোনা, রূপা ও মুক্তার বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়। বাদশাহর ইসলামী নাম মাহমুদ রাখা হয়। তিনি জুমার নামাজ আদায় ও খুতবা শোনার জন্য মসজিদে উপস্থিত হন। খ্রিস্টানদের উপাসনালয়গুলো জনশূন্য হয়ে পড়ে, অমুসলিমদের ওপর জজিয়া নির্ধারিত করা হয়, বাগদাদ ও অন্যান্য শহরে চলমান জুলুমের ধারা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং জবরদখলকৃত সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তাতারীদের হাতে এখন তসবিহ দেখা যায়।” [২]

ডক্টর রজব মুহাম্মদ আব্দুল হালিম লেখেন:

“গাজান তার ইসলাম গ্রহণের খবর ইরাক ও খোরাসানে পাঠিয়ে দেন। তিনি আমীর নওরোজ বেগ থেকে কুরআনের কিছু আয়াত শেখেন, একইভাবে সালাত শেখেন এবং ৬৯৪ হিজরীর রমজান মাসের রোজা রাখেন। প্রতি সন্ধ্যায় তার সাথে অনেক তুর্কি ও ফারসি লোক ইফতার করত। ফলে সেই সময় থেকেই তাতারীদের মধ্যে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে। তাদের অধিকাংশ সৈন্য ও অফিসার ইসলাম গ্রহণ করার ঘোষণা দেয়। মঙ্গোল আমীররাও এই পথেই চলতে শুরু করেন। তাদের মধ্যে একজন, যার নাম ছিল ফিরোজ কোহ, তার ৮০ হাজার অধীনস্থ ও সরদারদের সাথে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন।” [৩]

ইসলাম গ্রহণের পর গাজানের শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং তিনি তার বিরোধীদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন। আর্নল্ড লেখেন:

“যখন তিনি ইরান সিংহাসনের জন্য বাইদু খানের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, তখন তার প্রতিদ্বন্দ্বীর লঙ্করে যে মঙ্গোল মুসলমানরা ছিল, তারা বাইদুর সঙ্গ ত্যাগ করে তাদের সমধর্মী গাজানের সাহায্যে চলে আসে।” [৪]

উলামা ও ফুকাহাগণও গাজানের পাশে এসে দাঁড়ান। এর ফলে বাইদু খান মাত্র আট মাস শাসন করতে সক্ষম হন এবং গাজান তাকে পরাজিত করে জিলহজ ৬৯৪ হিজরীতে ইলখানি সালতানাতে মুকুটধারী হন। [৫] তিনি মঙ্গোলিয়ার খাকানের অধীনতা থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এর আগে সমস্ত মঙ্গোল শাসক খাকানের নায়েব হিসেবে গণ্য হতেন। গাজান ছিলেন প্রথম বাদশাহ যিনি...

[১] উকদ আল-জুমান লিল-আইনি: সন ৬৯৫ হিজরী

[২] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: সন ৬৯৪ হিজরী। হাফিজ ইবনে কাসির গাজানের ইসলাম গ্রহণকে ৬৯৪ হিজরীর ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করেছেন, অন্যদিকে আল্লামা আইনি একে ৬৯৫ হিজরীর অধীনে বর্ণনা করেছেন।

[৩] ইনতিশার আল-ইসলাম বাইনাল মুগুলা, পৃ. ১৮৮, ১৮৯

[৪] THE PREACHING OF ISLAM: 178, 179; দাওয়াত-ই-ইসলাম, পৃ. ২৩৩

[৫] ইনতিশার আল-ইসলাম বাইনাল মুগুলা, পৃ. ১৮৯

...মোগল ফেডারেশন থেকে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করেন। [১] গাজান ইসলাম গ্রহণের পর আরবি ও ফারসি শেখাও শুরু করেন। ফারসির ওপর তার পূর্ণ দখল অর্জিত হয়, অন্যদিকে আরবি তিনি বেশ ভালোই বুঝতে পারতেন এবং ইসলামি কিতাবাদিও অধ্যয়ন করতেন। [২]

গাজানের ইসলামের ওপর অযথা সন্দেহ ও সংশয়:

কিছু ঐতিহাসিক গাজানের ইসলাম গ্রহণকে ইখলাস বা আন্তরিকতার ওপর ভিত্তি করে দেখেননি, কিন্তু ঐতিহাসিক রশিদ উদ্দিন ফজলুল্লাহ (মৃত্যু ৭১৮ হিজরি) গাজানের পক্ষ সমর্থন করে তার ইসলামকে অন্তরের ইখলাসের ওপর ভিত্তি করে বলে অভিহিত করেছেন। তিনি আপত্তিকারীদের জবাব দিতে গিয়ে লেখেন:

“এমন একজন শক্তিশালী বাদশাহর কী লোভ থাকতে পারে যে তিনি নিজের ধর্ম পরিবর্তন করবেন, আর বিশেষ করে এমন একজন বাদশাহ যার মূর্তিপূজক পূর্বপুরুষরা বিশ্ব জয় করেছিলেন।” [৩]

গাজানের শাম আক্রমণ:

গাজান ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পর প্রত্যাশা ছিল যে ইলখানি সালতানাত এবং মামলুকদের মধ্যকার প্রাচীন শত্রুতা শেষ হয়ে যাবে এবং তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপিত হবে। কিন্তু যেহেতু এই শত্রুতার কারণগুলো কেবল ধর্মীয় ছিল না বরং রাজনৈতিকও ছিল, তাই উভয় সালতানাতের মধ্যে মতপার্থক্য বজায় থাকে এবং শেষ পর্যন্ত গাজান মামলুকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের একটি ধারা শুরু করে দেন। রবিউল আউয়াল ৬৯৯ হিজরিতে তার বাহিনী হিমসের যুদ্ধে মামলুক বাদশাহ আন-নাসির বিন কালাউনকে পরাজিত করে এবং কিছু সময় পর্যন্ত দামেস্কও তাদের দখলে থাকে। ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ.-এর প্রচেষ্টায় আন-নাসির বিন কালাউন পাল্টা আক্রমণের প্রস্তুতি নেন এবং রমজান ৭০২ হিজরিতে গাজানকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে শামকে তাতারীদের হাত থেকে রক্ষা করেন। [৪]

শাম আক্রমণের ব্যাপারে গাজান এবং তার দরবারের সাথে সংশ্লিষ্ট উলামাদের অবস্থান ছিল এই যে, মিশরের মামলুকরা কোনোভাবেই শাসনের যোগ্য নয় কারণ তারা গোলামদের বংশধর, অন্যদিকে গাজান বংশীয় আভিজাত্যের অধিকারী; অতএব মিশর রাষ্ট্রকে ইলখানি সালতানাতের অনুগত হওয়া উচিত। যদি মিশরের শাসকরা তা না করে তবে তাদের হুকুম বিদ্রোহী ও খারেজিদের মতো; সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা জিহাদ যাতে পৃথিবীতে আদল ও ইনসাফ কায়েম করা যায়। [৫]

কিন্তু অন্যদিকে বাস্তবতা হলো এই যে, এই যুদ্ধগুলোর সময় তাতার বাহিনী জায়গায় জায়গায় লুটতরাজ চালায়। বিশেষ করে দামেস্কে তারা মুসলমানদের ওপর চরম জুলুম-নির্যাতন চালায়। এই দৃশ্য দেখে মিশরীয় ও শামী উলামারা গাজানের রাজনীতি থেকে চরমভাবে বীতশ্রদ্ধ হন এবং ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ. গাজান ও তার বাহিনীর ওপর খারেজিদের হুকুম আরোপ করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে জিহাদে শরয়ি হিসেবে ঘোষণা করেন। [৬]

[১] আদ-দুরারুল কামিনাহ লি ইবনে হাজার: ৩/ ২৩৯, ২৫০, ত দাক্ষিণাত্য

[২] ইনতিশারুল ইসলাম বাইনাল মুগুল, পৃ. ২১৫

[৩] THE PREACHING OF ISLAM: 178; দাওয়াতে ইসলাম, পৃ. ২৩৩

[৪] এই যুদ্ধগুলোর বিবরণ গত অধ্যায়ে সুলতানুল মালিক আন-নাসির বিন কালাউনের অবস্থার অধীনে বিস্তারিতভাবে অতিক্রান্ত হয়েছে।

[৫] ইনতিশারুল ইসলাম বাইনাল মুগুল, পৃ. ৩০৩

[৬] বিস্তারিত গত অধ্যায়ে আল-মালিক আন-নাসির বিন কালাউনের অবস্থার মধ্যে অতিক্রান্ত হয়েছে।

শুধু তাই নয়, বরং কিছু আলেম গাজান এবং তার অনুসারীদের ওপর কুফর ও শিরকের ফতোয়াও দিয়েছিলেন। এই ঘৃণা এমন এক প্রতিরোধমূলক মনোভাবের রূপ ধারণ করেছিল যা কিছুকাল পরে মঙ্গোলদের সিরিয়া থেকে বের করে দিয়েছিল। যাই হোক, অত্যাচারের কারণে গাজান এবং তার সমস্ত অনুসারীদের ওপর কুফর ও শিরকের ফতোয়া দেওয়া ন্যায়সঙ্গত নয়। তবে তাদের জুলুম ও অত্যাচারের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। গাজান এবং তার সেনাবাহিনীর জুলুম ও অত্যাচারে লিপ্ত হওয়ার বেশ কিছু কারণ ছিল:

- তাতার সেনাবাহিনীতে সবাই মুসলিম ছিল না। বরং অনেকে শামানবাদী এবং বৌদ্ধও ছিল। আর্মেনিয়া ও জর্জিয়ার খ্রিস্টানদের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যা এই সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিছু লোক রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছিল কিন্তু অন্তরে কুফর লুকিয়ে রেখেছিল এবং তারা ছিল মুসলমানদের শত্রু। সম্ভবত লুটতরাজে এই ধরনের লোকদের অংশই বেশি ছিল। [১]
- নওমুসলিম তাতারীদের প্রশিক্ষণে তখনও অনেক ঘাটতি ছিল। তাদের মধ্যে তাদের পূর্বপুরুষদের অভ্যাসগুলো অবশিষ্ট ছিল।
- তাতারীরা তখনও পর্যন্ত চেঙ্গিসী আইন ‘ইয়াসা’ অনুসরণ করত, যাতে এই ধরনের লুটতরাজ প্রতিটি অভিযানের জন্য অপরিহার্য ছিল। তাই নওমুসলিম মঙ্গোলদেরও এই ধরনের কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়া কোনো আশ্চর্যের বিষয় ছিল না, তবে এই কারণে তাদের কাফের ও মুশরিক বলা ন্যায়বিচার থেকে দূরে।

ইলখানি সাম্রাজ্যে রাফেজীদের তৎপরতা:

তাতারীদের মধ্যে ইসলাম প্রচার হতে দেখে রাফেজীরা তাদের ইসলামী উদ্দীপনার সুযোগ নেওয়ার পূর্ণ চেষ্টা করেছিল। নাসিরুদ্দিন তুসী এবং ইবনুল আলকামির মতো শিয়ারা যেভাবে ইরাককে তাতারীদের হাতে তুলে দিয়েছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে তাতারীদের দরবারে তারা একটি বিশেষ স্থান পেয়েছিল। সমমনা হওয়ার কারণে রাফেজীদের সাথে ইহুদিদের সাধারণত বন্ধুত্ব থাকত। নাসিরুদ্দিন তুসী যখন আলমুত দুর্গে বাতেনীদের অধীনে কর্মরত ছিল, তখন সেখানে ইসমাইলীদের পাশাপাশি কিছু ইহুদি বুদ্ধিজীবীও তার সঙ্গী হয়েছিল। যখন হালাকু খান নাসিরুদ্দিন তুসীকে তার উজির বানাল, তখন এই ইসমাইলী ও ইহুদি বুদ্ধিজীবীরাও এই মজলিসের অংশ হয়ে গেল। এভাবে ইলখানি সাম্রাজ্যের এই প্রাথমিক যুগে রাফেজী এবং ইহুদিদের খুব সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই কারণেই সাদউদ্দৌলা নামক এক ইহুদি ইলখানি শাসক আরগুনের শাসনামলে উজির-এ-আজম পদে অধিষ্ঠিত ছিল এবং এই সময়ে সে ইসলামের শিকড় কাটার পূর্ণ চেষ্টা করেছিল। [২]

হালাকু তুসীর ইঙ্গিতে তার রাজধানী মারাগায় একটি বিশাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়েম করেছিল যাতে একটি বড় লাইব্রেরিও ছিল। সেই সাথে একটি মানমন্দিরও তৈরি করা হয়েছিল যার পেছনে বাগদাদ থেকে লুণ্ঠিত ধন-সম্পদ অকাতরে ব্যয় করা হয়েছিল। লাইব্রেরিতেও বাগদাদ থেকে লুণ্ঠিত বইয়ের বিশাল ভাণ্ডার ছিল। [৩] তুসী লাইব্রেরিতে পড়াশোনা করত, মানমন্দিরে জ্যোতির্বিদ্যায় মগ্ন থাকত এবং মাদরাসায় যুক্তিবিদ্যার পাঠ দিয়ে ছাত্র তৈরি করত যারা প্রায়ই তার মতোই মুক্তমনা, যুক্তিবাদী এবং ভ্রান্ত আকিদাবিশিষ্ট প্রমাণিত হতো। তুসী যুক্তিবিদ্যার ওপর বেশ কিছু বইও লিখেছিল। ৬৭২ হিজরিতে তার মৃত্যু হয়। [৪]

[১] ইনতিশারুল ইসলাম বাইনাল মুগুন্ল, পৃ. ২০৫, ২০৬

[২] তারিখ হাবিবুস সিয়্যার: ৩/১৩১

[৩] আস-সুলুক লি-মা’রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক লিল মাকরিজি: সন ৬৫৮ হিজরি

[৪] আস-সুলুক লি-মা’রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: সন ৬৭২ হিজরি

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

হালাকুর প্রপৌত্র গাজানের যুগে তুসীর পুত্র নসীরুদ্দীন তুসী ওয়াকফ মন্ত্রী নিযুক্ত হন। তিনি রাজকীয় চিকিৎসক ও জ্যোতিষীও ছিলেন এবং নক্ষত্ররাজির অবস্থা দেখে ভবিষ্যৎবাণী করতেন। তাঁর মর্যাদা এমন ছিল যে, যখন গাজান দামেস্ক জয় করলেন, তখন তাঁকে খিদমতের পুরস্কার হিসেবে ২০ লক্ষ দিরহাম (প্রায় ৫০ কোটি টাকা) প্রদান করেন। [১]

যেহেতু ইরাক ও ইরানে সংখ্যাগুরু ছিল আহলে সুন্নাত, তাই তাতারী শাসকরা সুন্নী উলামা ও জ্ঞানীদের থেকে বিমুখ থাকতে পারতেন না; ফলে তাতারীদের দরবারে শিয়া ও সুন্নী উভয়ই স্থান পেয়েছিল এবং উভয়ই নিজ নিজ চিন্তাধারা প্রচারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল।

বিশ্ব ইসলামের ইতিহাসের প্রথম আড়াই শতাব্দীতে শিয়াদের কোনো সরকার ছিল না। তৃতীয় হিজরী শতাব্দীর শেষভাগে বনু উবাইদ আফ্রিকায় প্রথম ইসমাইলি শিয়া সরকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। এই সময়ে বাহরাইন, আরব ও সিরিয়ার ওপর কারামাতি শিয়ারা দখলদারিত্ব কায়েম করেছিল। এর কয়েক দশক পর বনু বুওয়াইহ ইরাক ও ইরানে ইসনা আশারি শিয়া সরকার গঠন করে এবং আব্বাসী খলিফাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। এভাবে চতুর্থ হিজরী শতাব্দীতে অধিকাংশ ইসলামি বিশ্ব শিয়াদের কবজায় ছিল।

পঞ্চম হিজরী শতাব্দীতে মাহমুদ গজনভী, তুঘরিল বেগ, আল্প আরসালান এবং মালিক শাহ সেলজুকির মতো প্রখ্যাত বিজয়ীদের আবির্ভাবে আবারও আহলে সুন্নাতদের উত্থান ঘটে এবং কারামাতি ও বনু বুওয়াইহদের সরকারের পতন ঘটে। এরপর ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর উত্থানের সাথে সাথে মিশরের ইসমাইলি সরকারেরও অবসান ঘটে। এই পরিস্থিতি সপ্তম হিজরী শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত বজায় ছিল যে, এই সময়ে ইসলামি বিশ্বে কোনো শিয়া সরকার ছিল না। শিয়ারা নিজেদের পৃথক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য তাতারীদের সহযোগিতা করে এবং আব্বাসী খিলাফতের পতন ঘটায়। কিন্তু তাদের শাসনের স্বপ্ন পূরণ হতে পারেনি এবং তাতারীরা শাসন ক্ষমতা নিজেদের হাতেই রাখে। এরপর শিয়া উলামা ও জ্ঞানীরা এই চেষ্টায় লিপ্ত হন যে, কোনোভাবে তাতারীদের শিয়া বানানো যায় এবং তাদের মাধ্যমে সিরিয়া ও মিশরের সুন্নী সরকারের পতন ঘটানো যায় যেমনটা বাগদাদের ক্ষেত্রে করা হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে তারা তাতারী শাসকদের কাছে উজির, চিকিৎসক ও জ্যোতিষী হিসেবে নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করতে থাকেন। [২]

ওলজাইতু, মুহাম্মদ খোদাবন্দাহ:

গাজানের পর তার ভাই ওলজাইতু সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার মা খ্রিস্টান ছিলেন, তাই জন্মের পর তাকে বাপ্তিস্ম দেওয়া হয়েছিল এবং ‘নিকোলাস’ নাম রাখা হয়েছিল। তার শিক্ষা ও লালন-পালন খ্রিস্টীয় পদ্ধতিতে হয়েছিল, কিন্তু তার বিবাহ এমন এক মহিলার সাথে হয়েছিল যিনি মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। যখন ওলজাইতুর মা মারা যান, তখন তার স্ত্রী তাকে মুসলমান হওয়ার জন্য উৎসাহিত করতে শুরু করেন। অবশেষে এই প্রচেষ্টা সফল হয় এবং ওলজাইতু ইসলাম গ্রহণ করেন। [২]

৭০৩ হিজরীতে গাজানের মৃত্যুর পর তিনি ইলখানি সালতানাতের মুকুটধারী হন। ক্ষমতা গ্রহণের পর এক বছর পর্যন্ত তিনি একজন ভালো শাসকের মতো সমস্ত দায়িত্ব পালন করেন এবং তার আকিদা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনুসারী ছিল। [৩]

[১] আস-সুলুক লি-মা’রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক লিল-মাকরিজি: সন ৬৯৯ হিজরী; উকদুল জুমান ফি তারিখি আহলিয় যামান লিল-আইনি: সন ৬৯৯ হিজরী।

[২] THE PREACHING OF ISLAM 179; দাওয়াতে ইসলাম, পৃষ্ঠা ২৩৩।

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৮ / ১৫৩।

খুদাবন্দা ইসলামের সৌন্দর্য দেখে শুরুতে সাধারণ আহলে সুন্নাতের মাযহাব অনুযায়ী মুসলমান হয়েছিলেন, কিন্তু শীঘ্রই তার দরবারের একজন শিয়া আলেম জামাল উদ্দিন ইবনুল মুতাহহার তার চিন্তাধারায় প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেন। [১]

সুলতান খুদাবন্দা এমনিতে আলেম ও দরবেশদের খুব সম্মান করতেন। জামাল উদ্দিন ইবনুল মুতাহহারের ইলম ও ফযিলত তাকে তার ভক্ত বানিয়ে দেয় এবং তিনি চোখ বন্ধ করে তার প্রতিটি কথা বিশ্বাস করতে শুরু করেন। জামাল উদ্দিন তার অজ্ঞতা ও সরলতার সুযোগ নিয়ে তাকে বোঝাতে শুরু করেন যে, নবী করীম (সা.)-এর খিলাফতের প্রকৃত হকদার আহলে বাইত, আপনার (সা.) পরে খিলাফত হযরত আলী (রা.)-এর হক ছিল যা আবু বকর ও উমর (রা.) ছিনিয়ে নিয়েছেন। আহলে সুন্নাত যারা তাদের সাথে আছে, তারা একটি বাতিল মাযহাব অনুসরণ করছে। পক্ষান্তরে যারা হযরত আলী (রা.) এবং আহলে বাইতকে মানে তারাই সঠিক ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী আমল করছে।

মোদ্বাকথা, সুলতান খুদাবন্দা এই কথাগুলো বিশ্বাস করে কেবল শিয়া ইসনা আশারি মাযহাবই গ্রহণ করেননি, বরং ইবনুল মুতাহহারের কথায় আহলে সুন্নাতের মাযহাবকে আইন বহির্ভূত ঘোষণা করেন। যেহেতু তার শাসন খোরাসান, ইরান ও ইরাক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাই এই সমস্ত অঞ্চলের আহলে সুন্নাত কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন। ইবনুল মুতাহহারের প্ররোচনায় সুলতান খুতবা থেকে খুলাফায়ে সালাসার (তিন খলিফা) নাম বাদ দিয়ে দেন। নির্দেশ দেন যে, মসজিদের জুমার খুতবায় কেবল হযরত আলী (রা.) এবং তার সমর্থকদের নাম নেওয়া হবে, যেমন আন্নার বিন ইয়াসির (রা.)। [২] পক্ষান্তরে হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা.) সহ বাকি সমস্ত সাহাবীর নাম বাদ দেওয়া হবে। নতুন সরকারি মুদ্রায় বারো ইমামের নাম খোদাই করা হয়। [৩] কালিমা তাইয়েব্যো “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ”-এর সাথে “আলীউন ওয়ালিউল্লাহ” শব্দগুলোও যোগ করা হয়। [৪]

কাজী মাজদুদ্দিন ইসমাইলের সাহস ও কারামত এবং খুদাবন্দার রাফেযিবাদ থেকে প্রত্যাবর্তন:

জনগণকে জোরপূর্বক শিয়া বানানোর এই ষড়যন্ত্রকে বাগদাদ, ইসফাহান ও শিরাজের সাহসী আলেমগণ সফল হতে দেননি এবং সরকারি নির্দেশ মানতে অস্বীকার করেন। তারা যথারীতি খুতবায় চার খলিফার নাম নিতে থাকেন। সুলতান তা জানতে পেরে অত্যন্ত রাগান্বিত হন। তিনি শত্রুদের কষ্টদায়ক মৃত্যু দেওয়ার জন্য মানুষকে কুকুর পুষেছিলেন। বন্দিকে একটি চার দেয়ালের মধ্যে দাঁড় করিয়ে তার ওপর কুকুর ছেড়ে দেওয়া হতো। বন্দি প্রাণ বাঁচানোর জন্য দৌড়াত এবং কুকুরগুলো তাকে তাড়া করে কামড়াতে থাকত যতক্ষণ না তার কাজ শেষ হয়ে যেত এবং তার এক এক টুকরো মাংস খেয়ে ফেলত। সুলতান খুদাবন্দা—

[১] রেহলা ইবনে বতুতা: ২/৩৭, ত. একাডেমিয়া আল-মাগরিবিয়া।

ইবনুল মুতাহহারের আসল নাম হাসান বিন ইউসুফ ছিল। ৭২৬ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ইমাম ইবনে তাইমিয়াহর সমসাময়িক ছিলেন। তিনি ইসনা আশারি মাযহাবের সমর্থনে অনেক বই লিখেছেন। ইমাম সাহেব তার বাতিল আকিদা খণ্ডনের জন্য তার বিখ্যাত গ্রন্থ “মিনহাজুস সুন্নাহ” রচনা করেন। (আন-নুজুমুয যাহেরা: ৯/২৬৭, ত. দারুল কুতুব মিসর)।

[২] রেহলা ইবনে বতুতা: ২/৩৮, ত. একাডেমিয়া আল-মাগরিবিয়া।

[৩] তারিখ ইবনে খালদুন: ৫/২১৯, ত. দারুল ফিকর।

[৪] রওজাতুস সাফা: ৫/১৩৩, ত. নওল কিশোর।

চতুর্থ খণ্ড | মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

বিরোধী আলেমদের সেই কুকুরগুলোর সামনে ফেলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। সর্বপ্রথম শিরাজের কাজী ইমাম মাজদুদ্দিন ইসমাইল (রহ.)-কে আনা হলো। তাঁকে চার দেয়ালের ভেতরে এনে শিকারি কুকুরগুলোকে তাঁর ওপর ছেড়ে দেওয়া হলো। কাজী সাহেব বিন্দুমাত্র ঘাবড়ালেন না। কুকুরগুলো তাঁর কাছে পৌঁছামাত্রই থেমে গেল এবং লেজ নাড়াতে লাগল। এই খবর সুলতানের কাছে পৌঁছালে তিনি বিস্ময়াভিভূত হয়ে গেলেন এবং বুঝতে পারলেন যে এই বুজুর্গ হকের ওপর আছেন। তিনি খালি পায়ে দৌড়ে এলেন এবং কাজী সাহেবের কদম চুম্বন করতে লাগলেন। এরপর তিনি শিয়া আকিদা থেকে তওবা করলেন এবং পুরো সালতানাতে নতুন করে আহলে সুন্নাতে আকিদা ও রীতিনীতি পুনরুজ্জীবিত করলেন এবং শরীয়ত বিরোধী সমস্ত রীতিনীতির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলেন। [১]

শামের ওপর ইলখানিদের আক্রমণ:

ইসলাম গ্রহণ করা সত্ত্বেও ইলখানি মোগলদের সাথে মিশরের মামলুকদের বিরোধ পুরোপুরি শেষ হয়নি। সামান্য ঘটনা সীমান্ত সংঘর্ষ এবং কখনো কখনো সৈন্য অভিযানের কারণ হয়ে দাঁড়াত। ফলে মুহাম্মদ খুদাবান্দার শাসনামলেও এমনই একটি ঘটনা ঘটে যাতে মোগল বাহিনী রমজান ৭১২ হিজরিতে শামের সীমান্তে আক্রমণ করে এবং তিন সপ্তাহ পর্যন্ত রাহবা অবরোধ করে রাখে। স্থানীয় মুসলমানরা অত্যন্ত বীরত্বের সাথে এর মোকাবিলা করে। অবশেষে মুহাম্মদ খুদাবান্দা তাঁর উজির রশিদ উদ্দিন ফজলুল্লাহর পরামর্শে এই অভিযান ত্যাগ করেন এবং শহরবাসীর কাছ থেকে আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে ফিরে যান। [২]

রশিদ উদ্দিন ফজলুল্লাহ:

এই রশিদ উদ্দিন ফজলুল্লাহ ছিলেন একজন নওমুসলিম হেকিম। বংশগতভাবে তিনি ইহুদি ছিলেন। দর্শন, চিকিৎসা এবং ইতিহাসে তিনি পারদর্শী ছিলেন। তিনি গাজানের শাসনামলে রাজকীয় চিকিৎসক নিযুক্ত হয়েছিলেন। এরপর খুদাবান্দার যুগে উজির-এ-আজম পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি তাবরিজে অসংখ্য খানকাহ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁকে ‘রশিদ উদ-দৌলা’ উপাধি দেওয়া হয়েছিল কিন্তু সাধারণত তাঁকে “রশিদ উদ্দিন” নামেই স্মরণ করা হয়। [৩]

তিনি মোগল বাদশাহদের জন্য “জামেউত তাওয়ারিখ” নামে একটি বিশাল ইতিহাস গ্রন্থ সংকলন করেন যা ঐতিহাসিকদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বের অধিকারী। মুসলিম বিশ্বের ওপর তাতারীদের আক্রমণ, সমসাময়িক মুসলিম দেশসমূহ এবং মোগলদের বিভিন্ন সালতানাতে অবস্থার ওপর এটি একটি মূল্যবান উৎস।

খুদাবান্দার মৃত্যু এবং রশিদ উদ্দিনের হত্যাকাণ্ড:

৭১৬ হিজরিতে খুদাবান্দা মৃত্যুশয্যায় আক্রান্ত হন। চিকিৎসকরা তাঁর চিকিৎসায় অপারগ হয়ে পড়লে তাঁরা রশিদ উদ্দিনের কাছে পরামর্শ চাইলেন। তিনি শরীর থেকে দূষিত পদার্থ বের করার জন্য জোলাপ দেওয়ার পরামর্শ দেন। কিন্তু এই ব্যবস্থায় সুলতান...

[১] রেহলা ইবনে বতুতা: ২/ ৩৮, ৩৯, ত. একাডেমিয়া আল-মাগরিবিয়া। এই ঘটনাটি সাধারণ ঐতিহাসিকরা বর্ণনা করেননি কিন্তু ইবনে বতুতা তাঁর সফরনামায় এটি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। ইবনে বতুতা ইরান সফরের সময় স্বয়ং কাজী মাজদুদ্দিন ইসমাইলের সাথে শিরাজে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তিনি জানান যে, কাজী সাহেব তাঁর মাদ্রাসা “আল-মাজদিয়া”-তে ছিলেন। তিনি আমাকে অনেক সম্মান ও সমাদর করেছিলেন। তাঁর মজলিসে মিশকাতুল মাসাবিহ এবং মাশারিকুল আনওয়ারের দরস হতো। (রেহলা ইবনে বতুতা: ২/ ৪৭) অর্থাৎ এই ঘটনাটি অবিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে, তাই এর নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে কোনো সংশয় থাকা উচিত নয়।

[২] দুওয়ালুল ইসলাম: সন ৭১২ হিজরি।

[৩] আল-আলাম লিয়-ঘিরিকলি: ৫/ ১৫২, ত. লিল-মালাইয়িন।

অবস্থা আরও অবনতি হলো এবং তিনি মৃত্যুবরণ করলেন।

রশীদ উদ্দিনের বিরোধী দরবারীরা তাকে বিদ্রূপ ও লাঞ্ছনার লক্ষ্যবস্তু বানাল এবং তার ওপর সুলতানকে হত্যার অভিযোগ আরোপ করল। রশীদ উদ্দিন বারবার বললেন যে, আমার মতো একজন সাধারণ নিঃস্ব ব্যক্তি, যে বাদশাহর কৃপাদৃষ্টির কারণে এই উচ্চ পদে পৌঁছেছে, তার বাদশাহর সাথে কী শত্রুতা থাকতে পারে। কিন্তু মঙ্গোলরা তার একটি কথাও শুনল না। তিনি তার সমস্ত নগদ অর্থ দিয়ে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করলেন কিন্তু তাতে কাজ হলো না। মঙ্গোলরা তার কাছ থেকে দশ লক্ষ দিনার (প্রায় পঁচিশ বিলিয়ন টাকা) আদায় করল। এরপর তার ষোল বছর বয়সী ছেলেকে হত্যা করল। পরিশেষে রশীদ উদ্দিনের শুধু শিরশ্ছেদই করা হলো না, বরং শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্নভিন্ন করে বিভিন্ন শহরে পাঠানো হলো এবং সেগুলো পুড়িয়ে ফেলা হলো। তাবরিজে মাথা প্রদর্শন করে ঘোষণা করা হলো: “এটি ইহুদি নাস্তিকের মাথা।”

তার অসংখ্য রচনাবলীও পুড়িয়ে ফেলা হলো। সেগুলোর মধ্যে কেবল ‘জামেউত তাওয়ারীখ’ আমাদের কাছে পৌঁছেছে, যা ইতিহাস শাস্ত্রে রশীদ উদ্দিনের দূরদৃষ্টি ও অসাধারণ দক্ষতার এক উজ্জ্বল প্রমাণ। এই দুঃখজনক ঘটনাটি ৭১৭ হিজরীর। রশীদ উদ্দিনের বয়স ছিল ৭৫ বছর। সরকারিভাবে চরিত্র হননের কারণে এই কথাটি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল যে রশীদ উদ্দিন ইহুদি ছিলেন, যদিও পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ঘটনাবলী তা প্রমাণ করে না। [১]

ইমাম সাফাদী (রহ.) বলেন: “তার মধ্যে ধৈর্য, বিনয় ও বদান্যতার গুণাবলী ছিল।” [২]

ইমাম সাফাদী (রহ.) রশীদ উদ্দিন সম্পর্কে বিরোধীদের মতামত উল্লেখ করার পর সেগুলো খণ্ডন করে লিখেন:

“রশীদ উদ্দিনের ইসলাম গ্রহণ অনিচ্ছাকৃত ছিল না। তিনি মুসলমানদের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন এবং সর্বাবস্থায় তাদের সেবা করে গেছেন। আমাকে রাহবার কাজী নাজমুদ্দিন জানিয়েছেন যে, রশীদ উদ্দিন কীভাবে রাহবার অধিবাসীদের পক্ষে সুপারিশ করেছিলেন, রাহবাবাসীদের প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন এবং তাতারীদের হাত থেকে তাদের মুক্ত করতে সাহায্য করেছিলেন। তাবরিজে তার নেক আমলগুলো ছিল মহান। তিনি পুণ্যকর্মে লিপ্ত থাকতেন। ইসলাম বিদ্বেষ ও ধূর্ততার সাথে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না।” [৩]

আবু সাঈদ বাহাদুর খান:

৭১৬ হিজরীতে খোদাবান্দার পর তার পুত্র আবু সাঈদ বাহাদুর খান সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার অল্প বয়সের কারণে সালতানাতের শাসনব্যবস্থা তার নায়েব আমীর চূপান পরিচালনা করতে থাকেন। আবু সাঈদ যখন প্রাপ্তবয়স্ক হলেন, তখন আমীর চূপানের সাথে তার বিরোধ দেখা দিল। অবশেষে আবু সাঈদ জয়ী হয়ে রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীর দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করলেন। [৪] তিনি ছিলেন একজন খাঁটি মুসলমান, তাই তিনি সুন্নাহর নিদর্শনসমূহ ব্যাপকভাবে প্রচার করেন। [৫]

তার শাসনামলে ইরাকের নওমুসলিম তাতারী শাহজাদাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়। ৭১৯ হিজরীর সময়কালে তাদের মধ্যে ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয় যাতে তাদের হাজার হাজার লোক নিহত হয়। [৬] গৃহযুদ্ধের পর তাতারীরা এই যোগ্যতায় রইল না...

[১] আল-ওয়াকিফি বিল ওয়াফায়াত: ২৩/৫৮; আ'য়ানুল আসর ওয়া আওয়ানুন নাসর লিস-সাফাদী: ৪/৩২, ৩৩, ত: দারুল ফিকর; আল-আ'লাম লিয-যিরিকলী: ৫/১৫২, ৫৩০

[২] আ'য়ানুল আসর ওয়া আওয়ানুন নাসর: ৪/৩২, ৩৩

[৩] প্রাপ্ত

[৪] আল-মুখতাসার ফি আখবারিল বাশার লি-আবুল ফিদা: ৪/৯৬

[৫] দুওয়ালুল ইসলাম লিয-যাহাবী মা'আ যাইলুহ: সন ৭১৬ হিজরী

[৬] দুওয়ালুল ইসলাম লিয-যাহাবী মা'আ যাইলুহ: সন ৭১৯ হিজরী

তারা আরও রাজ্য বিস্তারের লোভ করত। আবু সাঈদ দূরদর্শিতার সাথে কাজ করলেন এবং ৭২১ হিজরিতে আল-মালিক আন-নাসিরের কাছে মূল্যবান উপহার পাঠিয়ে সন্ধি স্থাপন করলেন। এভাবে পূর্ব ও পশ্চিমের সমস্ত ইসলামী শহর নিরাপদ হয়ে গেল। [১]

আল-মালিক আন-নাসিরের সাথে আবু সাঈদের সম্পর্ক এতটাই সুদৃঢ় হয়েছিল যে, তিনি নিজের সালতানাতের কিছু অভ্যন্তরীণ সমস্যার তথ্যও আন-নাসিরের কাছে পাঠাতেন। ফলে যখন তিনি তাঁর বিরোধী মঙ্গোল আমির ‘চোপান’-এর ওপর বিজয়ী হলেন, তখন তিনি আল-মালিক আন-নাসিরকে পত্রের মাধ্যমে এই সুসংবাদ দিলেন এবং জানালেন যে তাঁর শাসন এখন সুসংহত হয়েছে। [২]

এভাবে এই দুই রাজ্যের মধ্যে গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠল। উপহারের সাথে সাথে দূতদের যাতায়াতও অব্যাহত থাকল। [৩]

সুলতান আবু সাঈদ একজন আদর্শ শাসকের মতো তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ইউরোপের সাথেও বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং সেখানকার বণিকদের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন। [৪] এই সময়ে নতুন বাণিজ্যিক পথ আবিষ্কৃত হয়। হিন্দুস্তান থেকে বাণিজ্যিক কাফেলাগুলো আগে পেশোয়ার, কابل ও বলখ হয়ে উরগঞ্জ (খোয়ারিজম) পর্যন্ত পৌঁছাত, এখন সমুদ্রপথও ব্যবহৃত হতে শুরু করে। অর্থাৎ হিন্দুস্তানের উপকূল থেকে বাণিজ্যিক জাহাজগুলো পারস্য উপসাগরের হরমুজ বন্দরে নোঙর করত এবং এখান থেকে বাণিজ্যিক পণ্য ইরান ও আফগানিস্তানের সীমান্ত এলাকা দিয়ে পার করে মধ্য এশিয়ায় পৌঁছে দেওয়া হতো। এই যুগেই মার্কো পোলো ইউরোপ থেকে চীন পর্যন্ত সফর করেন এবং পশ্চিমা বিশ্বকে প্রাচ্যের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে পরিচিত করান। [৫]

এভাবে ইরান, ইরাক এবং এশিয়া মাইনরে মঙ্গোলদের সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এখন মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির রঙে রঞ্জিত হয়ে গেল। তারা তাদের পৈতৃক ভাষা ও সংস্কৃতির পরিবর্তে ফারসি, আরবি ও তুর্কি ভাষা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করল এবং পারসিক, আরব ও তুর্কিদের মতো ইসলামি বিশ্বের একটি অংশে পরিণত হলো। খ্রিস্টধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম পরাজিত হলো এবং তাদের প্রাচীন নিদর্শন ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকল না। মোদাকথা, হালাকু খানের হাতে বাগদাদের পতনের মাত্র ছয় দশক অতিক্রান্ত হয়েছিল যে, ইসলামের দাওয়াত ইলখানি মঙ্গোলদের তলোয়ারকে ইসলামের তলোয়ারে পরিণত করে দিল। [৬]

হালাকু খান থেকে সুলতান আবু সাঈদ পর্যন্ত আফগানিস্তানের সমস্ত তাতার শাসক ইরানকে তাদের কেন্দ্র বানিয়ে খোরাসান ও ইরাক শাসন করেছেন। ৭৩৬ হিজরিতে আবু সাঈদের মৃত্যু এমন অবস্থায় হয় যে তাঁর কোনো পুত্র ছিল না। এই কারণে তাঁর উত্তরাধিকারের বিষয়ে সালতানাতের আমিরদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। ইরাক ও খোরাসানের তাতার শাহজাদারা পুনরায় বিবাদে লিপ্ত হয়। শাসকরা এত দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকে যে ২০ বছরে আটজন বাদশাহ আসলেন এবং চলে গেলেন। সালতানাতে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন অঞ্চলে স্বায়ত্তশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ৭৩৭ হিজরি থেকে ৭৪৪ হিজরি পর্যন্ত তাতারদের গৃহযুদ্ধ চলতে থাকে, যার ফলে হালাকু খানের প্রতিষ্ঠিত ইলখানি সালতানাত টুকরো টুকরো হয়ে নাম-নিশানা মুছে যায়। [৭]

[১] দুওয়ালুল ইসলাম লিজ-জাহাবি মাতা জুইউলিহি: সন ৭২১ হিজরি

[৩] ইনতিশারুল ইসলাম বাইনাল মুগ্গল, পৃ. ২২৫

[৫] আদ-দাওলাতুল খুওয়ারিজমিয়াহ ওয়াল মুগ্গল লিল হাফিজ আহমাদ হামদি, পৃ. ২৯০ থেকে ৩০৩

[৬] ইনতিশারুল ইসলাম বাইনাল মুগ্গল, পৃ. ২২৬

[২] আল-মুখতাসার ফি আখবারিল বাশার: ৪/৯৭

[৪] তারিখুদ দাওলাতিল মুগ্গলিয়াহ ফি ইরান, পৃ. ২৩১

[৭] তারিখ ইবনে খালদুন: ৫/৬২২ থেকে ৬২৭, ত. দারুল ফিকর

ইলখানি সালতানাতে রাফয প্রচারের প্রচেষ্টা এবং আহলে সুন্নাত উলামায়ে কেরামের ভূমিকা:

এখানে এটিও মনে রাখা উচিত যে, তাতারীদের মধ্যে রাফয (শিয়া মতবাদ) ছড়ানোর কাজ মূলত ইলখানি সালতানাতে হয়েছিল, যা ইরাক, পশ্চিম আফগানিস্তান, ইরান এবং এশিয়া মাইনরের পূর্ব অংশ নিয়ে গঠিত ছিল। সেখানে রাফযীরা তাদের আকিদা প্রচারের জন্য সক্রিয় ছিল, অন্যদিকে আহলে সুন্নাত উলামায়ে কেরামও অত্যন্ত সাহস ও দৃঢ়তার সাথে তাদের মোকাবিলা করেছিলেন। এই উলামাদের মধ্যে ইমাম যাইনুদ্দিন বাদভী (উমর বিন উমরান) রহ.-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যিনি সারা জীবন রাফযী ও বিদআতিদের বিরুদ্ধে উন্মুক্ত তলোয়ারের মতো ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে গাদ্দারির অভিযোগ এনে তাতারী শাসকদের দৃষ্টিতে তাঁকে অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়। শাসকরা তাঁকে এবং তাঁর এক সঙ্গীকে মানুষখেকো কুকুরের সামনে নিক্ষেপ করে। তাঁর সঙ্গীকে কুকুরগুলো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেছিল, কিন্তু তিনি আল্লাহর যিকির করতে থাকেন এবং কুকুরগুলো তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। এতে তাতারী শাসকরা লজ্জিত হয় এবং তাঁকে সম্মান ও মর্যাদার সাথে মুক্তি দেয়। [১]

রাফযীদের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক আধিপত্যের প্রচেষ্টা এবং তার প্রতিরোধ:

কিছু রাফযী নেতা বিভিন্ন উপায়ে মানুষকে একত্রিত করে রাজনৈতিক আধিপত্যের জন্যও সচেষ্ট ছিল, তবে সুন্নি আমীররা অত্যন্ত তৎপরতার সাথে তাদের প্রতিরোধ করেন। ইবনে বতুতা বর্ণনা করেন যে, সেই সময়ে তুসের একজন রাফযী শেখ হাসান দেড় লক্ষ লোকের একটি বাহিনী তৈরি করে ইরানের বেশ কয়েকটি শহর দখল করে নিয়েছিলেন এবং নিজের খেলাফতের দাবি করেছিলেন। ইলখানি মোগলরা কয়েকবার তাদের ওপর আক্রমণ করলেও পরাজিত হয়। অবশেষে হেরাতের শাসক হুসাইন বিন গিয়াসুদ্দিন এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন এবং তাদের কাহিনী খতম করেন। [২]

ইলখানি সালতানাত বাদে খোরাসান, মধ্য এশিয়া এবং গোল্ডেন হোর্ড (কিপচাক)-এর তাতারী রাষ্ট্রগুলোতে সুন্নি উলামাদের দাওয়াতি প্রচেষ্টা প্রবল ছিল। তবে শিয়াদের বুদ্ধিবৃত্তিক সংগ্রামের প্রভাবে ইরান ও ইরাকে তাদের সংখ্যা অতীতের তুলনায় কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছিল, কিন্তু সব অবস্থাতেই ইসলামি বিশ্বের “সওয়াদে আযম” আহলে সুন্নাতই ছিল।

শিয়াদের অনুপাত কিছুটা বেড়ে যাওয়ার একটি কারণ এটিও ছিল যে, মধ্য এশিয়া থেকে সিরিয়া পর্যন্ত তাতারীরা বেশিরভাগ সুন্নি জনপদগুলোকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছিল, কারণ তারাই তাতারীদের বিরুদ্ধে জিহাদে অগ্রণী ছিল। অন্যদিকে শিয়ারা সাধারণত তাতারীদের পক্ষ নিয়েছিল অথবা নিরপেক্ষ ছিল, তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের শহর বা জনপদগুলোতে হস্তক্ষেপ করা হয়নি [৩] এবং কিছু ক্ষেত্রে সুন্নি...

[১] আদ-দুরারুল কামিনাহ ফি আয়ানিল মায়াতিস সামিনাহ, ইবনে হাজার আসকালানী: ৩/ ২১৩, দাক্ষিণাত্য সংস্করণ।

ফায়দা: ইমাম যাইনুদ্দিন বাদভী কয়েক বছর পর দামেস্কে চলে আসেন, কিন্তু এখানেও হিংসুকরা তাঁর পিছু ছাড়েনি, যার ফলে তাঁকে দামেস্কের দুর্গে বন্দি করা হয়। সেই সময় ইমাম ইবনে তাইমিয়াও সেখানে বন্দি ছিলেন। ইমাম বাদভী তাঁর সাথে কারাগারে কাটানো দিনগুলোর কথা স্মরণ করতেন। তিনি বলতেন যে, ইবনে তাইমিয়া বন্দি অবস্থায় এই কবিতাটি আবৃত্তি করতেন:

لَا تَفْكِرَنَّ وَتَقِي اللَّهَ إِنَّ لَهُ الطَّافَا دَقَّتْ عَنِ الْأَذْهَانِ وَالْقَطَنِ
يَأْتِيكَ مِنْ لُطْفِهِ مَا لَيْسَ تَعْرِفُهُ حَتَّى تَظَنَّ الَّذِي قَدْ كَانَ لَمْ يَكُنْ

“চিন্তা করো না এবং আল্লাহর ওপর ভরসা রাখো, কারণ তাঁর অনুগ্রহ এত সুস্বপ্ন যে মেধা ও বুদ্ধি সেখানে পৌঁছাতে পারে না। তাঁর করুণা এমনভাবে আসে যা তুমি বুঝতে পারো না এবং মনে হয় যেন কখনো কিছুই হয়নি।” (আদ-দুরারুল কামিনাহ: ৩/ ২১৩)

[২] রিহলা ইবনে বতুতা: ৩/ ৩৬, মরক্কো একাডেমি সংস্করণ, রাবাত।

[৩] তারিখুল ইসলাম, আয-যাহাবী: ৩৩/ ৫০, তাদমুরী সংস্করণ।

শহরগুলোতেও তাদের গণহত্য থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। [১] তাই যখন এই হত্যা ও লুণ্ঠনের তুফান থামল, তখন স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম বিশ্বে শিয়া ও সুন্নি জনসংখ্যার অনুপাত আগের মতো ছিল না। [২]

নওমুসলিম ইলখানি এবং মামলুক শাসকদের দ্বন্দ্ব..... একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

এখানে এই বিষয়টি লক্ষ্য রাখা উচিত যে, ইরান ও ইরাকে শিয়া-সুন্নি বিরোধ এবং উভয় পক্ষের প্রচারণামূলক প্রচেষ্টার কারণে ইলখানি রাজপুত্ররা ইসলামের সঠিক মানহাজ ও মেজাজ সম্পর্কে দীর্ঘকাল ধরে বুদ্ধিবৃত্তিক বিভ্রান্তির শিকার ছিলেন। এই মানসিক অস্থিরতার কারণে তারা কয়েক দশক ধরে ইসলামি শরিয়তের সাথে পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ হতে পারেননি এবং বাকি ইসলামি দেশগুলোর সাথে তাদের সম্পর্ক তিক্তই ছিল। তাদের বিপরীতে সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল মামলুক সুলতানদের, যারা ছিলেন খাঁটি আহলে সুন্নাত এবং ওই যুগে ইসলামের ভৌগোলিক ও আদর্শিক সীমানা রক্ষা করছিলেন। যেহেতু ইলখানিদের সামরিক অভিযানের ফলে সুন্নি মামলুকরা সবসময় ক্ষতিগ্রস্ত হতো, তাই শিয়া লেখকদের পূর্ণ সমর্থন ইলখানিদের সাথেই ছিল এবং এই কারণেই ফারসি ইতিহাস গ্রন্থগুলো গাজান এবং মুহাম্মদ খুদাবান্দার প্রশংসা ও স্তুতি এবং মামলুকদের সমালোচনায় ভরপুর। যেহেতু গত শতাব্দীর অনেক উর্দু ইতিহাসবিদ তাতারীদের অবস্থার জন্য ফারসি উৎসগুলো ব্যবহার করেছেন, তাই নওমুসলিম তাতারী এবং মামলুকদের দ্বন্দ্ব তারা তাতারীদের সঠিক হওয়ার ধারণা দিয়েছেন, অথচ এটি বাস্তবতার পরিপন্থী।

যদি আরবি উৎসগুলোতে বর্ণিত হাফেজ ইবনে কাসির, হাফেজ জাহাবি, আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি এবং মাকরিজি রহ. এর মতো মহান ইসলামি আলেমদের মতামত সামনে রাখা হয়, তবে এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে নওমুসলিম তাতারীদের তুলনায় মামলুক সুলতান এবং দিল্লির শাহানশাহদের অস্তিত্ব ছিল একটি নেয়ামত। তাতারীরা তখন পর্যন্ত ইসলামের সাথে পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ হতে পারেনি। তারা যদি মামলুক বা দিল্লির সুলতানদের ওপর বিজয়ী হতো, তবে ইসলামের সঠিক রূপ ও কাঠামোর অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ত।

[১] যেমন বাগদাদের পতন এর একটি স্পষ্ট উদাহরণ।

[২] যদি কিছু ক্ষেত্রে শিয়া সাধারণ জনগণও গণহত্যার শিকার হয়ে থাকে (যেমন বাগদাদের পতনের সময় তাতারীদের পক্ষ থেকে শিয়া মহল্লাগুলো রক্ষার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও সুন্নি জনবসতির সাথে মিশে থাকা হাজার হাজার শিয়া নিহত হয়েছিল), তবে তা আমাদের দাবির পরিপন্থী নয়। একইভাবে যদি কিছু শিয়া আমাদের কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাতারীদের বিরুদ্ধে জিহাদে সুন্নিদের সাথে শরিক হয়ে থাকেন, তবে তাও অসম্ভব নয়। যাই হোক, জিহাদে আহলে সুন্নাতই অগ্রগণ্য ছিল এবং তারাই বেশি তাতারীদের লুণ্ঠনের লক্ষ্যবস্তু হয়েছিল এবং লাখ লাখ সংখ্যায় শহীদ হয়েছিল, যেখানে শিয়াদের এই ধ্বংসযজ্ঞে খুব কম জানমালের ক্ষতি সহ্য করতে হয়েছিল। হ্যাঁ, তাদের ডজন ডজন মাজার অবশ্যই ধ্বংস হয়েছিল কারণ এ বিষয়ে তাতারীরা শিয়া-সুন্নির পার্থক্য করেনি।

চাগতাই সালতানাতে ইসলামের প্রসার

চেঙ্গিস খানের পুত্র চাগতাই খানের সালতানাত মঙ্গোলিয়া খাগানাত, ইলখানি এবং উর্দুয়ে জরিন (গোল্ডেন হোর্ড)-এর মাঝখানে অবস্থিত ছিল এবং এই দেশগুলোকে একে অপরের সাথে সংযুক্ত করত। এটি চীনা তুর্কিস্তান এবং পামির মালভূমি থেকে শুরু করে মধ্য এশিয়া ও খোরাসান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। চাগতাই খানের মৃত্যুর কিছুকাল পর সালতানাত তার নাতি ও প্রপৌত্রদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। চাগতাই খান মুসলমানদের ঘোর শত্রু ছিল। সে তাদের বিভিন্নভাবে নির্যাতনের লক্ষ্যবস্তু বানানোকে অভ্যাসে পরিণত করেছিল। কাজী মিনহাজুস সিরাজ জুজজানি (রহ.) লিখেন:

“চাগতাইয়ের মেজাজে মুসলিম বিদ্বেষ এতটাই বদ্ধমূল ছিল যে, সে মুসলমানদের রক্ত ঝরাত এবং কাউকে জীবিত ছাড়ত না। চেঙ্গিস খানের প্রবর্তিত বিধানগুলো সে কার্যকর করে রেখেছিল, যেমন চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যাচার এবং বিশ্বাসঘাতকতার জন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতো। কারো গলায় লোকমা আটকে গেলে তাকে হত্যা করা হতো। ছোট বা বড় কোনো ব্যক্তি পানিতে পড়ে গেলে তাকে হত্যা করা হতো। যে কেউ নদীর তীরে বসে মুখ-হাত ধোত করত (অজু করত), তাকেও হত্যা করা হতো। সামান্য ভুলের জন্য মানুষকে সম্পূর্ণ নগ্ন করে তিন, পাঁচ বা দশটি লাঠির প্রচণ্ড আঘাত করা হতো। এই বিধানগুলোর সমষ্টিকে ‘ইয়াসা’ বলা হতো।” [১]

তিনি আরও লিখেন:

“চাগতাই সর্বদা মুসলমানদের কষ্ট দেওয়ার চিন্তায় মগ্ন থাকত এবং এমন সব উপায় তৈরি করত যাতে মুসলমানরা বিপদ ও কষ্টের শিকার হয় এবং অবশিষ্ট মুসলমানদের মূলোৎপাটন হয়ে যায় এবং কোথাও মুসলমানদের কোনো চিহ্ন না থাকে। সে এই ফিতনা ছড়ানোর চেষ্টা চালিয়ে যেত। সে মঙ্গোল আমির ও কর্মকর্তাদের বাধ্য করেছিল যেন তারা মুসলমানদের সাথে এমন আচরণ ও কথা বলে যা খাকান ও ওকতাই পর্যন্ত পৌঁছায় এবং তাদের জন্য ধ্বংস ও নির্মূলের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।” [২]

অন্য স্থানে তিনি লিখেন:

“চাগতাই ছিল একজন জালেম ও দুশ্চরিত্র মানুষ। চেঙ্গিস খানের সন্তানদের মধ্যে তার চেয়ে বড় মুসলমানদের শত্রু আর কেউ ছিল না। সে চাইত না যে কোনো ব্যক্তি মুসলমানদের কথা উল্লেখ করুক। তার এলাকায় এমন কোনো সম্ভাবনা ছিল না যে কোনো মুসলমান সুন্নাহ অনুযায়ী বকরি জবাই করবে বা সালাত আদায় করতে পারবে। সে ওকতাইয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট থেকে তাকে প্ররোচিত করত যেন মুসলমানদের হত্যা করা হয়। কোনো মুসলমান তার সামনে আসতে পারত না।” [৩]

[১] তবাকাত-ই-নাসিরি, মিনহাজুস সিরাজ জুজজানি: ২/১৫২, কাবুল সংস্করণ।

[২] তবাকাত-ই-নাসিরি: ২/১৫৩, কাবুল সংস্করণ।

[৩] তবাকাত-ই-নাসিরি: ২/১৬৭, কাবুল সংস্করণ।

চাগাতাই সালতানাতের শাসকদের মধ্যে ইসলাম প্রসারে বিলম্ব কেন হয়েছিল?

চাগাতাই এবং তার উত্তরাধিকারীদের কঠোরতার কারণে তাদের সালতানাতে মুসলমানরা অত্যন্ত দমিত অবস্থায় ছিল। এই সময়ে এখানে যদি কোনো অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করত, তবে তাকেও বড় ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো।

চাগাতাই সালতানাতের পুরো এলাকাটি ছিল মুসলমানদের। এখানকার জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল মুসলিম। তাতার আক্রমণের পূর্বে এই এলাকাগুলো মুসলিম আলেম, ফকিহ, মুহাদিস ও সুফিদের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল; পদে পদে মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকাহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সালতানাতের দক্ষিণ ও পশ্চিমেও সমস্ত শহর ছিল মুসলমানদের। তা সত্ত্বেও এখানে দখলদার তাতারদের মধ্যে ইসলামের সূর্য তুলনামূলক দেরিতে উদিত হয়েছিল। এর একটি কারণ ছিল খোদ এখানকার তাতার শাসকদের কঠোর মনোভাব।

দ্বিতীয় কারণটি ছিল এই যে, মঙ্গোলিয়া খানাত, ইলখানি এবং গোল্ডেন হোর্ড (উর্দুয়ে জরিন)-এর শাসকরা এই সালতানাতের ভৌগোলিক গুরুত্বের কারণে এর কোনো না কোনো অংশকে নিজেদের সালতানাতের সাথে একীভূত করার চেষ্টা চালিয়ে যেত। তাই এখানকার শাসকরা সবসময় তাদের স্বজাতীয়দের সাথে উত্তেজনার শিকার থাকতেন এবং এখানে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হতে পারত না। এই কারণেই অষ্টম হিজরি শতাব্দীতে যখন তাতার ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হওয়া সমস্ত শহর নতুন করে আবাদ হয়ে গিয়েছিল, মধ্য এশিয়ার অধিকাংশ শহর তখনও ধ্বংসপ্রাপ্ত ছিল এবং সেখানে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডও ছিল অত্যন্ত কম। সমরকন্দ, বুখারা এবং তিরমিজের মতো শহরগুলো যা একসময় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও অর্থনীতির কেন্দ্র ছিল, সেগুলো ছোট জনপদের পর্যায়ে রয়ে গিয়েছিল। সেগুলোর কোনো প্রাচীর ছিল না, ছিল না কোনো দুর্গ। অধিকাংশ মসজিদ ছিল বিধ্বস্ত এবং বাজারগুলো ছিল জনশূন্য। যেখানে আলেম ও গুণীজনদের জয়জয়কার ছিল, সেখানে হাতেগোনা কয়েকজন আলেমকে দেখা যেত।

[১]

এই পরিস্থিতিতে এখানকার ইসলামের দাঈগণ শাহজাদা ও শাসকদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর কাজ স্থগিত রাখেন এবং প্রথমে সাধারণ তাতারদের ইসলাম দ্বারা প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন। এই কাজটি মূলত খানকাহগুলোর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছিল, যার মধ্যে বুখারার শেখ সাইফউদ্দিন বাখারজি (রহ.)-এর খানকাহ কেন্দ্রীয় গুরুত্বের অধিকারী ছিল, যা চাগাতাই সালতানাতে সাধারণ তাতারদের ইসলামের নিকটবর্তী করতে থাকে; অন্যদিকে এই একই খানকাহ সেই সময়ে গোল্ডেন হোর্ড-এর শাহজাদাদেরও প্রভাবিত করেছিল। [২]

তাতারদের পক্ষ থেকে মধ্য এশিয়ার প্রশাসনিক কাজে যেসব মুসলিম উজিরদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল, তারাও এখানে ইসলামের পুনর্জাগরণের জন্য সতর্ক ও ধীরস্থিরভাবে বিভিন্ন কাজ আঞ্জাম দিয়েছিলেন, যার মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত শহর ও মসজিদগুলোর পুনর্নির্মাণের কাজও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই উজিরদের মধ্যে মাহমুদ ইয়ালভাচ, কুতুবউদ্দিন হাবাশ উমিদ এবং খাজা বাহাউদ্দিন মারঘিনানি উল্লেখযোগ্য। [৩]

চাগাতাই বংশের প্রথম মুসলিম শাসক:

চাগাতাইদের প্রথম শাসক যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তিনি ছিলেন চাগাতাই খানের নাতি মুবারক শাহ বিন কারাহলাকু, যিনি ৬৬৪ হিজরি (১২৬৬ খ্রিষ্টাব্দে)...

[১] ইনতিশারুল ইসলাম বাইনাল মুগুলা, পৃ. ২২৮, ২২৯; রিহলাতু ইবনে বতুতা: ৩/ ২২০, ২২১, ৩০, ৩৫, ত. একাডেমিয়া আল-মাগরিবিয়া

[২] সিয়াকু আলামিন নুবালা: ২৩/ ৩৬৩ থেকে ৩৬৯, ত. আর-রিসালাহ

[৩] ইনতিশারুল ইসলাম বাইনাল মুগুলা, পৃ. ২৩২

ক্ষমতায় আসে। বলা হয় যে তার মা ‘আরগানা’ মুসলিম ছিলেন এবং তারই প্রভাবে মুবারক শাহ মুসলিম হন। [১]

বুররাক খান গিয়াসউদ্দিন:

কিন্তু তার শাসনকাল স্থায়িত্ব লাভ করেনি এবং কিছুকাল পরেই তার চাচাতো ভাই বুররাক খান, যে অমুসলিম ছিল, তার থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়। তবে ইসলামের অগ্রযাত্রা শুরু হয়ে গিয়েছিল, ফলে বাদশাহ হওয়ার কিছুকাল পরে বুররাক খানও ইসলাম গ্রহণ করেন। তার ইসলামি নাম রাখা হয় গিয়াসউদ্দিন। তার এক ভাই আহমদ ওগুলও মুসলিম ছিলেন। যা-ই হোক, বুররাক ইসলাম প্রচারের সুযোগ পাননি। তার অধিকাংশ সময় তার ঘোর শত্রু হালাকু খানের পুত্র আবাকা খানের সাথে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অতিবাহিত হয়। বুররাক খান ৬৬৪ হিজরি থেকে ৬৬৮ হিজরি পর্যন্ত শাসন করেন। [২]

তালিকুয়া:

এরপর তার পুত্র দুওয়া খান বাদশাহ হন, কিন্তু শীঘ্রই সালতানাত শাহজাদাদের গৃহযুদ্ধের চারণভূমিতে পরিণত হয়। এই শাহজাদাদের ধর্ম সম্পর্কে ইতিহাস নীরব যে, তাদের মধ্যে কে কে মুসলিম ছিলেন আর কে কে অমুসলিম। তবে এই দ্বন্দ্ব রাজনৈতিক হওয়ার পাশাপাশি ধর্মীয় দিকও ছিল এবং ধারণা করা হয় যে, তাদের মধ্যে অধিকাংশ যেখানে পৈতৃক ধর্মের অনুসারী ছিলেন, সেখানে কিছু মুসলিমও ছিলেন। ৭০৮ হিজরিতে ‘তালিকুয়া বিন কাদামি’ ক্ষমতা লাভ করেন যাকে মুসলিম বাদশাহ হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনিও ক্ষমতার জন্য বেশি সময় পাননি এবং ৭০৯ হিজরিতে তাকে হত্যা করা হয়। গৃহযুদ্ধ এর পরেও অব্যাহত থাকে। [৩]

এসান বুকা:

এখন সিংহাসনে একজন মূর্তিপূজক শাহজাদা এসান বুকা (বিন দুওয়া বিন বুররাক) অধিষ্ঠিত হন, যিনি ৭১৮ হিজরি পর্যন্ত শাসন করেন। এই সময়ে তার এক ভাই ‘ইয়াসাওয়ার’ মুসলিম হয়ে যান এবং দুই ভাইয়ের মধ্যে চরম উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। অবশেষে ইয়াসাওয়ার পালিয়ে পারস্যের এক মোগল আমিরের কাছে চলে যান, যিনি তাকে সাহায্য করেন এবং ইয়াসাওয়ার ৭১৬ হিজরিতে এসান বুকাকে এক যুদ্ধে পরাজিত করেন। তবে তিনি এসান বুকাকে থেকে সিংহাসন ছিনিয়ে নিতে পারেননি। [৪]

কেবেক খান:

এসান বুকাকার পর ৭১৮ হিজরিতে এখানে কেবেক খান (বিন দুওয়া খান বিন বুররাক খান)-এর শাসন আসে যা আট বছর পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। এর আগে মধ্য এশিয়ার চাগতাই শাসকরা চীনা তুর্কিস্তানের শহর ‘মালিক’ (বালিগ)-এ অবস্থান করে তাদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসন পরিচালনা করতেন। কেবেক খান তাদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখার জন্য খোরাসানের নাখশব শহরের কাছে একটি নতুন শহর ‘কারশি’ আবাদ করে সেটিকে রাজধানী ঘোষণা করেন। তিনি প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে ইরান ও ইরাকের মুসলিম সভ্যতার অনুসরণ করেন।

[১] ইনতিশারুল ইসলাম বাইনাল মোগল, পৃ. ২৩৩

[২] ইনতিশারুল ইসলাম বাইনাল মোগল, পৃ. ২৩৩, ২৩৪

[৩] ইনতিশারুল ইসলাম বাইনাল মোগল, পৃ. ২৩৩

[৪] ইনতিশারুল ইসলাম বাইনাল মোগল, পৃ. ২৩৫

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

চতুর্থ খণ্ড

...এবং মুসলিম কর্মকর্তা ও বিদ্বানদের কাজে লাগালেন। রাজধানীতে একটি মসজিদও ছিল এবং কবক খানের ওসিয়ত ছিল যে, তাকে যেন এই মসজিদের ছায়ায় দাফন করা হয়। এতে বোঝা যায় যে, এই খান গোপনে মুসলমান হয়েছিলেন, কিন্তু জাতির বিদ্রোহের ভয়ে নিজের ইসলামকে গোপন রেখেছিলেন। ৭২৬ হিজরিতে কবক খানের মৃত্যু হয়। [১]

তারমা শিরিন খান:

কবক খানের আশঙ্কা সঠিক ছিল, কারণ চাগতাই মোগলরা তখনও কুফরির দিকে ঝুঁকে ছিল। এজন্য কবকের মৃত্যুর পর তারা শাসনভার তার অমুসলিম ভাই ইলচিকদাই-এর হাতে তুলে দেয়, যে মুসলিম কর্মকর্তাদের বরখাস্ত করা শুরু করে। কিন্তু অল্প সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তার ভাই তারমা শিরিন খান তার কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেন।

তিনি ৭২৬ হিজরিতে মধ্য এশিয়ার শাসক হন। ইসলামের নামহীন দাঈদের প্রচেষ্টায় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু নিজের ইসলামকে গোপন রেখেছিলেন। সিংহাসনে আরোহণের কিছুদিন পর তিনি মাওলানা হুসামুদ্দিন ইয়্যাগি এবং শেখ হাসান নামক দুই বুজুর্গের হাতে মুসলমান হওয়ার ঘোষণা দেন এবং নিজের নাম আলাউদ্দিন তারমা শিরিন রাখেন। তিনি সালাতের পাবন্দ হয়ে যান এবং শরিয়তে ইসলামিয়া বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করতে শুরু করেন। সে যুগের উলামায়ে কেরাম তাকে ন্যায়পরায়ণ, পবিত্র এবং দ্বীনদারদের প্রতি ভালোবাসা পোষণকারী হিসেবে গণ্য করতেন। চাগতাই সালতানাতে তারমা শিরিনের স্থান ঠিক তেমনই, যেমন ইলখানি সালতানাতে গাজান এবং গোন্ডেন হোর্ড-এ বারকা খানের ছিল। তার যুগে মধ্য এশিয়ার মোগলদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মুসলমান হয়ে যায়, যাতে তারমা শিরিনকে সহযোগিতা করা উলামা ও মাশায়েখদের বড় ভূমিকা ছিল। তারমা শিরিন বুখারাকে নিজের রাজধানী বানান এবং সালতানাতে দরজা ব্যবসায়ীদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়ে একে মুসলিম বিশ্বের সাথে সংযুক্ত করে দেন। ফলে মিশরসহ সমস্ত দেশ থেকে বাণিজ্যিক কাফেলা মধ্য এশিয়ায় আসা-যাওয়া শুরু করে।

কিন্তু তারমা শিরিনের এই নীতিগুলো অমুসলিম মোগল শাহজাদাদের পছন্দ হয়নি এবং তারা তারমাকে চেঙ্গিসী আইনের বিরোধী ঘোষণা করে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করে। যার মধ্যে একটি ছিল এই যে, তিনি মোগলদের সেই প্রথা ত্যাগ করেছেন যার অনুযায়ী প্রতি বছর সমস্ত আমির একত্রিত হয়ে বাদশাহর কর্মকাণ্ডকে ‘ইয়াসা আইন’ অনুযায়ী যাচাই করে এবং যদি তিনি একাধিকবার আইন লঙ্ঘন করে থাকেন তবে তাকে পদচ্যুত করা হয়। এই আপত্তিও ছিল যে, তিনি চাগতাই সালতানাতে মূল কেন্দ্র ছেড়ে বুখারায় কেন অবস্থান করছেন? অবশেষে পরিস্থিতি তারমা শিরিনের প্রতিকূলে চলে যায় এবং বিদ্রোহী গোষ্ঠী তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ৭৩৪ হিজরিতে তাকে পদচ্যুত করে। [২]

জাকাশাই এবং ইসলাম বিদ্বেষ:

বিদ্রোহীরা তারমা শিরিনের ভতিজা জাকাশাইকে শাসক বানিয়ে দেয়, যে ছিল বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। জাকাশাইয়ের যুগে ‘মালিক’...

[১] ইনতিশারুল ইসলাম বাইনাল মোগল, পৃষ্ঠা ২৩৫, ২৩৬

[২] ইনতিশারুল ইসলাম বাইনাল মোগল, পৃষ্ঠা ২৩৬ থেকে ২৩৮

...কে পুনরায় রাজধানী বানানো হলো। বৌদ্ধ ধর্মগুরুদের পাশাপাশি পাদ্রিরাও বেশ সক্রিয় হয়ে উঠল এবং নিজেদের আকিদা-বিশ্বাসের ব্যাপক প্রচার শুরু করল। ইউরোপে যখন এই আলোচনা ছড়িয়ে পড়ল, তখন সেখান থেকে পাদ্রিদের প্রতিনিধি দল আসতে শুরু করল, যাদেরকে রাজধানীতে ক্যাথলিক চার্চ নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হলো। [১]

বোজোন উগলি:

জকশাইয়ের শাসনকাল দীর্ঘস্থায়ী হয়নি এবং খুব শীঘ্রই তরমশিরিন খানের আরেক পুত্র বোজোন উগলি ৭৩৫ হিজরিতে ক্ষমতা দখল করেন [২], যার সম্পর্কে ইবনে বতুতার বক্তব্য হলো: “সে মুসলিম ছিল কিন্তু সে দীন থেকে দূরে এবং দুশ্চরিত্র ছিল।” [৩] সেই সময় ইসলামের দাওয়াতের বিপরীতে বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানদের উস্কানি সাম্রাজ্যকে এক অদ্ভুত সংঘাতের মুখোমুখি করে রেখেছিল। বোজোন অমুসলিমদের সাথে নিয়ে চলার চেষ্টা করেন এবং সেই খাতিরে তিনি ইহুদি ও খ্রিস্টানসহ সকল অমুসলিমকে নতুন উপাসনালয় নির্মাণের অনুমতি দেন, অথচ মুসলমানদের পূর্ববর্তী সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হতে থাকে। এই পরিস্থিতি মুসলমানদের উদ্দিগ্ন করে তোলে, যার ফলে ৭৪০ হিজরিতে রাজধানী মালিকে এক হাঙ্গামা সৃষ্টি হয়। জনতা একজন পাদ্রি, তার পাঁচ সঙ্গী এবং ইতালি থেকে আসা একজন বণিককে হত্যা করে। সরকার আতঙ্কিত হয়ে কারো বিরুদ্ধে কোনো মামলা করেনি। এরপর অমুসলিমরা মুসলমানদের আরও দমানো থেকে বিরত থাকে। [৪]

সুলতান খলিল:

কিছুকাল পর একজন মোগল শাহজাদা খলিল বিন আলিসুর (বিন দাওয়া বিন বারাক)-এর আবির্ভাব ঘটে। ঐতিহাসিকগণ খলিলকে একজন আবেদ, জাহিদ এবং সুফি শাসক হিসেবে স্মরণ করেছেন। শাহজাদা খলিলের দীনদারির কারণে মোগলসহ সাধারণ মুসলিম জনগণ তার চারপাশে সমবেত হতে থাকে। গজনির শাসক হুসাইন বিন সুলতান গিয়াসউদ্দিন তার জন্য একটি সাহায্যকারী বাহিনী পাঠান। তিরমিষের হাশেমি বংশোদ্ভূত প্রধান সৈয়দ আলাউল মুলক খুদাওয়ান্দ জাদা চার হাজার সৈন্য নিয়ে নিজে শাহজাদা খলিলের কাছে এসে পৌঁছান। এই শক্তি নিয়ে শাহজাদা খলিল বোজোনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। বোজোনের কাছে ৮০ হাজার সৈন্য ছিল কিন্তু চূড়ান্ত মুহূর্তে এই সৈন্যরা খলিলের পক্ষ নেয়। তারা বোজোনকে গ্রেপ্তার করে খলিলের হাতে সোপর্দ করে। এই বিস্ময়কর দৃশ্য প্রকাশ করছিল যে, অভ্যন্তরীণভাবে চাগতাই সাম্রাজ্যের অধিকাংশ মোগল সৈন্য ইসলাম গ্রহণ করেছে।

খলিল বোজোনকে হত্যা করেন এবং মাওরাউনহরকে কেন্দ্র ঘোষণা করে ৭৪৩ হিজরিতে চাগতাই সাম্রাজ্যের মসনদে আরোহণ করেন। তিনি তার শক্তিকে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য ব্যবহার করেন। একদিকে তিনি মধ্য এশিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় এলাকায় বসবাসরত বৌদ্ধদের পদানত করেন, অন্যদিকে তিনি তার পূর্বপুরুষদের প্রাচীন রাজধানী মালিক (বালিগ) পর্যন্ত পৌঁছে যান, যা বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী...

[১] ইনতিশারুল ইসলাম বাইনাল মোগল, পৃ. ২৩৮, ২৩৯

[২] ইনতিশারুল ইসলাম বাইনাল মোগল, পৃ. ২৩৯

[৩] রিহলা ইবনে বতুতা: ৩/৩০৩, তবা আকাদেমিয়া আল-মাগরিবিয়া আর-রিবাত

[৪] ইনতিশারুল ইসলাম বাইনাল মোগল, পৃ. ২৩৯

তারিখ উন্মতে মুসলিমা — চতুর্থ খণ্ড

এটি ছিল মঙ্গোলদের দুর্গ। এটি জয় করার পর তিনি মঙ্গোলিয়ার দিকে অভিযান চালান এবং খানাত-এ-মঙ্গোলিয়াকে ভীত-সম্ভ্রান্ত করে তাদের কাছ থেকে সন্ধির অঙ্গীকার নেওয়ার পর ফিরে আসেন। ফেরার পথে তিনি মালিকে সৈয়দ আলাউল মুলক খাওয়ান্দজাদাকে গভর্নর নিযুক্ত করেন যাতে মূর্তিপূজারী মঙ্গোলরা বিদ্রোহ করতে না পারে। এই সমস্ত অভিযান মাত্র দেড় বছরে সম্পন্ন হয়েছিল। এভাবে সুলতান খলিল চাগতাইদের বিক্ষিপ্ত সালতানাতকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি বিশাল ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তিনি সালতানাতকে সুসংহত করার সুযোগ পাননি এবং সিংহাসনে আরোহণের দুই বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। [১]

সুলতান খলিল ইসলামী ইতিহাসের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন। আফসোস যে তাঁর সমসাময়িকরা তাঁর কোনো জীবনী লেখেননি এবং তাঁর শাসনকালও ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। যদি তিনি আরও পনেরো বছর সময় পেতেন, তবে সম্ভবত তিনি সুলতান সালাহউদ্দিন এবং মাহমুদ গজনভীর সমকক্ষ প্রমাণিত হতেন। নকশবন্দী সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতা খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দী (৭১৮ হি. থেকে ৭৯৩ হি.)-এর সুলতান খলিলের সাথে গভীর সম্পর্ক ছিল। সুলতানের মৃত্যুর পর তিনি অত্যন্ত শোকাহত ও ব্যথিত হয়ে দুনিয়া ত্যাগ করেন এবং নিজের জীবন তাসাউউফের জন্য উৎসর্গ করেন। [২]

তুঘলক তৈমুরের যুগ:

৭৪৪ হিজরিতে সুলতান খলিলের মৃত্যুর পর চাগতাই সালতানাত আবারও ছোট ছোট টুকরোয় বিভক্ত হয়ে যায়। মুসলিম ও অমুসলিম মঙ্গোল শাহজাদারা আলাদা আলাদা রাষ্ট্র কায়েম করে। এই পরিস্থিতির পরিবর্তনকারী ব্যক্তি ছিলেন দাওয়া খান বিন বারাক খানের নাতি শাহজাদা তুঘলক তৈমুর, যিনি অমুসলিম ছিলেন এবং কাশগড় শাসন করতেন। তিনি ছিলেন একজন উচ্চাভিলাষী মানুষ এবং চাগতাই খানের উত্তরাধিকারের অন্যান্য দাবিদারদের পরাজিত করে সালতানাতকে তার পূর্বের সীমানায় ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি বিরোধীদের পরাজিত করার আগেই একজন বিজয়ী তাঁর হৃদয় জয় করে নিয়েছিলেন। [৩]

শেখ জামালউদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি এবং তুঘলক তৈমুর:

শেখ জামালউদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি বুখারার একজন ফেরেশতা তুল্য বুজুর্গ ছিলেন। একবার তিনি তাঁর কয়েকজন সঙ্গীর সাথে সফর করার সময় কাশগড়ের সেই এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলেন যা তুঘলক তৈমুরের পূর্বপুরুষদের শিকারগাহ হিসেবে সংরক্ষিত ছিল এবং সেখানে কোনো সাধারণ ব্যক্তির প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। শেখ জামালউদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি এবং তাঁর সঙ্গীরা অনবধানতাবশত নিষিদ্ধ সীমানায় প্রবেশ করলে সৈন্যরা তাঁদের সঙ্গীদেরসহ গ্রেফতার করে। আল্লাহর কুদরত যে সেই সময় তুঘলক তৈমুর নিজে শিকার করার উদ্দেশ্যে তাঁর ভৃত্য ও শিকারি কুকুরদের সাথে শিকারগাহে উপস্থিত ছিলেন। সৈন্যরা শাহজাদাকে এই অপরিচিত ব্যক্তিদের গ্রেফতারের খবর দিলে শাহজাদা তাঁদের নিজের কাছে তলব করেন। শেখ জামালউদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি এবং তাঁর সঙ্গীদের হাত বেঁধে তুঘলক তৈমুরের সামনে পেশ করা হলো। সে অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল: “তোমরা কারা এবং আমাদের জমিতে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করার সাহস তোমাদের কীভাবে হলো?”

[১] ইনতিশারুল ইসলাম বাইনাল মুগ্‌ল, পৃ. ২৩৯ থেকে ২৪১।

[২] দাওয়াতে ইসলাম, পৃ. ২৩৫; ইনতিশারুল ইসলাম বাইনাল মুগ্‌ল, পৃ. ২৪১।

[৩] ইনতিশারুল ইসলাম বাইনাল মুগ্‌ল, পৃ. ২৪০।

শেখ জামাল উদ্দিন রহ. উত্তর দিলেন:

“আমরা এই ভূখণ্ডে আগন্তুক, আমাদের মোটেও জানা ছিল না যে আমরা নিষিদ্ধ এলাকায় চলছি।”

শাহজাদা তার শিকারি কুকুরের দিকে ইশারা করে অবজ্ঞার সুরে শেখকে জিজ্ঞেস করল:

“বলো তো, তুমি উত্তম নাকি আমার কুকুর?”

শেখ জামাল উদ্দিন রহ. অত্যন্ত গাভীর ও নম্রতার সাথে উত্তর দিলেন: “জনাব! যদি আমি দুনিয়া থেকে ইমানের সাথে বিদায় নিতে পারি তবে আমিই উত্তম হবো, আর যদি আল্লাহ না করুন আমার মৃত্যু ইমানের ওপর না হয়, তবে এই কুকুরটিই আমার চেয়ে উত্তম হবে।”

আন্তরিকতা, শুভকামনা এবং হৃদয়ের গভীর থেকে উচ্চারিত এই শব্দগুলো শাহজাদার আত্মাকে নাড়িয়ে দিল এবং সে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠল যে, আসলে ইমান কী জিনিস যার অভাবে মানুষ কুকুরের চেয়েও অধম হয়ে যায়? সে তার সৈন্যদের বলল যে, যখন আমি শিকার থেকে ফিরব তখন এই বুজুর্গকে আমার কাছে নিয়ে আসবে।

শিকারের পর তুঘলক তৈমুর নির্জনে শেখ জামাল উদ্দিন রহ.-এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং তার কাছে ‘ইমান’-এর হাকিকত স্পষ্ট করার অনুরোধ করলেন। শেখ জামাল উদ্দিন রহ. অত্যন্ত চমৎকার শৈলীতে তাকে ইমানের হাকিকত বোঝালেন, ইসলামের সৌন্দর্য সম্পর্কে অবহিত করলেন এবং আল্লাহ তাআলার তাওহিদ, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সা.-এর রিসালাত ও কুরআন কারিমের সত্যতার এমন হৃদয়গ্রাহী দলিল পেশ করলেন যে শাহজাদার অন্তর এই সত্যগুলোর সামনে নত হয়ে গেল।

যখন শেখ কুফরের অসারতা, এর অপকারিতা এবং এর পরিণামে দুনিয়া ও আখিরাতের ধ্বংসের চিত্র তুলে ধরলেন, তখন শাহজাদা তার অতীত জীবনের ওপর অত্যন্ত লজ্জিত হলেন। সত্য তো এই যে, তুঘলক তৈমুরের অন্তর তখনই মুমিন হয়ে গিয়েছিল কিন্তু সে শেখের সামনে নিজের কিছু সীমাবদ্ধতা প্রকাশ করল এবং বলল: “যদি আমি এখনই মুসলমান হওয়ার ঘোষণা দিই তবে আমার প্রজাদের সঠিক পথে আনা অসম্ভব হবে। আপনি কিছু সময়ের জন্য নীরবে ফিরে যান এবং যখন আমি আমার বাপ-দাদার অধীনে তাজ ও তখতের মালিক হবো তখন আপনি আমার কাছে আসবেন।”

শেখ জামাল উদ্দিন রহ. নিজ দেশে ফিরে গেলেন এবং তুঘলক তৈমুর সাম্রাজ্য বিস্তারে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এদিকে শেখ জামাল উদ্দিন রহ. এক মরণব্যাধিতে আক্রান্ত হলেন। যখন মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল, তিনি তার পুত্র শেখ রশিদ উদ্দিনকে ডেকে বললেন: “তুঘলক তৈমুর একদিন বড় বাদশাহ হবে, তুমি সেই সময় তার কাছে যাবে এবং নির্ভয়ে তাকে আমার ইসলাম পৌঁছাবে আর তাকে সেই ওয়াদার কথা মনে করিয়ে দেবে যা সে আমার সাথে করেছিল।” [১]

শেখ রশিদ উদ্দিন তুঘলক তৈমুরের দরবারে:

এদিকে তুঘলক তৈমুর দীর্ঘ কয়েক বছরের যুদ্ধের পর তার বিরোধীদের দমনে সফল হলেন। ৭৪৬ হিজরিতে তিনি চীনা তুর্কিস্তান (সিনকিয়াং)-কে নিজের শাসনাধীনে অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। ৭৪৮ হিজরিতে তিনি মাওরাউননহরও দখল করে নিলেন।

[১] ইনতিশারুল ইসলাম বাইনাল মুঘল, পৃ. ২৩১, ২৩২; দাওয়াতে ইসলাম, পৃ. ২৩৫, ২৩৬।

তারিখ-ই-উম্মতে মুসলিমা

নিজের ছেলেকে সমরকন্দের গভর্নর বানিয়ে দিলেন এবং এক বুদ্ধিমান তরুণ মোগলকে, যে এক পায়ে ল্যাংড়া ছিল, তার উজির নিযুক্ত করে দিলেন। এই তরুণের নাম ছিল তৈমুর এবং পরবর্তীতে সে ‘তৈমুর লঙ’ নামে পরিচিত হয়। [১]

যখন তুঘলক তৈমুর একের পর এক বিজয় অর্জন করে একজন বড় বাদশাহ হয়ে গেলেন, তখন শেখ জামাল উদ্দিন রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ছেলে শেখ রশিদ উদ্দিনের অপেক্ষার অবসান হলো। তিনি দীর্ঘ সফর করে বাদশাহর সাথে দেখা করতে তার লশকরগাহে পৌঁছালেন, কিন্তু কর্মচারীরা তাকে বাদশাহর দরবারে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ দিল না। সব ধরনের চেষ্টা করেও যখন শেখ রশিদ উদ্দিন তুঘলক তৈমুরের সাথে দেখা করতে ব্যর্থ হলেন, তখন একদিন খুব ভোরে তিনি সেই হৃদয়স্পর্শী আওয়াজ তোলার সিদ্ধান্ত নিলেন যা ঘুমন্ত আত্মাকেও জাগিয়ে দেয়। তিনি লশকরগাহের কাছে আজানের সুমধুর ধ্বনি তুললেন। এই হৃদয়স্পর্শী আওয়াজ ভোরের নিস্তব্ধতা ভেঙে তুঘলক তৈমুরের কানে গিয়ে পৌঁছাল। তার চোখ খুলে গেল। সে রাগান্বিত হয়ে সৈন্যদের নির্দেশ দিল যে, ঘুম নষ্টকারী এই ‘বেয়াদব’কে ধরে নিয়ে এসো। তাতারীরা শেখ রশিদ উদ্দিনকে ধরে নিয়ে এল। তুঘলক তৈমুর এই কাজের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি জানানলেন:

“আমার পিতা জামাল উদ্দিন রহমাতুল্লাহি আলাইহি আমাকে আপনার সাথে দেখা করার অসিয়ত করেছিলেন। তিনি ইন্তেকালের আগে আপনাকে সালাম জানিয়েছিলেন। তিনি আমাকে আপনার কাছে সেই ওয়াদার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছেন যা আপনি তার সাথে করেছিলেন।”

এটি শুনে তুঘলক তৈমুর বললেন: “যখন থেকে আমি সিংহাসনে বসেছি, সেই ওয়াদা আমার মনে ছিল। কিন্তু সেই ব্যক্তি আর কখনো আসেনি। যা-ই হোক, আমি তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি।”

এই কথা বলে তিনি তখনই কালিমা তায়্যিবা পাঠ করলেন এবং ইসলামে দীক্ষিত হলেন। [২]

ঈমানি শক্তি এবং পালোয়ানি শক্তির মোকাবিলা:

এরপর তুঘলক তৈমুর চাইলেন যে লশকর বা সেনাবাহিনীর আমিরদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলে তাদের ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হোক। সবার আগে যে আমিরের সাথে কথা বলা হলো তিনি ছিলেন আমির তুলক। যখন তাকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হলো, তখন তিনি কেঁদে ফেললেন এবং বলতে লাগলেন:

“তিন বছর আগে কাশগরের কিছু নেক লোকের তাবলিগের মাধ্যমে আমি ইসলাম গ্রহণ করেছিলাম, কিন্তু আপনার ভয়ে কখনো তা প্রকাশ করতে পারিনি।”

এটি শুনে তুঘলক তৈমুর তুলককে আনন্দের সাথে জড়িয়ে ধরলেন। এরপর অন্যান্য শাহজাদা ও আমিরদের সাথে কথা বলা হলো এবং তারা সবাই ইসলামে দীক্ষিত হলেন। তবে এক মোগল আমির ‘জরাস’ ইসলাম গ্রহণ করার জন্য এই শর্ত রাখল যে, ইসলামের মুবাল্লিগ রশিদ উদ্দিনকে তার গোলামের সাথে কুস্তিতে জিতে দেখাতে হবে। এই গোলাম এমন এক শক্তিশালী পালোয়ান ছিল যে দুই বছরের উট তুলে ফেলত। যা-ই হোক, শেখ রশিদ উদ্দিন এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন এবং বললেন: “যদি আমি তোমার গোলামকে ধরাশায়ী করতে না পারি, তবে আমি তোমাকে মুসলমান হতে বলব না। আর যদি আল্লাহর এটাই ইচ্ছা হয় যে মোগলরা মুসলমান হয়ে যাক, তবে তিনি আমাকে অবশ্যই এই গোলামকে হারিয়ে দেওয়ার শক্তি দান করবেন।”

[১] ইনতিশারুল ইসলাম বাইনাল মুঘল, পৃ. ২৩২

[২] ইনতিশারুল ইসলাম বাইনাল মুঘল, পৃ. ২৩২; দাওয়াতে ইসলাম, পৃ. ২৩৬

তুঘলক তৈমুর এবং অন্যান্য মুসলিম আমিরগণ শেখকে অনেক বুঝিয়েছিলেন যে তিনি যেন মোকাবিলা না করেন, কিন্তু তিনি নিজের সংকল্পে অটল ছিলেন। অবশেষে মোকাবিলা শুরু হওয়ার দৃশ্য দেখার জন্য সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এক বিশাল জনসমাবেশ ঘটেছিল। কাফের গোলাম শেখ রশিদের বুকে এমন এক আঘাত করল যে তিনি বেহঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর যখন জ্ঞান ফিরল, তখন শেখের কদমে মাথা রেখে কালেমা শাহাদাত পাঠ করতে লাগল। চারদিক থেকে আফরিন ও তাহসিনের ধ্বনি উচ্চকিত হলো। সেই সময় এক লক্ষ ষাট হাজার মঙ্গোল তাদের শরীয়ত পরিপন্থী চুল কাটিয়ে ফেলল। [১]

তুঘলক তৈমুরের শাসনকাল ৭৬৫ হিজরি (১৩৬৩ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত ছিল। এই সময়ে এই বাদশাহ অত্যন্ত প্রজ্ঞা ও তৎপরতার সাথে নিজের রাজ্যে ইসলাম প্রচার করেন এবং তাঁর জীবদ্দশাতেই সেই সমস্ত প্রদেশে ইসলামের জয়জয়কার শুরু হয় যা চাগতাই খানের সালতানাত হিসেবে পরিচিত ছিল। এরপর চাগতাই সালতানাতে আর কোনো অমুসলিম শাসক অতিবাহিত হয়নি। [২]

তৈমুর লঙ:

তুঘলক তৈমুরের পর তাঁর সালতানাত ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলে তাঁর সুবাদার তৈমুর লঙ কেবল চাগতাই সালতানাতকেই ঐক্যবদ্ধ করেননি, বরং মঙ্গোলদের সমস্ত ‘খানাত’কে একত্রিত করে একটি বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত করেন।

তৈমুর লঙ ইতিহাসে একজন জালেম শাসক হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছেন। [৩] কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বের এই দিকটি যাই হোক স্মরণীয় যে, তিনি মঙ্গোল দরবারকে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রে পরিণত করেছিলেন। তাঁর সময়ের অত্যন্ত জলীলুল কদর (মর্যাদাবান) ওলামায়ে কেরাম তাঁর সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, যাদের মধ্যে আল্লামা সাদউদ্দীন তাফতাজানি এবং মীর সাইয়েদ শরীফ জুরজানি (রহ.)-এর মতো ব্যক্তিবর্গও ছিলেন। তৈমুর নিজেও একজন আলেম, ফাজিল এবং সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি নিজের আত্মজীবনীও লিখেছেন যা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আত্মজীবনীগুলোর মধ্যে গণ্য করা হয়। তিনি ইসলামের বিভিন্ন ভাষা এবং বিচিত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের ওপর দখল রাখতেন এবং ইলমি আলোচনায় অংশ নিতেন। তিনি অমুসলিম তুর্কি গোত্র এবং মঙ্গোলদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের জন্যও বিশেষ চেষ্টা করেন এবং মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকাহ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও আগ্রহ দেখাতেন। [৪]

[১] ইনতিশারুল ইসলাম বাইনাল মুগোল, পৃ. ২৩২, ২৩৩; দাওয়াতে ইসলাম, পৃ. ২৩৫ থেকে ২৩৭।

[২] ইনতিশারুল ইসলাম বাইনাল মুগোল, পৃ. ২৪১, ২৪৩।

[৩] তৈমুরের অবস্থা উসমানীয় সুলতান এবং দিল্লির সুলতানদের বর্ণনার প্রসঙ্গে আসবে। সেখানেই তাঁর বিজয়, কীর্তি এবং জুলুমের কথাও আলোচিত হবে।

[৪] ইনতিশারুল ইসলাম বাইনাল মুগোল, পৃ. ২৪৩ থেকে ২৪৭।

খানাত মঙ্গোলিয়ায় দাওয়াতে ইসলাম

তাতারদের তিনটি সালতানাত এক শতাব্দীর মধ্যে পুরোপুরি ইসলামের কোলে চলে এসেছিল, কিন্তু ইসলামের দাঈগণ তাদের প্রধান কেন্দ্র চীন জয় করতে পারেননি। এর কারণ স্পষ্ট যে, এই অঞ্চলটি মুসলিম বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল এবং এখানে তবলিগি দলগুলোর আসা সহজ ছিল না। তাছাড়া এই বিশাল ও বিস্তৃত দেশটি নিজের জায়গায় একটি স্বতন্ত্র জগত ছিল, যার প্রতিটি প্রদেশ ছিল একটি দেশের মতো।

চীনে ইসলামের প্রাথমিক পদচিহ্ন:

ইসলাম প্রচারের প্রেক্ষাপটে আমরা চীনকে তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত করতে পারি: প্রথম অঞ্চলটি হলো চীনা তুর্কিস্তান যাকে সিনকিয়াং বলা হয়, যেখানে বেশিরভাগ “উইঘুর” জাতির লোক বসবাস করে এবং এই অঞ্চলটি মধ্য এশীয় রাষ্ট্রগুলোর সাথে সংযুক্ত। এখানে ইসলামের নিদর্শন হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরুর দিকেই প্রকাশ পেয়েছিল। কারণ উমাইয়া খলিফাগণ ইসলামি বিজয়ের পরিধি চীনের সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিলেন। এমতাবস্থায় মধ্য এশিয়া ও পারস্যের মুসলমানদের সাথে চীনা তুর্কিস্তানের মানুষের মেলামেশা ঘটে, যার ফলে স্থানীয় লোকেরাও ইসলামে দীক্ষিত হয়, এমনকি কয়েক শতাব্দীর মধ্যে সেখানে মুসলমানদের বসতি গড়ে ওঠে।

দ্বিতীয় অঞ্চলটি চীনের মহাপ্রাচীরের ওপারে যাকে পূর্ব চীন বলা হয় এবং চীনের অধিকাংশ জনসংখ্যা সেখানেই। এখানে ইসলাম প্রচারের কাজ হিজরি প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে এবং দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরুতে সেই সময়ে শুরু হয় যখন এখানে মুসলিম ব্যবসায়ীদের যাতায়াত শুরু হয় এবং সরকারের পক্ষ থেকে তাদের মসজিদ নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হয় এবং তাদের দাওয়াতের মাধ্যমে আরও মানুষ মুসলমান হতে থাকে। সাধারণত এই লোকেরা বন্দরগুলোর কাছাকাছি বসবাস করত। [১] এটি ছিল তাং রাজবংশের শাসনের যুগ। একজন চীনা ঐতিহাসিক (যার সময়কাল ৭১৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৭৪২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত) তাদের সম্পর্কে লিখেছেন:

“পশ্চিমের অসভ্যদের দলে দলে লোক মধ্য রাজ্যে প্রবেশ করেছে। তারা অন্তত এক হাজার ক্রোশ এবং একশ দেশ থেকে ঝড়ের মতো ধেয়ে এসেছে এবং তাদের পবিত্র গ্রন্থগুলো উপহার হিসেবে নিয়ে এসেছে। এই বইগুলো গ্রহণ করে রাজপ্রাসাদের সেই বিভাগে পাঠানো হয়েছে যেখানে পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থ অনুবাদ করা হয়। ফলে সেই সময় থেকে তাদের আকিদা-বিশ্বাস সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং তাং সাম্রাজ্যে মানুষ প্রকাশ্যে সেগুলো অনুসরণ করতে শুরু করে।” [২]

[১] দাওয়াতে ইসলাম, পৃ. ২৯৩

[২] দাওয়াতে ইসলাম, পৃ. ২৯৩

এর সত্ত্বেও তাতারীদের আক্রমণ পর্যন্ত চীনে মুসলমানদের জনসংখ্যা খুব বেশি ছিল না। এই এলাকাটি মুসলিম বিশ্ব থেকে অনেক দূরে ছিল, যার ফলে মুসলমান ও অমুসলিমদের মধ্যে মেলামেশার সুযোগ খুব কম ছিল।

চেঙ্গিস খানের যুগে ইসলামের অগ্রগতি:

তৃতীয় অঞ্চলটি হলো উত্তর চীন, যার মধ্যে গোবি মরুভূমি, ‘মঙ্গোলিয়া’ এবং ‘বিলাদ-এ-খাতা’ অন্তর্ভুক্ত এবং এটাই ছিল মঙ্গোল ও তাতারীদের আসল জন্মভূমি। এখানে মুসলিম বণিকদের যাতায়াত চেঙ্গিস খানের যুগে শুরু হয়েছিল এবং চেঙ্গিস খান তাদের মধ্য থেকে অনেক মুসলমানকে তাদের যোগ্যতার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করেছিলেন, যাদের মধ্যে মাহমুদ ইয়ালওয়াজ, জাফর খাজা, হাসান এবং দানিশমান্দ হাজিব উল্লেখযোগ্য ছিলেন। [১] চেঙ্গিস খানের জীবদ্দশাতেই তার পরিবারের দু-একজন সদস্য ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। যেমন একটি বর্ণনা অনুযায়ী, তার একজন সেনাপতি ইসলামে দীক্ষিত হন এবং তার নাম জামাল খাজা হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়। [২]

ইসলাম সম্পর্কে চেঙ্গিস খানের আগ্রহ:

চেঙ্গিস খান মুসলমানদের কাছে তাদের ধর্ম সম্পর্কেও প্রশ্ন ও উত্তর করতেন, বিশেষ করে যখন তিনি মুসলিম বিশ্ব আক্রমণ করেন, তখন বছরের পর বছর ধরে ক্রমাগত বিজয় এবং মুসলমানদের নির্বিচার গণহত্যার পর তিনি অনুভব করেন যে, ইসলাম একটি বিশ্বজনীন শক্তি সম্পন্ন এক অসাধারণ ধর্ম। কারণ তিনি দেখছিলেন যে, ভয়াবহভাবে ধ্বংস হওয়া সত্ত্বেও একজন মুসলমানও তাতারীদের ধর্ম গ্রহণ করেনি। এতে চেঙ্গিস খান বুঝতে পারলেন যে, মুসলমানরা বর্তমানে পরাজিত হলেও ইসলামকে পিছু হটানো সম্ভব নয়। ফলস্বরূপ ৬২১ হিজরিতে যখন তিনি চীনে ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন পথে বুখারায় যাত্রাবিরতি করার সময় তিনি আদেশ দিলেন যে, মুসলমানদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার ধর্মের সবচেয়ে বড় আলেম, তাকে যেন আমার কাছে আনা হয়। বুখারার একজন বুজুর্গ, যাকে সদর-এ-জাহান বলা হতো, আদেশের পরিপ্রক্ষিতে কাজী আশরাফ নামক একজন বড় আলেম এবং একজন বিখ্যাত ওয়ায়েজকে চেঙ্গিস খানের দরবারে পাঠিয়ে দিলেন।

চেঙ্গিস খান তাদের দুজনকে জিজ্ঞেস করলেন: “তোমাদের আকিদা এবং ইসলামের শিক্ষা কী?”

তারা উত্তর দিলেন: “মহাবিশ্বের স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ। যিনি অতুলনীয়। তাঁর কোনো শরিক নেই।”

চেঙ্গিস খান বললেন: “এই আকিদার ব্যাপারে আমার কোনো আপত্তি নেই।”

তারপর চেঙ্গিস খান ইসলামের আরও বিস্তারিত জানতে চাইলে উলামায়ে কেরাম আকিদায়ে রিসালাত সম্পর্কে আলোচনা করলেন এবং বললেন:

“আল্লাহ তাঁর বান্দাদের হেদায়েতের জন্য পয়গম্বর পাঠিয়েছেন যাতে তারা মানুষকে বলতে পারেন যে কোন কাজগুলো করতে হবে এবং কোন কাজগুলো নিষিদ্ধ।”

চেঙ্গিস খান এই আকিদাকেও ভালো বলে অভিহিত করলেন এবং বললেন:

[১] ইনতিশারুল ইসলাম বাইনাল মুগুলা, পৃ. ২৬০

[২] ইনতিশারুল ইসলাম বাইনাল মুগুলা, পৃ. ২৬৫

“আমি তো খোদার বান্দা, কিন্তু আমিও সব সময় বিভিন্ন শহরে আমার দূত পাঠাই যাদের মাধ্যমে আমি বিভিন্ন আদেশ পাঠাই এবং অনেক কিছু থেকে নিষেধ করি, আমার সৈন্যদের ওপর কঠোরতম বিধিনিষেধ আরোপ করি।”

এর অর্থ ছিল যে, স্রষ্টার পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাদের কাছে রাসূল পাঠিয়ে নিজের আদেশ সম্পর্কে অবহিত করা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত বিষয়।

এরপর উলামায়ে কেরাম বললেন:

“মুসলিমরা নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিদিন আল্লাহর ইবাদত করে যাকে সালাত বলা হয়। এর সময় মানুষ বাকি সমস্ত সৃষ্টিজগত থেকে সম্পর্কহীন হয়ে যায় এবং আল্লাহর ইবাদতের জন্য দাঁড়িয়ে যায়।”

চেঙ্গিস খান এটিও পছন্দ করলেন।

উলামায়ে কেরাম এবার রোজা সম্পর্কে জানালেন এবং বললেন: “আল্লাহর নির্দেশ হলো বছরে এক মাস রোজা রাখা হোক।”

চেঙ্গিস খান সমর্থন করে বললেন: “একেবারে সঠিক কথা যে, মানুষ যদি এগারো মাস পর্যন্ত গাফিলতির সাথে অতিভোজন করে, তবে অন্তত এক মাস হিসাব করে খাওয়া উচিত যাতে নিজের স্রষ্টার নেয়ামতসমূহের কদর করা যায়।”

উলামায়ে কেরাম জাকাতের কথা উল্লেখ করে বললেন:

“প্রতি বছর বিশ আশরাফির মধ্য থেকে আধা আশরাফি নিঃস্ব ও অভাবীদের দেওয়াও ইসলামের বিধান।”

চেঙ্গিস খান এটিও পছন্দ করলেন এবং বললেন: “খোদা মানুষের মধ্যে কাউকে রিজিক বেশি দান করেছেন এবং কাউকে কম। সুতরাং যদি সচ্ছল ব্যক্তির নিঃস্বদের এভাবে দান করে তবে ভারসাম্য সৃষ্টি হবে।”

উলামায়ে কেরাম বললেন: “আল্লাহর বান্দাদের ওপর ফরজ যে, যদি সামর্থ্য থাকে তবে জীবনে একবার বাইতুল্লাহ জিয়ারত করা।”

চেঙ্গিস খান বললেন: “সারা জাহান খোদার ঘর। দুনিয়ার যেকোনো কোণে থেকে তাঁর কাছে পৌঁছানো সম্ভব। এখানে সঠিক পদ্ধতি হলো যাদের কাছে অতিরিক্ত সম্পদ আছে, তারা সওয়াবের জন্য তা ফকীর ও মিসকিনদের ওপর খরচ করে দেবে যাতে তাদের সুনাম কিয়ামত পর্যন্ত বাকি থাকে।”

যখন এই দুই আলেম সেখান থেকে বের হয়ে সদর-ই-জাহানের কাছে পৌঁছালেন, তখন কাজী আশরাফ এই মত প্রকাশ করলেন যে চেঙ্গিস খানকে মুসলিম গণ্য করা উচিত। কিন্তু ওয়ায়েজ হজ্জ অস্বীকার করার কারণে তাকে অমুসলিমই গণ্য করলেন। [১]

ওকতায়ী খানের যুগে মুসলিমদের প্রতি বিবেচনা:

চেঙ্গিস খানের উত্তরসূরি ওকতায়ীর চেষ্টা ছিল শহরগুলোকে আবাদ করা এবং প্রজাদের সাথে নম্র আচরণ করা। চীনের পূর্বদিকের এলাকাগুলোতে অনেক মুসলিম বসবাস করত এবং এমন মনে হয় যে ওকতায়ী তাদের গুণাবলীতে প্রভাবিত ছিল। তাই ক্ষমতায় আসার পর সে তার ভাইদের এবং মোগল আমিরদের সংকীর্ণমনা ও বিরোধিতা সত্ত্বেও মুসলিমদের সাথে সদাচরণের পথ অবলম্বন করে। সেই যুগের সমসাময়িক ঐতিহাসিক কাজী মিনহাজুস সিরাজ লেখেন:

[১] রওজাতুস সাফা: ৫ / ৩০, ৩১, ত নওলকিশোর... ওয়ায়েজের কথা সঠিক ছিল, কোনো ইসলামি রুকন অস্বীকারকারী মুসলিম হতে পারে না।

“ওকতায়ী নিজে অত্যন্ত দয়ালু এবং সদাচারী ছিলেন। তিনি মুসলিম বন্ধু ছিলেন এবং মুসলমানদের সম্মান করতে ও তাদের সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য আশ্রয় চেষ্টি করতেন। তাঁর শাসনামলে তাঁর সালতানাতের মুসলমানরা সমৃদ্ধ ও সম্মানিত ছিল। তাঁর সময়ে (চীনের) সমস্ত শহর যেমন তনকত, তমঘাজ এবং তিব্বত ইত্যাদিতে মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। তিনি সমস্ত অঞ্চলের দুর্গগুলো মুসলিম আমিরদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। ইরান ও তুরান থেকে যেসব আমিরদের ডাকা হয়েছিল, তাদের তুর্কিস্তান, তমঘাজ এবং তিব্বতে নিযুক্ত করা হয়েছিল। তিনি আদেশ জারি করেছিলেন যে, মুসলমানদের ‘বন্ধু’ এবং ‘ভাই’ বলে সম্বোধন করা হোক। তিনি মঙ্গোলদের আদেশ দিয়েছিলেন যেন তারা তাদের মেয়েদের মুসলমানদের সাথে নিকাহ দেয় এবং যদি কোনো (মুসলমান) তাদের সন্তানদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহ প্রকাশ করে তবে যেন অস্বীকার না করা হয়। সমস্ত পূর্ব অঞ্চলে জুমার নামাজ শুরু করা হয়েছিল। মুসলমানরা এই অঞ্চলগুলোতে বসতি স্থাপন করেছিল এবং তারা তাদের অনেক কসবা ও শহর আবাদ করে নিয়েছিল।” [১]

মিথ্যা স্বপ্ন শোনানো ইসলাম বিদ্বেষ্টকে শাস্তি:

তাঁর বড় ভাই চাগতাই এবং অন্যান্য দরবারীরা তাঁকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উস্কানি দিত, কিন্তু তিনি তাদের মতামত উপেক্ষা করতেন। একবার এক ব্যক্তি তাঁর দরবারে এসে দাবি করল যে, চেঙ্গিস খান স্বপ্নে এসে আমাকে এই ওসিয়ত করেছেন যে, মুসলমানদের সংখ্যা অনেক বেড়ে যাচ্ছে, আশঙ্কা আছে যে তাদের কারণে শেষ পর্যন্ত মঙ্গোল সালতানাত মুসলমানদের হাতে চলে না যায়। তাই গণহত্যা চালিয়ে মুসলমানদের পুরোপুরি নির্মূল করে দেওয়া হোক।

ওকতায়ী বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই ব্যক্তি মুসলিম বিদ্বেষ্টের কারণে একটি মিথ্যা দাবি করে মুসলমানদের হত্যা করাতে চায়। তিনি একটি বড় মজলিস আহ্বান করে সেই ব্যক্তিকে তার দাবি পুনরাবৃত্তি করার নির্দেশ দিলেন। যখন সে তার স্বপ্ন পুনরাবৃত্তি করল, তখন ওকতায়ী বললেন:

“তুমি কি মঙ্গোল ভাষা জানো নাকি তুর্কি, নাকি উভয়ই?” সেই ব্যক্তি উত্তর দিল: “আমি মঙ্গোল ভাষা জানি না, শুধু তুর্কি জানি।” ওকতায়ী বললেন: “আর চেঙ্গিস খান মঙ্গোল ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা জানতেন না। যদি তিনি স্বপ্নে তোমার সাথে মঙ্গোল ভাষায় কথা বলে থাকেন, তবে তুমি তা বুঝলে কীভাবে? আর যদি তোমার দাবি হয় যে তিনি তুর্কি বলছিলেন, তবে তা কি মিথ্যা নয়?”

সেই ব্যক্তি নিরন্তর হয়ে গেল এবং ওকতায়ী মিথ্যা দাবির শাস্তিস্বরূপ তাকে হত্যা করালেন।

এরপর ওকতায়ী মুসলমানদের বিরোধী আমিরদের, যাদের মধ্যে তাঁর বড় ভাই চাগতাইও ছিল, বুঝিয়ে বললেন:

“এই মুসলমানরা আমাদের ভাই এবং আমাদের বন্ধু। তাদের কারণে আমাদের রাষ্ট্র যে শক্তি পেয়েছে, তা স্পষ্ট। তাদের সাহায্যে দুনিয়া আমাদের জন্য বশীভূত হয়েছে।” [২]

ওকতায়ী এক মুসলমানের প্রাণ বাঁচালেন:

মঙ্গোল আইন অনুযায়ী পানিতে ডুব দিয়ে অজু বা গোসল করা নিষিদ্ধ ছিল। একবার ওকতায়ী খান সফরকালে এক মুসলমানকে পুকুরে গোসল করতে দেখলেন। পেছনে পেছনে চাগতাইও আসছিল। যদি সে মুসলমানটিকে পুকুরে দেখে ফেলত, তবে নিশ্চিতভাবেই তাকে হত্যা

[১] তাবাকাতে নাসিরি, ২ পৃষ্ঠা ১৫১, ১৫২

[২] তাবাকাতে নাসিরি: ৩/ ১৫৩ থেকে ১৫৭

করে দিত। ওকতাই তৎক্ষণাৎ রূপার একটি টুকরো সেই মুসলমানের কাছে পাঠালেন এবং আদেশ দিলেন: “এটি পুকুরে ফেলে দাও। যদি চগতাই আপত্তি করে তবে বলো যে আমি আমার রূপা বের করার জন্য ডুব দিচ্ছি।”

মুসলমানটি তেমনই করল। কিছুক্ষণ পর চগতাই সেখানে পৌঁছে গেল এবং মুসলমানটিকে পানিতে দেখে তাকে হত্যা করার জন্য জেদ ধরল। মুসলমানটি বলল: “আমার রূপা এখানে পড়ে গিয়েছে, আমি তা বের করছি।”

চগতাই ডুবুরিদের পানিতে পাঠালে সত্যিই সেখান থেকে রূপার টুকরোটি বেরিয়ে এল। এভাবে মুসলমানটির প্রাণ বেঁচে গেল। [১]

ওকতাইয়ের মুসলমানদের প্রতি এই পরিমাণ মেহেরবানি দেখে কাজী মিনহাজুস সিরাজ রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেন:

“আমি কিছু নির্ভরযোগ্য লোকের কাছে শুনেছি যে মুসলমানদের প্রতি এই পরিমাণ অনুগ্রহ ও করুণা এই কথার প্রমাণ যে ওকতাই গোপনে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল।” [২]

ওকতাইয়ের আগে এবং পরে মুসলমানদের ওপর কঠোরতা:

তবে ওকতাই ছাড়া মঙ্গোলিয়ার প্রায় সকল খাকান মুসলমানদের ব্যাপারে কঠোর ছিলেন। তাই তাদের ইসলামের দাওয়াত দেওয়া অত্যন্ত কঠিন ছিল। আর্নল্ড লিখেন:

“চেঙ্গিজ খান আদেশ দিয়েছিলেন যে, যারা পশুদের ইসলামি পদ্ধতিতে জবেহ করবে তাদের হত্যা করা হোক। এই আদেশ তার নাতি কুবলাই খান পুনরায় জারি করেন এবং সংবাদদাতাদের জন্য পুরস্কার নির্ধারণ করেন। এর ফলে জুলুম ও নির্যাতনের এমন এক যুগ শুরু হয় যা সাত বছর পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। ফলে অনেক অভাবী লোক এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে এই আদেশকে সম্পদ উপার্জনের একটি সহজ উপায় মনে করে এবং ক্রীতদাসরা মুক্তি লাভের জন্য তাদের মনিবদের ওপর মিথ্যা অপবাদ দেয়। গিয়ুক খান তার রাজ্যের শাসনভার দুইজন খ্রিস্টান উজিরের হাতে অর্পণ করেছিলেন এবং তার দরবারও খ্রিস্টান পাদ্রীদের দ্বারা পূর্ণ ছিল। ফলে তার শাসনামলেও মুসলমানদের ওপর অনেক কঠোরতা নেমে আসে।” [৩]

মঙ্গোলরা মুসলমানদের ওপর এমন সব নির্যাতন চালিয়েছিল যে, চীনা তামাশাকারীরা যখনই পর্দার ওপর ছায়া ফেলে ছবি দেখাত, তখন একটি ছবিতে একজন সাদা দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ লোককে দেখা যেত যার ঘাড় ঘোড়ার লেজের সাথে বাঁধা থাকত এবং ঘোড়া তাকে টেনে নিয়ে বেড়াত। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে মঙ্গোল ঘোড়সওয়াররা মুসলমানদের সাথে কেমন দুর্ব্যবহার করত। [৪]

তোরাকিনা খাতুনের যুগ এবং ফাতেমা ইরানি:

৬৩৯ হিজরিতে যখন ওকতাইয়ের মৃত্যু হলো, তখন সাময়িকভাবে তার স্ত্রী তোরাকিনা খাতুনকে সিংহাসনে বসানো হলো যিনি খ্রিস্টান ছিলেন। তার উপদেষ্টাদের মধ্যে ইরান থেকে বন্দি করে আনা একজন মুসলিম নারী ফাতেমার উল্লেখ পাওয়া যায়, যিনি অত্যন্ত মেধাবী ও বুদ্ধিমতী ছিলেন।

[১] তবাকাত-ই-নাসিরি: ২/১৫২, ১৫৩

[২] তবাকাত-ই-নাসিরি: ২/১৫৭, তবা কাবুল

[৩] THE PREACHING OF ISLAM 172, 173; দাওয়াত-ই-ইসলাম, ২২৬

[৪] THE PREACHING OF ISLAM 173, with footnote; দাওয়াত-ই-ইসলাম, ২২৬; হাওয়ালা হুরওয়ার্থ ১/১৫৯

এবং সে ধীরে ধীরে তুরাকিনার নৈকট্য লাভ করেছিল। তুরাকিনার শাসন পরিচালনায় ফাতেমার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। [১] এ থেকে আন্দাজ করা যায় যে, মুসলিম নারীরাও মোগল দরবারে যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি রাখতেন। তবে যেহেতু মোগল দরবারে ইসলাম, খ্রিস্টধর্ম এবং বৌদ্ধধর্মের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব চলছিল, তাই বিদ্বৈষীরা ফাতেমার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টায় লিপ্ত ছিল। সে সময় তুরাকিনার ছেলে শাহজাদা কুতান অসুস্থ ছিল। হিংসুকরা রটিয়ে দিল যে, ফাতেমা জাদুর মাধ্যমে তাকে অসুস্থ করেছে। কুতানও এই অভিযোগে বিশ্বাস করল এবং সে ওসিয়ত করল যে, যদি সে মারা যায় তবে যেন ফাতেমাকে হত্যা করা হয়। দুর্ভাগ্যবশত কুতানের মৃত্যু ঘটে এবং তুরাকিনা মোগল আমিরদের চাপে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফাতেমাকে তাদের হাতে সোপর্দ করেন। তাকে বেশ কয়েকদিন উলঙ্গ এবং ক্ষুধার্ত-তৃষ্ণার্ত অবস্থায় বেঁধে রাখা হয়েছিল এবং নানাভাবে তার ওপর নির্যাতন চালানো হয়েছিল, এমনকি সে না করা অপরাধ স্বীকার করে নেয়। এরপর তাকে চামড়ায় মুড়িয়ে নদীতে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। [২]

গিয়ুক খানের আমল:

তুরাকিনা পাঁচ বছর শাসনের পর কুরুলতাই (মোগলদের বিশ্ব মজলিস) ডেকে তার ছেলে গিয়ুক খানকে বাদশাহ নিযুক্ত করেন। [৩] শৈশব থেকেই খ্রিস্টান শিক্ষকরা তাকে লালন-পালন করেছিলেন, যার ফলে তিনি স্বভাবগতভাবেই খ্রিস্টান জাতির বড় সমর্থক ছিলেন। ফলে তার আমলে মঙ্গোলিয়া সাম্রাজ্যের পরিবেশ এমন হয়ে গিয়েছিল যে, কোনো মুসলিম কর্মচারী কোনো খ্রিস্টানের সামনে উচ্চস্বরে কথা পর্যন্ত বলতে পারত না। রাশিয়া, রোম এবং সিরিয়া থেকে বড় বড় পাদ্রিরা এসে তার দরবারে সমবেত হতে শুরু করেন। [৪]

মুসলমানদের বিরুদ্ধে খ্রিস্টানদের ষড়যন্ত্র:

একবার কিছু খ্রিস্টান, যারা মোগল সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিল, মুসলমানদের নির্মূল করার জন্য এই ফন্দি আঁটল যে, সমস্ত মুসলিম পুরুষকে খোজাকরণ করা হবে। তাদের প্রধান গিয়ুক খানকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলে এর আদেশনামাও হাসিল করে নেয়। কিন্তু যখন সে এই আদেশনামা নিয়ে গিয়ুক খানের দরবার থেকে বের হলো, তখন হঠাৎ মোগলদের শিকারি কুকুরগুলো তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তার অণ্ডকোষ চিবিয়ে ফেলল। দ্বীন-ই-মুহাম্মাদীর এই মোজেজা দেখে পাদ্রিরা এতটাই ভীত হয়ে পড়ল যে, তারা নিজেরাই সেই আদেশনামাটি ধ্বংস করে দিল। [৫]

[১] তারিখ-ই-জাহান কুশা জুওয়াইনি, পৃ. ২৯৭, ত. হরমুজ; আন-নিসা আল-হাকিমাত ফিল মোগল, ড. আলা মুহাম্মদ খলিল, পৃ. ১৩৬।

[২] তারিখ-ই-জাহান কুশা জুওয়াইনি, পৃ. ৩০১ থেকে ৩০৩, ত. হরমুজ; জামিউত তাওয়ারিখ (ফারসি), রশিদ উদ্দিন ফজলুল্লাহ: ২/২৩৮, লিডেন।

[৩] তারিখ-ই-জাহান কুশা জুওয়াইনি, পৃ. ৩০৩ থেকে ৩০৮, ত. হরমুজ।

[৪] তারিখ-ই-জাহান কুশা জুওয়াইনি, পৃ. ৩১৩, ৩১৩, ত. হরমুজ; জামিউত তাওয়ারিখ (ফারসি): ২/২৩৮, লিডেন।

[৫] রওজাতুস সাফা: ৫/৫৬... আকবর শাহ নজীবাবাদী এখানে ভুল করেছেন, তিনি লিখেছেন যে শিকারি কুকুরগুলো গিয়ুক খানের ওপর আক্রমণ করেছিল যার জখম থেকে তিনি কিছুদিন পর মারা যান। অথচ মূল উৎসের ইবারত থেকে এই অর্থ মোটেও বের হয় না। রওজাতুস সাফার ইবারতটি হলো:

“খ্রিস্টানদের একটি দল যারা গিয়ুক খানের প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রশাসনিক দায়িত্বে ছিল, তারা একটি আদেশনামা হাসিল করল যে অধিকৃত রাজ্যের মুসলমানদের খোজাকরণ করা হবে। সেই দলের একজন আলেম সেই আদেশনামাটি নিয়ে দরবার থেকে বের হয়ে আসলেন যাতে খ্রিস্টানদের সুসংবাদ দিতে পারেন এবং প্রদেশের কর্মচারীরা তা কার্যকর করতে পারে। ঘটনাক্রমে হিংস্র কুকুরগুলো তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তার অণ্ডকোষ উপড়ে ফেলল। এরপর খ্রিস্টানরা দ্বীন-ই-মুহাম্মাদী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)-এর মোজেজা দেখে ভীত হয়ে পড়ল এবং সেই আদেশনামার নামও আর মুখে নিল না।”

ইমাম নূরুদ্দিনের সাথে দুর্ব্যবহার:

দরবারে বৌদ্ধ পুরোহিতদের সংখ্যাও অনেক ছিল, যারা সর্বদা তাকে মুসলমানদের ওপর, বিশেষ করে আলেমদের ওপর জুলুম করার জন্য উস্কানি দিত। সেখানে ইমাম নূরুদ্দিন নামে একজন আলেম ছিলেন, যার জ্ঞান ও শ্রেষ্ঠত্বে মানুষ অত্যন্ত মুগ্ধ ছিল। বৌদ্ধ ধর্মগুরু এবং খ্রিস্টান পাদ্রিরা এটি সহ্য করতে পারল না। তারা গিউক খানের ওপর চাপ সৃষ্টি করল যেন সে ইমাম নূরুদ্দিনকে দরবারে তলব করে এবং আমাদের সাথে তার বিতর্ক (মুনাজারা) করায়। যদি তিনি রাসূল ﷺ-এর রিসালাতের সত্যতা এবং অন্যান্য ধর্মের ওপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে না পারেন, তবে তাকে যেন হত্যা করা হয়। গিউক খান ইমাম নূরুদ্দিনকে ডেকে পাঠাল এবং বিতর্কের মজলিস আয়োজন করল। ইমাম নূরুদ্দিন অকাট্য দলিলের মাধ্যমে নিজের দাবি প্রমাণ করলেন এবং প্রতিপক্ষের আপত্তির দাঁতভাঙা জবাব দিলেন।

পাদ্রিরা বলল: “পয়গম্বরকে আধ্যাত্মিক হতে হয়। নারীদের প্রতি তার কোনো আসক্তি থাকা উচিত নয়, যেমনটি ছিল হযরত ঈসা। তোমাদের পয়গম্বরের নয়জন স্ত্রী এবং অনেক সন্তান ছিল। আসলে এটি কেন?”

ইমাম নূরুদ্দিন রহমাতুল্লাহি আলাইহি উত্তর দিলেন:

“যদি পরিবার-পরিজন থাকা নবুওয়াতের পরিপন্থী হয়, তবে হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম-এর ৯৯ জন স্ত্রী কেন ছিল? হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম-এর একশত ষাট জন স্ত্রী এবং এক হাজার দাসী কেন ছিল?”

পাদ্রিরা নিরন্তর হয়ে সেই পয়গম্বরদের নবুওয়াত অস্বীকার করতে লাগল এবং বলল: “এরা পয়গম্বর ছিলেন না, কেবল বাদশাহ ছিলেন।”

যাই হোক, অপদস্থ হওয়ার পর পুরোহিত ও পাদ্রিরা বিতর্ক শেষ করে দিল এবং গিউক খানকে বলল:

“আপনি ইমাম নূরুদ্দিনকে বলুন যেন তিনি আমাদের দুই রাকাত সালাত আদায় করে দেখান।”

গিউক খানের কথায় ইমাম নূরুদ্দিন রহমাতুল্লাহি আলাইহি সালাতের নিয়ত বাঁধলেন। যখন তিনি সিজদায় গেলেন, তখন গিউকের আদেশে কিছু কর্মচারী তার মাথা সজোরে মাটিতে আছাড় দিতে লাগল, কিন্তু তিনি সালাত ভাঙলেন না। সালাত সম্পন্ন করে তিনি দোয়ার জন্য হাত তুললেন এবং কোনো অভিযোগ-অনুযোগ না করেই নিজের ঘরে চলে - ۝

সেই রাতেই গিউক খান মারা গেল এবং মঙ্গোলরা খুব ভীত হয়ে পড়ল। তারা এসে ইমাম নূরুদ্দিন রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর কাছে ক্ষমা চাইল। [১]

সেই সময় গিউক খান সমরকন্দে ছিল এবং মঙ্গোলিয়া যাচ্ছিল। সে ছিল একেবারেই যুবক এবং মাত্র এক বছর শাসন করতে পেরেছিল। [২]

মঙ্গু খানের আচরণ:

মঙ্গু খান চীন ও মঙ্গোলিয়ার মুসলমানদের সাথে কিছুটা নরম আচরণ করত। একবার সে কোনো এক সংবাদদাতার মাধ্যমে জানতে পারল যে, রাজধানীর বৌদ্ধ ধর্মগুরু “আইদিগুত” ঠিক জুমার সালাতের সময় মুসলমানদের গণহত্যা করার ষড়যন্ত্র করছে। মঙ্গু খান আইদিগুতকে গ্রেপ্তার করিয়ে জুমার সালাতের সময় মুসলমানদের সমাবেশের সামনে শূলে চড়িয়ে দিল। [৩]

[১] তবাকাত-ই-নাসিরি, মিনহাজুস সিরাজ জুজজানি: ২ / ১৭১ থেকে ১৭৩, ত. কাবুল

[২] জামিউত তাওয়ারিখ (ফার্সি), রশিদ উদ্দিন ফজলুল্লাহ: ২ / ২৫০, লিডেন

[৩] তারিখ-ই-হাবিবুস সিয়র: ৩ / ৬১

বৌদ্ধধর্মের জন্য সুযোগ-সুবিধা:

তবে মঙ্গু খানের পর মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ বেড়ে যায়। অন্যদিকে বৌদ্ধধর্মের প্রচারের জন্য সব ধরনের অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছিল, যার ফলে সেখানে বৌদ্ধদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর্নল্ড লিখেছেন:

“কুবলাই খানের আমলে চীনের মঙ্গোলদের ওপর বৌদ্ধধর্মের শক্তিশালী প্রভাব শুরু হয়েছিল কারণ তারা সব দিক থেকে বৌদ্ধদের অনুসারী দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। ফলে চতুর্দশ শতাব্দীর শুরুতে বৌদ্ধধর্ম এই লোকদের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করে। তাদের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য তিব্বতের লামারা অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে কাজ করেছিল। ফলে মঙ্গোলিয়ার মানুষ আজও এই ধর্মই পালন করে।” [১]

গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত মুসলমানদের ইসলামের জন্য প্রচেষ্টা:

তবে প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ইসলামের দাওয়াতের পথ রুদ্ধ হয়নি কারণ চেঙ্গিস খানের পুত্রদের আমলে পারস্য ও তুর্কিস্তানের হাজার হাজার মুসলমান মঙ্গোলিয়া সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। কুবলাই খানের আমলে তাসখন্দের নিকটবর্তী বনাকত-এর একজন বণিক আহমদ বিনাকতি বহু বছর ধরে তার অর্থমন্ত্রী ছিলেন। এছাড়াও একজন আরব মুসলমান তার কাজী এবং দ্বিতীয় একজন আরব উজিরের সহকারী ছিলেন। ইতিহাসে আবদুর রহমান নামক এক ব্যক্তিরও উল্লেখ পাওয়া যায় যিনি কুবলাই খানের কর আদায়কারী (কালেক্টর) ছিলেন। ইউরোপীয় পয়টক মার্কো পোলো, যিনি ১২৯৬ সালে (৬৯৬ হিজরি) কুবলাই খানের দরবারে উপস্থিত হয়েছিলেন, তিনি তার ভ্রমণকাহিনীতে সেখানকার দুই মুসলিম গণিতবিদ আলাউদ্দিন মওসিলি এবং ইসমাইল হিরউয়ির কথা উল্লেখ করেছেন। [২]

মঙ্গোলদের শাসনামলে যেহেতু হিন্দুস্তান ছাড়া প্রায় পুরো এশিয়া একটি সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছিল, তাই যাতায়াতের পথ সবদিকে উন্মুক্ত ছিল। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ইরান ও মধ্য এশিয়া থেকে অনেক মুসলমান চীনে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন, আবার কিছু চীনা মধ্য এশিয়া ও ইরানে আসতে শুরু করেন। এই মেলামেশাও ইসলামের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। [৩]

সাইয়িদ আজাল শামস উদ্দিন ওমর এবং তার সন্তানদের কীর্তি:

এই সময়ে বুখারার একজন বণিক শামস উদ্দিন ওমর মঙ্গোলিয়া খানদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন যাকে আরবরা “আস-সাইয়িদ আল-আজাল” এবং চীনারা “হিয়ান হাং ফাং” বলে ডাকত। তিনি চেঙ্গিস খানের আমলে এখানে এসেছিলেন এবং তাকে এক হাজার ঘোড়া উপহার দিয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। ওকতায় খান এবং মঙ্গু খানের আমলে তাকে উচ্চ পদে আসীন করা হয়েছিল, আর কুবলাই খান তাকে দক্ষিণ প্রদেশ ইউনান (Yunnan)-এর গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। শামস উদ্দিন ওমর সেখানে রাস্তাঘাট, সেতু এবং শহরগুলোর প্রাচীর নির্মাণ করান, মানুষের ওপর থেকে কর তুলে দেন এবং ন্যায়বিচার ও ইনসাফের প্রসার ঘটান। তার ছায়াতলে সেখানে বাইরে থেকে অনেক মুসলমান এসে বসতি স্থাপন করেন এবং স্থানীয় অনেক মানুষও দলে দলে মুসলমান হন। গভর্নর সেখানে কনফুসিয়াসের অনুসারীদের...

[১] THE PREACHING OF ISLAM, p. 170; দাওয়াত-ই-ইসলাম, পৃ. ২২১।

[২] ইন্ডিশারুল ইসলাম বাইনাল মুগুলা, পৃ. ২৬০, ২৬১; [৩] দাওয়াত-ই-ইসলাম, পৃ. ২৯৩।

...এর জন্য মন্দির এবং মুসলমানদের জন্য মসজিদ ও মাদরাসাও নির্মাণ করিয়েছিলেন।

৬৬৯ হিজরিতে এই নেক গভর্নরের মৃত্যু হলে পুরো চীনে শোক পালন করা হয়।

৮০৮ হিজরিতে চীনের মিং শাসকরা তাদের একজন বুদ্ধিজীবী “তশাং হো” এর মাধ্যমে শামসুদ্দিন ওমরের সেবার ওপর একটি বই সংকলন করিয়ে তাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

শামসুদ্দিন ওমরের পাঁচ ছেলে এবং উনিশজন নাতি ছিল যারা তার পরে এই প্রদেশের গভর্নরি এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তার এক ছেলে নাসিরুদ্দিন (নাইল ইয়া নিং) প্রথমে চীনের উজির, তারপর শানসির গভর্নর এবং পরে ইউনানের গভর্নর ছিলেন। ৬৯২ হিজরিতে তার মৃত্যু হয়। দ্বিতীয় ছেলে হাসান গুয়াংডং প্রদেশের সেনাপতি ছিলেন।

তৃতীয় ছেলে হোসেন প্রথমে রাজ্যের উজির এবং পরে পূর্ব উপকূলীয় প্রদেশ কিয়াংসি (জিয়াংসু)-এর একটি শহরের গভর্নর ছিলেন। তার ভাই নাসিরুদ্দিনের মৃত্যুর পর তাকে ইউনানের গভর্নর করা হয়। চতুর্থ ছেলে শামসুদ্দিন জিয়াংসুর একটি শহর “কিন তশাং”-এর ওয়ালি ছিলেন। পঞ্চম ছেলে মাসুদ প্রথমে উজির এবং পরে ইউনানের গভর্নর নিযুক্ত হন। আল্লাহর এই বান্দাদের প্রচেষ্টার ফলে অষ্টম হিজরি শতাব্দীর শুরুর দিকে এই প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। [১]

শামসুদ্দিন ওমরের নাতিরাও উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাদের মধ্যে নাসিরুদ্দিনের এক ছেলে যাকে “বায়ান ফানশাং” বলা হয়, “সিনগান ফু”-এর সবচেয়ে বড় মসজিদ নির্মাণ করেন। [২] তার প্রভাব-প্রতিপত্তি এত বেশি ছিল যে তিনি ৭৩৬ হিজরিতে (১৩৩৫ খ্রিস্টাব্দ) চীনের খাকানের কাছ থেকে এই স্বীকৃতি আদায় করতে সক্ষম হন যে ইসলাম একটি সত্য ধর্ম। [৩]

চীন ও মঙ্গোলিয়ার শাসক শ্রেণী মুসলমান হয়নি:

চীনে ইসলাম গ্রহণকারীদের পরিধি সাধারণ শ্রেণী পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল এবং চীনা শাসকদের মধ্যে কারো মুসলমান হওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায় না। এই কারণেই অন্যান্য মঙ্গোল সাম্রাজ্যের বিপরীতে এখানে দলে দলে মানুষের ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার ঘটনা ঘটেনি এবং এই কারণেই আজ পর্যন্ত চীন একটি অমুসলিম দেশ। তবে বৌদ্ধ ধর্মের কিছু অনুসারী যারা মঙ্গোল সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন, তারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন যাদের মধ্যে “করগজ” নামক একজন গভর্নরের উল্লেখ পাওয়া যায় যিনি আগে বৌদ্ধ ছিলেন এবং পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। কানসু প্রদেশের গভর্নর “আনান্দা” যিনি কুবলাই খানের নাতি ছিলেন, চতুর্দশ শতাব্দীতে চীনে ইসলাম প্রচারের জন্য পূর্ণ উদ্যমে সক্রিয় ছিলেন। তিনি “তান গুত”-এ অনেক মানুষকে মুসলমান করেন। নিজের কমান্ডাধীন সেনাবাহিনীতেও তিনি ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন যার ফলে অনেক সৈন্য মুসলমান হয়। একবার তাকে খাকানের দরবারে তলব করা হয় এবং বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়। অস্বীকার করায় তাকে বন্দি করা হয় কিন্তু পরে এই আশঙ্কায় মুক্তি দেওয়া হয় যে “তাম্বুত”-এর বাসিন্দারা যারা তার প্রতি গভীর ভক্তি রাখত তারা বিদ্রোহ না করে বসে। [৪]

[১] ইনতিশারুল ইসলাম বাইনাল মুঘল, পৃ. ২৬১ থেকে ২৬৩

[২] ইনতিশারুল ইসলাম বাইনাল মুঘল, পৃ. ২৬৩ মূল উৎসে শহরের নাম এভাবেই লেখা আছে। আমি চেষ্টা করা সত্ত্বেও জানতে পারিনি চীনের কোন শহরকে বোঝানো হয়েছে।

[৩] ইনতিশারুল ইসলাম বাইনাল মুঘল, পৃ. ২৬৩

[৪] দাওয়াতে ইসলাম, পৃ. ২২৮

চীনে ইসলাম সম্পর্কে ইবনে বতুতার মন্তব্য:

চীনে ইসলামের এই প্রসারের কথা ইবনে বতুতা তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে উল্লেখ করেছেন, যিনি মুসলিম বিশ্বের ওপর চেঙ্গিসী আক্রমণের ১২৭ বছর পর ৭৪৩ হিজরিতে চীনে পৌঁছেছিলেন। তিনি লিখেছেন:

“চীনের প্রতিটি শহরে মুসলমানদের আলাদা বসতি রয়েছে, তাদের মসজিদ রয়েছে যেখানে জুমার নামাজ এবং অন্যান্য নামাজ আদায় করা হয়। সেখানে মুসলমানদের সম্মান ও শ্রদ্ধা করা হয়।” [১]

তবে উত্তর চীন, মঙ্গোলিয়া এবং গোবি মরুভূমিতে সেই সময়েও স্থানীয় মুসলমান ছিল না, যেমনটি ইবনে বতুতা লিখেছেন:

“এখানে কোনো মুসলমান বাস করে না, তারা ব্যতীত যারা মুসাফির। কারণ এই এলাকা বসবাসের উপযোগীই নয়। এখানে কোনো জনাকীর্ণ শহর নেই। কিছু গ্রাম এবং সমতল ভূমি রয়েছে যেখানে ফসল, ফল এবং আখ উৎপন্ন হয়।” [২]

ইসলামের আধ্যাত্মিক শক্তির মোজেনা:

মঙ্গোলদের চারটি সাম্রাজ্যের উপরোক্ত পর্যালোচনা স্পষ্ট করে যে, ইসলাম তাদের মধ্যে তিনটিকে এক শতাব্দীর মধ্যে মুসলিম সাম্রাজ্যে পরিণত করেছিল যেখানে ইসলামি শরিয়ত কার্যকর ছিল এবং শাসকরা ইসলামের অনুরাগী ছিলেন, অন্যদিকে চতুর্থ সাম্রাজ্যে মুসলমানদের সম্মানের চোখে দেখা হতো এবং তাদের জন্য সব ধরনের উন্নতির পথ খোলা ছিল।

এই পর্যালোচনা একজন মুসলমানকে অত্যন্ত আনন্দ ও উল্লাসে এবং একজন অমুসলিমকে বিস্ময় ও অবাক করে দেয়। ইতিহাসের এই অধ্যায় অধ্যয়ন একজন নিরপেক্ষ মানুষকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করে যে, ইসলামের আধ্যাত্মিক শক্তি অতুলনীয় এবং চিরস্থায়ী। এটি এমন এক দীন যা প্রতিটি কাল ও স্থানে মানুষের অন্তর জয় করার ক্ষমতা রাখে। এটি এমন এক দীন যা চরম প্রতিকূল পরিস্থিতি এবং কঠিনতম সময়েও কেবল টিকে থাকতেই নয় বরং এগিয়ে যাওয়ার শক্তি রাখে এবং দুর্ভেদ্য বাধাগুলো বসন্তের বাতাসের মতো অতিক্রম করে যায়। এই কারণেই মুসলিম বিশ্বের ওপর চেঙ্গিস খানের আক্রমণের সোয়া শতাব্দী পার হওয়ার পর সমস্ত অধিকৃত ইসলামি দেশগুলোর তাতার শাসকরা তাদের পরিবার, গোত্র এবং প্রজাসমূহসহ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

টমাস আর্নল্ডের স্বীকৃতি:

প্রফেসর টি. ডব্লিউ. আর্নল্ড ইসলামের এই মোজেনায় বিস্ময় প্রকাশ করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে লিখেছেন:

“ইসলামের জন্য তার অতীত শান-শওকতের ভস্ম থেকে পুনরায় জেগে ওঠা এবং তার মুবাশ্শিগদের প্রচেষ্টায় সেই বন্য তাতারদের অনুগত করা অবধারিত ছিল।” [৩]

[১] রেহলা ইবনে বতুতা: ২/ ১২৭, ত. একাডেমি আল-মাগরিবিয়া রাবাত

[২] রেহলা ইবনে বতুতা: ৩/ ১৫১

মঙ্গোলিয়া বসবাসের উপযোগী না হওয়ার কারণ হলো এখানে তুষারপাত এবং প্রবল বাতাসের ঝড় প্রায়ই ঘটে থাকে, আজও মঙ্গোলিয়ায় প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার হার খুব কম। ঝড়ের কারণে এখানকার স্থানীয় মানুষের মৃত্যুর খবর সাধারণত আসতেই থাকে।

[৩] The preaching of Islam 170, দাওয়াত-ই-ইসলাম: অনুবাদ ডক্টর শেখ এনায়েত উল্লাহ, ত. ওয়াকফ বিভাগ পাঞ্জাব

তারিখ উম্মতে মুসলিমা, পঞ্চম খণ্ড

আকবর শাহ নাজিবাবাদীর মন্তব্য:

আকবর শাহ খান নাজিবাবাদী এই বিপ্লবের তাকভীনি হিকমতসমূহের ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন:

“মুসলমানরা বিজয়ী হয়ে তাদের বিজিতদের ইসলামের সম্পদে সমৃদ্ধ করেছে, আবার অন্যদিকে তারা বিজিত হয়েও নিজেদের বিজয়ীদের ইসলামের খাদেম বানিয়ে নিয়েছে। যদি চেঙ্গিস খান ও হালাকু খানের রাজ্য জয় ও রক্তপাত সংঘটিত না হতো, তবে ইসলামের সত্যতা ও মহত্বের এই দিকটি যে, তা বিজয়ীদেরও নিজের অনুগত করতে পারে, তা কিছুটা সন্দেহযুক্ত থেকে যেত। সুতরাং মঙ্গোলদের এই তাড়বকে যদি একদিকে মুসলিম বিশ্বের জন্য ‘বিপদ-এ-কুবরা’ বলা যায়, তবে অন্যদিকে এর নাম ‘রহমত-এ-উজমা’ রাখা যেতে পারে।” [১]

মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর মন্তব্য:

ইসলামের ইতিহাসবিদ হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. তাতারীদের ইসলাম গ্রহণের বিষয়ে লিখেছেন:

“ইসলাম আবারও এর প্রমাণ দিয়েছে যে, তার শত্রুদের জয় করার এবং নিজের ভালোবাসার জালে বন্দী করার এক অদ্ভুত ও বিস্ময়কর ক্ষমতা তার রয়েছে। তাতারীরা কেবল মুসলমানই হয়নি, বরং তাদের মধ্যে বড় বড় মুজাহিদ, বড় বড় আলেম ও ফকিহ এবং বড় বড় আল্লাহওয়াল্লা দরবেশের জন্ম হয়েছে এবং তারা অনেক নাজুক মুহুর্তে ইসলামের পাহারাদারির দায়িত্বও পালন করেছে।” [২]

হারল্ড ল্যান্স-এর আক্ষেপ প্রকাশ:

অন্যদিকে তাতারীদের ইসলাম গ্রহণে খ্রিস্টানরা চরম ধাক্কা খায়, যার প্রভাব তাদের লেখনিতে আজও প্রকাশ পায়। মার্কিন প্রাচ্যবিদ হারল্ড ল্যান্স (যাকে পশ্চিমা বিশ্ব নিরপেক্ষ ও সতর্ক ইতিহাসবিদ হিসেবে তুলে ধরে) এই পরিস্থিতিতে আক্ষেপের সুরে এটি না বলে থাকতে পারেননি:

“ইতিহাসের পরিহাস এই যে, দক্ষিণ-পশ্চিমে (চেঙ্গিস খানের বংশধররা) সেই উপাদানগুলোকেই লালন-পালন করেছে যাদের ধ্বংস করার জন্য সে কারাকোরাম থেকে এসেছিল।” [৩]

মঙ্গোলদের ইসলাম গ্রহণের কারণসমূহ:

উপরোক্ত আলোচনা থেকে মঙ্গোলদের ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার বিস্ময়কর বিপ্লবের কারণ ও রহস্যগুলো অনেকাংশেই স্পষ্ট হয়ে গেছে, তবে আমরা বিষয়টি গুছিয়ে আনার জন্য সেই কারণগুলো ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করছি:

- ১. ইসলাম একটি চিরঞ্জীব ধীন, এর শিক্ষাগুলো বিশ্বজনীন এবং প্রতিটি কাল ও স্থানের জন্য যথেষ্ট, যেখানে অন্যান্য ধর্মগুলো কুসংস্কার ও প্রথা, সেকেলে চিন্তাধারা এবং মিথ্যা ঐতিহ্যের সমষ্টি। বুদ্ধি ও বাস্তবতার দৃষ্টিতে সেগুলোর কোনো মর্যাদা নেই, ব্যবহারিক

[১] তারিখ-এ-ইসলাম নাজিবাবাদী: ৩/ ৪৩৪

[২] তারিখ-এ-দাওয়াত ও আজীমত: ১/ ৩৩৪

[৩] March of The Barbarians p: 287

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

খুতবাতে বাহাওয়ালপুর

জীবনে তাদের কোনো ভূমিকা নেই। কিন্তু ইসলাম নিজেই একটি জীবন। এটি একটি বৈদ্যুতিক প্রবাহ যা প্রকৃতির ধ্বংসকারী ও নির্মাতা। একে মিটিয়ে দেওয়া অসম্ভব বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত। মহাবিশ্বের স্রষ্টা নিজেই ইসলামের রক্ষক, যিনি ইসলামের স্থায়িত্বের দায়িত্ব নিয়েছেন।

৪. মহাবিশ্বের স্রষ্টা ইসলামের প্রচার এবং সৃষ্টির সংশোধনের একটি সুসংবদ্ধ ব্যবস্থা দিয়েছেন যাকে ‘দাওয়াত-এ-দীন’ হিসেবে অভিহিত করা হয়। হজুর খাতামুন নবীইয়ীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে ইসলাম প্রচারের ব্যবহারিক শিক্ষা দিয়েছেন। আপনার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ছিল দাওয়াত-এ-দীন। সত্য দ্বীনের প্রচার ও হেফাজতের এই ব্যবস্থাপত্র পতনের এই যুগেও উম্মতের কাছে ছিল এবং জ্ঞানী, গুণী ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিবর্গ একে অত্যন্ত সফলতার সাথে ব্যবহার করেছেন।

৩. তাতারীরা ছিল সম্পূর্ণ অসভ্য ও মূর্খ। ইলমের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। তাদের কাছে শক্তির একমাত্র মূলনীতি ছিল জীবন। তাদের কাছে কোনো প্রাচীন ধর্ম ছিল না। তাদের নিজস্ব ধর্ম ছিল ‘শামানিজম’, যা কেবল নক্ষত্র পূজা এবং মূর্তিপূজা ও কিছু কুসংস্কারের ওপর ভিত্তি করে ছিল। তারা আকাশ, নক্ষত্র, বাতাস এবং নেকড়েদের পূজা করত এবং চেঙ্গিস খানের আইন ‘ইয়াসা’ মেনে চলত। কঠোর পরিশ্রমী ও দুর্ধর্ষ হওয়া সত্ত্বেও তাদের স্বভাব ছিল বেদুঈনদের মতো সরল। তারা যুক্তি-তর্ক এবং দীর্ঘ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্পর্কে একেবারেই অবগত ছিল না। তাই তারা যখন কোনো বিষয়কে সত্য বলে বুঝতে পারত, তখন তার ওপর অটল থাকত।

৪. তাতারীরা মঙ্গোলিয়ার আধা-বন্য পরিবেশ থেকে বেরিয়ে প্রাচ্যের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ওপর দখলদারিত্ব কায়েম করেছিল। এখন তাদের সভ্য ও জ্ঞানী জাতিগুলোর সাথে মেলামেশা করতে হচ্ছিল, যাদের উচ্চতর সভ্যতা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করা তাদের বিশ্ব শাসনের জন্য কেবল উপকারীই নয় বরং প্রয়োজনীয় মনে হয়েছিল। ফলে তারা কেবল সেই জাতিগুলোর জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলা এবং আদব-কায়দাই নয়, বরং তাদের আকিদা-বিশ্বাস সম্পর্কেও জানতে আগ্রহী হয়ে উঠল। যে ধর্মগুলো তাতারীদের নিজেদের বলয়ে নিয়ে আসার জন্য সচেষ্ট ছিল, তাদের একটি স্বতন্ত্র দর্শন ছিল, তাই প্রতিটি ধর্মের প্রচারকরা তাতারীদের প্রভাবিত করার ব্যাপারে আশাবাদী ছিল। কিন্তু আল্লাহ তাদের মধ্যে ইসলামকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করলেন।

৫. ইসলামের দাওয়াত সফল হওয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল দাওয়াত দানকারীদের প্রাণপণ প্রচেষ্টা এবং ইবাদত-বন্দেগি। সেই অজ্ঞাতনামা প্রচারক ও দায়ীদের মধ্যে সেই মুজাহিদগণও ছিলেন যারা তাতারীদের লৌহ কারাগারে অসহ্য নির্যাতন সহ্য করছিলেন। এই মহান অভিযানে সেই সব পুরুষ ও নারীদেরও অংশ রয়েছে যারা গোলাম ও দাসী হিসেবে তাদের কাছে তুচ্ছ ও নিচু স্তরের সেবা দিচ্ছিল। এই দায়ীদের মধ্যে সেই সব সুফিগণও ছিলেন যারা অধিকৃত দেশগুলোর নির্জন কোণে বসে পৃথিবীর মানচিত্র পাতে দেওয়ার জন্য দিনের বেলা নীরবে দাওয়াত দিতেন এবং রাতে গোপনে দোয়া করতেন। তাদের মধ্যে এমন কিছু সম্মানিত মুসলমানও ছিলেন যারা তাদের পার্থিব যোগ্যতা ও দক্ষতার কারণে তাতারীদের কাছে কোনো উপযুক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং নিজেদের পদের সুযোগ নিয়ে অত্যন্ত হিকমত ও প্রজ্ঞার সাথে তাদের সত্যের পথে আনার চেষ্টা করতেন।

যখন এই দরদ ও ইখলাসের সাথে শাসকদের ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হলো, তখন তারা প্রথম হৃদয়ের অন্ধকারে আলোর রেখা অনুভব করল। তাদের রাজপুত্র এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করল এবং একে একে এই সত্যকে মেনে নিল। এরপর সাধারণ তাতারীরাও দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করল।

নওমুসলিম মঙ্গোলদের কীর্তিগাঁথা

অমুসলিম তাতার শাসকরা মুসলিম বিশ্বকে কেবল মানুষের কসাইখানা এবং তাদের গবাদি পশুর চারণভূমি হিসেবে ব্যবহার করেছিল, কিন্তু ইসলাম গ্রহণকারী তাতার শাসকরা নতুন করে দেশগুলো আবাদ করার কাজ শুরু করেন। যেহেতু এই সময়ে চেঙ্গিস খানের বংশধররা অনেক ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তার সন্তানদের ডজন ডজন পরিবার অস্তিত্ব লাভ করেছিল, তাই তাদের মধ্যে ক্ষমতা দখলের জন্য রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষও চলতে থাকে যার ফলে বিভিন্ন রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। তবে এই যুদ্ধগুলো ছিল সীমিত পরিসরে এবং মানুষের গণহত্যার সেই দৃশ্যগুলো আর পুনরাবৃত্তি হচ্ছিল না যা তাতারদের পাশবিক ঐতিহ্যের অংশ ছিল। নওমুসলিম তাতার শাসকদের মধ্যে সুলতান বারকা খান, সুলতান আহমদ খান, মাহমুদ গাজান, সুলতান মুহাম্মদ খুদাবন্দাহ, সুলতান আবু সাঈদ, তারমা শিরিন খান এবং মুহাম্মদ উজবেক খান মুসলমানদের উন্নতির জন্য অনেক কাজ করেছেন, নতুন করে আবাদ করার দিকে মনোযোগ দিয়েছেন। তাতারদের অত্যাচারের ভয়ে বাণিজ্যিক কাফেলার যাতায়াত কয়েক দশক ধরে বন্ধ ছিল, তা পুনরায় চালু করা হয়। মুসলমানদের সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং শিল্প-কারখানার নতুন বাগান গড়ে উঠতে শুরু করে। উজাড় হওয়া মুসলিম বিশ্বকে সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে উর্বর করার দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং পূর্বের অনেক কর বিলুপ্ত করা হয়। যেহেতু তাতার শাসকদের সম্পর্ক চীনের সাথে ছিল, তাই ভারত, ইরাক এবং খোরাসানের মুসলমানদের সম্পর্ক মধ্য চীন পর্যন্ত বিস্তৃত হতে থাকে।

চীনা কারিগররা তাদের চিত্রকর্মের শিল্পকে আফগানিস্তান, ভারত এবং মধ্য এশিয়া পর্যন্ত স্থানান্তরিত করে, অন্যদিকে আফগানিস্তান ও ইরান থেকে গালিচা তৈরির শিল্প চীনে পৌঁছায়। সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং শিল্প সম্পর্কের পাশাপাশি মুসলমানদের কথা ও কাজের মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত চীনের সেই দূরবর্তী এলাকাগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে যা এখন পর্যন্ত ইসলাম থেকে বঞ্চিত ছিল। [১]

মুসলিম তাতারদের একটি শাখা যারা ‘শাহানে মুঘলিয়া’ নামে পরিচিত, শতাব্দীকাল ধরে ভারতের ইসলামী সালতানাতে রক্ষক ছিল। এই বংশে বাবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান এবং আওরঙ্গজেবের মতো প্রখ্যাত শাসকরা জন্মগ্রহণ করেন যাদের কীর্তিগাঁথা আজ পর্যন্ত ইসলামী ইতিহাসে সংরক্ষিত আছে এবং উপমহাদেশের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ জুড়ে তাদের স্মৃতিস্তম্ভগুলো আজও তাদের হারানো গৌরবের কাহিনী শুনিয়ে যাচ্ছে। ইতিহাসের এই বিস্ময়কর বিপ্লব এবং তাতারদের এই আমূল পরিবর্তন দেখে অজান্তেই মরহুম ইকবালের এই কবিতাটি ঠোঁটে চলে আসে:

তাতার আক্রমণের কাহিনী থেকে এটি স্পষ্ট

মূর্তিপূজার ঘর থেকেই কাবার রক্ষক মিলেছে।

[১] আদ-দাওলাতুল খাওয়ারিজমিয়াহ ওয়াল মুগোল, পৃ. ২৫৩ থেকে ২৭৩; ইনতিশারুল ইসলাম বাইনাল মুগোল, পৃ. ১৪৬ থেকে ১৭৩, ২০৮ থেকে ২২০, ২২৬ থেকে ২৩৯, ২৫৭।

তারিখ-এ-উম্মত-এ-মুসলিমা

মঙ্গোল খানাতসমূহের তালিকা

(১) মঙ্গোলিয়া ও চীন সাম্রাজ্য

- ১. চেঙ্গিজ খান: ৬০৩ থেকে ৬২৪ হি. (১২০৬ থেকে ১২২৭ খ্রি.) — মঙ্গোল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।
- ২. ওকতায়ী খান বিন চেঙ্গিজ: ৬২৪ থেকে ৬৩৯ হি. (১২২৭ থেকে ১২৪১ খ্রি.) — রাশিয়া ও ইউরোপ নতুন করে বিজয়।
- তোরাকিনা খাতুন (ওকতায়ীর স্ত্রী): ৬৩৯ থেকে ৬৪৪ হি. (১২৪১ থেকে ১২৪৬ খ্রি.) — অন্তর্বর্তীকালীন সময়।
- ৩. গিউক খান বিন তুলি বিন চেঙ্গিজ: ৬৪৪ থেকে ৬৪৫ হি. (১২৪৬ থেকে ১২৪৮ খ্রি.) — খ্রিস্টানদের প্রতি অনুগ্রহ।
- ৪. মঙ্গু খান বিন তুলি: ৬৪৫ থেকে ৬৫৫ হি. (১২৪৮ থেকে ১২৫৭ খ্রি.) — এশিয়ার ওপর নতুন সামরিক অভিযান।
- আরিক বোকা বিন তুলি (বিদ্রোহী): ৬৫৫ থেকে ৬৫৮ হি. (১২৫৭ থেকে ১২৬০ খ্রি.) — কুবলাইয়ের সাথে গৃহযুদ্ধ।
- ৫. কুবলাই খান বিন তুলি: ৬৫৮ থেকে ৬৯৩ হি. (১২৬০ থেকে ১২৯৪ খ্রি.) — মঙ্গোল খানাতসমূহের উত্থানের যুগ। নতুন রাজধানী ‘খান বালিগ’ (পিকিং) আবাদ করেন।

(২) কিপচাক খানাত

- ১. জোচি বিন চেঙ্গিজ: ৬১৮ থেকে ৬২৩ হি. (১২২১ থেকে ১২২৭ খ্রি.) — মঙ্গোলদের গোল্ডেন হোর্ড শাখার প্রতিষ্ঠাতা।
- ২. বাতু বিন জোচি: ৬২৩ থেকে ৬৫০ হি. (১২২৭ থেকে ১২৫২ খ্রি.) — রাশিয়া আক্রমণ—মস্কো ও পোল্যান্ড দখল।
- সারতাক বিন বাতু: ৬৫০ হি. (১২৫২ খ্রি.) — সংক্ষিপ্ত শাসনকাল।

নাম সময়কাল সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ওলাঘটি বিন সারতাক ৬৫১ হিজরি (১২৫৩ খ্রি.) সংক্ষিপ্ত শাসনকাল

৩. বারকা বিন জুজি ৬৫২ থেকে ৬৬৫ হিজরি (১২৫৪ থেকে ১২৬৭ খ্রি.) ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম ব্যক্তি, ইলখানি তাতারদের সাথে জিহাদ।

৪. মাসু তিমুর বিন তুগান বিন বাতু ৬৬৫ থেকে ৬৮১ হিজরি (১২৬৭ থেকে ১২৮৩ খ্রি.) কনস্টান্টিনোপলের ওপর আক্রমণ, ইলখানিদের সাথে যুদ্ধ। ইসলাম গ্রহণ করা প্রমাণিত নয় তবে মুসলমানদের শত্রু ছিলেন না।

৫. তুদান মাসু খান বিন তুগান বিন বাতু ৬৮২ থেকে ৬৮৬ হিজরি (১২৮৩ থেকে ১২৮৭ খ্রি.) পাক্কা মুসলমান। সালতানাতে ইসলামের প্রচার করেন। হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়া এবং ইউক্রেনের খ্রিস্টানদের সাথে জিহাদ করেন। শেষে নিজের ইচ্ছায় রাজত্ব ছেড়ে সুফিদের সাহচর্য গ্রহণ করেন।

৬. তুলাবুগা বিন মাসু তিমুর ৬৮৬ থেকে ৬৯০ হিজরি (১২৮৭ থেকে ১২৯১ খ্রি.) সংক্ষিপ্ত শাসনকাল, মুসলিম শাসক।

৭. তুকতা বিন মাসু তিমুর ৬৯০ থেকে ৭১২ হিজরি (১২৯১ থেকে ১৩১২ খ্রি.) তারকা পূজারী, মুসলমানদের জন্য নরম, সেলজুক রুমের সাথে যুদ্ধ করেন।

৮. মুহাম্মদ উজবেক গিয়াসুদ্দিন বিন তুঘরিল শাহ বিন মাসু তিমুর ৭১২ থেকে ৭৩৬ হিজরি (১৩১২ থেকে ১৩৩৬ খ্রি.) উজবেক জাতির প্রতিষ্ঠাতা। ইসলামের প্রচারে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। তাতারদের অন্যান্য রাজ্যের সাথে যুদ্ধও চলতে থাকে।

৯. জনি বেগ বিন তুঘরিল ৭৩৬ থেকে ৭৫৭ হিজরি (১৩৩৬ থেকে ১৩৫৬ খ্রি.)

১০. মুহাম্মদ বিরদি বেগ বিন জনি ৭৫৭ থেকে ৭৫৯ হিজরি (১৩৫৬ থেকে ১৩৫৯ খ্রি.)

বিরদি বেগের পর তার ছেলে সিকান্দার খান এবং নাতি আবদুল্লাহ খান শাসন করেন। নবম হিজরি শতাব্দীতে (পঞ্চদশ খ্রিস্টীয় শতাব্দীতে) এই সালতানাত ছোট ছোট টুকরোয় বিভক্ত হয়ে যায়। [১]

[১] তারিখ ইবনে খালদুন: খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২০৭ থেকে ২০৯, ত. দারুল ফিকর।

(৩) ইল খানি সালতানাত

নস্বর শাসক শাসনকাল সমসাময়িক সুলতানগণ বিশেষ ঘটনাবলী

১ হালাকু খান ৬৫৪ হিজরি থেকে ৬৬৩ হিজরি (১২৫৬ খ্রি., ১২৬৫ খ্রি.) আইবেক, বাইবার্স ইল খানি সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা

২ আবাকা বিন হালাকু (নাসরানি) ৬৬৩ হিজরি থেকে ৬৮০ হিজরি (১২৬৫ খ্রি., ১২৮১ খ্রি.) বাইবার্স, কালাউন সিরিয়ায় আক্রমণ

৩ তাকুদার আহমদ - মুসলিম ৬৮০ হিজরি থেকে ৬৮৩ হিজরি (১২৮১ খ্রি., ১২৮৪ খ্রি.) কালাউন ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম দেশগুলোর সাথে সন্ধি করেন

৪ আরগুন বিন আবাকা ৬৮৩ হিজরি থেকে ৬৯০ হিজরি (১২৮৪ খ্রি., ১২৯১ খ্রি.) কালাউন সিরিয়ায় আক্রমণ

৫ কাইখাতু বিন হালাকু - মুসলিম ৬৯০ হিজরি থেকে ৬৯৪ হিজরি (১২৯১ খ্রি., ১২৯৫ খ্রি.) আল-আশরাফ খলিল মঙ্গোলদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ

৬ বাইদু বিন তারাকাই বিন হালাকু জমাদিউল আখিরা ৬৯৪ হিজরি থেকে যিলহজ ৬৯৪ হিজরি (এপ্রিল ১২৯৫ খ্রি. থেকে অক্টোবর ১২৯৫ খ্রি.) মুহাম্মদ আন-নাসির বিন কালাউন

৭ গাজান মাহমুদ বিন আরগুন - মুসলিম যিলহজ ৬৯৪ হিজরি থেকে ৭০৩ হিজরি (অক্টোবর ১২৯৫ খ্রি. থেকে ১৩০৪ খ্রি.) আল-আদিল কিতবুগা, লাজিন, মুহাম্মদ আন-নাসির বিন কালাউন সিরিয়ায় আক্রমণ

৮ ওলজাইতু বিন আরগুন, মুহাম্মদ খুদাবান্দা ৭০৩ হিজরি থেকে ৭১৬ হিজরি (১৩০৪ খ্রি. থেকে ১৩১৬ খ্রি.) বাইবার্স সানি জাশনগির, মুহাম্মদ আন-নাসির বিন কালাউন রাফয (শিয়া মতবাদ) প্রচার করেন, পরবর্তীতে তওবা করে সুন্নি হন

৯ আবু সাঈদ - সুন্নি মুসলিম ৭১৬ হিজরি থেকে ৭৩৬ হিজরি (১৩১৬ খ্রি. থেকে ১৩৩৬ খ্রি.) মুহাম্মদ আন-নাসির বিন কালাউন সুন্নাহর পুনর্জাগরণ, মুসলিম দেশগুলোর সাথে সন্ধি

(৩) চাগতাই খানাত

নম্বর শাসক শাসনকাল বিশেষ কথা

১ চাগতাই খান বিন চেঙ্গিস ৬২৩ হিজরি (১২২৬ খ্রি.) থেকে ৬৩৮ হিজরি (১২৪১ খ্রি.)

সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা

২ কারা বুলা খান বিন চাগতাই ৬৩৮ হিজরি (১২৪১ খ্রি.) থেকে ৬৫২ হিজরি (১২৫৩ খ্রি.)

৩ আরগানা খাতুন, কারা বুলার স্ত্রী কিছু সময়

৪ আলগু খান, চাগতাইয়ের নাতি ৬৫২ হিজরি (১২৫৩ খ্রি.) থেকে ৬৬৪ হিজরি (১২৬৫ খ্রি.)

৫ মুবারক শাহ বিন আরগানা ৬৬৪ হিজরি (১২৬৫ খ্রি.) থেকে ৬৬৬ হিজরি (১২৭০ খ্রি.)

চাগতাই সাম্রাজ্যের প্রথম মুসলিম শাসক

৬ বারাক খান গিয়াসুদ্দিন ৬৬৬ হিজরি (১২৭০ খ্রি.) থেকে ৬৬৯ হিজরি (১২৭০ খ্রি.)

মুসলিম শাসক

৭ দুয়া খান বিন বারাক ৬৬৯ হিজরি (১২৭০ খ্রি.)

গৃহযুদ্ধের সময় ৬৬৯ হিজরি (১২৭০ খ্রি.) থেকে ৭০৯ হিজরি (১৩০৯ খ্রি.)

৮ এসান বুগা বিন দুয়া খান ৭০৯ হিজরি (১৩০৯ খ্রি.) থেকে ৭১৮ হিজরি (১৩১৮ খ্রি.)

৯ কেবেক খান ৭১৮ হিজরি (১৩১৮ খ্রি.) থেকে ৭২৬ হিজরি (১৩২৬ খ্রি.) বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, পরে গোপনে মুসলিম হন

১০ তারমা শিরিন খান ৭২৬ হিজরি (১৩২৬ খ্রি.) থেকে ৭৩৪ হিজরি (১৩৩২ খ্রি.) ইসলামে দীক্ষিত হন

১১ জঙ্কশাই ৭৩৪ হিজরি (১৩৩২ খ্রি.) থেকে ৭৩৫ হিজরি (১৩৩৫ খ্রি.) বৌদ্ধ ধর্ম ও খ্রিস্টধর্মের পৃষ্ঠপোষক

১২ বুজুন ৭৩৫ হিজরি (১৩৩৫ খ্রি.) থেকে ৭৪২ হিজরি (১৩৪২ খ্রি.) নামেমাত্র মুসলিম, খ্রিস্টানদের পৃষ্ঠপোষক

১৩ খলিল বিন ইয়াসুর বিন দুয়া ৭৪২ হিজরি (১৩৪২ খ্রি.) থেকে ৭৪৪ হিজরি (১৩৪৩ খ্রি.) সুফি, ইসলাম প্রচারে সক্রিয়

১৪ তৈমুর খান

১৫ গাজান বিন মিসুর বিন দুয়া খান

১৬ দানিশমান্দ ওঘলান

১৭ কুলি খান

১৮ তুঘলক তৈমুর ৭৫৮ হিজরি (১৩৫৭ খ্রি.) থেকে ৭৬৫ হিজরি (১৩৬৩ খ্রি.) ইসলামে দীক্ষিত হন। তৈমুর লঙের প্রভু

১৯ খাজা খিজির খান

তৈমুর লঙের সমসাময়িক

তৃতীয় ফ্রন্ট..... উম্মাহর সংস্কার ও পথনির্দেশনা

সপ্তম ও অষ্টম হিজরি শতাব্দীর নাজুক মুহূর্তগুলোতে যেখানে একদিকে আত্মমর্যাদাশীল ও সাহসী মুসলিম নেতৃবৃন্দ মিলাতে ইসলামিয়ার ভৌগোলিক সীমানাকে আরও পদদলিত হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন, অন্যদিকে অজ্ঞাতনামা দাঈগণ তাতারীদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের মাধ্যমে সেখানকার মুসলমানদের নতুন প্রজন্মের আকিদা ও চিন্তাধারা রক্ষা এবং তাদের সংস্কার ও প্রশিক্ষণের জন্য উম্মাহর এমন একদল কর্মবীর (রিজাল-ই-কার) দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন যারা আল্লাহ তাআলার পরিচয় এবং ইলম ও ফজিলতের সম্পদে সমৃদ্ধ ছিলেন। তাদের মধ্যে বড় একটি অংশ ছিল দৃঢ় ঈমানদার এবং আধ্যাত্মিক অবস্থার অধিকারী (সাহেবে হাল) বুজুর্গদের, যারা পূর্বসূরি নেককারদের (সালাফে সালাহীন) বিশেষ সম্পর্কের উত্তরাধিকারী, তাদের মারেফাতের আমানতদার এবং তাদের কাছেই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলেন, যাদেরকে সুফি ও মাশায়েখ বলা হয়।

পরাজয়, ধ্বংস ও হতাশার এই বিশ্বে অবশিষ্ট মুসলমানদের যদি কোনো কিছুর সাহায্য বেঁচে থাকা সম্ভব হতো, তবে তা ছিল আল্লাহর স্মরণ, তাঁর সাথে সম্পর্ক এবং তাঁর সুস্পষ্ট দ্বীনের ওপর আমল। ইসলামি বিশ্বের অধিকাংশ জনপদ তাতারীদের জবরদখলে ছিল। মুসলমানদের নির্মম গণহত্যা এবং খ্রিস্টান মিশনারিদের তৎপরতা অবশিষ্ট মুসলিম উম্মাহকে ধর্মত্যাগের (ইরতিদাদ) দিকে প্ররোচিত করার মতো অনেক কারণ একত্রিত করেছিল। এই পরিস্থিতি আল্লাহওয়ালাদের অস্থির করে তুলেছিল এবং তারা অনুভব করেছিলেন যে, রাজনৈতিক পরাজয় ও বিপর্যয়ের পর গোমরাহির এই প্লাবনের সামনে যদি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা না হয়, তবে আগামী বছরগুলোতে ইসলাম ও মুসলমানদের অবশিষ্ট কাঠামোও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এই যুগের একজন মহান সুফি বুজুর্গ শেখ নাজমুদ্দিন রাজি (রহ.) (যিনি শেখ নাজমুদ্দিন কুবরা (রহ.)-এর ফয়েজপ্রাপ্ত ছিলেন) তাঁর কিতাব ‘মিরসাদুল ইবাদ’-এর ভূমিকায় লিখেছেন:

“আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই, এই ভয় ও আশঙ্কা তৈরি হয়েছে যে কেবল ইসলামের নামটুকুই অবশিষ্ট রয়ে গেছে, আমরা হাকিকত বা বাস্তবতা থেকে শূন্য হয়ে গেছি, মুসলমানদের কর্মফলের অশুভ পরিণতির কারণে এটাও হয়তো শেষ হয়ে যাবে এবং ইসলামের নাম-নিশানাও মুছে যাবে।” [১]

এই পরিস্থিতি উম্মাহর সংস্কারকদের ব্যথিত করেছিল, ফলে তারা প্রতিটি বিপদ থেকে বেপরোয়া হয়ে সব দিক থেকে উম্মাহর সংস্কার এবং এই নাজুক পরিস্থিতিতে তাদের শরয়ি পথনির্দেশনার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাদের মধ্যে উলামায়ে কেরামও ছিলেন এবং সুফিয়ায়ে কেরামও। এই দৃঢ়সংকল্প উলামাদের প্রচেষ্টা এবং সুফিয়ায়ে কেরামের সিলসিলাগুলো ইসলামি বিশ্বে অসাধারণ গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। পরবর্তী যুগের রাজনীতি, ইলমি ঐতিহ্য এবং সাহিত্য ও কবিতায় এই সংকল্পবদ্ধ ব্যক্তিদের (আসহাবে আজিমত) শিক্ষার গভীর প্রতিফলন দেখা যায়। এই সংস্কারকগণ নতুন করে ঈমান ও মারেফাতের প্রদীপ প্রজ্বলিত করেন এবং সমাজে অন্তরের সংস্কারের (ইসলাহে কলব) মেহনতের ওপর জোর দেন যাতে মানুষ...

[১] মিরসাদুল ইবাদ, পৃ. ১০৯, কলমি পাণ্ডুলিপি, কুতুবখানা আস্তানা, কোম (ইরান)-এ সংরক্ষিত।

আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন, বিপদ-আপদে ধৈর্য, অল্প সম্পদে তুষ্টি, দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি এবং আখেরাতের চিন্তায় অভ্যস্ত হয়ে যান। মুজাদ্দিদ উলামায়ে কেরাম এই উম্মতের হাত ধরেছেন এবং অত্যন্ত প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার সাথে হতাশার ঘোর অন্ধকার থেকে বের করে এনেছেন। নিচে এমন কিছু প্রতিভাবান ব্যক্তিত্বের কথা উল্লেখ করা হলো, যাদের সংস্কারমূলক, দাওয়াতি ও পুনর্জাগরণমূলক প্রচেষ্টার প্রভাব আজও ইসলামী বিশ্বে বিদ্যমান।

শেখ সাইফ উদ্দিন বাখারজি

৫৮৬ হিজরি থেকে ৬৫৯ হিজরি

এই সংকটময় যুগে শেখ সাইফ উদ্দিন বাখারজি (রহ.), যিনি জ্ঞান ও মারেফাতের ক্ষেত্রে নিজ সময়ের মুকুটহীন সম্রাট ছিলেন, এক বিশাল বৈপ্লবিক কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন এবং দাওয়াতে ইসলাম ও তারবিয়াতে রিজালের ময়দানে উম্মতে মুসলিমার জন্য এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়েছেন। তিনি ৫৮৬ হিজরিতে নিশাপুর ও হেরাতের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ‘বাখারজ’ নামক জনপদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম ছিল সাঈদ বিন মুতাহার, তবে তিনি সাইফ উদ্দিন উপাধিতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। দ্বীনি জ্ঞানসমূহে তাঁর মর্যাদা ছিল অত্যন্ত উঁচুতে। ইলমে হাদিসের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। এগারো বছর বয়সে তিনি বাগদাদে আসেন এবং আল্লামা ইবনুল জাওজি থেকে হাদিস শ্রবণ করেন। হিদায়া গ্রন্থকার আল্লামা মারগিনানি (রহ.)-এর পুত্র আল্লামা জালাল উদ্দিন (রহ.)-এর নিকট থেকে ফিকহি দক্ষতা অর্জন করেন। [১] ফিকহে হানাফিতে গভীর পাণ্ডিত্যের কারণে তাঁকে আহনাফ ফকিহদের মধ্যে গণ্য করা হয়। [২]

তাঁর চেহায়ায় নূরের এমন প্রভাব ছিল যে, পূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকানো কঠিন ছিল। তাঁর পীর ও মুর্শিদ শেখ নাজমুদ্দিন কুবরা (রহ.) তাঁকে জনসমক্ষে চলাচলের সময় নেকাব পরার নির্দেশ দিতেন যাতে মানুষ তাঁকে দেখে আত্মহারা না হয়ে পড়ে। [৩] শেখ নাজমুদ্দিন কুবরা (রহ.)-এর নির্দেশে তিনি ৬১৮ হিজরিতে খোয়ারিজমের রাজধানী থেকে বুখারায় আসেন, যা তাতারীদের আক্রমণে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছিল। সে সময় তাঁর বয়স ছিল প্রায় ৩২ বছর। তিনি বুখারাকে কেন্দ্র বানিয়ে সেখানে চল্লিশ বছর নিরলস কাজ করেন। তাঁর খানকাহ একই সাথে আধ্যাত্মিক সাধনার কেন্দ্র এবং হাদিসের মাদরাসা ছিল, যেখানে তিনি ৬২২ হিজরি থেকে বুখারি শরীফের দরস দেওয়া শুরু করেন। [৪] শেখ মিনহাজ উদ্দিন নাসফি (রহ.) তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন:

“তিনি উসুল ও ফুরূ’তে (মূলনীতি ও শাখা-প্রশাখায়) হাদিসের অনুসারী ছিলেন। তিনি জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসাশাস্ত্রে আগ্রহী ছিলেন না। তাঁর আধ্যাত্মিক পথ লৌকিকতামুক্ত ছিল। তিনি জ্ঞান ও ফযিলতের এক অতল সমুদ্র ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী প্রজন্মের জন্য এক গর্বের সম্পদ ছিলেন। তাঁর এক বিশেষ গান্ধীর্ষ ও মর্যাদা ছিল। তাঁর খ্যাতি মুসলমানদের পাশাপাশি তাতারীদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল।”

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ২৩/৩৬৩, ত. আর-রিসালা

[২] আল-জাওয়াহিরুল মুদিয়াহ ফি তাবাকাতিল হানাফিয়াহ: ১/২৩৯

[৩] সিয়রু আলামিন নুবালা: ২৩/৩৬৫, ত. আর-রিসালা

[৪] সিয়রু আলামিন নুবালা: ২৩/৩৬৫, ত. আর-রিসালা

তাঁর হিন্মতে ইলমে হাদিস তুর্কিস্তান এবং মাওরাউন্নাহরে (আরও একবার) ছড়িয়ে পড়ল। ফলে এই অঞ্চলগুলোতে সুন্নাহর নূর ছেয়ে গেল। [১]

তবে এই জনপ্রিয়তার পূর্বে শায়খ অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি যখন বুখারায় আসলেন, তখন সেই দিনগুলোতে সমরকন্দে বায়কু খান নামক এক তাতারী গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিল। [২] সে ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর মানুষ। সে তিরমিয আক্রমণের সময় বর্বরতা ও নৃশংসতার চরম সীমা অতিক্রম করে কেবল সমস্ত মুসলমানকেই হত্যা করেনি, বরং শহরের পশুপাখি পর্যন্ত মেরে ফেলেছিল। সে শায়খ রহমাতুল্লাহ-এর কর্মকাণ্ড এবং তাঁর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার খবর পেল। ফিতনাবাজ চাটুকাররা এই বিষয়গুলোকে ভুল রঙে উপস্থাপন করে বলল: “অবশেষে এই ব্যক্তি আপনার এলাকায় কী করতে এসেছে? নিশ্চিতভাবেই সে খলিফা হতে চায়।”

এ কথা শুনে বায়কু খান হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। সে নির্দেশ দিল শায়খকে গ্রেফতার করে সমরকন্দে নিয়ে আসা হোক। যখন তার সৈন্যরা শায়খের হাতে হাতকড়া এবং পায়ে বেড়ি পরিয়ে উন্মুক্ত তলোয়ারের পাহারায় বুখারা থেকে সমরকন্দে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন শায়খ রহমাতুল্লাহ-এর চেহারায় ভয়ের কোনো চিহ্নই ছিল না। তিনি অত্যন্ত প্রশান্তির সাথে বলছিলেন: “এই লাঞ্ছনার পর শীঘ্রই আমি বড় সম্মানের অধিকারী হব।”

আল্লাহর কুদরত যে, একদিকে শায়খ বাখারযী রহমাতুল্লাহ সমরকন্দের নিকটবর্তী হলেন, অন্যদিকে জালিম ও স্বৈরাচারী বায়কু খানের প্রাণবায়ু নির্গত হলো। তাতারী সৈন্যরা যখন এই সংবাদ পেল, তখন তারা শায়খকে মুক্ত করে দিল এবং এই কারামত দেখে প্রভাবিত হয়ে অনেক তাতারী ইসলাম গ্রহণ করল। সমরকন্দবাসীদের কাছে শায়খ রহমাতুল্লাহ-এর আগমনের খবর পৌঁছে গিয়েছিল। তারা অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে শায়খকে অভ্যর্থনা জানাল। তাদের অনুরোধে শায়খ রহমাতুল্লাহ কয়েক দিন সমরকন্দে অবস্থান করলেন। ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহ-এর মাজার জিয়ারতের জন্য ‘খারতাং’-এও গেলেন। মানুষ তাঁর থেকে প্রচুর উপকৃত হলো। কয়েক দিন পর শায়খ রহমাতুল্লাহ বুখারায় ফিরে গেলেন। [৩]

তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কেবল মুসলমানদের জন্যই অনুকরণীয় আদর্শ ছিল না, বরং তাতারী কর্মকর্তা ও সৈন্যরাও তাঁর দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পারত না। তাঁকে দেখে অসংখ্য মুসলমান নিজেদের সংশোধন করে নিয়েছিল এবং অগণিত তাতারী গোপনে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। তাতারী আমিরগণ তাঁর দ্বারা এতটাই প্রভাবিত ছিলেন যে, তাঁরা তাঁর কোনো কথা প্রত্যাখ্যান করতেন না।

৬৩৬ হিজরিতে তারাবী নামক এক ফিতনাবাজ ব্যক্তি মিথ্যা কারামত ও মোকাশাফার মাধ্যমে এক বিশাল জনগোষ্ঠীকে নিজের চারপাশে একত্রিত করে মঙ্গোলদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, যার ফলে সে নিজে তার সাত হাজার অনুসারীসহ নিহত হয়। তার বাকি অনুসারীরাও নিহত হতো, কিন্তু শায়খ বাখারযীর সুপারিশে মঙ্গোল আমিরগণ তাদের প্রাণভিক্ষা দেন এবং কপালে দাগ লাগিয়ে ছেড়ে দেন। [৪]

[১] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২৩/৩৬৩, ত. আর-রিসালাহ

[২] সমরকন্দ তখন মধ্য এশিয়ার প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল এবং বুখারাও এর অধীনে ছিল।

[৩] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২৩/৩৬৫

[৪] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২৩/৩৬৬, ৩৬৫, ত. আর-রিসালাহ

নোট: তারাব বুখারা থেকে ৯ মাইল দূরের একটি জনপদ। তারাবীর আবির্ভাব এখান থেকেই হয়েছিল। তার আসল নাম ছিল মাহমুদ। সে দাবি করত যে তার অধীনে জিন রয়েছে। সে গায়েব জানারও দাবিদার ছিল এবং এটিও প্রকাশ করত যে তার ওড়ার ক্ষমতা আছে। তার নিহত হওয়ার পরও তার মুরিদরা এটাই মনে করত যে সে উড়ে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে এবং ভবিষ্যতে কোনো এক সময়ে আবার আবির্ভূত হবে। (তারিখে জাহান কুশা, আতা মালিক জুওয়াইনী, পৃ. ১৯১-১৯২, ত. হারস)

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

সেই দিনগুলোতে তাতারীদের একজন বড় সর্দার শায়খের দাওয়াতে ইসলাম গ্রহণ করে তাঁর মুরিদ হয়ে যান। শায়খ তাঁর নাম রাখেন ‘মুমিন’। যেহেতু শায়খ (রহ.) যেভাবে ইসলামের তাবলিগ করছিলেন তাতে তাঁর জীবন সবসময় বিপদের মুখে ছিল, তাই নবমুসলিম তাতারী সর্দার শায়খের স্থায়ী পাহারাদার হয়ে যান। [১]

হাফেজ যাহাবী (রহ.) তাতারীদের মধ্যে শায়খ বাখারযী (রহ.)-এর এই জনপ্রিয়তার কথা উল্লেখ করে লিখেন:

“তাতারীদের মধ্যে শায়খ বাখারযী (রহ.) ‘আলগ শায়খ’ অর্থাৎ বড় হযরত নামে পরিচিত ছিলেন।” [২]

তাতারীদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে শায়খ বাখারযী (রহ.)-এর খ্যাতি পুরো ইসলামি বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। আব্বাসী খলিফার দরবারেও তাঁর নাম সম্মানের সাথে নেওয়া হতো। যদিও তিনি আমির ও শাসকদের সাথে সম্পর্ক রাখা পছন্দ করতেন না, কিন্তু সাধারণ ও বিশিষ্ট সবাই তাঁর দোয়া ও মনোযোগের প্রত্যাশী থাকতেন এবং কোনো না কোনো খিদমত করাকে নিজেদের সৌভাগ্য মনে করতেন। মুসতাসিম বিল্লাহ তাঁকে মূল্যবান উপহার পাঠাতেন। একবার পাঠানো উপহারের মধ্যে হযরত আলী (রা.)-এর নিজ হাতে লেখা কুরআন মাজিদও ছিল। আজারবাইজানের শাসক মুজাফফর উজবেক পাহলওয়ানের মেয়ে তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সেই পবিত্র দাঁত পাঠিয়েছিলেন যা ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছিল। শিরাজের শাসক আবু বকর বিন সাদ প্রতি বছর তাঁর খানকাহর জন্য এক হাজার দিনার হাদিয়া পাঠাতেন। মোসেলের শাসক বদরুদ্দিন লুলুও একবার হাদিয়া পাঠিয়েছিলেন। দিল্লির শাসক সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ এবং তাঁর নায়েবে সালতানাত সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবনও তাঁর সাথে পত্রালাপ করেছিলেন। [৩]

মাহমুদ ইয়ালওয়াজ যখন বুখারার গভর্নর হলেন, তখন তিনি মাথাপিছু এক দিনার এবং প্রতিটি বাণিজ্যিক পণ্যের ওপর দশমাংশ কর ধার্য করেন। এই সময়ে তিনি শায়খ (রহ.)-এর বুজুর্গির খ্যাতি শুনে তাঁকে এক হাজার দিনার পেশ করেন, কিন্তু শায়খ (রহ.) অবৈধ উপায়ে অর্জিত এই সম্পদ অত্যন্ত নির্লিপ্ততার সাথে প্রত্যাখ্যান করেন। [৪]

৬৪৫ হিজরিতে যখন মাস্জু খান মঙ্গোলিয়ার সিংহাসনে বসেন, তখন তিনি তাঁকে অনেক হাদিয়া পাঠান [৫] এবং রূপার...

[১] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২৩/৩৬৬, ত. আর-রিসালাহ

[২] “তাতারীদের মধ্যে শায়খ ‘আলগ শায়খ’ অর্থাৎ ‘আশ-শায়খুল কাবীর’ (বড় শায়খ) হিসেবে পরিচিত ছিলেন।” (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২৩/৩৬৬)

[৩] গিয়াসুদ্দিন বলবন নিশ্চিতভাবেই এই পত্রালাপ নায়েবে সালতানাত হিসেবে করেছিলেন, কারণ তাঁর বাদশাহ হওয়ার কয়েক বছর আগেই শায়খ বাখারযীর ইন্তেকাল হয়ে গিয়েছিল।

[৪] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২৩/৩৬৫, ত. আর-রিসালাহ

মাহমুদ বিন মুহাম্মদ খাওয়ারিজমের অধিবাসী ছিলেন এবং চেঙ্গিস খানের কাছে ব্যবসার জন্য গিয়েছিলেন, চেঙ্গিস খানের অনুগ্রহে তিনি তাঁকে কিনে নেন এবং তিনি মঙ্গোলিয়া সালতানাতের অনুগত হয়ে যান। তিনি চেঙ্গিস খানের পক্ষ থেকে শুরুতে কূটনৈতিক বিষয়ে নিযুক্ত ছিলেন। মঙ্গোলীয় ভাষায় দূতকে “ইয়ালওয়াজ” বলা হয়, ফলে এই শব্দটি তাঁর নামের অংশ হয়ে যায়। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। একই সাথে আরবি, ফারসি, তুর্কি, মঙ্গোলীয়, উইঘুর, খিতাই এবং হিন্দি ভাষা জানতেন। উন্নতি করে তিনি চেঙ্গিস ও তাঁর সন্তানদের উজির এবং পরে গভর্নর হন। মধ্য এশিয়ার গভর্নর হওয়ার পর তিনি অনেক ধ্বংসপ্রাপ্ত ইসলামি শহর নতুন করে আবাদ করেন। (মাজমাউল আদাব লি ইবনিল ফুওয়াতি: ৩/১৯৮, ত. ইরান)

যদিও অন্য একটি দৃষ্টিকোণ থেকে মাহমুদ ইয়ালওয়াজকে মুসলিম মিল্লাতের গাদ্দার হিসেবে বিবেচনা করা হয়, কারণ খাওয়ারিজমে চেঙ্গিস খানের আক্রমণের সাফল্যে তাঁরও হাত ছিল, তবে পরবর্তীতে তিনি যে গঠনমূলক কাজগুলো করেছেন, তা তাঁর অতীতের কিছুটা ক্ষতিপূরণ করে দেয়। মাহমুদ ইয়ালওয়াজের মৃত্যু ৬৫২ হিজরিতে হয় এবং তাঁর ছেলে মাসুদ বেগ তাঁর মৃত্যু ৬৮৮ হিজরি পর্যন্ত তাঁর পদে আসীন ছিলেন। তিনি বড় আলেম ও গুণী ব্যক্তি ছিলেন। এরপর তাঁর ছেলে আবু বকর ৬৯৭ হিজরি পর্যন্ত এই পদে ছিলেন। তাঁরা দুজনেই অনেক নির্মাণ কাজ করিয়েছেন। (দাওরু তুর্কিস্তান ফি ইসলামিল মুগুলা লিদ-দুকতুর মুহাম্মদ আলী আল-বার, পৃ. ৩১)

[৫] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২৩/৩৬৭, ত. আর-রিসালাহ

তারিখ-এ-উম্মত-এ-মুসলিমা (ষষ্ঠ খণ্ড)

এক হাজার ইঁটও বুখারা পাঠানো হয়েছিল যাতে শেখ বাখরযীর তত্ত্বাবধানে একটি মাদ্রাসা তৈরি করা হয়। মঙ্গু খানের নির্দেশে এই মাদ্রাসার খরচের জন্য বিশাল ও প্রশস্ত কৃষি জমিও ওয়াকফ করা হয়েছিল। [১]

মঙ্গু খানের যুগে মাহমুদ ইয়ালভাজের ছেলে মাসুদ বুখারার গভর্নর হয়ে এসেছিল, যে একজন মুতাজিলা আলেম ছিল। সে শেখের চৌকাঠ চুম্বন করল এবং ততক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে থাকল যতক্ষণ না সাক্ষাতের অনুমতি পেল। সে বলত: “শেখের প্রভাব আমাদের কর্মকর্তাদের অন্তরে এতটাই যে, তিনি যদি আমাকে হত্যার নির্দেশ দেন তবে তারা আমাকে বিনা দ্বিধায় হত্যা করে ফেলবে।” [২]

শেখ বাখরযী সর্বদা সত্যবাদী ও সঠিক পথে অটল ছিলেন এবং জালেম শাসকদের সামনে সত্য কথা বলতে কখনো কুণ্ঠাবোধ করেননি। যখন চাগতাই খানের উজির ইমাদ উদ্দীন হাবশ মধ্য এশিয়ার গভর্নর হলো, তখন শুরুতে সে মুসলমানদের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার চিন্তা করেনি বরং তার উদ্দেশ্য ছিল তাতারী প্রভুদের খুশি রাখা। এমন পরিস্থিতিতে শেখ বাখরযী (রহ.) তাকে একটি পত্র লিখলেন এবং তাতে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করে বললেন:

“আল্লাহ তোমাকে এই ক্ষমতা দিয়েছেন যাতে তুমি সত্যের দায়িত্ব পালন করো এবং সত্যের সাথে থাকো। যদি তুমি তা না করো, তবে বলো কাল কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে কী ওজর পেশ করবে?” [৩]

শেখ (রহ.) একজন চমৎকার বক্তা ছিলেন এবং তাঁর ভাষণগুলো অত্যন্ত প্রভাবশালী হতো যাতে নসিহতপূর্ণ কবিতার মাধুর্যও মিশে থাকত। শেখ (রহ.)-এর সাথে এমন গোলামরা ছিল যারা সবাই হাফেজে কুরআন এবং খোশনবীশ (লিপিকার) ছিল। শেখ (রহ.) তাদের কুরআন মাজীদ ও হাদীসও পড়াতেন।

শেখ (রহ.)-এর মৃত্যু ঘিলকদ ৬৫৯ হিজরীতে হয়েছিল। তাঁর ওসিয়ত অনুযায়ী তাঁকে তাঁর মুর্শিদ শেখ নজম উদ্দীন কুবরার খেরকায় (পোশাকে) কাফন দেওয়া হয়েছিল। তাঁর ওসিয়ত এও ছিল যে, তাঁর লাশের ওপর যেন কোনো বিলাপ ও মাতম না করা হয় এবং জানাজার আগে আগে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের প্রথাও যেন পালন না করা হয়।

বলা হয় যে, তাঁর জানাজার নামাজে চার লক্ষ মানুষ অংশগ্রহণ করেছিল। [৪] তিনি তাঁর উত্তরাধিকার হিসেবে নেক সন্তান, মাজায-ই-সিলসিলা (অনুমতিপ্রাপ্ত উত্তরসূরি), প্রশিক্ষিত মুরিদ এবং নওমুসলিম তাতারীদের এক বিশাল জামাত রেখে গেছেন। এ ছাড়া তিনি সুফিয়ানা কবিতা, রিসালাহ, ফতোয়া এবং চিঠিপত্রের এক বিশাল ভাণ্ডার রেখে গেছেন, যার বেশিরভাগই সময়ের আবর্তনে নষ্ট হয়ে গেছে, তবে তার কিছু অংশ “মজমুআ-এ-আসার-এ-সাইফ উদ্দীন বাখরযী” নামে প্রকাশিত হয়েছে। [৫]

[১] তারিখ-এ-জাহান কুশাজুয়িনী, পৃষ্ঠা ৪২৩, ত. ইনতিশারাত-এ-হরমস ইরান; তারিখ-এ-হাবীবুস সিয়্যার: ৩/৬১

[২] সিয়্যারু আলামিন নুবালা: ২৩/৩৭২, ত. আর-রিসালাহ

[৩] দুওয়াত-এ-তুর্কিস্তান ফিল ইসলাম লিল ডক্টর মুহাম্মদ আলী আল-বার, পৃষ্ঠা ৩২, ৩১

[৪] সিয়্যারু আলামিন নুবালা: ২৩/৩৬৩ থেকে ৩৬৯, ত. আর-রিসালাহ

[৫] এই সংকলনটি মাওলানা গোলাম নবী তওয়াঙ্কুলী চিশতীর প্রচেষ্টায় সংকলিত হয়ে “মুয়াসসাসাত-এ-নশর-এ-তেহরান” থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

শেখ মুসলিহ উদ্দিন সাদী শিরাজী

(৫৮৯ হিজরি থেকে ৬৯১ হিজরি / ১১৯৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২৯৩ খ্রিষ্টাব্দ)

তাতারীদের অধীনে থাকা মুসলিম দেশগুলোর পরাধীন মুসলমানদের সেই যুগে এমন উচ্চ সাহসী এবং অভিজ্ঞ সংস্কারকদের একান্ত প্রয়োজন ছিল, যাদের তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় তারা নিজেদের জীবনপথ নির্ধারণ করতে পারে এবং সময়ের চাহিদার আলোকে তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে পথ চলতে পারে। এই প্রয়োজন পূরণের জন্য যারা এগিয়ে এসেছিলেন, তাদের মধ্যে শেখ সাদী (রহ.)-এর ভূমিকা অত্যন্ত উজ্জ্বল। তিনি বাগদাদে আল্লামা ইবনুল জাওজি (রহ.)-এর কাছে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভ করেন। এছাড়া জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে তিনি দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ান এবং ইরাক, হিজাজ ও সিরিয়ার আনাচে-কানাচে ভ্রমণ করেন। এই সময়ে তিনি সিরিয়ার উপকূলে খ্রিস্টানদের হাতে বন্দীও হন এবং পরে একজন মুসলিম আমির মুক্তিপণ আদায় করে তাকে মুক্ত করেন এবং নিজের মেয়ের সাথে তার বিয়ে দেন। তিনি হিন্দুস্তানও সফর করেন এবং পণ্ডিতদের সাথে বিতর্ক ও আলোচনা করেন। একবার পূজারীর বেশ ধরে একটি মন্দিরেও কিছু দিন অতিবাহিত করেন।

মুসলিম বিশ্বে তাতারীদের আক্রমণের কিছুকাল আগে, যখন খোয়ারিজম সালতানাত এবং চেঙ্গিস খানের সালতানাতের মধ্যে বাণিজ্যিক চুক্তি হয়েছিল, তখন তিনি চীনা তুর্কিস্তান সফর করেন। সে সময়ও তার যৌবনকালের কবিতাগুলো এই দূরবর্তী অঞ্চলেও জনপ্রিয় ছিল। অবশেষে তাতারীদের সেই প্রলয়ঙ্করী আক্রমণ শুরু হয় যা অন্যান্য সালতানাতের সাথে সাথে তার জন্মভূমি শিরাজকেও গ্রাস করে। শেখ সাদী (রহ.) এই সময়টি নির্বাসিত অবস্থায় কাটান। উম্মতে মুসলিমার এই করুণ অবস্থা এবং বিভিন্ন দেশ ও জনপদে এই মহাবিপর্ষয়ের রক্তক্ষয়ী দৃশ্যগুলো তিনি সচক্ষে দেখেন এবং এর তীব্র প্রভাব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। ৬৫৬ হিজরি (১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) সালে যখন হলাকু খান বাগদাদ ধ্বংস করে আব্বাসীয় খিলাফতের অবসান ঘটান, তখন শেখ সাদী (রহ.) দুঃখ ও শোকে ফেটে পড়েন:

আসমান রা হক বুওয়াদ গর খুন বিবারদ বর জমিন... বর জাওয়াল-এ-মুলক-এ-মুস্তাসিম
আমিরুল মুমিনীন

“আমিরুল মুমিনীন মুস্তাসিমের শাসনের পতনের শোকে আকাশ যদি জমিনে রক্ত বর্ষণ করে, তবে তা যথার্থই হবে।” [১]

এই অস্থির সময়ে শেখ সাদী (রহ.) তার জন্মভূমি শিরাজ-এ ফিরে আসেন। তখন সেখানে তাতারীদের করদরাজ্য হিসেবে আবু বকর বিন সা’দ-এর শাসন ছিল। শেখ সাদী (রহ.) এখানে দরবেশসুলভ জীবন বেছে নেন এবং খানকাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংশোধন ও প্রশিক্ষণের কাজ শুরু করেন। তিনি শিরাজ শহরের বাইরে রুকনাবাদ-এর তীরে একটি বাগানে নিজের খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে মার্বেল পাথরের হাউজ তৈরি করেন। সালেকীনরা সেখানে সমবেত হতেন, শেখের দস্তরখানে খাবার খেতেন এবং তার হৃদয়স্পর্শী কথা শুনতেন। তাদের মধ্যে এমন লোকও থাকত যারা সেই হাউজগুলোতে কাপড় ধুতে আসত।

সেই যুগের প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমগুলোর মধ্যে বক্তৃতা, কবিতা, রচনা ও সংকলন এবং ওয়াজ ও নসিহত বিশেষ গুরুত্ব বহন করত।

[১] কুল্লিয়াতে সাদী, পৃষ্ঠা ৪৬।

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা — চতুর্থ খণ্ড

শেখ রহমতুল্লাহি আলাইহি সেই সমস্ত পথ ও মাধ্যম গ্রহণ করেছিলেন এবং উম্মাহকে সেই আধ্যাত্মিক ও তাত্ত্বিক খোরাক সরবরাহ করেছিলেন যার তাদের প্রয়োজন ছিল। এই সিলসিলায় শেখ রহমতুল্লাহি আলাইহি ওয়াজ ও নসিহতের মজলিস কায়েম করেন, হাজার হাজার কবিতা বলেন এবং অনেক রিসালা ও কিতাব রচনা করেন, যার মধ্যে গুলিস্তাঁ ও বোস্তাঁ অমর মর্যাদা লাভ করেছে। তিনি অত্যন্ত খারাপ পরিস্থিতিতেও তাঁর শ্রোতাদের হতাশা ও নিরুৎসাহিত হতে দিতেন না এবং হাস্যরসাত্মক বর্ণনায় কিছা ও উদাহরণের মাধ্যমে সংশোধন করতেন।

শেখ সাদী রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর এই মিশনে এতই সফলতা লাভ করেন যে, আপন-পর সবাই তাঁর মিষ্টভাষার ভক্ত হয়ে যায়। তাঁর লেখনি ফাসাহাত ও বালাগাত এবং প্রাঞ্জলতার উচ্চ মান হিসেবে গণ্য হতে থাকে এবং তাঁর কবিতার সূক্ষ্মতা ও কমণীয়তাকে কাব্যকলার চরম শিখর হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হতে থাকে। দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ আসত এবং তাঁর গদ্য ও পদ্যের অনুলিপি নিজ নিজ দেশে নিয়ে যেত। ফলে যাতায়াতের অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও সেই যুগে শেখ সাদী রহমতুল্লাহি আলাইহির লেখনি সারা বিশ্বে জনপ্রিয় হয়ে গিয়েছিল।

শেখ সাদী রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর বাণীতে উত্তম গুণাবলী ও উচ্চতর নৈতিকতার শিক্ষার পাশাপাশি তাঁর পাঠকদের অবচেতনভাবে আশা, উদ্দীপনা, সাহস, প্রাণবন্ততা ও প্রফুল্লতার দিকে নিয়ে যান। গুলিস্তাঁ ও বোস্তাঁ পড়লে কোথাও ভয়, হতাশা ও নিরাশার পরিবেশ পাওয়া যাবে না বরং আজও দুর্ঘটনার শিকার মানুষ এগুলো অধ্যয়ন করে নিজেকে সতেজ ও আনন্দিত অনুভব করে। ঐতিহাসিক কাহিনী, উপকথা, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, সংবাদ, কৌতুক এবং প্রাসঙ্গিক কবিতায় সজ্জিত শেখ সাদী রহমতুল্লাহি আলাইহির লেখনি মুসলিম উলামা ও গুণীজনদের এক নতুন ধারার প্রচেষ্টার সাথে পরিচিত করিয়েছে এবং দেখতে দেখতে কলম সৈনিকদের একটি পুরো দল এই ময়দানে নেমে আসে। যেহেতু তাতারীরা জ্ঞান ও গুণ থেকে বঞ্চিত ছিল, তাই তারা এই ময়দানে এই কলম সৈনিকদের ওপরই নির্ভর করতে বাধ্য হয়। এর ফলাফল এই দাঁড়াল যে, মুসলিম গুণীজন, সাহিত্যিক ও কবিরা প্রকাশ্যে কাজ করার সুযোগ পেলেন এবং কাফেরদের অধিকৃত এলাকাগুলোতে এমন কার্যকর অবস্থান তৈরি হলো যার মাধ্যমে তারা শুধু সমাজ নয় বরং শাসক শ্রেণীকেও তাত্ত্বিকভাবে প্রভাবিত করতে পুরোপুরি সফল হলেন।

শেখ সাদী রহমতুল্লাহি আলাইহির দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল এই যে, তিনি সেই যুগের অবশিষ্ট স্বাধীন বা করদ মুসলিম শাসক ও বাদশাহদের পথপ্রদর্শন ও মনন গঠনে নিয়মিত কাজ করেছেন। তাঁর কবিতায় শাসকদের সংশোধনের দিকটি অত্যন্ত উজ্জ্বল। গুলিস্তাঁ ও বোস্তাঁ-র শুরুর অধ্যায়গুলো এই বিষয়ের সাথেই সম্পর্কিত। শেখ সাদী রহমতুল্লাহি আলাইহি দীর্ঘ জীবন পেয়েছিলেন এবং নিজের প্রচেষ্টার প্রভাব নিজের জীবনেই দেখে নিয়েছেন। ৬৯১ হিজরি (১২৯৫ খ্রিস্টাব্দ) এ যখন তাঁর মৃত্যু হয়, তখন পরিস্থিতি অনুকূল হয়ে গিয়েছিল এবং ইসলামের পুনর্জাগরণের স্বপ্নের বাস্তবায়ন একটি বাস্তবতা হিসেবে সামনে এসেছিল। [১]

[১] রেহলা ইবনে বতুতা: ৫০/২, ত. একাডেমিয়া আল-মাগরিবিয়া আর-রিবাত; মুজামুল মুআল্লিফিন, ওমর বিন রেজা: ১৫১/৬, ত. মাকতাবাতুল মুসান্না বৈরুত; আল-আনওয়ারুস সাতিআহ ফিল মিয়াতুস সাবিআহ লিশ-শেখ আগা বুজুর্গ তেহরানি, মাকতাবাতুশ শামিলা; আল-হাওয়াদিসুল জামিআহ লি ইবনুল ফুওয়াতি: সন ৬৯৩ হিজরি। শেখ সাদীর জীবনের অনেক ঘটনা তাঁর রচনা গুলিস্তাঁ ও বোস্তাঁ-তেও ছড়িয়ে ছিটিয়ে পাওয়া যায়।

শাইখুল ইসলাম ইযযুদ্দীন ইবনে আবদুস সালাম

৫৭৮ হিজরী থেকে ৬৬০ হিজরী

শাইখুল ইসলাম ইযযুদ্দীন ইবনে আবদুস সালাম (রহ.) সপ্তম হিজরী শতাব্দীর মহান ইলমী ব্যক্তিত্বদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি ৫৭৮ হিজরীতে দামেস্কে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কোনো আলেম পরিবারের সদস্য ছিলেন না, আর শৈশবে দ্বীনি ইলম অর্জনের সুযোগও পাননি। যৌবনকাল পর্যন্ত তিনি একজন দরবেশ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন এবং জামে উমাবীর এক কোণে ইতিকাহে থাকতেন। ইবাদত ও রিয়াযতই ছিল তাঁর ওড়না ও বিছানা। একদিন প্রচণ্ড শীতের রাতে তাঁর গোসলের প্রয়োজন হলো। রাতে মসজিদের দরজাগুলো বাইরে থেকে বন্ধ করে দেওয়া হতো। তাই বাইরে গিয়ে গরম পানি সংগ্রহ করার কোনো উপায় ছিল না। তিনি ভাবলেন সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন এবং মসজিদের পুকুরের ঠান্ডা পানি দিয়ে গোসল করবেন। এরপর ঘুমানোর জন্য শুলে শীতের তীব্রতায় তিনি অচেতন হয়ে পড়েন। এই অবস্থায় তিনি এক গায়েবী আওয়াজ শুনতে পান: “তুমি কি ইলম চাও নাকি আমল?” তাকদীরে তাঁর জন্য সৌভাগ্য লেখা ছিল, তাই তিনি উত্তর দিলেন: “ইলম, কারণ ইলমের মাধ্যমেই আমলের পথ পাওয়া যায়।”

সকালে ঘুম থেকে উঠলে তাঁর হৃদয়ে দ্বীনি ইলম অর্জনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে। তিনি উলামায়ে কেরামের মজলিসে যুক্ত হন যেখানে তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ও মেধার বিকাশ ঘটে। খুব দ্রুতই তিনি বিভিন্ন ইলম ও ফন (কলাকৌশল)-এ পারদর্শী হয়ে ওঠেন।

[১]

হাফেজ ইবনে আসাকির (রহ.) এবং শাইখ সাইফুদ্দীন আমেদী (রহ.)-এর মতো মুহাদিসগণ তাঁর উস্তাদদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এরপর যখন তিনি দরস প্রদান শুরু করেন, তখন তাঁর মজলিস থেকে বড় বড় প্রখ্যাত আলেম তৈরি হন, যাদের মধ্যে ‘কিতাবুর রওজাতাইন’-এর লেখক আল্লামা আবু শামা মাকদিসী (রহ.) এবং হাদিসের ব্যাখ্যাকার আল্লামা ইবনে দাকীকুল ঈদ (রহ.)-এর মতো মূল্যবান রত্নরা ছিলেন। [২]

ইলমী মাকাম এবং সমাজে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব:

আল্লামা ইযযুদ্দীন ইবনে আবদুস সালাম (রহ.) দামেস্কের জামে মসজিদের যাওয়িয়া গাযালিয়াতে শিক্ষক ছিলেন। [৩] তাফসীর, হাদিস এবং ফিকহসহ বিভিন্ন শাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল, তাই তাঁর ইলমের মজলিস ছিল প্রবহমান নদীর মতো। তাঁকে ‘শাইখুল ইসলাম’ এবং ‘সুলতানুল উলামা’ উপাধিতে স্মরণ করা হতো। [৪] নেক কাজের প্রসার এবং গুনাহ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ উদ্দীপনা ছিল। শরীয়তের মাকাসিদ (উদ্দেশ্য), দ্বীনি আহকাম ও তার সূক্ষ্ম বিষয়গুলো অনুধাবনের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর যুগে অনন্য ছিলেন। আল্লামা সুবকী (রহ.)-এর মতে: ইলম, তাকওয়া, সত্যবাদিতা, সাহস, বীরত্ব এবং বাগ্মিতায় তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। [৫] তাঁর সমসাময়িক হাফেজ আবদুল আযীম আল-মুনযিরী (রহ.) (আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব-এর লেখক) বলতেন: “যে শহরে ইবনে আবদুস সালাম উপস্থিত আছেন, সেখানে অন্য কারো ফতোয়া দেওয়া সমীচীন নয়।” [৬]

[১] তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ আল-কুবরা লিস-সুবকী: ৮/২১২, ২১৩, ত. হিজর।

[২] তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ আল-কুবরা: ৮/২৪২।

[৩] তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ আল-কুবরা: ৮/২০৯।

[৪] তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ আল-কুবরা: ৮/২১১।

[৫] তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ আল-কুবরা: ৮/২০৯।

বিদআত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জিহাদ:

তিনি বিদআত ও অবৈধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সর্বদা মৌখিক জিহাদে লিপ্ত ছিলেন। আল্লামা আবু শামা মাকদিসি (রহ.) বলেন যে, তাঁর প্রচেষ্টার ফলে সিরিয়ায় অনেক বিদআত নির্মূল হয়েছে এবং অনেক সুন্নাহ পুনর্জীবিত হয়েছে। [১]

তিনি আইয়ুবী বংশের বেশ কয়েকজন সুলতানের শাসনকাল দেখেছেন। আল-মালিক আল-কামিল তাঁর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি যখন আল্লামাকে দামেস্কের কাজীর পদ গ্রহণের প্রস্তাব দেন, তখন তিনি উম্মতে মুসলিমার স্বার্থ বিবেচনা করে বেশ কিছু শর্ত আরোপ করে তা গ্রহণ করেন। তিনি সুলতানের পক্ষ থেকে বাগদাদের খলিফার কাছে দূত হিসেবেও নিযুক্ত হন। আল-কামিল জামে উমাবীর ইমামতি ও খুতবা প্রদানের দায়িত্বও তাঁর ওপর অর্পণ করেছিলেন [২], যাতে মানুষ অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিল। কারণ দীর্ঘকাল ধরে দামেস্কের এই প্রাচীনতম ইলমি ও ঈমানি কেন্দ্রটি কোনো প্রতিভাধর ব্যক্তিত্বের ফয়েজ থেকে বঞ্চিত ছিল। যখন আল্লামা ইবনে আবদুস সালাম (রহ.) মিস্বারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন তিনি প্রকাশ্যেই শরীয়ত পরিপন্থী প্রথা ও বিদআতের প্রতিবাদ করেন এবং কার্যত অনেক প্রথা ও বিদআত বন্ধ করে দেন। এর আগে খতিবরা সবুজ রঙের দামী জুব্বা (তাইলসান) পরিধান করতেন, খুতবার আগে তিনবার মিস্বারে তলোয়ার ঠুকতেন এবং হন্দময় ও অন্ত্যমিলযুক্ত খুতবা দিতেন, যাতে শব্দের জাঁকজমক বেশি থাকলেও অর্থগত প্রভাব কম ছিল। খুতবায় সুলতানদের অতিরঞ্জিত প্রশংসা ও গুণকীর্তনের প্রচলনও সাধারণ ছিল। বেশ কয়েকজন মুয়াজ্জিন মিলে খতিবের সামনে জুমার দ্বিতীয় আজান দিতেন। আল্লামা ইবনে আবদুস সালাম (রহ.) এই সমস্ত প্রথা বন্ধ করে দেন এবং সুন্নাহ অনুযায়ী সমস্ত পদ্ধতি চালু করেন। নিজের সামনে জুমার দ্বিতীয় আজানের জন্য মাত্র একজন মুয়াজ্জিন নিযুক্ত করেন। তিনি সহজ-সরল শব্দে খুতবা দিতেন। বাদশাহদের প্রশংসার পরিবর্তে তিনি তাঁদের জন্য দোয়ার ধারা শুরু করেন। [৩]

এর আগে মানুষ ফরজ নামাজের পর “إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ” আয়াতটি পাঠ করত, অথচ এই বিষয়টি সুন্নাহে নববী দ্বারা প্রমাণিত নয়। আল্লামা ইবনে আবদুস সালাম এটি বন্ধ করে দেন এবং এর পরিবর্তে “لا إله إلا الله وحده لا شريك له” পাঠের নিয়ম চালু করেন [৪], যা সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। [৫]

সুলতানদের সংশোধন ও প্রশিক্ষণ:

শায়খুল ইসলাম (রহ.) আইয়ুবী সুলতানদের এবং তাঁদের পরবর্তী মামলুকদের শাসনামলে সৃষ্ট রাজনৈতিক ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেন এবং প্রয়োজনবোধে শাসকদের ভুল সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে খোলাখুলি দ্বিমত পোষণ করেন। অনেক সময় তাঁর সত্যবাদিতার কারণে শাসকরা অসন্তুষ্টও হতেন, কিন্তু তিনি কখনো তার পরোয়া করেননি। [৬]

[১] তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ আল-কুবরা: ৮ / ২১০

[২] তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ আল-কুবরা: ৮ / ২৩২

[৩] তাবাকাতুশ শাফিইয়্যীন লি-ইবনে কাসীর, পৃ. ৮৭৩; তারিখুল ইসলাম লিয-যাহাবি, ওফাত: ৬৬০ হিজরি

[৪] পূর্বোক্ত সূত্র

[৫] এই দোয়াটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجُدُّ (সহিহ মুসলিম, হা: ১৩২৬, বাবু ইসতিহাবাবিল জিকর বা'দাস সালাত)

কিছু হাদিসে দোয়াটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (সহিহ মুসলিম, হা: ১৩৭১, বাবু ইসতিহাবাবিল জিকর বা'দাস সালাত)

[৬] তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ আল-কুবরা: ৮ / ২১০

সিরিয়ার শাসক আল-মালিক আল-আশরাফকে নসিহত:

শায়খুল ইসলাম রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাতারীদের আক্রমণের শুরুতেই মুসলিম বিশ্বের ওপর এর ধ্বংসাত্মক প্রভাব আঁচ করতে পেরেছিলেন এবং এ বিষয়ে একটি অটল ও দ্ব্যর্থহীন অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল যে, মুসলিম শাসকদের পারস্পরিক মতভেদ ভুলে এই তুফানের মোকাবিলায় ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত। শায়খুল ইসলাম রহমাতুল্লাহি আলাইহির এই আহ্বান সাধারণ মানুষের মজলিস থেকে শুরু করে শাসকদের রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। তিনি সর্বত্র জিহাদের জয়বা এবং দ্বীনি আত্মমর্যাদার এই বার্তার ঘোষক ছিলেন।

একজন মহান আলেম, মুফতি এবং খতিব হিসেবে তিনি সিরিয়ার সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে অত্যন্ত সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হতেন। কিন্তু সেই দিনগুলোতে সিরিয়া ও মিশরের সরকারগুলো পরিণতির কথা চিন্তা না করে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব লিপ্ত ছিল। তাতারীদের আক্রমণ, খাওয়ারিজমের ধ্বংসলীলা এবং সুলতান জালালুদ্দিনের বারো বছরের জিহাদি তৎপরতার সময়ে সিরিয়ার বাদশাহ আল-মালিক আল-আশরাফ তাতারীদের বিরুদ্ধে তলোয়ার ধরা থেকে সম্পূর্ণ বিরত ছিলেন। শায়খুল ইসলাম রহমাতুল্লাহি আলাইহি বাদশাহর এই নীতির সাথে কঠোর দ্বিমত পোষণ করতেন এবং চাইতেন যে সিরিয়ার সেনাবাহিনী তাতারীদের বিরুদ্ধে সারিবদ্ধ হোক। কিন্তু আফসোস যে, আল-মালিক আল-আশরাফ এই দায়িত্ব কখনো অনুভব করেননি। নিজের মৃত্যুর কিছুদিন আগে যখন তিনি অসুস্থ হয়ে জীবনের আশা ছেড়ে দিলেন, তখন তিনি শায়খুল ইসলাম রহমাতুল্লাহি আলাইহির খেদমতে নিজের ঘনিষ্ঠ আমিরকে পাঠিয়ে অনুরোধ করলেন যেন তিনি অসুস্থতা দেখতে এবং দোয়ার জন্য তাশরিফ আনেন। শায়খুল ইসলাম রহমাতুল্লাহি আলাইহি অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখার সুন্নাত আদায়ের নিয়তে তাশরিফ নিলেন। আল-মালিক আল-আশরাফ তাঁর হাত চুম্বন করলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে আরজ করলেন: “আমার জন্য দোয়া করুন এবং কিছু নসিহতও করুন।”

শায়খুল ইসলাম রহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন: “এই মুহূর্তে তাতারীরা ইসলামি দেশগুলোতে ঢুকে পড়ছে। তারা এই কথা থেকে শক্তি পাচ্ছে যে, আল্লাহর শত্রু এবং মুসলমানদের প্রতিপক্ষদের সাথে যুদ্ধ করার ফুরসত আপনার নেই। এই সময়েও আপনি আপনার ভাই আল-মালিক আল-কামিলের সাথে যুদ্ধের জন্য ছাউনি ফেলে বসে আছেন। আমার আরজ হলো, আপনি আপনার লক্ষ্য ওদিক থেকে সরিয়ে ইসলামের শত্রুদের দিকে ফিরিয়ে নিন। যদি আপনি সুস্থ হন, তবে আমাদের আশা আছে যে আল্লাহ আপনাকে কাফেরদের ওপর বিজয় দান করবেন। আর যদি আল্লাহর ফয়সালা অন্য কিছু হয়, তবে সুলতান নিজের নিয়তের বরকতে দুনিয়া থেকে বিদায় নেবেন।”

আল-মালিক আল-আশরাফ নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। তিনি তাঁর সেই বাহিনীকে, যা আল-মালিক আল-কামিলের মোকাবিলায় যাচ্ছিল, তাতারীদের মোকাবিলায় অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন। [১]

আস-সালিহ ইসমাইলের দুর্ব্যবহার এবং শায়খুল ইসলামের গ্রেফতারি:

আফসোস যে, এর পরপরই মালিক আল-আশরাফ ইন্তেকাল করেন এবং তাঁর ছেলে সালিহ ইসমাইল তাতারীদের বিরুদ্ধে জিহাদের এই নির্দেশ কার্যকর করতে বাধা দেন। অধিকন্তু, তিনি খ্রিস্টান শাসকদের সাথে বন্ধুত্বের ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে শুরু করেন। ৬৩৮ হিজরিতে তিনি “সাইদা” এবং “শাকীফ আরনুন” সহ বেশ কিছু মজবুত দুর্গ তাদের হাতে তুলে দেন।

[১] তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ আল-কুবরা: ৮/২৩০, ২৩১

তারিখে উম্মতে মুসলিমা — চতুর্থ খণ্ড

শাইখুল ইসলাম রহমাতুল্লাহি আলাইহি সালিহ ইসমাইলের এই নির্লজ্জতায় অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। তিনি খুতবায় তার জন্য দোয়া করা ছেড়ে দিলেন। তার পরিবর্তে তিনি এই দোয়া করতেন যে, হে আল্লাহ! ইসলাম এবং এর রক্ষকদের সাহায্য করুন।

সালিহ ইসমাইলের সাথে বন্ধুত্বের কারণে ফিরিজিরা এতটাই সাহসী হয়ে উঠেছিল যে, তারা দামেস্কে এসে অস্ত্রশস্ত্র ত্রয় করত। শাইখুল ইসলাম রহমাতুল্লাহি আলাইহি কীভাবে সহ্য করতে পারতেন যে, ফিরিজিরা মুসলমানদের কাছ থেকে অস্ত্র কিনে তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবহার করবে। তিনি অস্ত্র ব্যবসায়ীদের ফতোয়া দিলেন যে, ফিরিজিদের কাছে অস্ত্র বিক্রি করা জায়েজ নয়, কারণ এগুলো মুসলমানদের বিরুদ্ধেই ব্যবহৃত হবে।

শাইখুল ইসলাম রহমাতুল্লাহি আলাইহির এই পদক্ষেপগুলোর বিরুদ্ধে সরকার সক্রিয় হয়ে উঠল এবং সুলতান সালিহ ইসমাইলের আদেশে তাকে গ্রেপ্তার করা হলো। কিছুকাল তিনি দামেস্কের কারাগারে বন্দি থাকলেন। এরপর তাকে বায়তুল মুকাদ্দাসে স্থানান্তরিত করা হলো।

কিছুকাল পর সালিহ ইসমাইল ফিরিজিদের সাথে নিয়ে মিসর আক্রমণের জন্য সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করল। পথে বায়তুল মুকাদ্দাস অতিক্রম করতে হলো। সালিহ ইসমাইলের মনে অনবরত এই ভয় কাজ করছিল যে, শাইখুল ইসলামের গ্রেপ্তার তাকে কলঙ্কিত করছে, তাই সে তার এক বিশেষ সহচরকে নিজের রুমাল দিয়ে বলল:

“এটি শাইখুল ইসলামের খিদমতে পেশ করো এবং বিনীতভাবে বলো যে, আপনি চাইলে পূর্বের পদে ফিরে আসতে পারেন। যদি তিনি রাজি হন তবে তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আর যদি রাজি না হন তবে আমার তাঁবুর পাশেই তাকে বন্দি করে রেখো।”

সহচর একইভাবে গিয়ে শাইখুল ইসলাম রহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছে অনুন্নয়-বিনয় করল এবং বলল: “আপনি একটু বাদশাহর সাথে গিয়ে দেখা করুন, তার হাতে চুম্বন করুন, তবেই এই বিবাদ মিটে যাবে। আপনি আপনার পূর্বের পদে ফিরে যেতে পারবেন।”

শাইখুল ইসলাম রহমাতুল্লাহি আলাইহি নির্লিপ্ততার সাথে বললেন: “হে মিসকিন! বাদশাহর হাতে চুম্বন করা তো দূরের কথা! আমি তো এতেও রাজি নই যে বাদশাহ আমার হাতে চুম্বন করুক। তুমি আছো এক জগতে, আর আমি আছি অন্য জগতে।”

এখন তাকে রাজকীয় তাঁবুর কাছে অন্য একটি তাঁবুতে বন্দি করে রাখা হলো। শাইখুল ইসলাম রহমাতুল্লাহি আলাইহি সেখানে তিলাওয়াতে মশগুল থাকতেন, যার আওয়াজ রাজকীয় তাঁবুতে পৌঁছাত। একদিন সালিহ ইসমাইল তার সাথে আসা ফিরিজি কর্মকর্তাদের সামনে বন্ধুত্বের আন্তরিকতা জাহির করার জন্য বলল: “তোমরা যে বন্দির তিলাওয়াতের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ, সে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় আলেম। আমি তাকে এই জন্য বন্দি করেছি যে, সে মুসলমানদের দুর্গগুলো তোমাদের হাতে তুলে দেওয়ার প্রতিবাদ করত। আমি তাকে দামেস্কের খতিব পদ থেকে অপসারিত করেছি, শহর থেকে বহিষ্কার করেছি এবং তোমাদের খাতিরে তাকে বন্দি করেছি।”

ফিরিজি কর্মকর্তারা বলতে লাগল: “এমন ব্যক্তি যদি আমাদের কাছে থাকত, তবে আমরা তার পা ধুয়ে পানি পান করতাম।” [১]

শাইখুল ইসলামের মিসর যাত্রা:

কিছুকাল পর মিসরের শাসক নাজমুদ্দিন আস-সালিহ আইয়ুব সালিহ ইসমাইলকে পরাজিত করে শাম দখল করে নিলেন এবং শাইখুল ইসলাম রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বন্দিদশা থেকে মুক্তি দিলেন। এটি ৬৩৯ হিজরির ঘটনা।

[১] তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ আল-কুবরা লিস-সুবকি: ৮/২৩০, ২৩১, ত হিজর।

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

মিশরের বাদশাহ নাজমুদ্দিন আইয়ুব শেখুল ইসলাম রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর নিকট থেকে মিশরের জনগণের দ্বীনি দিকনির্দেশনা চেয়েছিলেন, তাই শেখুল ইসলাম রহমাতুল্লাহি আলাইহি কায়রোতে গমন করেন। পথে কারাক হয়ে যাওয়ার সময় সেখানকার শাসক আন-নাসির দাউদ তাকে সেখানেই বসবাসের অনুরোধ করেন যাতে মানুষ উপকৃত হতে পারে। শেখুল ইসলাম রহমাতুল্লাহি আলাইহি উত্তরে বললেন: “তোমার এই ছোট শহরটি আমার ইলমের জন্য সংকীর্ণ হয়ে পড়বে।” [১]

বিচারপতির পদে নিয়োগ - পদত্যাগের কারণ:

কায়রো পৌঁছালে আস-সালিহ আইয়ুব তার কদরদানি করে তাকে প্রধান বিচারপতি এবং জামে আমর ইবনুল আস-এর খতিব নিযুক্ত করেন। তার দ্বীনি আত্মমর্যাদাবোধ এমন ছিল যে, সালতানাতের একজন আমির ফখর উদ্দিন কোনো এক মসজিদের ছাদে তবলখানা স্থাপন করেছিলেন। শেখুল ইসলাম রহমাতুল্লাহি আলাইহি খবর পেয়ে তবলখানাটি ভেঙে ফেলেন, ভবিষ্যতে ফখর উদ্দিনের সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য ঘোষণা করেন এবং সেই সাথে বিচারপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেন। সুলতান সালিহ আইয়ুব অনেক অনুনয়-বিনয় করে তাকে পুনরায় এই পদ গ্রহণে রাজি করান এবং তিনি আরও কিছুকাল বিচারপতির দায়িত্ব পালন করেন। তবে শেষ পর্যন্ত তিনি বিচার বিভাগ থেকে পুরোপুরি সরে আসাই শ্রেয় মনে করেন।

বিচারপতির পদ ছাড়ার পরও তার মর্যাদা ও সম্মান কমেনি। তিনি দীর্ঘকাল জামে আমর ইবনুল আস-এ খতিব এবং মাদ্রাসায়ে সালিহিয়াতে শাফেয়ি ফিকহ-এর শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। [২]

মন্দ কাজ দূর করার জজবা:

তার মর্যাদা এবং সত্য বলার সাহসের আন্দাজ এই ঘটনা থেকে করা যায় যে, একবার তিনি জানতে পারলেন মিশরের কোনো এক স্থানে মদ বিক্রি হচ্ছে। তিনি ঈদের দিন কেল্লায় আয়োজিত এক বিশেষ মাহফিলে জনসমক্ষে সুলতানকে নাম ধরে তিরস্কার করে বললেন: “আইয়ুব! আল্লাহকে কী জবাব দেবে যখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, আমরা কি তোমাকে মিশরের রাজত্ব এজন্য দিয়েছিলাম যে মদ্যপান করা হবে?”

সুলতান অবাক হয়ে বললেন: “আসলেই কি এমনটা হচ্ছে?”

শেখুল ইসলাম রহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন: “হ্যাঁ অবশ্যই! অমুক জায়গায় মদ বিক্রি হচ্ছে আর তুমি এখানে আমোদ-প্রমোদ করছ।”

সুলতান এই উপদেশে অত্যন্ত লজ্জিত হলেন এবং সেই মদের দোকান বন্ধের নির্দেশ জারি করলেন।

পরে কোনো এক ছাত্র শেখুল ইসলাম রহমাতুল্লাহি আলাইহি-কে জিজ্ঞাসা করলেন: “আপনার কি সুলতানের ব্যাপারে কোনো ভয় অনুভূত হয়নি?”

তিনি বললেন: “সেই সময় আল্লাহর মহিমার সামনে তাকে আমার কাছে একটি বিড়ালের মতো মনে হচ্ছিল।” [২]

এখানে এই বিষয়টি মনে রাখা প্রয়োজন যে, সুলতান আস-সালিহ আইয়ুবের প্রতাপ সেই যুগে প্রবাদতুল্য ছিল। তার সামনে...

[১] তাবাকাতুশ শাফেয়িয়্যাতিল কুবরা লিস-সুবকি: ৮ / ২১০, ২৩৪, ২৩৫, তাবা হিজর

[২] তাবাকাতুশ শাফেয়িয়্যাতিল কুবরা: ৮ / ২১৩, তাবা হিজর

...এর ঘনিষ্ঠতম আমিরগণও নিজে থেকে কোনো কথা বলার সাহস পেতেন না। এমন মেজাজের অধিকারী স্বৈরাচারী বাদশাহর সামনে হকের বাণী উচ্চারণ করা শাইখুল ইসলাম রহ.-এর ঈমানি সাহস ও দ্বীনি আত্মমর্যাদার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

সপ্তম ক্রুসেডে অংশগ্রহণ এবং কারামতের প্রকাশ:

আস-সালিহ আইয়ুবের শেষ দিনগুলোতে সপ্তম ক্রুসেড শুরু হয় এবং এই সময়ে আস-সালিহ আইয়ুবের মৃত্যু ও তার উত্তরসূরি তুরান শাহর সিংহাসন আরোহণ ঘটে। এদিকে ক্রুসেডাররা অগ্রসর হয়ে কেবল দমিয়াতই দখল করেনি, বরং নীল নদ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে মানসুরা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। সেই সময় শাইখুল ইসলাম রহ. বাহিনীর সাহস যোগান এবং সৈন্যদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। একবার যখন ক্রুসেডাররা একদম কাছে চলে এসেছিল, তিনি অত্যন্ত জোশের সাথে ক্রুসেডারদের জাহাজ ডুবে যাওয়ার দোয়া করেন এবং আল্লাহর গায়েবি সাহায্য প্রার্থনা করেন। দেখতে দেখতেই ঝড় শুরু হলো এবং ক্রুসেডারদের জাহাজগুলো উল্টেপাল্টে গেল। [১]

মামলুক যুগে শাইখুল ইসলামের মর্যাদা... মামলুক আমিরদের নিলাম:

আইয়ুবী বংশের শাসনের অবসান ঘটলে মামলুকদের মধ্য থেকে ইজ্জুদ্দিন তুর্কমানি, আল-মালিকুল মুজাফফর সাইফুদ্দিন কুতুজ এবং আল-মালিকুজ জাহির রুকনুদ্দিন বাইবার্দের মতো প্রখ্যাত বাদশাহগণ শাইখুল ইসলাম রহ. থেকে উপকৃত হন।

মামলুক যুগে শাইখুল ইসলাম রহ.-এর মর্যাদার আন্দাজ এই কথা থেকে করা যায় যে, যখন মামলুকদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন শাইখুল ইসলাম রহ. ফতোয়া দিলেন যে, মামলুক আমিরগণ দাসের হুকুমে অন্তর্ভুক্ত এবং যতক্ষণ না তারা শরয়ি পদ্ধতিতে মুক্ত হবেন, ততক্ষণ তাদের লেনদেন শরয়ি আইন অনুযায়ী সঠিক হবে না।

এই ফতোয়ায় রাজদরবারে তোলপাড় সৃষ্টি হলো। মামলুক আমিরগণ তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, আপনি কী চান? তিনি বললেন: “আমরা একটি মজলিসে বায়তুল মালের পক্ষ থেকে আপনাদের নিলাম করব, তারপর শরয়ি পদ্ধতিতে আপনাদের মুক্তি দেওয়া হবে।”

মামলুক আমিরগণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন এবং তারা সুলতানের [২] কাছে গিয়ে অভিযোগ করলেন যে, শাইখ আমাদের প্রকাশ্য বাজারে নিলাম করে অপমানিত করতে চান। সুলতান শাইখুল ইসলাম রহ.-কে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন যে, এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার তার নেই।

এতে শাইখুল ইসলাম রহ. প্রতিবাদস্বরূপ মিসরের নাগরিকত্ব ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন। নিজের আসবাবপত্র বোঝাই করলেন, পরিবারের সদস্যদের সওয়ারিতে তুললেন এবং কায়রো থেকে বেরিয়ে পড়লেন। অর্ধেক পথ যেতে না যেতেই কেবল শহরের উলামা ও মাশায়েখই নন, বরং ব্যবসায়ী, শিল্পপতি এমনকি নারী ও শিশুরাও তার পিছু পিছু চলতে শুরু করল। সুলতানকে উপদেষ্টারা বললেন: “শাইখকে থামান, অন্যথায় আপনার শাসন ক্ষমতা চলে যাবে।” সুলতান এ কথা শুনে নিজেই সওয়ারি নিয়ে তার পিছু পিছু গেলেন এবং অনেক অনুনয়-বিনয় করে তাকে ফিরিয়ে আনলেন এবং অনুমতি দিলেন যে, তিনি নিজেই সালতানাতের আমিরদের নিলাম করবেন।

যেসব আমিরদের নিলাম হওয়ার কথা ছিল, তাদের মধ্যে খোদ মিসরের নায়েবে হাকামও (উপ-শাসক) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি নিজের সম্মান বাঁচাতে শাইখের...

[১] তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাতিল কুবরা: ৮/২১৬

[২] উৎসগুলোতে স্পষ্ট নয় যে এখানে সুলতান বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে। সম্ভবত সুলতান ইজ্জুদ্দিন তুর্কমানি অথবা সাইফুদ্দিন কুতুজ উদ্দেশ্য।

...কে বিনীত বার্তা পাঠালেন যেন তিনি নিলাম না করেন, কিন্তু শাইখ মানলেন না। নায়েবে হাকাম জানতে পেরে রাগে ফেটে পড়ে বললেন: “এই শাইখ কীভাবে আমাদের প্রকাশ্যে নিলাম করবেন? আমরা জমিনের মালিক। আল্লাহর কসম! আমি নিজের তলোয়ার দিয়ে তাঁর রক্ত ঝরাব।”

এই বলে তিনি নগ্ন তলোয়ার উঁচিয়ে কিছু সৈন্যসহ সরাসরি শাইখুল ইসলাম রহ.-এর দরজায় গিয়ে পৌঁছালেন। শাইখের ছেলে তাঁকে সংবাদ দিলেন যে, বাইরে নায়েবে হাকাম উন্মুক্ত তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। শাইখের প্রশান্তিতে বিন্দুমাত্র কমতি হলো না, তিনি বললেন: “বৎস! তোমার পিতার এমন মর্যাদা কোথায় যে আল্লাহর পথে শাহাদাত নসিব হবে।”

এই বলে তিনি অত্যন্ত প্রশান্তির সাথে বাইরে বের হলেন। তাঁকে দেখামাত্রই নায়েবে হাকামের ওপর এমন প্রভাব সৃষ্টি হলো যে, হাত থেকে তলোয়ার পড়ে গেল, শরীরে কম্পন শুরু হলো এবং তিনি অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন যে, শাইখ যেন তাঁর জন্য দোয়া করেন।

তারপর বললেন: “শাইখ, আপনি আমাদের সাথে কী করতে চান?”

শাইখুল ইসলাম রহ. বললেন: “বাজারে নিলাম করব।”

নায়েব বললেন: “আমাদের মূল্য কোথায় খরচ করবেন?”

শাইখুল ইসলাম রহ. বললেন: “মুসলমানদের জনকল্যাণমূলক কাজে।”

বললেন: “আমাদের মূল্য কে গ্রহণ করবে?” বললেন: “আমি নিজে।”

এরপর নিলামের মজলিস বসল। আমিরদের একে একে ডাক তোলা হলো। শাইখুল ইসলাম রহ. সম্মানস্বরূপ তাদের দাম বাড়িয়ে বাড়িয়ে ধরলেন। তাদের বিক্রি করে সেই অর্থ জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করলেন এবং আমিরগণ শরয়ী পদ্ধতিতে মুক্ত হয়ে নিজ নিজ ঘরে ফিরে গেলেন। [১]

সেই যুগে কোনো আলেমের মহত্ব, জনপ্রিয়তা এবং প্রভাব-প্রতিপত্তির এর চেয়ে বড় উদাহরণ খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন।

হালাকু খানের সাথে যুদ্ধ এবং শাইখুল ইসলামের ফতোয়া:

শাইখুল ইসলাম রহ. মুসলমানদের তাতারীদের ফিতনার বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে প্রস্তুত করতে চেয়েছিলেন। যখন হালাকু খান বাগদাদ অবরোধ করলেন এবং এই খবর মিশরে পৌঁছাল, তখন শাইখ রহ. অত্যন্ত চিন্তিত হলেন। তিনি বাগদাদের মুসলমানদের বিজয় ও সাহায্যের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে দোয়ায় কুনুতে নাযেলার ব্যবস্থা শুরু করালেন। যখন বাগদাদের পতনের খবর এল, তখন শাইখুল ইসলাম রহ. অত্যন্ত শোকাহত হলেন। [২]

এই ব্যাকুলতার কারণেই তিনি মিশরের শাসক, সেনাপতি, সৈন্য এবং জনগণকে তাতারীদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য প্রস্তুত করতে কোনো ত্রুটি রাখেননি। এর পাশাপাশি তাঁর পূর্ণ চেষ্টা ছিল যেন এই সময়ে শাসকরা কোনো জুলুম ও অন্যায়ে লিপ্ত না হয়, যাতে আল্লাহর সাহায্য ও সমর্থন এবং জনগণের দোয়া তাদের সাথে থাকে।

সুলতান সাইফউদ্দীন কুতুজ যখন হালাকু খানের সাথে মোকাবিলা করার সংকল্প করলেন, তখন সেনাবাহিনী প্রস্তুতির জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন

[১] তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ আল-কুবরা লিস-সুবকি: ৮/ ২১৭, ২১৮

[২] যাইল মিরআতুয যামান: ১/ ৮৯, ত. দারুল কিতাব আল-ইসলামি

ছিল। রাষ্ট্রের আমীরদের ধারণা ছিল যে, এই সুযোগে জনগণের কাছ থেকে জোরপূর্বক সম্পদ আদায় করার অনুমতি থাকা উচিত। কিন্তু যখন শাইখুল ইসলাম (রহ.)-এর কাছে ফতোয়া চাওয়া হলো, তখন তিনি একজন ব্যক্তির কাছ থেকে মাত্র এক দিনার নেওয়ার অনুমতি দিলেন, তাও এই শর্তে যে, প্রথমে বাদশাহ, উজির, আমীর এবং রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা তাদের সমস্ত সম্পদ জিহাদের জন্য ওয়াকফ করবেন।

ফলে রাষ্ট্রের আমীর এবং সরকারি কর্মকর্তারা তাদের ঘর থেকে সমস্ত নগদ অর্থ ও অলঙ্কার নিয়ে উপস্থিত হলেন। তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে কসম নেওয়া হলো যে, তারা ঘরে কিছুই অবশিষ্ট রাখেননি। এই বিশাল সম্পদ জিহাদের ব্যয়ের জন্য বরাদ্দ করার পর শাইখুল ইসলাম অনুমতি দিলেন যে, এখন জনগণের কাছ থেকে মাথাপিছু এক দিনার আদায় করা যেতে পারে। [১] তাঁর প্রচেষ্টার ফল এই দাঁড়ালো যে, মিশরীয় সেনাবাহিনী পাপাচারের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর সাহায্য ও নুসরতের ছায়ায় আইন জালুত নামক স্থানে তাতারীদের সাথে সাহসিকতাপূর্ণ মোকাবিলার যোগ্য হলো এবং তাদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেই ফিরল।

খিলাফতের পুনরুজ্জীবন:

শাইখুল ইসলাম (রহ.)-এর জীবনের সবচেয়ে বড় কীর্তি হলো এই যে, তিনি মামলুক সুলতানদের পথপ্রদর্শন করে মিশরে আববাসী খিলাফতের পুনরুজ্জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ৬৫৬ হিজরিতে (১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে) বাগদাদ ধ্বংসের সাথে সাথে খিলাফত বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল এবং প্রায় তিন বছর এমনভাবে অতিবাহিত হয়েছিল যে, মুসলিম বিশ্বে কোনো খলিফা ছিল না। শাইখুল ইসলাম (রহ.) এই দুর্বলতা অত্যন্ত তীব্রভাবে অনুভব করেছিলেন। তাঁর উদ্দীপনা ও পরামর্শে সুলতান বাইবার্স বাগদাদের শেষ খলিফা মুস্তাসিম বিল্লাহর চাচা আবুল কাসিম আহমদ মুস্তানসিরকে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সাথে কায়রোতে ডেকে আনেন এবং ১লা রজব ৬৫৯ হিজরি (১২ জুন ১২৬০ খ্রিষ্টাব্দ) বৃহস্পতিবার এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে তাঁর খিলাফত ঘোষণা করেন। সর্বপ্রথম শাইখুল ইসলাম (রহ.) এবং তাঁর পর সুলতান রুকনুদ্দিন বাইবার্স, কাযিউল কুযাত এবং রাষ্ট্রের অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ নতুন খলিফার হাতে বায়আত গ্রহণ করেন। শাইখুল ইসলাম (রহ.)-এর এই পদক্ষেপ সেই চরম বিপর্যয়ের যুগে মুসলিম বিশ্বকে আরও বেশি কেন্দ্রহীনতার শিকার হওয়া থেকে রক্ষা করেছিল। [২]

মৃত্যু:

শাইখুল ইসলাম ইযযুদ্দিন ইবনে আবদুস সালাম (রহ.) ১০ই জুমাদাল উলা ৬৬০ হিজরিতে ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স ছিল ৮৩ বছর। তখন আল-মালিকুজ জাহির বাইবার্সের শাসনকাল ছিল, যিনি তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন এবং তাঁর পরামর্শ ও ফতোয়াকে অনেক গুরুত্ব দিতেন। তাঁর মৃত্যুতে তিনি এতটাই শোকাহত হয়েছিলেন যে বলে উঠলেন: “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তাঁর মৃত্যু আমারই যুগে নির্ধারিত ছিল।” বাইবার্স নিজেই জানাজায় কাঁধ দিয়েছিলেন। জানাজার নামাজে রাজকীয় সদস্য এবং উলামা ও নেককার ব্যক্তিবর্গসহ সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এত ভিড় ছিল যে, সুলতান বাইবার্সের মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে এল:

“আমার শাসন এখন প্রতিষ্ঠিত হলো। নতুবা তিনি যা চাইতেন হুকুম দিতেন আর মানুষ তার জন্য ছুটে যেত।” [৩]

[১] আস-সুলুক ফি মারিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ২/ ৩২৭, ত. আল-ইলমিয়াহ

[২] তাবাকাতুশ শাফিইয়াতিল কুবরা: ৮/ ২৪৩

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৭/ ৩৩২, তাবাকাতুশ শাফিইয়াতিল কুবরা: ৮/ ২৪৪, ২৪৫

রচনা ও সংকলনসমূহ:

শাইখুল ইসলাম রহ.-এর ইলমি স্মৃতি এবং তাঁর বড় সদকায়ে জারিয়া হলো সেই সকল কিতাব ও রচনা যা আজ পর্যন্ত ফকিহ ও মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে প্রশংসা কুড়াচ্ছে। কয়েকটি বিশ্ববিখ্যাত রচনা নিচে দেওয়া হলো:

- আকিদাহ বিষয়ে: আল-ফারকু বাইনাল ইসলাম ওয়াল ঈমান
- তাফসীর বিষয়ে: তাফসীরুল ইয বিন আব্দুস সালাম
- হাদিস বিষয়ে: সহীহ মুসলিমের সংক্ষিপ্তসার “মুখতাসার সহীহ মুসলিম”
- সীরাতে নববী বিষয়ে: মাদিনাতুস সুউল ফি তাফদিলির রাসূল ﷺ
- আখলাক ও আদব বিষয়ে: মাকাসিদুর রিআয়াহ লি-হুকুকিল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা
- ফতোয়া সংকলনসমূহ: “আল-ফাতাওয়া আল-মিসরিয়্যাহ”, “আল-ফাতাওয়া আল-মাওসিলিয়্যাহ”
- উসূলে ফিকহ বিষয়ে: “আল-ইমাম ফি বায়ান আদিলাতিল আহকাম”

এ ছাড়াও তাঁর রচনাগুলোর মধ্যে নিম্নোক্ত কিতাবসমূহের উল্লেখও পাওয়া যায়:

“আল-কাওয়ায়িদুল কুবরা, মাজাযুল কুরআন, শাজারাতুল মাআরিফ, আল-গায়াহ ফি ইখতিসারিন নিহায়াহ, মুখতাসার রিআয়াতুল মুহাসিবি, বায়ানু আহওয়ালিন নাস ইয়াওমাল কিয়ামাহ, ফাওয়াইদুল বালওয়া ওয়াল মিহান।” [১]

মাকাসিদে শরীয়তের ওপর কাজ:

তবে তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, ওজনদার এবং গভীর কাজ হলো উসূলে ফিকহের একটি বিশেষ শাখা “মাকাসিদে শরীয়ত”-এর ওপর। ইমাম গাজালীর পর তিনি প্রথম জাতি সংস্কারক যিনি “মাকাসিদে শরীয়ত”-এর ওপর গভীর দৃষ্টি দিয়েছেন, এর বিভিন্ন রূপ স্পষ্ট করার পাশাপাশি সেগুলোর শ্রেণিবিভাগ করেছেন এবং এর গুরুত্বকে স্পষ্ট ও প্রস্ফুটিত করেছেন। এই সিলসিলায় তিনি বিভিন্ন রিসালা (পুস্তিকা) লিখেছেন যার মধ্যে “মাকাসিদুস সালাত” ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। মিসরের সুলতান আল-মালিকুল কামিল এই রিসালাটি অত্যন্ত পছন্দ করতেন এবং তিনি প্রায়ই এটি শুনতেন এবং বিশেষ মেহমানদের শোনাতেন।

এই যুগে আল্লামা সিবত ইবনুল জাওয়ী শামের প্রখ্যাত ওয়ায়েজ ও ঐতিহাসিক ছিলেন, যাঁর ওয়াজ মাহফিলে তিল ধারণের জায়গা থাকত না এবং কান্নাকাটির এক অদ্ভুত পরিবেশ সৃষ্টি হতো। একবার তিনি আল-মালিকুল কামিলের দরবারে এলে আল-মালিকুল কামিল তাঁকে এই রিসালাটি পড়ালেন। আল্লামা এটি পড়ে বলতে লাগলেন: “এমন লেখা আজ পর্যন্ত কেউ লেখেনি।”

ফলে তিনি এর একটি অনুলিপি নিজের সাথে নিয়ে গেলেন এবং নিজের ওয়াজ মাহফিলে এটি পড়ে শুনিয়ে মানুষকে তা নকল করাতে থাকলেন। [২]

শাইখুল ইসলাম রহ. দ্বীনের অন্যান্য বিষয়ের উদ্দেশ্য ও হিকমতসমূহের ওপরও একইভাবে গভীর দৃষ্টির সাথে চিন্তা-গবেষণা করে একটি ব্যাপক কাজ শুরু করেন এবং অবশেষে তাঁর গবেষণাসমূহ “কাওয়ায়িদুল আহকাম ফি মাসালিহিল আনাম” নামে পেশ করেন।

[১] তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাতিল কুবরা: ৮/২৪৮

[২] তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাতিল কুবরা: ৮/২৪০

প্রায় পাঁচশ পৃষ্ঠার এই বইটিতে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, শরীয়তের বিধানের পেছনে সমাজের কল্যাণ ও মঙ্গল, জীবনের ভারসাম্য ও পরিমিতিবোধ এবং মানুষের জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রু মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর হেফাজতসহ অনেক হিকমত নিহিত রয়েছে। এই বিষয়ের ওপর তিনি ‘আল-ফাওয়াইদ ফি ইখতিসার আল-মাকাসিদ’ নামে একটি সংক্ষিপ্ত বইও লিখেছেন। [১]

পরহেজগারী ও তাকওয়া। কামালত ও কারামত:

দ্বীনের খেদমতের পাশাপাশি ইবাদত ও রিয়াযতে তাঁর কোনো কমতি ছিল না। তাকওয়া ও পরহেজগারীতে তাঁর কোনো নজির ছিল না। তিনি শেখ শাহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দী (রহ.)-এর মুরিদ ছিলেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে ইজাজতপ্রাপ্তও ছিলেন। আউলিয়া ও নেককারদের সাথে তাঁর আত্মিক সম্পর্ক ছিল। তাঁর কারামত ও কাশফসমূহও বেশ মশহুর।

রিফের একজন সুফি বুজুর্গ আবদুল্লাহ বালতাজি জনৈক খাদেমের মাধ্যমে অনেক কিছু দিয়ে কায়রোতে পাঠিয়েছিলেন যাতে সেগুলো শায়খুল ইসলাম (রহ.)-কে হাদিয়া হিসেবে পেশ করা হয়। সেসব জিনিসের মধ্যে পনিরের একটি মটকাও ছিল। কায়রোতে প্রবেশের সময় পনিরের মটকাটি পড়ে ভেঙে যায় এবং পনির নষ্ট হয়ে যায়। খাদেম একজন খ্রিস্টান দোকানদারের কাছ থেকে পনির কিনে সাথে নিয়ে নেয়। যখন এই জিনিসগুলো শায়খ (রহ.)-এর খেদমতে পেশ করা হলো, তখন তিনি বাকি জিনিসগুলো কবুল করে নিলেন কিন্তু পনিরের মটকাটি দরজায় ফেরত রাখিয়ে দিলেন এবং খাদেমকে বললেন: “বেটা! এটি আনার কী প্রয়োজন ছিল? এই পনির এমন এক মহিলা তৈরি করেছে, যার হাত শুকর স্পর্শ করার কারণে নাপাক ছিল।” [২]

সরকারি পদে অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও আর্থিক দিক থেকে তিনি মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতেন। এর কারণ ছিল এই যে, তাঁর কাছে যা কিছু থাকত, তার বড় একটি অংশ তিনি সদকা করে দিতেন। কখনো এমনও হতো যে পকেটে কিছুই নেই এবং কেউ নিজের প্রয়োজনের কথা পেশ করল—এমন অবস্থায় তিনি নিজের পাগড়ি বা কাপড়ের কোনো টুকরো ছিঁড়ে তার হাতে তুলে দিতেন।

একবার দামেস্কে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। বাগান ও ক্ষেত-খামার বিরান হয়ে পানির দরে বিক্রি হতে লাগল। তাঁর স্ত্রী তাঁকে নিজের চুড়িগুলো দিয়ে বললেন: “এটি একটি ভালো সুযোগ যে আপনি আমার চুড়িগুলো বিক্রি করে একটি বাগান কিনে নিন।” তিনি চুড়িগুলো বিক্রি করে দিলেন এবং সেই টাকা গরিবদের মাঝে সদকা করে দিলেন। ঘরে ফিরে এলে স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন: “বাগান কিনেছেন?” তিনি বললেন: “হ্যাঁ! চুড়ির বিনিময়ে জান্নাতের বাগান কিনে নিয়েছি।” স্ত্রীও তাঁর মতোই ছিলেন। তিনি বলতে লাগলেন: “আল্লাহ আপনাকে সর্বোত্তম প্রতিদান দিন।” [৩]

খেদমতের ক্ষেত্রে এত সতর্কতা সত্ত্বেও তাঁর অবস্থা এমন ছিল যে, একবার কাউকে ফতোয়া দেওয়ার পর তাঁর মনে পড়ল যে জবাবে কিছু ভুল হয়েছে। ফলে পুরো কায়রোতে তিনি ঘোষণা করিয়ে দিলেন যে, এই মাসআলাটি ভুল বলা হয়েছে, এর ওপর আমল করা যাবে না। [৪]

[১] ‘কাওয়ায়েদুল আহকাম’ মাকতাবাতুল কুল্লিয়াত আল-আযহারিয়া কায়রো থেকে দুই খণ্ডে এবং ‘আল-ফাওয়াইদ’ দারুল ফিকর দামেস্ক থেকে এক খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

[২] তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাতিল কুবরা: ৮/২১৩।

[৩] তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাতিল কুবরা: ৮/২১৩।

[৪] তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাতিল কুবরা: ৮/২১৩।

ইমাম শরফ উদ্দিন আন-নববী

৬৩১ হিজরী থেকে ৬৭৬ হিজরী

এই যুগের আরেকজন মহান আলেম ছিলেন ইমাম শরফ উদ্দিন ইয়াহইয়া আন-নববী রহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি ৬৩১ হিজরীতে দামেস্কের পার্শ্ববর্তী গ্রাম ‘নওয়া’-তে জন্মগ্রহণ করেন। ইসলামী জ্ঞান অর্জনের পর তিনি দীর্ঘকাল দামেস্কের মাদ্রাসা আশরাফিয়াতে শিক্ষকতা করেন। ৬৫৫ হিজরীতে যখন তাঁর বয়স ২৪ বছর ছিল, তখন তিনি লেখালেখি ও সংকলনের কাজ শুরু করেন এবং বিশ বছর পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে এতে মগ্ন থাকেন এবং এই সময়ে নির্জন জীবন বেছে নেন। রাতের অধিকাংশ সময় ইবাদত করতেন। সারাদিন রোজা রাখতেন। চব্বিশ ঘণ্টায় মাত্র একবার সাহরির সময় পানি পান করতেন এবং কেবল রাতে খাবার খেতেন। সারাজীবন অবিবাহিত ছিলেন এবং কখনো সম্পদ উপার্জনের ইচ্ছা করেননি। পিতামাতা তাঁর জীবনধারণের জন্য মাঝে মাঝে যা যব পাঠাতেন, তিনি তাতেই সন্তুষ্ট থাকতেন। [১]

বিশ্বখ্যাত রচনাবলী:

তাঁর অধিকাংশ কাজ ইলমে হাদিসের ওপর। তাঁর সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থ এবং সহীহ হাদিসের সংকলন ‘রিয়াদুস সালাহীন’ সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এগুলো ছাড়াও ‘আল-আযকার’ এবং ‘আল-আরবাউন আন-নববীয়াহ’ থেকে আজ পর্যন্ত মানুষ উপকৃত হচ্ছে। তাঁর আরও কিছু রচনাবলী নিচে দেওয়া হলো:

- রিজালুল হাদিসে: তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত
- উলুমুল কুরআনে: আত-তিবইয়ান
- উসূলে হাদিসে: আত-তাকরীব ওয়াত-তায়সীর
- উসূলে ফিকহে: আদাবুল ফাতওয়া ওয়াল মুফতি ওয়াল মুস্তাফতি, আল-উসূল ওয়াদ-দওয়াবিত
- ফিকহে: দাকায়িকুল মিনহাজ, খুলাসাতুল আহকাম, রওদাতুত তালিবীন

তিনি শাফেয়ী ফিকহে ‘আল-মুহাযযাব’-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখতে শুরু করেন এবং ‘কিতাবুল বুয়ু’ পর্যন্ত এর নয়টি খণ্ড সম্পন্ন করেন। এর পরিশিষ্ট পরবর্তীতে আল্লামা তাকি উদ্দিন সুবকী আশ-শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন। ‘বুস্তানুল আরিফীন’ তাঁর আরেকটি উপকারী সংকলন যাতে আধ্যাত্মিক সংশোধন ও নফসের পবিত্রতার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে এবং আউলিয়ায়ে কেরামের অবস্থা ও বাণীসমূহ উদ্ধৃত করা হয়েছে। [২]

নির্ভীক সত্যবাদিতা:

তিনি নির্জনতাপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও মানুষের আশ্রয়স্থল ছিলেন। আলেম ও ফকিহগণ তাঁর জ্ঞান ও শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দিতেন। তিনি শাসক ও সুলতানদের থেকে দূরে থাকতেন, কিন্তু প্রয়োজনের সময় তাঁর চেয়ে বড় সত্যবাদী আর কেউ ছিল না। সামরিক অভিযানের আধিক্যের কারণে সরকার জনগণের ওপর কর আরোপ করলে সিরিয়ার জনগণ তাদের এলাকায় দুর্ভিক্ষের কারণে তা পরিশোধ করতে অক্ষম ছিল। কিছু আলেম এ বিষয়ে...

[১] আল-মানহালুল আযবুর রওয়ী ফী তারজামাতী কুতুবিল আউলিয়া আন-নববী লিস-সাখাবী, পৃষ্ঠা ৩০

[২] আল-মানহালুল আযবুর রওয়ী লিস-সাখাবী, পৃষ্ঠা ৩০, ৩১

শাসকদের নামে একটি আবেদনপত্র লিখলেন। এরপর ইমাম নববী রহ. সিরিয়ার একজন সম্মানিত আমির বদর উদ্দিন খাজিনদারকে একটি পত্র লিখে পাঠালেন যাতে তিনি আলেমদের আবেদনটি কায়রোতে সুলতান বাইবার্‌সের কাছে নিয়ে যান। বদর উদ্দিনের নামে লেখা পত্রে জনগণের ওপর থেকে সামরিক কর প্রত্যাহার এবং তাদের ন্যায়বিচার প্রদানের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়ে তিনি লিখলেন:

“জনাব অবগত আছেন যে, এ বছর সিরিয়ার জনগণ বৃষ্টিহীনতা, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, শস্যের অভাব এবং গবাদি পশুর মৃত্যুর কারণে অভাব-অনটন ও দুর্দশার শিকার। আপনি এও জানেন যে, শাসকের ওপর প্রজাদের প্রতি মমতা প্রদর্শন এবং তাদের কল্যাণ কামনা করা ওয়াজিব, কারণ দীন হলো কল্যাণ কামনার নাম। শরিয়তের আলেমগণ, যারা সুলতানের শুভাকাঙ্ক্ষী ও গুণগ্রাহী, তারা ইতিপূর্বেই পত্র পাঠিয়েছেন যাতে প্রজাদের দেখাশোনা এবং তাদের প্রতি কোমলতা প্রদর্শনের কথা উল্লেখ আছে। এতে কোনো ক্ষতি নেই বরং এটি নিছক কল্যাণকামিতা, মমতা এবং জ্ঞানীদের জন্য উপদেশ। আলেমগণ আমিরের কাছে যে পত্রটি পাঠিয়েছেন তা সুলতানের জন্য একটি আমানত ও নসিহত। এটি সুলতানের কাছে পৌঁছে দেওয়া আপনার ওপর ওয়াজিব, কারণ এ বিষয়ে আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।”

আমির বদর উদ্দিন এই পত্রগুলো সুলতানের কাছে নিয়ে গেলেন। সেখানে এই নসিহত পছন্দ করা হলো না বরং এর জবাবে একটি তিরস্কারমূলক বার্তা পাঠানো হলো। ইমাম নববী রহ. সেটি পড়ে সুলতানের নামে একটি পত্র লিখলেন যার শৈলী এত চমৎকার ও প্রভাবশালী যে একে শাসকদের নসিহত করার ক্ষেত্রে সর্বোত্তম নমুনা ও শাহকার হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। তিনি লিখলেন:

“আপনার মহান দরবার থেকে সতর্কবাণী ও তিরস্কার সম্বলিত জবাব এসেছে। আমরা মনে করি এতে যা লেখা হয়েছে তা শরিয়ত পরিপন্থী। আল্লাহ প্রয়োজনের সময় মাসআলা স্পষ্ট করা ওয়াজিব করেছেন, তাই আমাদের নীরবতা অবলম্বন করা হারাম। আপনি জবাবে লিখেছেন: ‘জিহাদ কেবল সেনাবাহিনীর ওপর ওয়াজিব নয়।’ আমরা তা অস্বীকার করিনি। কিন্তু জিহাদ হলো ফরজে কেফায়া। সুলতান যখন এর জন্য সেনাবাহিনী নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যারা প্রকৃতপক্ষে বায়তুল মাল থেকে খরচ পাচ্ছে, তখন বাকি প্রজারা সেই সব কাজের জন্য অবসর পায় যাতে তাদের নিজেদের, সেনাবাহিনীর এবং সুলতানের ফায়দা রয়েছে অর্থাৎ কৃষিকাজ, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি। এগুলো এমন কাজ যা সবার জন্য জরুরি। সেনাবাহিনীর জিহাদের জন্য বায়তুল মাল থেকে অর্থ নির্ধারিত রয়েছে। সুতরাং জনগণের কাছ থেকে জিহাদের জন্য কিছু নেওয়া ততক্ষণ পর্যন্ত জায়েজ নয় যতক্ষণ বায়তুল মালে কোনো নগদ অর্থ, পণ্য বা সম্পদ বিদ্যমান থাকে যা দিয়ে প্রয়োজন মেটানো সম্ভব। সুলতান মুহতারামের শহরগুলোর আলেমগণ এ বিষয়ে একমত। আমরা প্রথম এবং এই দ্বিতীয় পত্রে যা কিছু লিখেছি তা নিছক কল্যাণকামিতা হিসেবেই লিখেছি। আমরা এটি এ কারণেই লিখেছি যে আমাদের জানামতে সুলতান আলী শরিয়তের অনুসারী এবং প্রজাদের প্রতি মমতা ও দয়া প্রদর্শনে আখলাকে নববীর অনুসারী।”

“আপনি লিখেছেন যে আমরা (আলেমগণ) কেন কাফেরদের (পাপের) ওপর আপত্তি করি না যারা সুলতানাতে যেমন খুশি তেমন থাকে। তো জনাব, মুসলিম শাসক ও ঈমানদারদের তুলনা আমরা কাফেরদের সাথে কেন করব? আমরা বিদ্রোহী কাফেরদের কিসের দোহাই দিয়ে বাধা দেব যখন তারা আমাদের দ্বীনের ওপর বিশ্বাসই রাখে না।”

“আমরা সুলতানের ন্যায়বিচার ও অনুগ্রহ থেকে আশা করি যে তিনি আমাদের এই নসিহতের কারণে (রাগান্বিত হয়ে সিরিয়ার) জনগণ বা...”

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

কোনো গোষ্ঠীকে তিরস্কারের লক্ষ্যবস্তু বানাবেন না। যেখানে আমার নিজের বিষয়, আমাকে কোনো তিরস্কার বরং এর চেয়ে বেশি কোনো কিছুও আতঙ্কিত করতে পারে না আর না সুলতানের কল্যাণকামিতা থেকে বিরত রাখতে পারে, কারণ আমার ঈমান হলো যে এটি আমার ওপর এবং অন্যদের ওপর ওয়াজিব। আমাদের রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন যে আমরা যেখানেই থাকি যেন সত্য কথা বলি। আল্লাহর ব্যাপারে কোনো নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া না করি। [১]

বোঝা যায় যে সুলতান বিবারসের ওপর এই উপদেশের কোনো প্রভাব পড়েনি এবং নিজের বিশেষ দরবারি আলেমদের প্রভাবে তিনি এই বিষয়েই বিশ্বাসী ছিলেন যে সরকার জিহাদের জন্য জোরপূর্বক সম্পদ নিতে পারে। ফলে নিজের শেষ দিনগুলোতে তিনি আলেমদের থেকে নিয়মিত ফতোয়া নিলেন যে সুলতান জিহাদের জন্য প্রয়োজনে জনগণের কাছ থেকে জোরপূর্বক সম্পদ উসূল করতে পারেন। সবাই এতে স্বাক্ষর করে দিলেন। এই ফতোয়ার দলিলসমূহ ছিল এই যে জিহাদ এবং সীমান্ত রক্ষা সুলতানের ব্যক্তিগত কাজ নয় বরং এর উপকার উম্মাহর জন্য। যদি জনগণ সুলতানের কথায় এই প্রয়োজন পূরণ না করে তবে আশঙ্কা রয়েছে যে কাফেররা জোরপূর্বক বিজয়ী হয়ে তাদের থেকে সবকিছু কেড়ে নেবে।

তবে ইমাম নববী রহমাতুল্লাহ তাঁর পূর্ববর্তী অবস্থানে অটল রইলেন এবং এতে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করলেন। তিনি মনে করতেন যে যদি ফতোয়ায় নিঃশর্ত স্বাক্ষর করে দেওয়া হয় তবে পরবর্তী জালেম সুলতানদের হাতে একটি অজুহাত চলে আসবে। সুলতান বিবারসের অর্থের প্রয়োজন ছিল, তিনি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন এবং তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে বিরোধিতার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি উত্তর দিলেন:

“আমি শুনেছি যে আপনার এক হাজার গোলাম রয়েছে যারা স্বর্ণখচিত কোমরবন্ধ পরে এবং দুইশ বাঁদি রয়েছে যাদের কাছে অলঙ্কারের সিন্দুক রয়েছে। যদি আপনি প্রথমে এই সম্পদ খরচ করে দেন এবং আপনার গোলামরা পশমি কোমরবন্ধ পরতে শুরু করে আর বাঁদিদের কাছে কোনো অলঙ্কার অবশিষ্ট না থাকে, তখন আমি প্রজাদের সম্পদ নেওয়ার অনুমতি দিতে পারি।”

বিবারস এই নির্ভীক কথাবার্তায় রাগান্বিত হলেন এবং বললেন, “আপনি শহর থেকে বেরিয়ে যান।”

ইমাম নববী রহমাতুল্লাহ বললেন: “আপনার যা আদেশ!” এই বলে তিনি নিজের গ্রাম নবায় চলে গেলেন। পরবর্তীতে দামেস্কের আলেমরা এসে বিবারসকে ইমাম নববী রহমাতুল্লাহ-এর মর্যাদা ও অবস্থান সম্পর্কে অবহিত করলেন এবং বললেন: “তিনি আমাদের বড় ফকিহ এবং আলেম।”

সুলতান তৎক্ষণাৎ আলেমদের তাঁর কাছে পাঠালেন যেন তাঁরা তাঁকে সম্মান ও মর্যাদার সাথে ফিরিয়ে আনেন। কিন্তু ইমাম নববী রহমাতুল্লাহ সুলতানের ওপর এতটাই ক্ষুব্ধ ছিলেন যে বললেন: “আমি কসম খেয়েছি যে বিবারসের জীবদ্দশায় কখনো দামেস্কে যাব না।” সম্ভব ছিল সুলতান তাঁকে মানানোর জন্য আরও কিছু করতেন কিন্তু জীবন তাঁকে সেই সুযোগ দেয়নি এবং কয়েক দিন পর তাঁর ইন্তেকাল হয়ে যায়। এর পর ইমাম নববী রহমাতুল্লাহ-ও বেশিদিন বাঁচেননি এবং একই বছর ২৪ রজব ৬৭৬ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৪৫ বছর কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত জীবনে তিনি যে কাজ করেছেন তা তাঁকে চিরঞ্জীব করে রেখেছে। [২]

[১] আল-মানহালুল আযবুর রাভি ফি তারজামাতি কুতুবিল আউলিয়া আন-নববী লিস-সাখাভি, পৃ. ৩০ থেকে ৩৩; তুহফাতুত তালিবিন লি ইবনিল আত্তার, পৃ. ৮, ৯

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: সন ৬৭৬ হি.; তারিখুল ইসলাম লিয-যাহাবি সন ৬৭৬ হি.; আল-ইমাম আন-নববী আয আহমদ ফরিদ, পৃ. ১১ থেকে ১৫

মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমী

(৬০৪ হি. থেকে ৬৭২ হি. / ১২০৭ খ্রি. থেকে ১২৭৩ খ্রি.)

মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমী (রহ.) খোরাসানের (বর্তমান আফগানিস্তান) বলখ শহরে জন্মগ্রহণ করেন, যা তৎকালীন সময়ে খাওয়ারিজম সালতানাতের একটি অংশ ছিল। তাঁর দাদী ‘মালিকা-ই-জাহান’ খাওয়ারিজমের রাজপরিবারের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। মাওলানা রুমীর পিতা সুলতানুল উলামা বাহাউদ্দিন, শেখ নাজমুদ্দিন কুবরা (রহ.)-এর খলিফা হওয়ার পাশাপাশি সুলতান আলাউদ্দিন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন।

যখন খাওয়ারিজমে তাতারীদের আক্রমণের লক্ষণ প্রকাশ পেল, তখন শেখ নাজমুদ্দিন কুবরা (রহ.)-এর নির্দেশে তাঁর অনুসারীরা বিভিন্ন দেশের দিকে হিজরত করেন। শেখ বাহাউদ্দিনও তাঁর পুত্রকে নিয়ে বাগদাদ, মক্কা মুকাররমা, দামেস্ক এবং অন্যান্য শহর হয়ে এশিয়া মাইনরের দিকে চলে যান। এই সময়ে তাতারীরা মুসলিম বিশ্বের ওপর আক্রমণ চালিয়ে ইসলামী সালতানাতগুলোকে তছনছ করে দিয়েছিল। মাওলানা রুমী (রহ.) দীর্ঘ বছরব্যাপী এই পরীক্ষা ও বিপর্যয় নিজের চোখে দেখেছিলেন এবং এর আঘাত নিজের হৃদয়ে অনুভব করেছিলেন। এটি ছিল মাওলানা রুমী (রহ.)-এর যৌবনকাল। এই কঠিন ও ধৈর্য-পরীক্ষার পরিস্থিতিতে তিনি জ্ঞান অর্জনে মগ্ন ছিলেন এবং ইসলামের সেই ঐতিহ্য যা অনেক ইসলামী দেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল, তা নিজ বক্ষে সংরক্ষিত করে রাখছিলেন। এরপর দীর্ঘ সময় তিনি দরস ও তাদরীসে (শিক্ষাদান) অতিবাহিত করেন।

এরপর তাঁর জীবনে হযরত শামস তাবরিজী (রহ.)-এর আগমন ঘটে, যাঁর সাহচর্যের পরশপাথরের প্রভাবে তিনি খাঁটি সোনায় পরিণত হন। যখন তিনি এই আল্লাহর বান্দার কাছ থেকে ইশকে ইলাহীর (ঐশী প্রেম) দহন আত্মস্থ করলেন, তখন মহান রবের দরবার তাঁকে এই উন্মত্তের সংস্কার ও প্রশিক্ষণের মহান কাজের জন্য মনোনীত করল। মাওলানা রুমী (রহ.)-এর বাকি জীবন এই প্রচেষ্টা ও সাধনায় ব্যয় হয় যাতে আল্লাহর বান্দাদের মহান রবের মারেফাত (পরিচয়) দ্বারা সুশোভিত করা যায়।

তিনি ইলমে কালাম এবং তর্কমূলক বিতর্কের পথ ছেড়ে দিয়ে আত্মশুদ্ধি (তায়কিয়ায়ে নফস) ও মারেফাতে ইলাহীর দাওয়াত দেন এবং মানুষকে দ্বীনের রূহ ও হাকীকত (প্রকৃত রূপ) বোঝান। মাওলানা রুমী (রহ.)-এর মৌলিক বিষয় ছিল “ইশকে ইলাহী” (ঐশী প্রেম) এবং “ইসলাহে কলব” (হৃদয়ের সংস্কার)। তিনি সেই সব মুসলমানদের, যারা পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণকেই যথেষ্ট ইসলাম মনে করত, ঈমানের সেই উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত করেন যেখানে মহব্বতের জ্যোতি এবং ইশকের কারামত স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। মাওলানা রুমী (রহ.) মানুষকে মহান আল্লাহর মহিমা ও ভালোবাসার এমন শিক্ষা দিতেন যে, শ্রোতাদের অন্তর কখনো আল্লাহর ভয়ে কেঁপে উঠত আবার কখনো ভালোবাসার জোশে উদ্বেলিত হতো। মাওলানা রুমী (রহ.) সেই তাসাউফের দাওয়াত দিতেন যা কর্মের সাথে সম্পৃক্ত এবং জীবনের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি মুসলমানদের ঈমানের শক্তির সাথে শরীয়তে মুতাহ্হার (পবিত্র শরীয়ত) অনুসরণ করে কর্মের ময়দানে অগ্রগামী হওয়ার উপদেশ দিতেন। [১]

[১] কাসাসুল মাসনভী লিল হামিদী (আল-মুকাদ্দিমা): ১/৭ থেকে ১১২; তারিখে দাওয়াত ও আজীমত: ১/৩৩৫ থেকে ৩৯০।

চতুর্থ খণ্ড

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

মাওলানা রুমি রহ.-এর অমর কীর্তি হলো ‘মসনবী মানবী’, যা প্রকৃতপক্ষে তাঁর সারাজীবনের মেহনতের নির্যাস এবং হিকমত ও মারেফাতের এক বিশাল ভাণ্ডার। উম্মতে মুসলিমার মাঝে মসনবী যে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে, সেই যুগে সম্ভবত অন্য কোনো কিতাব এর সমকক্ষ ছিল না। মসনবীর কবিতাগুলোতে হৃদয়ের এমন দহন ও মিশ্রণ রয়েছে যে, কঠোর হৃদয়ের মানুষও তা দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পারে না। এতে সাধারণ উদাহরণ ও গল্পের মাধ্যমে শরীয়ত ও তরিকতের রহস্য ও সূক্ষ্ম বিষয়গুলোকে এমনভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, সাধারণ মানুষও তা সহজে বুঝতে পারে।

মসনবী মৃতপ্রায় উম্মতের হৃদয়ে হাকিকি ইশকের এক নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছে। লাখো আল্লাহর বান্দা এর দ্বারা উপকৃত হয়েছে এবং হতাশা ও নিরাশার আবর্ত থেকে বেরিয়ে ইয়াকিন, তাওয়াক্কুল, সংকল্প ও আশার উজ্জ্বল পথে অগ্রসর হয়েছে। মসনবীর নজিরবিহীন জনপ্রিয়তা এবং এর সুদূরপ্রসারী প্রভাবের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যে, উম্মতের পুনর্জাগরণে মাওলানা রুমি রহ. এবং তাঁর মসনবীর এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে।

[১]

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. ছিলেন সেই যুগের এক ক্ষণজন্মা ব্যক্তিত্ব। তাঁর আসল নাম ছিল আহমদ তাকিউদ্দিন। ইবনে তাইমিয়া ছিল তাঁর পারিবারিক উপনাম (কুনিয়াত), যা অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে। তাঁর জন্ম ৬৬১ হিজরিতে আল-জাজিরার হাররান শহরে। তাঁর পরিবার আট প্রজন্ম ধরে ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের খিদমতের সাথে যুক্ত ছিল। তাঁর দাদা আবুল বারাকাত মাজদুদ্দিন ইবনে তাইমিয়া রহ. ছিলেন অনেক বড় মুহাদ্দিস ও ফকিহ। তাঁর সংকলিত ‘মুনতাকাল আখবার’ ফিকহি বিন্যাসে হাদিসের একটি চমৎকার সংকলন, যা ফকিহদের নিকট অত্যন্ত সমাদৃত ছিল।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর বয়স যখন মাত্র ছয় বছর, তখন তাঁর পিতা আল্লামা আব্দুল হালিম ইবনে তাইমিয়া রহ.-কে তাতারীদের জুলুম থেকে বাঁচতে নিজের মাতৃভূমি ছেড়ে দামেস্কে চলে আসতে হয়। এখানে ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. কুরআন মাজিদ হিফজ করেন। এরপর আরবি সাহিত্য, ফিকহ ও হাদিসের শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। শৈশব থেকেই তাঁর স্মৃতিশক্তি ও মেধা এমন ছিল যে, ইমাম বুখারি রহ.-এর কথা মনে করিয়ে দিত। একবার এক আলেম এসে তাঁর পরীক্ষা নিলেন। তিনি একটি তখতি বা স্লেটে তেরোটি হাদিস লিখে দিলেন। ইবনে তাইমিয়া রহ. সেগুলো একবার মনোযোগ দিয়ে পড়ে নিলেন। আলেম তখতিটি সরিয়ে নিয়ে বললেন, ‘শোনাও’। ইবনে তাইমিয়া রহ. হুবহু শব্দে শব্দে সব শুনিয়ে দিলেন। আলেম তখতিতে আরও কয়েকটি হাদিস লিখে দিলেন। ইবনে তাইমিয়া রহ. সেগুলোও একবার পড়ে মুখস্থ শুনিয়ে দিলেন। সেই আলেম এটি দেখে বলতে লাগলেন: “এই শিশু যদি বেঁচে থাকে, তবে সে এক অনন্য কিছু হবে, কারণ এই যুগে তার দৃষ্টান্ত মেলা ভার।” [২]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় অত্যন্ত একাগ্রতার সাথে শিক্ষা লাভ করেন। হাদিস শাস্ত্রে তাঁর...

[১] কাসাসুল মসনবী লিল মুহাম্মদী (মুকাদ্দিমা): ১/ ৭ থেকে ১৩; তারিখ দাওয়াত ও আজিমত: ১/ ৩৩৫ থেকে ৪০০

[২] আল-উকুদুদ দুররিয়্যা ফি মানাকিব ইবনে তাইমিয়া লি ইবনি আবদিল হাদি, পৃ. ২০

উস্তাদদের সংখ্যা ছিল দুইশরও বেশি। বুখারী ও মুসলিম তাঁর মুখস্থ ছিল। তাফসীর ও আকীদার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন এক বিশাল সমুদ্র। তিনি যে বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করতেন, তাতে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করতেন। ইলমে কালাম, দর্শন, যুক্তিবিদ্যা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিজ্ঞানসমূহ তাঁর কাছে ছিল শিশুসুলভ আলোচনা, যেগুলোর ভুলভ্রান্তি তিনি প্রকাশ করে দিতেন। ফিকহ ও হাদীসের ওপর তাঁর যেমন দখল ছিল, তেমনি নাহ্, লুগাত, সীরাত ও ইতিহাসে তাঁর সমপরিমাণ দক্ষতা ছিল। উসূলে ফিকহ ও উসূলে হাদীসে তিনি ছিলেন ইমাম।

সতেরো বছর বয়সে তিনি যখন ইফতা-র আসনে বসলেন, তখন দামেস্কে হাম্বলীদের সুপ্রতিষ্ঠিত আলেমদের মধ্যে তাঁর গণনা হতে লাগল। এই সময়েই তিনি গ্রন্থ রচনার কাজ শুরু করেন এবং খুব দ্রুত তাঁর ইলমের খ্যাতি দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে।

পিতার ইন্তেকালের পর ২২ বছর বয়সে তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে মাদরাসায় হাদীসের দরস এবং জামে উমবীতে তাফসীরের দরস দিতে শুরু করেন। তাঁর ইলমী ও কারিগরি প্রতিভা আলেমদের বিস্ময়াভিভূত করে দিয়েছিল। তাঁর বয়স যখন ৩৩ বছর, তখন তিনি দামেস্কের মাদরাসা হাম্বলিয়াহ-এর প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। [১] আল-মালিকুন নাসির মুহাম্মদ বিন কালাউনের শাসনামলে সিরিয়ায় তাতারীদের আক্রমণের সময় ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন এবং বাদশাহসহ পুরো জাতিকে শত্রুর মোকাবিলায় দাঁড় করিয়ে দেন। এই সংঘর্ষের প্রাথমিক পর্যায়ে সিরিয়াবাসী পরাজিত হয়েছিল, কিন্তু ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি জনগণ ও শাসকদের মনোবল অটুট রাখেন, যার ফলে রমজান ৭০২ হিজরীতে মামলুকরা তাতারীদের বিরুদ্ধে এক ঐতিহাসিক বিজয় লাভ করে। [২]

ইবনে তাইমিয়াহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর বহুমুখী ইলমী খিদমত:

তিনি ইসলামী উলূমের বহুমুখী খিদমত এমনভাবে আঞ্জাম দিয়েছেন যে, তা পরিবেষ্টন করা কঠিন। দার্শনিকদের চিন্তা ও দর্শনের ওপর তিনি এমন লাজওয়াব জেরা করেছেন যে, যুক্তির পূজারীদের জন্য নিজেদের আত্মরক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। যুক্তিনির্ভর মুতাকাল্লিমদেরও তিনি সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু বানান এবং এই বিষয়টি স্পষ্ট করেন যে, দর্শনের জবাবে এরিস্টটল ও ফারাবীর যুক্তিবিদ্যাকে সমালোচনার মানদণ্ড বানিয়ে নিলে কখনোই কিতাব ও সুন্নাহর সঠিক তর্জমানি হতে পারে না, বরং সমস্যাগুলো আরও জটিল হয়ে যায়। আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে সেই পদ্ধতিই উত্তম এবং প্রতিটি যুগের জন্য যথেষ্ট ও ফলপ্রসূ যা কিতাব ও সুন্নাহর নুসূস-এর ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত।

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর যুগে অনেক মানুষ তাসাউফের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে সত্য পথ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। তাঁদের কয়েক দশক আগে শেখ ইবনে আরাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃ. ৬৩৮ হি.) গত হয়েছিলেন, যাঁর ‘ফুসুসুল হিকাম’ এবং ‘ফুতুহাতে মাক্কিয়াহ’ অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। তাঁর কিতাবসমূহে অনেক প্রক্ষিপ্ত বিষয় ও সংযোজনও করা হয়েছিল, বিশেষ করে ফুসুস সম্পর্কে খোদ ইবনে আরাবীর কিছু ভক্তদের বক্তব্য হলো যে, এতে এক-তৃতীয়াংশ অংশ পরবর্তীতে মেশানো হয়েছে। কিছু সুফীর কালাম ছিল জযব অবস্থার ফসল, যা মানুষ কোনো ব্যাখ্যা ছাড়াই হুবহু মেনে নিয়ে ভ্রান্ত আকীদা গ্রহণ করেছিল। মোটকথা, এই ধরনের রচনাগুলো অনেক নতুন আকীদা ও মতবাদের জন্ম দিয়েছিল যা কুরআন ও সুন্নাহর নুসূস-এর সাথে সাংঘর্ষিক ছিল। সুফীদের কিছু ভণ্ড দল...

[১] আল-উকুদুদ দুররিয়াহ, পৃ. ১৮ থেকে ২৭; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: বছর ৬৮২ হি., ৬৯৫ হি.

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: বছর ৬৯৯ হি., ৭০২ হি.

তারিখ-ই উম্মত-ই মুসলিমা

তারা এমন সব অদ্ভুত ও বিজাতীয় রীতিনীতি গ্রহণ করেছিল যার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক ছিল না। তাদের মাঝে কবরের প্রতি অতিভক্তি প্রদর্শন এবং কবরবাসীদের কাছে অভাব পূরণের প্রার্থনা করার রেওয়াজ ছিল সাধারণ বিষয়। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) এই ধরনের অতিরঞ্জন এবং শরীয়ত বিরোধী তাসাউফের বিরুদ্ধে মুখ ও কলম দিয়ে সংগ্রাম করেন এবং এর ত্রুটিগুলো স্পষ্ট করেন। [১] তাঁর প্রচেষ্টায় অনেক মানুষ তওবা করেন। [২]

বাতিল ফেরকাগুলো, বিশেষ করে বাতেনিয়া ও রাফেজিরা ইসলামের শিকড় কাটার কোনো সুযোগ ছাড়ে নি। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) অসংখ্য রিসালা ও কিতাবে তাদের প্রতারণা ও ধোঁকার পর্দা উন্মোচন করেন এবং এই বাস্তবতা স্পষ্ট করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং সাহাবায়ে কেরাম যে ইসলাম প্রচার করেছিলেন তার সাথে এদের কোনো সম্পর্ক নেই। [৩]

ব্যতিক্রমী মতামত ও পরীক্ষা:

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর পূর্বপুরুষরা হাম্বলী ছিলেন এবং তাঁর নিজের অধিকাংশ ফতোয়াও হাম্বলী ফিকহ অনুযায়ী ছিল। কিন্তু শরীয়তের নসূস, ফিকহি মাযহাবগুলোর উসূল এবং রেওয়াজাত ও আসনাদের ওপর মুজতাহিদসুলভ দৃষ্টি থাকার কারণে তাঁর জন্য হাম্বলী ফিকহকে হুবহু অনুসরণ করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। তাই তিনি সমস্ত ইমাম ও মুজতাহিদদের ফতোয়া থেকে উপকৃত হতেন এবং কোনো কোনো সময় বিতর্কিত মাসআলাগুলোতে যে মুজতাহিদের দলিল বেশি শক্তিশালী দেখতেন, তাঁর মাযহাব গ্রহণ করে নিতেন। [৪]

তাঁর অসাধারণ মেধার কারণে তিনি কয়েকটি মাসআলায় আসলাফদের গণ্ডির বাইরেও পা রেখেছিলেন, যার ফলে কোনো কোনো ইলমি মহলে তাঁর বিরুদ্ধে শোরগোল সৃষ্টি হয়েছিল। প্রচলিত তাসাউফের ত্রুটিগুলোর ওপর তাঁর সমালোচনার কারণে কিছু প্রভাবশালী লোক তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। বিরোধীরা কয়েকবার কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করে তাঁকে জেলে পাঠায়, কিন্তু তিনি যে বিষয়টিকে সত্য মনে করতেন তা থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হননি। কেবল দলিলের আলোকে নিজের অবস্থানের ভুল দেখতে পেলেই তিনি নিজের কথা থেকে ফিরে আসতেন। [৫]

শেষবারের মতো প্রেপ্তার ও কারাগারে মৃত্যু:

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) এক পর্যায়ে এই ফতোয়া দিয়েছিলেন যে, রওজা আতহারসহ কোনো কবরের জিয়ারতের উদ্দেশ্যে বিশেষ গুরুত্বের সাথে সফর করা সঠিক নয়। কারণ হাদিসে এসেছে: “তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোনো স্থানের উদ্দেশ্যে (সফরের) প্রস্তুতি নেওয়া যাবে না: মসজিদুল হারাম, মসজিদুল আকসা এবং আমার এই মসজিদ (মসজিদে নববী)।” [৬] ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর মতে, কবরের এই ধরনের জিয়ারতের মাধ্যমে শিরক ও বিদআতের দরজা খুলে যেত। তাঁর অভিমত ছিল এই হাদিস অনুযায়ী।

[১] দ্রষ্টব্য ইমাম ইবনে তাইমিয়ার কিতাবসমূহ: আর-রাদু আলাশ শাযিলী, আল-ওয়াসিতাহ বাইনাল হাক্কি ওয়াল খালক, যিয়ারাতুল কুবুর আল-ইসতিনজাদ বিল মাকবুর।

[২] আল-উকুদুদ দুররিয়াহ লি-ইবনি আবদিল হাদী, পৃ. ২১১।

[৩] তারিখ-ই দাওয়াত ওয়া আযীমত: ২/১৪১ থেকে ১৪৪, ৩১৩ থেকে ৩১৮।

[৪] তারিখ-ই দাওয়াত ওয়া আযীমত: ২/৭০ থেকে ১০৮... মনে রাখা দরকার যে, কোনো একজন ইমামের তাকলীদ করা শুধু সাধারণ মানুষের জন্যই নয় বরং অ-মুজতাহিদ আলেমদের জন্যও জরুরি, যাতে তারা চিন্তার বিভ্রান্তি, ইলমের স্বল্পতা এবং ফেরকাবাজি থেকে রক্ষা পেতে পারে। তবে মুজতাহিদের ওপর এই বাধ্যবাধকতা নেই। ইমাম ইবনে তাইমিয়া নিজেকে সেই ইলমি স্তরে মনে করতেন, যার প্রেক্ষিতে তিনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাকলীদের গণ্ডির বাইরে পা রেখেছিলেন। এটি ছিল তাঁর ইজতিহাদী পদক্ষেপ যার জন্য তাঁকে দোষারোপ করা যায় না। কিন্তু অন্য কেউ যদি তাঁর মতো ইলমি যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও তাঁর অনুকরণ করার চেষ্টা করে, তবে সে মুখ খুবড়ে পড়বে। কারণ নসূস থেকে মাসআলা ইস্তিহাত করার যে যোগ্যতা ও গভীরতা প্রয়োজন, তা সবার ভাগ্যে জোটে না। ইসলামি চিন্তাবিদ মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি (দা.বা.)-এর কিতাব “তাকলীদের শরয়ী মর্যাদা” অধ্যয়ন করা উচিত, যাতে এই বিষয়ের সমস্ত দিক নিয়ে অত্যন্ত চমৎকার আলোচনা করা হয়েছে।

[৫] তারিখ-ই দাওয়াত ওয়া আযীমত: ২/১১০ থেকে ১১৫।

[৬] সহীহ বুখারী, হা: ১১৮৯, বাবু ফাদলিস সালাতি ফিল মাসজিদ।

রওজায়ে আকদাসের জিয়ারতের জন্যও সংকল্প করে যাওয়া সমীচীন নয়, বরং মসজিদে নববীতে নামাজের নিয়তে হাজিরা দেওয়া উচিত এবং এরপর রওজায় সুন্নাত অনুযায়ী সালাত ও সালাম পেশ করা উচিত। বিরোধীরা তাঁর এই অভিমতকে এমনভাবে গ্রহণ করেছে যে, তিনি রওজায়ে আতহারের জিয়ারত অস্বীকারকারী। এই বিষয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে এমন উত্তেজনা ছড়ানো হয়েছিল যে, সুলতান আল-মালিক আন-নাসির তাঁর ভক্ত হওয়া সত্ত্বেও কৌশলগত কারণে তাঁকে বন্দি করতে বাধ্য হন। এটি ৭ শাবান ৭২৬ হিজরির ঘটনা। [১]

তাঁর জীবনের শেষ দুই বছর দামেস্কের কারাগারেই অতিবাহিত হয়। এই সময়ে তাঁর অধিকাংশ সময় তিলাওয়াত, অধ্যয়ন এবং লেখালেখিতে কাটত। তিলাওয়াতের আধিক্য এমন ছিল যে, তিনি কারাগারের দুই বছরে তাঁর ভাইয়ের সাথে কুরআন মাজিদের আশিটি খতম সম্পন্ন করেন। লেখালেখির ক্ষেত্রেও বেশিরভাগ জোর ছিল কুরআনের তাফসিরের ওপর। এছাড়া ফিকহি প্রশ্নের উত্তরও লিখে যেতেন। এক বছর দশ মাস অতিবাহিত হওয়ার পর তাঁর কাছ থেকে লেখালেখির সরঞ্জাম জব্দ করা হয়। এরপরও তিনি কয়লা দিয়ে কাগজের টুকরোয় লেখার কাজ চালিয়ে যান। জিলকদ ৭২৮ হিজরিতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং একই মাসের ২২ তারিখে ৬৭ বছর বয়সে পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। জানাজা কারাগার থেকে বের করা হয়। সেদিন শহরের সব বাজার বন্ধ ছিল। দামেস্কের ইতিহাসে শতাব্দীকাল ধরে এত বড় জানাজা কখনো দেখা যায়নি। [২] ‘মাকাবিরে সুফিয়া’ নামক কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন হয়। [৩]

হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন:

“তিনি তাঁর সমসাময়িকদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখতেন। উপস্থিত বুদ্ধি, হৃদয়ের শক্তি এবং ইলমে নকলি ও আকলির ওপর দখলের দিক থেকে তিনি এক বিস্ময়কর মানুষ ছিলেন।” [৪]

রচনাবলি:

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) রচনাবলির এত বিশাল ভাণ্ডার রেখে গেছেন যে, আজ পর্যন্ত পৃথিবী তাতে মুগ্ধ হয়ে আছে। তাঁর লেখনিসমূহ চিন্তার গভীরতা, অধ্যয়নের ব্যাপকতা, মুখস্থ শক্তি এবং ইলমি গভীরতার প্রমাণ। তাঁর ফাতাওয়াগুলো চার ইমামের ফিকহের ওপর তাঁর মজবুত দখলের পরিচয় দেয়। হাদিস ও ইতিহাসে তিনি সহিহ ও জয়িফ বর্ণনার পার্থক্য বজায় রেখে দলিল পেশ করেন। রিজালুল হাদিস এবং ইতিহাসের বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত সুপরিচিত বলে মনে হয়। তাঁর কলমের সাবলীলতা মানুষের মস্তিষ্কে সাথে নিয়ে বয়ে চলে। তাঁর বাচনভঙ্গি ফাসাহাত ও বালাগাতের চরম সীমায় পৌঁছে যায়। তাঁর আলোচনায় হৃদয়ের ব্যথা, ইমানি চেতনা, নবীর প্রতি ভালোবাসা, শরিয়তের সাথে গভীর সম্পর্ক এবং উম্মতের করুণ অবস্থার প্রতি আক্ষেপের বহিঃপ্রকাশ যত্রতত্র দেখা যায়। বাতিল ফেরকাগুলোর খণ্ডনে তাঁর কলম দুধারী তলোয়ার হয়ে ওঠে। তাঁর দলিল পেশ করার পদ্ধতিতে কুরআন ও সুন্নাহর নসূস এত আধিক্যের সাথে পাওয়া যায় যে অবাক হতে হয়। এর পাশাপাশি তিনি ঐতিহাসিক উদ্ধৃতি, যৌক্তিক প্রমাণ, অভিধান এবং নাহ থেকেও সাহায্য নিয়ে নিজের দাবি প্রমাণ করতে কোনো ত্রুটি রাখেন না। তাঁর কয়েকটি প্রসিদ্ধ রচনাবলির পরিচয় নিচে দেওয়া হলো:

[১] আল-উকুদুদ দুররিয়্যাহ, পৃ. ৩৩৩ থেকে ৩৭৭

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: বছর ৭২৮ হিজরি

[৩] তারিখ দাওয়াত ও আজিমত: ২/১২৫

[৪] আদ-দুরারুল কামিনাহ ফি আয়ানিল মিআতিল সামিনাহ: ১/৩৬, দাক্ষিণাত্য সংস্করণ

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

চতুর্থ খণ্ড

- আল-আকিদাহ আল-ওয়াসিতিয়াহ: আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ঐক্যমত্যপূর্ণ আকিদাহর প্রসিদ্ধ মূলপাঠ।
- শারহুল আকিদাহ আল-আস্বাহানিয়াহ: শেখ মুহাম্মদ বিন আস্বাহানীর ‘আল-আকিদাহ আল-আস্বাহানিয়াহ’-এর সর্বোত্তম ব্যাখ্যা।
- আত-তুহফাতুল ইরাকিয়াহ: ঈমানিয়াত বা বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়ের সহজবোধ্য বর্ণনা।
- কায়েদাহ আজিমা ফি আল-ফারক বাইনা ইবাদাত আহল আল-ইসলাম ওয়া ইবাদাত আহল আশ-শিরক: এতে মুসলিম ও কাফিরদের বিশ্বাস ও ইবাদতের মধ্যকার মৌলিক পার্থক্যগুলো স্পষ্ট করে প্রমাণ করা হয়েছে যে, একজন মুমিন এবং একজন মুশরিকের বিশ্বাস ও ইবাদতের মধ্যে কখনো কোনো মধ্যপন্থা হতে পারে না।
- আল-ফাতাওয়া আল-হামাবিয়াহ আল-কুবরা: আল্লাহর গুণাবলি সম্পর্কে শায়খুল ইসলামকে করা কিছু প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর, যার কারণে শায়খকে তৎকালীন আলেমদের বিরোধিতা এবং সরকারের পক্ষ থেকে শান্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল।
- দারউ তাআরুদিল আকলি ওয়ান নাকলি: ১০ খণ্ড: প্রায় তিন হাজার পৃষ্ঠা। বিবেক ও শরয়ী দলিলের (নসুস) মধ্যে ভারসাম্যের মূলনীতি। ইবনে সিনা, ইবনে রুশদ এবং তুসীর মতো প্রখ্যাত দার্শনিকদের মতবাদের খণ্ডন।
- ইকতিদাউস সিরাতিল মুস্তাকিম: দুই খণ্ড এবং প্রায় এক হাজার পৃষ্ঠার এই বইটি অত্যন্ত আলোড়ন সৃষ্টিকারী; এতে সেই সময়ের ঐসব বিদআত এবং কুফরি ও শিরকি রীতিনীতির খণ্ডন করা হয়েছে যা মুসলিম সমাজে প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল।
- আল-ইস্তিকামাহ: দুই খণ্ড। আল্লাহর কিছু গুণাবলি, তাঁর ভালোবাসা এবং বিবেকের সঠিক কর্মপরিধি সম্পর্কে অত্যন্ত সূক্ষ্ম আলোচনা।
- আল-ইকলিল: আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলির ওপর শরয়ী দলিলের (নসুস) আলোকে ঈমান আনা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যাখ্যা ও অপব্যাখ্যা পরিহার করা সম্পর্কে।
- আল-ঈমান: ঈমান ও ইসলামের হাকিকত বা প্রকৃত রূপের বর্ণনা।
- আত-তাদমুরিয়াহ: আল্লাহর নাম ও গুণাবলির আলোচনা, তাকদীরের বর্ণনা এবং তাকদীর সম্পর্কে বিভ্রান্ত দলগুলোর খণ্ডন।
- আল-জাওয়াবুস সহীহ লিমান বাদ্দালা দ্বীনাল মাসীহ: ৫ খণ্ড: খ্রিষ্টানদের আপত্তির দাঁতভাঙা জবাব এবং তাদের বাতিল আকিদাহর জোরালো খণ্ডন। এতে প্রমাণ করা হয়েছে যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম-এর দ্বীন সেটিই যার ওপর মুসলমানরা আমল করছে, পক্ষান্তরে নাসারারা এই দ্বীনকে পরিবর্তন করে কুফর ও শিরকের গোলকধাঁধায় আটকে আছে। আজ পর্যন্ত পাদ্রী সাহেবরা এই কিতাবের কোনো জবাব দিতে পারেননি।
- আল-উবুদিয়াহ: আল্লাহর ইবাদত এবং এ সম্পর্কে দ্বীনের সহজ ও সঠিক শিক্ষা, ঈমান ও ইসলামের ব্যাখ্যা, দাসত্ব ও আনুগত্যের হাকিকত, আল্লাহ সম্পর্কে মূখ্য সুফীদের চিন্তাধারার খণ্ডন এবং জিহাদের হাকিকত।
- মিনহাজুস সুন্নাহ আন-নাবাবিয়াহ: ৮ খণ্ড, আহলে সুন্নাতের আকিদাহর প্রমাণ এবং রাফেজীদের খণ্ডনে এক বিশাল সমুদ্র।
- আল-ফুরকান বাইনা আউলিয়া ইর-রহমান ওয়া আউলিয়া ইশ-শয়তান: শরীয়তের অনুসারী প্রকৃত আউলিয়া এবং সুফী দাবিদারদের মধ্যে পার্থক্য।

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

- ভেলকিবাজ আমলকারী এবং জাদুকরদের মধ্যে পার্থক্য প্রকাশকারী নিজ বিষয়ের ওপর প্রথম ও অনন্য কিতাব।
- যিয়ারাতুল কুবুর ওয়াল ইস্তিনজাদ বিল মাকবুর: কবরের যিয়ারতের অবৈধ প্রথা এবং দাফনকৃত বুজুর্গদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করার খণ্ডনে অত্যন্ত চমৎকার কিতাব।
- আর-রাদ্দু আলাল মানতিকিয়িন: যুক্তিবিদ্যা এবং গ্রীক যুক্তিনির্ভর দর্শনের গুরুত্বহীন ও অসার হওয়ার বিষয়ে এক অতুলনীয় কিতাব।
- আস-সাফাদিয়্যাহ: দুই খণ্ডে। দার্শনিক ও বাতেনীদের ভ্রান্ত আকিদা এবং ওয়াহদাতুল ওজুদ-এ বিশ্বাসী সুফিদের খণ্ডন; এরিস্টটল ও ইবনে সিনার চিন্তাধারার ভিত্তির ওপর আঘাত।
- আন-নুসাইরিয়্যাহ: নুসাইরি ফেরকার স্বরূপ উন্মোচনকারী প্রথম রচনা।
- বুগইয়াতুল মুরতাদ: দার্শনিক, বাতেনী এবং কারামতিদের ভ্রান্ত আকিদার ভিত্তি ধূলিসাৎকারী রচনা।
- মুকাদ্দিমা উসুলুত তাফসির: তাফসিরের মূলনীতি, এক অনন্য ও আকর্ষণীয় চণ্ডে।
- দাকায়িকুত তাফসির: তিন খণ্ডে: অত্যন্ত চমৎকার ও অতুলনীয় তাফসিরি আলোচনা।
- রাফউল মালাম আন আইন্মাতিল আলাম: আইন্মায়ে আরবা-র মর্যাদা ও মহত্বের ওপর এক অতুলনীয় রিসালা।
- রা'সুল হুসাইন: কারবালার ঘটনা, হযরত হুসাইন (রা.)-এর শাহাদাত এবং তাঁর পবিত্র মস্তক দাফনের স্থান সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে আলোচনা।
- আস-সিয়াসাতুশ শারইয়্যাহ ফি ইসলাহির রাযি ওয়ার রাইয়্যাহ: ইসলামী রাজনীতির মূলনীতি এবং শাসকদের তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করার বিষয়ে।
- আল-হিসবাহ ফিল ইসলাম: ইসলামী রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ 'মুহকামা-এ-ইহতিসাব' (জবাবদিহিতা বিভাগ)-এর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব, এর উপকারিতা এবং দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা।
- আল-ফাতাওয়াল কুবরা: ছয় খণ্ডে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে পরিবেষ্টনকারী গুরুত্বপূর্ণ ও দলিলভিত্তিক ফতোয়া।
- মাসআলাতুল মুরাবাতাহ বিস সুগুর: জিহাদ ও মুজাহিদদের উৎসাহ প্রদানের জন্য রিসালা, যাতে প্রমাণিত হয়েছে যে সীমান্তে পাহারারত সৈনিকরা মক্কায় ইবাদতে জীবন অতিবাহিতকারীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।
- আহাদিসুল কুসাসাস: সেই সব বর্ণনার বাস্তবতা যা মিস্বরে রাসুলের হাদিস হিসেবে বর্ণনা করা হয়, কিন্তু হয়তো মূল হাদিসে রদবদল করা হয়েছে অথবা সেগুলো সম্পূর্ণ বানোয়াট।
- আস-সারিমুল মাসলুল আলা শাতিমির রাসুল: হজুর নবী করীম (সা.)-এর শানে বেয়াদবি বা অবমাননাকারীদের শরয়ী শাস্তি সম্পর্কে একটি বিস্তারিত ও নজিরবিহীন আলোচনা।
- আয-যুহদু ওয়াল ওয়ারাউ ওয়াল ইবাদাহ: ঈমানি গুণাবলি, আত্মশুদ্ধি এবং উত্তম চরিত্র সম্পর্কে।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর রিসালার সংখ্যা প্রায় তিনশ বলা হয়। একজন সৌদি গবেষক ডক্টর আবদুর রহমান মুহাম্মদ

ইবনে আল-কাসিম তাঁর ফিকহী প্রবন্ধগুলোর সংকলন ‘মাজমুউল ফাতাওয়া’ নামে প্রকাশ করেছেন যা ৩৫ খণ্ডে সমাপ্ত। এই গবেষকের প্রচেষ্টায় ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ.-এর ফাতাওয়াগুলোর দুর্লভ সংকলন ‘আল-মুস্তাদরাক আলা মাজমুউল ফাতাওয়া’ শিরোনামে পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এর মাধ্যমে ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ.-এর ইলমী প্রতিভার আন্দাজ করা যায়।

হিন্দুস্তানে চিশতিয়া মাশায়েখদের অবদান

যেভাবে সিরিয়া ও মিশরে শাসক শ্রেণিকে ইসলামের প্রতিরক্ষায় জাগ্রত করার জন্য শাইখুল ইসলাম ইজ্জুদ্দিন বিন আব্দুস সালাম এবং আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ রহ.-এর মতো উলামায়ে কেরাম সক্রিয় ছিলেন, তেমনি দক্ষিণ এশিয়ায় মুসলিম সালতানাতে ইসলামী পরিচয় রক্ষা করা, সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে দ্বীনি রুহ ফুঁকে দেওয়া এবং একে মুসলিম বিশ্বের লাখো মুহাজিরদের জন্য শেষ আশ্রয়স্থলে পরিণত করার ক্ষেত্রে চিশতিয়া সিলসিলার বুজুর্গদের অবদান অবিস্মরণীয়। হিন্দুস্তানের মুসলিম সালতানাত এই দিক থেকে বাকি ইসলামী বিশ্ব থেকে ভিন্ন ছিল যে, এখানে জনসংখ্যার অনুপাতে মুসলমানরা ছিল আটার মধ্যে লবণের মতো। এই পরিস্থিতিতে বাইরে থেকে তাতারীদের আক্রমণ এবং হিন্দুস্তানের সীমান্তে তাদের ধ্বংসযজ্ঞ কেবল দিল্লির তুর্কি বংশোদ্ভূত মুসলিম বাদশাহদেরই কঠিন পরীক্ষায় ফেলেনি, বরং স্থানীয় মুসলিম জনপদও অস্থিরতা ও উদ্বেগের শিকার ছিল। এই নাজুক পরিস্থিতিতে চিশতিয়া সিলসিলার আকাবির ও মাশায়েখগণ এই ভূখণ্ডের সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ঈমান ও ইখলাস, ইয়াকিন ও মারিফাত এবং আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের মতো উচ্চ গুণাবলীতে সজ্জিত করে এই যোগ্য করে তুলেছিলেন যে, তারা উন্মত্তে মুসলিমার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে পারে।

খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী রহ.

চিশতিয়া সিলসিলার অগ্রপথিক হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী রহ. তাতারী আক্রমণের প্রায় ৩০ বছর আগে হিন্দুস্তানে আগমন করেন এবং আজমীরকে তাঁর তাবলীগী কার্যক্রমের কেন্দ্রে পরিণত করেন। তাতারীদের আক্রমণের সময় যখন দূর-দূরান্তের ধ্বংসপ্রাপ্ত ইসলামী অঞ্চলগুলো থেকে মুহাজিররা হিন্দুস্তানে সমবেত হতে শুরু করল, তখন খাজা সাহেব রহ. এবং তাঁর খলিফাগণ অত্যন্ত সাহসিকতা ও দূরদর্শিতার সাথে এই সিদ্ধান্ত নিলেন যে, ভবিষ্যতে হিন্দুস্তানকে মুসলিম বিশ্বের তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক অস্তিত্ব রক্ষার জন্য একটি শক্তিশালী ও বিস্তৃত ভিত্তির ওপর গড়ে তোলার কাজ শুরু করা উচিত। সে অনুযায়ী আল্লাহর ওপর ভরসা করে এই কাজ শুরু করা হলো। ৬২৭ হিজরিতে (১২৩০ খ্রিষ্টাব্দ) খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী রহ. ইন্তেকাল করেন, কিন্তু তাঁর খলিফাগণ তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে এগিয়ে চলেন।

খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী রহ.

খাজা মঈনুদ্দিন আজমেরী রহ.-এর জীবদ্দশাতেই তাঁর প্রধান খলিফা খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী রহ. দিল্লিতে হিদায়াত ও দিকনির্দেশনার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। স্থানীয় ও মুহাজির মুসলমান ছাড়াও সালতানাতে গণ্যমান্য ব্যক্তিরাত্ত তাঁর দ্বারা উপকৃত হতেন।

[১] তারিখ-এ দাওয়াত ও আজিমত: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩ থেকে ৩১; আরও দেখুন: তারিখ-এ মাশায়েখ-এ চিশত, হযরত শাইখুল হাদিস মাওলানা মুহাম্মদ জাকারিয়া কান্ধলভী।

ছিলেন। সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুতমিশ, যিনি ৬০৭ হিজরি থেকে ৬৩৩ হিজরি (১২০৯ খ্রি. থেকে ১২৩৬ খ্রি.) পর্যন্ত হিন্দুস্তানের বাদশাহ ছিলেন, তিনি তাঁর মুরিদ ছিলেন এবং সপ্তাহে দুইবার তাঁর খানকাহে সংশোধন ও ফয়েজ হাসিলের উদ্দেশ্যে হাজিরা দিতেন। বাদশাহর এই আচরণ সমস্ত প্রজাদের খাজা সাহেব (রহ.)-এর প্রতি ভক্তিতে আপ্লুত করে দিয়েছিল এবং মানুষ দলে দলে ইশক ও মারেফাতের এই ঝরনাধারা থেকে তৃপ্ত হওয়ার জন্য আসতে শুরু করেছিল। আধ্যাত্মিকতার এই জোয়ার পুরো হিন্দুস্তানে ঈমানি উদ্দীপনা, দ্বীনি চেতনা এবং ইসলামি ভ্রাতৃত্বের এমন এক পরিবেশ তৈরি করেছিল যে, সারা বিশ্বের আশ্রয়হীন মুসলমানদের জন্য এই ভূখণ্ডের দরজা উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং এই অঞ্চলে প্রতিটি বর্ণ ও বংশের মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে বিলীন করে নেওয়ার সক্ষমতা তৈরি হয়েছিল।

৬৩৩ হিজরিতে খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকি (রহ.)-এর ইন্তেকালের পর তাঁর সিলসিলার বহু মহান মাশায়েখ এই ময়দানে কাজ করতে থাকেন। খাজা ফরিদুদ্দিন গঞ্জেশকর (মৃ. ৬৬৪ হি.), শেখ আলাউদ্দিন সাবির (মৃ. ৬৯০ হি.) এবং খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া (মৃ. ৭২৫ হি.) (রহ.)-এর মতো মহান সংস্কারকগণ দাওয়াত ইলাল্লাহ এবং উন্মতের সংশোধনের এই সংগ্রামে সক্রিয় ছিলেন। বিশেষ করে হযরত খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া (রহ.) উপমহাদেশের মুসলিম সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্র এবং প্রতিটি স্তরের মানুষের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিলেন। তাঁর দাওয়াতি ও সংস্কারমূলক প্রচেষ্টার প্রভাব থেকে দিল্লির সুলতানগণও বঞ্চিত ছিলেন না। [১]

মাশায়েখে সোহরাওয়ার্দিয়ার কীর্তিসমূহ

চিশতিয়া সিলসিলা ছাড়াও অন্যান্য সিলসিলার মাশায়েখগণও এই যুগে মধ্য এশিয়া এবং পারস্য ও ইরাক থেকে হিন্দুস্তানে চলে এসেছিলেন এবং আত্মশুদ্ধি ও সংশোধনের খিদমতে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে সোহরাওয়ার্দিয়া সিলসিলার শিরোমণি শায়খুল ইসলাম হযরত বাহাউদ্দিন জাকারিয়া মুলতানি (রহ.)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যিনি বাগদাদে শেখ শাহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দি (রহ.)-এর নিকট থেকে ফয়েজ লাভ করেছিলেন এবং এরপর দাওয়াত ইলাল্লাহ ও ইলায়ে কালিমাতুল্লাহর জজবা নিয়ে হিন্দুস্তানে এসেছিলেন। অতঃপর তাঁর মুরিদ শাহ রুকনে আলম থেকে শুধু উপমহাদেশের সাধারণ মানুষই নয়, বরং সুলতান গিয়াসুদ্দিন তুঘলক, সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক এবং আলাউদ্দিন খিলজির মতো প্রখ্যাত বাদশাহগণও ফয়েজ হাসিল করেছিলেন। শাহ রুকনে আলম (রহ.)-এর খলিফা হযরত জাহানিয়া জাহাগাশত (রহ.)-এর খিদমতসমূহও ইতিহাসের অংশ। [২]

এই দ্বীনি বুজুর্গদের এক শতাব্দীর সক্রিয় প্রচেষ্টা একদিকে হিন্দুস্তানের মুসলিম সরকারকে ইসলামের পুনর্জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের সক্ষমতা দান করেছিল, অন্যদিকে তাঁদের প্রচেষ্টায় লক্ষ লক্ষ অমুসলিম ইসলামে দাখিল হয়েছিল এবং হিন্দুস্তান সালতানাতের ভিত্তি এতটাই মজবুত হয়ে গিয়েছিল যে, তাতারীদের একের পর এক আক্রমণও একে টলাতে পারেনি।

[১] তারিখ দাওয়াত ও আজিমত ৩/৩১ থেকে ১০১; আরও দেখুন: তারিখ মাশায়েখে চিশত, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ জাকারিয়া মুহাজিরে মাদানি (রহ.)।

নোট: চিশতিয়া খাজা সাহেবদের বিস্তারিত অবস্থা উপমহাদেশের সুলতানদের সমসাময়িক উলামা ও মাশায়েখদের আলোচনায় আসবে।

[২] আব-এ-কাউসার, শেখ ইকরাম, পৃ. ২৬০ থেকে ২৯৭; ইয়াদগারে সোহরাওয়ার্দিয়া, খাউয়ার সোহরাওয়ার্দি, পৃ. ১০৭ থেকে ২০৬, তানজির সানস লাহোর, ১৯৯৯ খ্রি.

নকশবন্দিয়া সিলসিলার খিদমত

মুসলমানদের সংস্কার এবং নওমুসলিম মোগলদের দ্বীনি তরবীয়তের দায়িত্ব পালনকারী সিলসিলাসমূহের মধ্যে “নকশবন্দিয়া সিলসিলা”-র প্রতিষ্ঠাতা হযরত খাজা বাহাউদ্দিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বুখারী রহ. (৭১৭ হিজরী - ৭৯২ হিজরী)-কে সর্বদা স্মরণ করা হবে।

খাজা বাহাউদ্দিন রহ.-এর তুর্কিস্তানের মুসলিম মোগল শাসক খলিলের সাথে বিশেষ আত্মিক সম্পর্ক ছিল, যিনি একজন আবেদ, জাহিদ ও সুফী স্বভাবের মানুষ ছিলেন এবং ৭৩৩ হিজরী (১৩৩২ খ্রি.) থেকে ৭৪৪ হিজরী (১৩৪৩ খ্রি.) পর্যন্ত শাসক ছিলেন। এই সম্পর্কের প্রভাব সাধারণ মোগলদের ওপরও পড়ে এবং তারা খাজা বাহাউদ্দিন রহ.-এর শিক্ষা থেকে উপকৃত হতে শুরু করে।

খাজা সাহেব রহ.-এর সংস্কার পদ্ধতিতে জিকির ও শোগল গোপন পদ্ধতিতে জারি রাখা হতো এবং নির্জনবাসের পরিবর্তে মানুষের সাথে মেলামেশা করা এবং তাদেরকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করতে থাকার শিক্ষা দেওয়া হতো। খাজা সাহেব রহ. নিজেও শিল্প ও কারুশিল্পের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতেন এবং রত্নের ওপর মিনাকারির কাজ করতেন, তাই তাকে “নকশবন্দ” বলা হতো।

তঁার সিলসিলার সাথে যুক্ত সালেকিনদের নকশবন্দি বলার একটি কারণ এটিও ছিল যে, খাজা সাহেব রহ. এবং তঁার খলিফাদের সাহচর্যে আল্লাহর মহব্বতের নকশা অন্তরে গেঁথে যেত। সাধারণ জীবনে আখলাক ও শালীনতা, কাসবে হালাল এবং আল্লাহর পথে জিহাদে দলে দলে অংশগ্রহণ এই ব্যক্তিদের পরিচয়ে পরিণত হয়েছিল। [১]

খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দ রহ.-এর খলিফাগণ মোগল, তুর্কি, হিন্দু এবং বৌদ্ধদের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে দিতে, মুসলমানদের মধ্যে তাসাউফকে জনপ্রিয় করতে এবং নওমুসলিমদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের মধ্যে হযরত খাজা উবায়দুল্লাহ আহরার রহ. (৮০৬ হিজরী থেকে ৮৯৪ হিজরী মোতাবেক ১৪০৩ খ্রি. থেকে ১৪৮৯ খ্রি.)-এর নাম অত্যন্ত উজ্জ্বল, যাঁর দ্বারা সেই যুগের অধিকাংশ তুর্কিস্তানি ও খোরাসানি শাসক অত্যন্ত প্রভাবিত ছিলেন। বড় বড় উলামায়ে কেরাম তাঁর হালকার সাথে যুক্ত ছিলেন। মাওলানা আব্দুর রহমান জামী রহ.-এর মতো আলেম তাঁর থেকে ফয়েজ প্রাপ্ত ছিলেন। এরপর কাবুলের খাজা বাকী বিল্লাহ রহ. (৯৭১ হিজরী থেকে ১০১২ হিজরী মোতাবেক ১৫৬৩ খ্রি. থেকে ১৬০৩ খ্রি.)-ও এই সিলসিলার একজন বুজুর্গ ছিলেন যিনি মারেফতের দৌলত নিয়ে দিল্লিতে আগমন করেন এবং এখান থেকে তাঁর ফয়েজ উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। সংক্ষেপে, নকশবন্দিয়া সিলসিলা দুই শতাব্দীর মধ্যে তুর্কিস্তান থেকে বেরিয়ে হিন্দুস্তান, ইরান এবং এশিয়া মাইনর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে যায়।

[১] তারিখ বুখারা, ভ্যাম্বেরি আরমিনিয়াস, অনুবাদ আহমদ মাহমুদ সাদাতী, পৃ. ২৮৭, ২৮৮; তারিখুত তুর্ক ফি আসিয়া আল-উস্তা, প্রফেসর বার্থোল্ড, আরবি অনুবাদ আহমদ সাঈদ সুলাইমান, পৃ. ১৯০ থেকে ২২০।

[২] তারিখ দাওয়াত ও আজিমত: ১/ ৩৩১ থেকে ৩৮৯; উর্দু দায়েরায়ে মাআরিফে ইসলামিয়া পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি লাহোর: ১১/ ৫০ থেকে ৫২; নকশবন্দিয়া সিলসিলার আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন:

(১) আল-ইনতিবাহ ফি সালাসিলিল আউলিয়া, হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী।

(২) হামাআত, হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী।

(৩) রুদে কাওসার, শেখ মুহাম্মদ আকরাম।

চতুর্থ ফ্রন্ট: ইলমি উত্তরাধিকার সংরক্ষণের কাজ

উম্মাহর যে হিতাকাঙ্ক্ষীরা এই নাজুক সময়ে নিজেদের শক্তি ব্যয় করেছিলেন, তাদের চতুর্থ গুরুত্বপূর্ণ ফ্রন্ট ছিল ইলমি উত্তরাধিকার সংরক্ষণের কাজ। এটি এমন এক প্রয়োজন ছিল যা পূরণ করা ছাড়া ইসলাম ও মুসলমানরা নিরাপদ থাকতে পারত না।

নতুন দ্বীনি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা:

এই মুহূর্তে উম্মাহর অবশিষ্ট তলোয়ারধারী (বাকিয়াতুস সুযুফ) আলেমগণ মুসলমানদের ইলমি উত্তরাধিকার সংরক্ষণের প্রয়োজনকে অন্য সব কাজের ওপর অগ্রাধিকার দেন এবং নিজেদেরকে এই উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। তারা মিসর, শাম, হিন্দুস্তান এবং আন্দালুসের মতো স্বাধীন মুসলিম দেশগুলোতে বড় বড় দ্বীনি মাদরাসা কায়েম করেন এবং সেগুলোর দরজা সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেন। মুসলিম বাদশাহ ও শাসকরা তাদের পূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং তাদের ব্যয়নির্বাহের জন্য নিজেদের কোষাগারের একটি বড় অংশ নির্দিষ্ট করে দেন। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই এই মাদরাসাগুলো এত উন্নতি লাভ করে যে, সেগুলো সমরকন্দ, বুখারা, হেরাত, নিশাপুর, বসরা ও বাগদাদের ধ্বংস হয়ে যাওয়া ইলমি কেন্দ্রগুলোর অভাব পুরোপুরি পূরণ করতে শুরু করে। ইলম পিপাসুরা দূর-দূরান্ত থেকে এই অঞ্চলগুলোর দিকে যাত্রা শুরু করে এবং নিজেদের ইলমি তৃষ্ণা মেটাতে থাকে। তাতারদের অধিকৃত মুসলিম দেশগুলোতেও ওলামায়ে দ্বীন ঘরের ভেতরে দরস ও তাদরীসের ধারা অব্যাহত রাখেন এবং প্রদীপের শিখা থেকে প্রদীপ জ্বালিয়ে চলেন। বিশ-পঁচিশ বছরের মধ্যেই এই প্রচেষ্টার ফলাফল সামনে আসতে শুরু করে; একদল ইলম অনুরাগী তরুণ প্রজন্ম তৈরি হয় এবং মুসলমানদের পথপ্রদর্শনকারী ওলামায়ে দ্বীনের বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা দূর হয়ে যায়। [১]

নতুন গ্রন্থ রচনার ধারা:

তাতারী আক্রমণ যেভাবে মুসলিম বিশ্বের জনশক্তিকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছিল, তেমনিভাবে এর ইলমি উপায়-উপকরণ এবং শতাব্দী ধরে সংগৃহীত কিতাব ভাণ্ডারকেও ধ্বংস করে দিয়েছিল। হাজার হাজার জামেয়া, মাদরাসা ও মাকতাবকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছিল। ফকীহ, মুহাদ্দিস, মুফাসসির, ওয়ায়েজীন, মুদাররিস এবং তলাবা—যারা বিগত প্রজন্মের মেহনতের ফসল এবং আগামী দিনের দ্বীনি ইলমের উত্তরাধিকারী ও রক্ষক ছিল—তাদের একটি পুরো প্রজন্ম এই বিশ্বব্যাপী ফিতনার আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছিল। তাতারীরা প্রতিটি শহর ও জনপদের কিতাবখানাগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছিল এবং শতাব্দী ধরে ঘাম ঝরিয়ে সংগ্রহ করা ইলমি সম্পদকে ছাইয়ে পরিণত করেছিল। শুধুমাত্র বাগদাদে ধ্বংস করা কিতাবগুলো এত বেশি ছিল যে, সেগুলোর কালি ও ছাইয়ের কারণে দজলা নদীর পানি অনেক দিন পর্যন্ত কালো দেখা গিয়েছিল।

ফলে তাতারীদের হাতে মধ্য এশিয়া, ইরান ও ইরাকে ধ্বংস হওয়া লাখ লাখ কিতাবের ক্ষতি পূরণ করার জন্য...

[১] শেখ আব্দুল কাদির নুয়াইমি আদ-দিমাশকী (মৃ. ৯২৭ হিজরী) তার কিতাব ‘আদ-দারিস ফি তারিখিল মাদারিস’-এ সেই যুগে প্রতিষ্ঠিত হওয়া কয়েক ডজন মাদরাসার কথা উল্লেখ করেছেন।

তাদের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করা হয়েছে। এই বইগুলোর সেই পাণ্ডুলিপিগুলো যা আন্দালুস, মিশর এবং হিন্দুস্তানে বিদ্যমান ছিল, সেগুলোর বিপুল সংখ্যক অনুলিপি তৈরি করা হয়েছিল, যার ফলে অন্যান্য দেশে হারিয়ে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ বইগুলোর অভাব পূরণ করা সম্ভব হয়েছিল। উলামায়ে কেরামের একটি দল অত্যন্ত নিষ্ঠা, ধৈর্য এবং দায়িত্ববোধের সাথে লেখালেখি ও সংকলনকে নিজেদের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। সময়ের প্রয়োজন ও পরিস্থিতির দাবি অনুযায়ী দায়িত্ববোধ ও ইখলাসের কারণে তাদের হাতে অত্যন্ত শক্তিশালী, যুক্তিপূর্ণ ও ব্যাপক বইসমূহ অস্তিত্ব লাভ করে। তারা তাফসীর, হাদীস ও ফিকহ ছাড়াও অন্যান্য সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনেক উন্নত মানের কিতাব রচনা করেন। সরফ, নাহ্ ও অন্যান্য শাস্ত্রের অনেক কিতাব আজও পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা এই উত্তাল সময়েই রচিত হয়েছিল।

যদি আমরা তাতারীদের আক্রমণের পর সপ্তম হিজরী শতাব্দীর শেষ দিকে রচিত এই ইলমী ভাণ্ডার পর্যালোচনা করি, তবে স্পষ্টভাবে অনুভূত হবে যে, সেই যুগের গভীর জ্ঞানসম্পন্ন উলামায়ে কেরাম উম্মতকে যে মজবুত ইলমী কাঠামো প্রদান করেছিলেন, আজ পর্যন্ত তার স্থায়িত্ব ও গুরুত্ব একইভাবে অটুট রয়েছে।

সপ্তম হিজরী শতাব্দীর উলামায়ে কেরামের ইলমী ও তালীফী খিদমত

এই অশান্ত সময়ে আল্লাহর কিতাবের সর্বোত্তম তাফসীরসমূহ লিখিত হয়েছে। ইমাম কুরতুবী (র.) (মৃ. ৬৭১ হি.)-এর হাতে বারো খণ্ডে ‘আল-জামি’ লি-আহকামিল কুরআন’ যা ‘তাফসীরে কুরতুবী’ নামে প্রসিদ্ধ, এই যুগেই সম্পন্ন হয়েছে। ইমাম আবুল বারাকাত আবদুল্লাহ বিন আহমদ নাসাফী (মৃ. ৭০১ হি.)-এর ‘মাদারিকুত তানজীল’ যা ‘তাফসীরে নাসাফী’ নামে পরিচিত, এই শতাব্দীরই এক অনন্য নিদর্শন। এরপর তাফসীর ‘আল-বাহরুল মুহীত’ সামনে আসে যা আবু হাইয়ান আন্দালুসী (র.) (মৃ. ৭৪৫ হি.)-এর এক মহান কীর্তি।

ইলমে হাদীসেও উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ইমাম ইয়াহইয়া বিন শরফ আন-নববী (র.) (মৃ. ৬৭৬ হি.) সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ‘আল-মিনহাজ’ রচনা করেন, যা আজও প্রত্যেক আলেম ও তালিবে ইলমের জন্য অপরিহার্য। তাঁর ‘রিয়াদুস সালিহীন’ আজও সহীহ হাদীসের সর্বোত্তম সংকলন হিসেবে সাধারণ ও বিশিষ্ট সকলের কাছে সমানভাবে সমাদৃত।

শায়খ রাযীউদ্দীন সাগানী (র.) (মৃ. ৬৫০ হি.)-এর ‘মাশারিকুল আনওয়ার’ আজও আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে। হাফেজ আবদুল আজিম মুনিরী (র.) (মৃ. ৬৫৬ হি.)-এর ‘আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব’ আজও তার নিজ বিষয়ে এক অতুলনীয় কিতাব হিসেবে গণ্য হয়। আল্লামা ইবনে দাকীকুল ঈদ (র.) (মৃ. ৭০২ হি.)-এর মতো হাদীস বিশারদগণ এই যুগেরই অন্তর্ভুক্ত।

হানাফী ফকীহগণ ফিকহ শাস্ত্রে ব্যাপক কাজ করেছেন। তাজুশ শরীয়াহ আল্লামা মাহমুদ ফিকহী মতনের কিতাব ‘উইকায়াহ’ লিখেছেন এবং আল্লামা আবুল বারাকাত নাসাফী (র.) (মৃ. ৭০১ হি.) ফিকহ শাস্ত্রে ‘কানযুদ্ দাকায়িক’ এবং উসূলে ফিকহে ‘মানারুল আনওয়ার’-এর মতো মতনসমূহ লিখেছেন। উসূলে ফিকহের প্রসিদ্ধ মতন ‘হুসামী’-ও এই যুগেরই আল্লামা হুসামুদ্দীন ফারগানী (র.) (মৃ. ৬৪৪ হি.)-এর রচিত।

এই দিনগুলোতেই ইবনে সালাহ (র.) (মৃ. ৬৪৩ হি.) উসূলে হাদীসের ওপর তাঁর প্রসিদ্ধ ‘মুকাদ্দিমাহ’ লিখেছেন এবং আদাবুল ইফতা-তে ‘উসূলে...

“আল-মুফতি ওয়াল-মুস্তাফতি” রচনা করেন।

আরবি ভাষা ও যুক্তিনির্ভর শাস্ত্রের (উলুমে আকলিয়া) প্রতিও মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল। এই শতাব্দীতেই ইবনে মালিক (মৃত্যু ৬৭২ হিজরি) নাহর (ব্যাকরণ) বিখ্যাত ছন্দোবদ্ধ গ্রন্থ “আলফিয়াহ” রচনা করেন। আল্লামা ইবনুল হাজিব (মৃত্যু ৬৪৬ হিজরি)-এর “শাফিয়াহ” এবং “কাফিয়াহ”-এর মূল পাঠও (মাতন) এই দিনগুলোরই। অলঙ্কারশাস্ত্র ও অর্থবিজ্ঞানে (ইলমে বালাগাত ও মাআনি) অতুলনীয় গ্রন্থ “মিফতাহুল উলুম”-এর রচয়িতা আল্লামা আবু ইয়াকুব আস-সাক্কাকিও এই সময়ের প্রখ্যাত আলেমদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই অস্থির দিনগুলোতেই যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনের বিখ্যাত মূল পাঠ “ঈসাঘুজী” এবং “হিদায়াতুল হিকমাহ” আল্লামা আসীরুদ্দীন আল-আভহারী (মৃত্যু ৬৬১ হিজরি)-এর হাতে লিখিত হয়। প্রামাণ্য আরবি অভিধান “লিসানুল আরব”-এর রচয়িতা ইবনে মানযুর (মৃত্যু ৭১১ হিজরি)-এর সম্পর্কও এই সময়ের সাথে ছিল। ইবনে মানযুর আল্লামা ইবনে আসাকিরের “তারিখে দামেশক”-এর সংক্ষিপ্তসারও তৈরি করেছিলেন যা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল।

তাতারী ফিতনা মুসলিম বিশ্বের পূর্ববর্তী অধিকাংশ নিদর্শন ও ঐতিহাসিক সম্পদকেও পদদলিত করেছিল, তাই ইসলামি ইতিহাস মুছে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। তবে তাতারী ফিতনার চরম উত্থানের সময় আল্লামা ইবনুল আসীর আল-জাযারি (মৃত্যু ৬৩০ হিজরি) “আল-কামিল ফিত তারিখ” সম্পন্ন করে এই সময় পর্যন্ত ইসলামি ইতিহাসকে সংরক্ষিত করে দেন। এই দিনগুলোতেই ইয়াকুত আল-হামাভি (মৃত্যু ৬২৬ হিজরি) “মুজামুল বুলদান”-এ হাজার হাজার শহর ও জনপদের বিবরণ সংগ্রহ করেন, পাশাপাশি “মুজামুল উদাবা”-তে তাঁর সময় পর্যন্ত সমস্ত প্রখ্যাত সাহিত্যিক, কবি, নাস্তিবিদ, সরফবিদ এবং ভাষাবিদদের অবস্থা বর্ণনা করে তাঁদের ইতিহাসে অমর করে দেন। কয়েক দশক পর ইবনে খাল্লিকান (মৃত্যু ৬৮১ হিজরি) সামনে আসেন এবং “ওয়াফায়াতুল আইয়ান” রচনা করে এই কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যান। ইলমের আকাশের অনেক উজ্জ্বল নক্ষত্রকে আমাদের এই অন্ধকার শতাব্দীতে আলোর রশ্মি ছড়াতে দেখা যায়।

অষ্টম ও নবম হিজরি শতাব্দীতে গ্রন্থ রচনা ও সংকলনের উদ্দীপনা:

এটি কেবল কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয়, বরং সপ্তম হিজরি শতাব্দীর বিপর্যয়কর যুগে ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞান সংরক্ষণ ও প্রসারের জন্য নিবেদিতপ্রাণ দৃঢ়সংকল্প আলেমদের অসাধারণ মনোযোগ ও নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার ফল ছিল যে, অষ্টম হিজরি শতাব্দী মুসলিম বিশ্বের জন্য জ্ঞানীয় উন্নতির দিক থেকে একটি আদর্শ যুগ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছিল এবং এতে এমন সব জ্ঞানের পাহাড় জন্ম নিয়েছিলেন যাদের প্রত্যেকেই মুসলিম বিশ্বকে জ্ঞানীয় ময়দানে স্বতন্ত্র গ্রন্থাগার উপহার দিয়েছিলেন।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (মৃত্যু ৭২৮ হিজরি)-এর মতো বিশ্ববিশ্রুত প্রতিভা, ইমাম জামালুদ্দীন আল-মিযযি (মৃত্যু ৭৪২ হিজরি)-এর মতো রিজালুল হাদিস শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ, আল্লামা আলাউদ্দীন আল-বাজি (মৃত্যু ৭১৪ হিজরি)-এর মতো মুতাকাল্লিম (ধর্মতত্ত্ববিদ) এবং আবু হাইয়ান আন-নাহভি (৬৫৪ থেকে ৭৪৫ হিজরি)-এর মতো আরবি ভাষার ইমাম...

[১] নোট: তবাকাতের কিতাবগুলোতে আল্লামার মৃত্যুসন ৬২৬ হিজরি বলা হয়েছে যা সঠিক নয়, কারণ ইতিহাসের কিতাবগুলো থেকে ৬২৭ হিজরিতে সুলতান জালালুদ্দীনের দরবারের সাথে উক্ত আল্লামার সংশ্লিষ্টতা এবং তাঁর আদেশে বাগদাদ সফরের কথা প্রমাণিত হয়। এছাড়াও সুলতান জালালুদ্দীনের পর তিনি চাগতাই খানের কাছেও কিছুকাল অতিবাহিত করেছিলেন। এই বর্ণনাগুলো সামনে রাখলে ৬২৯ হিজরিতে তাঁর মৃত্যুর কথাটি নিশ্চিতভাবে সঠিক মনে হয়।

নোট: “মিফতাহুল উলুম”-এর সংক্ষিপ্তসার আল্লামা আবদুর রহমান আল-কাযভিনি (মৃত্যু ৭৩৯ হিজরি) “তালখিসুল মিফতাহ” নামে তৈরি করেন এবং এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ “মুখতাসারুল মাআনি” আল্লামা তাফতায়ানী রচনা করেন।

এই জামানায় পুরোপুরি একাগ্রতার সাথে কর্মতৎপর দেখা যায়। [১]

এই মহান ব্যক্তিদের মধ্যে হাফিজ যাহাবী রহ. (ম্. ৭৪৮ হি.) রিজালুল হাদিস ও ইতিহাসে অনেক বড় কাজ করেছেন এবং তাযকিরাতুল হুফফাজ, মিজানুল ইতিদাল, তারিখুল ইসলাম, আল-ইবার ফি খবর মান গাবার, আল-আলাম বি-ওয়াফায়াতিল আলাম এবং সিয়ারু আলামিন নুবালা-এর মতো মহান কিতাবসমূহ রচনা করেছেন। হাফিজ ইবনে কাসীর দামেশকী রহ. (৭০১ হি. থেকে ৭৭৪ হি.) বিশ্বখ্যাত তাফসীর লিখেছেন যা তাফসীরে ইবনে কাসীর নামে পরিচিত। তাছাড়া আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-এর মতো ব্যাপক ইতিহাস এবং জামিউল মাসানিদ ওয়াস সুনান নামে হাদিসের এক বিশাল সংকলনও তাঁরই কীর্তি। হাফিজ জামালুদ্দিন আল-মিযযী রহ. (ম্. ৭৪২ হি.) তুহফাতুল আশরাফ বি-মা'রিফাতিল আতরাফ এবং তাহযীবুল কামাল ফি আসমায়ির রিজাল-এর মতো বিশাল ও কালজয়ী কিতাবসমূহ লিখেছেন।

হাফিজ ইবনে কাইয়্যিম রহ. (৬৯১ হি. থেকে ৭৫১ হি.) সীরাতে নববীর ওপর তাঁর অতুলনীয় রচনা যাদুল মাআদ ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ের ওপর অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী কিতাব রচনা করেছেন। এই যুগেই তাফসীর বিষয়ে ইমাম বালানসী (ম্. ৭৮২ হি.) তাফসীরু মুবহামাতিল কুরআন এবং শায়খ সামীন হালাবী (ম্. ৭৫৬ হি.) আদ-দুররুল মাসুন নামক তাফসীর সংকলন করেন।

হানাফী ফিকহের লক্ষ লক্ষ কিতাব আহনাফদের ইলমের কেন্দ্র বাগদাদ ধ্বংসের সময় তাতারীদের হাতে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। হাফিজ জামালুদ্দিন যায়লায়ী রহ. (ম্. ৭৬২ হি.) নাসবুর রায়াহ ফি তাখরিজি আহাদিসিল হিদায়াহ-এর মতো ইলমী শাহকার পেশ করে আহনাফদের অধিকাংশ দলিলকে সংরক্ষিত করে দিয়েছেন। তাঁরই সমসাময়িক সদরুশ শরীয়াহ উবায়দুল্লাহ বিন মাসউদ (ম্. ৭৪৭ হি.) হানাফী ফিকহের বিখ্যাত শরহ ওয়াকায়াহ রচনা করেন, তাছাড়া উসূলে ফিকহে মতন হিসেবে তানকীহ এবং এরপর তার শরহ তাওযীহ-ও লিখেছেন। এই সব কিতাব আজ পর্যন্ত উলুমে ইসলামিয়ার নেসাবের অন্তর্ভুক্ত।

আকলী (যৌক্তিক) উলূমের ওপরও কাজ হয়েছে। আল্লামা কুতুবুদ্দিন রাযী (৭৬৬ হি.) মানতিকের বিখ্যাত মতন শামসিয়া-এর শরহ লিখেছেন যা কুতুবী নামে পরিচিত। আল্লামা সাদউদ্দিন তাফতায়ানী (ম্. ৭৯২ হি.) মাকুলাত, ইলমে কালাম এবং উলূমে আরাবিয়্যাতে কিতাবের স্তূপ লাগিয়ে দিয়েছেন। শরহে আকায়েদে নাসাফী, আল-মুতাউওয়াল এবং মুখতাসারুল মাআনী তাঁর বিখ্যাত রচনা। তাঁরই সমসাময়িক সাইয়েদ শরীফ জুরজানী রহ. বিভিন্ন শাস্ত্রের ময়দানে স্মরণীয় কিতাবসমূহ রচনা করেছেন। সরফে মীর এবং নাহবে মীর তাঁর হাতে তৈরি হওয়া চিরসবুজ কারিগরি শাহকার। ইবনে হিশাম (ম্. ৭৬১ হি.) মুগনীল লাবীব, ইবনে আকীল (ম্. ৭৬৯ হি.) শরহে আলফিয়্যাহ এবং আখী সিরাজ আওধী (ম্. ৭৫৮ হি.) হিদায়াতুন নাহব রচনা করেছেন। [২] ইমাম তাজউদ্দিন সুবকী রহ. (ম্. ৭৭১ হি.) হাদিস, উসূলে ফিকহ, আসমায়ুর রিজাল, তাবাকাত এবং ইতিহাসের ময়দানে ভরপুর কাজ করেছেন এবং মূল্যবান নিদর্শন রেখে গেছেন যার মধ্যে মুজামুশ শুযুখ, আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর, রাফউল হাজিব আন মুখতাসার ইবনিল হাজিব,

[১] উম্মতের এই মহান ব্যক্তিদের বিস্তারিত অবস্থার জন্য দেখুন: ওয়াফায়াতুল আইয়ান লি-ইবনে খাল্লিকান; আল-আলাম লিয-যিরিকলী; তাবাকাতুল হুফফাজ লি-ইবনে হাজার আসকালানী; কাশফুয যুনুন আন আসামিল কুতুবি ওয়াল ফুনুন, আয কাতিব চালাবী (হাজী খলিফা)।

[২] এই ওলামায়ে কেরামের আরও বিস্তারিত অবস্থার জন্য দেখুন: আল-আলাম লিয-যিরিকলী; আল-ওয়াফী বিল ওয়াফায়াত লিস-সাফাদী; তাবাকাতুশ শাফিইয়াতিল কুবরা লিস-সুবকী; আল-ওয়াফায়াত লি-ইবনিল রাফে আস-সুলামী; আল-ওয়াফায়াত লি-ইবনে কুনফুয; কাশফুয যুনুন আন আসামিল কুতুবি ওয়াল ফুনুন, আয কাতিব চালাবী (হাজী খলিফা)।

তবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ আল-কুবরা, কায়েদাতুন ফিল জারহি ওয়াত তা'দীল এবং কায়েদাতুন ফিল মুয়াররিখীন প্রসিদ্ধ।

পরবর্তী স্তরে আল্লামা নূরুদ্দীন হাইসামি রহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃ. ৮০৭ হি.) হাদিস সংকলনের ক্ষেত্রে বিশাল কাজ করেছেন। ৯ খণ্ডে মাজমাউল বাহরাইন এবং ১০ খণ্ডে মাজমাউয যাওয়াইদ নামক হাদিস সংকলনগুলো তাঁর অমর কীর্তি।

অষ্টম হিজরি শতাব্দীর শেষভাগে হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানি রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর অসাধারণ প্রতিভা নিয়ে আবির্ভূত হন এবং অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সময়ের নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রমে ইসলামি বিশ্বকে হাদিস শাস্ত্র, রিজাল শাস্ত্র এবং ইতিহাসে একটি পূর্ণাঙ্গ কুতুবখানা (লাইব্রেরি) উপহার দিয়ে গেছেন। ফাতহুল বারী, আল-ইসাবাহ, তাহযীবুত তাহযীব, তাকরীবুত তাহযীব এবং লিসানুল মিজান-এর মতো মূল্যবান গ্রন্থগুলো তাঁর নাম জীবিত রাখার জন্য যথেষ্ট।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনি রহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃ. ৮৫৫ হি.) হাফিজ ইবনে হাজার রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর সমসাময়িক, একই অঞ্চলের এবং জ্ঞান ও মর্যাদায় তাঁর সমকক্ষ ছিলেন। তাঁর রচিত বুখারির ব্যাখ্যাগ্রন্থ উমদাতুল কারী এক বিস্ময়কর ইলমি শাহকার। একইভাবে তিনি আল্লামা মারগিনানি রহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃ. ৫৯৩ হি.)-এর হিদায়া গ্রন্থের ‘আল-বিনায়াহ’ নামে এমন এক সুমহান ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন, যা থেকে কোনো হানাফি ফকিহ অমুখাপেক্ষী নন। তিন শতাব্দীর ইতিহাসের এক নির্ভরযোগ্য উৎস ‘ইকদুল জুমান’-ও তাঁর কলমেই রচিত হয়েছে। [১]

এই যুগেই উপমহাদেশের মুহাম্মদ বিন ইয়াকুব ফিরোজাবাদী (মৃ. ৮১৭ হি.) আরবি অভিধানের প্রখ্যাত গ্রন্থ আল-কামুসুল মুহীত পেশ করেন।

এই আলেমদের জীবনী যদি আলাদাভাবে লেখা হয়, তবে তার জন্য একটি স্বতন্ত্র খণ্ডের প্রয়োজন হবে। আমরা এখানে মাত্র কয়েকজন মহান আলেমের জীবনী সংক্ষেপে পেশ করছি।

হাফিজ শামসুদ্দীন আয-যাহাবি রহমাতুল্লাহি আলাইহি: (৬৭৩ হি. হতে ৭৪৮ হি.)

শামসুদ্দীন হাফিজ মুহাম্মদ বিন আহমদ কায়মায আয-যাহাবি রহমাতুল্লাহি আলাইহি অষ্টম হিজরি শতাব্দীর সেই ক্ষণজন্মা ব্যক্তিত্বদের একজন ছিলেন, যাঁদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা থেকে পরবর্তী প্রজন্ম আজ পর্যন্ত উপকৃত হচ্ছে। বাস্তবতা হলো, হাফিজ যাহাবি রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর ৭৫ বছরের জীবনে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এবং গবেষণা ও সংকলনের এমন এক ভাণ্ডার রেখে গেছেন, যা পরবর্তী প্রত্যেক মুহাদিস, গবেষক এবং ঐতিহাসিকের জন্য অপরিহার্য ছিল। তিনি কবি ও সাহিত্যিকও ছিলেন। কাব্য ও গদ্যের ওপর দখল থাকার কারণে তাঁর লিখনশৈলী ছিল অত্যন্ত চমৎকার।

তিনি ৬৭৩ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে আল-জাজিরার মিয়াফারেকিন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। [২] বংশগতভাবে তিনি তুর্কমেনি ছিলেন। ১৮ বছর বয়সে হাদিস শিক্ষা শুরু করা করেন এবং শেষ পর্যন্ত এই শাস্ত্রের ইমামে পরিণত হন। তাঁর উস্তাদদের মধ্যে ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি সবচেয়ে উজ্জ্বল ছিলেন। [৩] ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ছাত্রদের মধ্যে হাফিজ যাহাবি রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর চেয়ে প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী আর কেউ ছিল না। হাফিজ ইবনে হাজার রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন:

[১] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: কাশফুয যুনুন - কাতিব চেলবি; আল-ফিহরিস্ত - ইবনে নাদীম; আল-আ'লাম - যিরিকলি; মু'জামুল মুয়াল্লিফীন - উমর রেজা কাহহালা; ওয়াফায়াতুল আইয়ান - ইবনে খাল্লিকান।

[২] আল-আ'লাম - যিরিকলি: ৫/৩২৬; ফাওয়াতুল ওয়াফায়াত: ৩/৩১৭।

[৩] আল-আ'লাম - যিরিকলি: ৫/৩২৬, ত. দারুল ইলম লিল মালারীন; ফাওয়াতুল ওয়াফায়াত - ইবনে শাকির সালাহুদ্দীন: ৩/৩১৫ হতে ৩১৭, ত. সাদির।

তারিখ-এ উম্মত-এ মুসলিমা

“আমি যমযমের পানি এই নিয়তে পান করেছিলাম যেন আমি হাফেজ যাহাবী রহিমাহুল্লাহ-এর মতো স্মৃতিশক্তি লাভ করি।” [১]

হাফেজ যাহাবী রহিমাহুল্লাহ-এর অধিকাংশ কাজ ইলমে রিজাল (হাদিস বর্ণনাকারীদের জীবনী)-এর ওপর, যা এতটাই বিস্তৃত যে কিয়ামত পর্যন্ত কোনো আলেম এ থেকে অমুখাপেক্ষী হতে পারবেন না। এর পাশাপাশি তিনি ইতিহাস এবং ব্যক্তিত্বদের অবস্থা অত্যন্ত সতর্কতা ও নিরপেক্ষতার সাথে সংগ্রহ করেছেন এবং যথাসম্ভব সনদের যাচাই-বাছাই করেছেন। যদি বলা হয় যে, বর্ণনাকারী এবং রিজাল শাস্ত্রের ওপর তাঁর চেয়ে গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি গত আট শতাব্দীতে অতিবাহিত হননি, তবে তা সম্পূর্ণ সঠিক হবে। ইমাম সুয়ুতী রহিমাহুল্লাহ বলেন:

“মুহাদিসগণ ফন-এ রিজাল এবং হাদিসের অন্যান্য শাস্ত্রে চারজন ব্যক্তিত্বের মুখাপেক্ষী: আল-মিযযী, আয-যাহাবী, আল-ইরাকী এবং ইবনে হাজার।” [২]

তাঁর সুযোগ্য ছাত্র ইমাম তাজউদ্দীন সুবকী রহিমাহুল্লাহ বলেন:

“তিনি ভালো কাজে প্রসিদ্ধ ছিলেন, বিনয়ী, সদাচারী, মিষ্টভাষী এবং ইবাদতগুজার ছিলেন। রাতে তাঁর ঘিকির ও ইবাদতের রুটিন ছিল। তিনি মারকাদে সালিহিয়া এবং দারুল হাদিস যাহিরিয়ার শাইখুল হাদিস ছিলেন। তাঁর কোনো নজির ছিল না। কোনো কঠিন সমস্যা দেখা দিলে তিনিই তা সমাধান করতেন, স্মৃতিশক্তিতে তিনি যুগের ইমাম ছিলেন, হাদিসের অর্থ ও শব্দে তিনি ছিলেন সমসাময়িকদের মধ্যে অনন্য। জারাহ ও তাদীল-এর অগ্রপথিক ছিলেন। প্রতিটি দিক থেকে তিনি রিজাল শাস্ত্র সম্পর্কে অবগত ছিলেন। যেন উম্মতের মানুষ তাঁর সামনে একটি ময়দানে উপস্থিত আছে এবং তিনি তাদের দেখে দেখে তাদের অবস্থা বর্ণনা করে যাচ্ছেন।” [৩]

তাযকিরাতুল হুফফাজ, তাবাকাতুল কুররা, মুখতাসার তাহযীবুল কামাল, আত-তাজরীদ ফি আসমায়িস সাহাবা, আল-মিযান ফিজ জুয়াফা, মীযানুল ইতিদাল এবং আল-মুগনি ফিজ জুয়াফা তাঁর সুপ্রসিদ্ধ রচনাবলি। আল-ইবার ফি খাবারি মান গাবার এবং দুওয়ালুল ইসলাম তাঁর ইতিহাসের প্রতি আগ্রহের সর্বোত্তম নিদর্শন। এগুলোতে সাত শতাব্দীর ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে।

তাঁর সবচেয়ে বড় কীর্তি হলো সিয়ারু আলামিন নুবালা (২৫ খণ্ড) এবং তারিখুল ইসলাম (৫২ খণ্ড)। এই দুটি মহান বিশ্বকোষ। সিয়ারু আলামিন নুবালা আমাদের কাছে থাকলে ব্যক্তিত্বদের সম্পর্কে এবং তারিখুল ইসলাম সামনে থাকলে সাত শতাব্দীর ইসলামি ইতিহাস সম্পর্কে অন্য কোনো কিতাবের প্রয়োজন খুব কমই পড়বে। এই “মাওসুআত” (বিশ্বকোষ)-গুলোতে তিনি যেখানে প্রয়োজন মনে করেছেন সেখানে নিজের মন্তব্যও পেশ করেছেন, যা থেকে উসূলে হাদিস, ফন-এ রিজাল এবং ইতিহাস শাস্ত্রের অনেক গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি সামনে আসে, যার মাধ্যমে শিল্পের সূক্ষ্ম বিষয়গুলো বোঝা যায় এবং ভারসাম্য ও সতর্কতার দক্ষতা অর্জিত হয়। [৪]

[১] তাবাকাতুল হুফফাজ, পৃ. ৫২১, ৫২২, ত. আল-ইলমিয়াহ

[২] তাবাকাতুল হুফফাজ, পৃ. ৫২২, ত. আল-ইলমিয়াহ

[৩] মুজামু শুয়ুখিস সুবকী, পৃ. ৩৫৩, ত. দারুল গারব

[৪] মুজামু শুয়ুখিস সুবকী, পৃ. ৩৫৫, ত. দারুল গারব

শেখ ইউসুফ আবুল হাজ্জাজ জামালুদ্দিন আল-মিযযী রহ. (৬৫৪ হি. থেকে ৭৪২ হি.)

শেখ ইউসুফ বিন আব্দুর রহমান, যিনি ইলমি জগতে জামালুদ্দিন আল-মিযযী নামে প্রসিদ্ধ, তিনি ‘খাতামুল হুফফাজ’ (হাফিজদের শেষজন) হিসেবে পরিচিত ছিলেন। হাদিসের শব্দাবলি এবং সনদসমূহের ওপর তাঁর জ্ঞান অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক ছিল। তিনি রবিউল আউয়াল ৬৫৪ হিজরিতে হালবের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। [১] তাঁর লালন-পালন দামেস্কের শহরতলি ‘মিযযা’ নামক স্থানে হয়েছিল, এ কারণে তাঁকে ‘মিযযী’ বলা হয়। [২]

তিনি শৈশবে কুরআন মাজিদ মুখস্থ করেন। এরপর তাঁর ঝোঁক ইলমে আরুয ও জ্যোতির্বিদ্যার দিকে হয়। তিনি লুগাত (অভিধান) এবং সরফ ও নাহ (ব্যাকরণ) শাস্ত্রে অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেন। [৩] কিন্তু একুশ বছর বয়সে তাঁর মনোযোগ ইলমে হাদিসের দিকে নিবদ্ধ হয় এবং এই শাস্ত্রের প্রতি তাঁর এমন অনুরাগ সৃষ্টি হয় যে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি এতেই মগ্ন ছিলেন। তিনি সিরিয়া, হিজাজ এবং মিশরের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন। এরপর ইমাম নববী, আহমদ বিন আবি আল-খায়ের এবং মুসলিম বিন আলানসহ বহু মুহাদিসের নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করেন এবং শেষ পর্যন্ত প্রথম সারির মুহাদিসদের অন্তর্ভুক্ত হন। [৪]

তিনি মাঝারি উচ্চতা সম্পন্ন, কিছুটা লালচে বর্ণের এবং সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন। শেষ বয়স পর্যন্ত তাঁর মেধা ও শরীর সচল ছিল। [৫] বার্ধক্য সত্ত্বেও তিনি ঠান্ডা পানি দিয়ে গোসল করতেন। [৬] ৯০ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি (দামেস্ক থেকে) সালিহিয়া পর্যন্ত পায়ে হেঁটে যেতেন। [৭] তাঁর হাতের লেখা অত্যন্ত সুন্দর ছিল। তিনি অত্যন্ত লজ্জাশীল, ধৈর্যশীল, অল্পে তুষ্ট এবং বিনয়ী মানুষ ছিলেন। মানুষের সাথে মেলামেশায় তিনি অত্যন্ত অমায়িক ছিলেন, তবে মেলামেশা কম করতেন। খুব কম কথা বলতেন। কিছু জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তর দিতেন এবং খুব ভালো উত্তর দিতেন। উত্তরে কঠোরতা অবলম্বন করতেন না। নিজের গুণগান বর্ণনা করতেন না এবং কারও গীবত করতেন না। আসলাফদের (পূর্বসূরিদের) পথে চলা পছন্দ করতেন। তাঁর মধ্যে কোনো চাতুর্য ছিল না। অত্যন্ত সাদাসিধে স্বভাবের মানুষ ছিলেন। [৮] জাঁকজমক ও সাজসজ্জা থেকে দূরে থাকতেন। [৯] সেই যুগের প্রখ্যাত ইমাম ইবনে সাইয়্যিদুন নাস রহ. তাঁর সম্পর্কে বলেন:

“আমি দামেস্কে এমন একজন মহান ইমামকে দেখেছি যিনি এমন একজন হাফিজে হাদিস ছিলেন যে তিনি তাঁর সমসাময়িকদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন। তিনি ছিলেন আবুল হাজ্জাজ আল-মিযযী, যিনি ইলমে হাদিসের উত্তাল সমুদ্র ছিলেন। তিনি আসমাউর রিজাল শাস্ত্রের সবচেয়ে বড় হাফিজ এবং আরব ও অনারব বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে সবচেয়ে বড় আলেম ছিলেন।” [১০]

[১] ফাওয়াতুল ওয়াফয়াত: ৩/৩৫৩

[২] আদ-দুরারুল কামিনাহ: ৬/২২৯, ২৩২; আল-আ’লাম লিয়-যিরিকলি: ৮/২৩৬

[৩] ফাওয়াতুল ওয়াফয়াত: ৩/৩৫৩; আদ-দুরারুল কামিনাহ: ৬/২২৯

[৪] আল-আ’লাম লিয়-যিরিকলি: ৮/২৩৬

[৫] আদ-দুরারুল কামিনাহ: ৬/২৩০

[৬] আদ-দুরারুল কামিনাহ: ৬/২৩০

[৭] আদ-দুরারুল কামিনাহ: ৬/২২৯... সালিহিয়া নামক একটি জনপদ কায়রোর কাছে ছিল কিন্তু এখানে দামেস্কের পার্শ্ববর্তী জনপদ উদ্দেশ্য, যা প্রাচীন শহরের উত্তরে কাসিউন পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত এবং সেখান থেকে দামেস্কের দৃশ্য চমৎকার দেখা যেত। (মাসালিকুল আবসার: ৩/৫১৯, ২৭/৩৯; রিহলা ইবনে বতুতা: ১/৬৭, ৭২; আত-তারিখুল মুশরিক)। দামেস্ক থেকে সালিহিয়ার দূরত্ব এক দেড় কিলোমিটার হবে এবং এই পথ ঢালু থেকে ধীরে ধীরে উচ্চতার দিকে যেত। এখন এটি দামেস্ক শহরের অন্তর্ভুক্ত।

[৮] আদ-দুরারুল কামিনাহ: ৬/২২৯, ২৩২

[৯] আ’য়ানুল আসর ওয়া আওয়ানুন নাসর লিস-সাফাদি (মৃত্যু ৭৬৪ হি.): ৫/৬৩৮, ত. দারুল ফিকর আল-মুয়াসির, বৈরুত

[১০] আ’য়ানুল আসর ওয়া আওয়ানুন নাসর লিস-সাফাদি: ৫/৬৫৩, ত. দারুল ফিকর

হাফেজ যাহাবী (রহ.) বলেন:

“আমি যাদের দেখেছি, তাদের মধ্যে চারজন ছিলেন সবচেয়ে শক্তিশালী স্মৃতির অধিকারী: ইবনে দাকীকুল ঈদ, আদ-দামইয়াতি [১], ইবনে তাইমিয়া এবং আল-মিযযী। ইবনে দাকীকুল ঈদ হাদিসের মর্মার্থ সবচেয়ে বেশি বুঝতেন। আদ-দামইয়াতি বংশতালিকায় (নাসাব) সবচেয়ে বেশি পারদর্শী ছিলেন। ইবনে তাইমিয়া মতন (হাদিসের মূল পাঠ) মুখস্থ রাখায় সবার চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন এবং আল-মিযযীর রিজাল (বর্ণনাকারী) শাস্ত্রের পরিচয় সবচেয়ে বেশি ছিল।” [২]

ইমাম মিযযীর সবচেয়ে বড় কীর্তি হলো তাহযীবুল কামাল ফি আসমা-ইর রিজাল, যা ৩৫ খণ্ডে সমাপ্ত এবং আট বছরের কঠোর পরিশ্রমের পর এটি সম্পন্ন হয়েছে। এর আগে রিজাল শাস্ত্রে এমন ব্যাপক ও গবেষণামূলক কোনো সংকলন অস্তিত্বে আসেনি এবং এরপর রিজাল শাস্ত্র নিয়ে গবেষণা করা কোনো আলেমই এটি থেকে অমুখাপেক্ষী থাকতে পারেননি। [৩]

তুহফাতুল আশরাফ বি-মা’রিফাতিল আতরাফ তাঁর আরেকটি অনন্য রচনা যা তেরো খণ্ডে সমাপ্ত। এতে সিহাহ সিভাহর হাদিসসমূহের আতরাফ (সূচনা অংশ) নিয়ে হাদিসগুলোর তাখরীজ করা হয়েছে এবং সেগুলোর সূত্র (তুরূক), ত্রুটি (ইলাল) ও সংশয় (আওহাম) নিয়ে অত্যন্ত গবেষণামূলক আলোচনা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই বইটি হাদিস শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ হতে আগ্রহীদের জন্য এক বিরল উপহার, যাতে হাদিসের অনেক জ্ঞান একত্রিত হয়েছে। এই কাজ তিনি ২৬ বছরে সম্পন্ন করেন। [৪]

তাঁর ওপর পরীক্ষাও এসেছে। ৭০৫ হিজরিতে কিছু হিংসুক ব্যক্তি তাঁর ওপর অপবাদ দিয়ে তাঁকে কারারুদ্ধ করায়। পরিশেষে ইমাম ইবনে তাইমিয়া চেষ্টা করে তাঁকে মুক্ত করেন। [৫] তিনি সর্বদা অভাবগ্রস্ত ছিলেন কিন্তু কখনো মুখে কোনো অভিযোগ আনেননি। একবার অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, তাঁকে নিজের হাতে লেখা তাহযীবুল কামালের মূল পাণ্ডুলিপি বিক্রি করতে হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ধৈর্য ও শুকরিয়ার সাথে জীবন অতিবাহিত করেন। [৬] শেষ দিনগুলোতে তিনি প্লেগ রোগের কবলে পড়েন এবং ১২ সফর ৭৪২ হিজরিতে যোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে আয়াতুল কুরসি তিলাওয়াত করতে করতে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। [৭] দাফন দামেস্কের ‘সুফিয়া কবরস্থানে’ ইমাম ইবনে তাইমিয়ার পাশে সম্পন্ন হয়। [৮]

[১] আদ-দামইয়াতি বলতে আব্দুল মুমিন বিন খালাফ শরফুদ্দিন আদ-দামইয়াতিকে বোঝানো হয়েছে, যিনি ৬১৩ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৭০৫ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। হাদিস ছাড়াও তিনি ইতিহাস ও বংশতালিকায় পারদর্শী ছিলেন। যার প্রমাণ তাঁর রচিত গ্রন্থ ‘কাবাইলুল খাজরাজ’, ‘কিতাবুল খাইল’ এবং ‘আল-আকদুত সামীন ফীমান ইসমুহু আব্দুল মুমিন’। (ফাওয়াতুল ওয়াফায়াত: ২/ ৩১০, ৩১১) হাফেজ যাহাবী তাঁর ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। (তাবাকাতুন নাসাবীন, পৃ. ৭১৩, লি-আবি য়ায়েদ বকর বিন আব্দুল্লাহ, মৃত্যু ১৪২৯ হি., دار الرشد, রিয়াদ, ১৯৮৭ খ্রি.) স্মরণীয় যে, হাফেজ যাহাবীর উস্তাদদের মধ্যে আরও একজন মুহাদিস মুহাম্মদ বিন আব্দুল আজিজ শামসুদ্দিন আবু আব্দুল্লাহ আদ-দামইয়াতি আদ-দিমাশকি (৬২০ হি.-৬৯৩ হি.) ছিলেন যিনি কিরাত বিশেষজ্ঞও ছিলেন। (তারিখুল ইসলাম লিয-যাহাবী, ওফিয়াতু সানাহ ৬৯৩ হি.) কিন্তু তিনি বংশতালিকাবিদ হিসেবে পরিচিত ছিলেন না। তাই এখানে তিনি উদ্দেশ্য হতে পারেন না।

[২] আল-আ’লাম লিয-যিরিকলি: ৮/ ২৩৭

[৩] তাহযীবুল কামাল ফি আসমা-ইর রিজাল: ৩৫/ ৩০৩, ত. আর-রিসালাহ

[৪] তুহফাতুল আশরাফ লিল মিযযী: ১/ ২, ত. আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৮৩ খ্রি.

[৫] আদ-দুরারুল কামিনাহ লি-ইবনে হাজার আল-আসকালানি: ৬/ ২৩০

[৬] আদ-দুরারুল কামিনাহ: ৬/ ২৩৩

[৭] আদ-দুরারুল কামিনাহ: ৬/ ২৩২, ২২৯

[৮] শাযারাতুয যাহাব: ৮/ ২৩৮

আল্লামা ইবনে কাইয়িম আল-জাওজিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি: (৬৯১ হিজরি থেকে ৭৫১ হিজরি)

মুহাম্মদ বিন আবু বকর আজ-জারয়ি রহমাতুল্লাহি আলাইহি, যাকে বিশ্ব হাফেজ ইবনে কাইয়িম নামে স্মরণ করে, তিনি সঠিক অর্থে তার উস্তাদ ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহির মেজাজ ও মানহাজের আমীন (বিশ্বস্ত উত্তরসূরি) ছিলেন। তিনি ২২ বছর বয়সে ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে যুক্ত হন এবং এরপর আর কখনো তাকে ছেড়ে যাননি, এমনকি কারাবাসের সময়ও সাথে ছিলেন এবং উস্তাদের মৃত্যুর পর পর্যন্ত তার সাথেই ছিলেন। [১]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহির রিসালা ও কিতাবসমূহ সংগ্রহ, নকল ও প্রচার করার ক্ষেত্রে তার একাগ্রতার বড় অবদান রয়েছে। এর পাশাপাশি তিনি নিজেও নিজ যুগের এক বিরল প্রতিভাধর আলেম ছিলেন। তিনি সময়ের প্রয়োজন অনুযায়ী দরস ও তাদরিস (শিক্ষাদান) এবং খুতবার পাশাপাশি সর্বোত্তম রচনা ও সংকলন পেশ করেছেন। কুরআন তাফসির, সুন্নাহর ব্যাখ্যা, আকিদা সংশোধন এবং আত্মশুদ্ধির (তাজকিয়া-এ-বাতিন) ক্ষেত্রে তার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। তিনি এসব বিষয়ে তার সমসাময়িক সকলের চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। [২]

ব্যক্তিগত চরিত্র ও গুণাবলির দিক থেকেও তিনি ঈর্ষণীয় ছিলেন। রাতের বড় অংশ ইবাদতে কাটাতেন। অধিকাংশ সময় আল্লাহর জিকিরে মশগুল থাকতেন। তার অন্তর আল্লাহর মহব্বত এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও ভক্তির রসে সিক্ত ছিল। তিনি হিংসা, ছিদ্রান্বেষণ এবং সৃষ্টির অনিষ্ট সাধন থেকে সর্বদা দূরে থাকতেন। [৩] হাফেজ ইবনে কাসির রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেন:

“আমাদের যুগে তার চেয়ে বেশি ইবাদতকারী এবং অধিক পরিমাণে নফল নামাজ আদায়কারী আর কেউ ছিল না। তিনি অত্যন্ত দীর্ঘ নামাজ পড়তেন এবং রুকু ও সেজদা অনেক দীর্ঘ করতেন।” [৪]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহির মেজাজে কিছু বিষয়ে যে কঠোরতা অনুভূত হয়, ইবনে কাইয়িম রহমাতুল্লাহি আলাইহি তা এড়িয়ে চলতেন এবং প্রসিদ্ধ বিতর্কিত বিষয়গুলোতে জমহুর আহলে সুন্নাত ওলামায়ে কেরামের সাথে একমত পোষণ করে বলতেন যে, আমাদের উস্তাদ একক বিষয়গুলোতে অন্ধ অনুকরণের যোগ্য নন। আল্লামা ইবনে কাইয়িম রহমাতুল্লাহি আলাইহি শরীয়ত অনুযায়ী প্রকৃত তাসাউফ ও সুন্নাহর অনুসারী মাশায়েখদের অনুসারী ছিলেন এবং তাদের প্রতিষ্ঠিত সংস্কার ও আত্মশুদ্ধির কেন্দ্রসমূহ এবং আত্মশুদ্ধি সংক্রান্ত কিতাবসমূহের পূর্ণ সমর্থক ছিলেন। ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি সুফিদের খণ্ডন করতে গিয়ে যে কঠোরতা প্রকাশ করেছিলেন, আল্লামা ইবনে কাইয়িম রহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজে তাসাউফের ওপর কলম ধরে তাতে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনেন। এই সিলসিলায় তার কলম থেকে “রওজাতুল মুহিব্বিন” এবং “রিসালা ইবনে কাইয়িম ইলা আহাদি ইখওয়ানিহি”-এর মতো রচনাগুলো অস্তিত্বে আসে। “তারিকুল হিজরাতাইন”-ও এই ধারার একটি অনন্য প্রচেষ্টা।

আল্লামা ইবনে কাইয়িম রহমাতুল্লাহি আলাইহির সবচেয়ে উপকারী কাজ হলো সিরাত-এ-তাইয়েবার ওপর। তার সংকলন “জাদুল মাআদ” আজকেও এই বিষয়ে একটি অতুলনীয় কিতাব হিসেবে গণ্য হয়। এতে শুধু সিরাতের অবস্থা ও ঘটনাবলি বর্ণনা করা হয়নি, বরং প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামী সমাজের প্রয়োজনকে সামনে রেখে গবেষণামূলক আলোচনা করা হয়েছে যা হাদিস, ফিকহ, লুগাত (ভাষা), ইতিহাস ও সিরাতসহ অনেক জ্ঞানকে অন্তর্ভুক্ত করে। [৫]

[১] আল-আলাম লিয়-ঘিরিকলি, ৬/৫৬, দারুল ইলম লিল-মালায়িন।

[২] যাইল তাবাকাতিল হানাবিলা লি-ইবনে রজব আল-হাম্বলি: ৫/১৭১, দারুল ওবিকান রিয়াদ।

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: বছর ৭৫১ হিজরি।

[৪] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: বছর ৭৫১ হিজরি।

[৫] আত-তাজুল মুকাম্মাল লিল-কানুজি, পৃ. ৩০৯-৩১২, কাতার ওয়াকফ মন্ড্রগালয়; আল-আলাম লিয়-ঘিরিকলি: ৬/৫৬, দারুল ইলম লিল-মালায়িন।

ইতিহাস উন্মতে মুসলিমা

সালাত ও সালামের ফযীলতের ওপর তাঁর সংকলন ‘জালাউল আফহাম’ তাঁর ইশকে রিসালাতের এক চমৎকার নিদর্শন। ‘আত-তিব্বুন নববী’ তাঁর এক অনন্য বিষয়ের প্রচেষ্টা যা আজও ঘরে ঘরে পড়া হয়। তিনি উসূলে ফিকহ এবং ফতোয়া প্রদানের নিয়মাবলীর ওপর ‘ইলামুল মুওয়াফ্ফিসীন’ নামে চার খণ্ডে এমন এক কিতাব রেখে গেছেন যার অধ্যয়ন আজ পর্যন্ত প্রত্যেক মুফতির জন্য অপরিহার্য মনে করা হয়।

‘আল-ফুরুসিয়াহ’ নামে তাঁর কিতাবটি অত্যন্ত চমৎকার যা ‘ফুনুনে হারব’ (রণকৌশল) বিষয়ে লেখা হয়েছে। এতে ঘোড়সওয়ারি এবং তীরন্দাজির গুরুত্ব, উপকারিতা ও ফযীলত ছাড়াও এই শিল্পগুলোতে দক্ষতা অর্জনের পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে এবং এতে নতুনদের পক্ষ থেকে হওয়া ভুলত্রুটিগুলো সংশোধন করা হয়েছে।

‘হাদিউল আরওয়াহ’ নামক গ্রন্থে তিনি জান্নাতের নেয়ামতসমূহ সম্পর্কে বর্ণিত কিতাব ও সুন্নাহর সমস্ত দলিল অত্যন্ত সুন্দর বিন্যাসে একত্রিত করেছেন। ইবনুল কাইয়্যিম ১৩ রজব ৭৫১ হিজরিতে দামেস্কে ইন্তেকাল করেন। [১]

ইমাদুদ্দীন হাফিজ ইবনে কাসীর দামেশকী রহ.: (৭০১ হি. হতে ৭৭৪ হি.)

ইসমাইল বিন উমর বিন কাসীর রহ. সিরিয়ার মাজদাল (বুসরার নিকটবর্তী) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ওই গ্রামের খতিব ছিলেন। হাফিজ ইবনে কাসীর রহ. পাঁচ বছর বয়সের ছিলেন যখন তাঁর পিতার ইন্তেকাল হয়। তিনি তাঁর পরিবারের সাথে দামেস্কে চলে আসেন। এখানে অত্যন্ত একাগ্রতা ও মেহনতের সাথে ইসলামী জ্ঞান অর্জন করেন। আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ রহ.-এর পাঠচক্রে থেকে তিনি শীর্ষস্থানীয় আলেম ও মুহাদ্দিস হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁর রচনাবলি দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। বর্ণনাগুলো হাদিস সংক্রান্ত হোক বা তাফসিরি কিংবা ঐতিহাসিক, সেগুলোর ওপর তাঁর দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত ব্যাপক ও গভীর, তাই তাঁর অধিকাংশ কাজ বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে।

এই ধারায় তাঁর সবচেয়ে বড় কীর্তি হলো ‘তাফসিরে ইবনে কাসীর’, যাতে বুদ্ধিবৃত্তিক সূক্ষ্মতা (যা ওই যুগে সাধারণ প্রবণতা ছিল) পরিহার করা হয়েছে। তাফসিরের সাথে সংশ্লিষ্ট হাদিসসমূহকে অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাফসিরের ভিত্তি সহীহ ও হাসান হাদিসের ওপর রাখা হয়েছে, তবে এমন কিছু ঘটনা বর্ণনাও নেওয়া হয়েছে যা নীতিগতভাবে গ্রহণযোগ্য। অবশ্য মুনকার, শায এবং মাওদু বর্ণনাগুলোকে কেবল বর্জনই করা হয়নি বরং সেগুলোর অসারতাও উন্মোচন করা হয়েছে।

তাঁর দ্বিতীয় মহান কীর্তি হলো ‘আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া’ নামক সেই শাহকার ইতিহাস গ্রন্থ যা আজ পর্যন্ত মুসলিম ঐতিহাসিকদের কাছে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উৎস হিসেবে গণ্য হয়। এতে হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে তাঁর নিজ সময় (৭৬৮ হি.) পর্যন্ত ঘটনাবলি ও বছরসমূহ একত্রিত করা হয়েছে। তিনি হরুফে তাহাজ্জি (বর্ণানুক্রম) অনুযায়ী সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা নির্ধারণ করে তাঁদের থেকে বর্ণিত হাদিসসমূহের এক বিশাল সংকলনও পেশ করেছেন যা ১০ খণ্ডে এবং ‘জামিওল মাসানিদ ওয়াস সুনান’ নামে প্রসিদ্ধ। [১]

[১] আত-তাজুল মুকালাল লিল-কানুজী, পৃ. ১৩৫; আল-আলাম লিয-যিরিকলী: ১/ ৩২০; যাইলুত তাকয়ীদ ফী রুওয়াতিল সুনানি ওয়াল আসানিদ লি-তাকিউদ্দীন আল-ফাসী: ১/ ১৭৩, ত. আল-ইলমিয়াহ।

আল্লামা ইবনে খালদুন রহ.: (৭৩২ হি. হতে ৮০৮ হি.)

আবদুর রহমান বিন মুহাম্মদ ইবনে খালদুন রহ. তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠতম ঐতিহাসিক, চিন্তাবিদ ও পণ্ডিত ছিলেন। তিনি তিউনিসে জন্মগ্রহণ করেন, সেখানেই লালিত-পালিত হন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখা থেকে তৃপ্ত হন। তিনি আন্দালুসের সেভিল শহরের অধিবাসী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ও সূক্ষ্মদর্শী মানুষ ছিলেন। তাঁর অধ্যয়ন ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। জিহ্বা ও কলম ব্যবহারে তিনি অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। তাঁর জীবনের একটি বড় অংশ ভ্রমণে অতিবাহিত হয়েছে। তিনি বড় বড় রাজাদের সান্নিধ্য লাভ করেছেন। ত্রিশ বছর বয়সে তিনি তিলিমসানের শাসক আবু ইনানের সঙ্গী হন। এরপর তিনি প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে কারারুদ্ধ হন এবং রাজদরবারে উত্থান-পতনের বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করেন। কারাগার থেকে মুক্তির পর তাঁর পূর্বের মর্যাদা ফিরে আসে, কিন্তু কিছুকাল পর তিনি আন্দালুসে চলে যান, যেখানে গ্রানাডার সুলতান আবু আবদুল্লাহ তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন। তিনি সুলতানের দূত হিসেবে ফ্রান্সদের কাস্টিল রাজ্যেও গিয়েছিলেন।

চল্লিশ বছর বয়সে তিনি আফ্রিকায় ফিরে আসেন এবং এখানে বিভিন্ন রাজদরবারের সাথে যুক্ত থাকেন। এই সময়েই তিনি তাঁর ইতিহাস গ্রন্থ লিখতে শুরু করেন। ৭৮৪ হিজরিতে যখন মিশরে চেরকাসীয় মামলুক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তিনি কায়রোতে আসেন এবং মালেকি ফিকহের দরস দিতে শুরু করেন। সুলতান আজ-জহির বরকুক তাঁকে তাঁর সঙ্গী করে নেন এবং সালতানাতের প্রধান কাজী নিযুক্ত করেন।

তাঁর পরিবার তিউনিসে ছিল; ইবনে খালদুন রহ. তাঁদের কায়রোতে আনার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা সবাই পথে সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়ে মারা যান। এই ঘটনা ইবনে খালদুন রহ.-কে নিভৃতচারী করে তোলে। তিনি কাজীর পদ ছেড়ে দিয়ে তাঁর ইতিহাস গ্রন্থ ‘দিওয়ানুল মুবতাদা ওয়াল খবর’ সমাপ্ত করতে মগ্ন হন। এটি ৭৯৭ হিজরিতে সমাপ্ত হয় এবং এতে পনেরো বছর সময় ব্যয় হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই কালজয়ী সৃষ্টিকে সারা বিশ্ব ‘তারিখে ইবনে খালদুন’ নামে চেনে।

এর মুকাদিমায় (উপক্রমণিকা) তিনি ইতিহাসতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞানের মূলনীতিসমূহ পেশ করেছেন এবং সেই সাথে মানব সভ্যতার ওপর এমন এক গবেষণামূলক আলোচনা করেছেন যার দৃষ্টান্ত আজ পর্যন্ত পেশ করা সম্ভব হয়নি। প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠার এই মুকাদিমা অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে জাতিসমূহের উত্থান-পতনের পর্যায় এবং ইতিহাসের দর্শন বিশ্লেষণ করে। এই মুকাদিমার কারণেই তাঁকে সমাজবিজ্ঞানের জনক বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে তিনিই সর্বপ্রথম সমাজবিজ্ঞানের মূলনীতিসমূহ বর্ণনা করেছেন এবং এই শিল্পকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছেন। মুকাদিমায় তিনি সেইসব বিজ্ঞানের ওপর বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন যেগুলোকে এখন সামাজিক বা সমাজতাত্ত্বিক বিজ্ঞান বলা হয়। হেগেল, মেকিয়াভেলি এবং গিবনের মতো পশ্চিমা পণ্ডিতগণ আল্লামা ইবনে খালদুন রহ.-এর জ্ঞানভাণ্ডার থেকেই উপকৃত হয়েছেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো, তিনি মাত্র পাঁচ মাসে এমন এক মহান মুকাদিমা সম্পন্ন করেছিলেন, যা তাঁর অসাধারণ মেধা, প্রজ্ঞা এবং অধ্যয়নের ব্যাপকতার প্রমাণ। [১] ৮০৮ হিজরিতে এই অনন্য বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত ইন্তেকাল করেন।

[১] আল-আলাম লিয-যিরিকলি: ৩/৩০৯; আস-সুলুক লি-মা’রিফাত দুওয়ালিল মুলুক: সন ৭৯১ হি., ৮০৮ হি.; রাফউল ইসর আন কুদাতিল মিসর: ১/২৩৭।

হাফিজ যয়নুদ্দীন ইরাকী রহমাতুল্লাহি আলাইহি: (৭২৫ হি. হতে ৮০৬ হি.)

হাফিজ যয়নুদ্দীন ইরাকী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর পূর্বপুরুষগণ উত্তর ইরাকের আরবিল শহরের অধিবাসী ছিলেন। পরবর্তীতে তাঁরা মিশরে স্থানান্তরিত হন যেখানে হাফিজ ইরাকী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর জন্ম হয়। তাঁর আসল নাম ছিল আব্দুর রহীম বিন আল-হুসাইন, তবে তিনি যয়নুদ্দীন উপাধিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। উসূলে হাদীস ছিল তাঁর বিশেষ ক্ষেত্র। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে ইবনে সালাহ-এর মুকাদ্দিমার ব্যাখ্যাগ্রন্থ “আত-তাকয়ীদ ওয়াল ইয়াহ”, “আলফিয়াতুল ইরাকী”, “যাইলু মীযানিল ইতিদাল” এবং ইমাম গাযালী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর “ইহয়াউ উলুমিদ্দীন”-এর তাখরীজ অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। তাঁর ছাত্রদের পরিধি ছিল অত্যন্ত বিস্তৃত। তাঁদের মধ্যে আল্লামা নূরুদ্দীন হাইসামী রহমাতুল্লাহি আলাইহি (৭৩৫ হি. - ৮০৭ হি.) ১৯ হাজার হাদীস সম্বলিত একটি সংকলন তৈরি করেন যা “মাজমাউয যাওয়াইদ ওয়া মানবাউল ফাওয়াইদ” নামে প্রসিদ্ধ। হাফিজ ইবনে হাজার রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মতো বিজ্ঞ আলেমও হাফিজ ইরাকী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর দরস থেকেই বের হয়েছেন। হাফিজ ইরাকী রহমাতুল্লাহি আলাইহি কায়রোতে ইন্তেকাল করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। [১]

হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি: (৭৭৩ হি. হতে ৮৫২ হি.)

হাফিজ ইবনে হাজার রহমাতুল্লাহি আলাইহি সেই সকল প্রখ্যাত আলেমদের একজন যাঁরা দ্বীনি ইলম বিকাশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি ১২ই শাবান ৭৭৩ হিজরীতে ফিলিস্তিনের আসকালান শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আসল নাম ছিল আহমদ বিন আলী। তিনি ছিলেন একজন উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন মুহাদ্দিস, ফকীহ, সাহিত্যিক এবং ঐতিহাসিক। তিনি হাফিজ ইরাকী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর বিশেষ ছাত্র এবং নিজ যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। শুরুতে তিনি কবিতা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী ছিলেন এবং এই শাখায় এতটাই পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন যে বড় বড় সাহিত্যিক ও কবিগণ তাঁর সামনে ম্লান হয়ে যেতেন। কিন্তু পরবর্তীতে সৌভাগ্যবশত তাঁর মনোযোগ ইলমে হাদীসের দিকে নিবদ্ধ হয়। তিনি হাফিজ যয়নুদ্দীন ইরাকী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ছাত্রত্ব গ্রহণ করেন এবং বহু হাদীসের মতন (মূল পাঠ) ও ইসনাদ (সূত্র) মুখস্থ করেন। জারহ ওয়া তা’দীল, ফন-এ-রিজাল এবং হাদীসের অর্থ ও মর্ম অনুধাবনে তিনি এমন উচ্চ মর্যাদা লাভ করেন যে হাফিজ ইরাকী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ইন্তেকালের পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি একজন উচ্চমানের ফকীহও ছিলেন; সিরাজুদ্দীন বুলকিনী এবং সিরাজুদ্দীন ইবনুল মুলাক্কিন রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মতো ফকীহদের নিকট থেকে তিনি ফিকহ শিক্ষা করেন। তিনি ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে সিরিয়া, হিজাজ এবং ইয়েমেন সফর করেন। কামুস প্রণেতা আল্লামা মাজদুদ্দীন শিরাজী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর সাথেও তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন। পরিশেষে তিনি কায়রোতে ফিরে আসেন এবং এখানকার বিভিন্ন মাদ্রাসা যেমন বাইবারসিয়া, জামালিয়া এবং সালিহিয়া-তে শিক্ষকতা ও শায়খুশ শুযুখ (শায়খুল হাদীস) পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তাঁর বাকি জীবন কায়রোতেই অতিবাহিত হয়। তিনি কয়েকবার বিচারক (কাযী) নিযুক্ত হয়েছিলেন। তবে জীবনের শেষ দশকগুলোতে শিক্ষকতার পাশাপাশি তাঁর পূর্ণ মনোযোগ গ্রন্থ রচনার দিকে নিবদ্ধ হয়। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ শাহকার (অনবদ্য সৃষ্টি) হলো সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ “ফাতহুল বারী”, যা কুরআন ও সুন্নাহর ইলমের এমন এক অতুলনীয় ভাণ্ডার যেখান থেকে প্রতিটি যুগের মুহাদ্দিসগণ নিরন্তর উপকৃত হয়ে আসছেন।

[১] তবাকাতুল হুফফায লিস-সুযুতী, পৃ. ৫৩৩, ত. ইলমিয়াহ; আল-আ’লাম লিয-যিরিকলী: ৩/৩৩৩, ত. দারুল ইলম লিল-মালায়ীন; হসনুল মুহাদারা ফী তারীখি মিসর ওয়া কাহেরা লিস-সুযুতী: ১/৩৬০।

তাদের দ্বিতীয় গৌরবময় কীর্তি হলো ইলমে রিজাল এবং জারহ ও তাদীল-এর ওপর করা মেহনতের পূর্ণতা দান, যা কয়েক শতাব্দী ধরে চলে আসছিল। হাফিজ ইবনে হাজার রহ. এই ময়দানে এমন মহান গ্রন্থসমূহ রচনা করেছেন যা পূর্ববর্তীদের গবেষণা, অনুসন্ধান, সৌন্দর্য, বিন্যাস, ভারসাম্য ও সামঞ্জস্যের ধারণাকেও হার মানায়। এই সিলসিলায় তিনি তাহযীবুত তাহযীব, তাকরীবুত তাহযীব এবং লিসানুল মীযান-এর মতো কালজয়ী গ্রন্থসমূহ সংকলন করেছেন।

তিনি ইসলামের ইতিহাসের ওপরও কাজ করেছেন এবং ‘আল-ইসাবাহ ফী তামীযিস সাহাবাহ’ লিখেছেন, যা সাহাবায়ে কেরামের জীবনী সংক্রান্ত সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য কিতাব হিসেবে গণ্য হয়। তিনি ‘ইনবাউল গুমর বি-আবনাউল উমর’ এবং ‘আদ-দুরারুল কামিনাহ ফী আয়ানিল মিআতিল সামিনাহ’-এর মতো ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহ রচনা করেছেন যাতে অষ্টম হিজরী শতাব্দীর ঘটনাবলী এবং উলামা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনী স্থান পেয়েছে। উসূলে হাদীসের ক্ষেত্রে তাঁর ‘নুখবাতুল ফিকার’ এবং ‘আন-নুকাত আলা কিতাবি ইবনিস সালাহ’ অত্যন্ত সুপরিচিত ও প্রসিদ্ধ। তাঁর রচনাবলীর সংখ্যা এবং মোট কলেবর এত বেশি যে, বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়ে যে একজন ব্যক্তি একাকী এত বেশি ইলমী ও গবেষণামূলক কাজ করতে পারেন। তাঁর মৃত্যু এবং দাফন ৮৫২ হিজরীতে কায়রোতে হয়েছে। [১]

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী রহ. (৮৪৯ হি. - ৯১১ হি.)

সেই সকল প্রাজ্ঞ আলেমদের মধ্যে যারা তাদের রচনামূলক ও গবেষণামূলক কাজের মাধ্যমে নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন, ইমাম আবদুর রহমান বিন আবু বকর জালালুদ্দীন সুয়ুতী রহ.-এর নাম সর্বদা চিরস্মরণীয় ও উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। তিনি নিজ যুগের একজন মহান আলেম ছিলেন। আকাইদ, তাফসীর, ফিকহ, হাদীস, লুগাত (ভাষা), নাহ্ব (ব্যাকরণ), আদব (সাহিত্য) এবং ইতিহাসসহ প্রতিটি ময়দানেই তিনি ছিলেন পারদর্শী।

ইমাম সুয়ুতী রহ. মিশরের ‘আসইউত’ নামক জনপদের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে সিরিয়া, হিজাজ, ইয়ামেন থেকে শুরু করে হিন্দুস্তান এবং মরক্কো পর্যন্ত সফর করেছেন। মিশরে ফিরে আসার পর তিনি শিক্ষকতাসহ অনেক উচ্চপদে আসীন হন। তাঁর পিতা কায়রোর আববাসী খলীফাদের ঘনিষ্ঠ ছিলেন, তাই আল্লামা সুয়ুতী রহ.-এর জন্য শুরু থেকেই সরকারি পদের দরজা উন্মুক্ত ছিল। তবুও তিনি ৪০ বছর বয়সে লেখালেখি ও সংকলন কাজকে নিজের একমাত্র অবলম্বন বানিয়ে নেন এবং ২২ বছর এই কাজেই নিমগ্ন থাকেন, এমনকি ৯১১ হিজরীতে কায়রোতেই তাঁর মৃত্যু হয়। ইলম ও শিল্পের ময়দানে তিনি যে কাজ করেছেন তা বিস্ময়কর। সম্ভবত এমন কোনো বিষয় নেই যাতে তিনি কলম ধরেননি। উলামায়ে কেরাম তাঁর রচনাবলীর সংখ্যা ছয়শতেরও বেশি বলে উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে প্রায় ৯০টি কিতাব এমন রয়েছে যা আজ পর্যন্ত অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ও পরিচিত। তাঁর প্রসিদ্ধতম রচনাবলীর একটি বলক নিম্নরূপ:

- হাদীসের মূল পাঠ: জামিউল আহাদীস (২০ খণ্ড। সাড়ে ৪৫ হাজার হাদীসের সংকলন)।
আল-জামিউস সাগীর (সাড়ে ১৪ হাজার হাদীসের সংকলন)
- হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ: শরহে মুসলিম, শরহে সুনানে ইবনে মাজাহ, কুতুল মুগতাজী আলা জামিযিত তিরমিযী

[১] আল-আলাম লিয-যিরিকলী: ১/১৭৮; যাইলুত তাকরীদ ফী রুওয়াতিল সুনানি ওয়াল আসানীদ লিল ফাসী: ১/৩৫২; আত-তাজুল মুকাব্বাল লিল কানুজী, পৃ. ৩৫৩।

তারিখ-এ-উম্মত-এ-মুসলিমা

- উসূলে হাদীস: তাদরীবুর রাবী
- ইলমুল হাদীস: আল-লাআলী আল-মাসনুআ ফিল আহাদীস আল-মাওদুআ
- রিজালুল হাদীস: ইসআফুল মুবাত্তাউ বি-রিজালি মুয়াত্তা, আসমাউল মুদাল্লিসীন
- ফিকহ: আল-হাবী লিল ফাতাওয়া (দুই খণ্ড)
- উসূলে ফিকহ: আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর
- তাফসীর: আদ-দুররুল মানসুর (৮ খণ্ড)... উসূলে তাফসীর: আল-ইতকান, আল-ইকলীল
- সীরাত: আল-খাসাইসুল কুবরা (দুই খণ্ড), আশ-শামাইলুশ শরীফাহ
- তারিখ ও তাবাকাত: তারিখুল খুলাফা, আশ-শামারীখ ফী ইলমিত তারিখ, হুসনুল মুহাদারা ফী তারিখি মিসর ওয়াল কাহিরা, তাবাকাতুল মুফাসসিরীন, যাইলু তাবাকাতিল হুফফাজ।

[১]

ইমাম শামসুদ্দীন সাখাতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি: (৮৩১ হি. - ৯০২ হি.)

মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান শামসুদ্দীন সাখাতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি হাফিজ ইবনে হাজার রহমাতুল্লাহি আলাইহির এক বিশিষ্ট ছাত্র ছিলেন। তিনি তাঁর উস্তাদ থেকে পূর্ণরূপে উপকৃত হন এবং তাঁরই মেজাজ ও রুচি অনুযায়ী ইলমী ও তালীফী কাজ করেন। আল্লামা সাখাতী রহমাতুল্লাহি আলাইহির পূর্বপুরুষদের সম্পর্ক মিশরের ‘সাখা’ নামক গ্রামের সাথে ছিল। তিনি কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন। ইলম অন্বেষণে তিনি বিভিন্ন দেশ সফর করেন এবং হাফিজ ইবনে হাজার রহমাতুল্লাহি আলাইহির সান্নিধ্যে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেন, যাঁর সাহচর্য তাঁকে ইলমের মূর্ত প্রতীকে পরিণত করেছিল। তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় মিশরে অতিবাহিত হলেও মদীনা মুনাওয়ারায় তাঁর মৃত্যু নসীব হয়।

আরবি সাহিত্য, হাদীস, ফিকহ এবং ইতিহাসে তাঁর মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চ ছিল। তাঁর অমর ও সর্বাধিক প্রসিদ্ধ কাজ ইতিহাসের ওপর। “আদ-দাওউল লামি’ লি-আহলিল করনিত তাসি’” গ্রন্থে তিনি নবম হিজরী শতাব্দীর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অবস্থা সংরক্ষিত করেছেন। দ্বিয়ারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইতিহাসের ওপর তাঁর কিতাব “আত-তুহফাতুল লতীফাহ ফী তারিখিল মদিনাতিশ শরীফাহ” আজও সমাদৃত। “আয-যাইলুত তাম” শিরোনামে তিনি হাফিজ যাহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহির “দুওয়ালুল ইসলাম”-এর পরিশিষ্ট লিখেছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও ভক্তির বহিঃপ্রকাশ তাঁর এক অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় কিতাব “আল-কাওলুল বাদী’ ফিস সালাতি আলাল হাবীবিশ শাফী’” থেকে প্রকাশ পায়, যা দরুদ ও সালামের ফযীলতের ওপর রচিত। তিনি বিশ্বের প্রসিদ্ধ শহর ও স্থানসমূহের ওপর “দাইরাতুল মাআরিফুল বুলদানিয়াত” নামে একটি বিশ্বকোষ তৈরি করেন। ইলমে ইতিহাসের গুরুত্ব, আদব এবং উসূলের বিষয়ে তাঁর রচিত “আল-ই’লান বিত-তাওবীখ লি-মান যাম্মাত তারিখ” চিরস্থায়ী খ্যাতি লাভ করেছে। [২]

[১] আল-আলাম লিয-যিরিকলী: ৩/১১০১; আত-তাজুল মুকাল্লাল লিল কানুজী, পৃ. ৩৩৩; সুল্লামুল উসুল ইলা তাবাকাতিল ফুহল লিল কাতিব চেলপি: ২/২৩৮।

[২] আল-আলাম লিয-যিরিকলী: ৬/১৯৩; আত-তাজুল মুকাল্লাল লিল কানুজী, পৃ. ৩৩৩।

নবজাগরণের কাহিনী, ইবনে বতুতার জবানিতে

বিগত পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা মুসলিম বিশ্বের যে নবজাগরণের (نشأة ثانية) কথা পড়েছি, উপযুক্ত হবে যে তার একটি চাক্ষুষ বিবরণ মহান পয়গম্বর ইবনে বতুতার জবানিতে শোনা যাক, যিনি ৭২৫ হিজরী থেকে ৭৫৪ হিজরীর মধ্যবর্তী সময়ে প্রায় সমগ্র মুসলিম বিশ্ব ভ্রমণ করেছিলেন।

ইবনে বতুতা মরক্কো থেকে যাত্রা শুরু করেন এবং ৭৫ হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে বিশ্বের ৪৪টি দেশ ভ্রমণ করেন। তিনি মক্কা মুয়াজ্জমা ও মদিনা মুনাওয়ারার মতো পবিত্র স্থানসমূহ জিয়ারত করেন এবং দিল্লি, কায়রো ও দামেস্কের মতো জনাকীর্ণ শহরগুলো ভ্রমণের শখ পোষণ করতেন। তিনি এটাও দেখতে চেয়েছিলেন যে, তাতারীদের প্লাবন বয়ে যাওয়ার পর মুসলিম বিশ্বের কী অবস্থা। যদিও তিনি জানতেন যে সেই এলাকাগুলো এখন আগের মতো জনবহুল নেই এবং সমরকন্দ ও বুখারার মতো বড় বড় তামাদুনিক শহরগুলোর পূর্বের জৌলুস এখন অতীত কাহিনীতে পরিণত হয়েছে, তবুও তিনি এখানকার মুসলিম জনপদগুলোর নবজাগরণ এবং শহরগুলোর ক্রমবিকাশের পর্যায়গুলো পর্যবেক্ষণ করতে চেয়েছিলেন। এছাড়া তিনি সেই নওমুসলিম মোগল শাসকদের শান-শওকত এবং তাদের কর্মকাণ্ডও দেখতে চেয়েছিলেন। তিনি ইরাকে মুসলমানদের সাবেক রাজধানী বাগদাদে পৌঁছান, যা হালাকু খানের হাতে ধ্বংস হওয়ার পর তার নওমুসলিম সন্তানদের হাতে পুনরায় আবাদ হয়েছিল। ইবনে বতুতা বলেন:

“এখানে দজলা নদীর সেতুগুলোতে দিনরাত নারী-পুরুষের আনাগোনা থাকে যারা এখানে বিনোদনের জন্য আসে। বাগদাদে এগারোটি এমন মসজিদ আছে যেখানে জুমার নামাজ পড়া হয়। এগুলো ছাড়াও আরও মসজিদ রয়েছে। মাদরাসাও আছে কিন্তু সেগুলো জরাজীর্ণ হয়ে গেছে... বাগদাদের পশ্চিম অংশ আগে জনবহুল ছিল। এখন তা জনশূন্য। মাত্র তেরোটি মহল্লা অবশিষ্ট আছে। প্রতিটি মহল্লা নিজেই একটি শহরের মতো। আটটি মহল্লায় জামে মসজিদ রয়েছে।” [১]

বাগদাদসহ সমগ্র ইরাকে নওমুসলিম তাতারী শাসক সুলতান আবু সাঈদের শাসন ছিল। ইবনে বতুতা (রহ.) লিখেন:

“আমি যখন বাগদাদে পৌঁছলাম তখন ইরাকের সুলতান আবু সাঈদ বাহাদুর খান সেখানেই ছিলেন। তিনি সুলতান মুহাম্মদ খোদাবন্দার পুত্র, যিনি মুসলমান হয়েছিলেন। সুলতান আবু সাঈদ একজন নওজোয়ান এবং সকল মানুষের চেয়ে বেশি সুন্দর, তার গালে দাড়ি-গোঁফ নেই।” [২]

তিনি এশিয়া মাইনরের সেলজুক সালতানাতের শহর কোনিয়াতে পৌঁছান এবং মাওলানা রুমি (রহ.)-এর মাজারে হাজিরা দেন। এরপর সিওয়াস, আরজানুর রুম এবং সামাররা হয়ে অবশেষে নওমুসলিম মোগলদের সালতানাত ‘খানাত-এ-কিপচাক’-এর দিকে রওনা হন যেখানে সেই সময় সুলতান মুহাম্মদ উজবেকের শাসন ছিল। কৃষ্ণসাগর অতিক্রম করে তিনি দশত-এ-কিপচাকের উপকূলে অবতরণ করেন। তিনি লিখেন:

“এই স্থানটি ছিল একটি সবুজ প্রান্তর যেখানে কোনো গাছপালা, পাহাড় বা জনবসতি ছিল না। এর দূরত্ব ছয় মাস...”

[১] রেহলা ইবনে বতুতা: ২/৬১, ত. আকাদেমিয়া আল-মাগরিবিয়া আল-রিবাত... নোট: এখান থেকে সামনের সকল উদ্ধৃতিতে আমরা ইবনে বতুতার বক্তব্যের আক্ষরিক অনুবাদ করিনি, বরং অপ্রয়োজনীয় শব্দসমূহ যা প্রসঙ্গ ও পূর্বাগের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল তা বাদ দিয়ে সারসংক্ষেপ পেশ করেছি।

[২] রেহলা ইবনে বতুতা: ২/৬৯, ত. আকাদেমিয়া আল-মাগরিবিয়া আল-রিবাত।

আছে। তিন মাসের দূরত্বের এলাকা সুলতান মুহাম্মদ উজবেকের সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত এবং বাকি অন্য কারো... এই মরুভূমিতে গাড়ি ছাড়া অন্য কোনো সওয়ারিতে সফর করা হয় না... গাড়িগুলোতে চারটি চাকা লাগানো থাকে। কোনোটি দুটি ঘোড়া টানে, কোনোটি তার চেয়ে বেশি। বলদ গাড়ি এবং উট গাড়িও থাকে। গাড়ির ওপর কাঠের জাল বুনে তার ওপর চামড়া বা কাপড়ের আবরণ চড়িয়ে দেওয়া হয়। এতে জালিদার জানালাও তৈরি করা থাকে যা দিয়ে গাড়িতে বসে থাকা লোকেরা বাইরে দেখতে পারে। গাড়ির ভেতরে মুসাফির আরাম করে শুতে পারে, ঘুমাতে পারে, খেতে পারে, লিখতে-পড়তে পারে এবং গাড়ি চলতে থাকে। যখন আমি সফরের ইচ্ছা করলাম, তখন এ ধরনের একটি উট গাড়ি ভাড়ায় নিলাম। [১]

তিনি সুলতান মুহাম্মদ উজবেকের সালতানাতের শান্তি ও শৃঙ্খলার অবস্থা এভাবে বর্ণনা করেন:

“যেখানে তাবু ফেলা হয় সেখানে ঘোড়া, উট এবং বলদগুলোকে গাড়ি থেকে খুলে দেওয়া হয় এবং চরে বেড়ানোর জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। এই পশুগুলোর পাহারার জন্য কোনো চৌকিদার থাকে না। কেউ এগুলো চুরি করে না, কারণ এখানে চুরির শাস্তি অত্যন্ত কঠোর। যদি কারো কাছে চুরির একটি ঘোড়া পাওয়া যায়, তবে তাকে জরিমানা হিসেবে নয়টি ঘোড়া দিতে হয়। ঘোড়া না থাকলে নিজের সন্তান দিতে হয়, তাও না থাকলে তাকে জবাই করে দেওয়া হয়।” [২]

ইবনে বতুতা রহ.-এর বর্ণনা অনুযায়ী সুলতান মুহাম্মদ উজবেকের সালতানাত বিশ্বের উত্তরে হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব ও পশ্চিমের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বজায় রেখেছিল। ইবনে বতুতা রহ. বলেন যে, সুলতানের সালতানাতে জেনোয়ার বণিকরা আসা-যাওয়া করে এবং ঘোড়ার ব্যবসা সিন্ধু ও হিন্দুস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত। সুলতানের সালতানাত ঘাসযুক্ত ময়দানের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাই এখানে ঘোড়া পালন এবং কেনাবেচার কাজ চরম শিখরে ছিল। তিনি লেখেন:

“এখানে ঘোড়া প্রচুর পরিমাণে আছে। এগুলোর দাম কম। অত্যন্ত উন্নত মানের ঘোড়া পঞ্চাশ-ষাট দিরহামে পাওয়া যায়। এক একটি চালানে ছয়-ছয় হাজার ঘোড়া রপ্তানি করা হয়। সস্তার সস্তা ঘোড়া হিন্দুস্তানে একশ দিনারে বিক্রি হয়।” [৩]

সুলতান মুহাম্মদ উজবেকের তাঁবুতে পৌঁছে তিনি প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে এভাবে বর্ণনা করেন:

“সুলতানের লশকর যাকে ‘উর্দু’ বলা হয়, একটি বড় শহরের মতো মনে হলো। এতে মসজিদও ছিল এবং বাজারও। রান্নাঘরগুলো থেকে ধোঁয়া উঠছিল। মানুষ এদিক-ওদিক চলাফেরা করছিল। সুলতান অত্যন্ত শান-শওকতপূর্ণ একজন বাদশাহ। তাঁর দেশ বিশাল এবং শহরগুলো বড়। তিনি বিশ্বের সাতজন মহান বাদশাহর একজন। একজন আমাদের আমির মাদাজিল্লাহ (সুলতান মরক্কো আবু ইনান ফারিস আল-মারিনি), দ্বিতীয়জন মিসর ও শামের সুলতান (আল-মালিক আন-নাসির বিন কালাউন), তৃতীয়জন ইরাকের সুলতান (আবু সাঈদ বাহাদুর), চতুর্থ এই সুলতান উজবেক, পঞ্চম তুর্কিস্তান ও মাওরাউন্নাহারের সুলতান (তারমা শিরিন খান),”

[১] রেহলা ইবনে বতুতা: ২/২১৮, ত. একাডেমিয়া আল-মাগরিবিয়া আর-রিবাত

[২] রেহলা ইবনে বতুতা: ২/২২০, ত. একাডেমিয়া আল-মাগরিবিয়া আর-রিবাত

[৩] রেহলা ইবনে বতুতা: ২/২৩৩, ত. একাডেমিয়া আল-মাগরিবিয়া আর-রিবাত

ষষ্ঠ হিন্দুস্তানের বাদশাহ (মুহাম্মদ তুঘলক) এবং সপ্তম চীনের বাদশাহ। [১]

সুলতানের লঙ্কর থেকে মাত্র দশ দিনের দূরত্বে বুলগেরিয়ার সীমান্ত ছিল যেখানে রাত খুব ছোট হয়। ইবনে বতুতা অনেক কষ্ট ও শ্রম স্বীকার করে এই দৃশ্য দেখার জন্য সেখানে গিয়েছিলেন। রমজান মাস ছিল। তিনি বলেন:

“আমরা মাগরিবের সালাত আদায় করলাম এবং ইফতার করলাম। ইফতারের মধ্যেই এশার আজান হয়ে গেল। তারাবিহ ও বিতর থেকে অবসর হলাম। কিছুক্ষণ পরই ফজরের ওয়াক্ত হয়ে গেল।” [২]

ইবনে বতুতা এরপর উটের গাড়িতে করে কাস্পিয়ান সাগরের উত্তরের সমভূমি পাড়ি দিয়ে খোয়ারিজমের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। চেন্সিস খান যে দেশটিকে ধ্বংস ও বরবাদ করেছিলেন, তা এখন নওমুসলিম তাতারীদের মাধ্যমে আবারও আবাদ হয়ে গিয়েছিল। সে সময় এখানকার আমির ছিলেন ‘কুতলু দিমুর’, যিনি ইবনে বতুতাকে অনেক সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করেন। ইবনে বতুতা এখানে কাজী ওমর আকবরী নামক এক আলেমের মেহমান হন। তিনি বলেন যে, এখানকার জনসংখ্যা এত বেশি যে দিনের বেলা গলি দিয়ে চলাফেরা করতে মেহমানদের কষ্ট হয়। তিনি খোয়ারিজমের রাজধানীর প্রশংসা এভাবে করেন:

“খোয়ারিজম শহর তুর্কিদের বড় শহরগুলোর অন্যতম। অনেক বড়, অনেক সুন্দর। এর বাজারগুলো আকর্ষণীয় এবং রাস্তাগুলো প্রশস্ত। এর জনসংখ্যা অনেক ঘন। খোয়ারিজমের বাসিন্দাদের মতো শরীফ, নেক স্বভাবের এবং মুসাফিরদের ভালোবাসার মতো মানুষ আমি কোথাও দেখিনি।” [৩]

তিনি এখানকার সালাতের পাবন্দির পরিবেশ দেখে খুশি হলেন। তিনি লেখেন:

“এই লোকেরা সালাতের ব্যাপারে অনেক পাবন্দ। তাদের একটি ভালো অভ্যাস দেখলাম যে, মুয়াজ্জিন নিজেই আশেপাশের ঘরগুলোতে মানুষকে সালাতের জন্য ডাকতে যান। যে ব্যক্তি সালাতে শরিক হয় না, মসজিদের ইমাম সবার সামনে তাকে প্রহার করেন, এই কাজের জন্য মসজিদে একটি চারুক বুলানো থাকে। সালাত আদায় না করা ব্যক্তির ওপর পাঁচ দিনার জরিমানাও করা হয়। জরিমানার অর্থ মসজিদে ব্যয় করা হয় অথবা ফকির ও মিসকিনদের খাওয়ানোর কাজে খরচ করা হয়।” [৪]

মধ্য এশিয়ার শহর বুখারা ও সমরকন্দসহ বিশাল এলাকা মঙ্গোলদের চাঘতাই বংশের সালতানাতের অধীনে ছিল। এখানে সে দিনগুলোতে নওমুসলিম তারমা শিরিন খানের শাসন ছিল যার ন্যায়বিচার ও ইনসাফ প্রসিদ্ধ। ইবনে বতুতা খোয়ারিজম থেকে বিদায় নিয়ে তার এলাকায় প্রবেশ করলেন। বুখারা তখনও আগের মতো আবাদ হতে পারেনি। তবে শহরের সাথে লাগোয়া জনপদ ‘ফাতহাবাদ’-এ শেখ সাইফউদ্দিন বাখারজি রহ.-এর খানকাহ ছিল এবং সেখানেই তার মাজার ছিল। তার সন্তানদের মধ্যে শেখ ইয়াহিয়া বাখারজি রহ. এই খানকাহ পরিচালনা করছিলেন। ইবনে বতুতা রহ. সেখানে গেলেন। শেখ ইয়াহিয়া রহ. ইবনে বতুতা রহ.-এর জন্য মাহফিলে হুসনে কিরাত আয়োজন করলেন। [৫]

[১] রেহলা ইবনে বতুতা: ২/২২৮, ত. একাডেমি আল-মাগরিবিয়া আর-রাবাত

[২] রেহলা ইবনে বতুতা: ২/২৩৫, ২৩৬, ত. একাডেমি আল-মাগরিবিয়া আর-রাবাত

[৩] রেহলা ইবনে বতুতা: ৩/১০৯, ত. একাডেমি আল-মাগরিবিয়া আর-রাবাত

[৪] রেহলা ইবনে বতুতা: ৩/১১০, ত. একাডেমি আল-মাগরিবিয়া আর-রাবাত

[৫] রেহলা ইবনে বতুতা: ৩/৩৩, ত. একাডেমি আল-মাগরিবিয়া আর-রাবাত

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

ইবনে বতুতা রহ. তরমা শিরিন খান সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন:

“তার সালতানাত বিশ্বের চারটি বড় সালতানাতের মাঝে অবস্থিত। অর্থাৎ চীন সালতানাত, হিন্দ সালতানাত, ইরাক সালতানাত এবং উজবেক সালতানাত। এই সকল সালতানাতের শাসকরা তরমা শিরিন খানকে সম্মান করেন এবং তাকে উপহার পাঠান।” [১]

তিনি সমরকন্দ, বুখারা এবং তিরমিযের উলামা ও মাশায়েখদের সাথে সাক্ষাৎ করে অবশেষে আমু নদী পার হয়ে বলখ পৌঁছান। তিনি জানান যে খোরাসানে চারটি বড় শহর রয়েছে, যার মধ্যে দুটি আবাদ আছে: হেরাত এবং নিশাপুর। আর দুটি ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় আছে: বলখ এবং মার্ভ।

বলখ তার যাত্রাপথে পড়েছিল, যে সম্পর্কে তিনি লিখেছেন:

“বলখের জামে মসজিদ বিশ্বের সকল মসজিদের চেয়ে অধিক চমৎকার ও প্রশস্ত। এর স্তম্ভগুলো উচ্চতায় মরক্কোর রাবাত শহরের জামে মসজিদের সদৃশ। এই মসজিদটি বনু আব্বাসের একজন আমির দাউদ বিন আলীর স্ত্রী নির্মাণ করিয়েছিলেন।” [২]

বলখ থেকে হেরাতের পথের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন:

“আমরা বলখ থেকে রওনা হলাম এবং কুহিস্তানের পাহাড়গুলোতে ভ্রমণ করে সাত দিন পর হেরাত পৌঁছালাম। পথে আমরা অনেক আবাদ গ্রাম পেলাম যেখানে পানির ঝরনা ও প্রচুর গাছপালা ছিল এবং অনেক খানকাহ ছিল, যেখানে আল্লাহর নেক বান্দারা দুনিয়া ত্যাগ করে ইবাদতে মগ্ন ছিলেন।” [৩]

হেরাতে মসজিদ, মাদ্রাসা, কুতুবখানা এবং খানকাহর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। বলখ ও মার্ভের পরিবর্তে হেরাত এখন মধ্য এশিয়া, ইরান, চীন এবং হিন্দুস্তানের মাঝে বাণিজ্যিক সংযোগস্থল হিসেবে কাজ করছিল এবং প্রতিদিন যাতায়াতকারী অসংখ্য বাণিজ্যিক কাফেলার বদৌলতে এর বাজারগুলো বিশ্বজুড়ে বাণিজ্যিক পণ্যে ভরপুর ছিল। ইবনে বতুতা মুসলিম বিশ্ব ভ্রমণের সময় বলখের পর অবশেষে হেরাতে পদার্পণ করেছিলেন। এটি ছিল ৭৩১ হিজরি (১৩৩০ খ্রিস্টাব্দ) এবং ৭৩৩ হিজরি (১৩৩২ খ্রিস্টাব্দ) এর মধ্যবর্তী সময়। সেই দিনগুলোতে খোরাসান শাহানে কার্ত-এর শাসক আমির মুইযউদ্দীন হুসাইনের অধীনে ছিল। এখানে উলামা ও ফুজালার সেই দলটি আশ্রয় নিয়েছিল যারা তাতারীদের ধ্বংসযজ্ঞের ভয়াবহ সময়ে ইলম ও আদবের উত্তরাধিকার রক্ষা করতে এবং তা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে অক্লান্ত সংগ্রাম করেছিল। কার্ত পরিবার ছিল তাদের রক্ষক ও পৃষ্ঠপোষক।

ইবনে বতুতা রহ. তার সম্পর্কে লিখেছেন:

“সুলতান মুয়াযযাম হুসাইন বিন সুলতান গিয়াসউদ্দীন ঘুরীর বীরত্ব সুপরিচিত এবং তার প্রতি আল্লাহর সাহায্য রয়েছে... তার মোকাবিলা রাফেযীদের সাথে হয়েছিল যাতে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং তাদের শাসন বিলুপ্ত হয়।” [৪]

[১] রেহলা ইবনে বতুতা: ৩/৩৭, ত. একাডেমিয়া আল-মাগরিবিয়া রাবাত

[২] রেহলা ইবনে বতুতা: ৩/৪৩, ত. একাডেমিয়া আল-মাগরিবিয়া রাবাত

[৩] রেহলা ইবনে বতুতা: ৩/৪৪, ত. একাডেমিয়া আল-মাগরিবিয়া রাবাত

[৪] রেহলা ইবনে বতুতা: ৩/৪৬, ত. একাডেমিয়া আল-মাগরিবিয়া রাবাত; এরপর ইবনে বতুতা সেই যুদ্ধের বিবরণ দিয়েছেন যাতে সুলতান হুসাইনের এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্যের মোকাবিলা তুসের এক রাফেযী রাজনীতিবিদ হাসানের দেড় লক্ষ সৈন্যের সাথে হয়েছিল, যাতে রাফেযীরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়।

হেরাত সম্পর্কে তাঁর বর্ণনা হলো:

“হেরাত খোরাসানের শহরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি জনবহুল। এখানকার মানুষ নেককার ও আমানতদার। তারা হানাফি মাযহাবের অনুসারী। তারা ফিতনা-ফ্যাসাদ থেকে দূরে থাকে।” [১]

নিশাপুর, যাকে তাতারীরা এমনভাবে ধ্বংস করেছিল যে সেখানে লাঙল চালানো হয়েছিল, তা আবারও ইসলামের দোলনায় পরিণত হয়েছিল, যার সম্পর্কে ইবনে বতুতা লিখেছেন:

“নিশাপুর খোরাসানের চারটি প্রধান শহরের একটি। ফলমূল, বাগান, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং ঝরনার প্রাচুর্যের কারণে একে দিমাশকে সগির (ছোট দামেস্ক) বলা হয়। এর মধ্য দিয়ে চারটি নদী প্রবাহিত হয়েছে। এর বাজারগুলো সুন্দর ও প্রশস্ত। এর মসজিদটি অনন্য ধরনের যা বাজারের মাঝখানে অবস্থিত এবং এর সাথে চারটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত আছে যেগুলোর মধ্য দিয়ে প্রচুর পানির ঝরনা প্রবাহিত হয়। এগুলোতে অনেক ছাত্র কুরআন মাজীদ ও ফিকহ শিক্ষা লাভ করে। এগুলো এই অঞ্চলের সবচেয়ে সুন্দর মাদ্রাসা।” [২]

কুন্দুজ ও বাঘলান সম্পর্কে লিখেছেন:

“এই জনপদগুলোতে আল্লাহর ওলী বুজুর্গরা প্রচুর সংখ্যায় রয়েছেন। বাগান ও নদীও রয়েছে। কুন্দুজে আমরা একটি ঝরনার পাড়ে একটি খানকাহতে ছিলাম যা শহরের এক দরবেশের ছিল, তাঁকে শেরে সিয়াহ অর্থাৎ কালো সিংহ বলা হতো। শহরের ওয়ালী, যাঁর সম্পর্ক ছিল মোসেলের সাথে, আমাদের মেহমানদারি করেন। আমরা কুন্দুজের বাইরে চল্লিশ দিন অবস্থান করি যাতে আমাদের উট ও ঘোড়াগুলো ভালোভাবে চরে নিতে পারে; এখানকার চারণভূমিগুলো অত্যন্ত চমৎকার, ঘাস প্রচুর। তুর্কিদের (নওমুসলিম তাতারীদের) কঠোর নির্দেশের কারণে এখানে ঘোড়া চুরি হয় না। মানুষ তাদের পশুদের মুক্ত ছেড়ে দেয়।” [৩]

মোটকথা, তাতারী তুফান যে দ্রুততার সাথে ছয়শ বছরের ইসলামী তাহযীব ও তামাদুনকে ধ্বংস করেছিল, উলামায়ে দ্বীন ও মাশায়েখে কেরামের মেহনত এবং মুসলিম শাসকদের তৎপরতা, একাগ্রতা ও কর্মতৎপরতার মাধ্যমে সেই বিশাল ক্ষতির ক্ষতিপূরণ করা হয় এবং পরবর্তী শতাব্দীর শেষ নাগাদ মুসলিম বিশ্ব আবারও উন্নতি ও স্থিতিশীলতার চরম শিখরে পৌঁছে যায়।

[১] রেহলা ইবনে বতুতা: ৩/৩৫, ত. একাডেমি আল-মাগরিবিয়া রাবাত

[২] রেহলা ইবনে বতুতা: ৩/৫৬, ত. একাডেমি আল-মাগরিবিয়া রাবাত

[৩] রেহলা ইবনে বতুতা: ৩/৫৮, ৫৯, ত. একাডেমি আল-মাগরিবিয়া রাবাত

চতুর্থ খণ্ড

তারিখে উন্মতে মুসলিমা

অষ্টম অধ্যায়

উসমানীয় সালতানাতের ইতিহাস

প্রতিষ্ঠাকাল থেকে উত্থানকাল পর্যন্ত

৬৯৯ হিজরি থেকে ৯১৮ হিজরি

(১২৮১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৫১২ খ্রিষ্টাব্দ)

উসমানীয় রাষ্ট্র

এখন আমরা ইতিহাসের অধ্যয়নে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছি, যেখান থেকে তুরস্কের মহান উসমানীয় সাম্রাজ্যের আলোচনা শুরু করা যাক। বর্তমান তুরস্ক যে অঞ্চল নিয়ে গঠিত, আগে তাকে এশিয়া মাইনর (আসিয়ায়ে সগরা - Asia minor) বলা হতো। গ্রিকরা একে ‘আনাতোলিয়া’ বলত, আর আরব ও তুর্কিরা একে ‘আনাতোল’ বলে।

ভৌগোলিক অবস্থা:

আনাতোলিয়ার পূর্বে ইরান ও আর্মেনিয়া অবস্থিত। উত্তর-পূর্বে জর্জিয়া, আর দক্ষিণ-পূর্বে ইরাক ও সিরিয়া অবস্থিত। উত্তর-পশ্চিমে বুলগেরিয়া এবং পশ্চিমে ভূমধ্যসাগরের ওপারে গ্রিস অবস্থিত।

এই অঞ্চলটি একটি উপদ্বীপ যা চারটি সাগরের সাথে মিলিত হয়েছে। এর উত্তরে কৃষ্ণসাগর, উত্তর-পশ্চিমে মারমারা সাগর, দক্ষিণে এজিয়ান সাগর এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর অবস্থিত। এই চারটি সাগর সরু প্রণালীর মাধ্যমে একে অপরের সাথে যুক্ত। কৃষ্ণসাগর বসফরাস প্রণালীর মাধ্যমে মারমারা সাগরের সাথে মিলিত হয়েছে এবং মারমারা সাগর দার্দানেলস প্রণালীর মাধ্যমে এজিয়ান সাগরের সাথে যুক্ত হয়েছে। এজিয়ান সাগরের দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর অবস্থিত।

বসফরাস প্রণালীর সেতু একে ইউরোপের সাথে যুক্ত করে। এই প্রণালীটি বিশ্বের দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে অন্যতম। এটি প্রায় ১৮ মাইল দীর্ঘ। এর সর্বোচ্চ প্রস্থ দুই মাইল, যা কোনো কোনো স্থানে এক মাইলেরও কম হয়ে যায়। রুমেলি হিসার নামক স্থানে এটি মাত্র ৭৫০ মিটার প্রশস্ত। এর পশ্চিম অংশে অবস্থিত বাইজেন্টাইন রোমের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল শতাব্দীকাল ধরে মুসলমানদের সাহসিকতার পরীক্ষা নিয়েছে। এখন প্রণালীর উভয় পাশে ইস্তাম্বুলের ঘনবসতি রয়েছে। দার্দানেলস প্রণালীও বিশ্বের অন্যতম বিখ্যাত প্রণালী যা প্রায় ৪০ মাইল দীর্ঘ এবং এক থেকে চার মাইল পর্যন্ত প্রশস্ত।

আনাতোলিয়ার (আনাতোল) উপকূলীয় অঞ্চল পাঁচ হাজার মাইলেরও বেশি। অন্যদিকে স্থল সীমান্ত প্রায় দেড় হাজার মাইল। আঙ্কারা, ইজমির, বুরসা, কোনিয়া, এদির্নে, ট্রাবজোন, এরজুরুম (আরজানুর রুম), মেরসিন, একি শেহর (এসকিশেহির) এবং আনতালিয়া এখানকার গুরুত্বপূর্ণ শহর। এই দেশটি এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে একটি সেতুর মতো। দুই মহাদেশের মধ্যবর্তী এই বিভাজন কৃষ্ণসাগর থেকে শুরু হয় এবং বসফরাস প্রণালী, মারমারা সাগর ও দার্দানেলস প্রণালী হয়ে এজিয়ান সাগর পর্যন্ত চলে যায়।

আনাতোলিয়া উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমে সরু উপকূলীয় অঞ্চল নিয়ে গঠিত। দক্ষিণে বড় বড় উপসাগর রয়েছে, অন্যদিকে পশ্চিম উপকূল অত্যন্ত আঁকাবাঁকা। মধ্য অঞ্চলটি বেশিরভাগ শুষ্ক মালভূমি নিয়ে গঠিত যেখানে স্থানে স্থানে লবণাক্ত পানির হ্রদ রয়েছে। উত্তর...

কৃষ্ণ সাগরের উপকূলীয় অঞ্চলে পাহাড়ি পর্বতমালা রয়েছে যা অত্যন্ত পাথুরে এলাকা। দক্ষিণে তউরুস পর্বতমালা এবং উত্তরে পন্টিক পর্বতমালা অবস্থিত। এই উভয় পর্বতমালা পূর্বের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গের সাথে মিলিত হয়েছে যেখান থেকে দজলা ও ফোরাত নদী উৎপন্ন হয়েছে। সবচেয়ে উঁচু পাহাড় হলো আরারাত পর্বত যা ৫ হাজার মিটারেরও বেশি উঁচু।

এখানে গ্রীষ্মকালে শুষ্ক গরম অনুভূত হয় এবং শীতকালে আর্দ্রতা বেশি থাকে। মে মাসে বেশি বৃষ্টিপাত হয়, অন্যদিকে জুলাই ও আগস্ট মাস একেবারেই শুষ্ক থাকে। কোনিয়া এবং মালাতিয়ার মালভূমি দেশের শুষ্কতম এলাকা হিসেবে গণ্য হয়। পূর্বের পাহাড়ি অঞ্চলে শীতকাল অত্যন্ত তীব্র হয় এবং তাপমাত্রা মাইনাস ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নেমে যায়। [১]

আনাতোলিয়ার ইতিহাস:

আনাতোলিয়ার ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন। খ্রিস্টপূর্ব যুগে এটি গ্রিক সভ্যতার অধীনে ছিল। ৩৩৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এখানে সিকান্দার আজম দখল করেন কিন্তু তার উত্তরসূরিরা এই অঞ্চলটি ধরে রাখতে পারেননি। এরপর রোমানরা এটি জয় করে। রোমান যুগেই হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর আবির্ভাব ঘটে। তাঁর পরে খ্রিস্টধর্ম যখন নতুন রূপে আবির্ভূত হয়, তখন এর দাওয়াত এখানে সাধারণ হয়ে ওঠে। তৃতীয় খ্রিস্টাব্দের শেষ নাগাদ খ্রিস্টধর্ম ছড়িয়ে পড়েছিল। সপ্তম খ্রিস্টাব্দে আরবের মরুভূমি থেকে ইসলামের আবির্ভাব ঘটে এবং কয়েক দশকের মধ্যে সাহাবায়ে কেরাম ফিলিস্তিন, সিরিয়া ও মিশর থেকে কায়সারের সাম্রাজ্য মিটিয়ে দেন। উমাইয়া যুগে পূর্ব আনাতোলিয়ার একটি বড় অংশ বিজিত হয় এবং রোমান সাম্রাজ্য আনাতোলিয়ার উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এরপর বনু আব্বাসের যুগে বাইজেন্টাইন রোমান সাম্রাজ্যের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। প্রায় সাত শতাব্দী ধরে এই অঞ্চলটি মুসলমান ও রোমানদের মধ্যে সবচেয়ে বড় যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে থাকে। কখনো মুসলমানরা রোমানদের পিছু হটিয়ে কুস্তনতুনিয়ার সামনে পৌঁছে যেতেন, আবার কখনো রোমানরা আক্রমণ চালিয়ে ইরাক ও সিরিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত চলে আসতেন।

আনাতোলিয়া স্থায়ীভাবে জয় করতে না পারার কারণসমূহ:

মুসলমানদের পক্ষ থেকে এই অঞ্চলটি স্থায়ীভাবে জয় করতে না পারার বেশ কিছু কারণ ছিল:

- ১. সবচেয়ে বড় কারণ ছিল মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ বিবাদ, যার ফলে তারা কখনো এই অঞ্চলটি বিজয়ের জন্য পুরোপুরি মনোনিবেশ করতে পারেননি এবং এই কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যায়।
- ২. দ্বিতীয় কারণ ছিল মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্টি হওয়া ঈমানি ও চারিত্রিক অবক্ষয়, যার কারণে এখানে দখলদার থাকার পরেও তারা রোমানদের সামনে প্রথম যুগের মুজাহিদদের মতো উচ্চতর চরিত্র প্রদর্শন করতে পারেননি। এর ফলে এখানকার মানুষের ইসলাম গ্রহণের গতি ধীর ছিল এবং অনেক শহর বিজিত হওয়ার পর বারবার রোমানদের হাতে চলে যেত।
- ৩. যেহেতু এই অঞ্চলটি তিন দিক থেকে উপদ্বীপের মতো ছিল এবং ইউরোপের সাথে যুক্ত ছিল, তাই ইউরোপীয় সরকারগুলো নৌবহরের...

[১] উর্দু দায়েরাতুল মাআরিফ পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি: প্রবন্ধ তুরস্ক। দায়েরাতুল মাআরিফ আল-ইসলামিয়া দ্বিতীয় সংস্করণ: প্রবন্ধ এশিয়ায়ে কুচক। আত-তারিখ ওয়াল জুগরাফিয়া আজ মাসউদ খাওয়ান্দ, অধ্যায় আনাতোলিয়া।

...এর মাধ্যমে এখানে খুব দ্রুত পৌঁছে যেত, যেখানে মুসলিমদের কেন্দ্রগুলো থেকে সেনাবাহিনী পৌঁছাতে বেশ সময় লাগত।

পঞ্চম হিজরি শতাব্দীর শেষভাগে সেলজুকরা প্রায় পুরো আনাতোলিয়া জয় করে মারমারা উপসাগর পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু যখন ক্রুসেড শুরু হলো এবং ইউরোপীয় বাহিনী আনাতোলিয়াকে যাতায়াতের পথ বানিয়ে বায়তুল মুকাদাসের দিকে যেতে শুরু করল, তখন এই সময়ে কিছু ইউরোপীয় ও রোমান নবাব ও রাজপুত্র আনাতোলিয়ার বিভিন্ন এলাকা দখল করে নেয় এবং এভাবে আনাতোলিয়ার একটি বড় অংশ আবারও মুসলিমদের হাতছাড়া হয়ে যায়।

উসমানীয় তুর্কিরা অসম্পূর্ণ কাজ সম্পন্ন করেছে:

সাত শতাব্দী পর উসমানীয় তুর্কিরা বিশ্বের মানচিত্রে আবির্ভূত হয়ে এই অসম্পূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে এবং পুরো এশিয়া মাইনরকে (আনাতোলিয়া) এক পতাকাতলে নিয়ে এসে একে ইসলামের শক্তিশালী কেন্দ্রে পরিণত করে। শুধু তাই নয়, তারা বুলগেরিয়া, বলকান, আলবেনিয়া, বসনিয়া ও কসোভোর মতো ইউরোপীয় এলাকাগুলোকেও পদানত করে এবং সেখানে ইসলামি ব্যবস্থা কার্যকর করে ন্যায়বিচার ও উন্নত চরিত্রের এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যে, সেখানে চারদিকে কালিমায়ে তাওহিদ প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। [১]

আনাতোলিয়ার সরকারসমূহ:

আনাতোলিয়ায় উসমানীয় তুর্কিদের আগমনের সময় এখানে অনেকগুলো রাষ্ট্র ও আমিরাত প্রতিষ্ঠিত ছিল। অমুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বাইজান্টাইন (ইজনিক) এবং “ত্রাবজোন” ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এই দুটি রাষ্ট্রই কনস্টান্টিনোপল থেকে বিতাড়িত কিছু বাইজান্টাইন রাজপুত্র ক্রুসেডের সময় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সালজুকায়ে রুম, কারামানিয়া আমিরাত, বনু আশরাফ আমিরাত, বনু হামিদ আমিরাত, বনু মুস্তাশা আমিরাত, জারমিয়ানিয়ান আমিরাত, আলে সাহিব আতা আমিরাত, দেনিজলি (লাদিক) আমিরাত, বনু আইদিন আমিরাত, সারুখানি আমিরাত, কারাসি আমিরাত এবং বনু ইসফান্দিয়ার আমিরাত উল্লেখযোগ্য। [২]

উসমানীয় তুর্কিদের অবদান:

উসমানীয় তুর্কিরা অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে এই শিক্ষা গ্রহণ করেছিল যে, মুসলিমদের পারস্পরিক গৃহযুদ্ধ সবসময় তাদের বিজয়ের পথ রুদ্ধ করেছে। তাই তারা তাদের পুরো মনোযোগ ইউরোপের দিকে নিবদ্ধ রাখে এবং তাদের সুলতানরা ইউরোপে প্রবেশ করে কয়েক শতাব্দী ধরে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন জিহাদ চালিয়ে যান। তারা যতটা সম্ভব মুসলিম দেশগুলোর সাথে দ্বন্দ্ব জড়ানো থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখেন এবং ইসলামের শত্রুদের দমন এবং ইসলামের প্রচার ও সুরক্ষাকে নিজেদের লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করেন।

খ্রিস্টান শক্তিগুলো শতাব্দীকাল ধরে সিরিয়া ও মিশরে আক্রমণ চালিয়ে আসছিল, কিন্তু উসমানীয়দের বিদ্যুৎগতিসম্পন্ন আক্রমণে ভীত হয়ে তাদের সমস্ত মনোযোগ নিজেদের প্রতিরক্ষার দিকে নিবদ্ধ হয় এবং মুসলিম বিশ্বের উপকূলগুলো দখলের চিন্তা তাদের জন্য এক দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়। এসব অবদানের কারণে উসমানীয় সালতানাত মুসলিম বিশ্বে এমন জনপ্রিয়তা লাভ করে যার উদাহরণ কেবল কুরুনে উলা-তে (ইসলামের প্রাথমিক যুগে) পাওয়া যায়।

[১] উর্দু দাইরাতুল মাআরিফ, পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি: প্রবন্ধ তুর্কি। আত-তারিখ ওয়াল জুগরাফিয়া, মাসউদ খাওয়ান্দ কর্তৃক, আনাতোলিয়া অধ্যায়।

[২] তারিখে উসমানি, ইসমাইল হাক্কি উজুন কর্তৃক, পৃষ্ঠা ৩০ থেকে ১০৭। এই আমিরাতগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এই অধ্যায়ের শেষে আসছে।

...শাসকদের মধ্যে পাওয়া যায়। এই সুখ্যাতির কারণেই মুসলমানরা তাদেরকে খিলাফতের যোগ্য মনে করেছিল এবং যখন তারা কায়রোর আববাসীয় খলিফাদের কাছ থেকে খিলাফত নিজেদের নামে করিয়ে নিয়েছিল, তখন মুসলিম বিশ্বে এর বিরুদ্ধে কোনো আওয়াজ ওঠেনি।

উসমানীয় সুলতানদের প্রতি প্রাচ্যবিদ ও বাতিল দলগুলোর বিদ্রোহ:

যেহেতু উসমানীয় সুলতানরা ইউরোপের গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তাই ইউরোপীয় শক্তিগুলো সর্বদা তাদের চরিত্র হননের ওপর জোর দিয়েছে। অধিকাংশ উসমানীয় সুলতান ছিলেন আলেম, ফাজেল, ন্যায়পরায়ণ, প্রজাবৎসল, মুত্তাকী, মুজাহিদ এবং ধর্মপ্রাণ। তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা ও মতাদর্শের ওপর অবিচল এবং হানাফী ফিকহের অনুসারী ছিলেন। সুফি ও মাশায়েখদের প্রতি তাদের গভীর ভক্তি ছিল। তাদের অধিকাংশ কোনো না কোনো শায়খের মুরিদ এবং জিকির-আজকারের পাবন্দ ছিলেন। এই গুণাবলি ধর্মনিরপেক্ষ গোষ্ঠী এবং প্রাচ্যবিদদের কাছে কীভাবে সহনীয় হতে পারে?

উসমানীয় সুলতানদের ধর্মীয় আবেগ এবং ধর্মীয় খিদমত যেখানে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে তাদের জনপ্রিয় করে তুলেছিল, সেখানে বাতিল দলগুলো তাদের সর্বদা চরম ঘৃণার চোখে দেখত। কারণ উসমানীয়দের উত্থান ফিরকাবাজির প্রবক্তাদের মাথা নত করে দিয়েছিল। তাই বাতিল দলগুলো উসমানীয়দের শিকড় কাটতে ব্যস্ত ছিল এবং বারবার তাদের পিঠে খপ্পর বসিয়েছিল।

এ জাতীয় উপাদানগুলোর সবচেয়ে বড় কেন্দ্র ছিল ইরান, যেখানে সফবীয়রা শাসন প্রতিষ্ঠা করে উসমানীয়দের সাথে শতাব্দীকাল ধরে যুদ্ধ-বিগ্রহ চালিয়েছিল। আজও ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্যিক, প্রাচ্যবিদ এবং ইরানি ঐতিহাসিকদের লেখায় উসমানীয় সুলতানদের চরিত্র হননের ধারা অব্যাহত রয়েছে। পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা এই মহান উসমানীয় সাম্রাজ্যের ইতিহাস পেশ করব এবং আমাদের পূর্ণ চেষ্টা থাকবে যেন আমরা ঐতিহাসিক বর্ণনার স্তূপ থেকে পরিচ্ছন্ন ও নির্ভরযোগ্য উপাদান নির্বাচন করে পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করতে পারি।

আনাতোলিয়ার রাষ্ট্রসমূহ

উসমানীয় সাম্রাজ্যের চারপাশ বোঝার জন্য প্রথমে আনাতোলিয়ার সেই গুরুত্বপূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর পরিচিতি প্রয়োজন যেগুলোর উল্লেখ সামনে বারবার আসবে। এগুলোর মধ্যে কিছু রাষ্ট্র ছিল মুসলিম এবং কিছু অমুসলিম। নিম্নে আমরা এই রাষ্ট্রগুলোর অবস্থা অত্যন্ত সংক্ষেপে পেশ করছি। প্রথমে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর আলোচনা হবে, তারপর অমুসলিম রাষ্ট্রগুলোর।

পাঠকরা যদি মাঝখানে একঘেয়েমি অনুভব করেন, তবে এই রাষ্ট্রগুলোর পরিচিতি বাদ দিয়ে সরাসরি উসমানীয় সুলতানদের অবস্থা অধ্যয়ন শুরু করতে পারেন এবং মাঝখানে যেখানে কোনো রাষ্ট্রের উল্লেখ আসবে এবং তার পরিচিতির প্রয়োজন অনুভব করবেন, তখন এই পৃষ্ঠাগুলোর দিকে ফিরে আসতে পারেন।

মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ

আনাতোলিয়ায় উসমানীয় সাম্রাজ্যের সমসাময়িক মুসলিম রাষ্ট্র ছিল প্রায় দুই ডজন, যেগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রগুলোর নাম হলো:

১. বনু কারাসি রাষ্ট্র
৪. বনু হামিদ রাষ্ট্র
৭. বনু মেনতেশা রাষ্ট্র
১০. বনু গেরমিয়ান রাষ্ট্র (গেরমিয়ান, জারমিয়ান)
১২. বনু জুলকাদির রাষ্ট্র
১৪. বনু সাহেব আতা রাষ্ট্র
১৭. বনু তাজ উদ্দিন রাষ্ট্র
১৯. কুতলু শাহলার রাষ্ট্র
২. আইদিন আমিরাত
৫. বনু আশরাফ রাষ্ট্র
৮. বনু পারওয়ানা রাষ্ট্র
১১. বনু রমজান রাষ্ট্র
১৩. বনু জান্দার রাষ্ট্র (বনু ইসফান্দিয়ার, বনু চুবান)
১৫. বনু তেক্কে রাষ্ট্র
১৮. বনু ইনানজ রাষ্ট্র (দিনজলির আমিরগণ)
২০. আইকোনিয়ন রাষ্ট্র
৩. বনু এরতিনা রাষ্ট্র
৬. বনু সারুখানি রাষ্ট্র
৯. বনু কারামান রাষ্ট্র
১৬. কাজী বুরহান উদ্দিন রাষ্ট্র
২১. রুম সালজুক রাষ্ট্র

এখন এই রাষ্ট্রগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পেশ করা হচ্ছে। [১]

[১] আনাতোলিয়ার এই সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্রের অবস্থা নিম্নোক্ত উৎসসমূহ থেকে নেওয়া হয়েছে:

আত-তারিখুল ইসলামি, মাহমুদ শাকির: ৮/৪৮ থেকে ৫৭; তারিখুদ দাওলাতিল উসমানীয়াহ, ইলমাজ: ১/৭৫ থেকে ৭৭।

তারিখ মিল্লাতে মুসলিমা

১. বনু কারাসি রাষ্ট্র: ৭০২ হিজরি থেকে ৭৩৬ হিজরি (১৩০৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩৩৫ খ্রিষ্টাব্দ)

এই ছোট রাষ্ট্রটি মারমারা সাগরের দক্ষিণে এবং এজিয়ান সাগরের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত ছিল। এর সর্বোচ্চ আয়তন ছিল চব্বিশ হাজার বর্গকিলোমিটার পর্যন্ত। এই রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ শাসকদের পরিচয় নিচে দেওয়া হলো:

- ১. কারাসি: এর প্রতিষ্ঠাতা “কারাসি” সেলজুক সুলতান দ্বিতীয় মাসউদের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। আনাতোলিয়া থেকে সেলজুকদের ক্ষমতা শেষ হতেই তিনি ৭০০ হিজরিতে “মিসিয়া” অঞ্চলে নিজের স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করেন এবং “কারাসি”কে নিজের রাজধানী নির্ধারণ করেন যা একটি উপকূলীয় শহর ছিল। এই রাষ্ট্রটি একটি নৌবহরেও সজ্জিত ছিল।
- ২. আজলান বেগ: “কারাসি”-র পর তার পুত্র আজলান বেগ তার স্থলাভিষিক্ত হন, যার উসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা উসমান খানের সাথে সুসম্পর্ক ছিল।
- ৩. তৈমুর খান: আজলানের পর তার পুত্র তৈমুর খান এখানকার শাসক হন। তৈমুর খানের পর তার দুই পুত্রের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়, যার ফলে উসমান খানের উত্তরসূরি ওরখান ৭৩৭ হিজরিতে এই রাষ্ট্রটিকে নিজের অধিকৃত অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। এটি আনাতোলিয়ার প্রথম মুসলিম রাষ্ট্র ছিল যা উসমানীয় সাম্রাজ্যের সাথে একীভূত হয়।

২. ইমারতে আইদিন: ৬৯৯ হিজরি থেকে ৮৫৯ হিজরি (১৩০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৪৫৫ খ্রিষ্টাব্দ)

এটি আনাতোলিয়ার পশ্চিমে ছিল। আইদিন (প্রাচীন নাম: কিজিল হিসার), বিরগি, আয়াসুলুগ এবং ইজমির এর গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল। এর সর্বোচ্চ আয়তন ছিল বিশ হাজার বর্গকিলোমিটার পর্যন্ত। এই রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ শাসকদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় হলো:

- ১. আইদিন: রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন “আইদিন”, যার পিতা মুহাম্মদ বেগ রুম সেলজুকদের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং উপকূলীয় ফ্রন্টের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। তার মৃত্যুর পর আইদিন তার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি মঙ্গোলদের আধিপত্য অপছন্দ করতেন, তাই রুম সেলজুকদের মঙ্গোলদের করদ রাজ্যে পরিণত হতে দেখে তিনি ৬৯৯ হিজরিতে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। ৭৩৪ হিজরি পর্যন্ত তিনি শাসন পরিচালনা করেন। এরপর তার মৃত্যু হয়।
- ২. মুহাম্মদ বিন আইদিন: এরপর তার পুত্র মুহাম্মদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছয় বছর শাসন করেন।
- ৩. উমর বেগ বিন মুহাম্মদ বিন আইদিন: ৭৪১ হিজরিতে মুহাম্মদ বিন আইদিনের পুত্র উমর বেগ শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি একটি শক্তিশালী নৌবহর তৈরি করেন এবং এজিয়ান সাগরের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেন। তার নৌ-মুজাহিদিনরা গ্রিস, থ্রেস এবং খ্রিস্টানদের অন্যান্য সামরিক দ্বীপগুলোতে সফল আক্রমণ চালাতে থাকেন। কিছু এলাকা তারা দখলও করেন।

উমর বেগ ৭৪৫ হিজরিতে ক্রুসেডারদের নৌবহরকে ভস্মীভূত করে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ইজমিরে একটি শক্তিশালী দুর্গ নির্মাণ করেন যা খ্রিস্টানদের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ৭৪৯ হিজরিতে তিনি ক্রুসেডারদের সাথে যুদ্ধরত অবস্থায় শহীদ হন।

- ৪. ঈসা বিন মুহাম্মদ বিন আইদিন: এরপর তার ভাই ঈসা শাসক হন। তিনি উসমানীয় সুলতান বায়েজিদ ইলদিরিমের আনুগত্য স্বীকার করে নেন। বায়েজিদ ইজমির তার জন্য ছেড়ে দেন এবং আশেপাশের এলাকাগুলো নিজের দখলে নিয়ে নেন। ঈসা ৭৯২ হিজরিতে...

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

...মৃত্যু বরণ করেন, যার পর ইজমিরও উসমানীয় সালতানাতের অংশে পরিণত হয়।

৫. মুসা বিন মুহাম্মদ বিন আইদিন: ৮০৫ হিজরিতে তৈমুর লঙের আক্রমণে ইজমির উসমানীয়দের হাত থেকে বেরিয়ে যায় এবং মোগলরা এখানে ঈসার পুত্র মুসাকে করদ শাসক নিযুক্ত করে।

৬. মুস্তফা বিন মুসা: কয়েক বছর পর মুসার পুত্র মুস্তফা এখানকার শাসক হন, তিনি উসমানীয়দের বশ্যতা স্বীকার করে ৮২৫ হিজরি পর্যন্ত এখানে শাসন করেন। এরপর আইদিন আমিরাত উসমানীয় সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

৩. বনু আরতনা রাষ্ট্র: ৭২৮ হিজরি থেকে ৭৮২ হিজরি (১৩২৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩৮০ খ্রিষ্টাব্দ)

এই রাষ্ট্রটি আনাতোলিয়ার পূর্বে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এর রাজধানী প্রথমে কায়সারিয়া এবং পরে সিওয়াস ছিল। আঙ্কারা, তোকাত, এরজিনজান, আমাসিয়া, সিনোপ, সামসুন এবং কুনিয়া এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই আমিরাত তখন প্রতিষ্ঠিত হয় যখন সেলজুকায়ে রুমের পতন ঘটে এবং আনাতোলিয়ার অধিকাংশ এলাকা পুরোপুরি মোগলদের হাতে চলে যায়। এমন পরিস্থিতিতে ৭১৭ হিজরিতে ইলখানি বাদশাহ আবু সাঈদ বাহাদুর খান বিখ্যাত মোগল জেনারেল চুপানের বংশধরদের মধ্য থেকে তৈমুর তাশ নামক এক কর্মকর্তাকে এখানকার শাসক নিযুক্ত করেন।

৭২৮ হিজরিতে তৈমুর তাশকে আনাতোলিয়া থেকে পালিয়ে মিশরে আশ্রয় নিতে হয়। যাওয়ার সময় তিনি নিজের স্থলে তার এক বিশ্বস্ত কর্মকর্তা “আরতনা”কে এই পদে স্থলাভিষিক্ত করেন। আবু সাঈদ বাহাদুর “আরতনা”কে এখানকার শাসনের অনুমতিপত্র প্রদান করেন।

৮৩৬ হিজরিতে আবু সাঈদ বাহাদুর খানের মৃত্যুর পর ইলখানি মোগলরা দুর্বল হয়ে পড়ে, ফলে সুযোগ বুঝে “আরতনা” এখানে স্বাধীন সরকার গঠন করেন। আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি প্রথমে তাবরিজের মোগল শাসক কুশাক বিন চুপানের সাথে আনুগত্য প্রকাশ করেন। এরপর মিশরের মামলুক সম্রাট নাসিরুদ্দিন মুহাম্মদ বিন কালাউনের সাথে আনুগত্যের সম্পর্ক স্থাপন করেন। আরতনার পর শাসনভার তার সন্তানদের হাতে চলে যায়।

৪. বনু হামিদ রাষ্ট্র: ৭০০ হিজরি থেকে ৭৯৩ হিজরি (১৩০১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩৯১ খ্রিষ্টাব্দ)

বনু হামিদ রাষ্ট্রটি কুনিয়ার পশ্চিমে “এগ্রিদির” শহরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এর প্রধান শাসকরা ছিলেন:

১. হামিদ বেগ: রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হামিদ বেগ নামক একজন তুর্কমেনি আমির। সেলজুকায়ে রুমের পতনের পর তিনি এখানে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন।

২. দুন্দার ফালাক উদ্দিন: তার পুত্র দুন্দার তার স্থলাভিষিক্ত হন যার উপাধি ছিল “ফালাক উদ্দিন”। তারই নামানুসারে এই রাষ্ট্রের রাজধানীর নাম “ফালাকাবাদ” রাখা হয়। তবে দুন্দার মোগল আমির তৈমুর তাশের হাতে পরাজিত হন। তিনি দুন্দারকে গ্রেফতার করে ৭২৪ হিজরিতে হত্যা করেন। এভাবে রাষ্ট্রের ওপর তার দখল মজবুত হয়।

৩. খিজির বিন দুন্দার: ৭২৮ হিজরিতে তৈমুর তাশকে পালিয়ে মিশরে যেতে হয় যার পর দুন্দারের পুত্র খিজির নিজের রাষ্ট্র...

...ফেরত নিয়ে নিলেন।

- ইসহাক বিন খিজর: খিজরের পর তার পুত্র ইসহাকের শাসনকাল আসে।
- ইলিয়াস বিন খিজর: এরপর ইসহাকের পুত্র ইলিয়াস ক্ষমতা লাভ করেন।
- কামাল উদ্দিন হুসাইন বিন ইসহাক: এরপর ইসহাকের দ্বিতীয় পুত্র কামাল উদ্দিন হুসাইন শাসন করেন। ৭৭৬ হিজরিতে কামাল উদ্দিন হুসাইন বনু করমানের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সুলতান মুরাদ আউয়ালের বশ্যতা স্বীকার করে নেন। ৭৯৩ হিজরিতে তার মৃত্যু হয় এবং এই রাষ্ট্র উসমানীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

৫. বনু আশরাফ রাষ্ট্র: ৬৯৭ হিজরি থেকে ৭৯৩ হিজরি (১২৮০ খ্রি. থেকে ১৩৯১ খ্রি.)

এই রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আয়তন ছিল ১৬ হাজার বর্গকিলোমিটার। উলুবোরলু, এগ্রিদির এবং হামিদাবাদ (ইস্পার্তা) ছিল এর প্রধান শহর। এতে নিম্নোক্ত শাসকরা শাসন করেছেন:

- সুলাইমান বিন আশরাফ: এই রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সেলজুক শাসক গিয়াসউদ্দিন মাসউদ সানির একজন কর্মকর্তা সাইফউদ্দিন সুলাইমান বিন আশরাফ। তবে তার সময়ে রাষ্ট্রটি আধা-স্বায়ত্তশাসিত ছিল।
- মুহাম্মদ মুবারিজ উদ্দিন: ৭০১ হিজরিতে সাইফউদ্দিন সুলাইমান মৃত্যুবরণ করলে সেলজুকদের ক্ষমতাও শেষ হয়ে গিয়েছিল। ফলে তার পুত্র মুহাম্মদ ‘মুবারিজ উদ্দিন’ উপাধি ধারণ করে একটি পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন।
- সুলাইমান শাহ বিন মুহাম্মদ মুবারিজ: এরপর তার পুত্র সুলাইমান শাহ তার স্থলাভিষিক্ত হন। মঙ্গোল আমির তৈমুর তাশ ৭২৮ হিজরিতে এই রাষ্ট্র দখল করে নেন, কিন্তু এর কিছুকাল পরেই তাকে মিশরে পালিয়ে যেতে হয় এবং বনু হামিদের খিজর বিন হামিদ এই রাষ্ট্রটি দখল করে নেন।

৬. বনু সারুখান রাষ্ট্র: ৬৯৯ হিজরি থেকে ৮১৩ হিজরি (১৩০০ খ্রি. থেকে ১৪১০ খ্রি.)

এই রাষ্ট্রটি তার উন্নতির চরম শিখরে ১৪ হাজার বর্গকিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এর প্রধান শাসকদের পরিচয় নিচে দেওয়া হলো:

- সারুখান: রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা সারুখান ছিলেন একজন তুর্কমেনি আমির, যিনি সেলজুক রুমের পতনের পর ৭০০ হিজরিতে উপকূলীয় শহর ‘লিডিয়া’ (মানিসা)-তে নিজের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি একটি নৌবহর গঠন করে জেনোয়ার খ্রিস্টান জলদস্যুদের আনাতোলিয়ার উপকূল থেকে বিতাড়িত করেন। তিনি আনাতোলিয়ার কিছু স্বাধীন রাষ্ট্রের সাথে উসমানীয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে জোট গঠন করেছিলেন। একইভাবে তিনি বাইজেন্টাইন রোমানদের সাথেও একটি বন্ধুত্বপূর্ণ চুক্তি করেছিলেন, তবে পরবর্তীতে এই চুক্তিটি ভেঙে যায়। ৭৪৬ হিজরিতে সারুখানের মৃত্যু হয়।
- ফখর উদ্দিন ইলিয়াস বিন সারুখান: সারুখানের পুত্র ফখর উদ্দিন ইলিয়াস ৭৬৭ হিজরি পর্যন্ত শাসন করেন।
- মুজাফফর উদ্দিন ইসহাক বিন ফখর উদ্দিন: ফখর উদ্দিনের পর তার পুত্র মুজাফফর উদ্দিন ইসহাক চেলবি শাসনের মসনদে...

...সামলে নিলেন। তিনি বনু কারমানকে সাথে মিলিয়ে নিলেন এবং উভয়ে উসমানীয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন কিন্তু তারা পরাজিত হলেন এবং সুলতান বায়েজিদ শান্তি হিসেবে বনু সারুখানের রাজ্যের কিছু অংশ কেড়ে নিলেন। ইসহাক চেলপি ৭৯০ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

- ৪. খিজির শাহ বিন মুজাফফর: মুজাফফরের পুত্র খিজির শাহ ৭৯২ হিজরি পর্যন্ত শাসন করেন। অবশেষে বায়েজিদ এই পুরো রাজ্যকে উসমানীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন, তবে তৈমুর লং বায়েজিদকে পরাজিত করে ৮০৫ হিজরিতে খিজির শাহকে তার রাজ্য ফিরিয়ে দেন।
- ৫. মুহাম্মদ চেলপি বিন খিজির: খিজির শাহের পর তার পুত্র মুহাম্মদ চেলপি শাসক হন, কিন্তু উসমানীয়রা ৮১৩ হিজরিতে তাকে নৈতিক অপরাধে লিপ্ত হওয়ার কারণে হত্যা করে এবং এই রাজ্য উসমানীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

৭. বনু মেনতেশা রাজ্য: ৬৭৯ হিজরি থেকে ৮২৯ হিজরি (১২৮০ খ্রি. থেকে ১৪২৬ খ্রি.)
এই রাজ্য “কারা”, “নাজিন” এবং “বালাত” অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর সর্বোচ্চ আয়তন ছিল ২৩ হাজার বর্গকিলোমিটার পর্যন্ত। এখানকার প্রধান শাসকদের পরিচয় নিচে দেওয়া হলো:

- ১. এখানকার প্রথম শাসক ছিলেন সেলজুকদের একজন উপকূলীয় আমির “হাজি”। তার আমলে রাজ্যটি আধা-স্বায়ত্তশাসিত ছিল।
- ২. মেনতেশা: হাজীর পর তার পুত্র “মেনতেশা” রুম সেলজুকদের দুর্বল পেয়ে এখানে স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। ৭৩০ হিজরিতে তার মৃত্যু হয়।
- ৩. ওরখান শুজাউদ্দিন: মেনতেশার পর তার পুত্র “ওরখান শুজাউদ্দিন” সিংহাসন আরোহণ করেন।
- ৪. ইব্রাহিম বিন ওরখান: এরপর ইব্রাহিম শাসক হন যার সাথে বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতার সাক্ষাৎ হয়েছিল।
- ৫. তাজউদ্দিন আহমদ গাজী বিন ইব্রাহিম: ইব্রাহিমের পর তার পুত্র তাজউদ্দিন আহমদ গাজী শাসক হন।
- ৬. মুহাম্মদ বিন ইব্রাহিম: আহমদের পর তার ভাই মুহাম্মদ শাসক হন।
- ৭. ইলিয়াস বিন মুহাম্মদ: মুহাম্মদ বিন ইব্রাহিমের পর তার পুত্র ইলিয়াস ক্ষমতা লাভ করেন যিনি উসমানীয় শাসক বায়েজিদ ইলদিরিমের সাথে দ্বন্দ্ব পরাজিত হন এবং ৭৯২ হিজরিতে পালিয়ে “সিনোপ”-এ চলে যান। ৮০৫ হিজরিতে তৈমুর লং-এর হাতে উসমানীয়দের পরাজয়ের পর তিনি পুনরায় নিজের শাসনভার গ্রহণ করেন।
- ৮. লাইস বিন ইলিয়াস: ৮২৩ হিজরিতে ইলিয়াসের মৃত্যুতে তার পুত্র লাইস শাসক হন। ৮২৯ হিজরিতে সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ এই রাজ্য দখল করে নেন এবং বনু মেনতেশাকে “তোকাত”-এ বন্দি করেন। এভাবে এই শাসনের অবসান ঘটে।

৮. বনু পারওয়ানা রাজ্য: ৬৭৬ হিজরি থেকে ৭২২ হিজরি (১২৭৭ খ্রি. থেকে ১৩২২ খ্রি.)
এই রাজ্য কৃষ্ণ সাগরের উপকূলীয় শহর “সিনোপ”-এ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেলজুক সুলতান ইজ্জুদ্দিন কায়কাউস ৬১১ হিজরিতে এটি দখল করেন কিন্তু কিছুকাল পর “ত্রাবজোন”-এর বাইজেন্টাইন শাসক এটি মুসলমানদের কাছ থেকে কেড়ে নেন। এর শাসকদের...

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

পরিচিতি নিম্নরূপ:

- ১. পারওয়ানা: সুলতান কিলিজ আরসালান চতুর্থের আমলে একজন সেলজুক আমির মুঈনুদ্দিন পারওয়ানা তাকে অনেক সাহায্য করেছিলেন, যার ফলে সুলতান তাকে ‘সিনোপ’ শহরের শাসনভার অর্পণ করেন। কিন্তু পারওয়ানা ভয় পাচ্ছিলেন যে সুলতান তাকে হত্যা করতে পারেন, তাই তিনি তার পুত্র মুঈনুদ্দিন মুহাম্মদকে এখানে নায়েব হিসেবে নিযুক্ত করেন। ৬৭৬ হিজরিতে পারওয়ানার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়।
- ২. মুঈনুদ্দিন মুহাম্মদ: এখন তার পুত্র মুঈনুদ্দিন মুহাম্মদ এখানকার শাসক হন। তিনি মঙ্গোলদের সাথে সন্ধি করে এখানে ৬৯৬ হিজরি পর্যন্ত শাসন করেন।
- ৩. মুহাজ্জিবুদ্দিন: মুঈনুদ্দিনের পুত্র মুহাজ্জিবুদ্দিন তার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনিও পিতার নীতি অনুযায়ী মঙ্গোলদের আনুগত্য স্বীকার করেন। ৭০০ হিজরিতে তার মৃত্যুর সাথে সাথে এই বংশের শাসনের অবসান ঘটে।

৯. বনু কারামান রাষ্ট্র: ৬২৮ হিজরি থেকে ৮৯২ হিজরি (১২৫০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৪৮৭ খ্রিষ্টাব্দ)

এই রাষ্ট্রটি আনাতোলিয়ার কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত ছিল। লারেন্দা (কারামান), কোনিয়া, এরকেলি এবং আরমেনাক ছিল এর গুরুত্বপূর্ণ শহর। এর শাসকদের পরিচিতি পেশ করা হলো:

- ১. কারিমুদ্দিন কারামান: এর প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট হলো, সেলজুক বাদশাহ আলাউদ্দিন কায়কোবাদ ‘আরমেনাক’ শহর জয় করার পর সেখানে পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে তুর্কমেনদের বসতি স্থাপন করান। ৬৫৪ হিজরিতে সুলতান কিলিজ আরসালান চতুর্থ একজন তুর্কমেন সরদার কারিমুদ্দিন কারামানকে সেখানকার শাসক নিযুক্ত করেন। ৬৬০ হিজরিতে তার মৃত্যু হয়।
- ২. মুহাম্মদ বেগ বিন কারামান: কারামানের পর তার পুত্র মুহাম্মদ (ওঘলু মুহাম্মদ বেগ প্রথম) তার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি ‘আরমেনাক’ শহরকে কেন্দ্র বানিয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করেন। ৬৭৫ হিজরিতে তিনি কোনিয়া দখল করেন, তবে ৬৭৬ হিজরিতে সুলতান গিয়াসুদ্দিন কায়খসরু তৃতীয়ের সাথে যুদ্ধে তিনি নিহত হন।
- ৩. মাহমুদ বিন কারামান: মুহাম্মদের পর তার ভাই মাহমুদ শাসক হন এবং তার সন্তানদের মধ্যে এই শাসন চলতে থাকে।
- ৪. আলাউদ্দিন: ৭৩৪ হিজরিতে উসমানীয় সুলতান মুরাদ প্রথম এখানকার শাসক আলাউদ্দিন কারামানের কন্যা নাফিসার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তা সত্ত্বেও বনু কারামান এবং উসমানীয়দের মধ্যে উত্তেজনা বজায় থাকে, যার ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হয় এবং আলাউদ্দিন বন্দি হন। তার কন্যা নাফিসার সুপারিশে বার্ষিক কর প্রদানের চুক্তিতে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। ৭৯৩ হিজরিতে তিনি পুনরায় বিদ্রোহ করেন এবং সুলতান বায়েজিদ ইলদিরিমের একজন জেনারেলের সাথে যুদ্ধে নিহত হন। তার পুত্রকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় এবং তার রাজ্যের অধিকাংশ উসমানীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।
- ৫. মুহাম্মদ বিন আলাউদ্দিন: তৈমুর লঙের আক্রমণের পর মুহাম্মদ বিন আলাউদ্দিন মুক্তি পান এবং তিনি নিজের রাজ্য সামলে সেখানে তৈমুর লঙের নামে মুদ্রা জারি করেন। এরপর নিজের রাজ্যকে বিস্তৃত করে তিনি ৮১২ হিজরিতে বনু গেরমিয়ান রাজ্যের ওপরও...

দখল করে নেয়। তবে ৮১৭ হিজরিতে উসমানীয় সম্রাট সুলতান মুহাম্মদ চালবি তাকে পরাজিত করেন, যার পর সে বন্দী হয়। তবে উসমানীয়রা তাকে ক্ষমা করে মুক্তি দেয়। মুহাম্মদ বিন আলাউদ্দিন মিশরে চলে যান এবং মামলুকদের সহায়তায় আবারও আনাতোলিয়ায় আক্রমণ করেন। কিন্তু তিনি পরাজিত হন এবং আবারও বন্দী হন। তাকে বন্দী হিসেবে মিশরে পাঠানো হয় যেখান থেকে তিনি আবারও পালিয়ে যান এবং ৮২৩ হিজরিতে আনাতোলিয়ায় ফিরে এসে আন্টালিয়া অবরোধ করেন। বছরের পর বছর ব্যর্থ অভিযানের পর এই দুর্ভাগা ৮২৪ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

- ৬. আলাউদ্দিন আলী: তার ভাই আলাউদ্দিন আলী, যিনি মিশরের মামলুকদের সাথে যুক্ত ছিলেন, তার স্থলাভিষিক্ত হন। তবে তার ভতিজা ইব্রাহিম বিন মুহাম্মদ এবং ঈসা বিন মুহাম্মদ তার বিরুদ্ধে চলে যান এবং সুলতান মুরাদ সানি-র অনুগত হন। সুলতান তার দুই বোনকে তাদের সাথে বিয়ে দেন এবং ঈসাকে রুমেলির গভর্নর নিযুক্ত করেন। এরপর সুলতান আলাউদ্দিন আলীর কাছ থেকে কারামানের সিংহাসন কেড়ে নেন এবং তার তৃতীয় বোনের সাথে তার বিয়ে দেন এবং তাকে সোফিয়ার গভর্নর নিযুক্ত করেন।
- ৭. ইব্রাহিম বিন মুহাম্মদ: কারামান রাজ্যের শাসনভার এখন ইব্রাহিমকে দেওয়া হয়। কিন্তু যখন ইব্রাহিম তার ছেলে ইসহাককে তার উত্তরসূরি করতে চাইলেন, তখন তার ভাইয়েরা তার সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন।
- ৮. পীর আহমদ: এই দ্বন্দ্ব পীর আহমদ, যিনি সুলতান মুহাম্মদ চালবির নাতি ছিলেন, ক্ষমতার মসনদে বিজয়ী হন। ইসহাক পালিয়ে আজারবাইজানের শাসক উজুন হাসানের কাছে সাহায্য চান এবং কোনিয়া দখল করেন। তবে সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ তাকে পরাজিত করে পীর আহমদকে সিংহাসন ফিরিয়ে দেন। পীর আহমদ কিছুকাল পর উসমানীয়দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন কিন্তু ৮৭৮ হিজরিতে তিনি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন এবং কোনিয়া উসমানীয় সাম্রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। কারামান আমিরাতের বাকি অংশে পীর আহমদ এবং তার ভাই কাসিম ৮৭৯ হিজরি পর্যন্ত যৌথভাবে শাসন করেন। অবশেষে তাদের দুজনের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। ৮৮০ হিজরিতে পীর আহমদের মৃত্যু হয়।
- ৯. কাসিম: একই বছর কাসিম উসমানীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরাজিত হন কিন্তু তিনি তার রাজ্য রক্ষা করতে সক্ষম হন। উসমানীয় শাহজাদা জমশিদ তার ভাই সুলতান বায়েজিদ সানি-র প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে কাসিমের কাছে আসেন এবং তার সাথে শাসনে শরিক হন। তবে কিছুকাল পর তিনি আনাতোলিয়া ছেড়ে রোডসের খ্রিস্টানদের কাছে আশ্রয় নেন। কাসিম সুলতান বায়েজিদ সানি-র সাথে সন্ধি করেন এবং ৮৮৮ হিজরিতে তার মৃত্যু পর্যন্ত শাসক হিসেবে থাকেন।
- ১০. মাহমুদ বিন তারঘুত: তার মৃত্যুর সময় তার কোনো পুত্র জীবিত ছিল না, তাই আমিররা দরবারের এক কারামানি আমির মাহমুদ বিন তারঘুতকে সিংহাসনে বসান। তবে কাসিমের নাতি তার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড়ান। উসমানীয় সুলতান বায়েজিদ সানি তাকে সমর্থন করেন, যার ফলে মাহমুদ বিন তারঘুত উসমানীয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং মিশরের মামলুকদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। অবশেষে ৮৯২ হিজরিতে উসমানীয়রা এই রাজ্য দখল করে নেয় এবং এভাবে বনু কারামানের শাসনের অবসান ঘটে।

কারামানের আমিররা সেলজুক রুমের প্রকৃত উত্তরাধিকারী হওয়ার দাবিদার ছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা কখনোই পুরো আনাতোলিয়া দখল করতে পারেননি। তবে তাদের চরম উন্নতির সময়ে অর্থাৎ ৭৬১ হিজরিতে (১৩৬০ খ্রিস্টাব্দ) তাদের রাজ্যের আয়তন ছিল প্রায় এক লক্ষ বর্গ কিলোমিটার।

পৌঁছে গিয়েছিল। বনু করমান তাদের সরকারি কাজকর্মে তুর্কি ভাষা ব্যবহার করত, যেখানে সেলজুক-এ রুম ফারসি ভাষাকে প্রচলিত করে রেখেছিল।

১০. বনু গেরমিয়ান রাষ্ট্র (বনু জুরমিয়ান): (৬৫৮ হিজরি হতে ৮৩২ হিজরি / ১২৬০ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৪২৯ খ্রিস্টাব্দ)

এই রাষ্ট্র সেলজুক-এ রুমের পতনের পর ৭০০ হিজরিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে এর কেন্দ্র ছিল মধ্য আনাতোলিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব শহর মালাতিয়ার কাছে, এরপর এই লোকেরা আঙ্কারার কাছে স্থানান্তরিত হয় এবং দক্ষিণ-পশ্চিম আনাতোলিয়ার কুতাহিয়াহ শহরকে নিজেদের কেন্দ্র বানিয়ে নেয় যা বাইজেন্টাইন রাষ্ট্রগুলোর সাথে সংযুক্ত ছিল। এই রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সীমানা চল্লিশ হাজার বর্গকিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

৭৯২ হিজরি পর্যন্ত এই সরকার টিকে ছিল, পরিশেষে বায়েজিদ ইলদিরিম এখানকার শাসক ইয়াকুব সানি-র ওপর রাগান্বিত হয়ে তাকে বন্দি করেন। তবে তিনি পালিয়ে গিয়ে তৈমুর লঙের সাথে যোগ দেন। তৈমুর লঙ ৮০৫ হিজরিতে আনাতোলিয়া অভিযানের পর তাকে এই রাষ্ট্র ফিরিয়ে দেন। তৈমুর লঙের মৃত্যুর পর তিনি উসমানীয়দের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন। তার কোনো সন্তান ছিল না, তাই ৮৩২ হিজরিতে মৃত্যুর পূর্বে তিনি নিজের অসিয়তনামায় উসমানীয় রাষ্ট্র ও সুলতান মুরাদ সানি-র নামে রাষ্ট্রটি লিখে দেন।

১১. বনু রমজান রাষ্ট্র: (৭৫৩ হিজরি হতে ১০১৭ হিজরি / ১৩৫২ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দ)

এটি সিরিয়া ও মিশরের মামলুক এবং উসমানীয়দের মাঝে একটি ‘বাফার স্টেট’ হিসেবে বিবেচিত হতো। এর সর্বোচ্চ আয়তন ছিল ৩৩ হাজার বর্গকিলোমিটার। প্রথমে এর কেন্দ্র ছিল ‘বুস্তান’। পরবর্তীতে ‘আদানা’ শহর এর রাজধানী হয়।

৯২২ হিজরি (১৫১৬ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত এটি মামলুকদের অধীনে ছিল। এরপর এটি উসমানীয়দের করদ রাজ্যে পরিণত হয়। এখানকার গুরুত্বপূর্ণ শাসকদের পরিচয় নিচে দেওয়া হলো:

- মীর আহমদ বিন রমজান: এর ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন একজন তুর্কমেন আমির শিহাবুদ্দিন আহমদ বিন রমজান (মীর আহমদ) ৭৭৯ হিজরিতে, যিনি মিশরের মামলুকদের মোকাবিলা করে তাদের পিছু হটিয়েছিলেন। এরপর মামলুক সুলতান ফারাজ বিন বারকুক তার মেয়ের সাথে তার বিয়ে দেন, ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং উভয়ে মিলে তৈমুর লঙের আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করেন। ৮১৮ হিজরিতে মীর আহমদ ছয় মাস অবরোধের পর তারসুস শহর জয় করেন। এর পরের বছর মীর আহমদের মৃত্যু হয়।
- ইব্রাহিম বিন মীর আহমদ: তার পুত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকার নিয়ে বেশ মতবিরোধ ছিল, তবে পরিশেষে তার পুত্র ইব্রাহিমকে উত্তরাধিকারী হিসেবে গ্রহণ করা হয়। তিনি শুরুতে মিশরের সুলতানের আনুগত্য করেন কিন্তু পুনরায় ৮৩০ হিজরিতে বিদ্রোহ করেন, যার ফলে তাকে গ্রেপ্তার করে মিশরে পাঠানো হয় যেখানে ৮৩১ হিজরিতে তাকে হত্যা করা হয়।
- ইজ্জুদ্দিন হামজা বিন ইব্রাহিম: তার স্থলে তার পুত্র ইজ্জুদ্দিন হামজা কিছুদিন শাসক ছিলেন। এরপর তার দুই চাচা: মুহাম্মদ...

এবং আলী, যিনি আদনা আমিরাতের কিছু অধীনস্থ শহরের আমিল ছিলেন, তার বিরোধী হয়ে যান।

- ৪. আরসালান বিন দাউদ বিন ইব্রাহিম: এই টানাপোড়েনের ফলে ইজুদ্দিনের পরিবর্তে আদনার শাসনভার আরসালান দাউদ বিন ইব্রাহিমকে দেওয়া হয়। ৮৮৫ হিজরিতে আরসালান দাউদ নিহত হন।
- ৫. খলিল বিন আরসালান: এখন তার পুত্র গারসুদ্দিন খলিল সিংহাসনে বসেন। এ পর্যন্ত আনাতোলিয়ার এই রাষ্ট্রটি মিশরের মামলুকদের অনুগত ছিল। কিন্তু খলিলের শাসনামলে এটি উসমানীয় সালতানাতের দিকে ঝুঁকে পড়ে। খলিল ৯১৬ হিজরি পর্যন্ত শাসক ছিলেন।
- ৬. মুহাম্মদ বিন আরসালান: এরপর তার ভাই মুহাম্মদ সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ইস্তাম্বুলেও যান। তিনি উসমানীয় সুলতান প্রথম সেলিমের সাথে মিশর অভিযানে অংশ নেন এবং ৯২৩ হিজরিতে কায়রোর বাইরে “রিদানিয়ার যুদ্ধে” নিহত হন।
- ৭. বেরি বেগ: এরপর তার ভাই বেরি বেগ ৯৭৬ হিজরি পর্যন্ত রাষ্ট্রের ওয়ালি ছিলেন।
- ৮. দরবেশ বিন বেরি বেগ: তার মৃত্যুর পর তার ছোট ছেলে দরবেশ, যিনি তারতুসের আমির ছিলেন, ছয় মাস শাসন করেন।
- ৯. ইব্রাহিম বিন বেরি বেগ: এরপর বড় ছেলে ইব্রাহিম (আইনতাবের শাসক) আধিপত্য বিস্তার করেন এবং ৯৯৭ হিজরি পর্যন্ত শাসক ছিলেন।
- ১০. মুহাম্মদ বিন ইব্রাহিম: এরপর তার পুত্র মুহাম্মদ সিংহাসনে বসেন। অবশেষে ১০১৭ হিজরিতে বনু রমজানের শাসনের অবসান ঘটে।

১২. রিয়াসাতে বনু জুল কাদির: ৭৭৯ হিজরি থেকে ৯২৮ হিজরি (১৩৭৭ খ্রি. থেকে ১৫২২ খ্রি.)

এই রাষ্ট্রটি “বুস্তান” এবং এর পার্শ্ববর্তী শহরগুলোর সমন্বয়ে গঠিত ছিল। সিরিয়া ও মিশরের মামলুক এবং উসমানীয় রাষ্ট্রের মধ্যে এটি একটি আড়াল হিসেবে কাজ করত। ১৩৯৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এটি মামলুকদের অধীনে ছিল, এরপর উসমানীয়দের করদ রাজ্যে পরিণত হয়। তবে মাঝেমধ্যে এর আনুগত্য পরিবর্তিত হতো। এই পরিবারটি নিজেদের পারস্যের সাসানীয় বংশের সাথে সম্পর্কিত বলে দাবি করত, কিন্তু গবেষকরা তাদের তুর্কমেনি হিসেবে গণ্য করেছেন। তারা চেঙ্গিস খানের আক্রমণের সময় হিজরত করে আনাতোলিয়ায় এসেছিল। এখানকার গুরুত্বপূর্ণ শাসকদের পরিচিতি নিচে দেওয়া হলো:

- ১. জয়নুদ্দিন বিন জুল কাদির: এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আমির জুল কাদির, যার পুত্র জয়নুদ্দিন বুস্তান জেলায় জায়গির লাভ করেন। ৭৪০ হিজরিতে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং চল্লিশ বছর শাসন করার পর ৭৮০ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।
- ২. খলিল বিন জয়ন: তার পুত্র খলিল মারআশ এবং মালাতিয়াকেও রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করেন। তবে তার ভাই ইব্রাহিম, যিনি “খারপুত”-এর আমির এবং মিশরের মামলুকদের সমর্থক ছিলেন, তাকে হত্যা করেন।
- ৩. সুলি বিন জয়ন: শূন্য সিংহাসনে তাদের আরেক ভাই “সুলি” আসীন হন, যিনি একজন উসমানীয় আমির মুহাম্মদ চেলবির শ্বশুর ছিলেন এবং উসমানীয় সালতানাতের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। কিন্তু ইব্রাহিম ৮০০ হিজরিতে তাকেও হত্যা করেন।
- ৪. নাসিরুদ্দিন বিন জয়ন: তবে দুই ভাইকে হত্যা করা সত্ত্বেও তিনি ক্ষমতা পাননি এবং এবার ক্ষমতার মসনদ তার...

তারিখ মিল্লাতে ইসলামিয়া

চতুর্থ খণ্ড

এর আরও এক ভাই নাসিরুদ্দিন মুহাম্মদকে দেওয়া হলো। সে একজন অভিজ্ঞ সৈনিক ছিল, যে তার রাষ্ট্রকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিয়েছিল এবং এই মর্যাদা রক্ষার জন্য সে বনু কারামান, উসমানীয় এবং মামলুক এই তিন পক্ষের সাথেই লড়াই করতে থাকে। ৮০৩ হিজরিতে তৈমুরের আক্রমণের মোকাবিলায় সে বীরত্বের সাথে লড়েছিল, তবে শেষ পর্যন্ত তাকে নতি স্বীকার করতে হয়। তৈমুরের প্রত্যাবর্তনের পর সে আবারও স্বাধীন হয়ে যায়।

শীঘ্রই উসমানীয় সুলতান মুহাম্মদ চেলবির সাথে তার যুদ্ধ শুরু হয়। আক্ষারার কাছে ৮১৫ হিজরিতে এক ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। নাসিরুদ্দিন মুহাম্মদের রাষ্ট্র পিছু হটতে বাধ্য হয়। এখন সে আনুগত্য প্রকাশ করে মিশরের মামলুকদের কাছে সাহায্য চাইল। মামলুকরা তাকে কায়সারিয়া দুর্গ দিয়ে দিল। তবে শীঘ্রই উসমানীয়রা এই দুর্গটি ছিনিয়ে নিল। নাসিরুদ্দিন মুহাম্মদ এটি দেখে মামলুকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে উসমানীয়দের সাথে যোগ দিল। সুলতান মুরাদ সানি তাকে কায়সারিয়া ফেরত দিয়ে দিলেন। নাসিরুদ্দিন মুহাম্মদ আবারও মামলুকদের সাথে যুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল এবং কায়রো পৌঁছে গেল। নিজ দেশে ফিরে আসার পর ৮৩৬ হিজরিতে তার মৃত্যু হয়।

৫. সুলাইমান বিন নাসিরুদ্দিন: তার পর তার ছেলে সুলাইমান, যে মালতিয়ার আমির ছিল, সিংহাসনে বসল। সে তার মেয়ে মুকাররামাকে সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহের সাথে বিবাহ দিয়ে উসমানীয়দের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করল। ৮৫৮ হিজরিতে তার মৃত্যু হয়।

৬. আরসালান বিন সুলাইমান: এখন তার ছেলে আরসালান সিংহাসনে বসল। আজারবাইজানের শাসক উজুন হাসান তার বিরুদ্ধে আক্রমণ করে “খারপুত” দখল করে নিল। আরসালান মামলুকদের কাছে সাহায্য নিতে কায়রো চলে গেল। ৮৭০ হিজরিতে একটি মসজিদে তাকে হঠাৎ হত্যা করা হয়।

৭. শাহ সওয়ার বিন সুলাইমান: তার শূন্য সিংহাসনে উসমানীয়রা তার ভাই শাহ সওয়ারকে বসাল, অন্যদিকে মামলুকরা তার অন্য ভাই শাহ বুদানকে বসানোর চেষ্টা করল। শাহ বুদান পরাজিত হয়ে মিশরে আশ্রয় নিল। মামলুকরা তাদের চাচা রুস্তম বিন নাসিরুদ্দিন মুহাম্মদকে সিংহাসনে বসানোর সিদ্ধান্ত নিল, এভাবে এক টানাপোড়েন শুরু হলো। ৮৭২ হিজরিতে শাহ সওয়ার রুস্তম ও মামলুকদের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করল, কিন্তু ৮৭৬ হিজরিতে আইন তাব-এর যুদ্ধে সে পরাজিত হলো, তাকে বন্দী করে মিশরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হলো।

৮. শাহ বুদান বিন সুলাইমান: তার স্থলে শাহ বুদানকে সিংহাসনে বসানো হলো। উসমানীয়রা এর জবাবে তার ভাই বোজকুর্ত আলাউদ্দৌলার শক্তিকে সামনে নিয়ে এল, যার ফলে ৮৮৪ হিজরিতে শাহ বুদান আবারও পালিয়ে মিশরে চলে গেল।

৯. আলাউদ্দৌলা: আলাউদ্দৌলা ক্ষমতা লাভ করে মিশরের মামলুকদের অনুগত হিসেবে সম্পর্ক স্থাপন করল, যার ফলে মামলুকরা তাকে শাহ বুদানকে হত্যার জন্য প্ররোচিত করল। শাহ বুদানকে হত্যার পর আলাউদ্দৌলা আবারও উসমানীয়দের সাথে যুক্ত হলো। সে তার মেয়ে আয়েশাকে সুলতান বায়েজিদ ইলদিরিমের সাথে বিবাহ দিল, যার গর্ভে সুলতান সেলিম আউয়াল জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু কিছুকাল পর আলাউদ্দৌলা উসমানীয়দের বিরোধী হয়ে গেল। পারস্পরিক যুদ্ধে আলাউদ্দৌলা পরাজিত হলো এবং ৯২১ হিজরিতে তাকে গ্রেপ্তার করে হত্যা করা হলো। তার মাথা কেটে তার নাতি সুলতান সেলিম আউয়ালের সামনে পেশ করা হলো।

১০. আলী বিন শাহ সওয়ার: উসমানীয়রা তার স্থলে আলী বিন শাহ সওয়ারকে সিংহাসনে বসাল এবং রাজ্যে উসমানীয় সুলতানের খুতবা...

জারি করা হয়েছিল। আলী বিন শাহ সওয়ার সুলতান সেলিম আউয়ালের মিশরের অভিযানেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ৯২৮ হিজরিতে সুলতান সুলাইমান কানুনির আদেশে তাকে হত্যা করা হয়। এর সাথেই বনু ঘিল কাদিরের শাসনের সমাপ্তি ঘটে। এই রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আয়তন ছিল সত্তর হাজার বর্গকিলোমিটার।

(১৩) বনু জান্দার রাষ্ট্র (বনু আসফান্দিয়ার, বনু চুপান): ৬৯০ হিজরি থেকে ৮৬৬ হিজরি (১২৯১ খ্রি. থেকে ১৪৬১ খ্রি.)

এই রাষ্ট্র আনাতোলিয়ার উত্তর-পশ্চিম জেলা ‘কাস্তামোন্সু’-তে প্রতিষ্ঠিত ছিল, যার সীমানা বাইজেন্টাইনদের সাথে মিলিত ছিল। আফলানি এবং সিনোপ-ও এর গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হুসামুদ্দিন চুপান বেগ, যিনি নিজেকে বনু মাখজুম বলতেন এবং হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর বংশধর হওয়ার দাবিদার ছিলেন। তার বংশধররা এখানে শাসন করেন যাদের বনু জান্দার বলা হতো। ৭৯৫ হিজরিতে এখানে বায়েজিদ ইলদিরিম দখল করে নেন। তবে তৈমুর লঙের কাছে পরাজিত হওয়ার পর এই এলাকাও হাতছাড়া হয়ে যায় এবং বনু জান্দারের একজন আমির আসফান্দিয়ার এখানে আধিপত্য বিস্তার করে ৮৪৭ হিজরি পর্যন্ত শাসন পরিচালনা করেন। সুলতান মুরাদ সানি তার মেয়েকে বিয়ে করেন যার ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়। আসফান্দিয়ারের পর এই রাষ্ট্র ‘বনু আসফান্দিয়ার’ নামে পরিচিতি লাভ করে। সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ ৮৬৬ হিজরিতে কাস্তামোন্সু দখল করে নেন এবং বনু আসফান্দিয়ারের শাসনের অবসান ঘটে।

(১৪) বনু সাহেব আতা রাষ্ট্র: ৬৭৬ হিজরি থেকে (১২৭৭ খ্রি.)

ফখরুদ্দিন আলী বিন হুসাইন রুম সেলজুকদের মহান উজিরদের একজন ছিলেন। রাজধানী কোনিয়াতে তাকে ‘সাহেব আতা’ বলা হতো। যখন মঙ্গোলরা রুম সেলজুকদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করল, তখন সাহেব আতা ‘নাদের’ নামক একটি গ্রামে নির্জনতা অবলম্বন করেন এবং তার সম্পদ ‘কারাহিসার’ দুর্গে সুরক্ষিত করেন। সাহেব আতা ৬৮৪ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন, যেখানে তার ছেলেরা তার কয়েক বছর আগে ৬৭৬ হিজরির একটি যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন। সাহেব আতার মৃত্যুর পর তার নাতিরা ‘কারাহিসার’-এর দুর্গ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরিশেষে বনু কারামান তাদের কাছ থেকে এই দুর্গটি ছিনিয়ে নেয়।

(১৫) বনু তেক্কে রাষ্ট্র: ৬৯৯ হিজরি থেকে ৮২৬ হিজরি (১৩০০ খ্রি. থেকে ১৪২৩ খ্রি.)

এই রাষ্ট্র আনাতোলিয়ার দক্ষিণ শহর ‘আনতালিয়া’ এবং এর আশপাশের এলাকায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন একজন তুর্কমেনি অফিসার তেক্কে পাশা, যিনি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদে প্রসিদ্ধ ছিলেন। রুম সেলজুকরা মঙ্গোলদের সামনে অসহায় হয়ে পড়ার পর তিনি ৭০০ হিজরিতে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ৭৯৫ হিজরিতে বায়েজিদ এটি দখল করে নেন, কিন্তু কয়েক বছর পর তৈমুর লঙ তাদের কাছ থেকে এটি ছিনিয়ে নেন। ৮৩০ হিজরিতে এটি পুনরায় উসমানীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এর সর্বোচ্চ আয়তন ছিল চৌদ্দ হাজার বর্গকিলোমিটার।

১৬. কাজী বুরহান উদ্দিনের রাষ্ট্র: ৭৮২ হিজরি থেকে ৮০১ হিজরি (১৩৮০ খ্রি. থেকে ১৩৯৯ খ্রি.)

এটি পূর্ব আনাতোলিয়ার বিশাল শহর সিওয়াসে প্রতিষ্ঠিত ছিল, যা কাজী বুরহান উদ্দিন “বনু আরতনা” থেকে লাভ করেছিলেন। এটি কিছুকাল মিশরের মামলুকদের করদরাজ্য ছিল। পরিশেষে বায়েজিদ ইয়ালদারাম একে উসমানীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

১৭. বনু তাজ উদ্দিনের রাষ্ট্র: ৭০৭ হিজরি থেকে ৮১৮ হিজরি (১৩০৮ খ্রি. থেকে ১৪১৫ খ্রি.)

এর আয়তন ছিল বারো হাজার বর্গকিলোমিটার। এর কেন্দ্র ছিল “নিকসার”। মুহাম্মদ চেলপির যুগে এটি বিজিত হয়।

১৮. বনু ইনানজ “উমারা-এ-দেনিজলি” রাষ্ট্র: ৬৭৬ হিজরি থেকে ৭৯৬ হিজরি (১২৭৬ খ্রি. থেকে ১৩৬৮ খ্রি.)

এরা বনু কারমিয়ানের একটি শাখা ছিল। তাদের প্রধান শহর ছিল লাদিক (দেনিজলি)। তাদের রাষ্ট্র আট হাজার বর্গকিলোমিটার বিস্তৃত ছিল। সুলতান মুরাদ সানি ৮৩২ হিজরিতে একে উসমানীয় সাম্রাজ্যের অংশে পরিণত করেন।

১৯. কুতলু শাহলার রাষ্ট্র: ৭৪০ হিজরি থেকে ৭৯৫ হিজরি (১৩৪০ খ্রি. থেকে ১৩৯৩ খ্রি.)

এর আয়তন ছিল পাঁচ হাজার বর্গকিলোমিটার। এর কেন্দ্র ছিল “আমাসিয়া”। বায়েজিদ ইয়ালদারাম ৭৯৫ হিজরিতে এটি জয় করেন।

২০. আক কয়ুনলু রাষ্ট্র:

এই আমিরাত দিয়ার বকর থেকে আমদ এবং মারদিন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্রথম সেলিম ৯১২ হিজরিতে এটি জয় করেন। [১]

২১. সেলজুকায়ে রুম রাষ্ট্র:

এটি আনাতোলিয়ার সবচেয়ে বড় মুসলিম রাষ্ট্র ছিল। গুরুত্বের কারণে এর আলোচনা সামনে বিস্তারিতভাবে আসছে।

অমুসলিম রাষ্ট্রসমূহ

আনাতোলিয়ায় বাইজেন্টাইন রোমের অধীনে কিছু খ্রিস্টান সরকারও প্রতিষ্ঠিত ছিল, যার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র ছিল দুটি:

• ১. ইজনিক (বাইজেন্টাইন)

• ২. ট্রাবজোন তাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

[১] আনাতোলিয়ার এই সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্রের বিবরণ নিম্নোক্ত উৎসসমূহ থেকে নেওয়া হয়েছে: আত-তারিখুল ইসলামি, মাহমুদ শাকির: ৮ / ৩৮ থেকে ৫৭; তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ: ১ / ৭৫ থেকে ৭৭।

(১) ইজনিক (বাইজান্টিয়াম):

দ্বাদশ শতাব্দী ঈসাবীর শেষভাগে বাইজান্টিয়াম রোমের কেন্দ্র ইস্তাম্বুল তীব্র অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ষড়যন্ত্র এবং বিদ্রোহের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিল। অবশেষে পোপের পৃষ্ঠপোষকতায় ইউরোপীয় ক্রুসেডার বাহিনী ৬০০ হিজরি (১২০৩ খ্রিষ্টাব্দ) সালে ইস্তাম্বুলে আক্রমণ করে বাইজান্টিয়ামদের কাছ থেকে সিংহাসন ছিনিয়ে নেয় এবং সেখানে একজন ল্যাটিন রাজপুত্র বন্ডউইন ডি ফ্ল্যান্ডার্সকে কায়সার হিসেবে সিংহাসনে বসায়। ৬০২ হিজরি (১২০৬ খ্রিষ্টাব্দ) সালে কায়সার বন্ডউইন ডি ফ্ল্যান্ডার্স বুলগেরিয়ার সাথে যুদ্ধে নিহত হন এবং তার ভাই হেনরি কায়সার হন।

এদিকে পলাতক বাইজান্টিয়াম রাজপুত্রদের মধ্যে একজন সাহসী ব্যক্তি থিওডোর লাসকারিস ইস্তাম্বুল প্রণালীর ওপারে আনাতোলিয়ার উত্তর-পশ্চিমে ইজনিক শহর দখল করেন এবং সেখানে একটি নতুন বাইজান্টিয়াম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন যাকে ‘বাইজান্টিয়াম’ বা ‘ইজনিক’ বলা হতো। এটি আনাতোলিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী খ্রিস্টান ঘাঁটি ছিল, যার সাথে রুমের সেলজুকদের কখনো যুদ্ধ আবার কখনো সন্ধি হতো। থিওডোর ৬১৯ হিজরি (১২২২ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত শাসন করে মৃত্যুবরণ করেন এবং তার স্থলে জন ৩য় ভাটাতজেস ৬৫২ হিজরি (১২৫৪ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত শাসন করেন। এরপর তার পুত্র লাসকারিস ২য় চার বছর শাসন করেন এবং অকাল যৌবনেই মৃত্যুবরণ করেন। যেহেতু তার উত্তরাধিকারী নাবালক ছিল, তাই সালতানাতের নায়েব মাইকেল (মিশেল), যিনি একই পরিবারের একজন চতুর ব্যক্তি ছিলেন, ৬৫৭ হিজরি (১২৫৯ খ্রিষ্টাব্দ) সালে ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নেন [১]। পরের বছর তিনি ইস্তাম্বুলে আক্রমণ করে ল্যাটিন কায়সারকে পরাজিত করেন এবং নিজেই ইস্তাম্বুলের সিংহাসন গ্রহণ করে কায়সার হন।

৬৮১ হিজরি (১২৮২ খ্রিষ্টাব্দ) সালে মাইকেলের মৃত্যুর পর বাইজান্টিয়াম রাষ্ট্র টালমাটাল হতে শুরু করে। এই সময়েই উসমানীয়দের উত্থান ঘটে। যেহেতু উসমানীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা আরতুগ্রুলের জায়গির এই এলাকাতেই ছিল, তাই উসমানীয়দের শুরু থেকেই ইজনিক রাষ্ট্রের সাথে মোকাবিলা করতে হয় এবং তাদের মধ্যে ক্রমাগত যুদ্ধ চলতে থাকে। মাইকেলের মৃত্যুর পর উসমানীয়রা দ্রুত বাইজান্টিয়ামের বিভিন্ন দুর্গ জয় করে, এমনকি সুলতান ওরহানের যুগে ইজনিকসহ সমস্ত শহর বিজিত হয় [২]।

(২) ট্রাবজোন:

৬০০ হিজরি (১২০৩ খ্রিষ্টাব্দ) সালে ইতালীয়দের ইস্তাম্বুল দখলের পর, অন্য একজন বাইজান্টিয়াম রাজপুত্র ‘অ্যালেক্সিয়াস কমেনোস’ আনাতোলিয়া এবং আর্মেনিয়ার সংযোগস্থলে কৃষ্ণ সাগরের তীরে অবস্থিত বিখ্যাত শহর ‘ট্রাবজোন’-এ পৌঁছান এবং সেখানে দখলদারিত্ব কায়েম করে একটি নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন যা ‘বাতুম’ থেকে ‘এরেগলি’ এবং কিজিলিরমাক নদীর বদ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তবে শীঘ্রই এই সালতানাতের সাথে রুমের সেলজুকদের যুদ্ধ শুরু হয় এবং ইজুদ্দিন কায়কাউস ৬১১ হিজরি (১২১৪ খ্রিষ্টাব্দ) সালে এর বিখ্যাত বন্দর সিনোপসহ একাধিক...

[১] তারিখ-ই-উসমানি, প্রফেসর ইসমাইল হাক্কি উজুনচারশিলি: ১/৩৯ থেকে ৪৩, ফারসি অনুবাদ ড. ইরাজ নোবখত, কায়হান পাবলিকেশন্স, ১৩৬৮ হিজরি।

[২] তারিখ-ই-উসমানি, ইসমাইল হাক্কি উজুনচারশিলি: ১/১৫৩, ১৫৪।

দুর্গগুলো দখল করে নেওয়া হলো, যার পর ট্রাবজোন রাষ্ট্র সেলজুক রুমকে কর প্রদান করতে শুরু করল।

সেলজুকদের সাথে ট্রাবজোনের আচরণ কখনো আনুগত্যপূর্ণ আবার কখনো বৈরী ছিল। সেলজুকরা শক্তিশালী হলে তারা কর প্রদান করত এবং কখনো তাদের মধ্যে দুর্বলতার লক্ষণ দেখা দিলে তারা স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে দিত। সপ্তম হিজরি শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে যখন তাতারদের উত্থান ঘটল, তখন সেলজুক রুমের মতো ট্রাবজোন রাষ্ট্রও ইলখানি তাতারদের করদ রাজ্যে পরিণত হলো।

সপ্তম হিজরি শতাব্দীর শেষের দিকে যখন ইলখানি তাতারদের পতন শুরু হলো, তখন ট্রাবজোনের রাজা দ্বিতীয় ইউয়ানিস (১২৬৬-১২৯৭ খ্রি.) জেনোয়ার খ্রিস্টান বণিকদের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি করেন, যার ফলে এই বণিকরা রাষ্ট্রের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। ৭৩২ হিজরি (১৩৩২ খ্রি.) সালে ট্রাবজোন এবং আনাতোলিয়ার তুর্কমেন আমিরদের মধ্যে উত্তেজনা বাড়তে থাকে, যার ফলে ৭৪৭ হিজরি (১৩৪৬ খ্রি.) সালে এই রাষ্ট্রের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শহর ‘মানিসা’ তুর্কমেনদের দখলে চলে যায়। তৃতীয় অ্যালেক্সিওস (১৩৪৯-১৩৯০ খ্রি.) তার পতনোন্মুখ সরকারকে বাঁচাতে নিজের বোন রাজকুমারী মারিয়া এবং তার চার কন্যাকে তুর্কমেন আমিরদের সাথে বিবাহ দিয়ে কিছু সময়ের জন্য নিজের সাম্রাজ্য রক্ষা করেন, কিন্তু এর ফলে তুর্কমেন আমিররা ট্রাবজোনের অধিকাংশ অঞ্চলের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে ফেলে। এখন ট্রাবজোন রাষ্ট্র পূর্ব-পশ্চিমে ‘বাতুম’ থেকে ‘গিরেসুন’ এবং উত্তর-দক্ষিণে ‘আইবোর্ড’ থেকে পাহাড়ি অঞ্চল পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল।

উসমানীয়রা এই রাষ্ট্রের প্রতি অনেক দেরিতে মনোযোগ দেয়। সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ এর ওপর একটি আক্রমণ চালিয়েছিলেন যা ব্যর্থ হয়। অবশেষে ৮৬৬ হিজরি (১৪৬২ খ্রি.) সালে সুলতান মুহাম্মদ ফাতিহ এটি জয় করেন। [১]

[১] ইসমাইল উজুন হাক্কি রচিত তারিখ-ই-উসমানি: ২/৫১ থেকে ৫৬।

সালাজিকা-এ-রুমের ওপর এক নজর

সেই সময়ে আনাতোলিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম রাষ্ট্র ছিল রোমের সেলজুকদের (সালাজিকা-এ-রুম), যার কেন্দ্র ছিল কোনিয়া। যেহেতু উসমানীয় তুর্কিদের শাসন রোমের সেলজুকদের প্রতিনিধিত্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাই এখানে রোমের সেলজুকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া জরুরি। এই সালতানাত বাইজেন্টাইন রোমান সাম্রাজ্যের সেই এলাকাগুলোর ওপর গঠিত ছিল যা খুলাফায়ে রাশেদিন, বনু উমাইয়া এবং বনু আব্বাসের যুগে জয় করা হয়েছিল। হিজরি পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এই এলাকাগুলো সেলজুকরা জয় করে নেয়। শুধুমাত্র তাদের পশ্চিম অংশ বাকি রয়ে গিয়েছিল যেখানে সেলজুকদের কাছে পরাজিত হওয়া আর্মেনীয় খ্রিস্টানরা নিজেদের রাষ্ট্র কায়েম করেছিল, এই এলাকাটি বর্তমানে কিলিকিয়া নামে পরিচিত।

কুতুলমিশ বিন ইসরাঈল:

রোমের সেলজুকদের আদি পুরুষ ছিলেন সেলজুক বংশের একজন সরদার কুতুলমিশ (বিন ইসরাঈল বিন সেলজুক), যিনি “শিহাবুদ দৌলা” উপাধিতে পরিচিত ছিলেন। তিনি সেলজুক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা তুঘরিল বেগের শাসনামলে আজারবাইজানের শাসক নিযুক্ত হন এবং তুর্কমেন গোত্রগুলোকে সংগঠিত করে আনাতোলিয়ার ওপর আক্রমণ শুরু করেন এবং বেশ কিছু এলাকা জয় করে নেন।

তুঘরিল বেগের মৃত্যুর পর কুতুলমিশ ইরান দখলের চেষ্টা করেন, যার ফলে নতুন সেলজুক সুলতান আল্প আরসালানের সাথে তার দ্বন্দ্ব শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত কুতুলমিশ নিহত হন এবং তার ছেলেরা বন্দি হন। এটি ৪৫৫ হিজরি (১০৬৩ খ্রিস্টাব্দ) সালের ঘটনা। পরবর্তীতে আল্প আরসালান তার উজির নিজামুল মুলক তুসির পরামর্শে কুতুলমিশের ছেলদের মুক্ত করে আনাতোলিয়ার বিজিত এলাকাগুলোতে মোতায়ন করে দেন। [১]

(১) সুলাইমান বিন কুতুলমিশ:

৪৬৪ হিজরি (১০৭১ খ্রিস্টাব্দ) সালে মালাজকার্ড নামক স্থানে আল্প আরসালানের সাথে রোমান সম্রাট রোমানোসের ঐতিহাসিক যুদ্ধ হয় যাতে সম্রাট বন্দি হন। কুতুলমিশের ছেলেরা: সুলাইমান শাহ এবং মনসুর এই যুদ্ধে অত্যন্ত বীরত্বের পরিচয় দিয়ে বিজয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাই আল্প আরসালান খুশি হয়ে সুলাইমান শাহকে আনাতোলিয়ার বিজিত এলাকাগুলোর গভর্নর নিযুক্ত করেন এবং তাকে পুরো আনাতোলিয়া বিজয়ের দায়িত্ব অর্পণ করেন।

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, সাইয়েদ মুহাম্মদ, পৃষ্ঠা ৪৭, ৪৮।

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

আবুল আরসালানের পর মালিক শাহের শাসনামলেও সুলাইমানের এই অবস্থান বজায় ছিল এবং তিনি আনাতোলিয়ায় একের পর এক বিজয় অর্জন করতে থাকেন। তিনি কোনিয়া জয় করে একে নিজের কেন্দ্র হিসেবে নির্ধারণ করেন। ৪৭০ হিজরিতে (১০৭৭ খ্রিষ্টাব্দে) তিনি মালিক শাহ থেকে আলাদা হয়ে এখানে স্বায়ত্তশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠা করেন এবং ‘নিকেয়া’ (ইজনিক)-কে নিজের কেন্দ্র বানান। ৪৭১ হিজরিতে (১০৭৮ খ্রিষ্টাব্দে) তিনি বাইজেন্টাইন শহর ‘নিকেয়া’ (ইজনিক) এবং ‘নিকোমিডিয়া’ (ইজমিত) জয় করে নেন। অবশেষে তিনি অগ্রসর হতে হতে মারমারা সাগরের উপকূল পর্যন্ত পৌঁছে যান যেখান থেকে কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীর পরিষ্কার দেখা যেত। এই সমস্ত বিজিত এলাকা তিনি রোমানদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন, তাই তার পরিবারকে সেলজুক-ই-রুম বলা হতো।

সুলাইমানের বিজয়ের একটি বড় কারণ ছিল এই যে, তিনি আনাতোলিয়ায় আগত তুর্কমেন উপজাতিদের মধ্যে জিহাদের চেতনা ফুঁকে দিয়েছিলেন এবং তাদের বাইজেন্টাইন রোমের মোকাবিলায় দাঁড় করিয়েছিলেন। দ্বিতীয় কারণ ছিল এই যে, বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার শিকার ছিল, তাই তারা আনাতোলিয়ায় তাদের অধিকৃত অঞ্চলগুলো পুরোপুরি রক্ষা করতে অক্ষম ছিল।

৪৭৭ হিজরিতে সুলাইমান দক্ষিণের দিকে অগ্রসর হন এবং আন্তাকিয়া জয় করেন, যার পর তিনি আলেপ্পো অবরোধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। সিরিয়ার সেলজুক বংশের প্রতিষ্ঠাতা তুতুশ প্রথম তার এলাকা রক্ষার জন্য ময়দানে নামেন। ৪৭৮ হিজরিতে (১০৮৬ খ্রিষ্টাব্দে) সুলাইমান ও তুতুশের মধ্যে যুদ্ধ হয় যাতে সুলাইমান নিহত হন। মালিক শাহ তার উত্তরাধিকারী কিলিজ আরসালানের সিংহাসন আরোহণ গ্রহণ করেননি বরং তাকে ইরানে তলব করে বন্দি করে রাখেন। [১]

২. কিলিজ আরসালান:

৪৮৫ হিজরিতে (১০৯২ খ্রিষ্টাব্দে) মালিক শাহের মৃত্যু হলে তার উত্তরসূরি বারকিয়ারুক কিলিজ আরসালানকে আনাতোলিয়ার গভর্নর নিযুক্ত করেন। কিলিজ আরসালান একজন দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ মানুষ ছিলেন। তিনি কোনিয়াকে কেন্দ্র বানিয়ে তার পিতার সালতানাতকে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং সমস্ত এলাকা পুনরায় জয় করেন। তবে ৪৯০ হিজরিতে (১০৯৭ খ্রিষ্টাব্দে) তাকে প্রথম ক্রুসেড যুদ্ধে আসা ইউরোপীয় বাহিনীর মোকাবিলা করতে হয়। এই বাহিনীগুলো এশিয়া মাইনর হয়ে ফিলিস্তিনের দিকে যাচ্ছিল। কিলিজ আরসালান তাদের থামানোর পূর্ণ চেষ্টা করেন এবং তাদের প্রাথমিক বাহিনীকে তছনছ করে দেন, তবে লাখ লাখ সৈন্যের সামনে বাঁধ দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। ক্রুসেডাররা আন্তাকিয়াসহ তার রাজ্যের অনেক গুরুত্বপূর্ণ শহর পদদলিত করে সিরিয়ায় ঢুকে পড়ে এবং বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌঁছে যায়। ক্রুসেডারদের হাতে পরাজয়ের পর আনাতোলিয়ার বেশিরভাগ এলাকা কিলিজ আরসালানের হাতছাড়া হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও তিনি কোনিয়া ও এর আশপাশে নিজের শাসন বজায় রাখেন।

ক্রুসেডীয় ঝড় কিছুটা স্তিমিত হলে কিলিজ আরসালান তার শাসন বিস্তারের জন্য কোমর বাঁধেন এবং ৪৯৮ হিজরিতে (১১০৩ খ্রিষ্টাব্দে) সুলতান বারকিয়ারুকের মৃত্যুর পর পূর্ণ স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে উত্তর ইরানের ওপর দখল প্রতিষ্ঠার চেষ্টা শুরু করেন। ৫০০ হিজরিতে (১১০৭ খ্রিষ্টাব্দে) তিনি আল-জাজিরায় অগ্রসর হয়ে মসুল ও দিয়ারবাকির জয় করেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে...

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, সাইয়েদ মুহাম্মদ, পৃষ্ঠা ৩৮ থেকে ৫০।

স্থানীয় গভর্নর জাওলির মোকাবিলায় পিছু হটতে বাধ্য হন এবং এরই মধ্যে তিনি খাবুর নদীর একটিতে ডুবে পরলোকগমন করেন। [১]

(৩) **মালিক শাহ বিন কিলিজ আরসালান:** কিলিজ আরসালানের এগারো বছর বয়সী ছেলে মালিক শাহও এই অভিযানে সাথে ছিলেন। পরাজয়ের পর তিনি মসুল থেকে গ্রেফতার হয়ে সুলতান মুহাম্মদ বিন মালিক শাহের কারাগারে নিষ্কিণ্ত হন এবং রুম সালজুকদের শাসন স্থগিত হয়ে যায়। অবশেষে ৫০৩ হিজরিতে মালিক শাহ কারাগার থেকে পালিয়ে আনাতোলিয়ায় পৌঁছে যান এবং “মালতিয়া”-তে সিংহাসনে আরোহণ করে নিজের পৈতৃক শাসন পুনরুদ্ধার করেন। তিনি আট বছর শাসন করেন। [২]

(৪) **রুকন উদ্দিন মাসউদ:** এখন কিলিজ আরসালানের দ্বিতীয় পুত্র রুকন উদ্দিন মাসউদ সিংহাসনে আরোহণ করেন, যিনি ৫১০ হিজরি থেকে ৫৫১ হিজরি পর্যন্ত পুরো চল্লিশ বছর শাসন করেন এবং নিজের সালতানাতের শান-শওকত পুনরায় প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেই সাথে বাইজেন্টাইন রোমানদেরও সামনে বাড়তে দেননি। তবে শেষ দিকে তিনি নিবুদ্ধিতার পরিচয় দিয়ে সালতানাতকে তিন ভাগে ভাগ করে দেন: রাজধানী কোনিয়া নিজের পুত্র কিলিজ আরসালান সানি (দ্বিতীয়)-এর হাতে তুলে দেন, আঙ্কারা ও উত্তরের প্রদেশগুলো নিজের দ্বিতীয় পুত্র শাহেনশাহর নামে করে দেন, আর সিওয়াস ও পূর্বদিকের এলাকাগুলো নিজের জামাতা “ইয়াগি বাসান”-কে অর্পণ করেন। এই সিদ্ধান্তের ফলে শাহজাদাদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। [৩]

(৫) **কিলিজ আরসালান সানি:** আট বছরের গৃহযুদ্ধের পর কিলিজ আরসালান সানি ক্ষমতার সমস্ত দাবিদারদের ওপর বিজয়ী হন। ৫৫৯ হিজরিতে (১১৬৪ খ্রি.) “ইয়াগি বাসান”-এর মৃত্যুর পর তিনি সিওয়াস ও পূর্বদিকের প্রদেশগুলো দখল করে নেন। ৫৭২ হিজরিতে (১১৭৬ খ্রি.) তিনি নিজের ভাই শাহেনশাহ এবং তার মিত্র বাইজেন্টাইন বাহিনীকে “জিউরিল”-এর উপকণ্ঠে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধ “মিরিওকেফালন যুদ্ধ” নামে পরিচিত। এরপর রুম সালজুক সালতানাত পুনরায় শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই সময়েই সিরিয়া ও মিশরে সালাহউদ্দিন আইয়ুবির শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, কিছুকাল উভয় সরকারের মধ্যে সীমান্ত সংঘাত চলতে থাকে, অবশেষে ৫৭৬ হিজরিতে (১১৮০ খ্রি.) উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সন্ধি হয়।

কিলিজ আরসালান সানি প্রায় ৩৬ বছর শাসন করেন। এই সময়ে তিনিও এই মারাত্মক ভুল করেন যে, নিজের পুত্র গিয়াস উদ্দিন কায়খসরুকে রাজধানীতে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে বাকি সালতানাত অন্যান্য পুত্রদের মধ্যে ভাগ করে দেন। এর ফলে পিতার জীবদ্দশাতেই ভাইদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায় এবং সালতানাতের ঐক্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এই সময়েই তৃতীয় ক্রুসেডের দামামা বেজে ওঠে এবং ৫৮৬ হিজরিতে (১১৯০ খ্রি.) জার্মানি থেকে আসা ক্রুসেডার বাহিনী কিলিজ আরসালান সানিকে পরাজিত করে আনাতোলিয়ার ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। কিলিজ আরসালান সানির কাছে কোনিয়া অবশিষ্ট ছিল কিন্তু তার...

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, সাইয়েদ মুহাম্মদ, পৃ. ৫০ থেকে ৫২; আল-কামিল ফিত তারিখ, বছর ৫৫০ হিজরি।

[২] তারিখু দামেশক, ইবনুল কালানিসি, পৃ. ৪৫৩; আল-কামিল ফিত তারিখ, বছর ৫০০ হিজরি; আল-মুখতাসার ফি আখবারিল বাশার: ২/২২২; তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ: ১/৬৯।

[৩] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, সাইয়েদ মুহাম্মদ, পৃ. ৫২, ৫৩; তারিখে উসমানি, ইসমাইল হাক্কি উজুন: ১/৩।

...এর মর্যাদা এখন একজন করদ দাতার মতো ছিল। দুই বছর পর ৫৮৮ হিজরি (১১৯২ খ্রিষ্টাব্দ) সালে কিলিচ আরসালান সানি ইন্তেকাল করেন। [১]

৬. গিয়াসউদ্দিন কায়খসরু আউয়াল:

কিলিচ আরসালান সানির অসিয়ত অনুযায়ী তার পর গিয়াসউদ্দিন কায়খসরু আউয়াল সিংহাসনে আরোহণ করেন। সৌভাগ্যবশত পরের বছরই সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ক্রুসেডার আক্রমণকারীদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন এবং আক্রমণকারীরা ইউরোপে ফিরে যায়। এর ফলে আনাতোলিয়াও বিদেশি একচেটিয়া আধিপত্য থেকে মুক্তি পায়, তবে শাহজাদাদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ অব্যাহত ছিল। অবশেষে ৫৯২ হিজরি (১১৯৬ খ্রিষ্টাব্দ) সালে শাহজাদা রুকনউদ্দিন সুলাইমান বাকি ভাইদের ওপর বিজয়ী হন। [২]

৭. রুকনউদ্দিন সুলাইমান:

রুকনউদ্দিন সুলাইমান পূর্ব আনাতোলিয়ার আরজুরুমসহ বিশাল এলাকা জয় করেন। ৬০০ হিজরি সালে পোপের প্রেরিত বাহিনী কনস্টান্টিনোপল দখল করে কায়সার-ই-রোমকে বিতাড়িত করে, যার ফলে বাইজেন্টাইন শাহজাদারা ‘ইজনিক’ এবং ‘ত্রাবজোন’-এ দুটি আলাদা কেন্দ্র স্থাপন করে। এই বিশৃঙ্খলার কারণে সেলজুক রোমের জন্য বাইজেন্টাইন রোমকে আরও পিছু হটানো সহজ হয়ে যায়। তবে এর কিছুদিন পরই রুকনউদ্দিন সুলাইমান ইন্তেকাল করেন। [৩]

৮. গিয়াসউদ্দিন কায়খসরু আউয়াল, দ্বিতীয়বার:

এখন কিলিচ আরসালান সানির দ্বিতীয় পুত্র গিয়াসউদ্দিন কায়খসরু আউয়ালের যুগ শুরু হয়। তিনি ছিলেন একজন সাহসী, দয়ালু এবং দূরদর্শী শাসক। তিনি ইলম ও ফজিলতে ভূষিত এবং নিজেও একজন কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। এই সময়ে আনাতোলিয়ার সেলজুক সালতানাত অত্যন্ত শোচনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন ছিল। এই অঞ্চলে খ্রিস্টানদের দুটি সরকার প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সেলজুক সালতানাত তাদের দয়ার ওপর নির্ভরশীল ছিল। সেলজুকদের কাছে কোনো উপকূলীয় শহর ছিল না, যার ফলে তাদের অর্থনীতি ও বাণিজ্যের অবস্থা ছিল নাজুক।

এই পরিস্থিতিতে গিয়াসউদ্দিন কায়খসরু শাসনভার গ্রহণ করেন এবং ৬০১ হিজরি (১২০৫ খ্রিষ্টাব্দ) সালে কোনিয়া পুনরায় জয় করে নিজের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করেন। কায়খসরু আউয়ালের দ্বিতীয় বড় কৃতিত্ব ছিল সালতানাতকে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করা। তার তৃতীয় কৃতিত্ব হলো ৬০৩ হিজরি (১২০৭ খ্রিষ্টাব্দ) সালে ভূমধ্যসাগরের উপকূলে অবস্থিত আনতালিয়া বন্দর দখল করা, যার ফলে সেলজুকদের বাণিজ্যিক পথ পুনরায় উন্মুক্ত হয়। পরের বছর তিনি আলেপ্পোর শাসক আল-মালিকুজ জাহির বিন সালাহউদ্দিন আইয়ুবির সাহায্যে ‘কিলিকিয়া’-র আর্মেনীয় খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে এই এলাকাটিও জয় করেন।

এরপর তিনি বাইজেন্টাইন রোমানদের নতুন কেন্দ্র ‘ইজনিক’ অভিমুখে অগ্রসর হন এবং ‘অ্যান্টিওক’-এর ময়দানে রোমান সম্রাট ‘লাসকারিস’-কে পরাজিত করেন। শত্রুপক্ষের পিছু হটার পর গিয়াসউদ্দিন সতর্কতার বিষয়টি লক্ষ্য রাখেননি এবং নিজে ব্যক্তিগতভাবে...

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, সাইয়েদ মুহাম্মদ, পৃ. ৫২, ৫৩; তারিখে উসমানি, ইসমাইল হাক্কি উজুন: ১ / ৫০৩

[২] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, সাইয়েদ মুহাম্মদ, পৃ. ৫৩; তারিখে উসমানি, ইসমাইল হাক্কি উজুন: ১ / ৬০৫

[৩] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, সাইয়েদ মুহাম্মদ, পৃ. ৫৩; তারিখে উসমানি, ইসমাইল হাক্কি উজুন: ১ / ৬০৬

বাদশাহর পশ্চাদ্ধাবনে বের হলেন, রোমান বাদশাহ যে প্রাণভয়ে পালাচ্ছিল, গিয়াসউদ্দিনকে মাথার ওপর দেখে ফিরে আক্রমণ করল যাতে গিয়াসউদ্দিন শহীদ হলেন। এটি ৬০৮ হিজরি (১২১১ খ্রিস্টাব্দ) এর ঘটনা। [১]

৯. ইজ্জুদ্দিন কায়কাউস:

গিয়াসউদ্দিন খসরু আউয়ালের পর তার বড় ছেলে ইজ্জুদ্দিন কায়কাউস ক্ষমতা লাভ করেন। তাকে তার ছোট ভাই আলাউদ্দিন কায়কোবাদের বিদ্রোহের সম্মুখীনও হতে হয়েছিল, তবে তিনি ৬০৮ হিজরি থেকে ৬১৭ হিজরি (১২১১ থেকে ১২১৯ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত শাসন করেন। ৬১১ হিজরিতে তিনি কৃষ্ণসাগরের উপকূলীয় শহর ‘সিনোপ’ জয় করে নিজের সালতানাতকে আরও বিস্তৃত করেন।

কায়কাউস একজন ভালো সাহিত্যিক ও কবি ছিলেন এবং ফারসিতে কবিতা বলতেন। তিনি ভরা যৌবনেই পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। [২]

১০. আলাউদ্দিন কায়কোবাদ:

এখন তার ছোট ভাই আলাউদ্দিন কায়কোবাদ আউয়াল সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ৬১৭ হিজরি থেকে ৬৩৪ হিজরি (১২১৯ থেকে ১২৩৭ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত আঠারো বছর শাসন করেন। ৬১৭ হিজরি (১২২১ খ্রিস্টাব্দ) থেকে ৬২২ হিজরি (১২২৫ খ্রিস্টাব্দ) এর মধ্যে তিনি ভূমধ্যসাগরের উপকূলে বাইজেন্টাইনদের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন জিহাদ করেন এবং তাদের থেকে অনেক দুর্গ ছিনিয়ে নেন। ৬২২ হিজরিতে (১২২৫ খ্রিস্টাব্দ) তিনি কৃষ্ণসাগরের ওপারে ক্রিমিয়ার দিকেও একটি অভিযান পাঠান এবং বিজয় লাভ করেন। তার যুগে সেলজুকায়ে রুমের সালতানাত তাহজিব ও তামাদুন, ইলমি ও নির্মাণ কর্মকাণ্ড এবং ধন-সম্পদের দিক থেকে তার শিখরে পৌঁছে গিয়েছিল। জাহাজ নির্মাণ শিল্পে সেলজুকরা সবার আগে গণ্য হতে শুরু করে। কিন্তু আলাউদ্দিন কায়কোবাদের যুগে যখন আনাতোলিয়া শিল্প ও কারুকার্যে আবাদ হচ্ছিল, ঠিক সেই দিনগুলোতে মধ্য এশিয়া, খোরাসান, ইরান, ইরাক এবং আল-জাজিরা চেন্সিস খানের আক্রমণে তছনছ হচ্ছিল। তাতারীদের মোকাবিলায় খাওয়ারিজমি সালতানাত চুরমার হয়ে গিয়েছিল এবং এর শাসক আলাউদ্দিন খাওয়ারিজম শাহ পালিয়ে গিয়ে অজ্ঞাতনামা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

এমন পরিস্থিতিতে খাওয়ারিজমের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী সুলতান জালালুদ্দিন খোরাসান ও হিন্দুস্তানে জিহাদি মোর্চা তৈরিতে ব্যর্থ হওয়ার পর ইরান ও আজারবাইজানে সরকার কায়েম করে চেষ্টা করেন যেন সিরিয়া ও আনাতোলিয়ার মুসলিম শাসকরা এই ফিতনার মোকাবিলায় ঐক্যবদ্ধ হন। আলাউদ্দিন কায়কোবাদ এই আহ্বানে সাড়া দেন কিন্তু আফসোস যে এই ঐক্য টেকসই প্রমাণিত হয়নি এবং সীমান্ত বিরোধের কারণে পারস্পরিক সম্পর্ক শত্রুতায় রূপ নেয়। অবশেষে আলাউদ্দিন কায়কোবাদ ৬২৭ হিজরিতে (১২৩০ খ্রিস্টাব্দ) সিরিয়ার শাসকদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সিওয়াসের কাছে সুলতান জালালুদ্দিন খাওয়ারিজম শাহর শক্তি চূর্ণ করে দেন। [৩]

কিন্তু সুলতান জালালুদ্দিনের পরাজয়ের পর ৬২৯ হিজরিতে তাতারীরা সেলজুকায়ে রুমের সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং তারা সিওয়াস ও এরজিনজান পর্যন্ত লুটতরাজ করে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে দেয়। [৪] আলাউদ্দিন কায়কোবাদ তাদের মোকাবিলার খাতিরে...

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, সাইয়েদ মুহাম্মদ, পৃ. ৫৩; তারিখে উসমানি, ইসমাইল হাক্কি উজুন: ১/ ৭০

[২] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, সাইয়েদ মুহাম্মদ, পৃ. ৫৩; তারিখে উসমানি, ইসমাইল হাক্কি উজুন: ১/ ৭০

[৩] সিরাতে সুলতান জালালুদ্দিন, শিহাবুদ্দিন আন-নাসাউয়ি, পৃ. ৩২২ থেকে ৩২৯

[৪] তারিখে উসমানি, হাক্কি উজুন: ১/ ৯

আইয়ুবীয় রাষ্ট্র সীমান্ত শহর আখলাত নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়, যার ফলে ৬৩০ হিজরিতে আইয়ুবীয় ও সেলজুক রুমের মধ্যে এক দীর্ঘ সংঘাত শুরু হয়। প্রথম যুদ্ধে আইয়ুবীয়রা পিছু হটতে বাধ্য হয়। দ্বিতীয় যুদ্ধে রুহা, হাররান এবং রাক্কা তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়, তবে তৃতীয় যুদ্ধে তারা সেলজুকদের কাছ থেকে এই এলাকাগুলো পুনরুদ্ধার করে। অবশেষে ৬৩৪ হিজরির মহররম মাসে আব্বাসীয় খলিফা মুস্তানসির বিল্লাহ মধ্যস্থতা করে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধবিরতি করান। [১]

এই সময়ে তাতারীদের বিপদের আশঙ্কা আরও বেড়ে গিয়েছিল। কায়কোবাদ তাদের মোকাবিলা করা কঠিন মনে করে তাদের সাথে সন্ধি করতে চাইলেন। তাতারীরা উত্তর দিল যে, এর জন্য তাকে মঙ্গোলিয়ায় গিয়ে দরবারে হাজিরা দিতে হবে, তবেই তাকে তাতার সালতানাতের অনুগত হিসেবে গণ্য করা হবে। এই উত্তরে আলাউদ্দিন কায়কোবাদ অত্যন্ত হতাশ হলেন। অবশেষে আলাউদ্দিন কায়কোবাদ তার মৃত্যুর কিছুদিন আগে তাদের আনুগত্য স্বীকার করতে রাজি হন। এর পর শওয়াল ৬৩৪ হিজরি (১২৩৭ খ্রিষ্টাব্দ) তে কায়কোবাদের মৃত্যু হয়। [২]

(১১) গিয়াসউদ্দিন কায়খসরু সানি

আলাউদ্দিন কায়কোবাদের পর তার পুত্র গিয়াসউদ্দিন কায়খসরু সানি সিংহাসনে বসেন, যার শাসনামলে তাতারীদের নিয়মিত আক্রমণ শুরু হয়। ৬৪০ হিজরিতে তাতার সর্দার বাজি নুয়ান আরজে রুম আক্রমণ করেন এবং সামান্য প্রতিরোধের পর তা জয় করে নেন। সেখানে পুরুষদের নির্বিচারে হত্যা করা হয় এবং নারী ও শিশুদের বন্দী করা হয়। গিয়াসউদ্দিন এই খবর শুনে হাজার হাজার সৈন্য নিয়ে তাতারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। ১১ই মহররম ৬৪১ হিজরিতে সিওয়াসের উত্তর-পূর্বে কোসাদাগ নামক স্থানে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয় যাতে মুসলমানরা পরাজিত হয়, সিওয়াস তাতারীদের দখলে চলে যায় এবং গিয়াসউদ্দিন পালিয়ে বাইজেন্টাইন রাজপুত্রদের শহর ইজনিক-এ আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। অবশেষে তার উজির মুহাজ্জাবউদ্দিন বাজি নুয়ানের সাথে আলোচনা করেন এবং বার্ষিক মোটা অংকের কর দিতে রাজি হয়ে সাময়িকভাবে এই বিপদ এড়ান। যখন বাজি নুয়ান তার বাহিনী নিয়ে আজারবাইজানে ফিরে যান, তখন সেলজুক রুম পুরোপুরি তাতারীদের করদ রাজ্যে পরিণত হয় এবং তাদের মর্যাদা নামমাত্র শাসকের মতো হয়ে যায়। এই দুর্বলতার সময় আরও বৃদ্ধি পায় যখন রাজপুত্রদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় এবং রুকনউদ্দিন কিলিচ আরসালান চতুর্থ ও ইজ্জউদ্দিন কায়কাউস দ্বিতীয় আলাদা আলাদা এলাকা দখল করে আনাতোলিয়াকে দুই ভাগে বিভক্ত করে দেন। [৩]

সেলজুক রুমের পতন:

সেলজুক রুমকে পতনোন্মুখ দেখে রোমান সাম্রাজ্যও এখানে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে। সেই সাথে তুর্কি আমিরদের বিদ্রোহ সেলজুক সাম্রাজ্যকে আরও দুর্বল করে দেয়। ইরানে দখলদার ইলখানি তাতারীদের আধিপত্য ধীরে ধীরে এশিয়া মাইনরে বাড়তে থাকে, এমনকি এই দেশে তারা নিরঙ্কুশ ক্ষমতা লাভ করে। তারা সেলজুক সুলতানের কাছ থেকে উজির নিয়োগের ক্ষমতাও কেড়ে নেয়। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে ইলখানি শাসকদের নিয়োগ তারা নিজেরাই করতে শুরু করে।

[১] তারিখ-ই-উসমানি আজ হাক্কি উজুন: ১০/১; মিরাত আল-জামান লি ইবনুল জাওজি: সন ৬৩১ হিজরি।

[২] তারিখ আদ-দাওলা আল-উসমানিয়া আজ সৈয়দ মুহাম্মদ, পৃষ্ঠা ৫৩; তারিখ-ই-উসমানি আজ হাক্কি উজুন: ১/৮০; মিরাত আল-জামান: সন ৬৩৪ হিজরি।

[৩] তারিখ আদ-দাওলা আল-উসমানিয়া আজ সৈয়দ মুহাম্মদ, পৃষ্ঠা ৫৩, ৫৪, ৫৫।

সেলজুক রুমের কাছে এখন কেবল কোনিয়া অবশিষ্ট ছিল, যেখানে বিভিন্ন প্রদেশের আমিররা সেলজুক রুমের আনুগত্য থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল এবং তারা কেন্দ্রের সাথে নামমাত্র আনুগত্যও শেষ করে দিয়েছিল। প্রতি বছর এই আমিররা তাদের কোষাগার থেকে একটি বিশাল অংকের অর্থ ইলখানি তাতারীদের প্রদান করত যাতে তাদের আমিরাতগুলো বহাল থাকতে পারে। এর পাশাপাশি তাতারীদের পক্ষ থেকে জনগণের ওপরও ভারী কর আরোপ করা হয়েছিল যা পরিশোধ করা অত্যন্ত কঠিন ছিল, ফলে এই সমৃদ্ধ দেশটি ধ্বংসের মুখে পতিত হয়।

৬৯৪ হিজরিতে গিয়াসউদ্দিন মাসুদ তাতারীদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন কিন্তু তিনি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। তাকে হামাদানে বন্দি করা হয় এবং কিছু সময়ের জন্য আনাতোলিয়ায় কোনো সেলজুক শাসকের আনুষ্ঠানিক রাজত্বও অবশিষ্ট ছিল না। মঙ্গোলরা ৬৯৫ হিজরিতে (১২৯৬ খ্রিষ্টাব্দ) আনাতোলিয়াকে চার ভাগে বিভক্ত করে একজন প্রধান মুজিরউদ্দিন আমির শাহকে এই অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করে। [১]

তবে এই পরিস্থিতি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি এবং যখন ইলখানিদের সিংহাসনে গাজান আসীন হন, তখন তিনি দেখলেন যে আনাতোলিয়ার মানুষ সেলজুক পরিবার ব্যতীত অন্য কারো রাজত্বে সন্তুষ্ট নয়। তিনি ৬৯৫ হিজরির (১২৯৬ খ্রিষ্টাব্দ) শেষের দিকে কোনিয়ার সিংহাসন আল-সেলজুককে ফিরিয়ে দিয়ে সেখানে দ্বিতীয় ইজ্জউদ্দিন কায়কাউসের নাতি তৃতীয় আলাউদ্দিন কায়কোবাদকে বসিয়ে দেন, যার সাথে গাজানের ভাতিজির বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু তৃতীয় কায়কোবাদ আনাতোলিয়া সামলাতে পারেননি এবং সেখানে ৬৯৭ হিজরিতে গাজানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ফেটে পড়ে। গাজানের বাহিনী প্রথমে বিদ্রোহ দমন করে [২] এবং এরপর ৬৯৯ হিজরিতে কায়কোবাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালায়। [৩] তিনি পালিয়ে দিয়ার বকর-এ গিয়ে আত্মগোপন করেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধরা পড়েন। গাজান তাকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন কিন্তু পরে দয়া করে তাকে পদচ্যুত করার ওপরই ক্ষান্ত হন।

৭০১ হিজরিতে (১৩০২ খ্রিষ্টাব্দ) আনাতোলিয়ার রাজমুকুট আবারও গিয়াসউদ্দিন মাসুদের মাথায় রাখা হয়। সেলজুক রুমের এই শেষ সুলতান নামমাত্র রাজত্বের সাথে বাকি জীবন ‘কায়সারী’তে অতিবাহিত করেন। ৭০৮ হিজরিতে পঞ্চাশ বছর বয়সে তিনি পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন এবং ইলখানিরা তার স্থলে অন্য কাউকে নিযুক্ত করেনি। এর পরপরই কারামানি নবাবরা স্বাধীনতা লাভ করে কোনিয়া দখল করে নেয় এবং এভাবেই এই সালতানাতের অবসান ঘটে। [৪]

সেলজুক রুমের শাসন ব্যবস্থা

সেলজুক রুমের শাসন ব্যবস্থা তুর্কিদের অন্যান্য প্রাচীন সরকারের মতোই ছিল যেখানে বাদশাহ ছিলেন নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী। প্রদেশকে ‘আয়ালাত’ বলা হতো। প্রতিটি প্রদেশ কেন্দ্রের ‘ইদারা-ই-আয়ালাত’-এর অধীনে ছিল। গভর্নরদের ‘সুবাশি’ বলা হতো। [৫]

সাহেব-ই-দেওয়ানের ক্ষমতা:

বাদশাহর পর সবচেয়ে বড় পদ ছিল ‘সাহেব-ই-দেওয়ান’-এর, যাকে ‘সাহেব-ই-আজম’ও বলা হতো। সালতানাতের

[১] তারিখুদ দাওলাতুল উসমানিয়া, সাইয়েদ মুহাম্মদ, পৃ. ৫৫, ৫৬

[২] তারিখে উসমানি, উজুন: ২৫/১, ২৬০; তারিখুদ দাওলাতুল উসমানিয়া, ইলমাজ: ১/৪৭

[৩] তারিখে সালাতিন বনি উসমান, পৃ. ৩৩, ৩৪

[৪] তারিখে উসমানি, উজুন: ২৫/১, ২৬০; তারিখুদ দাওলাতুল উসমানিয়া, ইলমাজ: ১/৪৭

[৫] তারিখে উসমানি, উজুন: ২৫/১

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

তিনি বেশিরভাগ বিষয় দেখাশোনা করতেন। তাঁর মর্যাদা ছিল আব্বাসীয় রাষ্ট্রে ‘উজির’-এর মতো।

সাহেব-ই-দেওয়ানের অধীনে নিম্নোক্ত বিভাগগুলো কাজ করত:

- ‘দেওয়ান-ই-তুগরা’ (নিশানচি): এটি রাজকীয় ফরমান জারির দপ্তর ছিল। রাজকীয় ফরমানকে ‘পরওয়ানা’ বলা হতো।
- ‘দেওয়ান-ই-ইস্তিফা’: এর দ্বারা ‘রাজস্ব বিভাগ’ বোঝানো হতো এবং এর দায়িত্বশীলকে ‘মুস্তাওফি’ বলা হতো। কোষাগারের সমস্ত আয় এবং সমস্ত সরকারি ব্যয়ের নির্ভরতা এই দপ্তরের কর্মদক্ষতার ওপর ছিল।
- ‘দেওয়ান-ই-মাজালিম’: এটি বিচার বিভাগের নাম ছিল যার অধীনে আদালত প্রতিষ্ঠিত হতো এবং কাজি নিযুক্ত করা হতো। ফরিয়াদিদের আবেদন শোনা হতো এবং তাদের প্রতিকার করা হতো। [১]

সামরিক ব্যবস্থা:

সামরিক আমিরদের ‘আতাবক’ (আতাবেগ) বলা হতো যারা যুদ্ধ ছাড়াও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতেন।

সেনাবাহিনীর দুটি ধরন ছিল: পেশাদার ও স্বেচ্ছাসেবক।

পেশাদার সেনাবাহিনী অশ্বারোহী এবং পদাতিক বাহিনীর আলাদা আলাদা দল নিয়ে গঠিত ছিল এবং সরাসরি বাদশাহর অধীনে থাকত। তাদের প্রতি তিন মাস অন্তর বেতন প্রদান করা হতো।

স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীরও দুটি ধরন ছিল: এক প্রকার তারা যারা নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাস করত। দ্বিতীয় প্রকার তারা যারা নির্দিষ্ট আমিরদের অধীনে থাকত। প্রয়োজন অনুযায়ী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে তলব করা হতো।

সেনাবাহিনীর ব্যবস্থাপনার কেন্দ্র ছিল রাজধানী, যাকে ‘দেওয়ান-ই-আরজ’ বলা হতো। [২]

নৌবাহিনী:

সেলজুক-ই-রুমের শাসন ব্যবস্থায় নৌবাহিনীর অত্যন্ত গুরুত্ব ছিল। উপকূলীয় অঞ্চলগুলোর জন্য একজন আলাদা তত্ত্বাবধায়ক থাকতেন যাকে ‘মালিকুস সাওয়াহিল’ বলা হতো। নৌবাহিনী তাঁর অধীনে ছিল। তাছাড়া বিভিন্ন উপকূলীয় শহরে স্থাপিত জাহাজ নির্মাণ কারখানার তদারকিও তিনি করতেন।

নৌবহরের আমিরকে ‘রাইসুল বাহর’ বলা হতো এবং তিনি ‘মালিকুস সাওয়াহিল’-এর নির্দেশনায় কাজ করতেন। [৩]

পরবর্তীতে উসমানীয় সুলতানগণও নৌবাহিনীর সেই বৈশিষ্ট্যগুলো বজায় রেখেছিলেন যা সেলজুক-ই-রুম প্রবর্তন করেছিলেন।

[১] তারিখ-ই-উসমানি, ইসমাইল হাক্কি উজুন: ১/৩৫, ৩৬

[২] তারিখ-ই-উসমানি, ইসমাইল হাক্কি উজুন: ১/৩৭

[৩] তারিখ-ই-উসমানি, ইসমাইল হাক্কি উজুন: ১/৩৬, ৩৭

সেলজুক রুমের কিছু ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব:

সেলজুক রুম ধর্মীয়, জ্ঞানতাত্ত্বিক এবং সাহিত্যিক ঐতিহ্যকে বিকশিত করেছে। এই যুগে তাসাউফ বিশেষভাবে উন্নতি লাভ করে। আনাতোলিয়ায় বড় বড় সুফি, কবি ও সাহিত্যিকদের আবির্ভাব ঘটে, যাদের মধ্যে কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব ছিলেন:

- মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি: ৬০৪ হিজরি থেকে ৬৭২ হিজরি (১২০৭ খ্রি. থেকে ১২৭৩ খ্রি.)। মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি ছিলেন একজন অত্যন্ত বিজ্ঞ আলেম এবং উচ্চমানের ফারসি কবি। তিনি খাজা শামস তাবরিজ থেকে ফয়েজ লাভ করেন এবং তাসাউফের জগতের সম্রাট হন। তাঁর কাব্যগ্রন্থ “মসনবী মানবী” তাসাউফ, নৈতিকতা এবং আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের শিক্ষার ক্ষেত্রে অতুলনীয় খ্যাতি অর্জন করেছে।
- হাজি বকতাশ ওয়ালী: ৬০৫ হিজরি থেকে ৬৬৯ হিজরি (১২০৯ খ্রি. থেকে ১২৭১ খ্রি.)। হাজি বকতাশের অনুসারী দল “সিলসিলা শুয়াইবিয়া” নামে পরিচিত ছিল। আনাতোলিয়ায় এর সাথে অসংখ্য মানুষ যুক্ত ছিল।
- সুলতান ওলাদ: ৬২৩ হিজরি থেকে ৭১২ হিজরি (১২২৬ খ্রি. থেকে ১৩১২ খ্রি.)। সুলতান ওলাদ ছিলেন একজন প্রখ্যাত সুফি। আনাতোলিয়ায় তাঁর সিলসিলা অনেক বিস্তার লাভ করে যা “সিলসিলা মৌলভিয়া” নামে পরিচিত ছিল।
- ইউনুস এমরে: ৬৩৭ হিজরি থেকে ৭২০ হিজরি (১২৪০ খ্রি. থেকে ১৩২০ খ্রি.)। ইউনুস এমরে একজন সুফি হওয়ার পাশাপাশি তুর্কি ভাষার একজন জাদুকরী কবিও ছিলেন। তিনি তাঁর কাব্যের মাধ্যমে অত্যন্ত সুন্দর শৈলীতে তাসাউফের শিক্ষা দিতেন।
- আহমদী: ৭৩৪ হিজরি থেকে ৮৩৬ হিজরি (১৩৩৪ খ্রি. থেকে ১৪৩৩ খ্রি.)। আহমদী গজল এবং মসনবী ধারার কবি ছিলেন। তুর্কিদের ঐতিহ্যবাহী কবিতায় তাঁর স্থান অত্যন্ত উঁচুতে। [১]
- খাজা নসরুদ্দিন: ৬০৪ হিজরি থেকে ৬৮৩ হিজরি (১২০৮ খ্রি. থেকে ১২৮৪ খ্রি.)। নিজের কৌতুক ও রসিকতার মাধ্যমে দুনিয়াকে হাসিয়ে মাতিয়ে রাখা এই ব্যক্তিত্বকেও সেলজুক রুমের যুগের সাথে সম্পর্কিত করা হয়।

খাজার জন্ম “সিভরি হিসার” শহরে হয়েছিল। আক শহর এবং কোনিয়াতে শিক্ষা লাভ করেন। একটি মসজিদে ইমাম এবং পরে মুদাররিস নিযুক্ত হন। ওয়াজ ও বক্তৃতায় অনেক খ্যাতি অর্জন করেন। কোনিয়ার আশেপাশে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কাজা (বিচারক) পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। ৬৮৩ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। বয়স ছিল ষাট বছরের কাছাকাছি। তিনি অত্যন্ত মেধাবী এবং বুদ্ধিমান মানুষ ছিলেন। তাঁর ঘটনাবলীতে উচ্চমানের সাহিত্যিক সূক্ষ্মতা রয়েছে। এতে কুরুচিপূর্ণতার কোনো নামগন্ধ নেই। তবে প্রত্যেকে তাঁর ঘটনাবলীকে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখে। শিশুরা তাঁকে একজন রসিক বৃদ্ধ হিসেবে কল্পনা করে খুশি হয়, যে লাঠি হাতে নিজের গাধার সাথে সাথে ঘুরে বেড়ায়। মুখ লোকেরা তাঁকে একজন নির্বোধ ও পাগল লোক মনে করে, যেখানে জ্ঞানীরা তাঁর ব্যঙ্গ ও কৌতুকের আড়ালে হিকমত এবং নৈতিক শিক্ষার প্রতিফলন দেখতে পান। [২]

[১] তারিখ-ই উসমানি, ইলমাজ: ১/ ৭৭, ৭৮

[২] মাজাল্লাতুর রিসালাহ: জুলাই ১৯৫২ খ্রি., প্রবন্ধ উস্তাদ আতাউল্লাহ তারজি হাশী

যদিও একটি মত অনুযায়ী খাজার সম্পর্ক উসমানি সুলতানদের যুগের সাথে ছিল, কারণ তাঁর সাথে তৈমুর লঙের সাক্ষাতের কাহিনীও বিখ্যাত, তবে এটা সম্ভব যে এই কাহিনীগুলো পরবর্তী সংযোজন। মনে রাখা প্রয়োজন যে, খাজা নসরুদ্দিনকে “জুহা”ও বলা হয়, তবে তিনি সেই “জুহা” নন যার আরবি কৌতুকগুলো বিখ্যাত। উভয়ের মধ্যে পার্থক্যের জন্য খাজাকে “জুহা আল-রুমি” এবং আরব বিদুষককে “জুহা আল-কুফি” বলা হয়, যে প্রায় ১৩০ হিজরিতে মারা গিয়েছিল। একটি মত এমনও আছে যে, এই উভয়ই কাল্পনিক চরিত্র।

তারিখ উন্মতে মুসলিমা - চতুর্থ খণ্ড

রুমের সেলজুক সালতানাত ২৩৮ বছর স্থায়ী ছিল। এতে নিম্নোক্ত শাসকগণ অতিবাহিত হয়েছেন:

ক্রমিক শাসক সময়কাল বিশেষ তথ্য

১ সুলাইমান বিন কুতুলমিশ বিন সেলজুক ৪৬৯ হিজরি থেকে ৪৭৯ হিজরি (১০৭৭ খ্রি. থেকে ১০৮৬ খ্রি.) সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা

.

খোরাসানের সেলজুকরা আনাতোলিয়াকে নিজেদের অধীনে নিয়ে নেয় ৪৭৯ হিজরি থেকে ৪৮৫ হিজরি (১০৮৬ খ্রি. থেকে ১০৯২ খ্রি.) আল্প আরসালান বাকি অংশে আলাদা প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। রুমের সেলজুক শাসন স্থগিত।

২ কিলিজ আরসালান প্রথম (দাউদ বিন সুলাইমান) ৪৮৫ হিজরি থেকে ৫০০ হিজরি (১০৯২ খ্রি. থেকে ১১০৭ খ্রি.) নতুন করে সরকার গঠন করেন। প্রথম ক্রুসেড।

.

কোনো শাসক ছিল না। বিশৃঙ্খলা ৫০০ হিজরি থেকে ৫০২ হিজরি (১১০৭ খ্রি. থেকে ১১০৯ খ্রি.)

৩ মালিক শাহ বিন কিলিজ আরসালান প্রথম ৫০২ হিজরি থেকে ৫১০ হিজরি (১১০৯ খ্রি. থেকে ১১১৬ খ্রি.) মালাতিয়াকে কেন্দ্র করে শাসন শুরু করেন।

৪ রুকন উদ্দিন মাসউদ বিন কিলিজ আরসালান ৫১০ হিজরি থেকে ৫৫১ হিজরি (১১১৬ খ্রি. থেকে ১১৫৬ খ্রি.) কোনিয়াকে কেন্দ্র বানান। দীর্ঘতম সময়কাল।

৫ কিলিজ আরসালান দ্বিতীয় বিন মাসউদ ৫৫১ হিজরি থেকে ৫৮৮ হিজরি (১১৫৬ খ্রি. থেকে ১১৯২ খ্রি.) দীর্ঘ সময়কাল। তৃতীয় ক্রুসেডে জার্মানদের আক্রমণের সম্মুখীন হন। সালতানাত পুত্রদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায়।

৬ গিয়াস উদ্দিন কায়খসরু প্রথম বিন কিলিজ আরসালান দ্বিতীয় ৫৮৮ হিজরি থেকে ৫৯২ হিজরি (১১৯২ খ্রি. থেকে ১১৯৬ খ্রি.)

৭ সুলাইমান শাহ দ্বিতীয় বিন কিলিজ আরসালান দ্বিতীয় ৫৯২ হিজরি থেকে ৬০০ হিজরি (১১৯৬ খ্রি. থেকে ১২০৪ খ্রি.)

৮ কিলিজ আরসালান তৃতীয় বিন সুলাইমান শাহ ৬০০ হিজরি থেকে ৬০১ হিজরি (১২০৪ খ্রি. থেকে ১২০৫ খ্রি.)

৯ গিয়াস উদ্দিন কায়খসরু প্রথম - পুনরায় ৬০১ হিজরি থেকে ৬০৮ হিজরি (১২০৫ খ্রি. থেকে ১২১১ খ্রি.) বিভক্ত সালতানাতকে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করেন।

১০ ইজ্জ উদ্দিন কায়কাউস প্রথম বিন কায়খসরু ৬০৮ হিজরি থেকে ৬১২ হিজরি (১২১১ খ্রি. থেকে ১২১৯ খ্রি.)

১১ আলাউদ্দিন কায়কোবাদ প্রথম বিন কায়খসরু ৬১২ হিজরি থেকে ৬৩৪ হিজরি (১২১৯ খ্রি. থেকে ১২৩৭ খ্রি.) শাসনের চরম উৎকর্ষ।

১২ গিয়াস উদ্দিন কায়খসরু দ্বিতীয় বিন কায়কোবাদ ৬৩৪ হিজরি থেকে ৬৪৪ হিজরি (১২৩৭ খ্রি. থেকে ১২৪৬ খ্রি.) তাতারদের কাছে পরাজয়।

১৩ ইজ্জ উদ্দিন কায়কাউস দ্বিতীয় বিন কায়খসরু দ্বিতীয় ৬৪৪ হিজরি থেকে ৬৪৬ হিজরি (১২৪৬ খ্রি. থেকে ১২৪৮ খ্রি.)

১৪ ইজ্জ উদ্দিন কায়কাউস দ্বিতীয় বিন কায়খসরু দ্বিতীয় এবং কিলিজ আরসালান চতুর্থ বিন কায়খসরু দ্বিতীয় ৬৪৬ হিজরি থেকে ৬৫৮ হিজরি (১২৪৮ খ্রি. থেকে ১২৫৯ খ্রি.) দুই ভাই মিলে শাসন করতে থাকেন।

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

১৫. ইজ্জুদ্দিন কায়কাউস সানি বিন কায়খসরু সানি, সাথে: কিলিচ আরসালান চাহারুম বিন কায়খসরু সানি, সাথে: কায়কোবাদ সানি বিন কায়খসরু সানি | ৬৪৮ হিজরি থেকে ৬৫৬ হিজরি (১২৪৯ খ্রি. থেকে ১২৫৭ খ্রি.) তিন ভাই মিলে শাসন করতে থাকেন।

১৬. কিলিচ আরসালান চাহারুম বিন কায়খসরু সানি, সাথে: কায়কোবাদ সানি বিন কায়খসরু সানি | ৬৫৬ হিজরি থেকে ৬৫৮ হিজরি (১২৫৭ খ্রি. থেকে ১২৫৯ খ্রি.) উভয় মিলে শাসন করতে থাকেন।

১৭. কিলিচ আরসালান চাহারুম বিন কায়খসরু সানি | ৬৫৮ হিজরি থেকে ৬৬৩ হিজরি (১২৫৯ খ্রি. থেকে ১২৬৫ খ্রি.)

১৮. কায়খসরু সালেস বিন কিলিচ আরসালান চাহারুম | ৬৬৩ হিজরি থেকে ৬৮১ হিজরি (১২৬৫ খ্রি. থেকে ১২৮২ খ্রি.) দুই বছর বয়সে সিংহাসনে বসানো হয়।

১৯. গিয়াসুদ্দিন মাসুদ সানি বিন কায়কাউস সানি | ৬৮১ হিজরি থেকে ৬৮৩ হিজরি (১২৮২ খ্রি. থেকে ১২৮৪ খ্রি.)

২০. কায়কোবাদ সালেস বিন ফারামুরজ বিন কায়কাউস সানি | ৬৮৩ হিজরি (১২৮৪ খ্রি.)

২১. গিয়াসুদ্দিন মাসুদ সানি - দ্বিতীয়বার | ৬৮৩ হিজরি থেকে ৬৯৫ হিজরি (১২৮৪ খ্রি. থেকে ১২৯৬ খ্রি.)

মুজিরুদ্দিন আমির শাহ - মঙ্গোলদের পক্ষ থেকে আনাতোলিয়ার নায়েব | ৬৯৫ হিজরি (১২৯৬ খ্রি.) সলাজিকা-ই-রুম স্থগিত - মঙ্গোলদের শাসন।

২২. কায়কোবাদ সালেস - দ্বিতীয়বার | ৬৯৫ হিজরি থেকে ৭০০ হিজরি (১২৯৬ খ্রি. থেকে ১৩০১ খ্রি.)

২৩. গিয়াসুদ্দিন মাসুদ সানি - তৃতীয়বার | ৭০১ হিজরি থেকে ৭০৭ হিজরি (১৩০২ খ্রি. থেকে ১৩০৭ খ্রি.) সর্বশেষ শাসক।

উসমানীয়দের পূর্বপুরুষদের আনাতোলিয়ায় আগমন

উসমানীয় তুর্কিদের পূর্বপুরুষ কারা ছিলেন? এবং তারা কখন ও কোন পরিস্থিতিতে আনাতোলিয়ায় এসেছিলেন? এই প্রশ্নগুলো ব্যাপক গবেষণার দাবি রাখে। ঐতিহাসিকগণ এই বিষয়ে একমত যে, তারা ছিল মধ্য এশিয়ায় বসবাসকারী তুর্কিদের ‘ওঘুজ’ গোত্রের একটি শাখা ‘কায়ি’র অন্তর্ভুক্ত। তাদের আদি জন্মভূমি ছিল ‘মার্ত’ [১]।

৬২১ হিজরিতে ‘কায়ি’ গোত্রের নেতা সুলাইমান শাহ গোত্রকে সাথে নিয়ে হিজরত করেন এবং আমেনিয়ায় পৌঁছে যান [২]। এরপর তিনি আনাতোলিয়ার দিকে অগ্রসর হন এবং দক্ষিণ-পূর্ব আনাতোলিয়ার ‘আখলাত’ জেলায় বসতি স্থাপন করেন [৩]। ৬২৮ হিজরিতে সুলাইমান শাহের গোত্র একবার...

[১] আত-তারিখুল ইসলামি: ৮, পৃষ্ঠা ৫৯... সাধারণত বলা হয় যে, এই গোত্রগুলো অমুসলিম ছিল এবং তারা এশিয়া মাইনরে বসবাসের পর ইসলাম গ্রহণ করেছিল, কিন্তু এটি একটি দুর্বল মত। ইতিহাসে এর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। বাস্তবতা হলো, তারা তুর্কিস্তান থেকে সেই যুগে হিজরত করে এসেছিল যখন সেখানে ইসলাম পৌঁছে গিয়েছিল। স্বয়ং গোত্রের প্রতিষ্ঠাতার নাম ‘সুলাইমান’ হওয়ার বিষয়টি এর প্রমাণ যে তারা মুসলিম ছিল, কারণ অমুসলিম তুর্কিদের এমন নাম হতো না।

[২] তারিখু সালাতিন বানি উসমান, পৃষ্ঠা ৩২... প্রাচীন উৎসগুলো এই বিষয়ে স্পষ্ট করে না যে, এই লোকেরা কখন এবং কেন আনাতোলিয়ায় এসেছিল? উসমানীয় সালতানাতের যুগে লিখিত কিছু বই এই বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করে। প্রসিদ্ধ বর্ণনা হলো, এই লোকেরা মুসলিম বিশ্বের ওপর তাতারদের (মঙ্গোল) আক্রমণের সময় মধ্য এশিয়া থেকে পালিয়ে আনাতোলিয়ায় পৌঁছেছিল। কিন্তু গত শতাব্দীর বেশ কিছু তুর্কি গবেষক তুর্কি ইতিহাস পর্যালোচনা করে এটি অস্বীকার করেছেন। তাদের মতে, সপ্তম হিজরি শতাব্দীতে উসমানীয়দের তুর্কিস্তান থেকে হিজরত করা একটি ঐতিহাসিক উপকথা, যার প্রাচীন উৎসগুলোতে কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। এই গবেষকদের ধারণা হলো, এই গোত্র পঞ্চম হিজরি শতাব্দীতে সেলজুক বাহিনীর সাথে স্থানান্তরিত হয়ে ইরানে বসতি স্থাপন করেছিল এবং সপ্তম হিজরি শতাব্দীতে তারা এই গোত্র নিয়ে তুর্কিস্তান থেকে নয়, বরং ইরান থেকে হিজরত করেছিল। (তারিখে উসমানি, ইসমাইল হাক্কি উজুন: ১/১১৮)

এই বিষয়েও মতভেদ রয়েছে যে, এই হিজরতে কতজন লোক ছিল? একটি মত অনুযায়ী, সুলাইমান শাহের সাথে পঞ্চাশ হাজার পরিবার ছিল। (নুসরাতুল ইমান বি-দাওলাতি আলি উসমান, পৃষ্ঠা ৫১)। কিন্তু এই কথাটি দূরবর্তী মনে হয়, কারণ পঞ্চাশ হাজার পরিবারের অর্থ হলো প্রায় তিন থেকে চার লক্ষ মানুষ, যাদের মধ্যে অন্তত এক লক্ষ যোদ্ধা ছিল। এত বড় শক্তি তো পুরো আনাতোলিয়া দখল করে নিতে পারত। দ্বিতীয় মত হলো (সুলাইমান শাহের মৃত্যুর পর গোত্রটি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়), আরতুগ্রুলের সাথে ৪৪০ জন লোক ছিল (সিবতুল আজাম আল-আওয়ালি: ৪/৪০৭), অর্থাৎ হিজরতকারী উভয় অংশে প্রায় এক হাজার লোক ছিল। গবেষক ইলমাজ দীর্ঘ চিন্তাভাবনার পর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, তারা ছিল প্রায় চারশ পরিবার, যাদের সদস্য সংখ্যা চার হাজারের বেশি ছিল। (তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়াহ: ১/৮৮)

[৩] নুজহাতুল আনজার: ৬/২

[৪] আত-তারিখুল ইসলামি, মাহমুদ শাকির: ৮/৫৯... কিছু গবেষকের মতে, এই লোকেরা সুলতান জালালুদ্দিন খাওয়ারিজম শাহের সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে আমেনিয়া এবং পূর্ব আনাতোলিয়ায় পৌঁছেছিল। (তারিখে উসমানি, ইসমাইল হাক্কি উজুন: ১/১১৮, টীকা ৭)। এই ধারণাটি সঠিক মনে হয় কারণ সুলাইমান শাহের আনাতোলিয়ায় হিজরতের বছর ৬২১ হিজরি বলা হয়। (তারিখু সালাতিন বানি উসমান, পৃষ্ঠা ৩২)। এটি সেই বছর ছিল যখন সুলতান জালালুদ্দিন ইরান থেকে ভারতে এসে সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরের বছর সুলতান আজারবাইজান জয় করে রুমের সেলজুকদের সাথে মৈত্রী চুক্তি করেন। সুলতানের সেনাবাহিনীতে তুর্কিস্তান থেকে হিজরতকারী তুর্কিদের একটি বিশাল সংখ্যা ছিল, যাদের নিয়ে সুলতান ৬২৮ হিজরি পর্যন্ত আমেনিয়া ও জর্জিয়ার খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলেন এবং এই লোকেরাই শেষ পর্যন্ত সুলতানের অনুগত ছিল। এটি অসম্ভব নয় যে, কায়ি গোত্রের যুবকরাও তাদের মধ্যে ছিল এবং এই অভিযানের সময় তারা আখলাতের আশপাশের এলাকাকে নিজেদের আবাসস্থল বানিয়ে নিয়েছিল। সুলাইমান শাহের আবাসস্থল ‘মাহান’ বলা হয় এবং মাহান নামক এলাকা এখনো পূর্ব আনাতোলিয়ায় বিদ্যমান। (তারিখে উসমানি, ইসমাইল হাক্কি উজুন: ১/১১৮, ১১৯, টীকা ৭)। সুলতান জালালুদ্দিন খাওয়ারিজম শাহও মাহানে অবস্থান করেছিলেন এবং এখানকার তুর্কিরা সুলতানকে অনেক সাহায্য করেছিল। (সিরাতে সুলতান জালালুদ্দিন আজ-জাহাবি, পৃষ্ঠা ৩৫৬, ৩৬১)

তারিখে উন্মতে মুসলিমা

খিলাফতে উসমানিয়া

তারপর তারা হিজরত করলেন এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হলেন। [১]

সফর চলাকালীন আলেপ্পোর নিকটবর্তী ফোরাত নদী পার হওয়ার সময় সুলাইমান শাহ ডুবে মৃত্যুবরণ করেন। তাকে নদীর তীরে জা’বার দুর্গের (জা’বার) সামনে দাফন করা হয়। এই স্থানটি আজও ‘তুর্ক মাজার’ নামে পরিচিত। [২]

সুলাইমান শাহের ইন্তেকালের পর কাফেলার মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। অধিকাংশ লোক সফর অব্যাহত রাখার পক্ষে অনড় ছিলেন, অন্যদিকে কিছু লোক ফিরে যেতে চেয়েছিলেন। সুলাইমান শাহের চার পুত্র ছিল। দুই পুত্র: ‘সুসুর’ এবং ‘দুন্দার’ গোত্রের অধিকাংশের সাথে পূর্ব দিকে যাত্রা করেন। অন্যদিকে দুই পুত্র: ‘আরতুগরুল’ এবং ‘গুনদুগদু’ প্রায় চারশ পরিবারের সাথে এশিয়া মাইনরের উত্তর-পশ্চিম জেলাগুলোর দিকে রওনা হন। আরতুগরুলের বয়স তখন ছিল প্রায় ৩৯ বছর। তিনি তার গোত্রকে নিয়ে কিছুকাল বিভিন্ন উর্বর উপত্যকায় অতিবাহিত করেন। [৩]

[১] আত-তারিখুল ইসলামি: ৮/৫৯; তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া আজ ইয়িলমাজ: ১/৮৩, ৮৫।

প্রয়োজনীয় নোট:

(১) তুর্কি উচ্চারণে সাধারণত ‘গাইন’ (غ) সাকিন (অনুচ্চারিত) হয়, তাই ‘আরতুগরুল’ (ارطغرل)-কে ‘আরতোরুল’ পড়া হয়।

(২) এটি প্রসিদ্ধ যে এই হিজরত আনাতোলিয়া থেকে তুর্কিস্তানের দিকে ছিল, কিন্তু ঐতিহাসিকরা এটি বলতে অক্ষম যে তারা যদি তুর্কিস্তান যাচ্ছিল তবে কেন? কিছু ঐতিহাসিক মনে করেন যে সেই সময় তাতাররা বলখ আক্রমণ করেছিল তাই তারা ফিরে যাচ্ছিল। (আত-তারিখুল ইসলামি: ৮/৫৯) কিন্তু এই কথাটি সম্পূর্ণ ভুল কারণ সেই সময়ও তুর্কিস্তান তাতারদের দখলে ছিল এবং সেখানে সাধারণ গণহত্যা থেকে বেঁচে যাওয়া মুসলমানরা অত্যন্ত সংকীর্ণ জীবন অতিবাহিত করছিল। তাই সেখানে কারো জন্য নিরাপদ হওয়া সম্ভব ছিল না। এছাড়া ৬২৮ হিজরিতে তাতাররা বলখে পুনরায় আক্রমণ শুরু করেছিল এবং তারা সেই লোকদের তালাশ করছিল যারা সুলতান জালালুদ্দিনের সাথে সক্রিয় ছিল। এমনকি ওজোন হাসান লিখেছেন যে তাতার সর্দার জুরমাগুন (যিনি সুলতান জালালুদ্দিনের পিছু ধাওয়ার জন্য এসেছিলেন) ৬২৯ হিজরিতে (১২৩১ খ্রি.) আনাতোলিয়ার পূর্ব অঞ্চলসমূহ: আরজিনজান এবং সিওয়াস পর্যন্ত ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে ফিরে গিয়েছিলেন। (তারিখে উসমানি আজ হাক্কি ওজোন: ১/৯) এমন পরিস্থিতিতে কাফেলার তুর্কিস্তান যাওয়া মৃত্যুর মুখে যাওয়ার সমতুল্য ছিল। তাই গবেষক ইয়িলমাজ এই সম্ভাবনা ব্যক্ত করেছেন যে পূর্ব আনাতোলিয়ায় তাতারদের হামলার আশঙ্কাই এই হিজরতের কারণ ছিল। (তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া: ১/৮৩) তারপর ঐতিহাসিকদের ঐকমত্য রয়েছে যে সুলাইমান শাহ যে পথে সফর করছিলেন তা সিরিয়ার দিকে যাচ্ছিল। এর থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে এই লোকেরা সিরিয়া যাচ্ছিল। এর থেকে অনুমান করা যায় যে চারণভূমির সন্ধানে যা যাযাবর গোত্রগুলোর হিজরতের প্রধান কারণ হয়ে থাকে। কিন্তু চারণভূমির সন্ধানে সিরিয়াকে কেন প্রাধান্য দেওয়া হলো? এর কারণ এই বোঝা যায় যে সুলাইমান শাহ সুলতান জালালুদ্দিনের নিখোঁজ হওয়া বা শাহাদাতের খবর শোনার পর পূর্ব আনাতোলিয়াকে একেবারেই অনিরাপদ মনে করে তাতারদের বিপদের কথা মাথায় রেখে সেখান থেকে বের হয়ে সিরিয়ায় নিরাপদ আশ্রয় ভেবেছিলেন। তবে সামনে গিয়ে গোত্রের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয় যার কারণ ইতিহাসে উল্লেখ নেই কিন্তু লক্ষণ থেকে বোঝা যায় যে গোত্রের একটি অংশ আশা করেছিল যে আলাউদ্দিন কায়কোবাদ তাদের আশ্রয় দেবেন কারণ সুলতান জালালুদ্দিনের নিখোঁজ হওয়ার পর তার অনেক সৈন্যকে আলাউদ্দিন কায়কোবাদ নিজের সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। (তারিখে ইবনে খালদুন: ৫/১৭৬) এবং তাদের আনাতোলিয়ার পূর্ব অঞ্চলে বসবাসের অনুমতি দিয়েছিলেন। (তারিখে উসমানি আজ হাক্কি ওজোন: ১/৯) সম্ভবত আরতুগরুল যখন জানতে পারলেন তখন তিনি মধ্য আনাতোলিয়া যাওয়া পছন্দ করলেন।

[২] তুর্কিদের ইতিহাস রচয়িতা অধিকাংশ ঐতিহাসিক আরতুগরুলের পিতার নাম সুলাইমান শাহ-ই লিখেছেন এবং তার ডুবে যাওয়ার ঘটনাও উল্লেখ করেছেন, তবে কিছু আধুনিক গবেষকের গবেষণা অনুযায়ী আরতুগরুলের পিতার নাম ‘গুন্দুজ আল্প’ ছিল। (তারিখে উসমানি আজ ইসমাইল হাক্কি ওজোন: ১/১২০, ১২১, টীকা) ইয়িলমাজ আরতুগরুলের বংশলতিকা এভাবে বর্ণনা করেছেন: আরতুগরুল বিন গুন্দুজ আল্প বিন কায় আল্প বিন সারুক আল্প বিন কায় আল্প। তবে সাথে সাথেই লেখক বলেছেন যে এটি একটি কাল্পনিক বংশলতিকা। (তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া: ১/৮৩)

[৩] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া আজ ইয়িলমাজ: ১/৮৫, ৮৬; নুসরাতুল আহলিল ঈমান বি দাওলাতি আলি উসমান আজ শেখ বকরি, পৃ. ৫১, ৫২; সিমতুন নুজুমিল আউয়ালি: ৩/৩১২ ও ৩২২।

আরতুগ্রল

৬২৯ হি. থেকে ৬৮০ হি.

(১২৩২ খ্রি. থেকে ১২৮১ খ্রি.)

আরতুগ্রল আনাতোলিয়ায় পৌঁছান এবং তাঁর পুত্র “সাউজি”-কে সেলজুক শাসক সুলতান আলাউদ্দিন কায়কোবাদের কাছে এই আবেদন নিয়ে পাঠান যেন তাঁর গোত্রকে “কোনিয়া”-র “কারামান” তহসিলে বসবাসের অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু “সাউজি” পথেই মারা যান। কিছুকাল পর এই গোত্র উত্তর-পশ্চিমের প্রদেশগুলোর দিকে যাত্রা করে। [১] এই সময়ে এক স্থানে দুটি বাহিনীকে যুদ্ধরত অবস্থায় দেখা যায়: একদিকে ছিল বাইজেন্টাইন রোমান এবং অন্যদিকে ছিল মুসলিম। রোমানদের পাল্লা ভারী ছিল এবং মুসলিমরা পিছু হটছিল। এমন পরিস্থিতিতে আরতুগ্রল তাৎক্ষণিকভাবে মুসলিমদের পক্ষ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং তাঁর জানবাজ যোদ্ধাদের নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁর সাহসিকতা রোমানদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে দেয় এবং মুসলিমদের সাহস পুনরায় ফিরে আসে। অবশেষে ময়দান মুসলিমদের দখলে থাকে এবং রোমানরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। [২]

ইসমাইল হাক্কি উজুনচারশিলি উসমানীয় ইতিহাসের প্রাচীন পাণ্ডুলিপির বরাতে উল্লেখ করেছেন যে, এই ঘটনাটি ৬২৯ হিজরির এবং এই যুদ্ধটি “ইজনিক” রাষ্ট্রের বাইজেন্টাইন খ্রিস্টানদের সাথে হচ্ছিল কারণ তারা সীমান্ত লঙ্ঘন করেছিল। [৩]

(১) ইতিহাসে এই সফরের কারণ উল্লেখ নেই, তবে মনে হয় আরতুগ্রল সেলজুক সুলতানের সাথে সাক্ষাৎ করা জরুরি মনে করেছিলেন। যখন পুত্রের দুতিয়ালি সফল হয়নি, তখন তিনি জানতে পারেন যে সুলতান উত্তর-পশ্চিমের অভিযানে ব্যস্ত আছেন; তিনি সেখানে গিয়ে সুলতানের সাথে সাক্ষাৎ করার সংকল্প করেন। এটি তকদিরের লিখন যে এই সাক্ষাৎ রণক্ষেত্রে হয়েছিল।

(২) নুযহাতুল আনজার: ২/৭; আত-তারিখুল ইসলামি, মাহমুদ শাকির: ৮/৬০।

(৩) তারিখে উসমানি: ১/১২২।

কিছু ভুল বর্ণনার ওপর মন্তব্য:

(১) এটি প্রসিদ্ধ যে, আরতুগ্রল যখন রণক্ষেত্রে দুটি দলকে যুদ্ধ করতে দেখেন, তখন তিনি নিজের বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য দুর্বল পক্ষকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নেন এবং যখন যুদ্ধের উত্তেজনা প্রশমিত হয়, তখন তিনি জানতে পারেন যে তিনি যে দলকে সমর্থন করেছেন তা ছিল সেলজুক রোমের বাহিনী। এই বর্ণনাটি গ্রহণযোগ্য নয় কারণ: [১] সেই যুগের ইতিহাসে এমন কোনো বর্ণনা নেই। [২] কোনো বুদ্ধিমান নেতা এমন কাজ করতে পারেন না যে না দেখে বা না জেনে নিজের গোত্রকে বিপদে ফেলে দেবেন। আরতুগ্রলের পুরো জীবন সাক্ষ্য দেয় যে তিনি অত্যন্ত চতুর ও বুদ্ধিমান মানুষ ছিলেন। [৩] এই সীমান্তগুলোতে মুসলিম ও কাফেরদের মধ্যে যুদ্ধ সাধারণত লেগেই থাকত, তাই যেকোনো সৈনিক এক নজরেই চিনতে পারত যে এটি কী ধরনের যুদ্ধ হচ্ছে। [৪] সেলজুকরা সর্বদা পতাকা এবং স্পষ্ট চিহ্ন নিয়ে যুদ্ধ করত। সেলজুক রোমানরা লাল রঙের পতাকায় চাঁদের চিহ্ন নিয়ে যুদ্ধ করত। আরতুগ্রল এবং তাঁর গোত্র সেলজুক রোমের এলাকাগুলোতে অনেক বছর কাটিয়েছিলেন। এটা সম্ভব ছিল না যে তারা এই দেশের বাহিনীকে চিনতে পারবে না। সঠিক কথা হলো, তারা এই দেশের প্রতিরক্ষার জন্য এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, যার পূর্বে তারা বসবাস করতেন এবং এখন যার পশ্চিমে বসতি স্থাপন করতে আসছিলেন।

(২) এটি প্রসিদ্ধ যে এই যুদ্ধ তাতার এবং সেলজুকদের মধ্যে হয়েছিল। অনেক ঐতিহাসিক এটি উল্লেখ করেছেন, কিন্তু গত শতাব্দীতে উসমানীয় তুর্কিদের ইতিহাসের ওপর হওয়া গবেষণামূলক কাজের ফলে এটি প্রমাণিত হয়েছে যে এই যুদ্ধ বাইজেন্টাইন রোমান এবং সেলজুকদের মধ্যে হয়েছিল। (বাকি অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠার টীকায়)।

এরতুগ্রল সেলজুক জায়গিরদার হিসেবে:

সেলজুক শাসক আলাউদ্দিন কায়কোবাদ এরতুগ্রলের পক্ষ থেকে আকস্মিক সাহায্য পেয়ে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন, তাকে সম্মানিত করেন এবং সম্মানস্বরূপ তার গোত্রকে “মুকাদামাতুস সুলতান” নাম দেন। এরতুগ্রল অল্প সময়ের মধ্যেই “কারাজাহিসার” এবং “সোণ্ডত” আক্রমণ করে সেগুলোকে সেলজুক শাসনের অন্তর্ভুক্ত করেন। এছাড়া “বিলেজিক”-এর শাসককে পরাজিত করে কর প্রদানে বাধ্য করেন। এই বীরত্বপূর্ণ কাজের জন্য সুলতান আলাউদ্দিন তাকে “সোণ্ডত”-এর জায়গিরদার নিযুক্ত করেন, যেখানে আনাতোলিয়ার বাইজেন্টাইন রাজ্যগুলোর আক্রমণের আশঙ্কা থাকত। ঐতিহাসিক কারমানির বর্ণনা অনুযায়ী, এই স্থানটি “তুমানিজ” এবং “আরমানাক” পাহাড়ের মাঝখানে অবস্থিত ছিল, যেখানে এরতুগ্রল তার গোত্রের চারশ পরিবার নিয়ে বসতি স্থাপন করেন। এই জায়গিরের আয়তন ছিল প্রায় দুই হাজার বর্গকিলোমিটার। ৬৩৪ হিজরিতে (১২৩৭ খ্রিস্টাব্দ) প্রথম কায়কোবাদের মৃত্যু হয়। তার উত্তরসূরি গিয়াসউদ্দিনের শাসনামল থেকে এই সালতানাতের পতন শুরু হয়। ৬৩৬ হিজরিতে (১২৩৯ খ্রিস্টাব্দ) গিয়াসউদ্দিনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয়, যার ফলে ক্রিমিয়া হাতছাড়া হয়ে যায়। তিন বছরের মধ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, রাষ্ট্র দুর্বল হয়ে যায় এবং সেনাবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

এর চেয়েও বড় কথা হলো সীমান্তে তাতারীদের আক্রমণ শুরু হয়। তাদের মোকাবিলায় একের পর এক পরাজয়ের পর ৬৪১ হিজরিতে গিয়াসউদ্দিন তাদের কর দিতে সম্মত হন। তবে কোনিয়া সালতানাত তাতারীদের করদ রাজ্যে পরিণত হলেও এরতুগ্রলের ওপর এর কোনো প্রভাব পড়েনি, কারণ তিনি যে প্রদেশের জায়গিরদার ছিলেন তা তাতারীদের নাগালের বাইরে ছিল।

৬৪৪ হিজরিতে (১২৪৬ খ্রিস্টাব্দ) গিয়াসউদ্দিনের মৃত্যু হয়। তার সালতানাতের অনেক অংশে মঙ্গোলদের অনুগত পুতুল শাসক বসানো হয়। এভাবে সেলজুকদের শাসন আরও সংকুচিত হয়ে পড়ে, তবে এই সময়ে এরতুগ্রল সমানভাবে তার পদে বহাল থাকেন। তিনি কেবল নিজের সীমান্তগুলোই ভালোভাবে রক্ষা করেননি, বরং আশেপাশের অনেক এলাকাও জয় করেন। [১]

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টীকা অংশ) যদিও কিছু বর্ণনায় এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, এই যুদ্ধ সেলজুক রুম এবং সুলতান জালালুদ্দিন খাওয়ারেজম শাহের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল, কিন্তু এটি একটি বড় ভুল ধারণা যা প্রাচ্যবিদরা অনুমানের ভিত্তিতে ছড়িয়েছেন। ইতিহাসের মূল পাঠে এর কোনো প্রমাণ নেই। ঐতিহাসিক প্রমাণাদি এই দুই যুদ্ধকে এক হিসেবে গণ্য করতে অস্বীকার করে। ঐতিহাসিকগণ একমত যে, এরতুগ্রলের পিতা সুলাইমান শাহের মৃত্যু ৬২৮ হিজরিতে হয়েছিল এবং এরতুগ্রল এরপর সেলজুক রুমের সমর্থনে যুদ্ধ করেছিলেন। অন্যদিকে ইয়াসি চিমেনের যুদ্ধ রমজান ৬২৭ হিজরিতে (অর্থাৎ এক বছর আগে) সংঘটিত হয়েছিল। সুতরাং এরতুগ্রলকে এতে শরিক মনে করা এবং একেই সেলজুক রুম ও উসমানীয় তুর্কিদের মধ্যে সম্পর্কের প্রথম যোগসূত্র হিসেবে গণ্য করার প্রশ্নই ওঠে না।

স্মর্তব্য যে, সেলজুক রুম এবং সুলতান জালালুদ্দিনের মধ্যে ইয়াসি চিমেন নামক স্থানে সংঘটিত যুদ্ধের বিবরণ ইতিহাসের বইগুলোতে পূর্ণ বিস্তারিতভাবে সংরক্ষিত আছে, যেখানে কোথাও উল্লেখ নেই যে কোনো একটি দল হঠাৎ এসে সেলজুক রুমকে সাহায্য করেছে। এই যুদ্ধের বিবরণে স্পষ্টভাবে লেখা আছে যে, সেলজুক রুম সিরিয়ার বাহিনীকে সাথে নিয়ে সুলতান জালালুদ্দিনের মোকাবিলা করেছিল এবং তাদের সম্মিলিত বাহিনীর সংখ্যা সুলতান জালালুদ্দিনের লশকর থেকে বেশি ছিল। সম্মিলিত বাহিনীর পাল্লা শুরু থেকেই ভারী ছিল এবং সুলতান জালালুদ্দিনের অসুস্থতার কারণে খাওয়ারেজমি সৈন্যরা শক্তভাবে লড়তে পারেনি এবং দ্রুত পিছু হটে। (সেলজুক নামাহ - ইবনে বিবি, পৃ. ১৫৬ থেকে ১৬৬; সিরাতে জালালুদ্দিন মানকুবিরনি, পৃ. ৩১৫ থেকে ৩৩২; ইবনে খালদুন: ৫/ ১৩৫ থেকে ১৩৮)। এর বিপরীতে এরতুগ্রল যে বাহিনীকে সাহায্য করেছিলেন তা সংখ্যায় কম এবং পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে ছিল। সুতরাং এই দুই যুদ্ধের মধ্যে কোনো সাদৃশ্য নেই। ইয়াসি চিমেনের যুদ্ধ ছিল আলাদা, যাতে সুলতান জালালুদ্দিন এবং সেলজুক ও সিরীয় শাসকরা একে অপরের মুখোমুখি ছিল এবং এই যুদ্ধটি ছিল আলাদা যাতে এরতুগ্রল রোমানদের মোকাবিলায় সেলজুক রুমের পক্ষ নিয়েছিলেন।

[১] আখবারুদ দুওয়াল ওয়া ১১১১ - কারমানি: ৩/ ৭৬; আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া ফিল তারিখিল হাদিস - ইসমাইল ইয়াগি, পৃ. ৮ থেকে ১৩; তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া - ইলমাজ: ১/ ৮৫ থেকে ৮৭; তারিখ সালাতিন বনি উসমান - ইউসুফ বেগ আসিফ, পৃ. ৩০ থেকে ৩৫।

উসমানীয় রাষ্ট্রের উন্নতিতে ইসলামী সংগঠনগুলোর ভূমিকা:

সেই সময়ে এশিয়া মাইনরে কিছু সংগঠন ইসলামের পুনর্জাগরণ এবং জিহাদের চেতনা জাগ্রত করার কাজ করছিল। যদিও এই সংগঠনগুলো খুব বেশি সুসংগঠিত ছিল না, তবে জনগণের ওপর এদের প্রভাব ছিল অত্যন্ত গভীর। উসমানীয় সালতানাত প্রতিষ্ঠার আগেই এই সংগঠনগুলো উত্তর-পশ্চিম এশিয়া মাইনরে সক্রিয় ছিল। সৌভাগ্যবশত উসমানীয়দের শাসনের ভিত্তি এই এলাকাতেই স্থাপিত হয়েছিল এবং তারা এখানে জিহাদের জন্য ক্রমাগত নতুন জনবল পেতে থাকে।

এগুলোর মধ্যে একটি সংগঠন “গাজাত” নামে পরিচিত ছিল। এটি কখন গঠিত হয়েছিল তা স্পষ্ট নয়, তবে মনে হয় যেহেতু এই এলাকাগুলো প্রায়ই বাইজেন্টাইনদের আক্রমণের শিকার হতো এবং তাদের লুটতরাজের ফলে মুসলমানদের ছোট ছোট জনপদ ও গ্রামগুলো প্রায়ই ক্ষতিগ্রস্ত হতো, তাছাড়া এখানে চুরি-ডাকাতির ঘটনাও ছিল সাধারণ বিষয়, তাই স্থানীয় মুসলমানরা সরকারি বাহিনী বা পুলিশের দয়ার ওপর নির্ভর না করে নিজেদের প্রয়োজনীয় প্রতিরক্ষা নিজেরাই করার জন্য এই ধরনের ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়েছিল।

গাজীরা একটি বিশেষ পোশাক পরিধান করতেন যাতে মাথায় সাদা টুপি ছিল বাধ্যতামূলক। একইভাবে “ফুতুওয়াহ” নামেও একটি সংগঠন কাজ করত। সবচেয়ে বিখ্যাত সংগঠন ছিল “আল-আখিয়্যাহ”, যাতে বেশিরভাগ শ্রমিক, কারিগর এবং কৃষক অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর শাখাগুলো প্রতিটি জনপদে ছিল এবং প্রতিটি শাখার তত্ত্বাবধায়ককে “আখি” বলা হতো। এই সংগঠনগুলোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যগুলো ছিল নিম্নরূপ:

- যুবকদের যুদ্ধবিদ্যার প্রশিক্ষণ দেওয়া, তাদের ধর্মীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা, মানুষকে জালিমদের জুলুম-অত্যাচার থেকে রক্ষা করা ও ন্যায়বিচার পাইয়ে দেওয়া, চোর ও ডাকাতদের নির্মূল করা এবং যুবকদের জিহাদের জন্য প্রস্তুত রাখা।
- উলামা, সুফি এবং মাশায়েখগণ এই সকল সংগঠনের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন এবং তাদের সাহস ও অনুপ্রেরণা জোগাতেন। [১]

আনাতোলিয়ায় তুর্কমেনদের জীবনের ওপর এক নজর:

আরতুগ্রলের সাথে আসা তুর্কমেন যোদ্ধারা রোমানদের বিরুদ্ধে সেলজুক সালতানাতের অগ্রবর্তী বাহিনীর ভূমিকা পালন করতে শুরু করে। তারা আনাতোলিয়ার বড় শহরগুলোতে বসবাসকারী সেই তুর্কিদের চেয়ে অনেক বেশি সক্রিয় ছিল যারা আরব ও ইরানি সভ্যতা ও সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল। এই তুর্কমেনরা ছিল শ্রেষ্ঠ মুজাহিদ। তারা জিহাদ ও যুদ্ধের অনুরাগী ছিল। আনাতোলিয়ার মাশায়েখ ও দরবেশগণ এই তুর্কমেনদের ধর্মীয় প্রশিক্ষণের দায়িত্ব পালন করতে শুরু করেন। তাদের প্রত্যেকেই কোনো না কোনো শেখ এবং খানকাহর সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে। এই মাশায়েখগণ তাদের জিহাদের ফজিলতও শোনাতেন, যার ফলে এই মুজাহিদদের মধ্যে ইসলামের প্রসারের জন্য নতুন ভূখণ্ড জয় করার চেতনা ছড়িয়ে পড়ে।

এই মুজাহিদদের শক্তির মূল ভিত্তি ছিল অশ্বারোহণ। তারা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সফর করত এবং রাতারাতি শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত।

[১] ফি উসুলিত তারিখিল উসমানি, পৃ. ৩৩ থেকে ৩৮... এই সংগঠনগুলোকে ক্রুসেড যুগের “টেম্পলার্স”-এর সাথে তুলনা করা যেতে পারে, যাদের একটি স্থায়ী সামরিক ব্যবস্থা ছিল এবং তারা যুদ্ধের ময়দানে ধর্মীয় আবেগ ও উদ্দীপনার সাথে পূর্ণ অংশগ্রহণ করত।

...নতুন বিজিত এলাকাগুলোতে তুর্কমেনদের আরও বসতি স্থাপনের ধারা বাড়তে থাকে এবং আনাতোলিয়া তুর্কিদের নতুন ইসলামি জন্মভূমি হয়ে ওঠে। এই লোকদের মধ্যে এক নতুন জীবনের আকাঙ্ক্ষা দেখা যাচ্ছিল। বীরত্ব ও সাহসিকতায় সজ্জিত এই যুবকদের অধিকাংশের ইচ্ছা ছিল পৃথিবীর শেষ সীমানা পর্যন্ত ইসলামের পতাকা ওড়ানো। উপত্যকা, গ্রাম ও মফস্বল শহরগুলোতে বসবাসকারী এই লোকদের জীবন ছিল অত্যন্ত সাধারণ। তাদের সামাজিক জীবনের কেন্দ্র ছিল মসজিদ, যার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা প্রতিষ্ঠান ছিল: মক্তব (প্রাথমিক শিক্ষার পাঠশালা), মাদ্রাসা (মাধ্যমিক স্তরের পাঠশালা) এবং তকিয়া (خانقاہ - সুফিদের আস্তানা)। তাদের সাধারণ মেলামেশার স্থান ছিল সেই ঝরনা বা জলাধারগুলো যেখানে তারা অজু ও গোসল করত। এই লোকেরা সেলজুকদের মুদ্রা ব্যবহার করত। তারা তাদের বাদশাহদের নামে খুতবা পাঠ করত এবং সেলজুক রাজধানীগুলোতে বার্ষিক কর প্রদান করত। [১]

‘নুজহাতুল আনজার’-এর লেখকের মতে, প্রাথমিক যুগে আরতুগ্রল ও তার গোত্র যে জায়গির পেয়েছিল তা কারাহিসার (আফিয়ন জেলা, কোনিয়ার নিকটবর্তী) এবং বিলেজিক-এর মধ্যবর্তী ছিল এবং এই এলাকাকে ‘সোজাক’ বলা হতো, এই এলাকার একটি পাহাড় ‘আইলাতজ’-ও আরতুগ্রলের জায়গিরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। [২] পরবর্তীতে আরতুগ্রল তার অধিকৃত এলাকা যথেষ্ট বৃদ্ধি করেন।

৬৮৫ হিজরিতে আরতুগ্রল কুতাহিয়াহ জেলা জয় করেন। এভাবে তার জায়গিরের আয়তন ৪৮০০ বর্গকিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তিনি সেলজুকদের প্রতিনিধিত্বে যে রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন তা তিনটি জেলা: কুতাহিয়াহ, বিলেজিক এবং এসকিশেহির শহরের মফস্বল ও গ্রামীণ এলাকাগুলোতে বিস্তৃত ছিল। কুতাহিয়াহ প্রায় পুরোটাই এই জায়গিরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিলেজিক জেলার দুটি শহর ‘সোগুত’ এবং ‘বোজুয়ুক’ এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। অন্যদিকে এসকিশেহির জেলার উত্তর অংশ এবং এই জেলার দুটি নদী: বোরসিক ও সাকারিয়া-র মধ্যবর্তী এলাকা তার জায়গিরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই ছোট রাষ্ট্রটিই পরবর্তীতে মহান উসমানীয় সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। [৩]

আরতুগ্রল দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন এবং জীবনের ৯৩টি বসন্ত দেখার পর ৬৮০ হিজরিতে (১২৮১ খ্রিস্টাব্দে) ইন্তেকাল করেন। [৪]

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়াহ, ইলমাজ: ১/ ৮৯

[২] নুজহাতুল আনজার ফি আজায়িবিত তারিখ ওয়াল আখবার: ২/ ৭

[৩] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়াহ, ইলমাজ: ১/ ৮৭

[৪] তারিখ সালাতিন বনি উসমান, ইউসুফ বেগ আসিফ, পৃ. ৩০ থেকে ৩৫

আরতুগ্রলের বয়স: আরতুগ্রলের জন্ম ৫৮৭ হিজরিতে (১১৯১ খ্রিস্টাব্দে) হয়েছিল। (তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়াহ, ইলমাজ: ১/ ৮৬) এই হিসেবে ইন্তেকালের সময় তার বয়স সৌর বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী ৯০ এবং চান্দ্র বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী ৯৩ বছর হয়েছিল। আরতুগ্রলের ইন্তেকাল সম্পর্কে অন্যান্য বর্ণনাও রয়েছে। এক বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ৬৮৭ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। (তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ, পৃ. ১১৬) সেই অনুযায়ী আরতুগ্রলের বয়স পূর্ণ এক চান্দ্র শতাব্দী হবে। এক বর্ণনা অনুযায়ী ইন্তেকালের বছর ছিল ৬৮৯ হিজরি। (নুজহাতুল আনজার: ২/ ৭) সেই অনুযায়ী আরতুগ্রলের বয়স একশ দুই চান্দ্র বছর হবে।

নোট:

‘এসকিশেহির’ পশ্চিম তুরস্কের একটি শহর। বর্তমানে এটি একটি শিল্পনগরী এবং রেলওয়ে জংশন।

‘বিলেজিক’ (বিলাজিক) আঙ্কারার পশ্চিমে এসকিশেহির শহরের কাছে এর উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত।

‘কুতাহিয়াহ’ এসকিশেহির শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি প্রাদেশিক রাজধানী যা পুরসাক নদীর তীরে অবস্থিত। এই এলাকাটি গরম পানির ঝরনার জন্য বিখ্যাত।

উসমান খান গাজী উসমানীয় সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা

৬৯৯ হি. থেকে ৭২৬ হি.

(১২৮১ খ্রি. থেকে ১৩২৬ খ্রি.)

উসমান খান আরতুগ্রুলের বড় ছেলে ছিলেন। তিনি ৬৫৬ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। এটি সেই বছর ছিল যখন বাগদাদে আব্বাসীয় খিলাফতের অবসান ঘটেছিল। ঐশী ইচ্ছায় ঠিক সেই সময়েই উসমানীয় খলিফাদের পূর্বপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছিল। উসমান খান ছিলেন অত্যন্ত সাহসী, বুদ্ধিমান এবং উচ্চাভিলাষী এক যুবক। তাঁর লালন-পালন হয়েছিল জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর পরিবেশে। আলেম, নেককার এবং ওলি-আউলিয়াদের প্রতি তাঁর গভীর ভক্তি ছিল। তিনি প্রায়ই আরিফ বিল্লাহ শেখ বালি কারমানির খানকায় যেতেন এবং কখনো কখনো রাতও কাটাতেন। শেখ কারমানি তাঁর ওপর এতটাই আস্থা রাখতেন যে, তিনি নিজের মেয়েকে তাঁর সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। পিতার মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিল ২৪ বছর। সেই সময় কোনিয়ায় সেলজুক সালতানাতে রুমের শাসক ছিলেন সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাসুদ। তাঁর অবশিষ্ট ক্ষুদ্র সালতানাত আরতুগ্রুলের গোত্রের আনুগত্যের কারণেই উত্তর সীমান্তে সুরক্ষিত ছিল। তাই তিনি পূর্ণ আস্থার সাথে উসমান খানকে তাঁর পিতার পদে নিযুক্ত করেন। উসমান খান নিজেকে এই পদের যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে প্রমাণ করেন এবং প্রদেশের শাসনব্যবস্থা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পরিচালনা করেন। ৬৮৮ হিজরিতে তিনি কোনিয়ার নিকটবর্তী কারাজাহিসার (কারা হিসার) নামক শক্তিশালী দুর্গটি জয় করেন এবং এটিকে নিজের রাজধানী বানান।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাসুদ উসমান খানের সম্মানে তাঁর নামের সাথে ‘বে’ উপাধি যোগ করেন, নিজের বিশেষ পতাকা ও রাজকীয় নিদর্শনসমূহ তাঁর হাতে তুলে দেন এবং খুতবায় তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত করেন। এভাবে উসমান খান পদমর্যাদার দিক থেকে সালতানাতের নায়েব এবং কার্যত একজন ক্ষমতাধর শাসক হয়ে ওঠেন। [১]

সালাজিকা-এ-রুমের পতন:

এই সময়ে সেলজুক রুম মঙ্গোলদের করদ রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ৬৯৭ হিজরিতে সেলজুক রাজা গিয়াসউদ্দিন মাসুদ বিদ্রোহ করেন কিন্তু ব্যর্থ হয়ে তাদের বন্দি হন। মঙ্গোলরা পরের বছর আলাউদ্দিন কায়কোবাদ তৃতীয়কে সিংহাসনে বসায় কিন্তু তিনিও তাতারদের সন্তুষ্ট করতে পারেননি, ফলে তাতার শাসক গাজান তাঁকে বন্দি করেন। [২]

[১] আখবারুদ দুওয়াল ওয়া আসারুল উওয়াল: ৩/৭; নুজহাতুল আনজার: ২/১৮০; তারিখুদ দাওলাতুল উসমানিয়া লি-ইলমাজ: ১/৭৩; তারিখুদ দাওলাতুল আলিয়া, পৃ. ১১৮। কারা মানে কালো, হিসার মানে দুর্গ। তুরস্কে কারা হিসার নামে অনেক দুর্গ রয়েছে। এখানে উদ্দেশ্য হলো আফিয়ন জেলার দুর্গ যাকে কারাজাহিসারও বলা হতো।

[২] তারিখুদ দাওলাতুল উসমানিয়া লি-সাইয়েদ মুহাম্মদ, পৃ. ৫৫, ৫৬; তারিখে উসমানি লি-উজুন: ১/২৬, ২৭; তারিখুদ দাওলাতুল উসমানিয়া লি-ইলমাজ: ১/৭৩।

উসমান খান স্বাধীন শাসক হিসেবে:

এখন আনাতোলিয়া তীব্র কেন্দ্রাভিমুখিতার দিকে ধাবিত হচ্ছিল। এমন পরিস্থিতিতে অনেক মানুষ উসমান খানের ছায়াতলে থাকাকে অগ্রাধিকার দিতে শুরু করে। কোনিয়ার অধিকাংশ সেনাবাহিনীও উসমান খানের পতাকাতলে চলে আসে। ফলে ৬৯৯ হিজরিতে উসমান খান স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। সেলজুক সুলতান আলাউদ্দিন কায়কোবাদ তৃতীয় তাকে স্বাধীনতার অনুমতি দিয়ে রাজকীয় প্রতীকসমূহ প্রেরণ করেন। এভাবে আনাতোলিয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চলগুলোতে উসমান খানের খুতবা প্রচলিত হয়ে যায়। এর আগে তার নামের সাথে বেগ (আমির) লাগানো হতো, কিন্তু এখন তিনি নিজের জন্য “বাদশাহ” উপাধি গ্রহণ করেন। [১]

উসমান খানের পররাষ্ট্রনীতি:

কয়েক দশক ধরে রুম সেলজুকদের বিশাল সাম্রাজ্য অনেকগুলো টুকরোয় বিভক্ত হয়ে যাচ্ছিল এবং এই ধারা অব্যাহত ছিল। উসমান খানের রাজত্ব শুরু হওয়ার সময় আনাতোলিয়ায় তুর্কমেনদের অনেকগুলো আলাদা আলাদা সরকার ছিল। ইজমিরে আইদিন পরিবার, দক্ষিণ শহর আনতালিয়ায় বনু তেক্কে, পূর্ব অঞ্চলে বনু আরতানা, উত্তর অঞ্চলে: মালাতিয়া, কুতাহিয়াহ এবং আঙ্কারায় বনু গেরমিয়ান, কোনিয়ার পশ্চিম জেলা আকরিদিরে বনু হামিদ, মিসিয়ায় বনু কারাসি এবং লিডিয়ায় বনু সারুখান ক্ষমতাসীন ছিল। [২]

উসমান খানের সামনে সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য দুটি পথ ছিল: সহজ পথটি ছিল এই যে, তিনি এই ডজনখানেক ছোট ছোট স্বাধীন আমিরাতগুলোর সাথে শক্তি পরীক্ষা করতেন। দ্বিতীয় পথটি ছিল এই যে, তিনি উত্তরের দিকে মনোনিবেশ করে বাইজেন্টাইনদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতেন। উসমান খান দ্বিতীয় পথটিকে অগ্রাধিকার দেন এবং প্রতিবেশী মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সাথে সংঘর্ষ থেকে যথাসম্ভব নিজেকে বাঁচিয়ে রাখেন। তিনি কোনিয়ার প্রতীকী সেলজুক শাসকদের আদব ও সম্মানও সর্বদা বজায় রাখেন এবং তাদের সাথে পূর্ববর্তী রীতি ও উপাধি অনুযায়ী আচরণ করেন। তাতাররা ৭০১ হিজরিতে গিয়াসউদ্দিন মাসুদকে রাজমুকুট পরিয়ে দেয়, যিনি শেষ সেলজুক সুলতান হিসেবে প্রমাণিত হন। বাস্তবে তার কোনো মর্যাদা ছিল না। যাই হোক, উসমান খান তার এই মখদুমদের সাথে বিবাদে জড়ানোর অশোভন চেষ্টা কখনো করেননি।

উসমানীয় রাষ্ট্রের বিস্ময়কর উন্নতির কারণসমূহ:

উসমান খানের নবজাতক রাষ্ট্রটি অত্যন্ত দ্রুততার সাথে বিকশিত হয়। এর দুটি কারণ ছিল: একটি হলো এই যে, এই নতুন রাষ্ট্রটি মারমারা সাগরের তীরে বাইজেন্টাইনদের সবচেয়ে নিকটবর্তী এবং অত্যন্ত বিপজ্জনক স্থানে অবস্থিত ছিল, যার ফলে এটি প্রাকৃতিকভাবেই জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর অধিক সুযোগ লাভ করে এবং এই জিহাদই আল-উসমানের নাম সূর্যের মতো উজ্জ্বল করে দেয়।

দ্বিতীয় কারণটি ছিল এই যে, এই পরিবারের লোকেরা শারীরিক শক্তি, সাহসিকতা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দীনদারি এবং ন্যায়বিচার ও দয়ায় অনন্য ছিলেন। এসব কারণে অরাজকতার এই যুগে উসমান খানই এমন একজন মুজাহিদ হিসেবে প্রমাণিত হন যিনি মঙ্গোল এবং বাইজেন্টাইনদের মোকাবিলায় একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সাফল্য অর্জন করেন। [৩]

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়াহ, ইলমাজ: ১/ ৯০ থেকে ৯২; আত-তারিখুল ইসলামি, মাহমুদ শাকির: ৮/ ৬২; নুযহাতুল আনযার: ২/ ৬; আখবারুদ দুওয়াল ওয়া আসারুল আওয়াল: ৩/ ৫

[২] আত-তারিখুল ইসলামি, মাহমুদ শাকির: ৮/ ৬০ থেকে ৬২

[৩] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়াহ, ইলমাজ: ১/ ৯০

রাষ্ট্রের সম্প্রসারণ:

স্বাধীনতার ঘোষণার পর উসমান খান সেই এলাকাগুলো জয় করতে শুরু করেন যা সেলজুকদের দখল থেকে কিছুকাল আগে মুক্ত হয়ে স্বাধীন হয়েছিল। তিনি উপকূলীয় এলাকা পর্যন্ত পৌঁছানো জরুরি মনে করতেন। তাঁর রাষ্ট্র আনাতোলিয়ার মাঝখানে ছিল এবং কোনো উপকূল এর সাথে যুক্ত ছিল না। তিনি ৭০১ হিজরিতে ইজনিক থেকে বিলেজিক যাওয়ার মহাসড়কে অবস্থিত “ইয়েনি শেহির” (ইয়ার হিসার) জয় করেন যেখান থেকে বাইজেন্টাইনদের উপকূলীয় শহর “বুরসা” আক্রমণ করা সম্ভব ছিল। উসমান খান “ইয়েনি শেহির”-এর দুর্গ ও প্রাচীরকে বেশ মজবুত করেন এবং একে নিজের অস্থায়ী রাজধানী ঘোষণা করেন। ৭০৮ হিজরিতে তিনি আক হিসার জয় করেন। কোনিয়ার পূর্ব জেলা বিলেজিক, ইনেগোল এবং একি শেহির (এসকি শেহির)-ও তাঁর শাসনাধীন হয়ে যায়। এই সময়ে ৭০৮ হিজরিতে শেষ সেলজুক সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাসুদ মৃত্যুবরণ করেন এবং এভাবে রুম সেলজুকদের যুগের সমাপ্তি ঘটে। [১]

উসমান খান আশেপাশে বসবাসরত আমেনীয় খ্রিস্টানদের সতর্ক করেন যে তারা যেন ইসলাম গ্রহণ করে অথবা জিজিয়া প্রদান করে, অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হবে। আমেনীয় শাসকদের মধ্যে কেউ কেউ ইসলাম গ্রহণ করেন। কেউ জিজিয়া প্রদান করা পছন্দ করেন। বাকিরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায় এবং মঙ্গোলদের সাহায্যের জন্য ডেকে পাঠায়। উসমান খান মঙ্গোল ও আমেনীয়দের জোটের বিন্দুমাত্র পরোয়া করেননি এবং নিজের পুত্র ওরহানকে সৈন্যবাহিনী দিয়ে মোকাবিলার জন্য পাঠান। ওরহান অত্যন্ত বীরত্বের সাথে প্রতিপক্ষের মোকাবিলা করেন এবং তাদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে তাড়িয়ে দেন। ৭০১ হিজরিতে (১৩০১ খ্রিষ্টাব্দ) উসমান খান “ইজমিত” এবং “ইজনিক” (নিসিয়া)-এর মধ্যবর্তী সমতল ভূমিতে অগ্রসর হন এবং “আফিয়ন হিসার” দুর্গের কাছে রোমান সেনাপতি মুজালিওনকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। কিছুকাল পর তিনি বুরসা ও নিকিয়া-র মধ্যবর্তী “ত্রিকোঙ্কা” দুর্গও জয় করেন যা “ইজনিক” ও “ইজমিত”-কে সংযোগকারী মহাসড়কে অবস্থিত ছিল। এভাবে উত্তর উপকূল পর্যন্ত তাঁর যাতায়াত সহজ হয়ে যায়। উসমান খানের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল এশিয়া মাইনরের পূর্ব ও পশ্চিম রোমান রাষ্ট্রগুলোর মধ্যবর্তী স্থলপথ বন্ধ করে দেওয়া এবং এভাবে তাদের বিচ্ছিন্ন করে ধীরে ধীরে পদানত করা। সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ইউরোপ অভিযানের সময় তখনো অনেক দূরে ছিল।

কিছুকাল তিনি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা উন্নত করতে ব্যস্ত থাকেন। ৭০৭ হিজরিতে তিনি মারমারা সাগরের উপকূল পর্যন্ত আক্রমণ করেন এবং কিছু এলাকা জয় করে নিজের রাষ্ট্রকে সমুদ্রের সাথে যুক্ত করেন। এভাবে পূর্ব ও পশ্চিমের রোমান রাষ্ট্রগুলো একে অপরকে সাহায্য করার অযোগ্য হয়ে পড়ে এবং তুর্কিদের বিজয়ের গতি ত্বরান্বিত হয়। একই বছর তুর্কি বাহিনী কাতা, লাফকা, আক হিসার এবং কুজ হিসারের মজবুত দুর্গগুলো দখল করে। ৭১২ হিজরিতে এই বাহিনী “কিউয়াহ”, “তারাকলু কিচা” এবং “তেকুর বিকারি”-র দুর্গগুলোও জয় করে ফেলেছিল। কিছুকাল পরেই “কুবরা হিসার”-এর মতো দুর্গও ইসলামি পতাকাতলে চলে আসে। [২] [৩]

[১] আরতুগ্রুলের যুগে বিলেজিক জেলা এবং এসকি শেহির জেলার জমি এবং গ্রাম ও জনপদগুলো জয় হয়েছিল কিন্তু জেলা সদর অর্থাৎ শহরগুলো দখলে আসেনি।

[২] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, উজিলমাজ: ১/ ১৯০ থেকে ১৯২; তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, সাইয়েদ মুহাম্মদ, পৃ. ৫৫, ৫৬।

[৩] আখবারুদ দুওয়াল ওয়া ুর্টাল আওয়াল: ৩/ ৯০৮।

বুরসা অভিযান:

বুরসার [১] রোমান শাসক উসমান খানের ক্রমবর্ধমান বিজয়ের সামনে বাঁধ দেওয়ার জন্য “আত্রানোস”, “আদ্রানোস”, “কেস্টেল” এবং “কেতে”-এর নবাবদের সাথে নিয়ে উসমান খানের কেন্দ্র “ইয়েনি শহর”-এর ওপর আক্রমণ করেন। কিন্তু উসমান খান পুরোপুরি প্রস্তুত ছিলেন। তিনি নিজে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে তাদের মোকাবিলা করেন। “কিয়ুন হিসার”-এর ময়দানে এক ভয়াবহ যুদ্ধ হয় যাতে রোমানরা পরাজিত হয় এবং পিছু হটতে বাধ্য হয়। কিন্তু উসমান খান তাদের ছেড়ে দেননি এবং পিছু ধাওয়া করে “ডিম্বোজ”-এর ময়দানে তাদের পুনরায় চ্যালেঞ্জ করেন। এখানে রোমানদের অবশিষ্ট সৈন্যদলও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কেস্টেলের নবাব নিহত হন এবং আত্রানোস ও বুরসার শাসকরা কোনোমতে প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। [২]

এই যুদ্ধের পর উসমান খান বুরসা আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু করেন। বুরসা তার সৌন্দর্য, প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং দুর্গের প্রাচীরের মজবুতীর জন্য অতুলনীয় বলে বিবেচিত হতো এবং মারমারা সাগরের উপকূল থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার দূরে ছিল। এখানকার প্রাকৃতিক ঝরনা, ফলমূল মানুষকে মুগ্ধ করে রাখত। কনকনে শীতের আবহাওয়ায় এই অঞ্চলের গরম পানির ফুটন্ত ঝরনা আল্লাহর কুদরত স্মরণ করিয়ে দিত।

উসমান খান ৭১৭ হিজরিতে বুরসার উভয় পাশে দুটি দুর্গ নির্মাণ শুরু করেন যাতে অবরোধ যত দীর্ঘই হোক না কেন, সৈন্যদের মনোবল না ভাঙে। দুর্গ নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ার পর উসমান খান ৭২২ হিজরিতে সেনাবাহিনী নিয়ে বুরসা কঠোরভাবে অবরোধ করেন। অবরোধ দীর্ঘ হতে থাকে। উসমান খান এই অভিযান তার উত্তরসূরি ওরখান-এর ওপর ন্যস্ত করেন এবং নিজে অন্যান্য শহরের দিকে মনোনিবেশ করেন। তিনি “ইয়েনিজে হিসার”, “আক হিসার” এবং “টেকফুর বিকারি”-কে যুদ্ধ ছাড়াই জয় করে নেন।

ক্রমাগত অভিযান তাকে অসুস্থ করে দিয়েছিল, তাই তিনি নিজের কেন্দ্রে ফিরে আসেন। তার বাহিনী তার প্রতিনিধিদের নেতৃত্বে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে। “কারা তেকিয়া”, “কারা জাইশ” এবং “তুজ বাজারী” সহ অনেক এলাকা এই সময়ে বিজিত হয়। “ইজমিত” এবং “ইজনিক”-এর অনেক জনপদও পদানত হয়। [৩]

অবশেষে চার বছরের অবরোধের পর ২রা রবিউস সানি ৭২৬ হিজরি (৬ এপ্রিল ১৩২৬ খ্রিস্টাব্দ) বুরসা বিজিত হয়। [৪] ওরখান বুরসার নাগরিকদের সাথে অত্যন্ত ভালো ব্যবহার করেন। তার এই চরিত্র দেখে শহরের খ্রিস্টান শাসক “আফরিনোস” ইসলাম গ্রহণ করেন। উসমানীয় দরবার থেকে তাকে ‘বেগ’ উপাধি দেওয়া হয় এবং তিনি উসমানীয় সালতানাতের একজন খ্যাতিমান সেনাপতি হিসেবে প্রমাণিত হন। [৫]

[১] একে “ব্রুসা” এবং “বুরসা”ও বলা হতো।

[২] তারিখ সালাতিন বনি উসমান আজ ইউসুফ বেগ আসাফ, পৃ. ৩৫।

[৩] আখবারুদ দাওলা: ৩/৮, ৯... কিছু ঐতিহাসিকের মতে শহরটির অবরোধ দশ বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। সম্ভবত তারা দুর্গ নির্মাণের শুরু থেকে অবরোধের সময়কাল গণনা করেছেন। তবে এটি জানা যায় যে নিয়মিত অবরোধ ৭২২ হিজরিতে শুরু হয়েছিল, যেমনটি ঐতিহাসিক কুরমানি লিখেছেন। বুরসা কবে বিজিত হয়েছিল? এ বিষয়েও মতভেদ রয়েছে। এক মত অনুযায়ী এটি উসমান খানের জীবদ্দশায় এবং অন্য মত অনুযায়ী তার মৃত্যুর পর ওরখানের যুগে বিজিত হয়। কুরমানি দ্বিতীয় মতটি বর্ণনা করেছেন, কিন্তু যদি উসমান খানের মৃত্যুর তারিখ রমজান ৭২৬ হিজরি মেনে নেওয়া হয় যেমনটি ফারিদ বেগ মহাম্মী লিখেছেন, তবে প্রথম মতটিই অগ্রগণ্য প্রমাণিত হয়।

[৪] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া আজ ইলমাজ: ১/৯৩।

[৫] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়া, পৃ. ১২০।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

উসমান খানের ওসিয়তসমূহ

এদিকে উসমান খানের শারীরিক অবস্থাও অবনতির দিকে যেতে লাগল। আর ওরখান বুরসা বিজয়ের পরপরই এই সংবাদ পেলেন এবং তিনি দ্রুত কেন্দ্রের দিকে চলে এলেন। পিতাকে মৃত্যুশয্যায় দেখে তাঁর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল, তিনি এটি না বলে পারলেন না: “হে মহানুভব! আপনি কত শক্তিশালী শত্রুদের পরাস্ত করেছেন! কত দেশ জয় করেছেন। আজ আপনার এই অবস্থা!!”

পিতা মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁর যোগ্য পুত্রকে উত্তর দিলেন:

“বেটা! আমি আমার রবের কাছে চলে যাচ্ছি। আমি এই বিষয়ে গর্ববোধ করি যে, তুমি প্রজাদের প্রতি ন্যায়বিচারকারী এবং ইসলামের প্রসারের জন্য আল্লাহর পথে জিহাদকারী।” [১]

আমার সন্তান! তুমি জানো যে আমাদের আসল উদ্দেশ্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে সন্তুষ্ট করা, তুমি এটিও জানো যে আল্লাহর দ্বীনের নূর জিহাদের মাধ্যমে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, সুতরাং তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজে নিয়োজিত থাকো। বেটা! আমরা সেই সব লোকদের অন্তর্ভুক্ত নই যারা দেশ দখলের লালসা বা মানুষের ওপর হুকুম চালানোর জন্য যুদ্ধ করে। আমরা তো ইসলামের জন্যই বাঁচি এবং ইসলামের জন্যই মরি। আর আমার বেটা! তুমি এই কাজের জন্য পুরোপুরি যোগ্য।

ইসলামের প্রচার, মানুষের সেদিকে পথপ্রদর্শন এবং মুসলমানদের ইজ্জত-সম্মান ও জান-মালের হেফাজতের দায়িত্ব তোমার কাঁধে এসে পড়েছে। আল্লাহ শীঘ্রই তোমার কাছে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। [২]

তারপর তাকে শেষ ওসিয়তগুলো করে বললেন:

“বেটা! সাবধান! সর্বদা এমন সব বিষয় থেকে বেঁচে থাকবে যার নির্দেশ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দেননি। আমার বেটা! তোমার অনুগতদের সম্মান ও শ্রদ্ধা করে তাদের সাথে রাখবে। বাহিনীকে পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত করতে থাকবে। দেখো! এমন যেন না হয় যে শয়তান তোমাকে সম্পদ ও বাহিনীর অহংকারে লিপ্ত করে দেয়।

বেটা! আমি তোমাকে ওলামায়ে দ্বীনের সর্বদা খেয়াল রাখার, তাদের বেশি বেশি সম্মান করার এবং তাদের পরামর্শ অনুযায়ী চলার ওসিয়ত করছি। তারা তোমাকে কল্যাণ ছাড়া অন্য কিছুর কথা বলবে না। যখন কোনো কঠিন সমস্যা দেখা দেবে তখন ওলামাদের পরামর্শ নেবে। শরীয়তের বিশেষজ্ঞদের থেকে কখনো দূরত্ব বজায় রাখবে না। বেটা! ভালো করে জেনে নাও যে এই দুনিয়ায় আমাদের একমাত্র পথ আল্লাহর পথ, আর আমাদের একমাত্র গন্তব্য আল্লাহর দ্বীনের প্রচার। আমরা দুনিয়া ও পদের প্রত্যাশী নই। [৩] আমার সন্তানদের এবং আমার বন্ধুদের জন্য আমার ওসিয়ত এই যে, দ্বীনের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য আল্লাহর পথে জিহাদ সর্বদা জারি রাখবে, ইসলামের সর্বদা সেবা করতে থাকবে। জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর মাধ্যমে কালিমায়ে তাওহীদকে দুনিয়ার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দেবে।”

[১] তারিখ সালাতিন বনী উসমান, ইউসুফ বেগ আসিফ, পৃ. ৩৫। জওয়ানিব মুদিয়াহ ফি তারিখিল উসমানিয়্যিন, পৃ. ২১

[২] জওয়ানিব মুদিয়াহ ফি তারিখিল উসমানিয়্যিন, পৃ. ২১

[৩] জওয়ানিব মুদিয়াহ ফি তারিখিল উসমানিয়্যিন, পৃ. ৫; আল-উসমানিয়্যুন ফিত তারিখ ওয়াল হাদারাহ, ডক্টর মুহাম্মদ হারব, পৃ. ১৬

“আমার সন্তানদের মধ্যে যে কেউ সত্য ও ন্যায়বিচার থেকে বিচ্যুত হবে, সে কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শাফায়াত থেকে বঞ্চিত হবে। হে বৎস! দুনিয়াতে এমন কেউ নেই যার ঘাড় মৃত্যু নত করে দেয়নি। আল্লাহর হুকুমে আমার অন্তিম সময় ঘনিয়ে এসেছে। আমি এই শাসনভার তোমার হাতে অর্পণ করছি এবং তোমাকে আল্লাহর সোপর্দ করছি। প্রতিটি বিষয়ে ন্যায়বিচারের খেয়াল রাখবে।” [১]

এগুলো ছিল সেই ওসিয়ত যা উসমান খানের পুত্র ও পৌত্রগণ দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছিলেন এবং এগুলো এই সালতানাতের মূল সংবিধানের মর্যাদা লাভ করেছিল। যতক্ষণ পর্যন্ত উসমানীয় সুলতানগণ এগুলোর ওপর অটল ছিলেন, সাফল্য তাদের পদচুম্বন করেছে।

উসমান খানের মৃত্যু:

এই ওসিয়তগুলোর পর ২১ রমজান ৭২৬ হিজরিতে উসমান খান নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। তাঁর বয়স ছিল ৭০ বছর। তাঁর ওসিয়ত অনুযায়ী মরদেহ বুরসায় দাফন করা হয়। [২] তিনি ২৭ বছর শাসন করেন এবং তাঁর পিতার কাছ থেকে প্রাপ্ত চার হাজার আটশ বর্গকিলোমিটারের জায়গিরকে ১৬ হাজার বর্গকিলোমিটার পরিব্যাপ্ত এক শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করেন।

এই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল নিম্নোক্ত শহর ও জেলাসমূহ:

- ১. বিলেচিক
- ২. এসকিশেহির
- ৩. কিফে
- ৪. আক গাজি
- ৫. সাকারিয়া
- ৬. কুতাহিয়াহ
- ৭. মুদানিয়া
- ৮. ইয়েনিশেহির
- ৯. ইনেগোল (বুরসার পার্শ্ববর্তী এলাকা) [৩]

উসমানের রাজনীতির ওপর এক নজর:

উসমান খানের রাজনীতিতে কয়েকটি জিনিসের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। তিনি এক সময়ে কেবল একটি প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধ শুরু করতেন। অত্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী অবরোধসমূহ ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে অব্যাহত রাখা এবং এই অভিযানগুলোর সমস্ত কষ্ট হাসিমুখে সহ্য করা তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিচয় দেয়। তাঁর যুদ্ধকৌশলে রক্তপাত হতো অত্যন্ত কম এবং শত্রু ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হতো। তিনি বিদ্রোহ দমনের জন্য নববিজিত এলাকাগুলোর শাসনব্যবস্থা অত্যন্ত দৃঢ়তা ও সূক্ষ্মতার সাথে পরিচালনা করতেন, সেখানে উন্নয়নমূলক কাজ করতেন, মানুষের সাথে সদয় আচরণ করতেন এবং তাদের কথা ও আচরণের মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। তাঁর ন্যায়বিচার, সদাচরণ এবং ইসলাম প্রচারে তাঁর চরিত্রের প্রভাবের প্রমাণের জন্য এই ঘটনাটিই যথেষ্ট যে, একবার তাঁর দরবারে একজন তুর্কি মুসলিম এবং একজন বাইজেন্টাইন খ্রিস্টান তাদের মামলা নিয়ে আসে। উসমান খান বিষয়টি পর্যালোচনার পর খ্রিস্টান ব্যক্তির পক্ষে রায় দেন। খ্রিস্টান ব্যক্তিটি অবাক হয়ে বলল:

“আপনি আমার পক্ষে কীভাবে রায় দিলেন অথচ আমি তো মুসলিম নই।”

উসমান খান বললেন: “আমি তোমার পক্ষে কেন রায় দেব না যখন আল্লাহর নির্দেশ হলো:”

[১] আস-সালাতিনুল উসমানিয়্যুনে, পৃ. ৩৩

[২] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়্যাহ, পৃ. ১২২

[৩] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ, ইলমাজ: ১/ ৯৩, ৯৪

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানতসমূহ তার হকদারদের নিকট পৌঁছে দাও এবং যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার করো, তখন ইনসাফের সাথে বিচার করো.....” [১]

এটি দেখে সেই খ্রিস্টান তৎক্ষণাৎ মুসলিম হয়ে গেল। [২]

উসমান খান ন্যায়বিচার ও ইনসাফ এবং দয়া ও অনুগ্রহের পাশাপাশি প্রতিটি প্রদেশে বেশ ভালো একটি স্থায়ী সেনাবাহিনী মোতায়ন রাখতেন। তাঁর রাজনীতির সফলতা এখান থেকেই স্পষ্ট যে, এত দীর্ঘ শাসনকালে তাঁর বিরুদ্ধে কোনো বিদ্রোহ হয়নি।

উসমান খান ছিলেন অত্যন্ত সাহসী, যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী, সঠিক মতামতের অধিকারী, দূরদর্শী, উচ্চাভিলাষী, দয়ালু এবং আত্মমর্যাদাশীল একজন মানুষ। তিনি প্রজাদের সাথে সর্বদা সদাচরণ করতেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ছিল অত্যন্ত দরবেশসুলভ। তিনি তাঁর উত্তরাধিকার হিসেবে কয়েক জোড়া পশমি পোশাক, একটি পাগড়ি এবং একটি উত্তম পোশাক ছাড়া আর কিছুই রেখে যাননি। [৩] ইতিহাসে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এইটুকুই যথেষ্ট ছিল যে, তিনি ছয় শতাব্দী ধরে টিকে থাকা “উসমানীয় সাম্রাজ্যের” প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

উসমানীয়দের দুই শত্রু:

উসমানীয়দের নবজাতক রাষ্ট্রের প্রধান শত্রু ছিল দুইজন: এক মঙ্গোল এবং অন্যটি বাইজেন্টাইন। উসমান খানের সৌভাগ্য ছিল যে, সেই সময়ে মিসর ও সিরিয়ায় মামলুকদের শাসন ছিল যারা মঙ্গোলদের কঠোরতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। তাদের উপস্থিতির কারণে মঙ্গোলদের অধিক মনোযোগ সিরিয়ার দিকে নিবদ্ধ ছিল এবং এশিয়া মাইনরে তাদের আক্রমণের তীব্রতা কমে গিয়েছিল। অন্যদিকে মঙ্গোলদের মধ্যেও ইসলাম ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং এভাবে উসমান খানের মৃত্যুর আগেই এশিয়া মাইনর তাদের বিপদ থেকে নিরাপদ হয়ে গিয়েছিল।

উসমানীয় শব্দের অর্থ:

উসমানীয় সাম্রাজ্যের ছোট-বড় সকল সদস্য “উসমানীয়” নামে পরিচিত ছিল। এর অর্থ এই ছিল না যে তারা সবাই উসমান খানের বংশধর ছিল। বরং “উসমানীয়” ছিল একটি “দল” এবং একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠী, যেমনটি ছিল উমাইয়া ও আব্বাসীয়রা, যারা যদিও একটি বংশগত ও জাতিগত পরিচয় রাখত, তবে সাধারণত তাদের প্রত্যেক অনুগত ব্যক্তিকে উমাইয়া বা আব্বাসীয় বলা হতো।

[১] সূরা আন-নিসা, আয়াত নম্বর: ৫৮

[২] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া লিস-সাল্লাবি, পৃ. ৪৮, হাওয়ালা: জাওয়ানিবে মুদিয়াহ ফি তারিখিল উসমানিয়্যিন, পৃ. ৩৩

[৩] তারিখ সালাতিন বনি উসমান, ইউসুফ বেক আসিফ, পৃ. ৩৩

অরখান

৭২৬ হিজরি থেকে ৭৬১ হিজরি

(১৩২৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩৬০ খ্রিষ্টাব্দ)

উসমান খানের উত্তরসূরি “অরখান” তার পিতার জীবদশাতেই নিজের সামরিক দক্ষতা ও রাজনৈতিক যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছিলেন। তিনি ৬৮৭ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। সিংহাসনে আরোহণের সময় তার বয়স ছিল ৩৮ বছর। [১]

সীমান্তে রাজধানী:

অরখানের লক্ষ্য ছিল সমুদ্রের ওপারের ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো, যেগুলোতে আক্রমণের জন্য বুর্সা সেরা কেন্দ্র হতে পারত, তাই তিনি “বুর্সা”-কে নিজের রাজধানী বানান। কিছু ঐতিহাসিকের মতে, খোদা উসমান খান এর তাগিদ দিয়েছিলেন। এটি ছিল একটি সাহসী ও বিস্ময়কর কৌশল যে, নিজের শাসনকেন্দ্র শত্রুর সীমান্তে স্থাপন করা। সাধারণত শাসকরা রাষ্ট্রের কোনো মধ্যবর্তী শহরকে কেন্দ্র বানান যাতে সালতানাতের সমস্ত শহরের সাথে যোগাযোগ থাকে এবং কেন্দ্র শত্রুর আক্রমণের আওতা থেকে দূরে থাকে। কিন্তু উসমানীয় সুলতানরা এর ঠিক উল্টোটা ভেবেছিলেন যে, কেন্দ্র বাইজেন্টাইনদের সীমান্তে হওয়া উচিত, এজন্যই অরখান বুর্সাকে রাজধানী বানান। এরপর যখন মারমারা সাগরের ওপারের এলাকাগুলো বিজিত হলো, তখন আলে উসমান “এদিরনে” (আড্রিয়ানোপল)-কে কেন্দ্র বানিয়ে নেয়। যদিও এভাবে যুদ্ধের সময় রাজধানী শত্রুর ঘেরাওয়ে চলে আসার ঝুঁকি বিদ্যমান ছিল, কিন্তু জিহাদের উদ্দীপনায় ভরপুর উসমানীয়দের কাছে এমন আশঙ্কার কোনো গুরুত্ব ছিল না। বাস্তবতা ছিল এই যে, তাদের আসল লক্ষ্য অর্থাৎ বাইজেন্টাইন রাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধে জিহাদে পূর্ণ মনোযোগ তখনই দেওয়া সম্ভব ছিল যখন শাসক নিজে রণাঙ্গনে বা তার খুব কাছাকাছি থাকতেন।

এছাড়া উসমানীয়দের সামনে পূর্ববর্তী ইতিহাস ছিল যে, শতাব্দীকাল ধরে মুসলমানরা এশিয়া মাইনরের সীমান্তে বসবাস করেও এর পূর্ণ প্রতিরক্ষা করতে পারেনি। এখানে রোমানরা সবসময় লুটতরাজ ও ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর সুযোগ পেত, যার কারণে তারা কখনোই এই অঞ্চলটি পুনরুদ্ধারের চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারেনি। এর প্রতিকার এটাই হতে পারত যে, ইসলামি সরকারের কেন্দ্র রোমানদের সীমান্তে হবে এবং তাদের এলাকাগুলোতে অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে যাতে ইউরোপীয় দেশগুলো তাদের শেষ সীমানা রক্ষার চিন্তায় মগ্ন থাকে এবং ইসলামি বিশ্বের দিকে আসার চিন্তা তাদের মন থেকে মুছে যায়। এই রণকৌশলের ভিত্তি যদিও উসমান খান স্থাপন করেছিলেন কিন্তু...

[১] আখবারুদ দুওয়াল: পৃ. ১০৩

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

এই পদক্ষেপ ওরহানকে সুযোগ করে দিল। তিনি বুর্সাকে কেন্দ্র বানােন এবং নিজের বাহিনীকে আনাতোলিয়ার চারদিকে ছড়িয়ে দিলেন এবং বাইজেন্টাইনদের অবশিষ্ট কেল্লা ও শহরগুলো জয় করতে দেরি করেননি। [১]

আনাতোলিয়ায় বিজয়সমূহ:

সিংহাসন আরোহণের এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই ওরহান এশিয়া মাইনরের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর নিকোমিডিয়া (ইজমিত) জয় করে নেন। ৭৩১ হিজরিতে তিনি “কয়ুন হিসার” এবং খ্রিস্টানদের ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় শহর “নাইসিয়া” (ইজনিক) দখল করেন, যেখানে বড় বড় পাদ্রী ও সন্ন্যাসীরা বসবাস করতেন। এখন এশিয়া মাইনরে বাইজেন্টাইনদের শেষ শহর ছিল “ইজনিক”। দুই বছরের অবরোধের পর এই শহরটিও জয় করা হয় এবং এশিয়া মাইনর থেকে বাইজেন্টাইন শাসনের চিহ্ন মুছে যায়। ৭৩৬ হিজরিতে (১৩৩৬ খ্রিস্টাব্দে) ওরহান পশ্চিম আনাতোলিয়ার মারমারা সাগরের দক্ষিণে অবস্থিত “কারাসি” রাজ্যকেও নিজের সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। [২]

নির্মাণ কাজ এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পুনর্গঠন:

এই বিজয়গুলোর পর ওরহান প্রায় বিশ বছর কোনো যুদ্ধে লিপ্ত না হয়ে পূর্ণ মনোযোগের সাথে সালতানাতের নির্মাণ ও উন্নয়নে ব্যস্ত থাকেন। তিনি বুর্সা ও ইজনিকে দুটি উচ্চমানের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া সমস্ত বিজিত শহরে মাদ্রাসা ও খানকাহ খুলে দেন যাতে ইসলামের দাওয়াত ও শিক্ষা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। বিজয়ের পর তিনি প্রতিটি স্থানে স্থানীয় খ্রিস্টানদের সাথে দয়া ও মহানুভবতার আচরণ করেন, তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করেন এবং যারা হিজরত করতে ইচ্ছুক ছিল তাদের এই অনুমতি দেন যে তারা যেন তাদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে সমস্ত ধন-সম্পদ ও আসবাবপত্রসহ যেখানে ইচ্ছা চলে যেতে পারে। [৩]

নতুন মুদ্রা প্রচলন:

ওরহানের পিতা উসমান খান কেবল নিজের নামে খুতবা পাঠের ওপরই সন্তুষ্ট ছিলেন এবং নিজের নামে কোনো মুদ্রা জারি করেননি। ওরহানের সিংহাসন আরোহণের সময় আনাতোলিয়ায় সেলজুক আমলের মুদ্রা প্রচলিত ছিল। ওরহান বাদশাহীর এই স্বাতন্ত্র্য এবং সংরক্ষিত রাজ্যগুলোর জন্য নিজের নামে মুদ্রাও জারি করেন। [৪]

আলাউদ্দিন আলী বেগ এবং আলাউদ্দিন পাশা, একটি ভুল ধারণার নিরসন:

উসমান খানের ছয়জন পুত্র ছিল: (১) ওরহান (২) আলাউদ্দিন আলী বেগ (৩) পাজারলি (৪) চুবান (৫) মালিক (৬) হামিদ। তাদের মধ্যে ওরহান সবার বড় ছিলেন। তার পরে ছিলেন আলাউদ্দিন আলী বেগ। একটি সাধারণ ভুল ধারণা রয়েছে যে আলাউদ্দিন আলী বেগ বড় ভাই ছিলেন। এই ভুল ধারণার ওপর ভিত্তি করে ইতিহাসে এই অনুমানও করে নেওয়া হয়েছে যে ওরহান যখন ছোট ছিলেন...

[১] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়া, পৃ. ১২৩, ১২৪; তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া লি-ইলমাজ: ১/৯৩, ৯৪।

[২] আখবারুদ দুওয়াল: ৩/১০; তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়া, পৃ. ১২৩।

[৩] আখবারুদ দুওয়াল: ৩/৯ থেকে ১১; তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়া: ২৩ থেকে ১২৮।

[৪] দৌলতে উসমানিয়া লি-ডক্টর আজিজ: ১/২৭, দারুল মুসান্নিফীন আজমগড়, ভারত।

বড় ভাই হওয়া সত্ত্বেও আলাউদ্দিন ধৈর্য ধারণ করেন এবং ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের সাথে ভাইয়ের উজির হয়ে সালতানাতের সেবা করতে থাকেন। এটি একটি বড় ভুল ধারণা।

গবেষকদের মতে, যে আলাউদ্দিন উজিরের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং ‘পাশা’ নামে পরিচিত ছিলেন, তিনি ছিলেন ভিন্ন এক ব্যক্তি। তিনি গাজী উসমান খানের আমল থেকেই উজিরের পদে ছিলেন। পক্ষান্তরে আলাউদ্দিন আলী বেগ বিন উসমান খান ওরহান থেকে ছোট ছিলেন। তিনি কখনো উজিরের পদে ছিলেন না, তবে ওরহানের শাসনামলে তাকে ‘বেলারবে’ অর্থাৎ প্রধান সেনাপতি বানানো হয়েছিল। দীর্ঘ সময় এই দায়িত্ব পালনের পর ওরহানের শাসনামলেই তার মৃত্যু হয় এবং তাকে তার পিতার পাশে দাফন করা হয়। [১]

মনসব-এ-ওজারাত:

উসমানীয় সালতানাতে উজিরের পদের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। [২] উসমান খানের সময় থেকেই নিয়ম ছিল যে, এই পদের জন্য সরকারি কর্মকর্তাদের বাইরে থেকে কোনো বিজ্ঞ আলেমকে নিয়োগ দেওয়া হতো। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত উসমানীয়দের মধ্যে এই প্রথা চালু ছিল, যার ফলে উসমানীয় সালতানাত উচ্চপর্যায়ের উজির লাভ করেছিল, যাদের মধ্যে আলাউদ্দিন পাশা বিন হাজী কামালউদ্দিনের নাম তালিকার শীর্ষে রয়েছে। তিনি উসমান খানের পর ওরহানের শাসনামলেও উজির ছিলেন। [৩]

পাশা খেতাব:

আলাউদ্দিন ছিলেন উসমানীয় সালতানাতের প্রথম পদাধিকারী যিনি পাশা খেতাব পেয়েছিলেন। তার পর ওরহানের বড় ছেলে সুলাইমান শাহকে এই খেতাবে ভূষিত করা হয়। প্রথম মুরাদের আমলে পাশা খেতাব কারা খলিলকে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে একই সাথে একাধিক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে এই খেতাবে ভূষিত করা হতে থাকে। [৪]

আলাউদ্দিন পাশার কীর্তি:

আলাউদ্দিন পাশা ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানী, ইবাদতকারী, দুনিয়াবিমুখ এবং সুফি-সাধকদের খাদেম। তিনি ছিলেন মুসলিম বিশ্বের এমন এক উজ্জ্বল নক্ষত্র যিনি চিন্তার গভীরতা, উচ্চতর আদর্শ এবং পরিকল্পনা প্রণয়নের অসাধারণ যোগ্যতায় সমৃদ্ধ ছিলেন। তিনি নবগঠিত উসমানীয় সালতানাতের জন্য এমন কিছু মূলনীতি ও নিয়মকানুন নির্ধারণ করেছিলেন যে, তা শুরু থেকেই উন্নতি ও স্থিতিশীলতার পথে চলতে শুরু করে। তিনি সেনাবাহিনী, বিচার বিভাগ এবং পুলিশ বিভাগে এমন সব সংস্কার করেছিলেন যে দীর্ঘকাল পর্যন্ত সেগুলোতে কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজন পড়েনি। সে সময়ের সমসাময়িক সালতানাতগুলো শাসনব্যবস্থা ও আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে স্থবিরতার শিকার ছিল। আলাউদ্দিন সময়ের দাবি বুঝে এমন এক কার্যকর পরিবেশ তৈরি করেছিলেন যে উসমানীয় সালতানাত বাকি বিশ্ব থেকে অনেক এগিয়ে গিয়েছিল। [৫]

[১] তারিখ-ই-উসমানি আজ উজুন: ১/১৩৬, ১৩৭।

[২] এই পদকে পরবর্তীতে “সদারত-ই-উজমা” এবং পদাধিকারীকে “সদর-ই-আজম” বলা হতে থাকে।

[৩] তারিখ-ই-উসমানি আজ উজুন: ১/১৩৯।

[৪] দৌলত-ই-উসমানিয়া আজ ডক্টর আজিজ: ১/৩১, বরাতে হার্বার্ট গিবন্স।

[৫] তারিখ আদ-দাওলা আল-আলিয়া, পৃ. ১২২।

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

জায়গিরদারি ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত সমস্যাসমূহ:

শতাব্দীকাল ধরে বিশ্বের সকল রাজতন্ত্রে বাদশাহর শক্তি জায়গিরদারদের আনুগত্য ও আজ্ঞাবহতার ওপর নির্ভরশীল ছিল। কেবল এবং সৈন্যবাহিনী তাদের কাছেই থাকত। তারা জায়গিরের জমির ফলন থেকে ফায়দা হাসিল করত এবং এর বিনিময়ে কেন্দ্রকে প্রয়োজন অনুযায়ী জনশক্তি সরবরাহ করত। কিন্তু এই ব্যবস্থা অনেক সময়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল:

- (১) জায়গিরগুলোতে কর্মরত ব্যক্তি ও কৃষকরাই সাধারণত সৈন্য হিসেবে যুদ্ধে যেত, তাই সেনানিবাসগুলোতে স্থায়ী সৈন্যের সংখ্যা কম থাকত। যুদ্ধের পর অধিকাংশ সৈন্য নিজ নিজ গ্রাম, জনপদ ও জায়গিরে ফিরে যেত এবং প্রাত্যহিক কাজে লিপ্ত হতো। যে সকল জায়গিরদার বেশি শক্তি অর্জন করত, তারা মাঝেমাঝে বিদ্রোহ করে স্বাধীন হয়ে যেত। তাই কোনো শাসকই জায়গিরদারদের পক্ষ থেকে পুরোপুরি নিশ্চিত থাকতে পারতেন না। আলাউদ্দিন কোনোভাবে এই সময়ের সমাধান করতে চেয়েছিলেন।
- (২) দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটি ছিল সেই সব লোকদের নিয়ে যারা তাদের পৈতৃক ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, কীভাবে তাদের আনুগত্যকে সুদৃঢ় করা যায়। তাদের মর্যাদা ছিল “মুয়াল্লাফাতুল কুলুব”-এর মতো। যদি তাদের সাথে সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ আচরণ না করা হতো, তবে আশঙ্কা ছিল যে তারা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়বে এবং উম্মাহর জন্য একটি দরকারী অংশ হওয়ার পরিবর্তে একটি আলাদা গোষ্ঠী হয়ে যাবে অথবা তাদের পূর্ববর্তী ধর্মে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করবে।
- (৩) তৃতীয় সমস্যাটি ছিল রাজ্যের জিম্মি খ্রিস্টানদের নিয়ে যারা বারবার মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করত। তাদের ইসলামের সাথে পরিচিত করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। প্রথমত এজন্য যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার দায়িত্ব মুসলমানদের ওপর অর্পিত ছিল। দ্বিতীয়ত এজন্য যে, যদি এই লোকেরা ইসলাম থেকে দূরে থাকে তবে এখানে কেবল শক্তির জোরে মুসলমানদের কর্তৃত্ব চিরকাল টিকে থাকতে পারত না।
- (৪) চতুর্থ সমস্যাটি ছিল যুদ্ধে নিহত বা নিখোঁজ হওয়া খ্রিস্টানদের এতিম সন্তানদের নিয়ে যারা এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াত। যদি তাদের পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রশিক্ষণ না দেওয়া হতো তবে তারা সমাজের জন্য একটি কলঙ্ক হয়ে দাঁড়াত।

সমস্যার সমাধান - সেনাবাহিনীর পুনর্গঠন:

এই সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্য আলাউদ্দিন পাশা সেনাবাহিনীর পুনর্গঠন জরুরি মনে করেন এবং এই বিভাগকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন।

উসমান খান পাশার আমলে সেনাবাহিনীর ব্যবস্থা ছিল গোত্রীয় প্রকৃতির। বাদশাহর আহ্বানে সেনাবাহিনী আসত এবং যুদ্ধ শেষে তাদের ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হতো। আলাউদ্দিন পাশা একটি নিয়মিত সামরিক ব্যবস্থা বিন্যস্ত করেন যার ফলে সকল সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ কমান্ড স্বয়ং বাদশাহর হাতে থাকত। বাদশাহর অধীনস্থ প্রদেশগুলোকে “সুবাশি” বলা হতো, আর প্রধান সেনাপতিকে বলা হতো “বেলারবে”। এই পদটি সাধারণত কোনো শাহজাদাকে দেওয়া হতো। ওরহানের আমলে প্রথমে শাহজাদা সুলাইমান পাশা এবং পরে শাহজাদা মুরাদ খান বেলারবে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

উসমান খানের আমল থেকে সকল শহর ও জনপদে কাজী নিযুক্ত করা হয়েছিল। এই ব্যবস্থা যথারীতি বহাল থাকে।

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

চতুর্থ খণ্ড

রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো গভর্নর এবং সেনাপতিদের মাধ্যমে বাদশাহর দরবারে পেশ করা হতো এবং সেখান থেকে আদেশ জারি করা হতো।

নতুন সংস্কার অনুযায়ী বাহিনীকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছিল: ১. বেতনভুক্ত ২. জায়গিরদার ৩. অনিয়মিত।

আবার এদের প্রত্যেকের দুটি করে ধরণ ছিল: ১. অশ্বারোহী ২. পদাতিক।

নিয়মিত বাহিনীর পদাতিকদের ‘ইয়ায়া’ এবং অশ্বারোহীদের ‘মুসাল্লাম’ বলা হতো। অশ্বারোহী বাহিনী আনাতোলিয়ার তুর্কি যুবকদের নিয়ে গঠিত হতো। পদাতিক বাহিনী দশ, একশ এবং এক হাজারের ছোট-বড় দলে বিভক্ত ছিল। দশজন সৈন্যের অফিসারকে ‘অন বাশি’, একশ সৈন্যের অফিসারকে ‘ইউজ বাশি’ এবং এক হাজারের অফিসারকে ‘বিন বাশি’ বলা হতো। অশ্বারোহীরা পাঁচজনের দলে বিন্যস্ত ছিল এবং প্রতি ছয়টি দল (ত্রিশজন অশ্বারোহী) নিয়ে একটি ছোট ইউনিট গঠিত হতো।

পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী শান্তিকালীন সময়ে সরকারের পক্ষ থেকে নির্ধারিত জমি থেকে বেতন পেত এবং সকল প্রকার কর থেকে মুক্ত ছিল। যুদ্ধের সময় এদের প্রত্যেক সৈন্যকে দৈনিক দুটি স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া হতো। এই নিয়মিত বাহিনীই ছিল রাষ্ট্রের মূল শক্তি।

[১]

সামগ্রিকভাবে স্থায়ী বাহিনীতে ৯০ হাজার সৈন্য ছিল। ৪০ হাজার অশ্বারোহী এবং ৫০ হাজার পদাতিক। [২]

জায়গিরদার বাহিনীকে বিজিত অঞ্চলে মোতায়ন করা হতো এবং সেখানকার জায়গিরের আয় তাদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হতো। সেখানকার সীমান্ত রক্ষার পাশাপাশি দুর্গ ও রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত, মালামাল পরিবহন এবং খনির কাজের মতো দায়িত্বও তাদের ওপর ছিল। বড় জায়গিরকে ‘জায়ামত’ এবং ছোট জায়গিরকে ‘তিমার’ বলা হতো।

অনিয়মিত বাহিনী (স্বেচ্ছাসেবী) ‘আকিনজি’ নামে পরিচিত ছিল, যারা গনিমতের মালের অংশ পেত। এদের মধ্যে ‘আখিয়ান-ই-রুম’, ‘গাজিয়ান-ই-রুম’ এবং ‘আবদালিয়ান-ই-রুম’ নামে মুজাহিদদের আলাদা আলাদা দল ছিল যারা প্রয়োজন অনুযায়ী কাজ করত। যুদ্ধ ছাড়া সাধারণ দিনগুলোতে তারা জীবনের বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত থাকত। প্রায়ই যুদ্ধের সময় এই স্বেচ্ছাসেবীরাই সবার আগে থাকত এবং প্রথম আক্রমণ তারাই করত। শত্রু যখন তাদের সাথে যুদ্ধ করে ক্লান্ত হয়ে পড়ত, তখন নিয়মিত বাহিনী সুসংগঠিতভাবে আক্রমণ করত। [৩]

ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের জবানিতে উসমানীয় বাহিনীর প্রশংসা:

এই নতুন গঠন ও সংস্কারের ফলে উসমানীয় সালতানাতের বাহিনী খুব দ্রুত একটি অপরাজেয় শক্তিতে পরিণত হয়। একজন ইউরোপীয় পর্যটক ‘ব্রোকুয়ের’ এই বাহিনীর কর্মদক্ষতার প্রশংসা করে লেখেন:

[১] তারিখ-ই-উসমানি, উজুন: ১/ ১৫১, ১৫২, ৫৭১ থেকে ৫৮৩; দৌলত-ই-উসমানিয়া, ডক্টর উয়ায়ের: ১/ ২৭ থেকে ৩০, ত. দারুল মুসান্নিফীন আজমগড় ভারত; ফি উসুলুত তারিখিল উসমানি, আহমদ আব্দুর রহিম মুস্তফা, পৃ. ৩৩ থেকে ৩৫, ত. দারুলশ শুরুক।

[২] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ, পৃ. ৯৭।

[৩] তারিখ-ই-উসমানি, উজুন: ১/ ৫৭১ থেকে ৫৮৩; দৌলত-ই-উসমানিয়া, ডক্টর উয়ায়ের: ১/ ২৭ থেকে ৩০, ত. দারুল মুসান্নিফীন আজমগড় ভারত; ফি উসুলুত তারিখিল উসমানি, আহমদ আব্দুর রহিম মুস্তফা, পৃ. ৩৩ থেকে ৩৫, ত. দারুলশ শুরুক।

তারিখে উন্মতে মুসলিমা

“উসমানীয়রা আগেই জানতে পারে যে খ্রিস্টান বাহিনী কখন আসছে এবং কোথায় তাদের মোকাবিলা করা ফলপ্রসূ হবে। এর কারণ হলো উসমানীয়রা যুদ্ধের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে। তাদের চাউশ (পর্যবেক্ষণকারী দল) এবং গোয়েন্দারা সঠিক পথনির্দেশনা প্রদান করে।”

সেই পর্যটকই লিখছেন:

“উসমানীয়রা হঠাৎ রওনা হতে পারে। একশ খ্রিস্টান সৈন্য দশ হাজার উসমানীয়র তুলনায় বেশি শোরগোল করে। দামামা বাজার সাথে সাথেই উসমানীয়রা কুচকাওয়াজ শুরু করে দেয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত নির্দেশ না পায়, ততক্ষণ তারা নিজেদের কদম মোটেও থামায় না। হালকা অস্ত্রে সজ্জিত হওয়ার কারণে তারা এক রাতে ততটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে ফেলে, যতটুকু খ্রিস্টানরা তিন দিনে অতিক্রম করে।” [১]

এক শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপ এমন সুসংগঠিত বাহিনী তৈরি করতে অক্ষম ছিল। ফ্রান্সের রাজা অষ্টম চার্লসের পনেরোটি সামরিক দল, যেগুলোকে আধুনিক যুগের প্রথম পেশাদার সেনাবাহিনী মনে করা হয়, তা ওরখানের সামরিক সংস্কারের এক শতাব্দী পর অস্তিত্বে এসেছিল। [২]

মারমারা সাগরের ওপারে:

আল্লাহর কালিমাকে প্রতিটি অঞ্চলে সমুন্নত করা ওরখানের উদ্দেশ্য ছিল। বুর্সার মতো শক্তিশালী উপকূলীয় শহরকে কেন্দ্র বানানোর পর এবং আশেপাশের সমস্ত দুর্গ ও শহর জয় করার পরেও তিনি ইউরোপে আক্রমণ করতে তাড়াছড়ো করেননি। তিনি অত্যন্ত সতর্ক ও দূরদর্শী মানুষ ছিলেন এবং জানতেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের সালতানাত মজবুত না হয়, ততক্ষণ কোনো বড় যুদ্ধ শুরু করা আত্মহত্যার শামিল। তাছাড়া এই যুদ্ধ কোনো একটি দেশের সাথে ছিল না, বরং মোকাবিলায় ইউরোপের ডজন ডজন ছোট-বড় রাষ্ট্র ছিল।

ওরখান উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করতে থাকেন। এশিয়া মাইনরের বিজিত শহরগুলোকে সমৃদ্ধ ও স্থিতিশীল করতে এবং ইয়েনি চেরি-র মতো জানবাজ বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিতে অনেক বছর কেটে গেল। এই বাহিনী প্রস্তুত হওয়ার পর ওরখান অনুভব করছিলেন যে এখন ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায় খোলার সময় এসে গেছে; মুসলমানদের এখন ইউরোপে কদম রেখে এক নতুন পৃথিবী গড়ার কাজ শুরু করে দেওয়া উচিত। এমন সময় আল্লাহর ইচ্ছায় এই পদক্ষেপের জন্য এক বিরল সুযোগ তৈরি হলো।

১৩৪৭ খ্রি. (১৩৩১ হি.)-এ কনস্টান্টিনোপলের রাজা তৃতীয় অ্যান্ড্রোনিকাসের মৃত্যুর পর রাজপরিবারে ফাটল ধরেছিল। তার ছেলে জন প্যালিওলোগাস ছিল মাত্র ৯ বছরের। এর সুযোগ নিয়ে উজির-এ-সালতানাত কান্টাকুজেনাস সরকারের ওপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেন। রানী এর বিরোধিতা করেন, ফলে রানী এবং কান্টাকুজেনাসের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। ছয় বছর পর্যন্ত সালতানাতে বিশৃঙ্খলা বিরাজ করে। কান্টাকুজেনাস কনস্টান্টিনোপলে প্রবেশের চেষ্টা করতে থাকেন কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। অবশেষে তিনি অনুভব করলেন যে এই লড়াইয়ে তারই পাল্লা ভারী থাকবে, যে সমুদ্রের ওপারের মুসলিম বাদশাহর সমর্থন লাভ করবে। তিনি ওরখানের কাছে বার্তা পাঠালেন যে, যদি তিনি তাকে সামরিক সাহায্য করে জিতিয়ে দেন, তবে বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে তিনি নিজের মেয়েকে তার সাথে নিকাহ দেবেন। ওরখান এভাবে ইউরোপে কদম রাখার সুযোগ পাচ্ছিলেন, তাই তিনি তৎক্ষণাৎ ছয় হাজার সৈন্য সাহায্যের জন্য...

[১] দৌলতে উসমানিয়া, ডক্টর উযায়ের: ১/ ৩০, ৩১, সূত্র: হার্বার্ট গিবন্স

[২] দৌলতে উসমানিয়া, ডক্টর উযায়ের: ১/ ৩০

পাঠিয়ে দিলেন, কান্তাকুজেনোস তাদের সহযোগিতা এবং দরবারের কিছু আমিরের সমর্থনের কারণে কনস্টান্টিনোপলে প্রবেশ করতে সক্ষম হলেন। রানীকে তার সাথে সন্ধি করতে হলো। স্থির হলো যে রাজত্ব একটি প্যানেলের ওপর ন্যস্ত থাকবে যাতে পাঁচজন ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত থাকবেন: রানী, শাহজাদা জন প্যালিওলোগোস, কান্তাকুজেনোস, তার স্ত্রী এবং কন্যা। কান্তাকুজেনোস চুক্তি অনুযায়ী তার এক কন্যাকে (যিনি প্যানেলের সদস্য ছিলেন) শাহজাদা জন প্যালিও-র সাথে বিয়ে দিলেন। দ্বিতীয় কন্যাকে ওরখানের নিকাহে দান করলেন।

৭৫৬ হিজরি (১৩৫৫ খ্রিস্টাব্দ) সালে কনস্টান্টিনোপল এক নতুন বিপদের সম্মুখীন হলো। সার্বিয়ার শাসক স্টিফেন ডুসান বুলগেরিয়া দখল করে নিজের শক্তি অনেক বাড়িয়ে নিয়েছিলেন। তিনি বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যকে দুর্বল দেখে এর সালোনিকা রাজ্য দখল করে নিলেন এবং এরপর কনস্টান্টিনোপল আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন। কনস্টান্টিনোপলের রাজপরিবারের সদস্যরা এটি দেখে আবারও মুসলমানদের কাছে সাহায্য চাইলেন। ওরখান সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে দিলেন যারা স্টিফেন ডুসানকে কনস্টান্টিনোপল পৌঁছানোর আগেই বাধা দেওয়ার প্রস্তুতি নিল। তবে যুদ্ধের প্রয়োজন হয়নি, বরং স্টিফেন পথেই মারা যান এবং তার বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। বিপদ কেটে যাওয়ার পর মুসলমানরা ফিরে আসেন।

ওরখান সমুদ্র পাড়ি দেওয়া সেনাপতিদের কাছ থেকে ইউরোপের উপকূলীয় রাজ্যগুলোর অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারতেন। ইউরোপীয়দের বিশৃঙ্খলা ও দুর্বলতাকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে সেখানে ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করার এটিই ছিল উপযুক্ত সময়। ফলে ওরখান সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করলেন এবং মারমারা সাগরের সামুদ্রিক এলাকা দার্দানেলেস-এ এমন কিছু ঢৌকি স্থাপন করলেন যেখান থেকে নির্দেশ পাওয়া মাত্রই মুসলমানরা সমুদ্র পার হতে পারতেন। অবশেষে কিছুকাল পর উসমানীয় বংশের ইউরোপে আনুষ্ঠানিকভাবে পা রাখার সুযোগ মিলে গেল। ঘটনাটি ছিল এমন যে, কনস্টান্টিনোপলে কান্তাকুজেনোস সমস্ত রাজকীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করার চেষ্টা করেন। রানী এবং শাহজাদা জন প্যালিও এর প্রতিরোধ করেন। তাদের পাল্লা ভারী দেখে কান্তাকুজেনোস আবারও উসমানীয় সালতানাতের কাছে সাহায্য চাইলেন এবং বিনিময়ে এই অনুমতি দিলেন যে, মুসলমানরা উপকূলের বেশ কিছু দুর্গ দখল করে নেবে, তার পক্ষ থেকে কোনো বাধা দেওয়া হবে না।

ওরখান এই অভিযানের জন্য তার সাহসী পুত্র ৩৮ বছর বয়সী সুলাইমান পাশাকে নির্বাচন করলেন, যিনি সালতানাতের বিগলর বেগি (প্রধান সেনাপতি) ছিলেন। সেই সময় পর্যন্ত উসমানীয় সালতানাত প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল এবং সমুদ্রে তাদের তেমন প্রভাব ছিল না, ফলে তাদের কাছে নৌকা বা যুদ্ধজাহাজের সংখ্যা এত বেশি ছিল না যে কোনো বড় সৈন্যবাহিনী তাতে আরোহণ করতে পারে। সুলাইমান পাশা এই অভাব এভাবে পূরণ করলেন যে, কাঠের তক্তা জোড়া দিয়ে সাধারণ নৌকা তৈরি করালেন এবং তাতে ৪০ জন জানবাজ যোদ্ধাকে নিয়ে “কামার” উপকূল থেকে রাতের অন্ধকারে “দার্দানেলেস” পার হলেন। অন্য পাড়ে নেমে এই মুজাহিদিনরা বাইজেন্টাইনদের নৌকাগুলো দখল করলেন এবং সেগুলো টেনে নিয়ে ফিরে এলেন। এই নৌকাগুলোর সাহায্যে ইসলামী বাহিনী পার হতে থাকল। এরা ছিল ৩০ হাজার সৈন্য যাদের নিয়ে সুলাইমান কনস্টান্টিনোপলের দিকে অগ্রসর হলেন এবং শাহজাদা জন প্যালিওকে পরাজিত করে কান্তাকুজেনোসের রাজত্ব সুসংহত করলেন। এই অভিযানের সাথেই সুলাইমান পাশা উপকূলীয় দুর্গ “জিম্পে”-র ওপরও দখল প্রতিষ্ঠা করলেন। এরপর পার্শ্ববর্তী আরও অনেক দুর্গ জয় করা হলো। [১]

[১] আখবারুদ দুয়াল: ৩ / ১১; তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়া, পৃ. ১২৩ থেকে ১২৭; আত-তারিখুল ইসলামি - মাহমুদ শাকির: ৮ / ২৬, ২৭; তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া - ইলমাজ: ১ / ৯৫, ৯৬; তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া - সাইয়েদ মুহাম্মদ, পৃ. ৯১, ৯২।

গ্যালিপোলি বিজয়:

এখান থেকে নিকটতম বড় শহর ছিল “গ্যালিপোলি”। সেখানকার শাসক “টেগুর” মুসলমানদের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করার জন্য একটি বিশাল বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করেন। সুলাইমানের সাথে অল্প কিছু জানবাজ ছিল, কিন্তু তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে শত্রুর মোকাবিলা করেন এবং তাদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। এই সময়ে হঠাৎ এমন এক ভূমিকম্প হয় যে “গ্যালিপোলি”র প্রাচীর ধসে পড়ে। মুসলমানরা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে এবং সরাসরি শহরে প্রবেশ করে তা দখল করে নেয়। এটি একটি অত্যন্ত বড় ও মজবুত শহর ছিল এবং কনস্টান্টিনোপল থেকে এর দূরত্ব ছিল ৮৬ মাইল। এটি ভবিষ্যতে ইউরোপে উসমানীয় সালতানাতের কেন্দ্রে পরিণত হয়। [১]

রুমেলি:

উসমানীয় তুর্কিদের ইতিহাসে গ্যালিপোলি বিজয়ের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে, কারণ এখন তারা বিজয়ী হিসেবে ইউরোপে প্রবেশ করেছিল এবং এখান থেকেই তাদের জন্য নতুন নতুন বিজয়ের পথ উন্মুক্ত হতে যাচ্ছিল। মুসলমানরা ইউরোপে পা রেখে ইতিহাসকে এক নতুন মোড় দিয়েছিল এবং কুফর ও শিরকে নিমজ্জিত এই মহাদেশে একটি মুসলিম রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। মারমারা সাগরের ওপারে উসমানীয়দের বিজিত এলাকাগুলোকে তাদের পরিভাষায় “রুমেলি” বলা হতে থাকে। পরবর্তী দশকগুলোতে নতুন নতুন বিজয়ের ফলে “রুমেলি”র আয়তন দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এভাবে সামগ্রিকভাবে উসমানীয় রাষ্ট্র দুটি ইউনিটে বিভক্ত হয়ে যায়:

১. আনাতোলিয়া: অর্থাৎ এশিয়া মাইনরের অধিকৃত অঞ্চলসমূহ।

২. রুমেলি: অর্থাৎ সমুদ্রের ওপারের অধিকৃত অঞ্চলসমূহ। [২]

সুলাইমান পাশার আরও বিজয় এবং মৃত্যু:

গ্যালিপোলি বিজয়ী সুলাইমান পাশা তাঁর উত্তম আচরণ, শিষ্টাচার, কোমলতা, দয়া এবং ইনসাফ ও মহানুভবতার মাধ্যমে বিজিত অঞ্চলের নাগরিকদের মন জয় করে নিয়েছিলেন। তিনি দারদানিয়েল উপকূলের পার্তাপ, জিনা কালা, ইপসালা, রোদোস্টো, কায়রা পোলি, ভিজো, টেকফুর এবং তাগি-র মতো স্থানগুলোও জয় করেন। এভাবে কনস্টান্টিনোপল পশ্চিম দিক থেকেও ইসলামী শাসনের ঘেরাওয়ার মধ্যে চলে আসে। দুই বছর পর ৭৬০ হিজরিতে সুলাইমান শিকারের সময় হঠাৎ ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে ইন্তেকাল করেন। তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৩৮ বছর। শুধু ওরহান নয়, বরং সমস্ত মুসলমান তাঁর মৃত্যুতে প্রচণ্ড শোকাহত হন। সাধারণ ধারণা ছিল যে, তিনি যদি বেঁচে থাকতেন তবে তাঁর বাবা ও দাদার মতো একজন মহান বিজয়ী প্রমাণিত হতেন। তাঁকে মারমারা সাগরের ইউরোপীয় উপকূলে দাফন করা হয় যাতে মুসলমানরা এখান থেকে পিছু হটার কথা কখনও মনে না আনে। [৩]

[১] আখবারুদ দুওয়াল: ৩/১১১; তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, সাইয়েদ মুহাম্মদ, পৃ. ৯২, ৯১; তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়া, ১২৩ থেকে ১২৭; আত-তারিখুল ইসলামী, মাহমুদ শাকের: ৮/২৬, ২৫; তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ: ১/১৬২, ৯৫।

[২] রুমেলি: এই নাম সেই তুর্কি প্রদেশগুলোর ওপর প্রয়োগ করা হতো যেগুলোর মধ্যে (থ্রেস), (মেসিডোনিয়া), (বুলগেরিয়া), (সার্বিয়া), (আলবেনিয়া) এবং সমস্ত দ্বীপপুঞ্জ (বাহরে ইজে) অর্থাৎ ইউরোপীয় সেই সমস্ত ভূখণ্ড অন্তর্ভুক্ত ছিল যা উসমানীয় রাষ্ট্রের অধীন ছিল (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-তে বর্ণিত স্থানগুলোর পরিচিতি: ৩/২২, মাকতাবা শামিলা)। পাঠক যেন “রুমেলি” পরিভাষাটি ভালোভাবে মনে রাখেন যাতে পরবর্তী আলোচনায় কোনো বিভ্রান্তি না হয়।

[৩] তারিখু সালাতিন বনি উসমান, পৃ. ৩২; তারিখু উসমানি, ওজুন: ১/১৮৩; তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ: ১/৯৬।

শাহজাদা মুরাদ খান:

সুলাইমানের মৃত্যুর পর ওরখান তার বিজিত এলাকাগুলো তার দ্বিতীয় পুত্র মুরাদ খানের তত্ত্বাবধানে দিয়ে দেন এবং তাকে রোমানদের বিরুদ্ধে জিহাদ অব্যাহত রাখার নির্দেশ দেন। মুরাদ এই নির্দেশ অনুযায়ী মারমারা সাগর অতিক্রম করে গ্যালিপোলি পৌঁছান এবং সেনাবাহিনী প্রস্তুত করে “চোরলি” আক্রমণ করেন যা কনস্টান্টিনোপল থেকে তিন দিনের (৭৩.৭ কিলোমিটার) দূরত্বে ছিল। এটি বিজয়ের পর তিনি “দিমোতিকা” সহ আরও বেশ কিছু দুর্গ জয় করেন। উসমানীয় সালতানাত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কনস্টান্টিনোপলের বাদশাহর বিরুদ্ধে কোনো অভিযান পরিচালনা করেনি এবং সেখানকার অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে কোনো হস্তক্ষেপ করেনি। কিন্তু কিছুকাল পর স্বয়ং কনস্টান্টিনোপলের জনগণ কান্টাকুজেনাস-এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়। তাদের বক্তব্য ছিল যে, তিনিই মুসলমানদের ইউরোপে নিয়ে আসার কারণ। বিদ্রোহ সফল হয়। কান্টাকুজেনাসকে সিংহাসন ছেড়ে নির্জনে চলে যেতে হয়। তার স্থলে শাহজাদা জন প্যালিলোগাস চতুর্থ (ইউহানা পঞ্চম) বাদশাহ হন। তিনি ইউরোপীয় উপকূলে আল-ই-উসমানের আরও বিজয় থেকে বাঁচতে তাদের সাথে সন্ধি করেন এবং বিজিত শহরগুলোর ওপর তাদের দখল মেনে নেন। মুসলমানরা জন প্যালিলোগাসের সাথে চুক্তির পূর্ণ সম্মান প্রদর্শন করে এবং তিনি ৫১ বছর শাসন করে ৭৯৩ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। [১]

ওরখানের মৃত্যু..... সীরাত এবং কীর্তির ওপর এক নজর:

ওরখান তার সাহসী পুত্র সুলাইমান পাশার আকস্মিক মৃত্যুতে প্রচণ্ড শোকাহত ছিলেন, যার ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং পুত্রের মৃত্যুর মাত্র এক বছর পর ৭৬১ হিজরিতে পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। তাকে রাজধানী বুর্সায় দাফন করা হয়। তার বয়স ছিল ৮৩ বছর। তিনি ৩৫ বছর শাসন করেন এবং উসমানীয় সালতানাতকে অত্যন্ত মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে দেন। তিনি তার পিতার দেওয়া রাষ্ট্রকে ছয় গুণ বৃদ্ধি করে ৯৫ হাজার বর্গকিলোমিটারে পৌঁছে দিয়েছিলেন। [২]

তিনি সুন্দর অবয়ব এবং সুন্দর চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। অত্যন্ত দানশীল, উদার, ন্যায়পরায়ণ এবং সাদাসিধে জীবন পছন্দ করতেন। সালতানাতের ব্যাপক ব্যস্ততা সত্ত্বেও ইবাদত ও রিয়াযতের জন্য যথেষ্ট সময় বের করতেন। তার নানা শেখ কুরমানি একজন সুফি বুজুর্গ ছিলেন, ওরখান তার ব্যক্তিত্ব দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত ছিলেন। তিনি উলামা ও দরবেশদের সাহচর্যকে গনিমত মনে করতেন। প্রখ্যাত উলামায়ে দ্বীন তার দরবারের সাথে যুক্ত ছিলেন। খানকাহ, মাদ্রাসা এবং মসজিদ নির্মাণ ছিল তার জীবনের বিশেষ শখ। বাইজেন্টাইনদের এশীয় কেন্দ্র “ইজনিক”-এ প্রথম জামে মসজিদ এবং একটি বিশাল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তার সদকায়ে জারিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল। [৩]

[১] আত-তারিখুল ইসলামি মাহমুদ শাকের: ৮/৬৩, ৬৪

[২] তারিখুদ দাওলাতুল উসমানিয়া ইয়ালামাজ, পৃ. ৯৭

[৩] আখবারুদ দুওয়াল: ৩ / ১১, ১২; তারিখ সালাতিন বনী উসমান, পৃ. ৩৬

মুরাদ খান আউয়াল

৭৬১ হি. থেকে ৭৯১ হি.

(১৩৬০ খ্রি. থেকে ১৩৮৯ খ্রি.)

ওরখানের পর তার উত্তরাধিকারী মুরাদ খান সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ৭২৭ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ক্ষমতা গ্রহণের সময় তার বয়স ছিল ৩৪ বছর। [১] তিনি একজন উচ্চাভিলাষী, বুদ্ধিমান, যোদ্ধা, দূরদর্শী এবং দয়ালু মানুষ ছিলেন। [২]

প্রাথমিক অভিযানসমূহ

যদিও ওরখান তার রাজ্যের সীমানা যথেষ্ট বৃদ্ধি করেছিলেন, তবুও আনাতোলিয়ার বেশিরভাগ অংশ তখনও অন্যান্য রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মুরাদ খানের সিংহাসন আরোহণের সময় উসমানীয় সাম্রাজ্য আনাতোলিয়ার উত্তর-পশ্চিম অংশে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এছাড়া ইউরোপের গ্যালিপলি এবং থ্রেসের কিছু অংশ তার দখলে ছিল যেখানে কিছু মুসলমান বসতি স্থাপন করেছিল।

আঙ্কারা বিজয়:

মুরাদ খান অত্যন্ত দ্রুততার সাথে তার সাম্রাজ্যের সীমানা বিস্তার করেন। তিনি তার ক্ষমতার প্রথম বছর ৭৬১ হিজরিতে এশিয়া মাইনরের মধ্যবর্তী শহর ‘আঙ্কারা’ (আনকারা)-র ওপর সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন, যা ছিল বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী শহর। এর চারপাশ জুড়ে ছিল বিশাল চারণভূমি যেখানে হাজার হাজার ভেড়া ও ছাগলের পাল চরে বেড়াত। এই গবাদি পশু থেকে প্রাপ্ত পশম সারা বিশ্বে রপ্তানি করা হতো। এখানকার শাসকরা কারামানিদের ষড়যন্ত্রের কারণে উসমানীয় সুলতানদের বিরোধী হয়ে উঠেছিল। মুরাদ খান তাদের কোনো সুযোগ দেননি এবং খুব দ্রুত এই শহর জয় করে নেন। লারেন্দার শাসক ইবনে কারামান আঙ্কারা বিজয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তিনি তাতার ও তুর্কমেনদের বেশ কিছু গোত্রকে একত্রিত করে মুরাদ খানের বিরুদ্ধে অভিযান চালান। কিন্তু মুরাদ খান আক্রমণকারীদের নাস্তানাবুদ করে ছাড়েন এবং শেষ পর্যন্ত সম্মিলিত বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়। [৩]

এদিরনে (অ্যাড্রিয়ানোপল) বিজয়:

মুরাদ খান কনস্টান্টিনোপল জয় করতে ইচ্ছুক ছিলেন, তবে তিনি ভালোভাবেই জানতেন যে বিশ্বের এই সুদৃঢ়তম শহরের ওপর পূর্ব দিক থেকে...

[১] আখবারুদ দুওয়াল: ৩/১৩

[২] তারিখ সালাতিন বনি উসমান, পৃ. ৩৯

[৩] আখবারুদ দুওয়াল: ৩/১৩; তারিখ উসমানি আজ উজুন: ১/১৮৭

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

করা প্রতিটি আক্রমণই ব্যর্থ হয়েছে। এর বিজয়ের সম্ভাবনা পশ্চিম দিক থেকেই বেশি ছিল। তিনি কনস্টান্টিনোপলের সাথে চুক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে আপাতত একে স্পর্শ করেননি, তবে এর পশ্চিম ও উত্তরে অভিযান অব্যাহত রাখেন। ৭৬১ হিজরিতে তিনি তাঁর সেনাপতি লালা শাহিনকে ‘আদ্রিয়ানোপল’ (এদিরনে) বিজয়ের জন্য প্রেরণ করেন। বাগান, বাগা ও নদীবেষ্টিত এই শহরটি কনস্টান্টিনোপল থেকে ৯৫ মাইল দূরে ছিল এবং ইউরোপের বড় শহরগুলোর মধ্যে গণ্য হতো। এখানে লালা শাহিনের আক্রমণ ব্যর্থ হতে থাকে। অবশেষে মুরাদ খান নিজেই দার্দানেলেস প্রণালী অতিক্রম করে রণাঙ্গনে উপস্থিত হন এবং এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর শহরটি জয় করেন। এখন বলকান (থ্রেস) এবং মেসিডোনিয়াসহ দক্ষিণ বুলগেরিয়ার সমস্ত শহর তাঁর আয়ত্তে চলে আসে। [১]

ইয়েনি চেরি বাহিনী গঠন

সিংহাসনে আরোহণের তৃতীয় বছরে সুলতান মুরাদ আউয়াল তাঁর অধীনে জানিসারদের একটি বিশেষ বাহিনী তৈরি করতে শুরু করেন যা ‘ইয়েনি চেরি’ নামে পরিচিত হয়। তাঁর উজির কার খলিল (খায়রুদ্দিন পাশা) তাঁকে এই পরামর্শ দিয়েছিলেন। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল অনাথ বালক, নওমুসলিমদের সন্তান এবং অল্পবয়সী যুদ্ধবন্দীদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা, যাতে তারা মুসলিম পরিবারগুলোর তত্ত্বাবধানে এবং সরকারের বিশেষ অনুগ্রহে বেড়ে ওঠে এবং অনাথ বা অলস শিশুদের মতো নষ্ট না হয়ে বরং সমরবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে দেশ ও জাতির জন্য গর্বের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

- সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, এভাবে গঠিত বিশেষ বাহিনী সরাসরি বাদশাহর অধীনে থাকবে, কোনো গোত্র, পরিবার বা রাজবংশের কোনো দপ্তরের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক থাকবে না।
- এর সৈন্যদের সম্মানস্বরূপ বাদশাহর সন্তান হিসেবে গণ্য করা হবে, তারা বাদশাহকে তাদের পিতা বলে সম্বোধন করবে।
- ইসলামি পরিবেশে লালন-পালন ও শিক্ষার কারণে তারা দৃঢ় ও চরিত্রবান মুসলিম হিসেবে গড়ে উঠবে এবং বাদশাহর বিশেষ মনোযোগ ও অনুগ্রহের কারণে তারা সর্বদা রাজসিংহাসনের অনুগত থাকবে।

সে অনুযায়ী কিছু বালককে এই অভিযানের জন্য নির্বাচন করা হয়। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পরিবেশ এমনভাবে রাখা হয়েছিল যাতে শিক্ষার্থীরা প্রচলিত বিজ্ঞান ও সমরবিদ্যা শেখার পাশাপাশি ইসলামি মূল্যবোধ, ঈমানি শিক্ষা, আমল, আখলাক ও চরিত্রে অনন্য হয়ে ওঠে এবং সরকারি সম্মানে ভূষিত হয়ে সমস্ত নাগরিকের কাছে ঈর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এই কৌশলের ফলে ধীরে ধীরে স্থানীয় খ্রিস্টানরা ইসলামের কাছাকাছি আসতে শুরু করে, এমনকি পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে এখানে শতভাগ মুসলিম জনসংখ্যা দেখা দিতে থাকে।

[২] যখন এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রথম দলটি শিক্ষা সমাপ্ত করল, তখন তাদের দোয়ার জন্য একজন সুফি বুজুর্গ হাজি বেকতাশের খানকাহতে পাঠানো হলো। হাজি বেকতাশ এই যুবকদের বিজয় ও সাহায্যের জন্য দোয়া করলেন এবং নিজের জামার আস্তিন ছিঁড়ে তাদের অফিসারের মাথায় বেঁধে দিলেন এবং এই বাহিনীর নাম ‘ইয়েনি চেরি’ প্রস্তাব করলেন, যার অর্থ ‘নতুন বাহিনী’। [৩]

[১] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়া, পৃষ্ঠা ১২৮ থেকে ১৩০।

[২] নুসরতে আহলে ঈমান, পৃষ্ঠা ১৭৫; আখবারুদ দুওয়াল: ৩/৩; আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া - আস-সাল্লাবি, পৃষ্ঠা ১৫২; আত-তারিখুল ইসলামি - মাহমুদ শাকির: ৮/৬৩।

[৩] আখবারুদ দুওয়াল: ৩/৩, এর আরবি উচ্চারণ ছিল ‘ইয়েনি তশারি’ যা পরবর্তীতে ‘ইনকাশারি’ হয়ে যায়।

ইয়েনী চেরীর বৈশিষ্ট্যসমূহ:

ইয়েনী চেরী সৈন্যেরা চামড়ার সাদা টুপি পরতেন। [১] বাকি উর্দিতেও সাদা রঙের প্রাধান্য ছিল। উর্দিতে কাঁধ এবং পিঠের কিছু অংশে একটি বিশেষ কাপড় সেলাই করা থাকত যাকে “পাতরাতমা” বলা হতো। সৈন্যেরা তাদের টুপি বাঁকা করে রাখতেন, অন্যদিকে অফিসারের টুপি সোজা হতো যাকে “উসকুফ” বলা হতো। এর ওপর কালো রঙের একটি বিশেষ ডোরাকাটা দাগ থাকত। [২]

সেনাবাহিনীর পতাকা ছিল লাল রঙের এবং তাতে অর্ধচন্দ্র ছিল। অর্ধচন্দ্রের নিচে একটি তলোয়ার ছিল যা হযরত আলী (রা.)-এর তলোয়ারের দিকে নিসবত করে “যুলফিকার” বলা হতো। [৩] ইয়েনী চেরীদের তলোয়ার চালনা, নেজা বা বল্লম নিক্ষেপ এবং অশ্বারোহণের পাশাপাশি পরিখা ও প্রাচীর ভাঙা এবং তীর চালনার বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। পরবর্তীতে বন্দুক এবং কামান চালানোও প্রশিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। [৪]

ইয়েনী চেরীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে “আকাসি”, নায়েবে সিপাহসালারকে “সেকবান বাশি” এবং “পতাকাবাহী”কে “বায়রাকদার” বলা হতো। [৫] এছাড়াও শোরবাজি বাশি (রান্নাঘরের কর্মকর্তা), সাক্কা আগাসি (পানি সরবরাহ কর্মকর্তা), ওদাহ বাশি (রাজকীয় তাঁবুর কর্মকর্তা) গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী ছিলেন। [৬]

ইয়েনী চেরী বাহিনী ছিল উসমানীয় সুলতানদের তলোয়ার চালনাকারী বাহু। তারা অসংখ্য যুদ্ধ ও অভিযানে বীরত্ব ও সাহসিকতার অবিস্মরণীয় কীর্তি স্থাপন করেছে। এই যুবকদের মধ্যে নও-মুসলিমদের মতো জোশ, জযবা এবং কুরবানির উদ্দীপনা ছিল। তদুপরি বাদশাহর যে নৈকট্য ও আস্থা তারা লাভ করেছিল, তার জন্য তারা দুনিয়ার সবকিছু উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকত।

ইয়েনী চেরী বাহিনীর মাদ্রাসাগুলো ছিল বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত প্রথম “ক্যাডেট কলেজ”। এতে ভর্তি হওয়া ছাত্রদের এমন সুযোগ-সুবিধা ও সুযোগ প্রদান করা হতো যে তারা সমাজে গর্বের সাথে মাথা উঁচু করে চলত। তাদের জন্য উচ্চপদস্থ পদের দরজা খোলা থাকত। এই কারণেই উসমানীয় সেনাবাহিনীর নৌ ও স্থল বাহিনীর জেনারেলদের মধ্যে ইউরোপীয় বংশোদ্ভূতদের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। ইয়েনী চেরীতে যোগদানের জন্য খ্রিস্টান নাগরিকদের ওপর কখনো চাপ সৃষ্টি করা হয়নি। এই বাহিনীর অধিকাংশ অংশ নও-মুসলিম ইউরোপীয়দের সন্তান অথবা যুদ্ধে এতিম হয়ে যাওয়া ইউরোপীয় শিশুদের নিয়ে গঠিত ছিল। এমন শিশুও ছিল যারা খ্রিস্টান নাগরিকদের সন্তান ছিল, যাদের অভিভাবকরা সরকারি সুযোগ-সুবিধা লাভের আশায় স্বেচ্ছায় এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তি করিয়েছিলেন। এমন কোনো শিশুর উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায় না যাদেরকে বাবা-মায়ের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে জোরপূর্বক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। [৭]

সুলতান মুরাদ রাবে (চতুর্থ মুরাদ)-এর শাসনামলে (একাদশ হিজরি শতাব্দী মোতাবেক সপ্তদশ খ্রিস্টীয় শতাব্দী) এই বাহিনীর সাথে সম্পৃক্তদের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পায় যে, তাদেরই বংশধরদের “ইয়েনী চেরী”তে ভর্তির জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। [৮]

[১] তারিখ-এ-উসমানী আয ওজোন: ৫২৬/১

[২] নুসরাতুল ঈমান, পৃ. ৫৭; তারিখ-এ-উসমানী আয ওজোন: ৫২৬/১, ৫৭৭

[৩] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া আয সাল্লাবি, পৃ. ৫৫

[৪] তারিখ-এ-উসমানী আয ওজোন: ৫৭৭/১

[৫] তারিখ-এ-উসমানী: ৫২৬/১

[৬] তারিখ-উদ-দাওলাতুল আলিয়াহ, পৃ. ১৩৩

[৭] দাওলাত-এ-উসমানিয়া আয ডক্টর মুহাম্মদ আজিজ: ২৮/১

[৮] ফী উসুলিত তারিখিল উসমানী আয আহমদ আব্দুর রহিম মুস্তফা, পৃ. ৩৩, ৩৪; দাওলাত-এ-উসমানিয়া আয ডক্টর আজিজ: ২৮/১

দ্রষ্টব্য: লেখক যেখানেই দেখেছেন, অধিকাংশ প্রাচীন উৎসে ইয়েনী চেরী গঠনের ঘটনা সুলতান মুরাদ খান আউয়ালের সময়ের বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

(নুসরাতুল ঈমান, পৃ. ৫৭; আখবারুদ দুওয়াল: ১৩/৩) তবে কিছু ঐতিহাসিকের বর্ণনা অনুযায়ী এটি ওরখান আউয়ালের সময়ের ঘটনা এবং অধিকাংশ আধুনিক ঐতিহাসিক এটিই গ্রহণ করেছেন। (তারিখুদ দাওলাতুল আলিয়াহ, পৃ. ১২২, ১২৩; আত-তারিখুল ইসলামী আয মাহমুদ শাকের: ৬৩/৮; দাওলাত-এ-উসমানিয়া আয ডক্টর মুহাম্মদ আজিজ: ২৮/১)

তারিখ উম্মতে মুসলিমা (চতুর্থ খণ্ড)

উসমানীয়দের বিজয়াভিযান কি ইয়েনি চেরি-র ওপর নির্ভরশীল ছিল?

এটি প্রসিদ্ধ যে, ইয়েনি চেরি বাহিনী শুরু থেকেই উসমানীয়দের সবচেয়ে প্রভাবশালী অংশ ছিল এবং উসমানীয় সালতানাতের বিজয়াভিযানগুলো তাদের ওপরই নির্ভরশীল ছিল। এটি একটি ভুল ধারণা। ইয়েনি চেরি সক্রিয় ছিল এতে কোনো সন্দেহ নেই, তবে এতে কেবল বাছাইকৃত তরুণদের রাখা হতো। এর আন্দাজ এখান থেকে করা যায় যে, সুলতান মুরাদ আউয়াল এবং বায়েজিদ ইলদিরিমের যুগে “ইয়েনি চেরি” বাহিনীতে এক হাজারেরও কম সৈন্য ছিল। সুলতান মুহাম্মদ (ফাতেহ কুসতুনতুনিয়া)-এর যুগে ইয়েনি চেরি সৈন্য ছিল মাত্র বারোশ। তবে সুলতান সেলিম আউয়ালের যুগে ইয়েনি চেরি বাহিনীতে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দেখা যায়, তখন এই বাহিনী দশ হাজার সৈন্যের সমন্বয়ে গঠিত ছিল। সুলাইমান কানুনির যুগে এই সংখ্যা বারো হাজার পর্যন্ত পৌঁছেছিল। তবে এই সংখ্যা সত্ত্বেও একে বাহিনীর প্রভাবশালী অংশ বলা যেত না, কারণ উসমানীয় লশকরের মোট সৈন্য সংখ্যা ছিল এক লক্ষেরও বেশি।

কুসতুনতুনিয়া বিজয়ের পর প্রায় এক শতাব্দী পর্যন্ত ইয়েনি চেরি বাহিনী তার পূর্বের অবস্থায় বহাল ছিল। এরপর এটি একটি সুযোগ-সুবিধাভোগী ও আদুরে গোষ্ঠীর রূপ ধারণ করে, যাদের দিয়ে কাজ করানো সুলতানদের জন্য কঠিন হয়ে পড়েছিল। একে কার্যকর রাখার জন্য সুলতানগণ এর বিন্যাস ও সংগঠনে বিভিন্ন পরিবর্তন আনেন, যার ফলে এটি তার প্রাচীন রূপ হারিয়ে ফেলে। অমুসলিম বা নওমুসলিম পরিবারের সন্তানদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ধারা বন্ধ হয়ে যায় এবং সতেরো শতকে সুলতান মুরাদ রাবে-র নির্দেশে ইয়েনি চেরিদের সন্তান এবং স্থানীয় তুর্কিদের “ইয়েনি চেরি”-তে ভর্তি করা শুরু হয়। এভাবে বাছাইকৃত তরুণদের পরিবর্তে সব ধরনের লোক বাহিনীর অংশ হতে শুরু করে, যার ফলে সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে যায়। আঠারো শতকে উসমানীয় শাসক সুলতান মাহমুদ সানির যুগে ইয়েনি চেরির সংখ্যা ছিল এক লক্ষ চল্লিশ হাজার। প্রকৃতপক্ষে ইয়েনি চেরির এই সংখ্যা বৃদ্ধিই তাদের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এই পুরো পর্যালোচনা থেকে এটি প্রমাণিত হয় যে, উসমানীয় বাহিনীর সূচনা ও উত্থানের যুগে ইয়েনি চেরি বাহিনীর প্রভাবশালী অংশ কখনোই ছিল না, বরং এটি বাছাইকৃত তরুণদের সমন্বয়ে গঠিত একটি বাহিনী ছিল যাদের কাজ ছিল সুলতানকে রক্ষা করা এবং তাঁর কমান্ডে যুদ্ধ করা। [১]

শিশুদের জোরপূর্বক ভর্তির প্রোপাগান্ডা এবং এর জবাব:

পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকরা উসমানীয় সালতানাতকে কলঙ্কিত করার জন্য এই ভিত্তিহীন ও প্রমাণহীন প্রোপাগান্ডা চালিয়ে আসছে যে, উসমানীয় সুলতানগণ খ্রিস্টান শহরগুলোর ওপর এটি বাধ্যতামূলক করেছিলেন যে, প্রতিটি গ্রাম, জনপদ এবং এলাকা থেকে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক শিশুকে তাদের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠাতে হবে। অর্থাৎ এটি ছিল একটি জোরপূর্বক ভর্তি যা মানবাধিকারের পরিপন্থী ছিল। এভাবে প্রাচ্যবিদরা উসমানীয় সুলতানদের চরিত্রের ওপর চরম আক্রমণ করেছেন। অথচ এই অভিযোগের সাথে বাস্তবতার কোনো সম্পর্ক নেই। উসমানীয় সালতানাতের উত্থানের যুগে ইয়েনি চেরিতে এত বেশি তরুণ ভর্তি করা হতো না যে প্রতিটি গ্রাম ও জনপদ থেকে শিশু নেওয়ার প্রয়োজন হতো। আর পরবর্তীতে যখন ভর্তির পরিধি বাড়ানো হলো, তখন এতে ইয়েনি চেরিদের সন্তান অথবা সাধারণ তুর্কি নাগরিকদের নেওয়া হতে থাকে।

[১] ফি উসুলুত তারিখিল উসমানি, আহমদ আব্দুর রহিম মুস্তফা, পৃষ্ঠা ৩৩, ৩৪; দাওলাতে উসমানিয়া, ডক্টর আজিজ: ১/৮।

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

এর আগে ইয়েনি চেরি (Yeni Cheri)-র জন্য সেই সব ছেলেদের বেছে নেওয়া হতো এবং নির্বাচন করা হতো যারা হয় নওমুসলিমদের সন্তান ছিল অথবা যুদ্ধে নিহত নাসারাদের (খ্রিস্টানদের) সেই সব এতিম সন্তান ছিল যাদের দেখাশোনা করার মতো কেউ ছিল না। তাদের জন্য নিরাপদ ও উন্নত ভবিষ্যতের ব্যবস্থা করাও সালতানাতের দায়িত্ব ছিল। উসমানীয় সুলতানগণ এই দায়িত্ব অত্যন্ত নিপুণভাবে পালন করেছেন এবং এভাবে অনেক শিশুকে ইয়েনি চেরি বানিয়ে দেশ ও জাতির খেদমতের সুযোগ দেওয়ার মাধ্যমে এমন নিরাপদ ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ প্রদান করেছেন যা যেকোনো ব্যক্তি তার নিজের সন্তানদের জন্য পেতে পছন্দ করবে। উসমানীয় সুলতানদের পক্ষ থেকে নাসারা শিশুদের জোরপূর্বক সেনাবাহিনীতে ভর্তি করার অপবাদ ডক্টর গিব এবং কার্ল ব্রোকলম্যানের মতো প্রাচ্যবিদরা (ওরিয়েন্টালিস্ট) আরোপ করেছিলেন। এরপর প্রাচ্যবিদদের থেকে তথ্য গ্রহণকারী অনেক মুসলিম ঐতিহাসিকও তা হুবহু নকল করেছেন এবং তারপর ধীরে ধীরে এই কথাটি যেন একটি স্বীকৃত সত্যে পরিণত হয়েছে, অথচ বাস্তবতার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। [১]

মুরাদ খানের বাইজান্টাইন এবং ইউরোপীয় শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে জিহাদ

এড্রিয়ানোপল (এদিরনে) বিজয়ের পর বাইজান্টাইনদের কাছে উত্তর থ্রেস, মেসিডোনিয়া এবং মোরিয়ার কিছু এলাকা বাকি ছিল যা তুর্কিরা যেকোনো সময় জয় করতে পারত। প্রকৃতপক্ষে বাইজান্টাইনদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়, যার একটি কারণ ছিল এই যে, সেই সময় ইউরোপের কোনো সালতানাতের পক্ষ থেকে তাদের কোনো সাহায্য পৌঁছাচ্ছিল না। তাই বাইজান্টাইনদের ওপর আক্রমণের জন্য এটি ছিল সুবর্ণ সুযোগ।

থ্রেস বিজয়:

তবে সুলতান মুরাদ কনস্টান্টিনোপলের সাথে সম্পাদিত চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করে সেখানে আক্রমণ করা থেকে বিরত থেকে চারপাশের দুর্গ ও শহরগুলোর ওপর সৈন্য পরিচালনা করেন। প্রথমে কনস্টান্টিনোপল থেকে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত ‘চোরলু’ দুর্গ এবং তারপর ‘কিরক কিলিসে’ দুর্গ জয় করা হয়। বাইজান্টাইনরা এই পরিস্থিতিতে ঘাবড়ে গিয়ে নিজেরাই মোকাবিলায় বেরিয়ে আসে, কিন্তু ‘এসকি বাবা’ নামক স্থানে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে সুলতানের হাতে তারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। তুর্কিদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে। ৭৬৩ হিজরি (১৩৬২ খ্রিস্টাব্দ)-তে ‘মেসিডোনিয়া’ জয় করা হয়। পরের বছর উসমানীয় জেনারেল এভরানোস বেগ ‘ভারদার’ এবং ‘গুমুলজিনা’ জয় করেন।

অন্যদিকে সুলতানের প্রধান সেনাপতি লালা শাহিন আরও সামনে এগিয়ে বলকানের দক্ষিণে অবস্থিত ফিলিপোপলিস (ফিলিব) শহরটিও বাইজান্টাইনদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেন। এভাবে প্রায় পুরো থ্রেস উসমানীয়দের দখলে চলে আসে। এই বিজয়গুলো ৭৬৪ হিজরি (১৩৬৩ খ্রিস্টাব্দ)-তে অর্জিত হয়। [২] এই পরাজয়ের পরপরই বাইজান্টাইন সম্রাট উসমানীয়দের সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হন যার শর্তগুলো ছিল নিম্নরূপ:

(১) বাইজান্টাইনরা উসমানীয়দের বিজিত থ্রেস এলাকা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করবে না।

[১] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া, সাল্লাবি, পৃষ্ঠা ৫২ থেকে ৫৫।

[২] দাওলাতে উসমানিয়া, ডক্টর আজিজ: ১/৪০, ৪১; তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ: ১/৯৮; তারিখে উসমানি: ১/১৯১, ১৯২; আদ-দাওলাতুল আলিয়া, পৃষ্ঠা ১৩০।

দ্রষ্টব্য: ফিলিপোপলিস শহরটি বুলগেরিয়ার বর্তমান রাজধানী সোফিয়া এবং ‘এড্রিয়ানোপল’-এর মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত।

২. বাইজেন্টাইনরা উসমানীয়দের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় শক্তিগুলোকে কোনো সাহায্য করবে না।

৩. তুরস্কের স্বাধীন রাজ্যগুলোর সাথে উসমানীয়দের যুদ্ধের ক্ষেত্রে বাইজেন্টাইনরা উসমানীয় সালতানাতকে সাহায্য করবে। [১]

উসমানীয়দের বিরুদ্ধে ইউরোপের জোটবদ্ধ হওয়া এবং এর কারণ:

ইউরোপে পা রাখা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত উসমানীয়দের মোকাবিলা কেবল বাইজেন্টাইনদের সাথেই ছিল। ইউরোপের বাকি শক্তিগুলো এই সংঘাতের ময়দানে কোনো অংশ নেয়নি, যার একটি বড় কারণ ছিল এই যে, খ্রিস্টান জগত দুইশ বছরের ক্রুসেড যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল এবং এখন তারা বিশ্রাম নিতে, নিজেদের ক্ষয়ক্ষতি মেরামত করতে বা পারস্পরিক বিবাদে লিপ্ত ছিল। দ্বিতীয় কারণটি ছিল গ্রীক ও ইতালীয় গির্জাগুলোর মধ্যকার দ্বন্দ্ব, যার ফলে ইউরোপীয় শক্তিগুলো কনস্টান্টিনোপল থেকে দূরত্ব বজায় রেখেছিল। তবে উসমানীয়দের ফিলিপোপলিস বিজয়ের পর পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছিল। যদিও উসমানীয়রা এই শহরটি বাইজেন্টাইনদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল, কিন্তু ভৌগোলিকভাবে এটি বুলগেরিয়ায় অবস্থিত ছিল। এর বিজয় মুসলমানদের জন্য মধ্য ইউরোপের রাজপথ খুলে দিয়েছিল। এটি দেখে ইউরোপীয় শাসকরা অস্থির হয়ে পড়লেন। তাদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে পোপ আরবান পঞ্চম একটি নতুন ক্রুসেড ঘোষণা করেন এবং হাঙ্গেরি, রোমানিয়া, সার্বিয়া ও বসনিয়ার রাজাদের নির্দেশ দেন যেন তারা সম্মিলিতভাবে মুরাদ খানের দমন করেন। [২]

মার্টিজা যুদ্ধ:

অবশেষে ৭৬৩ হিজরি (১৩৬৩ খ্রিস্টাব্দ) সালে ষাট হাজার খ্রিস্টান সৈন্যের একটি বাহিনী উসমানীয় সালতানাতের নতুন অধিকৃত অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হয়। মুরাদ খান এই খবর শোনামাত্রই রাজধানী বুর্সা থেকে বের হন এবং সমুদ্র পাড়ি দিয়ে প্রতিপক্ষের দিকে রওনা হন। তবে তার আগেই তার বেইলারবে লালা শাহিন ‘এদিরনে’ থেকে তার সৈন্যদের নিয়ে রণক্ষেত্রের দিকে রওনা হয়েছিলেন। মিত্রবাহিনী মার্টিজা নদী পার হচ্ছিল, যা বুলগেরিয়ার পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে এজিয়ান সাগরে গিয়ে পড়েছে। লালা শাহিনের ডান হাত হাজি ইল বেগ দ্রুত আক্রমণ চালিয়ে মিত্রবাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন, যারা নদীর তীরে তারু গেড়েছিল। এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে আক্রমণকারী বাহিনীর প্রায় সবাই নিহত হয়। সার্বিয়ার শাসক পালানোর সময় মার্টিজা নদীতে ডুবে মারা যান। হাঙ্গেরির রাজা কোনোমতে বেঁচে পালিয়ে যান এবং নিজ দেশে পৌঁছে একটি গির্জা নির্মাণ করে প্রাণ রক্ষার শুকরিয়া আদায় করেন। [৩]

মার্টিজা যুদ্ধের প্রভাব:

মার্টিজা যুদ্ধের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবগুলো নিচে দেওয়া হলো:

- এই যুদ্ধ প্রমাণ করে দিয়েছে যে, তুর্কিরা ইউরোপের যেকোনো শক্তিকে পরাজিত করতে সক্ষম।
- এই বিজয়ের পর বলকান পর্বতমালার দক্ষিণের অধিকাংশ এলাকা উসমানীয় সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

[১] দাওলাতে উসমানিয়া, ড. আজিজ: ১/৩০, ৩১; তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ: ১/৯৮; তারিখে উসমানি: ১/১৯১, ১৯২।

[২] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া, আস-সাল্লাবি, পৃ. ৫৮, ৫৯; দাওলাতে উসমানিয়া, ড. আজিজ: ১/৩১, ৩২; তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়া, পৃ. ১৩১।

[৩] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া, আস-সাল্লাবি, পৃ. ৫৮, ৫৯; তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়া, পৃ. ১৩১; দাওলাতে উসমানিয়া, ড. আজিজ, পৃ. ৪১; তারিখে উসমানি, উজুন: ১/১৯৩, ১৯৪; তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ: ১/৯৮।

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

- (৩) কনস্টান্টিনোপল প্রায় সব দিক থেকেই উসমানীয় বিজয়ের মাধ্যমে ঘেরাও হয়ে যায় এবং ইউরোপের সাথে এর স্থলপথের যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।
- (৪) উসমানীয়দের সীমানা বুলগেরিয়ার দক্ষিণ এবং সার্বিয়ার পূর্ব পর্যন্ত পৌঁছে যায়।
- (৫) কনস্টান্টিনোপলের রাজার সাথেও নতুন করে বিষয়গুলো মীমাংসা করা হয়; তিনি উসমানীয়দের বশ্যতা স্বীকার করে নেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন যে ভবিষ্যতে যুদ্ধগুলোতে তিনি তাদের সামরিক সহায়তা প্রদান করবেন। [১]

রাজধানী বুর্সা থেকে এদিরনে স্থানান্তর:

মারিৎসা যুদ্ধের পর মুরাদ খান ইউরোপে আরও অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং এই উদ্দেশ্যে “বুর্সা”র পরিবর্তে ইউরোপের নববিজিত অঞ্চল “থ্রেস”-এর শহর “ডিমোটিকা”কে নিজের রাজধানী বানান। দুই বছর পর ৭৬৭ হিজরি (১৩৬৫ খ্রিস্টাব্দ) সালে তিনি রাজধানী “এদিরনে”তে স্থানান্তর করেন, যা কনস্টান্টিনোপল বিজয় পর্যন্ত উসমানীয়দের সাম্রাজ্যের কেন্দ্র হিসেবে বহাল ছিল। [২]

বলকানে বিজয়সমূহ:

দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে মন্টিনিগ্রো, রোমানিয়া, বসনিয়া, হার্জেগোভিনা, সার্বিয়া, ক্রোয়েশিয়া, যুগোস্লাভিয়া এবং মেসিডোনিয়ার সম্মিলিত অঞ্চল যা ৪ লক্ষ ৬৬ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত, তাকে “বলকান” বলা হয়। ৭৬৮-৭৭০ হিজরি (১৩৬৭ খ্রিস্টাব্দ) সালে সুলতান মুরাদের বাহিনী বলকানের বিচ্ছিন্ন রাজ্যগুলোতে প্রবেশ করে, যারা পারস্পরিক অনৈক্যের কারণে কোনো সম্মিলিত প্রতিরক্ষা ফ্রন্ট গঠন করতে অক্ষম ছিল।

এখন তাদের সামনে ছিল বুলগেরিয়া। বুলগেরিয়ার রাজা ইভান শিশম্যান উসমানীয়দের জন্য একজন শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, যিনি বুলগেরিয়ার দক্ষিণ প্রদেশসমূহ, থ্রেসের কিছু অংশ এবং বলকানে “দানিযুব” থেকে রোডোপ নদী পর্যন্ত এক বিশাল অঞ্চলের মালিক ছিলেন।

সবার আগে সুলতানের সেনাপতি তৈমুর তাশ পাশা উত্তরের দিকে অগ্রসর হয়ে বুলগেরিয়ার শহর “ইয়ানবোলি” (ডায়ামপোলিস) দখল করেন, অন্যদিকে লালা শাহীন বুলগেরিয়ার রাজধানী “সোফিয়া”র দক্ষিণে অবস্থিত “ইখতিমান” (সামাকোভ) জয় করেন।

পরের বছর ৭৬৯ হিজরি (১৩৬৮ খ্রিস্টাব্দ) সালে সুলতান মুরাদ নিজেই সসৈন্যে অভিযান পরিচালনা করেন এবং বলকান পর্বতমালার দক্ষিণে অবস্থিত “আইডোস” দখল করেন। এরপর “সোজোপোল” এবং “খায়রাবোলু”ও জয় করেন। ৭৭০ হিজরি (১৩৬৯ খ্রিস্টাব্দ) সালে “পিনারহিসার”, “ভিজে” এবং “কিরক্লারেলে” বিজিত হয়। এভাবে বুলগেরিয়ার দক্ষিণ জেলাগুলোতে রোডোপ পর্বতমালা পর্যন্ত এলাকা বিজিত হয়।

বুলগেরিয়ার রাজা শিশম্যান সাহস হারিয়ে কর প্রদানের চুক্তি করেন এবং নিজের বোনকে সুলতানের হারামে পাঠিয়ে সন্ধি করেন, যার ফলে বলকান পর্বতমালার উত্তরে অবস্থিত বুলগেরিয়ার শহরগুলো তার কাছেই থাকতে দেওয়া হয়। [৩]

সামাকোভের যুদ্ধ:

তবে শিশম্যান এই চুক্তিটি সাময়িক সময়ের জন্য করেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে বুলগেরিয়া একা উসমানীয়দের মোকাবিলা করতে পারবে না।

[১] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া - সাল্লাবি, পৃ. ৫৯, ৬০; তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়া, পৃ. ১৩১, ১৩২; তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া - ইলমাজ: ১/ ৯৯; দৌলতে উসমানিয়া - ডক্টর উযায়ের, পৃ. ৩৪; আত-তারিখুল ইসলামি - মাহমুদ শাকির: ৮/ ২৮, ২৯

[২] দৌলতে উসমানিয়া - ডক্টর উযায়ের, পৃ. ৩৪

[৩] তারিখে উসমানি: ১/ ১৯৭

তারিখ-ই উম্মত-ই মুসলিমা (মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস)

চতুর্থ খণ্ড

সুতরাং চুক্তির মাধ্যমে নিজেকে পূর্ণ পরাজয় থেকে রক্ষা করে তিনি সময় লাভ করেন এবং সার্বিয়ার রাজা ‘লাজার’কে, যিনি এ পর্যন্ত এই যুদ্ধগুলোতে অংশ নেননি, নিজের সাথে যুক্ত করে নেন। এর ফলে ৭৭৪ হিজরি (১৩৭১ খ্রিস্টাব্দ) সালে সার্ব ও বুলগেরীয়দের সম্মিলিত বাহিনী উসমানীয়দের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়। ওদিকে উসমানীয় সেনাপতি লালা শাহিন তার বাহিনী নিয়ে বের হন। ‘সোফিয়া’র নিকটবর্তী সামাকোভের ময়দানে এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যাতে খ্রিস্টান জোট শোচনীয় পরাজয়ের সম্মুখীন হয়। এই যুদ্ধের ফলে বলকান পর্বতমালা পর্যন্ত বুলগেরিয়ার সমস্ত এলাকা উসমানীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। [১]

সার্বিয়া আক্রমণ:

এখন সার্বিয়াকে বুলগেরীয়দের সাথে জোটবদ্ধ হওয়ার স্বাদ আস্বাদন করানো জরুরি ছিল, তাই সুলতান মুরাদ খান কোনো বিলম্ব ছাড়াই সেখানে বাহিনী প্রেরণ করেন। প্রথমে এই বাহিনী ‘ম্যাসেডোনিয়া’ এবং ‘গুমুলজিনা’র দিকে অগ্রসর হয়। ‘ম্যাসেডোনিয়া’ স্টিফেন ডুশানের সময় থেকে সার্বিয়ার অংশ হিসেবে চলে আসছিল। উসমানীয়রা ৭৬৩ হিজরি (১৩৬২ খ্রিস্টাব্দ) সালে ম্যাসেডোনিয়া এবং ৭৬৪ হিজরি (১৩৬২ খ্রিস্টাব্দ) সালে ‘গুমুলজিনা’ জয় করেছিলেন, কিন্তু বুলগেরীয়দের সাথে জোটবদ্ধ হওয়ার পর সার্বিয়া বিদ্রোহ করে এই এলাকাগুলো ফিরিয়ে নিয়েছিল। এখন উসমানীয়রা এই উভয় শহর পুনরায় জয় করেন।

এরপর ‘এসকে চে’, ‘মোরোলিয়া’, ‘কাওয়ালা’, ‘দ্রামা’, ‘জাখনা’ এবং ‘সেরেস’ শহরগুলো আত্মসমর্পণ করে। পরিশেষে উসমানীয় বাহিনী ভারদার নদী অতিক্রম করে প্রাচীন সার্বিয়া, আলবেনিয়া এবং বসনিয়ায় প্রবেশ করে। সুলতান মুরাদের সেনাপতি ওরনোস বেগ এবং সাম্রাজ্যের উজির কারাহ খলিল (খায়রুদ্দিন পাশা) এই বিজয়গুলোতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই যুদ্ধগুলো প্রায় দেড় বছর ধরে চলতে থাকে, যার ফলে ভারদার নদীর পূর্বের সমস্ত এলাকা বিজিত হয়, অন্যদিকে এর পশ্চিমে উসমানীয়দের আক্রমণ অব্যাহত ছিল। এই পরিস্থিতিতে সার্বিয়ার রাজা লাজার পরাজয় স্বীকার করে সন্ধির আবেদন করেন এবং কর দিতে সম্মত হন।

এই সময়ে বুলগেরিয়াতেও অগ্রযাত্রা অব্যাহত ছিল। ৭৭৩-৭৭৪ হিজরি (১৩৭২ খ্রিস্টাব্দ) সালে লৌহ শিল্পের জন্য বিখ্যাত শহর ‘কোস্টেভিল’ও বিজিত হয়। অবশেষে বুলগেরিয়ার রাজা বাধ্য হয়ে উসমানীয়দের বশ্যতা স্বীকার করে নেন। [২]

মোদাকথা, ৭৬৮ হিজরি (১৩৬৭ খ্রিস্টাব্দ) থেকে ৭৭৭ হিজরি (১৩৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত চলমান এই যুদ্ধগুলোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ছিল এই যে, প্রথমবারের মতো ইউরোপীয় দেশগুলো উসমানীয় সাম্রাজ্যের সাথে চুক্তি করতে বাধ্য হয়। [৩]

চিরমেন যুদ্ধ:

কিন্তু বুলগেরিয়া দীর্ঘকাল অঙ্গীকার রক্ষা করেনি। তারা সার্বিয়া এবং রোমানিয়ার সাথে মিলে একটি বড় জোট গঠন করে এবং উভয় মিলে তুর্কিদের সীমান্তে আক্রমণ চালায়। ৩ সফর ৭৭৩ হিজরি (২৬ সেপ্টেম্বর ১৩৭১ খ্রিস্টাব্দ) তারিখে ‘চিরমেন’ উপত্যকায় যুদ্ধ সংঘটিত...

[১] তারিখ-ই উসমানি: ১/ ১৯৭, ১৯৮

[২] তারিখ-ই উসমানি: ১/ ১৯৮, ১৯৯; দৌলত-ই উসমানিয়া, ড. উয়ায়ের, পৃ. ৩৩, ৩৪

[৩] তারিখ আদ-দাওলা আল-উসমানিয়া, ইলমাজ: ১/ ৯৮, ৯৯

এই যুদ্ধে খ্রিস্টানরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। সার্বিয়ার রাজা ফোটশিন এবং তার ভাই, যিনি উগলেশা (Uglesa)-এর শাসক ছিলেন, তারা নিহত হন। (তারা উভয়েই সার্বিয়ার প্রাক্তন রাজা স্টিফেন ডোমেনের পুত্র ছিলেন।) এই যুদ্ধের পর উসমানীয় বাহিনী অ্যাড্রিয়াটিক সাগরের উপকূল পর্যন্ত পৌঁছে যায়। [১]

ইউরোপে বিজয়ের ধারা:

উসমানীয় বাহিনী পশ্চিম বলকানে বিরতিহীনভাবে অগ্রসর হতে থাকে। দক্ষিণ-পশ্চিম ত্রোয়েশিয়ার অ্যাড্রিয়াটিক উপকূলীয় শহর ডালমাটিয়া (Dalmatia), মেসিডোনিয়ার দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর মোনাস্টির (Bitola), আলবেনিয়ার নিকটবর্তী বেরলাত এবং ইসতিব জয় করা হয়। কিছু শহর দীর্ঘ অবরোধের পর পদানত হয়।

বুলগেরিয়ার বর্তমান রাজধানী ‘সোফিয়া’র অবরোধ তিন বছর ধরে চলে। অবশেষে ৭৮৭ হিজরিতে (১৩৮৫ খ্রিস্টাব্দ) এটি জয় করা হয়। এই সময়ে পূর্ব বুলগেরিয়ার অনেক শহরেও ইসলামি পতাকা উড্ডীন হয়।

৭৮৮ হিজরিতে (১৩৮৬ খ্রিস্টাব্দ) সার্বিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা কেন্দ্র ‘নিশ’-ও নতি স্বীকার করে। পরের বছর উসমানীয় সেনাপতি খায়রুদ্দিন পাশা গ্যালিপলি থেকে আক্রমণ চালিয়ে মেসিডোনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ শহর স্যালোনিকা জয় করেন। তার পুত্র আলী পাশা বুলগেরিয়ার রাজা শিশম্যানকে পিছু হটতে বাধ্য করেন এবং তিনি পালিয়ে নিকোপোলিসে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন।

৭৮৯ হিজরিতে (১৩৮৭ খ্রিস্টাব্দ) আলী পাশা নিকোপোলিস অবরোধ করেন। অবশেষে বুলগেরিয়ার রাজাকে আত্মসমর্পণ করতে হয়। বুলগেরিয়ার অর্ধেক এলাকা উসমানীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং বাকি অর্ধেকের ওপর বুলগেরিয়ার রাজার শাসন বজায় থাকে। এভাবে উসমানীয়দের সীমানা পশ্চিমে আলবেনিয়া এবং উত্তর-পশ্চিমে বসনিয়া পর্যন্ত পৌঁছে যায়। [২]

কায়সার এবং তার পুত্রের ষড়যন্ত্র:

এই সময়ে কায়সার জন প্যালিলোগাস বাহ্যিকভাবে মুরাদ খানের অনুগত সেজে গোপনে উসমানীয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। তিনি ৭৭০ হিজরিতে (১৩৬৯ খ্রিস্টাব্দ) ইতালি সফর করেন এবং রোমের পোপের কাছে আবেদন জানান যেন তিনি পুরো ইউরোপকে মুরাদ খানের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করেন। পোপের সহানুভূতি অর্জনের জন্য তিনি সব ধরনের লাঞ্ছনা সহ্য করেন, এমনকি ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে রোমান চার্চের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নেন এবং ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে পোপ তাকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন।

ফেব্রার পথে ভেনিসের কিছু মহাজন কায়সারকে বন্দি করে, যাদের কাছ থেকে তিনি রোম সফরের জন্য ঋণ নিয়েছিলেন। এই সংবাদ তার বড় ছেলে অ্যাড্রোনিকাসের কাছে পৌঁছায়, যিনি উত্তরাধিকারী ছিলেন এবং সেই সময় কনস্টান্টিনোপলে প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন অযোগ্য, উচ্চাভিলাষী এবং চঞ্চল যুবক এবং সদ্য ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে মদমত্ত হয়ে পড়েছিলেন, তাই তিনি পিতাকে কোনো সাহায্য করেননি। অবশেষে কায়সারের দ্বিতীয় পুত্র ম্যানুয়েল, যিনি স্যালোনিকার শাসক ছিলেন, নিজের সম্পত্তি বিক্রি করে পিতার ঋণ পরিশোধ করেন।

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ: ৯৯/১

[২] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ: ১০০/১; দাওলাতে উসমানিয়া, ড. উয়াইর, পৃ. ৪৪, ৪৫

এবং তাকে মুক্ত করলেন।

কায়সার ফিরে এসে এন্ড্রোনিকাসের উত্তরাধিকার বাতিল করে দিলেন এবং তার পরিবর্তে ছোট ছেলে ম্যানুয়েলকে, যে কঠিন সময়ে তাকে সঙ্গ দিয়েছিল, নতুন উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করলেন। এতে এন্ড্রোনিকাস অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন।

কায়সার দীর্ঘকাল ইউরোপ থেকে সাহায্যের অপেক্ষায় ছিলেন, কিন্তু পোপের প্রতিশ্রুতিগুলো মরীচিকা প্রমাণিত হলো। ৭৭৪ হিজরি (১৩৭৩ খ্রিস্টাব্দ) সালে তিনি পোপের কাছে প্রতিনিধি পাঠিয়ে পুনরায় সাহায্যের আবেদন করেন, কিন্তু এই প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয় এবং দূতকে রিক্তহস্তে ফিরে আসতে হয়। তখন কায়সার হতাশ হয়ে উসমানীয় সালতানাতের বশ্যতা স্বীকার করে নেন এবং নিজের আনুগত্যের জামিন হিসেবে তার ছেলে থিওডোরসকে মুরাদ খানের কাছে পাঠিয়ে দেন।

কিছুকাল পর যখন মুরাদ খান এশিয়া মাইনরের অভিযানে ব্যস্ত ছিলেন, তখন কায়সারের বড় ছেলে এন্ড্রোনিকাস মুরাদ খানের ছোট ছেলে শাহজাদা সাউজির সাথে দেখা করতে উসমানীয়দের রাজধানী আদ্রিয়ানোপল (এদিরনে) এ আসেন। দুজনের মেজাজ একই রকম ছিল, তাই শীঘ্রই তাদের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। শাহজাদা এন্ড্রোনিকাস সাউজির সামনে তার বাবার অন্যায়ের ফিরিস্তি তুলে ধরেন এবং সাথে সাথে তাকে এই অনুভূতিও দেন যে, সে নিজেও তো তার বাবার অবহেলার শিকার। কেন না তারা দুজনে মিলে নিজেদের সেনাবাহিনী একত্রিত করে বিদ্রোহ করে এবং নিজ নিজ দেশের রাজা হয়ে যায়। সাউজি এই প্রলোভনে পা দিলেন। তিনি আদ্রিয়ানোপলের উসমানীয় বাহিনীকে বাইজেন্টাইন শাহজাদার বাহিনীর সাথে যুক্ত করে কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করেন।

মুরাদ খান এই খবর পাওয়া মাত্রই এশিয়া থেকে ইউরোপীয় উপকূলে চলে আসেন। একই সাথে তিনি কায়সারকে পত্র পাঠিয়ে কঠোর তিরস্কার করেন এবং দাবি করেন যে, বিদ্রোহে লিপ্ত উভয় শাহজাদার জন্য কঠোরতম শাস্তির সমর্থন করতে হবে। কায়সার এই অপরাধ থেকে নিজের সম্পূর্ণ নির্দোষিতা প্রকাশ করেন এবং বিদ্রোহীদের দমনের জন্য সব ধরনের সহযোগিতা প্রদানের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। সাথে সাথে তিনি সুলতানের এই প্রস্তাবও গ্রহণ করে নেন যে, উভয় বিদ্রোহী শাহজাদাকে গ্রেফতারের পর অন্ধ করে দেওয়া হবে।

কায়সারকে দমনের পর মুরাদ খান শাহজাদাদের শিবিরের দিকে অগ্রসর হন এবং ঘোষণা করেন যে, যারা বিদ্রোহীদের সঙ্গ ত্যাগ করবে সেই সৈন্যদের ক্ষমা করে দেওয়া হবে। এই ঘোষণার পর হাতেগোনা কয়েকজন ছাড়া সব বিদ্রোহী সৈন্য শাহজাদাদের থেকে আলাদা হয়ে গেল। মুরাদ খান উভয় শাহজাদাকে গ্রেফতার করলেন। তিনি নিজের ছেলের চোখে গলিত সিসা ঢেলে তাকে অন্ধ করে দিলেন এবং পরে হত্যা করালেন। বিদ্রোহে লিপ্ত বাইজেন্টাইন আমিরদের মারিৎসা নদীতে ডুবিয়ে মারা হলো। অন্যদিকে কায়সারের ছেলেকে শিকলবন্দী করে কনস্টান্টিনোপলে পাঠিয়ে দেওয়া হলো যাতে তিনি নিজেই তাকে শাস্তি দেন। কায়সার সুলতানের ক্রোধ থেকে বাঁচতে বাহ্যিকভাবে তো নিজের ছেলের ওপর অন্ধত্বের শাস্তি কার্যকর করলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি অত্যন্ত নমনীয়তা প্রদর্শন করলেন এবং এমনভাবে শাস্তি দিলেন যে শাহজাদার কেবল একটি চোখ ক্ষতিগ্রস্ত হলো, আর অন্য চোখের দৃষ্টিশক্তি কিছুটা হলেও অবশিষ্ট থাকল। মোদাকথা, কায়সার মুরাদ খানকে সন্তুষ্ট করে কনস্টান্টিনোপল অবরোধের বিপদ এড়িয়ে গেলেন। এই ঘটনাটি ৭৮৭ হিজরি (১৩৮৫ খ্রিস্টাব্দ) সালের।

এই ঘটনার পর কায়সারকে উসমানীয় সালতানাতের সাথে নতুন করে বশ্যতার চুক্তি করতে হলো এবং নতুন শর্ত অনুযায়ী তিনি...

উসমানীয় বাহিনীতে সামরিক সেবা প্রদানের জন্য তিনি বাধ্য হন, যার জামিন হিসেবে তিনি তাঁর পুত্র ম্যানুয়েলকে সুলতান মুরাদের দরবারে পাঠিয়ে দেন। [১]

সংস্কারের যুগ

(৭৭৮ হিজরি (১৩৭৬ খ্রি.) থেকে ৭৮৩ হিজরি (১৩৮১ খ্রি.))

ইউরোপীয় শক্তিগুলোকে শিক্ষা দেওয়ার পর সুলতান মুরাদ ৭৭৮ হিজরি (১৩৭৬ খ্রি.) থেকে ৭৮৩ হিজরি (১৩৮১ খ্রি.) পর্যন্ত প্রায় পাঁচ বছর এমনভাবে অতিবাহিত করেন যেখানে তাঁর মনোযোগ বিজয়ের চেয়ে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার উন্নতি, গঠনমূলক ও উন্নয়নমূলক কাজ এবং প্রশাসনিক সংস্কার প্রবর্তনের দিকে নিবদ্ধ ছিল।

তিনি পেশাদার সেনাবাহিনী এবং জায়গিরদার সৈন্যদের ব্যবস্থার পুনর্গঠন সম্পন্ন করেন, সরকারি জমি পৃথক করেন এবং মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকাহর জন্য জমি ওয়াকফ করেন। তিনি সেনাবাহিনীর সাধারণ কাজের জন্য জিম্মি নাগরিকদের একটি দল গঠন করেন যারা তাবু স্থাপন ও অপসারণ, মালবাহী পশু ও যানবাহনের দেখাশোনা, আস্তাবল পরিষ্কার করা এবং অন্যান্য সাধারণ কাজে নিয়োজিত ছিল।

এই সময়ে সামরিক পতাকার জন্য “লাল” রঙ নির্ধারণ করা হয় যা পরবর্তীতে উসমানীয় সাম্রাজ্যের জাতীয় রঙে পরিণত হয়। [২]

আনাতোলিয়ার অভিযানসমূহ - আমির কারামানের কন্যার সাথে শাহজাদা বায়েজিদের বিবাহ:

মুরাদ খানের অধিক মনোযোগ ইউরোপীয় অঞ্চলের দিকে ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি আনাতোলিয়ায় তাঁর সীমানা সম্প্রসারণের গুরুত্ব ভুলে যাননি। তবে তিনি চেয়েছিলেন যে এই প্রক্রিয়াটি কোনো রক্তপাত ছাড়াই শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হোক। এশিয়া মাইনরে তাঁর চারপাশে তুর্কমেন আমিরদের বেশ কিছু স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্র ছিল যেগুলোকে তিনি যখন খুশি বশীভূত করতে পারতেন। অন্যদিকে ইউরোপে তাঁর প্রতিটি অগ্রসর পদক্ষেপ প্রতিবেশী মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ করে তুলছিল এবং স্বায়ত্তশাসিত আমিররা তাঁর নেতৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে যাচ্ছিলেন। তবে তিনটি রাষ্ট্র: জারমিয়ান রাষ্ট্র, কারামান রাষ্ট্র এবং হামিদীয়া রাষ্ট্র তাঁর উদ্বেগের কারণ ছিল। বিশেষ করে কারামানের আমিররা নিজেদের উসমানীয় রাষ্ট্রের সমকক্ষ মনে করতেন কারণ রুম সালতানাতের কেন্দ্র কোনিয়া তাঁদের দখলে ছিল। ফলে এই উভয় রাষ্ট্রই আনাতোলিয়ায় সেলজুকদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী এবং এই অঞ্চলের অভিভাবক হওয়ার দাবিদার ছিল।

মুরাদ খান উত্তেজনার এই পরিবেশ প্রশমিত করার জন্য ৭৮৩ হিজরিতে (১৩৮১ খ্রি.) তাঁর পুত্র শাহজাদা বায়েজিদের সাথে আমির কারামানের কন্যার বিবাহ সম্পন্ন করেন। কনে যৌতুক হিসেবে কুতাহিয়াহ দুর্গসহ কারামান রাষ্ট্রের বেশ কিছু দুর্গের চাবি সাথে নিয়ে এসেছিলেন। বুর্সায় বিয়ের অনুষ্ঠান অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয় যেখানে আনাতোলিয়ার সকল রাষ্ট্রের প্রতিনিধি এবং...

[১] তারিখ-ই-উসমানি: ১/১৬৭, ১৬৮; দাওলাত-ই-উসমানিয়া, ড. আজিজ: ১/৪২, ৪৩, ৪৪

[২] দাওলাত-ই-উসমানিয়া, ড. আজিজ: ১/২৫০

মিশরের সুলতানের রাষ্ট্রদূতরা শরিক হলেন। এই মেহমানরা নিজেদের সাথে গ্রীক দাসী, আরবি ঘোড়া, আলেকজান্দ্রিয়ার রেশমি কাপড়, স্বর্ণমুদ্রা ভর্তি সোনা ও রূপার পাত্র এবং অলঙ্কৃত পেয়ালা ও থালা নিয়ে এসেছিলেন। সুলতান মুরাদ খান এই সমস্ত উপহার উপস্থিতদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। তবে যখন কারামানের কেব্লাগুলোর চাবি পেশ করা হলো, সুলতান সেগুলো নিজের কাছে রাখলেন। এভাবে কোনো যুদ্ধ ছাড়াই এই কেব্লাগুলো উসমানীয় সালতানাতের অংশ হয়ে গেল। [১]

হামিদিয়ার কেব্লাগুলো কিনে নেওয়া হলো:

৭৮৩ হিজরি (১৩৮১ খ্রিস্টাব্দ) সালে সুলতান মুরাদ খান এক বড় সাফল্য অর্জন করেন। তিনি হামিদিয়া রাজ্যের শাসককে এই মর্মে রাজি করান যে তিনি তার রাজ্যের একটি বড় অংশ তার কাছে বিক্রি করে দেবেন। এই কেব্লাগুলোর মধ্যে “আক শহর”, “ইয়ালভাজ”, “বেয়শেহির”, “সিদি শহর” এবং “কারা আগাচ” অন্তর্ভুক্ত ছিল। [২]

কারামানিদের সাথে দ্বন্দ্ব এবং কুনিয়া বিজয়:

উসমানীয় রাষ্ট্রের সাথে হামিদিয়া রাজ্যের এই এলাকা যুক্ত হওয়ার ফলে কারামান রাজ্যের সাথে হামিদিয়ার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং কারামান রাজ্য উত্তর ও পশ্চিম দিক থেকে পুরোপুরি উসমানীয়দের সাথে সংযুক্ত হয়ে গেল। যেহেতু এই দুই রাজ্যের মধ্যে আগে থেকেই শত্রুতা চলে আসছিল, তাই কারামানের আমিররা এই সীমান্ত সংযোগকে বিপদের দৃষ্টিতে দেখলেন। এদিকে ৭৮৩ হিজরি (১৩৮২ খ্রিস্টাব্দ) সালে বনু হামিদ, ৭৮৫ হিজরি (১৩৮৩ খ্রিস্টাব্দ) সালে বনু জান্দার এবং ৭৮৭ হিজরি (১৩৮৫ খ্রিস্টাব্দ) সালে আমির আমাসিয়া সুলতান মুরাদ খানের আনুগত্য স্বীকার করে নেন। এরপর বনু কারামান, যারা কুনিয়ার শাসক ছিলেন, তাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করা হলো। এভাবে সুলতান মুরাদ খান তার মেয়ে বিবি নারিসাকে কুনিয়ার নবাব আলাউদ্দিনের সাথে বিবাহ দিলেন। কিন্তু ৭৮৯ হিজরিতে আলাউদ্দিন আত্মীয়তার সম্পর্ক উপেক্ষা করে বিদ্রোহ করে বসলেন। এর কারণ ছিল এই যে, সেই বছর মিশরের আব্বাসীয় খিলাফতের পক্ষ থেকে মুরাদ খানকে আনাতোলিয়ার নেতৃত্বের সনদ দেওয়া হয়েছিল, অথচ এর আগে এই সম্মান বনু কারামানের ছিল। এই বঞ্চনায় ক্ষুব্ধ হয়ে আলাউদ্দিন উসমানীয় সালতানাতের সীমানায় আক্রমণ করে বসলেন।

মুরাদ খান খবর পাওয়া মাত্রই ৭০ হাজার সৈন্য নিয়ে কুনিয়ার দিকে যাত্রা করলেন। বাহিনীর কমান্ড ছিল তার উত্তরাধিকারী বায়েজিদের হাতে, যিনি হঠাৎ আক্রমণ করে কারামানি বাহিনীকে তছনছ করে দিলেন। মুরাদ খান শাহজাদাকে তার এই বীরত্বের জন্য ‘ইলদিরিম’ (আকাশের বিদ্যুৎ) উপাধি দিলেন। পরাজয়ের পর কুনিয়ার আমির আলাউদ্দিন তার স্ত্রী বিবি নারিসাকে (সুলতানের মেয়ে) সুপারিশকারী হিসেবে পাঠালেন এবং মুরাদ খান সুপারিশ গ্রহণ করে আমিরকে ক্ষমা করে দিলেন। এই বিজয়ে সার্বিয়ার খ্রিস্টানরাও উসমানীয়দের সাথে ছিল। মুরাদ খান বিজয়ের পর নির্দেশ দিয়েছিলেন যে নাগরিকদের জান ও মালের ওপর যেন হাত দেওয়া না হয়। কিন্তু সার্ব খ্রিস্টানরা নির্দেশ অমান্য করে লুটতরাজ শুরু করে দিল। এতে মুরাদ খান রাগান্বিত হয়ে এই ধরনের কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিলেন। এই খবর যখন সার্বিয়ার লোকদের কাছে পৌঁছাল, তখন তারা নিজেদের স্বজাতির প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য উত্তেজিত হয়ে উঠল। [৩]

[১] দৌলতে উসমানিয়া, ডক্টর আজিজ: ১/৩৬

[২] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইজলমাজ: ১/৯৯, ১০০

[৩] আখবারুদ দাওলা: ১৩/৩

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

যখন ক্রুসেড যুদ্ধ শুরু হলো

ইউরোপের অধিবাসীরা আগে থেকেই উসমানীয়দের প্রতি ক্ষুব্ধ ছিল। সার্বিয়ার রাজা তুর্কিদের ইউরোপ থেকে বের করে দেওয়ার ডাক দিলে যাজকদের একটি বিশাল দল তার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে। পুরো ইউরোপে এক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। সেখানে ষষ্ঠ হিজরি শতকের ক্রুসেড যুদ্ধের মতো সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর বিরুদ্ধে যে ধরনের উদ্দীপনা ও উত্তেজনা ছিল, ঠিক তেমনই পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। ৭৯১ হিজরি (১৩৮৯ খ্রিস্টাব্দে) সার্বিয়া, বসনিয়া, বুলগেরিয়া, আলবেনিয়া, হাঙ্গেরি, গ্যালিসিয়া, পোল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, জার্মানি এবং ইতালির সেনাবাহিনী একত্রিত হয়ে একটি প্লাবনের মতো উসমানীয় অধিকৃত অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে।

লালা শাহীন পাশা ২০ হাজার সৈন্য নিয়ে বসনিয়ার সীমান্তে প্লোচনিক নামক স্থানে তাদের মোকাবিলা করেন, কিন্তু তার কৌশল সফল হয়নি। মিত্রবাহিনী উসমানীয়দের ঘিরে ফেলে। এই যুদ্ধে তুর্কিদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং মাত্র পাঁচ হাজার সৈন্য কোনোমতে প্রাণে বেঁচে ফিরে আসতে সক্ষম হয়। এটি ছিল তাদের প্রথম পরাজয়, যা ইউরোপীয় শক্তিগুলোকে তাদের বিরুদ্ধে একটি বড় বিজয়ের আশা জাগিয়ে তোলে। [২]

ক্রুসেড যুদ্ধ - কসোভোর যুদ্ধ

মুরাদ খান যখন বুরসায় এই সংবাদ পেলেন, তখন তিনি তার সেনাবাহিনী প্রস্তুত করে তার এশীয় ও ইউরোপীয় করদ রাজ্যগুলোর সৈন্যদলসহ অত্যন্ত দ্রুততার সাথে রণক্ষেত্রের দিকে রওনা হলেন। কসোভোর (Kosovo) কাছে উভয় বাহিনী মুখোমুখি হলো। সুলতানের বাহিনী কসোভো নদীর পূর্ব দিকে এবং খ্রিস্টানদের বাহিনী পশ্চিম তীরে অবস্থান করছিল। শত্রু বাহিনীর সংখ্যা এত বেশি ছিল যে, মুসলমানদের জন্য প্রথমবারের মতো বিজয় কঠিন মনে হতে লাগল। এমন পরিস্থিতিতে মুরাদ খান আল্লাহর কাছে বিজয় ও সাহায্যের প্রার্থনা করছিলেন। রাতে তিনি তাঁবুতে জায়নামাজে বসে হাত তুলে বলছিলেন:

“ইয়া আল্লাহ! হে দয়ালু! হে আসমানসমূহের মালিক! হে দোয়া কবুলকারী! এই ফকীরের দোয়া কবুল করুন! আমরা আপনার গুনাহগার বান্দা। আপনি দানকারী, আমরা ভিখারি। আপনি অন্তরের খবর জানেন। আমি নিজের জন্য কিছুই চাই না, আমি গনিমতের মাল হাসিল করতে আসিনি। আমি কেবল আপনার সন্তুষ্টির প্রত্যাশী। হে আল্লাহ! আমি আপনার পথে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করতে চাই। মুসলমানদের শত্রুদের সামনে লজ্জিত করবেন না। আমাকে তাদের ধ্বংসের কারণ বানাবেন না। তাদের বিজয়ী করুন। রাজত্বও আপনার এবং শক্তিও আপনার। আপনি যাকে চান তাকে তা দান করেন। আমি আপনার ইজ্জত ও জালালের কসম খেয়ে বলছি যে, আমার কাছে এই নশ্বর দুনিয়ার জিহাদ কাম্য নয়। আমি সর্বদা শাহাদাতের অশ্বেষায় লড়াই করেছি। হে আল্লাহ! এবার আমাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করুন।” [১]

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইয়ালামাজ: ১/১০০

[২] আল-জাওয়ানিবুল মুদিয়াহ, পৃষ্ঠা: ৩০, ৩১, ১৯০

কুরআন মাজীদেৱ সুসংবাদ:

এই সময়ে তিনি কুরআন মাজীদ খুললেন এবং হঠাৎ এই আয়াতের ওপর তাঁর দৃষ্টি পড়ল:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنَّ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ.

“হে নবী! আপনি মুমিনদেরকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করতে থাকুন। যদি তোমাদের মধ্যে বিশ জন ধৈর্যশীল থাকে, তবে তারা দুইশ জনের ওপর বিজয়ী হবে। আর যদি তোমাদের মধ্যে একশ জন থাকে, তবে তারা এক হাজার (কাফিরদের) ওপর বিজয়ী হবে।” [১]

এই আয়াতগুলো পাঠ করে মুরাদ খান প্রশান্তি লাভ করলেন এবং তাঁর সাহস বেড়ে গেল। সকালে যুদ্ধক্ষেত্রে তুমুল লড়াই শুরু হলো। বাহিনীর মধ্যভাগে একদিকে ছিলেন মুরাদ খান এবং অন্যদিকে ছিলেন সার্বিয়ার রাজা। উভয় পক্ষ থেকে বীররা প্রাণের বাজি ধরলেন। ধ্বংস ও অস্তিত্ব রক্ষার এই লড়াই দীর্ঘতর হতে থাকল এবং হাজার হাজার লাশ পড়ে যাওয়ায় জমিনে রক্তের নদী বইতে লাগল। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে তুর্কিদের পা যখন টলমল করছিল, তখন মুরাদ খানের উত্তরাধিকারী বায়েজিদ ইয়ালদারাম নিজের বাহিনী নিয়ে শত্রুর মধ্যভাগে ঢুকে পড়লেন এবং এমন বীরত্ব প্রদর্শন করলেন যে শত্রুর কাতারগুলো তখনই হয়ে গেল। তাঁর এই সাহসিকতা তুর্কিদের মনোবল বাড়িয়ে দিল এবং তারা একযোগে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আট ঘণ্টার এই লড়াই এমনভাবে শেষ হলো যে, সার্বিয়ার রাজা ‘লাজার’ হামলায় নিহত হলেন এবং খ্রিস্টানরা যারা মুসলমানদের পরাজিত করার ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল, তারা বিশৃঙ্খল অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালাতে লাগল। এই যুদ্ধ ৭৯০ হিজরি (১৩৮৯ খ্রিস্টাব্দ) সালে সংঘটিত হয়েছিল। খ্রিস্টানরা একে তাদের ইতিহাসের নিকৃষ্টতম পরাজয় হিসেবে গণ্য করে।

এই যুদ্ধ আগামী কয়েক শতাব্দীর জন্য ইউরোপের ভাগ্য নির্ধারণ করে দিল। যেসব এলাকা তুর্কিদের দখলে ছিল না, সেখানেও তাদের বিজয়ের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এটি প্রমাণিত হলো যে, পুরো ইউরোপ মিলেও উসমানীয়দের ইউরোপ থেকে বের করতে পারবে না। এই যুদ্ধ তুর্কিদের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী সার্বিয়ার স্বাধীনতা খতম করে দিল। ইউরোপে এরপর কেবল হাঙ্গেরিই এমন এক দেশ ছিল যা উসমানীয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে লড়াইতে পারত। [২]

শাহাদাতের ঘটনা:

মুরাদ খানের দোয়া কবুল হয়েছিল। যুদ্ধের পর তিনি ময়দানে লাশ এবং বন্দিদের পর্যবেক্ষণ করছিলেন, এমন সময় লাশের স্তুপের মধ্য থেকে মিলোশ কাবিলোভীচ নামক এক সার্ব অফিসার উঠে তাঁর দিকে এগিয়ে এল। তুর্কি সৈন্যরা তাকে ধরে নিরস্ত্র করে দিল, কিন্তু সে জানাল যে সে বাদশাহর হাতে ইসলাম গ্রহণ করতে চায়। মুরাদ খানের আদেশে সৈন্যরা তাকে ছেড়ে দিল। সে সামনে এগিয়ে গিয়ে মুরাদ খানের হস্তচুম্বন করতে লাগল। এই সময়ে সে হঠাৎ নিজের আঙ্গিনে লুকিয়ে রাখা বিষাক্ত খঞ্জর বের করে এমন এক মারাত্মক আঘাত করল যে বাদশাহ আর বাঁচতে পারলেন না। [৩]

[১] সূরা আল-আনফাল, আয়াত নম্বর ৬৫

[২] আখবারুদ দুওয়াল: ৩/১৫, উসমানি তুর্ক, পৃ. ৩৮, ৩৯, আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া আয-সাল্লাবি, পৃ. ৬০

[৩] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া আয-সাল্লাবি, পৃ. ৬০

মুরাদ খানের শেষ কথা:

মুরাদ খানের শেষ কথাগুলো ছিল এই:

“আমি বিদায় নেওয়ার সময় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি যে, তিনি আমার মতো ফকিরের দোয়া কবুল করেছেন। আমার ছেলে বায়েজিদের আনুগত্য করো। বন্দিদের শাস্তি দিও না, কষ্ট দিও না, তাদের থেকে কোনো কিছু ছিনিয়ে নিও না। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ...”

কিছুক্ষণ পরই নিজ যুগের এই সাহসী ব্যক্তি শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেন। এই ঘটনাটি ১৫ শাবান ৭৯১ হিজরি (৮ অক্টোবর ১৩৮৮ খ্রিস্টাব্দ)-এর। হত্যাকারীকে মেরে ফেলা হয় এবং শহীদের মরদেহ বুর্সায় নিয়ে গিয়ে দাফন করা হয়।

এই ঘটনার পর উসমানীয় সালতানাতে এই নিয়ম করা হয় যে, যখনই কোনো সাক্ষাৎপ্রার্থী সুলতানের সাথে দেখা করত, তখন দুজন সৈন্য ডানে ও বামে থেকে তার আস্তিন ধরে থাকত যাতে পুনরায় কোনো দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে। [১]

মুরাদ খানের বয়স ছিল ৬৫ বছর। তিনি ৩১ বছর শাসন করেন এবং সারা জীবন জিহাদে অতিবাহিত করেন। তিনি তার পূর্বপুরুষদের মতো সচ্চরিত্রবান, মুত্তাকি, সাহসী ও দানশীল ছিলেন। তবে তিনি সরলতা ও দরবেশির পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি বজায় রাখার জন্য রাজকীয় শান-শওকত প্রদর্শন করা জরুরি মনে করতেন। [২]

মুরাদ খানের সংস্কারসমূহ

মুরাদ খান সেনাবাহিনী, বিচার বিভাগ এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অনেক সংস্কার সাধন করেন। এর আগে সেনাবাহিনীতে আলাদা কোনো আদালত ছিল না। মুরাদ খান ‘কাজী আসকার’ নামে সেনাবাহিনীর জন্য আলাদা আদালত প্রতিষ্ঠা করেন। কাজী কারাহ খলিলকে প্রথমবারের মতো এই পদে অধিষ্ঠিত করা হয়।

এর আগে ‘বেলার বে’ (প্রধান সেনাপতি) পদটি কেবল আল-উসমানের জন্য নির্ধারিত ছিল। কিন্তু মুরাদ খান প্রথমবারের মতো পরিবারের বাইরের একজন সম্মানিত সদস্য লালা শাহিনকে এই পদে নিযুক্ত করেন। এরপর তৈমুর তাশ এই পদ লাভ করেন।

মুরাদ খানের আগে অশ্বারোহী বাহিনী নিজেরাই নিজেদের ঘোড়ার দেখাশোনা করত। তিনি ‘ভয়নুক’ (সাইস) নামে একটি আলাদা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন যার সদস্যরা ঘোড়ার দেখাশোনা করত এবং সেনাবাহিনীর পূর্ণ মনোযোগ যুদ্ধের ওপর থাকত।

কৃষি ব্যবস্থারও উন্নতি হয় এবং বিজিত বিশাল ভূমি সেনাবাহিনীর মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়। প্রত্যেক সৈন্যকে জায়গির থেকে অংশ দেওয়া হতো যাতে সামরিক সেবা থেকে অবসরের পর সে সচ্ছল জীবন যাপন করতে পারে।

মুরাদ খান অন্যান্য ইসলামি রাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন। তার আমলে প্রথমবারের মতো উসমানীয় সালতানাতে সাথে মিশরের আব্বাসীয় খিলাফত ও মামলুকদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। খলিফা মুতাওয়াঙ্কিল, খলিফা ওয়াসিক এবং চেরকাসীয় মামলুকদের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান...

[১] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া, আস-সান্নাবি, পৃ. ৬০

[২] আখবারুদ দুওয়াল: ৩/১৫, উসমানি তুর্ক, পৃ. ৩৪ থেকে ৩৬

তারিখ-ই-উম্মতে মুসলিমা

আজ-জহির বরকুক সুলতান মুরাদের সমসাময়িক ছিলেন। আজ-জহির বরকুক মুরাদ খানের বিজয়াভিযানের গুণগ্রাহী ছিলেন। তিনি উসমানীয় তুর্কিদের এশিয়া মাইনরে নিজের সহযোগী হিসেবে গণ্য করতেন, যার ফলে আনাতোলিয়ার অন্যান্য তুর্কমেন রাষ্ট্রগুলোর অবস্থান আরও দুর্বল হয়ে পড়ে।

মুরাদ খান যথাসম্ভব মুসলিম শাসকদের সাথে যুদ্ধ এড়িয়ে চলতেন। এর পরিবর্তে তিনি সমঝোতার মাধ্যমে মুসলিম আমিরাতগুলোকে সাথে রাখার চেষ্টা করতেন। যেমনটি তিনি ৭৮৩ হিজরিতে হামিদিয়া রাষ্ট্র থেকে এর পাঁচটি দুর্গ: ইয়ালভাজ, ইয়েনিশেহির, আকশেহির, সাইদিশেহির এবং কারাগাছ মোটা অংকের মূল্যে কিনে নিয়েছিলেন। [১]

উন্নয়ন, ধর্মীয় সহনশীলতা ও সাম্রাজ্যের বিস্তার:

নিজের পিতা ও পিতামহের মতো সুলতান মুরাদও অনেক মসজিদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং খানকাহ নির্মাণ করিয়েছিলেন। তিনি অমুসলিম নাগরিকদের তাদের নিজ নিজ ধর্ম পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। ৭৭৮ হিজরিতে (১৩৮৫ খ্রিষ্টাব্দ) পোপ আরবান ষষ্ঠ গ্রিক চার্চের প্যাট্রিয়াককে লেখা এক পত্রে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, মুরাদ খান গির্জাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন এবং তাঁর কাছে খ্রিস্টানদের সাথে দুর্ব্যবহারের কোনো অভিযোগ নেই।

মুরাদ খানের শাহাদাত পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্যের পরিধি পাঁচ লক্ষ বর্গকিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। এর মধ্যে দুই লক্ষ আশি হাজার বর্গকিলোমিটার আনাতোলিয়ায় এবং দুই লক্ষ বিশ হাজার বর্গকিলোমিটার ‘রুমেলিয়া’ (ইউরোপীয় অঞ্চল)-তে ছিল। এভাবে তিনি তাঁর পিতা ‘অরখান’-এর শাসনামলের তুলনায় পাঁচ গুণ বৃদ্ধি করেছিলেন। এই সময়ে তিনি নিজে ৩৭টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং প্রতিবারই সাফল্য তাঁর পদচুম্বন করে। [২]

ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ সুলতান মুরাদের গুণাবলির স্বীকৃতিদানকারী:

ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ সুলতানের গুণাবলি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। সেই সময়ের একজন সমসাময়িক ইউরোপীয় ঐতিহাসিক লিখেছেন:

“তিনি নিজে ৩৭টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং সবগুলোতে বিজয়ী হন। তাঁর খ্যাতি এমন একজন নেতার মতো ছিল যিনি কখনো পরাজিত হননি। বার্ষিক্যেও তাঁর শক্তি ও কর্তৃত্ব কোনো কমতি আসেনি।” [৩]

অন্য একজন ঐতিহাসিক বলেন:

“এটা সম্ভব নয় যে সেই সময়ের সমসাময়িক ইউরোপীয় শাসকদের মধ্যে তাঁর মতো কোনো শাসক খুঁজে পাওয়া যাবে। তিনি কেবল একজন চতুর সেনাপতি এবং বাস্তবধর্মী কৌশলীই ছিলেন না, বরং তিনি নিজের সত্তায় একজন প্রগতিশীল রাজনীতিজ্ঞও ছিলেন। তিনি জন্মগতভাবে একজন নেতা ছিলেন। তিনি উসমানীয়দের একটি ঐক্যবদ্ধ ও আদর্শ জাতিতে পরিণত করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর সময় এই জাতির ভবিষ্যৎ পাঁচ শতাব্দীর জন্য সুরক্ষিত হয়ে গিয়েছিল।” [৪]

[১] আখবারুদ দুওয়াল: ১/১৩৩।

[২] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ: ১/১০০।

[৩] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ: ১/১০২।

[৪] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ: ১/১০৩।

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

একজন ফরাসি ঐতিহাসিক লিখেছেন:

“তিনি ছিলেন একজন সাহসী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং কর্মঠ মানুষ। বার্ষিক্যেও তিনি যৌবনের মতোই ক্ষিপ্র ও চটপটে ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি। কোনো অভিযান শুরু করার আগে তার পূর্ণ নকশা তৈরি না করা পর্যন্ত তিনি তা শুরু করতেন না। তিনি আনুগত্য ও বাধ্যতা স্বীকারকারী দেশ ও জনগণের সাথে তাদের ধর্ম যাই হোক না কেন, কল্যাণ, নম্রতা ও সদাচরণের আচরণ করতে চাইতেন। তার পাকড়াও থেকে কেউ বাঁচতে পারত না। তিনি সর্বদা সত্য কথা বলতেন, যদিও তার ফলাফল তার বিরুদ্ধেই যাক না কেন। তার আমানতদারি ও সততার ওপর সকলের আস্থা ছিল, তারা আপন হোক বা পর।” [১]

ডক্টর গিবন লিখেছেন:

“তিনি তার সময়ের সকল শাসক এবং বিশ্বের সকল সাম্রাজ্যের কর্মকর্তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি সেই সীমানা ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন যা তার পিতা কল্পনা করেছিলেন। তিনি রোমান কায়সারের আস্থা এবং কিছুটা তার ভালোবাসাও অর্জন করেছিলেন। তিনি অর্থোডক্স চার্চের সাথে তার চেয়ে বহুগুণ ভালো আচরণ করেছিলেন যা ক্যাথলিক চার্চের লোকেরা তাদের সাথে করেছিল।” [২]

[১] History of the Othman Turk Khalkokondylas: p. 29

[২] The History of the Decline and Fall of the Roman Empire by Edward Gibbons: p. 52

বায়েজিদ ইয়ালদারাম

৭৯১ হিজরি হতে ৮০৫ হিজরি

(১৩৮৯ খ্রি. হতে ১৪০৩ খ্রি.)

মুরাদ খানের শাহাদাতের পর তার ২৯ বছর বয়সী উত্তরাধিকারী বায়েজিদ শাবান ৭৯১ হিজরিতে ক্ষমতার মসনদে বসেন। তিনি ছিলেন একজন শরীফ, সদাচারী, দূরদর্শী এবং প্রশাসনিক দক্ষতায় ভরপুর এক যুবক। অত্যন্ত অভিজ্ঞ সৈনিক এবং দক্ষ পরিকল্পনাকারী ছিলেন। তার সৈন্যবাহিনী পরিচালনা এবং আক্রমণ এত দ্রুত ও আকস্মিক হতো যে দুনিয়া তাকে “ইয়ালদারাম” (আকাশের বিদ্যুৎ) বলে ডাকত। তিনি একদিন আনাতোলিয়ায় থাকলে অন্যদিন সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আক্রমণ করতেন। [১]

ভাইকে মৃত্যুদণ্ড:

বায়েজিদ সিংহাসনে আরোহণের পরপরই তার ভাই ইয়াকুবকে কোনো এক অজুহাতে নিজের কাছে ডেকে আনেন এবং সেখানে তাকে বন্দি করে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়। আসলে বায়েজিদের সন্দেহ ছিল যে তিনি হয়তো বিদ্রোহ করতে পারেন। উসমানীয় বংশে সন্দেহ ও সংশয়ের ভিত্তিতে নিজের আত্মীয়দের হত্যা করার এটিই ছিল প্রথম উদাহরণ। এরপর অনেক উসমানীয় সম্রাট এই কাজ করেছেন। [২]

বায়েজিদের শাসনামল ইতিহাসের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, এই সময়ে একদিকে উসমানীয়দের বিজয়ের পরিধি গ্রিস পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। অন্যদিকে একই সময়ে বিখ্যাত মুঘল শাসক তৈমুর হিন্দুস্তান বিজয়ের পর উত্তর-পশ্চিমের দিকে অগ্রসর হন। এভাবে বিশ্বের দুই বিখ্যাত বিজেতা একে অপরের মুখোমুখি হন। বায়েজিদ ও তৈমুর লঙের সংঘাতের কথা আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব, তবে তার আগে তৈমুরের সেই অভিযানগুলোর কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যা বায়েজিদের সিংহাসনে আরোহণের আগেই ঘটেছিল।

তৈমুর লঙের আবির্ভাব:

মুরাদ খানের সময়েই পূর্ব দিক থেকে এক বিশাল বিপদ দেখা দিয়েছিল। এই মুঘল শাসক ছিলেন তৈমুর লঙ, যিনি মাত্র কয়েক বছরে মধ্য এশিয়া ও খোরাসানকে রক্তরঞ্জিত করে সারা বিশ্বকে অবাক করে দিয়েছিলেন। যদিও তিনি নওমুসলিম তাতারদের বংশধর ছিলেন, কিন্তু তার অভ্যাস ছিল তার অমুসলিম পূর্বপুরুষদের মতো। দুঃসাহসিকতা, কঠোরতা এবং পরিশ্রমী মনোভাব তার মধ্যে প্রবলভাবে বিদ্যমান ছিল। তৈমুর শব্দের অর্থ লোহা এবং তিনি সত্যিই একজন লৌহমানব ছিলেন। ৭৬৬ হিজরিতে (১৩৬৪ খ্রিস্টাব্দ) দক্ষিণ খোরাসানের...

[১] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া ফিত তারিখিল হাদিস, পৃষ্ঠা ৪০

[২] আখবারুদ দুওয়াল: ৩/১৫

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

চতুর্থ খণ্ড

উপজাতিদের সাথে একটি যুদ্ধের সময় তীরের আঘাতের কারণে তিনি কিছুটা খুঁড়িয়ে হাঁটতেন, তাই বিরোধীরা তাকে ‘তৈমুর লঙ’ (খোঁড়া তৈমুর) বলে ডাকত। [১] তার দরবারে উলামা ও ফকিহগণও ছিলেন। তিনি তাদের কথা শুনতেন কিন্তু কাজ করতেন নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন একজন স্বাধীনচেতা ব্যক্তি। তার ধর্মীয় ঝোঁকের মধ্যে শিয়া মতবাদের প্রতি অনুরাগ লক্ষ্য করা যায়। তবে তার দরবারে সুন্নি ও শিয়া উভয় প্রকারের আলেম উপস্থিত থাকতেন। তিনি ৭৩৬ হিজরি (১৩৩৫ খ্রিস্টাব্দ) সালে সমরকন্দে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ‘আমির তুরগাই’ বারলাস গোত্রের সর্দার এবং সমরকন্দের শাসক ছিলেন। [২]

তৈমুরের বিজয়সমূহ:

পিতার মৃত্যুর পর তৈমুর গোত্রের সর্দার হন। তিনি শৈশব থেকেই চেঙ্গিস খানের বিজয়সমূহ দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত ছিলেন, তাই সীমাহীন রক্তপাত ও বিজয়ের নেশা তার মাথায় চেপে বসে। তরুণ বয়সেই তিনি ক্ষমতা দখলের জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠেন। তিনি মধ্য এশিয়ার তাতার শাসক তুঘলক তৈমুরের সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে আফগানিস্তানের অনেক এলাকা জয় করেন। তুঘলক তৈমুর তাকে সমরকন্দের গভর্নরও নিযুক্ত করেছিলেন।

৭৭০ হিজরি (১৩৬৮ খ্রিস্টাব্দ) সালে বলখ জয়ের পর তৈমুর স্বাধীন শাসনের ঘোষণা দেন। কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি সমরকন্দ ও বুখারা সহ মধ্য এশিয়ার অধিকাংশ শহর দখল করে তার প্রভু তুঘলক তৈমুরের পরিবারকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। তিনি সমরকন্দকে তার রাজধানী ঘোষণা করেন এবং নতুন বিজয়ের জন্য কোমর বেঁধে নামেন। তার কাছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় সেনাবাহিনী ছিল যার নিয়মিত সৈন্য সংখ্যা ছিল আট লক্ষ পর্যন্ত। [৩]

তৈমুরের অত্যাচার:

৭৮১ হিজরি (১৩৭৯ খ্রিস্টাব্দ) নাগাদ তৈমুর মধ্য এশিয়া সহ খোয়ারিজমও দখল করে নিয়েছিলেন। ৭৮২ হিজরি (১৩৮০ খ্রিস্টাব্দ) থেকে ৭৮৫ হিজরি (১৩৮৩ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত তিনি আমু দরিয়ার ওপারে খোরাসানে অভিযান চালাতে থাকেন এবং অবশেষে তীব্রতম প্রতিরোধ ভেঙে এই পুরো এলাকা (বর্তমান আফগানিস্তান) পদানত করেন। এরই মধ্যে তার বাহিনী ইরানেও প্রবেশ করেছিল। ৭৮৩ হিজরি থেকে ৭৮৮ হিজরির মধ্যে তিনি ইরানের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ জুড়ে দখলদারিত্ব কায়েম করেন। শিরাজের শাসক শাহ মনসুর অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে তার মোকাবিলা করেছিলেন কিন্তু তার কোনো কৌশল কাজে আসেনি এবং তিনি নিহত হন।

তৈমুর এই অভিযানগুলোর সময় জনগণের ওপর এমন অত্যাচার চালিয়েছিলেন যে মানুষ চেঙ্গিস খান ও হালাকু খানের কাহিনী ভুলে গিয়েছিল। প্রতিটি বিজিত শহরে লাশের স্তূপ করে রাখা হতো। তিনি যখন হেরাত জয় করেন, তখন একজন ঐতিহাসিকের মতে:

[১] তারিখে উসমানি, ওজুন: ১/৩৩৩।

[২] মুঘলদের আদি পুরুষ ছিলেন তুমনাহ খান, তার দুই পুত্র ছিল: কুবিল খান এবং কাচুলি বাহাদুর। কুবিল খানের বংশধরদের চতুর্থ প্রজন্মে চেঙ্গিস খান জন্মগ্রহণ করেন। অন্যদিকে কাচুলি বাহাদুরের বংশধরদের অষ্টম প্রজন্মে তৈমুর লঙ জন্মগ্রহণ করেন। তৈমুরের লভ্য বংশতালিকা হলো: তৈমুর বিন তুরগাই বিন আবগাই বিন তাচার বিন বারশাম বিন বারলাস বিন কাচুলি বাহাদুর বিন তুমনাহ খান। চেঙ্গিস খানের বংশতালিকা হলো: চেঙ্গিস বিন ইয়াসুকাই বিন বারতান বিন কুইলাহ বিন কুবিল খান বিন তুমনাহ খান।

[৩] আজায়িবুল মাকদুর, পৃষ্ঠা ৫ থেকে ১০, ১৮৫।

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা (মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস) - চতুর্থ খণ্ড

“শহরে একটি দোকানও খোলা থাকতে পারেনি। শহরের গলি ও বাজারে লাশের স্তুপ দেখা যাচ্ছিল।”

ইসফাহানে ছয় লক্ষ মানুষকে তলোয়ারের নিচে ফেলা হয়েছিল। এক জায়গায় বিজয়ের পর দুই হাজার মানুষকে মাটিতে এমনভাবে পিষে ফেলা হয়েছিল যে তাদের হাড়, রক্ত ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মাটিতে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। এরপর সেই রক্তে ভেজা মাটি দিয়ে বিজয়ের স্মারক মিনার তৈরি করা হয়েছিল। অধিকাংশ শহরে ইমারত, মিনার, প্রাচীর ও বুরুজ মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

তৈমুরের এই বিজয়ের প্রভাব সরাসরি আনাতোলিয়ার রাজনীতির ওপর পড়েছিল। মুরাদ খান আনাতোলিয়ার যেসব তুর্কি আমিরদের বশীভূত ও করদ রাজ্যে পরিণত করেছিলেন, তৈমুরের সৌভাগ্যের নক্ষত্র তুঙ্গে দেখে তারা তাদের আনুগত্য পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। অবশেষে যখন মুরাদ খান কসোভোর শেষ যুদ্ধে লড়তে গিয়েছিলেন, তখন আনাতোলিয়ার তুর্কি রাজ্যগুলো: সারুখান, আইদিন, তেকে, জারমিয়ান এবং হামিদিয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে উসমানীয়দের অধীনতা থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়। [১]

বায়েজিদের বিজয়সমূহ

ওদিকে বায়েজিদ তার পিতার শাহাদাতের পর সার্বিয়ার সাথে যুদ্ধ অব্যাহত রাখেন এবং উত্তর-পূর্ব বুলগেরিয়ায় দানিউব নদীর তীরে ‘ভিদিন’ শহর পর্যন্ত অগ্রসর হন। অবশেষে নিহত সার্বীয় রাজা লাজারের পুত্র সিটিফেন লাজারোভিচ, যিনি সার্বিয়ার নতুন শাসক হয়েছিলেন, ৭৯২ হিজরি (১৩৮৯ খ্রিস্টাব্দ) সালে সন্ধির আবেদন করেন।

বায়েজিদ ইউরোপীয় ঐক্য ভাঙতে চেয়েছিলেন, তাই তিনি সন্ধির আবেদন গ্রহণ করেন এবং সিটিফেন লাজারোভিচ ও তার ভাইকে সার্বিয়ায় নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করে তাদের অনুমতি দেন যে তারা তাদের ধর্ম ও বিশ্বাস অনুযায়ী সেখানকার শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করতে পারবে। তবে প্রজাদের কাছ থেকে জিজিয়া আদায় করে কেন্দ্রে পাঠাতে হবে এবং প্রয়োজনে সৈন্য সরবরাহ করা তাদের দায়িত্ব হবে। বায়েজিদ লাজারের মেয়ের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে এই সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করেন। এভাবে ভবিষ্যতে বুলগেরিয়া ও সার্বিয়ার ঐক্যের কোনো আশঙ্কা রইল না। [২]

এশিয়া মাইনর বিজয়:

ইউরোপে জিহাদের পর এশিয়া মাইনরের রাজ্যগুলো জয় করে “সংযুক্ত আনাতোলিয়া” প্রতিষ্ঠা করা বায়েজিদের দ্বিতীয় অগ্রাধিকার ছিল। তার আশঙ্কা ছিল যে, তৈমুর যদি উসমানীয় সালতানাতে আক্রমণ করেন, তবে এশিয়া মাইনরের বিদ্রোহী রাজ্যগুলো তার মিত্র হিসেবে প্রমাণিত হবে। তাই বায়েজিদ এশিয়া মাইনরে অত্যন্ত দ্রুত অভিযান শুরু করেন। তিনি ৭৯২ হিজরি (১৩৯০ খ্রিস্টাব্দ) থেকে ৮০৩ হিজরি (১৪০১ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত কয়েকটি ধাপে এশিয়া মাইনরের অধিকাংশ আমিরাত জয় করেন। ৭৯২ হিজরি (১৩৯০ খ্রিস্টাব্দ) সালে “আইদিন” এবং ৭৯৩ হিজরি (১৩৯১ খ্রিস্টাব্দ) সালে “সারুখান” দখল করেন। একই বছর “তেকে”ও জয় করেন। ৭৯৪ হিজরি (১৩৯২ খ্রিস্টাব্দ) সালে “কারামান”-এর বিদ্রোহী আমির আলাউদ্দিনকে পরাজিত করে কোনিয়া জয় করেন। আলাউদ্দিনকে বারবার বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে হত্যা করা হয়।

[১] আজায়েবুল মাকদুর ফি আখবার-ই-তৈমুর, পৃ. ১১০ থেকে ১১৫; হিন্দুস্তানে তৈমুর যে ধ্বংসলীলা চালিয়েছিলেন তার এক বালক দেখার জন্য দেখুন: তারিখ-ই-ফেরেশতা, মুহাম্মদ কাসিম ফেরেশতা (উর্দু অনুবাদ আশফাক আহমেদ: ১/৩৩৮ থেকে ৩৪২, লাহোর)।

[২] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া ফিত তারিখিল হাদিস, পৃ. ৪১।

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

এখন বায়েজিদ পূর্ব আনাতোলিয়ার দিকে অগ্রসর হতে শুরু করেন। ৭৯৫ হিজরিতে (১৩৯৩ খ্রি.) ‘আমাসিয়া’, ‘তোকাত’, ‘নিকসার’ এবং ‘জানিক’ বিজিত হয়। ৭৯৭ হিজরিতে (১৩৯৫ খ্রি.) তিনি উত্তর আনাতোলিয়ার তুর্কি রাজ্যসমূহ: ‘সিনোপ’ এবং ‘কাসতামোনি’ দখল করেন। ৮০০ হিজরিতে কৃষ্ণসাগরের তীরে অবস্থিত ‘সামসুন’ জয় করেন। ৮০১ হিজরিতে (১৩৯৯ খ্রি.) দক্ষিণ আনাতোলিয়ার রাজ্য ‘জুল-কাদির’ এবং ৮০২ হিজরিতে মালটিয়া (যাকে সিরিয়া ও মিশরের মামলুকরা তাদের অধীনস্থ রাজ্য মনে করত) জয় করে নেন। যেহেতু এই বছরগুলোতে তৈমুর ইরান ও হিন্দুস্তান বিজয়ে ব্যস্ত ছিলেন, তাই বায়েজিদ তার অভিযান সম্পন্ন করার সুযোগ পেয়ে যান। এর মধ্যে কিছু অভিযান বায়েজিদের নেতৃত্বে স্বয়ং পরিচালিত হয়েছিল এবং কিছু এলাকা তার সেনাপতিরা জয় করেছিলেন। [১] এভাবে তৈমুরের সাথে সংঘর্ষের সময় আসার আগেই বায়েজিদ পুরো এশিয়া মাইনর জয় করে ফেলেছিলেন।

বুলগেরিয়া বিজয়:

অন্যদিকে বায়েজিদের বাহিনী ইউরোপেও ক্রমাগত অগ্রসর হতে থাকে। ইউরোপে উসমানীয় সালতানাতের সবচেয়ে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল বুলগেরিয়া। এর দক্ষিণ অঞ্চল মুরাদ খানের যুগেই জয় করা হয়েছিল। তবে এখন বায়েজিদ বুলগেরিয়াকে পুরোপুরি জয় করার জন্য কোমর বাঁধেন। সার্বিয়াকে করদ রাজ্যে পরিণত করার পর ৭৯৭ হিজরিতে (১৩৯৩ খ্রি.) বায়েজিদ তার পুত্র সুলাইমান পাশাকে এক বিশাল বাহিনী দিয়ে বুলগেরিয়ার দিকে প্রেরণ করেন। সেখানকার রাজা কঠোর প্রতিরোধ গড়ে তোলেন কিন্তু সুলাইমান পাশা তার রাজধানী ‘তিরনোভো’ বিজয় না করে দম নেননি। এরপর তুর্কি বাহিনী উত্তর বুলগেরিয়ার দিকে অগ্রসর হয় এবং দেখতে দেখতে সেটিও দখলে নিয়ে নেয়। বুলগেরিয়ার মতো বিশাল দেশ দখলের এই অভিযান এক বছরের মধ্যেই সম্পন্ন হয়। এটি ছিল এই শতাব্দীর একটি ঐতিহাসিক ঘটনা যা পুরো ইউরোপকে অবাক করে দিয়েছিল। [২]

ক্রুসেড যুদ্ধ..... নিকোপোলিসের যুদ্ধ:

বুলগেরিয়া বিজয়ের পর ইউরোপের প্রতিটি শাসক উসমানীয়দের পক্ষ থেকে বিপদ অনুভব করতে শুরু করেন। হাঙ্গেরি তখন ইউরোপের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ ছিল এবং বুলগেরিয়া বিজয়ের পর উসমানীয় বাহিনী এর সীমান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। এখানকার রাজা সিগিসমুন্ড রোমের পোপ বনিফেস নবমকে এই উপলব্ধি করান যে, যদি ইউরোপ ক্রুশের নামে ঐক্যবদ্ধ না হয়, তবে অল্প সময়ের মধ্যেই পুরো ইউরোপ মুসলমানদের দখলে চলে যাবে। পোপ হাঙ্গেরির রাজার সাথে একমত হয়ে ইউরোপীয় দেশগুলোকে বায়েজিদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। ইউরোপে আবারও ক্রুসেড যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। কনস্টান্টিনোপলের কায়সার উসমানীয়দের ভয়ে প্রকাশ্যে এই জোটে শরিক হননি, কিন্তু গোপনে তিনি এই ষড়যন্ত্রের অংশ ছিলেন।

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া লি-ইলমাজ: ১/১০০; আখবারুদ দুওয়াল: ৩/১৬০; তারিখি উসমানি আজ ওজুন: ১/৩৩০, ৩৩৩। ৮০১ হিজরিতে বায়েজিদ সিভাসের শাসক কাজী বুরহানুদ্দিনের মৃত্যুর পর এই রাজ্যটিও নিজের অধীনে নিয়ে নেন। এছাড়াও ৮০৩ হিজরিতে (১৪০১ খ্রি.) তিনি পূর্ব আনাতোলিয়ার এরজিনজান রাজ্য জয় করেন, সেখানকার শাসক তাহেরতেন, যিনি তৈমুরের আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন, পালিয়ে তৈমুরের কাছে চলে যান। (আজায়িবুল মাকদুর, পৃ. ১৩০, ১৩১; তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া আজ সাইয়েদ মুহাম্মদ: পৃ. ১২৭) বিস্তারিত সামনে আসছে।

[২] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া ফিত তারিখিল হাদিস, পৃ. ৪১।

বায়েজিদ ৭৯৫ হিজরি (১৩৯৩ খ্রি.) থেকে ৭৯৯ হিজরি (১৩৯৭ খ্রি.) পর্যন্ত প্রায় পাঁচ বছর এশিয়া মাইনরের (ইশিয়ায়ে কুচাক) অভিযানে ব্যস্ত ছিলেন। এই সময়ে মিত্রবাহিনী পূর্ণ নিশ্চিত্তে একটি বড় যুদ্ধের ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের মধ্যে যুদ্ধ চলছিল, কিন্তু পোপের বুঝানোর ফলে শেষ পর্যন্ত তারা বায়েজিদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়।

হাঙ্গেরি, ব্রিটেন ও ফ্রান্স ছাড়াও অস্ট্রিয়া, ওয়ালাচিয়া, পোল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, কাস্টিল (উত্তর আন্দালুস), সুইজারল্যান্ড, গ্রিস, ইতালি এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের সেনাবাহিনী উসমানীয়দের বিরুদ্ধে সমবেত হয়, যাদের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ বিশ হাজারের বেশি। ইউরোপের প্রথম সারির রাজপুত্র ও নবাবগণ এই সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। ফ্রান্সের রাজার তিন চাচাতো ভাই: জেমস, হেনরি এবং ফিলিপ ফরাসি বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন। ডিউক অফ বারগাভি (কাউন্ট ডি নেভার্স) তার সেনাবাহিনী নিয়ে উপস্থিত হন। অস্ট্রিয়ার বাহিনী হারমান এবং কাউন্ট অফ দ্য লির অধীনে ছিল। আল-কুদস (জেরুজালেম) থেকে পালিয়ে ইউরোপে আশ্রয় নেওয়া টেম্পলাররা, যারা তাদের নিষ্ঠুরতার জন্য পরিচিত ছিল, তারাও এই বাহিনীর অংশ ছিল। গত দুই শতাব্দীতে এটি ছিল ইউরোপীয় দেশগুলোর সবচেয়ে বড় সম্মিলিত সামরিক অভিযান, যাকে মধ্যযুগের শেষ ক্রুসেড বলা হয়। বুদাপেস্টে সমস্ত মিত্র শাসকদের কাউন্সিল বসে যুদ্ধের পরিকল্পনা করে এবং হাঙ্গেরির রাজাকে তাদের নেতা হিসেবে নির্বাচিত করে।

নিজের সাথে মিত্রবাহিনীর এত বিশাল সংখ্যা দেখে হাঙ্গেরির রাজা দম্ভভরে বলেছিলেন: “যদি আমাদের ওপর আকাশও ভেঙে পড়ে, তবে আমরা আমাদের বর্শা দিয়ে তা ঠেকিয়ে দেব।”

অবশেষে এই বাহিনী ‘রুমেলি’তে প্রবেশ করে। মিত্রবাহিনী জানত যে বায়েজিদ তার সেনাবাহিনী নিয়ে এশিয়া মাইনরের অভিযানে ব্যস্ত আছেন, তাই তারা জনপদগুলো লুণ্ঠন করে, শস্যক্ষেত উজাড় করে এবং মানুষের গণহত্যা চালিয়ে সামনে অগ্রসর হতে থাকে। তারা প্রথমে উসমানীয়দের করদ রাজ্য সার্বিয়াকে ধ্বংস করে। তারপর দানিউব নদীর তীরে উত্তর বলকান পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং এখানে উসমানীয়দের সীমান্ত শহর ‘নিকোপোলিস’ অবরোধ করে। নিকোপোলিসের দুর্গাধিপতি বুঘলান বেগ এত বিশাল বাহিনী দেখেও সাহস হারাননি এবং শহর হস্তান্তর করতে অস্বীকার করেন। যদি তিনি আত্মসমর্পণ করতেন, তবে মিত্রবাহিনী অগ্রসর হয়ে পুরো বলকান দখল করে নিত এবং বায়েজিদ আসার আগেই তার রাজধানী ‘আদ্রিয়ানোপল’ পর্যন্ত পৌঁছে যেত। তখন পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক হয়ে উঠত, কিন্তু বুঘলান বেগের সাহসিকতা ও রণকৌশল কিছুদিনের জন্য মিত্রবাহিনীর অগ্রযাত্রা থামিয়ে দেয়। তা সত্ত্বেও মিত্রবাহিনীর ধারণা ছিল যে, তাদের শক্তি ও আধিক্যের কথা শুনে বায়েজিদ সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার সাহস করবেন না এবং তারা সহজেই দার্দানেলেস প্রণালী (দারায়ে দানিয়াল) অতিক্রম করে আনাতোলিয়া জয় করে নেবে। তাদের এই আশাও ছিল যে, তারা সিরিয়ায় পৌঁছে বায়তুল মুকাদ্দাসও দখল করতে পারবে।

বায়েজিদ তখন আনাতোলিয়ায় ছিলেন। মিত্রবাহিনীর নিকোপোলিস পৌঁছানোর খবর পাওয়া মাত্রই তিনি দার্দানেলেস প্রণালী অতিক্রম করে নিঃশব্দে আদ্রিয়ানোপল পৌঁছান এবং সেনাবাহিনী বিন্যস্ত করে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে রণক্ষেত্রের দিকে ছুটে যান। তার অধীনে সত্তর হাজার সৈন্য ছিল। তারা সংখ্যায় মিত্রবাহিনীর চেয়ে কম হলেও প্রশিক্ষণ, শৃঙ্খলা এবং আধুনিক অস্ত্রের দক্ষতায় এগিয়ে ছিল।

তারিখ উম্মত-এ-মুসলিমা

নিকোপোলিস অবরোধকারী মিত্রশক্তির রাজাদের যখন গোয়েন্দারা সংবাদ দিল যে, ছয় ঘণ্টার মধ্যে বায়েজিদ রণক্ষেত্রে পৌঁছাতে চলেছেন, তখন মিত্রশক্তি একে একটি মিথ্যা গুজব মনে করে অটুহাসি দিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পর এই খবরের সত্যতা নিশ্চিত হলো। তারপর যখন হঠাৎ বায়েজিদ দিগন্তে আবির্ভূত হলেন, তখন সবার মুখ বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল। বায়েজিদ শিবিরের জন্য নিকোপোলিস থেকে কয়েক মাইল দূরে এমন একটি স্থান নির্বাচন করলেন যেখানে সামনে টিলার সারি ছিল এবং ত্রুসেডার বাহিনী তাঁর সৈন্যদলকে দেখতে পাচ্ছিল না।

এদিকে মিত্রশক্তির তখনও নিজেদের সংখ্যাধিক্যের অহংকার ছিল। তারা বায়েজিদকে শীঘ্রই এক শিক্ষণীয় পরিণতির সম্মুখীন করার স্বপ্ন দেখছিল। ডিউক অফ বারগাভি হাঙ্গেরির রাজা সিগিসমুন্ডের কাছে আবেদন করলেন যেন তাঁর বাহিনীকে অগ্রবর্তী দল (হরাওল) বানিয়ে তুর্কিদের ওপর আক্রমণে অগ্রণী হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়।

হাঙ্গেরির রাজা তুর্কিদের যুদ্ধকৌশল সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল যে তুর্কিদের আক্রমণের অপেক্ষা করা উচিত। তিনি বললেন: “প্রথমে তুর্কিদের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সামনে অগ্রসর হবে। মূল নিয়মিত বাহিনী পরে আক্রমণ করবে। তাই আপনারা তাদের নিয়মিত বাহিনীর আক্রমণের অপেক্ষা করুন।”

কিন্তু ফরাসিরা উসমানীয়দের কোনো পাতাই দিচ্ছিল না। তারা পথে গ্রেপ্তারকৃত তুর্কি বন্দিদের হত্যা করল এবং বিজয়ের উল্লাসে স্লোগান দিল। তারা জানত না যে তারা কেমন পরিণতির সম্মুখীন হতে যাচ্ছে।

বায়েজিদ আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়ে নিয়েছিলেন। যুদ্ধের নেতৃত্ব তিনি নিজেই দিচ্ছিলেন। তিনি নিয়মিত বাহিনীর চল্লিশ হাজার সৈন্যকে ময়দানে সারিবদ্ধ করলেন এবং স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে ছোট ছোট দলের আকারে অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রস্তুত করলেন।

অবশেষে যুদ্ধ শুরু হলো। ফরাসি অশ্বারোহীরা অগ্রবর্তী দল হয়ে আক্রমণ চালাল। তাদের পেছনে হাঙ্গেরির রাজা পুরো বাহিনী নিয়ে আসছিলেন। বায়েজিদের স্বেচ্ছাসেবক দলগুলো পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী ফরাসিদের সাথে সংঘর্ষের পর দ্রুত ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল এবং মিত্রশক্তি অগ্রসর হতে হতে সেই টিলাগুলো পর্যন্ত পৌঁছে গেল যা বায়েজিদের শিবিরের সামনে ছিল।

এখানে বায়েজিদের বাহিনীর সাথে তাদের মোকাবিলা হলো। এদিকে মুসলিম স্বেচ্ছাসেবকরা যারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল, তারা সংগঠিত হয়ে তাদের পেছন থেকে আক্রমণ করল। ফরাসিরা উভয় দিক থেকে ঘেরাও হয়ে মারাত্মকভাবে ফেঁসে গেল। তাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক লোকই ফিরে যেতে পারল এবং হাঙ্গেরির রাজাকে এই ধ্বংসের সংবাদ দিল। এটি শুনে মিত্রশক্তির ওপর কম্পন শুরু হলো। তারা তখনও সামলে উঠতে পারেনি যে বায়েজিদ নিয়মিত বাহিনী নিয়ে তাদের ওপর আক্রমণ করে দিলেন। কিছু ইউরোপীয় রাজপুত্র কঠোর প্রতিরোধ গড়ে তুলল, ফ্রান্সের পতাকা ছয়বার পড়ে গেল, প্রতিবারই কোনো না কোনো অফিসার সেটি তুলে নিল। যুদ্ধের কঠিন পর্যায়ে হাজার হাজার মুসলমানও শহীদ হলেন, তবে এক প্রলয়ংকরী লড়াইয়ের পর ইউরোপীয় বীরদের পা টলে গেল। কিন্তু দানিউব নদী তাদের পেছনে ছিল, তাই হাজার হাজার সৈন্য ডুবে মারা গেল।

সামগ্রিকভাবে এক লাখ বিশ হাজার খ্রিস্টানের মধ্যে মাত্র বিশ হাজার বাঁচতে পেরেছিল। এক লাখ লোক মুসলমানদের তলোয়ার অথবা নদীর ঢেউয়ের শিকার হলো। দশ হাজার বন্দি হলো যাদের মধ্যে ডজনখানেক রাজপুত্র, নবাব এবং অফিসার অন্তর্ভুক্ত ছিল। হাঙ্গেরির রাজা এবং ব্রিটিশ যুবরাজ চতুর্থ হেনরি বেঁচে ফিরলেন। ৩০ হাজার মুসলিম সৈন্য শহীদ হলেন। এটি ২২ জিলহজ ৭৯৮ হিজরি (২৫ সেপ্টেম্বর ১৩৯৬ খ্রিস্টাব্দ)-এর ঘটনা।

ঘটনাটি হলো, যুদ্ধের শেষে বায়েজিদ যখন যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শন করলেন, তখন স্থানে স্থানে শহীদদের লাশ দেখতে পেলেন। তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এল:

“এই বিজয় অনেক চড়া মূল্যে অর্জিত হয়েছে। আমি হাঙ্গেরির কাছ থেকে এই বীরদের রক্তের বদলা নিয়ে ছাড়ব।”

বায়েজিদ বন্দীদের পর্যবেক্ষণ করে তাদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে হত্যা করালেন। কয়েকজনকে দাসে পরিণত করলেন। আর কিছু বন্দী কর্মকর্তাকে এই সুস্পষ্ট বিজয়ের সুসংবাদসহ প্রদর্শনের জন্য বিভিন্ন শহরে পাঠিয়ে দিলেন।

এরপর বায়েজিদ ইউরোপীয় রাজা, রাজপুত্র এবং নবাবদের ডাকলেন, যাদের সংখ্যা ছিল সাতাশ। তাদের মধ্যে ডিউক অফ বারগান্ডি (জিন সন্স), ফিলিপ ডি কুপ্ট, কাউন্ট হেনরি ডি লরেন এবং মার্শাল বুসি কাল্টের মতো নামকরা শাসক ব্যক্তির অস্তিত্ব ছিলেন। বায়েজিদ তাদের সম্বোধন করে বললেন:

“তোমরা অকারণে আমার রাজ্যে আক্রমণের কষ্ট করেছ। আমি নিজেই হাঙ্গেরি, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স, জার্মানি এবং ইতালি জয় করতে বদ্ধপরিকর। আমার সংকল্প হলো ইতালির রোম শহরের সেন্ট পিটারের বেদিতে গিয়ে নিজের ঘোড়াকে দানা খাওয়াব। এখন তোমাদের সাথে সেখানেই দেখা হবে। তোমরা যদি আরও বেশি প্রস্তুতি নিয়ে মোকাবিলায় আসো তবে আমি খুশি হব। যদি তোমাদের প্রতি আমার সামান্যতম ভয় থাকত, তবে আমি তোমাদের কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি নিতাম যে তোমরা ভবিষ্যতে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। কিন্তু আমি তোমাদের তাকিদ দিচ্ছি যে, নিজ দেশে পৌঁছে অবিলম্বে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে দাও।”

এই যুদ্ধ এটি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, তুর্কিদের ইউরোপ থেকে বিতাড়িত করার দাবি নিছক একটি অলীক কল্পনা মাত্র। এই বিজয়ের পর মুসলিম বিশ্বে উসমানীয় সালতানাতের সম্মান ও প্রতিপত্তি বহুগুণ বেড়ে গেল। এছাড়া কায়রোর আব্বাসীয় খলিফা আল-কায়েম বায়েজিদকে সুলতান উপাধি প্রদান করেন, যার ফলে তাঁর মর্যাদা ও সুখ্যাতি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। মামলুক সুলতান আজ-জাহির বারকুকের সাথেও উসমানীয় সালতানাতের সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হলো। এই যুদ্ধের সবচেয়ে বড় প্রভাব ছিল এই যে, পূর্ব ইউরোপের পাশাপাশি পশ্চিম ইউরোপেও তুর্কিদের ভীতি ছড়িয়ে পড়ল। হাঙ্গেরির দাপট শেষ হয়ে গেল এবং তাদের সামরিক শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ইউরোপে এখন এমন কোনো শক্তি অবশিষ্ট ছিল না, যা উসমানীয়দের আক্রমণের মোকাবিলা আরও কয়েক বছরও করতে পারত। [১]

কনস্টান্টিনোপলের ওপর বায়েজিদের আক্রমণসমূহ

ইউরোপ এবং এশিয়া মাইনরের এই বিজয়াভিযানগুলোর সময় বায়েজিদকে তিনবার কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করতে হয়েছিল। প্রাচ্যবিদদের দাবি হলো, বায়েজিদ চুক্তিগুলো উপেক্ষা করে কেবল কায়সারের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কনস্টান্টিনোপল দখলের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। যদিও এই কথাটি সম্পূর্ণ ভুল। স্বয়ং কায়সার বারবার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে বায়েজিদকে এই অভিযানগুলোতে বাধ্য করেছিলেন। সুতরাং...

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ: ১/ ১০৭, ১০৮; তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়া, পৃ. ১৩৩, ১৩৪; আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া ফিত তারিখিল হাদিস, পৃ. ৩২। প্রসিদ্ধ আছে যে, বায়েজিদের আগে উসমানীয় তুর্কিদের প্রত্যেক শাসককে আমির বলা হতো, কিন্তু এটি সঠিক নয়। লেন পুল লিখেছেন যে, ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত প্রাথমিক উসমানীয় শাসকদের মুদ্রাতেও “সুলতান” শব্দ খোদাই করা পাওয়া যায়। তবে বায়েজিদের বিশেষত্ব ছিল এই যে, তিনি ছিলেন প্রথম উসমানীয় শাসক যিনি খলিফার পক্ষ থেকে সুলতান উপাধি লাভ করেছিলেন। (দাওলাতে উসমানিয়া, ড. আজিজ: ১/ ৭৫, বরাতে লেন পুল, পৃ. ৫০, পাদটীকা)

কন্সটান্টিনোপলের ওপর বায়েজিদের আক্রমণের বর্ণনার আগে এটি জরুরি যে আমরা এই আক্রমণগুলোর প্রেক্ষাপট এবং মূল কারণগুলো পর্যালোচনা করি।

কায়সার জন প্যালিলোগাসের সাথে লেনদেন:

কায়সার জন প্যালিলোগাস সুলতান মুরাদের শাসনামলে গোপনে উসমানীয় সালতানাতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে আসছিলেন, তবে তাঁর বিচক্ষণতার কারণে উসমানীয় সালতানাত ও কন্সটান্টিনোপলের মধ্যে যুদ্ধের পরিস্থিতি কখনো তৈরি হয়নি। জন প্যালিলোগাস বায়েজিদের শাসনামল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিনি ৫১ বছর রাজত্ব করেন। বায়েজিদ তাঁর সাথে সম্পাদিত চুক্তির কখনো লঙ্ঘন করেননি।

জন প্যালিলোগাস দীর্ঘকাল ধরে তাঁর পুত্র অ্যাড্রোনিকাসের পক্ষ থেকে কষ্ট সহ্য করে আসছিলেন কারণ সে পিতার কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল। অবশেষে জন প্যালিলোগাস এই অযোগ্য শাহজাদাকে কারারুদ্ধ করেন। শেষ পর্যন্ত শাহজাদার অনুরোধে পিতা-পুত্রের বিবাদে উসমানীয় সালতানাতকে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করতে হয়। যার ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, জন প্যালিলোগাসকে সিংহাসনে বহাল রাখা হয় এবং অ্যাড্রোনিকাসকে একটি দ্বীপে নজরবন্দি করা হয়। [১] কায়সারের সাথে এখন একটি নতুন চুক্তি সম্পাদিত হলো। বাইজেন্টাইনদের ওপর জিজিয়া ধার্য করা হলো যার অধীনে কায়সার প্রতি বছর ত্রিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করতে বাধ্য হলেন। তদুপরি, তাঁকে চাহিদা অনুযায়ী উসমানীয় সালতানাতকে সৈন্য সরবরাহ করতে বাধ্য করা হলো। এশিয়া মাইনরে বাইজেন্টাইনদের দুর্গগুলোর মধ্যে কেবল একটি দুর্গ “ফিলাডেলফিয়া” অবশিষ্ট ছিল। এই চুক্তিতে এটিও উসমানীয়দের নামে করে দেওয়া হলো এবং যখন দুর্গাধিপতি কায়সারের আদেশে দুর্গ খালি করতে অস্বীকার করল, তখন কায়সারের গ্রীক সৈন্যরা তাকে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে দখল করে উসমানীয়দের হাতে তুলে দিল।

কিছুকাল পর্যন্ত চুক্তির ওপর আমল হতে থাকল। এই সময়ে বায়েজিদ এশিয়া মাইনরের রাজ্যগুলোর বিরুদ্ধে অভিযানে লিপ্ত হলে চুক্তি অনুযায়ী কায়সারের পুত্র প্রথম ম্যানুয়েল কিছু সহায়ক সৈন্যসহ তাঁর সাথে ছিলেন। [২]

এই সময়ে উসমানীয় বাহিনী কিছু নৌ-বিজয় অর্জন করে এবং রোডসসহ কয়েকটি দ্বীপ দখল করে নেয়। কায়সার জন প্যালিলোগাস এটি দেখে বিপদ অনুভব করেন এবং কন্সটান্টিনোপলে প্রতিরক্ষামূলক প্রস্তুতি শুরু করেন। বায়েজিদ যখন এটি জানতে পারলেন, তখন তিনি কায়সারকে বলে পাঠালেন: “শহরের প্রাচীরগুলো ধ্বংস করে দাও, অন্যথায় আমি তোমার চোখের মণি (অর্থাৎ তোমার পুত্রকে) ছিনিয়ে নেব।” কায়সার ভীত হয়ে যুদ্ধ প্রস্তুতি বন্ধ করে দিলেন, এর কয়েকদিন পর কায়সার জন প্যালিলোগাস ইন্তেকাল করেন। এটি ৭৯২ হিজরি (১৩৯০ খ্রিস্টাব্দ) এর ঘটনা। [৩]

ম্যানুয়েলের রাজত্ব এবং কন্সটান্টিনোপল অবরোধ:

পিতার মৃত্যুর সংবাদ শোনামাত্রই প্রথম ম্যানুয়েল সুলতান বায়েজিদের অনুমতি না নিয়েই রাতারাতি পালিয়ে যান এবং কন্সটান্টিনোপল পৌঁছে সিংহাসনে আরোহণ করেন। বায়েজিদ এই কাজের জন্য তাঁকে একটি হুমকিমূলক চিঠি লেখেন যার ফলে ম্যানুয়েল আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং হাঙ্গেরির রাজাকে চিঠিপত্রের মাধ্যমে বায়েজিদের বিরুদ্ধে উসকানি দিতে শুরু করেন। তাঁর এমনই একটি চিঠি বায়েজিদের গোয়েন্দাদের হাতেও লেগেছিল।

[১] তারিখ সালাতিন বনি উসমান, পৃ. ৩২, ৩৩

[২] দৌলতে উসমানিয়া, ডক্টর উয়াইর, পৃ. ৫৩

[৩] তারিখ উসমানি, ওজুন: ১/ ৩১০

[৪] তারিখ উসমানি, ওজুন: ১/ ৩১০

লেগে গিয়েছিল। বায়েজিদ তা সত্ত্বেও উপেক্ষা করলেন এবং মনুয়েলকে পত্র পাঠিয়ে বললেন যে, তাকে হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হচ্ছে, তাই চুক্তি অনুযায়ী সাহায্যকারী বাহিনী পাঠানো হোক। মনুয়েল এতেও কোনো কর্ণপাত করলেন না।

এটি দেখে বায়েজিদ প্রথমবারের মতো ৭৯৩ হিজরিতে (১৩৯১ খ্রিষ্টাব্দ) কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করেন। তবে তিনি শহরের ওপর সরাসরি কোনো আক্রমণ করেননি, বরং কেবল অবরোধের ওপরই সন্তুষ্ট থাকেন, যার ফলে বহির্বিশ্বের সাথে শহরের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং সেখানে দুর্ভিক্ষের মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। মনুয়েল এটি দেখে হাঙ্গেরির রাজা এবং পোপের কাছে গোপন বার্তা পাঠান, যাতে ধর্মের দোহাই দিয়ে বলা হয়েছিল যে, তারা যেন অবিলম্বে বায়েজিদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করে, অন্যথায় খ্রিস্টানদের এই প্রাচীন কেন্দ্রটি মুসলমানদের দখলে চলে যাবে। তবে সেই সময় ইউরোপীয় শক্তিগুলো কিছুই করতে পারেনি। [১]

চুক্তির শর্তাবলি:

অবশেষে বায়েজিদ কয়েকটি শর্ত মানিয়ে নিয়ে অবরোধ তুলে নেন। সেই শর্তগুলো অনুযায়ী:

- বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের ওপর ধার্যকৃত জিজিয়ার পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া হলো।
- শহরের বাইরের খেত ও বাগানগুলোর উৎপাদনের ওপর কর ধার্য করা হলো।
- সিদ্ধান্ত হলো যে, কায়সার কনস্টান্টিনোপলে মুসলমানদের পুনর্বাসন করবেন, যাদের জন্য সাতশ ঘর নির্দিষ্ট করা হবে।
- সিদ্ধান্ত হলো যে, শহরে একটি মসজিদ এবং একটি শরয়ী আদালত প্রতিষ্ঠা করা হবে। আদালতে মুসলিম কাজী নিযুক্ত করা হবে।

চুক্তি অনুযায়ী মনুয়েল সেখানে মুসলমানদের পুনর্বাসিত করেন, শরয়ী আদালত চালু করেন এবং একটি মসজিদও নির্মাণ করিয়ে দেন। তবে কিছুকাল পর মনুয়েল চুক্তি ভঙ্গ করে মসজিদটি ধ্বংস করে দেন এবং মুসলমানদের শহর থেকে বের করে দেন। [২]

কনস্টান্টিনোপলের দ্বিতীয় অবরোধ:

বায়েজিদ কিছুকাল আনাতোলিয়ার বিজয়ে ব্যস্ত ছিলেন। এরপর এরই মধ্যে কিছুটা বিরতি নিয়ে তিনি ৭৯৬ হিজরিতে (১৩৯৪ খ্রিষ্টাব্দ) পুনরায় আনাতোলিয়া থেকে রুমেলিতে আসেন এবং কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের পরিকল্পনা করেন। তিনি স্যালোনিকা জয় করে সেখানে সেনানিবাস স্থাপন করেন এবং কনস্টান্টিনোপল ঘেরাও করেন। অন্যদিকে তার বাহিনী বুলগেরিয়ার উত্তর অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। [৩]

বায়েজিদ এই ছাড় দিতে প্রস্তুত ছিলেন যে, কায়সারের আনুষ্ঠানিক শাসন তার জায়গায় বহাল থাকবে, কিন্তু তার মতে ইউরোপ বিজয়ের জন্য এটি জরুরি ছিল যে, দারদানেলস প্রণালীর পাশাপাশি বসফরাস প্রণালীও মুসলমানদের অধীনে থাকে যাতে তারা স্বাধীনভাবে ইউরোপের প্রতিটি অংশে যেতে পারে। এই প্রণালীর ওপর আধিপত্য তখনই সম্ভব ছিল যখন কনস্টান্টিনোপল মুসলমানদের অধীনে থাকবে অথবা সেখানে মুসলমানদের বসতি থাকবে। এই দ্বিতীয় অবরোধও কোনো ফলাফল ছাড়াই শেষ হয়ে যায় কারণ ইউরোপীয় শক্তিগুলো উসমানীয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

[১] তারিখ-ই উসমানি, লেখক ওজুন: ১ / ৩১০ থেকে ৩১২ টীকা সহ।

[২] আখবারুদ দুওয়াল: ৩ / ১৭, ফি উসুলিত তারিখিল উসমানি, পৃ. ৫৩, তারিখ-ই সালাতিন-ই বনি উসমান: পৃ. ৩৩।

[৩] তারিখ-ই সালাতিন-ই বনি উসমান: পৃ. ৩৩... বুলগেরিয়ার এই অভিযানের বিবরণ আগে অতিক্রান্ত হয়েছে যাতে নিকোপোলিসের যুদ্ধও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ছিল, যার ফলশ্রুতিতে বায়েজিদকে নিকোপোলিসের যুদ্ধ লড়তে হয়েছিল।

কনস্টান্টিনোপলের তৃতীয় অবরোধ:

“নিকোপোলিসের যুদ্ধ” থেকে অবসর পেয়ে বায়েজিদ আবারও নতুন প্রস্তুতির সাথে ৭৯৯ হিজরিতে (১৩৯৭ খ্রিষ্টাব্দ) তৃতীয়বারের মতো কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করেন। তিনি রক্তপাত ছাড়াই কায়সার ম্যানুয়েলের সাথে বিষয়টি মীমাংসা করার চেষ্টা করেন এবং দাবি জানান যে কায়সার যেন শহরটি তাঁর হাতে তুলে দেন, কিন্তু ম্যানুয়েল তা মানেননি। এই সময়ে অবরোধের কঠোরতা শহরবাসীর জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। প্রতিরোধের সমর্থক গোষ্ঠী ম্যানুয়েলের সাথে ছিল। অন্যদিকে শান্তিপ্রিয় গোষ্ঠী তাঁর ভতিজা “ইউয়ানিস”-এর চারপাশে সমবেত হয়েছিল। এই রাজপুত্র “সিলিভরি”-র শাসক ছিলেন এবং তাঁর চাচার সাথে তাঁর চরম উত্তেজনা চলছিল। বায়েজিদের সাথেও তাঁর যোগাযোগ ছিল এবং আশা করা হচ্ছিল যে তিনি শহরটি মুসলমানদের হাতে তুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন।

এই আশঙ্কা ম্যানুয়েলেরও ছিল। তিনি ইউয়ানিসের সাথে সন্ধি করেন এবং তাঁকে কনস্টান্টিনোপলের শাসনে নিজের অংশীদার করে নেন। এর পরপরই ম্যানুয়েল ইউয়ানিসকে কনস্টান্টিনোপলে নায়েব নিযুক্ত করেন এবং নিজে গোপনে ইউরোপ সফরে বেরিয়ে পড়েন যাতে উসমানীয়দের বিরুদ্ধে পশ্চিম থেকে পুনরায় নতুন ফ্রন্ট খোলা যায়। এটি ১৩৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ঘটনা। [১] একই সাথে তিনি মঙ্গোল বিজেতা তৈমুর লং-কে, যাঁর শাসনসীমা আনাতোলিয়ার সাথে এসে মিশেছিল, পত্র পাঠিয়ে উসমানীয় সালতানাত আক্রমণ করার আমন্ত্রণ জানান। [২]

ইউরোপে গ্রিস পর্যন্ত বায়েজিদের অগ্রযাত্রা এবং আকস্মিক প্রত্যাবর্তন। কনস্টান্টিনোপলের চতুর্থ অবরোধ:

এদিকে বায়েজিদ ক্রমাগত খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে জিহাদে লিপ্ত ছিলেন। নিকোপোলিসের যুদ্ধের দুই বছর পর ৮০০ হিজরিতে (১৩৯৮ খ্রিষ্টাব্দ) তিনি পরিকল্পনা অনুযায়ী ইউরোপে আরও অগ্রসর হন। তিনি প্রথমে গ্রিসের দিকে অগ্রসর হন কারণ এখানকার সেনাবাহিনী নিকোপোলিসের যুদ্ধে তাঁর বিরুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। তিনি গ্রিসের ঐতিহাসিক শহর “থিসালি” এবং “এথেন্স” জয় করেন এবং এখান থেকে ৩০ হাজার মানুষকে আনাতোলিয়ায় স্থানান্তরিত করেন। তাঁর সেনাপতিরা অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরির দিকে অগ্রসর হন। এই অভিযান চলাকালেই তিনি কায়সারের সেই উস্কানিমূলক পত্রের খবর পান যা তিনি তৈমুরকে পাঠিয়েছিলেন। এর কিছুদিন পরই তিনি খবর পান যে তৈমুর ভারত থেকে ফিরে উত্তর ইরানে পৌঁছে গেছেন। এমন পরিস্থিতিতে বায়েজিদ প্রয়োজন মনে করেন যে, সামনে অগ্রসর হওয়ার আগে কায়সারের কেন্দ্র জয় করা এবং তারপর আনাতোলিয়ার প্রতিরক্ষা মজবুত করা উচিত। ফলে বায়েজিদকে ইউরোপের অভিযান অসমাপ্ত রেখে কনস্টান্টিনোপলের দিকে মনোনিবেশ করতে হয়, যেখানে তখন কায়সারের ভতিজা ইউয়ানিস শাসক ছিলেন। বায়েজিদ বার্তা পাঠিয়ে দাবি করেন যে তিনি যেন কনস্টান্টিনোপল তুর্কিদের হাতে তুলে দেন, কিন্তু ইউয়ানিস তা অস্বীকার করেন। অবশেষে ৮০১ হিজরিতে (১৩৯৯ খ্রিষ্টাব্দ) বায়েজিদ চতুর্থবারের মতো এই শহর অবরোধ করেন যা চার মাস পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। বিজয় যখন সন্নিহিত, তখনই হঠাৎ আনাতোলিয়ার ওপর তৈমুর লং-এর আক্রমণ বিজয়ের সম্ভাবনা ধূলিসাৎ করে দেয়। [৩]

[১] তারিখ উসমানি: ১/ ৩৩০ থেকে ৩৩২

[২] তারিখ সালাতিন বনি উসমান, পৃ. ৪৩

[৩] তারিখ সালাতিন বনি উসমান, পৃ. ৪৩, ৪৪

তৈমুরের আক্রমণ

বায়েজিদের সিংহাসন আরোহণের পর থেকে তৈমুর এ পর্যন্ত আরও অনেক অভিযান সম্পন্ন করেছিলেন। ইরান বিজয়ের পর তার পরবর্তী পদক্ষেপ ছিল ইরাক। ৭৯৫ হিজরিতে তিনি ইরাক জয় করেন এবং বাগদাদের সিংহাসনশায়ী আহমদ খান জালায়ের বিন ওয়াইস তৈমুরী বাহিনীর ধ্বংসলীলায় অসহায় হয়ে মিশরের বাদশাহ আল-জাহির বারকুকের কাছে আশ্রয় নেন। ৮৯৬ হিজরিতে তৈমুর মসুল, দিয়ারবাকর, রাহা এবং তিকরিতও দখল করে নেন। [১] তৈমুর আমেনিয়া বিজয়ের পর দরবন্দের পাহাড় অতিক্রম করে দشت-ই-কিপচাকে (Dasht-e-Kipchak) পা রাখেন এবং মঙ্গোলদের সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্য ‘গোল্ডেন হোর্ড’ (সুবর্ণ বাহিনী)-কে পরাজিত করেন। [২]

পূর্ব আনাতোলিয়ায় তৈমুর:

তৈমুরের সামনে এখন মাত্র দুটি শক্তিশালী সালতানাত বাকি ছিল: একটি মামলুক সালতানাত, অন্যটি উসমানীয় সালতানাত। তৈমুর চেয়েছিলেন এই উভয় সালতানাতকেও তার করদ রাজ্যে পরিণত করতে। তবে তিনি পরবর্তী অভিযান স্থগিত রেখে নিজের রাজধানী সমরকন্দের দিকে যাত্রা করেন [৩] এবং গত কয়েক বছরের অভিযানে লুণ্ঠিত বিশাল ধন-সম্পদ ও অগণিত ভাণ্ডার সেখানে সংরক্ষিত করেন। এরপর তিনি দ্রুতগতিতে ফিরে আসেন। খোরাসান ও আজারবাইজান হয়ে তিনি আনাতোলিয়ার পূর্ব সীমান্তে এসে উপস্থিত হন। সীমান্ত প্রদেশ এরজিনজানের শাসক ‘তাহর্তন’ ভীত হয়ে তার অনুগত হয়ে যান। [৪] এই দিনগুলিতে তৈমুর সুলতান আল-জাহির বারকুককে লিখে পাঠান:

“আমরা আল্লাহর ক্রোধ থেকে সৃষ্ট তাঁর লস্কর (বাহিনী)। যারা আল্লাহর গযবের শিকার হয়, আমরা তাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করি। আমরা কারো ফরিয়াদে (আর্তনাদে) নরম হই না। কারো ক্রন্দন আমাদের প্রভাবিত করে না। আল্লাহ আমাদের অন্তর থেকে দয়া কেড়ে নিয়েছেন। আমাদের কাছে ধ্বংসই কেবল তাদের জন্য যারা আমাদের আনুগত্য করে না।”

আল-জাহির বারকুক জবাবে লিখিয়েছিলেন:

“যদি আল্লাহ তোমাদের অন্তর থেকে দয়া কেড়ে নিয়ে থাকেন, তবে এটিই সবচেয়ে বড় দোষ যা তোমরা নিজেরাই স্বীকার করে নিয়েছ। তোমরা কি অশ্বারোহীদের ভেড়া-বকরি দিয়ে ভয় দেখাচ্ছ? যদি আমরা তোমাদের হত্যা করি তবে তা হবে এক মহান পুরস্কার। আর যদি আমরা নিহত হই তবে জান্নাত আমাদের থেকে মাত্র এক মুহূর্তের দূরত্বে থাকবে।” [৫]

তৈমুর এই সময়ে মামলুক বা উসমানীয়দের দিকে অগ্রসর হননি বরং পারস্য (ফারস) বিজয়ের পূর্ণতা দানে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। [৬]

[১] আজায়িবুল মাকদুর ফি আখবার-ই-তৈমুর, ইবনে আরবশাহ, পৃ. ৮১ থেকে ৮৭, ৯৭, ত. কলকাতা।

[২] আজায়িবুল মাকদুর, পৃ. ১১৮ থেকে ১২৯।

[৩] মাকরিজি তৈমুরের সমরকন্দ প্রত্যাবর্তনের তারিখ ৭৯৬ হিজরি উল্লেখ করেছেন। (আস-সুলুক লি-মা’রিফাতিল দুওয়ালিল মুলুক: ৫/৩৫৬)

[৪] আজায়িবুল মাকদুর, পৃ. ১৩০, ১৩১; মাকরিজির মতে তৈমুরের এরজিনজান পৌঁছানোর ঘটনা ৭৯৭ হিজরির। (আস-সুলুক লি-মা’রিফাতিল দুওয়ালিল মুলুক: ৫/৪০১)

[৫] আজায়িবুল মাকদুর ফি আখবার-ই-তৈমুর, পৃ. ১৩৭, ১৩৮; এই পত্রালাপের তারিখ মাকরিজি ৭৯৬ হিজরি উল্লেখ করেছেন। (আস-সুলুক লি-মা’রিফাতিল দুওয়ালিল মুলুক: ৫/৩৫০)

[৬] মুতাম্মিম-ই-তৈমুর জাঁহাকুশা: ফাসল ১৮ থেকে ফাসল ২৩, ত. ইসফাহান।

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

তিনি ইউরোপে বায়েজিদের বিজয়ের খবর শুনতেন এবং নিজের সালতানাতের পরিধি বৃদ্ধি করছিলেন। তার রাজধানীর সীমানা আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল, যাদের শাসকরা কখনো তৈমুরের সাথে দিত, আবার কখনো বায়েজিদের। যখন তারা উসমানীয় সালতানাতের প্রতি অসন্তুষ্ট হতো, তখন তৈমুরের কাছে সাহায্য চাইত। আবার যখন তৈমুরের প্রতি বিরক্ত হতো, তখন বায়েজিদের সাথে যোগাযোগ করত। [১]

কাজী বুরহান উদ্দিনের দরবারে তৈমুরের দূতদের হত্যা:

৮০০ হিজরির শুরুতে তৈমুর আবারও আনাতোলিয়ার সীমান্তে পৌঁছান এবং সিওয়াসের শাসক কাজী বুরহান উদ্দিনের কাছে এই বার্তা পাঠান যে, তিনি যেন তার অনুগত হয়ে যান। কাজী বুরহান উদ্দিনকে একজন বিজ্ঞ আলেম এবং সাহসী শাসক হিসেবে স্মরণ করা হয়।

[২] তুর্কি ঐতিহাসিক ইসমাইল উজুন চারশিলি লিখেছেন:

“আনাতোলিয়ার অন্যান্য শাসকদের বিপরীতে, যারা দুর্বল সংকল্প ও দ্বিধাগ্রস্ত ছিল, তিনি ছিলেন একজন সাহসী ও উদ্যমী ব্যক্তি।” [৩]

কাজী বুরহান উদ্দিন তৈমুরের দূতদের শিরশ্ছেদ করান এবং একই সাথে বায়েজিদ ইলদিরিম ও মিশরের সুলতান আল-জাহির বারকুকের কাছে পত্র পাঠিয়ে তাদের তৈমুরি বিপদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন:

“আমি তৈমুরের দূতদের সাথে যে আচরণ করেছি, তা আল্লাহর জমিনে তাঁর বান্দাদের ওপর তৈমুরের করা অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া। আমি আপনাদের সমর্থনের ওপর ভরসা করেই এই আচরণ করেছি, নতুবা তার বিশাল বাহিনীর মোকাবিলা করার শক্তি আমার কোথায়, যাদের সামনে কোনো রাজা বা কোনো দুর্গ টিকতে পারেনি। আমি আপনাদের উভয়ের (মামলুক ও উসমানীয়) সীমান্তের রক্ষক এবং আপনাদের উভয়ের অগ্রবর্তী দল। আপনারা যদি আমাকে একা ছেড়ে দেন, তবে আপনারাও পরবর্তী দুর্ঘটনা থেকে নিরাপদ থাকবেন না। আগুনের স্ফুলিঙ্গ শুরুতে নেভানো না হলে পরে হয়তো তা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে না।”

বায়াজিদ ইলদিরিম কাজী বুরহান উদ্দিনের এই কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং একটি উৎসাহব্যঞ্জক ফিরতি পত্রে বলেন:

“এই সাহসিকতার ফলে তৈমুর পালিয়ে যাবে, অন্যথায় আমরা মোকাবিলায় এক অপরাজেয় বাহিনী নিয়ে আসব।” [৪]

জমিনে একজন বাদশাহর শাসন হবে:

অন্যদিকে কাজী বুরহান উদ্দিনের এই কাজে তৈমুর প্রচণ্ড ক্ষোভে ফেটে পড়ছিলেন। এই পরিস্থিতিতে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, বিশ্বের মহান অধিপতি হিসেবে কেবল একজনই টিকে থাকবে এবং তিনি বায়েজিদের সালতানাতকে আর বিকশিত হওয়ার সুযোগ দেবেন না। তিনি বলতেন:

[১] ফি উসুলুত তারিখিল উসমানি, পৃ. ৫৬, ৫৭

[২] আস-সুলুক লি-মা'রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ৫/৭০৪

[৩] তারিখে উসমানি: ১/৩১৭

[৪] আজায়িবুল মাকদুর, পৃ. ১৩০, ১৩১

কাজী বুরহান উদ্দিন তৈমুরের দূতকে কখন হত্যা করেছিলেন? এর সময়কাল নিয়ে সংশয় রয়েছে। মাকরিজির বর্ণনা অনুযায়ী, তৈমুর ৮০০ হিজরির মহররম মাসে সিওয়াসে পৌঁছেছিলেন। (আস-সুলুক লি-মা'রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক: ৫/৭০৪)। সম্ভব হতে পারে যে, সিওয়াস বলতে সিওয়াসের নিকটবর্তী এলাকা বোঝানো হয়েছে, কারণ সর্বসম্মতিক্রমে তৈমুর তখনো সিওয়াস জয় করেননি। সম্ভবত সেই সময় তৈমুর ভয় দেখানোর জন্য দূত পাঠিয়েছিলেন এবং কাজী বুরহান উদ্দিনের আদেশে সেই দিনগুলোতেই দূতদের হত্যা করা হয়েছিল।

“যেভাবে আকাশে একজন খোদা আছেন, তেমনি জমিনেও একজন বাদশাহর শাসন থাকবে।” [১]

তবে তিনি ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দেন এবং আক্রমণে কোনো তাড়াহুড়ো করেননি [২], বরং তিনি মামলুকদের কাছেও একজন দূত পাঠান, যিনি হালাবে পৌঁছে তৈমুরের পত্র প্রদান করেন। পত্রে তৈমুরি সালতানাতের আনুগত্যের তাকিদ এবং সেই সাথে তৈমুরি মুদ্রা ও খুতবা চালুর নির্দেশ ছিল। তৈমুরের দূতের বক্তব্য ছিল:

“আমাদের প্রভু শাসনের অধিক হকদার। তিনি যাকে নিযুক্ত করবেন সেই খলিফা ও শাসক হবে। তিনিই অনুসরণের যোগ্য, বাকি সব বাদশাহ তাঁর খাদেম। অন্য কারো রাষ্ট্র পরিচালনার কোনো অধিকার নেই। মামলুকরা তো মেঘপালক, তারা রাজনীতি কী বোঝে।”

সম্ভবত এমন আধিপত্যবাদী বার্তা পাঠিয়ে তৈমুর নিজেই যুদ্ধের পথ উন্মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। [৩] তা-ই হলো। মিশরের সুলতানের প্রতিনিধি হালাবের শাসক এই বার্তা গ্রহণ করেন এবং উত্তেজিত হয়ে তৈমুরের দূতকে হত্যা করেন। এর অর্থ স্পষ্ট ছিল যে, মামলুকরা মাথা নত করতে প্রস্তুত নয়। [৪]

হিন্দুস্তানে তৈমুরের আক্রমণ:

তৈমুর একদিকে পূর্ব আনাতোলিয়ায় আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন এবং অন্যদিকে হালাবে তাঁর দূতের হত্যার পর তিনি মামলুকদেরও ক্ষমা করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর বাহিনী হালাবের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার উপক্রম হয়েছিল, এমন সময় হঠাৎ তিনি হিন্দুস্তানে ফিরোজ শাহ তুঘলকের মৃত্যুর পর সৃষ্ট রাজনৈতিক সংকট তীব্র হওয়ার খবর পান। [৫]

তৈমুর দীর্ঘকাল ধরে হিন্দুস্তান বিজয়ের স্বপ্ন দেখছিলেন। তিনি এই সুযোগকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করলেন এবং ইরাক ও ইরানের নববিজিত অঞ্চলগুলোতে তাঁর পুত্র মিরান শাহকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে নিজে ৮০০ হিজরিতে দ্রুত সমরকন্দে পৌঁছান এবং সেখানে কিছুদিন কাটিয়ে খাইবার গিরিপথ দিয়ে হিন্দুস্তানে প্রবেশ করেন। তাঁর অসীম শক্তির সামনে সবাই পরাস্ত হতে থাকে। [৬]

৮০১ হিজরির সফর মাসে তিনি পাঞ্জাবের বিভিন্ন শহর জয় করছিলেন। এরপর তাঁর বাহিনী পানিপথ হয়ে যমুনা নদী পার হয়। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তারা দিল্লির সামনে পৌঁছে যায়। ৮০১ হিজরির জমাদিউল আউয়াল মাসে তৈমুর দিল্লি জয় করেন, যার পর সেখানে তিন দিন ধরে হত্যা ও লুণ্ঠনের তাণ্ডব চলে। [৭]

[১] ফী উসুলিত তারিখিল উসমানি, পৃ. ৫৬

[২] আজায়িবুল মাকদুর, পৃ. ১৩৯

[৩] আজায়িবুল মাকদুর, পৃ. ১৭৬, ১৭৭

[৪] নাইলুল আমাল ফী জাইলিল দুওয়াল লি-জাইনুদ্দিন ইবনে শাহিন আল-মালতি: ৩/ ৩৮

[৫] আজায়িবুল মাকদুর, পৃ. ১৩৯, ১৪০

ইবনে আরবশাহ বিষয়টি এমনভাবে লিখেছেন যেন ফিরোজ শাহ তুঘলকের মৃত্যু সেই দিনগুলোতেই হয়েছিল এবং তৈমুর তা শুনেই হিন্দুস্তানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন, যদিও বিষয়টি এমন ছিল না। ফিরোজ শাহ কয়েক বছর আগে ৩ রমজান ৭৯০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেছিলেন, কয়েক বছর ধরে হিন্দুস্তানে তাঁর পুত্র ও পৌত্ররা শাসন করছিল এবং এখন তাদের মধ্যে তীব্র গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল এবং সালতানাত বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। (তারিখে ফেরেশতা: ১/ ৩৩৮ থেকে ৩৪১)

[৬] তৈমুর তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন: “হিন্দুস্তানে আমার প্রবেশের বছরটি অষ্টম হিজরি শতকের সমাপ্তি ঘটিয়েছিল” (মানাম তৈমুর জাহানগুশা, পৃ. ২৮৯, ত. ইসফাহান)

[৭] তারিখে ফেরেশতা: ১/ ৩৩৮ থেকে ৩৪২

তৈমুর দ্বিতীয়বার পূর্ব আনাতোলিয়ায়:

দিল্লি জয়ের পর তৈমুর যখন অন্যান্য ভারতীয় রাজ্যগুলো জয়ে ব্যস্ত ছিলেন, তখন তিনি সিরিয়া ও মিশরের সুলতান আল-জাহির বারকুকের মৃত্যুর সংবাদ পান। [১] একই সাথে তিনি তৈমুরি দূতদের হত্যার অপরাধে সিওয়াসের শাসক কাজী বুরহানউদ্দিনের হত্যার খবরও পান। এর পরপরই তিনি উত্তর ইরানে তার প্রতিনিধি শাহজাদা মিরান শাহের পক্ষ থেকে একটি পত্র পান যাতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যে, তিনি যেন বার্বক্যের কারণে শাসনের আর কষ্ট না করেন বরং নিভৃতবাস গ্রহণ করে শাসনভার তার যোগ্য সন্তানদের হাতে তুলে দেন। এই পত্র তৈমুরকে এতটাই চিন্তিত করে যে, তিনি ভারতকে এই অবস্থায় রেখেই অত্যন্ত দ্রুততার সাথে তাবরিজের দিকে রওনা হন। তার গতি এতটাই তীব্র ছিল যে, ৭ রবিউল আউয়াল ৮০২ হিজরিতে তিনি উত্তর ইরানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। তবে তিনি প্রত্যাশার বিপরীতে মিরান শাহকে কেবল বুঝিয়ে শান্ত করার ওপরই ক্ষান্ত হন। [২]

তৈমুরের কাঙ্ক্ষিত আমিরগণ উসমানীয়দের আশ্রয়ে:

তৈমুরের ভারতে ব্যস্ত থাকার সময় বাগদাদের বিতাড়িত শাসক সুলতান আহমদ বিন উওয়াইস শাহ মিশরের সাহায্যে ফিরে এসে বাগদাদ থেকে তৈমুরের গভর্নর আমির মাসউদকে বের করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তৈমুর ফিরে আসতেই তিনি আবারও পালিয়ে যান এবং আজারবাইজানের শাসক করা ইউসুফের কাছে আশ্রয় নেন। তৈমুর তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য কালক্ষেপণ না করে আজারবাইজানে অভিযান চালান এবং বিরোধীদের নির্মূল করেন। ২ জমাদিউল আখিরাতে তিনি জর্জিয়ার কেন্দ্র তিবলিসিও জয় করেন। এই পরিস্থিতিতে করা ইউসুফ তুর্কমানি এবং সুলতান আহমদ বিন উওয়াইসের কাছে উসমানীয় সালতানাত ছাড়া আর কোনো আশ্রয়ের জায়গা ছিল না। তাই তারা উভয়েই বায়েজিদের কাছে চলে যান। তৈমুর এই উভয়কে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে চেয়েছিলেন। উসমানীয়দের কাছে তাদের আশ্রয় নেওয়া তাকে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ করে। [৩]

বায়েজিদের বিদ্রোহী আমিরগণ তৈমুরের সাহায্যকারী:

তৈমুরের ক্রোধের একটি কারণ এটিও ছিল যে, তিনি পূর্ব আনাতোলিয়ার সিওয়াস রাজ্যকে নিজের অধীনে নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি পৌঁছানোর আগেই সিওয়াসের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ রাজ্যটি বায়েজিদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন এবং বায়েজিদের ছেলে...

[১] আজায়িবুল মাকদুর, পৃ. ১৩৭... আল-জাহির বারকুকের মৃত্যু শাওয়াল ৮০১ হিজরিতে হয়েছিল।

[২] আজায়িবুল মাকদুর, পৃ. ১৩৭।

[৩] কাজী আবুল আব্বাস বুরহানউদ্দিন হানাফির আসল নাম ছিল আহমদ বিন আবদুল্লাহ। ঐতিহাসিকগণ তাকে একজন বিজ্ঞ আলেম, সাহিত্যিক ও সুচরিত্রবান ব্যক্তি হিসেবে অভিহিত করেছেন। তার পিতা বনু আরতানা (কায়সারির শাসক)-এর এখানে কাজী ছিলেন। বুরহানউদ্দিন আলেপ্পো ও কায়রোতে শিক্ষা লাভ করেন। একটি বর্ণনা অনুযায়ী মিশরে থাকাকালীন কোনো এক ফকিরের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়, কাজী বুরহানউদ্দিন তাকে খাবার খাওয়ান। সেই দরবেশ তাকে কাশফ (আধ্যাত্মিক দর্শন)-এর মাধ্যমে জানান যে, তিনি আনাতোলিয়ার শাসক হবেন। তিনি তাকে বলেন: তুমি এখানে থেকে না, তুমি তো সুলতানে রুম হবে। ফলে কাজী বুরহানউদ্দিন নিজ দেশে ফিরে আসেন এবং দরস ও তাদরীসের (শিক্ষাদান) সাথে সাথে অভিজাত ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে মেলামেশা শুরু করেন এবং শেষ পর্যন্ত সেখানকার শাসক হতে সফল হন। পরবর্তীতে মতভেদের কারণে সিওয়াসের ক্ষমতা দখল করে কায়সারি ও মালটিয়াকেও এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। ৭৮৯ হিজরিতে সিওয়াস রাজ্য একটি চুক্তির অধীনে মিশরের মামলুকদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। ৭৯৯ হিজরিতে আজারবাইজানের মঙ্গোলরা সিওয়াস আক্রমণ করলে মামলুক বাহিনী এসে সিওয়াসকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করে। ৮০০ হিজরির শেষের দিকে একজন বিদ্রোহী সর্দার কারাইলুক উসমান তুর্কমানি বিদ্রোহ করেন এবং কাজী বুরহানউদ্দিনকে হত্যা করেন। (আনবাবুল গুমর: ২/ ৫৯, ৮০১ হিজরি)। মাকরিজির বর্ণনার প্রেক্ষাপট থেকে জানা যায় যে, কাজীর হত্যাকারী জিলকদ ৮০১ হিজরিতে নিহত হয়েছিল। (আস-সুলুক লিল মাকরিজি: ৫/ ২১৯)।

[৪] আজায়িবুল মাকদুর, পৃ. ১৩৯ থেকে ১৫৬।

[৫] আজায়িবুল মাকদুর, পৃ. ১৫৬, ১৫৭; তারিখে উসমানি: ১/ ৩৩৩।

সুলাইমান সুবাদার হিসেবে সেখানকার ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করেছিলেন। [১] এদিকে এশিয়া মাইনরের সেই তুর্কমেন আমিরগণ, যাদের রাজ্যগুলো বায়েজিদ সম্প্রতি দখল করেছিলেন, তারা তৈমুরের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তাকে বায়েজিদের বিরুদ্ধে আরও উসকে দিচ্ছিলেন। এই আমিরদের মধ্যে বনু কারমিয়ান, বনু মানিশা, বনু আইদিন এবং বনু আসফান্ডিয়ার উল্লেখযোগ্য ছিলেন। [২] এই আমিরগণ তৈমুরকে আক্রমণের সবচেয়ে উপযুক্ত পথ এবং প্রতিপক্ষের দুর্বল দিকগুলো সম্পর্কেও অবহিত করতে থাকেন। [৩]

মামলুক ও উসমানীয়রা কেন ঐক্যবদ্ধ হতে পারল না?

সেই সময়ের পরিস্থিতি এমন ছিল যে, মামলুক ও উসমানীয় উভয়ের মাথার ওপর তৈমুরি ক্রোধের তলোয়ার বুলছিল এবং উভয়ই তা থেকে আত্মরক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। কিন্তু এই অভিন্ন বিপদ সত্ত্বেও তারা তৈমুরের মোকাবিলায় কোনো যৌথ কৌশল প্রণয়ন করতে পারেনি। এর একটি কারণ ছিল এই যে, মহররম ৮০২ হিজরিতে বায়েজিদ মালটিয়া দখল করে নিয়েছিলেন, যা মামলুকদের সাথে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলোর অন্তর্ভুক্ত ছিল। মালটিয়া আক্রমণের আগে বায়েজিদ মিশরের নতুন সুলতান ফারাজ বিন বারকুকের কাছে একটি ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠনের দাওয়াত দেওয়ার জন্য একটি প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিলেন, যারা এই অবস্থানও তুলে ধরেছিল যে, মালটিয়া সিওয়াস রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং যেহেতু সিওয়াস কাজী বুরহানউদ্দিনের মৃত্যুর পর থেকে উসমানীয়দের অধীনে রয়েছে, তাই এর এই শহরটিও উসমানীয়দের কাছে থাকা উচিত। ফারাজ বিন বারকুক এই দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। [৪]

যদি দেখা যায় তবে বায়েজিদের এই দাবি অযৌক্তিক ছিল, কারণ কাজী বুরহানউদ্দিন তার জীবদ্দশায় মিশরের মামলুকদের সাথে যুক্ত ছিলেন এবং মালটিয়াও মামলুকদের শাসনাধীন ছিল। হওয়া উচিত ছিল এই যে, এমন সময়ে বায়েজিদকে যদি নিজের এক-দুটি দুর্গ মামলুকদের হাতে তুলে দিয়েও তাদের সাথে ঐক্য করতে হতো, তবে তিনি যেন তা থেকে পিছপা না হতেন। কিন্তু এর পরিবর্তে তিনি তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট রাজ্যটি দখল করে নেন এবং ঐক্যের দাওয়াতে এই ফরমায়েশ রাখেন যে, এই রাজ্যটি উসমানীয়দের নামে করে দেওয়া হোক। এমন প্রতিনিধি দলের ফলাফল ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই হতে পারত না। ফলে মামলুকরা ঐক্যের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে, যার পর বায়েজিদ কোনো দ্বিধা ছাড়াই সৈন্য পরিচালনা করে মালটিয়া দখল করে নেন। শুধু তাই নয়, বরং এর আশপাশের দুর্গগুলো: ‘কাখতা’, ‘বেহনসা’ এবং ‘দারান্দা’ যা মামলুকদের অনুগত দুর্গপতিদের কাছে ছিল, তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেন, সেইসাথে ‘বুস্তান’ জেলাও দখল করে নেন। এভাবে উসমানীয়দের সীমানা ফোরাত নদীর সাথে সংযুক্ত হয়ে যায়। [৫]

ফলে উভয় দেশের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং একত্রে তৈমুরের মোকাবিলা করার প্রশ্নটি শেষ হয়ে যায়। একে অপরের বিষয়ে জেদ ও মতভেদের ফলাফল এই দাঁড়ালো যে, উভয় দেশ কেবল সেই শহরগুলোই নয়, বরং তাদের অনেক সেরা প্রদেশও হারিয়ে ফেলে।

[১] আজায়িবুল মাকদুর, পৃ. ১৬৬, ১৬৭

[২] আখবারুদ দুওয়াল ওয়া আসারুল আওয়াল: ১৮/৩

[৩] তারিখ-ই উসমানি আজ উজুন: ৩২৬/১

[৪] তারিখ-ই উসমানি আজ উজুন: ৩৩২/১

[৫] তারিখ-ই উসমানি আজ উজুন: ৩৩২/১, ৩৩৩

তৈমুর দ্বিতীয়বার আনাতোলিয়ার সীমান্তে। সিওয়াসের পরিণতি:

হিন্দুস্তান থেকে ফেরার পথে তৈমুর পাঁচ লক্ষের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হতে হতে আজারবাইজানের দিক থেকে আনাতোলিয়ার পূর্ব সীমান্তে পৌঁছে যান। এখানকার শাসক শাহজাদা সুলাইমান পাশা নিজের সংক্ষিপ্ত বাহিনী নিয়ে মোকাবেলা করা অসম্ভব দেখে কেল্লাদারদের অবিচল থাকার নির্দেশ দিয়ে নিজের পিতার কাছে কনস্টান্টিনোপলে চলে যান। ১৭ জিলহজ ৮০২ হিজরিতে সিওয়াস সীমান্ত শহরে তৈমুরের প্রথম আক্রমণ হয়। এখানে বায়েজিদের পুত্র এরতুগ্রুল অত্যন্ত বীরত্বের সাথে কেল্লায় অবরুদ্ধ থেকে মোকাবেলা করতে থাকেন। কিন্তু শত্রু প্রাচীর ধ্বংসের সব ব্যবস্থা করে এসেছিল। সে প্রাচীরের ভিত্তি খনন করে সুড়ঙ্গ তৈরি করায় এবং তাতে গাছের গুঁড়ি ফেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুনের তাপে প্রাচীর জায়গায় জায়গায় ধসে পড়ে এবং আঠারো দিনের অবরোধের পর ৫ মহররম ৮০৩ হিজরিতে তৈমুরি বাহিনী ভেতরে প্রবেশ করে। যদিও ঘোষণা করা হয়েছিল যে উসমানীয় বাহিনীসহ সকলের জান-মালের নিরাপত্তা দেওয়া হবে, কিন্তু কেল্লা বিজয়ের পর এরতুগ্রুলসহ সমস্ত সৈন্যদের বন্দী করা হয়। তৈমুর তাদের সাথে ধর্মীয় ও স্বজাতীয় হওয়ার তোয়াক্কা না করে লোমহর্ষক ও অমানবিক আচরণ করেন। তিন হাজার বন্দীকে হাত-পা বেঁধে পুঁটলির মতো করে কেল্লার পরিখায় জীবন্ত নিক্ষেপ করে মাটিচাপা দেওয়া হয়। শাহজাদা এরতুগ্রুলকে শিরশ্ছেদ করা হয়।

বায়েজিদ যখন এই হৃদয়বিদারক সংবাদ পেলেন, তখন তিনি আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। সম্ভবত তৈমুর এই চরম নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করেছিলেন যাতে বায়েজিদ আনাতোলিয়ায় আসতে বাধ্য হন এবং কায়সারের সালতানাত রক্ষা পায়। বাস্তবে তাই হলো। বায়েজিদ তখন কনস্টান্টিনোপলের চতুর্থ অবরোধে ব্যস্ত ছিলেন। তাকে ক্ষুব্ধ হয়ে অবরোধ তুলে নিতে হলো। তিনি রাজধানী এড্রিয়ানোপলে শাহজাদা সুলাইমান পাশাকে নায়েব নিযুক্ত করে নিজে আনাতোলিয়ায় পৌঁছে যান। [১] বায়েজিদ ধারণা করেছিলেন যে তৈমুর সিওয়াস থেকে তার পূর্ণ শক্তি নিয়ে অগ্রসর হবেন, কিন্তু কায়সারের ওপর আক্রমণ করতে তৈমুর কোনো তাড়াহুড়া করেননি। [২]

তৈমুরের পরিকল্পনা:

প্রকৃতপক্ষে সিওয়াস বিজয়ে তীব্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হওয়ার পর তৈমুর বুঝতে পেরেছিলেন যে আনাতোলিয়ার কেল্লাগুলো একে একে এভাবে জয় করা অত্যন্ত কঠিন ও সময়সাপেক্ষ কাজ। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে একটি চূড়ান্ত যুদ্ধ লড়া উচিত এবং তাও তখন যখন বায়েজিদ তার পুরো বাহিনী নিয়ে খোলা ময়দানে বেরিয়ে আসবেন। [৩]

ফলে সিওয়াস দখলের পর তৈমুর আর অধিক কেল্লা অবরোধে সময় ব্যয় না করে তৎক্ষণাৎ সিরিয়ার দিকে রওনা হন এবং বায়েজিদের সাথে যুদ্ধ আরও দুই বছরের জন্য পিছিয়ে যায়। [৪]

[১] আজায়িবুল মাকদুর, পৃ. ৭১ থেকে ৭৩; তারিখ-ই-উসমানি আজ উজুন: ১/৩৩৬; তারিখুদ দাওলাতুল আলিয়া, পৃ. ১৩৬

[২] তারিখ-ই-উসমানি আজ উজুন: ১/৩৩৯

[৩] তারিখুদ দাওলাতুল উসমানিয়া আজ ইলমাজ: ১/১০৯

[৪] তারিখ-ই-উসমানি আজ উজুন: ১/৩৩৭; তারিখুদ দাওলাতুল উসমানিয়া আজ সৈয়দ মুহাম্মদ, পৃ. ১২৭

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

তৈমুর শামে

তৈমুর প্রথমে এই দেশগুলো জয় করা এজন্য জরুরি মনে করছিল যে, মামলুকরা তার দূতকে হত্যা করেছিল যা তার জন্য অসহনীয় ছিল। তার এই আশঙ্কাও ছিল যে, মামলুক সুলতান ফারাজ বিন বারকুক প্রয়োজনে বায়েজিদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারে এবং উভয়ের যৌথ আক্রমণ তাকে দুই দিক থেকে ঘিরে ফেলে বিপজ্জনক প্রমাণিত হতে পারে। তাই ৮০৩ হিজরিতে তৈমুর দক্ষিণের দিকে যাত্রা করে। সে আনাতোলিয়ার দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর বাহনাসা ও মালাতিয়ায় রক্তের হোলি খেলে শামের দিকে রওনা হয়। [১]

তৈমুরের আক্রমণের ভয় এবং একজন আলেম-এ-দ্বীনের সত্যবাদিতা:

তৈমুর সীমান্তবর্তী শহর আইনতাবে ছাউনি ফেলে আলেপ্পোর শাসকের কাছে দূত পাঠায়। বার্তায় বলা হয়েছিল:

“আমরা গত বছর আমাদের দূতের হত্যার প্রতিশোধ নিতে আলেপ্পোর সীমান্ত পর্যন্ত এসেছিলাম। কিন্তু আমরা হিন্দুস্তানের বিশৃঙ্খলার খবর পেলাম, আমরা সেখানে গেলাম এবং আল্লাহ আমাদের বিজয়ী করলেন। এরপর আমরা জর্জিয়া গেলাম এবং আল্লাহ বিজয় দান করলেন। এরপর উসমানের সন্তান (বায়েজিদ)-এর বেয়াদবির কথা জানতে পেরে আমরা তাকে শাসন করেছি এবং সিওয়াস ও অন্যান্য শহরে যা করেছি তা তোমাদের জানা আছে। আমরা মিসরবাসীদের কাছে চিঠি পাঠিয়েছি কিন্তু কোনো উত্তর আসেনি। যদি আনুগত্য না করে তবে মুসলমানদের রক্তের দায় তোমাদের ঘাড়ে হবে। ওয়াসসালাম।”

আলেপ্পোর শাসক এই পত্র কায়রোর সুলতান ফারাজ বিন বারকুকের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে সুলতান ও খলিফার উপস্থিতিতে যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হলো। এই সময়ে এই বিতর্ক শুরু হলো যে, সামরিক প্রস্তুতির জন্য ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ নেওয়া কি সঠিক হবে? এর ওপর কাজী জামাল উদ্দিন হানাতী বললেন:

“যদি আপনারা জোরপূর্বক এমনটা করতে চান তবে আপনাদের সেই শক্তি আছে, কিন্তু যদি আপনারা আমাদের কাছে জিজ্ঞাসা করেন তবে আমরা এর অনুমতি দেব না। কেউই এর বৈধতার ফতোয়া দেবে না। সেনাবাহিনীর এই মুহূর্তে জনগণের দোয়ার প্রয়োজন। এমন কাজ করা উচিত নয় যাতে তাদের বদদোয়া পাওয়া যায়।”

দ্বিতীয় প্রস্তাব এই পেশ করা হলো যে, ওয়াকফ সম্পত্তি সামরিক খাতে ব্যয় করা হোক। কাজী জামাল উদ্দিন এটি থেকেও নিষেধ করলেন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ., যিনি সেই যুগের অত্যন্ত উচ্চমর্যাদার আলেম ও মুহাদ্দিস ছিলেন, তিনি বলেন যে, পরবর্তীতে তাই করা হয়েছিল যা থেকে কাজী জামাল উদ্দিন নিষেধ করেছিলেন এবং এর ফলাফল ভালো হয়নি। [২]

শামে তৈমুরের আক্রমণের অবস্থা... হাফেজ ইবনে হাজার রহ.-এর জবানিতে:

অবশেষে তৈমুরি বাহিনী শামে প্রবেশ করল। প্রথমে শামের উত্তর প্রদেশ আলেপ্পো এবং এরপর দামেস্ক তার ধ্বংসলীলার শিকারে পরিণত হলো।

[১] ইনবাইল গুমর: সন ৮০৩ হিজরি; রওয়ুল মানাযির পাণ্ডুলিপি, পৃষ্ঠা ১৬৬

[২] ইনবাইল গুমর: সন ৮০৩ হিজরি

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) তাঁর নিজ দেশ সম্পর্কে তৈমুরের আক্রমণের অবস্থা এভাবে বর্ণনা করেছেন:

“তৈমুর রবিউল আউয়াল (৮০৩ হিজরী)-এর প্রথম দশকে আলেপ্পোর সামনে পৌঁছাল। শহরের আমীররা পরামর্শ করলেন; কেউ কেউ খোলা ময়দানে মোকাবিলার পরামর্শ দিলেন এবং কেউ কেউ মিশর থেকে সাহায্য না আসা পর্যন্ত কেবল আত্মরক্ষা নিয়ে প্রাচীরের ওপর থেকে লড়াই করার পরামর্শ দিলেন। শেষ পর্যন্ত প্রথম পরামর্শটিই গৃহীত হলো এবং শহরের বাইরে তাবু খাটানো হলো।

শনিবার ৪ঠা রবিউল আউয়াল উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হলো। তৈমুর হাতিসহ আক্রমণ করল। অধিকাংশ লোক পিঠ দেখিয়ে পালিয়ে গেল। তবে ত্রিপোলির শাসক এবং কিছু আমীর দৃঢ়ভাবে মোকাবিলা করলেন এবং লড়াইয়ে লড়াইয়ে শহীদ হলেন। ইসলামী লশকর শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলো। মানুষ আলেপ্পোর দরজার দিকে দৌড়াল। এই হুড়োহুড়িতে অসংখ্য মানুষ পদপিষ্ট হলো। আমীরদের বাহিনী কেবল আত্মরক্ষা নিয়ে গেল। তৈমুরী বাহিনী যারা পিছু ধাওয়া করছিল, তারা শহরে ঢুকে আগুন লাগিয়ে দিল। নারী ও শিশুদের বন্দী করা হলো। পুরুষ ও বালকদের তলোয়ারের নিচে ফেলে দেওয়া হলো। জামে মসজিদ কসাইখানার দৃশ্য পেশ করছিল। মসজিদে ঘোড়া বেঁধে রাখা হয়েছিল এবং নারীদের ইজ্জত তাদের পরিবারের সামনেই লুণ্ঠন করা হয়েছিল, এমনকি তৈমুরের সৈন্যরা প্রকাশ্যে ব্যভিচার করতেও দ্বিধাবোধ করত না। তারপর কেবল ঘেরাও করে এর পরিখা ভরাট করে দেওয়া হলো। দুই-তিন দিন পর কেবলদার নিজের এবং নিজের সাথীদের প্রাণের নিরাপত্তার বিনিময়ে কেবল সমর্পণ করল। তাকে এবং তার সাথীদের শিকল দিয়ে বেঁধে ফেলা হলো। তৈমুর কেবল পরিদর্শন করল। শহরবাসী নিরাপত্তার জন্য যে মালপত্র কেবল রেখেছিল, তা সবই লুট করে নেওয়া হলো। তৈমুরের সামনে বন্দী বালক ও কুমারী মেয়েদের পেশ করা হলো। সে তাদের সবাইকে আমীরদের মধ্যে বণ্টন করে দিল।

তারপর তৈমুরের সৈন্যরা শহরের উপকণ্ঠের জনবসতিগুলোতে লুটতরাজ ও হত্যাযজ্ঞ শুরু করল। অবস্থা এমন হয়েছিল যে, এই জনপদগুলোর মধ্য দিয়ে কেউ গেলে তার পা কোনো না কোনো লাশের ওপর পড়ত। তৈমুর কাটা মাথা দিয়ে মিনার তৈরি করাল, যার মধ্যে তিনটি মিনার ‘রাবিয়া বিন জাজা’ (নামক টিলা)-এর ওপর ছিল। বন্দীদের মধ্যে নিষ্পাপ শিশুরা ক্ষুধার্ত অবস্থায় মারা গিয়েছিল, যাদের সংখ্যা নিহতদের চেয়েও বেশি ছিল।

বলা হয় যে, তৈমুর যখন কেবল বসল এবং ওলামাদের তলব করল, তখন সে তাদের কাছে হযরত আলী এবং হযরত মুয়াবিয়া (রাযি.) সম্পর্কে প্রশ্ন করল। এর উত্তরে কাজী কফসী মালেকী বললেন: ‘তাঁরা সবাই মুজতাহিদ ছিলেন।’

এ কথা শুনে তৈমুর রাগান্বিত হয়ে বলল:

‘তোমরাও সিরিয়াবাসীদের অনুসারী। তোমরা সবাই ইয়াজিদী, তোমরা হুসাইন (রাযি.)-এর হত্যাকারী।’ [১]“

তৈমুরের আল্লামা ইবনে শাহনাহ (রহ.)-এর সাথে কথোপকথন:

তৈমুর ওলামাদের সাথে রাখত কিন্তু মাসআলা জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে কঠোরতা প্রদর্শন করত এবং এতে ওলামাদের হত্যা বা শাস্তির উপক্রমও হতো। তৈমুরের ওলামাদের সাথে কথোপকথনের আলোচনা আলেপ্পোর একজন হানাফী আলেম মুহিবুদ্দীন ইবনে শাহনাহ (রহ.) বিস্তারিতভাবে করেছেন।

[১] ইনবাউল গুমর ফি আনবাউল উমর: ২/১৩৩ থেকে ১৩৬।

তারেখে উম্মতে মুসলিমা (মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস) — চতুর্থ খণ্ড

তাদের প্রত্যক্ষদর্শী বর্ণনার সারসংক্ষেপ হলো এই যে, আলেপ্পো দুর্গ জয় করার পরের দিন তৈমুর সওয়াল-জওয়াবের একটি মজলিস সাজালেন। শহরের আলেমদের তলব করলেন। নিজের দোভাষী আব্দুল জব্বার সমরকন্দীর মাধ্যমে তাদের বলে পাঠালেন:

“আমি তাদের কাছে এমন একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করতে চাই যা আমি সমরকন্দ, বুখারা, হেরাত এবং সমস্ত বিজিত অঞ্চলের আলেমদের জিজ্ঞাসা করেছি, কিন্তু কেউ স্পষ্ট জবাব দেয়নি। তোমরা তাদের মতো হয়ো না। তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বড় আলেম এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, সেই যেন জবাব দেয়। সে যেন জেনে রাখে যে, আমি আলেমদের সাথে উঠাবসা করি। তাদের সাথে আমার বিশেষ সম্পর্ক ও ভালোবাসা রয়েছে। আমি দীর্ঘ সময় ধরে ইলম অর্জনে মশগুল আছি।”

আলেমগণ মুহিব্বুদ্দিন ইবনে শুহনা রহ.-এর দিকে ইশারা করে বললেন: “তিনি এখানকার মুফতি। তাকে জিজ্ঞাসা করুন।”

তৈমুর জিজ্ঞাসা করলেন: “গতকাল আমাদের এবং তোমাদের লোক নিহত হয়েছে। তাদের মধ্যে শহীদ কে, আমাদের নিহতরা নাকি তোমাদের?”

মজলিসে নিশ্চিন্তা ছেয়ে গেল। এমন সময় আল্লাহ আল্লামা ইবনে শুহনা রহ.-এর অন্তরে একটি উপযুক্ত জবাব ঢেলে দিলেন। তিনি বললেন:

“এটি সেই একই প্রশ্ন যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল এবং তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জবাব দিয়ে দিয়েছিলেন। আমিও সেই জবাবই দেব যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছিলেন।”

তৈমুর আল্লামার কথা শুনে তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন এবং দোভাষীকে বলতে লাগলেন: “এই সাহেব আমার সাথে ঠাট্টা করছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এই প্রশ্ন আবার কীভাবে করা যেতে পারে এবং তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীভাবে এর জবাব দিতে পারেন?”

ইবনে শুহনা রহ. বললেন: “এক গ্রাম্য ব্যক্তি রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে উপস্থিত হয়ে আরজ করল: মানুষ আত্মমর্যাদার কারণে লড়াই করে, বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য লড়াই করে, নিজের অবস্থান দেখানোর জন্য লড়াই করে, এদের মধ্যে আল্লাহর পথে লড়াইকারী কে? আপনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: যে এই জন্য লড়াই করে যেন আল্লাহর কালিমা সমুন্নত হয়, সেই শহীদ। [১]”

তৈমুর এটি শুনে আনন্দিত হয়ে উঠলেন এবং বললেন: “চমৎকার! চমৎকার!”

এরপর তৈমুর সাবলীল হয়ে গেলেন, হিন্দুস্তান থেকে ইরাক পর্যন্ত নিজের বিজয়াভিযানের স্মৃতিচারণ করতে লাগলেন।

ইবনে শুহনা রহ. বললেন: “এই নেয়ামতের শুকরিয়া স্বরূপ এই উম্মতের সাথে ক্ষমার আচরণ করুন এবং কাউকে হত্যা করবেন না।”

তৈমুর বলতে লাগলেন: “আল্লাহর কসম! আমি জেনে-বুঝে কাউকে হত্যা করিনি। তোমরাই শহরের দরজায় নিজেদের প্রাণ দিয়েছ। আল্লাহর কসম আমি তোমাদের কাউকে হত্যা করব না। তোমাদের জান ও মাল নিরাপদ।”

এরপর তৈমুর একের পর এক প্রশ্ন করতে লাগলেন এবং আলেমদের মধ্যে প্রত্যেকেই জবাব দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন।

কাজী শরফুদ্দিন তাদের বোঝালেন এবং বললেন:

“আল্লাহর দোহাই! এই ব্যক্তিকে (ইবনে শুহনা) জবাব দিতে দাও, কারণ সে জানে সে কী বলছে।”

[১] مَنْ قَاتَلَ لِيَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (সহীহ বুখারী, হা: ২৮১০, অধ্যায়: যে আল্লাহর কালিমা সমুন্নত করার জন্য লড়াই করে; সহীহ মুসলিম, হা: ১৯০৩, ১৯০৪) সহীহাইন-এর বর্ণনাসমূহের মর্মার্থ একই, তবে সেগুলোতে “শহীদ” শব্দটি উল্লিখিত নেই।

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

শেষে তৈমুর জিজ্ঞেস করলেন: “তোমরা আলী, মুয়াবিয়া এবং ইয়াজিদ সম্পর্কে কী বলো?”

ইবনে শুহনা রহমাতুল্লাহি আলাইহি কাজী শরফুদ্দিনের কানে কানে বললেন: “ভেবেচিন্তে উত্তর দেবেন কারণ এই ব্যক্তি (তৈমুর) শিয়া।”

তবে তাদের আগেই কাজী আলম উদ্দিন কফসি মালিকি কোনো দ্বিধা ছাড়াই বলে দিলেন: “এই সকল ব্যক্তিবর্গ মুজতাহিদ ছিলেন।”

একথা শুনে তৈমুর রাগান্বিত হলেন এবং গর্জন করে বললেন:

“হে হালববাসী! তোমরা দামেশকবাসীদের অনুসারী যারা ইয়াজিদি। তারাই তো হযরত হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুকে শহীদ করেছিল।”

এই অবস্থা দেখে আল্লামা ইবনে শুহনা রহমাতুল্লাহি আলাইহি পরিস্থিতি সামাল দিলেন এবং কাজী মালিকির সাফাই গেয়ে বললেন:

“এই ভদ্রলোক কেবল সেই উত্তরই দিয়েছেন যা তিনি কোনো কিতাবে লেখা দেখেছেন এবং এর অর্থ বুঝতে পারেননি।”

একথা শুনে তৈমুরের রাগ কিছুটা প্রশমিত হলো। তিনি ইবনে শুহনা রহমাতুল্লাহি আলাইহি সম্পর্কে বললেন: “ইনি একজন আকর্ষণীয় ব্যক্তি।” আর কাজী শরফুদ্দিন সম্পর্কে বললেন: “ইনি একজন প্রাজ্ঞ ও বাগ্মী ব্যক্তি।” এরপর তৈমুর ইবনে শুহনা রহমাতুল্লাহি আলাইহির বয়স জিজ্ঞেস করলেন। তিনি ৫৪ বছর বললেন। এরপর কাজী শরফুদ্দিনকে একই প্রশ্ন করলেন। তিনি বললেন: “আমি ইবনে শুহনার চেয়ে এক বছরের বড়।”

তৈমুর বললেন: “তোমরা আমার সন্তানদের মতো। আমার বয়স ৭৬ বছর।” এরপর মজলিস মুলতবি হয়ে গেল।

তৈমুরের পক্ষ থেকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি মরীচিকা প্রমাণিত হলো এবং ওলামায়ে কেরামের সাথে সাক্ষাতের পর তিন সপ্তাহ পর্যন্ত হালবে হত্যাযজ্ঞ ও লুটতরাজের বাজার গরম রইল। রবিউল আউয়ালের শেষে তৈমুর আল্লামা ইবনে শুহনা রহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং কাজী শরফুদ্দিনকে পুনরায় ডেকে পাঠালেন এবং হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে তাদের আকিদা জিজ্ঞেস করলেন। কাজী ইবনে শুহনা রহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন:

“এতে কোনো সন্দেহ নেই যে সত্য হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথে ছিল। হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু খলিফাদের (অর্থাৎ খুলাফায়ে রাশেদিন) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না, কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই হাদিস প্রমাণিত যে: আমার পরে খিলাফত ত্রিশ বছর পর্যন্ত থাকবে। আর এই ত্রিশ বছর হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে।”

পহেলা রবিউস সানি তৈমুর দামেশকের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন তখন একজন আমিরকে পাঠিয়ে আল্লামা ইবনে শুহনা রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করলেন:

“দামেশকের শাসক যে মুঘল দূতকে হত্যা করেছিল, তাকে হত্যা করা জায়েজ হবে কি না?”

ইবনে শুহনা রহমাতুল্লাহি আলাইহি আমিরকে উত্তর দিলেন: “এখানে মুসলমানদের মাথা কেটে কেটে তৈমুরের সামনে পেশ করা হচ্ছে, এ ব্যাপারে কোনো ফতোয়া চাওয়া হচ্ছে না অথচ তৈমুর কসম খেয়েছিলেন যে তিনি আমাদের কাউকে হত্যা করবেন না।”

আমির এই উত্তর নিয়ে তৈমুরের কাছে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পর এই উত্তর নিয়ে ফিরে এলেন:

“সুলতান মুসলমানদের মাথা আনার নির্দেশ দেননি। তিনি নিহতদের মাথা কাটার কথা বলেছিলেন যাতে প্রথা অনুযায়ী তা দিয়ে মিনার তৈরি করা যায় কিন্তু সৈন্যরা এর ভুল অর্থ বুঝেছে।” [১]

এই অদ্ভুত উত্তর থেকে আন্দাজ করা যায় যে জালিম শাসকরা তাদের নিষ্ঠুরতাকে কীভাবে বৈধতার পোশাক পরায়।

[১] রওজাতুল মানাজির আজ ইবনে শুহনা: পাণ্ডুলিপি, পৃ. ১২৮, ১২৯; আজায়িবুল মাকদুর, পৃ. ১৯০ থেকে ১৯২।

দমশকের ধ্বংসলীলা:

তৈমুরি বাহিনী যখন আলেপ্পো থেকে দমশকের দিকে অগ্রসর হলো, তখন কায়রো থেকে সুলতান ফারাজ বিন বারকুক এবং আব্বাসীয় খলিফা তাদের মোকাবিলার জন্য রওনা হলেন। ৬ই জমাদিউল আউয়াল তারা দমশকে পৌঁছালেন। [১] এরপর উভয় পক্ষের মধ্যে ছোটখাটো সংঘর্ষ চলতে থাকে। [২] কিন্তু কোনো চূড়ান্ত যুদ্ধের আগেই মামলুকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয় এবং তারা হতাশ হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। মিশরের সুলতান এবং আব্বাসীয় খলিফা শোচনীয় অবস্থায় মিশরের দিকে চলে যান এবং ৫ই জমাদিউল আখিরা কায়রো পৌঁছান। এদিকে দমশকবাসী হতাশ হয়ে ১৫ই জমাদিউল আখিরা ৮০৩ হিজরিতে শহরের দরজা খুলে দেয়। [৩]

দমশকে যা কিছু ঘটেছিল সে সম্পর্কে হাফিজ ইবনে হাজার (রহ.)-এর চেয়ে নির্ভরযোগ্য বর্ণনা আর কারো হতে পারে না। তিনি লিখেছেন:

“দশ লক্ষ দিনার প্রদানের শর্তে সন্ধি হলো এবং শহরের অধিবাসীদের এই অর্থ প্রদানে অংশীদার করা হলো। কিন্তু পরে তৈমুর বললেন যে, তার উদ্দেশ্য ছিল এক হাজার তুমান। এক তুমান দশ হাজার দিনারের সমান হয়। (অর্থাৎ অর্থের পরিমাণ বাড়িয়ে এক কোটি দিনার করে দেওয়া হলো। বর্তমান হিসেবে প্রায় পঁচিশ আরব রুপি)। এটি শুনে নাগরিকদের বিপদ দ্বিগুণ-চতুর্গুণ হয়ে গেল। তারা অনুতপ্ত হতে লাগল কিন্তু এখন অনুশোচনা ছিল নিরর্থক। তৈমুর প্রথম যে জুলুমটি করলেন তা হলো জামে মসজিদ উমাইয়া খালি করে দেওয়া। সেখানে তার নায়েব শাহ মালিক তার পরিবার ও ঘোড়াসহ বসবাস শুরু করল। মসজিদগুলোতে সালাত এবং বাজারগুলোতে ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেল। তৈমুর শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের কাছ থেকে দমশকের মহল্লাগুলোর নাম লিখিয়ে নিলেন এবং প্রতিটি মহল্লা তার আমিরদের নামে বরাদ্দ করে দিলেন। প্রত্যেক আমির তার মহল্লায় গেল এবং সেখানকার বাসিন্দাদের কাছে অর্থ দাবি করল। প্রত্যেক ব্যক্তি অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় নিজের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকত। তার কাছে বিপুল পরিমাণ অর্থ দাবি করা হতো। যদি সে তা দিতে না পারত, তবে তার ধন-সম্পদ লুট করে নেওয়া হতো। যখন ঘরে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকত না, তখন তার নারীদের ধরে আনা হতো এবং তার চোখের সামনে তাদের সাথে ব্যভিচার করা হতো যাতে তার অপমান আরও বেশি হয়। এরপর মানুষকে প্রচণ্ড মারধর করা হতো যাতে তারা ধন-সম্পদ পেশ করে। ৭ দিন পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত ছিল। এই সময়ে অসংখ্য মানুষ নির্যাতনের সহ্য করতে না পেরে মারা যায়।”

অবশেষে মোগল আমিররা শহর থেকে বের হলেন এবং এরপর ১লা রজব পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনীর সাথে শহরের ওপর আক্রমণ চালালেন। তাদের হাতে ছিল উন্মুক্ত তলোয়ার। যা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তারা তা লুট করে নিল। নবজাতক শিশুদের পায়ের নিচে পিষ্ট করে তারা তাদের বাবা-মাকে বন্দি করে নিয়ে গেল। শহরের বিভিন্ন স্থানে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হলো যার ফলে শহরের অধিকাংশ অংশ ভস্মীভূত হয়ে গেল। বিশেষ করে জামে মসজিদ উমাইয়া এবং এর আশপাশের এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হলো। অবস্থা এমন ছিল যে, যেকোনো মোগল সৈন্য যেকোনো ঘরে ঢুকে পড়ত এবং লুটতরাজ, হত্যা, অগ্নিসংযোগ বা ব্যভিচার যা খুশি করত। কারো হাত উঠত না বা কারো কণ্ঠস্বর বের হতো না কারণ সবার হৃদয়ে ভয় ও আতঙ্ক ছেয়ে গিয়েছিল।

[১] ইনবাউল গুমর: ১৩৬/২

[২] ইনবাউল গুমর: ১৩৭/২

[৩] আস-সুলুক লিল মাকরিজি: ৩৭/৬; আজায়িবুল মাকদুর, পৃ. ২০৫

তিন শাবান তৈমুরি বাহিনী ফিরে গেল। তখন শহরে প্রচুর পরিমাণে পঙ্গপাল নেমে এল। এই মাসে (শাবান মাসে) শহরে এত মানুষ মারা গেল যে তাদের সংখ্যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। কেউ পুড়ে, কেউ পালিয়ে যেতে অক্ষম হয়ে ক্ষুধার জ্বালায়, কেউ পালিয়ে যাওয়ার পথে ক্লান্ত হয়ে মারা গেল। কেউ কেউ দুর্বল ও অসহায় অবস্থায় পড়ে থেকে মারা গেল। এক মুদ (প্রায় এক সের) গমের দাম চল্লিশ দিরহাম (প্রায় দশ হাজার টাকা) পর্যন্ত পৌঁছে গেল। মানুষ পঙ্গপাল সংগ্রহ করে খেতে ও বিক্রি করতে লাগল এবং এটাই তাদের সাধারণ খাবারে পরিণত হলো। এক রতল (প্রায় আধা সের) পঙ্গপাল সাড়ে চার দিরহামে পাওয়া যাচ্ছিল। শহরের মানুষ ছিল নগ্নপদ ও নগ্নদেহ। তাদের মধ্যে যারা অবস্থাপন্ন ছিল তারা কুর্তা পরিহিত ছিল অথবা চামড়া জড়িয়ে ছিল এবং চিৎকার করে পঙ্গপাল বিক্রি করছিল। সাধারণ মানুষ অবশিষ্ট আসবাবপত্র খুঁজছিল যাতে তা বিক্রি করে পঙ্গপাল কিনতে পারে। শহরে লাগা আগুন নেভানোর কেউ ছিল না, তাই আগুন পুরো শহরে ছড়িয়ে পড়েছিল। [১]

সংক্ষেপে, দামেস্কের মতো ঐতিহাসিক শহর তৈমুরের হাতে সম্পূর্ণভাবে দগ্ধ ও ধ্বংস হয়ে গেল।

দামেস্কের আলেমদের সাথে কথোপকথন:

দামেস্কেও তৈমুর আলেমদের সাথে প্রশ্নোত্তর চালিয়ে যাচ্ছিল। তার পক্ষ থেকে তার মুখপাত্র আল্লামা আব্দুল জব্বার হানাফি এবং সিরিয়াবাসীদের পক্ষ থেকে কাজিউল কুজাত তকিউদ্দিন হাম্বলি বিতর্ক চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এই সময়ে হযরত আলী এবং হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর মতপার্থক্য, হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদাত এবং ইয়াজিদের ভূমিকা নিয়েও আলোচনা হলো।

অবশেষে একজন আলেম এই বলে এই বিতর্কের সমাপ্তি ঘটালেন যে, “তারা গত হয়ে গেছেন। এই ফিতনাগুলো থেকে আল্লাহ আমাদের হেফাজত করেছেন এবং আমাদের তলোয়ারগুলোকে এই রক্তপাত থেকে পবিত্র রেখেছেন। আমাদের আকিদা সেটাই যা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের।”

তৈমুর এরপর খুলাফায়ে রাশেদিনের মর্যাদা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। কাজি শামসুদ্দিন নাবলুসি বললেন:

“জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব বংশের চেয়ে বেশি, তাই অল্প বংশীয় আলেম উচ্চ বংশীয় মুখের চেয়ে বেশি সম্মানিত। সাহাবীদের ঐকমত্য ছিল যে, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শ্রেষ্ঠত্ব হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ওপর রয়েছে। কারণ হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ব্যাপারে সাহাবীরা একমত ছিলেন যে তিনি সবার চেয়ে বড় আলেম, ইসলামে সবচেয়ে মজবুত এবং অগ্রগামী। সাহাবীদের ঐকমত্যের সমর্থন খোদ এই হাদিস থেকে পাওয়া যায় যে, লা তাজতামিউ উম্মাতি আলাদ দলালাহ... আমার উম্মত গোমরাহির ওপর একত্রিত হবে না।”

একথা বলে কাজি নাবলুসি নিজের কুর্তা খুলে ফেললেন। তৈমুর অবাক হয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করলে কাজি সাহেব বললেন:

“আপনার লস্করে বিভিন্ন ফিরকার লোক রয়েছে, এই মজলিসের কথাগুলো তাদের কাছে অবশ্যই পৌঁছাবে এবং তাদের মধ্যে যে কেউ আমাকে প্রকাশ্যে হত্যা করে ফেলবে। তাই আমি শাহাদাতের এই সৌভাগ্যের জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত।”

তৈমুর সাবাশ দিয়ে বলে উঠল: “এই কাজি তো অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাষী, বাগ্মী এবং সাহসী লোক।”

তারপর এই বলে মজলিস মূলতবি করে দিল যে, ভবিষ্যতে এই কাজি যেন আমার কাছে না আসে। [২]

[১] ইনবাউল গুমর বি আবনাইল উমর: ২/ ১৩৭ থেকে ১৩৯

[২] আজায়িবুল মাকদুর, পৃষ্ঠা ২১৯, ২২০

বাগদাদের ধ্বংসলীলা:

শীতকাল শেষ হওয়া পর্যন্ত তৈমুর সিরিয়ায় অবস্থান করেন এবং বসন্তের শুরুতে যখন বরফ গলে রাস্তা খুলে যায়, তখন তিনি যাত্রা শুরু করেন [১]। সিরিয়া থেকে লুণ্ঠিত বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ সমরকন্দে পাঠিয়ে দিয়ে তৈমুর তৃতীয়বারের মতো ইরাকের দিকে অগ্রসর হন, যেখানে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। তৈমুর বাগদাদে পৌঁছালে এখানকার পলাতক শাসক আহমদ বিন ওয়াইসের প্রতিনিধি ফারাজ প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তৈমুর তাকে পরাজিত করে ঠিক ঈদুল আযহার দিন শহরে প্রবেশ করেন এবং শহরটিকে কসাইখানায় পরিণত করেন। বাগদাদের প্রায় সমস্ত ইমারত ধ্বংস করে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হয় [২]। হাফিজ ইবনে হাজার (রহ.) ঈদুল আযহার দিন তৈমুরের এই রক্তপাতের ওপর এভাবে মন্তব্য করেন:

“তিনি মুসলমানদের জবাই করে কুরবানি করেন, এমনকি তাদের রক্ত দজলা নদীতে প্রবাহিত হতে থাকে। এখানে মাথার খুলি দিয়ে অনেক মিনার তৈরি করা হয়। বলা হয় যে, নিহতের সংখ্যা ৯০ হাজারে পৌঁছেছিল।” [৩]

আনাতোলিয়ায় তৈমুরের তৃতীয় আক্রমণ

তৈমুরের অনুপস্থিতিতে বায়েজিদ আনাতোলিয়ার আরেকটি পূর্বঞ্চলীয় রাষ্ট্র “আরজিনজান” জয় করে নিয়েছিলেন, যার আমির “তহরতান” তৈমুরের অনুগত ছিলেন [৪]। তহরতান পালিয়ে তৈমুরের কাছে চলে যান এবং বায়েজিদের বিরুদ্ধে তথ্য দিতে শুরু করেন [৫]। তৈমুর পুনরায় আনাতোলিয়ায় পৌঁছান এবং কিছু দিন কোনিয়াতে অবস্থান করেন [৬]। তৈমুরের অনেক আমির এবং তাঁর শাহজাদারা নিজেদের সমধর্মী, সমভাষী, সুন্নি হানাফি বাদশাহর সাথে যুদ্ধ করাকে সমীচীন মনে করতেন না। বিশেষ করে এই কারণে যে, সেই সময় এই বাদশাহ খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে জিহাদে লিপ্ত ছিলেন। তবে তৈমুর তাদের মতামত প্রত্যাখ্যান করেন এবং এই বলে তাদের নিজের মতাদর্শী করেন:

“আমরা জিহাদ করে চীন জয় করার সংকল্প করেছি। যদি আমরা উসমানীয়দের এভাবেই ছেড়ে দিই, তবে তারা চীন অভিযানের সময় আমাদের পেছন থেকে আক্রমণ করবে।” [৭]

তৈমুরের হুমকিমূলক পত্র ও দাবিদাওয়া:

এরপর তিনি বায়েজিদকে একটি হুমকিমূলক পত্র পাঠান যাতে বলা হয়েছিল:

“সাবধান! আমাদের অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকো, অন্যথায় তোমরা আমাদের ক্রোধের মুখে পড়বে। তোমরা আমাদের বিরোধীদের পরিণতি সম্পর্কে নিশ্চয়ই শুনেছ। সুতরাং বাদানুবাদ এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ ত্যাগ করো।” [৮]

উসমানীয়দের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে না দেওয়ার জন্য তৈমুরের দাবিগুলো ছিল নিম্নরূপ:

- আনাতোলিয়ার আমিরদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া সমস্ত এলাকা তাদের ফিরিয়ে দিতে হবে।

[১] মানাম তৈমুর জাহাঙ্গুশা, পৃ. ৩৮১, ত. ইসফাহান

[২] ইনবাউল গুমর বি-আবনাউল উমর: ২/২০৮; আজাইবুল মাকদুর, পৃ. ২৩৭ থেকে ২৩৯; নাইলুল আমাল ফি জাইলুদ দুওয়াল লি-ইবনে শাহীন আল-মালতি: ৩/৬৬

[৩] ইনবাউল গুমর বি-আবনাউল উমর: ২/২০৮

[৪] আজাইবুল মাকদুর, পৃ. ১৭০

[৫] মানাম তৈমুর জাহাঙ্গুশা, পৃ. ৩৮২

[৬] তারিখুদ দাওলাতুল উসমানিয়া আজ ইলমাজ: ১/১১০

[৭] আজাইবুল মাকদুর, পৃ. ২৫০, ২৫১

- ২. উসমানীয় সুলতানগণ তৈমুরি ধাঁচের পাগড়ি ও কোমরবন্ধ পরিধান করবেন যাতে তৈমুরি সালতানাতের আনুগত্য প্রকাশ পায়।
- ৩. বায়েজিদের এক পুত্র জিম্মি হিসেবে তৈমুরের কাছে থাকবে।
- ৪. এরজিনজানের শাসক “তাহেরতান”-এর বন্দি পরিবারকে মুক্তি দিতে হবে এবং “কামাক” দুর্গ তাদের ফিরিয়ে দিতে হবে। [১]
- ৫. কারা ইউসুফ তুর্কমানি এবং সুলতান আহমদ বিন উওয়াইস জালাইরিকে তৈমুরের হাতে সোপর্দ করতে হবে। [২]

বায়েজিদের জবাব:

বায়েজিদ এসব দাবি ও হুমকি শুনে রাগে কাঁপতে লাগলেন এবং বললেন:

“আমাকে কি এমন আজেবাজে কথা দিয়ে ভীত করা যাবে? তৈমুর কি আমাকে অনারব রাজাদের মতো মনে করেছে? আমি কি জানি না সে কীভাবে রাজাদের প্রতারণার মাধ্যমে হত্যা করেছে এবং কীভাবে সে তাদের দমন করে চলেছে? সে জালিম, রক্তপিপাসু, অঙ্গীকার ভঙ্গকারী এবং বিশ্বাসঘাতক। এখন এই বিবাদের ফয়সালা আমি করব। ইসলামের গাজীরা আমার অধীনে আছে, যুদ্ধ আমাদের পেশা এবং জিহাদ আমাদের নেশা। আমরা আল্লাহর পথে তাঁর কালিমা বুলন্দ করার জন্য লড়াই করে আসছি এবং আমাদের সাথে সেই সব লোক আছে যারা জানাতের বিনিময়ে আল্লাহর কাছে নিজেদের জান ও মাল বিক্রি করে দিয়েছে।”

তিনি তৈমুরকে দাঁতভাঙা জবাব দিয়ে তার দাবি মানতে সরাসরি অস্বীকার করলেন এবং পত্রের শেষে এমনকি এও লিখে দিলেন: “যদি আমি মোকাবিলায় পলায়ন করি, তবে আমার স্ত্রীদের তিন তালাক।”

তৈমুর বায়েজিদের উত্তর পড়ে তার মেজাজের উগ্রতা আঁচ করতে পারলেন এবং এরপর এই দুর্বলতাকেই উসকে দিয়ে একে নিজের বিজয়ের সবচেয়ে বড় মাধ্যম বানালেন। [৩]

তৈমুরের গোয়েন্দাদের তৎপরতা:

তৈমুর আক্রমণের আগে আনাতোলিয়ায় গোয়েন্দা ও তথ্যদাতাদের প্রবেশ করিয়েছিলেন যাতে প্রতিদ্বন্দ্বী সালতানাতের প্রতি মুহূর্তের খবর পাওয়া যায়। এ ছাড়া তিনি গোপন প্রতিনিধি পাঠিয়ে আনাতোলিয়ায় বসবাসরত মোগল গোত্রগুলোর সরদারদের এক জাতি ও এক বংশের দোহাই দিয়ে নিজের সমর্থনে রাজি করিয়েছিলেন। তার প্রতিনিধিরা বায়েজিদের অনেক কর্মকর্তাকে এই ধারণা দিয়েছিল যে, তৈমুর দয়ালু ও দানশীল এবং তার বাহিনী সচ্ছল। বায়েজিদ কৃপণ এবং তার বাহিনী অভাবগ্রস্ত। এ ধরনের কথার মাধ্যমে বায়েজিদের বাহিনীতে হতাশা ছড়ানো হতে থাকে এবং কর্মকর্তাদের আনুগত্য কেনা হতে থাকে। [৪]

তৈমুরের প্রতারণামূলক বার্তা:

ওদিকে বায়েজিদ সৈন্য পরিচালনা শুরু করেছিলেন। তৈমুর মোকাবিলার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত ছিলেন, তবে তাকে বিভ্রান্ত করার জন্য তিনি...

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, সাইয়েদ মুহাম্মদ, পৃ. ১২৮

[২] ইনবাউল গুমর: ২/২২৮

[৩] আখবারুদ দুওয়াল: ৩/১৮

[৪] ইনবাউল গুমর: ২/২২৮

কিছু শান্তিপূর্ণ বার্তা পাঠাল। উদাহরণস্বরূপ, একটি পত্রে সে বায়জীদকে লিখেছিল:

“তুমি আল্লাহর পথে জিহাদকারী একজন যুবক। আমি তোমার সাথে যুদ্ধ করতে চাই না। তুমি তোমার বাপ-দাদার সাম্রাজ্য নিয়ে সন্তুষ্ট থাকো। বাকি শহরগুলো আমার হাতে তুলে দাও।” [১]

ততক্ষণে বায়জীদ পনেরো দিনের পথ অতিক্রম করে ফেলেছিলেন, তবে এই প্রথম তিনি তৈমুরের অবস্থানে কিছুটা নমনীয়তা অনুভব করলেন, ফলে তিনি কোনো এক প্রকার সন্ধির কথা চিন্তা করতে লাগলেন। [২] বায়জীদের প্রধানমন্ত্রী জানদার আলী পাশাও কোনোভাবে যুদ্ধ এড়ানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন, যা মেনে নিয়ে বায়জীদ তৈমুরের কাছে কিছু উপহার পাঠালেন, কিন্তু উত্তেজনা আগের মতোই বজায় রইল। তৈমুর বায়জীদের উপহারগুলো অপছন্দ করে বললেন যে, “এগুলোর সংখ্যা দশ কেন? নয় কেন নয়? তুর্কিদের কাছে নয় একটি প্রিয় সংখ্যা এবং সুনাতও হলো বিজোড় সংখ্যা গ্রহণ করা।” [৩] এই ধরনের অজুহাত এটা প্রকাশ করার জন্য যথেষ্ট ছিল যে, তৈমুর বায়জীদকে মানসিকভাবে বিভ্রান্ত করছেন। বায়জীদও বুঝতে পারলেন যে তৈমুর তার সময় নষ্ট করছেন। [৪]

উভয় বাহিনীর অগ্রসর হওয়া:

এখন যুদ্ধ অনিবার্য ছিল। গ্রীষ্মকাল শুরু হয়ে গিয়েছিল। ফসল ও বাগানগুলো পেকে আসছিল। বায়জীদ চাচ্ছিলেন না যে তৈমুর সেগুলো ধ্বংস করুক বা জনগণের আরও ক্ষতি করুক। [৫] তৈমুর তখন দক্ষিণ-পশ্চিমের শহর কোনিয়াতে ছিলেন। [৬]

বায়জীদের বাহিনী দুই দিক থেকে অগ্রসর হয়ে একটি চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য কোনিয়ার উত্তরে অবস্থিত আনাতোলিয়ার মধ্যবর্তী শহর আঙ্কারায় সমবেত হতে শুরু করল [৭], যার বিশালতার কারণে সেখানে একটি বড় বাহিনীকে রাখার সুযোগ ছিল এবং আশেপাশের বিস্তীর্ণ মালভূমিতে দুটি বড় বাহিনীর লড়াইয়ের জন্য অনেক বড় ময়দান ছিল।

বায়জীদ যদি সেখানেই অবস্থান করে তৈমুরের জন্য অপেক্ষা করতেন এবং নিজের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পন্ন করে রাখতেন, তবে তা তার জন্য ভালো হতো। তৈমুরের দিকে অগ্রসর হয়ে তাকে আরও এলাকা ধ্বংস করা থেকে বিরত রাখার চিন্তাটি ছিল তাড়াহুড়ো ভিত্তিক, কারণ তৈমুর যদি উত্তর-পশ্চিমের দিকে অগ্রসর হয়ে আরও দু-একটি শহর ধ্বংসও করে দিতেন, তবুও উসমানীয়দের মূল বাহিনী নিরাপদ থাকত যা এই ক্ষতির প্রতিশোধ খুব দ্রুত নিতে পারত। বায়জীদ এই বিষয়টি উপেক্ষা করেছিলেন এবং তৈমুর এটি মাথায় রেখেছিলেন। তিনি বায়জীদের দিকে অগ্রসর না হয়ে বরং তার বাহিনীকে ক্লান্ত করার কৌশল অবলম্বন করেন এবং বারবার নিজের অবস্থান পরিবর্তন করতে থাকেন। তিনি আগে থেকেই পথের নদী, নালা, সেতু এবং পাহাড় সম্পর্কে পূর্ণ তথ্য রাখতেন এবং কোথাও এমন সুযোগ দেননি যাতে প্রতিপক্ষের বাহিনী তার ওপর পেছন থেকে বা ডানে বা বামে থেকে আক্রমণ করতে পারে। [৮]

[১] ইনবাইল গুমর: ২/২২৫; আখবারুদ দুওয়াল: ৩/১৮

[৩] তারিখে উসমানি: ১/৩৫১

[৫] আজাইবুল মাকদুর, পৃ. ২৬৬

[৭] তারিখে উসমানি: ১/৩৫১

[২] ইনবাইল গুমর: ২/২২৫

[৪] ইনবাইল গুমর: ২/২২৫

[৬] মানাম তৈমুর জাহাঙ্কুশা, পৃ. ৩৮১

[৮] মানাম তৈমুর জাহাঙ্কুশা, পৃ. ৩৮৩

কমাখের ওপর তৈমুরের দখল:

কুনিয়া থেকে আঙ্কারার দিকে না গিয়ে তৈমুর আনাতোলিয়ার দক্ষিণ ও পূর্বের সেই জেলাগুলোর মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেন যা তিনি তাঁর পূর্ববর্তী অভিযানে জয় করেছিলেন। শাওয়াল ৮০৪ হিজরি (মে ১৪০২ খ্রিষ্টাব্দ) মাসে তিনি আরজিনজান থেকে আধা মঞ্জিল দূরে ফোরাত নদীর তীরে অবস্থিত “কমাখ” দুর্গে গিয়ে পৌঁছান [১], যা এর চারপাশের অত্যন্ত গভীর খাদের কারণে অপরাজেয় বলে বিবেচিত হতো। তৈমুরের পঙ্গপাল সদৃশ বিশাল বাহিনী পাথর ও শিলাখণ্ড দিয়ে খাদগুলো ভরাট করে ফেলে এবং বারো দিনের অবরোধের পর দুর্গটি জয় করে নেয়। [২]

আঙ্কারা থেকে পূর্ব আনাতোলিয়ার দিকে বায়েজিদের যাত্রা এবং তৈমুরের কৌশল:

বায়েজিদ যখন এটি জানতে পারলেন, তখন তিনি সামনে এগিয়ে গিয়ে “আলা দাগ”-এর পাহাড়ি এলাকায় গিয়ে ব্যূহ রচনা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কারণ পাহাড়ি এলাকায় পদাতিক বাহিনী অশ্বারোহীদের চেয়ে ভালো লড়াই করতে পারে এবং উসমানীয় বাহিনীতে পদাতিক সৈন্যই বেশি ছিল, যেখানে তৈমুরের কাছে ছিল বেশিরভাগ অশ্বারোহী। কিছু অভিজ্ঞ আমীর তাঁকে আপাতত সামনে এগোতে নিষেধ করেন এবং পরামর্শ দেন যে, প্রথমে তৈমুরের শিবিরের চারপাশ ঘেরাও করে তাঁকে তাঁর সাহায্যকারীদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হোক। এরপর তাঁর ওপর আক্রমণ করা হোক।

তবে বায়েজিদ নিজের শক্তির ওপর ভরসা করে এই পরামর্শকে কোনো গুরুত্ব দেননি এবং প্রচুর ধন-সম্পদ আঙ্কারায় রেখে আনাতোলিয়ার পূর্ব দিকে যাত্রা করেন, যেখানে তৈমুর “সিওয়াস” ও “তোকাত”-এর মধ্যবর্তী স্থানে তারু গেড়ে অবস্থান করছিলেন। তৈমুর যদি এখান থেকে পশ্চিম দিকে কিছুটা অগ্রসর হতেন, তবে তিনি এমন এক এলাকায় চলে আসতেন যেখানে আশেপাশে উসমানীয়দের অনেকগুলো দুর্গ ছিল এবং সেখানে তাঁকে ঘেরাও করা সম্ভব হতো। তৈমুর বিষয়টি বুঝতে পারেন এবং আর সামনে এগোনোর ভুল করেননি। তিনি বায়েজিদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। যখন তিনি খবর পেলেন যে বায়েজিদের বাহিনী মাত্র কয়েক দিনের দূরত্বের মধ্যে রয়েছে, তখন তিনি হঠাৎ তাঁর বিশাল বাহিনীসহ ময়দান ছেড়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে চলে যান। বায়েজিদ সিওয়াসে পৌঁছে দেখলেন যে শত্রু ময়দান ছেড়ে চলে গেছে।

এই সময়ের মধ্যে তৈমুর কায়সারিয়া পৌঁছে যান, যেখান থেকে তিনি উত্তর-পশ্চিম দিকে মুখ করে আঙ্কারার দিকে অভিযান শুরু করেন। [৩] কিন্তু তৈমুর এখন এই চিন্তায় পড়ে গেলেন যে, পেছনে বায়েজিদের বাহিনীর কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না, আবার সামনে থেকেও উসমানীয়দের অন্য কোনো বাহিনী বাধা দিচ্ছে না। কেন এমন হচ্ছে? বায়েজিদ কি তাঁকে ওত পেতে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করছেন? তৈমুরের ডান দিক থেকে বায়েজিদের আক্রমণের ভয় ছিল না, কারণ সেই দিকে ছিল কিজিল ইর মাক নদী, যার তীর ঘেঁষেই তিনি সফর করছিলেন। তবে যখনই বাহিনী কোনো পাহাড়ি এলাকা দিয়ে অতিক্রম করত, তৈমুর তাঁর বাহিনীকে অত্যন্ত সতর্ক করে দিতেন এবং নিজেও চারদিকে নজর রাখতেন। [৪] এই পুরো পথটি ছিল সবুজ-শ্যামল এবং পানির কোনো অভাব ছিল না। তাই তৈমুরের বাহিনী খুব সহজেই তাদের লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। [৫]

[১] আজায়িবুল মাকদুর, পৃ. ২৫৬ থেকে ২৫৮

[২] তারিখে উসমানি: ১/৩৫২

[৩] তারিখে উসমানি: ১/৩৫২, ৩৫৩

[৪] তারিখে উসমানি: ১/৩৫৩

[৫] আজায়িবুল মাকদুর, পৃ. ২৬৮

আক্ষারার যুদ্ধক্ষেত্র

এদিকে বায়েজিদ সংবাদ পেয়েছিলেন যে শত্রু আক্ষারার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বায়েজিদের জন্য উপযুক্ত ছিল তৈমুরের পিছু ধাওয়া করার পরিবর্তে, তার সমস্ত সীমান্ত বাহিনীকে বিভিন্ন দিক থেকে আক্ষারার দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেওয়া এবং তৈমুরের সাহায্য ও রসদ সরবরাহের পথ বন্ধ করে তার বাহিনীকে দুর্বল করে দেওয়া। কিন্তু বায়েজিদ আক্ষারাকে বিপদের মুখে দেখে অস্থির হয়ে পড়লেন। তিনি ভয় পাচ্ছিলেন যে আক্ষারাতেও অন্যান্য শহরের মতো গণহত্যা চালানো হবে এবং মানুষের ওপর কিয়ামত নেমে আসবে। তিনি দেরি না করে আক্ষারার দিকে যাত্রা শুরু করলেন।

ওদিকে তৈমুর আক্ষারায় পৌঁছে পূর্ণ শক্তিতে প্রাচীরে আক্রমণ করতে শুরু করেন, অন্যদিকে কেল্লাদার ইয়াকুব বেগ বীরত্বের সাথে প্রতিরোধ করছিলেন। তৈমুর শহরের উত্তর-পশ্চিম দিক দখল করে শহরের পথগুলো বন্ধ করার চেষ্টা শুরু করেন যাতে বায়েজিদ পৌঁছানোর আগেই তিনি আক্ষারা দখল করে নিতে পারেন। তার ধারণা ছিল যে বায়েজিদ তার পিছু পিছু সেই মহাসড়ক দিয়েই আক্ষারায় পৌঁছাবেন যে পথে মোগলরা ভ্রমণ করেছে, ফলে বায়েজিদের আক্ষারায় পৌঁছাতে আরও কয়েক দিন সময় লাগবে।

কিন্তু বায়েজিদ একটি অপরিচিত পথ অবলম্বন করে, যা “কেল্লা চক” এবং “রাওয়ালি” হয়ে আসত, অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছিলেন। এক সন্ধ্যায় তিনি হঠাৎ আক্ষারার উত্তর-পূর্ব দিক থেকে আবির্ভূত হলেন এবং চুবুক উপত্যকার “কাসবা মালিক শাহ”-এর সামনে তারু স্থাপন করলেন। বায়েজিদকে এভাবে হঠাৎ আবির্ভূত হতে দেখে তৈমুরি বাহিনীতে হুলস্থূল পড়ে গেল। তৈমুর অবিলম্বে শহর থেকে সৈন্য সরিয়ে নিলেন। বায়েজিদের অফিসাররা পরামর্শ দিলেন যে শত্রু সামলে ওঠার আগেই এখনই তাদের ওপর নৈশকালীন আক্রমণ (শবখুন) চালানো হোক, কিন্তু বায়েজিদ একজন মর্যাদাবান প্রতিপক্ষের মতো বিরোধী পক্ষকে প্রস্তুতির পূর্ণ সুযোগ দিলেন। এভাবে তিনি শত্রুর মাথার ওপর হঠাৎ পৌঁছে যে মনস্তাত্ত্বিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন, তা হ্রাস পেল এবং তৈমুর যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পন্ন করার জন্য যথেষ্ট সময় পেয়ে গেলেন। [১]

তৈমুর তার বাহিনীর চারপাশে একের পর এক তিনটি পাহারাদার দল নিযুক্ত করলেন। অফিসারদের বললেন যেন তারা সতর্ক ও সজাগ থাকেন কারণ শত্রু রাতে নৈশকালীন আক্রমণ করতে পারে। সৈন্যদের নির্দেশ দিলেন যেন তারা অবিলম্বে ঘুমিয়ে পড়ে যাতে পূর্ণ বিশ্রাম নিতে পারে এবং পরের দিন কোনো ক্লান্তি অনুভব না করে ঘুম থেকে জেগে ওঠে। [২]

তৈমুর তখনও জানতেন না যে বায়েজিদের কাছে কত সৈন্য আছে এবং তার সামরিক প্রস্তুতি কেমন। তিনি একটি দলকে নির্দেশ দিলেন যেন তারা নিঃশব্দে গিয়ে উসমানীয় বাহিনীর কিছু টহলরত সৈন্যকে ধরে নিয়ে আসে যাতে তাদের কাছ থেকে কিছু তথ্য বের করা যায়। তবে কিছুক্ষণ পর তিনি জানতে পারলেন যে সেই দলটি তাদের বেশ কয়েকজন সৈন্যকে হারিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছে। তৈমুর বুঝতে পারলেন যে প্রতিপক্ষ পুরোপুরি সতর্ক। তিনি তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন:

[১] তারিখ-ই-উসমানি: ১/ ৩৫২, ৩৫৩

[২] মানাম তৈমুর জাহানগুশা, পৃ. ৩৮৩

“সেই রাতে আমি কয়েকবার আমার তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলাম এবং কান পেতে রইলাম কিন্তু কোনো শব্দ শুনতে পেলাম না। চারদিকে অন্ধকার ছিল। আকাশে নক্ষত্ররাজি জ্বলজ্বল করছিল। আমি মনে মনে নক্ষত্রদের সম্বোধন করে বললাম: হতে পারে আগামীকাল তোমরা এই ময়দানেই আমার লাশ দেখতে পাবে। তবুও আমার মনে মৃত্যুর বিন্দুমাত্র ভয় ছিল না।” [১]

তৈমুর সারা রাত জেগে রইলেন এবং পুরো রাত ইবাদত ও বিজয়ের দোয়ায় কাটিয়ে দিলেন। [২]

অন্যদিকে বায়েজিদের বাহিনীর অবস্থা খুব একটা ভালো ছিল না। তারা একটি অপরিচিত দুর্গম পাহাড়ি পথে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে একটানা সফরের কারণে মারাত্মকভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া তারা তৃষ্ণার্তও ছিল কারণ সেই পথে পানির বেশ অভাব ছিল। অথচ তৈমুরের বাহিনী ছিল সম্পূর্ণ সতেজ এবং পানির উৎসগুলোও তৈমুরি বাহিনীর দখলে ছিল। [৩]

উভয় বাহিনীর তুলনা এবং প্রথম দিনের যুদ্ধ:

১৫ জিলহজ ৮০৪ হিজরি (২৮ জুলাই ১৪০২ খ্রিস্টাব্দ) তারিখে উভয় বাহিনী মুখোমুখি হলো। [৪]

এই ময়দানটি পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত ছিল। তৈমুরের বাহিনী ময়দানের পূর্ব অংশে ছিল এবং বায়েজিদের বাহিনী ছিল পশ্চিম দিকে। [৫]

ইতিহাসের এই অবিস্মরণীয় যুদ্ধের সময় বায়েজিদের বয়স ছিল ৪৭ বছর, তার বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল এক লক্ষ বিশ হাজার। তার তরুণ পুত্ররা তার সাথেই ছিল। [৬] অন্যদিকে ৬৭ বছর বয়সী অভিজ্ঞ ও পোড়খাওয়া তৈমুর লং তিন লক্ষ সৈন্য নিয়ে ময়দানে উপস্থিত ছিলেন। সংখ্যাগত দিক থেকে তৈমুরের বাহিনী বায়েজিদের বাহিনীর ওপর স্পষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব রাখত। [৭]

তৈমুর যুদ্ধের আগে এই বিশাল ময়দান পরিদর্শন করার সময় বায়েজিদকে অল্লবুদ্ধি সম্পন্ন মনে করছিলেন। তিনি লিখেছেন:

“আমি বায়েজিদের ভুলের ওপর অবাক হচ্ছিলাম যে, সে কীভাবে এই সমতল ময়দানে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিল। সে জানে যে...”

[১] মনম তৈমুর জাহাঙ্গুশা, পৃ. ৩৮৩।

[২] তারিখ-ই-উসমানি: ১/৩৫৩-এর টীকা, জাফরনামার বরাতে।

[৩] ইনবাইল গুমর: ২/২২৮; আজায়িবুল মাকদুর, পৃ. ২৬৯।

কিছু বর্ণনা অনুযায়ী, বায়েজিদ নিজের নির্লিপ্ততা প্রদর্শনের জন্য যুদ্ধের একদিন আগে বাহিনীকে শিকারে নিয়ে গিয়েছিলেন যেখানে পানির খুব অভাব ছিল, ফলে তৃষ্ণার কারণে পাঁচ হাজার উসমানি সৈন্য মারা যায় এবং যারা বেঁচে ছিল তাদের অবস্থাও শোচনীয় হয়ে পড়ে। এরপর শিকার থেকে ফিরে তিনি দেখলেন যে তৈমুর তার শিবিরের ওপর দখল করে নিয়েছেন এবং যে ঝরনা থেকে তার বাহিনী পানি সংগ্রহ করতে পারত, তৈমুর সেটির গতিপথও ঘুরিয়ে দিয়েছেন। তাই বায়েজিদকে বাধ্য হয়ে ক্লান্ত-শ্রান্ত এবং তৃষ্ণায় কাতর বাহিনী নিয়ে তৈমুরের সাথে যুদ্ধ করতে হয়। (তারিখ-ই-দাওলাত-ই-উসমানিয়া: ১/১৬৯, আকবর শাহ নজীবাবাদীও তার “তারিখ-ই-ইসলাম”-এ এটিই উদ্ধৃত করেছেন)। এই বর্ণনাটি অবাস্তব মনে হয়। বায়েজিদের মধ্যে তড়িঘড়ি করার প্রবণতা অবশ্যই ছিল কিন্তু তিনি এতটাও নির্বোধ ছিলেন না যে যুদ্ধের চরম মুহূর্তে শিবির এবং পানির উৎস শত্রুর সামনে অরক্ষিত রেখে শিকারে বেরিয়ে যাবেন। তাছাড়া এই বর্ণনার নির্ভরযোগ্যতাও অত্যন্ত সন্দেহজনক। অনেক খোঁজাখুঁজি সত্ত্বেও আরব, ফারসি এবং তুর্কি ঐতিহাসিকদের কারো কাছে এমন কোনো বর্ণনা পাওয়া যায়নি। দৃশ্যত এই বর্ণনাটি প্রাচ্যবিদদের (Orientalists) কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে এবং সম্ভবত এটি বানোয়াট। হ্যাঁ, উসমানি বাহিনীর ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত হওয়ার কথা স্বয়ং আরব ও তুর্কি ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করেছেন এবং এর কারণ হিসেবে বলেছেন যে বায়েজিদ পানিশূন্য মরু পথ বেছে নিয়েছিলেন এবং ওদিকে আঙ্কারায় তৈমুর পানির উৎসগুলোর ওপর দখল করে নিয়েছিলেন। সুতরাং এমতাবস্থায় যখন উসমানি বাহিনী আগে থেকেই ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত ছিল এবং সামনে শত্রু প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, তখন এটি অত্যন্ত অসম্ভব যে বায়েজিদ তার সৈন্যদের অবস্থাকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে তাদের শিকারের নিরর্থক দৌড়ঝাঁপে ক্লান্ত করে আরও শোচনীয় অবস্থায় ফেলবেন।

[৪] তারিখ-ই-উসমানি: ১/৩৫৩।

[৫] মনম তৈমুর জাহাঙ্গুশা, পৃ. ৩৮৫।

[৬] তারিখ আদ-দাওলাত আল-উসমানিয়া, ইলমাজ: ১/১১০।

[৭] তারিখ আদ-দাওলাত আল-উসমানিয়া, ইলমাজ: ১/১১০..... কিছু বর্ণনায় এই সংখ্যা পাঁচ লক্ষ এবং কিছু বর্ণনায় আট লক্ষ পর্যন্ত বলা হয়েছে।

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

আমার বাহিনী অশ্বারোহী। অশ্বারোহীদের যুদ্ধের জন্য সমতল ময়দান সর্বোত্তম। পাহাড়ি এলাকায় অশ্বারোহী বাহিনী অকার্যকর হয়ে পড়ে এবং স্বাধীনভাবে যুদ্ধ করতে পারে না। হ্যাঁ, সমতল ময়দানে অশ্বারোহীরা সবদিকে যেতে পারে এবং শত্রুর মাথা গুঁড়িয়ে দিতে পারে। [১]

তবে বায়েজিদ নির্বোধ ছিলেন না। তিনি এই ময়দানকে শত্রুর কবরস্থানে পরিণত করার জন্য এক অদ্ভুত কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। তিনি শত শত এমন রথ তৈরি করেছিলেন যেগুলোর সামনে কাস্তুর মতো একটি পাখা লাগানো ছিল। যখন রথ চলত, তখন এই ধারালো পাখাটি ঘূর্ণনের মাধ্যমে সামনে আসা সবকিছু কেটে ফেলত। প্রতিটি গাড়িতে বেশ কয়েকজন সৈন্যও সওয়ার ছিল যারা একটি মজবুত আড়ালের পেছনে লুকিয়ে থাকত এবং স্প্রিংযুক্ত আধুনিক ইস্পাত নির্মিত ধনুক দ্বারা সজ্জিত ছিল, যেখান থেকে তিন ইঞ্চি লম্বা ফলাযুক্ত তীর নিক্ষেপ করা হতো।

যুদ্ধ শুরু হতেই বায়েজিদের বাহিনী একটি বিশাল ধনুকের আকৃতি ধারণ করল। এই ধনুকের দুই প্রান্তে এই মরণঘাতী রথগুলো এমনভাবে অগ্রসর হচ্ছিল যেন তারা তৈমুরের বাহিনীর দুই পাশ দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে পেছনে গিয়ে একে অপরের সাথে মিলিত হতে চায়। এই রথগুলোর সামনে অশ্বারোহী বা পদাতিক কেউই টিকতে পারছিল না। তারা তৈমুরের বাহিনীকে এমনভাবে কাটছিল যেন কাস্তুর দিয়ে ফসল কাটা হচ্ছে। রথারোহী তীরন্দাজদের স্প্রিংযুক্ত ধনুকের তীরগুলো এত শক্তিশালীভাবে নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল যে, যাকে স্পর্শ করত তাকেই চিরে ফুঁড়ে বেরিয়ে যেত। [২]

তৈমুর যখন এই দৃশ্য দেখলেন তখন তিনি হতভম্ব হয়ে গেলেন। তিনি লিখছেন:

“যখন যুদ্ধ শুরু হলো তখন আমি বুঝতে পারলাম যে বায়েজিদ নয় বরং আমি নিজেই নির্বোধ। আমি বুঝতে পারলাম যে ফাঁদকে আমি ভয় পাচ্ছিলাম, এটি সেই ফাঁদই ছিল। আমার ধারণা ছিল যে শাহে রুম আমাকে কোনো পাহাড়ি এলাকা বা সংকীর্ণ গিরিপথে নিয়ে গিয়ে অতর্কিত হামলার লক্ষ্যবস্তু বানাবেন যাতে আমার বাহিনীকে ধ্বংস করতে পারেন, কিন্তু তিনি আমাকে আক্ষারার বিশাল ময়দানে ঘিরে ফেলেছেন যাতে নিজের রথগুলোকে ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারেন।” [৩]

তৈমুর তীব্র আশঙ্কার সম্মুখীন হলেন যে, ধনুকের মতো ছড়িয়ে পড়া উসমানীয় বাহিনী যদি তাদের পেছনেও পৌঁছে যায়, তবে তিনি পূর্ণ অবরোধের মুখে পড়ে পরাজিত হবেন। তিনি তার অফিসারদের নির্দেশ দিলেন যে তারা যেন যেকোনো মূল্যে বায়েজিদের বাহিনীকে পেছনে আসা থেকে বিরত রাখে। এই উদ্দেশ্যে তৈমুরের নির্দেশে পেছন দিক থেকে আসা রথগুলোকে থামানোর জন্য সেগুলোর ওপর মিনজানিকের মাধ্যমে বারুদের হাঁড়ি নিক্ষেপ করে সেগুলোকে জ্বালিয়ে দেওয়া হলো, অন্যদিকে সামনের দিক থেকে আক্রমণকারী রথগুলোর সামনে শিকল, তক্তা, পেরেক এবং খুঁটির সাথে বাঁধা দড়ি দিয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হলো। এছাড়া...

[১] মানাম তৈমুর জাহাঙ্কুশা, পৃ. ৩৮৫

[২] মানাম তৈমুর জাহাঙ্কুশা, পৃ. ৩৮৫... স্পষ্টতই এই রথগুলো রাতারাতি তৈরি করা হয়নি। নিশ্চিতভাবেই কয়েক মাস আগে থেকেই এগুলোর নির্মাণ কাজ চলছিল এবং বায়েজিদ সেগুলোকে কোথাও লুকিয়ে রেখেছিলেন। তৈমুরের গোয়েন্দারা অবশ্যই খুব সক্রিয় ছিল কিন্তু বায়েজিদের কিছু চাল সম্পর্কে তারাও অবগত হতে পারেনি। এ থেকে বোঝা যায় যে বায়েজিদ সম্পর্কে এই ধারণা একেবারেই সঠিক নয় যে তিনি অনভিজ্ঞ এবং অদূরদর্শী ছিলেন। হ্যাঁ, তার পক্ষ থেকে কিছু ভুল অবশ্যই হয়েছিল এবং সেগুলোই তার পরাজয়ের কারণ ছিল।

[৩] মানাম তৈমুর জাহাঙ্কুশা, পৃ. ৩৮৫

রথগুলোকে অকেজো করার ক্ষেত্রে রশি নিক্ষেপকারীরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তারা রথগুলোর সামনে লাগানো পাথার ওপর রশি নিক্ষেপ করে সেগুলোর ঘূর্ণন থামিয়ে দিত। তা সত্ত্বেও বায়জিদের রথগুলো তৈমুরের বাহিনীকে মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতি পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছিল। [১]

এই দিনের লড়াইয়ে তৈমুরের রণকৌশল ছিল রক্ষণাত্মক। তার পুরো মনোযোগ এই রথগুলো থেকে বাঁচা এবং সেগুলোকে অকেজো করার ওপর নিবদ্ধ ছিল। তিনি এটা বুঝতে পেরেছিলেন যে, উসমানীয় বাহিনীর আসল শক্তি হলো এই রথগুলো। যদি এগুলোকে ধ্বংস করে দেওয়া যায়, তবে বিজয় শীঘ্রই পদচূষন করবে। এই দিন তৈমুর নিজে লড়াইয়ে শরিক হননি, বরং এক পাশে থেকে বাহিনীকে নির্দেশনা দিতে থাকেন। সন্ধ্যা হতেই তিনি বাহিনীকে পিছিয়ে নিয়ে ছাউনিতে প্রবেশ করান, যার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পরিখা, বাঁধ এবং বাংকারের মাধ্যমে সুদৃঢ় করা হয়েছিল। তবে তৈমুরের প্রবল আশঙ্কা ছিল যে, বায়জিদ রথগুলোর মাধ্যমে রাতে পুনরায় আক্রমণ করবেন। যদি এমনটা হতো, তবে তৈমুরের পরাজয় ছিল সুনিশ্চিত; কারণ তার প্রস্তুতকৃত সেই বারুদ শেষ হয়ে গিয়েছিল যা দিয়ে রথগুলোকে জ্বালানো হয়েছিল। তৈমুরের ভাগ্য যে, বায়জিদ নৈশকালীন অতর্কিত হামলার প্রয়োজন মনে করেননি, বরং একজন দূতের মাধ্যমে তৈমুরকে একটি সতর্কতামূলক বার্তা পাঠানোর ওপরই সন্তুষ্ট থাকেন, যাতে বলা হয়েছিল:

“তোমাদের জন্য এটাই ভালো যে সকালে ফিরে যাও, অন্যথায় আগামীকাল আমরা এর চেয়েও অনেক বেশি যুদ্ধ-রথ মোকাবিলায় নিয়ে আসব।” [২]

আলাপ-আলোচনা এবং সময় অতিবাহিত করা:

দ্বিতীয় দিন প্রবল বৃষ্টি শুরু হলো, তৈমুরের বাহিনীর পেছনে কিজিল ইরমাক নদী প্রবাহিত হচ্ছিল, তাতে বন্যার মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো। তৈমুর আবারও বিপদের আশঙ্কা করলেন যে, যদি বায়জিদ এই অবস্থায় আক্রমণ করে বসেন তবে তার বাহিনী বন্যার কবলে পড়ে যেতে পারে; তবে উসমানীয় বাহিনী বৃষ্টি থেকে বাঁচতে নিজেদের তাঁবুতেই অবস্থান করছিল, যা তুলনামূলকভাবে নিরাপদ ছিল।

তৃতীয় দিন আবহাওয়া মনোরম হয়ে উঠল এবং সূর্য উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিল। কিন্তু সেই দিনও বায়জিদ আক্রমণ করলেন না, কারণ তিনি আরও রথের অপেক্ষায় ছিলেন যা কারখানা থেকে তৈরি হয়ে খুব শীঘ্রই তার কাছে পৌঁছানোর কথা ছিল। তিনি আবারও দূত পাঠিয়ে তৈমুরকে প্রস্তাব দিলেন যে, তিনি যেন পূর্ণ ধ্বংস থেকে বাঁচতে ফিরে যান, তাকে নিরাপদ পথ দেওয়া হবে।

তৈমুরের বারুদ প্রস্তুত করার জন্য কিছু সময়ের প্রয়োজন ছিল, তাই তিনি আলাপ-আলোচনার সিলসিলা দীর্ঘ করে দুই দিন অতিবাহিত করলেন। এই সময়ের মধ্যে তার কারিগররা প্রচুর পরিমাণে বারুদ তৈরি করে ফেলল, যা উসমানীয় রথগুলো ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট ছিল। এই প্রস্তুতির পর তৈমুর আবারও ময়দানে নামলেন। তিনি বাহিনীকে জানিয়ে দিলেন যে, আজ চূড়ান্ত ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত আক্রমণ অব্যাহত থাকবে, পিছিয়ে আসার কোনো প্রশ্নই নেই। [৩]

চূড়ান্ত যুদ্ধের দিন:

এটি ছিল ১৯ জিলহজ ৮০৪ হিজরি (১ আগস্ট ১৪০২ খ্রিস্টাব্দ)। চূড়ান্ত যুদ্ধের দিন। [৪] বায়জিদও পুরোপুরি প্রস্তুত ছিলেন। তিনি ডান বাহতে আনাতোলিয়ার বাহিনীকে রাখলেন, যাদের সাথে তাতার সৈন্যরাও ছিল। এই সারির শেষ প্রান্তে তীরন্দাজদের...

[১] মানাম তৈমুর জাহাঙ্গুশা, পৃ. ৩৮৬, ৩৮৭

[২] মানাম তৈমুর জাহাঙ্গুশা, পৃ. ৩৮৯

[৩] মানাম তৈমুর জাহাঙ্গুশা, পৃ. ৩৮৯ থেকে ৩৯২

[৪] তারিখ-ই-উসমানি: ১/৩৫২

দলগুলো ছিল— বায়েজিদের সেনাপতি শাহজাদা স্টিফেনও ডান পার্শ্বে ছিলেন যার নেতৃত্বে ইউরোপের করদ রাজ্যগুলোর বিশ হাজার সৈন্য ছিল। বাম পার্শ্বের নেতৃত্বে ছিলেন শাহজাদা সুলাইমান পাশা যাকে রুমেলির বাহিনী দেওয়া হয়েছিল, এই বাহিনীগুলোর পেছনে সারুখান, কারাসি এবং আইদিনের বাহিনীগুলো তাদের সমর্থন দিচ্ছিল।

কেন্দ্রে উজির-এ-আজম জানদারলি আলী পাশার সাথে বায়েজিদের পুত্ররা: ঈসা, মুসা এবং মোস্তফার বাহিনী ছিল যখন শাহজাদা মুহাম্মদ (হাকিম আমাসিয়া) তার বন্ধুদের সাথে পেছনে রসদ ভাঙারের দায়িত্বে ছিলেন।

বায়েজিদ নিজে কাসবা মালিক শাহ-এর একটি উঁচু টিলার ওপর ছিলেন এবং ইয়েনি চেরি জোয়ানরা তাকে তাদের নিরাপত্তা বেষ্টনীতে রেখেছিল। ইয়েনি চেরির সামনে দ্রুতগামী পদাতিক সৈন্যদের দল ছিল যাদের ‘আজাব’ বলা হতো। [১]

অন্যদিকে তৈমুরের ডান পার্শ্ব শাহজাদা মিরান শাহ এবং আমির মুহাম্মদ সুলতানের কমান্ডে ছিল। বাম পার্শ্বে শাহজাদা শাহ রুখ, খলিল সুলতান এবং কিছু আমির নিযুক্ত ছিলেন। তৈমুর অত্যন্ত যুদ্ধ-অভিজ্ঞ সৈন্যদের চল্লিশটি বিশেষ দল নিজের কমান্ডে রেখেছিলেন। লশকর বা বাহিনীর সামনের অংশে ৩২টি হাতি ছিল। [২]

সূর্য উদিত হতেই যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল এবং আলম-এ-ইসলামের দুটি বিশাল বাহিনী একে অপরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এটি ছিল পূর্ব ও পশ্চিমের দুই মহান বাদশাহর মধ্যকার যুদ্ধ। মনে হচ্ছিল যেন দুটি পাহাড় একে অপরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। উভয় পক্ষই জীবন বাজি রেখে চরম যুদ্ধ শুরু করল। মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে লাগল, লাশের স্তুপ জমে গেল, বাতাসে রক্তের ফোয়ারা ছুটছিল এবং দুপুর নাগাদ ধূসর মাটি লাল হয়ে গিয়েছিল।

আজ বায়েজিদের রথগুলো কোনো কাজে আসতে পারেনি কারণ তৈমুরের অগ্নি-নিষ্ক্ষেপকারীরা বিপুল পরিমাণ বারুদ বর্ষণ করে সেগুলোকে জ্বালিয়ে দিয়েছিল। [৩] এখন প্রথাগত অস্ত্র দিয়েই যুদ্ধের ফয়সালা হতে হতো, ফলে উভয় বাহিনী একে অপরের সাথে ভয়াবহভাবে মিশে গেল। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত যুদ্ধ পূর্ণ তীব্রতার সাথে চলতে থাকল। বায়েজিদ তার ইয়েনি চেরি দলগুলোর সাথে তৈমুরি কেন্দ্রের আক্রমণাত্মক হামলাগুলোকে চরমভাবে ব্যর্থ করে দিচ্ছিলেন এবং প্রতিবারই শত্রু পিছু হটতে বাধ্য হচ্ছিল।

এমন পরিস্থিতিতে তৈমুর সিদ্ধান্ত নিলেন যে প্রথমে প্রতিপক্ষের ডান ও বাম পার্শ্বকে কেন্দ্র থেকে আলাদা করা হোক। তৈমুরের নিজের ডান পার্শ্ব অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল এবং নদীর আড়ালে থাকার কারণে একেবারে নিরাপদ ছিল। এর বিপরীতে উসমানীয়দের বাম পার্শ্ব ছিল যার কমান্ড শাহজাদা সুলাইমান করছিলেন, এর সামনের সারিতে রুমেলি এবং পেছনের সারিতে তাতার তীরন্দাজরা ছিল। তৈমুর তার অধিকাংশ শক্তি এই দিকে লাগিয়ে দিলেন, তা সত্ত্বেও দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত মোগলদের কোনো সুবিধা হলো না।

তবে এই সময়ে সুলাইমানের অধীনে থাকা তাতার দলগুলো যারা তৈমুরের সাথে আঁতাত করেছিল, হঠাৎ তারা রুমেলি দলগুলোর পিঠে তীর বর্ষণ শুরু করল। এভাবে শাহজাদা সুলাইমান দ্বিমুখী হামলার মুখে পড়ে পিছু হটতে বাধ্য হলেন।

[১] তারিখ-এ-উসমানি: ১/৩৫৫, ৩৫৬

[২] তারিখ-এ-উসমানি: ৩৫৬/১

[৩] মানাম তৈমুর জাহাঙ্গুশা, পৃ. ৩৯২

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

ওদিকে বায়েজিদের ডান বাহু, যাতে বিশ হাজার সার্বীয় সৈন্য ছিল, তৈমুরের বাম বাহুর ওপর জোরালো আক্রমণ করে তাদের পেছনে হটিয়ে দিয়েছিল। মঙ্গোলদের পেছনের সারিগুলো তাদের পিছু হটা বাহিনীকে শক্তি জোগানোর অনেক চেষ্টা করেছিল কিন্তু তারা সফল হয়নি এবং মঙ্গোলদের বাম বাহু তখনই হয়ে গিয়েছিল। তৈমুর এই পরিস্থিতিতে অত্যন্ত বিচলিত ছিলেন, তবে সেই মুহূর্তে তার দুশ্চিন্তা দূর হয়ে গেল যখন তাতার বাহিনী বিশ্বাসঘাতকতা করল এবং আনাতোলিয়ার বাহিনীগুলো বায়েজিদকে একা ফেলে তৈমুরের বাহিনীর সাথে যোগ দিল। এই দুরবস্থা সত্ত্বেও সার্বীয় সৈন্যরা দীর্ঘক্ষণ বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে থাকে, এমনকি তৈমুরও তাদের প্রশংসা করতে বাধ্য হন। যাই হোক, এই বিপর্যয়ের মুখে শেষ পর্যন্ত উসমানীয়দের ডান বাহুকেও পিছু হটতে হলো [১]।

এই অবস্থা দেখে বায়েজিদের উজির-এ-আজম আলী পাশা এবং অন্যান্য আমিররা তাকে পরামর্শ দিলেন যে, পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাওয়ার আগেই আমাদের পিছু হটা উচিত। তবে বায়েজিদ বলেছিলেন যে, আমি অপমানের জীবনের চেয়ে সম্মানজনক মৃত্যুকে প্রাধান্য দিই [২]।

বায়াজিদ ঘেরাওয়ার মধ্যে:

বায়াজিদ সিংহের মতো অবিরাম যুদ্ধ করছিলেন এবং জানিসারি সৈন্যরা তার ডানে-বামে নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করছিল। তাদের প্রতিটি আক্রমণে মঙ্গোলদের লাশের স্তুপ জমে যাচ্ছিল, তবে তৈমুরের কাছে জনবল অনেক বেশি থাকায় সাথে সাথেই তাদের স্থলাভিষিক্ত করার মতো বিকল্প সৈন্য চলে আসত। এই সময়ে তৈমুরি বাহিনী ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে উসমানীয় বাহিনীর মূল কেন্দ্রের চারপাশ ঘিরে ফেলে বায়েজিদকে তার ডান ও বাম বাহু থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল। বায়েজিদ এখন আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করতে বাধ্য হচ্ছিলেন, তাই তিনি “চাতাল তেপে” নামক একটি উঁচু মালভূমির দিকে অগ্রসর হলেন এবং সেখানে পৌঁছে শত্রুর মোকাবিলায় অটল থাকলেন। দশ হাজার জানিসারি সৈন্য তার চারপাশে একটি লৌহবলয় তৈরি করে রেখেছিল। তৈমুর এটি দেখে তার ত্রিশ হাজার সৈন্যকে এই টিলার ওপর শেষবারের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দিলেন।

এখন মঙ্গোলরা পিঁপড়ের মতো চারদিক থেকে “চাতাল তেপে”-র ওপর চড়তে শুরু করল। এই আক্রমণে তৈমুর নিজেও শরিক ছিলেন [৩]। তিনি এক হাতে তলোয়ার এবং অন্য হাতে কুঠার নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন এবং আক্রমণ করছিলেন, যার ফলে তার বাহিনীর উৎসাহ দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিল। তবে জানিসারিদের প্রতিরোধের কোনো জবাব ছিল না। তৈমুর সেই সময় চমকে উঠলেন যখন একজন উসমানীয় সৈন্য আক্রমণ করে তার ঘোড়ার পেট তলোয়ার দিয়ে চিরে ফেলল। তৈমুর নিচে পড়ে যাওয়ার সময় ওই সৈন্যকে কুঠার দিয়ে আঘাত করে ধরাশায়ী করলেন এবং ঘোড়া পরিবর্তন করে যুদ্ধে লিপ্ত থাকলেন [৪]।

তৈমুর আহত হলেন:

এই ভয়াবহ যুদ্ধের মধ্যে এমন এক মুহূর্ত এল যখন তৈমুর ও বায়েজিদ একে অপরের মুখোমুখি হলেন এবং উভয়ের দেহরক্ষীরা একে অপরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হলো [৫]। এখানে তৈমুর জীবনের কঠিনতম মুহূর্তের সম্মুখীন হলেন। বায়েজিদের জানিসারি তীরন্দাজরা ভয়ংকরভাবে তীর বর্ষণ করে শত্রুর ব্যাপক ক্ষতি করছিল, এমন সময় একটি তীর তৈমুরের গালে বিঁধে তিনি আহত হলেন। ওদিকে বায়েজিদ...

[১] তারিখ-ই-উসমানি: ১/৩৫৬, ৩৫৭, টীকা সহ।

[২] তারিখ-ই-উসমানি: ১/৩৫৭... বায়েজিদ সেই সময় পিছু হটে আঙ্কারা শহরে অবরুদ্ধ হতে পারতেন কারণ তৈমুর আঙ্কারা জয় করতে ব্যর্থ হচ্ছিলেন, কিন্তু বায়েজিদ সম্ভবত এই কারণেও পিছু হটা থেকে বিরত ছিলেন যে তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া স্ত্রীদের তালুক দেওয়ার শপথ করেছিলেন।

[৩] তারিখ-ই-উসমানি, পৃ. ৩৫৭ টীকা সহ।

[৪] মানাম তৈমুর জাহানগুশা, পৃ. ৩৯২, ৩৯৩।

[৫] নুজহাতুল আনজার: ২/১১।

...এর এক সিপাহি তৈমুরের নলার ওপর বর্শা দিয়ে আঘাত করল। তৈমুর তৎক্ষণাৎ কুঠার চালিয়ে বর্শাধারীর কাঁধ ভেঙে দিলেন এবং অনবরত লড়াই করতে থাকলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই একজন উসমানি সিপাহির গুরজ তৈমুরের মাথায় এসে পড়ল এবং তিনি বেহঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। রক্ষীরা তাঁকে অতি কষ্টে রক্ষা করল এবং তাঁবুতে নিয়ে গেল [১]।

ওদিকে বায়েজিদের সিপাহিরা নিহত হতে থাকল এবং এখন মাত্র দুই-তিন হাজার ইয়ানি চেরি যুবক তাঁর সাথে রয়ে গিয়েছিল, যারা পূর্ণ তৎপরতার সাথে তাঁকে রক্ষা করছিল। এই সময়ে বায়েজিদ শত্রুর ঘেরাও ভেঙে নিজের ডান অথবা বাম বাহুর সেই দলগুলোর সাথে গিয়ে মিলিত হওয়ার কথা ভাবছিলেন, যারা কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত এই বিশাল ময়দানের উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে শত্রুর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। কিন্তু এখন পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। পরাজয়কে ভাগ্যের লিখন মনে করে উসমানিদের ডান বাহুর কমান্ডার শাহজাদা সুলেমান এবং শাহজাদা মুহাম্মদ চেলবি নিজেদের অফিসারদের নিয়ে ময়দান থেকে পালিয়ে যাচ্ছিলেন। বাম বাহুর সাহসী সিপাহিরা দীর্ঘক্ষণ প্রাণপণ লড়াই করেছিল, কিন্তু প্রতিরোধ নিষ্ফল দেখে কিছুক্ষণ আগে তারাও ময়দান থেকে সরতে শুরু করেছিল।

বায়েজিদ সন্ধ্যা হওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন যাতে অন্ধকারে ঘেরাও ভাঙা সহজ হয়। হঠাৎ একজন ইয়ানি চেরি অফিসার অত্যন্ত আবেগপূর্ণ ভঙ্গিতে শাহজাদাদের পলায়নের দুঃখজনক সংবাদ বায়েজিদের কাছে পৌঁছে দিলেন এবং বললেন:

“সুলতান! আপনি কেন দাঁড়িয়ে আছেন? পুরো লশকর গাদ্দারি করে ময়দান থেকে পালিয়ে গেছে।”

বায়েজিদ এ কথা শোনামাত্রই রাগে দিশেহারা হয়ে পড়লেন এবং নিজের শাহজাদাদের থামানোর জন্য কোনো দ্বিধা ছাড়াই ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। একজন ইয়ানি চেরি অফিসার ঘাবড়ে গিয়ে বললেন: “হে সুলতান! আমাদের ঘেরাওয়ের বাইরে যাবেন না।”

কিন্তু বায়েজিদ তা শুনেও না শোনার ভান করলেন এবং শত্রুর ঘেরাও চিরে পলাতক শাহজাদাদের পেছনে রওনা হলেন। ইয়ানি চেরি অফিসাররা আফসোস করতে থাকলেন। ওদিকে মুঘল অশ্বারোহীরা লাগাম টেনে বায়েজিদের পিছু নিল [২]।

বায়েজিদের গ্রেফতারি:

বায়েজিদ ছিলেন আকাশের বিদ্যুতের মতো ক্ষিপ্ৰগতির, যিনি সম্ভবত তাঁর দ্রুতগতির কারণে কারও হাতে আসতেন না। কিন্তু রজ্জু নিক্ষেপকারীরা ফাঁস ছুড়ে এই প্রখ্যাত তলোয়ারবাজকে বন্দি করার চেষ্টা শুরু করল। বায়েজিদ তাদের কোনো সুযোগই দিচ্ছিলেন না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁর ঘোড়া হোঁচট খেল। বায়েজিদ নিচে পড়ে যাওয়ার সাথে সাথেই অন্য ঘোড়ায় সওয়ার হতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু এরই মধ্যে তিনি মুঘলদের ফাঁসের কবলে পড়ে গেলেন। মুঘল সিপাহিরা তাঁকে গ্রেফতার করে নিজেদের ছাউনিতে নিয়ে গেল [৩], যেখানে আহত তৈমুরের জ্ঞান ফিরে এসেছিল। বিজয়ের আনন্দে তিনি নিজের জখমের পরোয়া করলেন না [৪]। এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বর্ণনাকারী একজন ইয়ানি চেরি সিপাহির বক্তব্য ছিল:

“আমরা দেখলাম যে মুঘলরা বায়েজিদকে গ্রেফতার করে তৈমুরের কাছে নিয়ে যাচ্ছে। যদি সুলতান আমাদের কথায় মনোযোগ দিয়ে আমাদের বৃত্ত থেকে বের না হতেন, তবে সম্ভবত গ্রেফতারি থেকে বেঁচে যেতেন। অন্ধকার ঘনিয়ে আসতেই আমরা তাঁকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতাম [৫]।”

[১] মনম তৈমুর জহাঙ্গুশা, পৃ. ৩৯৩

[২] তারিখ-এ-উসমানি: ১/৩৫৭, ৩৫৮ সাথে ঢাকা

[৩] তারিখ-এ-উসমানি: ১/৩৫৭

[৪] মনম তৈমুর জহাঙ্গুশা, পৃ. ৩৯৩, ৩৯৪

[৫] তারিখ-এ-উসমানি: ১/৩৫৭, ৩৫৮ সাথে ঢাকা, সূত্র “তওয়ারিখ-এ-আল-এ-উসমান”

একটি বর্ণনা এই যে, মুঘলরা একটি বড় কার্পেট ছুড়ে বায়েজিদকে তাতে জড়িয়ে ফেলেছিল। (মুজহাতুল আনজার: ২/১১)

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভাগ্যে যা লেখা ছিল তাই হলো এবং এই ভয়াবহ সংঘাত বায়েজিদের বন্দি হওয়ার মতো এক আক্ষেপজনক পরিণতির মাধ্যমে সমাপ্ত হলো। যুদ্ধে তৈমুরের চল্লিশ হাজার সৈন্য নিহত হয়েছিল। তার বাহিনীতে এমন ক্ষতি সে সারা জীবনে দেখেনি। [১]

আক্ষারার যুদ্ধের প্রভাব:

আক্ষারার যুদ্ধ ছিল মুসলমানদের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় লড়াই। মুসলমানদের ইতিহাসে এটি সর্বদা স্মরণীয় হয়ে থাকবে এবং এর ক্ষতের যন্ত্রণা সর্বদা অনুভূত হতে থাকবে। তৈমুর এর আগে মুসলিম বিশ্বের ওপর যে জুলুম চালিয়েছিলেন, তাও উপেক্ষা করা যায় না; কিন্তু বায়েজিদের শক্তি ভেঙে দিয়ে তিনি যে অপরাধ করেছেন তা একেবারেই ক্ষমার অযোগ্য এবং অপূরণীয়। যদি বায়েজিদের ওপর এই যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া না হতো, তবে নবম হিজরি শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে সমগ্র ইউরোপ ইসলামের পদানত হওয়া অসম্ভব ছিল না। কিন্তু এর বিপরীতে এই পরাজয় উসমানীয় সালতানাতের কাছ থেকে অর্ধ শতাব্দীর বিজিত এলাকাগুলো ছিনিয়ে নিল। কনস্টান্টিনোপলের মুমূর্ষু কায়সারতন্ত্র আরও পঞ্চাশ বছর সময় পেয়ে গেল। ঐক্যবদ্ধ আনাতোলিয়ার স্বপ্নের বাস্তবায়ন ৭০ বছর পিছিয়ে গেল। বায়েজিদ মাত্র তেরো বছরে ৪ লক্ষ ৪১ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকা জয় করে সামগ্রিকভাবে সালতানাতকে ৯ লক্ষ ৪২ হাজার বর্গকিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন। এই সমস্ত এলাকা পুনরুদ্ধারে তার উত্তরসূরিদের ১১৫ বছর সময় লেগে গেল। [২]

বায়েজিদের পরাজয় প্রকৃতপক্ষে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের পরাজয় ছিল এবং তৈমুরের বিজয় ছিল ইউরোপের বিজয়। এই পরিণতির ফলে একদিকে যেমন ইসলামি বিশ্বে দুঃখ ও বেদনার এমন তীব্র ঢেউ বয়ে গেল যার যন্ত্রণা আজ বহু শতাব্দী পরেও অনুভূত হচ্ছে, অন্যদিকে ইউরোপে আনন্দ ও উল্লাসের এমন পরিবেশ তৈরি হলো যে এই যুদ্ধের স্মৃতি আজও তাদের সতেজ করে তোলে।

ইউরোপের ইসলামি পতাকাতলে আসার এটি ছিল দ্বিতীয় বড় সুযোগ যা মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে গেল। প্রথমবার দ্বিতীয় হিজরি শতাব্দীতে ফ্রান্সের ‘বালাতুশ শুহাদা’র যুদ্ধে মুসলমানদের যে পরাজয় হয়েছিল তা ইউরোপে ইসলামের অগ্রযাত্রা থামিয়ে দিয়েছিল। সাত শতাব্দী পর বায়েজিদের যুগে মুসলমানরা দ্বিতীয়বার এমন সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু এবারও বাজি হাতছাড়া হয়ে গেল। বালাতুশ শুহাদায় মুসলমানদের পথ রুদ্ধকারী ছিল একজন অমুসলিম জেনারেল। কিন্তু এখানে স্বয়ং একজন কালিমা পাঠকারী শাসক ইসলামের প্রসারের পথ বন্ধ করে দিলেন। যদি এই যুদ্ধে তৈমুর পরাজিত হতেন বরং তিনি নিহত হতেন, তবে মুসলমানদের কোনো ক্ষতি হতো না বরং তারা একজন স্বৈরাচারী ও কঠোর শাসক থেকে মুক্তি পেত এবং বায়েজিদ ইউরোপে আরও অগ্রযাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে পারতেন। কিন্তু তার পরাজয় ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিল এবং মুসলিম বিশ্ব আজ পর্যন্ত তার ক্ষতিপূরণ করতে পারেনি। যদিও বায়েজিদের উত্তরসূরিরা কনস্টান্টিনোপল জয় করেছিলেন এবং ইউরোপে তাদের আরও বিজয় অব্যাহত ছিল, কিন্তু নিকোপোলিসের যুদ্ধে ইউরোপের ডজনখানেক দেশকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে বায়েজিদ বিজয়ের যে তুফানি পরিবেশ তৈরি করেছিলেন, তার পুনরাবৃত্তি আর কখনো সম্ভব হয়নি।

বায়েজিদের পরাজয়ের কারণসমূহ:

আমরা বায়েজিদের পরাজয়ের কারণগুলো উপেক্ষা করতে পারি না। গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, এই পরাজয়ের প্রধান কারণগুলো ছিল নিম্নরূপ:

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ: ১/ ১১০

[২] পূর্বোক্ত সূত্র অনুযায়ী

তারিখ-এ-উম্মত-এ-মুসলিমা (চতুর্থ খণ্ড)

১. বায়েজিদ তৈমুরের জুলুম দেখে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। এই অবস্থা তাকে তড়িঘড়ি করতে বাধ্য করেছিল।
২. ইউরোপে ক্রমাগত বিজয়ের কারণে তিনি অস্বাভাবিক আত্মবিশ্বাসে ভুগছিলেন। তাই তিনি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ছাড়াই যুদ্ধ শুরু করেন, ফলে একটি সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধ কোনো উন্নত যুদ্ধ পরিকল্পনা ছাড়াই জরুরি অবস্থায় লড়তে হয়েছিল।
৩. বায়েজিদের বাহিনী ছিল ক্লান্ত-শ্রান্ত। তাদের সংখ্যাও ছিল কম। তৈমুরের কাছে বায়েজিদের তুলনায় দ্বিগুণ সতেজ বাহিনী ছিল।
৪. বায়েজিদের বাহিনীতে সার্বীয় সৈন্যদের উপস্থিতি উসমানীয় তুর্কি আমিরদের মনোবল ভেঙে দেওয়ার কারণ হয়েছিল, কারণ তারা খ্রিস্টানদের সাহায্যে যুদ্ধ করাকে জাতীয় মর্যাদার পরিপন্থী মনে করতেন।
৫. উসমানীয় বাহিনীর অধিকাংশ সদস্য সর্বদা খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আসছিল। মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কোনো আগ্রহ বা অভিজ্ঞতা তাদের ছিল না। এই কারণেই তাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মুসলমানদের বিরুদ্ধে পূর্ণ উদ্দীপনা নিয়ে লড়তে পারেনি।
৬. পরাজয়ের তাৎক্ষণিক কারণ ছিল উসমানীয় বাহিনীর সেই তাতার আমিরদের বিশ্বাসঘাতকতা, যাদের অধীনে বাহিনীর একটি বিশাল অংশ ছিল।

পরাজয়ের পর আনাতোলিয়া এবং উসমানীয় শাহজাদাদের অবস্থা:

যুদ্ধের পর তৈমুর এশিয়া মাইনরে সৈন্যবাহিনী ছড়িয়ে দিয়ে বিভিন্ন স্থানে সিরিয়া ও ইরাকের মতো ধ্বংসাত্মক দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি করেন। বায়েজিদ বনু কারামান, বনু মানতাশা, বনু আইদিন, বনু সারুখানি এবং বনু হামিদসহ বিভিন্ন রাজবংশ থেকে যেসব এলাকা দখল করেছিলেন, তৈমুর সেগুলো তাদের ফিরিয়ে দিয়ে নিজের করদ রাজ্যে পরিণত করেন। শাবান ৮০৫ হিজরিতে তিনি যখন ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন বায়েজিদকে তার নারী ও দাসীদেরসহ সাথে নিয়ে যান। বায়েজিদের ছয়জন পুত্র ছিল: সুলাইমান, ঈসা, মুহাম্মদ, মুসা, মোস্তফা ও কাসিম। তাদের মধ্যে কাসিম ছিল অত্যন্ত ছোট। বাকি পাঁচজন তাদের পিতার সাথে আক্ষারার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

পরাজয়ের পর বড় ছেলে সুলাইমান পালিয়ে বুরসায় পৌঁছেছিলেন, সেখান থেকে পরিবার-পরিজনকে নিয়ে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে রাজধানী আদ্রিয়ানোপলে আশ্রয় নেন। শাহজাদা মুহাম্মদ তার আমাসিয়া দুর্গে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। মোস্তফা নিখোঁজ হয়ে যান, সম্ভবত তিনি যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন। শাহজাদা ঈসাও পালিয়ে যেতে সক্ষম হন, অন্যদিকে শাহজাদা মুসা বায়েজিদের সাথেই বন্দি ছিলেন। [১]

উসমানীয়দের জ্ঞানভাণ্ডার এবং সরকারি নথিপত্র ধ্বংস:

আনাতোলিয়ার ওপর তৈমুরের দখলের সবচেয়ে বড় ক্ষতি ছিল সেই জ্ঞানভাণ্ডারের ধ্বংসযজ্ঞ, যা কখনো পূরণ করা সম্ভব নয়। তৈমুরি বাহিনী বুরসা থেকে উসমানীয়দের ধনসম্পদ লুট করে নেয় এবং গ্রন্থাগার ও সরকারি নথিপত্রের দপ্তরগুলো পুড়িয়ে দেয়। এই কারণেই আক্ষারার যুদ্ধ পর্যন্ত উসমানীয়দের ইতিহাস অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে পাওয়া যায়, কারণ ইতিহাসবিদদের লিখিত পাণ্ডুলিপিগুলো পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। [২]

তৈমুর ও বায়েজিদের পারস্পরিক কথোপকথন:

বায়েজিদ গ্রেফতার হওয়ার পর তৈমুরের সামনে উপস্থিত হওয়ার আগে তাকে নিম্নোক্ত পত্রটি পাঠিয়েছিলেন:

[১] আনবাবুল গুমর: ২/২২৬; তারিখে উসমানি: ১/৩৫৮ থেকে ৩৬০, ৩৭০, ৩৭১; তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া (ইলমাজ): ১/১১০; আখবারুদ দুওয়াল: ৩ পৃষ্ঠা ২০।

[২] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া (ইলমাজ): ১/১১২।

“আকাশের আবর্তন এর কারণ হয়েছে যে আমি পরাজিত হয়েছি এবং হে মহান আমির, আপনি বিজয়ী সাব্যস্ত হয়েছেন। এখন আমার জান ও মাল আপনার কজায়। কিন্তু আমি আশা করি যে আপনি আমার সাথে আপনার মহত্বের শান অনুযায়ী আচরণ করবেন।”

তিন দিন পর বায়েজিদকে তৈমুরের সামনে পেশ করা হলো। তৈমুর তাকে পাশে বসালেন এবং বললেন:

“আমি তোমার চিঠি পেয়েছি যা প্রকাশ করে যে তুমি তোমার অহংকারের পাহাড় থেকে নিচে নেমে এসেছ। তুমি জেনে নিয়েছ যে তৈমুরের সাথে পাঞ্জা লড়ে তুমি ভুল করেছ।”

বায়েজিদ উত্তর দিলেন: “হে আমির! যদি কোনো বাদশাহ বাইরে থেকে এসে আপনার দেশে আক্রমণ করত তবে কি আপনি তার সাথে যুদ্ধ করতেন না? যদি আমি আপনার দেশে আক্রমণ করতাম তবে আপনার আমার ওপর রাগান্বিত হওয়ার অধিকার ছিল। কিন্তু আমি যা কিছু করেছি তা কেবল নিজের আত্মরক্ষায় করেছি। এটা আলাদা কথা যে ভাগ্য আমার সাথে ছিল না এবং আমি পরাজিত হয়েছি।”

তৈমুর নিরুত্তর হয়ে বললেন: “আমি তোমার এই ওজর কবুল করছি যে তুমি আমার সাথে যুদ্ধে বাধ্য ছিলে।” [১]

বায়েজিদ তার প্রজাসাধারণ ও দেশের অত্যন্ত হিতাকাঙ্ক্ষী ও দরদী ছিলেন। এই চিন্তার কারণেই তিনি এক সুযোগে তৈমুরকে বললেন:

“আমার তিনটি ওসিয়ত মনে রাখবেন: রুম (আনাতোলিয়া)-এর লোকদের হত্যা করবেন না কারণ তারা ইসলামের দুর্গ। দ্বীনের সাহায্য করার দায়িত্ব আপনার ওপর সবার আগে বর্তায় যেহেতু আপনিও মুসলমান হওয়ার দাবি করেন।

এই শহরগুলোতে তাতারীদের আবাদ হতে দেবেন না। যদি আপনি এমনটি করেন তবে তারা এখানকার গোত্রগুলোকে (ফাসাদের) আগুনে ভরে দেবে। তারা মুসলমানদের জন্য নাসারাদের চেয়েও বেশি ক্ষতিকর।

মুসলমানদের কেবল ও শহরগুলো ধ্বংস করবেন না। তাদের তাদের এলাকা থেকে বের করবেন না। এই লোকেরা দ্বীনের রক্ষক। এরা মুজাহিদ ও গাজীদের আশ্রয়স্থল। এই দেশ আমানত যা আমি আপনার কাছে সোপর্দ করছি।” [২]

কিছু দিন পর তৈমুর এক বিদ্রোহী সর্দার “তোগুল”-এর পশ্চাদ্ধাবনে আজারবাইজানের দিকে রওনা হলেন। যার বাহিনী বনু সারুখান, কুর্দিস্তানি এবং তাতারী সৈন্যদের নিয়ে গঠিত ছিল। দিয়ার বকরের উপত্যকায় তৈমুর প্রতিপক্ষকে ধরে ফেললেন। তোগুলের সৈন্যেরা গদা ও খঞ্জর ছাড়াও এক অনন্য অস্ত্র “চমাক” চালনায় পারদর্শী ছিল, তৈমুরের বাহিনী এর সাথে অপরিচিত ছিল বিধায় চরম ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে কোনোমতে জয়ী হতে পারল। সেদিন মাগরিবের সালাতের পর তৈমুর বায়েজিদকে তলব করে জিজ্ঞেস করলেন: “আপনার কাছে এমন শক্তপ্রাণ সৈন্য বিদ্যমান ছিল, আপনি তাদের থেকে ফায়দা হাসিল করে একটি অপরাজেয় বাহিনী কেন তৈরি করেননি?”

বায়েজিদ বললেন: “নিয়ামতের কদর তখনই হয় যখন তা হাত থেকে বেরিয়ে যায়। বাস্তবে আমি এই লোকদের থেকে অনেক ফায়দা হাসিল করতে পারতাম কিন্তু করতে পারিনি।” [৩]

বায়েজিদের পলায়নের চেষ্টা:

শাহজাদা মুহাম্মদ তার পিতার জন্য সবচেয়ে বেশি চিন্তিত ছিলেন। তিনি পিতাকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করার জন্য কিছু বাছাইকৃত যুবক পাঠালেন...

[১] মানাম তৈমুর জাহাঙ্কুশা, পৃ. ৩৯৫, ৩৯৬

[২] নুযহাতুল আনযার: ২/ ১১

[৩] মানাম তৈমুর জাহাঙ্কুশা, পৃ. ৩০৬ থেকে ৩০৮

সে দিনগুলোতে তৈমুর সিওরে হিসারের কাছে তাঁরু গেড়েছিলেন। শাহজাদা মুহাম্মদের যুবকরা সুড়ঙ্গ খুঁড়ে বায়েজিদ এবং তার বেগলার বেগ ফিরোজ পাশাকে কুঠুরি থেকে বের করে নিয়েছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ঠিক সেই সময়েই পাহারাদাররা সেখানে পৌঁছে যায় এবং তারা বায়েজিদকে পুনরায় গ্রেপ্তার করে। তৈমুর বায়েজিদকে চরম অপমানিত করেন এবং তার ওপর পাহারা আরও কঠোর করে দেন। অন্যদিকে ফিরোজ পাশাকে হত্যা করিয়ে দেন। [১]

تيمور (তৈমুর)-এর বর্ণনা অনুযায়ী বায়েজিদের সাথে তার আচরণ খুব ভালো ছিল, কিন্তু অন্যান্য ঐতিহাসিকদের বর্ণনা থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে তৈমুরের আচরণ ছিল অদ্ভুত। যদিও তৈমুর বায়েজিদের ওপর কোনো শারীরিক নির্যাতন করেননি বরং তাকে পানাহার ও জীবনযাপনের উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেছিলেন, কিন্তু তিনি তাকে মানসিকভাবে উত্ত্যক্ত করতে থাকেন। তিনি তাকে কাছে ডাকতেন, নিজের সামনে খাবার খাওয়াতেন, কখনো নরম সুরে কথা বলতেন, কখনো তার প্রতি করুণা দেখাতেন, আবার কখনো তাকে নিয়ে উপহাস করতেন এবং অটুহাসি দিতেন।

একদিন তিনি এক আমোদ-প্রমোদের আসর বসালেন এবং বায়েজিদকেও ডাকলেন। বায়েজিদ আসরে বসে দৃষ্টি তুলতেই দেখলেন যে, তার ঘরের মহিলারা এবং দাসীরা উপস্থিতদের পানীয় পরিবেশন করছে। নিজের ঘরের সম্মানকে এভাবে তামাশা হতে দেখে বায়েজিদ জীবন্ত মৃত হয়ে গেলেন। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তার জন্য মৃত্যুর চেয়েও যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠল। যার ইশারায় ইউরোপীয় সম্রাটরা মাথা নত করত, তিনি দুঃখ ও বিষাদের প্রতিচ্ছবি এবং শিক্ষার এক জীবন্ত উদাহরণ হয়ে রইলেন। [২] ইবনে আরব শাহের মতে, তৈমুর বায়েজিদের সাথে এমন আচরণ এই প্রতিশোধমূলক মনোভাব থেকে করেছিলেন যে, বায়েজিদ তার চিঠিতে মহিলাদের কথা উল্লেখ করেছিলেন এবং তাদের তালকের কসম খেয়েছিলেন। মঙ্গোলদের কাছে পুরুষদের কথোপকথনে নারীদের উল্লেখ করা অনেক বড় অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। [৩]

বায়েজিদের মৃত্যু:

নিজের অবস্থার ওপর আক্ষেপ করতে করতে বায়েজিদ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সফরের অযোগ্য হয়ে যান। একদিন যখন তিনি অসুস্থতার কারণে তৈমুরের কাছে উপস্থিত হতে পারছিলেন না, তখন তিনি তৈমুরের কাছে একটি পত্র পাঠান যাতে লেখা ছিল:

“আমি গুরুতর অসুস্থ এবং আমি জানি যে আমি খুব শীঘ্রই মারা যাব। প্রাচীনকাল থেকেই এটি হয়ে আসছে যে, যে রাজাই বন্দি হয়েছেন, তিনি বন্দিদশাতেই মারা গেছেন। সুতরাং আমি যদি অসুস্থতায় না মরি, তবে বন্দিত্ব আমাকে মেরে ফেলবে। কিন্তু হে সম্মানিত আমির! আপনি এটি মেনে নেবেন না যে আমার মৃত্যুর পর রুমের সালতানাত আল-উসমানের হাত থেকে বেরিয়ে যাক। আপনার কাছে আমার শুধু এই অনুরোধ যে, আপনি আমার ছেলেকে আমার উত্তরসূরি বানিয়ে দিন যাতে আমাদের বংশের যে প্রদীপ শতাব্দী ধরে জ্বলছে, তা যেন নিভে না যায়। আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, আমার ছেলে আপনার করদ ও আজ্ঞাবহ হয়ে থাকবে।”

তৈমুর এই পত্রের উত্তরে লিখিয়েছিলেন:

“আমি তোমার ছেলেকে রুমের শাসক বানিয়ে দেব এই শর্তে যে সে আমার করদ হয়ে থাকবে।” [৪]

[১] তারিখ-ই উসমানি: ১/৩৫৯ টীকা সহ... ফরিদ বেগের মতে বায়েজিদ তিনবার বন্দিদশা থেকে পালানোর চেষ্টা করেছিলেন। (তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়া, পৃ. ১৩৬)

[২] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়া, পৃ. ১৩৬

[৩] আজায়িবুল মাকদুর, পৃ. ২৭৮, ২৭৯

[৪] আজায়িবুল মাকদুর, পৃ. ২৭৯

[৫] মানাম তৈমুর জাহাঙ্গুশা, পৃ. ৩১০

বায়েজিদের অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে থাকে। তিনি হাঁপানি ও কণ্ঠনালীর প্রদাহে (খুনাক) আক্রান্ত হয়েছিলেন। অবশেষে বন্দি হওয়ার সাত মাস পর ১৪ শাবান ৮০৫ হিজরি (২৬ ফেব্রুয়ারি ১৪০৩ খ্রিস্টাব্দ) তিনি বন্দি অবস্থায় প্রাণ বিসর্জন দেন। ইম্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। সেই সময় তৈমুরের কাফেলা তাবরিজের নিকটবর্তী আক শহরে পৌঁছেছিল। এই মৃত্যুর ঘটনাটি এতটাই হৃদয়বিদারক ছিল যে, সেই বিশ্বজয়ী বিজেতা যিনি লক্ষ লক্ষ মানুষকে নির্দিধায় হত্যা করেও নিজের হৃদয়ে কোনো ভার অনুভব করেননি, তিনিও নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। উসমানীয় বংশের এই মহান বীরের হতাশাজনক মৃত্যুতে তার অশ্রু প্রবাহিত হলো। তিনি বায়েজিদের মরদেহ তার বন্দি পুত্র মুসার হাতে তুলে দেন, তাকে নিজের প্রতিনিধি হিসেবে শাসনের প্রতীক স্বরূপ রাজকীয় পোশাক (খিলআত), তলোয়ার এবং একশটি ঘোড়া প্রদান করেন এবং নির্দেশ দেন যে পিতার মরদেহ যেন রাজকীয় সম্মানের সাথে দাফন করা হয়। মরদেহটিকে মমি করার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংরক্ষিত করে একটি কফিনে রাখা হয়েছিল, যা নিয়ে মুসা আমিরদের সাথে বুরসার উদ্দেশ্যে রওনা হন যাতে সেখানে মরদেহ দাফন করা যায়। [১]

বায়েজিদের অবস্থার ওপর এক নজর:

বায়েজিদ চৌদ্দ বছর তিন মাস শাসন করেন। তার জন্ম ৭৬১ হিজরিতে (১৩৬০ খ্রিস্টাব্দ) হয়েছিল। সেই হিসেবে তার বয়স ছিল প্রায় ৪৪ বছর। [২] তার সম্পর্কে হাফিজ ইবনে হাজার (রহ.) নিম্নোক্ত প্রশংসামূলক বাক্য লিখেছেন:

“তিনি শ্রেষ্ঠ শাসকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিলেন। জ্ঞান ও আলেমদের ভালোবাসতেন। কুরআনওয়ালাদের সম্মান করতেন।” [৩]

“বায়েজিদ ইলদিরিম কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য বিখ্যাত হয়েছিলেন, তার খ্যাতি দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। সুলতান আজ-জাহির বারকুক তাকে পত্র পাঠান এবং একের পর এক দূত প্রেরণ করেন। দুনিয়াতে এমন কোনো বাদশাহ ছিল না যে বায়েজিদকে উপহার পাঠায়নি এবং তার সাথে পত্রালাপ করেনি।” [৪]

“বায়েজিদ মুসলমানদের সবচেয়ে বড় বাদশাহ ছিলেন, (শহরগুলোর) নিরাপত্তার দিক থেকে সবচেয়ে বেশি শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতেন। কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদে তিনি সবার চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। তিনি তার সমসাময়িক বাদশাহদের কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদে অলসতা এবং জনগণের কাছ থেকে কর আদায়ের বিষয়ে সমালোচনা করতেন।” [৫]

বায়েজিদ নির্মাণ ও উন্নয়নমূলক কাজ করানোর দিকে পূর্ণ মনোযোগ দিতেন। তিনি অসংখ্য মসজিদ, খানকাহ, হাম্মামখানা এবং হাসপাতাল নির্মাণ করেন। হাসপাতালের জন্য মিশর থেকে দক্ষ চিকিৎসক আনিয়েছিলেন। [৬] বুরসার সুমহান জামে মসজিদ (জামে মসজিদ ইলদিরিম) তার নির্মাণশৈলীর রুচির সাক্ষী, যা ভেতর ও বাইরে থেকে মার্বেল পাথরের ছিল এবং ঝরনার মিষ্টি পানি এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতো। [৭]

[১] আখবারুদ দুওয়াল: ৩/১২১, নুযহাতুল আনজার: ২/১১১, তারিখ-ই-উসমানি: ১/৩৬৬। কিছু ঐতিহাসিক বায়েজিদকে হাঁপানি ও কণ্ঠনালীর প্রদাহের রোগী বলে উল্লেখ করেছেন, অন্যদিকে ঐতিহাসিক উজুন উসমানীয়দের কিছু প্রাচীন উৎস যেমন তারিখ-ই-আশিকজাদা, তারিখ-ই-লুতফি পাশা এবং ঐতিহাসিক উরুজ বেগের বরাতে বর্ণনা করেছেন যে, বায়েজিদ তার পরাজয়, বন্দিত্ব ও অপমানে অত্যন্ত মর্মান্বিত ছিলেন, ফলে তিনি তার আংটিতে লুকানো বিষ পান করেন যার ফলে তার অবস্থা খারাপ হয়ে যায় এবং কয়েকদিন পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। (তারিখ-ই-উসমানি: ১/৩৪২, ৩৪৩, সাথে টীকা) তবে বায়েজিদের মেজাজ বিবেচনা করলে এমনটা হওয়া অসম্ভব নয়।

[২] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়া, পৃ. ১৩৭।

[৩] ইনবাতুল গুমর: ১/৪৯২।

[৪] তারিখ-ই-উসমানি: ১/৩৬৮।

[৫] ইনবাতুল গুমর: ২/২২৭।

[৬] ইনবাতুল গুমর ফি আবনাইল উমর: ২/২২৫, সন ৮০৫ হিজরি।

[৭] ইনবাতুল গুমর: ১/৪৯২।

তার ন্যায়বিচার ও ইনসাফের কথা তারা এভাবে উল্লেখ করেন:

“তিনি খুব ভোরে একটি উন্মুক্ত মজলিসে বসতেন। লোকজন তার সামনে এমন দূরত্বে দাঁড়িয়ে থাকত যে তিনি তাদের দেখতে পেতেন। যার ওপর কোনো জুলুম হতো সে ফরিয়াদ পেশ করত এবং বায়েজিদ তখনই তার প্রতিকার করে দিতেন। তার রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলার অবস্থা এমন ছিল যে, কেউ তার মালামাল যেকোনো জায়গায় রেখে চলে যেত, কেউ তা স্পর্শ করত না।” [১]

একটি অদ্ভুত ঘটনা:

এ প্রসঙ্গে ইবনে আরব শাহ একটি অদ্ভুত ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, এক যুদ্ধকালীন সফরে বায়েজিদের এক ঘনিষ্ঠ অফিসারের তৃষ্ণা পেল। পানি না পেয়ে সে পাশের একটি জনপদের এক মহিলার কাছে পানি চাইল। সে জানাল যে পানি নেই। অফিসার দেখল মহিলার কাছে একটি পাত্রে দুধ রাখা আছে। সে দ্রুত সেই দুধ পান করে নিল। মহিলাটি শোরগোল শুরু করল এবং বলল যে এই দুধ শিশুদের জন্য ছিল। সে সরাসরি বায়েজিদের কাছে এসে ফরিয়াদ করল। বায়েজিদ সেই অফিসারকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। সে অস্বীকার করল এবং বলল যে বৃদ্ধা মিথ্যা বলছে। বায়েজিদ মহিলাকে বললেন: “আমি এই অফিসারের পেট চিরে দেখছি। যদি দুধ বের হয় তবে তোমাকে এর মূল্য পরিশোধ করে দেব, আর যদি না বের হয় তবে এর বদলে তোমাকে হত্যা করব।”

মহিলা বলতে লাগল: “আল্লাহর কসম! আমি মিথ্যাবাদী নই। কিন্তু আমি তাকে হত্যা করাতে চাই না। আমি মামলা তুলে নিচ্ছি।”

বায়েজিদ বললেন: “ইনসাফ তো হয়েই ছাড়বে।”

একথা বলে তিনি তলোয়ার দিয়ে অফিসারের পেট চিরে ফেললেন। রক্তের সাথে সাথে পাকস্থলী থেকে দুধের ফোঁটাও বের হলো। তিনি বৃদ্ধাকে দুধের দাম দিয়ে বিদায় করলেন এবং লঙ্করে ঘোষণা করে দিলেন যে, যে ব্যক্তি আমার রাজ্যে অনুমতি ছাড়া কারো কোনো জিনিস নেবে, তাকে এই শাস্তিই দেওয়া হবে। [২]

তৈমুরের পরিণাম:

বায়েজিদের মৃত্যুর পর তৈমুর বেশিদিন জীবিত ছিলেন না। তিনি তার রাজধানী সমরকন্দে ফিরে যান। বায়েজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান তাকে মুসলিম বিশ্বে অত্যন্ত কলঙ্কিত করেছিল। সুখ্যাতি অর্জনের জন্য তিনি সমরকন্দে একটি অত্যন্ত চমৎকার জামে মসজিদ নির্মাণ শুরু করেন। এরপর জীবনে প্রথমবারের মতো কোনো অমুসলিম রাজ্যের ওপর আক্রমণের প্রস্তুতি নেন এবং চীনের দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু তার ভাগ্যে এই সৌভাগ্য ছিল না। সিহন নদীর তীরে তার বাহিনীকে প্রচণ্ড তুষারপাতের সম্মুখীন হতে হয়। বাধ্য হয়ে যুদ্ধাভিযান বন্ধ করে দেওয়া হয়। কয়েকদিন পর ১৭ শাবান ৮০৭ হিজরিতে তৈমুর এই অভিযান অসম্পূর্ণ রেখে মৃত্যুবরণ করেন। [৩]

[১] ইনবাইল গুমর: ২/ ৭৭, সন ৮০৫ হিজরি।

[২] আজায়িবুল মাকদুর, পৃষ্ঠা ২৬৬, ২৬৭।

নোট: এই ঘটনা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য এই নয় যে, আমরা বায়েজিদের এই ফয়সালাকে শরয়িভাবে জায়েজ সাব্যস্ত করছি। স্পষ্টতই এটিও একটি চরমপন্থা ছিল যে খিয়ানতের শাস্তি মৃত্যুর মাধ্যমে দেওয়া হবে। উদ্দেশ্য কেবল এটি জানানো যে বায়েজিদ জনগণের ওপর কোনো প্রকার জুলুম ও অবিচার একেবারেই বরদাশত করতেন না।

[৩] আজায়িবুল মাকদুর, পৃষ্ঠা ৩৩৮।

তৈমুর বায়জিদের সাথে যে আচরণ করেছিলেন, তা তাঁর ব্যক্তিত্বকে আরও কলঙ্কিত করে তোলে। যদি তাঁর মধ্যে সামান্যতম উদারতা থাকত, তবে এই মহান বিজয়ের শুরুরিয়া হিসেবে তিনি তাঁকে মুক্ত করে দিতেন। মুসলিম বিজয়ীরা অমুসলিম রাজাদেরও অনুগ্রহ করে মুক্ত করে দিতেন, যেমন সুলতান আল্লা আরসালান কায়সার আরমানুস দিওজানুসসহ অনেক রোমান রাজপুত্রকে গ্রেপ্তারের পর সসন্মানে ফেরত পাঠিয়েছিলেন এবং যেমন স্বয়ং বায়জিদ নিকোপোলিসের যুদ্ধের পর ২৭ জন অমুসলিম শাসক ও নবাবকে মুক্তি দিয়েছিলেন। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, তৈমুর একজন সমসাময়িক মুসলিম বাদশাহর সাথেও এমন আচরণ করেননি।

বায়জিদকে কি খাঁচায় রাখা হয়েছিল?

বিভিন্ন বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে যে, তৈমুর বায়জিদকে খাঁচায় রেখেছিলেন। অন্যদিকে কিছু আধুনিক ঐতিহাসিক, যারা তৈমুর কর্তৃক বায়জিদের প্রতি দুর্ব্যবহারের বর্ণনাগুলো প্রত্যাখ্যান করেন, তারা বলেন যে বায়জিদকে খাঁচায় নয় বরং কেবল হেফাজতে রাখা হয়েছিল। খাঁচার উল্লেখ কেবল একটি উপকথা। তবে ইতিহাসে বায়জিদকে খাঁচায় রাখার উল্লেখ বিদ্যমান। ঐতিহাসিক কুরমানি লিখেছেন:

“[১] ‘وقع السلطان في القفص’

(সুলতান খাঁচায় বন্দি হলেন।)

কিছু লোক ‘কাফাস’ (قفص)-এর এই ব্যাখ্যা করেন যে, বায়জিদকে খাঁচায় নয় বরং পালকিতে রাখা হতো যার ওপর সুরক্ষামূলক গরাদ বা লোহার সুরক্ষামূলক জাল লাগানো ছিল, কিন্তু তৈমুরের বিরোধীরা বিদ্রোহবশত একে খাঁচা হিসেবে অভিহিত করেছে। এই ব্যাখ্যার দুর্বলতা কারো কাছে গোপন নয়। খাঁচা আর অন্য কিসের নাম? খাঁচার স্বরূপ হুবহু এখানে বিদ্যমান, তাই একে খাঁচা হিসেবে অভিহিত না করে আর কী বলা যাবে? বড়জোর এটি বলা যেতে পারে যে, সেটি সাধারণ খাঁচার চেয়ে কিছুটা উন্নত ও আরামদায়ক খাঁচা ছিল, কিন্তু ছিল তো খাঁচাই। একে কি তৈমুরের অনুগ্রহের মধ্যে গণ্য করা হবে?

কিছু লোক এখানে ব্যাখ্যা করে ‘কাফাস’ দ্বারা রূপক অর্থ অর্থাৎ বন্দিত্ব বুঝিয়েছেন। যদি এই ব্যাখ্যা মেনেও নেওয়া হয়, তবুও তৈমুর নির্দোষ প্রমাণিত হন না। পরিশেষে ইউরোপের সাথে যুদ্ধরত একজন মুজাহিদ বাদশাহকে নারীদেরসহ বন্দি করা কোন সওয়াবের কাজ ছিল?

তৈমুরের জন্য এমন কোনো বাধা ছিল না যে তিনি বায়জিদকে সসন্মানে মুক্ত করে দিতে পারতেন না। বায়জিদের কাছ থেকে কখনোই এই আশঙ্কা ছিল না যে তিনি ইউরোপের অভিযান ছেড়ে মুঘল সাম্রাজ্য আক্রমণ করবেন। বায়জিদ আগেও কখনো তৈমুরের অঞ্চলে আক্রমণ করেননি, বরং তৈমুরই উসমানীয় সাম্রাজ্যে প্রবেশ করেছিলেন। তৈমুর যদি ভদ্রতা প্রদর্শন করে বায়জিদকে ছেড়ে দিতেন, তবে ইতিহাস তাঁকে উদারমনা শাসকদের অন্তর্ভুক্ত করত। কিন্তু আফসোস যে, তাঁর এই কল্যাণকর কাজের তৌফিক হয়নি।

হ্যাঁ, তৈমুর এতটুকু অবশ্যই করেছিলেন যে, বায়জিদের পুত্রদের নিজের করদ রাজ্যে পরিণত করে আনাতোলিয়ার কিছু অংশে টিকে থাকতে দিয়েছিলেন। [২] এভাবে উসমানীয় সাম্রাজ্য পুরোপুরি বিলীন হওয়া থেকে বেঁচে যায় এবং এই অবশিষ্ট ক্ষমতার বলেই তারা পুনরায় উত্থান লাভ করে।

[১] আখবারুদ দুওয়াল: ৩/৩০

[২] তারিখে উসমানি: ১/৩৬১

বায়েজিদের চরিত্রের ওপর কিছু প্রশ্ন:

বায়েজিদ ইয়ালদারাম সম্পর্কে ইউরোপীয় ঐতিহাসিক ও প্রাচ্যবিদরা রটিয়ে রেখেছেন যে তিনি মদ্যপ ও দুশ্চরিত্র মানুষ ছিলেন, কিন্তু এটি নিছক অপপ্রচার। সে যুগের কোনো ইতিহাসে এর প্রমাণ নেই। এর বিপরীতে তাঁর সমসাময়িক ঐতিহাসিক ইবনে আরব শাহ (৭৯১ হিজরি - ৮৫৪ হিজরি) বলেন:

“নিশ্চয়ই তিনি ন্যায়পরায়ণ বাদশাহদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং তাঁর মধ্যে তাকওয়া ও দ্বীনের ওপর দৃঢ়তা ছিল।”

(নিঃসন্দেহে তিনি ন্যায়পরায়ণ শাসকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি পরহেজগার এবং দ্বীনদারিতে দৃঢ় ছিলেন।) [১]

হ্যাঁ, তাঁর মধ্যে কিছু ত্রুটি ছিল, যেমন মেজাজে উগ্রতা ও তড়িঘড়ি করার প্রবণতা ছিল, যেমনটি ইবনে আরব শাহ লিখেছেন:

“তাঁর মধ্যে মুহূর্তকালের ধৈর্য ছিল না, তিনি কথা বলার সময় দরবারের মাঝখান থেকে কিনারা পর্যন্ত দ্রুত হাঁটাইটি করতেন।” [২]

হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) আনাতোলিয়ায় যাওয়া এক মিশরীয় দূতের বরাতে বর্ণনা করেছেন:

“তিনি যা চাইতেন সেই প্রবৃত্তিই পূরণ করতেন।”

(বায়েজিদ যা চাইতেন সেই প্রবৃত্তিই পূরণ করতেন।) [৩]

তবে এখানে স্পষ্টভাবে মদ্যপান বা দুশ্চরিত্রের উল্লেখ নেই। প্রবৃত্তি পূরণ করা বৈধ গণ্ডির মধ্যেও হতে পারে। হ্যাঁ, কিছু প্রমাণ থেকে জানা যায় যে বায়েজিদের জীবনযাত্রায় শরিয়ত পরিপন্থী কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) বর্ণনা করেছেন যে বায়েজিদের গোসলখানার হাউজ এবং পানাহারের পাত্রগুলো রূপার তৈরি ছিল। [৪]

যদি এই বর্ণনা সঠিক হয়, তবে নিশ্চিতভাবেই এমনটি করা শরিয়ত অনুযায়ী ভুল ছিল এবং নিঃসন্দেহে এ ধরনের ভুলগুলো আল্লাহর সাহায্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তবে এতে মদ্যপান ও হারাম কাজ পর্যন্ত কথা বাড়িয়ে দেওয়ার অবকাশ দেখা যায় না, যা ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা প্রচার করে আসছেন এবং প্রাচ্যবিদদের থেকে সংগৃহীত উপকরণের মাধ্যমে এই বিষয়টি গত দুই শতাব্দীর ইসলামী সাহিত্যেরও অংশ হয়ে গেছে। একইভাবে বায়েজিদের বেগমদের মধ্যে ইউরোপীয় রাজকন্যাদের উপস্থিতি এবং আক্ষারার যুদ্ধে তাঁর পরিকল্পনায় কিছু দুর্বলতা প্রকাশ পাওয়া থেকেও তাঁর মদ্যপ ও লম্পট হওয়া প্রমাণিত হয় না। [৫]

[১] আজায়িবুল মাকদুর, পৃ. ২৫১

[২] আজায়িবুল মাকদুর, পৃ. ২৫১

[৩] ইনবাউল গুমর: ২/ ২২৬

[৪] ইনবাউল গুমর: ২/ ২২৬

[৫] মনে রাখতে হবে যে আমরা প্রমাণের অস্বীকৃতি জানাচ্ছি, সম্ভাবনার নয়। মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়। তার গুনাহে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা সব সময় থাকে। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত অকাট্য ঐতিহাসিক তথ্যসূত্র বা শক্তিশালী প্রমাণ না পাওয়া যায়, ততক্ষণ কোনো ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণ করা সঠিক নয়। আমাদের মতে মুসলিম শাসকদের মন্দ কাজের প্রমাণের ন্যূনতম মানদণ্ড হলো, তাদের সমসাময়িক বা নিকটবর্তী সময়ের মুসলিম বর্ণনাকারীরা তা বর্ণনা করেছেন এবং তার বিপরীতে অধিকতর শক্তিশালী কোনো বর্ণনা বিদ্যমান নেই। বায়েজিদ সম্পর্কে আমরা এমন কোনো সাক্ষ্য পাইনি। তাই আমরা এই অভিযোগ গ্রহণ করতে পারি না।

গৃহযুদ্ধের সময়কাল

৮০৫ হিজরি থেকে ৮১৬ হিজরি

(১৪০৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৪১৩ খ্রিষ্টাব্দ)

আক্ষারার যুদ্ধে বায়েজিদ ইলদিরিমের বন্দি হওয়ার পর বায়েজিদের প্রতিষ্ঠিত ঐক্যবদ্ধ আনাতোলিয়া অনেকগুলো টুকরোয় বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। কিছু অংশ তৈমুরের বদান্যতার শিকার হয়েছিল কারণ তিনি অনেক এলাকা সেই সেলজুক এবং তুর্কমেন আমিরদের ফিরিয়ে দিয়েছিলেন যারা আগে আনাতোলিয়ার ছোট ছোট রাজ্যের মালিক ছিলেন। কারামানিরা, যাদের বায়েজিদ ক্ষমতাচ্যুত করে বুরসায় বন্দি করে রেখেছিলেন, তৈমুরের আদেশে তারা মুক্তি পান এবং তাদের এলাকা তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়। বনু গেরমিয়ান, বনু সারুখান, বনু মেনতেশা, বনু ইসফান্দিয়ার এবং বনু হামিদ পুনরায় তাদের পৈতৃক এলাকায় তৈমুরের করদ দাতা শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। কিছু এলাকায় তৈমুর নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এভাবে এই অঞ্চলে অসংখ্য রাজ্য, অনেক শাসক এবং ডজন ডজন আমির সামনে চলে আসেন। [১] আনাতোলিয়ায় উসমানীয়দের এই ধ্বংসাবস্থা দেখে ‘রুমেলি’রও কিছু স্থানে বিদ্রোহ দেখা দেয়। [২] যার মধ্যে হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়া, পোল্যান্ড এবং আলবেনিয়া উল্লেখযোগ্য। তবে গ্রিস, জেনোয়া এবং ভেনিসের খ্রিস্টানরা আগের মতোই তাদের অনুগত থাকে। [৩] কারণ অমুসলিম প্রজাদের সাথে উসমানীয়দের আচরণ ছিল অত্যন্ত উন্নত। এই অঞ্চলের খ্রিস্টানরা যারা অর্থোডক্স চার্চের সাথে যুক্ত ছিল, তারা অতীতে ক্যাথলিক চার্চের অনুসারী রাজা এবং যাজকদের দ্বারা সর্বদা দুর্ব্যবহারের শিকার হয়েছিল। কিন্তু উসমানীয়রা ধর্মীয় বিষয়ে তাদের সাথে সম্মানের আচরণ বজায় রেখেছিল, তাই তারা উসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিল এবং ইউরোপীয় রাজাদের তুলনায় উসমানীয়দের প্রাধান্য দিত। [৪] ফলে এত খারাপ পরিস্থিতির মধ্যেও অধিকাংশ ইউরোপীয় অধিকৃত অঞ্চল উসমানীয় রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত থাকে।

উসমানীয় শাহজাদারা তৈমুরের করদ দাতা হিসেবে:

তৈমুরের কাছে বায়েজিদের দাবি ছিল যেন তিনি তার উত্তরাধিকারী সুলাইমান পাশাকে নিজের সাম্রাজ্যের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন, অথচ তৈমুর তার তিন ছেলেকে প্রতিনিধি বানিয়ে তাদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের বীজ বপন করে দেন। পরবর্তীতে চতুর্থ ছেলেও এই দ্বন্দ্ব জড়িয়ে পড়ে।

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ: ১/১১৩; তারিখে উসমানি: ১/৩৫৯, ৩৬০।

[২] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়া, পৃষ্ঠা ১৩৭... আগেই বলা হয়েছে যে, রুমেলি বলতে উসমানীয় সাম্রাজ্যের ইউরোপীয় অধিকৃত অঞ্চলগুলোকে বোঝায়।

[৩] ফি উসুলিত তারিখিল উসমানি, পৃষ্ঠা ৫৯।

[৪] তারিখে উসমানি: ১/৩৭০।

এভাবে তৈমুর ভবিষ্যতে উসমানীয়দের পাল্টা আক্রমণের ভয় থেকে নিশ্চিত হন।

বায়জিদের এই পুত্রদের অবস্থা পর্যায়ক্রমে নিম্নরূপ:

- ১. সুলাইমান পাশা: সুলাইমান পাশা ছিলেন সবার বড়, যাকে বায়জিদ ‘রুমেলি’তে নিজের রাজধানী আদ্রিয়ানোপল অর্পণ করেছিলেন। তিনি পিতাকে সাহায্য করার জন্য আঙ্কারার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত পালিয়ে যান এবং আদ্রিয়ানোপলে গিয়ে আশ্রয় নেন। তৈমুর তাকে তার বশ্যতা স্বীকারের আমন্ত্রণ জানান যা সুলাইমান পাশা গ্রহণ করে নেন। [১]

সুলাইমান পাশা আদ্রিয়ানোপলে সুলতান হিসেবে শাসন করতে লাগলেন। তার বাকি ভাইয়েরা নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করা সত্ত্বেও তাকেই সুলতান বলে মানতেন, তবে তাদের চেষ্টা ছিল যেন তার সালতানাতের সীমানা আর বৃদ্ধি না পায়, তাই নিজেদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হলো। [২]

আঙ্কারার যুদ্ধের সময় কনস্টান্টিনোপলের সম্রাট কায়সার ম্যানুয়েল দ্বিতীয় খ্রিস্টান রাজাদের কাছ থেকে বায়জিদের বিরুদ্ধে সাহায্য নিতে ইউরোপ গিয়েছিলেন। বায়জিদের পরাজয়ের খবর শোনামাত্রই তিনি ফিরে রওনা হলেন। তার ফিরে আসা পর্যন্ত উসমানীয়দের রাজধানী আদ্রিয়ানোপলে সুলাইমান পাশা সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। সেই সময় কায়সার এবং সুলাইমান উভয়ই দুর্বল ছিলেন এবং নিজ নিজ শাসন রক্ষা করতে চাচ্ছিলেন, ফলে উভয়ের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো যার অধীনে থেসালোনিকি এবং কৃষ্ণ সাগরের উপকূলীয় অধিকৃত অঞ্চলগুলো কায়সারকে দিয়ে দেওয়া হলো এবং স্থির হলো যে এর বিনিময়ে কায়সার সুলাইমান পাশাকে তার ভাইদের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রদান করবেন। [৩]

সুলাইমানের অভিজ্ঞ আমীরগণ এই চুক্তির বিরুদ্ধে ছিলেন কিন্তু তাদের কোনো কথা চলল না। প্রকৃতপক্ষে সুলাইমান একজন আলেম ও জ্ঞানী ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও বিলাসিতায় অভ্যস্ত এবং ইচ্ছাশক্তিহীন ছিলেন। তার উজির-এ-আজম জানদার আলী পাশা একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন এবং সালতানাতকে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত করার ব্যাপারে অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন, কিন্তু সুলাইমান এই সঠিক মতদানকারী ব্যক্তির থেকে বিন্দুমাত্র কোনো ফায়দা হাসিল করতে পারেননি। [৪]

- ২. ঈসা: আঙ্কারার যুদ্ধের পর বায়জিদের মেজ ছেলে ঈসা আনাতোলিয়ার বালকেসিরি শহরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তিনি বুর্সাও দখল করে নিয়েছিলেন যা গত শতাব্দীতে উসমানীয়দের রাজধানী ছিল। তিনিও তৈমুরের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছিলেন, ফলে তৈমুর সমরকন্দ ফিরে যাওয়ার সময় তাকে শাসনের ফরমান পাঠিয়ে দেন। [৫]

[১] তারিখ-এ-উসমানি: ১/ ৩৬২, ৩৭০

[২] তারিখ-উদ-দাওলাত-উল-উসমানিয়া, ইলমাজ: ১/ ১১৩

[৩] চুক্তিতে কায়সারের পাল্লা ভারী ছিল, তাই তার ইচ্ছানুসারে সুলাইমান তার সবচেয়ে ছোট ভাই কাসিমকে, যে তখনো শিশু ছিল, জিম্মি হিসেবে কায়সারের হাতে তুলে দেন। প্রাচ্যবিদ চার্লস ডিল পশ্চিমা ঐতিহাসিক ডুকাসের বরাতে উল্লেখ করেছেন যে, কায়সার কাসিমকে নিজের পদ্ধতিতে শিক্ষা ও দীক্ষা দিয়েছিলেন যার ফলে তিনি গ্রিক ভাষায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন এবং সেই ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাবে তিনি খ্রিস্টান হয়ে যান। ১৪১৭ খ্রিস্টাব্দে তার মৃত্যু হয় এবং তাকে একটি গির্জার প্রাঙ্গণে সমাহিত করা হয়। (তারিখ-এ-উসমানি: ১/ ৩৭২, ৩৭৪-এর টীকা) তবে এই কথাটি নির্ভরযোগ্য হওয়া জরুরি নয় কারণ ডুকাসের ইতিহাসে অনেক ঘটনা বানোয়াট।

[৪] তারিখ-এ-উসমানি: ১/ ৩৬১, ৩৬২, ৩৭০

[৫] তারিখ-এ-উসমানি: ১/ ৩৬১, ৩৬২

৩. মুসা: এই দিনগুলোতে বায়েজিদের মৃত্যু হয় এবং তার ছেলে মুসা, যে তার সাথে বন্দী ছিল, তৈমুরের অনুমতি নিয়ে পিতার মরদেহ নিয়ে রওনা হয় যাতে বুরসায় তাকে দাফন করা যায়। কিন্তু সেখানে পৌঁছাতেই তার ভাই ঈসার সাথে (যে বুরসার শাসক ছিল) দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। শুরুতে মুসা ঈসাকে বুরসা থেকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়, কিন্তু ঈসা দমে যাওয়ার পাত্র ছিল না। সে বুরসা পুনরুদ্ধারের জন্য একটি বাহিনী গঠন করে আক্রমণ করে; মুসা তার মোকাবিলা করতে না পেরে পালিয়ে কুতাহিয়ায় বনু কারমিয়ানের কাছে আশ্রয় নেয়, যেখানে আমির ইয়াকুব বেগ তার মামা ছিলেন। কিছু দিন পর সে বনু কারমানের কাছে চলে যায়। পিতার মমি করা মরদেহ তার সাথেই ছিল। [১]

৪. মুহাম্মদ চেলবি: ছোট ছেলে মুহাম্মদ চেলবি আনাতোলিয়ার উত্তর-পূর্ব শহর “আমাসিয়া”-তে ছিল। সে অত্যন্ত প্রজ্ঞা, কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার সাথে তোকাত, সিভাস এবং জানিককেও নিজের শাসনের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। এভাবে একটি বিশাল এলাকা তার দখলে চলে আসে। তৈমুর তাকেও শাসনের সনদ পাঠিয়ে দেয়। [২] বনু আইদিন এবং বনু কারমিয়ানও তাকে নিজেদের বাদশাহ হিসেবে মেনে নেয়। [৩]

গৃহযুদ্ধের নয় বছরের সময়কাল: ৮০৫ হিজরি থেকে ৮১৬ হিজরি (১৪০২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪১৩ খ্রিস্টাব্দ)

তৈমুর উসমানীয় সাম্রাজ্যকে যেভাবে সীমাবদ্ধ ও খণ্ডিত করে গিয়েছিল, তার স্বাভাবিক পরিণতি ছিল সাম্রাজ্যের দুর্দশা ও দুর্বলতা। ফলে অবশিষ্ট এই অঞ্চলের ওপর অনেক শত্রুর নজর ছিল এবং তারা উসমানীয়দের সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করার জন্য প্রস্তুত ছিল। আবার সাম্রাজ্যের বিভাজন খোদ বায়েজিদের ছেলেদের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত করে দিয়েছিল। তাদের প্রত্যেকেই চাইত অবশিষ্ট পুরো সাম্রাজ্যের শাসক হতে। এই কাজটি তারা তাদের সবচেয়ে বড় শত্রু তৈমুরের পৃষ্ঠপোষকতায় করছিল। আশঙ্কা ছিল যে, উসমানীয় সাম্রাজ্য এই ভাইদের গৃহযুদ্ধের কারণে কয়েক বছরের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু এমন সময়ে মুহাম্মদ চেলবি (যাকে প্রথম মুহাম্মদ বলা হয়) একজন উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিত্ব হিসেবে আবির্ভূত হন এবং তিনি এগারো বছরের সংগ্রামের পর উসমানীয় সাম্রাজ্যকে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করেন।

ঈসা ও মুহাম্মদ চেলবির দ্বন্দ্ব:

আনাতোলিয়ায় একদিকে ছিল ঈসা, অন্যদিকে মুহাম্মদ। ঈসার কাছে ছিল বুরসা ও বালিকেসির, আর মুহাম্মদ চেলবির কাছে ছিল আমাসিয়া ও সিভাস। দুজনের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। মুহাম্মদ চেলবি ঈসাকে সন্ধির প্রস্তাবও দেন এবং প্রস্তাব করেন যে আমরা এশীয় অধিকৃত অঞ্চলগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিই, কিন্তু ঈসা পুরো এলাকা না নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়ার পাত্র ছিল না। অবশেষে “উলুবাদ”-এর ময়দানে দুজনের মধ্যে যুদ্ধ হয় যাতে ঈসা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়।

[১] তারিখ-ই-উসমানি: ১/ ৩৭৪

[২] তারিখ-ই-উসমানি: ১/ ৩৬১, ৩৬২, ৩৭৫

[৩] তারিখুদ দাওলাতুল উসমানিয়া, ইলমাজ: ১/ ১১৩

মুহাম্মদ চেলবি বিজয়ের পর বুরসা দখল করে নেন, ইজনিকও তাঁর শাসনাধীনে চলে আসে। তাঁর অপর ভাই মুসা তখনো ইয়াকুব বেগের কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন। মুহাম্মদ চেলবি ইয়াকুব বেগের কাছে বার্তা পাঠান যে, তুমি মুসাকে আমার পিতার লাশের সাথে বুরসায় পাঠিয়ে দাও। ফলে মুসা বায়েজিদ ইলদিরিমের লাশের কফিন নিয়ে বুরসায় পৌঁছান, যেখানে মুহাম্মদ চেলবি জামে মসজিদের কাছে সরকারি হাসপাতালের সামনে পূর্ণ সম্মান ও মর্যাদার সাথে তাঁকে দাফন করেন। [১]

ঈসা ও সুলাইমানের জোট। ঈসার পরাজয় ও মৃত্যু:

এই সময়ে ঈসা পালিয়ে বড় ভাই সুলাইমানের কাছে এড্রিয়ানোপল পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং তাঁকে মুহাম্মদ চেলবির বিরুদ্ধে উস্কাচ্ছিলেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা সফল হয় এবং কিছুকাল পর তিনি সুলাইমান পাশার সাহায্যে একটি বিশাল সেনাবাহিনী প্রস্তুত করে পুনরায় আনাতোলিয়ায় প্রবেশ করেন। আবারও মুহাম্মদ চেলবি ও ঈসার মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। বেশ কয়েকটি যুদ্ধে একের পর এক পরাজিত হওয়ার পর ঈসা এসকিশেহর শহরে আত্মগোপন করেন, কিন্তু মুহাম্মদ চেলবির কর্মীরা তাঁর সন্ধান পেয়ে যায় এবং তাঁকে হত্যা করে লাশ বুরসায় পাঠিয়ে দেয়, যেখানে তাঁকে তাঁর পূর্বপুরুষদের কবরস্থানে দাফন করা হয়। [২]

মুহাম্মদ চেলবি ও সুলাইমান পাশার মুখোমুখি অবস্থান। সুলাইমান পাশার আনাতোলিয়া অভিযান:

এখন উসমানীয় সালতানাতের দুইজন দাবিদার অবশিষ্ট রইলেন: আনাতোলিয়ায় ছিলেন মুহাম্মদ চেলবি এবং ইউরোপের উপকূলে সুলাইমান পাশা। উচিত ছিল যে, এক ভাই আনাতোলিয়া সামলাবেন এবং অন্যজন “রুমেলি” সামলাবেন। কিন্তু সুলাইমান পাশা মুহাম্মদ চেলবিকে দমন করা জরুরি মনে করলেন এবং সেনাবাহিনী নিয়ে আনাতোলিয়ায় পৌঁছে গেলেন। মুহাম্মদ চেলবি এত বড় বাহিনীর মোকাবিলা করতে পারতেন না, তাই তিনি বুদ্ধিমত্তার সাথে বুরসা ত্যাগ করেন এবং পিছু হটে আমাসিয়ায় অবস্থান নেন। সুলাইমান পাশা অগ্রসর হয়ে বুরসা দখল করে নেন। [৩]

সুলাইমান পাশার আক্কারা দখল:

সুলাইমান পাশা শীঘ্রই আক্কারায় আক্রমণ করেন এবং কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই তা জয় করে নেন। এখানে তিনি গ্রীষ্মকাল কাটাতে শুরু করেন এবং অভ্যাস অনুযায়ী ভোগ-বিলাসে মগ্ন হয়ে পড়েন। মুহাম্মদ চেলবি এই সুযোগটি কাজে লাগান এবং সেনাবাহিনী নিয়ে বুরসার দিকে যাত্রা করেন। এই খবর সুলাইমান পাশার কাছে পৌঁছালে তিনি ঘাবড়ে যান এবং আনাতোলিয়া থেকে পালিয়ে যাওয়ার কথা ভাবতে থাকেন। তবে উজির-এ-আজম জানদার আলী পাশা তাঁকে সাহস যোগান, যার ফলে তিনিও সেনাবাহিনী নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। অবশেষে বুরসার কাছে উভয় বাহিনী মুখোমুখি হয়। আলী পাশা রক্তপাত ছাড়াই সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিলেন। তিনি মুহাম্মদ চেলবিকে পত্র পাঠিয়ে নিজের শুভাকাঙ্ক্ষার নিশ্চয়তা দেন এবং বলেন যে, আপনার কিছু কর্মকর্তা সুলাইমানের সাথে হাত মিলিয়েছে, যুদ্ধ শুরু হতেই তারা আপনার সঙ্গ ত্যাগ করবে, তাই সন্ধি করে নিন। মুহাম্মদ চেলবি এই বার্তার কোনো তোয়াক্কা করেননি। তবে শীঘ্রই তাঁর এক কর্মকর্তা বিশ্বাসঘাতকতা করে সুলাইমান পাশার কাছে চলে যান যার...

[১] তারিখ-ই-উসমানি: ১/ ৩৭৫, ৩৭৬

[২] তারিখ-ই-উসমানি: ১/ ৩৭৬, ৩৭৭, ৩৭৮

[৩] তারিখ-ই-উসমানি: ১/ ৩৭৮

...থেকে আলী পাশার বার্তার সত্যতা প্রমাণিত হলো। অবশেষে মুহাম্মদ চেলবি তার সেনাবাহিনী নিয়ে আমাসিয়ায় ফিরে গেলেন এবং যুদ্ধ এড়ানো সম্ভব হলো। [১]

সুলাইমানের অদূরদর্শিতা এবং বনু কারামানের মুহাম্মদ চেলবির সাথে মৈত্রী:

সুলাইমান পাশা দৃশ্যত আনাতোলিয়ায় এক প্রবল শক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন এবং এই অহংকারে তিনি কালক্ষেপণ না করে আশেপাশের রাজ্যগুলোকে দমন করার চেষ্টা শুরু করেন, যার মধ্যে বনু কারামান ছিল তালিকার শীর্ষে। এটি দেখে বনু কারামানের আমিরগণ মুহাম্মদ চেলবির সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তার সাথে মৈত্রী স্থাপন করেন। [২]

রুমেলিতে মুসার আক্রমণ এবং সুলাইমান পাশার প্রত্যাবর্তন:

মুহাম্মদ চেলবি এই চুক্তির মাধ্যমে শাহজাদা মুসাকে মুক্ত করেন, যিনি বনু কারামানের কাছে জিম্মি ছিলেন। তিনি তাকে একটি বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করে রুমেলিতে আক্রমণের দায়িত্ব অর্পণ করেন, যাতে সুলাইমান পাশা এটি দেখে ফিরে যেতে বাধ্য হন এবং আনাতোলিয়া তার হাত থেকে মুক্তি পায়। ফলে মুসা বনু কারামানের আমিরের ছোট ভাইকে সাথে নিয়ে মুহাম্মদ চেলবির বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে “সিনোপ” উপকূল থেকে নৌকায় চড়ে ইউরোপের উপকূলে অবতরণ করেন। সুলাইমান পাশা এই সংবাদ পাওয়া মাত্রই তার রাজধানী এড্রিয়ানোপলকে বিপন্ন মনে করে দ্রুত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে রুমেলিতে ফিরে যান। এভাবে আনাতোলিয়ায় মুহাম্মদ চেলবির পথ পরিষ্কার হয়ে গেল। [৩] আনাতোলিয়ায় সুলাইমান পাশার অবস্থান ছিল মাত্র চার মাস। [৪] এই সময়ে (৮০৯ হিজরিতে) তিনি প্রথা অনুযায়ী সেখানে তার পিতার কবরের ওপর একটি মাজার নির্মাণ করেন। [৫] আনাতোলিয়ায় অবস্থানের শেষ দিনগুলোতে সুলাইমান পাশার উজির জানদার আলী পাশার মৃত্যু হয় এবং তিনি একজন শ্রেষ্ঠ উপদেষ্টা থেকে বঞ্চিত হন। [৬]

মুসার মোকাবিলায় সুলাইমান পাশার পরাজয়:

মুসা “রুমেলি” পৌঁছে ওয়ালাচিয়া (রোমানিয়া), সার্বিয়া এবং بلغاریہ (বুলগেরিয়া)-র খ্রিস্টান আমিরদেরও নিজের সাথে যুক্ত করে নেন, কারণ সুলাইমানের সাথে তার সংঘাত ছিল অনিবার্য। অন্যদিকে সুলাইমানও পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং কায়সারের বাহিনীর সাহায্য নিয়ে মোকাবিলায় নামেন। অবশেষে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়, যার মধ্যে সার্বিয়ার সেনাপতি “ভোগ”, যিনি সার্বিয়ার রাজা ডেসপটের ভাই ছিলেন, বিশ্বাসঘাতকতা করে সুলাইমান পাশার সাথে যোগ দেন। এর ফলে মুসা ময়দান ছেড়ে পিছু হটতে বাধ্য হন। সুলাইমান বিজয়ের অহংকারে দূরদর্শিতা দেখাননি এবং মুসার পুনরায় আক্রমণের ব্যাপারে অসতর্ক হয়ে অভ্যাসবশত ভোগবিলাসে মগ্ন হয়ে পড়েন।

ওদিকে মুসা আগের চেয়েও বেশি প্রস্তুতি নিয়ে পুনরায় আক্রমণ করেন। সোফিয়ার কাছে তিনি সুলাইমানের বাহিনীকে পরাজিত করেন এবং দ্রুত রাজধানী এড্রিয়ানোপলের দিকে অগ্রসর হন। ওদিক থেকে রাজধানীর বাহিনীও প্রতিরক্ষার জন্য বেরিয়ে আসে। কনস্টান্টিনোপল এবং এড্রিয়ানোপলের মধ্যবর্তী একটি উপত্যকায় উভয় বাহিনীর মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় এবং খণ্ডযুদ্ধ শুরু...

[১] তারিখ-ই উসমানি: ১/৩৭৮, ৩৭৯

[২] তারিখ-ই উসমানি: ১/৩৭৯

[৩] তারিখ-ই উসমানি: ১/৩৭৯, ৩৮০; তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়া: পৃষ্ঠা ১৩৮

[৪] তারিখ-ই উসমানি: ১/৩৮০

[৫] তারিখ-ই উসমানি: ১/৩৭৬

[৬] তারিখ-ই উসমানি: ১/৩৭৯, ৩৮০

হয়ে গেল। সুলাইমান সেই সময় অত্যন্ত দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়ে বিলাসিতার উপকরণে মগ্ন ছিলেন। যখন তাকে পরিস্থিতির ভয়াবহতা সম্পর্কে অবগত করার চেষ্টা করা হলো, তখন তিনি রাগান্বিত হয়ে তার চেরি (সৈন্যবাহিনীর) উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হাসান আগার দাড়ি মুড়িয়ে দিলেন। এই দুর্ব্যবহারের কারণে তার কর্মকর্তারাও অসন্তুষ্ট হয়ে পড়লেন। হাসান আগা তার চেরি যুবকদের নিয়ে মুসার সাথে গিয়ে যোগ দিলেন। সুলাইমান যখন এই পরিস্থিতি দেখলেন, তখন প্রতিরোধ নিরর্থক মনে করে কায়সারের কাছে আশ্রয় নিতে কনস্টান্টিনোপলের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন, কিন্তু পথিমধ্যে কিছু গ্রামবাসী তাকে ধরে হত্যা করে ফেলে। এই ঘটনাটি ১লা মহররম ৮১৩ হিজরি (১৮ মে ১৪১০ খ্রিস্টাব্দ) এর। তার মরদেহ বুর্সায় তার পৈতৃক কবরস্থানে দাফন করা হয়। তার বয়স ছিল ৩৫ বছর এবং শাসনকাল ছিল আট বছর। [১]

এর কারণ হিসেবে এটাই বলা হয় যে, তিনি কারো পরামর্শ মানতেন না এবং অধীনস্থদের তুচ্ছজ্ঞান করতে অভ্যস্ত ছিলেন। এই কারণে তার নিজের অনুগতরা তার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিল। [২]

মুসার স্বায়ত্তশাসন। সার্বিয়া ও কনস্টান্টিনোপল আক্রমণ:

মুসা ছিলেন মুহাম্মদের প্রতিনিধি, কিন্তু এড্রিয়ানোপল দখল করার পর তিনি স্বায়ত্তশাসন ঘোষণা করেন এবং বাদশাহ হয়ে নিজের নামে মুদ্রা জারি করেন। তিনি শীঘ্রই সার্বিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন, কারণ সার্বিয়ার সেনাবাহিনী বিশ্বাসঘাতকতা করে সুলাইমান পাশার পক্ষ নিয়েছিল। এই আক্রমণে মুসা সার্বদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন এবং বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তিস্বরূপ সার্বিয়ার রাজার ভাই ‘ভোগ’-কে হত্যা করেন। তবে হাঙ্গেরির রাজা মুসাকে সার্বিয়া থেকে বিতাড়িত করার জন্য আক্রমণ করেন। মুসাকে অভিযান অসম্পূর্ণ রেখেই ফিরে আসতে হয়।

মুসা এই অভিযানগুলোর পর মাত্রাতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসে ভুগছিলেন, তাই তিনি এড্রিয়ানোপলকে রাজধানী বানিয়ে নিজের স্বায়ত্তশাসন ঘোষণা করেন। মুসা বলতেন যে, তৈমুরকে আমার পিতার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে উস্কানি দেওয়ার প্রধান অপরাধী হলো কায়সার। ফলে তিনি শীঘ্রই কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করেন। এখানে আক্রমণের একটি কারণ এটিও ছিল যে, কায়সার ম্যানুয়েল সুলাইমান পাশার মিত্র ছিলেন এবং তিনি সুলাইমান পাশাকে সমর্থনের বিনিময়ে তার কাছ থেকে উসমানীয়দের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অধিকৃত এলাকা হাতিয়ে নিয়েছিলেন এবং এখন তিনি উসমানীয়দের কর দিতে অস্বীকার করছিলেন। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে মুসা কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করেন। [৩]

মুহাম্মদ ও মুসার যুদ্ধসমূহ। মুসার পরাজয়:

প্রথম মুহাম্মদ রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতাকে বহিঃস্থ অভিযানের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতেন। তার মতে, কায়সারের সাথে যুদ্ধ করা এই মুহূর্তে উসমানীয় সাম্রাজ্যের জন্য ক্ষতিকর ছিল, তাই তিনি মুসার সামরিক অভিযানের বিরোধী ছিলেন। অধিকন্তু, কায়সার প্রথম মুহাম্মদের সাথে পত্রবিনিময় করে তাকে নিজের সাহায্যের জন্য রাজি করিয়ে নেন। প্রথম মুহাম্মদ কনস্টান্টিনোপল পৌঁছান এবং মুসার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন। এটি ইতিহাসের এক অত্যন্ত অদ্ভুত দৃশ্য ছিল যে, সেই বায়েজিদ যিনি কনস্টান্টিনোপল জয় করার জন্য চারবার আক্রমণ করেছিলেন, আজ তার পুত্ররা এই শহরকে কেন্দ্র করে একে অপরের মুখোমুখি

[১] তারিখ উসমানি: ১/ ৩৮২, ৩৮৩, ঢাকা সহ; তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়া, পৃ. ১৩৮।

[২] দাওলাতে উসমানিয়া: ১/ ৭৩, ৭৫।

[৩] তারিখ উসমানি: ১/ ৩৮৩, ৩৮৫।

সামনে ছিলেন। একজন একটি শহর দখল করার চেষ্টা করছিলেন এবং অন্যজন কায়সারকে বাঁচাতে চাচ্ছিলেন।

এভাবে দুই ভাইয়ের লড়াইয়ের ফলে কনস্টান্টিনোপল অবরোধ দুর্বল হয়ে পড়ে। অবশেষে মুসা আনাতোলিয়ার এক সর্দারকে মুহাম্মদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত করেন। এই বিদ্রোহের খবর শুনে প্রথম মুহাম্মদকে আনাতোলিয়ায় ফিরে যেতে হয়। কিন্তু তিনি বেশি সময় নেননি এবং কয়েক দিনের মধ্যে বিদ্রোহ দমন করে আবার কনস্টান্টিনোপলে পৌঁছে যান এবং সার্বিয়ার শাসককে মিত্র বানিয়ে তাকে মুসার বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করতে রাজি করান। সার্বিয়াকে আক্রমণ করতে দেখে মুসা কনস্টান্টিনোপল অবরোধ ত্যাগ করে সার্বদের সাথে লড়াই করার জন্য সীমান্তে চলে যান। এদিকে মুহাম্মদও পেছন থেকে তার ওপর আক্রমণ করেন। সোফিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব উপত্যকা ‘সামাকভ’-এ যুদ্ধ শুরু হয় যাতে মুসা পরাজিত ও নিহত হন। এখন প্রথম মুহাম্মদের জন্য পথ পরিষ্কার ছিল। তিনি এড্রিয়ানোপল দখল করে নেন। এভাবে এগারো বছরের গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটে এবং প্রথম মুহাম্মদ এককভাবে শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। [১]

এই গৃহযুদ্ধগুলোর ওপর একটি মন্তব্য:

উসমানীয় শাহজাদাদের এই পারস্পরিক লড়াই ছিল রাজ্য জয়ের লালসার এক অদ্ভুত দৃষ্টান্ত। বায়েজিদের পুত্ররা এত বড় ধ্বংসের পরেও ঐক্যবদ্ধ হননি, অথচ সময়ের দাবি ছিল তারা একপ্রাণ হয়ে শত্রুদের মোকাবিলা করবেন। এই এগারো বছরের সংঘাত এমন এক অবস্থায় শুরু হয়েছিল যখন তাদের পিতা তৈমুরের বন্দিশালায় লাঞ্ছনা ও অপমানের জীবন অতিবাহিত করছিলেন। এমন সময়ে পুত্রদের একে অপরের সাথে বিবাদে লিপ্ত হওয়া ছিল অত্যন্ত দুঃখজনক। তারা যদি ঐক্যবদ্ধ হতেন, তবে এই এগারো বছরে নিজেদের সাম্রাজ্যকে অসাধারণ স্থিতিশীলতা ও উন্নতি দান করতে পারতেন। কিন্তু ক্ষমতার লোভ তাদের গৃহযুদ্ধে লিপ্ত রেখেছিল। এই কারণেই ৮০৭ হিজরিতে তৈমুর যখন এক বিশাল সাম্রাজ্য রেখে পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছিলেন, তখন তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে তার কোনো শত্রু অবশিষ্ট নেই।

কিন্তু এই পরিস্থিতির আরেকটি দিকও আছে। তৈমুর এই বিশাল সাম্রাজ্য জোর-জবরদস্তি ও গণহত্যার মাধ্যমে অর্জন করেছিলেন। তিনি অবশ্যই একজন দিগ্বিজয়ী (জাহাঙ্গীর) ছিলেন কিন্তু সাম্রাজ্য রক্ষক (জাহানবান) ছিলেন না। ফলে তার পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার দশ-বারো বছরের মধ্যেই বিশাল তৈমুরি সাম্রাজ্য—যা চীনের সীমান্ত থেকে তুরস্ক এবং আরাল সাগর থেকে গঙ্গা-যমুনার তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল—টুকরো টুকরো হয়ে যায়। এর বিপরীতে ছিন্নভিন্ন ও বিধ্বস্ত উসমানীয় সাম্রাজ্য দশ-বারো বছর পর আবারও নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে উন্নতির দিকে ধাবিত হয়। ন্যায়বিচার ও ইনসাফ এবং জুলুম ও অত্যাচারের শাসনের মধ্যে এটাই পার্থক্য। ন্যায়বিচার হলো উর্বর জমিতে বীজ বপন করার মতো এবং জুলুম হলো মরুভূমিতে লাঙল চালানোর মতো। সেখানে রহমতের মেঘের সামান্য ছিটেফোঁটা পড়লেই জমি সবুজ-শ্যামল হয়ে ওঠে, আর এখানে মুষলধারে বৃষ্টিও বৃথা যায়।

[১] তারিখ-ই-উসমানি: ১/৩৮৬ থেকে ৩৯০; তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়া, পৃ. ১৩৮; তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া: ১/১১৫

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

মুহাম্মদ চেলপি (প্রথম মুহাম্মদ)

৮১৬ হি. থেকে ৮২৩ হি.

(১৪১৩ খ্রি. থেকে ১৪২১ খ্রি.)

প্রথম মুহাম্মদ ৮১৬ হিজরিতে (১৪১৩ খ্রি.) বুর্সাকে কেন্দ্র করে আনুষ্ঠানিকভাবে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ৭৮১ হিজরিতে (১৩৭৯ খ্রি.) জন্মগ্রহণ করেন। ক্ষমতা গ্রহণের সময় তাঁর বয়স ছিল ৩৫ বছর। এর আগে তাঁর ভাই সুলাইমান পাশা সাত বছর পর্যন্ত এড্রিয়ানোপলে শাসন করেছিলেন, কিন্তু যেহেতু এই সময়টি গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছিল, তাই অধিকাংশ ঐতিহাসিক সুলাইমানকে উসমানীয় সুলতানদের মধ্যে গণনা করেন না এবং প্রথম মুহাম্মদকে পঞ্চম উসমানীয় শাসক হিসেবে গণ্য করেন। প্রথম মুহাম্মদের সামনে একটি মৃত সাম্রাজ্যকে পুনর্জীবিত করার চ্যালেঞ্জ ছিল। এই কাজটি আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হলেও প্রথম মুহাম্মদ অত্যন্ত দূরদর্শিতা ও পরিকল্পনার সাথে এই কাজ সম্পন্ন করেন। তাঁর রাজনৈতিক নীতি কয়েকটি পর্যায়ের ওপর ভিত্তি করে ছিল। প্রথম কাজ ছিল উসমানীয় সাম্রাজ্যের অবশিষ্টাংশকে একটি পতাকার নিচে নিয়ে আসা। দ্বিতীয় পদক্ষেপ ছিল আনাতোলিয়ার হারানো অঞ্চলগুলো পুনরুদ্ধার করা। এরপর তিনি সাম্রাজ্যের স্থিতিশীলতার দিকে মনোযোগ দিতে চেয়েছিলেন। এই দুর্বল অবস্থায় নতুন শত্রু তৈরি না করে বরং পূর্বের প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথেও সম্মানজনক শান্তি বজায় রাখা জরুরি ছিল। ফলে তিনি নিকটবর্তী ইউরোপীয় প্রতিবেশী এবং সামুদ্রিক রাষ্ট্রগুলোর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে সাফল্য অর্জন করেন। [১]

আনাতোলিয়া বিজয়

মুহাম্মদ চেলপি কয়েক বছর ধরে আনাতোলিয়ার তুর্কমেন রাষ্ট্রগুলোকে একে একে তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে থাকেন। তিনি ইজমির, আইদিন আমিরাত এবং বনু জান্দার রাষ্ট্রকে পদানত করেন। এরপর বনু জান্দার এবং বনু জারমিয়ানের যুবকদের নিজের সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করে কারামান রাষ্ট্রের দিকে অগ্রসর হন এবং তা জয় করেন। সেখানকার শাসক দ্বিতীয় মুহাম্মদ বেগ ওঘলু, যিনি তাঁর ফুফাতো ভাই ছিলেন, তাঁকে গ্রেপ্তার করেন; তবে আনুগত্যের শপথ নিয়ে তাঁকে মুক্তি দেন। তৈমুর কারামান, সিভরিহিসার এবং আকশেহিরসহ বেশ কয়েকটি বড় শহরের শাসকদের স্বাধীন করে দিয়েছিলেন। মুহাম্মদ চেলপি এই সমস্ত এলাকা পুনরায় উসমানীয় সাম্রাজ্যের সাথে সংযুক্ত করেন। তিনি পূর্ব আনাতোলিয়ার এমন কিছু রাষ্ট্রের সাথে সন্ধি করেন যারা তৈমুরের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

মুহাম্মদ চেলপির এই সাফল্য দেখে জারমিয়ান, মেনতেশে এবং সারুখানের আমিরগণ তাঁর অনুগত হয়ে যান।

[১] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়া, পৃষ্ঠা ১৪৯।

উন্মতে মুসলিমার ইতিহাস

রিয়াস্তগুলোর মধ্যে রোডসের ওস্তাদে আজম এবং জেনোয়ার প্রধানদের সাথেও তিনি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে নেন। [১] মোটকথা, মুহাম্মদ চেলবির দূরদর্শিতা, রাজনৈতিক দক্ষতা এবং অবিচল ধৈর্যের কারণে কোনো বড় রক্তপাত ছাড়াই আনাতোলিয়া পুনরায় উসমানীয়দের ছায়াতলে চলে আসে।

বিদ্রোহ দমন:

মুহাম্মদ চেলবিকে কারামানিদের ষড়যন্ত্রের কারণে দুবার যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হয়। ৮১৮ হিজরিতে (১৪১৫ খ্রিষ্টাব্দে) কারামানের আমির তার বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ করেন কিন্তু পরাজিত হন। মুহাম্মদ আউয়াল তাকে মিত্র থাকার প্রতিশ্রুতিতে ক্ষমা করে দেন। কিছুকাল পর কারামানের আমির পুনরায় বিদ্রোহ করেন। এবারও মুহাম্মদ আউয়াল তাকে পরাজিত করেন এবং অভ্যাস অনুযায়ী ক্ষমা করে দিয়ে নিজের উচ্চমানসিকতার পরিচয় দেন।

উসমানীয়দের একজন নামকরা আমির কারাজুনাইদ বিদ্রোহ করে স্মার্না (ইজমির) সহ কিছু শহরের ওপর দখল কায়েম করে নিয়েছিলেন এবং নিজের স্বাধীন সালতানাত কায়েমের প্রচেষ্টায় ছিলেন। মুহাম্মদ আউয়াল তাকেও পরাস্ত করেন। তারপর সদয় আচরণ করে তাকে নাইকোপোলির গভর্নর বানিয়ে দেন। [২]

শেখ বদরুদ্দিনের ফিতনা:

আলে উসমানের শাসক ও আমিরগণ তাসাউফের সাথে যুক্ত ছিলেন। তারা আউলিয়া কেরামদের প্রতি ভক্তি রাখতেন এবং তাদের থেকে আধ্যাত্মিক ফয়েজ হাসিল করতে আগ্রহী থাকতেন। তাদের ধর্মীয় প্রশিক্ষণে মাওলানা রুমির (রহ.) মতো বুজুর্গদের খানকাহি সিলসিলার বড় প্রভাব ছিল। তবে এটিও সত্য যে, কিছু ভণ্ড সুফি উসমানীয়দের সরল বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে ভ্রান্ত আকিদা ভিত্তিক আন্দোলন চালাতে সফল হয়েছিল। এমনই একটি আন্দোলন ছিল শেখ বদরুদ্দিনের আন্দোলন, যা ৮১৯ হিজরিতে (১৪১৬ খ্রিষ্টাব্দে) চরম রূপ ধারণ করে।

বদরুদ্দিনের চিন্তাগুলো নাস্তিক্যবাদী ছিল। তার বক্তব্য ছিল যে, সমস্ত মানুষ চাই সে যে কোনো ধর্মেরই হোক, ভাই ভাই এবং ধন-সম্পদে সবার সমান অংশ রয়েছে। তার এই চিন্তাগুলো অনেকটা বর্তমান সময়ের সমাজতন্ত্র বা প্রাচীন ইরানি মজদাকিয়াতের সাথে মিলে যায়। তিনি এটিও বলতেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অন্য নবীদের ওপর কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই এবং ঈমানের দিক থেকে মুসলমান ও ইহুদি সমান। এই আন্দোলনের দ্বারা মানুষ দ্রুত প্রভাবিত হচ্ছিল। বিশেষ করে খ্রিষ্টান, ইহুদি এবং নওমুসলিমরা এর শিকার হচ্ছিল। ইহুদি বংশোদ্ভূত তোরলাক কামাল নামক এক ব্যক্তি বদরুদ্দিনের বিশেষ দাঈ ছিল, যার কারণে ইহুদিরা এই আন্দোলনে অগ্রণী ছিল।

মুহাম্মদ আউয়াল বুলগেরিয়ার শাহের নওমুসলিম পুত্র সিমসানকে এই ফিতনা দমনের জন্য পাঠান। বদরুদ্দিন তার মোকাবিলায় নিজের নায়েব পীর কলিজা মোস্তফাকে পাঠান, যে উসমানীয় বাহিনীকে পরাজিত করে। মুহাম্মদ আউয়াল এই সংবাদ পেয়ে দ্বিতীয় লস্কর সদর আজম বায়েজিদ পাশার নেতৃত্বে পাঠান। ইজমিরের কাছে যুদ্ধ হয় যার ফলে পীর কলিজা গ্রেপ্তার হয়ে নিহত হয়। তার অধিকাংশ অনুসারী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। ফিতনার মূল হোতা বদরুদ্দিন মেসিডোনিয়ায় অবস্থান গ্রহণ করছিল। এক জবরদস্ত যুদ্ধের পর তাকে...

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া আজ ইয়ালমাজ: ১/১১৬, ১১৭; তারিখু সালাতিন বনি উসমান, পৃষ্ঠা ৪৭।

[২] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়া, পৃষ্ঠা ১৩৯।

পরাজিত হলো। সে নিজে ধরা পড়ল এবং তার কৃতকর্মের শাস্তি পেল। [১]

ফজলুল্লাহ তাবরিজির ফিতনা:

ফজলুল্লাহ তাবরিজিও ছিলেন এমনই একজন সুফি, যিনি অত্যন্ত চতুরতার সাথে নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেছিলেন। তার দল ‘হুগফিয়া’ নামে পরিচিত ছিল। ফজলুল্লাহ তাবরিজির একটি কুফরি আকিদা ছিল এই যে, আল্লাহ কোনো মনোনীত মানুষের মধ্যে বিলীন (হলুল) হয়ে মহাবিশ্বের ব্যবস্থা পরিচালনা করেন। ধীরে ধীরে তিনি তার বিশেষ মুরিদদের কাছে এই দাবিও করেন যে, আল্লাহ তার মধ্যে বিলীন হয়ে গেছেন। এভাবে তার মুরিদরা তাকে খোদা মানতে শুরু করে। তৈমুর লঙের পুত্র মিরান শাহ ৭৯৬ হিজরিতে (১৩৯৪ খ্রিষ্টাব্দ) তাবরিজিকে হত্যা করান, তবে তার খলিফারা গোপনে কাজ করে যাচ্ছিল।

এমনই একজন খলিফা উসমানীয় সালতানাতের আমির ও সাধারণ মানুষের সামনে প্রেম ও মারেফাতের কথা বলে তাদের প্রভাবিত করতেন, এমনকি তিনি সুলতান মুহাম্মদ চেলবিকেও নিজের ভক্ত বানিয়ে ফেলেছিলেন। সুলতান তাকে একজন আল্লাহওয়ালা মানুষ মনে করতেন এবং তাকে অনেক সম্মান করতেন। তখন পর্যন্ত তিনি তার আকিদা সম্পর্কে জানতেন না, কিন্তু তার উজির মাহমুদ পাশা সত্য জানতেন এবং অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন যে সুলতান একজন ভ্রান্ত আকিদার পীরের অনুসারী হয়ে গেছেন। তার এই আশঙ্কাও ছিল যে, অকাট্য প্রমাণ ছাড়া সুলতানের কাছে অভিযোগ করলে সুলতান অসন্তুষ্ট হবেন।

অবশেষে একদিন মাহমুদ পাশা পীরকে নিজের বাড়িতে দাওয়াত দিলেন এবং এই সময়ে তার প্রতি অগাধ ভক্তি ও ভালোবাসা প্রকাশ করলেন। এটি দেখে পীর মনে করলেন যে তার জাদু কাজ করেছে, তাই তিনি মাহমুদ পাশার কাছে নিজের কুফরি আকিদা প্রচার করতে শুরু করলেন। এভাবে তার কুফর প্রমাণিত হলো। সুলতানের কিছু বিশেষ আমির সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য পর্দার আড়ালে বসে ছিলেন; তারা সামনে চলে এলেন এবং তার মুখে লাগাম টেনে ধরলেন। এখন পীর পালানোর চেষ্টা করলেন কিন্তু ধরা পড়লেন এবং সুলতানের অনুমতিতে তার বেশ কয়েকজন সমমনা সাথীসহ তাকে হত্যা করা হলো। [২]

শাহজাদা মোস্তফার আবির্ভাব:

কিছুকাল পর মুহাম্মদকে আরেকটি ফিতনার সম্মুখীন হতে হয়। আক্ষারার যুদ্ধে তার এক ভাই মোস্তফা নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন। ৮১৫ হিজরিতে (১৪১৮ খ্রিষ্টাব্দ) তিনি হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করেন এবং দাবি করেন যে বড় ভাই হিসেবে তিনিই তার পিতার প্রকৃত উত্তরাধিকারী। নিকোপোলির গভর্নর জুনায়েদ, যাকে মুহাম্মদ ক্ষমা করে দিয়েছিলেন এবং গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন, তাকে সমর্থন করেন এবং সম্রাট ম্যানুয়েলও তাকে সাহায্য করেন। এভাবে তার চারপাশে একটি শক্তিশালী বাহিনী গড়ে ওঠে, যার সাহায্যে তিনি ৮২২ হিজরিতে দার্দানেলিস দখল করে নেন। মুহাম্মদ আউয়াল যখন খবর পেলেন, তখন তিনি বাহিনী নিয়ে তার মোকাবিলায় রওনা হলেন। স্যালোনিকার কাছে যুদ্ধে মোস্তফা পরাজিত হন এবং তিনি সম্রাট ম্যানুয়েলের কাছে গিয়ে আশ্রয় নেন। মুহাম্মদ আউয়াল সম্রাটের কাছে দাবি জানান যেন বিদ্রোহীকে তার হাতে তুলে দেওয়া হয়, কিন্তু সম্রাট...

[১] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়া, পৃ. ১৩৯, ১৫০; তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া: ১ / ১১৮

[২] নুসরাতু আহলিল ঈমান বি দাওলাতি উসমান, লেখক: শায়খ মুহাম্মদ বিন আবিস সুরুর আল-বাকরি (মৃত্যু ১০৭১ হি.), পৃ. ৬৮, ৬৯

...অস্বীকার করে দিলেন, তবে এই প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তাকে নজরবন্দি রাখা হবে এই শর্তে যে তার খরচ প্রদান করা হবে। মুহাম্মদ এটি গ্রহণ করে নিলেন। [১]

কিছু ঐতিহাসিকের মতে, এই বিদ্রোহী ছিল কোনো এক ছদ্মবেশী যে মোস্তফার সাথে চেহারার মিল থাকার সুযোগ নিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করেছিল। কিন্তু এই ধারণাটি দুর্বল, কারণ সে যদি জাল শাহজাদা হতো তবে কারাজুনিদ (Qara Junayd) এর মতো পুরনো তুর্কি জেনারেল তাকে চিনে ফেলতেন। প্রথম মুহাম্মদ কর্তৃক কায়সারকে মোস্তফার ভরণপোষণের খরচ প্রদান অব্যাহত রাখাও এর প্রমাণ যে সে সত্যিই তার ভাই ছিল, অন্যথায় প্রথম মুহাম্মদ একজন জালিয়াতের খরচ বহনের কষ্ট কখনোই করতেন না।

রোমানিয়ার শাহজাদার সাথে উত্তেজনা ও সন্ধি:

মুহাম্মদ চেলবিকে নবীন ও দুর্বল মনে করে হাঙ্গেরির রাজা সিগিসমুন্ড, যিনি সেই সময়ে জার্মানির শাসকও হয়ে গিয়েছিলেন, উসমানীয়দের সাথে যুদ্ধের বাহানা খুঁজতে লাগলেন। এমনিতে দীর্ঘ সময় ধরে সার্বিয়া, বসনিয়া এবং অস্ট্রিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের কর্তৃত্ব নিয়ে হাঙ্গেরি ও উসমানীয় সাম্রাজ্যের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিল। এছাড়া কিছুকাল আগে একটি নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছিল যে, হাঙ্গেরির রাজার অনুগত রোমানিয়ার (ওয়ালাচিয়া) রাজা ‘মিরশা’ মুহাম্মদ চেলবির বিদ্রোহী ভাই ‘মোস্তফা’র সাথে মিত্রতা চুক্তি করেছিলেন, যার প্রতিক্রিয়ায় তার ঘোর বিরোধী প্রধান ‘ড্যান’ মুহাম্মদ চেলবির মিত্র হয়ে গিয়েছিলেন। সিগিসমুন্ড মুহাম্মদের কাছে দাবি করলেন যেন ড্যানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়।

যদিও মুহাম্মদ চেলবি এই পরিস্থিতিতে ইউরোপীয় শক্তিগুলোর সাথে উত্তেজনা চাচ্ছিলেন না, কিন্তু এই অযৌক্তিক দাবি মেনে নেওয়াও জাতীয় মর্যাদার পরিপন্থী ছিল। ফলে মুহাম্মদ চেলবি তা অস্বীকার করলেন। মোদাকথা, হাঙ্গেরি মিরশাকে এবং উসমানীয় রাষ্ট্র ড্যানকে সমর্থন দিয়ে যেতে লাগল এবং এভাবে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেল।

অবশেষে মিরশা ও ড্যানের মধ্যে এক ভয়াবহ সংঘর্ষ হলো যাতে ড্যান নিহত হলেন, তবে মিরশার বাহিনীর প্রধান সেনাপতিও নিহত হলেন। মিরশা দেখলেন যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে, তখন তিনি নিজের ছেলেকে মুহাম্মদ চেলবির কাছে দূত হিসেবে পাঠিয়ে তার সাথে সন্ধি করে নিলেন। [২]

হাঙ্গেরির রাজার সাথে সংঘর্ষ:

৮১৮ হিজরি (১৪১৫ খ্রিস্টাব্দ) সালে হাঙ্গেরির রাজা নিজেই সৈন্যবাহিনী নিয়ে বের হলেন, কিন্তু ‘ক্রোয়েশিয়া’র ‘ডুবোজ’ উপত্যকায় উসমানীয় জেনারেল গাজী ইসহাক বেগ তাকে বাধা দিলেন এবং পিছু হটতে বাধ্য করলেন। হাঙ্গেরির রাজাকে ফিরে যেতে দেখে বলকানে উসমানীয়দের শত্রুরা দমে গেল এবং ডিউক হারসেক নামক এক নবাব উসমানীয় রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে নিলেন। [৩]

সারায়েভো নির্মাণ:

গাজী ইসহাক বেগ এই অনুকূল পরিবেশে বসনিয়ার স্লোভেনিয়া প্রদেশ পর্যন্ত অগ্রসর হলেন। এখানে তিনি একটি ছোট শহর ‘সরাই বসনা’ও জয় করেন, যার অবস্থান চারপাশ থেকে পাহাড়ে ঘেরা হওয়ার কারণে অত্যন্ত সুন্দর ও নিরাপদ ছিল। উসমানীয় জেনারেলরা সিদ্ধান্ত নিলেন যে বসনিয়ার কেন্দ্র এই শহরটিই হওয়া উচিত, ফলে সেখানে বড় পরিসরে...

[১] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়া, পৃ. ১৫১, ১৫২; তারিখ-ই উসমানি, উজুন চারশিলি: ১/ ৪১৫ থেকে ৪১৭

[২] তারিখ-ই উসমানি, উজুন চারশিলি: ১/ ৪০১

[৩] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ: ১/ ১১৭

নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছিল, যার ফলে এই জনপদটিই বসনিয়ার বর্তমান রাজধানী ‘সারায়েভো’ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। [১]

সীমান্ত দুর্গ নির্মাণ। রোমানিয়া ও হাঙ্গেরির ওপর আক্রমণ। ইসহাক বেগের শাহাদাত:

মুহাম্মদ আউয়াল হাঙ্গেরি ও রোমানিয়ার সাথে উত্তেজনার পর সীমান্ত সুরক্ষার দিকে অধিক মনোযোগ দেওয়া জরুরি মনে করেন এবং ৮১৯ হিজরিতে (১৪১৬ খ্রি.) রোমানিয়া সীমান্তে ‘তুরনু’ ও ‘ইয়েরকোয়ি’ নামক দুটি শক্তিশালী দুর্গ নির্মাণ করান। মুহাম্মদ আউয়াল কেবল এতেই স্ফান্ত হননি, বরং হাঙ্গেরির রাজাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করার জন্য ৮১৯ হিজরি (১৪১৬ খ্রি.), ৮২৩ হিজরি (১৪২০ খ্রি.) এবং ৮২৪ হিজরিতে (১৪২১ খ্রি.) ট্রান্সিলভেনিয়ার ওপর একে একে তিনটি আক্রমণ পরিচালনা করেন। এই আক্রমণগুলোর নেতৃত্বে ছিলেন জেনারেল গাজী ইসহাক বেগ।

শেষ আক্রমণে তিনি ‘সিটরিয়া’ পর্যন্ত পৌঁছে যান, যেখানে হাঙ্গেরি ও জার্মানির যৌথ বাহিনী সেই উপদ্বীপ রক্ষার জন্য মোতায়েন ছিল যার ওপর ‘ত্রিয়েস্তে’র বিখ্যাত বন্দর অবস্থিত। এই যুদ্ধে শত্রুপক্ষের বারো হাজার পদাতিক, সাত হাজার অশ্বারোহী এবং তিনজন সেনাপতি নিহত হয়। বিজয়ের পর ইসহাক বেগ ট্রান্সিলভেনিয়ায় আরও অগ্রসর হতে থাকেন, কিন্তু একটি খণ্ডযুদ্ধে তিনি শহীদ হন। উসমানীয় বাহিনী ‘সারায়ো’ অঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছে যায়, যেখানে তিনি ‘আকেরমান’ (Cetatea Alba) দুর্গ অবরোধ করেন, কিন্তু দুর্গটি জয় করা সম্ভব হয়নি। [২]

ভেনিসের সাথে নৌ-সংঘাত:

মারমারা সাগর ছিল বিশ্বের অন্যতম ব্যস্ত বাণিজ্যিক পথ এবং ভেনিসের বণিকরা তাদের উন্নত ও শক্তিশালী জাহাজের বদৌলতে এর ওপর আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছিল। বায়েজিদ ইলদিরিম তাদের সমকক্ষ হওয়ার জন্য উসমানীয় নৌ-শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাহাজ তৈরির কারখানা স্থাপন করেছিলেন, যার ফলে উসমানীয় নৌ-জাহাজগুলোও ইউরোপীয় বন্দরগুলোতে যাতায়াত শুরু করে। এই সময়ে তারা মারমারা সাগর দিয়েও যাতায়াত করত যেখানে ভেনিসের আধিপত্য ছিল এবং এর দ্বীপপুঞ্জ ‘সাইক্ল্যাডস’-এর ‘অ্যান্ড্রোস’ দ্বীপের শাসক ছিলেন পিয়েত্রো জেনো নামক এক রাজপুত্র। তিনি উসমানীয় জাহাজগুলো দখল করার চেষ্টা করেন, যার ফলে ভেনিস ও উসমানীয় রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। ৮১৮ হিজরিতে উসমানীয় জেনারেল চালি বেগ ত্রিশটি যুদ্ধজাহাজ নিয়ে এই দ্বীপগুলোতে আক্রমণ করেন এবং সেখানকার অনেক জাহাজ ধ্বংস করে ফিরে আসেন।

এর প্রতিশোধ নিতে পিয়েত্রো জেনো ৮১৯ হিজরির সফর মাসে (মে ১৪১৬ খ্রি.) একটি নৌ-বহর নিয়ে গ্যালিপলিতে আক্রমণ করেন এবং উপকূলীয় দুর্গকে লক্ষ্যবস্তু বানান। চালি বেগ তাদের মোকাবিলায় এগিয়ে আসেন। এখানে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয় যাতে চালি বেগ শাহাদাত বরণ করেন। তবে উসমানীয় নৌবাহিনী তাদের সামুদ্রিক সীমান্ত রক্ষা করতে এবং ভেনিসের আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হয়। এরপর বাইজেন্টাইন সম্রাটের মধ্যস্থতায় উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনা হয় এবং সন্ধি স্থাপিত হয়। [৩]

[১] তারিখুদ দাওলাতুল উসমানিয়াহ, ইলমাজ: ১/ ১১৭

[২] তারিখুদ দাওলাতুল উসমানিয়াহ, ইলমাজ: ১/ ১১৭

[৩] তারিখে উসমানি: ১/ ৩৯৮ থেকে ৪০০; তারিখুদ দাওলাতুল উসমানিয়াহ, ইলমাজ: ১/ ১১৭; তারিখুদ দাওলাতুল উসমানিয়াহ, সৈয়দ মুহাম্মদ, পৃষ্ঠা ১৩১, টিকা সহ।

প্রথম মুহাম্মদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা:

মুহাম্মদ রাজনৈতিক প্রজ্ঞা কাজে লাগিয়ে ইউরোপে নিজের মিত্র তৈরি করেন। আলবেনিয়া এবং বসনিয়ার কিছু প্রদেশ, যারা আফ্কারার যুদ্ধের পর স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল, তারা আশঙ্কা করছিল যে উসমানীয়রা হয়তো পুনরায় তাদের ওপর আক্রমণ করবে। তারা যখন প্রথম মুহাম্মদের সিংহাসন আরোহণে অভিনন্দন জানাতে প্রতিনিধি দল পাঠাল, তখন প্রথম মুহাম্মদ তাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন এবং বিরোধীদের শান্তির বার্তা দিলেন। [১]

তিনি শুরুতেই সার্বিয়ার শাসককে নিজের মিত্র বানিয়ে নিয়েছিলেন। [২] ভেনিস প্রজাতন্ত্র কয়েকটি সংঘর্ষের পর সম্পর্কের পুনরুদ্ধারের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয় এবং শান্তির হাত বাড়িয়ে দেয়, আর মুহাম্মদ এর ইতিবাচক উত্তর দেন। [৩]

কায়সারের সাথে তাঁর আগে থেকেই বন্ধুত্ব ছিল এবং কৃষ্ণ সাগরের কয়েকটি দুর্গ তাকে দিয়ে তিনি তাকে আরও সমৃদ্ধ করেছিলেন। [৪]

জীবনের শেষ বছরে তিনি কনস্টান্টিনোপল সফরেও গিয়েছিলেন যেখানে তাঁকে জমকালো অভ্যর্থনা জানানো হয় এবং ফেরার পথে কায়সার ম্যানুয়েল দ্বিতীয় নিজে তাঁকে উসমানীয় রাষ্ট্রের সীমান্ত পর্যন্ত এগিয়ে দিতে আসেন। [৫]

তাঁর পূর্বপুরুষদের তুলনায় প্রথম মুহাম্মদের ইউরোপে যুদ্ধ খুব সামান্যই হয়েছিল, যাতে বিশেষ কোনো শহর হস্তগত হয়নি, তবে উসমানীয়রা নিজেদের কোনো এলাকা হাতছাড়াও হতে দেয়নি। তদুপরি, এই যুদ্ধগুলোর ফলে এই সুবিধা হয়েছিল যে পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রগুলো উসমানীয়দের দুর্বল ভাবা ছেড়ে দিয়েছিল এবং উসমানীয় বাহিনীর তাৎক্ষণিক আক্রমণের ভয় তাদের অন্তর থেকে দূর হয়ে গিয়েছিল।

মৃত্যু:

কনস্টান্টিনোপল সফর থেকে ফেরার পর প্রথম মুহাম্মদ আমাশয় রোগে আক্রান্ত হন এবং কোনোভাবেই আর সুস্থ হননি। অবশেষে এই মহান সম্রাট ৮২৪ হিজরির রবিউস সানি মাসে (মার্চ ১৪২১ খ্রিষ্টাব্দ) পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। তাঁর বয়স ছিল ৩৮ বছর।

তাঁর মৃত্যুর খবর চল্লিশ দিন পর্যন্ত গোপন রাখা হয়েছিল কারণ তাঁর উত্তরাধিকারী মুরাদ খান আনাতোলিয়া শহরে ছিলেন এবং আশঙ্কা ছিল যে এই খবর কনস্টান্টিনোপলে পৌঁছে গেলে বিদ্রোহী শাহজাদা মোস্তফা সেখান থেকে এসে সিংহাসন দখলের চেষ্টা করবে। [৬]

কীর্তিসমূহ:

প্রথম মুহাম্মদ সাত বছর নয় মাস শাসন করেন। তাঁর সময়ে উসমানীয়দের সাম্রাজ্য খুব একটা বিস্তৃত হয়নি, তবে এটি কোনো অংশে কম ছিল না যে তিনি উসমানীয়দের হারানো সাম্রাজ্যের একটি বড় অংশ পুনরায় উদ্ধার করেন এবং একে সুসংহত করতে সাফল্য অর্জন করেন এবং আনাতোলিয়াকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে নিরাপদ করেন। তিনি কোনো প্রদেশ শত্রুদের হাতে যেতে দেননি। দারদানেলিস প্রণালী তাঁর দখলে ছিল, তাই এর রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক গুরুত্ব ছিল অনেক বেশি এবং কোনো দেশই একে উপেক্ষা করতে পারত না।

[১] তারিখ-ই উসমানি: ১/৩৯৩

[২] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া মিনান নুশ্ব ইলাল ইনহীদার, পৃ. ৩২

[৩] তারিখ-ই উসমানি: ১/৪০০; আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া আয সাল্লাবি, পৃ. ৭৩

[৪] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ, পৃ. ১৪৯; আখবারুদ দুওয়াল লিল কারমানি: পৃ. ২৩; তারিখ-ই উসমানি: ১/৩৯৩

[৫] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া আয ইলমাজ: ১/১১৯

[৬] আখবারুদ দুওয়াল লিল কারমানি: ২৩/৪; তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া আয ইলমাজ: ১/১১৯

তিনি বিরোধীদের সাথে বিচক্ষণতা, সতর্কতা ও সহনশীলতার আচরণ করতেন। বিদ্রোহীদের দমনের পর তিনি তাদের অবস্থা সংশোধনের সুযোগ দিতেন। কারামানের আমীর বিদ্রোহ করলে তাকে পরাজিত করার পর মুহাম্মদ কেবল পবিত্র কুরআনের ওপর ভবিষ্যতে অনুগত থাকার শপথ নিয়ে তাকে ক্ষমা করে দেন। সে পুনরায় বিশ্বাসঘাতকতা করলেও মুহাম্মদ পুনরায় ক্ষমার নীতি অবলম্বন করেন। [১]

এই দূরদর্শী বাদশাহ সালতানাতকে অভ্যন্তরীণভাবে এতটাই শক্তিশালী করেছিলেন যে মানুষ আগের মতো সচ্ছল হয়ে ওঠে, ব্যবসা-বাণিজ্য চাঙ্গা হয়, শিল্প ও কারুশিল্পের প্রসার ঘটে, ইলমি মজলিস, মাদ্রাসা ও খানকাহগুলোর জৌলুস বৃদ্ধি পায়। তিনি প্রতিটি ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে সমান ন্যায়বিচার ও দয়ার আচরণ করেন।

তিনি অনেক মাদ্রাসা ও মসজিদ নির্মাণ করেন। বুর্সার সেই বিশাল মসজিদটি সম্পন্ন করেন যার কাজ সুলতান মুরাদ আউয়াল শুরু করেছিলেন। এটি ইসলামী স্থাপত্যশৈলী ও পাথর খোদাইয়ের এক অনন্য নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হয়। এর সাথে একটি বড় দরসগাহও নির্মাণ করেন এবং লঙ্গরখানা চালু করেন যেখানে দরিদ্রদের বিনামূল্যে খাবার সরবরাহ করা হতো।

তিনি উসমানীয় বংশের প্রথম শাসক ছিলেন যিনি কাবা শরীফ, মসজিদে হারাম এবং মক্কাবাসীদের জন্য একটি বিশাল বার্ষিক অর্থ বরাদ্দ করেন যা ‘সানাবিয়াহ’ ও ‘সুররা’ নামে পরিচিত ছিল। উসমানীয় সুলতানদের মধ্যে এই ধারা অব্যাহত থাকে। এই অর্থ হারামাইন শরীফাইনের সেবা, তত্ত্বাবধান, নির্মাণ ও মেরামত, দরিদ্রদের সাহায্য এবং অন্যান্য জনকল্যাণমূলক ও উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করা হতো। এই কীর্তিগুলোর কারণে মুহাম্মদ আউয়ালকে ‘খাদেমুল হারামাইন আশ-শরীফাইন’ এবং ‘মুহাম্মদ চেলবি’ বলে স্মরণ করা হয়। চেলবি শব্দের অর্থ হলো ‘সাহসী ও গম্ভীর মানুষ’। [২]

তার শান্তিকামী নীতির কারণে যুদ্ধের অবসান ঘটে। পুরো আনাতোলিয়া ও ইউরোপে শান্তির সুবাতাস বইতে শুরু করে এবং উসমানীয় সালতানাত পুনরায় উন্নতির মহাসড়কে ধাবিত হয়।

৮০৪ হিজরি (১৪০২ খ্রিস্টাব্দ) সালে যখন বায়েজিদ ইয়ালদারাম তৈমুরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, তখন উসমানীয় রাষ্ট্রের আয়তন ছিল নয় লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার বর্গকিলোমিটার। বিশ বছর পর ৮২৪ হিজরি (১৪২১ খ্রিস্টাব্দ) সালে যখন মুহাম্মদ আউয়ালের মৃত্যু হয়, তখন এই আয়তন ছিল আট লক্ষ সত্তর হাজার বর্গকিলোমিটার। [৩] অর্থাৎ বায়েজিদের আমলে সালতানাত বিস্তৃতির যে চরম সীমায় পৌঁছেছিল, মুহাম্মদ আউয়ালের সময়ে পুনরায় তার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। পার্থক্য ছিল মাত্র ৭২ হাজার বর্গকিলোমিটারের। কিন্তু মুহাম্মদ আউয়াল যে চরম বিপর্যয় থেকে সালতানাতকে টেনে তুলেছিলেন, তা বিবেচনা করলে এই ঘটতি কোনো গুরুত্বই রাখে না এবং এই বিস্ময়কর কীর্তির কারণেই মুহাম্মদ আউয়ালকে উসমানীয় সালতানাতের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

[১] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ, পৃ. ১৩৯

[২] আখবারুদ দুওয়াল, পৃ. ৩৩; নুযহাতুল আনযার - মাহমুদ মাকদিশি তিউনিসি (মৃত্যু ১২২৮ হি.): ২/১২; তারিখু সালাতিনী বনী উসমান, পৃ. ৪৭

[৩] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়াহ - ইলমাজ: ১/১১৯

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

সুলতান মুরাদ সানি

৮২৪ হিজরি থেকে ৮৫৫ হিজরি

(১৪২১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৫১ খ্রিস্টাব্দ)

সুলতান মুরাদ সানি ছিলেন সুলতান মুহাম্মদ আউয়ালের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং উত্তরাধিকারী। মুহাম্মদ আউয়ালের জীবদ্দশায় তিনি আনাতোলিয়ার গভর্নর ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তিনি এড্রিয়ানোপল পৌঁছান যেখানে তাঁর সিংহাসন আরোহণের ঘোষণা দেওয়া হয়। সে সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৮ বছর। সুলতান মুরাদ সানির শাসনামল ইউরোপীয় শক্তিগুলোর হাত থেকে নিজের সাম্রাজ্য রক্ষায় অতিবাহিত হয়। [১]

কায়সারের ষড়যন্ত্র, মোস্তফা বিন বায়েজিদের বিদ্রোহ:

মুরাদের সিংহাসন আরোহণের খবর শুনে কায়সার ম্যানুয়েল সানি তাঁকে অল্পবয়সী ও অনভিজ্ঞ মনে করে এই বার্তা পাঠান যে, তিনি যেন কোনো যুদ্ধ শুরু না করার অঙ্গীকার করেন এবং এর জামিন হিসেবে তাঁর দুই ভাইকে কনস্টান্টিনোপলে পাঠিয়ে দেন। যদি তিনি তা না করেন, তবে তাঁর চাচা মোস্তফা বিন বায়েজিদ, যিনি বন্দি জীবন অতিবাহিত করছেন, তাঁকে মুক্ত করে দেওয়া হবে। মুরাদ সানি এই অযৌক্তিক দাবিতে কোনো কর্ণপাত করেননি। তখন কায়সার মোস্তফাকে কেবল বিদ্রোহে উস্কানিই দেননি, বরং তাঁকে দশটি যুদ্ধজাহাজ ও সৈন্যদের পূর্ণ সহায়তা প্রদান করেন এবং বিনিময়ে এই প্রতিশ্রুতি নেন যে, তিনি উসমানীয় সাম্রাজ্যের অধিপতি হবেন এবং গ্যালিপলি ও কৃষ্ণসাগরের সমস্ত বাইজেন্টাইন অধিকৃত এলাকা কনস্টান্টিনোপলকে ফিরিয়ে দেবেন। মোস্তফা এই প্রলোভনে পড়ে যান; কায়সারের দেওয়া সামরিক শক্তি নিয়ে তিনি গ্যালিপলিতে আক্রমণ করেন এবং দুর্গটি ছেড়ে শহরটি দখল করে নেন। এরপর তিনি রাজধানী এড্রিয়ানোপলের দিকে অগ্রসর হন।

মুরাদ তাঁর মোকাবিলা করার জন্য প্রধান সেনাপতি বায়েজিদ পাশাকে পাঠান। কিন্তু মোস্তফা তাঁর বাহিনীর সামনে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন যে, আমিই সাম্রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী, আমার বর্তমানে আমার অল্পবয়সী ভতিজার শাসনের কোনো যৌক্তিকতা নেই। অনেক তুর্কি সৈন্য তাঁর অবস্থানের সাথে একমত হয়ে তাঁর সাথে যোগ দেয় এবং তারা নিজেরাই বায়েজিদ পাশাকে হত্যা করে।

মোস্তফার সাহস অনেক বেড়ে যায় এবং তিনি মুরাদ সানির মোকাবিলা করার জন্য রওনা হন। মুরাদ সানি একটি খালের পেছনে পরিখা খনন করে তাঁর অপেক্ষায় ছিলেন। যুদ্ধের আগেই মোস্তফার সৈন্যরা তাঁর বিশ্বাসঘাতকতার কারণে তাঁকে ছেড়ে সুলতান মুরাদের সাথে যোগ দেয়। মোস্তফা পালিয়ে গ্যালিপলি পৌঁছান কিন্তু শেষ পর্যন্ত গ্রেফতার হন এবং মুরাদ তাঁকে ফাঁসি দেন। [২]

[১] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়া, পৃ. ১৫৩

[২] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়া, পৃ. ১৫৩

তারিখে উন্মত্তে মুসলিমা — চতুর্থ খণ্ড

শাহজাদা মোস্তফা বিন মুহাম্মদের বিদ্রোহ:

মুরাদ সানি জানতেন যে এসবই কায়সারের কারসাজি। তাই এর জবাবে তিনি কনস্টান্টিনোপল আক্রমণ করেন। তুমুল যুদ্ধের পর ৩ রমজান ৮২৪ হিজরি (২১ আগস্ট ১৪২২ খ্রিষ্টাব্দ) শহরটি বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে ছিল, কিন্তু কায়সারের ষড়যন্ত্রমূলক রাজনীতি পাশা উল্টে দিল।

মুরাদ সানির এক ছোট ভাই মোস্তফা বিন মুহাম্মদ আনাতোলিয়ার গভর্নর ছিলেন। অবরোধ শুরু হতেই কায়সার তার সাথে গোপন চিঠিপত্র আদান-প্রদান করে তাকে প্ররোচিত করতে শুরু করেন। কায়সারের বক্তব্য ছিল যে, সে যদি বাদশাহ হওয়ার দাবি করে তবে কনস্টান্টিনোপল তাকে সম্ভাব্য সব ধরনের সাহায্য করবে। এর পাশাপাশি কায়সার আনাতোলিয়ার অন্যান্য তুর্কমেন আমিরদেরও মোস্তফা বিন মুহাম্মদের সাহায্যে রাজি করিয়েছিলেন। বিশেষ করে কারামানি আমিররা, যারা উসমানীয়দের সাথে পুরনো শত্রুতা পোষণ করত, প্রতিশোধ নিতে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে লড়িয়ে দিতে মোস্তফার সমর্থক হয়ে গেল। ঠিক সেই দিনগুলোতে যখন কনস্টান্টিনোপল বিজয় হতে যাচ্ছিল, মোস্তফা নিজের শাসন ঘোষণা করলেন এবং সালতানাতে বেশ কয়েকটি শহর দখল করে শেষ পর্যন্ত বুর্সার মতো শক্তিশালী রাজনৈতিক কেন্দ্র ঘেরাও করলেন।

মুরাদ সানিকে কনস্টান্টিনোপলের অবরোধ ত্যাগ করে তার মোকাবিলায় বের হতে হলো। তিনি আনাতোলিয়ায় পৌঁছালেন যেখানে দুই ভাইয়ের মুখোমুখি দেখা হলো। সুলতান মুরাদকে ময়দানে দেখে মোস্তফার অধিকাংশ সৈন্য তার সঙ্গ ছেড়ে আলাদা হয়ে গেল। মোস্তফাকে গ্রেপ্তার করে হত্যা করা হলো। [১]

তুর্কমেন রাষ্ট্রগুলোর ওপর সামরিক অভিযান:

এই ফিতনা দমন করার পরপরই সুলতান মুরাদ আনাতোলিয়ার সেই তুর্কমেন রাষ্ট্রগুলোর ওপর আক্রমণ চালালেন যারা বিদ্রোহের এই আগুন উসকে দেওয়ার সাথে জড়িত ছিল। তিনি কারামানি আমিরকে পরাজিত করে হত্যা করেন এবং তার স্থলে তার পুত্রকে আমির নিযুক্ত করেন। কারামানকে নিজের সালতানাতে অন্তর্ভুক্ত করার পরিবর্তে তিনি কেবল করদ রাজ্যে পরিণত করার ওপর সন্তুষ্ট থাকেন। এরপর সারুখান এবং হামিদীয়া রাষ্ট্রগুলোকে পদানত করা হয়। কাস্তামুনুর আমিরও নতি স্বীকার করেন এবং অর্ধেক রাজ্যের সাথে নিজের মেয়েকেও সুলতান মুরাদের সাথে বিবাহ দেন। ৮৩১ হিজরি (১৪২৮ খ্রিষ্টাব্দ) সালে আমির কারামান মারা গেলে সুলতান মুরাদ তার রাজ্যকে নিজের সালতানাতে সাথে একীভূত করে নেন। এভাবে কয়েক বছরের মধ্যে সেই অধিকাংশ এলাকা পুনরায় উসমানীয়দের অধীনে চলে আসে যা আঙ্কারার যুদ্ধের পর স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল। [২]

নতুন কায়সারের ষড়যন্ত্র। ইউরোপীয় অধিকৃত অঞ্চলে বিদ্রোহ:

কনস্টান্টিনোপলের অবরোধ শেষ হলো এবং এই মুমূর্ষু সাম্রাজ্য আরও ত্রিশ বছর সময় পেয়ে গেল, কিন্তু মুরাদ সানির প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। কিছুদিন পর (১৪২৫ খ্রিষ্টাব্দে) কায়সার ম্যানুয়েল মারা যান এবং তার উত্তরসূরি কায়সার জন প্যালিলোগাস দ্বিতীয় মুরাদ সানি...

[১] তারিখুদ দাওলাতুল আলিয়া, পৃ. ১৫৩

[২] তারিখুদ দাওলাতুল আলিয়া, পৃ. ১৫৫

...কে কর দিতে সম্মত হলো। সন্ধিচুক্তি অনুযায়ী এস্ট্রানিয়া এবং লোহিত সাগরের উপকূলে কায়সারের অবশিষ্ট অধিকৃত অঞ্চলগুলোও উসমানীয়দের হাতে তুলে দেওয়া হলো।

নতুন কায়সার জানতেন যে, উসমানীয়দের পরবর্তী আক্রমণ তার সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করে দিতে পারে, তাই তিনি ইউরোপীয় শাসকদের উসমানীয়দের বিরুদ্ধে উস্কানি দিতে শুরু করলেন। ৮৩১ হিজরিতে সার্বিয়ার রাজা স্টিফেন, যিনি উসমানীয় সাম্রাজ্যের করদ রাজ্য ছিলেন, মৃত্যুবরণ করেন এবং তার স্থলে উগ্র মেজাজের জর্জ বার্নিকোভিচ ক্ষমতায় আসেন। কায়সার তাকে বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত করলেন।

এদিকে দ্বিতীয় মুরাদ ইউরোপে তার শাসন এলাকা সম্প্রসারিত করছিলেন। ৮৩৭-৮৪৩ হিজরিতে (১৪৩০ খ্রি.) তিনি ভেনিসের নৌবহরকে পরাজিত করে স্যালোনিকা, জাণ্টি দ্বীপ এবং দক্ষিণ গ্রিসের বিশাল এলাকা নিজের সাম্রাজ্যভুক্ত করে নেন। ভেনিস কঠোর শর্তে সন্ধি করে নিজেকে রক্ষা করে। ভেনিস ছিল কনস্টান্টিনোপলের মিত্র। এর পরাজয়ে কায়সার আরও বেশি আঘাত পান এবং তিনি উসমানীয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে নতুন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। তার আহ্বানে ইউরোপীয় শাসকরা উসমানীয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করেন। পোল্যান্ডের রাজা লাডিসলাস, যিনি ১৪৩৪ খ্রিস্টাব্দে হাঙ্গেরি দখল করে এক বিশাল শক্তির অধিকারী হয়েছিলেন, কায়সারের সহযোগী হয়ে যান। তিনি তুর্কিদের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় শক্তিগুলোকে একত্রিত করেন। জার্মানি, আলবেনিয়া এবং বসনিয়ার নবাবরাও তার সমর্থক হয়ে যান। উসমানীয় সাম্রাজ্যের করদ রাজ্য ওয়ালাচিয়াও তাদের সাথে যোগ দেয়।

অন্যদিকে ইউরোপীয় দেশগুলোর ইশারায় উসমানীয় সাম্রাজ্যের নববিজিত ইউরোপীয় শহরগুলোতে বিদ্রোহ শুরু হয়ে যায়। বিদ্রোহীরা তুর্কি কর্মকর্তাদের ট্রান্সিলভেনিয়া প্রদেশ থেকে বিতাড়িত করে দেয়।

ইউরোপীয় শক্তিগুলোর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ বুলগেরিয়ায় অগ্রসর হন এবং বেলগ্রেড অবরোধ করেন। এদিকে তার সেনাপতি ফরিদ পাশা ট্রান্সিলভেনিয়ার হারমানস্টাড দুর্গ ঘেরাও করেন। এই অভিযানের সময় হঠাৎ আনাতোলিয়ায় কারামানিরা বিদ্রোহ করে বসে এবং সুলতান মুরাদকে অভিযান ছেড়ে সেখানে যেতে হয়। এটি ৮৪৭ হিজরির (১৪৪২ খ্রি.) ঘটনা। সুলতান মুরাদ আনাতোলিয়ায় পৌঁছে কারামানিদের বিদ্রোহ দমন করেন। আমির ইব্রাহিম গ্রেফতার হন। ইবনে হাজার আসকালানি রহ. ফতোয়া দেন যে, যদি সে তওবা না করে তবে সে মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য, কারণ সে জিহাদে ব্যস্ত সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। ইব্রাহিম ক্ষমা প্রার্থনা করে সুলতান মুরাদের সাথে সন্ধি করেন। সুলতান তাকে ক্ষমা করে দেন। [১]

হুনিয়াদি জানোসের সাথে যুদ্ধ। সন্ধিচুক্তি:

এই দিনগুলোতে পশ্চিম ইউরোপের একজন সেনাপতি হুনিয়াদি জানোস (Hunyadi Janos) উসমানীয় তুর্কিদের বিরুদ্ধে লড়াইতে হাঙ্গেরি পৌঁছান। তিনি হাঙ্গেরির প্রাক্তন রাজার অবৈধ সন্তান ছিলেন। যুদ্ধ অভিজ্ঞতা, ধূর্ততা এবং চতুরতায় তার অনেক খ্যাতি ছিল।

তিনি এসেই ট্রান্সিলভেনিয়া অবরোধকারী ফরিদ পাশার বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করেন এবং তাকে পরাজিত করে শহরের অবরোধ ব্যর্থ করে দেন। এই যুদ্ধে ফরিদ পাশা এবং তার পুত্র গ্রেফতার হন। হুনিয়াদি তাদের দুজনের টুকরো...

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ: ১/ ১২২ থেকে ১২৫।

টুকরো করে দিল। হুনিয়াদে মুসলমানদের প্রচণ্ড ঘৃণা করত। তার রক্তপিপাসার অবস্থা এমন ছিল যে, সে প্রতিদিন খাবার খাওয়ার সময় তুর্কি বন্দীদের তলব করত এবং তাদের শিরশ্ছেদ করাত।

মুরাদ সানি যখন এই পরাজয় এবং হুনিয়াদের রক্তপাতের খবর পেলেন, তখন তিনি শাহাবুদ্দিন পাশাকে ৮০ হাজার সৈন্য দিয়ে মোকাবিলার জন্য পাঠালেন। ওয়াজগ-এর ময়দানে যুদ্ধ হলো। এবারও হুনিয়াদে বিজয়ী হলো।

এই বিজয়গুলো ইউরোপীয় শক্তিগুলোর মধ্যে এক প্রচণ্ড উদ্দীপনা সৃষ্টি করল, যা দেখে রোমের পোপ চতুর্থ জন ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের ঘোষণা দিলেন এবং মুরাদ সানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করাকে ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে নির্ধারণ করলেন। হাঙ্গেরির রাজা ছাড়াও ওয়ালাচিয়া, বসনিয়া, ফ্রান্স এবং জার্মানি পর্যন্ত বাহিনীগুলো মুরাদ সানির বিরুদ্ধে জোটে शामिल হলো। ভেনিস এবং জেনোয়ার নৌবহরও ক্রুসেডারদের সাহায্যের জন্য পৌঁছে গেল। হুনিয়াদেকে এই সম্মিলিত বাহিনীর সেনাপতি নির্বাচিত করা হলো।

ক্রুসেডার বাহিনী ক্রমাগত অগ্রসর হতে হতে দানিউব নদী পার হয়ে গেল এবং তুর্কিদের সীমান্ত চৌকি ও দুর্গগুলো জয় করতে থাকল। ১৪৪৩ খ্রিস্টাব্দে নিশ নামক স্থানে একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হলো। তুর্কি বাহিনী এখানেও পরাজয় বরণ করল, চার হাজার মুসলমান শহীদ ও বন্দী হলেন। হুনিয়াদে সোফিয়া দখল করে নিল। এরপর সে ফিলিপোপোলিস থেকেও তুর্কিদের বিতাড়িত করল। বলকান পর্বতমালার উপত্যকায় তুর্কিরা আবারও ব্যুহ রচনা করল, কিন্তু এবারও ক্রুসেডাররা বিজয়ী হলো। হুনিয়াদে প্রকাশ্যে রুমেলিয়ায় লুটতরাজ ও ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে থাকল। তুর্কিদের রাজধানী আদ্রিয়ানোপল তার সামনে ছিল, কিন্তু সতর্কতার কারণে সে আর অগ্রসর হলো না। সুলতান মুরাদ কারামানিদের বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত ছিলেন, তাই তিনি ইউরোপীয় রণাঙ্গনে পৌঁছাতে পারেননি, যেখানে ক্রমাগত বিজয় ক্রুসেডারদের মনোবল বাড়িয়ে দিয়েছিল আর তুর্কিদের সাহস ভেঙে পড়ছিল। মুরাদ যখন আনাতোলিয়ার অভিযান শেষ করে আদ্রিয়ানোপলের দিকে রওনা হলেন, তখন ক্রুসেডাররা বলকানের বিশাল এলাকা জয় করে ফেলেছিল। তবে মুরাদের আগমনের খবর শুনে ক্রুসেডাররা আর অগ্রসর হওয়া বন্ধ করে দিল। হুনিয়াদে অগণিত গনিমতের মাল এবং বন্দীদের নিয়ে ফিরে গেল।

সুলতান মুরাদ রণাঙ্গনে পৌঁছে নিজের বাহিনীর মনোবল ভেঙে পড়তে দেখে আপাতত সন্ধি করাকেই শ্রেয় মনে করলেন। এই যুদ্ধে তার ভগ্নিপতি মুহাম্মদ চেলপিও বন্দী হয়েছিলেন এবং পরিবারের পক্ষ থেকে চাপ ছিল যে, যেকোনো উপায়ে তাকে মুক্ত করতে হবে। ‘জেগেডিন’ নামক স্থানে মিত্রশক্তির সাথে আলোচনা হলো। খ্রিস্টানরা ইঞ্জিল এবং মুসলমানরা কুরআনের ওপর শপথ নিয়ে ৮৪৮ হিজরি (১২ জুলাই ১৪৪৪ খ্রিস্টাব্দ) পারস্পরিক একটি চুক্তি করল, যার শর্তানুযায়ী:

- দশ বছরের জন্য যুদ্ধবিরতি হলো।
- সার্বিয়া স্বাধীন ঘোষিত হলো। এর রাজা জর্জ ব্র্যাক্সোভিচের কাছ থেকে কর আদায় বন্ধ করে দেওয়া হলো।
- ওয়ালাচিয়া হাঙ্গেরিকে দিয়ে দেওয়া হলো।
- লশকর প্রধান মুহাম্মদ চেলপি, যিনি যুদ্ধে বন্দী হয়েছিলেন, তাকে মোটা অংকের মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত করা হলো। [১]

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ, পৃ. ২২১-২২৩; তারিখে উসমানি, উজুন: ১/ ২৪৭-২৮২।

সুলতানের নির্জনবাস - খ্রিস্টানদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ:

সুলতান মুরাদ ২২ বছরের যুদ্ধ এবং গৃহযুদ্ধ থেকে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। ইউরোপের কাছে সাম্প্রতিক পরাজয় তাকে মানসিকভাবে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল, তবে শান্তি চুক্তির কারণে তিনি আশ্বস্ত ছিলেন যে এখন দশ বছর শান্তিতে কাটবে। তিনি একজন ইবাদতকারী ও পরহেজগার মানুষ এবং মেজাজের দিক থেকে দরবেশ ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন বাকি জীবন ইবাদত এবং আল্লাহর জিকিরে মশগুল থাকতে। এরই মধ্যে তার উত্তরাধিকারী আলাউদ্দিনের ইন্তেকাল হয়ে যায়, যার ফলে তার দুঃখ আরও বেড়ে যায়। তিনি তার দ্বিতীয় পুত্র মুহাম্মদ খানকে, যার বয়স তখন ১২ বছর ছিল, সিংহাসনে বসিয়ে দেন এবং নিজে আনাতোলিয়ায় গিয়ে নির্জনবাস গ্রহণ করেন এবং খানকাহগুলোতে সময় কাটাতে শুরু করেন।

শাহজাদা মুহাম্মদ খানের সিংহাসন আরোহণের কিছু দিন পরেই এদিকে কারামানিরা আনাতোলিয়ায় বিদ্রোহ করে দেয়। ওদিকে সুলতান মুরাদের নির্জনবাস এবং কারামানিদের বিদ্রোহ ইউরোপীয় শক্তিগুলোকে অবিলম্বে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গে প্ররোচিত করে, যদিও চুক্তির এক মাসও অতিবাহিত হয়নি। পোপের প্রতিনিধি কার্ডিনাল জুলিয়ান, যিনি শুরু থেকেই শান্তির বিপক্ষে ছিলেন, ইউরোপীয় শাসকদের সাথে দেখা করেন এবং পোপের পূর্ণ সমর্থনে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের ওপর জোর দেন। তিনি বিশ্বাস করান যে, মুসলমানদের সাথে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা গুনাহ এবং এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা সওয়াবের কাজ। অবশেষে ক্রুসেডাররা শান্তি চুক্তি ভেঙে যুদ্ধের জন্য কোমর বেঁধে নেমে পড়ে। হুনিয়াডে শুরুতে চুক্তি ভাঙার বিরোধিতা করেছিলেন, কিন্তু যখন তাকে প্রলোভন দেখানো হলো যে বিজয়ের পর তাকেই বুলগেরিয়ার রাজা বানানো হবে, তখন তিনিও রাজি হয়ে গেলেন। হাঙ্গেরিতে খ্রিস্টান রাষ্ট্রগুলোর জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যেখানে চুক্তি ভঙ্গের ঘোষণা দেওয়া হয়। তবে সিদ্ধান্ত হয় যে, আক্রমণ ১ সেপ্টেম্বর ১৪৪৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্থগিত রাখা হবে যাতে সেই সময়ের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী সীমান্ত দুর্গগুলো তুর্কিদের কাছ থেকে খালি করিয়ে নেওয়া যায়।

তুর্কিরা, যারা এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে একেবারেই অবগত ছিল না, চুক্তি অনুযায়ী দুর্গগুলো খালি করে দেয়। এই খবর পাওয়া মাত্রই হাঙ্গেরি ও পোল্যান্ডের রাজা লাডিসলাস তৃতীয়, তার নায়েব জেনারেল হুনিয়াডে এবং কার্ডিনাল জুলিয়ান মিত্র বাহিনীর সাথে যাত্রা শুরু করেন। পোপের পতাকা এই বাহিনীর সাথে ছিল। ২ সেপ্টেম্বর ক্রুসেডাররা তুর্কি সীমান্তে প্রবেশ করে। তারা পথে আসা গ্রামগুলোতে অগ্নিসংযোগ করে দেয়, এই ধ্বংসযজ্ঞে অনেক গির্জাও পুড়ে যায় কিন্তু আক্রমণকারীরা কোনো পরোয়া করেনি। অবশেষে এই লাগামহীন শক্তি তুর্কিদের দুর্গগুলো জয় করতে করতে ‘ভার্না’ পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং শহরটি অবরোধ করে। এই সময়ে ভেনিস, বারগান্ডি এবং জেনেভার নৌবহর দার্দানেলেস প্রণালীতে প্রবেশ করে যাতে তুর্কিরা সমুদ্র পার হয়ে ইউরোপীয় সীমান্তে সাহায্য পৌঁছাতে না পারে।

এই পরিস্থিতিতে সালতানাতের আমীরগণ সুলতান মুরাদের কাছে পৌঁছান এবং আবেদন করেন যে তিনি যেন পুনরায় সালতানাতের বিষয়াবলী নিজের হাতে নিয়ে প্রতিপক্ষের মোকাবিলা করেন, অন্যথায় দেশ রক্ষা করা কঠিন হবে। সুলতান মুরাদ পরিস্থিতির নাজুকতা দেখে পুনরায় সিংহাসনে আসীন হন। তিনি অবিলম্বে চল্লিশ হাজার সৈন্য প্রস্তুত করেন এবং রণাঙ্গনের দিকে রওনা হন। দার্দানেলেস প্রণালীতে জেনেভার নৌবহরকে ঘুষ দিয়ে তিনি ইউরোপের উপকূলে অবতরণ করেন এবং দ্রুত সামনে এগিয়ে গিয়ে ভার্না থেকে চার মাইল দূরে ছাউনি ফেলেন। এখানে ব্যূহ বিন্যাস করা হয়। ডান বাহুর কমান্ড আনাতোলিয়ার বেগ্লারবে কারাচা বে-কে এবং বাম বাহুর কমান্ড রুমেলির বেগ্লারবে...

শিহাবুদ্দিন পাশার ওপর অর্পণ করা হলো। মধ্যভাগের নেতৃত্ব সুলতান নিজে গ্রহণ করলেন এবং প্রথা অনুযায়ী ইয়েনি চেরি বাহিনীকে সাথে রাখলেন। ইয়েনি চেরি বাহিনী তাদের সামনে পরিখা খনন করে নিল যাতে প্রয়োজনে সেগুলোর আড়ালে থেকে প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করা যায়।

ক্রুসেডারদের কল্পনায়ও ছিল না যে সুলতান মুরাদ নিজে সৈন্যবাহিনী নিয়ে উপস্থিত হবেন, কিন্তু হুনিয়াদে পূর্ববর্তী বিজয়গুলোর কারণে অত্যন্ত অহংকারে মত্ত ছিল। সে সমস্ত সতর্কতা উপেক্ষা করে ১লা শাবান ৮৪৮ হিজরি (২৪ নভেম্বর ১৪৪৪ খ্রিষ্টাব্দ) উসমানীয়দের ওপর আক্রমণ চালিয়ে দিল। সারাদিন অত্যন্ত ভয়াবহ যুদ্ধ চলল। আসরের কাছাকাছি সময়ে শত্রুর প্রচণ্ড চাপে মুসলমানদের কাতারগুলো ছত্রভঙ্গ হয়ে যাচ্ছিল। একদিকে হুনিয়াদে, যে মিত্রবাহিনীর বাম পার্শ্বের কমান্ডার ছিল, উসমানীয়দের ডান পার্শ্বকে পিছু হটতে বাধ্য করেছিল। অন্যদিকে রোমানিয়ার বাহিনী তাদের সমস্ত শক্তি উসমানীয়দের বাম পার্শ্ব কেন্দ্রীভূত করে সেটিকেও পেছনে সরিয়ে দিয়েছিল। মুসলমানদের উভয় পার্শ্বকে পিছু হটতে দেখে হাঙ্গেরির রাজা লাডিসলাস নিশ্চিত হয়ে গেল যে উসমানীয়দের শক্তি শেষ হয়ে গেছে। সে উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে তার বিশেষ বাহিনী নিয়ে সামনে এগিয়ে এল এবং পূর্ণ শক্তিতে ইসলামের মধ্যভাগের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, যেখানে সুলতান মুরাদ ময়দানে অটল ছিলেন এবং আল্লাহর কাছে বিজয় ও সাহায্যের প্রার্থনা করছিলেন। হাঙ্গেরির রাজা তার বাহিনীসহ সুলতান মুরাদের বিশেষ বাহিনীর কাছে পৌঁছে গেল। সুলতান মুরাদ তার বাহিনীকে উৎসাহিত করলেন এবং উভয় পক্ষের সৈন্যরা একে অপরের সাথে জড়িয়ে পড়ল। এই সময়ে ইয়েনি চেরি বাহিনীর একজন অফিসার তৈমুরতাশ হাঙ্গেরির রাজার কাছে পৌঁছে গেল এবং কুঠার দিয়ে তার ঘোড়ার পায়ে এমন মোক্ষম আঘাত করল যে ঘোড়ার সাথে হাঙ্গেরির রাজাও মাটিতে পড়ে গেল। ইয়েনি চেরি সেনাপতি খাজা খিজির এটি দেখামাত্রই সেদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং নির্দয়ভাবে হাঙ্গেরির রাজার শিরশ্ছেদ করে তা বর্শার মাথায় গেঁথে দিল এবং চিৎকার করে বলল: “এই যে হাঙ্গেরির দুর্ভাগা রাজার মাথা।”

এটি দেখে হাঙ্গেরি ও পোল্যান্ডের বাহিনীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ল এবং তুর্কিরা প্রাণভরে তাদের লাশ ফেলতে লাগল। এই গোলযোগের মধ্যে কার্ডিনাল জুলিয়ান, যে এই যুদ্ধের আগুন জ্বালানোর মূল অপরাধী ছিল, নিহত হলো। হুনিয়াদে কিছুক্ষণ তার বাহিনীর সাথে অটল থেকে যুদ্ধ চালিয়ে গেল। সে হাঙ্গেরির রাজার মাথা ফিরিয়ে নেওয়ার অনেক চেষ্টা করল কিন্তু ব্যর্থ হলো। অবশেষে হুনিয়াদেও পলায়নের পথ বেছে নিল। তুর্কিরা তাদের পিছু নিল এবং মিত্রবাহিনীর দুই-তৃতীয়াংশ সৈন্যকে তলোয়ারের আঘাতে শেষ করে দিল। যুদ্ধের সময়কাল ছিল সকাল থেকে আসর পর্যন্ত। ৯০ হাজার খ্রিষ্টান বন্দী হলো। তুর্কিদের প্রায় দশ হাজার জানবাজ শহীদ হলেন, যাদের মধ্যে সুলতানের ভগ্নিপতি এবং বইলারবে কারাজা পাশাও ছিলেন। [১]

উসমানীয়দের ধর্মীয় সহনশীলতার সার্বদের ওপর প্রভাব:

এই যুদ্ধ ইউরোপীয় শক্তিগুলোর অগ্রযাত্রাকে থামিয়ে দিল এবং তুর্কিদের প্রভাব-প্রতিপত্তি আবারও প্রতিষ্ঠিত হলো। হুনিয়াদে এরপর আর পুনরায় আক্রমণের সাহস করতে পারেনি, তার নিজস্ব ধর্মীয় গোঁড়ামিও তার বদনামের কারণ হয়েছিল এবং তাদের অনেক মিত্র মুরাদের সাথে যোগ দিল। হুনিয়াদে ক্যাথলিক রোমান চার্চের অনুসারী ছিল, যেখানে সার্বিয়া ও বসনিয়ার খ্রিষ্টানরা গ্রিক চার্চের অনুসারী ছিল। হুনিয়াদে গ্রিক চার্চের ঘোর বিরোধী ছিল। পশ্চিমা ঐতিহাসিকদের বর্ণিত বর্ণনা অনুযায়ী

[১] আখবারুদ দুওয়াল: ৩/২৬; তারিখুদ দাওলাতিল উসমানীয়াহ (ইলমাজ): ২/১২৬, ১২৭; তারিখে উসমানী: ১/৩৯০ থেকে ৩৯৩।

বসনিয়ার সর্দার বার্নিকোভিচ যখন হুনিয়াদির কাছে জানতে চাইলেন যে, বিজয়ের পর আপনি সার্বিয়া ও বসনিয়ার অধিবাসীদের সাথে কী আচরণ করবেন? তখন সে উত্তর দিল: “আমি তাদের জোরপূর্বক রোমান চার্চে অন্তর্ভুক্ত করব।”

ভার্নার যুদ্ধে হুনিয়াদির পরাজয়ের পর যখন সেই সর্দার সুলতান মুরাদের কাছে একই প্রশ্ন করলেন, তখন উত্তর পেলেন: “আমি খ্রিস্টানদের তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী ইবাদত করার অনুমতি দেব।”

সুলতানের এই উদারতার কারণে সার্বিয়া ও বসনিয়া আবারও উসমানীয় সালতানাতের অনুগত হয়ে গেল এবং তাদের অনেক সর্দার সানন্দে ইসলাম গ্রহণ করল। [১]

সুলতান মুরাদের নির্জনবাস..... তৃতীয়বার শাসনভার গ্রহণ:

সুলতান মুরাদ এই বিজয়ের পর নিশ্চিত হয়ে আবারও নির্জনবাস গ্রহণ করেন এবং শাহজাদা মুহাম্মদ খানকে সিংহাসনে বসান। কিছুকাল পরিস্থিতি স্বাভাবিক ছিল এবং সুলতান মুরাদ “আইদিন”-এ একাগ্রচিত্তে ইবাদতে মগ্ন ছিলেন, কিন্তু তাকে এই সিদ্ধান্ত তখন প্রত্যাহার করতে হয় যখন ইয়েনি চেরি বাহিনী বেতন ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির দাবি জানিয়ে এক হাঙ্গামা সৃষ্টি করে।

উসমানীয় বাহিনীর এই সবচেয়ে অনুগত অংশটি এতটাই অবাধ্য হয়ে উঠেছিল যে, সাধারণ আমিররা তাদের সামলাতে অক্ষম হয়ে পড়েন। এমন পরিস্থিতিতে সালতানাতের আমিরগণ সুলতান মুরাদের কাছে পুনরায় শাসনের লাগাম ধরার আবেদন জানান। সুলতান বুঝতে পেরেছিলেন যে, তার কপালে শান্তিতে বসে থাকা নেই এবং রাষ্ট্রীয় কাজ থেকে তার দূরে থাকা দেশ ও জাতির জন্য চরম ক্ষতিকর। তিনি পুনরায় এড্রিয়ানোপলে পৌঁছান এবং সিংহাসন গ্রহণ করেন। তার আগমনে প্রজাসাধারণ ও সেনাবাহিনী তাকে চমৎকারভাবে অভ্যর্থনা জানায়। ইয়েনি চেরি বাহিনীও বিদ্রোহ ত্যাগ করে। সুলতান তার বাকি জীবন দেশের দেখাশোনায় অতিবাহিত করেন এবং তার পুত্র মুহাম্মদ খানকে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার জন্য এশিয়া মাইনরের গভর্নর নিযুক্ত করেন। [২] এই মুহাম্মদ খানই পরবর্তীতে সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ নামে পরিচিত হন।

হুনিয়াদির সাথে শেষ যুদ্ধ..... সার্বিয়ার অন্তর্ভুক্তি:

কিছুকাল পর সুলতান মুরাদকে কায়সারের অনুগত রাষ্ট্র ‘মোরিয়া’ আক্রমণ করতে হয়। এই রাষ্ট্রের এক অংশে কায়সারের এক ভাই থমাস এবং অন্য অংশে তার দ্বিতীয় ভাই কনস্টানটাইন শাসন করত। কনস্টানটাইন সুলতান মুরাদের সীমানায় অগ্রসর হয়ে কিছু এলাকা দখল করে নিয়েছিল। সুলতান মুরাদ করিহ্দের যোজক পার হয়ে পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এই যুদ্ধে উসমানীয় বাহিনী প্রথমবারের মতো গোলন্দাজ বাহিনী ব্যবহার করে। কামানের গর্জনে কায়সারের ভাইদের অন্তর কেঁপে ওঠে এবং তারা আনুগত্য স্বীকার করে নেয়। এভাবে মোরিয়া উসমানীয়দের করদ রাজ্যে পরিণত হয়।

ওদিকে ভার্নার পরাজয় হুনিয়াদিকে—যে কার্যত হাঙ্গেরির শাসক হয়ে বসেছিল—এতটাই বিচলিত করে রেখেছিল যে, সে ফিরে গিয়ে এক নতুন যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে দেয়। সে যেকোনো মূল্যে পরাজয়ের কলঙ্ক মুছে ফেলতে এবং নিজের মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছিল।

[১] দৌলতে উসমানিয়া, ডক্টর আজিজ: ১/৮৮, বরাতে ক্রেসি: ১/১১৩

[২] আখবারুদ দুওয়াল: ২/৩

তারিখ উম্মতে মুসলিমা - চতুর্থ খণ্ড

ছিল। সে বছ বছর ধরে বসনিয়া ও সার্বিয়ার শাসকদের উসমানীয়দের থেকে চিরস্থায়ী স্বাধীনতার প্রলোভন দেখিয়ে নিজের সাথে রাখার চেষ্টা করতে থাকে। একইভাবে অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলোকেও সে উসমানীয়দের বিরুদ্ধে উস্কানি দিতে থাকে। অবশেষে সে এক লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করে ফেলে, যার মধ্যে হাঙ্গেরীয়, জার্মান, পোলিশ, সার্ব এবং বসনিয় উপজাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। সামগ্রিকভাবে এগুলো ছিল ছোট-বড় ৩৮টি বাহিনী এবং ভিন্ন ভিন্ন বংশোদ্ভূত হওয়ার কারণে এক বাহিনীর সৈন্যেরা অন্য বাহিনীর ভাষাও বুঝত না। হুনিয়াদে এই মিত্রবাহিনীকে নিয়ে কসোভোতে পৌঁছায়। ওদিকে সুলতান বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে পাল্টা আক্রমণ করেন। ১৭ অক্টোবর ১৪৪৮ খ্রিস্টাব্দে কসোভোর সেই ঐতিহাসিক ময়দানে যুদ্ধ শুরু হয়, যেখানে ৫৯ বছর আগে ইউরোপীয় বাহিনী সুলতান মুরাদ আউয়ালের মোকাবিলায় শোচনীয় পরাজয় বরণ করেছিল। তিন দিন ও তিন রাত পর্যন্ত যুদ্ধ চলতে থাকে। লাশের স্তুপ জমে যায়। তৃতীয় দিন সুলতানের সেনাপতি তুরখান পাশা নিজের বাহিনী নিয়ে পেছন দিক থেকে গিয়ে শত্রুর পালানোর পথ বন্ধ করে দেন, অন্যদিকে ডান ও বাম দিক থেকে সুলতান তাদের ঘেরাও করে ফেলেছিলেন। অবশেষে মিত্রবাহিনী শোচনীয় পরাজয় বরণ করে পালিয়ে যায়। তাদের সতেরো হাজার সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয়, অন্যদিকে উসমানীয়দের চার হাজার সৈন্য শহীদ হন। এই যুদ্ধ ইউরোপীয় শক্তিগুলোকে অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত করে দেয়। তারা পুনরায় হুনিয়াদের সাথে দাঁড়ানোর সাহস করতে পারেনি। হুনিয়াদে এই পরাজয়ের পর নিজের খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলে। সার্বিয়ার স্বাধীনতা শেষ হয়ে যায় এবং একে তুর্কি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয় এবং বসনিয়া তুর্কিদের করদ রাজ্যে পরিণত হয়। [১]

আলবেনীয় রাজপুত্র সিকান্দার বেগের বিদ্রোহ:

মুরাদ সানির শাসনের শুরুর বছরগুলোতে আলবেনিয়ার আমির জন কাস্ট্রিয়ট তার চার ছেলেকে সুলতান মুরাদের দরবারে পাঠান যাতে তাদের ইয়েনি চেরি বাহিনীতে ভর্তি করা হয়। ভাগ্যের পরিহাস যে, তাদের মধ্যে তিন রাজপুত্র প্রশিক্ষণের সময় মারা যান। জন কাস্ট্রিয়টের সন্দেহ হয় যে তাদের বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে। সে সুলতানকেও নিজের সন্দেহের কথা জানায় এবং চতুর্থ রাজপুত্র জর্জ কাস্ট্রিয়টের বিশেষ নিরাপত্তার আবেদন করে। সুলতান সেই অনুযায়ী জর্জ কাস্ট্রিয়টকে বিশেষ তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ দেওয়ান এবং ইসলামি শিক্ষার সাথে পরিচিত করান। সে যখন আঠারো বছর বয়সে পৌঁছায়, তখন তাকে একটি সামরিক দলের সেনাপতি বানিয়ে দেওয়া হয়। কিছুকাল পর তাকে সিকান্দার বেগ উপাধি দিয়ে একটি অঞ্চলের শাসক নিযুক্ত করা হয়।

৮৩৬ হিজরিতে জন কাস্ট্রিয়টের মৃত্যু হলে সুলতান আলবেনিয়াকে উসমানীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। সিকান্দার বেগের পক্ষে এটি সহ্য করা সম্ভব হয়নি। এগুলো ছিল সেই দিন যখন হুনিয়াদে তুর্কিদের সাথে যুদ্ধ শুরু করে ক্রমাগত সাফল্য অর্জন করছিল। সিকান্দার বেগ একে তুর্কিদের থেকে আলবেনিয়ার স্বাধীনতার সুবর্ণ সুযোগ মনে করে এবং একদিন সুলতানের প্রধান লিপিকারের কামরায় ঢুকে খঞ্জরের মুখে তার থেকে আলবেনিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত দুর্গ আক হিসারের দলিল নিজের নামে লিখিয়ে নেয় এবং পালিয়ে আলবেনিয়া পৌঁছে যায়। আক হিসারের তত্ত্বাবধায়ককে সেই দলিল দেখিয়ে সে দুর্গটি দখল করে নেয়। এরপর সে ধর্মত্যাগী হওয়ার ঘোষণা দিয়ে...

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া: ১/ ১২৭, ১২৮

পুরো আলবেনিয়া থেকে তুর্কিদের বিতাড়িত করার অভিযান শুরু করে দিল। তার দেশবাসী দলে দলে তার চারপাশে সমবেত হতে লাগল। সে পুরো আলবেনিয়ায় তুর্কিদের গণহত্যা চালান। তলোয়ারের হাত থেকে বেঁচে যাওয়া মুসলমানরা হিজরত করতে বাধ্য হলো। সুলতান মুরাদ এই ফিতনা নির্মূল করার অনেক চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু আলবেনিয়ার ওপর আধিপত্য অর্জন করতে পারেননি। [১]

সুলতান মুরাদ সানির ইন্তেকাল:

সুলতান মুরাদ সানির বাকি জীবন শান্তি ও স্বস্তির সাথে অতিবাহিত হলো। তিনি নিজের সালতানাতকে উন্নত করতে এবং আদল ও ইনসাফ কায়েম রাখতে মশগুল ছিলেন। ২৯ বছর ১০ মাসের দীর্ঘ শাসনকাল অতিবাহিত করার পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং চার দিনের সংক্ষিপ্ত অসুস্থতার পর ৫ মহররম ৮৫৫ হিজরি (৯ ফেব্রুয়ারি ১৪৫১ খ্রিস্টাব্দ) তারিখে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। তাঁর বয়স ছিল ছেচল্লিশ বছর। তাঁকে বুরসায় দাফন করা হয়। তিনি ছিলেন শেষ উসমানীয় বাদশাহ যাকে এই শহরে সমাহিত করা হয়েছে। [২]

সুলতান মুরাদ সানির চরিত্রের এক বলক:

সুলতান মুরাদ সানি ছিলেন একজন সাদাসিধে মেজাজ, দরবেশ স্বভাবের এবং মুজাহিদ শাসক। তিনি ইলম ও ফজিলতে পুরোপুরি সজ্জিত ছিলেন। ইবনে আরব শাহের মতো ওলামায়ে কেরাম তাঁর উস্তাদদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি হাফেজে কুরআন ছিলেন, ১৮ বছর বয়স থেকে তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত ছিলেন এবং প্রচুর নফল রোজা রাখতেন। তাঁর বেশিরভাগ সময় প্রাসাদের আরাম-আয়েশের পরিবর্তে মসজিদ, মাদ্রাসা বা খানকাহগুলোতে অতিবাহিত হতো। সুফিয়ায়ে কেরামের সাথে তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিনি তাঁর কবরের ওপর কোনো গম্বুজ না বানানোর ওসিয়ত করেছিলেন।

তিনি নির্মাণকাজের শৌখিন ছিলেন। বুরসায় জামে মসজিদ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়েম করেছেন যা আজও বিদ্যমান। এড্রিয়ানোপলে একটি দারুল হাদিস, বেশ কিছু দরসগাহ এবং তিন মিনার বিশিষ্ট এক বিশাল মসজিদ তাঁর স্মৃতিচিহ্ন। এরকমে নদীর ওপর তিনি “উজুন কুবরা” নামে প্রায় চারশ মিটার দীর্ঘ এক বিশাল সেতু নির্মাণ করান যা ষোলো বছরে সম্পন্ন হয়েছিল। তাঁর আদল ও ইনসাফ ছিল সন্দেহাতীত। [৩]

তিনি সর্বদা জিহাদের ওপর মনোযোগ নিবদ্ধ রাখতেন। তিনি মুসলিম বাদশাহদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার পক্ষপাতী ছিলেন, এজন্য যথাসম্ভব তাদের সাথে যুদ্ধের কোনো অজুহাত তৈরি হতে দিতেন না। এ বিষয়ে তিনি তাঁর পিতা মুহাম্মদ চেলপির সমমনা ছিলেন। তৈমুর লং উসমানীয় বাদশাহীকে নিজের করদ রাজ্যে পরিণত করেছিলেন। মুহাম্মদ চেলপি এই সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। মুরাদ সানির যুগে তৈমুরি সালতানাত দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং উসমানীয় সালতানাত পুনরায় উন্নতির দিকে ধাবিত হচ্ছিল। এমন পরিস্থিতিতে মোগলদের সাথে আনুগত্যের সম্পর্ক বজায় রাখা জরুরি ছিল না, কিন্তু সুলতান মুরাদ সানি নিছক লৌকিকভাবে হলেও তৈমুর লং-এর উত্তরসূরি শাহ রুখের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে রেখেছিলেন, যাতে অকারণে রক্তপাতের পরিস্থিতি তৈরি না হয়। [৪]

[১] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়া, পৃ. ১৫৮, ১৫৯

[২] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়া, পৃ. ১৫৫ থেকে ১৫৯; তারিখু সালাতিন বনি উসমান, পৃ. ৫০ থেকে ৫২; আখবারুদ দুওয়াল, ৩/২৭; তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া আজ ইলমাজ: ১/১২৯

[৩] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া আজ ইলমাজ: ১/১৩০

[৪] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া আজ ইলমাজ: ১/১৩০

চতুর্থ খণ্ড

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

অমুসলিম ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে সুলতান মুরাদ সানি:

অমুসলিম ঐতিহাসিকগণও সুলতান মুরাদের ন্যায়পরায়ণতা এবং উচ্চ চরিত্রের প্রশংসা করেন। বাইজেন্টাইন ঐতিহাসিক প্রিন্স ডুকাস (Prens Dukas) লিখেছেন:

“তিনি জনগণকে ভালোবাসতেন। দুর্বলদের প্রতি দয়ালু ছিলেন। এ ব্যাপারে মুসলিম বা খ্রিস্টান প্রজাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। উভয়ের সাথে সমান আচরণ করতেন। তিনি শত্রুদের সাথে কৃত ওয়াদা পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। যে কেউ তাঁর সাথে ওয়াদা ভঙ্গ করত, সে আল্লাহর আযাবের শিকার হতো। তিনি যুদ্ধের জন্য নিজে অটল থাকতেন কিন্তু শান্তি ও নিরাপত্তার ছায়ায় জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা এবং নির্মাণ কাজে ব্যস্ত থাকাকে অগ্রাধিকার দিতেন। তিনি প্রতিটি যুদ্ধ চরম প্রয়োজনের ভিত্তিতে করেছেন। যখন তিনি শত্রুদের ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করতেন, তখন তাদের ধ্বংস করে ফেলার পর্যায় পর্যন্ত যেতেন না বরং সন্ধির দরজা খোলা রাখতেন।” [১]

জার্মান ঐতিহাসিক ভ্যান হ্যামার (Van Hammer) লিখেছেন:

“সুলতান মুরাদ ন্যায়বিচার ও আভিজাত্যের সাথে ৩০ বছর শাসন করেছেন। তিনি প্রজাদের প্রতি ধর্মীয় ভেদাভেদ ছাড়াই ন্যায়পরায়ণ ও সদীচ্ছাসম্পন্ন ছিলেন। তিনি শান্তির মতো যুদ্ধক্ষেত্রেও ওয়াদা পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। তিনি সন্ধিকে অগ্রাধিকার দিতেন কিন্তু যখন যুদ্ধের প্রয়োজন হতো তখন তাতে দ্বিধা করতেন না এবং ওয়াদা ভঙ্গকারীদের কঠোর শাস্তি দিতেন।” [২]

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া: ১/১৩০

[২] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া: ১/১৩০

তারিখ-ই-উম্মাতে মুসলিমা

মুহাম্মদ খান (মুহাম্মদ সানি)..... ফাতেহ কুসতুনতুনিয়া

৮৫৫ হিজরি থেকে ৮৮২ হিজরি

(১৪৫১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৪৮১ খ্রিষ্টাব্দ)

সুলতান মুরাদ সানির পর তাঁর পুত্র মুহাম্মদ খান সিংহাসনে আরোহণ করেন, যাঁর বয়স তখন ছিল মাত্র ২২ বছর। তিনিই সেই মুহাম্মদ খান, যিনি কুসতুনতুনিয়া বিজয়ের অবিস্মরণীয় কীর্তির কারণে “সুলতান মুহাম্মদ খান ফাতেহ” নামে প্রসিদ্ধ হন।

মুহাম্মদ খান অত্যন্ত বুদ্ধিমান, চতুর, সাহসী এবং যোদ্ধা শাহজাদা ছিলেন। দীর্ঘদেহী, সুঠাম গড়ন, প্রভাবশালী চেহারা এবং ঘন লালচে দাড়ি তাঁকে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ দেখাত। বীরত্ব, ধৈর্য ও দৃঢ়তা এবং উচ্চ সংকল্পের মতো গুণাবলি তাঁর মধ্যে পূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল। তাঁকে শ্রেষ্ঠ উলামা ও জ্ঞানীরা শিক্ষা দান করেছিলেন।

সুলতান মুরাদ তাঁর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে কোনো ত্রুটি রাখেননি। অভিজ্ঞতার জন্য তাঁকে শৈশবেই মানিসার গভর্নর নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং শিক্ষার জন্য তাঁর সাথে বেশ কয়েকজন দক্ষ শিক্ষক নিযুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শাহজাদার পড়াশোনার চেয়ে অভিযানের প্রতি বেশি আগ্রহ ছিল। পড়াশোনায় তাঁর অবহেলা দেখে শিক্ষকরা নাজেহাল হয়ে পড়লেন। সুলতান মুরাদ বিষয়টি জানতে পেরে অত্যন্ত চিন্তিত হলেন এবং তাঁর উপদেষ্টাদের কাছে জানতে চাইলেন এমন কোনো শিক্ষক আছেন কি না, যিনি শাহজাদাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেন। উপদেষ্টারা শেখ শিহাবুদ্দিন কুরানির নাম প্রস্তাব করলেন, যিনি তাজবিদ ও তাফসিরের একজন প্রখ্যাত শিক্ষক ছিলেন। সুলতান মুরাদ অবিলম্বে তাঁকে একটি মোটা অংকের পারিশ্রমিকে শাহজাদার গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করলেন। সেই সাথে তাঁর হাতে একটি বেত দিয়ে বললেন: “যদি শাহজাদা অবাধ্যতা করে তবে এই বেত দিয়ে কাজ নেবেন।” শেখ শিহাবুদ্দিন কুরানি শাহজাদার কাছে গিয়ে বললেন: “তোমার পিতা আমাকে তোমাকে পড়ানোর জন্য পাঠিয়েছেন। যদি তুমি অবাধ্যতা করো তবে তোমাকে প্রহার করব।” মুহাম্মদ খান এমন কথা কখনো শোনেননি, তাই তিনি একে কৌতুক মনে করে হেসে দিলেন। শেখ তৎক্ষণাৎ বেত তুলে নিয়ে সজোরে কয়েকটি আঘাত করলেন। এরপর মুহাম্মদ খান পুরোপুরি শুধরে গেলেন। তিনি মন দিয়ে পড়াশোনা শুরু করলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই কুরআন মাজিদের শিক্ষা সম্পন্ন করলেন। সুলতান মুরাদ তাঁর ছেলের মধ্যে এই পরিবর্তন দেখে শিক্ষককে প্রচুর পুরস্কারে ভূষিত করলেন।

এরপর মুহাম্মদ খানের বক্ষ জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন এক ভাণ্ডারে পরিণত হলো যে তিনি তাঁর সময়ের বড় আলেমদের মধ্যে গণ্য হতে লাগলেন। [১]

ঐতিহাসিকদের বক্তব্য হলো, তিনি হাদিস, ইতিহাস এবং ভূগোলে পারদর্শী ছিলেন। নিজের মাতৃভাষা তুর্কি ছাড়াও আরবি, ফারসি, হিব্রু,

[১] নুসরাতু আহলিল ঈমান বি-দাওলাতি আলি উসমান, পৃষ্ঠা ৭৩, ৭৪।

তিনি গ্রিক ও লাতিন ভাষাও জানতেন। কাব্য ও সাহিত্যে তাঁর অবস্থান এতই উচ্চ ছিল যে, তুর্কি কবিতায় তিনি নিজের একটি দিওয়ান রেখে গেছেন। সামরিক যোগ্যতায় তাঁর সমসাময়িক কেউ তাঁর সমকক্ষ ছিল না। তিনি দয়ালু ও মেহেরবান ছিলেন, তবে কিছুটা কঠোর মেজাজেরও ছিলেন। সামরিক বা রাজনৈতিক বিষয়ে অপরাধ প্রমাণিত হলে তিনি কঠোর শাস্তি দিতেন। তিনি রাজকীয় গান্ধীর্যের প্রতি এতই সজাগ ছিলেন যে, প্রয়োজন ছাড়া কখনো দরবার বা মজলিস সাজিয়ে বসতেন না। তিনি অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন। তাঁকে হাসতে দেখা গেছে এমন ঘটনা বিরল। প্রয়োজন ছাড়া কখনো কথা বলতেন না।

তিনি ধর্মীয় মূল্যবোধের অনুসারী ছিলেন। জামাতের সাথে সালাত আদায়ের পূর্ণ ব্যবস্থা করতেন। তিনি আমানতদার ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। কখনো ইনসাফ হাতছাড়া হতে দিতেন না। অপরাধীদের ক্ষমা করে দিতেন। তিনি কেবল একটি বিশাল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী এবং প্রখ্যাত বিজেতাই ছিলেন না, বরং জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূর্ত প্রতীক এবং শিল্প ও সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন। তাঁর পিতার নির্জনবাস অবলম্বনের কারণে পিতার জীবদ্দশাতেই তিনি দুইবার রাজসিংহাসনে বসেছিলেন। যদিও সে সময় তাঁর বয়স ছিল পনেরো-ষোলো বছর এবং একজন শাসক হিসেবে তিনি বিশেষ কোনো কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি, তবে এরপর তিনি রাজনৈতিক ও সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য আরও পাঁচ-ছয় বছর সময় পান এবং এশিয়া মাইনরের গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত থাকেন। এই সময়ে তাঁর যোগ্যতার বিস্ময়কর উন্নতি ঘটে। ফলে সিংহাসনে আরোহণের আগেই তিনি শাসনের সমস্ত গুণাবলীতে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। [১]

দুশ্শপোষ্য ভাইকে হত্যার অভিযোগ এবং এর বাস্তবতা:

মুহাম্মদ খান সানি (দ্বিতীয়) পিতার মৃত্যুর সময় এশিয়া মাইনরে ছিলেন। তিনি দারদানেলস প্রণালী পার হয়ে এড্রিয়ানোপল পৌঁছান এবং শাসনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। যেহেতু যুবরাজ থাকাকালীন তিনি পিতার আদেশে দুইবার শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু উভয়বারই ব্যর্থ হয়েছিলেন, তাই সাধারণ ধারণা ছিল যে তিনি একজন দুর্বল শাসক প্রমাণিত হবেন। ফলে সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা তাঁর ওপর আধিপত্য বিস্তার করে নিজেদের ক্ষমতা বাড়াতে চেয়েছিল। তাছাড়া তাঁকে অযোগ্য মনে করে বিভিন্ন জল্পনা-কল্পনা ও গুজবও তুঙ্গে ছিল। এই পরিস্থিতির ফল এই দাঁড়াল যে, সুলতান সম্পর্কে একটি অদ্ভুত উপকথা ছড়িয়ে পড়ল যা পশ্চিমা ইতিহাসের অংশ হয়ে গেল এবং পরবর্তীতে আমাদের ইতিহাসগুলোতেও উদ্ধৃত হতে লাগল। এই উপকথা অনুযায়ী, সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ সিংহাসনে আরোহণের পরপরই তাঁর এক দুশ্শপোষ্য ভাই আহমদ চেলবিকে হত্যা করিয়েছিলেন, যার মা ছিলেন সার্বিয়ার রাজকুমারী। এই হত্যাকাণ্ডটি এমন এক সময়ে ঘটেছিল যখন শিশুটির মা অর্থাৎ সার্বিয়ার রাজকুমারী নতুন সুলতানকে সিংহাসনে আরোহণের অভিনন্দন জানাতে এসেছিলেন। এই সময়ে সুলতানের আদেশে তাঁর একজন কর্মকর্তা ‘আলী বেগ বিন আওরানোস’ সেই নিষ্পাপ শিশুটিকে হত্যা করতে পৌঁছায়। তখন তার ধাত্রী তাকে গোসল করাচ্ছিল। কর্মকর্তা ধাত্রীর হাত থেকে শিশুকে ছিনিয়ে নিয়ে তাকে হাউজে ডুবিয়ে মেরে ফেলে। [২] ঐতিহাসিকরা এর ওপর এই মন্তব্যও করেন যে, এভাবে সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ ক্ষমতার সুরক্ষা এবং বিদ্রোহ দমনের জন্য কেবল সন্দেহের বশবর্তী হয়ে ভাইদের হত্যার প্রথা শুরু করেছিলেন। এমনকি এও বলা হয় যে, সুলতান রাজনৈতিক কৌশলের খাতিরে নিজের ভাইদের হত্যা করাকে আইন হিসেবে রাজকীয় ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন।

[১] ফাতেহ আল-কুস্তনতিনিয়া আস-সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতেহ লিস-সাল্লাবি, পৃ. ৮৩, ৮৪; তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া আয-ইলমায: ১/ ১৩৩ থেকে ১২৫; দাওলাতে উসমানিয়া আয ডাক্তার উয়াইর: ১/ ৯৫।

[২] Histoire de l’Empire Ottoman by Hammer।

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

প্রকৃতপক্ষে এই ঘটনার ওপর বিশ্বাস করার অনিবার্য প্রভাব এটাই হতে পারে যে, সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহকে এমন এক গুরুতর অপরাধের অপরাধী মনে করা হবে যার কোনো সাফাই পেশ করা সম্ভব নয়। এই কারণেই ঐতিহাসিকগণ এই ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখের সাথে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই ঘটনাটি কি প্রমাণিত? এ বিষয়ে গবেষকদের দুটি দল রয়েছে:

এক দলের মতে এই ঘটনার কিছু ভিত্তি অবশ্যই আছে, তবে ঘটনাটি যেভাবে প্রসিদ্ধ, তা বাস্তবতার পরিপন্থী।

দ্বিতীয় দলের মতে এই ঘটনাটি নিছক বানোয়াট। প্রথম দলের ব্যক্তিবর্গ এই সম্ভাবনাকে স্বীকার করে নিয়ে যে, সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহের সিংহাসন আরোহণের পর তাঁর ছোট ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছিল, এখানে দুই ধরনের ব্যাখ্যা পেশ করেন:

- ১. সাবেক বাদশাহ মুরাদ সানির আট মাস বয়সী একটি ছেলে ছিল যার মা ছিলেন সার্বিয়ার রাজকুমারী। ইয়েনিচেরি বাহিনীর কিছু কর্মকর্তার ধারণা ছিল যে, এই শিশুটি ভবিষ্যতে তার মায়ের প্ররোচনায় এসে বিদ্রোহের কারণ হতে পারে। তাই মুহাম্মদ খান সানির সিংহাসন আরোহণের অনুষ্ঠানের সময় ইয়েনিচেরি বাহিনীর কোনো এক কর্মকর্তা এই শিশুটিকে হত্যা করে। সে নিজের পক্ষ থেকে এই কাজটি করেছিল বাদশাহর নৈকট্য এবং বড় পদ পাওয়ার জন্য। সেই যুগে ইয়েনিচেরি কর্মকর্তারা শাসকদের পক্ষ থেকে ক্রমাগত তোয়াজ দেখে এতটাই উদ্ধত হয়ে গিয়েছিল যে, অনেক কাজ তারা নিজেরাই করে ফেলত যার খেসারত সরকারকে দিতে হতো। এই কাজটিও তেমনই এক পরিবেশে হয়েছিল। যা-ই হোক, সুলতান মুহাম্মদ খান এই দুঃখজনক ঘটনায় কঠোর অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং এই কাজের অপরাধী কর্মকর্তাকে কোনো প্রকার ছাড় না দিয়ে কিসাস হিসেবে মৃত্যুদণ্ড দেন। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ এই ঘটনাকে এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যেন মনে হয় এই সব সুলতানের আদেশেই হয়েছিল। অথচ এমনটি হলে শাস্তি পাওয়ার আগে সেই কর্মকর্তা সুলতানের নাম নিতে পারত। এই বিষয়টিও উল্লেখযোগ্য যে, নিহত শাহজাদার মা সার্বিয়ান রাজকুমারী মুহাম্মদ খান সানিকে সিংহাসন আরোহণের মুবারকবাদ দিতে এসেছিলেন। যদি এই হত্যাকাণ্ড মুহাম্মদ খানের আদেশে হতো, তবে রাজকুমারী তাঁর মুখও দেখতেন না। তাছাড়া সুলতান মুহাম্মদ খান সানির এই দুঃখপোষ্য ভাইয়ের কাছ থেকে কী আশঙ্কাই বা থাকতে পারত!! [১]

- ২. দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি হলো, শিশুর ধাত্রী তাকে একটি হাউজের পাড়ে গোসল করাচ্ছিল, হঠাৎ কোনো জরুরি কারণে তাকে উঠতে হয়। এদিকে শিশুটি পাশ ফিরে হাউজে পড়ে যায় এবং কেউ তাকে তোলার আগেই সে দম ছেড়ে দেয়। সেই দিনগুলোতে সুলতানের কর্মকর্তা আলী বেগের পক্ষ থেকে কোনো গুরুতর অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল যার কারণে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এর ফলে জনগণের মধ্যে এই কথা ছড়িয়ে পড়ে অথবা বিরোধীরা উদ্দেশ্যমূলকভাবে এটি প্রচার করে দেয় যে, দুঃখপোষ্য ভাইকে সুলতান নিজেই হত্যা করিয়েছেন এবং আলী বেগকে এই জন্য খতম করে দেওয়া হয়েছে যে, শিশুটিকে তারই হাতে হত্যা করানো হয়েছিল, তাই নিজের বিরুদ্ধে প্রমাণ মুছে ফেলার জন্য আলী বেগকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এভাবে একটি গুজব ছড়িয়ে পড়ে ঐতিহাসিক বর্ণনার রূপ ধারণ করেছে, অথচ বাস্তবতার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। [২]

অন্যদিকে তুরস্কের ইতিহাসের ওপর কাজ করা কিছু ব্যক্তিবর্গ এই ঘটনাকে পুরোপুরি ভিত্তিহীন বলে গণ্য করেন যাদের...

[১] তারিখ-ই-ইসলাম, আকবর শাহ নজীবাবাদী: ২/১০৫

[২] আত-তাদলিস ফি তারিখি দাওলাতিল ইসলামিয়াতিল উসমানিয়া, ডক্টর নায়েল সাইয়েদ আহমদ: আর্কাইভ মুনতাদাল ফাসিহ, তাবা মাকতাবাতুশ শামিলা

তারিখ-এ-উম্মত-এ-মুসলিমাহ — চতুর্থ খণ্ড

ডক্টর মুহাম্মদ সালেম রশিদী তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি এই বিষয়ে প্রামাণিক ও সতর্ক পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভঙ্গিতে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন:

“হ্যামার এই বর্ণনাটি বাইজেন্টাইন ঐতিহাসিক ডুকাস থেকে উদ্ধৃত করেছেন এবং পরবর্তীকালের পশ্চিমা ও প্রাচ্যের ঐতিহাসিকগণ একইভাবে তা থেকে এটি নকল করেছেন, এমনকি বিষয়টি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে মনে হয় যেন এর অনুসন্ধান সম্পন্ন হয়ে গেছে। অথচ বাস্তবতা হলো, সুলতানের পক্ষ থেকে তাঁর দুগ্ধপোষ্য ভাইকে হত্যার ঘটনাটি বানোয়াট, যার বাস্তবে কোনো ভিত্তি নেই।” [১]

কয়েক লাইন পর বিজ্ঞ ঐতিহাসিক লিখেছেন:

“যদি সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহের প্রতি আরোপিত এই ঘটনার সামান্যতম সত্যতা থাকত, তবে ফরাসি ঐতিহাসিক ‘ফ্রানজেস’ অবশ্যই তা উল্লেখ করতেন, যিনি কনস্টান্টিনোপলের সম্রাটের বিশ্বস্ত ও বন্ধু ছিলেন। তিনি সম্রাট এবং উসমানীয় দরবারের মধ্যে বছবার কূটনৈতিক দায়িত্বও পালন করেছিলেন। সুতরাং অন্যান্য রোমান ঐতিহাসিকদের তুলনায় তিনি এই ঘটনাগুলোর নিকটতম সাক্ষী ছিলেন। এরপর ফ্রানজেসেরই সবচেয়ে বেশি অধিকার ছিল এই ঘটনাটি উল্লেখ করার, একে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে প্রচার করার, কারণ তিনি সুলতানের প্রতি বিদ্রোহ পোষণ করতেন, সুলতানের প্রতি তাঁর তীব্র ঘৃণা ও অন্ধ শত্রুতা ছিল। তিনি সুলতানকে বিদ্রূপ ও সমালোচনা করতে এবং এই জাতীয় বিষয়গুলোকে প্রচার করতে অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু এই সমস্ত কিছু সত্ত্বেও তিনি সুলতানের প্রতি আরোপিত উক্ত কাহিনীটি উল্লেখ করেননি, বরং তিনি ট্রাবজোন সম্রাটের বর্ণনার প্রসঙ্গে অত্যন্ত স্পষ্টতা ও ব্যাখ্যার সাথে লিখেছেন যে, সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তাঁর কোনো ভাই একেবারেই ছিল না। এই ফরাসি ঐতিহাসিক অন্তরের গভীর থেকে চেয়েছিলেন যে, মুহাম্মদ ফাতেহ মৃত্যুবরণ করে তাঁর পিতার সাথে মিলিত হতেন, যাতে উসমানীয় সাম্রাজ্য কোনো উত্তরাধিকারী ছাড়াই বিশৃঙ্খলা, অস্থিরতা এবং ভাগ্য অন্বেষণকারীদের যুদ্ধের চারণভূমিতে পরিণত হতো।” [২]

এরপর তিনি লিখেছেন:

“সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহের চারজন ভাই ছিল যারা সকলেই তাঁদের পিতা মুরাদ সানির জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এই কারণেই প্রাচ্যবিদ মর্গাদাস সেই উসমানীয় সুলতানদের কথা উল্লেখ করার সময় যারা তাঁদের ভাইদের হত্যা করিয়েছিলেন, সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহের কোনো উল্লেখ করেননি। সুতরাং সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহের দিকে নিসবত করা দুগ্ধপোষ্য ভাই হত্যার ঘটনাটি নিছক একটি বানোয়াট বর্ণনা যা বাইজেন্টাইন ঐতিহাসিক ‘ডুকাস’ উদ্ভাবন করেছিলেন এবং তাঁর থেকে অস্ট্রিয়ান ঐতিহাসিক হ্যামার এই বর্ণনাটি গ্রহণ করেছেন। এরপর পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকগণ তা নকল করতে থাকেন। এভাবে উদ্ধৃত হওয়া এবং ছড়িয়ে পড়ার কারণে বর্ণনাটি একটি সঠিক বর্ণনার মর্যাদা লাভ করেছে, অথচ বাস্তবতা ও সত্যের সাথে এর দূরতম কোনো সম্পর্কও নেই।” [৩]

এই বিস্তারিত আলোচনার পর ডক্টর রশিদী জানিয়েছেন যে, কিছু প্রাচ্যবিদ উক্ত ঘটনার সাথে আরও কিছু সংযোজনও করতে থাকেন। যেমন গিবন এই সংযোজন করেছেন যে, সুলতান তাঁর একাধিক ভাইকে হত্যা করেছিলেন। কিছু প্রাচ্যবিদ এর ওপর

[১] আস-সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতেহ, পৃ. ৩৬০, ত. দারুল বাশির

[২] আস-সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতেহ, পৃ. ৩৬১

[৩] আস-সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতেহ, পৃ. ৩৬১

এই টীকা যুক্ত করা হয়েছে যে, তাদের মধ্যে এক ভাই পালিয়ে ইউরোপে চলে যান এবং খ্রিস্টান হয়ে ‘ক্যালিস্টাস ওসমানি’ নামে পরিচিত হন। রাজা ফ্রেডরিক তাকে অস্ট্রিয়ায় একটি জায়গির প্রদান করেন। সেখানে এক রাজকুমারী তার প্রেমে পড়েন এবং যখন এই রাজপুত্র মারা যান, তখন সেই রাজকুমারী তার শোকে সন্ন্যাসিনী হয়ে যান। [১] এগুলো সবই বানোয়াট কাহিনী। যখন মূল ঘটনারই কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই, তখন এর ওপর সংযোজন ও মন্তব্যের কোনো অবকাশ কোথায় থাকে। [২]

কায়সারের সাথে সংঘাতের সূচনা:

সুলতান সিংহাসনে আরোহণের পর দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন: একটি হলো হাঙ্গেরির রাজার সাথে তিন বছরের জন্য সন্ধি করেন যাতে কায়সারের সাথে মোকাবিলার প্রয়োজন হলে বাহিনী অন্য কোনো ফ্রন্টে ব্যস্ত না থাকে। দ্বিতীয়ত, তিনি ইয়েনি চেরি বাহিনীকে লাগাম পরান এবং বিদ্রোহী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে তাদের নিয়ন্ত্রণে আনেন।

সুলতান মুহাম্মদ সানির সিংহাসনে আরোহণের খবর কনস্টান্টিনোপলে পৌঁছায় যেখানে ৮৫২ হিজরি থেকে কায়সার কনস্টানটাইন দ্বাদশ (Constantine XII) সিংহাসনে আসীন ছিলেন। তার কাছে ‘ওরখান’ নামক এক বিদ্রোহী তুর্কি রাজপুত্র বন্দী ছিল যার দেখাশোনার খরচ উসমানীয় সরকার পাঠাত। কায়সারও সুলতান মুহাম্মদ খান সানির অল্প বয়স দেখে তাকে একজন ভীরা শাসক মনে করার ভুল করেন এবং অবিলম্বে তাকে বার্তা পাঠান যে, তিনি যেন ‘ওরখান’-এর দেখাশোনার খাতে পাঠানো অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করেন, অন্যথায় তাকে মুক্ত করে দেওয়া হবে এবং সে উসমানীয় সালতানাতের উত্তরাধিকার দাবি করে সিংহাসন দখল করে নেবে।

কায়সার আশা করেছিলেন যে সুলতান এই বার্তায় ঘাবড়ে যাবেন কিন্তু বিষয়টি সম্পূর্ণ উল্টো হলো। সুলতান এই দাবিকে কোনো গুরুত্বই দিলেন না। কায়সার পুনরায় দূত পাঠিয়ে এর ওপর জোর দিলেন। জবাবে সুলতান ‘ওরখান’-এর খরচ পুরোপুরি বন্ধ করে দিলেন এবং কায়সারের দূতদের দরবার থেকে বের করে দিলেন। এরপর তিনি কায়সারের দাবিকে একটি অন্যায় আচরণ হিসেবে গণ্য করে কনস্টান্টিনোপলে চূড়ান্ত আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন। [৩]

কনস্টান্টিনোপল..... ইতিহাসের আয়না:

এই শহরটি বাইজেন্টাইন সম্রাট কনস্টানটাইন প্রথম ৩২৭ খ্রিস্টাব্দে বসফরাস প্রণালী এবং শখ-ই-জরিন (গোল্ডেন হর্ন)-এর ত্রিকোণ ভূমিতে আবাদ করেছিলেন। তিনি শহরের নাম রেখেছিলেন ‘নতুন রোম’ কিন্তু এটি তার প্রতিষ্ঠাতার নামে কনস্টান্টিনোপল হিসেবে বিখ্যাত হয়ে যায়। ইনিই সেই রাজা যিনি খ্রিস্টধর্মের বিকৃত রূপকে উৎসাহিত করে ইউরোপ ও এশিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। এর আগে খ্রিস্টধর্মের পরিধি অত্যন্ত সীমিত ছিল।

পঞ্চম খ্রিস্টীয় শতাব্দীতে যখন বাইজেন্টাইন রোমান সাম্রাজ্য রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতভেদের কারণে এশীয় ও ইউরোপীয় দুই...

[১] আস-সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ, পৃ ৩৬১, ত. দার আল-বাশির

[২] লেখক এখন পর্যন্ত মুসলমানদের প্রাচীন উৎসগুলোতে এই ঘটনার বর্ণনা পাননি। তবে ডক্টর সালিম রাশিদি এতটুকু অবশ্যই লিখেছেন যে, তুর্কি ইতিহাসের কিছু প্রাচীন উৎসে সুলতানের ভাই হত্যার ঘটনা বর্ণিত আছে। কিন্তু উক্ত ডক্টর লিখেছেন যে, সেই উৎসগুলোতে ভাই হত্যার ঘটনাটি ভুল এবং বিভ্রান্তিমুক্ত নয়। (আস-সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ, পৃ ৩৬১, ত. দার আল-বাশির)

[৩] ফী উসুলিত তারিখিল উসমানি, পৃ ৬৮, তারিখে ইসলাম নাজিবাবাদি: ৩/ ৫৩৯

তারিখ-এ-মিল্লাত-এ-মুসলিমা

অংশে বিভক্ত হয়ে গেলে তার সাথে সাথে গির্জাও দুই অংশে বিভক্ত হয়ে গেল। প্রাচ্যে খ্রিস্টধর্মের কেন্দ্র ছিল ‘কনস্টান্টিনোপল’, আর প্রতীচ্যে এই সম্মান ‘রোম’ ছিনিয়ে নিয়েছিল। উভয় অঞ্চলের ধর্মীয় প্রধানরাও আলাদা আলাদা হয়ে গেলেন। এখন কনস্টান্টিনোপলের গির্জা গ্রিকদের ছিল যা অর্থোডক্স চার্চ নামে পরিচিত ছিল এবং এর প্রধানকে ‘বাতরিক’ (Patriarch) বলা হতো। রোমের গির্জা ক্যাথলিক চার্চ নামে পরিচিত ছিল যার প্রধানকে পোপ বলা হতো।

কনস্টান্টিনোপল তার অত্যন্ত মজবুত প্রাচীরের কারণে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত প্রতিটি আক্রমণের মুখে অপরাজেয় ছিল। ২১টি অবরোধ ও যুদ্ধে এটি তার অপরাজেয় হওয়ার প্রমাণ দিয়েছিল। এই শহরটি সোয়া এগারো শতাব্দী ধরে বাইজেন্টাইন রোমানদের রাজধানী হিসেবে চলে আসছিল। এর মাঝে ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে ভেনিসের এক ভাগ্য অন্বেষী এখানে দখল করে কায়সারতন্ত্র নিজের বংশে স্থানান্তরিত করে এবং এখানে ল্যাটিন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে যা রোমের পোপের অনুগত ছিল। তবে ৬০ বছর পর বাইজেন্টাইনরা গ্রিকদের সাহায্যে এখানে দখল করে কায়সারতন্ত্রকে রোমের কবল থেকে মুক্ত করে নেয় এবং এখানে পুনরায় অর্থোডক্স চার্চের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে।

এই শহরটি কেবল কায়সারের রাজধানী এবং গ্রিক গির্জার কেন্দ্র হওয়ার কারণেই খ্রিস্টান জগতের প্রাণ ছিল না, বরং বাণিজ্যিক, তামাদুনিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকেও সারা বিশ্বে অনন্য ছিল। এর বিজয়ের ফলে কেবল খ্রিস্টধর্মের পতাকাই অবনমিত হতো না এবং কায়সারতন্ত্র মিটে যেত না, বরং পার্শ্ববর্তী ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ বিজয়ের পর পুরো ইউরোপ দখলের সেই স্বপ্ন যা বায়েজিদ ইলদিরিম দেখেছিলেন, তা খুব শীঘ্রই পূরণ হতে পারত। [১]

খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ থেকেই মুসলিম শাসকরা এই শহরটি জয় করার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। এ ব্যাপারে সহীহ হাদীস বিদ্যমান ছিল:

“أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرٍ مَغْفُورٌ لَهُمْ”

“আমার উম্মতের প্রথম যে সেনাবাহিনী কায়সারের শহরে জিহাদ করবে, তাদের জন্য ক্ষমার সুসংবাদ রয়েছে।” [২]

যদিও এই হাদীসের বাহ্যিক লক্ষ্য ছিল সেই সব লোক যারা সর্বপ্রথম এখানে জিহাদ করেছিল, কিন্তু এর একটি সম্ভাব্য অর্থ এও ছিল যে, এই শহরটি সর্বপ্রথম যারা জয় করবে তাদের জন্য এই সুসংবাদ। তাই মুসলমানরা আট শতাব্দী ধরে এই সুসংবাদ অর্জনের জন্য বার বার এই শহর অবরোধ করেছিল কিন্তু কখনও সফল হতে পারেনি। শেষ চেষ্টা মুহাম্মদ খান সানির দাদা বায়েজিদ ইলদিরিম করেছিলেন, যা তৈমুর লঙের আক্রমণের কারণে সফল হতে পারেনি।

কায়সারের প্রচেষ্টা:

কায়সার যখন দেখলেন যে মুহাম্মদ খান সানি কনস্টান্টিনোপল জয় না করে ক্ষান্ত হবেন না, তখন তিনি কনস্টান্টিনোপলের বাসিন্দাদের, যাদের সংখ্যা এক লক্ষের বেশি ছিল, উৎসাহিত করলেন যে তারা যেন শহরের প্রতিরক্ষার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত থাকে। তাদের সাথে যুদ্ধ...

[১] নুযহাতুল আনযার: ১৯/২, ২০; তারিখ সালাতিন বনী উসমান, ইউসুফ বেগ আসিফ, পৃ. ২২ থেকে ২৪; আস-সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ, ডক্টর আবদুস সালাম ফাহমি, পৃ. ৫৫ থেকে ৫৯।

[২] সহীহ বুখারী, হা: ২৯২৪, বাব কিতালুর রুম।

ব্যয় নির্বাহের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা হলো। সেই সঙ্গে কায়সার রোমে নিজের দূত পাঠিয়ে ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণের ঘোষণা দিলেন এবং ধর্মীয় আবেগের দোহাই দিয়ে আবেদন করলেন যেন তাকে মুসলমানদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের ঘোষণা দেওয়া হয়। এই আবেদনের প্রেক্ষিতে পোপ নিকোলাস পঞ্চম ইউরোপীয় দেশগুলোকে তুর্কিদের বিরুদ্ধে অভিযানে নামার নির্দেশ দিলেন। এই নির্দেশ অনুযায়ী স্পেন, ভেনিস এবং জেনোয়ার সেনাবাহিনী কনস্টান্টিনোপলে পৌঁছে গেল। পোপ নিজে একজন বিখ্যাত কার্ডিনাল 'ইসিডোর'কে একটি বাহিনীসহ প্রেরণ করলেন। তিনি কনস্টান্টিনোপলে পৌঁছে প্রাচীন অর্থোডক্স গির্জা 'আয়া সোফিয়া'তে ক্যাথলিক রীতি অনুযায়ী উপাসনা করলেন।

কায়সারের গ্রিক মন্ত্রী লুকাস নটারাস ক্যাথলিক গির্জার সাথে এই ঐক্যের বিরোধী ছিলেন। ৬০১ হিজরি (১২০৪ খ্রিস্টাব্দ) সালের অভিযানে রোম কনস্টান্টিনোপলবাসীর ওপর যে পাশবিক নির্যাতন চালিয়েছিল, তা তার মনে ছিল। এই কারণেই গ্রিস কায়সারকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে কোনো অংশ নেয়নি, বরং গ্রিসের জনগণ স্পষ্টভাবে বলত যে, কায়সারের অর্থোডক্স গির্জা ত্যাগ করে ক্যাথলিক গির্জার দিকে ঝুঁকে পড়া আল্লাহর গজব এবং কনস্টান্টিনোপল থেকে কায়সারতন্ত্রের অবসানের লক্ষণ।

কায়সারের গ্রিক প্রধানমন্ত্রী কনস্টান্টিনোপলের রাস্তায় চিৎকার করে বেড়াতে যে, আমি এখানে লাতিন টুপির পরিবর্তে সুলতান মুহাম্মদ খানের মুকুট এবং তুর্কিদের আমামা দেখা বেশি পছন্দ করি। যখন প্রধানমন্ত্রীর এই চিৎকার ও আহাজারি বৃথা প্রমাণিত হলো, তখন তিনি শহরে বসবাসরত গ্রিক বাসিন্দাদের নিয়ে দেশত্যাগ করে গ্রিসে চলে গেলেন। [১]

তোপখানার প্রাথমিক যুগ

কায়সার গ্রিকদের বিরোধিতার কোনো পরোয়া না করে শহরে খাদ্যদ্রব্য, রসদ এবং অস্ত্রের বিশাল ভাণ্ডার গড়ে তুলেছিলেন। দুর্গের প্রাচীর ও সীমানার পুরনো অংশগুলো মেরামত করে আরও মজবুত করা হচ্ছিল। ইউরোপীয় দেশগুলো থেকে বড় বড় আমির, জেনারেল, অস্ত্র নির্মাণ ও স্থাপত্য বিশেষজ্ঞ এবং সৈন্যরা ক্রমাগত কনস্টান্টিনোপলে পৌঁছাচ্ছিল। তাদের নৌবহরগুলো দার্দানেলেস প্রণালী দিয়ে প্রবেশ করে কনস্টান্টিনোপলের বন্দরে নোঙর করত।

সেই সময় পৃথিবীতে তোপখানা বা কামান সবেমাত্র উদ্ভাবিত হয়েছিল। রোমানদের কাছেও কামান ছিল এবং তুর্কিদের কাছেও, তবে এই কামানগুলো ছিল একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ের। বড় বড় পাইপের মধ্যে অত্যন্ত ওজনের গোলা ভরা হতো এবং বারুদের সাহায্যে সেগুলো ছুড়ে প্রতিপক্ষকে লক্ষ্যবস্তু বানানো হতো। এই প্রক্রিয়ায় কামানের মুখ ফেটে যাওয়ার আশঙ্কা থাকত। তাই একবার গোলা নিক্ষেপ করার পর কামানটিকে পুরোপুরি ঠান্ডা হতে দেওয়া হতো। এভাবে সারাদিনে একটি কামান মাত্র আট-দশটি গোলা নিক্ষেপ করতে পারত। কামানের কাজ ছিল মানজানিকের মতোই, অর্থাৎ দুর্গ ও প্রাচীর ভেঙে ফেলা। এই কাজেও সেই সময় পর্যন্ত কামান ও মানজানিকের কার্যকারিতার মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য ছিল না। [২]

[১] তারিখ সালাতিন বনী উসমান, পৃ. ৫৩, ৫৪

[২] তারিখ আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া আজ ইলমাজ: ১/ ১৩১, ১৩২; তারিখ আদ-দাওলাতুল আলিয়া: পৃ. ১৬২

শহরের প্রতিরক্ষামূলক প্রকৃতি:

কনস্টান্টিনোপলের আকৃতি ছিল ত্রিভুজাকার। এক দিকে ছিল স্থলভাগ এবং দুই দিকে সমুদ্র। পশ্চিম দিকে যেখানে স্থলভাগ ছিল, সেখানে বিশ্বের সবচেয়ে সুরক্ষিত প্রাচীর ছিল যা পঞ্চম শতাব্দীতে সম্রাট দ্বিতীয় থিওডোসিয়াস নির্মাণ করেছিলেন। এটি কয়েক গজ প্রশস্ত তিনটি প্রাচীরের সমন্বয়ে গঠিত ছিল। অভ্যন্তরীণ দুটি প্রাচীরের মাঝখানে ষাট ফুট প্রশস্ত এবং একশ ফুট গভীর পরিখা ছিল যা অতিক্রম করা অসম্ভব ছিল। অভ্যন্তরীণ অংশের শেষ প্রাচীরটি ছিল সবচেয়ে উঁচু যার সাথে আকাশচুম্বী বুরুজ স্থাপিত ছিল।

সমুদ্রের দিকে দক্ষিণে ছিল মারমারা সাগর এবং উত্তরে বসফরাস প্রণালী, যার পূর্ব তীরে তুর্কিদের দুর্গ ছিল এবং পশ্চিম দিকে কায়সারের। বসফরাসের একটি জলধারা শিং-এর মতো বাঁক নিয়ে স্থলভাগের কয়েক মাইল ভেতরে ঢুকে কনস্টান্টিনোপলের উত্তর-পূর্ব দিককে পুরোপুরি সুরক্ষিত করে তুলেছিল। এই জলধারাকে ‘গোল্ডেন হার্ন’ বা ‘শাখ-ই-জরিন’ বলা হতো। শহরের বন্দরটি এই জলধারার তীরেই অবস্থিত ছিল।

কনস্টান্টিনোপলের সামুদ্রিক দিকগুলোও সুরক্ষিত ছিল, মারমারা সাগরে রোমান নৌবহর মোতায়ন ছিল যখন গোল্ডেন হার্নে রোমানদের যুদ্ধজাহাজও ছিল এবং তাছাড়াও বন্দর থেকে দূরে বসফরাস প্রণালীর মুখে লোহার একটি ভারী শিকল টেনে দেওয়া হয়েছিল যার কারণে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীর নৌকা বা জাহাজের পক্ষে বন্দরের কাছে পৌঁছানো সম্ভব ছিল না। হ্যাঁ, যখন শহরবাসী কোনো নৌকা বা জাহাজকে বন্দরে প্রবেশের অনুমতি দিত, তখন একটি ঢাকা ঘুরিয়ে সেই শিকলটিকে সমুদ্রের গভীরে নামিয়ে দিত, এভাবে পথ খুলে যেত। [১]

রুমেলি হিসার নির্মাণ:

বায়েজিদ ইলদিরিম কনস্টান্টিনোপল আক্রমণ করার জন্য বসফরাস প্রণালীর পূর্ব তীরে একটি দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন যাকে আনাদোলু হিসার বলা হতো। মুহাম্মদ খান সানি তাঁর অভিযানের আগে বসফরাস প্রণালীকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রণালীর পশ্চিম তীরে নিজের হাতে নকশা তৈরি করে চার মাসের সংক্ষিপ্ত সময়ে ত্রিভুজ আকৃতির একটি ছোট কিন্তু অত্যন্ত শক্তিশালী দুর্গ নির্মাণ করান যাকে রুমেলি হিসার নাম দেওয়া হয়। এর প্রাচীরগুলো উত্তর-দক্ষিণে ৮২০ ফুট এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৪১০ ফুট দীর্ঘ ছিল। এগুলোর পুরুত্ব ছিল ২৩ ফুট। দুর্গটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৮২ মিটার উঁচুতে ছিল এবং এর বুরুজগুলোর উচ্চতা ছিল ৯২ ফুট।

এই দুর্গটি কায়সারের কাছ থেকে জমি নিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। ঐতিহাসিকদের মতে, সুলতান যখন এটি নির্মাণের সংকল্প করলেন তখন কায়সারের কাছে বার্তা পাঠালেন যে উপসাগরের অন্য তীরে মাত্র একটি ষাঁড়ের চামড়ার সমান জমি প্রয়োজন। কায়সার এটিকে কৌতুক মনে করে অনুমতি দিয়ে দিলেন। সুলতান একটি বড় ষাঁড়ের চামড়ার স্তরগুলোকে সূক্ষ্মভাবে আলাদা করে তা দিয়ে সুতা তৈরি করালেন এবং সেগুলো উপসাগরের সংকীর্ণতম অংশের তীরে ছড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। যে জায়গা পাওয়া গেল সেখানেই দুর্গ নির্মাণ করা হলো।

এখন আনাদোলু এবং রুমেলি দুর্গগুলোতে কামান স্থাপন করা হলো, মাঝখানে মাত্র ৬৬০ মিটার প্রশস্ত উপসাগর ছিল, এভাবে...

[১] তারিখ সালাতিন বনি উসমান, ইউসুফ বেগ আসিফ, পৃষ্ঠা ২৮ থেকে ২৮৭।

বসফরাস প্রণালীর উভয় প্রান্ত তুর্কিদের দখলে চলে আসে এবং রোমানদের জন্য তুর্কিদের অনুমতি ছাড়া তাদের গোলাবর্ষণ থেকে বেঁচে নিজেদের জাহাজ কৃষ্ণসাগরে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। তবে তা সত্ত্বেও তাদের জন্য মারমারা সাগর উন্মুক্ত ছিল। ইউরোপীয় নৌবহর দার্দানেলস প্রণালী দিয়ে মারমারা সাগরে আসত এবং গোল্ডেন হর্নে প্রবেশ করে বন্দরে নোঙর করত। [১]

সুলতানের অগ্রযাত্রা..... কায়সারের রাজধানীতে আক্রমণ:

সুলতান মুহাম্মদ খান সানি ২৩ মার্চ পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে নিজের রাজধানী এড্রিয়ানোপল থেকে কনস্টান্টিনোপলের উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং তেরো দিন স্থলপথে সফরের পর ২১ রবিউল আউয়াল (৫ এপ্রিল ১৪৫৩ খ্রি.) কায়সারের রাজধানীর পশ্চিম দিকে উপস্থিত হন এবং শহরের সেন্ট রোমানোস গেটের সামনে নিজের তাবু স্থাপন করেন। [২]

তিনি আক্রমণের আগে নিজের প্রধান উজির আহমদ পাশাকে পাঠিয়ে দেশের বড় বড় উলামা ও মাশায়েখদের এই জিহাদে অংশগ্রহণের অনুরোধ করেছিলেন। এই সকল ব্যক্তিবর্গ তখন সুলতানের ছাউনিতে উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে শেখ শামসুদ্দিন মুহাম্মদ বিন হামজা এবং শেখ আক বিক-ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। শেখ শামসুদ্দিন আহমদ পাশাকে বলে দিয়েছিলেন:

“ইনশাআল্লাহ এই শহর এই বছরেরই ২০ জমাদিউল আউয়াল দুপুর বেলা বিজয় হবে।” [৩]

ইসলামী লস্কর পূর্ণ প্রস্তুতির সাথে এই অপরাজেয় প্রাচীরের ওপর আক্রমণ শুরু করে দেয়। এই সময়ে সুড়ঙ্গ খনন বিশেষজ্ঞরা প্রাচীরের ভিত্তিতে সুড়ঙ্গ তৈরির চেষ্টা করছিল।

কনস্টান্টিনোপলের বাহিনী পূর্ণ উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে মোকাবিলা করতে থাকে। কায়সার কনস্টান্টিন নিজে প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম তদারকি করছিলেন। পাদ্রিরা সৈন্যদের সাহস বাড়িয়ে তাদের অবিচল থাকার উপদেশ দিচ্ছিলেন। পোপ নিকোলাস পঞ্চম কর্তৃক নিযুক্ত কার্ডিনাল তার বীরদের যুদ্ধের অগ্নিকুণ্ডে নিষ্ক্ষেপ করে যাচ্ছিলেন। গ্রীক নবাব ডিউক নোটরাস এবং জেনোয়ার সেনাপতি জন অগাস্টিনও শহরের প্রতিরক্ষায় জানপ্রাণ লড়িয়ে দিয়েছিলেন। এই সময়ে হাঙ্গেরিও তুর্কিদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করে কায়সারকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং তার সাহায্যের জন্য একটি বাহিনী পাঠিয়ে দেয়। এভাবে কনস্টান্টিনোপলের প্রতিরক্ষা আরও মজবুত হয়ে যায়।

শুরুতে খ্রিস্টানরা শহর থেকে বেরিয়ে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ চালাতে থাকে, কিন্তু এই আক্রমণগুলোতে তাদেরই বেশি ক্ষতি হয়। এরপর শহরের দেয়াল থেকে পাথর নিষ্ক্ষেপ ও তীরন্দাজি ছাড়াও মানজানিক ও কামানের মাধ্যমে মুসলমানদের ওপর পাল্টা আক্রমণ অব্যাহত থাকে। ওদিকে উসমানীয়দের কামানগুলোও গর্জন করছিল। এতে দুইশটি কামান ছিল, যার বেশিরভাগই হাঙ্গেরির একজন কামান নির্মাতা ‘আরবান’ তৈরি করে দিয়েছিল। এই কামানগুলো তিনশ কেজি ওজনের পাথরের গোলা এক মাইল দূরত্ব পর্যন্ত নিষ্ক্ষেপ করত। একটি কামান স্থাপন ও চালানোর জন্য সাতশ লোকের কর্মীদল ছিল। নল ভর্তি করতে এবং একটি ফায়ার করতে দুই ঘণ্টা

[১] আখবারুদ দুয়াল: ৩/ ২৮; তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া: ১/ ১৩১; নুজহাতুল আনজার: ২/ ২৬

[২] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া: ১/ ১৩৩

[৩] আল-বদরুত তালি’ আয আল্লামা শাওকানি: ২/ ৬৭

লাগত। প্রাচীন ধাঁচের এই গোলন্দাজ বাহিনী কয়েক দিন লক্ষ্যভেদের পর শহরের প্রাচীরকে কয়েক জায়গায় ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিল, তবে রোমানরা দেরি না করে মেরামত করে প্রাচীরকে পুনরায় মজবুত করে নিয়েছিল।

সুলতান এটি দেখে প্রাচীরের ওপর সরাসরি আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। মুজাহিদগণ পরিখা কয়েক জায়গায় ভরাট করে প্রাচীর পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন, কিন্তু তা জয় করার কোনো উপায় ছিল না। উপর থেকে অবরুদ্ধরা জ্বলন্ত তেল নিক্ষেপ শুরু করে দিল, যার ফলে মুসলমানদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হলো। সুলতান এই প্রচেষ্টার ব্যর্থতার পর চাকার ওপর চলাচলকারী সুউচ্চ কাঠের মিনার তৈরি করালেন যেগুলোকে ‘দাবাবাহ’ বলা হতো। মুজাহিদগণ দাবাবাহর মাধ্যমে প্রাচীরের দিকে অগ্রসর হতেন এবং তীর নিক্ষেপ ও পাথর বর্ষণ করে প্রতিপক্ষকে লক্ষ্যবস্তু বানাতে থাকতেন। দাবাবাহর চূড়ায় চলন্ত সেতু লাগানো হয়েছিল যাতে সেগুলোর মাধ্যমে প্রাচীরে পৌঁছানো যায়। কিন্তু যখনই দাবাবাহগুলো প্রাচীরের কাছে পৌঁছাত, অবরুদ্ধরা অগ্নিগোলক নিক্ষেপ করে সেগুলো জ্বালিয়ে দিত।

অবরোধ শুরু হওয়ার ৪৯ দিন অতিবাহিত হয়ে গেল কিন্তু বিজয়ের কোনো পথ দেখা গেল না। এই সময়ে তুর্কি নৌবাহিনী, যা বিশ হাজার সৈন্য এবং প্রায় তিনশ ছোট জাহাজের সমন্বয়ে গঠিত ছিল, সমুদ্রের দিক থেকে কনস্টান্টিনোপলের বন্দর গোন্ডেন হর্নের প্রবেশমুখে নোঙর ফেলেছিল। তবে লোহার শিকল এবং তার ওপারে রোমান নৌবহর তাদের আর সামনে এগুতে দেয়নি।

১৫ এপ্রিল জেনেভার পাঁচটি যুদ্ধজাহাজ খাদ্য, রসদ এবং গোলাবারুদ নিয়ে পশ্চিম দিক থেকে আবির্ভূত হলো। সেগুলো মারমারা সাগরে প্রবেশ করল এবং সরাসরি গোন্ডেন হর্নের দিকে যাত্রা করল। উসমানীয় নৌবাহিনী তাদের পথ আটকানোর আশ্রয় চেষ্টা করল, কিন্তু তাদের জাহাজগুলো ইউরোপীয় জাহাজগুলোর তুলনায় ছোট ছিল, তাই ইউরোপীয় জাহাজগুলো তাদের ঠেলে পথ পরিষ্কার করে গোন্ডেন হর্নে পৌঁছে গেল। বন্দরের কর্মীরা লোহার শিকল নামিয়ে তাদের ভেতরে প্রবেশ করিয়ে নিল এবং শিকল পুনরায় টেনে দিল।

[১]

যখন যুদ্ধজাহাজ স্থলের ওপর দিয়ে চালানো হলো:

সুলতান মুহাম্মদ খান সানি অবরুদ্ধদের কাছে নতুন সাহায্য পৌঁছানো এবং নিজের নৌবাহিনীর ব্যর্থতার এই দৃশ্য সচক্ষে দেখলেন। প্রতিটি কৌশল ব্যর্থ হতে দেখে তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন এবং নতুন কোনো পরিকল্পনা নিয়ে ভাবতে লাগলেন। সেই সময় রোমানদের অধিকাংশ শক্তি স্থলের প্রাচীরে জমা ছিল যেখানে মুসলমানদের আক্রমণের তীব্রতা ছিল। মারমারা সাগরে তাদের নৌবহর দাঁড়িয়ে ছিল যা মুসলমানদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখত। গোন্ডেন হর্নের বন্দর ইস্পাত সদৃশ শিকলের কারণে মুসলমানদের নৌবহরের নাগালের বাইরে সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল। প্রতিপক্ষের বেশ কিছু যুদ্ধজাহাজ শিকলের কাছে পাহারা দিচ্ছিল, তবে গোন্ডেন হর্নের তীরে শহরের প্রাচীর খুব বেশি উঁচু ছিল না, কারণ এই উপসাগরের প্রবেশমুখ অতিক্রম করে শহর পর্যন্ত পৌঁছানো এমনিতেই অসম্ভব মনে করা হতো।

সুলতান ভাবলেন, যদি কোনোভাবে এই জলপথে নৌবহর পৌঁছে দেওয়া যায়, তবে শহর সব দিক থেকে ঘেরাও হয়ে যাবে এবং বিজয় সহজ হয়ে যাবে। কিন্তু ইস্পাত সদৃশ শিকল এবং রোমান জাহাজগুলোর উপস্থিতিতে এই কাজ কীভাবে সম্ভব ছিল?

ভাবতে ভাবতে তাঁর মাথায় এক অদ্ভুত কৌশল এল। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, বসফরাস প্রণালীতে মোতায়ন করা তাঁর নৌবহর—

[১] تاريخ الدولة العثمانية (তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া), ইলম: ১/ ১৩২ থেকে ১৩৩; الدولة العثمانية (আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া), সাল্লাবি: ১/ ১০০, ১০১।

স্থলের ওপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হোক এবং নৌ-অবরোধের এলাকাটি স্থলের ওপর দিয়ে ঘুরে অতিক্রম করা হোক। এরপর রোমান নৌবাহিনীর পেছনে এসে জাহাজগুলোকে শহরের বন্দরের সামনে এনে পানিতে নামিয়ে দেওয়া হোক এবং বন্দরে অতর্কিতে আক্রমণ করা হোক।

সুলতান স্থলের ওপর দিয়ে জাহাজ টেনে নেওয়ার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। বসফরাস প্রণালীর তীর থেকে গোন্ডেন হর্ন পর্যন্ত স্থলের একটি দশ মাইল দীর্ঘ অংশ ছিল। এর ওপর কাঠের বড় বড় মজবুত তক্তা বিছিয়ে দেওয়া হলো এবং সেগুলোকে চর্বি ও তেলের মাধ্যমে খুব পিচ্ছিল করে নেওয়া হলো। ১৪ই জমাদিউল আউয়ালের পূর্ণিমার আলোতে হাজার হাজার সৈন্য ৮০টি ছোট জাহাজকে এই তক্তাগুলোর ওপর তুলে ঠেলতে শুরু করল। সৌভাগ্যবশত বাতাসের অভিমুখ সেদিকেই ছিল, তাই পালগুলো খুলে দেওয়া হলো, ফলে জাহাজগুলোকে কাঙ্ক্ষিত দিকে নিয়ে যাওয়ার পরিশ্রম কিছুটা কমে গেল।

সারা রাত ধরে জাহাজগুলোকে গোন্ডেন হর্নে নামানোর প্রক্রিয়া চলতে থাকল। এই শোরগোলের শব্দ রোমানদের কানে পৌঁছাতে থাকল কিন্তু তারা কিছুই বুঝতে পারল না যে কী হচ্ছে। পশ্চিম দিক থেকে তুর্কিদের গোলন্দাজ বাহিনী সারা রাত গোলাবর্ষণ করতে থাকল, তাই খ্রিস্টানদের মনোযোগ সেদিকেই নিবদ্ধ ছিল এবং গোন্ডেন হর্ন বন্দরের ওপারে হওয়া নড়াচড়া তারা একেবারেই বুঝতে পারল না। ভোরের আলো ফোটার আগেই তুর্কিরা তাদের জাহাজগুলো গোন্ডেন হর্নে নামিয়ে নিল এবং তারপর সেগুলোকে এক সারিতে এমনভাবে দাঁড় করাল যে উপসাগরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত একটি সেতু তৈরি হয়ে গেল। তুর্কি বাহিনী এর মাধ্যমে শহরের বন্দর ও প্রাচীর পর্যন্ত পৌঁছে গেল। ভোরের আলোতে যখন শহরবাসী এই দৃশ্য দেখল, তখন তারা হতভম্ব হয়ে গেল। [১]

ইউরোপীয় ঐতিহাসিক ডুকাস সুলতানের এই বিস্ময়কর কৃতিত্বে বিস্ময় প্রকাশ করে লিখেছেন:

“আমরা এর আগে এমন অলৌকিক ঘটনার কথা কখনও দেখিনি বা শুনিনি। মুহাম্মদ খান সানি স্থলপথ অতিক্রম করে সমুদ্রে পৌঁছে গেলেন এবং তাঁর নৌবহর সমুদ্রের ঢেউয়ের পরিবর্তে পাহাড়ের চূড়াগুলো পার হয়ে গেল। মুহাম্মদ খান সানি এই কৃতিত্বের কারণে সিকান্দার আজমকেও ছাড়িয়ে গেলেন। [২]”

কায়সারকে শেষবারের মতো নিরাপত্তার প্রস্তাব:

কায়সার শেষ চেষ্টা হিসেবে মারমারা সাগরে থাকা তাঁর নৌবহরকে গোন্ডেন হর্নে আসার নির্দেশ দিলেন, কিন্তু যখন এই নৌবহর বসফরাস প্রণালীতে পৌঁছাল, তখন উভয় দিকে থাকা তুর্কি দুর্গগুলো থেকে তাদের ওপর গোলাবর্ষণ করা হলো। বেশ কিছু জাহাজ ডুবে যাওয়ার পর রোমান নৌবহর পিছু হটল। একই দিনে (২৩শে মে) কায়সার পরাজয় নিশ্চিত দেখে সুলতানের কাছে বার্তা পাঠালেন যে, যদি একজন করদ শাসক হিসেবে কনস্টান্টিনোপল তাঁর কাছেই থাকতে দেওয়া হয়, তবে তিনি চাওয়া মাত্রই খরাজ প্রদান করতে প্রস্তুত। কিন্তু সুলতান মুহাম্মদ খান সানি ফিতনার এই কেন্দ্রটিকে যেকোনো মূল্যে জয় করার সংকল্প করেছিলেন, তাই জবাবে বলে পাঠালেন যে, যদি তিনি আত্মসমর্পণ করেন তবে তাঁকে দক্ষিণ গ্রিস দেওয়া যেতে পারে। কায়সার এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন এবং যুদ্ধের সিদ্ধান্তে অটল রইলেন।

[১] আখবারুদ দুওয়াল: ২৮/৩; তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়া, পৃ. ১৬৩

[২] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া আজ ইলমাজ: ১/ ১৩৫

সুলতান কায়সারকে আরও একবার বার্তা পাঠালেন যে, তিনি চাইলে তাঁর আত্মীয়স্বজন, ধনভাণ্ডার এবং ধন-সম্পদসহ যে কোনো জায়গায় চলে যেতে পারেন, কিন্তু কায়সার তবুও কোনো ইতিবাচক উত্তর দেননি। [১]

চূড়ান্ত হামলা... শেখ শামসুদ্দিনের দুআ... সুস্পষ্ট বিজয়:

অবশেষে ১৯ জমাদিউল আউয়াল (২৮ মে) রাতে সুলতান বাহিনীকে নির্দেশ দিলেন যেন তারা পরদিন ভোরে শেষ চূড়ান্ত হামলার জন্য প্রস্তুত থাকে। সারা রাত ধরে সেনাবাহিনী নতুন উদ্দীপনার সাথে প্রস্তুতি নিতে থাকে। ২০ জমাদিউল আউয়াল (২৯ মে) ফজরের নামাজের পর সুলতান দশ হাজার নির্বাচিত সৈন্য নিয়ে শহরের পশ্চিম প্রাচীরে আক্রমণ করেন। কামানগুলো গর্জন করে গোলা নিক্ষেপ করছিল এবং শহরের প্রাচীর ভেঙে পড়ছিল। রোমানরাও পূর্ণ জাতীয় উদ্দীপনার সাথে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। সুলতান শহরের প্রাচীরের সামনে তাবু গেড়ে অনবরত দুআয় মগ্ন ছিলেন এবং উলামা ও মাশায়েখদের দিয়েও দুআ করাচ্ছিলেন, কিন্তু বিজয় অর্জনে বিলম্ব হচ্ছিল। অবশেষে দুপুর হয়ে গেল, মুসলমানরা তাদের পূর্ণ শক্তি যুদ্ধে নিয়োজিত করেছিল কিন্তু বিজয়ের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। তখন সুলতানের এক আমির অস্থির হয়ে শেখ শামসুদ্দিনের তাবুর দিকে ছুটে গেলেন। তিনি দেখলেন যে তিনি সিজদায় মাথা রেখে অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে বিজয় ও সাহায্যের জন্য দুআ করছেন। হঠাৎ তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং তাকবীরের ধ্বনি দিয়ে উচ্চস্বরে বললেন: “আলহামদুলিল্লাহ! শহর বিজয় হয়েছে।” আমির ফিরে শহরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে তুর্কি কামানগুলো প্রাচীরের একটি অংশ ধসিয়ে দিয়েছে।

সুলতান বাহিনীকে শহরে প্রবেশের নির্দেশ দিলেন। উসমানীয় সৈন্যরা তিন ধাপে আক্রমণ চালায়: প্রথমে জানবাজ বাহিনী পরিখা অতিক্রম করে ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীর দিয়ে শহরে প্রবেশ করতে শুরু করে। আমির ওয়ালিউদ্দিন সুলাইমান প্রাচীরে মোতায়েন শত্রুদের সাথে লড়াই করে তুর্কিদের লাল হেলালি পতাকা স্থাপন করেন এবং এই সংঘর্ষেই প্রাণ বিসর্জন দেন। শত্রু পতাকাটি ফেলে দেওয়ার আগেই একের পর এক আঠারো জন উসমানীয় সৈন্য সেখানে পৌঁছায়, প্রত্যেকেই পতাকা রক্ষা করতে করতে শহীদ হতে থাকে। এই সময়ে সৈন্যদের দ্বিতীয় দল কামানের গোলার আঘাতে সৃষ্ট ফাটল এবং মইয়ের সাহায্যে শহরে ঢুকে ফটকগুলো দখল করে নিয়েছিল। ফটকগুলো খুলে যেতেই তৃতীয় দল ভেতরে প্রবেশ করে এবং শহরে ছড়িয়ে পড়ে। সবশেষে ইয়েনি চেরি (জানিসারি) বাহিনী ভেতরে প্রবেশ করে এবং শহর নিয়ন্ত্রণে নিতে শুরু করে। কায়সার শেষ মুহূর্তে তার সংরক্ষিত বাহিনী এবং দেহরক্ষী দলসহ শহর রক্ষার জন্য ফটকে পৌঁছেছিলেন। তার অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও অনেক নবাব ও আমির ময়দান ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। তবুও কায়সার অটল থাকেন। তার নেতৃত্বে রোমানরা প্রতিরোধে কোনো কমতি রাখেনি কিন্তু বিজয়ীদের সামনে তাদের কোনো কৌশল খাটেনি। এদিকে তুর্কি নৌবাহিনী খাড়ির মুখে কন্ডা করে শিকল ফেলে দিয়েছিল এবং পুরো উসমানীয় নৌবহর গোন্ডেন হর্ন বন্দরে পৌঁছে গিয়েছিল। সেই সৈন্যরা চোখের পলকে বন্দর দখল করে পূর্ব প্রাচীরও জয় করে নেয়। এভাবে আল্লাহর সাহায্য ও সমর্থনে বাইজেন্টাইন রাজধানী বিজয় হলো। [২]

[১] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া আজ সাল্লাবি: ১/১০০, ১০১; তারিখুদ দাওলাতুল আলিয়া, পৃ. ১৬৩, ১৬৪; তারিখুদ দাওলাতুল উসমানিয়া আজ ইলমাজ: ১/১৩৫, ১৩৬।

[২] আখবারুদ দুওয়াল: ৩/২৯; তারিখুদ দাওলাতুল উসমানিয়া আজ ইলমাজ: ১/১৩৭; আল-বদরুত তালি: ২/১৬৭।

তারিখে উম্মতে মুসলিমা (চতুর্থ খণ্ড)

সুলতান মুহাম্মদ খান ফাতেহ আয়া সোফিয়া এবং কায়সারের প্রাসাদে:

সুলতান ঘোড়ায় চড়ে প্রাচীরের ধ্বংসপ্রাপ্ত অংশ দিয়ে শহরে প্রবেশ করলেন এবং শুকরিয়ার সেজদা আদায় করলেন। তিনি দোয়া করলেন যেন আল্লাহ শহীদদের ওপর তাঁর রহমত নাযিল করেন। তিনি শহর বিজয় সম্পর্কে বর্ণিত রাসূলের হাদীস পাঠ করলেন এবং গাজীদের মাগফিরাতের সুসংবাদ দিলেন। যোহরের ওয়াক্ত হয়ে গিয়েছিল, তিনি “আয়া সোফিয়া” গির্জায় আযান দিলেন এবং জামাতের সাথে সালাত আদায় করলেন। তাঁর নির্দেশে গির্জাটিকে মসজিদের মর্যাদা দেওয়া হলো, তবে নির্মাণে কেবল ততটুকুই পরিবর্তন করা হয়েছিল যা শরীয়ত অনুযায়ী ওয়াজিব ছিল এবং যা ছাড়া সালাত জায়েজ হতো না।

সুলতান কায়সারের রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলেন। এই অতুলনীয় কায়সার যা তিন মহাদেশ জুড়ে বিস্তৃত বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের কেন্দ্র ছিল এবং সারা বিশ্বের শাসক, নবাব ও রাষ্ট্রদূতরা এই চৌকাঠে আসাকে গর্ব মনে করতেন, আজ তা বাসিন্দাশূন্য হয়ে পড়েছে। কায়সার যুদ্ধ করতে করতে শহরের সেন্ট আরমানোস গেটের কাছে নিহত হয়েছিলেন। তাঁর মাথা কেটে সুলতানের সামনে পেশ করা হয়েছিল। কায়সারের এক নাতি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছাড়া এই বংশের আর কোনো নাম-নিশান বাকি রইল না। [১]

এভাবে নবী আকরাম (সা.)-এর সেই ভবিষ্যদ্বাণীও অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হলো যে: “إِذَا هَلَكَ قَيْصَرٌ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ” (যখন কায়সার ধ্বংস হবে, তখন তার পরে আর কোনো কায়সার থাকবে না।) [২]

শেখ শামসুদ্দিনের নসিহত:

বিজয়ের পরের দিন সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ শেখ শামসুদ্দিনের তাঁবুতে উপস্থিত হলেন। শেখ নিজের জায়গায় শুয়ে রইলেন। সুলতান দস্তবুসি করে অনুরোধ করলেন যে, তাঁকে যেন কিছু দিন নির্জনে সাথে রেখে জিকির ও ইবাদতে মগ্ন হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। শেখ মানা করে দিলেন এবং বললেন: “যদি তুমি নির্জনে জিকির ও ইবাদতে মশগুল হও, তবে এমন স্বাদ পাবে যে সালতানাত থেকে মন উঠে যাবে এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা বিপর্যস্ত হতে শুরু করবে। এমনটা হলে আল্লাহ আমাদের ওপর অসন্তুষ্ট হবেন। নির্জনে জিকির ও ইবাদতের উদ্দেশ্য এটাই যে মানুষ যেন ন্যায়পরায়ণ হয়। এর জন্য তুমি কয়েকটি বিষয়ের খেয়াল রাখো।” এই বলে শেখ সুলতানকে ন্যায়বিচার, তাকওয়া এবং আত্মশুদ্ধি সম্পর্কে কিছু নসিহত করলেন। [৩]

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)-এর হারিয়ে যাওয়া কবর আবিষ্কার:

সুলতান হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)-এর কবরের সন্ধানে ছিলেন যা শতাব্দী ধরে হারিয়ে গিয়েছিল। এতটুকু জানা ছিল যে তা শহরের প্রাচীরের কাছে। শেখ শামসুদ্দিনকে এই দায়িত্ব দেওয়া হলো। তিনি শহরের প্রাচীরের কাছে গেলেন এবং কাশফ ও আধ্যাত্মিক অনুভবের মাধ্যমে কবরের সঠিক স্থান নির্ধারণ করলেন। সুলতান জানতে পেরে শেখকে বললেন: “এমন কোনো নিদর্শন বর্ণনা করুন যাতে নিশ্চিত হওয়া যায় যে এটিই তাঁর দাফনস্থল।”

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া: ১/ ১৩৮, ১৩৯

[২] সহীহ আল-বুখারী, হা: ৩১২০, কিতাবুল জিহাদ

[৩] আল-বদরুত তালি’ লিশ-শাওকানি: ২/ ১৬৭

শেখ বললেন: “এখানে খনন করলে দুই হাত নিচে একটি মার্বেল পাথরের ফলক পাওয়া যাবে যা থেকে এই দাবি প্রমাণিত হবে।” খনন করা হলে সত্যিই দুই হাত নিচে একটি মার্বেল পাথরের ফলক পাওয়া গেল, যাতে ল্যাটিন ভাষায় লেখা ছিল যে এটি আবু আইয়ুব আনসারির শেষ বিশ্রামস্থল। সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ বিস্ময় ও আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার পর তিনি কবরের মেরামত করালেন এবং সেখানে একটি গম্বুজ নির্মাণ করে দিলেন। [১]

কনস্টান্টিনোপলের ওপর মুসলমানদের এগারোটি আক্রমণ এক নজরে:

কনস্টান্টিনোপলের ঐতিহাসিক বিজয় ২০ জমাদিউল আউয়াল ৮৫৭ হিজরি (২৯ মে ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দ) তারিখে হয়েছিল। মুসলমানরা এখানে এগারো বার সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছিল। প্রথম অভিযান ৩২ হিজরিতে হযরত উসমান (রা.)-এর নির্দেশে হযরত আমির মুয়াবিয়া (রা.) করেছিলেন। [২] দ্বিতীয়বার ৪৯ হিজরিতে আমির মুয়াবিয়া (রা.)-এর নির্দেশে ইয়াজিদ আক্রমণ করেছিল। [৩] তৃতীয়বার ৯৭ হিজরিতে সুলাইমান বিন আব্দুল মালিকের নির্দেশে মাসলামা বিন আব্দুল মালিক আক্রমণ করেছিলেন। [৪] চতুর্থবার ১৬৫ হিজরিতে মাহদি আব্বাসির নির্দেশে তাঁর উত্তরাধিকারী হারুনুর রশিদ আক্রমণ করেছিলেন। [৫] পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম এবং অষ্টম বার বায়েজিদ ইলদিরিম আক্রমণ করেছিলেন। নবম অভিযান মুসা বিন বায়েজিদ এবং দশম অভিযান মুরাদ সানি করেছিলেন। এগারোতম এবং শেষ আক্রমণ সুলতান মুহাম্মদ খান সানি করেছিলেন। এই বিজয়ের স্মরণে তাঁকে ‘ফাতেহ’ উপাধি দেওয়া হয় এবং তিনি সুলতান মুহাম্মদ খান ফাতেহ নামে বিখ্যাত হন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ২৫ বছর। [৬]

বিজয়ের পর সুলতানের জনগণের সাথে সদাচরণ:

কনস্টান্টিনোপলের যুদ্ধে চল্লিশ হাজার খ্রিস্টান নিহত এবং ষাট হাজার বন্দি হয়েছিল। সুলতান বন্দিদের সাথে অত্যন্ত ভালো ব্যবহার করেন এবং তাঁদের মুক্ত করে একটি আলাদা মহল্লায় পুনর্বাসিত করেন। সুলতান ঘোষণা করেন যে খ্রিস্টানদের ধর্মীয় বিষয় এবং পাদ্রিদের ধর্মীয় কর্তৃত্বে কোনো হস্তক্ষেপ করা হবে না। তিনি এই প্রতিশ্রুতির ওপর পুরোপুরি আমল করেন। খ্রিস্টানদের ধর্মীয় স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তাঁদের গির্জাগুলোকে নিরাপত্তা দেওয়া হয় এবং তাঁদের নিজেদের প্যাট্রিয়াক (প্রধান যাজক) নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হয়। ফলে খ্রিস্টানরা একত্রিত হয়ে জেনাডিউসকে নিজেদের প্যাট্রিয়াক হিসেবে নির্বাচিত করে। সুলতান এই নির্বাচনের ওপর আস্থা প্রকাশ করে নতুন প্যাট্রিয়াককে রোমানদের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করেন এবং তাঁর নিরাপত্তার জন্য ইয়েনি চেরি বাহিনীর একটি দল নির্দিষ্ট করে দেন। গির্জার বড় পদগুলোর জন্য একটি কাউন্সিল গঠন করা হয়। [৭]

বিজয়বর্তা:

এই মহান বিজয়ের সুসংবাদ পুরো ইসলামি বিশ্বে পাঠানো হয়। মিসরের মামলুক শাসক ইনাল শাহকেও পত্র লেখা হয়।

[১] আল-বদরুত তালি ফি মাহাসিনি মান বাদাল করনিস সাবি, আশ-শাওকানি: ২/১৬৮

[২] তারিখু খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ১৬৭; তারিখুত তবারি: ৩/৩০৩

[৩] তারিখুত তবারি: ৫/২৩২

[৪] প্রাপ্ত

[৫] আল-মারিফাতু ওয়াত তারিখ: ১/১৫৩; তারিখুত তবারি: ৮/১৫২

[৬] আস-সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতেহ, লেখক: আব্দুস সালাম আব্দুল আজিজ আল-ফাহমি, পৃ. ৬৩ থেকে ৬৯, দারুল কলম দামেস্ক; আল-ফাতহুল কুসতুনতিনিয়া লিস-সাল্লাবি, পৃ. ৮৫

[৭] তারিখু সালাতিন বানি উসমান, পৃ. ৫৩, ৫৫; তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া: ১/১৩৯ থেকে ১৪১

“আমাদের পূর্বসূরিদের পথই সর্বোত্তম, যারা আল্লাহর পথে জিহাদকারী ছিলেন। আমরা রাসূল-এর এই বাণীর ওপর আমল করছি যে, যার পা আল্লাহর পথে ধূলিমলিন হয়েছে, আল্লাহ তার ওপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিয়েছেন। এজন্যই আমরা এই বছর কুসতুনতুনিয়া বিজয়ের সংকল্প করেছিলাম। আল্লাহ তা আমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন। ৫৪ দিনের যুদ্ধের পর আল্লাহ আমাদের বিজয় দান করেছেন।” [১]

একইভাবে হিজাজের শাসকের কাছে গনিমতের মালের সর্বোত্তম উপহারসহ এই পত্র পাঠানো হয়েছিল:

“এই বছর আল্লাহ আমাদের এমন এক বিজয় দান করেছেন যা কোনো চোখ দেখেনি এবং কোনো কান শোনেনি। আমরা বিখ্যাত শহর কুসতুনতুনিয়া বিজয়ের সুসংবাদ জানিয়ে এই পত্র পাঠাচ্ছি। আশা করি আপনি হারমাইনের সমস্ত সাদাত, উলামা, আউলিয়া, বাইতুল্লাহর জিয়ারতকারী এবং রওজায়ে রাসূল-এ হাজিরা দানকারীদের আল্লাহর পক্ষ থেকে দানকৃত এই মহান বিজয়ের সুসংবাদ পৌঁছে দেবেন। তাঁদের দোয়ার বরকতেই আল্লাহ আমাদের এই বিজয়ের স্বাদ আস্বাদন করিয়েছেন। আমরা দূতের মাধ্যমে খাঁটি সোনার সাত হাজার ফ্লোরিন পাঠাচ্ছি, যার মধ্যে দুই হাজার সম্মানিত সাদাতদের জন্য, এক হাজার হারমাইনের খাদেমদের জন্য এবং বাকিগুলো হারমাইনের দরিদ্রদের জন্য।” [২]

কুসতুনতুনিয়া..... ইসলামবুল..... ইস্তাম্বুল:

সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ কায়সারের কেন্দ্র জয় করে একে উসমানীয় সালতানাতের রাজধানী বানিয়েছিলেন। এর একটি প্রাচীন নাম “আস্তানবুল”-ও ছিল, যেমনটি প্রাচীন ঐতিহাসিক ইয়াকুত হামাভী (মৃত্যু ৬২৬ হিজরি) লিখেছেন। যেহেতু কুসতুনতুনিয়া উচ্চারণ করা কিছুটা কঠিন ছিল, তাই অনেক মানুষ একে “আস্তানবুল” বলত। মুহাম্মদ ফাতেহ একে রাজধানী বানানোর পর এর নাম পরিবর্তন করেন এবং “আস্তানবুল”-এর সাথে মিল রেখে নতুন নাম “ইসলামবুল” (অর্থাৎ ইসলাম আবাদ) নামকরণ করেন। কিন্তু অনেক মানুষ একে “আস্তানবুল”-ই বলতে থাকে। ধীরে ধীরে “ইসলামবুল” শব্দটি পরিত্যক্ত হয়ে যায় এবং এই শহর “ইস্তাম্বুল” নামে পরিচিতি পায়।

পৌনে পাঁচ শতাব্দী পর্যন্ত এটি উসমানীয়দের রাজধানী ছিল। গত শতাব্দীতে উসমানীয় খিলাফতের পতনের পর “আঙ্কারা” (আঙ্গোরা) তুরস্কের রাজধানী হয় এবং ইস্তাম্বুলের রাজনৈতিক কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে প্রায় দুই হাজার বছরের যুগের অবসান ঘটে। [৩]

কুসতুনতুনিয়া বিজয় উসমানীয় সালতানাতকে একটি বিশ্বজনীন শক্তির মর্যাদা দান করে পুরো ইউরোপে আলোড়ন সৃষ্টি করে। বাইজেন্টাইনদের ১১২৫ বছরের সালতানাতের পতন বিশ্ব ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা ছিল। একজন পশ্চিমা ঐতিহাসিক লিখেছেন: “ইস্তাম্বুল বিজয় বিশ্বের ইতিহাসের অন্যতম মহান ঘটনা। ইউরোপের ভবিষ্যতের ওপর এর গভীর প্রভাব পড়ে। এই ঘটনা বিশ্বের ইতিহাসকে পুরোপুরি বদলে দিয়েছে। মধ্যযুগের অবসান ঘটে এবং আধুনিক যুগের সূচনা হয়।” [৪]

[১] সুলতান ৫ এপ্রিল রণাঙ্গনে পৌঁছেছিলেন এবং ২৯ মে শহর জয় করেছিলেন। এভাবে ৫৪ দিনই হয়।

[২] আদ-দাওলাতুল উসমানীয়াহ, সাল্লাবি: ১/ ১০৬, ১১১; আতলাস আল-ফুতুহাত আল-ইসলামিয়াহ: ৩/ ৩৩৪ থেকে ৩৩৬

[৩] ফি উসুলিত তারিখিল উসমানি, পৃ. ৬৯

[৪] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানীয়াহ: ১/ ১৩৩

তারিখ-ই উম্মত-ই মুসলিমা

সুলতান মুহাম্মদ খান ফাতেহ-এর ইউরোপীয় অভিযানসমূহ

কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের পর ইউরোপে সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ-এর প্রভাব-প্রতিপত্তি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কোনো তাৎক্ষণিক আক্রমণ থেকে বাঁচতে হাঙ্গেরি আবারও উসমানীয় সালতানাতের বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। ব্রাক্সোভিচ, ওয়ালাচিয়া, রোমানিয়া (আফলাক) এবং মলদোভিয়া (বগদান)-এর আমিরগণও আনুগত্য প্রকাশ করেন। মোরিয়ার শাসক ডিমেরিয়াস এবং টমাস, যারা বাইজেন্টাইন শাসকদের ভাই ছিলেন, তাদের এলাকাগুলো উসমানীয় সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত করে দেন। জেনোয়ার দ্বীপপুঞ্জ থিওস এবং লেসবস ছাড়াও এজিয়ান সাগরের আরও অনেক দ্বীপ উসমানীয়দের করদ রাজ্যে পরিণত হয়। তবে অনেক শাসকের এই পদক্ষেপ ছিল কেবল সাময়িক সময়ের জন্য। কিছুকাল পরেই সার্বিয়া, হাঙ্গেরি, রোমানিয়া এবং ভেনিস উসমানীয়দের বিরুদ্ধে জোট গঠন শুরু করে। [১]

ক্রুসেড:

এই বিশৃঙ্খলার পেছনে সবচেয়ে বড় হাত ছিল হুনিয়াদির, যে ভার্নার যুদ্ধে তৃতীয় লাডিসলাসের মৃত্যুর পর হাঙ্গেরির শাসক হয়েছিল। সে সার্বিয়ার শাসক জর্জ ব্রাক্সোভিচকে উসমানীয়দের বিরুদ্ধে নিজের সাথে মিলিয়ে নেয়। সার্বিয়ার ভূখণ্ড তখন দুই ভাগে বিভক্ত ছিল: পশ্চিম অংশ হাঙ্গেরির এবং পূর্ব অংশ উসমানীয়দের অধীনে ছিল। সার্বিয়ার শাসকরা যখন হাঙ্গেরি থেকে বিপদের আশঙ্কা করত তখন উসমানীয়দের সাথে যোগ দিত, আর যখন উসমানীয়দের থেকে বিপদ অনুভব করত তখন হাঙ্গেরির সাথে জোট করত। সার্বিয়ার বর্তমান শাসক জর্জ ব্রাক্সোভিচ বাহ্যিকভাবে উসমানীয় সালতানাতের সমর্থনের দাবি করত, কিন্তু ভেতর থেকে সে ছিল মুসলমানদের শত্রু। সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ-ও তার অবস্থা সম্পর্কে বেখবর ছিলেন না, তাই তিনি বলতেন: “সে বন্ধুত্ব প্রকাশ করে কিন্তু বাস্তবে সে শত্রু।”

জর্জ হুনিয়াদির প্রস্তাব গ্রহণ করার পর সার্বিয়ার যোদ্ধাদের দুর্গে অবস্থান নেওয়ার নির্দেশ দেয় এবং নিজে হুনিয়াদির কাছ থেকে সাহায্য নিতে হাঙ্গেরি চলে যায়। ওদিকে সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ-এর গুপ্তচররা জর্জের গতিবিধির ওপর নজর রাখছিল। ফলে সুলতান সময়মতো এই ষড়যন্ত্রের খবর পেয়ে যান এবং তিনি সার্বিয়ার দিকে সৈন্য চালনা শুরু করেন। তবে শীতকাল শুরু হওয়ার কারণে তিনি বেশি দূর এগোতে পারেননি এবং রাজধানীতে ফিরে আসেন। তার বাহিনী আমির ফিরোজ বেগের নেতৃত্বে মোরাভা নদীর তীরে অবস্থিত সোফিয়া শহরে মোতায়েন ছিল। এই সময়ে হঠাৎ হুনিয়াদি এবং জর্জ তাদের বাহিনী নিয়ে সেখানে পৌঁছে যায় এবং তারা কেবল উসমানীয়দের পরাজিতই করেনি, বরং ফিরোজ বেগকে বন্দি করে সাথে নিয়ে যায়। যাওয়ার সময় তারা সীমান্ত শহর “বিরুতা” এবং “ভিদিন” অগ্নিসংযোগ করে ধ্বংস করে দেয়। [২]

বেলগ্রেড অবরোধ:

এখন সার্বিয়া ও হাঙ্গেরির অবাধ্যতার দাপট দমন করা জরুরি হয়ে পড়েছিল। সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ পূর্ণ প্রস্তুতির সাথে ৮৫৯ হিজরি (১৪৫৫ খ্রিস্টাব্দ) বসন্তকালে সার্বিয়া আক্রমণ করেন এবং এর পূর্ব অংশগুলো নতুন করে পদানত করার পর পশ্চিম অঞ্চল...

[১] তারিখ-ই উসমানি, উজুন: ২/৫০৩

[২] মুহাম্মদ আল-ফাতেহ, পৃ. ১৫৯ থেকে ১৬১

...প্রবেশ করলেন যা হাঙ্গেরির দখলে ছিল।

ওদিকে সুলতানের অগ্রযাত্রার আগেই পুরো ইউরোপে হুলুস্থুল পড়ে গিয়েছিল। “ক্যাপিস্ট্রানো” নামক এক উগ্র সন্ন্যাসী স্পেন, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, জার্মানি এবং ফ্রান্স সফর করে ইউরোপের রাজাদের উসমানীয়দের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান। পোপ ক্যালিক্সটাস তৃতীয় সমস্ত গির্জায় তুর্কিদের বিরুদ্ধে বিশেষ প্রার্থনা করা বাধ্যতামূলক করে দেন। অবশেষে ইতালি, ফ্রান্স, জার্মানি, বারগান্ডি, ভেনিস, জেনেভা, রোডস, পোল্যান্ড এবং সার্বিয়ার সেনাবাহিনী সুলতানের মোকাবিলা করার জন্য বেলগ্রেডে সমবেত হলো, যাদের মোট সংখ্যা ছিল তিন লক্ষ। ইউরোপের রাজারা হাঙ্গেরির রাজা হুনিয়াদিকে মিত্রবাহিনীর কমান্ডার নিযুক্ত করেন এবং পোপ তার বিশেষ প্রতিনিধি জন অ্যাঞ্জেলোকে তার সহায়তার জন্য পাঠান।

সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহও তার সেনাবাহিনী বিন্যস্ত করতে থাকেন। অবশেষে ৮৬০ হিজরির শেষ শাবান (জুলাই ১৪৫৬ খ্রিস্টাব্দ) সুলতান দেড় লক্ষ সৈন্যের বাহিনী নিয়ে বেলগ্রেডের সামনে পৌঁছে যান, যা দানিউব নদী এবং এর একটি উপনদীর মোহনায় অবস্থিত হওয়ার কারণে অত্যন্ত নিরাপদ ও সুদৃঢ় বলে বিবেচিত হতো। সুলতান তার নৌবহরকেও তলব করেছিলেন যা নদীর দিক থেকে শহরটিকে ঘিরে ফেলেছিল, অন্যদিকে স্থলভাগ থেকেও অবরোধ করা হয়েছিল। বেশ কয়েক দিন ধরে অবরোধের যুদ্ধ চলতে থাকে। উভয় পক্ষ থেকে কামান চালানো হতে থাকে। প্রতিপক্ষের গোলাবর্ষণে সুলতানের শ্রেষ্ঠ জেনারেল কারাপাশা শহীদ হন, যার ফলে উসমানীয়রা প্রচণ্ড আঘাত পায়। নদীতে যুদ্ধজাহাজ এবং নৌকাগুলোর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ চলতে থাকে যাতে মুসলমানরা অগ্রসর হতে পারেনি।

অবশেষে সুলতান সমস্ত মনোযোগ স্থলপথের আক্রমণের দিকে নিবদ্ধ করেন। ওদিকে হুনিয়াদি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে শহর রক্ষা করছিলেন, অন্যদিকে সন্ন্যাসী “ক্যাপিস্ট্রানো” মিত্রবাহিনীর সাহস বাড়াচ্ছিলেন। যা-ই হোক, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করার পর ২৭ শাবান ৮৬০ হিজরি (২১ জুলাই ১৪৫৬ খ্রিস্টাব্দ) সুলতান সেনাবাহিনীকে শহরের ওপর চূড়ান্ত আক্রমণের নির্দেশ দেন। সেদিন অত্যন্ত ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। মুসলমানরা শহরের একটি অংশ দখল করতেও সক্ষম হয়। তবে খ্রিস্টানদের প্রবল পাল্টা আক্রমণের কারণে ছয় ঘণ্টার যুদ্ধের পর সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলে মুসলমানদের পিছু হটতে হয়।

৬ আগস্ট সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ নিজেই সেনাবাহিনীর কমান্ড হাতে নিয়ে আক্রমণে শরিক হন। সেদিন উসমানীয় বাহিনী আবারও প্রতিপক্ষকে হটিয়ে পুনরায় শহরে ঢুকে পড়ে। তবে সন্ন্যাসীর উদ্দীপনায় খ্রিস্টানরা অত্যন্ত জোরালো পাল্টা আক্রমণ করে এবং হুনিয়াদি সতেজ বাহিনীর সাথে উসমানীয়দের শহরের ভেতরে ঘিরে ফেলে। সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ শহরের প্রাচীরে হাতাহাতি যুদ্ধ করার সময় উরুতে গভীর আঘাত পান এবং ঘোড়া থেকে নিচে পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। জানিসারি বাহিনী তাকে সুরক্ষাবলয়ে নিয়ে নেয়, অন্যদিকে খ্রিস্টানরা সুলতানকে হত্যা বা বন্দী করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে। এভাবে এই স্থানে যুদ্ধের সবচেয়ে ভয়াবহ লড়াই সংঘটিত হয়। জানিসারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হাসান বেগ শত্রুদের ওপর প্রাণপণ আক্রমণ করেন এবং লাশের স্তুপ তৈরি করে নিজেও শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেন। এই সংঘর্ষের মধ্যেই হুনিয়াদি মারাত্মকভাবে আহত হন। অবশেষে উসমানীয়রা নিরাপদে শহর থেকে বের হতে সক্ষম হয়। সুলতানকে পালকিতে করে তাঁবুতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ইসলামী বাহিনীকে বাধ্য হয়ে...

প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হতে হয়েছিল। এভাবে বেলগ্রেড জয় হতে হতেও বাকি থেকে গেল। [১] এই পিছু হটাকে মক্কা বিজয় এবং হুনাইন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে দেখা হলে বোঝা যায় যে, এতে মুসলমানদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ছিল। ঐতিহাসিক সালেম রশিদী লিখেন:

“এই যুদ্ধে উসমানীয় সৈন্যরা শত্রুকে ঠিক তেমনি তুচ্ছ মনে করছিল যেমনটি মক্কা বিজয়ের পর হুনাইন যুদ্ধে হয়েছিল। তারা নিজেদের সংখ্যাধিক্য ও শক্তির ওপর গর্ব করছিল এবং তারা নিজেদের মধ্যে বলছিল: আমরা গতকাল কনস্টান্টিনোপল জয় করেছি যা প্রাচ্যে খ্রিস্টধর্মের সবচেয়ে বড় দুর্গ এবং সবচেয়ে সুরক্ষিত কেন্দ্র ছিল। সুতরাং বেলগ্রেড আবার কী জিনিস? অথচ কোনো বাহিনীর জন্য এর চেয়ে বেশি ক্ষতিকর আর কিছু নেই যে তারা শত্রুকে তুচ্ছ ও দুর্বল মনে করবে, চাই তার অবস্থা যেমনই হোক না কেন।” [২]

পুরো ইউরোপে খ্রিস্টানরা তাদের এই বিজয়ে উৎসব পালন করে। পোপ ক্যালিক্সটাস তৃতীয়-এর আদেশে ৬ই আগস্ট উসমানীয়দের পিছু হটার স্মরণে ‘মুক্তির উৎসব’ হিসেবে নির্ধারিত হয়। হাঙ্গেরির রাজা হুনিয়াদি, যিনি ‘ভার্নার যুদ্ধ’ এবং ‘দ্বিতীয় কসোভো যুদ্ধে’ পরাজয়ের কারণে নিজের মর্যাদা হারিয়েছিলেন, তিনি আবারও ‘জাতীয় বীর’ হয়ে ওঠেন। তবে তিনি যুদ্ধে পাওয়া আঘাত থেকে সেরে উঠতে পারেননি এবং বিজয়ের কয়েক দিন পর ১১ই আগস্ট ১৪৫৬ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। এদিকে সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহকে আল্লাহ সুস্থ করে দেন এবং তিনি দৃঢ় সংকল্পের সাথে বলেন: ‘বেলগ্রেড আজ হোক বা কাল অবশ্যই পদানত হবে। যদি আমি না পারি, তবে আমার বংশধররা অবশ্যই এটি জয় করবে।’ [৩]

রোমানিয়ার পিশাচতুল্য রাজা ড্রাকুলা:

রোমানিয়ার (ওয়ালাচিয়া) রাজা মিরশা প্রথম বায়েজিদ ইয়ালদারামের আমলে উসমানীয় সাম্রাজ্যের সাথে কর প্রদানের চুক্তি করেছিলেন। কিন্তু এরপর শাসনক্ষমতা তার ছেলে ব্লাদ টেপেস তৃতীয় (Vlad Tepes)-এর হাতে আসে, যে ছিল অত্যন্ত জালেম মানুষ। সে নিজের প্রজাদের ওপরও জুলুম-অত্যাচার করত এবং সেই সাথে উসমানীয় সাম্রাজ্যের ব্যবসায়ীদেরও কষ্ট দিত। তার নিষ্ঠুরতা ও রক্তপিপাসু স্বভাবের কারণে ইউরোপীয়রা তাকে ‘ড্রাকুলা’ বলে স্মরণ করত, অন্যদিকে তুর্কিরা তাকে ‘পেরেকওয়ালা রাজা’ বলত। কারণ সে তার বিরোধীদের শরীরে পেরেক ঠুকে তাদের হত্যা করত। ইতিহাসে এমন নিষ্ঠুর শাসকের উদাহরণ খুব কমই পাওয়া যায়। সে মজলুমদের আহাজারি ও আর্তনাদ শুনতেই আনন্দ পেত। তার আমোদ-প্রমোদের আসর এবং পানাহারের মজলিস এমন বেদনাদায়ক দৃশ্য ছাড়া পূর্ণ হতো না।

সে নির্যাতনের অদ্ভুত সব পদ্ধতি উদ্ভাবন করত এবং এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি তৈরি করত। সে জীবিত মানুষের চামড়া ছাড়িয়ে নিত, বন্দীদের ক্ষতে লবণ ছিটিয়ে দিত এবং লবণাক্ত ক্ষতগুলোকে বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে দিত। কখনো সে মানুষকে ধরে কোনো জায়গায় বসাত, তাদের পেট ভরে খাওয়াত ও মদ পান করাত এবং যখন তারা নেশায় মাতাল হয়ে যেত, তখন আগুন লাগিয়ে তাদের পুড়িয়ে মারত। কখনো সে মায়েদের সামনে তাদের সন্তানদের শিরশ্ছেদ করত এবং কখনো সন্তানদের সামনে তাদের মায়েদের পুড়িয়ে মারত এবং সন্তানদের বাধ্য করত তাদের মায়েদের মাংস খেতে।

[১] মুহাম্মদ আল-ফাতেহ, ডক্টর সালেম রশিদী, পৃষ্ঠা ১৫৯ থেকে ১৬২; তারিখ সালাতিন বনী উসমান, পৃষ্ঠা ৫৩; আখবারুদ দুওয়াল: ৩/৩৩; তারিখে উসমানী: ২/১৬ থেকে ১৮; তারিখুদ দাওলাতুল আলিয়া, পৃষ্ঠা ১৬৯, ১৭০; তারিখুদ দাওলাতুল উসমানিয়া, ইলমাজ: ১/১৫২

[২] মুহাম্মদ আল-ফাতেহ, ডক্টর সালেম রশিদী, পৃষ্ঠা ১৬২

[৩] মুহাম্মদ আল-ফাতেহ, ডক্টর সালেম রশিদী, পৃষ্ঠা ১৬৩

তার কাছে যত বেশি ক্ষমা বা দয়ার আবেদন করা হতো, তার জুলুম ও নির্যাতন তত বেশি বেড়ে যেত। একবার এক তাতারীকে তার কাছে ফাঁসি দেওয়া হতে যাচ্ছিল, তখন কিছু তাতারী তার জন্য সুপারিশ করতে এল। কিন্তু দয়ার আবেদনের জবাবে ড্রাকুলা তাদের আদেশ দিল যে, তারা যেন তাদের স্বজাতিকে নিজেরাই ফাঁসি দেয়। যখন তারা অস্বীকার করল, তখন ড্রাকুলা বন্দিকে পুড়িয়ে কাবাব বানিয়ে ফেলল এবং তাতারীদের তা খাওয়ার নির্দেশ দিল। যখন তারা রাজি হলো না, তখন তাদেরও হত্যা করিয়ে দিল।

ড্রাকুলার এই লোমহর্ষক আচরণ ছিল এমন লোকদের সাথে যারা নির্দোষ ছিল এবং তার নিজের প্রজা ছিল। কল্পনা করুন যে সে অন্যদের ওপর কেমন জুলুম চালাত। ফলে প্রায়ই তুর্কি বণিকরা তার নির্যাতনের শিকার হতো। [১]

ড্রাকুলার বিরুদ্ধে অভিযান। রোমানিয়া দখল:

এই ফিতনা দমনের জন্য সুলতান মুহাম্মদ ফাতিহ রোমানিয়াকে অনুগত করা জরুরি মনে করলেন। তাই তিনি দূত পাঠিয়ে ড্রাকুলাকে একটি চুক্তিতে বাধ্য করলেন, যার মাধ্যমে ড্রাকুলা উসমানীয় সালতানাতের সাথে কর প্রদানের চুক্তির নবায়ন করল। এই ঘটনাটি ৮৬৪ হিজরি (১৪৬০ খ্রিস্টাব্দ) সালের। কিন্তু ড্রাকুলা এই প্রতিশ্রুতি কেবল যুদ্ধের প্রস্তুতির সময় পাওয়ার জন্য দিয়েছিল। ফলে শীঘ্রই সে হাঙ্গেরির নতুন রাজা “মাতিয়াস”-এর পরিবারে আত্মীয়তা করে তার সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করল এবং তার সাথে উসমানীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধচুক্তি করে নিল।

সুলতান যখন এই খবর পেলেন, তখন এই ধূর্ত ও নিষ্ঠুর মানুষটির হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য হামজা পাশা এবং ইউনুস বেগ নামক দুই বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে কূটনৈতিক প্রতিনিধি হিসেবে ড্রাকুলার কাছে পাঠালেন। তাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল যে, তারা যেন বিশেষ সাক্ষাতের বাহানায় নির্জনে ড্রাকুলার সাথে দেখা করে তাকে হত্যা করে। কিন্তু এই নেকড়ে বিপদের গন্ধ পেয়ে গেল এবং উভয় দূতের হাত-পা কাটিয়ে তাদের পেরেক সদৃশ খুঁটিতে ঝুলিয়ে দিল। এরপর সে সেনাবাহিনী নিয়ে উসমানীয় সালতানাতের বুলগেরীয় অধিকৃত অঞ্চলে ঢুকে পড়ল এবং ২৫ হাজার মানুষকে বন্দি করে নিয়ে এল, যাদের মধ্যে নারী, শিশু এবং বৃদ্ধরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সুলতান শেষ সতর্কবার্তা হিসেবে আরও একটি প্রতিনিধি দল ড্রাকুলার কাছে পাঠালেন যাতে বন্দিদের উদ্ধার করা যায়। যখন তুর্কি দূত রোমানিয়ার দরবারে পৌঁছালেন, তখন ড্রাকুলা তাদের আদেশ দিল যে তারা যেন পাগড়ি খুলে তাকে সম্মান প্রদর্শন করে। প্রতিনিধি দল এই অপমান মেনে নিতে অস্বীকার করল। এটি দেখে ড্রাকুলা বলল: “আচ্ছা! তাহলে এখন থেকে এই পাগড়িগুলো সবসময় তোমাদের মাথায় থাকবে।” সে নির্দেশ দিল যে, প্রতিটি দূতের পাগড়ির ওপর একটি করে পেরেক রেখে মাথায় ঠুকে দেওয়া হোক।

দূতদের এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর সুলতানের পক্ষে চুপ করে বসে থাকা সম্ভব ছিল না। তিনি পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী প্রস্তুত করে স্থল ও জল উভয় দিক থেকে রোমানিয়া আক্রমণ করলেন। স্থলবাহিনী মাহমুদ পাশার নেতৃত্বে রওনা হলো, আর সুলতান নৌবাহিনী নিয়ে কৃষ্ণসাগরে প্রবেশ করলেন এবং সেখান থেকে দানিউব নদী হয়ে রোমানিয়া পৌঁছালেন। উসমানীয় বাহিনী কাছে আসার পর ড্রাকুলা তার পরিবার-পরিজন এবং আত্মীয়স্বজনকে দূরবর্তী নিরাপদ এলাকায় পাঠিয়ে দিল এবং নিজে বনাঞ্চলে...

[১] মুহাম্মদ আল-ফাতিহ, ডক্টর রশিদী, পৃষ্ঠা ২০২, ২০৩ সাথে টীকা।

সে ভালোভাবেই তুর্কি ভাষা জানত, তাই মাঝেমধ্যে তুর্কি সেজে সুলতানের লশকরে আসত এবং তথ্য সংগ্রহ করে ফিরে যেত। সুলতানের লশকর ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করার পর এক রাতে সে দশ হাজার সৈন্য নিয়ে হঠাৎ অতর্কিত হামলা চালায় এবং সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহের তাঁবু পর্যন্ত পৌঁছে যায়। কিন্তু জানিসারি সৈন্যরা তাকে পিছু হটতে বাধ্য করে। তার এক হাজার সৈন্য বন্দী হয় যাদের সুলতান হত্যা করান। তবে ড্রাকুলা ভূতের মতো জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে যায়। সুলতান তার অভিযান অব্যাহত রাখেন, অন্যদিকে ড্রাকুলা খোলা ময়দানে মোকাবিলা করা অসম্ভব দেখে চোরাগোপ্তা হামলা চালিয়ে যেতে থাকে। অবশেষে ইসলামী বাহিনী রোমানিয়ার বিভিন্ন শহর জয় করে রাজধানী “বুখারেস্ট” (Bucharest) পর্যন্ত পৌঁছে যায়। শহরের বাইরে খুঁটিতে হাজার হাজার লাশ গেঁথে রাখা হয়েছিল। এরা ছিল সেই ২৫ হাজার বন্দী যাদের উদ্ধার করতে মুসলমানরা এখানে এসেছিল। এই দৃশ্য দেখে সুলতান অত্যন্ত ব্যথিত হন।

এই অভিযান থেকে ফেরার কিছুকাল পর ৮৬৬ হিজরি (১৪৬২ খ্রিস্টাব্দ) সালে সুলতান ড্রাকুলার ছোট ভাই রাউলকে, যে সুলতানের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল, রোমানিয়ার করদ শাসক নিযুক্ত করেন। অন্যদিকে হাঙ্গেরির রাজা ড্রাকুলাকে, যে এতদিন তার কাছে বন্দী ছিল, ৮৮১ হিজরি (১৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) সালে রাউল যুদ্ধে নিহত হওয়ার পর মুক্তি দেন। সে নিজ দেশে ফিরে পুনরায় বিশৃঙ্খলা ছড়াতে শুরু করে। তবে ৮৮২ হিজরি সালে সে তার নিজের এক দাসের হাতে নিহত হয়। তার মাথা কেটে শহর ও গ্রামগুলোতে ঘোরানো হয় এবং মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। এভাবেই জুলুমের এক ভয়াবহ কাহিনীর করুণ সমাপ্তি ঘটে। [১]

সার্বিয়া, দক্ষিণ গ্রিস এবং বসনিয়া বিজয়:

সেই দিনগুলোতে সার্বিয়ার নবাব ব্রাঙ্কোভিচ হাঙ্গেরির রাজার সাথে যোগসাজশ করে উসমানীয় সালতানাতের সীমান্তে চোরাগোপ্তা হামলা চালাচ্ছিল। সার্বিয়া এমন একটি অঞ্চল ছিল যা উসমানীয়রা কয়েকবার জয় করেছিল, কিন্তু প্রতিবারই এখানে বিদ্রোহ হতো এবং এই অঞ্চল হাতছাড়া হয়ে যেত। ব্রাঙ্কোভিচের চোরাগোপ্তা হামলা উসমানীয়দের জন্য পুনরায় সামরিক অভিযানের অজুহাত তৈরি করে দেয়। ফলে প্রধান উজির মাহমুদ পাশার নেতৃত্বে সার্বিয়ায় আক্রমণ শুরু হয়। ৮৬২ হিজরি থেকে ৮৬৫ হিজরি (১৪৫৮ থেকে ১৪৬১ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত এই অভিযান চলতে থাকে এবং অবশেষে পুরো সার্বিয়া বিজিত হয়।

দক্ষিণ গ্রিসের মোরিয়া প্রদেশে বাইজেন্টাইন শাসক পরিবারের দুই ভাই থমাস এবং ডিমিট্রিয়াসের শাসন ছিল, যারা সাময়িকভাবে উসমানীয়দের করদ রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। তবে তারা নিজেদের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখতে পারেনি এবং গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়। এর ফলে আলবেনিয়া দক্ষিণ গ্রিসে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পায়। দক্ষিণ গ্রিসে আলবেনীয় হস্তক্ষেপের আশঙ্কায় সুলতান নিজেই মোরিয়া অভিমুখে অভিযান পরিচালনা করেন। আলবেনীয়রা পালিয়ে যায়। এভাবে ৮৬৩ হিজরি (১৪৫৮ খ্রিস্টাব্দ) সালে পূর্ব মোরিয়া উসমানীয় সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত হয়।

কিছুকাল পর থমাস এবং তার ভাই সুলতানের অন্যান্য রণাঙ্গনে ব্যস্ততার সুযোগ নিয়ে মোরিয়ার ওপর...

[১] তারিখ-ই-উসমানি: ২ / ৭৬ থেকে ৭৮; মুহাম্মদ আল-ফাতেহ, ডক্টর রশিদী, পৃষ্ঠা ২০৩ থেকে ২০৭।

পুনরায় দখল করতে চেয়েছিল কিন্তু সুলতান এই চেষ্টা ব্যর্থ করে দেন এবং ৮৬৫ হিজরি (১৪৬০ খ্রিষ্টাব্দ) সালে অভিযান চালিয়ে শুধু মোরিয়া নয় বরং ‘এথেস’ও জয় করে নেন। এভাবে ভেনিস এবং কয়েকটি শহর ছাড়া সমগ্র গ্রিস বিজিত হয়। ৮৬৯ হিজরি (১৪৬৩ খ্রিষ্টাব্দ) সালে এজিয়ান সাগরের দ্বীপপুঞ্জও জয় করা হয়। এরই মধ্যে ৮৬৭ হিজরি (১৪৬২ খ্রিষ্টাব্দ) সালে ওয়ালাচিয়া (আফলাক)-তেও তুর্কি পতাকা উড়তে শুরু করে।

সার্বিয়া বিজয়ের পর সুলতান মুহাম্মদ ফাতিহ ইউরোপীয় জোটের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান অব্যাহত রাখেন এবং বসনিয়ার শাসককে আনুগত্যের আহ্বান জানান, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। অবশেষে সুলতান ৮৬৮ হিজরি (১৪৬৩ খ্রিষ্টাব্দ) সালে সেখানে সেনাবাহিনী পাঠান। বসনিয়া তার মজবুত দুর্গগুলোর জন্য বিখ্যাত ছিল, কিন্তু উসমানীয়দের বিজয়ের সামনে সমস্ত দুর্গ বালির দেয়াল প্রমাণিত হলো। [১]

আলবেনিয়া বিজয়: সিকান্দার বেগের দমন:

এই সময়ে আলবেনিয়াতেও সামরিক অভিযান চালানো হয়েছিল। এখানকার আলবেনীয় বংশোদ্ভূত শাসক জর্জ কাস্ট্রিয়ট (প্রাক্তন সিকান্দার বেগ) সুলতান মুরাদ সানির আমলে ধর্মত্যাগী হয়ে বিদ্রোহ করেছিলেন। মুরাদ সানি এই ফিতনা দমন করতে পারেননি। সুলতান মুহাম্মদ ফাতিহ অন্যান্য রণাঙ্গনে সাফল্যের পর আলবেনিয়ায় জর্জ কাস্ট্রিয়টের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন। এখানকার আকাশচুম্বী পাহাড়গুলো জর্জ কাস্ট্রিয়টের জন্য অত্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়স্থল ছিল। এ ছাড়া তিনি নিজে অত্যন্ত সাহসী, অভিজ্ঞ এবং নিজ জনগণের মধ্যে জনপ্রিয় ছিলেন। অধিকন্তু, তার প্রশিক্ষণ উসমানীয় সামরিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হয়েছিল, তাই তিনি তুর্কিদের যুদ্ধকৌশল এবং দুর্বলতাগুলো খুব ভালোভাবেই জানতেন। এ কারণে জর্জ কাস্ট্রিয়টের মোকাবিলায় উসমানীয় বাহিনী বারবার পরাজয় বরণ করে। তবে দীর্ঘ রক্তক্ষয়ের পর ৮৬৬ হিজরি (১৪৬১ খ্রিষ্টাব্দ) সালে জর্জ কাস্ট্রিয়ট নিজেই আনুগত্য প্রকাশ করেন। সুলতান ইতিবাচক সাড়া দিয়ে সেনাবাহিনী ফিরিয়ে নেন। কিছুকাল পরেই জর্জ কাস্ট্রিয়ট আবার বিদ্রোহ করেন। এবার উসমানীয় বাহিনী বন্য়ার মতো আলবেনিয়ায় প্রবেশ করে এবং দীর্ঘ অভিযানের পর অবশেষে ৮৭২ হিজরি (১৪৬৭ খ্রিষ্টাব্দ) সালে পুরো আলবেনিয়া মুসলমানদের ছায়াতলে চলে আসে। জর্জ পালিয়ে ভেনিসে আশ্রয় নেন এবং কিছুদিন পর সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। [২]

উজুন হাসানের ষড়যন্ত্র: ভেনিসের বিজয়সমূহ:

ভেনিস প্রজাতন্ত্র (যাকে আরব ইতিহাসে আল-বুন্দুকিয়া বলা হয়) উসমানীয় সুলতানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র ছিল। ভেনিসবাসীরা পোপের সমর্থন লাভ করে ইউরোপীয় দেশগুলোকে উসমানীয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে উসকে দেয়। পুরো ইউরোপে সুলতানের বিরুদ্ধে একটি অভিযান শুরু হয় এবং উসমানীয় সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করার জন্য সেনাবাহিনী প্রস্তুত হতে থাকে।

এই দিনগুলোতে ভেনিসবাসীরা এশিয়াতেও একজন শক্তিশালী মিত্র পেয়ে যায়। তিনি ছিলেন তৈমুর লঙের উত্তরসূরি ইরানের শাসক উজুন হাসান, যার স্ত্রী ছিলেন ডেসপিনা ক্যাথরিনা নামক একজন খ্রিস্টান। উজুন হাসান ইরানের শাহ হাসান আলী এবং খোরাসানের শাহ আবু সাঈদ তৈমুরিকে পৃথক পৃথক রণাঙ্গনে পরাজিত করে পারস্য, খুজিস্তান, কুর্দিস্তান এবং উত্তর ইরানের বিশাল এলাকা পদানত করেছিলেন এবং তার সীমানা উসমানীয় সাম্রাজ্যের সাথে গিয়ে মিশেছিল, যাকে তিনি সর্বদা ঘৃণার চোখে দেখতেন।

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া: ১/ ১৩৮ থেকে ১৫০

[২] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া: ১/ ১৫১ থেকে ১৫৫

যদিও উজুন হাসান সুন্নি ছিলেন, কিন্তু শিয়াদের সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। তিনি সফভী সিলসিলার পীর শেখ জুনাইদকে, যিনি শিয়া ইতনা আশারি ছিলেন, কেবল নিজের সাথে মিলিয়ে নেননি বরং নিজের বোনকেও তাঁর সাথে বিবাহ দিয়েছিলেন যাতে তাঁর মুরিদরা রাজনৈতিকভাবে তাঁর সমর্থক হয়ে যায়। পরবর্তীতে এই সিদ্ধান্ত আহলে সুন্নাহের জন্য অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক প্রমাণিত হয়।

ভেনিসের অধিবাসীরা উজুন হাসানের কাছে কিছু বড় কামান এবং প্রচুর পরিমাণে বারুদ পাঠায় এবং তাঁর স্ত্রীর এক খ্রিস্টান আত্মীয়কে ইরানে পাঠিয়ে তাঁর সাথে কথা বলে তাঁকে নিজের মিত্র বানিয়ে নেয়। ঠিক হয় যে, একদিক থেকে উজুন হাসান এশিয়া মাইনরকে উসমানীয়দের দখল থেকে ছিনিয়ে নেবেন এবং অন্যদিকে ইউরোপীয় দেশগুলো আক্রমণ করে তুর্কিদের ইউরোপ থেকে বের করে দেবে। উসমানীয়রা সময়মতো এই ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারে যার ফলে ৮৭৮ হিজরিতে (এপ্রিল ১৪৭৩ খ্রিষ্টাব্দে) ইউরোপীয় রণাঙ্গনে ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হয়। সৌভাগ্যবশত ইউরোপীয়দের উৎসাহ-উদ্দীপনা খুব দ্রুত স্তিমিত হয়ে যায় কারণ সেই দিনগুলোতে পোপ, যাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় এই অভিযান শুরু হয়েছিল, মারা যান এবং নতুন পোপ যুদ্ধের বিরোধিতা করেন।

ভেনিসের অধিবাসীরা এই ষড়যন্ত্রের মূল হোতা হওয়ার কারণে যে কোনো মূল্যে শান্তির যোগ্য ছিল, তাই সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ সুযোগ পেয়েই ভেনিসের ওপর সৈন্য পরিচালনা করেন এবং ৮৭৫ হিজরিতে (১৪৭০ খ্রিষ্টাব্দে) এর গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপ ‘ইউবোয়া’ জয় করেন। এরপর উসমানীয় বাহিনী গ্রিসের শহরগুলো: ‘থেসালি’ এবং ‘অ্যাটিকা’ও দখল করে নেয়। ভেনিসের উপকূলের পর উসমানীয় বাহিনী পূর্ব ইতালিতে অগ্রসর হতে থাকে। উসমানীয় বাহিনীর একটি অংশ দানিউব নদীর সাথে সাথে আক্রমণ করতে করতে হাঙ্গেরিতে প্রবেশ করে এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে ইসলামী পতাকা উড়িয়ে অস্ট্রিয়া পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

এই যুদ্ধগুলো প্রায় নয় বছর ধরে চলতে থাকে। ৮৮২ হিজরিতে সুলতানের সেনাপতি ওমর পাশা ভেনিসের রাজধানী পর্যন্ত পৌঁছে যান। দীর্ঘ সংঘর্ষের পর ক্লান্ত হয়ে ভেনিসের অধিবাসীরা উসমানীয়দের কাছে সন্ধির প্রস্তাব দেয়। শাওয়াল ৮৮২ হিজরিতে (১৪৭৯ খ্রিষ্টাব্দে) কঠোর শর্তে সন্ধি গৃহীত হয় যার ফলে ভেনিসের অধিবাসীরা যুদ্ধের বিশাল ক্ষতিপূরণ এবং বার্ষিক জিজিয়া প্রদানে সম্মত হয়। এই প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয় যে, প্রয়োজনের সময় ভেনিস একশ জাহাজের বহর নিয়ে উসমানীয় সালতানাতকে সাহায্য করবে। সন্ধিনামা অনুযায়ী ভেনিসের অধিবাসীদের নেগ্রোপন্ট, আর্গোস এবং আলবেনিয়ার সেই এলাকাগুলো খালি করে দিতে হয় যেগুলোর ওপর তারা দীর্ঘকাল ধরে দখলদার ছিল। এভাবে বলকানের কিছু উপকূলীয় অংশই তাদের কাছে থেকে যায়। [১]

জাজিরা রোডস আক্রমণ:

৮৮৫ হিজরিতে সুলতানের একটি বাহিনী ভূমধ্যসাগরের বিখ্যাত দ্বীপ রোডসের দিকে যাত্রা করে যেখানে জলদস্যু খ্রিস্টানদের স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই লোকেরা সমুদ্রে ডাকাতি করত এবং মুসলমানদের উপকূলীয় জনপদগুলোতে আক্রমণ করত। সুলতান তাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য এখানে দুবার সৈন্য পরিচালনা করেন কিন্তু প্রতিটি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। কিছুকাল পর সুলতান আরেকটি বাহিনী পাঠান। এবার সেনাপতি দ্বীপের ছোট ছোট শহরগুলো জয় করতে করতে রাজধানীর কাছে পৌঁছে যান।

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া: ১/১৬৬ থেকে ১৬৮; তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়া, পৃষ্ঠা ১৭১ থেকে ১৭৩।

অবশেষে এই শহরটিও জয় করা হলো, শুধু দুর্গটি বাকি ছিল যে সৈন্যবাহিনী এবং সেনাপতির মধ্যে পারস্পরিক আস্থার অভাব একটি জেতা বাজি উল্টে দিল। সেনাপতি শহরে প্রবেশের সময় জোর দিয়েছিলেন যে কোনো সৈন্য যেন শহরে লুটতরাজ না করে, কিন্তু সেনাবাহিনী জেদ ধরল যে লুটতরাজের অনুমতি দিতে হবে। সেনাপতি নিজের সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। এটি দেখে সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহের লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করল। এই বিশৃঙ্খল অবস্থায় সেনাপতিকে ফিরে আসার পথ বেছে নিতে হলো এবং এই দ্বীপটি জয় করার পরেও হাতছাড়া হয়ে গেল। [১]

পূর্বাঞ্চলীয় অভিযানসমূহ

ত্রাবজোন বিজয়:

আর্মেনিয়া এবং আনাতোলিয়ার মাঝে কৃষ্ণ সাগরের তীরে অবস্থিত স্বাধীন বাইজেন্টাইন রাষ্ট্র ত্রাবজোন যা ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা তখনও পর্যন্ত পুরোপুরি উসমানীয়দের বিজয়ের আওতার বাইরে ছিল। সুলতান মুরাদ সানি স্থল ও জলপথ থেকে এর ওপর একটি আক্রমণ করেছিলেন কিন্তু সামুদ্রিক ঝড়ের কারণে এই আক্রমণ সফল হতে পারেনি। সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ-এর আমলে আর্মেনিয়ার উসমানীয় গভর্নর খিজির বেগ এখানে আরও একটি আক্রমণ করেন যার পর ত্রাবজোনের রাজা চতুর্থ ইউয়ানিস উসমানীয় সাম্রাজ্যকে কর (খরাজ) দিতে সম্মত হন। সেই সাথে তিনি ইরান ও আর্মেনিয়ার শাসক উজুন হাসানের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করেন এবং নিজের মেয়ে ক্যাথোলিনাকে তার সাথে বিবাহ দেন। এই সম্পর্ক পরবর্তীতে উসমানীয়দের জন্য বেশ ভারী প্রমাণিত হয়েছিল কারণ উজুন হাসান এরপর ত্রাবজোনের রাজনীতিতে আধিপত্য বিস্তার করে উসমানীয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে মুখোমুখি অবস্থানে চলে যান।

১৪৫৮ খ্রিস্টাব্দে চতুর্থ ইউয়ানিসের মৃত্যুতে তার ভাই ডেভিড কমেনেনাস সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময়ে উজুন হাসান তার সাথে সম্পর্ক অনেক বাড়িয়ে নেন এবং তাকে প্ররোচিত করেন যেন সে উসমানীয় সাম্রাজ্যকে কর প্রদান না করে বরং আগে থেকে পরিশোধিত কর ফেরত দেওয়ার জন্য জেদ ধরে। ডেভিড কমেনেনাস এই প্ররোচনায় পা দেন এবং ১৪৬০ খ্রিস্টাব্দে তিনি একটি প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ-এর কাছে এই বোকামিপূর্ণ দাবি করে বসেন। সুলতান প্রতিনিধি দলকে উত্তর দিলেন: “আপনারা যান। আমি নিজের ঋণ পরিশোধ করতে নিজেই আসব।”

এই হুমকির পর ত্রাবজোন রাষ্ট্র এবং উসমানীয় সাম্রাজ্যের মধ্যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। উজুন হাসান এতে আরও ইন্ধন যোগান এবং ডেভিড কমেনেনাস তার পরামর্শে পোপ ও অন্যান্য ইউরোপীয় সরকারগুলোর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন।

এই খবরগুলো সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ-এর কাছে পৌঁছালে তিনি ফিতনার এই কেন্দ্রটি নির্মূল করার সংকল্প করেন। তার আদেশে সিনোপের ওয়ালি ইয়াকুব বেগ একশটি যুদ্ধজাহাজ নিয়ে সমুদ্রপথে অগ্রসর হতে শুরু করেন। এদিকে সুলতান নিজে আনাতোলিয়া পৌঁছে সিভাসের মহাসড়ক দিয়ে ত্রাবজোনের দিকে অগ্রসর হন। পথে উজুন হাসানের সেনাপতি খুরশিদ বেগ নিজের সেনাবাহিনী নিয়ে বাধা হয়ে দাঁড়ান কিন্তু সুলতানের বিগলার বেগ আহমদ পাশা তাকে তাড়িয়ে দেন।

সুলতান ইয়াসি চমেন পৌঁছেছিলেন এমন সময় একজন কুর্দি আমির শেখ হুসাইন নিজের সাথে উজুন হাসানের মা সারা খাতুনকে নিয়ে হাজির...

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়াহ: ১/ ১৭৩, ১৭৪।

সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ সেই বৃদ্ধার সাথে অত্যন্ত সম্মানের সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাকে “মা” বলে ডাকতে থাকলেন। এই বৃদ্ধা বেশ কয়েক দিন সুলতানের মেহমান হয়ে থাকলেন। এই সময়ে তিনি মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে সুলতানকে যুদ্ধাভিযান থেকে বিরত রাখার অনেক চেষ্টা করলেন কিন্তু সুলতান, যিনি এই ধরনের কৌশল সম্পর্কে অবগত ছিলেন, তার ওপর কোনো প্রভাব পড়ল না।

সুলতানের সবচেয়ে বড় আশঙ্কা ছিল পাছে ডেভিড কমেন পালিয়ে যেতে সফল না হয়; পালানোর সম্ভাব্য পথ ছিল সেই দুর্গম পাহাড়ি এলাকা যা সিভাস এবং ট্রাবজোনের মধ্যবর্তী ছিল। সুলতান মাহমুদ পাশাকে পরিচিত মহাসড়কে পাঠিয়ে নিজে এই পাহাড়ি এলাকায় অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। এই পথটি এতটাই কঠিন ছিল যে অশ্বারোহীরা তা ব্যবহার করতে পারছিল না। সুলতান নিজে সৈন্যদের সাথে পায়ে হেঁটে কঠিন চূড়া এবং টিলা অতিক্রম করতে থাকলেন এমনকি ট্রাবজোন সামনে দৃশ্যমান হতে লাগল। ডেভিড কমেন যখন দেখলেন যে তিনি একই সময়ে তিন দিক থেকে উসমানীয় বাহিনীর ঘেরাওয়ার মধ্যে রয়েছেন, তখন তিনি লজ্জিত হয়ে সুলতানের দরবারে উপস্থিত হলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। সুলতান তার সাথে সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে আচরণ করলেন। ২১ মহরম ৮৬৬ হিজরিতে “দরিয়ায়ে আক্সো মাকারাসো”-এর তীরে ডেভিড সুলতানের কাছে রাষ্ট্র হস্তান্তরের চুক্তি লিখে দিলেন। [১]

উজুন হাসানের পরাজয়:

ওদিকে এশিয়ায় উসমানীয় সালতানাতের পূর্ব সীমান্তে উজুন হাসান আক্রমণ করছিলেন, তিনি কারামানিয়া রাষ্ট্রও দখল করে নিয়েছিলেন। তবে সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ এই ফ্রন্টে তার দ্বিতীয় পুত্র বায়েজিদ সানিকে নিযুক্ত করেছিলেন এবং তার নেতৃত্বে উসমানীয় বাহিনী সেখানেও পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে লড়াই করছিল।

রবিউল আউয়াল ৮৭৮ হিজরি (আগস্ট ১৪৭৩ খ্রিস্টাব্দ) এর যুদ্ধে উজুন হাসানের বাহিনী উসমানীয়দের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। তার পুত্র জয়নুল আবেদিন এবং তার খ্রিস্টান প্রধান সেনাপতি নিহত হন। চার বছর পর ৮৮২ হিজরিতে উজুন হাসান ইন্তেকাল করেন। তার বংশধরদের শাসন আরও আঠারো বছর চলতে পেরেছিল এবং ১৫০১ খ্রিস্টাব্দে সাফাভিরা এর ওপর দখলদারিত্ব কায়েম করে। [২]

কৃষ্ণ সাগর এবং ক্রিমিয়ার অভিযানসমূহ:

এই সময়ে পূর্ব ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত গুরুত্বপূর্ণ মঙ্গোল রাষ্ট্র “গোল্ডেন হোর্ড” (জেররিন খিল) পতনের শিকার হয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল, এর পরাজয় ও পতনের ফলে যেসব রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল, তাদের মধ্যে ক্রিমিয়া রাষ্ট্রটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল যা উত্তর ককেশাস এবং রাশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এর উপকূলে অনেকগুলো দুর্গ ছিল যেখানে জেনোয়ার অধিবাসীরা উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। ক্রিমিয়ার মুসলিম মঙ্গোল শাসক যিনি খান-ই-ক্রিমিয়া নামে পরিচিত ছিলেন, জেনোয়ার আধিপত্যের কারণে খুব অতিষ্ঠ ছিলেন। জেনোয়ার অধিবাসীরা এর বন্দরগুলোর ওপর আধিপত্যের মাধ্যমে কৃষ্ণ সাগরের সমস্ত বাণিজ্য নিজেদের হাতে নিয়ে রেখেছিল এবং আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক আদায় করে তারা বিপুল মুনাফা অর্জন করছিল। এমন পরিস্থিতিতে খান-ই-ক্রিমিয়া সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহকে লিখলেন যেন তিনি জেনোয়ার অধিবাসীদের বের করে দিয়ে ক্রিমিয়া রাষ্ট্রকে...

[১] তারিখ-ই-উসমানি: ২/৫১ থেকে ৫৬

[২] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া: ১/১৫৫ থেকে ১৫৭, ১৬০ থেকে ১৬৫

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

নিজের তত্ত্বাবধানে নিয়ে নিলেন। সুলতান নিজেও কৃষ্ণসাগরে ইউরোপীয়দের আধিপত্য সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর নীতি ছিল এই যে, সালতানাতকে কৃষ্ণসাগরের চারপাশে বিস্তৃত করে পুরো সাগরকে ইসলামী শাসনের অধীনে নিয়ে আসা।

সুলতান তাঁর শাসনের শুরুতেই এই নীতি কার্যকর করতে শুরু করেন। ৮৫৬ হিজরি (১৪৫১ খ্রিস্টাব্দ) সালে তিনি তাঁর আমীরুল বাহর সুলাইমান বেগকে ৫টি যুদ্ধজাহাজ দিয়ে কৃষ্ণসাগরে পাঠান। তিনি দক্ষিণ উপকূলের বাতুমি (Batumi) জয় করে জর্জিয়ার জেলাসমূহ ‘আজার’ এবং ‘সুখুম’ ছাড়াও ‘আভখাজ’ রাজ্যের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেন। এভাবে জর্জিয়ার পুরো উপকূল উসমানীয় সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের কিছুকাল পর গোল্ডেন হর্নের সাথে সংযুক্ত সালতানাতের এলাকা ‘গালাতা’ (Galate) দখল করে জেনোয়াদের বিতাড়িত করেন। এরপর তিনি বিদেশি শক্তির জন্য বসফরাস এবং দার্দানেলেস প্রণালী বন্ধ করে দেন। ইউরোপ এবং ক্রিমিয়ায় বসবাসরত জেনোয়ারা তাদের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ও যাতায়াতের জন্য উসমানীয় সালতানাতকে কর দিতে বাধ্য হয়। শাবান ৮৫৯ হিজরি (জুলাই ১৪৫২ খ্রিস্টাব্দ) সালে সুলতান কৃষ্ণসাগরে একটি নৌবহর পাঠান, যা ক্রিমিয়ার ওপর আধিপত্য বিস্তার করে এবং সেখানে জেনোয়াদের সবচেয়ে বড় বন্দর ‘থিওডোসিয়া’ (Theodosia)-কে কর প্রদানে বাধ্য করে। প্রাচীনকালে এই বন্দরকে ‘কাফা’ বা ‘কেফে’ বলা হতো।

৮৭৮ হিজরিতে সুলতান তাঁর প্রধান উজির মাহমুদ পাশাকে সেনাপতি নিযুক্ত করে এই নৌ-অভিযানে পাঠান। মহররম ৮৮০ হিজরি (মে ১৪৭৫ খ্রিস্টাব্দ) সালে উসমানীয় আমীরুল বাহর আহমদ পাশা ১৮৩টি যুদ্ধজাহাজ এবং ২৯০টি বাণিজ্যিক জাহাজের বহর নিয়ে কৃষ্ণসাগরে বের হন। এই সাগরে এর আগে এত বড় নৌবহর কখনো দেখা যায়নি। এই বহর ক্রিমিয়ার উপকূলে অবস্থিত জেনোয়াদের বন্দরগুলোতে আক্রমণ শুরু করে। কাফার যুদ্ধের পর জেনোয়ারা পরাজিত হয় এবং তাদের চল্লিশ হাজার সৈন্য বন্দি হয়। এখান থেকে বিপুল পরিমাণ গনিমতের মাল ছাড়াও প্রচুর উচ্চমানের যুদ্ধজাহাজ হস্তগত হয়। কেফে (Theodosia) দখল করে নেওয়া হয়। কনস্টান্টিনোপলের পর এটি এশিয়া ও ইউরোপের সংযোগস্থলে অবস্থিত সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হতো। এখানে একটি শিল্প ও বাণিজ্যিক শহরের ভিত্তি স্থাপন করা হয়, যার জনসংখ্যা খুব দ্রুত সাত লাখে পৌঁছে যায়। ক্রিমিয়ার খান, যিনি চেঙ্গিস খানের পুত্র জোচির বংশধর ছিলেন, স্বেচ্ছায় উসমানীয় রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে নেন। এই চুক্তি হয় যে, উসমানীয় সালতানাত ক্রিমিয়ার যেকোনো শাসক নিযুক্ত করতে পারবে, তবে শর্ত হলো তাকে চেঙ্গিস খানের বংশধর হতে হবে। এই চুক্তি পরবর্তী তিন শতাব্দী পর্যন্ত বহাল থাকে এবং ক্রিমিয়ায় উসমানীয়দের করদ রাজ্য হিসেবে মুসলিম তাতারদের শাসন কায়েম থাকে।

তাতার শাসকদের পূর্বপুরুষ হাজি গিরাই ছিলেন গিয়াসউদ্দিন বিন তাশ তিমুরের পুত্র। তাঁর এক পুত্র মেঙ্গলি ‘গিরাই’ উপাধি গ্রহণ করেন, যার পর থেকে এই পরিবারের প্রতিটি শাসক গিরাই নামে পরিচিত হতে থাকেন। হাজি গিরাই, নূর দৌলত গিরাই এবং মেঙ্গলি গিরাই নিজেদের ‘সুলতান’ বলতেন, কিন্তু ৮৮০ হিজরি (১৪৭৫ খ্রিস্টাব্দ) সালে তুর্কিদের অধীনে আসার পর তাঁদের ‘সুলতান’ উপাধি ত্যাগ করতে হয় এবং তাঁরা কেবল ‘খান’ নামে পরিচিত হতে থাকেন। সংক্ষেপে, পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত...

ঈসায়ী পর্যন্ত ত্রিমিয়া উপদ্বীপ এবং ইউক্রেনের বড় অংশে এই পরিবার কোনো না কোনোভাবে শাসন করতে থাকে।

আহমদ পাশা কৃষ্ণসাগরের দক্ষিণ উপকূলে অবশিষ্ট ছোট ছোট বাইজেন্টাইন রাজ্যগুলোও জয় করে নেন। এরপর এই নৌবহর কার্চ প্রণালী হয়ে আজভ সাগরে প্রবেশ করে এবং এখানে দন নদীর মোহনায় অবস্থিত সামুদ্রিক বন্দরটি দখল করে নেয়। আজভে একটি মজবুত দুর্গ নির্মাণ করে একে সুরক্ষিত করা হয়। এই বিজয়গুলো ৮৮০ হিজরি (১৪৭৫ ঈসায়ী) সালে অর্জিত হয়। এটি সেই বছর ছিল যখন রাশিয়ায় ‘জার’ বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে রাশিয়ার জাররা উসমানীয় সুলতানদের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে প্রমাণিত হয়। বিংশ শতাব্দীর কমিউনিস্ট বিপ্লব পর্যন্ত তাদের রাজত্ব টিকে ছিল। [১]

ইতালি আক্রমণ

কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের পর সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ খ্রিস্টধর্মের দ্বিতীয় কেন্দ্র ইতালির রাজধানী রোম দখলের মাধ্যমে তাঁর প্রপিতামহ বায়েজিদ ইলদিরিমের সংকল্প পূরণ করতে চেয়েছিলেন। বায়েজিদ বলেছিলেন যে, তিনি রোমের সেন্ট পিটার্সের বেদীতে তাঁর ঘোড়াকে দানা খাওয়াবেন। সুলতানের জন্য ইতালি দখল করা খুব একটা কঠিন ছিল না, কারণ সেই সময় ইতালির কিছু রাজ্য উসমানীয় সালতানাতে শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল এবং কিছু রাজ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে উসমানীয় মুদ্রা প্রচলিত ছিল। ইতালির দক্ষিণ অর্ধাংশে পোপের শাসন ছিল, কিন্তু তাদেরও উসমানীয়দের মোকাবিলা করার শক্তি ছিল না।

সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ ৮৮৫ হিজরির জমাদিউল আউয়াল (জুলাই ১৪৮০ ঈসায়ী) মাসে ইতালির উদ্দেশ্যে একটি নৌবাহিনী প্রেরণ করেন, যার নেতৃত্বে ছিলেন আহমদ পাশা। এই অভিযানের আগে তাঁকে উজির-এ-আজমের পরিবর্তে প্রধান সেনাপতির (সিপাহসালার-এ-আলা) পদ দেওয়া হয় এবং প্রধান উজিরের (সদারত-এ-উজমা) দায়িত্ব মুহাম্মদ পাশাকে দেওয়া হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল আহমদ পাশা যেন এই দীর্ঘ অভিযানের জন্য নিশ্চিত হতে পারেন এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে রাজনৈতিক বিষয়গুলো সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হয়। আহমদ পাশার নৌবহরে ২০টি বড় এবং ৫২টি ছোট যুদ্ধজাহাজ ছিল। এ ছাড়া আরও ৩০টি জাহাজ ছিল রসদ ও সৈন্য পরিবহনের জন্য। প্রথম আক্রমণ ইতালির উপকূলীয় শহর ‘ওটরান্টো’-তে করা হয়। এখানে চৌদ্দ দিনের যুদ্ধে শত্রুপক্ষের ২২ হাজার সৈন্যের মধ্যে ১২ হাজার নিহত হয়। অবশেষে ১১ আগস্ট ১৪৮০ ঈসায়ী তারিখে শহরবাসী আত্মসমর্পণ করে। এখানে সাড়ে ছয় হাজার তুর্কি সৈন্য মোতায়েন করে নৌবহর আরও সামনে এগিয়ে যায়। ‘ওটরান্টো’ ইতালির প্রবেশদ্বার এবং ‘বাবুল ফাতহ’ (বিজয়ের দ্বার) নামে পরিচিত ছিল। এরপর ইতালিতে এমন কোনো শহর ছিল না যা দীর্ঘ সময় প্রতিরোধ করতে পারত। পোপ সিক্সটাস চতুর্থ রোম থেকে পালিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, যখন সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ এই বিজয়ের সংবাদ শুনে বসফরাসে উসমানীয় পতাকা উত্তোলন করেন, যা এই সংকেত দিচ্ছিল যে সুলতান নিজেই তাঁর বিশেষ বাহিনী নিয়ে রণাঙ্গনে রওনা হতে চলেছেন। [২]

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া: ১ / ১৬৮ থেকে ১৭২।

১৭৭১ ঈসায়ী সালে রুশরা ত্রিমিয়া জয় করে এবং ১৭৮৩ ঈসায়ী সালে একে আনুষ্ঠানিকভাবে রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। এভাবে শুধু গেরাই বংশের চারশ বছরের শাসনের অবসান ঘটেনি, বরং এখানে মুসলমানদের ক্ষমতার সূর্যও অস্তমিত হয়।

[২] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া: ১ / ১৭৩ থেকে ১৭৬।

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

সুলতান মুহাম্মদ খান ফাতেহ-এর মৃত্যু:

কিন্তু রোম বিজয়ের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হওয়ার আগেই সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ হঠাৎ তীব্র আমাশয়ে আক্রান্ত হন এবং দেখতে দেখতে ৪ রবিউল আউয়াল ৮৮৬ হিজরি (৩ মে ১৪৮১ খ্রিস্টাব্দ) ইন্তেকাল করেন।

পরবর্তীতে তদন্তে জানা যায় যে, এটি সুলতানের চিকিৎসক “লাকোবো”-র কারসাজি ছিল। ভেনিসের এই চিকিৎসক বাহ্যিকভাবে কালিমা পড়ে মুসলমান হয়েছিলেন। তিনি ইয়াকুব পাশা নামে পরিচিত ছিলেন এবং সুলতানের পূর্ণ আস্থা অর্জন করেছিলেন। তিনি সুলতানের ওষুধে এমন বিষ মিশিয়ে দিয়েছিলেন যা ধীরে ধীরে কাজ করত।

এই চিকিৎসকই সুলতানের মৃত্যুর তাৎক্ষণিক খবর এই শব্দে ইউরোপে পাঠিয়েছিলেন: “বড় শকুন মারা গেছে।” ষোল দিনে এই সংবাদ ভেনিসে পৌঁছায়। ইউরোপে এটি উদযাপন করা হয়। পোপের নির্দেশে তিন দিন পর্যন্ত শুকরানা ইবাদত পালন করা হয়। [১]

সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ-এর বিজয়ের একটি পর্যালোচনা:

সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ-এর বয়স ছিল ৫২ বছর। তিনি ৩১ বছর শাসন করেন। তাঁর পুরো শাসনকাল যুদ্ধবিগ্রহের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে যাতে প্রায় আট লক্ষ সৈন্য শহীদ হন, তবে যে বিজয়গুলো অর্জিত হয়েছে তা প্রমাণ করে যে শহীদদের রক্ত বৃথা যায়নি। এই সময়ে বারোটি রাষ্ট্র এবং দুই শতাধিক শহর বিজিত হয়।

সুলতানের ক্ষমতার শুরুতে কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের সময় উসমানীয় সাম্রাজ্যের আয়তন ছিল ৯ লক্ষ ৬৪ হাজার বর্গকিলোমিটার। এশিয়ায় ৪ লক্ষ ৮০ হাজার এবং ইউরোপে ৪ লক্ষ ৮৪ হাজার বর্গকিলোমিটার। ২৮ বছর পর যখন সুলতানের মৃত্যু হয়, তখন এই আয়তন বেড়ে ২২ লক্ষ ১৪ হাজার বর্গকিলোমিটার হয়েছিল। ১৫ লক্ষ ১১ হাজার বর্গকিলোমিটার এশিয়ায় এবং ৭ লক্ষ ৩ হাজার বর্গকিলোমিটার ইউরোপে। এর মাধ্যমে সুলতানের বিজয়ের ব্যাপকতা অনুমান করা যায়। [২]

জ্ঞানানুরাগ এবং জনকল্যাণমূলক কাজ:

সুলতান যুদ্ধাভিযানে এত ব্যস্ততা সত্ত্বেও আশ্চর্যজনকভাবে নির্মাণ ও জনকল্যাণমূলক কাজে তাঁর পূর্বপুরুষদের চেয়ে কম ছিলেন না। তিনি সমস্ত শহর ও গ্রামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন যেখানে সেই সমস্ত দ্বীনি ও আধুনিক বিষয় পড়ানো হতো যা দুনিয়াতে প্রয়োজন হয়। এগুলোর পাঠ্যক্রমও সুলতান নির্ধারণ করেছিলেন এবং এগুলোর জন্য কোষাগার থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ ছিল। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়মিত পরীক্ষা হতো। সফল ছাত্রদের মাঝে সনদ বিতরণ করা হতো। এই সনদের ভিত্তিতেই যোগ্যতা অনুযায়ী সরকারি চাকরি পাওয়া যেত। [৩]

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া: ১/ ১৭৭-১৭৯; তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়া, পৃ. ১৭৬

[২] আতলাস ফুতুহাত-ই-ইসলামিয়া: ৩/ ৩৬২

[৩] নুযহাতুল আনযার: ২/ ১৮, ১৯

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

চতুর্থ খণ্ড

সুলতানের জ্ঞানানুরাগের অবস্থা এমন ছিল যে, তিনি যখনই কোনো প্রাজ্ঞ আলেমের কথা জানতে পারতেন, চেষ্টা করে তাকে নিজের কাছে আমন্ত্রণ জানাতেন এবং সম্ভাব্য সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতেন। অসাধারণ মর্যাদার অধিকারী আলেমদের থেকে তিনি নিজে উপকৃত হতেন এবং ছাত্র হয়ে তাদের কাছে কিতাব পড়তেন। অন্যান্য শহর ও দেশের আলেমরা জ্ঞানের এই কদরদানির কথা শুনে দলে দলে ইস্তাম্বুলের দিকে যাত্রা করতেন। এভাবে এই শহর জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা আবাদ হতে থাকে।

এ বিষয়ে মাওলানা খাজা জাদার ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য। তিনি বুরসার একজন দরিদ্র আলেম ছিলেন। মাদ্রাসা আল-আসাদিয়াহ-তে সরফ ও নাহ পড়াতেন। সুলতানের জ্ঞানানুরাগের কথা শুনে তিনি ইস্তাম্বুল যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু সফরের জন্য অর্থ ছিল না। অবশেষে ঋণ করে একটি ঘোড়া কিনলেন এবং ইস্তাম্বুলের দিকে রওনা হলেন। পথে দেখলেন যে সুলতান সসৈন্যে ইস্তাম্বুল যাচ্ছেন। উজির মাহমুদ পাশা তার আগমনের কথা জানতে পেরে তাকে সুলতানের তাঁবু পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন। সেখানে কোনো সরফ বা নাহ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা চলছিল। মাওলানা খাজা জাদাও নিজের মতামত পেশ করলেন। ‘যিরক’ নামক এক দরবারী এর ওপর আপত্তি করলে তিনি তাকে এমন জোরালো জবাব দিলেন যে সুলতান বলতে বাধ্য হলেন: “যিরক! তোমার কথার কোনো গুরুত্ব নেই।”

মজলিস শেষ হলে সব আলেম নিজ নিজ তাঁবুতে চলে গেলেন এবং সরকারি খাদেমরা তাদের আপ্যায়নে লেগে গেলেন। মাওলানা খাজা জাদাকে কেউ চিনত না। তিনি সেই গাছের নিচেই শুয়ে পড়লেন যার সাথে তার ঘোড়াটি বাঁধা ছিল। তার আফসোস হচ্ছিল যে তাকে কেউ জিজ্ঞেস করার নেই। রাতের কোনো এক প্রহরে তিনজন খাদেম সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করছিলেন: “মাওলানা খাজা জাদার তাঁবু কোথায়?”

পরিচিত কেউ একজন বলল: “ঐ যে গাছের নিচে শুয়ে থাকা লোকটিই খাজা জাদা।”

খাদেমদের বিশ্বাস হলো না। তাদের ধারণা ছিল যে তিনিও অন্যান্য মেহমান আলেমদের মতো কোনো তাঁবুতে অবস্থান করছেন। তারা মাওলানার কাছে এলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন: “আপনিই কি খাজা জাদা?”

তিনি ইতিবাচক উত্তর দিলেন, তবুও খাদেমদের সন্দেহ দূর হলো না, তারা বলল: “আপনি কি সত্যিই সত্যি বলছেন?”

উত্তর দিলেন: “হ্যাঁ, অবশ্যই।” খাদেমরা বলল: “আপনি কি মাদ্রাসা আল-আসাদিয়াহ-র উস্তাদ?” বললেন: “জি হ্যাঁ।”

খাদেমরা বলল: “আপনিই কি যিরককে লাজওয়াব করেছিলেন?” বললেন: “এমনই হয়েছিল।”

খাদেমরা এগিয়ে এসে তার দস্তবুসি করল এবং বলল: “সুলতান আপনাকে নিজের উস্তাদ নিযুক্ত করেছেন।”

মাওলানা ভাবলেন তার সাথে ঠাট্টা করা হচ্ছে, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই যখন খাদেমরা তার জন্য তাঁবু খাটিয়ে গালিচা, বিছানা, পানাহারের সরঞ্জাম এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করল, তখন তার কিছুটা বিশ্বাস হলো।

সুলতান সত্যিই তাকে নিজের উস্তাদ বানিয়ে নিলেন এবং তার কাছে ‘ইলমুস সরফ’-এ ‘মাতন ইযযুদ্দিন তুর্কমানি’ পড়তে লাগলেন। পরবর্তীতে তাকে আদরিয়ানোপল-এর কাজী নিযুক্ত করা হয়। খাজা জাদার বৃদ্ধ পিতা যখন ছেলের এই মান-মর্যাদার কথা জানতে পারলেন, তখন তার বিশ্বাস হচ্ছিল না। অবশেষে তিনি নিজেই আদরিয়ানোপলের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। খাজা জাদা খবর পেয়ে অধীনস্থ কর্মকর্তা এবং আলেমদের এক বিশাল দল নিয়ে শহরের...

দরজায় তাঁদের স্বাগত জানাতে এলেন।

বাবা এই বিশাল জনসমাবেশ দেখে জিজ্ঞেস করলেন: “এই কে আসছে?”

বলা হলো: “আপনার সাহেবজাদা (পুত্র) আসছেন।”

বাবা অবাক হয়ে বললেন: “আমার ছেলে কি এই উচ্চমর্যাদায় পৌঁছে গেছে?”

কিছুক্ষণ পর বাবা ও ছেলের সাক্ষাৎ হলে ছেলে বাবার হাত চুম্বন করে বললেন:

“আব্বাজান! আপনি যদি আমাকে অর্থ উপার্জনে নিয়োজিত করতেন, তবে আমি কখনোই এই মর্যাদায় পৌঁছাতে পারতাম না।” [১]

এটিই ছিল ইলমের সেই কদরদানি, যা মুহাম্মদ ফাতেহ-এর যুগে উসমানীয় সাম্রাজ্যকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দিয়েছিল।

আইন প্রণয়ন:

উলামায়ে কেরামের সান্নিধ্য এবং অধ্যয়নের প্রতি নিরন্তর আগ্রহ সুলতানের মধ্যে এমন এক অসাধারণ প্রতিভা তৈরি করেছিল যে, তিনি প্রথমবারের মতো তাঁর বিশাল রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বিস্তারিত আইন প্রণয়ন করেন এবং এভাবে শতাব্দীকাল ধরে এই সাম্রাজ্যকে অত্যন্ত মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে দেন। এটি ছিল একটি বিস্তারিত ও সুশৃঙ্খল সংবিধান, যাকে ‘কানুন নামা’ বলা হতো।

কানুন নামা অনুযায়ী আইন প্রণয়নের মূল উৎস ছিল কুরআন মাজীদ, এরপর ছিল সহীহ হাদীসের স্থান। তারপর আইন্মায়ে আরবা-এর ফিকহ অনুসরণ করা হতো। এগুলোর পর সুলতানের আদেশের মর্যাদা ছিল। যদি সুলতানের আদেশ শরীয়তের পরিপন্থী হতো, তবে উলামায়ে কেরামের অধিকার ছিল যে, তা শরীয়ত বিরোধী প্রমাণ করে তা বাতিল করে দেওয়া। সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক, বিচারিক ও সামরিক আইন চূড়ান্ত করার আগে উলামা ও মুফতিয়ানে কেরামের সামনে সত্যায়নের জন্য পেশ করা হতো। [২]

সাম্রাজ্যের বিভাগসমূহ:

কানুন নামায় সাম্রাজ্যকে একটি তাঁবুর সাথে তুলনা করা হয়েছিল। এই তাঁবুর দরজাকে ‘বাব-ই আলী’ নাম দেওয়া হয়েছিল, যার অর্থ রাজকীয় প্রাসাদ। কানুন নামায় বলা হয়েছিল যে, সাম্রাজ্যের তাঁবু চারটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত:

- ১. উযরায়ে সুলতানাত (ক্যাবিনেট)
- ২. কাজী (বিচার বিভাগ)
- ৩. দপ্তরদার (অর্থ বিভাগ)
- ৪. নিশানচি (সরকারি নথিপত্র তৈরির বিভাগ)

উজির-এ-আযমকে ‘সদর-এ-আযম’ বলা হতো। সাম্রাজ্যের মোহর তাঁর কাছেই থাকত। সরকারের সমস্ত বিষয় ও সমস্যা সমাধানের পরিষদকে ‘দিওয়ান-ই-মুশাওয়ারাত’ বলা হতো। এই পরিষদের সভাপতি স্বয়ং সুলতান হতেন, তবে সুলতানের অনুপস্থিতি বা ব্যস্ততায়...

[১] নুসরাতু আহলিল ঈমান বি-দাওলাতি আলি উসমান, পৃ. ৭৬ থেকে ৭৯।

[২] আল-ইসলাম ওয়াদ-দুস্তুর, শায়খ তৌফিক বিন আব্দুল আজিজ আস-সুদাইরি, পৃ. ১৬০।

সেই সময় সদর-ই-আজম এর সভাপতিত্ব করতেন। সদর-ই-আজম-এর মন্ত্রিপরিষদ আহ্বান করার এবং আলাদা দরবার করার অধিকারও ছিল। সরকারি যন্ত্রের সমস্ত নির্ভরতা সদর-ই-আজম-এর যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতার ওপর ছিল।

বিচার বিভাগ স্বাধীন ছিল কিন্তু এর ব্যবস্থাপনা সদর-ই-আজম-এর দায়িত্বে ছিল। সালতানাতের সমস্ত কাজীদের নিয়োগ তিনিই করতেন। ইউরোপ ও এশিয়ার উসমানীয় আদালতগুলোর জন্য আলাদা আলাদা কাজী-উল-কুজ্জাত ছিলেন। কাজী আসকার বিভাগটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সেনাবাহিনীর সাথে সর্বদা একজন কাজী থাকতেন। এই কাজীদের নির্বাচন উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন উলামাদের মধ্য থেকে করা হতো। ফিকহ শাস্ত্রে পারদর্শী দুইশ উলামার একটি জামাতের কাজ ছিল কেবল ফাতাওয়া জারি করা। এই ব্যক্তিবর্গ মুফতি নামে পরিচিত ছিলেন এবং তাদের মর্যাদা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের চেয়েও বেশি ছিল।

দফতরদারের দায়িত্বে ছিল অর্থব্যবস্থার পুরো ব্যবস্থাপনা। সালতানাতকে প্রদেশ, কমিশনারি এবং জেলাগুলোতে বিভক্ত করা হয়েছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে ‘পাশা’ এবং জেলা তহসিলদারকে (কালেক্টর) ‘বেলার বে’ বলা হতো। কমিশনারকে ‘সানজাক বে’ বলা হতো। তুর্কি ভাষায় পতাকাকে সানজাক বলা হয়, যেহেতু প্রতিটি কমিশনারির পতাকা আলাদা ছিল তাই তাদের প্রধানদের ‘সানজাক বে’ বলা হতো। মুহাম্মদ ফাতিহ-এর যুগে কেবল ইউরোপীয় অধিকৃত অঞ্চলে ৩৬টি সানজাক ছিল।

সালতানাতের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো ‘দার আগা’ নামে পরিচিত ছিল। এগুলোর দুটি প্রকার ছিল: অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক। অভ্যন্তরীণ আগারা দরবারে উপস্থিত থাকতেন আর বাহ্যিক আগাদের প্রদেশগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ পদে পাঠানো হতো। [১]

সুলতান মুহাম্মদ খান ফাতিহ-এর যুগ..... উসমানীয়দের উত্থান:

মুহাম্মদ ফাতিহ একজন সৌভাগ্যবান শাসক ছিলেন যিনি পঞ্চদশ শতাব্দীতে উসমানীয় সালতানাতকে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী ও বিস্তৃত সরকারে পরিণত করেছিলেন যা এশিয়া মাইনর থেকে শুরু করে দানিউব নদী এবং ক্রিমিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি কনস্টান্টিনোপল জয় করে রাসূল ﷺ-এর ভবিষ্যদ্বাণী এবং মুসলমানদের আটশ বছরের প্রাচীন আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে দেখিয়েছেন এবং হাদীস মুবারাকায় বর্ণিত সুসংবাদের অধিকারী হয়েছেন। বুলগেরিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডের যুদ্ধ ছাড়া তিনি কোথাও পরাজিত হননি। একজন বিজয়ী হিসেবে তিনি তার পূর্বপুরুষদের ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। মুহাম্মদ পাশা এবং আহমদ কাইদুক পাশা ছিলেন তার সেরা সেনাপতি যারা তার বিজয়াভিযানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। আহমদ পাশা বিশেষভাবে প্রশংসার দাবিদার যিনি সেনাবাহিনীতে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। মুহাম্মদ ফাতিহ-এর বিজয়াভিযানে আহমদের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা এবং পরামর্শের বড় ভূমিকা ছিল।

সুলতানের ইন্তেকালের ফলে ইউরোপে মুসলমানদের বিজয়াভিযানের জোয়ার থেমে যায়। সুলতানের যুগ ছিল মুসলমানদের সেই রেনেসাঁ বা নবজাগরণের চরম শিখর যা ক্রুসেড এবং তাতারীদের ধ্বংসযজ্ঞের পর শুরু হয়েছিল। তার ইন্তেকালের মাধ্যমে এই যুগ সমাপ্তিতে পৌঁছায়। যদিও ইসলামি বিশ্বের মহান অট্টালিকা হঠাৎ করে পতনের শিকার হয়নি এবং এর পরেও কয়েক দশক পর্যন্ত বিজয়াভিযানের ধারা অব্যাহত ছিল, কিন্তু বাস্তবতা হলো সুলতানের বিদায়ের সাথে সাথেই একদিকে তার সন্তানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায় এবং অন্যদিকে মাত্র এগারো বছর পর আন্দালুসে মুসলমানদের শেষ রাষ্ট্র গ্রানাডার পতন ঘটে।

[১] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ, পৃ. ১৭৭

যদি সুলতান আরও কয়েক বছর সময় পেতেন এবং ‘রোম’ বিজয় হয়ে যেত, তবে এটা অসম্ভব ছিল না যে সুলতানের বাহিনী এরপর পশ্চিম ইউরোপ জয় করে আন্দালুস পর্যন্ত পৌঁছে যেত এবং সেখানকার মৃতপ্রায় ইসলামী সালতানাত পুনরায় জীবিত হয়ে উঠত। এমন পরিস্থিতিতে এটাও অসম্ভব ছিল না যে, দুই-তিন শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপ সম্পূর্ণ মুসলিম হয়ে যেত।

কিন্তু ইউরোপের অধিবাসীদের ইসলাম গ্রহণ তকদিরে লেখা ছিল না। আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিগত সিদ্ধান্তের প্রকৃত হিকমত নিজেই ভালো জানেন। তবে এ কথা স্পষ্ট যে, আল্লাহ দুনিয়াকে পরীক্ষার ক্ষেত্র বানিয়েছেন, তাই আমরা ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক উভয় দিক থেকে প্রতিটি যুগে পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হতে থাকব। যদি সারা দুনিয়া ঈমান নিয়ে আসত এবং সবাই মুমিন মুসলমান হয়ে যেত, তবে সম্ভবত এই দুনিয়ায় পরীক্ষা ও আজমাইশের সেই পরিবেশই শেষ হয়ে যেত যার জন্য আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে।

সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ... কঠোরতা এবং প্রতিকার:

সুলতান সম্পর্কে সাধারণত প্রসিদ্ধ যে, তিনি অত্যন্ত কঠোর ও নির্দয় ছিলেন। যদিও এই কথাটি অতিরঞ্জিত। তিনি প্রশাসনিক দিক থেকে অবশ্যই আপসহীন ছিলেন এবং এ ব্যাপারে কারো পরোয়া করতেন না, কিন্তু যদি তিনি নিজের ভুল বুঝতে পারতেন, তবে তার প্রতিকার করতে কোনো ভ্রুটি রাখতেন না। একটি ঘটনা থেকে তাঁর স্বভাবের আন্দাজ করা যেতে পারে।

শেখ শিহাবুদ্দিন কোরানী ছিলেন সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহের সেই মহান উস্তাদ, যাঁর বদৌলতে তিনি ইলমের প্রতি অনুরাগী হয়েছিলেন। সুলতান মুহাম্মদ খান সিংহাসনে আরোহণের পর তাঁর মর্যাদা আরও বৃদ্ধি করেন এবং তাঁকে সালতানাতের উজিরের পদের প্রস্তাব দেন। শেখ ওজর পেশ করে বললেন: “আপনার অধীনে এমন অনেক লোক আছে যারা প্রচুর পরিমাণে আপনার খিদমত করছে এই আশায় যে হয়তো তারা কখনো উজিরের পদ পাবে। যদি তাদের পরিবর্তে অন্য কাউকে এই পদ দেওয়া হয়, তবে তারা হতাশ হয়ে আপনার থেকে বিমুখ হয়ে যাবে।”

সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ এই ওজর কবুল করে নিলেন এবং তাঁকে সামরিক আদালতের কাজিউল কুজাত (প্রধান বিচারপতি) পদের প্রস্তাব দিলেন। তিনি তা কবুল করে নিলেন। কিন্তু কিছুদিন পর সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ এবং শেখের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হলো। কারণ এই ছিল যে, শেখ সুলতানের পরামর্শ ছাড়াই অধস্তন কাজীদের নিয়োগ দিতে শুরু করেছিলেন, অথচ নিয়ম অনুযায়ী এ বিষয়ে সুলতান বা সদরে আজমের সাথে পরামর্শ করা জরুরি ছিল। সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ এতে অসন্তুষ্ট ছিলেন কিন্তু তাঁকে সরাসরি মানা করতে লজ্জা পাচ্ছিলেন। কিছুকাল পর সুলতান তাঁকে বুরসায় আওকাফের তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার প্রস্তাব দিলেন। শেখ তা ফিরিয়ে দিলেন এবং তা গ্রহণ করলেন না।

কিছুকাল পর সুলতানের পক্ষ থেকে শেখের নামে একটি ফরমান এলো। শেখ যখন তা নিয়ে চিন্তা করলেন, তখন তা শরিয়তের পরিপন্থী পেলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই ফরমান পুড়িয়ে ছাই করে দিলেন। সুলতান যখন জানতে পারলেন, তখন তিনি এতটাই রাগান্বিত হলেন যে তাঁকে তৎক্ষণাৎ বরখাস্ত করলেন।

শেখ মনঃক্ষুব্ধ হয়ে সালতানাত থেকে বেরিয়ে গেলেন এবং মিশরে গিয়ে সুলতান কাইতবে-র কাছে থাকতে লাগলেন। সুলতান কাইতবে তাঁর অসীম সম্মান ও খিদমতে কোনো ভ্রুটি রাখেননি।

কিছুকাল পর সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হলেন। তিনি সুলতান কাইতবে-র কাছে পত্র পাঠিয়ে অনুরোধ করলেন যেন তিনি শেখকে ফেরত পাঠিয়ে দেন যাতে তিনি পুনরায় উসমানীয় সালতানাতের শোভা বর্ধন করেন। সুলতান কাইতবে শেখকে সেই পত্র দেখালেন এবং...

সেই সাথে বললেন: “আপনি সেখানে একেবারেই যাবেন না। আমরা তাদের চেয়েও বেশি আপনার খেদমত করছি।”

শায়খ বললেন: “আপনি ঠিকই বলেছেন, কিন্তু কথা হলো আমার এবং সুলতান মুহাম্মদ খানের মধ্যে এমন এক স্বাভাবিক ভালোবাসা রয়েছে যেমনটা পিতা ও পুত্রের মধ্যে হয়ে থাকে। আমাদের মধ্যে যে মনোমালিন্য হয়েছে তা ভিন্ন কথা। সুলতানও জানেন যে আমি তাকে আন্তরিকভাবে ভালোবাসি। এখন যদি তার বলা সত্ত্বেও আমি না যাই, তবে তিনি মনে করবেন যে আপনি আমাকে নিষেধ করেছেন। এতে উভয় সালতানাতের মধ্যে ঘৃণা ও শত্রুতা সৃষ্টি হবে।”

সুলতান কাইতবাই তাঁর কথার গুরুত্ব অনুভব করে তাঁকে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। সুলতান মুহাম্মদ খান তাঁর আগমনে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করলেন। সুলতান তাঁকে বুরসার কাজী এবং মুফতি নিযুক্ত করলেন। তাঁর জন্য দৈনিক দুইশ, মাসিক বিশ হাজার এবং বার্ষিক ষাট হাজার দিরহামের এক বিশাল ভাতা নির্ধারণ করলেন। এছাড়া সময়ে সময়ে মূল্যবান উপহার ও পুরস্কার প্রদানের ধারা অব্যাহত রাখলেন। শায়খ এর পরেও মাঝেমাঝে সুলতানকে উপদেশ ও নসিহত করতেন, সুলতান কখনো তাতে কিছু মনে করতেন না। শায়খ সুলতানের অধীনে কর্মরত থাকাকালীন ‘গায়াতুল আমানি ফি তাফসিরি সাবয়িল মাসানি’-এর মতো তাফসির বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন যা চারদিকে প্রসিদ্ধি লাভ করে। [১]

[১] নুসরাতুল আহলিল ঈমান বি-দাওলাতি আলি উসমান, শায়খুল ইসলাম মুহাম্মদ বিন আবু সুরুর আল-বাকরি আস-সিদ্দিকি (মৃত্যু ১০৬১ হিজরি), পৃষ্ঠা ৭৪, ৭৫।
নোট: লেখক এখানে এই ঘটনাটিকে ৮৬২ হিজরির বলে উল্লেখ করেছেন, তবে এটি ভুল বলে মনে হয়। কারণ সেই সময় পর্যন্ত সুলতান কাইতবাই মিসরের শাসক হননি। ঐতিহাসিকদের ঐকমত্য হলো যে, সুলতান কাইতবাইয়ের শাসনকাল রজব ৮৭২ হিজরি থেকে শুরু হয়েছিল। অথচ এই ঘটনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, শায়খ যখন মিসর গিয়েছিলেন তখন সুলতান কাইতবাই শাসক ছিলেন।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

চতুর্থ খণ্ড

সুলতান বায়েজিদ সানি

৮৮৬ হিজরি হতে ৯১৮ হিজরি

(১৪৮১ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১৫১২ খ্রিষ্টাব্দ)

সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ-এর ইন্তেকালের সময়, তাঁর প্রধান সেনাপতি আহমদ পাশা ইতালির প্রবেশদ্বার “ওটরাণ্টো” দখল করে নিয়েছিলেন এবং আগামী বসন্তকালে রোম অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তিনি শহরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে অত্যন্ত সুদৃঢ় করে পরবর্তী লড়াইগুলোর জন্য একে একটি শক্তিশালী সেনানিবাসে পরিণত করেছিলেন। এমন সময়ে সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ-এর মৃত্যুতে তিনি প্রচণ্ড আঘাত পান। তিনি একজন আমিরকে নিজের প্রতিনিধি বানিয়ে শহর রক্ষার নির্দেশ দেন এবং নিজে দ্রুত ইস্তাম্বুলের উদ্দেশ্যে রওনা হন যাতে নতুন সুলতানের কাছ থেকে রোম বিজয়ের অনুমতি লাভ করতে পারেন।

কিন্তু এই সময়ের মধ্যে মুহাম্মদ ফাতেহ-এর বিশাল সাম্রাজ্যে বিভেদের রেখা ফুটে উঠেছিল। এই প্রখ্যাত সুলতানের দুই ছেলে ছিল: বড় ছেলে বায়েজিদ যার বয়স ছিল ৩৬ বছর, তিনি ছিলেন সন্ধিকামী, শান্তিকামী, কোমল স্বভাবের এবং ধীরস্থির। তাঁর একাগ্রতা, পরহেজগারি এবং ইবাদতগুজারির কারণে ঐতিহাসিকগণ তাঁকে “বায়েজিদ সুফি” বলে স্মরণ করেন। ছোট ছেলে জমশিদ যার বয়স ছিল ২২ বছর, তিনি পিতার মতো যোদ্ধা ও সাহসী ছিলেন। তাই সাম্রাজ্যের কিছু সদস্যের ধারণা ছিল যে জমশিদকেই বাদশাহ বানানো উচিত, কিন্তু বায়েজিদের সমর্থক উমারাগণ জয়ী হন এবং সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ-এর পর বায়েজিদ শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি ২২ রবিউল আউয়াল ৮৮৬ হিজরি (২৩ মে ১৪৮১ খ্রিষ্টাব্দ) সিংহাসনে আরোহণ করেন।

আহমদ পাশা যখন ইস্তাম্বুল পৌঁছালেন তখন বায়েজিদ সিংহাসনে আরোহণ করে ফেলেছেন। আহমদ পাশা কোনো দ্বিধা ছাড়াই বায়েজিদের হাতে বায়আত গ্রহণ করেন এবং রোম অভিযানের ব্যাপারে তাঁর কাছ থেকে অনুমতির সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন। কিন্তু বায়েজিদ শুরুর দিনগুলোতেই এমন এক সমস্যায় জড়িয়ে পড়েন যে রোম বিজয়ের পরিকল্পনা স্বপ্ন ও কল্পনায় পরিণত হয়। [১]

শাহজাদা জমশিদের বিদ্রোহ:

এই সমস্যাটি ছিল তাঁর ভাই শাহজাদা জমশিদের। সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ-এর ইন্তেকালের সময় তিনি কারমানের গভর্নর ছিলেন। যেহেতু সাম্রাজ্যের কিছু সদস্য তাঁকে বাদশাহ হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন, তাই তাঁদের সমর্থনে জমশিদ দাবি করেন যে সাম্রাজ্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করে এশীয় অধিকৃত অঞ্চলগুলো তাঁকে দিয়ে দেওয়া হোক। কিন্তু বায়েজিদ এই দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। মিমাংসা...

[১] তারিখুদ দাওলাতুল উসমানিয়া: ১/১৮৫; তারিখুদ দাওলাতুল আলিয়া, পৃ. ১৭৯, ১৮০।

সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল এবং অবশেষে ৮৮৬ হিজরি (২ জুন ১৪৮১ খ্রিষ্টাব্দ) তারিখে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ হলো যাতে জমশিদ ব্যর্থ হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হলেন।

ইতালির দরজা হাতছাড়া হয়ে গেল:

মুসলমানদের এই গৃহযুদ্ধের কারণে রোমের উখড়ে যাওয়া শ্বাস পুনরায় ফিরে এল। পোপ যখন ইউরোপীয় শক্তিগুলোকে তাদের ধর্মীয় কেন্দ্র রক্ষার আহ্বান জানানেন, তখন স্পেন, ফ্রান্স এবং অস্ট্রিয়াসহ অনেক দেশ তার সাথে যোগ দিল। তাদের সম্মিলিত বাহিনী অগ্রসর হয়ে ‘ওটরান্টো’ অবরোধ করল। সেখানে নিয়োজিত তুর্কি বাহিনী আক্রমণকারীদের সাথে আলোচনা করল এবং এই সিদ্ধান্ত হলো যে, তাদের প্রাণের নিরাপত্তা দিয়ে ইস্তাম্বুল ফেরার পথ দেওয়া হবে। এই চুক্তির অধীনে শহরের দরজা খুলে দেওয়া হলো। কিন্তু ইউরোপীয় বাহিনী শহরে প্রবেশ করার পর তুর্কিদের সাথে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করল এবং তাদের গণহত্যা করে প্রায় সবাইকে এমনভাবে তলোয়ারের নিচে ফেলল যে শহরের অলিগলি তাদের রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল।

এভাবে দ্বিতীয় হিজরি শতাব্দীতে বালাতুশ শুহাদার যুদ্ধ এবং অষ্টম হিজরি শতাব্দীতে বায়েজিদ ইলদিরিমের ইউরোপ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর, বায়েজিদ সানির যুগে মুসলমানদের তৃতীয়বারের মতো ইউরোপের কেন্দ্রস্থল থেকে পিছু হটতে হলো। [১]

সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ-এর পুত্র, ইউরোপীয় শক্তিগুলোর জিম্মি:

ওদিকে শাহজাদা জমশিদ সিংহাসন লাভে ব্যর্থ হওয়ার পর তার পরিবার-পরিজন ও মায়ের সাথে মিশরে চলে গেলেন এবং সেখানকার মামলুক সুলতানের কাছে আশ্রয় নিলেন। কিছুকাল পর তিনি নতুন করে প্রস্তুতি নিয়ে ৮৮৭ হিজরি (জুন ১৪৮২ খ্রিষ্টাব্দ) সালে আবারও তার বড় ভাই বায়েজিদ সানির বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করলেন। এবারও তিনি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলেন এবং ত্রিশ-চল্লিশজন সঙ্গীর সাথে কোনোমতে প্রাণ বাঁচিয়ে বের হতে পারলেন। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় তিনি মিশরে যাওয়ার পরিবর্তে, যেখানে তার পরিবার ও মা অবস্থান করছিলেন, ইউরোপের রোডস দ্বীপের দিকে রওনা হলেন।

রোডস দ্বীপের শাসক ডাবসন যখন উসমানি শাহজাদার আগমনের খবর শুনলেন, তখন তিনি একে সুবর্ণ সুযোগ মনে করলেন এবং তাকে লিখে পাঠালেন যে, আমরা আপনাকে উসমানি সালতানাতের উত্তরাধিকারী মনে করি এবং যেকোনো খেদমতের জন্য প্রস্তুত আছি। জমশিদ আশ্বস্ত হয়ে রোডসে পৌঁছে গেলেন।

এখানে তাকে জমকালো অভ্যর্থনা জানানো হলো এবং কিছু দিন পর্যন্ত বেশ খাতির-যত্ন করা হলো। তবে বাস্তবে খ্রিস্টানরা আতিথেয়তা ও সেবার আবরণে তাকে জিম্মি করে ফেলেছিল এবং তার মাধ্যমে উসমানি সালতানাত থেকে চড়া মূল্যে অর্থ আদায়ের পরিকল্পনা ঠিক করে ফেলেছিল। কিছু দিন পরই রোডসের শাসক প্রথমে জমশিদের কাছ থেকে একটি অঙ্গীকারনামা লিখিয়ে নিলেন যে, যদি তিনি সুলতান হন তবে রোডসবাসীদের সমস্ত সম্ভাব্য সুযোগ-সুবিধা দেবেন। এরপর বায়েজিদ সানির কাছে পত্র পাঠালেন যে, রোডসবাসীদের জন্য উসমানি সালতানাতের সমস্ত বন্দর খুলে দিতে হবে এবং তাদের কাছ থেকে কোনো প্রকার ট্যাক্স আদায় করা যাবে না। এ ছাড়া রোডসকে বার্ষিক ৪৫ হাজার ডুকাত (উসমানি মুদ্রা) প্রদান করতে হবে। অন্যথায় জমশিদকে সামরিক সহায়তাসহ মুক্ত করে দিয়ে উসমানি সালতানাতে বিদ্রোহ...

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া: ১/১৮৫; তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়া, পৃ. ১৮০

বরপা করা হবে। বিদ্রোহ থেকে বাঁচতে বায়েজিদ রোডসের শাসকের প্রতিটি শর্ত মেনে নিলেন।

অন্যদিকে রোডসের শাসক মিশরে জমশিদের মায়ের কাছে পত্র পাঠিয়ে তার কাছ থেকেও বার্ষিক দেড় লক্ষ ড্যাকাট দাবি করেন এবং হুমকি দেন যে, এমনটি না করলে জমশিদকে বায়েজিদের হাতে তুলে দেওয়া হবে যেখানে তার মৃত্যুদণ্ডও হতে পারে। জমশিদের মা-ও বাধ্য হয়ে এই শর্ত মেনে নিলেন। এভাবে রোডসের খ্রিস্টানরা উভয় হাত দিয়ে মুসলমানদের লুট করতে শুরু করল।

যেহেতু রোডস একটি ছোট রাষ্ট্র ছিল, তাই কিছুকাল পর রোডসের শাসক আশঙ্কা বোধ করলেন যে, উসমানীয় বাহিনী যেকোনো সময় জমশিদকে উদ্ধার করতে দ্বীপে আক্রমণ করতে পারে। তাই জমশিদকে প্রথমে ইতালির ভেনিস শহরে এবং পরে ফ্রান্সের মিলিয়ন শহরে পাঠিয়ে দেওয়া হলো এবং একের পর এক তাকে বিভিন্ন দুর্গে রাখা হতে লাগল। তার সঙ্গীদের সংখ্যাও কমানো হতে থাকল, এমনকি শেষ পর্যন্ত তিনি একা হয়ে পড়লেন।

৮৯৫ হিজরি পর্যন্ত জমশিদ রোডসের শাসকের আমানত হিসেবে ফ্রান্সে অবস্থান করেন এবং রোডসের শাসক যথারীতি উসমানীয় সালতানাত ও জমশিদের মা উভয়ের কাছ থেকেই অর্থ হাতিয়ে নিতে থাকেন। এই সময়ে জমশিদের গুরুত্ব দেখে ইউরোপের বহু শাসক এবং স্বয়ং রোমের পোপ জমশিদকে জিম্মি হিসেবে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার চেষ্টা শুরু করেছিলেন। তাদের মধ্যে ফ্রান্সের রাজা অগ্রগণ্য ছিলেন কারণ জমশিদ তারই রাজ্যে অবস্থান করছিলেন।

রোডসের শাসক এই পরিস্থিতি দেখে জমশিদের মায়ের কাছে পত্র পাঠান এবং ওয়াদা করেন যে, যদি ভ্রমণ ব্যয়ের দেড় লক্ষ ড্যাকাট পাঠিয়ে দেওয়া হয় তবে জমশিদকে বাড়ি ফিরিয়ে দেওয়া হবে। জমশিদের মা এই অর্থ পাঠিয়ে দিলেন কিন্তু রোডসের শাসক ওয়াদার কোনো তোয়াক্কাই করলেন না। ফ্রান্সের রাজার লোলুপ দৃষ্টি থেকে বাঁচাতে তিনি জমশিদকে ইতালিতে পোপ শিনোসের কাছে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। পোপের জন্য এর চেয়ে খুশির বিষয় আর কী হতে পারে যে, সেই সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ-এর সন্তান তার কঙ্জায় থাকবে, যিনি কয়েক বছর আগে রোম বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে ছিলেন।

রোডসের শাসকের এই ভয় ছিল যে, জমশিদ ইতালিতে চলে যাওয়ার পর রোডসের প্রাপ্ত অর্থের ধারা যেন বন্ধ না হয়ে যায়। তাই তিনি পোপের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলেন যে, ইতালিতে জমশিদের নজরবন্দি থাকা সত্ত্বেও রোডস উসমানীয় সালতানাত থেকে বার্ষিক অর্থ গ্রহণ করতে থাকবে। পোপ এটি গ্রহণ করে নিলেন। এদিকে ফ্রান্সের রাজা জমশিদকে নিজের দেশেই রাখতে চেয়েছিলেন কিন্তু পোপের পীড়াপীড়িতে তিনি তাকে রোমে পাঠাতে রাজি হলেন, তবে এই ওয়াদা নিলেন যে জমশিদকে ইতালির বাইরে কোথাও পাঠানো হবে না। এই ওয়াদার দৃঢ়তার জন্য পোপের কাছ থেকে জামানত হিসেবে দশ হাজার পাউন্ড গ্রহণ করা হলো।

জমশিদ রোমে পৌঁছালে তাকে জমকালো সংবর্ধনা দেওয়া হলো। জমশিদ পোপের কাছে আবেদন করলেন যেন তাকে বাড়ি ফিরে যেতে দেওয়া হয়। পোপ জবাবে তাকে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের প্ররোচনা দিলেন এবং ওয়াদা করলেন যে, এমনটি করলে পুরো ইউরোপ তার পাশে দাঁড়াবে এবং তাকে উসমানীয় সালতানাতের সিংহাসন ফিরিয়ে দেবে। জমশিদ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন।

পরে জমশিদকে সাধারণ কয়েদিদের মতো একটি ইমারতে বন্দি করে রাখা হলো।

কিছুকাল পর মিশরের বাদশাহ জমশিদকে উদ্ধারের প্রচেষ্টা শুরু করেন। তিনি জমশিদকে নিজের রাজ্যের নাগরিক ও বিশেষ মেহমান ঘোষণা করে পোপের কাছে তাকে মিশরে পাঠিয়ে দেওয়ার আবেদন জানান, কিন্তু তাতে কোনো কর্ণপাত করা হয়নি। অন্যদিকে বায়েজিদ ও পোপের মধ্যে কূটনৈতিক যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং এই বিষয়টি মীমাংসা করা হয় যে, জমশিদকে বন্দি রাখার বার্ষিক মূল্য এখন রোডসবাসীদের পরিবর্তে পোপকে প্রদান করা হবে।

তিন বছর পর পোপ শিনুস ইন্তেকাল করেন এবং নতুন পোপ আলেকজান্ডার বায়েজিদকে বার্তা পাঠান যে, যদি এককালীন তিন লক্ষ ড্যাকাট পাঠানো হয়, তবে জমশিদের কাঁটা চিরতরে উপড়ে ফেলা হবে। বায়েজিদ এই অর্থ পাঠিয়ে দেন, কিন্তু পোপ জমশিদকে হত্যা করানোর আগেই ৯০১ হিজরিতে ফ্রান্সের বাদশাহ অষ্টম চার্লস জমশিদকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য ইতালি আক্রমণ করেন। পোপ রোম থেকে পালিয়ে সেন্ট অ্যাঞ্জেলো দুর্গে আশ্রয় নেন, জমশিদও তার সাথেই ছিলেন। ফরাসি বাহিনী অবরোধের পর দুর্গটি জয় করে নেয়। এভাবে জমশিদ ফরাসিদের দখলে চলে আসেন। ফ্রান্সের রাজা তাকে সাথে নিয়ে যান এবং নিজের দেশে নেপলস দুর্গে নজরবন্দি করে রাখেন। পোপ হাত কচলাতে থাকেন। এখন তার সামনে দুটি পথ ছিল: বায়েজিদকে জমশিদের মাথার দাম তিন লক্ষ ড্যাকাট ফেরত দেওয়া অথবা কোনোভাবে জমশিদকে মেরে ফেলা। পোপ দ্বিতীয় পথটি বেছে নিয়ে বায়েজিদকে বার্তা পাঠান যে, তিনি তার ওয়াদা পূরণ করবেন। তিনি ফ্রান্সে একজন নাপিত পাঠান যে নেপলস দুর্গ পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম হয়। একদিন সুযোগ বুঝে সে জমশিদের খাবারে ধীরগতির বিষ মিশিয়ে দেয় এবং বিষাক্ত ক্ষুর দিয়ে তার ক্ষৌরকর্মও সম্পন্ন করে।

অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিষক্রিয়া জমশিদকে মৃত্যুশয্যায় ফেলে দেয়। শেষ মুহূর্তে তার কাছে তার মায়ের চিঠি পৌঁছায়, কিন্তু তিনি এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে চিঠিটিও পড়তে পারেননি এবং কেবল এই দোয়া করেন:

“হে আল্লাহ! যদি এই কাফেররা আমার মাধ্যমে মুসলমানদের ক্ষতি করতে চায়, তবে আমাকে আজই তুলে নাও।”

কিছুক্ষণ পর জমশিদের রুহ কবজ হয়ে যায়। তার বয়স ছিল ৩৬ বছর। তার লাশ বায়েজিদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, যাকে বুরসায় দাফন করা হয়। [১]

শিক্ষণীয় বিষয়:

জমশিদের বন্দিদশার এই ঘটনাটি বিভিন্ন দিক থেকে অত্যন্ত শিক্ষণীয়। একদিকে এটি মুসলিম শাহজাদা ও শাসকদের অদূরদর্শিতার এক চিত্র যে, তারা সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ-এর উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত হন, যার ফলে রোম বিজয়ের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায়। শাহজাদা জমশিদের বায়েজিদের মোকাবিলায় দাঁড়ানো এবং ব্যর্থতার পর ইউরোপীয়দের ওপর আস্থা রাখা ছিল এক বিরাট বোকামি, যার খেসারত তাকে তেরো বছরের বন্দিদশা এবং মুসলমানদের লক্ষ লক্ষ টাকা প্রদানের মাধ্যমে দিতে হয়েছে। একইভাবে বায়েজিদের নিজের ভাইকে কাফেরদের হাতে হত্যা করানোর পদক্ষেপটিও ছিল অত্যন্ত দুঃখজনক।

এর দ্বারা এটিও প্রমাণিত হয় যে, ইউরোপীয়রা মুসলমানদের দুর্বলতার সুযোগ নিতে দেরি করত না এবং...

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া: ১/১৮৬, ১৮৮; তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়া, পৃ. ১৮১, ১৮২; তারিখ সালাতিন বনি উসমান, পৃ. ৫৬, ৫৭।

সুযোগ পেলেই তারা প্রতারণা ও জঘন্য ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তাদের সব ধরনের ক্ষতি করত এবং নৈতিকতা ও সৌজন্যের সকল মূল্যবোধ ভুলে যেত। অন্যদিকে মুসলমানদের জন্যও এটি একটি চিন্তার বিষয় যে, কেন তারা কুরআনের বিধান এবং সীরাতে নববীর শিক্ষা ভুলে গিয়ে সাময়িক সুবিধার জন্য শত্রুদের হাতে ব্যবহৃত হয়?

দ্বিতীয় বায়েজিদের বিজয়সমূহ:

জেমের নির্বাসনের সময় দ্বিতীয় বায়েজিদ পুনরায় বিজয়ের ধারা শুরু করেছিলেন। যদিও রোম বিজয়ের স্বপ্ন পূরণ হতে পারেনি, তবে অন্যান্য রণাঙ্গনে সেনাবাহিনী অগ্রসর হতে থাকে। বায়েজিদ নৌবাহিনীকে বিশেষভাবে শক্তিশালী করেছিলেন কারণ তার মনে এই ভয় ছিল যে, ইউরোপীয়রা শাহজাদা জেমকে নিয়ে যেকোনো সময় সমুদ্রপথে আক্রমণ করতে পারে।

বায়েজিদ ৮৮৮ হিজরিতে (১৪৮৩ খ্রিষ্টাব্দ) হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে জয়ী হন। পরের বছর উসমানীয় বাহিনী বোগদান (মলদোভিয়া)-এর দিকে অগ্রসর হয়। এই এলাকাটি বর্তমান রোমানিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। উসমানীয় বাহিনী এই অঞ্চলের বেশ কিছু শহর জয় করে, যার মধ্যে কিলি দুর্গটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যা ২০ জুমাদিউল আখিরা ৮৮৯ হিজরিতে (১৫ জুলাই ১৪৮৪ খ্রিষ্টাব্দ) বিজিত হয়।

ডিনিস্টার নদীর মোহনার বাম তীরে অবস্থিত ‘আক্কেরমান’ (আক কারমান) দুর্গটি, যা জেনোয়ার সাথে সংযুক্ত ছিল, তা এই কারণে গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে এখান থেকে ক্রিমিয়ার দিকে পথ বের হতো। এই অপরাজেয় দুর্গের ওপর ৮২২ হিজরি, ৮৫৮ হিজরি এবং ৮৭৯ হিজরিতে উসমানীয় বাহিনী তিনটি আক্রমণ চালিয়েছিল কিন্তু সফল হয়নি। দানিউব নদী এবং ডিনিস্টার নদীর মোহনাগুলো দখল করার পর উসমানীয়দের জন্য এর ওপর আক্রমণ করা সহজ হয়ে যায়, ফলে দ্বিতীয় বায়েজিদের আমলে রজব ৮৮৯ হিজরিতে (জুলাই ১৪৮৪ খ্রিষ্টাব্দ) এই দুর্গটিও জয় করা হয়। এভাবে তুর্কিরা ক্রিমিয়ার দিকে যাওয়ার সমস্ত মহাসড়ক দখল করে নেয়।

মলদোভিয়ার কাছে কৃষ্ণ সাগরের আর কোনো উপকূল অবশিষ্ট থাকল না এবং কৃষ্ণ সাগর সব দিক থেকে উসমানীয় সাম্রাজ্যের দখলে চলে এল।

৮৯৮ হিজরির (১৪৯৩ খ্রিষ্টাব্দ) শেষের দিকে বসনিয়ার গভর্নর ইয়াকুব পাশা দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের স্লাভোনিয়া রাজ্য আক্রমণ করেন এবং তা জয় করে স্টাইরিয়াও (Bistiria) নিজের অধীনে নিয়ে আসেন, যা দক্ষিণ-পূর্ব অস্ট্রিয়ার একটি পাহাড়ি রাজ্য।

এই বাহিনীর ফেরার পথে ক্রোয়েশিয়ায় খ্রিস্টানরা জোরালো আক্রমণ করে, কিন্তু ইয়াকুব পাশা দাঁতভাঙা জবাব দিয়ে খ্রিস্টানদের নাস্তানাবুদ করে দেন। সাড়ে পাঁচ হাজার খ্রিস্টান নিহত হয় এবং ২৫ হাজার বন্দি হয়। এই বিজয় ২৭ জিলকদ ৮৯৮ হিজরিতে (৯ সেপ্টেম্বর ১৪৯৩ খ্রিষ্টাব্দ) অর্জিত হয়।

হাঙ্গেরি ও পোল্যান্ডের সাথেও সংঘর্ষ হয়। অবশেষে পোল্যান্ডের সাথে সন্ধি হয় এবং চুক্তি অনুযায়ী পোল্যান্ডের কিছু সীমান্ত দুর্গ তুর্কিরা লাভ করে। হাঙ্গেরির সাথে সীমান্ত যুদ্ধ দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকে, এরপর সন্ধি হয়ে যায়। [১]

ভেনিস উপকূলের বিজয়সমূহ:

৯০২ হিজরি থেকে ৯০৯ হিজরির (১৪৯৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৫০৩ খ্রিষ্টাব্দ) মধ্যে ভেনিসের ওপর অসংখ্য আক্রমণ হয়, যার মধ্যে ‘লেপান্তো’, ‘করুন’,

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানীয়াহ: ১/১৮৭, ১৮৮; তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ, পৃ. ১৮৩ থেকে ১৮৫।

“নওয়ারিন” এবং “ডরাজো”-এর মতো শহরগুলো বিজিত হয়েছিল। এই যুদ্ধগুলোর মধ্যে ৯০৫ হিজরির যুদ্ধটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাতে তুর্কি নৌবাহিনী ভেনিসের নৌবাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে অসংখ্য দ্বীপ জয় করেছিল।

৯০৬ হিজরির নৌযুদ্ধটিও স্মরণীয় ছিল, যাতে ভেনিস, ইতালি, ফ্রান্স এবং স্পেনের সম্মিলিত নৌবহরের মোকাবিলা করতে হয়েছিল। ইউরোপীয় শক্তিগুলো সিদ্ধান্ত নিয়ে এসেছিল যে, এবার তারা উসমানীয়দের ভূমধ্যসাগর থেকে বিতাড়িত করবে। কিন্তু তুর্কিদের নৌ-সেনাপতি কামাল, যিনি বায়েজিদের গোলাম ছিলেন, এই যুদ্ধে এমন দক্ষতা ও সাহসিকতার পরিচয় দেন যে ইউরোপের শক্তি সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে যায়। [১]

আন্দালুসের মুসলমানদের সাহায্য:

এই দিনগুলোতেই আন্দালুসের ওপর খ্রিস্টানদের পূর্ণ দখল প্রতিষ্ঠিত হয়, যার পর ক্যাস্টিলের রাজা ফার্ডিনান্ড এবং রানী ইসাবেলা সেখানকার মুসলমানদের জোরপূর্বক খ্রিস্টান বানানোর অভিযান শুরু করেন। লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে হত্যা করা হয় এবং লক্ষ লক্ষ মানুষকে জোরপূর্বক ব্যাপ্টিজম [২] দেওয়ার জন্য নির্যাতন কক্ষে নিক্ষেপ করা হয়। অগণিত মুসলমান আন্দালুস থেকে হিজরত করতে বাধ্য হন।

নৌ-সেনাপতি কামাল এই সময়ে নৌবহরের মাধ্যমে আন্দালুসের উপকূলে অতর্কিত হামলা চালান এবং অনেক মুসলমানকে নিরাপদে খ্রিস্টানদের কবল থেকে উদ্ধার করে উত্তর আফ্রিকার উপকূলে পৌঁছে দেন। [৩]

আহমদ পাশার হত্যাকাণ্ড:

আহমদ পাশা সাম্রাজ্যের অভিজ্ঞ ও যোগ্যতম কর্মকর্তাদের একজন ছিলেন। তিনি ইয়েনিচেরি অফিসার থেকে পদোন্নতি পেয়ে জেনারেল হয়েছিলেন। ৮৬৫ হিজরিতে (১৪৬১ খ্রি.) তিনি বেইলারবেয়ি অর্থাৎ প্রধান সেনাপতির পদ লাভ করেন। ১৪৭৪ খ্রিস্টাব্দে মাহমুদ পাশার মৃত্যুর পর সুলতান মুহাম্মদ ফাতিহ তাকে উজিরে আজম পদে অধিষ্ঠিত করেন। ছয় বছর পর সুলতান মুহাম্মদ ফাতিহ কোনো কারণে অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে পদচ্যুত করেন এবং ছয় মাস বরখাস্ত রাখার পর ক্ষমা করে তাকে রুমেলির গভর্নর নিযুক্ত করেন।

বায়েজিদ শাহজাদা থাকাকালীন সময় থেকেই তাকে অপছন্দ করতেন। এরপর তিনি যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন আহমদ পাশার সহানুভূতি শাহজাদা জামশিদের সাথে ছিল। আহমদ পাশার পদমর্যাদা বিবেচনা করে বায়েজিদ তার ওপর হাত দিতে ইতস্তত করছিলেন, কিন্তু শাহজাদা জামশিদের নির্বাসনের পর যখন তিনি কিছুটা স্বস্তি পেলেন, তখন তিনি আহমদ পাশাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন। এই কাজটি তিনি রাজধানীর বাইরে করা শ্রেয় মনে করলেন এবং সাম্রাজ্যের কিছু সদস্য ও ইয়েনিচেরি সৈন্যদের নিয়ে ইস্তাম্বুল থেকে এড্রিয়ানোপল পৌঁছালেন।

৬ শাওয়াল ৮৮৭ হিজরির রাতে সেখানে এক অনুষ্ঠানে আহমদ পাশাকে রাজকীয় পোশাক (খিলআত) পরানো হয়। এরপর হঠাৎ সুলতানের ইশারায় সৈন্যরা ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তার শিরশ্ছেদ করে। ইয়েনিচেরি সৈন্যরা এ নিয়ে বেশ হাঙ্গামা করেছিল, কিন্তু পরে তারা শান্ত হয়ে যায়। [৪]

[১] ফি উসুলুত তারিখিল উসমানি, আহমদ আবদুর রহিম মুস্তফা, পৃ. ৬৭, ৭৫, ত-দারুশ শুরুক কায়রো; তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়ায়্যাহ, পৃ. ১৭৯, ১৮০; তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ: ১/ ১৯৭ থেকে ২০০।

[২] ব্যাপ্টিজম বা ইস্তিবাক: মাথায় পানি ছিটিয়ে কাউকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করার অনুষ্ঠান যা গির্জায় যাজকদের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়।

[৩] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া: ১/ ১৯৬, ১৯৭।

[৪] তারিখে উসমানি: ২/ ১৮৮।

তারিখ উম্মত-ই-মুসলিমা

মিশরের মামলুকদের সাথে দ্বন্দ্ব ও সন্ধি:

বায়েজিদের শাসনামলে জমশিদের বিদ্রোহের কারণে যে দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল, তার একটি প্রভাব ছিল এই যে, মিশরের মামলুকরা উসমানীয় সালতানাতের সীমান্তে আক্রমণ করে কিছু জেলা ও দুর্গ দখল করে নেয়। বায়েজিদ সেগুলো পুনরুদ্ধার করতে পারেননি। পরবর্তীতে উভয় পক্ষের মধ্যে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, দুর্গগুলো মামলুকদের কাছেই থাকবে, তবে সেগুলোর আয় হারামাইন শরিফাইনের সেবায় ব্যয় করা হবে। [১]

মামলুকদের সাহায্য..... ইসলামী ঐক্যের এক চমৎকার নিদর্শন:

তবে বায়েজিদ মুসলিম বিশ্বের সাধারণ স্বার্থে মামলুকদের সাহায্য করতে কখনো দ্বিধা করেননি। এই সময়ে পর্তুগিজ নৌবাহিনী ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগর দখল করে মুসলিম দেশগুলোর বাণিজ্যিক অবরোধের চেষ্টা শুরু করেছিল। মামলুকদের নৌবাহিনী এই জলদস্যুদের নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হচ্ছিল।

বায়েজিদ মিশরীয় নৌবাহিনীকে পর্তুগিজদের মোকাবিলায় শক্তিশালী করতে বিশেষ আগ্রহ দেখান। প্রখ্যাত তুর্কি নৌ-কমান্ডার হুসাইন রইস মিশরে গিয়ে মামলুক সুলতান কানসুহ আল-গৌরির অধীনে নৌ-বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ১৫০৭ খ্রিস্টাব্দে নৌবহর লোহিত সাগরে নিয়ে গিয়ে মামলুকদের জন্য ইয়েমেন জয় করেন।

বায়েজিদ সানি আরেকজন শ্রেষ্ঠ নৌ-সেনাপতি কামাল রইসকে ৩০০টি কামান, ৮০টি যুদ্ধজাহাজ এবং অন্যান্য যুদ্ধ সরঞ্জামসহ মিশরে পাঠিয়ে সেখানকার নৌবাহিনীকে আরও শক্তিশালী করেন। পরবর্তীতে মিশরীয় নৌবাহিনীর প্রশিক্ষণের জন্য আহমদ ওগলু এবং হামিদ রইসের মতো অভিজ্ঞ কমান্ডারদের কায়রোতে পাঠান। যখন কানসুহ আল-গৌরি এই সেবার বিনিময়ে পারিশ্রমিক পাঠাতে চাইলেন, তখন বায়েজিদ সানি তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন:

“এটি কাফেরদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের একটি যৌথ সমস্যা।” [২]

বায়েজিদের পদত্যাগ এবং প্রথম সেলিমের উত্তরাধিকার:

বায়েজিদ সানির শেষ বছরগুলোতে তার পুত্রদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই শুরু হয়। বড় শাহজাদা কাইদুক এবং ছোট ছেলে সেলিম ক্ষমতার দাবিদার ছিলেন। সেলিম তখন ইউরোপীয় অঞ্চলের গভর্নর ছিলেন এবং নিজের গুণাবলির কারণে সেনাবাহিনীতে অধিক জনপ্রিয় ছিলেন। সুলতান নিজে মেজ শাহজাদা আহমদকে উত্তরাধিকারী করতে চেয়েছিলেন।

এই পরিস্থিতিতে তিন ছেলেই নিজ নিজ উদ্যোগে পিতার অনুমতি ছাড়াই একে অপরের অঞ্চলে আক্রমণ শুরু করেন। এমনকি পিতার প্রিয় মেজ শাহজাদা আহমদ নিজেই ইস্তাম্বুল অবরোধ করেন যাতে পিতাকে ক্ষমতাচ্যুত করে নিজে সিংহাসনে বসতে পারেন। বায়েজিদ তার প্রিয় পুত্রের মোকাবিলা করতে ইতস্তত করছিলেন। তার সিদ্ধান্তহীনতা দেখে সেনাবাহিনীর আমীরগণ সেলিমকে সিংহাসনে বসানোর সিদ্ধান্ত নেন এবং দরবারে সমবেত হয়ে দাবি জানান যে, সুলতান নিজে পদত্যাগ করে ক্ষমতা সেলিমের হাতে হস্তান্তর করবেন।

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া: ১/ ১৮৯ থেকে ১৯১, তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়া, পৃ. ১৭৯, ১৮০

[২] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, পৃ. ৩৩২, ৩৩৩

হস্তান্তর করে দেয়। বায়েজিদ এই দাবি মেনে নেন এবং ২৬ মহরম ৯১৮ হিজরি (২৫ এপ্রিল ১৫১২ খ্রিস্টাব্দ) তারিখে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে নির্জনবাসের জীবন বেছে নেন। তবে তিনি বেশিদিন বেঁচে থাকতে পারেননি এবং ১লা রবিউল আউয়াল (২৯ মে) পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। [১]

বায়েজিদ সানির চরিত্র:

সুলতান বায়েজিদ সানির চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ইউসুফ বেগ আসাফ লিখেছেন:

“তিনি ৬৭ বছর জীবিত ছিলেন। তিনি সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন। নাক ছিল বাঁকানো এবং চুল ছিল কালো। তিনি নম্র স্বভাবের, জ্ঞানানুরাগী এবং জ্ঞানগর্ভ মজলিসের অনুসারী ছিলেন। তিনি কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি একজন মুভাক্কি ও পরহেজগার মানুষ ছিলেন। রমজানের শেষ দশক তিনি নির্জনে কাটাতেন অথবা শেখ মহিউদ্দিন ইয়াজুরির কাছে ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। তিনি তাঁর শাসনকালে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও জামে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। তিনি প্রতি বছর কাবার জন্য মূল্যবান সম্পদ পাঠাতেন। তিনি তীরন্দাজিতে পারদর্শী ছিলেন এবং যুদ্ধে নিজে অংশগ্রহণ করতেন। জিহাদ থেকে ফিরে এসে তিনি নিজের শরীর ও কাপড়ের ধুলোবালি সংগ্রহ করতেন, এমনকি সেই ধুলোবালি দিয়ে একটি কাঁচা ইট তৈরি করা হয়েছিল। তাঁর অসিয়ত ছিল যে, তাঁর মৃত্যুর পর এই ইটটি তাঁর মাথার নিচে রেখে দাফন করা হয়, কারণ হাদিসে এসেছে: ‘যে ব্যক্তির পা আল্লাহর পথে ধূলিমলিন হয়েছে, আখেরাতে আগুন তাকে স্পর্শ করতে পারবে না’।” [২]

তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের মতো জ্ঞান ও মর্যাদার ক্ষেত্রেও একটি উচ্চ স্থান রাখতেন। তিনি একজন চমৎকার কবি এবং দক্ষ ক্যালিগ্রাফার ছিলেন। ধনুক তৈরির শিল্পে তাঁর ব্যাপক দক্ষতা ছিল। তাঁর গুণাবলির স্বীকৃতি শত্রুরাও দিত। তাঁকে কাছ থেকে দেখা একজন ইউরোপীয় দূত তাঁর চিঠিতে লিখেছেন:

“বায়েজিদের উচ্চতা মাঝারি থেকে কিছুটা বেশি... তিনি মোটেও মদ পান করেন না... খাবার কম খান... ঘোড়সওয়ারিতে পারদর্শী... শিকার এবং অশ্বারোহণ তাঁর প্রিয় শখ... তিনি ধর্মীয় নিদর্শনগুলোর অত্যন্ত সম্মান করেন... সদকা ও খয়রাত করেন... দর্শন ও জ্যোতির্বিদ্যায় তাঁর গভীর আগ্রহ রয়েছে... রাষ্ট্রের খবরাখবর রাখার প্রয়োজনীয় কাজের পর সময়ের একটি বড় অংশ সেনাবাহিনীর সংগঠন ও বিন্যাসে ব্যয় করেন... তিনি সেনাবাহিনীকে আধুনিক অস্ত্র ও বারুদশাস্ত্রে সজ্জিত করেছেন।” [৩]

বায়েজিদের আমলে সংঘটিত আন্তর্জাতিক বিপ্লবসমূহ:

বায়েজিদ সানির আমলে বিশ্বজুড়ে অনেক রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটেছিল। এটি ছিল ইসলামি রাষ্ট্রগুলোর পতন ও অবনতি এবং বাতিল শক্তিগুলোর উত্থানের সময়। যদিও এই বিপ্লব পুরোপুরি প্রকাশ পেতে আরও দুই-তিন শতাব্দী পার হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আজ আমরা সেই সময়ের দিকে তাকালে বলতে পারি যে, ইউরোপের উত্থান এবং মুসলমানদের পতনের সূচনা এই যুগ থেকেই হয়েছিল।

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া: ১/২০৬ থেকে ২১১, তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়া, পৃ. ১৮৬, ১৮৭

[২] তারিখ সালাতিন বনি উসমান: ৫৯... হাদিসের শব্দগুলো হলো: مَا أَغْبَرْتُ قَدَمًا عَبْدٌ مِّنْ أَغْبَرَتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ (সহিহ বুখারি, হা: ৯০৭) فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ (সহিহ বুখারি, হা: ২৮১১)

[৩] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া: ১/২১১, ২১২

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

বায়েজিদের আমলে সংঘটিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নিচে দেওয়া হলো:

- ১. আন্দালুসের ইসলামি রাষ্ট্রের শেষ দুর্গ গ্রানাডার পতন ঘটে। পুরো আন্দালুস খ্রিস্টানদের দখলে চলে যায়।
- ২. কলম্বাস নতুন পৃথিবী আমেরিকায় পৌঁছান এবং সেখানে ইউরোপীয় জাতিগুলোর উপনিবেশ স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু হয়।
- ৩. ভাস্কো দা গামা ভারতের উপকূলে পৌঁছান এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো একটি নতুন শিকারভূমি খুঁজে পায়।
- ৪. ইরানে শাহ ইসমাইল শিয়া রাষ্ট্র ‘সাফাভি সাম্রাজ্য’-এর ভিত্তি স্থাপন করেন, যা পরবর্তীতে উসমানীয়দের সবচেয়ে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে প্রমাণিত হয়।
- ৫. তুর্কিস্তানে শায়বানি খানের উত্থান ঘটে, যিনি শেষ পর্যন্ত ইসমাইল সাফাভির বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন।
- ৬. মধ্য এশিয়ায় বাবরের আবির্ভাব ঘটে, যিনি কয়েক বছর পর ভারতে এসে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন।

বায়েজিদ সানির শাসনকালের ওপর একটি মন্তব্য:

বায়েজিদ সানির শাসনকালকে আমরা সব দিক থেকে সফলও বলতে পারি না, আবার পুরোপুরি ব্যর্থও বলতে পারি না। এই যুগে যেমন বিশৃঙ্খলা ও বিভেদ ছিল, তেমনি বিজয়ও ছিল। বায়েজিদ সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহের প্রখ্যাত সেনাপতি আহমদ গেদিক পাশার রূপে এক বিশাল নিয়ামত পেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি এই মহান জেনারেলের কোনো সদ্যবহার করেননি। তিনি যদি তাঁর কদর করতেন এবং তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়োজিত রাখতেন অথবা অন্তত তাঁর পরামর্শগুলো শুনতেন, তবে তাঁর বিজয়ের পরিধি অনেক বৃদ্ধি পেতে পারত। আহমদ পাশার হত্যাকাণ্ড ছিল বায়েজিদের রাজনৈতিক ভুলগুলোর একটি নমুনা। এ ধরনের ভুল করার ফলে উসমানীয় সাম্রাজ্যের উত্থানের দিনগুলো সীমিত হয়ে পড়ে।

এই যুগেই উসমানীয় সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সূচনা হয়। বায়েজিদ সিংহাসনে আরোহণের পরপরই তাঁর ভাই জমশিদের বিদ্রোহের সম্মুখীন হন এবং বার্ষিক্যে তাঁকে তাঁর পুত্রদের অবাধ্যতা ও গৃহযুদ্ধের তিক্ততা সহ্য করতে হয়।

তুর্কানে উসমান - খিলাফতের আগে

প্রথম যুগ: সূচনা থেকে তৈমুর লঙের আক্রমণ পর্যন্ত

নম্বর শাসক শাসনকাল চরিত্র বিশেষ বিপ্লব

১ উসমান খান ৬৮০ হিজরী থেকে ৭২৬ হিজরী (১২৮১ খ্রি. থেকে ১৩২৬ খ্রি.) নেক সীরাত সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা

২ ওরখান ৭২৬ হিজরী থেকে ৭৬১ হিজরী (১৩২৬ খ্রি. থেকে ১৩৬০ খ্রি.) নেক সীরাত সালতানাতকে সুসংহত করেন

৩ মুরাদ খান প্রথম ৭৬১ হিজরী থেকে ৭৯১ হিজরী (১৩৬০ খ্রি. থেকে ১৩৮৯ খ্রি.) নেক ও বাহাদুর সালতানাতকে সম্প্রসারিত করেন

৪ বায়েজিদ ইয়ালদারাম ৭৯১ হিজরী থেকে ৮০৫ হিজরী (১৩৮৯ খ্রি. থেকে ১৪০৩ খ্রি.) বিলাসপ্রিয়, বাহাদুর, তেজস্বী মেজাজ সালতানাতকে সম্প্রসারিত করেন কিন্তু তৈমুরের কাছে পরাজিত হয়ে সালতানাত হারান

.

গৃহযুদ্ধ ও অরাজকতার যুগ ৮০৫ হিজরী থেকে ৮১৬ হিজরী (১৪০৩ খ্রি. থেকে ১৪১৩ খ্রি.)

.

.

দ্বিতীয় পুনর্জাগরণ যুগ: তৈমুরী আক্রমণের পর

নম্বর শাসক শাসনকাল চরিত্র বিশেষ বিপ্লব

১ মুহাম্মদ চেলপি (মুহাম্মদ প্রথম) ৮১৬ হিজরী থেকে ৮২৪ হিজরী (১৪১৩ খ্রি. থেকে ১৪২১ খ্রি.) যোগ্য শাসক ভাইদের সাথে গৃহযুদ্ধ - সালতানাতকে নতুন করে সুসংগঠিত করেন

২ মুরাদ খান দ্বিতীয় ৮২৪ হিজরী থেকে ৮৫৫ হিজরী (১৪২১ খ্রি. থেকে ১৪৫১ খ্রি.) নেক সীরাত সালতানাতকে নতুন করে সুসংহত করেন

উসমানীয় খিলাফত (দ্বিতীয় অংশ)

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

৩ | মুহাম্মদ ফাতেহ (মুহাম্মদ সানি) | ৮৫৫ হি. থেকে ৮৮৬ হি. (১৪৫১ খ্রি. থেকে ১৪৮১ খ্রি.) | সাহসী এবং বিজ্ঞ | কনস্টান্টিনোপল বিজয়

৪ | বায়েজিদ সানি | ৮৮৬ হি. থেকে ৯১৮ হি. (১৪৮১ খ্রি. থেকে ১৫১২ খ্রি.) | যোগ্য শাসক | পতনের লক্ষণসমূহ

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

চতুর্থ খণ্ড

গ্রন্থপঞ্জি

প্রথম খণ্ড থেকে তৃতীয় খণ্ড

তারীখে উম্মতে মুসলিমা

ক্রমিক নং | কিতাবের নাম | লেখক

হরফ আলিফ

- ১. আল-আলাম - খাইরুদ্দিন আয-যিরিকলি
- ২. আল-আলাকুল খাতিরা ফি যিকর উমারা আশ-শাম ওয়াল জাযিরা - ইযযুদ্দিন ইবনে শাদ্দাদ আল-হালাবি
- ৩. ইগাসাতুল লাহফান মিন মাসায়িদিশ শয়তান - ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওযিয়া
- ৪. আল-আলামুল আলিয়া ফি মানাকিবি ইবনে তাইমিয়া - আবু হাফস বাযযার
- ৫. আল-ইলমাম বিল আলাম - মুহাম্মদ বিন কাসিম আন-নুওয়াইরি আল-ইসকান্দারি
- ৬. ইনবাউল গুমর বি আবনাউল উমর - হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানি
- ৭. আল-উনসুল জলিল বিতারিখিল কুদস ওয়াল খলিল - আবুল ইয়ামান আল-উলাইমি
- ৮. ইনতিশারুল ইসলাম বাইনাল মুগুল - ডক্টর রজব মুহাম্মদ আব্দুল হালিম
- ৯. আসবাবুন নুযুল - আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মদ আল-ওয়াহিদি আন-নিশাপুরি
- ১০. আইয়ানুল আসর ওয়া আওয়ানুন নাসর - সালাহুদ্দিন আস-সাফাদি
- ১১. আল-আনওয়ারুস সাতিআ ফিল মিয়াতুস সাবিআ - আশ-শাইখ আগা বুযুর্গ তেহরানি
- ১২. আব-ই-কাওসার - শেখ মুহাম্মদ ইকরাম
- ১৩. আল-ইনতিবাহ ফি সালাসিলিল আউলিয়া, শাহ ওয়ালিউল্লাহর রিসালাহ সমূহের অন্তর্ভুক্ত - শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদিসে দেহলভি
- ১৪. আখবারুদ দুওয়াল ওয়া আসারুল উওয়াল ফিত তারিখ - আহমদ বিন ইউসুফ কারমানি
- ১৫. আতলাসুল ফুতুহাতিল ইসলামিয়া - আহমদ আদিল কামাল
- ১৬. আল-ইসলাম ওয়াদ দুস্তুর - শেখ তাওফিক বিন আব্দুল আজিজ আদ-দাইরি
- ১৭. উর্দু দাইরাতুল মাআরিফ আল-ইসলামিয়া - জামাআতে মুয়াল্লিফিন

হরফ বা

- ১৮. আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব - ইবনে ইযারি আল-মাররাকুশি
- ১৯. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া - হাফিজ ইসমাইল ইবনে কাসির আদ-দিমাশকি
- ২০. বুগয়াতুত তালাব ফি তারিখি হালাব - কামালুদ্দিন ইবনুল আদিম
- ২১. আল-বদরুত তালি' বি মাহাসিন মান বা'দাল করনিস সাবি' - মুহাম্মদ বিন আলী আশ-শাওকানি

হরফ তা

- ২২. তারিখে মাশায়েখে চিশত - মাওলানা যাকারিয়া কান্ধলভি
- ২৩. তারিখে বুখারা - আরমিনুস ভাস্বেরি, অনুবাদ: আহমদ মাহমুদ সাদাতী
- ২৪. তারিখুত তুর্ক ফি আসিয়া আল-উস্তা - প্রফেসর বার্থোল্ড, আরবি অনুবাদ: আহমদ সাঈদ সুলাইমান
- ২৫. তুহফাতুল আশরাফ - জামালুদ্দিন ইউসুফ আল-মিযযি

মৃত্যুর সন খণ্ডসমূহ প্রকাশক প্রকাশের সন

১৩৯৬ হিজরী ৮ দারুল ইলম লিল-মালাজিন ২০০২ খ্রিষ্টাব্দ

৬৯৩ হিজরী ৩ মানশুরাত ওয়াজারাতিস সাকাফাহ, সিরিয়া ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দ

৭৭১ হিজরী ২ মাকতাবাতুল মাআরিফ, রিয়াদ উল্লেখ নেই

৭৩৯ হিজরী ১ আল-মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত ১৩০০ হিজরী

৭৭৫ হিজরী ৩ দাইরাতুল মাআরিফ আল-উসমানিয়া হায়দ্রাবাদ, দাক্ষিণাত্য ১৩৮৮ হিজরী
- ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দ

৮৫২ হিজরী ৪ লাজনাতু ইহয়ায়িত তুরাস ১৩৮৯ হিজরী - ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দ

৯৩৮ হিজরী ২ মাকতাবাতু কুন্দুস, ওমান উল্লেখ নেই

১ দারুল নাহদাহ আল-আরাবিয়্যাহ, কায়রো ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দ

৪৬৮ হিজরী ১ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ১৪১১ হিজরী

১৩১৮ হিজরী - ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ ৫ দারুল ফিকরিল মুয়াসির, বৈরুত ১৩১৮ হিজরী - ১৯৯৮
খ্রিষ্টাব্দ

১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দ ১ মাকতাবা শামিলা, মুদ্রিত সংস্করণের সাথে অমিল উল্লেখ নেই

১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দ ১ ইদারা সাকাফাত ইসলামিয়া, লাহোর ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দ

১১৭৬ হিজরী ৬ শাহ ওয়ালিউল্লাহ ইনস্টিটিউট, নয়াদিল্লি ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দ

১০১৯ হিজরী ৩ আলমুল কুতুব, বৈরুত ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দ

উল্লেখ নেই ১ দারুস সালাম, লাহোর উল্লেখ নেই

উল্লেখ নেই ১ ওয়াজারাতুল আওকাফ ১৩২৫ হিজরী

২৪ দানিশগাহ, পাঞ্জাব ১৯৬৩ থেকে ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দ

মৃত্যুর সন খণ্ডসমূহ প্রকাশক প্রকাশের সন

৭৬২ হিজরী ২ দারুস সাকাফাহ, বৈরুত ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দ

৭৭৪ হিজরী ১৫ দারুল হিজর ১৪০৭ হিজরী - ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দ

৬৬০ হিজরী ১২ দারুল ফিকর উল্লেখ নেই

১২৫০ হিজরী ২ দারুল মা'রিফাহ উল্লেখ নেই

মৃত্যুর সন খণ্ডসমূহ প্রকাশক প্রকাশের সন

১৩০২ হিজরী - ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দ ১ মাকতাবাতুশ শায়খ, করাচি

১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দ ১ সরোশ, ইরান ১৩৯২ হিজরী

১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দ ১ আল-হাইআতুল মিসরিয়্যাতুল আম্মাহ ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দ

৭৪২ হিজরী ১৩ আল-মাকতাবুল ইসলামী ১৪০৩ হিজরী - ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দ

বইয়ের নাম, লেখক ক্রমিক নং

তহজীবুল কামাল ফি আসমায়ির রিজাল, আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ আল-মিযযি ২৬

আত-তাজুল মুকাল্লাল মিন জাওয়াহিরি মাআছিরিত তিরায়িল আখিরি ওয়াল আউয়াল,
মুহাম্মদ সিদ্দিক হাসান খান আল-কান্নুজি ২৭

তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়াহ, সাইয়েদ আহমদ ২৮

আত-তারিখুল ইসলামি, ডক্টর মাহমুদ শাকির ২৯

তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়াহ, ইলমাজ ওজতুনা, অনুবাদক: আদনান মাহমুদ সালমান
..... ৩০

তারিখে উসমানি ফারসি, অনুবাদ: ইরাজ নবখত চারশি লি, প্রফেসর ইসমাইল হাক্কি ওজান
..... ৩১

তারিখে সালাতিনে বনি উসমান, ইজ্জত ইউসুফ বেগ আসাফ ৩২

তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানিয়াহ, মুহাম্মদ ফরিদ বেগ বিন আহমদ ফরিদ
পাশা ৩৩

আত-তাদলিস ফি তারিখিদ দাওলাতিল উসমানিয়াহ, ডক্টর নায়েল সাইয়েদ আহমদ
৩৪

আত-তারিখুল ইসলামি, ডক্টর আহমদ শালবি ৩৫

তারিখে সাকলিয়াহ, মাওলানা রিয়াসাত আলী নদভী ৩৬

তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, আবু আমর খলিফা বিন খাইয়াত আশ-শায়বানি ৩৭

তারিখে ইবনে খালদুন, আবদুর রহমান ইবনে খালদুন ৩৮

তারিখুল ইসলাম, শামসুদ্দিন আয-যাহাবি ৩৯

তারিখে ইসলাম, শাহ মঈনুদ্দিন নদভী ৪০

তারিখে ইউরোপ, অনুবাদ: মৌলভি হামিদ আহমদ আনসারি, এ. জে. গ্রান্ট ৪১

তারিখে তবারি (তারিখুর রসুল ওয়াল মুলুক), ইবনে জারির আত-তবারি ৪২

তারিখে মুখতাসারুদ দুওয়াল, আবুল ফারাজ ইবনুল ইবরি ৪৩

তারিখে জাহান কুশা (এই সংস্করণটি লাইডেন (হল্যান্ড)-এর পাণ্ডুলিপি সামনে রেখে প্রস্তুত
করা হয়েছে যা তিন খণ্ডে এবং ১৯১২ সালে মুদ্রিত হয়েছে), আতা মালিক জুওয়াইনি
..... ৪৪

তারিখে গুজিদাহ, আহমদ উল্লাহ মুস্তাওফি ৪৫

তারিখে বায়হাকি, মুহাম্মদ বিন হুসাইন বায়হাকি ৪৬

আত-তারিখুস সিয়াসি লিদ-দাওলাতিল খাওয়ারেজমিয়াহ, ডক্টর আফাফ সাইয়েদ সাবরা
..... ৪৭

তারিখে খাওয়ারেজম শাহী, গোলাম রব্বানি আজিজ ৪৮

তারিখে দাওয়াত ও আজিমত, সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী ৪৯

তারিখে হাবিবুস সিয়াহ ফি আখবারি আফরাদিল বাশার, গিয়াসুদ্দিন মীর খোয়ান্দ ৫০

তারিখে ওয়াসসাফুল হাজরাহ, আবদুল্লাহ বিন ফজলুল্লাহ ওয়াসসাফ ৫১

তারিখে আদবিয়াতে ইরান, ডক্টর এডওয়ার্ড জি. ব্রাউন, ফারসি অনুবাদ: গোলাম হুসাইন
সাদরি ৫২

তারীখে উম্মতে মুসলিমা

চতুর্থ খণ্ড

মৃত্যু সাল খণ্ড প্রকাশক প্রকাশকাল

৭৩২ হিজরী ৩৫ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত ১৪০০ হিজরী - ১৯৮০ ঈসায়ী

১৩০৭ হিজরী ১ ওয়াজারাতে আওকাফ, কাতার ১৪২৮ হিজরী - ২০০৭ ঈসায়ী

১

২০১৩ ঈসায়ী ২২ আল-মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত ১৪১৫ হিজরী - ১৯৯৫ ঈসায়ী

২০১২ ঈসায়ী ২ মানশুরাতে মুয়াসসাসাতুল ফয়সাল, তুরস্ক ১৯৮৮ ঈসায়ী

১৯৭৫ ঈসায়ী ৫ তুর্ক তারিখ কুরুমু বাসি ১৯৬২ ঈসায়ী

১ মুয়াসসাসাতু হিন্দাউয়ি লিত-তালীম ওয়াস-সাকাফাহ ২০১৩ ঈসায়ী

১৩৩৮ হিজরী ১ দারুল নাফায়েস, বৈরুত ১৪০১ হিজরী - ১৯৮১ ঈসায়ী

ডিজিটাল আকারে: আরশিফ মুনতাদা আল-ফাসাহ, শামিলা

২০০০ ঈসায়ী ১০ মাকতাবাতুন নাহদাতুল মিসরিয়্যাহ, কায়রো ১৯৮৭ ঈসায়ী

উল্লেখ নেই ১ দারুল মুসান্নিফীন, আজমগড় ১৯৩৩ ঈসায়ী

২২০ হিজরী ১ দারুল কালাম, মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, দামেস্ক ১৩৯৭ হিজরী

৮০৮ হিজরী ৮ দারুল ফিকর, বৈরুত ১৪০৮ হিজরী - ১৯৯৫ ঈসায়ী

৭৪৮ হিজরী ১৫ দারুল গারব আল-ইসলামী ২০০৩ ঈসায়ী

১৯৭৪ ঈসায়ী ২ দারুল ইশাআত, করাচি উল্লেখ নেই

১৯৩৮ ঈসায়ী ১ জামিয়া ওসমানিয়া, দাক্ষিণাত্য ১৯৩১ ঈসায়ী

৩১০ হিজরী ১১ দারুল মাতারিফ, মিসর; দারুল তুরাস, বৈরুত ১৩৮৭ হিজরী

২৮৫ হিজরী ১ দারুল শারক, বৈরুত ১৯৯২ ঈসায়ী

২৮৩ হিজরী ৩ হার্মিস ১৩৮৭ হিজরী

৭৫০ হিজরী ১ ইনতিশারাত আমির কবির, ইরান উল্লেখ নেই

৭৭০ হিজরী ১ দানেশগাহে ফেরদৌসী, মশহাদ ১৩৫০ হিজরী

সমসাময়িক ১ দারুল কিতাব আল-জামিঈ, কায়রো ১৯৮৭ ঈসায়ী

১ মজলিসে তারাক্কি-এ-আদব, লাহোর ১৯৭৭ ঈসায়ী

১৩১৯ হিজরী ৮ মজলিসে নাশরিয়াতে ইসলাম, করাচি উল্লেখ নেই

৯৩২ হিজরী ৩ ইনতিশারাত খৈয়াম উল্লেখ নেই

৭৩০ হিজরী ৪ বোস্বে ১২৬৯ ঈসায়ী

১৯২৬ ঈসায়ী ১ মাতবা মারওয়ারিদ, মারকাজ-এ-তাহকিকাত, ইসফাহান

তারিখ উম্মতে মুসলিমা (চতুর্থ খণ্ড)

বইয়ের নাম, লেখক ক্রমিক নং

তারিখুল খুলাফা, জালালুদ্দিন সুয়ুতী ৫৩

তারিখ ইবনে আল-ওয়ারদী, জয়নুদ্দিন ইবনে আল-ওয়ারদী আল-মা'আররি আল-কিন্দি ৫৪

তারিখ ফুতুহাত-ই-মুঘল, জে. জে. স্যাভার্স, ফারসি অনুবাদ: আবুল কাসিম হালাত ৫৫

তারিখুল মক্কাতিল মুশাররাফাহ ওয়াল মাদিনাতিল শরিফাহ, ইবনে জিয়া আল-মাক্কি আল-হানাফি ৫৬

তারিখ-ই-ফেরেশতা (উর্দু অনুবাদ) মুহাম্মদ কাসিম ফেরেশতা, উর্দু অনুবাদ: মুশফিক খাজা ৫৭

তারিখুদ দাওলাতিল মুঘুলিয়াহ ফি ইরান, ডক্টর আব্দুল আজিজ আব্দুল আলাম ফাহমি ৫৮

তারিখ-ই-ইসলাম, আকবর শাহ নজীবাবাদী ৫৯

তুহফাতুত তালিবিন ফি তারজামাতিল ইমাম আন-নববী, আবুল হাসান আলাউদ্দিন ইবনুল আত্তার ৬০

তারিখুল মালিকুজ জাহির, ইজ্জুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে শাদ্দাদ ৬১

তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়াহ মিনান নুশু ইলাল ইনহীদার, ডক্টর খলিল ইনালজিক, অনুবাদ: ডক্টর মুহাম্মদ এম. আল-আরনাউত ৬২

হরফ জ

জামিউত তাওয়ারিখ (আরবি), রশিদুদ্দিন ফজলুল্লাহ, আরবি অনুবাদ: মুহাম্মদ সাদিক নাশআত, ফুয়াদ আব্দুল মু'তি ৬৩

আল-জাওয়াহিরুল মুদিয়াহ ফি তাবাকাতিল হানাফিয়াহ, আবু মুহাম্মদ মুহিউদ্দিন আল-হানাফি ৬৪

জাওয়ানিবে মুদিয়াহ ফি তারিখিল উসমানিয়ায়িন আল-আতরাক, জিয়াদ মাহমুদ আবু গানিমাহ ৬৫

জামিউত তাওয়ারিখ (ফারসি), রশিদুদ্দিন ফজলুল্লাহ ৬৬

হরফ চ

চেন্সিস খান (উর্দু অনুবাদ: আজিজ আহমদ), হ্যারল্ড ল্যান্স ৬৭

হরফ হ

আল-হুরুব আস-সালিবিয়াহ, মুহাম্মদ আরুসি আল-মাতওয়ী ৬৮

আল-হাওয়াদিসুল জামিআহ ওয়াত তাজারুবুন নাফিআহ ফিল মিআতিল সাবিআহ, কামালুদ্দিন আবুল ফজল ইবনুল ফুওয়াতি ৬৯

আল-হুকুমাতুল ইসলামিয়াহ, সৈয়দ রুহুল্লাহ খোমেনী ৭০

হুসনুল মুহাদারা ফি তারিখি মিসর ওয়াল কাহিরা, জালালুদ্দিন সুয়ুতী ৭১

হায়াতে সালাহউদ্দিন, মুন্সী মুহাম্মদ সিরাজুদ্দিন আহমদ ৭২

হরফ খ

আল-খুতুতুল আরিদা লিল উসুসিল্লাতি কামা আলাইহা দিনুশ শিয়াতিল ইসনা আশারিয়াহ, মুহিবুদ্দিন বিন আবিল ফাতহ ৭৩

খাজা তুসী ইয়া রুহি ওয়া আকল, আব্দুল ওয়াহিদ ওয়াফায়ী ৭৪

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

মৃত্যুর সাল খণ্ডসমূহ প্রকাশক প্রকাশের সাল

৯১১ হিজরী ১ মাকতাবা নিযার ১৪২৫ হিজরী - ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ

৭৩৯ হিজরী ২ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত ১৪১৭ হিজরী - ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দ

উল্লেখ নেই ১ মুয়াসসাসাতু ইনতিশারাত, তেহরান উল্লেখ নেই

৮৫২ হিজরী ১ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ ১৪২৪ হিজরী - ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ

১৬২০ খ্রিষ্টাব্দ ৪ আল-মিযান, লাহোর ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দ

উল্লেখ নেই ১ দারুল মাআরিফ, মিশর উল্লেখ নেই

১০ মে ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দ ৩ নাফিস একাডেমি, করাচি ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দ

৭২২ হিজরী ১ আদ-দারুল আসারিয়াহ, আন্মান ১৪২৮ হিজরী - ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দ

৬৮৪ হিজরী ১

- .
- .

উল্লেখ নেই ১ দারুল মাদার আল-ইসলামি উল্লেখ নেই

১৩১৮ হিজরী ৩ দারুল ইহয়ায়িল কুতুবিল আরাবিয়াহ, মিশর উল্লেখ নেই

৭৭৫ হিজরী ২ মীর মুহাম্মদ কুতুবখানা, করাচি উল্লেখ নেই

উল্লেখ নেই ১ দারুল ফুরকান লিন-নাশর ওয়াত-তাওযি ১৪০৩ হিজরী - ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দ

৭০২ হিজরী ৩ ইদারা-ই-গাহ বালুশা ফ্রান্সেস ব্রিল লিডেন (হল্যান্ড) ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দ

১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দ ১ গোহর পাবলিশিং উল্লেখ নেই

সমসাময়িক ১ দারুল গারব আল-ইসলামি ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দ

৭২৩ হিজরী ১ শামিলা উল্লেখ নেই

১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দ ১

- .
- .

৯১১ হিজরী ২ দারুল ইহয়ায়িল কুতুবিল আরাবিয়াহ ১৩৮৭ হিজরী - ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দ

উল্লেখ নেই ১ আল-ফয়সাল, লাহোর ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দ

১৩৮৯ হিজরী ১ আল-মাকতাবাতুশ শামিলা উল্লেখ নেই

উল্লেখ নেই ১ মুয়াসসাসাতু ইনতিশারাত, আমির কবির ১৩৯২ হিজরী

তারিখ মিল্লাত-ই-মুসলিমা

ক্রমিক নং কিতাবের নাম লেখক

হরফ দ

৭৫. দুওয়াল আল-ইসলাম মা'আ আল-যাইল শামস উদ্দিন আয-যাহাবী

৭৬. আদ-দারিস ফি তারিখ আল-মাদারিস আব্দুল কাদির আন-নুয়াইমি

৭৭. আদ-দুরার আল-কামিনাহ ফি আয়ান আল-মিআহ আস-সামিনাহ হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানি

৭৮. দাওয়াত-ই-ইসলাম টি ডব্লিউ আর্নল্ড, অনুবাদ: শেখ মুহাম্মদ এনায়েত উল্লাহ

৭৯. আদ-দাওলাহ আল-খাওয়ারিজমিয়াহ ওয়াল মাগুল হাফিজ আহমদ হামদি

৮০. কাইফা আসলামা আল-মাগুল? (দাওর তুর্কিস্তান ফি ইসলাম আল-মাগুল) ডক্টর মুহাম্মদ আলী আল-বার

৮১. আদ-দাওলাহ আল-উসমানিয়াহ ফিল তারিখ আল-ইসলামি আল-হাদিস ইসমাইল আহমদ ইয়াগি

৮২. আদ-দাওলাহ আল-উসমানিয়াহ: আওয়ামিল আন-নুহদ ওয়া আসবাব আস-সুকুত আলী মুহাম্মদ আস-সাল্লাবি

৮৩. দাওলাত-ই-উসমানিয়া ডক্টর মুহাম্মদ আজিজ

হরফ যাল

৮৪. যাইল মিরআত আয-যামান আবুল ফাতহ কুতুব উদ্দিন আল-ইউনিনি

৮৫. আয-যাইল আত-তাম আলা দুওয়াল আল-ইসলাম শামস উদ্দিন সাখাভি

৮৬. যাইল তাবাকাত আল-হানাবিলাহ জয়নুদ্দিন ইবনে রজব হাম্বলী

৮৭. যাইল আত-তাকয়িদ ফি রুওয়াত আস-সুনান ওয়াল আসানিদ তাকি উদ্দিন আল-ফাসি

হরফ রা

৮৮. রিসালাহ ইলাস সুলতান আল-মালিক আন-নাসির ফি শান আত-তাতার (ফি “জামে মাসায়েল ইবনে তাইমিয়া”) ইবনে তাইমিয়া, সংকলক: আজিজ শামস

৮৯. রিহলাত ইবনে জুবায়ের ইবনে জুবায়ের আল-আন্দালুসি

৯০. আর-রাওদ আয-যাহির ফি সিরাত আল-মালিক আয-যাহির আলা উদ্দিন ইবনে আব্দুল যাহির

৯১. রওজাতুস সাফা ফি সিরাতিল আশ্বিয়া ওয়াল মুলুক ওয়াল খুলাফা মীর খোয়ান্দ (মুহাম্মদ বিন আমির খোয়ান্দ শাহ হারভি)

৯২. রওজাতুল জিনান মুহাম্মদ বাকির আল-মুসাভি

৯৩. রিহলাত ইবনে বতুতা আবু আব্দুল্লাহ ইবনে বতুতা

৯৪. রাফউল ইসর আন কুদাত মিসর হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানি

৯৫. রওজাতুল মানাজির ফি ইলমিল আওয়াইল ওয়াল আওয়াহির মুহিবুদ্দিন আবুল ওয়ালিদ মুহাম্মদ ইবনে শিহনা

হরফ সিন

৯৬. সিয়ারু আলামিন নুবালা শামস উদ্দিন আয-যাহাবী

৯৭. সুনান আত-তিরমিজি মুহাম্মদ বিন ঈসা আত-তিরমিজি

তারীখে উম্মতে মুসলিমা

চতুর্থ খণ্ড

মৃত্যু সাল খণ্ড সংখ্যা প্রকাশক প্রকাশের সাল

৭৩৮ হি. ২ দার সাদির, বৈরুত ১৯৯৯ খ্রি.

৯২৬ হি. ১ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ ১৪১০ হি.-১৯৯০ খ্রি.

৮৫২ হি. ৬ মজলিস দাইরাতুল মাআরিফ আল-উসমানিয়া, হায়দ্রাবাদ, ভারত ১৩৯২ হি.-১৯৭২ খ্রি.

১৯৩০ খ্রি. ১ আওকাফ বিভাগ, পাঞ্জাব সরকার, লাহোর

.

.

১ দারুল ফিকরিল আরাবি, কায়রো ১৯৪৯ খ্রি.

সমসাময়িক ১ দারুল ফাতহ লিন-দিরাসাত ওয়ান-নাশর ১৪২৯ হি.-২০০৮ খ্রি.

২০০৯ খ্রি. ১ মাকতাবাতুল ওবাইকান, রিয়াদ ১৪১৭ হি.-১৯৯৬ খ্রি.

সমসাময়িক ১ দারুত তাওজি ওয়ান-নাশর আল-ইসলামিয়া, মিশর ১৪২১ হি.-২০০১ খ্রি.

.

২ দারুল মুসান্নিফীন শিবলী একাডেমি, আজমগড়, ভারত ২০০৯ খ্রি.

— — — —

৭২৬ হি. ৪ দারুল কুতুবিল ইসলামি, কায়রো ১৪১৩ হি.-১৯৯২ খ্রি.

৯০২ হি. ৩ দারু ইবনিল ইমাদ, বৈরুত ১৪১২ হি.

৭৯৫ হি. ৫ মাকতাবাতুল ওবাইকান ১৪২৫ হি.-২০০৫ খ্রি.

৮৩২ হি. ২ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত ১৪১০ হি.-১৯৯০ খ্রি.

— — — —

৭২৮ হি. ১ দারু আলমিল ফাওয়াইদ লিন-নাশর ওয়াত-তাওজি ১৪২২ হি.

৬১২ হি. ১ দার, বৈরুত উল্লেখ নেই

৬৯২ হি. ১ আর-রিয়াদ উল্লেখ নেই

৯০৩ হি. ৫ নাওয়াল কিশোর উল্লেখ নেই

.

.

মুয়াসসাসাতু দারিন নাশর, তেহরান

.

৭৭৯ হি. ৫ একাডেমি আল-মামলাকাতুল মাগরিবিয়া, রাবাত ১৪১৭ হি.

৮৫২ হি. ১ মাকতাবাতুল খানজি, কায়রো ১৪১৮ হি.-১৯৯৮ খ্রি.

৮১২ হি. ১ পাণ্ডুলিপি

.

— — — —

৭৩৮ হি. ২৫ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ ১৪০৫-১৯৮৫ খ্রি.

২৭৯ হি. ৫ মুস্তফা আল-বাবি আল-হালাবি, মিশর ১৩৯৫-১৯৭৫ খ্রি.

বইয়ের নাম (লেখক) ক্রমিক নং

আস-সুলুক লি-মা'রিফাত দুওয়ালিল মুলুক (তাকিউদ্দীন আল-মাকরিজি) ৯৮

সিরাত সুলতান জালালুদ্দীন মানকুবিরনি (শিহাবুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আহমদ আন-নাসাউয়ি)
..... ৯৯

সালজুক নামা (ইবনে বিবি - উর্দু অনুবাদ: মুহাম্মদ জাকারিয়া মাইল) ১০০

সিমতু নুজুমিল আউয়ালি ফি আনবাউল আউয়াইল ওয়াত তাওয়ালি (আব্দুল মালিক আল-
ইসামী আল-মাক্কি) ১০১

সুল্লামুল উসুল ইলা তাবাকাতিল ফুহুল (কাতিব চেলপি - হাজি খলিফা) ১০২

আস-সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ (ডক্টর মুহাম্মদ সালিম আল-রশিদি) ১০৩

হরফ শ

শারহুন নববী আলা সহীহ মুসলিম (ইমাম শরফ আন-নববী) ১০৪

শিফাউল গারাম বি-আখবারিল বালাদিল হারাম (আবুল তাইয়িব মুহাম্মদ বিন আহমদ আল-
ফাসি) ১০৫

শাজারাতুজ জাহাব ফি আখবারি মান জাহাব (ইবনে ইমাদ আল-হাম্বলী) ১০৬

হরফ স

সহীহ মুসলিম (মুসলিম বিন হাজ্জাজ আল-কুশাইরি) ১০৭

সহীহ আল-বুখারী (মুহাম্মদ বিন ইসমাইল আল-বুখারী) ১০৮

হরফ ত

তাবাকাত-ই নাসিরি (কাজি মিনহাজুস সিরাজ) ১০৯

তাবাকাতুশ শাফিইয়াতিল কুবরা (তাজউদ্দীন আব্দুল ওয়াহাব আস-সুবকি) ১১০

তাবাকাতুন নাসায়িন (বকর বিন আব্দুল্লাহ আবু যায়েদ বিন মুহাম্মদ) ১১১

আত-তাওয়াইফুল মাগুলিয়্যাহ ফি মিসর (ডক্টর সালাহুদ্দীন মুহাম্মদ নূর) ১১২

তাবাকাতুশ শাফিইয়ীন (আবুল ফিদা ইবনে কাসীর আদ-দিমাশকি) ১১৩

তাবাকাতুল হুফফাজ (জালালুদ্দীন সুয়ুতী) ১১৪

হরফ আ

আল-আরব ফি সিকিলিয়্যাহ (ডক্টর ইহসান আব্বাস) ১১৫

আল-ইবার ফি খাবারি মান গাবার (হাফিজ শামসুদ্দীন আজ-জাহাবী) ১১৬

উমদাতুল কারী শারহ সহীহ আল-বুখারী (বদরুদ্দীন আইনি হানাফী) ১১৭

আল-উকুদুদ দুররিয়্যাহ মিন মানাকিবি ইবনে তাইমিয়্যাহ (শামসুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আহমদ
আদ-দিমাশকি) ১১৮

আল-আসজাদুল মাসবুক ওয়াল জাওহারুল মাহকুক ফি তাবাকাতিল খুলাফা ওয়াল মুলুক
(আল-মালিকুল আশরাফ আল-গাসসানি) ১১৯

ইকদুল জুমান ফি তারিখি আহলিয যামান (বদরুদ্দীন আল-আইনি) ১২০

আল-উকুদুদ দুররিয়্যাহ ফি মানাকিবি ইবনে তাইমিয়্যাহ (ইবনে আব্দুল হাদি আদ-দিমাশকি)
..... ১২১

তারীখে উম্মতে মুসলিমা

চতুর্থ খণ্ড

সন ও মৃত্যু খণ্ডসমূহ প্রকাশক প্রকাশের সন

.

৮৩৫ হিজরী ৮ দারুল কুতুব, বৈরুত ১৪১৮ হিজরী - ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ

.

৬৩২ হিজরী ১ দারুল ফিকর আল-আরাবি, কায়রো ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দ

.

৬৮০ হিজরী ১ কেন্দ্রীয় উর্দু বোর্ড, লাহোর ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দ

.

১১১১ হিজরী ৪ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, বৈরুত ১৪১৯ হিজরী - ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ

.

১০৬৭ হিজরী ৬ মাকতাবা আরসিকা, ইস্তাম্বুল, তুরস্ক ২০১০ খ্রিষ্টাব্দ

.

..... ১ দারুল বাশির, মিশর ১৪৩৪ হিজরী - ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ

.

৭৬৬ হিজরী ৬ দারুল ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত ১৩৯২ হিজরী

.

৮৩২ হিজরী ২ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ ১৪২১ হিজরী - ২০০০ খ্রিষ্টাব্দ

.

১০৮৯ হিজরী ১১ দারুল ইবনে কাসীর, দামেস্ক ১৪০৬ হিজরী - ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দ

.

৪২১ হিজরী ৫ দারুল জিল ১৪১৩ হিজরী - ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দ

.

২৫৬ হিজরী ৯ দারুল তওকুন নাজাত ১৪২২ হিজরী

.

৬৫৮ হিজরী ২ আঞ্জুমানে তারীখে আফগানিস্তান, কাবুল ১৩৩৩ হিজরী

.

৭৭৬ হিজরী ১০ হাজার লিতিবায়তি ওয়ান নাশর ১৩১৩ হিজরী

.

১২২৯ হিজরী ১ দারুল রুশদ, রিয়াদ ১৪০৭ হিজরী - ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দ

.

সমসাময়িক ১ মানশাউল মাআরিফ, আলেকজান্দ্রিয়া -

.

৭৭৬ হিজরী ১ মাকতাবাতুস সাকাফাতুদ দ্বীনিয়াহ ১৪১৩ হিজরী - ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দ

.

৯১১ হিজরী ১ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, বৈরুত ১৪০৩ হিজরী

.

১৩২২ হিজরী ১ দারুল সাকাফাহ, বৈরুত, লেবানন ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দ

.

মৃত্যু ৭৪৮ হিজরী ৪ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ উল্লেখ নেই

.

৮৫৫ হিজরী ২৫ দারুল ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবি উল্লেখ নেই

.

৭৬৬ হিজরী ১ দারুল কুতুব আল-আরাবি, বৈরুত উল্লেখ নেই

.

৮০৩ হিজরী ১ দারুল বায়ান, বাগদাদ ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দ

.

৮৫৫ হিজরী ৫ দারুল কুতুব ওয়াল ওয়াসায়েক উল্লেখ নেই

.

মৃত্যু ৪৬৬ হিজরী ১ দারুল কুতুব আল-আরাবি, বৈরুত উল্লেখ নেই

তারিখে মিল্লাতে মুসলিমা

আজায়িবুল মাকদুর ফি আখবার-ই-তৈমুর, ইবনে আরব শাহ ১২২

আল-উসমানিয়্যুন ফিত তারিখ ওয়াল হাদারাহ, ডক্টর মুহাম্মদ হারব ১২৩

বর্ণ ফ

ফাওয়াতুল ওয়াফায়াত, ইবনে শাকির সালাহউদ্দীন ১২৪

ফিরোজুল লুগাত জামে, মকবুল বদখশানি ১২৫

আল-ফিহরিস্ত, ইবনে নাদিম বাগদাদী ১২৬

ফাতিহে কুস্তনতুনিয়া আস-সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ, আলী মুহাম্মদ আস-সাল্লাবি
১২৭

ফি উসুলিত তারিখিল উসমানি, আহমদ আব্দুর রহিম মুস্তফা ১২৮

বর্ণ ক্বাফ

কিসসাতুত তাতার মিনাল বিদায়াহ ইলা আইন জালুত, ডক্টর রাগিব আস-সিরজানি
১২৯

কিসাসুল মাসনবী, মুহাম্মদ মুহাম্মদী ১৩০

বর্ণ কাফ

আল-কামিল ফিত তারিখ, ইবনে আসির আল-জাযারি ১৩১

কিতাবুর রওদাতাইন ফি আখবারিদ দাওলাতাইন (উয়ুনুর রওদাতাইন), আবু শামা আল-
মাকদিসি ১৩২

কাশফুল আসরার, আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনি ১৩৩

কুল্লিয়াতে সাদী, তাহকীক: মুহাম্মদ আলী ফুরুগী, মুসলিহউদ্দীন সাদী শিরাজী ১৩৪

কাশফুজ জুনুন আন আসামিল কুতুবি ওয়াল ফুনুন, কাতিব চেলবি (হাজি খলিফা)
১৩৫

বর্ণ লাম

লিসানুল মিজান, হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানি ১৩৬

বর্ণ মীম

মাওসুয়াতুল আরাবিয়্যাহ আল-আলামিয়্যাহ, জামায়াতুম মিনাল উলামা ১৩৭

আল-মুসলিমুন ফি সিকিলিয়্যাহ, আহমদ তৌফিক আল-মাদানি ১৩৮

মুজামু মাতনিল লুগাহ, আহমদ রেজা আল-আমিলি বাহাউদ্দীন ১৩৯

মুফাররিজুল কুরুব ফি আখবারি বানি আইয়ুব, ইবনে ওয়াসিল আল-আসবাহানি ১৪০

আল-মুনতাজাম ফি তারিখিল মুলুকি ওয়াল উমাম, আব্দুর রহমান ইবনুল জাওজি ১৪১

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, আবু বকর ইবনে আবি শায়বাহ ১৪২

আল-মাওয়াযিজ ওয়াল ইতিবার বি জিকরিল খুতাতি ওয়াল আসার (আল-খুতাতুল
মাকরিজি), তাকিউদ্দীন আল-মাকরিজি ১৪৩

তারীখে উম্মতে মুসলিমা

খণ্ড ৪

মৃত্যুর সাল খণ্ডসমূহ প্রকাশক প্রকাশের সাল

৮৫২ হিজরী ১ কলকাতা ১৮১৭ খ্রি.

সমসাময়িক ১ আল-মারকাজুল মিসরি লিদ-দিরাসাতিল উসমানিয়্যাহ, কায়রো ১৪১৩ হিজরী - ১৯৯৩ খ্রি.

৭৬২ হিজরী ৪ দারু সাদির, বৈরুত ১৯৭৩ - ১৯৭৪ খ্রি.

১ ফিরোজ সন্স, লাহোর

৩৩৮ হিজরী ১ দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত ১৪১৭ হিজরী - ১৯৯৭ খ্রি.

সমসাময়িক ১ দারুল নাশর ওয়াত তাওজি', কায়রো, মিশর ১৪২৪ হিজরী - ২০০৬ খ্রি.

২০০২ ১ দারুল শুরুক ১৪০৬ হিজরী - ১৯৮৬ খ্রি.

সমসাময়িক ১ মুয়াসসাসাতু ইকরা, কায়রো ১৩২৭ খ্রি.

দারুল মাহাব্বাতিল বাইদা, বৈরুত ১৪১৮ হিজরী - ১৯৯৮ খ্রি.

৩৩০ হিজরী ১০ দারুল কিতাবিল আরাবি, বৈরুত ১৪১৭ হিজরী - ১৯৯৭ খ্রি.

৬২৫ হিজরী ৪ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত ১৯৯৭ খ্রি.

১৯৮৯ ১ তেহরান ১৯৬৩ খ্রি.

২৯১ হিজরী ১ হার্মাস, ইরান

১০৬৭ হিজরী ২ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ ১৯৪১ খ্রি.

৮৫২ হিজরী ৭ মাতবা' নিযামিয়া, হায়দ্রাবাদ দাক্ষিণাত্য ১৩৯০ হিজরী - ১৯৭১ খ্রি.

সফটওয়্যার

১৩৭৫ হিজরী ১ আল-মাতবা'তুল আরাবিয়্যাহ, আলজেরিয়া

১৩৭২ হিজরী ৫ দারু মাকতাবাতিল হায়াত, বৈরুত ১৩৭৭ হিজরী

৬৯৭ হিজরী ৫ দারুল কুতুব ওয়াল ওয়াসাইকুল কাওমিয়্যাহ, মিশর ১৩৭৭ হিজরী - ১৯৫৭ খ্রি.

৫৯৭ হিজরী ১৯ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ ১৪১২ হিজরী - ১৯৯২ খ্রি.

২৩৫ হিজরী ৭ মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ ১৪০৯ হিজরী

৮৩৫ হিজরী ৪ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ১৪১৮ হিজরী

৭৯৯

মিরকাতুল মাফাতিহ ফি শারহি মিশকাতিল মাসাবিহ — মোল্লা আলী কারী আল-হারাভী
..... ১৪৪

মুজামুল উদাবা — ইয়াকুত আল-হামাভী ১৪৫

মুজামুল বুলদান — ইয়াকুত আল-হামাভী ১৪৬

আল-মুখতাসার ফি আখবারিল বাশার — আবুল ফিদা ১৪৭

মিরসাদুল ইবাদ মিনাল মাবদা ইলাল মাআদ (ফারসি) পাণ্ডুলিপি — নাজমুদ্দিন রাজি
১৪৮

মাওরিদুল লাতাফাহ ফি মান ওয়ালিয়াস সুলতানাহ ওয়াল খিলাফাহ — ইউসুফ বিন তাগরি
বারদি ১৪৯

আল-মানহালুস সাফি ওয়াল মুস্তাওফি বাদাল ওয়াফি — ইউসুফ বিন তাগরি বারদি
১৫০

আল-মাকসাদুল আরশাদ ফি জিকর আসহাবিল ইমাম আহমাদ — বুরহানুদ্দিন ইবনে
মুফলিহ ১৫১

মাজালিসুল মুমিনি — কাজী নুরুল্লাহ শুস্তারি ১৫২

মিরাতুল জিনান ওয়া ইবরাতুল ইয়াকজান — আবদুল্লাহ বিন আসআদ আল-ইয়াফেয়ী
১৫৩

মাসালিকুল আবসার ফি মামালিকিল আমসার — আহমাদ বিন ইয়াহইয়া আল-আদাওয়ী
আল-উমারি ১৫৪

মুখতারুল আখবার — বাইবার্স মানসুরি ১৫৫

মাজমুউল ফাতাওয়া — আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনে তাইমিয়া আল-হাররানি
১৫৬

মুফাকাহাতুল খিলান ফি হাওয়াদিসিজ জামান — ইবনে তুলুন হানাফী ১৫৭

মাজালিসুস সুলতান আল-গাওরি, সাফাহাত মিন তারিখি মিসর ফিল কারনিল আশিরিল
হিজরি — ডক্টর আব্দুল ওয়াহাব আজ্জাম ১৫৮

মাজমাউল আদাব ফি মুজামিল আলকাব — আবুল ফজল কামালুদ্দিন ইবনুল ফুওয়াতি
..... ১৫৯

মুজামুল মুয়াল্লিফিন — উমর বিন রেজা কাহহালা আদ-দিমাশকি ১৬০

আল-মানহালুল আজবু রাভি ফি তারজামতি কুতুবিল আউলিয়া আন-নববী — শামসুদ্দিন
আবুল খায়ের আস-সাখাভী ১৬১

মুজামুশ শুযুখ — তাজউদ্দিন আব্দুল ওয়াহাব আস-সুবকি ১৬২

মাজাল্লাতুর রিসালাহ জুলাই ১৯৫২ খ্রি., প্রবন্ধ: উস্তাদ আতাউল্লাহ তারজি বাশি —
সম্পাদক আহমাদ জায়য়াত পাশা ১৬৩

মানাম তৈমুর জাহাঙ্গুশা — তৈমুর লং ১৬৪

আল-মারিফাহ ওয়াত তারিখ — ইয়াকুব বিন সুফিয়ান আল-ফাসাওয়ী ১৬৫

হরফ ন

নিহায়াতুল আরাব ফি ফুনুনিল আদাব — শিহাবুদ্দিন আন-নুওয়াইরি ১৬৬

আন-নুজুমুজ জাহিরহ ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহিরা — জামালুদ্দিন ইউসুফ বিন তাগরি
বারদি ১৬৭

আন-নাওয়াদিরুস সুলতানিয়াহ ওয়াল মাহাসিনুল ইউসুফিয়াহ — বাহাউদ্দিন ইবনে শাদ্দাদ
..... ১৬৮

আন-নিসাউল হাকিমাত ফিল মাগুল — ডক্টর আলা মাহমুদ খলিল ১৬৯

চতুর্থ খণ্ড

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

মৃত্যুর সাল খণ্ডসমূহ প্রকাশক প্রকাশের সাল

১০১২ হি. ৯ দারুল ফিকর, বৈরুত ১৪২২ হি. - ২০০২ খ্রি.

৬২৬ হি. ৭ দারুল গারব আল-ইসলামি, বৈরুত ১৪১৩ হি. - ১৯৯৩ খ্রি.

৬২৬ হি. ৭ দার সাদির, বৈরুত ১৯৯৫ খ্রি.

৭৩২ হি. ৪ আল-মাতবাতা আল-হুসাইনিয়া, মিসর উল্লেখ নেই

৬৫২ হি. ১ কুতুব খানা আস্তানা কুম, ইরান উল্লেখ নেই

৮৭৪ হি. ২ দারুল কুতুব আল-মিসরিয়া, কায়রো উল্লেখ নেই

৮৭৪ হি. ৭ আল-হাইআ আল-মিসরিয়া উল্লেখ নেই

৮৮৪ হি. ৩ মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ ১৪১০ হি. - ১৯৯০ খ্রি.

১০১৯ হি. ১ কিতাব ফরোশি ইসলামিয়া, তেহরান উল্লেখ নেই

৭৬৮ হি. ৪ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ ১৪১৭ হি. - ১৯৯৭ খ্রি.

৭৩৯ হি. ২৭ আল-মাজমাউস সাকাফি, আবুধাবি ১৪২৩ হি.

৭২৫ হি. ১ আদ-দারুল মিসরিয়াহ আল-লুবনানিয়াহ ১৯৯৩ খ্রি.

৭২৮ হি. ৩৫ মুজাম্মা আল-মালিক ফাহাদ ১৪১২ হি. - ১৯৯৮ খ্রি.

৯৫৩ হি. ১ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ ১৪১৮ হি. - ১৯৯৮ খ্রি.

১৯৫৯ খ্রি. ১ মাকতাবাতুস সাকাফাহ আদ-দীনিয়াহ, কায়রো ১৪৩১ হি. - ২০১০ খ্রি.

৭২৩ হি. ১ উইজারাতুস সাকাফাহ, ইরান ১৪১৬ হি.

১৩০৮ হি. ১৩ মাকতাবাতুল মুসান্না, বৈরুত উল্লেখ নেই

৯০২ হি.

.

মাকতাবা শামিলা উল্লেখ নেই

৭৭৬ হি. ১ দারুল গারব আল-ইসলামি ২০০২ খ্রি.

১৩৮৮ হি. ১ মাকতাবা শামিলা উল্লেখ নেই

৮০৭ হি. ১ মুস্তাওফি, মারকাজ তাহকিকাত রাইয়ানা, ইসফাহান উল্লেখ নেই

৩২৭ হি. ৩ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত ১৪০১ হি. - ১৯৮১ খ্রি.

— — — —

৭৩৩ হি. ৩৩ দারুল কুতুব ওয়াল ওয়াসাইক আল-কাওমিয়াহ ১৪২৩ হি.

৪৩৭ হি. ১৬ দারুল কুতুব, মিসর উল্লেখ নেই

৬৩২ হি. ১ মাকতাবাতুল খানজি, কায়রো ১৪১৫ হি. - ১৯৯৪ খ্রি.

ক্রমিক নং বইয়ের নাম লেখক

১৭০ নুসরাতুল আহলিল ঈমান বি দাওলাতি আলি উসমান শাইখুল ইসলাম মুহাম্মদ বিন আবিস সুরুর আল-বাকরি

১৭১ নুযহাতুল আনজার ফি আজায়িবিত তাওয়ারিখ ওয়াল আখবার মাহমুদ মাকদিস

১৭২ নাইলুল আমাল ফি জাইলিল দুওয়াল জয়নুদ্দিন ইবনে শাহিন আল-মালতি

১৭৩ নুযহাতুল আনাম ফি তারিখিল ইসলাম সারিমুদ্দিন ইবনে দুকমাক

হরফ ওয়াও

| ১৭৪ | ওয়াফায়াতুল আইয়ান | ইবনে খাল্লিকান |

| ১৭৫ | ওয়াফাউল ওয়াফা বি আখবারি দারিল মুস্তফা | আলী বিন আবদুল্লাহ আস-সামহুদি |

| ১৭৬ | আল-ওয়াফি বিল ওয়াফায়াত | সালাহুদ্দিন আস-সাফাদি |

| ১৭৭ | আল-ওয়াফায়াত | তাকিউদ্দীন ইবনে রাফি আল-সালামি |

| ১৭৮ | আল-ওয়াফায়াত | ইবনে কুনফুদ |

হরফ ইয়া

| ১৭৯ | ইয়াদগারে সোহরাওয়ার্দিয়া | খাউর সোহরাওয়ার্দি |

চতুর্থ খণ্ড

তারীখে উম্মতে মুসলিমা

মৃত্যুর সন খণ্ডসমূহ প্রকাশক প্রকাশের সন

১০৭১ হি. ১ মাজমাউল কাসিমি লিল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ একাডেমি আল-কাসিমি ১৪১৩
হি. - ২০১২ খ্রি.

১২২৮ হি. ২ দারুল গারব আল-ইসলামি, বৈরুত ১৯৮৮ খ্রি.

৯২০ হি. ৯ আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ লিভিবায়াতি ওয়ান নাশর, বৈরুত ১৪২২ হি. -
২০০২ খ্রি.

৮০৯ হি. ১ আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, বৈরুত ১৪২০ হি. - ১৯৯৯ খ্রি.

৬৮১ হি. ৭ দার সাদির ১৯৯৪ খ্রি.

৯১১ হি. ৪ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ ১৪১৯ হি.

৭৬৩ হি. ২৯ দারু ইহয়ায়িত তুরাস ১৪২০ হি. - ২০০০ খ্রি.

৭৭৩ হি. ২ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত ১৪০২ হি.

৮১০ হি. ১ দারুল আফাক আল-জাদিদাহ, বৈরুত ১৪০৩ হি. - ১৯৮৩ খ্রি.

সমসাময়িক ১ নাজির সন্স, লাহোর ১৯৯৯ খ্রি.

চতুর্থ খণ্ড

উন্মত্তে মুসলিমার ইতিহাস

মৃত্যুর বছর খণ্ডসমূহ প্রকাশক প্রকাশনা

১৯১৩ ১ আর্চিবল্ড কনস্টেবল অ্যান্ড কোং

১৯৬২ ১ রবার্ট হেল লিমিটেড, লন্ডন ১৯৪১

১৭৯৪ ২ জর্জ বেল অ্যান্ড সন্স, লন্ডন ১৮৮৪

২ লন্ডন। ব্র্যাডবেরি অ্যান্ড ইভান্স ১৮৫৬

১৯৩১ ১

১৮৩৯ ৩ জি পি পাটনা এমজেড সন্স ব্রেড ফুড স্ট্রিট, লন্ডন ১৮৯৮

৩০ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা ১৯৮০

৮০৪

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

নং বইয়ের নাম লেখক

১৮০ দ্য প্রিচিং অফ ইসলাম টি.ডব্লিউ. আর্নল্ড

১৮১ দ্য মার্চ অফ দ্য বারবারিয়ানস হ্যারল্ড ল্যাম্ব

১৮২ দ্য হিস্ট্রি অফ দ্য ডিক্লাইন অ্যান্ড ফল অফ দ্য রোমান এম্পায়ার এডওয়ার্ড গিবন

১৮৩ হিস্ট্রি অফ দ্য উসমান তুর্কস (সংকলিত ই.এস. ক্রিসি এম.এ) ভন হ্যামার

১৮৪ সালাহউদ্দিন স্ট্যানলি লিন পল

১৮৫ দ্য হিস্ট্রি অফ দ্য ক্রুসেডস জোসেফ ফ্রাঁসোয়া মিশাউড (অনুবাদক: ডব্লিউ. রবসন)

১৮৬ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা: ১৫তম

৮০৫

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

গবেষণা

ইসলামের ইতিহাসবিদ মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান মদদাজিল্লুহ

আল-মানহাল পাবলিশার্স

ব্লক এ-১, গুলশান-ই-জাওহার, ইউনিভার্সিটি রোড, করাচি

0321-3135009 / 0321-2000870

www.almanhalpublisher.com

almanhalpublisher@gmail.com

চতুর্থ অংশ

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

পঞ্চম খণ্ড

গবেষণা

ইসলামের ইতিহাসবিদ মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান মাদদাজিঞ্জুহু

মুদ্রণাধীন

আল-মানহাল পাবলিশার্স

ব্লক এ-১, গুলিস্তান-ই-জওহর, ইউনিভার্সিটি রোড, করাচি

০৩২১-৩১৩৫০০৯, ০৩২১-২০০০৮৭০

www.almanhalpublisher.com

almanhalpublisher@gmail.com

৮০৭

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

ষষ্ঠ খণ্ড

গবেষণা:

ঐতিহাসিক ইসলাম মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান মদাজিদ্দুল্লাহ

মুদ্রণাধীন

আল-মানহাল পাবলিশার্স

ব্লক এ-১, গুলিস্তান-ই-জওহর, ইউনিভার্সিটি রোড, করাচি

০৩২১-৩১৩৫০০৯ ০৩২১-২০০০৮৭০

www.almanhalpublisher.com

almanhalpublisher@gmail.com